প্রমীলা
গল্প
সংগ্রহ

প্রমীলা

গল্প সংকলন

প্রমীলা

গল্প সংকলন

সেকালের বিখ্যাত, একালের বিস্মৃতি

১০০ জন লেখিকার ১০০ টি গল্প

সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ
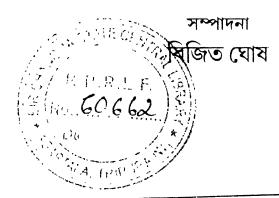
পরিবেশনায়

সৈকত প্রকাশন

৬, জেল-আশ্রম রোড ▫ আগরতলা- ৭৯৯০০৭

ফোন (০৩৮১)২২২-৫৩৯৭ ▫ মোবাইল ৯৪৩৬৪৬১১৭০

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
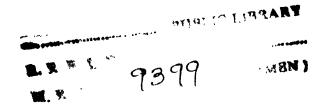
কলকাতা-৭০০ ০০৯

PRAMILA GALPA SANKALAN

100 Bengali Short Stories written by 100 Female Writers

Edited by
Bijit Ghosh

First Published
January 1963

ISBN : 978-81-7332-632-5

Price : ₹ 375/- only

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক
কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন, ডা. এস.
সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

আমার মা

এবং

মাতৃস্থানীয়া যাঁরা আমায় ভালোবেসেছেন;

তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম—

শ্রীমতী আশালতা ঘোষ

শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ

শ্রীমতী তারা রায়

শ্রীমতী স্বপ্না নায়ক

শ্রীমতী অরণ্যলতা ঘোষ

শ্রীমতী মালা সিন্‌হা

বিজিত ঘোষের অন্যান্য গ্রন্থ :

- স্মরণীয় যাঁরা (১-৫ খণ্ড)
- ইচ্ছেখুশি
- এলাটিং বেলাটিং সই লো
- সত্যজিৎ রায়
- উইলিয়াম কেরী
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- নকশাল আন্দোলনের গল্প
- বাংলার ছোটোগল্প (বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ)
- নানা রূপে সত্যজিৎ
- হাসির গল্পে প্রহসন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
- দাঙ্গার গল্প দাঙ্গার বিরুদ্ধে
- বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিবাদী চেতনা
- নির্বাচিত ছোটোগল্প : নতুন আলোকে
- বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও চণ্ডীমঙ্গল
- সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
- স্নাতক বাংলা ছোটোগল্প
- জলছবি
- চোখের আলোয়
- বেলা অবেলায়
- দিপালীর দিনলিপি
- স্যার
- অন্বেষণ

সূচিপত্র

ভূমিকা

মানুষ জন্মেছেন কবে জানি না! তবে এটা জানি, মানব সন্তান কথা বলতে শেখা-মাত্র, মানে মা, বাবা শব্দ উচ্চারণের পরবর্তী পর্যায়েই বলেছে,– গল্প বলো, গল্প শুনি। তার সে শুনতে চাওয়া তো মা-ঠাকুমা-দিদিমার কাছেই। তাঁরাই প্রথম গল্পের জন্মদাত্রী। কথাকোবিদ। শিশু-সন্তানের আবদার মেটাতে প্রথম মুখে মুখে গল্প বানানো শুরু করেছিলেন তাঁরাই।

সবকিছুরই সূচনারও আগে একটা আরম্ভ থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারটাকে বলতেন : 'প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো।' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্পের প্রদীপটি জ্বলার আগেও তার সলতে পাকানোর কাজ করে গেছেন অনেকেই। বিশেষ করে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন এবং অতি-অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। স্বর্ণকুমারী দেবীই বাংলা ভাষায় প্রথম মহিলা গল্পকার।

গল্প : গল্প আমাদের বড়ো আদরের জিনিস। গর্বের ধন। সে কী আজকের কথা! মানবজন্ম থেকেই গল্পেরও জন্ম। মানুষ কথা বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছে গল্প বলতে পারাও। গল্প শব্দটি এসেছে 'জল্প' বা 'জল্পন' বা 'জল্পনা' থেকে। আর জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা-প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে তাকে কল্পনার নানা রঙে রাঙিয়ে মনোহারী করে তুলত। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন গল্প বলার ইতিহাস। যাযাবর মানুষের মনে একদিন প্রথম দেখা দিয়েছিল কথার অঙ্কুর। সেই কথাকে তারা প্রথম রূপ দিয়েছিল ভাষার মধ্যে। মানুষের গল্প বলার/শোনার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম কালের।

গল্পের উৎস : গল্পের উৎসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পুরাকাহিনি। রূপকথা। আর, উপকথার কথা। হোমারকে বলা হয় প্রতীচ্য গল্প-সাহিত্যের পথ-নির্দেশক। এছাড়া তো আছেই আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গল্প। সে-সব গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে 'ঋগ্বেদে'। 'জাতকে'। 'রামায়ণে'। 'মহাভারতে'। 'পঞ্চতন্ত্রে'। আর গল্প আছে আরব্য-পারস্য উপন্যাসে।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-কে তো একটা গল্প-ভাণ্ডারই বলা চলে। এছাড়া 'হিতোপদেশ', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভারতের 'কথাসরিৎসাগর' সমগ্র পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করেছিল। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ তা এক বিশ্ব-কথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়।

আদি গল্প : 'গোপীচাঁদের গীত', 'মনসার ভাসান', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি পাঁচালি বা গাথাগুলিকেও বাংলা সাহিত্যের আদি-গল্প রূপে ধরা যেতে পারে।

মানুষের নন্দন সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এখনও গল্পের জাদুতে মুগ্ধ।

সেই কতকাল আগে কোন্ মহাজন কথাকে বৃহৎ করে লিখেছিলেন 'বৃহৎ-কথা'। আর কথা-সরিতের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যিনি বা যাঁরা, তাঁরা তো আজ ইতিহাস। এগুলোই আমাদের বাংলা গল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জন্তু-জানোয়ার-পক্ষীকেও যাঁরা নায়ক বা কথকের মর্যাদা দিয়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন, সেই সাহসী আদি গল্পকারগণ আমাদের প্রণম্যজন। বহুকাল আগে 'পঞ্চতন্ত্র' আর 'হিতোপদেশ'-এও তো কম মহান গল্প শোনানো হয় নি। তারও পর কত-শত শতক পার হয়ে গেল চর্যা আর পদ্যের প্রবহমানতায়। সেই বয়ে চলা স্রোতোধারায় ক্রমশ একের পর এক এসে গেল গদ্য। গদ্য-সাহিত্য। আদি-গল্প। গল্প। ছোটোগল্প।

গদ্য : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানের কথা বলতেই হয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এও উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) দুশো বছর আগেও বাঙালি সমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আবেদন-পত্র, মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক লেখাপত্র ও অন্যান্য দু'চারটি ছোটোখাটো বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। যদিও সে-সব ছিল নিতান্তই কাজকর্মের ভাষা। বলাবাহুল্য, সেই কেজো গদ্যভাষা আদৌ শিল্পের ভাষা নয়। তা গদ্য মাত্র। গদ্যসাহিত্যও কখনোই নয়।

দোম আন্তোনিও (আন্তোনিয়ো) দো রোজারিয়ো (রোজারিও) রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটি ১৭২৬-এর পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে এটি প্রকাশ করেন। এটি নিছক একটি ধর্মপুস্তিকা।

১৭৩৫-এ রচিত হয় পর্তুগীজ পাদরি মানোএল (মানোয়েল)-দা-আস্সুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটিও প্রশ্নোত্তর ঢঙে লেখা একটি ধর্ম-পুস্তিকা মাত্র।

এভাবে ক্রমশ বাংলা গদ্য পুঁথি থেকে মুদ্রণের যুগে আসতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই কলেজের অবদান বিস্ময়কর।

গদ্য গ্রন্থ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশিরাই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংলন্ড থেকে নবাগত কিশোর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এই কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য-গ্রন্থের মুদ্রণ ও ক্রমবিকাশে এই বিদেশি মানুষটির অবদান প্রতিক্ষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৭৬১-র ১৭ আগস্ট নরদামটন-শায়ারের পলাস-পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কেরী। ধার্মিক পিতার ধার্মিক পুত্র। ধর্মপ্রচারের জন্য সপরিবারে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন। ১৭৯৩-এর ১১ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার জন

টমাসের বাংলার শিক্ষক রামরাম বসুকে কেরী তাঁর মুনশি নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের বিনিময়ে কেরীকে বাংলা শেখাবার জন্য নিয়োজিত হন রামরাম বসু।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পান উইলিয়ম কেরী। সেই ভার গ্রহণের পর তিনি বিভাগীয় সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত-মুনশির নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু। রামরাম এই কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরী যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটির শেষোক্ত গ্রন্থটির মধ্যে ('ইতিহাসমালা') বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল্পরসের সন্ধান পাই। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ইতিহাসমালা'-র গল্পগুলির উৎস লোককথা হতেও পারে। তবু এই আখ্যান বা গল্পগুলির মধ্যে কেরীর উর্বর কল্পনা, মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নিশ্চয়ই। 'ইতিহাসমালা'-য় কেরীর গল্পগুলি পড়লেই এ-কথার সত্যতা মিলবে। গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কখনও-কখনও চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশনে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কেরী। তাঁর রচনা ভঙ্গিমাও চিত্তাকর্ষক। সরল গল্প-আখ্যান পাঠককে আনন্দ দেয়।

বাংলা গদ্যরীতির সাধু প্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, তা ১৮১২-তে কেরীর রচিত 'ইতিহাসমালা' থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু গল্পে চমৎকার সরস রঙ্গ-কৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য কেরী, সেই-কালের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এ-কালেও নিশ্চয়ই সকলের উচ্চপ্রশংসাই পাবেন।

কেরীর নির্দেশেই তাঁর পূর্বে অবশ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)। এ-কথা সত্য, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা অক্ষরে ছাপা বাঙালির রচিত প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু নীরস, তথ্যসর্বস্ব এই রচনায় গল্প-রসের কোনো অবকাশই ছিল না। তাছাড়া প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থের রচনাকার হলেও গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়।

সে কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। ইনি লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩-তে রচিত ১৮৩৩-এ মুদ্রিত)।

গদ্য সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কলমে ছিল বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য গদ্য-সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র ভাষা-সচেতন শিল্পী। তাঁর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। ভাষার মাধুর্যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছটায়, সর্বোপরি গল্প-রস পরিবেশনের কৃতিত্বে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান বা গল্প সে-যুগের পক্ষে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই প্রথম ভাষার প্রসন্নতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, সর্বোপরি গল্প-রস পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) রচনায় গল্প-রস ব্যাপারটা কল্পনাতেও আসে না। আসলে তিনি যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায় তার্কিকতাই প্রধান। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র অভিপ্রায়ে তাঁর গদ্য হয়েছে শাণিত অস্ত্র। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য লেখালেখি হওয়ায়

সেখানে রম্য-সাহিত্য রস সৃষ্টির কোনো অবকাশই ছিল না। রামমোহন রায় ছিলেন প্রধানত যোদ্ধা। শিল্পী নন। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যেই বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) লেখালেখির প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। তবু তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মানসে আখ্যানধর্মী নকসা লেখেন। সেই রচনাগুলিতেও আমরা যথেষ্ট গল্পরসের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি সামাজিক গল্প।

যেমন অসংখ্য ছোটো ছোটো আখ্যানধর্মী সামাজিক গল্পের ফুল দিয়ে একটি অখণ্ড মালা গেঁথেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সকল কর্মেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর গভীর সমাজসচেতনতা-বোধ। তাঁর গ্রন্থাবলি রচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী'-তেও এই সমাজ-সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) রচনাতেও আমরা পেয়েছি কাহিনিধর্মী গল্প-রস।

ছোটোগল্পের পূর্বাভাস : গল্প : আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প একান্তই উনিশ শতকের দান। এই শতাব্দীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সমসাময়িক কালে গল্প লিখেছেন। তবে যথার্থ অর্থে আধুনিক ছোটোগল্প বলতে যা বুঝি তা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এনেছেন রবীন্দ্রনাথই।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্পের কিছুটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে শ্রী পূঃ চঃ রচিত 'মধুমতী' গল্পে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসে (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত (১৮৭৩/১২৮০) হয়। ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য 'মধুমতী' যথার্থ অর্থে ছোটোগল্প হয়ে ওঠেনি। 'বঙ্গদর্শন'-এ রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমের বিভিন্ন কাহিনির প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়ে। বিন্যাস ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য কারও কারও মতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্পের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১২৮১/১৮৭৪) প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামের গল্প দুটিতে। কিন্তু এ দুটিও ঠিক ছোটোগল্প নয়। 'নভেল' শ্রেণির রচনা। এর মধ্যে অবশ্য 'দামিনী' গল্পটিতে ছোটোগল্পের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তবুও এগুলিকে ঠিক ছোটোগল্প না বলে, ছোটোগল্পের পূর্বাভাস বললেই যথার্থ বলা হয়।

ছোটোগল্পের আবির্ভাব : বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই গল্প পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটোগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপ-সৃষ্টি শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। তাই ছোটোগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে আধুনিক ছোটোগল্পের পূর্বপুরুষ সন্ধান নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আসলে প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোটোগল্পের জন্ম হতে পারে না। তাই, ছোটোগল্পের জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে। শিল্পবিপ্লবের পর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ছোটোগল্পের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রম-অগ্রসরমান জীবনধারায়। ছোটোগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট বাউন্ড ইন এ বটল', আর নাথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়েস ওমনিবাস'-এ।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ছোটোগল্পের জন্ম পুরোনো পৃথিবীতে (ইউরোপে) হয়নি। হয়েছে নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)।

একসময় জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে ধসে পড়ে। প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর ভক্তি করতে চায় না। এমন সময়েই বুঝি ব্যক্তির হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয় আত্মজিজ্ঞাসা।

ছোটোগল্পের জন্ম এই লগ্নেই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল এই সংঘর্ষ। মুক্তি-ব্যাকুলতা। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সমাজ-সচেতনতা। এই সময়ে ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে দেখা দিলেন ছোটোগল্পের প্রথম পাঁচ প্রবর্তক। গী দ্য মোপাসাঁ। এডগার অ্যালন পো। নাথানিয়েল হথর্ন। নিকোলাই গোগোল। এবং রবীন্দ্রনাথ।

ছোটোগল্পের সংজ্ঞা : ছোটোগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ কঠিন। আজ পর্যন্ত ছোটোগল্পের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, ছোটোগল্প কত বিচিত্র রকমের হতে পারে।

সব গল্পই ছোটোগল্প নয়। এমনকি আকারে ছোটো হলেও সে গল্প অনেক সময় ছোটোগল্প নাও হতে পারে। ছোটোগল্পের চরিত্র-সংখ্যা কম। ঘটনাও কম। পরিশেষে কোনো একটি প্রধান ঘটনা বা চরিত্র বা ভাব প্রাধান্য লাভ করে এখানে।

ছোটোগল্প জীবনের ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপায়ণ। সেই সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসাও বটে। ছোটোগল্পের গঠন-কৌশল বিষয়ে সবচেয়ে জরুরি হল, একাগ্র-কল্পনা-সংহতি। উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির একমুখিতা। ছোটোগল্প প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, 'ছোটোগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন.....আর্টে কনটেন্টের মূল্যের চাইতে ফর্ম-এর মূল্য ঢের বেশি।'

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে,'......আধুনিক ছোটোগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে....। ছোটোগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোটোগল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটোগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।'

ছোটোগল্প শিল্পীর অনুভূতিপ্রসূত এমন এক বাধাবন্ধনযুক্ত গদ্য কাহিনি, যার সুনির্দিষ্ট ও একমুখী বক্তব্য কোনো ঘটনা. পরিবেশ বা মানসিকতাকে আশ্রয় করে দ্বন্দ্ব ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

ছোটোগল্প এমনই এক গদ্যকাহিনি, যার স্বল্প পরিসরে গল্পটির চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতিকে বা চরম পরিণতিতে গল্পকার শৈল্পিক কুশলতায় উচ্চতর কোটিতে পৌঁছে দেন। ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি, সাংকেতিকতা যাই ছোটোগল্পের বিষয়ীভূত হোক না কেন, তা গল্পকারের পরিমিতিবোধ, আকস্মিক সূচনা, পরিশেষে রসের নিবিড় মোচড় বা চমৎকারিত্বের গুণে সার্থক হয়ে ওঠে।

ইংরেজ গল্পলেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন প্লট-প্রধান, চরিত্র-প্রধান ও ইম্প্রেশন-মুখ্য এই তিন শ্রেণির ছোটোগল্পের কথা বলেছেন। দুনিয়ার সকল ছোটোগল্পকেই এই তিন শ্রেনির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আজকাল লক্ষ করা যায়, ইম্প্রেশন-মুখ্য গল্পেরই সমাদর বেশি। এডগার এ্যালান পো-ও এই শ্রেণির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন।

ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে এডগার অ্যালান পো বলেছেন—ছোটোগল্প হল গদ্যে লেখা এমন কাহিনি যা পড়তে আধ ঘণ্টা থেকে এক বা দুঘণ্টা সময় লাগে। বলা যায়, সেই গল্পই ছোটোগল্প, যা এক বৈঠকে বসে পড়ে ফেলা চলে। ছোটোগল্পের দৈর্ঘ্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলে বলা যায়, এ গল্পের বিষয়ও সংক্ষিপ্ত। জীবনের কোনো বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতার এক একটি মোড়ক হঠাৎই উন্মুক্ত হয়। গল্পকারের মনের দিগন্তে জীবনের কোনো কোনো দিক হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আকস্মিক ঝলসে ওঠে; তখনই জন্ম নেয় ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের একমুখিতার উপর জোর দিয়ে ওয়েবস্টার ডিকসেনারি এবং এনসাইক্লোপিডিয়াতে বলা হয়েছে : 'A short story usually representing the crisis of a single problem.'

ছোটোগল্প হল ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম শিল্পপ্রকরণ। তাই একে বলা হয় 'Piculiar Product of the Nineteenth Century'.

ছোটোগল্পের সার্থক ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা এখনও তৈরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। "An Introduction to the study of literature" গ্রন্থে হাডসন ছোটোগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : 'A short story must contain one and only one informing idea and that idea must be worked out with absolute singleness of method.'

কিন্তু আধুনিক ছোটোগল্প শুধুমাত্র ঐক্য সর্বস্বই নয়, শব্দের মিতব্যয়িতা, প্রয়োগপদ্ধতির একনিষ্ঠতা, বক্তব্য বিষয়ের বাহুল্যহীনতা, গল্পের সামগ্রিক সুরের একতা, উপযুক্ত পটভূমির ব্যবহার, চরিত্র চিত্রণে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদিও তার মধ্যে দেখা যায়।

ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য :

১. চরিত্র সংখ্যা কম।

২. আকৃতিতে ছোটো।

৩. একমুখিতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. এখানে ঘটনার ঘনঘটা থাকে না।

৫. এটি হল 'A slice of life'-এর শিল্পরূপ।

৬. ছোটোগল্পে প্রায়ই অতৃপ্তির রেশ বর্তমান।

ছোটোগল্পের কতগুলি সাধারণ লক্ষণ আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) ছোটোগল্প শুরু হয় একেবারে প্রথম পংক্তি থেকেই, পো যাকে বলেছেন 'from the very initial sentence'.

(খ) স্বল্প আয়তনে ছোটোগল্পের আয়োজন বাহুল্য বর্জিত। উপকরণের বহুলতা, অবান্তর বিন্যাস তার রূপ ও প্রকৃতির অন্তরায়। জীবনের বিচিত্র সম্ভার থেকে প্রয়োজনীয় মাত্র কয়েকটি উপাদানই গল্পকারকে বেছে নিতে হয়। উপন্যাসের বিচিত্রমুখী বিস্তার, ঘটনার ঘনঘটা, বহুবিধ চরিত্রের ভেতর ও বাইরের দ্বন্দ্বে পরিস্ফুট বিশাল ও গহন মানসলোক ছোটোগল্পের প্রকরণসীমার অতীত।

(গ) আয়তনের স্বল্পতা ও গঠনশৃঙ্খলার অপরিহার্যতার কারণে ছোটোগল্পে বিশদ চরিত্র-চিত্রণের অবকাশ থাকে না। চরিত্রও থাকে অল্প কয়েকটি। তার মধ্যে একটি বা দুটি চরিত্রের কোনো একটি বিশিষ্টতা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

(ঘ) আদর্শ ছোটোগল্পে একটি চরমমুহূর্ত বা 'ক্লাইম্যাক্স' থাকে। ঘটনা, ভাব ও চরিত্রের একটি তুঙ্গ চূড়ায় যে বিদ্যুৎঝলক তাতেই ছোটোগল্পের প্রাণসত্তার সার্থক রূপায়ণ। এদিক থেকে একাঙ্ক নাটকের সঙ্গে ছোটোগল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঙ) ছোটোগল্প তার স্বল্প পরিসরে আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট এক সংযত ও ঘনসংবদ্ধ শিল্পরূপ যা পাঠকমনে সৃষ্টি করে একটি একক ধারণা বা Single impression, এই 'ইম্প্রেশন'টি গড়ে ওঠে প্লটের একমুখী ও সুনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থনের পরিণতিরূপে।

(চ) ছোটোগল্প যেমন শুরু হয় কিছুটা চকিতে তেমনি তার সমাপ্তিতে থাকে চমক, একধরনের নাটকীয়তা যা পাঠককে ঝাঁকুনি দেয়।

(ছ) ছোটোগল্প দ্রুত শুরু হয়ে দ্রুত শেষ হয়, অর্থাৎ এর একটি গতিময়তা আছে।

(জ) ছোটোগল্পে অতি-কথনের অবকাশই নেই; বাক্‌সংক্ষেপ, ভাষার সংকেত ও সচেতন ব্যবহার, সংকেতময়তা ইত্যাদি ছোটোগল্পলেখকের প্রথম পাঠ। সুনির্বাচিত, ইঙ্গিতবহ শব্দ; ভাবময় স্বতঃস্ফূর্ত বাক্যবিন্যাস; বিষয়োপযোগী নির্ভুল ভঙ্গী, বাহুল্যহীন অথচ অভ্রান্ত শৈলী—এ সবেরই সার্থক সমাহারে ছোটোগল্প লাভ করে তার স্বল্পায়তন বাহ্য অবয়ব আর অব্যর্থ স্বরূপ।

ছোটোগল্প : প্রথম সার্থক ছোটোগল্প : রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে গল্প রচনার প্রয়াস বা প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। তিনিই প্রথম 'ছোটোগল্প' কথাটি ব্যবহার করেন। 'ছোটোগল্প' নাম দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর গল্প-সংগ্রহ। ১৮৯৪ সালে। এটিই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সংকলন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম সার্থক ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা' (১৮৯১)। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক ছোটোগল্পও এটি। অবশ্য এটিই তাঁর লেখা প্রথম ছোটোগল্প নয়। এরও আগে রবীন্দ্রনাথ আরও চারটি ছোটোগল্প রচনার চেষ্টা করেছিলেন। ১২৮৪-তে 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ/ভাদ্র) 'ভিখারিনী' গল্পটি রচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। তবে এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর রচনাবলির অন্তর্ভুক্ত করেননি। গল্প হিসেবে এটি খুবই কাঁচা হাতের লেখা। অবশ্য তাঁর বয়সও তখন মাত্র ষোলো। এটি ছোটোগল্প তো নয়ই, একটি সুগঠিত গল্পও নয়। এরপর ১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথ 'নবজীবন' পত্রিকায় (কার্ত্তিক/অগ্রহায়ণ ১২৯১) 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামে দুটি ছোটোগল্প লেখেন। পরের বছরই ১৮৮৫-তে 'মুকুট' (১২৯২) নামের আর একটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম চারটি রচনার মধ্যে একটিও ছোটোগল্পের যথাযথ **শিল্পরূপ** পায়নি।

এর প্রায় দীর্ঘ ছ-বছর পর (১৮৯১) বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পীর শিল্প-সাধনার সফলতম প্রকাশ দেখা যায় 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মোট ছটি ('দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি') গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই বাংলা ছোটোগল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছিলেন .

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি ক'রে।
ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি, মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরযার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের (১৯৪১) পর কেটে গেছে দীর্ঘ ৭০ টি বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা ছোটোগল্প থেমে থাকেনি আদৌ। সেই বিস্তীর্ণ পথে আমরা পেয়েছি অনেক মহিলা লেখককেই।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রথম মহিলা গদ্য রচনাকারের নাম কৈলাসবাসিনী গুপ্ত। তাঁর 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' প্রকাশিত হয় সেকালের 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন কৈলাসবাসিনী গুপ্ত। ১৮৪৯-এ, বারো বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। এই কৈলাসবাসিনী গুপ্তই প্রথম গদ্য-গ্রন্থের মহিলা-লেখক। তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা', 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস', 'বিশ্বশোভা' ইত্যাদি।

এর ঠিক একবছর পর, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। সেটিকে তাঁর এক অসামান্য দৃপ্ত আত্মকথা-ই বলা যেতে পারে।

তারও একবছর পর, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। রাসসুন্দরী দাসীর (১৮০৯-১৮৯৯) 'আমার জীবন' (১৮৭৫)। বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের প্রথম আত্মজীবনী। 'আমার জীবন' সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : 'এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।'

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক, প্রতিভাময়ী আশাপূর্ণা দেবী মেয়েদের লেখালেখি নিয়ে মাঝে মধ্যেই একটি অনুযোগ করতেন। 'মহিলা লেখিকাদের প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের একটা সহজ তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, লেখিকা শুনিলেই অগ্রাহ্য করেন, পড়িবার আগেই সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দেন, তাই যে পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত লেখক দেখা যায় দেশে, সে পরিমাণ লেখিকা নয়।'

কথাটি সামগ্রিকভাবে সত্য হলেও, আশাপূর্ণা নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যতিক্রম। কোনো তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, উদাসীনতা লেখিকা আশাপূর্ণাকে অন্তত কখনও সইতে হয় নি। বাঙালি পাঠক তাঁকে হৃদয়ের গভীরে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছেন।

এ-কথা অস্বীকার করলে ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা করা হবে যে, বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট লেখিকার অভাব কোনোদিনই ছিল না। অনেক লেখিকাই সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন; অন্তত সেকালে।

সেই প্রথম যুগে গল্প-উপন্যাস লিখে যথেষ্টই খ্যাতি পেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের লেখালেখির ব্যাপারে কখনও কোনো বাধা আসে নি। পরিবর্তে, তাঁদের সে ব্যাপারে উৎসাহিতই করা হত। আসলে সে-সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে প্রকাশিত হত সাহিত্য সাময়িকপত্র। ১৮৭৭-এ 'ভারতী' প্রকাশ পাচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। সেই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। ১৮৮৪-তে 'ভারতী'-র একক সম্পাদক হন স্বয়ং স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)-ই।

প্রথম থেকেই 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক স্বর্ণকুমারী। পরবর্তীকালে তাঁর দুই বিদুষী কন্যাও (হিরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী) নিয়মিত লিখেছেন 'ভারতী'-তে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা গল্পকার, প্রথম ঔপন্যাসিক, 'ভারতী' সম্পাদক, প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্ণকুমারী সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটোগল্প সংকলনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'নবকাহিনী' (১৮৯২), 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' (১৯১০)। উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মালতী' (১৮৮০), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'হুগলির ইমামবাড়ি' (১৮৮৭), 'স্নেহলতা'-১ খণ্ড (১৮৯০), 'স্নেহলতা', ২য় খণ্ড (১৮৯৩), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), 'কাহাকে?' (১৮৯৮), 'রাজকন্যা' (১৯১৩), 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) ইত্যাদি।

দু'দফায় (১৮৮৪-১৮৯৫ এবং ১৯০৬-১৯২০) 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

লেখালেখির স্বীকৃতি হিসেবে মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন (১৯২৬-এ)।

বাংলা ভাষার প্রথম গল্পকারই শুধু নন; প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকও তিনি। একজন মহিলার পক্ষে এ গৌরব খুবই দুর্লভ ব্যাপার। শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যেও প্রথম যুগে মহিলা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। সেই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট আর শার্লক ব্রনটি ও এমিলি ব্রনটি (দুই বোন; শান্তা ও সীতা দেবীর মতো) এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ। আমাদের বাংলায় সেই সম্মানের একমাত্র অধিকারিণী স্বর্ণকুমারী দেবী।

সেকালের লেখিকাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বাল্যবিবাহ আর অকালবৈধব্য। প্রায় অধিকাংশ নারীকেই তখন বিবাহ দেওয়া হত বারো বছরের মধ্যেই। সেকালে, সর্বদিক থেকে সুবিখ্যাত ঠাকুর বাড়িও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কন্যা স্বর্ণকুমারীর বিবাহ দিয়েছিলেন এগারো বছর বয়সেই। বিবাহের পরের বছরই তাঁর বিদগ্ধ স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল, কিশোরী স্বর্ণকুমারীকে রেখে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, পড়াশোনা শেখানোর জন্যে। স্বর্ণকুমারীর লেখালেখির সূত্রপাতও সেখান থেকেই।

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা শরৎকুমারী চৌধুরানীর বিবাহ হয়েছিল ১১ বছর বয়সে। সেকালের সুবিখ্যাত, অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক নিরুপমা দেবী মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিধবা হন এবং সুদীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

সেকালের কমবয়সী স্বচ্ছল শিক্ষিত বিধাবাদের অনেকে লেখালেখিকে অবলম্বন করেই দীর্ঘ

জীবন অতিবাহিত করেছেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন কোনোকালেই সমাজে সাদরে স্বীকৃতি পায় নি। আজকের মতো সেদিন গৃহের বাইরে নারীদের কোনো স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র গড়ে ওঠে নি। যদিও গৃহে আবদ্ধ থেকেও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি তাঁদের কম সমৃদ্ধ ছিল না।

বিধবার সম্পত্তিহরণের চেষ্টা, উৎখাত, নানান মামলা মোকদ্দমা, কমবয়সী সব বিধবাদের নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে লোভের দৃষ্টি, বিধবার উত্তরাধিকারী নেই, তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পুড়িয়ে মারো তাকে, নাম দাও সতীদাহ, আরো কতো কী! ফলে এ লেখার মধ্য দিয়ে বলার কথা কিছু কম ছিল না তাঁদের।

এখনকার নারীদের তুলনায় সেকালের কমবয়সী বিধবাদের গৃহাভ্যন্তরে থেকেও অনেক কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাইরের শারীরিক পরিশ্রমের থেকে তা ঢের বেশি। সুন্দরী বালবিধবা তার সতীত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করেছে। নিজেকে শুদ্ধ, পবিত্র রাখতে চাওয়ার সেই কঠিন সংগ্রাম একা একাই চালাতে হয়েছে তাদের। সেইসব দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্টের অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে চেয়েছেন তাঁরা। কাকেই বা বলবেন, তাঁর মনের সেই অনন্ত কষ্ট, যন্ত্রণার কথা? সঙ্গী নেই কেউ। তাই লেখা। সাধারণ, অকপট, আন্তরিক, আটপৌরে এইসব লেখায় আছে একটা নিজস্ব সৌন্দর্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগের অভাব সত্ত্বেও সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব সর্বতোভাবে পালন করেও, কত রকমের বাধা অতিক্রম করে তখনকার নারীরা লিখে গেছেন, তার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে সাবিত্রী রায়ের লেখা 'অন্ত:সলিলা' গল্পটির বাস্তব কাহিনিটি। অনেকেই সংসারের মধ্যে থেকে, সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেই লিখেছেন নিশ্চয়। এ ব্যাপারে বোধহয় সব থেকে সেরা উদাহরণ হতে পারেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী।

মহিলাদের লেখা গল্প পড়তে পড়তে এবং সেই লেখিকাদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। পড়াশোনা জানা শিক্ষিত ঘরের অনেক বালবিধবা গৃহবধূ ক্রমাগত লিখেছেন সে সময়ে। প্রধানত, তাঁর কিছু বলার ছিল। ছিল লেখার তীব্র আন্তরতাগিদও। সেই সঙ্গে বোধহয় অনেকেরই সন্তানহীন স্বামীহীন সংসারের অনন্ত অবসর ও দুঃখবোধের অনুকূল পটভূমিও তাঁদের দিয়ে নিরন্তর লিখিয়ে নিয়েছে।

সেকালের অনেক লেখিকাই এসেছেন বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে। সে সময় অধিকাংশ নারীর বিবাহ হয়েছে বারো বছরের মধ্যেই। অনেকের বৈধব্যও ঘটেছে অত্যন্ত কমবয়সে। সেই একক জীবনের শূন্যতা ভরাতে সেকালে অনেক মহিলাই চলে এসেছিলেন লেখালেখির জগতে।

তবে সেকালের শিক্ষিত সমাজ নারীদের লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সাবিত্রী রায়ের 'অন্তঃসলিলা' গল্পে লেখিকার লেখকতার বাধার চিত্রটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব হলেও, সেকালে কিন্তু মহিলাদের লেখালেখিকে শিক্ষিত সমাজ উৎসাহই দান করে গেছেন। সেই সঙ্গে আরও একটি সুবিধা ছিল তখন। সে সময় অনেক পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন মহিলা।

লক্ষণীয় বিষয়, এখনকার গল্প সংকলন-গুলোতে দেখি মহিলা-লেখকদের সংখ্যা সে-কালের তুলনায় নিতান্ত কম।

অথচ সে-কালের তুলনায় শিক্ষা, আর্থিক স্বাধীনতা, বাইরে বার হওয়া, সমস্তরকম স্বাধীনতা, সমস্ত-কিছুই অনেক বেশি বেশি পেয়েও এখন লেখালেখি করেন অনেক কম মহিলা; আগের তুলনায় চোখে পড়ার মতো কম। একালে বিদুষী মননশক্তিশালিনী মহিলার সংখ্যা বেশি হলেও, সেই অনুপাতে বিশিষ্ট লেখিকার সংখ্যা আদৌ বৃদ্ধি পায়নি; সে-কালের তুলনায়।

সে-সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক অনামী লেখিকার গল্প ছাপা হয়েছে নিয়মিত। তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলি মেয়েদের লেখালিখির যথেষ্ট কদর করতো বোঝাই যায়। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য,

সেকালের এক বিখ্যাত পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক তাঁর গোটা পত্রিকাটিরই একটি বিশেষ সংখ্যা করেছিলেন, শুধুমাত্র মহিলাদের লেখা নিয়ে। জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ'-র ১৩২২ বঙ্গাব্দের সেই বিশেষ কার্তিক সংখ্যাটি ছিল একমাত্র মহিলা-লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ। সেই বিশেষ সংখ্যার লেখকসূচিতে ছিলেন : সুশীলা সেন, কাঞ্চনমালা দেবী, সুনীতি দেবী, হেমনলিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অমলা দেবী, ঊর্মিমালা দেবী, মৃণালিনী সেন, প্রমীলা মিত্র প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ছিল লেখিকাদের স্বর্গরাজ্য।

এ-কালের এক গল্প-সংকলন সম্পাদিকা মনে করেন, স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম মহিলা পত্রিকা-সম্পাদক। প্রথম বাঙালি মহিলা-গল্পকার স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রথম মহিলা-ঔপন্যাসিকও তিনিই। '...তিনিই প্রথম মহিলা সম্পাদক। তাঁরই জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ভারতী পত্রিকায় (১২৮৪ প্রথম প্রকাশ, ১২৯০ পর্যন্ত) ১২৯১ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।'

—না; পত্রিকা সম্পাদনায় মহিলা হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী আদৌ প্রথম নন। তারও আগে, আমরা বাংলা ভাষায় মহিলা পরিচালিত প্রথম একটি মাসিক পত্রিকা পাই। পত্রিকাটির নাম 'অনাথিনী'। প্রকাশকাল, ১৮৭৫। সম্পাদিকা থাকমণি দেবী। দ্বিতীয় প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদিকা তাঁর নাম গোপনই রেখেছিলেন। সেই পত্রিকাটির নাম ছিল 'হিন্দুললনা'। তারপর পাই রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী', ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ('ভারতী' প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৭৭-এ; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়)।

স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা থেকেই মহিলা গল্পকারদের আবির্ভাব ও জয়যাত্রা। 'ভারতী' পত্রিকা এবং 'ভারতী ও বালক' (১২৯৩- ১২৯৯) নামে আরও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীও 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে। সরলা দেবী 'হিন্দুস্থান' (লাহোর) পত্রিকাটিও সম্পাদনা করেন।

বনলতা দেবী সম্পাদনা করেন 'অন্তঃপুর' (১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশ)। এর সাতবছর পর 'অন্তঃপুর' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন লীলাবতী মিত্র।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী 'পুণ্য' (১৩০৪) ও সুচারু দেবী সম্পাদনা করতেন 'পরিচারিকা'। পরবর্তীকালে 'পরিচারিকা'র সম্পাদনা-কর্মে ন'বছর (১৩২৩-১৩৩১) যুক্ত ছিলেন রাণি নিরুপমা দেবী।

সরযূ দত্ত দীর্ঘ তেরো বছর যাবৎ (১৩১২-১৩২৫) 'ভারত মহিলা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। কুমুদিনী বসু ও হেমলতা দেবী সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সম্পাদনায় বার হত 'জাহ্নবী' পত্রিকাটি। সঙ্গে ছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। বছর তিনেক (১৩৩৫- ১৩৩৭) 'পাপিয়া'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বিভাবতী সেন। 'জয়শ্রী'-র ত্রয়ী সম্পাদক ছিলেন লীলাবতী নাগ, শকুন্তলা দেবী ও রেণুকা সেন।

সন্তোষকুমারী গুপ্তা সম্পাদনা করতেন 'শ্রমিক' পত্রিকাটি। কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনায় বার হত 'সুপ্রভাত'।

'বাঙ্গালার কথা' (১৩২৮-১৩২৯) নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাটির, চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বাসন্তী দেবী; যেমন, 'মাতৃমন্দির' (১৩৩০-১৩৩৪) পত্রিকায় ছিলেন সুরবালা দত্ত, অক্ষয়কুমার নন্দীর সঙ্গে। পরবর্তীকালে সুরবালা দত্তের স্থানে আসেন সুশীলা নন্দী। 'মুক্ত' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তরুবালা সেন ও নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

গল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে লেখালেখি তো আছেই; সেই সঙ্গে এবং তা ছাড়াও সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন সেকালের অনেক লেখিকাই।

সেকালে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা সকলেই প্রথমাবধি লেখালেখির অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যারা তো সুশিক্ষা সহ লেখালেখির নিতান্ত অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। পারিবারিক উৎসাহ, প্রেরণা পেয়েছেন প্রতিনিয়তই।

অন্যদিকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবারের পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুখলতা রাও; পরবর্তীকালে লীলা মজুমদার, 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই বিদুষী কন্যা শান্তা দেবী ও সীতা দেবী প্রমুখ সে সময় নিয়মিত লিখেছেন। ব্রাহ্ম পরিবারের পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার ফলে এঁরা লেখালেখির সুযোগ পেয়েছিলেন যথেষ্ট।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর (১৮৬১-১৯২০) 'শুভবিবাহ' নামের ছোটোগল্প গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।'

সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী। ১৮৯০ সালে ইংরেজি অনার্স সহ মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে, পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করে স্নাতক হন তিনি। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ: 'নববর্ষের স্বপ্ন'।

সরলাবালা সরকারের (১৮৭৫-১৯৬১) পিতামহী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী ('আমার জীবন') লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী। বারো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। তেইশ বছর বয়সে অকালবৈধব্য নেমে আসে তাঁর জীবনে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে সরলাবালার লেখা 'স্মৃতিচিহ্ন' গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার পায়। তাঁর দুটি গল্প-গ্রন্থ সেকালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। সে দুটি হল : 'চিত্রপট' (১৯১৭) ও 'গল্পসংগ্রহ' (১৯৫৭)। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার' হিসেবে নিযুক্ত করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারিনী হন।

সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পের ইংরেজি অনুবাদক, সে-কালের বিখ্যাত ছোটোগল্প লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী। ১১ বছর বয়সে যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে সরোজকুমারী দেবীর বিবাহ হয়।

গল্পকার হিসেবে সরোজকুমারী দেবী সেকালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'অন্ধের দিব্যদৃষ্টি' গল্পটি লিখে তিনি 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করেন। ১৩১২-তে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থ: 'কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প।' ১৩২২-এ প্রকাশিত 'অদৃষ্টলিপি' ও 'ফুলদানি' গ্রন্থ-দুটিকে গল্প না বলে, এখনকার ভাষায় অণু-উপন্যাস বলা যেতে পারে।

সেকালের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের জনপ্রিয় লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২) ছিলেন অন্যতম। তিনি বিশিষ্ট মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী তাঁর বোন। সেকালের সুপরিচিত নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন ইন্দিরা দেবীর মাতামহ। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সুরূপা দেবী।

প্রথম উপন্যাস 'স্পর্শমণি' লিখেই চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম উপন্যাসের পর গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় পর পর তিনটি। 'কেতকী', 'নির্মাল্য' এবং 'ফুলের তোড়া।' 'পরাজিতা',

'স্রোতের গতি', 'সৌধরহস্য' ও 'মাতৃহীন' উপন্যাস চারটির মধ্যে শেষোক্তটি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। জীবিত অবস্থায় তাঁর শেষ উপন্যাস 'প্রত্যাবর্তন।' মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্য-গ্রন্থ 'গীতিকথা' ও গল্পগ্রন্থ 'শেষদান'। মাত্র ৪২ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি।

নিতান্ত রক্ষণশীল পরিবারে অত্যন্ত পরাধীন অবস্থার মধ্যে থেকেও উদার হৃদয়ের এক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) সৃষ্টিশীল কাজ করে গেছেন। সে সময় নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বেগম রোকেয়া স্থাপন করেছিলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল'।

তাঁর লেখা একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'পদ্মরাগ'। ধর্মনিরপেক্ষতার গভীর দর্শন মর্মস্পর্শী রূপে ফুটে উঠেছে এই উপস্যাসে। 'মুক্তিফল' তাঁর লেখা রূপকথাধর্মী এক অসামান্য সৃষ্টি। এছাড়া তাঁর নিবন্ধ গ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী'ও আর এক অসাধারণ নির্মাণ। ইংরেজিতেও একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন তিনি, 'সুলতানা' জ ড্রিম'। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম, 'মতিচূর'।

২৪ বছর বয়সে (১৯০৪ সালে) রোকেয়া লিখেছিলেন পুরুষশাসিত সমাজে কেবল গায়ের জোরে মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়েছে সমস্তরকম ন্যায্য অধিকার থেকে। তসলিমা আদৌ নন, ১০৭ বছর আগে এই কথা লেখেন যিনি অসমসাহসিকতার সঙ্গে, সেই বেগম রোকেয়াই প্রকৃত অর্থে প্রথম নারীবাদী।

আজ থেকে ১০৭ বছর আগে (১৯০৪), মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে, রোকেয়া যখন পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের দাবি জানান, তখন বাঙালি সমাজে নারী সম্পর্কে এমন ধারণা সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। 'রবীন্দ্রনাথ সহ সেকালের কোনো নাম করা লেখক যে তাঁর কথা কোথাও উল্লেখ করেননি, সে কি কেবল তাঁর লেখা বহুল প্রচলিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি বলে, নাকি তাঁর বক্তব্যকে তাঁরা তখন নিতান্ত আজগুবি আযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, বলা মুশকিল।' (গোলাম মুরশিদ)

অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮) বিবাহ হয় মাত্র দশ বছর বয়সে। ইনি ছিলেন ইন্দিরা দেবীর দিদি। বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন অনুরূপা দেবীর পিতামহ।

অনুরূপার লেখা প্রথম গল্পটিই কুন্তলীন পুরস্কার পায়। সেটি অবশ্য স্বনামে নয়, প্রকাশিত হয়েছিল 'রাণীদেবী' ছদ্মনামে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'টিলকুঠী' ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেকালে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসটি। এটি ১৩১৯-এ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসটি নাট্যরূপে স্টার মঞ্চে দীর্ঘকাল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস সেকালে নাট্যরূপে পরিবেশিত হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেগুলি হল : 'মা', 'মহানিশা', 'পথের সাথী', 'বাগদত্তা।' অনুরূপা দেবীর লেখা গল্প-গ্রন্থ: 'নির্বাচিত গল্প।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপা দেবীকে ১৯৩৫ ও ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মহিলা-ঔপন্যাসিক নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১)-র বিবাহ হয় মাত্র ১০ বছর বয়সে। ১৪ বছরেই তাঁর জীবনে নেমে আসে অকালবৈধব্য।

নিরুপমা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল'। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিদি'। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকায় এটি প্রকাশ পায়। আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩), 'আলেয়া' (১৯১৭), 'বিধিলিপি' (১৯১৯), 'শ্যামলী, (১৯১৯), 'বন্ধু' (১৯২১), 'পরের ছেলে' (১৯২৪), 'দেবত্র' (১৯২৭), 'যুগান্তরের কথা' (১৯৪০), 'অনুকর্ষ' (১৯৪১) ইত্যাদি।

সমকালে নিরূপমা দেবীর মতো খ্যাতি আর কোনো ঔপন্যাসিকই পান নি। তাঁর একাধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে অভিনীত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

নিরুপমা দেবীর 'আমার ডায়েরি' (১৯২৭) একটি অসাধারণ গ্রন্থ। তাঁর গল্প-সংগ্রহ 'অষ্টক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭-তে।

১৯৩৮ এবং ১৯৪৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিরুপমা দেবীকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন।

অনুরূপা দেবী ও নিরূপমা দেবী কথাসাহিত্যের প্রথম সারিতে নিজেদের আসন স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র লিখেছিলেন : 'শরৎচন্দ্র যখন পূর্ণ প্রতিভায় দেদীপ্যমান, বসুমতীর সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাপন লিখিতে বসিয়া এই দুই মহিলাকে লইয়া যথেষ্ট বিব্রত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন নেপোলিয়নের মতো সম্রাটের মুকুট প্রায় কাড়িয়া লইয়াছেন—সুতরাং কোনো মহিলাকে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী বলিলে খারাপ শোনায়। এই সংকটে সতীশবাবুকে বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। অবশেষে অনুরূপাকে 'সাহিত্য অমরার ইন্দ্রাণী' ও নিরুপমাকে 'উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী' খেতাব দিয়া একটা রফা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য প্রথমদিকে নিরুপমার প্রতিষ্ঠাই বেশি ছিল ('দিদি'ই তাহার প্রধান কারণ)। পরে অবশ্য অনুরূপার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি যে তেজ ও দার্ঢ্যের সহিত বাংলা সাহিত্য জগতের শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া গিয়াছেন সমসাময়িক খুব কম পুরুষ সাহিত্যিকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘটিয়াছে।'

সুলেখিকা পূর্ণশশী দেবীর (১৮৮৫) অনেক গল্পই 'কুন্তলীন' ও 'কেশরঞ্জন' পুরস্কার পেয়েছিল। একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণশশী অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির কয়েকটি হল: 'স্নেহময়ী', 'মেয়ের রূপ', 'মহিলা মজলিশ', 'আঁধারে আলো', 'সাদাকালো' ইত্যাদি।

'ঝড়ের পাখী' ও 'অভাগীর স্বপ্ন' পূর্ণশশী দেবীর দুটি গল্প-গ্রন্থ। তাঁর রচিত স্মৃতিকথা : 'মনে পড়ে।'

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৪৩) ছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী সাহিত্যিক সম্পাদক শ্রী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে সুখলতা বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর ছোটোবোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীও (১৮৯০-১৯৪৩) ছিলেন সুসাহিত্যিক। পুণ্যলতার দুটি গ্রন্থ সেকালে অত্যন্ত খ্যাতি পেয়েছিল। গ্রন্থ দুটি হল: 'ছেলেবেলার দিনগুলি' এবং 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প'।

সুখলতা কৃতী ছাত্রীও ছিলেন। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বেথুন কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করেন তিনি। অল্পসময়েই শিক্ষিকা হিসেবে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত 'আলোক' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন সুখলতা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'গল্প আর গল্প' (১৯১২), 'আরো গল্প' (১৯১৫), 'সোনার ময়ূর' (১৯২৫) 'নিজে পড়ো' (১৯৫৬), 'লালিভুলির দেশে' (১৯৫৭), 'নানান গল্প' (১৯৪৩), ইত্যাদি।

'নিজে পড়ো' গ্রন্থটির জন্য ১৯৫৬-তে ভারত সরকার সুখলতা রাওকেই সর্বপ্রথম 'সাহিত্যপুরস্কার' সম্মানে সম্মানিত করেন।

কথাসাহিত্যিক গিরিবালা দেবীর (১৮৯১-১৯৪৩) প্রথম গল্প 'ছলনা' প্রকাশিত হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী'-তে। তখন গিরিবালার বয়স কুড়ি। ওই সময়েই চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভাগ্যহীনা' গল্পটি।

প্রায় দুশো ছোটোগল্প এবং কুড়িটি উপন্যাসের রচয়িতা গিরিবালা দেবী। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'তৃণগুচ্ছ'।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির কয়েকটি হল : 'রূপহীনা', 'দানপ্রতিদান', 'খণ্ডমেঘ', 'মুকুটমণি', 'কুড়নো মানিক', 'হিন্দুর মেয়ে' ইত্যাদি। সাহিত্যিক বাণী রায় গিরিবালা দেবীর কন্যা।

গিরিবালা দেবী তাঁর বিখ্যাত 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটির জন্য ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লীলা' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

ছোটোগল্প রচনাতে জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৪৩) অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা গল্প-গ্রন্থগুলি সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ব্যান্ডমাস্টারের মা' (১৩৬৮), 'রাজযোটক' (১৩৪৭/১৯৪১), 'আরাবল্লীর আড়ালে' (১৩৬৩), 'আরাবল্লী কাহিনি' (১৩৭২), 'রাজা রানির যুগ', 'মর্ত্যের অপ্সরা' , 'সোনারূপা নয়' ইত্যাদি। শেষোক্ত গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয় ।

'আরাবল্লীর আড়ালে' পড়ে কালজয়ী সাহিত্যিক রাজশেখর বসু লেখেন : 'কয়েক বৎসর আগে কোনো মাসিক পত্রিকায় আপনার ওমদাবাই পড়ে মনে হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে একজন অসাধারণ শক্তিমতী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছে। "আরাবল্লীর আড়ালে" বই-এ আপনার পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। টমাস হার্ডির স্নিগ্ধ পল্লীচিত্র, আরব্য উপন্যাসের রহস্য আর ক্ষুধিত পাষাণের বেদনা একত্র সমাবেশ করেছেন।'

জ্যোতির্ময়ী দেবীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'ছায়াপথ', 'মনের অগোচরে' ইত্যাদি।

'সময় ও সুকৃতি', জ্যোতির্ময়ীব লেখা একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য ভ্রমণস্মৃতি। তাঁর লেখা 'স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ' একটি অনন্য সাধারণ স্মৃতি আলেখ্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য জ্যোতির্ময়ী দেবীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' পুরস্কারে সম্মানিত করেন, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম গল্প-সংকলন 'রাজযোটক' (১৩৪৭/১৯৪১) সম্পর্কে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছিলেন: 'বাংলাদেশ ছোটোগল্প আজ বোধহয় কোনো দেশের চেয়ে ছোটো নয়, 'রাজযোটক' সেই কথাটি বার বার মনে করিয়ে দিলে।'

১৯৬৯-এ জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্প সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'যেকালে সমস্ত তপস্যা ও সাধনা এক কুঞ্চিত-ভ্রূ জিজ্ঞাসাচিহ্নে লাঞ্ছিত, সমস্ত মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, সে সময় এই পরিপক্ক হৃদয়ের দীর্ঘ সাধনার ধনগুলি যদি একালের পাঠক মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে পাঠ করেন তবে আপনার হৃদয়ের হারানো অনেক প্রিয় ও শ্রেয় বস্তুকে খুঁজে পাবেন'।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন শ্রীমতী শান্তা দেবী

বেথুন কলেজের স্নাতক (১৯১৪), কৃতী শান্তা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'উদ্যানলতা' (এটি শান্তা ও সীতা দেবী, দুই বোন যৌথভাবে লেখেন) 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়েই পাঠকমহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সংযুক্তা দেবী নামে।

শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'জহিরা', 'চিরন্তনী', 'জীবনদোলা', 'অলখঝোরা' ইত্যাদি। উপন্যাসের থেকেও অনেক বেশি মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে শান্তা দেবীর গল্পগ্রন্থ-গুলিতে। 'উষসী', 'সিঁথির সিঁদুর', 'বধূবরণ', 'পথের দেখা', 'দেওয়ালের আড়াল', 'পঞ্চদর্শী' ইত্যাদি অনন্যসাধারণ সব গল্প গ্রন্থ রচনা করে গেছেন শান্তা দেবী।

'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্ধশতাব্দীর বাংলা' নামের মূল্যবান গ্রন্থটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তা দেবীকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'পূর্বস্মৃতি'-তে সমকালের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার (১৮৯৪-১৯৭৪) 'সেখ আন্দু' উপন্যাসটি সমকালে খুব বিখ্যাত হয়েছিল। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২২-এ 'প্রবাসী' পত্রিকায়। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'নমিতা', 'জন্মঅপরাধী,' 'জন্ম অভিশপ্তা', 'ইমানদার,' 'মুচি', 'বিনির্ণয়', 'গঙ্গাজল', 'তেজস্বতী', 'চৌকো চোয়াল', 'জয়পতাকা', 'অন্তরের পথে', 'স্মৃতিচিহ্ন' ইত্যাদি।

শৈলবালা ঘোষজায়া বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহিনী লেখিকা। তাঁর বিদ্রোহ প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে 'মা', 'মন্ত্রশক্তি'-র অসামান্য জনপ্রিয়তা নিয়ে এই পথেই হেঁটেছেন অনুরূপা দেবী। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে বরাবরই দেখেছি চিরবিদ্রোহিনী রূপে। পরবর্তীতে এই পথের অনন্যা পথিক রূপে আজও পাই মহাশ্বেতা দেবীকে)।

'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই বিদুষী কন্যা সীতা দেবী ও শান্তা দেবী।

দুই বোন প্রথমে একসঙ্গে একটি উপন্যাস লেখেন। ১৯১৭-তে সেটি 'প্রবাসী' তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সমকালে উপন্যাসটি অত্যন্ত খ্যাতিও পেয়েছিল। উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'উদ্যানলতা'; আর সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সংযুক্তা দেবী' ছদ্মনামে। তার আগে দুই বোন একসঙ্গে অনুবাদ করেছিলেন 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এই গ্রন্থটিও।

সীতা দেবীর (১৮৯৫-১৯৭৪) উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'পথিকবন্ধু', 'সোনার খাঁচা', 'রজনীগন্ধা', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'মাতৃঋণ', 'জন্মসত্ত্ব', 'পরভৃর্তিকা', 'মহামায়া', 'মাটির বাসা', 'বন্যা' ইত্যাদি। শেষোক্ত উপন্যাসটি ১৩৩৫-এ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বন্যা' উপন্যাসটি 'The Waters of Destiny' নামে 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সীতা দেবীর লেখা প্রথম ছোটোগল্প 'চোখের আলো' ১৩২৪-এ 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। তাঁর আরও কয়েকটি ছোটোগল্প সংকলন হল : 'ছায়াবীথি', 'বজ্রমণি', 'আলোর আড়াল' ইত্যাদি। শেষোক্ত গল্পটিই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল 'তমসা' নামে।

বেথুনে পড়াশোনা করা ও ইংরেজিতে স্নাতক সীতা ফরাসিও শিখেছিলেন চমৎকার। তিনি স্বর্ণলতা চৌধুরী ছদ্মনামে ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, স্পেনীয় ও ইতালিয় ছোটোগল্পের অনুবাদ করেছেন প্রচুর।

সুষমা সেনগুপ্ত (১৯৩০-১৯৮৭)-র অসংখ্য ভালো ছোটোগল্প সেকালে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে 'গল্পভারতী' পত্রিকায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলিব মধ্যে আছে 'আগামী', 'চিরন্তনী', 'ত্রিস্রোতা' ইত্যাদি।

বিশিষ্ট মহিলা কথাশিল্পী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২)-র প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' ১৩৩০-এ প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এই উপন্যাসটি বাংলায় 'ভাঙাগড়া', হিন্দিতে 'ভাবী' ও মালয়ালাম ভাষায় 'কুলদবম্' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

এছাড়াও প্রভাবতী দেবীর 'পথের শেষে' উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'বাঙলার মেয়ে' সেকালে দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মঞ্চে অভিনীত হয়।

বড়োদের ও ছোটোদের জন্য লেখা গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : 'অম্বা' (১৯২২), 'আয়ুষ্মতী' (১৯২৩), 'আমার কথা' (১৯২৪), 'জাগরণ' (১৯৩৩), 'সংসার পথের যাত্রী', 'শুভা', 'ধূলার ধরণী', 'অপরাধের

জের', 'ব্রতচারিণী', 'রাঙ্গা বউ', 'মহীয়সী নারী', 'ব্যথিতা ধরিত্রী' প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর গল্প-গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'বিধবার কথা।'

তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাবতী দেবীকে 'লীলা' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। আর তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন নবদ্বীপের বিদ্বজন সভা।

লীলা মজুমদার (১৯০৮)-এর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯২২-এ 'সন্দেশ' পত্রিকায়। কৃতী ছাত্রী (বি এ ও এম এ উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন) লীলা মজুমদার এর খ্যাতি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে হলেও, বড়োদের জন্যও তিনি অনেক লিখেছেন। তার মধ্যে 'পদিপিসির বর্মীবাক্স', 'খেরোর খাতা', 'হলদে পাখির পালক' খুবই বিখ্যাত। তাঁর আত্মজীবনী বা আত্মকথা 'পাকদণ্ডী' একটি অসামান্য গ্রন্থ।

প্রথম বাঙালি মহিলা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক ঔপন্যাসিক হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তাঁর কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি ট্রিলজি উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) ও 'বকুলকথা' (১৯৭৪)। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র জন্য আশাপূর্ণাকে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' সম্মানে সম্মানিত করা হয় (১৯৬৬)। এই উপন্যাসের সূত্রেই আশাপূর্ণা পেলেন ভারতজোড়া খ্যাতি। ১৯৭৬-এ ঘোষিত হয় ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মান এবং 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' (সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান)। অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন আশাপূর্ণা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (জব্বলপুর ১৯৮৩, রবীন্দ্রভারতী-১৯৮৭, বর্ধমান-১৯৮৮, যাদবপুর-১৯৯০) তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে (১৯৯৩) 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

অসংখ্য উপন্যাস আর অজস্র ছোটোগল্প লিখে গেছেন আশাপূর্ণা। তাঁর নিজের কথায় : 'আমার ছোটোগল্পের বইগুলিই আমার বেশি প্রিয়'।

প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৭)-র প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'মাধবীর জন্য' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মনোলীনা' (১৯৪৪)। তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটি হল 'সেতুবন্ধ', 'মাধবীর জন্য', 'সমুদ্রহৃদয়', 'পথে হল দেরী', 'অতল জলের আহ্বান' ইত্যাদি।

বাণী রায় (১৯১৮-১৯৯২) অজস্র ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'প্রেম', 'কনে দেখা আলো' 'হাসিকান্নার দিন', 'প্রেমের দেবতা' প্রভৃতি।

কথাশিল্পী সাবিত্রী রায়ের (১৯১৮-১৯৮৫) প্রথম উপন্যাস 'সৃজন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। 'ত্রিস্রোতা' (১৯৫০) ও তিন খণ্ডের 'পাকা ধানের গান' সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তাছাড়া 'মেঘনা পদ্মা', 'সমুদ্রের ঢেউ', 'মালশ্রী', 'স্বরলিপি', 'হলদে ঝোরা', 'নীল চিঠির ঝাঁপি' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। গল্প-সংকলন : 'নতুন কিছু নয়।'

সেকালের বিশিষ্ট জনপ্রিয় উপন্যাসিক আশালতা সিংহ (১৯১৯-১৯৮৩)-র প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম।' মাত্র ১৬ বছর বয়সে এই উপন্যাসটি লেখেন তিনি।

'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'দেশ' প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, উপন্যাস লিখতেন তিনি।

তাঁর রচিত যে-সব গ্রন্থ সমকালে অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'অমিতার প্রেম', 'মানসী', 'আবির্ভাব', 'ক্রন্দসী', 'কলেজের মেয়ে', 'স্বয়ম্বরা', 'বিয়ের পরে', 'শহরের মোহ', 'সমর্পণ', 'একাকী', 'ভুলের ফসল', 'নতুন অধ্যায়', 'দুই নারী', 'জীবনধারা', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'অভিযান', 'অন্তর্যামী', 'মধুচন্দ্রিকা' ইত্যাদি।

সাহিত্য-সাধনায় সবিশেষ কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশালতা সিংহকে 'লীলা' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। সাহিত্যকৃতির জন্য আশালতা সিংহকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

সুজাতা নামে খ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক (১৯২১-১৯৮২)-এর প্রকৃত নাম কল্যাণী দেবী। নাটক, ভ্রমণ কাহিনি, চিত্রনাট্য ও ছোটোগল্প রচনা করলে; সমকালে তাঁর যে উপন্যাসগুলি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল, সেগুলি হল: 'বেহাগে বাহার', 'অপরাজিতা', 'দ্বিতীয় রহিত' ইত্যাদি।

সুলেখা স্যান্যালের (১৯২৮-১৯৬২) আত্মজীবনীমূলক প্রথম উপন্যাস 'নবাঙ্কুর'। দ্বিতীয় উপন্যাস : 'দেওয়াল পদ্ম'। গল্প-সংকলন 'সিঁদুরে মেঘ'।

কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮) একই সঙ্গে সাহিত্যের তিন শাখাতেই (গল্প, উপন্যাস, কবিতা) যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯৮৭-তে তিনি 'হরিণাবৈরী' কাব্যগ্রন্থের জন্য ভুয়ালকা পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'লীলা' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তাঁর গল্প-গ্রন্থ : 'শ্রেষ্ঠ গল্প'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে,—'সহজসুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি', 'চারজন রাগী যুবতী', 'একটি খারাপ মেয়ের গল্প' ইত্যাদি।

যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা সকলেই প্রয়াত। জীবিতদের মধ্যেও অনেকেই আজ পাঠক হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তারও পরবর্তী সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নানা ধরনের গল্প লিখে চলেছেন অসংখ্য মহিলা লেখক। তাঁদের সকলের কথা পৃথকভাবে বলার সময় আসে নি এখনো। কাল তাঁদের প্রতিভার বিচার করবে একদিন। এখন আমরা অনন্ত আগ্রহে অপেক্ষা করবো তাঁদের আরো ভালো ভালো গল্প পড়ার জন্য। প্রার্থনা করব, তাঁদের লেখনী আমৃত্যু সচল থাকুক।

মেয়েদের পড়াশোনা শেখা শুরু হল এই তো সেদিন! দিনটা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। ভারতে প্রথম বাংলায় সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সরকারি শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনিই নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। প্রবর্তন হল বাংলায় মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষার।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভদ্রলোক মাত্রেই অনুভব করতে পারছিলেন সে-সময়। সেই প্রেক্ষিতেই রাজা রাধাকান্ত দেব নিজগৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫-এ আর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রবর্তন করেন উত্তরপাড়ার জমিদার। বারাসাতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা স্থাপন করেন আরও একটি বালিকা বিদ্যালয়।

১৮৪৯-এর ৭ মে, বেথুন ও বিদ্যাসাগরের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' বেথুন-এর মৃত্যুর (১৮৫১) পর সেটি বিদ্যাসাগরের একক পরিচালনায় বেথুন স্কুল নামেই স্থায়িত্ব লাভ করে।

অবশ্য বিদ্যাসাগর ও বেথুনের অনেক আগেই ইংরেজ মিশনারিগণ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেটা ১৮১৮-১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। ওই সময়েই 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি খ্রিস্টান মহিলা সমিতির প্রচেষ্টায় আটটি মেয়েদের স্কুল চালু হয়। শুধু এ-গুলিই নয়, ১৮২২ থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে আরও ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি।'

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটে এদেশে। তারই স্পর্শে বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের নারীগণও সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মহিলাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ লক্ষ করা যায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবকেরা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নেন। ফলে অন্দরমহলেও প্রবেশ করতে থাকে শিক্ষার আলো। লোকাচার দেশাচারের গণ্ডি অতিক্রম করে অনেক মহিলাই নিজেদের যুক্ত করেছেন সাহিত্যসাধনায়। স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য সাহিত্যকে মাধ্যম করেছেন তাঁরা।

অনেক কিছু বলবার কথা জমেছে তাঁদের মনে; অনেক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের লেখনীতে। ঘোমটার আড়ালে অদৃশ্য থেকে কেবল পারিবারিক কর্তব্য পালনের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের ভূমিকা শেষ বলে আর মনে করেন নি। সে-সবের পাশাপাশি সৃজনশীলতার মধ্যেও তাঁরা নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছেন।

নিজের অনুভব, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধিকে প্রকাশের আকুলতায় সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা। অথচ তাদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক সৃষ্টিগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে, পরবর্তী প্রজন্মের উদাসীনতায়। আমাদের জাতির মজ্জাগত বিস্মৃতি আর স্বভাবজাত উদাসীনতা থেকে সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত লেখিকাদের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলিকে বাঁচাতেই এই সামান্য চেষ্টা।

ছোটোগল্পের ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহিলা গল্পকারের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমাদের নির্বাচিত সেকাল-একালের ১০০টি গল্পের মধ্য দিয়ে শতবর্ষব্যাপী সমাজ বিবর্তনের একটা সামগ্রিক ছবি এখানে দেখতে পাই আমরা। কী ভাবছিলেন, শতবর্ষ আগে আমাদের বঙ্গদেশের নারী সমাজ? ক্রমশ তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বিবর্তন, রূপান্তর ঘটতে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। সুদীর্ঘ ১০০ বছর ধরে রচিত এই গল্পগুলির মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছে বহমান সমাজের ছবি। নারীদের নিজেদের মনোলোকের ছবিও। সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। এই সব গল্পে তাই সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন দেখি আমরা। ফলে ১০০ টি গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সমাজ-বিবর্তনের একটা স্পষ্ট ধারা।

সেকালের গল্পগুলির মধ্যে প্রধানত ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজে, পরিবারে নারীর অবস্থান। আবার পরবর্তীকাল থেকে, সমকালের লেখিকাদের লেখনীতে ফুটে উঠেছে পরিবর্তিত বাস্তবতার অন্য ছবি।

গল্পগুলি নিয়ে আমি পৃথকভাবে কিছু বলছি না। কারণ, সেকাল থেকে একাল, ১৩০০-১৪১৭, এই দীর্ঘ ১১৭ বছরব্যাপী রচিত গল্পগুলির মধ্যে সামাজিক ক্রমবিবর্তনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি পাঠকরাই আবিষ্কার করতে পারবেন, এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে।

নারীদের সমাজে অবস্থান, পারিবারিক অবস্থান, পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা; তাঁদের ভাবনা চিন্তার ক্রমবিবর্তন, প্রতিবাদ-মনস্কতা একটু একটু করে রাতের আঁধার কেটে দিনের আলোর মতো সে সব রূপান্তর, পর্বান্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই ১০০টি গল্পে। গল্পগুলির মধ্যে প্রচলিত সমাজবিধির কাছে আত্মসমর্পণও আছে, আছে বিদ্রোহও। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীদের অবমাননার কথা আছে; আছে এখনকার নানাবিধ সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মনোবিশ্লেষণও। ভাষা, উপস্থাপনায়, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে, আঙ্গিক গঠনের নতুনত্বে গল্প ক্রমশ পাল্টেছে।

পাল্টেছে তার বিষয়-ভাবনা। পাল্টেছে তার ভাষাও। কালের নিয়মে ভাষা বদলেছে। যুগে-যুগে সময়ের ব্যবধানেও বদলেছে ভাষা। আবার সেকালে এবং একালেও প্রথম শ্রেণির ছোটোগল্পকারদের

হাতে গল্পের বিষয়, পরিবেশ, শ্রেণি, চরিত্রানুযায়ী ভাষার অনিবার্য বিবর্তন লক্ষ করার মতো। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন লেখকের রচিত ছোটোগল্পে ভাষার বিবর্তন তো ঘটেইছে, এমনকি একই কালে, একই লেখকের লেখা গল্পের বিষয়ের ভিন্নতার কারণে ভাষা গেছে বদলে। আবার একই লেখকের প্রথম দিকের, মধ্যভাগের ও শেষ ভাগের গল্পের ভাষার মধ্যেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করার মতো।

প্রমীলা গল্প-সংকলনের জন্য ডাকযোগে অনেকেই গল্প পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে অসম, গৌহাটি, শিলচর থেকে এসেছে অনেক গল্প। তা থেকে অল্প কয়েকটি গল্প মনোনীত হলেও অধিকাংশ গল্প মনোনীত করতে না পারার জন্য আমি নিরূপায় ও দুঃখিত। আপনারা আবার আরও ভালো গল্প পাঠান। যাতে তা আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রহণ করতে পারি, স্রেফ সেইসব গল্পের নিজস্ব শক্তিতে।

অনবধানতাবশত দুচারজন বিশিষ্ট লেখিকা হয়তো এই সংকলনে বাদ পড়েছেন। তাঁদের সকলের সেরা লেখাটি নিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ১০০ জনের মধ্যে মাত্র কয়েকজন লেখিকার পরিচিতি সংগ্রহ করতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে চেষ্টা করব। যে ক'জন লেখিকার জন্ম-সন পাইনি (এঁদের মধ্যে অমলা দেবী, ঊর্মিলা গুপ্তা, গোপা সেন ও পুষ্পলতা দেবী সে-কালের লেখিকা। এঁদের সময়কালের হদিশ পেলেও, নির্দিষ্ট জন্ম-সন জানা যায় নি।); সংকলনে তাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী।

গ্রন্থের কলেবরের কথা বিবেচনা করে অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাদের ক্রয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখেই, প্রকাশকের পরামর্শক্রমে 'প্রমীলা' গল্প-সংকলনে গল্পের সংখ্যাকে ১০০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেই হল। যদিও এখনই আমার হাতে মনোনীত গল্পের সংখ্যা ১৫০-এর বেশি। তবু আপাতত এখানেই থামতে হল।

'প্রমীলা' গল্প-সংকলন নামের এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি প্রকাশ সম্ভব হল 'পুনশ্চ'-র কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়কের জন্যই। আমার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থের, সবকটিরই প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক। আমার সম্পাদনায় এর আগেও কয়েকটি বৃহৎ গ্রন্থ সন্দীপ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', ১২ খণ্ডের 'বাংলার ছোটোগল্প', ১০ খণ্ডের 'হাসির গল্পে প্রহসন', 'নানারূপে সত্যজিৎ', 'দাঙ্গার গল্প : দাঙ্গার বিরুদ্ধে' ইত্যাদি। আমার সম্পাদিত সবকটি গ্রন্থই পাঠক সমাদরে গ্রহণ করায় আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি এ গ্রন্থটিও তাঁদের নিরাশ করবে না।

আমার সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মতো এ-গ্রন্থটিরও পাঠকের ভালোবাসা-আগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে, তখন আমাদের মনোনীত বাকি গল্পগুলি এই সংকলনে স্থান তো পাবেই; সেই সঙ্গে নিশ্চয় স্থান পাবে আরো কিছু ভালো গল্প, গল্পের জোরেই।

আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট
শ্রীরামপুর

(ড. বিজিত ঘোষ)

মুকুল

নগেন্দ্রবালা দাসী

॥ ১ ॥

যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স এগার বৎসর; কিন্তু বয়স অল্প হইলেও, আমার শাশুড়ি না থাকায় বিবাহের এক বৎসর পর হইতেই আমাকে নিয়মিত রূপে স্বামীর ঘর করিতে হয়। শ্বশুর ও স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে আমার অন্য কোনো অভিভাবক ছিলেন না।

বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে একদিন রাত্রিতে আমি আমার আট মাসের ছোটো মেয়েটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছি, স্বামী সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন; বাহিরে ভয়ানক দুর্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি এমন সময় বাহির হইতে শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "সুবোধ, একবার এদিকে এসো।" স্বামী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। একটা দ্বারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলাম। বোধহয় আমার আসিবার পূর্বেই তাঁহাদের দুই-একটা কথা হইয়া গিয়াছিল। আমি একটা কথা শুনিলাম, কিন্তু হঠাৎ মর্ম বুঝিতে পারিলাম না; শ্বশুর মহাশয় বলিতেছিলেন, "এরকম বিপদে একজন কুলীন ব্রাহ্মণে পালটি ঘরের আর একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মান রক্ষা না করিলে আর কে করিবে।"

স্বামী। "আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু বাবা—"

শ্বশুর মহাশয়। "তাহা জানি সুবোধ, কিন্তু বুঝিয়া দেখ আমার অন্য কোনো সন্তান নাই যে তাহাকে দিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব।"

অনেকক্ষণ কথা নীরব ছিল, সহসা তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আপনাদেরই আশ্রিত প্রতিপালিত আমি, এ বিপদে কোথায় দাঁড়াইব? আমার উপায় করুন, সুবোধবাবু!"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কী বল সুবোধ? একমাত্র তোমার মতামতের উপর এই শুভকার্য নির্ভর করিতেছে।" স্বামী অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন, অবশেষে বলিলেন, "কী আর বলিব? আপনার যেমন অভিরুচি; আপনার আদেশে আমি বলিদানে প্রস্তুত।" তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর—অতি ধীর।

"আমি বুঝিতেছি এ কাজটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু দুর্যোগের রাত্রিতে অন্য উপায় আর কী আছে? আজ ব্রাহ্মণের জাতি যায়!"—শ্বশুর মহাশয়ের কথা শেষে অপরিচিত ব্যক্তি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমায় রক্ষা করুন সুবোধবাবু, এ বিপদে আমাকে উদ্ধার করুন।"

অতি মৃদুস্বরে আরও দুই চারিটা কথার পর সকলে নীরব হইলেন; পদশব্দে চমকিত হইয়া আমি ফিরিয়া দ্রুত পদে আমার দ্বিতলস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই স্বামী ফিরিয়া

আসিলেন, বিরস বদনে রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আজ রাত্রে বাড়ি ফিরিব না।" আমি তাঁহার বসনাগ্র চাপিয়া ধরিলাম, "কোথায় যাও?"

স্বামী উত্তর করিলেন না, ক্ষুণ্ণভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। শেষে আমি আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে করতে যাবে?"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "না মরিতে!"

আমার বড়ো রাগ হইল; বলিলাম, "কেন বিয়ে করবে? তোমার ত স্ত্রী এখনও মরে নাই।" "বাবার আজ্ঞা।" এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম। তাঁহার কথা শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; রাগ করিয়া বলিলাম, "বাবার আজ্ঞায় তুমি আবার বিয়ে করবে? কী পিতৃভক্তি!"—স্বামী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে আমার কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল, তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য আমি কোনো চেষ্টা করিলাম না; কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল মরণ হইলে বাঁচিতাম। কিন্তু না মরিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—'এমন মানুষ তো উপন্যাসের বাহিরে কোথাও দেখি নাই, বাবার এক কথাতেই আবার বিবাহ করিতে চলিলেন, আমি কেহ নহি।' শেষে কনের বাপের ওপর গিয়া সব রাগ পড়িল, বুড়ো আর কোথাও জায়গা পেলে না, মরতে এখানে এসেছিল! যদি মেয়ের বরই না মিলাতে পারবি, তবে গঙ্গার জলে মেয়েটাকে ফেলে দিলি না কেন?—বোধহয় শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রত্যুষে যখন বুড়ি কাঁদিয়া উঠিল তখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, স্বামী বিবাহ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, নবাগতা বধূ আমাকে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম, সেসব কিছুই নয়: বুড়িকে কোলে লইয়া শুইয়া আছি!

॥ ২ ॥

বিবাহ করিয়া স্বামী পরদিন বাড়ি ফিরিলেন, দেখিলাম নবাগতা বধূ বালিকা নহে, সে যুবতী। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে মুখখানি অতি সুন্দর! আমি আমার দুঃখ ঢাকিয়া আবার তাহার মুখ দেখিলাম; কী সুন্দর! যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক, তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে একটি সুন্দর সরল কমনীয় মাধুর্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বিমুগ্ধ হইতে হয়, মুখখানি আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু আমার প্রাণের বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; রাগে, যন্ত্রণায় আমি তাহার দিকে চাহিলাম না। সে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল, তাহাকে আমি একটা কথাও বলিতে পারিলাম না। ঘরে গিয়া দেখিলাম স্বামী বসিয়া আছেন; আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "তোমার বোধহয় খুব রাগ হয়েছে, না?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, "তুমি ভালোবাসতে পারবে তো! কোন্ অপরাধে আমাকে পর করলে?" স্বামী সস্নেহে আমার অশ্রু মুছাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, তোমাকে পর করিব কেন? কিন্তু মুকুলকেও যত্ন করতে হবে।" আমি কোনো উত্তর করিতে পারিলাম না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইলাম। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "মুকুলের কাল রাতেই বিয়ের লগ্ন স্থির হয়েছিল, কিন্তু ওই রকম ঝড় বৃষ্টিতে বর আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া মুকুলের বাবা আমাদের এখানে এসেছিলেন।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "থাক, ও সব আমি জানি।" সে দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে মুকুল বাপের বাড়ি চলিয়া গেল, আর এক সপ্তাহ পরে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে লইয়া আসিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলাম, "আমি এখানে থাকব না, বাপের বাড়ি পাঠাবে ত পাঠাও, নইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" তিনি প্রথমে চমকিয়া

উঠিলেন, তারপরই সংযত স্বরে বলিলেন, "অমন করো ত আমি মরিব। দেখ, বন্দুকে গুলি ভরিয়া রাখিয়াছি, আবশ্যক বুঝিলেই এই গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

কী নিষ্ঠুর কথা! শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ও মরিবার বাসনা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। আমার বাপের বাড়ি যাওয়া হইল না; শেষে মুকুলের সহিত খুঁটিনাটি লইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, মুকুল আমার কাছে অকারণে তিরস্কৃত হইয়া একটাও উত্তর করে না; নতমুখে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। একা আর কতই বকিয়া মরিব, তাহলে ত কার্য সিদ্ধ হইবে না। মুকুল ত ইহাতে বাড়ি ছাড়িবে না। অবশেষে একটা বুদ্ধি আঁটিলাম, কণ্টক যাহাতে সহজে উৎপাটিত হয় তাহার চেষ্টায় রহিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় মুকুলের ঘরে ঢুকিলাম, দেখিলাম মুকুল জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আমি ডাকিলাম, "মুকী!" মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত করিয়া মধুর কণ্ঠে মুকুল বলিল, "কেন দিদি?"

আমি বলিলাম, 'তোর সঙ্গে গোটা কত কথা আছে।'

'বল না দিদি, কী কথা!' মুকুল আমার হাত ধরিয়া শয্যায় বসাইল।

'আমার স্বামী তোমাকে বিবাহ করেছেন, কিন্তু তোমাকে ভালো বাসেন কী?'

মুকুল। 'কেন দিদি, একথা বলছ? তিনি ত খুব যত্ন করেন।'

আমি। 'না, তিনি তোমায় একটুও ভালোবাসেন না।'

মুকুল। 'তা, কী করবো? আমার বাবাকে তিনি যে বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন, এই যথেষ্ট, ভালোবাসা না বাসা তাঁহার ইচ্ছা।'

সেকী! তুই এই অবস্থাতেই সুখী? আমার কথায় উত্তর মুকুল নত মুখে বলিল, "হাঁ" আমি বুঝিলাম, এ বড়ো সহজ মেয়ে নয়! তাহার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলাম, "তোমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, তার কী?"

ভয়চকিত নেত্রে মুকুল আমার দিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "কেন দিদি?"

"আমার স্বামীতে আমার পুরো দখল, তুই রাক্ষসী, তার মাঝে কে?" বলিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মুকুল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি। কী হয়েছে বল না।"

আমি বলিলাম, "তুই যত শীঘ্র হয় বাড়ি ছাড়িয়া যা, নহিলে আমি বড়ো অনর্থ ঘটাব, কিন্তু সাবধান, যদি এই সব কথা বাহিরে প্রকাশ পায়; তবে তোর অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

মুকুল বলিল, "স্বামীকেও জানাইব না দিদি?"

"স্বামী! তোর স্বামী কিসের?" আমার কথা শুনিয়া এবার মুকুল কাঁদিয়া ফেলিল। আমি সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলাম।

রাত্রিতে শ্বশুর মহাশয় আহারে বসিয়াছেন; মুকুল ও আমি সম্মুখে বসিয়া আছি, কিন্তু পরে মুকুল অতি বিনীতভাবে বলিল, "বাবা!"

শ্বশুর মহাশয় সস্নেহে কহিলেন, "কেন মা লক্ষ্মী!"

মুকুল একবার আমার দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন কী?"

কিয়ৎকালের জন্য আহার স্থগিত রাখিয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কেন?"

মুকুল একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "অনেক দিন বাপের বাড়ি যাইনি, তাই বল্‌ছি।" শ্বশুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।" তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বড়ো বউমা! তোমার কী মত?"

আমি নতমস্তকে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আপনার মতের উপর আর আমার কথা কী?"

মুকুলের পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির হইল, শুনিলাম স্বামীরও মত আছে; বড়ো দুঃখের পর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বিদায়ের সময় আসিল, মুকুল স্বামীর কাছে বিদায় লইতে গেল; আমি গোপনে দেখিলাম, তাঁহার মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু নয়নে দুই ফোঁটা অশ্রু! সে ভক্তিভরে অবনত মস্তকে স্বামীকে প্রণাম করিল। পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে আজিকার মতো বিদায় দাও; আবার মরিবার দিন বিদায় লইব।" বলিতে বলিতে তাহার নয়নের সঞ্চিত অশ্রু সুকোমল গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। মুকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"এত শীঘ্র ও কথা বলিতে নাই মুকুল, আমরা এখনও অনেক দিন বাঁচিব।" বলিয়া স্বামী আদরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে তাহার মস্তক বক্ষে ধারণ করিলেন, দেখিলাম উভয়েই নির্বাক, আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

॥ ৩ ॥

মুকুল শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে পিত্রালয়ে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সে আর এখানে আসে নাই। আসিবার চেষ্টাও করে নাই; করিলে কী হইত, কে জানে? শুনিতাম তাহার সমবয়স্করা জিজ্ঞাসা করিত, "তুই এবার শ্বশুরবাড়ি গেলিনে কেন?" সে হাসিতে হাসিতে বলিত, "তোরা যেমন বোকা! কে আবার সাধ করে সতীন-ঘর করতে যায়?" গুরুজনের কেহ কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নতমুখে গম্ভীরভাবে বলিত, "বুড়ো মা-বাপ ক'টা দিনই বা আছেন, এই বেলা তাঁদের সেবা করে নিই।" যাহা হউক, আমার চক্রান্তটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আশ্বিন মাসের পূজার সময় মুকুলের দাসী একখানা পত্র লইয়া আসিল, মুকুল লিখিয়াছে, "দিদি, অনেকদিন তোমায় দেখি নাই; দেখিতে বড়ো ইচ্ছা করে। সে কথা যাক, এই পূজার সময় 'মা' তত্ত্ব করিলেন; ইহার সঙ্গে আমি দুই শিশি 'দেলখোস' পাঠাইলাম; তাহা তুমি লইও। আমার দাদা এবার পূজায় এই দুইটা আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলাম আমার ইহাতে কোনোই দরকার নাই, দিদি আমার দান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না; অনুগ্রহ করিয়া লইও। শুনিয়াছি 'দেলখোস' খুব ভালো গন্ধ দ্রব্য। আমার প্রণাম গ্রহণ করিও।"

আমি শিশি দুইটি হাতে লইয়া উপরে উঠিতেছে, স্বামী তখন নীচে নামিতেছেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে ও কী?" আমি শিশি দুইটি তাঁহাকে দিতে গেলাম, মধ্যে হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন; পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি বলিলেন, "মুকুল 'দেলখোস' দিয়াছে!" সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমাকেই দিয়াছে।"

স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি পূজার সময় প্রতিদানে তাহাকে কী দিবে?" আমি ঘৃণায় মুখ ফিরাইলাম। তিনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে আমি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলাম। আমার বাবা বর্মায় কাজ করিতেন; এই সময় তিনি বাড়ি আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা কয় ভাই বোনে মিলিত হইয়াছিলাম।

আমি পৌষ মাসটা সেইখানেই রহিলাম; গয়ায় সে বৎসর ভয়ানক প্লেগ হইতেছিল; সুতরাং আমার শীঘ্রই গয়ায় যাওয়া হইল না। মাঘ মাসের শেষে একটা নূতন সংবাদ পাইলাম। হিংসা দ্বেষে আমার দেহ মন জর্জরিত হইয়া উঠিল; স্বামী লিখিয়াছেন, "সেদিন মুকুলের একটি ছেলে হইয়াছে। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম; ছেলেটি বড়োই সুন্দর হইয়াছে তাহাকে দেখিলেই ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে,...।"

রোষে, ক্ষোভে আমি তাঁহার এ পত্রের উত্তর দিলাম না; আমার মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইলাম।

ফাল্গুন মাসে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটিল, শ্বশুর মহাশয়ের পত্রে শুনিলাম, স্বামী প্লেগাক্রান্ত। ভয়ে বিষাদে আমার শরীরের রক্ত শুকাইয়া গেল, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় প্রতি পত্রে লিখিতেছিলেন, "বউমা যেন এখন এখানে না আসেন।" তাঁহার নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য, কাজেই যাওয়া আর হইল না। তিন সপ্তাহ পরে আমি মুকুলের একখানি পত্র পাইলাম। সে প্রথমে লিখিয়াছে, "দিদি আমার চিঠি পড়িবে কী?" তাহার পর লিখিয়াছে, "দিদি, তোমার স্বামী আজকাল অনেক ভালো আছেন, আমি শ্বশুর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছি, যাহাতে তুমি শীঘ্র আসিতে পাও; তুমি আসিলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।"

বুঝিলাম সে এখন শ্বশুরালয়ে, তাহা হইলে সে স্বামীর এই দুঃসময়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, বোধ করি সমস্ত দিন রাত জাগিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। আমার মন কী জানি কেন অনেকখানি নরম হইয়া গেল, হঠাৎ মনে হইল তাহার উপর আমি বড়ো অন্যায়াচরণ করিয়াছি।

॥ ৪ ॥

বৈশাখ মাসে শ্বশুরমহাশয়ের পত্র পাইয়া আমি গয়ায় উপস্থিত হইলাম। "দিদি এসেছ?" বলিতে বলিতে মুকুল আমাকে প্রণাম করিল। লজ্জায় ঘৃণায় আমি কোনো কথা কহিতে পারিলাম না। মুকুল আমার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিল...যে ঘরে স্বামী শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া মুকুল মৃদুস্বরে বলিল, "দেখেছ, দিদি এসেছেন।"

নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া স্বামী আমাকে দেখিলেন, বলিলেন, "এসেছ? বড়ো কষ্টে এবার বাঁচিয়াছি। যদি মুকুল কাছে না থাকিত, তবে বুঝি এবার রক্ষা পাইতাম না। শুধু মুকুলের অবিশ্রান্ত সেবায় স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছ।"

এবার আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, স্নেহ ভরে মুকুলকে চুম্বন করিলাম, তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। স্বামী বিপদে আমাদের উভয়েরই যে সমান বিপদ!

মুকুল আপনার অঞ্চলে আমার অশ্রু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "কেন কাঁদ দিদি; এখন ত আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার হইয়াছি; যে বিপদে পড়িয়াছিলাম! মা রক্ষা না করলে, এতদিনে কে কোথায় পড়িতাম দিদি!"

আমি দেখিলাম, মুকুল এবার ভয়ানক দুর্বল, শরীর বড়োই শীর্ণ। আমি বলিলাম, "তুই এত রোগা হয়েছিস কেন? মুকুল তোর ছেলে কোথায়?"

মুকুল বলিল, "দিদি, ছেলেকে বাপের বাড়ি রেখে এসেছিলাম। শ্বশুর মহাশয় কী এখানে আনতে দেন? সেখানে আমার বড়ো বোনের কাছে সে থাকত; আজই তাকে এনেছি।"

মুকুল চলিয়া গেলে স্বামী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন; "মুকুলের ভয়ানক অসুখ, এই বেলা তাকে একটু যত্ন করো, সে আর বেশি দিন বাঁচবে না।" আমি ভয়ে চমকিয়া বলিলাম, "কী অসুখ?"

স্বামী কাতরস্বরে বলিলেন, "তার যক্ষ্মা হয়েছে।"

শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, আমি মনে করিয়াছিলাম, এবার তার সঙ্গে আর মনান্তর ঘটাব না, দুইজনে মিশিয়া ঘর করিব। মুকুল ছেলে কোলে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি, একে তোমায় দিলাম, আমার ছেলেয় কাজ নাই।" সেই সুন্দর শিশুটিকে কোলে লইতে হাত বাড়াইলাম; মুকুল আমার কোলে তাহাকে দিল, বুকে চাপিয়া ধরিয়া আমি তাহার মুখ চুম্বন করিলাম।"

স্বামী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "দাও আমাকে।" আমি তাঁহার কোলে ছেলেকে দিলাম, মুকুল বাহিরে চলিয়া গেল।

যখন নির্জনে মুকুলের কাছে দাঁড়াইলাম; তখন সে একটা নিশ্বাস টানিয়া অতি কষ্টে বলিতে লাগিল, "দিদি এবার আমি মরিব, আমার সব কাজ ফুরাইয়াছে; আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" সে একটা বাক্স খুলিয়া ফেলিল; একটি স্নিগ্ধে কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিল; মুকুল বলিল, "দিদি আমার শরীর যখন খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল, তখন স্বামী একটা না একটা কিছু হাতে করিয়া প্রায়ই সেখানে আমাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার উপহারগুলি অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি, দেখ এই কাপড়, সেমিজ, জ্যাকেট, কুন্তলীন, দেলখোস, আতর, ল্যাভেন্ডার, চিক্ বাজু, ইয়ারিং সবই তিনি দিয়াছেন। আমি তোমাকে দিলাম। আর তার কাছে যা' পেয়েছি দিদি, তা' আমার বুকে লুকান আছে।" সে শেষের কথাগুলি বড়ো আর্দ্র স্বরে বলিল।

আমি বলিলাম, "মুকুল, তুমি বার বার ও কথা কচ্ছ কেন, এবার আর আমি তোমাকে কিছু বলিব না।"

মুকুল বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি এবার আমাকে যেতেই হবে।"

মুকুল কথা শেষ করিয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু অঞ্চলে মার্জনা করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ভয়ে আমার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলাম, "মুকুল, বোন, তোমার কী খুব অসুখ করছে?"

"দিদি, একবার স্বামীকে দেখিব।" বলিতে বলিতে মুকুল রক্ত বমন করিল। আমি ছুটিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মুকুল অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে পুনঃ পুনঃ রক্ত বমন করিতে লাগিল।

স্বামী আসিয়া তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুকুল ধীরে ধীরে হাত দুইখানি তুলিয়া স্বামীর পায়ের উপর রাখিল, বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, ম্লান হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি, বিদায়!"

তাহার চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুকুল চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

মুকুল সত্যই সব ফেলিয়া চলিয়া গেল! স্বামী কাঁদিতেছেন, শ্বশুর মহাশয় কাঁদিতেছেন, আমি মুকুলের রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাষাণী আমি মরিলাম না কেন?

শরৎকুমার

স্বর্ণকুমারী দেবী

শরতের ঘরখানি একতলায়, ঠিক বাগানের ধারেই, ঘরের পাশেই ছোট্ট একটু বারান্দা। রাত্রিকালে পড়িতে পড়িতে অবসন্ন বোধ করিলে, শরীর মনে বল সঞ্চয়ার্থে কত সময় সে এই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত। বাগানের ফলের গন্ধে তখন কাহার হাসি মনে পড়িয়া যাইত? তারকার জ্যোতিতে কাহার নয়নের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির উপর ভাসিয়া উঠিত। আকাশ-পৃথ্বী-মথিত এই আশানন্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে যখন পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিত তখন আর কোনো পরিশ্রমকেই তাহার পরিশ্রম বলিয়া মনে হইত না। তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের সেই জীবনব্যাপী আশা আজ একটি মুহূর্তে এমন করিয়া দগ্ধীভূত ভস্মে পরিণত করিলে তুমি?—হা ভগবান?

হাসির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজিও সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তরুলতায়, আকাশে বাতাসে চন্দ্রালোকের কী পুলক-কম্পন বহিয়াছিল! কিন্তু শরতের হৃদয়ে?—ইহার এক কণাও প্রবেশ করিল না। পুরাতন আনন্দ-দৃশ্যের দিকে চাহিয়া সে একান্ত নিরানন্দ মনে, আকুল হৃদয়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল—"উঃ, আজই যদি আমি এখান হইতে চালিয়া যাইতে পারিতাম!"

পরদিনই সে আপনাকে বিলাত-যাত্রার আয়োজন ব্যাপৃত করিয়া তুলিল। শরৎ আজন্মকাল হইতে মাতুল শ্যামাচরণের আশ্রয়েই পুত্রবৎ প্রতিপালিত। তিনিই তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছিলেন। সকালেই মামার নিকট হইতে শরৎ খরচপত্র লইয়া নয়টা না বাজিতে বাজিতে কোনোরূপে আহারাদি শেষ করিয়া একখানা ঠিকা গাড়ির দোলায় নিউ-মার্কেটের দিকে ছুটিল।—গেটের কাছে নামিয়াই সম্মুখে দেখিল বন্ধুবর শ্রীধরকে। জিনিসপত্র চিনিতে এবং কিনিতে শ্রীধর যেমন পাকা শরৎ তেমনি কাঁচা। যে কাজে যে পটু সে কাজ করিতে তাহার লাগেও ভালো, অন্যথা ঠিক বিপরীত। অতএব দুজনের সঙ্গলাভে দুজনে সুখ বোধ করিল। তাহার দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক অবশেষে চলিল লেড-ল কোম্পানির দোকানে। অভিপ্রায়, সেখানে শরৎ কলার, টাই ও কামিজ প্রভৃতি কতকগুলো জিনিস কিনিবে, আর পোশাকে পরিচ্ছদ কিছু কিছু ফরমাসও দিয়া যাইবে। নানা কাপড়ের মধ্য হইতে দু-একটা কাপড় বাছিতে এবং গায়ের মাপজোক দিতে যে কতটা সময় যায় ইতিপূর্বে সে জ্ঞানই শরতের ছিল না। এ কার্য সমাধা করিয়া টমাস কুকের গেটের কাছে যখন তাহারা নামিল ঠিক সেই মুহূর্তে দুম করিয়া আফিসের গেটও বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন শনিবার।—দরজা বন্ধের আওয়াজটা এমন জোরে শরতের বুকে ধাক্কা দিল যে ক্ষণকাল জ্ঞানশূন্যের মতোই সে সেই ফুটপাথের উপর বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শরতের একটা নৈরাশ্য শ্রীধরের নিকই ভারি হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল। তথাপি হাসিটা চাপিয়া লইয়া সান্ত্বনার স্বরে সে বলিল,—"এত মুষড়ে পড়লে কেন হে? ক্যাবিন আজ এনগেজ করা হোল না তাতে আর ক্ষতিটা কী এমন ই? জাহাজ তো আর আজই ছাড়ছে না—ছাড়বে সেই ১৫, আজ মাত্র মাসের ছ-তারিখ। চল চল আজ রেসের দিন, সেখানে যাওয়া যাক্, মন টন সব ভল হয়ে যাবে।"

ঠিকা গাড়ির গাড়োয়ান শরতের চেনা লোক, জিনিসপত্র সহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া দুই বন্ধুতে পদব্রজে রেস কোর্সের দিকে চলিল। গেটের নিকট পৌঁছিয়া, দু-খানা টিকিট কিনিয়া লইয়া তাহারা একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিয়াই শ্রীধর মুহূর্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল—তাহার টিকি পর্যন্ত আর দেখা গেল না। এই জনাকীর্ণ অপরিচিত রাজ্যে একাকী পড়িয়া প্রথমটা শরৎ কেমন একটা বিজনতা উপলব্ধি করিল। ক্রমশ সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'বুকমেকার'গণ স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাজি খেলার টিকিট বিক্রয় করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে টাঙ্গান বোর্ডে যে যে ঘোড়া এ যাত্রা দৌড়িবে তাহাদের নাম লেখা। সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বাজিদারগণ তাহা পড়িতেছে, পড়িয়া ঘোড়া বাছিয়া সাধ্যমত বা অসাধ্যমত কোনো একটা বা ততোধিক ঘোড়ার নামে বাজির টাকা জমা দিতেছে। শরৎকুমার এইরূপ দু-একটা ভিড়ের পাশ কাটাইয়া দৌড়াচক্রের নিকটে বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এইস্থান—বিশেষত এরূপ দৃশ্য তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। —শরৎ যে বিকাল বেলাটাও ঘরে বসিয়া পড়িয়া কাটায় এমন নহে, ততদূর ভালো ছেলে সে নয়। গড়ের মাঠের বেঙ্গলি ব্যায়াম ক্লাবের সে একজন মেম্বর। প্রায়ই বিকাশ বেলা সে এখানে আসিয়া কোনোদিন বা খেলিত, কোনোদিন বা খেলা দেখিত। কিন্তু ইহার পর আর কোনো স্থানে যাইবার তাহার সময় হইত না; সখও ছিল না।

ইতিপূর্বে অনেকগুলি দৌড় হইয়া গিয়াছে। আর একটা আরম্ভের এখনো কিছু সময় আছে, তবুও বেড়ার ধারে ইতিমধ্যে লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আরোহী (জকি) পরিচালিত বহু অশ্ব চক্রমধ্যে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কেতকার (Starter) সাঙ্কেতিক যন্ত্র খুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র মুহূর্তে সেই সকল অশ্ব একই সঙ্গে চক্রপথ আলোড়িত করিয়া ক্ষিপ্ত বেগে ছুটিল। দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, আশ্বের প্রতি পদক্ষেপে বাজিখেলোয়াড়দিগের হৃৎপিণ্ডে রক্তস্রোত দারুণ বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল; জকিগণ নিজ নিজ ঘোড়াকে সর্বাগ্রে চালাইবার চেষ্টায় প্রাণের প্রতি মায়া মমতা ভুলিয়া গেল! কি এ বিকট উত্তেজনা! সর্বগ্রাসী উন্মাদনা! বিরাট বিশ্বের ঝটিকা আবর্তন যেন এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে উন্মত্ত দোলায় দোল দিতে লাগিল।—

একজন জকি মধ্য-পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। মাথা ফাটিয়া তাহার সর্ব শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রতি মায়া মমতা দেখাইবার সময় ইহা নহে। একটা বেগবান অশ্ব জকির গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল তাহার জানুর উপর যেন ঘোড়াটার পায়ের আঘাত পড়িল। দুচারিজন কোমলহৃদয় দর্শক আহা আহা করিয়া উঠিল, শরৎকুমার দুইহাতে আপনার চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া পুনরায় চক্রের দিকে চাহিল তখন আর সেই হতভাগ্য জকিকে সেখানে দেখিল না,—তখন ঘোড়াগণ নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা আকাশভেদী রবে সম্মান-জয়ধ্বনি উঠিল। রণ্‌জির নাসিকা সর্বাগ্রে দেখা গিয়াছে, তাহারই জিৎ। আহ্লাদে গর্বে তাহার জকির মাথাটা যেন আধহাত উঁচু হইয়া উঠিল। 'বেটি' ও 'সুইটি' রণ্‌জির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ক্ষেপ দৌড় এইরূপে শেষ হইয়া গেলে, রণ্‌জির অনুবর্তী ভাবে অশ্বগণ জয়ধ্বনি মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া চলিল।

আর সকলে বেড়ার ধার হইতে সরিয়া যাইবার পূর্বেই শরৎকুমার সেই আহত জকির সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। আপনাকে ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়া সে অবিলম্বে আহতের শুশ্রূষার স্থানে আসিয়া দেখিল তাহার কলেজেরই একজন পরিচিত ডাক্তার জকির মাথা বাঁধিয়া দিতেছেন। শরৎ সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ দান পূর্বক জকির জানু পরীক্ষা করিতে বলিলেন। শরৎ সাতিশয় তৎপর ভাবে পরীক্ষা পূর্বক জানাইল, যে যতদূর মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা হয় নাই, জানু-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকারে সে যেরূপ দক্ষতার সহিত পা বাঁধিয়া দিল তাহাতে ডাক্তার সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার তখন ক্লাবে যাইবার সময়। শরৎ দৈবপ্রেরিত রূপে আসিয়া সাহেবকে এসময় উদ্ধার না করিলে তাঁহার টেনিস খেলার এবং পানারামেরও যে বিলম্ব হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধন্যবাদ সহকারে শরতের নামের কার্ডখানা চাহিয়া লইলেন।

প্রাঙ্গণের একধারে দুইজনে কথা হইতেছিল। একজন ভগ্নহৃদয়ে কহিল—"এবারও হেরে গেলুম বিজনদা! এই শেষ chanceটা আমাকে দিতেই হবে।"

কথাটা বলিল শচীন্দ্র, ওরফে খোকা, হাসির ভ্রাতা। উত্তরে বিজন বলিল—"টাকা কোথা শচীন?"

"কেন, তোমার 'বেটি'ত দ্বিতীয় দাঁড়াল—তুমি ত বেশ টাকা পাবে।"

"বেশ টাকা পাব? হায়রে! টায়টোয়ে যদি ধার গুলো শোধ যায় তবেই ঢের; এর মধ্যে তোমার ধারই ত অনেক।" বলিয়া বিজন বাজির টাকা আনিতে ছুটিল। এই সময় শরৎ এদিকে আসিতে আসিতে শচীনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাল্লো?" শচীন হঠাৎ শরৎকে এখানে দেখিয়া প্রথমটা একটু যেন অবাক হইয়া গেল; পরমুহূর্তেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া শরতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলিল, "হ্যাল্লো শর-দা! তুমিও বাজি খেলছ নাকি?

"না, খোকাবাবু না"।

"তবে এখানে এসে কী লাভ?" সে অবজ্ঞার সুরে মুখভঙ্গি করিল। তারপর কী মনে হইল; খুব নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একটা কথা আছে শর-দা।"

"কী কথা?"

"এখানে না-ওই গাছতলায় চল।" শরতের সহসা মনে হইল হয়ত ভাইকে দিয়া হাসিই বা তাহাকে কোনো কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে কিম্বা যদিবা কোনো চিঠিই দিয়া থাকে?" একবার তাহার পিতার অসুখের সময় হাসি তাহাকে একখানা পত্র লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। একটা অকারণ আশায় তাহার মাথাটা যেন সহসা ঘুরিয়া উঠিল! গাছতলায় আসিয়া দুই একবার ঢোঁক গিলিয়া বাধ বাধ করিয়া শচীন বলিল, "শর-দা, তোমার কাছে টাকা আছে?" শরতের ধীরে ধীরে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, একটুখানি সময় লইয়া বলিল—"আছে।"

"আমাকে কিছু ধার দেবে?"

"কত ."

"বেশি নয় শ তিনেক?"

"তিনশ! তাহলে যে আমার টিকিটের টাকা কম পড়বে!"

শরৎ বিলাত যাইবে—শচীন তাহা শুনিয়াছিল, বলিল,—"সে তো দেরি আছে, স্টিমার তো আজই ছাড়ছেনা,—আমি তোমাকে কালই টাকা ফিরত দেবো।—আমাকে এই শেষ chanceটা দাও শর-দা—দয়া করো, নইলে এ দেনো থেকে উদ্ধার পাবনা।"

"কিন্তু যদি এবারও না জেতো?"

"নিশ্চয়ই জিতব—bound to win, তুমি কী মনে করো ভগবান এমন নিষ্ঠুর এমন unjust!"

তাহার এইরূপ উন্মত্ত বাক্যে শরৎ অবাক হইয়া গেল, তাহার মায়া করিতে লাগিল; ছেলেবেলা হইতে ছোটো ভাইটির মতো তাহাকে মনে করে। করুণ স্বর কহিল—"কিন্তু তুমি দেখছনা—পরশুই আমার ক্যাবিন ঠিক করতে হবে, নইলে এ-যাত্রা আমার যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"বন্ধ হবে না! আমি তোমাকে ঠিক বলছি।"

"ধর যদি নাই জেতো?"

"তবুও আমি কালই তোমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো।"

"কী করে? তোমার বাবাকে তো আমি চিনি, তিনি তো দেবেন না।"

"মায়ের কাছে নেব; আমার পাশের পুরস্কার তাঁর কাছে আমার পাওনা আছে।"

"কিন্তু তোমার তো ধার অনেক—সব কী—"

"আঃ, তাতে আর হয়েছে কী? সে ভাবনা আমার। ধর যদি আমার ঘোড়াটা প্রথম হয়—তাহলে আমার ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে যাবে। উঃ কী মজা!"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"ধর, তা হোলনা?"

"তাহলেও তোমার টাকা কালই চুকিয়ে দেবো; দেবোই দেবো। তোমাকে শপথ পরে বলছি।"

"শপথ করতে হবেনা—কিন্তু আর একটা বিষয়ে যদি শপথ করো তো আমি গিতে পারি।"

"কী?"

"তুমি কথা দাও এবার হারো বা জেতো আর কখনো এ রকম বাজির খেলা খেলবেনা?"

"যদি শপথ না করি?"

"তাহলে টাকা দেবো না।"

শরৎকুমারের স্বর দৃঢ়—শচীন বুঝিল উপায়ান্তর নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পর বলিল—"বেশ তাই হবে, আমি শপথ করছি এই আমার শেষ বাজি খেলা।"

শরৎ পকেট হইতে ৩০০ টাকা বাহির করিয়া শচীনকে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে এবার শচীন জিতিল, তাহার ঘোড়া দ্বিতীয় হইল। ইহাতে ৫০০ শতের উপর সে টাকা পাইয়া গেল, কিন্তু তবুও তাহার সব ধার শোধ গেল না। বিজনকুমার তাহাকে যত টাকা ধার দিয়াছিল সব টাকা কাটিয়া লইয়া কেবল ৫০ টাকা মাত্র তাহাকে দিল। তাহাই শরৎকে দিয়া শচীন সানুনয়ে বলিল "শরদা, তুমি কিছু মনে করোনা, দেখলে তো বিজনদা আগে তার টাকা সব কেটে নিলে; আমি মনে করেছিলুম তোমাকেই আগে দেবো; কিন্তু তা আর হলনা। নাই দিকগে ভয় পেয়োনা—আমি নিশ্চয়ই কাল তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো।" বার বার এইরূপে শর-দাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক টমটমে আসিয়া উঠিল। এবং গাড়ি হাঁকাইয়া দুই বন্ধুতে গৃহযাত্রা করিল।

বাজি খেলার নেশা হইতে শচীনকে রক্ষা করিতে পারিল এই ভাবিয়া শরৎ বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। তবে এই আনন্দ তাহার আত্মপ্রসাদে পরিণত হইতে পারিত, যদি ঋণের বদলে টাকাটা সে শচীনকে দানরূপে দিয়া দিতে পারিত। তাহা পারে নাই বলিয়া শরৎকুমারের মনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল; একটা ধিক্কারেরও উদয়-হইল। এত বড়ো হইয়াছে সে, এখনো একটা পয়সার জন্য মামার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের ব্যয়ভার কোথায় নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবে—না এখনো তাহার জন্য মামারই ভাবিতে হয়। শরৎ বিলাত গেলে এ ভাবনা তাঁহার কত বাড়িয়া যাইবে! সে যদি কলিকাতায় বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করে তাহা হইলে অবশ্য এ দায় হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ধৈর্য ধরিয়া কাজ করিলে অল্পদিনের মধ্যে এখানে তাহার পসার জমিবারও সম্ভাবনা—কারণ সে সার্জারিতে সর্বপ্রধান হইয়াছে। কিন্তু মামারই যে বিশেষ ইচ্ছা সে বিলাত

যায়,—তিনিই তো একান্ত উৎসাহ সহকারে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কী করিয়া পিতৃতুল্য মাতুলের এই গভীর স্নেহ-প্রণোদিত মঙ্গল-ইচ্ছাকে সে উপেক্ষা করিবে? তাহার নিজেরও যদি ইহাতে অনিচ্ছা থাকিত তাহা হইলেও সে তাঁহার এ ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু শরতের মনেও এ ইচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন এই ভিত্তিমূলে আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সুন্দর প্রাসাদের নক্সা আঁকিয়াছিল নিরাশার জলে তাহা মুছিয়া গিয়াছে,—তবুও সে বিলাত যাইতে চায়; কেন না ইহাই এখন তাহার শান্তি লাভের উপায়।

শরৎ শচীনের নিকট হইতে টাকা ফিরাইয়া পাইবার অপেক্ষায় রহিল। রবিবারে টাকা পাইবার কথা কিন্তু মঙ্গলবারেও টাকা আসিল না। তবে কী শচীনকে টাকার জন্য শরৎ চিঠি লিখিবে? কিন্তু তাগাদা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিশ্চয়ই শচীন টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, —পারিলেই নিজে আসিয়া দিয়া যাইত। চিঠি লিখিলে তাহাকে কেবল বিব্রত করা হইবে মাত্র!

কিন্তু মামার কাছে কী বলিয়া জবাবদিহি করিবে সে? কী করিয়া আবার আজ টাকা চাহিবে?

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য তাঁহার শ্যালীপতি রাজা অতুলেশ্বরের স্টেটের ম্যানেজার। রাণীগঞ্জে ইহার যে কয়লার খনি আছে—প্রায় শনিবার শ্যামাচরণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতে যান,—এবং হিসাব নিকাশ সহ প্রায়ই সোমবারে বাড়ি ফেরেন। এবার তিনি সোমবারের পরিবর্তে বুধবার বাড়ি ফিরিলেন, কিন্তু তখনও শরতের টাকা আসিল না, শরৎ বুঝিল, আর টাকা পাইবার আশা নাই।—এই দুশ্চিন্তার মধ্যে বিলাত যাওয়ার ইচ্ছাটাও তাহার যেন একরকম ডুবিয়া গেল।

মামা খাওয়া দাওয়ার পর আফিসঘরে কাগজের দপ্তর সম্মুখে করিয়া টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া একটা পায়রার পালকে কান চুলকাইতেছিলেন, এমন সময় শরৎ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পালকটা টেবিলে কলমদানীতে রাখিয়া তাহাকে সম্মুখের চৌকিতে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"ক্যাবিনের টিকিট কেনা হোল?"

"না এখনো হয়নি?"

"এখনো হয়নি! এ স্টিমার তাহলে দেখছি তোর যাওয়াই হবে না! আজকালকার ছেলেদের যে কি রকম পাথুরে চাল হয়েছে,—তাঁরা থাকবেন টিট হয়ে বসে—আর কাজগুলো যেন আপনি এসে ধরা দেবে! এমন গয়ংগচ্ছ কেন, ব্যাপারখানা কী বলো দেখি?"

"টাকা কম পড়ে গেল।"

"টাকা কম পড়ে গেল! যত কিছু খরচ হতে পারে হিসাব ধরে তার উপর আমি যে একশ টাকা বেশি দিয়ে দিলুম। কত টাকা কম পড়েছে?"

"আড়াই শ।"

"আড়াই শ? সর্বনাশ! অত টাকা কি করলে তুমি?" শরৎকে নীরব দেখিয়া লজ্জিত মনে করিয়া বলিলেন,—"থাক আর বলতে হবে না—বুঝেছি ব্যাপারখানা কী! বিলিতি লোকে বেড়ে চোমরা করে ধরেছে, আপনাকে আর সামলাতে পার নি,—হাজার হোক ইংরেজ বাচ্ছার খোসামোদ! মনটা গলে মোম হয়ে পড়ে—তখন কী আর টাকা কড়ি মনে থাকে! উপেনদাদা এ কথাটা বড্ড ঠিক বলেন—ইংরাজে যতদিন পায়ের জুত বুরুস না করে ততদিন রাঙ্গা মুখের মোহ ছোটো না। সাধে কি তোকে বিলাত পাঠাতে চাই—নিজের সাধ ত মিটল না, চিরকালই নিগার রয়ে গেলুম!"—

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল—"না মামা—"

"আরে আর লজ্জায় কাজ কি? যা হয়েছে তা হয়েছে,—তবে নবাবের ভাগ্নে যে নস্ ভবিষ্যতে এটা মনে রাখিস। সেকালে আমরা কী রকম চালে চলেছি শুনবি? একটি আফিসের কাপড়ে ১০টি বচ্ছর কাটিয়েছি, তারপর যদি তোমার মামীর অনুরোধের দায়ে না পড়তে হোত,—আর মাইনেটাও সেই সঙ্গে না বাড়ত তাহলে আরও কতদিন যে চাপকানটা আমায় চেপে থাকতেন তা বলতে পারিনে।"

কথাটা বলিয়া শ্যামাচরণ বাবু একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, সম্প্রতি বৎসর খানেক মাত্র তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মামীর নামে শরতেরও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। মামীর স্নেহে সে মাতার অভাব কখনো অনুভব করে নাই। তিনি তাহাকে এতই ভালো বাসিতেন যে মেয়েরা অনেক সময় ঈর্ষাকাতর হইয়া মাকে অনুযোগ করিত। মা হাসিয়া বলিতেন, "তোরা আমার মেয়ে বইত নয়—ও যে আমার পুত্র সন্তান।" আসল কথা বালক পিতৃমাতৃহীন বলিয়া আপনার স্নেহে তিনি তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিতেন। তিনি যে তাহার আপনার মা নন্—মাতুলানী মাত্র, শরৎ শিশুকালে তাহা জানিতই না,—বড়ো হইয়া যখন জানিল, তখনও তিনি শরতের হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃরূপেই অধিষ্ঠিত রহিলেন।—

কিছুপরে শ্যামাচরণ বলিলেন—"কী এত কাপড় কিনেছিস নিয়ে আয় দেখি, কখনও ত ও রকম কাপড় পরা হয়নি,—দেখেও একবার চক্ষু সার্থক করি।"

"না আমার কাপড়ে অত খরচ হয়নি। আপনি কাপড়ের জন্য যে টাকা দিয়েছিলেন, তার চেয়েও কম টাকাই লেগেছে।"

"তবে কিসে অত খরচ করে এলি?"

"একজন বন্ধুকে ধার দিয়েছি।"

এইবার তিনি সত্যসত্যই রাগিয়া গেলেন।

"বন্ধুকে ধার দিয়েছ! তোদের একটু ধর্মজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান নেই? আজকালকার ছেলেরা কী এতদূর পাষণ্ড হৃদয়হীন! জানিস কত কষ্ট করে তোকে আমার বিলাত পাঠাতে হচ্ছে? বড়ো মেয়েটিকে এবার ভালো করে পূজার তত্ত্ব পর্যন্ত করা হল না। বেশ বুঝছি সেজন্যে তার কত গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। মেজ মেয়েটি আসন্নপ্রসবা,—তাকেও আনতে পারছিনে; আনলেই ত খরচপত্র আছে। ছোটটির বিয়েটাও পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। শুধু ত তোর প্যাসেজমনি নয়—বিলাত যাবামাত্র ভর্তির খরচ প্রভৃতি কত খরচ আছে। যতদিন তুই পাশ হয়ে ফিরে না আসবি ততদিন আমার আর মুক্তি নেই। আর তুই এর মধ্যে বন্ধুকে ধার দিয়ে নবাবি করতে গেলি!"

রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়া ভাবিলেন—"অত কথা না বলিলেই হইত।" শরৎ নতমুখে রহিল। মামা যে কতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছেন ঠিক সে জ্ঞানটা এতদিন তাহার ছিলনা। আজ সহসা তাহার যেন অন্ধ নয়ন খুলিয়া গেল। কিছু পরে সে বলিল, "তবে মামা আমি বিলাত যাবনা—এইখানেই প্র্যাকটিস করি।"

"অমনি রাগ হল! আজকালকার ছেলেদের একটা কথা বলার যো নেই; আমার বাবা রাগের সময় আমাকে কত গালিগালাজই না করতেন,—কিন্তু সেই বিষের মধ্যেও আমরা অমৃত উপলব্ধি করেছি। আমি ত কোনো জন্মে দেবদেবী মানিনে, ঈশ্বর আছেন কি না আছেন তাও জানিনে, কখনো জানতে চাইওনি; কিন্তু বাবার মনে আঘাত লাগবার ভয়ে প্রতিদিনই শালগ্রাম শিলার কাছে মাথা নুইয়েছি। তুই ভাববি, এ কী চাতুরী? চাতুরী নয় এটা পিতৃভক্তি। এ সংসারে জ্ঞানবান স্রষ্টা পুরুষ কেউ আছেন কিনা জানিনে; কিন্তু আমার পিতৃদেব যে আমার স্রষ্টা পুরুষ তা আমি জানি, তিনিই আমার মনে সাক্ষাৎ দেবতা। সে ভক্তিটুকু আজকালকার ছেলেরা হারিয়েছে!"

"না মামা তা নয়। আজ আমি খুব ভালো করে বুঝছি আমার জন্য আপনি কত কষ্ট স্বীকার করছেন। কিন্তু তবুও ত আপনি কর্তব্য পালনে কুণ্ঠিত নন,—আমারও কী এ সম্বন্ধে একটা কর্তব্য নেই মামা?"

"দেখ ওই লম্বা-চওড়া কথাগুলো শুনলে আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে। এ সব বক্তৃতা রাখ। এখনি টাকা দিচ্ছি—নিয়ে যা,—ক্যাবিন ঠিক করে আয়,—এ স্টিমারে আর যাওয়া হবে না তবে পরের স্টিমারে যেতে পারবি। তোর ভালো আমি যা বুঝি তাই করো।"

"কিন্তু আমারও ত এখন বোঝবার ক্ষমতা জন্মেছে।"

শ্যামাচরণের সর্বাঙ্গে এইবার সত্যই বিষের জ্বালা ধরিল। ছেলে-মেয়ের নিকট হইতে প্রতিবাদ তাঁহার অসহ্য! ইহাই তাঁহার স্বভাবের একটা বিশেষ দুর্বলতা; ইহাতে তিনি শ্রদ্ধাভক্তিরই একান্ত অভাব দেখেন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস গিয়াছিলেন—আর এখনকার ছেলেদের গুরুজনের প্রতি একটা অবিসম্বাদী শ্রদ্ধাবিশ্বাসও নাই! হায় রে! ইহার পর তিনি আর আত্মসম্বরণ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না; ক্রোধ-বিকৃত স্বরে বলিলেন, —"লক্ষ্মীছাড়া, তোমার মজ্জায় দেখা ইংরাজি স্বাধীনতা ঢুকেছে। (যেন তিনি এ দোষ হইতে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত!) তোমাকে বিলাত পাঠিয়ে সত্যই ফল নেই, আরো জানোয়ার বনে আসবে। যা ইচ্ছা তবে তাই তুমি কর।"

শরৎ ধীরে ধীরে পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। তিনি এতদূর প্রত্যাশা করেন নাই ভাগিনেয়ের স্পর্ধায় তিনি অবাক হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ সাহসে তিনি রাগ করিবেন না প্রশংসা করিবেন? কিন্তু ইহা স্থির করিতে পারিবার পূর্বেই তাঁহার চক্ষু খুলিতে হইল। একজন ভৃত্য একখানা তার-পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ সেখানা হাতে করিয়া শরৎকে বলিলেন "রসিদ লিখিয়া দাও।" টেলিগ্রাম পড়িয়াই শ্যামাচরণ চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "রাজাবাহাদুর ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন, ডাক্তার নিয়ে আজকার গাড়িতেই প্রসাদপুর যেতে হবে। তুই যা একজন ভালো ডাক্তার ঠিক করে আয়। আমি ততক্ষণ অন্যান্য আয়োজন করে ফেলি। আগামী স্টিমারে তোর যখন বিলাত যাওয়া হোলই না তখন তুইও সঙ্গে চল্। সার্জারিটা ত তুই ভালো বুঝিস। তুই সঙ্গে থাকলে আমার ভাবনাটা অনেক কম হবে।"

শরৎ ইহাতে কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া ডাক্তার ঠিক করিতে গেল।

আদরের, না অনাদরের?

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা সুকুমারী বালা আমারই,—আমারই সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তাই বড়ো সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মতো প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত প্রকৃতি কী সুন্দর! দেখিতে দেখিতে তখন বহু দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—এমনই কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরও মধুরতর মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম, আমার বাতায়নের সম্মুখবর্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কে ও?—কেষ্টদাসী, আজ যে বড়ো রাত থাকতে থাকতে ঘাটে এসেছিস?—কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, তোদের বউয়ের কী এবার তবে বেটাছেলেটি হল?'

"না গো ছোটো কাকি, সে কথা আর বলো না—আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে। যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে?"

"এবার নিয়ে তিনটে মেয়ে হল বুঝি?"

"হ্যাঁ গো, কাকি, তিনটে হল।"

"তা হলে গণ্ডা ভর্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।"

"হ্যাঁ গো খুড়ী, তারই ত মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বলে—কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠল না, কথা কইলে না। বউ মেয়ে তুলবে না; কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে, গলা টিপে দেব। আমি এখানে না থাকলে মেয়েটা বোধ করি মাটিতে পড়ে থেকে সদ্য মারা যেত। বাড়িসুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হয়ে গেছে।"

"তা থাকবে বৈ কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগী মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কি না একটা মাটির ঢেলা হল।"

"আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় বলে বউ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলই বিশ্রী কি না, এবার বউয়ের এমন অরুচি হয়েছিল যে, পেটে জল

যেত না। মেয়েটা এই সবে চার বছরের; খুকী হয়েছে শুনে বলছে, ও ত খোকা নয়, তবে ওকে বিলিয়ে দাও।"

"কচি ছেলে, ওরা যেমন শোনে তাই বুঝে; একটা একটা কথা পাকা মতন বলে ফেলে, তা আটকৌড়ে হবে ত?"

"তা এখন কি জানি, হয়তো অমনি নিয়ম রক্ষা, আটটি ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল খোকাটি হবে, আট-কৌড়েতে ভালো করে হাঁড়ি করবে, তবে ষষ্ঠী পুজোতে তেল সন্দেশ বিলোবে, তা কিছুই হল না, সকলই মিথ্যা হল।"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিক না। এর হল না হল না করে এত দিন পরে শেষে মেয়ে হতেই চলল। নরেশ একটি ছেলে, কেবল মেয়ে হলে নাম রাখবে কে?"

"তা খুড়ী, দাদা কী করবে। এ-কালের ছেলে, ওরা ঝগড়া ঝাটির ভয় পায়। বউয়ের ছেলে হল না, হল না, করে মা যখন হেদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখনই দাদা বিয়ে করতে চায় নি, তা এখন ত মনে হচ্ছে—ছেলে হবার আশা হয়েছে। তবে মায়ের কিনা একটি ছেলে, মা তাড়াতাড়ি সকলই চায়। বউয়ের কিছু এমন বেশি বয়সে মেয়ে হয়নি, বছর আঠারোতে বুঝি বড়ো মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হয়ে বউকে কত ওষুধ খাইয়েছিল, কত মাদুলি, কত ঠাকুরের দোর ধরা, কত কী করার পর ওই মেয়ে হল। তা তখন আশা হল, মেয়ে হয়েছে, তা এইবার নাতি হবে—ও মা, বার বার তিন বার, আর কত সহ্য করবে। তা, মা ত বলে যে, বউয়ের এবার মেয়ে হলেই ছেলের আবার বিয়ে দেব। তা দাদা ত রাজী হয় না, নইলে মা কন্যে পর্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মাও একটু চিরকাল অধৈর্য আছে। আমরা তাই বলি, অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কী হবে, মেয়ে হয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই, ঊষার ঈষৎমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বলজ্বল করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাতসমীরণ কতদূর হইতে কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনও উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানালায় গিয়া বসিলাম। একদিকে বাখারির বেড়া এবং তিনদিকে ইমারৎবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান নামধারী স্থানের মধ্যে একটি ছোটো রকম পুষ্করিণী। এখন বর্ষাতে কূলে কূলে জল হইয়াছে। কিন্তু চারিপাশের জল হিংচা,কলমি, সুশুনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুকুরটির পাড়ে এক ধারে আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি দু-চারিটি ফলবান বৃক্ষ—বৃক্ষের তলা কেহ কখনও পরিষ্কার করে না। এক ধারে পাঁচ ছয়টি কলাগাছ—প্রায়ই তাহাদের একটি-না-একটি গাছকে ফলভাবে পুকুরের উপর অবিনত দেখা যায়। এক ধারে দু-একটা আধ-মরা, গাঁদাফুলের গাছ—দু-একটি জীর্ণ গোলাপগাছ—কখনও তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দু-একটি কুঁড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহা অর্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুকাইয়া যায়। একটি অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু-চারিটি ফুলও লতার বুকে শোভা পায়— সে ফুলে দেবপুজাও হয়। রোপণকালে লতাটির কত না আদর ছিল, কিন্তু এখন আর কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনও ধীরে ধীরে নিজ কার্য করিতেছে।

"ও, মা, কথা কইতে কইতে ভোর হয়ে এল—আজ রাতে জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হল না। তা থাক্—একটু জাহ্নবীর জল পরশ করব এখন—একেবারে তবে পুকুর থেকে চান করেই যাই।

ওগো, ও নাতবৌ, এইখানে আমায় একটু তেল দিয়ে যা।" আজ ঘাটের শুভ দিন—ভারি মজলিস—গৃহিণী নহিলে ঘাট ভালো মানায় না।

"তাই ত বলি কেষ্টদাসী, এ কালের ছেলেপিলে কি মা-বাপকে মানে? আমার শ্বশুর বড়ো গিন্নীর (ইঁহার সপত্নীর) ছেলে হল না বলে অমনই আমার সঙ্গে কর্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন, তেমনই, বছর দুই বিয়ে হতে না হতে প্রথমেই আমার রাধানাথ হল—তা আঃ, কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়াকপালী বসে আছি—ভাগ্যিস তাঁর দুটো গুঁড়ো আছে, তাই নিয়ে সংসারে আছি— নইলে পাগল হয়ে কোন্ দেশে চলে যেতুম। তার পর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড়ো গিন্নীর হরলাল হল। আমার যখন বিয়ে হল, তখন বড়ো গিন্নীর ছেলে হবার বয়েস যায় নি—শুনেছি তবে ওর বাপ খুব ছোটো বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন—আর কর্তার চেয়ে বড়ো গিন্নী বছর দুয়েক বয়স্‌সে ছোটো ছিল—বিয়ের সময় মাথায় প্রায় এক দেখে সুতো জোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হয়ে বিয়ে হয়েছিল, কর্তার তো আমি দোজপক্ষের মতো নই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মতো হলুম। তা সেকালের কর্তারা অত হিসেব-কিতেব বুঝতেন না, বললেন বিয়ে করো—এঁরাও অমন এ-কালের ছেলেদের মতো মা-বাপের কথা ঠেলতে পারতেন না। আমার শ্বশুর বলতেন, যে-আবাগের বেটী কোঁদল করবে, সে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকুক—আমার বাড়ি তার ঠাঁই হবে না। তাঁদের দবন্ ছিল কত—কর্তা বাড়ির ভেতর এলে আমরা কচিকাঁচা বউ-ঝি তো ভয়ে কাঁটা হতুম—ঠাকরুণ সুদ্ধ ভয়ে সারা হতেন। একেলে মেয়েরা যেমন দিবা রাত্রি স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকে—জানিস কেষ্ট, আমাদের তা হবার জো ছিল না। রাত্রে সকল নিশুতি হলে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আসত, তবে যেতুম। এক-একদিন বারান্দায়, কী দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম—আর কেউ ঘরে যেতে বলতে যদি ভুলে যেত, তবে সেইখানেই রাত কাটত। রাধানাথ ছ-মাসের হলে তবে শাশুড়ি একদিন রাধানাথের বিছানা ঘরে দিলেন, সেইদিন থেকে যার যেদিন পালা পড়ত, সে সেইদিন ঘরে শুতে যেতুম। আমাদের ছেলে হলে ছ-মাস কর্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার হুকুম থাকত না—তবে এদানী কিছু দরকার হলে কর্তা লুকিয়ে চুরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে, কী রান্নাঘরে এসে বলে যেতেন। তা বাছা, আমরা দিনের বেলা কথা কইতুম না। শাশুড়ি টের পেলে গঞ্জনা সহিতে হবে, এমন কথা নাই বা কইলুম। তা এ-কালে সবরকমই আলাদা দেখে শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে—হস্ত তৈলসমেত সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি রমণীমুখকমল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেরই মন গৃহিণীর বক্তৃতার দিকে, সকলেই নিজ নিজ স্নান ভুলিয়া গিয়াছেন—কাহারও দাঁত মাজা আর শেষ হয় না, কেহ গামছা দিয়া গাত্র মর্দন করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। মূল কথা, মিত্রদের মেয়েটা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই—তাই ত, আহা, মেয়েটা হল, বেটাছেলেটি হলেই সার্থক হ'ত, বলিয়া আহা উহু করিতেছেন। একজন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা হোক, কত লোকের সাত মেয়ের পর ছেলে হয়—আমার পিসতুত বোনের সেদিন চার মেয়ের পর খোকাটি হয়েছে—খোকাটি এই যেটের এক বছরের হল।"

এই রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দু-একটি ঘোমটাবৃত যুবতী বধূ ও কন্যা স্নান করিতেছিল—একটি চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃ সম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল,—"তা মা, মামীর মেয়ে হয়েছে বলে তোমাদের দুঃখু রাখবার যেন ঠাঁই নেই, তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনি হচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীর মেয়েদের বেশ ভালো লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভালো। তোমাদের এক

কথা, মেয়ে বুঝি কোনো কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ, দু-তিন মাস যে করে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন? দিদিমাই ত সুখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত করে, ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার?—এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে। এই যে ও-বাড়ির ছোটো ঠাকুরমা—কাকা ত এক পয়সা আনতে পারেন না—যাই ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকার সুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দু বোন হয়, তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" এমন বিদ্রোহসূচক কথা শুনিয়া ঘাটসুদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পের্‌ভা, থাম্ থাম্—যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কী বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা কথা ভালো শোনায় না।"

"তা ছোটো ঠাকুরমা, সত্যি কথা বলছি—কেন এই ও বাড়ির ছোটো মামীও বলছেন যে, ওঁর যদি মেয়ে হয়, তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও ত মেয়েদের কত ভালোবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই ত পাছে মেয়ে হয় বলে অত ভয় পান। মেয়ে হয়েছে, এখন ছেলে হবার সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভালো করে আদর পর্যন্ত করতে পারেন না। মামাবাবু ভয়ে পুজোর ভালো কাপড় অবধি করতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু, তোমরা কি বোবা—তোমরা কী মেয়ে নও—?"

"হ্যাঁ গো জ্যাঠাইমা ঠাকরুণ, আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস? আমি মায়ের সন্তান—দিদিমার আদুরে, ঠাকুরমার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন, ও কি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা বলে বাপু গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভার সমবয়স্কা আরও দু-চারিটি কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল— "কী ঠান্‌দিদি, আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কী?"

"কী লো হরিদাসী, এসেছিস? তাই ত বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায়? আমরা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের সুখের কথা কইছি বই ত নয়। তোদেরই, এখন জাঁকের বয়েস—তাই বলছিলুম, বলি হরিদাসী যে এখনও এল না— কাল রাতে বুঝি নাতিজামাই এসেছিল?"

"সে আমি কী জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমরা জান। আমরা ঘাটে আসতে আসতে পথের ধারে হরকালী কাকার বাড়ি গেছলুম—তাদের খোকা হয়েছে দেখে এলুম; তাই আসতে একটু দেরি হল।"

"বটে। ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস—এখন সময় ভালো, সব দিকে ভালো হয়— বউয়েদের কেবলই বেটাছেলে হচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি করা রে—ষষ্ঠী পুজোয় তেল সন্দেশ দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ানো রে, দাওয়ানো রে, সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—একটা বউ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী। "—ত হলই বা—মেয়ে বুজি ফেল্‌না?"

"ও বাবা। তোদের এ-কালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ওই কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন কাজের গা?"

"কোন্ কাজের নয় গা? বাপ মা, স্বামী পুত্র, কারও অসুখ হোক, কারও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে, এত কী ছেলেতে বোঝে? ওগো, ওগো, স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজার টাকাকড়ি থাক্, দেখ, যে বাড়িতে গৃহিণী নেই, সে ঘরকন্না যেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নেই, সে ছেলেপিলের কত অযত্ন। মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কী না বিয়ে দিতে হবে।

তা বাপু, ছেলের জন্য কী কিছু খরচ নেই? সেনেদের বাড়ি দেখতে পাই, ছেলেদের খাওয়া হলে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা-তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো জামা, সাফ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু পয়সা করে এক-একজনের আবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটি করে তিন চারটিকে দেয়। ছেলেরা ভালো গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড়ো বড়ো ছেলেরাও মা-বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোটো বোন দুটি রাধুনীর কাছে শোয়।—আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে! সে দিন ও বাড়ির মেজ কাকির মেয়ে মামার বাড়ি থেকে বাড়ি এসেছে, ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে, তখনও কেউ খায়নি বলে ঠাকুরমা স্বচ্ছন্দে তাকে বললে কিনা, মেয়েমানুষ আগ-দোফের ভাত খাবি কি! এখনও কেউ খায়নি, আগে ভাগে ভাত দাও। আগে বাপ বুড়ো খাগ, তবে সেই পাতে খাস। আহা, সে ছ-সাত বৎসরের মেয়ে, অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগল, শাশুড়ির ব্যাভার দেখে মেজ কাকিমা রাগ করে তখনই তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগল যে, বাছা একদিন বাড়ি এল, দুটো ভাতের জন্যে কেঁদে চলে গেল। এ কী মায়ের প্রাণে সয়। তা কে জানে, মেয়ে আদরের না অনাদরের।"

"বাবা, এ-কালের মেয়েগুলোর মুখের তোড় দেখ, যেন ঝড় বয়ে গেল, যা যা আর জলে পড়ে থাকিস নে, অসুখ হবে।"

যাহা হউক, অল্পবয়স্কারা আর অধিক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না। তাহারা স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসিতেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পুষ্করিণী অধিকারিণীর সেই তৈলমর্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কী ব্যাপার!—ইনি ভারি ব্যস্ত—ইঁহারই গৃহে কাল শাঁখ বাজিয়াছে—বধূর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কী—ঠাকুরঝি যে, আজ গঙ্গা নাইতে যাসনি? আমি বলি, আজ কেবল আমারই যাওয়া হয়নি—তা বোন্, কী করি, মেজ বউমার কাল রাত্রে বেটাছেলেটি হল—তা ফেলে যাই কী করে? জানিস ত, এ-কালের মেয়েগুলো সব বিবি হয়েছে-তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না। আমি তেমন মেয়ে নই—ওই জন্যে বউয়েদের কখনও প্রসবকালে বাপের বাড়ি পাঠাই না। বাপের বাড়ি পাঠাই না। সেজ বউয়ের বাপ আবার ডাক্তার, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান। জান ঠাকুরঝি, আমাদের যেমন নিয়ম আছে, ডাক্তারে বলেন, ও-সব ফেলে দাও—আমি তেমন মেয়ে নই—এই বসে থেকে বৌকে ভাজা ভাজা করে তাপ দিয়ে এলুম, এইবার নেমে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তার আছেন, তিনি আছেন,—তাঁর মেয়ে ঘরে এনে কী আমি নিয়মভঙ্গ করব। সে-বার আঁতুড়ে সেজ বউয়ের মেয়েটা গেল, ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এইসব স্যাঁতানে জায়গায় পড়ে ব্যায়ারাম হয়েছে,—বলে আঁতুড় নাড়তে চান—আমি তা কিছুতে করতে দিই নি।"

"সে মেয়েটার কই কি ব্যায়ারাম হয়েছিল, আমি ত শুনি নি—তার উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল?"

"তাই ত বলছি ভাই—ওঁরা বড়ো বোঝেন, শিশি শিশি ওষুধ এল, গেলাতে চান—গিলবে কে?—বাবা মুখ চেপে ধরে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগের যা, রোজা এনে সব করলুম, তা কিছু হল না। হবে কি—রোজা বললে যে, পোয়াতি চাঁপাফুলের গাচের নীচে গেছল—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহেবের মেয়ে, বেটী হয়ত কোনো গাছতলায়-মাছতলায় গেছল, ও সব ত মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়িমুখো হতে দিই নি। সেবার যেন মেয়েটা গেল গেল, কিছু ক্ষতি হল না—এবার বেটাছেলেটি হয়েছে, একটু ভালো করে তাপ সেঁক না দিলে কী হয়? পোয়াতি ভালো থাকলে, তবে ছেলের পিত্তেশ—কী বলিস ভাই?"

"তা বই কী, বংশ রক্ষার জন্য বউয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই ত নয়। তা হোক, বেটাছেলেটি হয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস। তোদের সূতিকাপুজো আছে ত?"

"হ্যাঁ' সূতিকাপুজো হবে বৈকি—তা লক্ষ বামনের পায়ের ধুলো কোথায় পাব,—বারোটি বামনের পায়ের ধুলো দেব—আর পুজা-আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বউয়ের ছেলেদের বেলা করেছি, এরও তেমনি হবে—এক হাঁড়ি জলপান, একটি করে সিকি, চারটে করে মেঠাই, এইসব ঘরে ঘরে দেব—আর বাড়িতে ছেলেরা যারা আসবে, তাদের বেটাছেলেদের দু আনা, মেয়েদের চার পয়সা করে দেব। আর বেঁচেবত্তে থাকে ত ভাতটিও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের, তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা, একটা ঘড়া কালই দিতে হল—আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হলে, সেই যা নাড়িকাটা একটা টাকা ধরা আছে—আর কী।"

"তা পরমেশ্বর দিন দিয়েছেন, আমোদ-আহ্লাদ খরচপত্র করবি বই কী! আমার দু মেয়ে এখানে আছে, আমার ঘরে তিনটে হাঁড়ি দিস, আর আমার সতীন পো বউও ভিন্ন হয়েছে।"

"হ্যাঁ ভাই, তা বললে ভালো। এই বাড়ি গিয়ে হাঁড়ির ফর্দ করতে হবে। আবার বাজনা আসবে, তবে নাচ আসবে, তার বিদায় খরচ ঢের"—

"শুনেছিস, মিত্তিরদের বউয়ের আবার মেয়ে হয়েছে।"

"ও মা, বলিস কী, আবার মেয়ে—কে বললে?"

"এই কেষ্টর রাত থাকতে হয়েছিল, আঁতুড়ে ছুঁয়েছিল কিনা, সেই কত দুঃখ খেদ করতে লাগল—তারই সঙ্গে কথায় কথায় জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হল না—আমি ভোরে কাপড় কাঁচতে এসেছি, আর কেষ্ট এল।"

"হ্যাঁ ঠাকুরঝি, গঙ্গা তোমার কার নাম গা?"

"আমার ছোটো খুড়-শাশুড়ির নাম 'ফঙ্গমণি', তাই আমরা জাহ্নবী বলি—ঠাকুরদের নাম আমাদের প্রায় করবাব জো নেই। আমাদের বৃহৎ পরিবার সকল নাম বেছে চলতে হয় ত—আমরা ত একেলে নই যে, সুদ্ধ শ্বশুব শাশুড়ির নামটি হদ্দ মেরে কেটে বাছব।"

"তাই ত ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বউটা কি গা—এবার গোটা চার পাঁচ মেয়ে হল বুঝি—আমার বড়ো বউমার যেটের কোলে এই দুটি; দুটি নষ্ট হয়েছে। তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেজ বউমারও দুটি বেটা, একটা মেয়ে, তা মেয়েটা মামার বাড়ি থাকে, দিদিমার আদুরে, মেজ বউমা বাপের একটি মেয়ে কি না। তা ওই প্রথম মেয়ে দিদিমাই মানুষ করেছে, সে মেয়ের ভার আর আমাদের নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতের তেলোয় করে নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে করে কাপড় পরানো হয়, হেমন্তকুমারী নাম তা হেমবাবু বলে ডাকা হয়। সে মেয়ের আদিখ্যেতা কত। আর সেজ বউয়ের দুটো মেয়ের একটা সেই আঁতুড়ে গেছে, আর এই খোকাটি হয়েছে।"

"তা বেঁচে থাক্, আমরা সব পাঁচ কর্মে যাব, খাব, নেব। আমাদের ঘরের কথা। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বই ত নয়। সূতিকাপুজো নেই, আটকড়াই করো আর না করো, ভাত—তা বড়ো সাধ হয় ত পাঁচজনকে এনে খাওয়াও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওয়া, তার ক্রিয়া নেই, কর্ম নেই, পিতৃপুরুষ এক গণ্ডুষ জল পায় না। ওই যা বিয়ের সময় একবার পিতৃপুরুষ জল পান বই ত নয়।"

"যাই, এই বেলা বাড়ি যাই; সেজ বউয়ের বাপ হয়ত এসে এতক্ষণ কত হাঙ্গামা করছে। ছেলেরা ছেলেমানুষ, তারা ত কথা কইতে বড়ো পারে না—আমি এমন জবরদস্তি না হলে রক্ষা ছিল। আর ছেলেগুলোরও ওই মত—সব একেলে কিনা। তা আমার উপর বড়ো কথা কয় না,

বেশি বললেই আমি বলি যে, এখন বড়ো হয়েছিস, আমার মানবি কেন? আমি তোদের চারটি নিয়ে, বিধবা হয়ে কত কষ্ট করে তোদের এত বড়ো করলুম, এখন আমি পর হলুম, শ্বশুরই আপনার হল। তা ওরা আর বড়ো কথা কইতে পারে না। এই ছোটো ছেলে—ওই একটু মুখফোঁড়—আর কোলের কিনা, আদুরে—ওকে কিছু বলতে পারি নে, ও আঁতুড়ে-মাতুড়ে ছুঁয়ে নেপে সৃষ্টি করে। এই আঁতুড় উঠবে আর বউগুলোকে দিয়ে নেপ বালিশ পর্যন্ত সব কাচিয়ে নেব।"

"ও কথা আর বলিস নে—জাত-জন্ম আর রইল না। এ কালের ছেলে, ওরা সব একরকম। আমার ছোটো জামাই অমনি, সে বার বিধু প্রসব হতে এখানে এসেছিল, জামাই রোজ দেখতে আসত, সেই বিছানায় বসে গল্প-সল্প করে চলে যেত। প্রথম যে দিন এল— আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে করে দাঁড়িয়েছি, আর আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার খপ্ করে পায়ের ধুলো নিলে। কি করব, বললুম—'বাবা, আঁতুড় ছুঁয়ে কি আমায় ছুঁতে আছে? আবার হাতে মালা।' তা অপ্রস্তুত হয়ে বলে 'আমার অত মনে ছিল না।' আমি আর কি করব—মালা গেল, আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইয়ের যে মত, মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়—আমি লুকিয়ে দুটো দুটো গুঁড়ো ঝাল দিই—মেয়েগুলোও তেমনি হাত পেতে নিলে, কতক খেলে, কতক বা না খেলে, —বলে, 'ঝাল খেলে মা কেবল জলতেষ্টা বাড়ে বই ত নয়, তোমরা ত জল দেবে না—সুদ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্টাও হয় না, জলও চাই না। কে জানে ভাই, ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায় না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে, অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি করে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে সুদ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কী প্রাণ বাঁচে।"

"তা বই কি, আমার এই চারটি গুঁড়ো হয়েছে, ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে পয়সা দিয়ে পায়ে হাত ধরে জল চুরি করে খেয়েছি। এদিকে ভাজা ভাজা তাপ, ওদিকে সরা সরা ঝাল—যেমন তেষ্টা, তেমনি গার জ্বালা—ওতেই ত শরীর ঝনঝনে হয়। ওই গো, বাজনা এসেছে, তবে আজ আসি।" বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভিজা কাপড়ের অঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান।

গৃহিণী। "দেখেছিস গয়লা-বউ, হরকালীর মায়ের তেজ দেখেছিস্। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, আপনার চার ছেলে বলে কেবল জানানো হয়—আমার চারটি গুঁড়ো। যমের জ্বালা ভুগতে হয় নি, তাই অত জাঁক—ছেলে হলেই ত হয় না। বাঁচাই মূল। যমে না সর্বনাশ করলে আমিও আজ রাজার মা।"

গয়লা-বউ। "তা বই কি মা-ঠাকরুণ, যমের জ্বালা বড়ো জ্বালা। আমার দু ছেলে দু মেয়ে যমকে দিয়েছি, এখন দুটি মেয়ে একটি ছেলে নিয়ে প্রাণ ধরে আছি—বড়োটি শ্বশুরবাড়ি গেছে; মা কেঁদে কেঁদে মরছি। মা, আমরা দুঃখী মানুষ, তা বাছারা আমার এমন যে, আমার পয়সা নেই, কেমন বোঝে—পাছে চাইলে না দিতে পারি, তাই এত সোনার সামগ্রী পাড়ায় আছে, কখনও খেতে কিনতে চায় না।"

গৃহিণী। "তোর মেয়েটি না বেশ ভাগ্যিমন্তের ঘরে পড়েছে?"

গয়লা-বউ। "হ্যাঁ মা, তোমার আশীর্বাদ তারা বড়ো ভাগ্যিমন্ত, আর আমার নয়নতারাকে খুব যত্ন করে। কিন্তু তা বলে কী মায়ের মন বোঝে—আমি যে সকালে এক পয়সার মুড়ি তিনজনকে দিতে পারি না, তাতে যে আমার বুক ফেটে যায়।"

গৃহিণী। "তা কি করবি, কাঁদিস নে, চুপ কর্। মেয়েজন্ম পরের ঘরে যাবার জন্যেই হয়েছে। তাই ত বলি গয়লা-বউ, মেয়েগুলো মিথ্যা। দুদিন বাদে পরের ঘর যাবে—তা বলে এ-কালের মেয়েদের কাছে তা বলবার জো নেই।"

গয়লা-বউ। "তা মা, দু-দিন বাদে শ্বশুরবাড়ি যাবে বলেই ত আমার প্রাণ কেমন করে। তাই

জন্যেই ত মা, আমি মেয়ে দুটিকে না দেখে থাকতে পারি নে। বেটাছেলে মা, বেঁচে থাকলে ওরা আপনারা আনবে নেবে, বউ হবে, আদর যত্ন চিরদিন পাবে— আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে। মেয়েদের মা না করলে আর কে করবে? শাশুড়ি ননদ অত করবে না—দু-দিন বাদে মেয়েরা আবার মা হবে—আপনারা ছানাপোনা নিয়েই ব্যস্ত হবে। আজ যদি মা আমি না আদর করি ত কে আর তাদের আদর করবে।"

গৃহিণী। "তা বই কী। তোর ঢের গেছে কী না, তাই তোর বেশি মায়া—নইলে জগৎ জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটি হয়েছে বলছে বলতে দশ হাত বুক হয়—শুনতে কেমন। ঘটাঘটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হলেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হলে, লোকে বলে, তা হউক—এইবার ছেলে হবে। প্রথম যা হয়েছে, বেঁচে থাক্— জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে ত মঙ্গল। তবে ত ছেলের পিত্তেশ।"

গয়লা-বউ। "হ্যাঁ, মা, যাই—বেলা হল।"

ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল, স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম। প্রকৃতি জননীর আর সেই মধুর স্নেহময় ভাব নাই—এখন চারিদিকে কর্তব্যের ঘোর শাসনকর্তব্য লইয়া সকলে ছুটোছুটি করিতেছে। নয়নে আর সেই মোহ নাই—সূর্যালোকে সকলই পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মনে জাগিতেছে আদরের, না অনাদরের। স্নেহেও পক্ষপাতিত্ব আছে—শুধু স্নেহে নহে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যাসম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার সে ফুলটি এখনও ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্যালোকে এখনও সে ফুল স্পর্শ করে নাই, তাই এখনও সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুযুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—

"অনুগ্রহ করে এই করো, অনুগ্রহ করো না এ জনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিয়া আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমার, তুমি আদরের, না অনাদরের? —আমি আদরের।

অদৃষ্ট চক্র

মানকুমারী বসু

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

আমার গত জীবনের ঘটনা শুনিলে লোকে আমাকে কী বলিবে জানি না, কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষেই বাঙালির ঘরের একজন "নিরীহ মেয়ে"।—আমার অদৃষ্ট-চক্রই আমার অখ্যাতি বা সুখ্যাতির প্রবর্তক। একথা যিনি বুঝিবেন, এ ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনি শুনিয়া তাঁহার কাজ নাই।

পশ্চিমে মধুপুরে, ছোটো পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে বালিকা আমি বড়োই ভালোবাসিতাম। সকলে বলিত, "সুকুমারী পাহাড়ে মেয়ে হয়ে গেল!" তাহা সত্য না হউক, কিন্তু পাহাড়ের উপরে গিয়া দেখিতে পাইতাম—পশ্চিমের আকাশে সিন্দুর ঢালিয়া দিয়া, রবিটি ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইত; মেঘের গায়ে সোনালি আলো ছড়াইয়া পড়িত, নীচে সবুজ শস্যক্ষেত্রে বায়ু ঢেউ খেলাইয়া দিত, বড়ো বড়ো মহিষ, গরু এবং মানুষ সব ছোটো দেখাইত, সেই বিচিত্র সৌন্দর্য দেখার আনন্দ আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আর যে আমাকে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখাইত, তাহাকেও ভুলিতে পারিব না। আমার মনে হয়, অস্তমান সূর্যের সেই অপূর্ব শোভা পাহাড়ের উপরে বসিয়া না দেখিলে, নবমানবের চক্ষু সার্থক হয় না! কিন্তু সত্য বলিতেছি, সেই শোভারাশি উপভোগ করিবার মতো শক্তি তখনও আমার জন্মে নাই;—যতীশ আমাকে দেখাইত, বুঝাইত আরও শিখাইত। তাই আমি প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাইতাম। যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার সময়ে আমার বয়স আট, নয়, দশ এবং এগারো বৎসর। চারি বৎসর পর্যন্ত এইরূপ হইতেছিল।

আমার বাবা কলকাতার একজন বড়ো ডাক্তার। বাবা, মা, আমি, আমার ছোটো ভাই ললিত আর লোকজন, আমরা সকলেই পূজার সময়ে মধুপুরে যাই। বাবা দুই এক মাস পরে কলকাতায় আসেন, আমরা ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সেখানে থাকি। ললিত ও আমি, মাতা পিতার এই দুইটি মাত্র সন্তান।

মধুপুরেই যতীশের সহিত আমার প্রথম বন্ধুত্ব। যতীশের বাড়ি পল্লিগ্রামে; তাহার বাপ জমিদার। মধুপুরে তাঁহাদেরও এক বাড়ি আছে, তাঁহারা শীতকালে সেইখানে থাকেন।

যতীশ আমার অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড়ো। যতীশ আমাকে পড়া বলিয়া দেয়; আঁক কষিতে ও লিখিতে শেখায়; আমার সঙ্গে বেড়াইতে যায়, গল্প করে। তাঁহার সৌন্দর্যের কী এক অনির্বচনীয় শক্তি দেখিয়াছি, যে সকল ভুলিয়া তাহার কাছে থাকিতে হয়; অথবা তাহার কাছে থাকিলে সকল ভুলিতে হয়! বলিতে গেলে গোলমাল হইয়া যায়, কিন্তু সত্য সত্যই যতীশের মুখে কী আছে? কলকাতায় থাকিয়া সে পড়িত, কিন্তু তাহাদের হোস্টেলের নিয়মানুসারে সে বিশেষ কারণ ব্যতীত বাহিরে যাইতে পারিত না; সেই জন্য কলকাতায় আমাদের বড়ো একটা সাক্ষাৎ হইত না। তাই যতীশ যখন পড়িতে যাইত, আমি সমস্ত বৎসর তাহার মুখখানি ভাবিয়া কাটাইতাম।

কলকাতার মাসগুলা যেন দুই হাতে সরাইয়া, মধুপুরে যাইবার মাসকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করিত। লোকে ইহাতে "পূর্ব্বরাগ" ভাবিবে কিনা জানি না; কিন্তু আমার বয়স যখন যাহা, তাহা বলিয়াছি। তবু আমার মনে একটা কথা আছে। সে কথা এই যে বাল্যকালের ভালোবাসাই আমাদের খাঁটি ভালোবাসা। পণ্ডিতেরা মানবের সর্ববিধ সুশিক্ষা বাল্যকালে আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন; আমার বোধ হয়, ভালোবাসার অনুশীলনও বাল্যকালে করিতে হয়। কেননা প্রাপ্তবয়সে মানব-প্রাণ অমন গলিতে পারে না, পরের ভিতর অমন আপনাকে হারাইতে পারে না, এবং হৃদয়ে পরের অমন সুন্দর ফটোটিও উঠিতে পারে না। যাহা হউক ইহার পরে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, তাহা পরে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রি গভীর। মধুপুরের বাড়িতে খাটের উপরে আমি ঘুমাইতেছিলাম; সহসা ঘরের মধ্যে কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলাম মা বাবার সহিত কথা কহিতেছেন, আমারই বিবাহের কথা; আমি নিঃশব্দে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে তাহা শুনিতে লাগিলাম। নিজের বিবাহের কথা শুনিতে কোন্ বালিকার সাধ নাই?

শুনিলাম মা বলিতেছেন, "মেয়ের বিয়ের ভাবনায়ই তো আমার মাথা ঘোরে। গেল আশ্বিনে আমার সুকুমারী তের বছরে পড়েছে; আজ পর্যন্ত তুমি কোথাও সম্বন্ধ ঠিক কোল্লে না; হিন্দু ঘরের মেয়ে কত দিন আইবুড়া থাকবে? আর তুমিই বা এর পরে তাড়াতাড়ি ওকে কার হাতে দেবে? বাবা উত্তর করিলেন, "মেয়ের বিয়ের ভাবনা তোমার আছে, আমার কী নাই? পাত্র ত খুঁজচি, তা মনের মতো ঘর বর পাই কৈ? আমাদের ত একটি মেয়ে, যাকে তাকে ধরে দিতে পারি কি?"

মাতা। কী বল্‌ছিলে তুমি?—যতীশের সঙ্গে সকুর বিয়ে হতে পারে না কেন? ছেলেটি দেখতে যেমন সোনার চাঁদ, বিদ্যাবুদ্ধি তেমনি, আবার জমিদারের ছেলে। অমন পাত্র আর কোথায় পাবে?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম, বাবা উত্তর করিতেছেন, "যতীশেরা খুব বড়ো কুলীন কায়স্থ। কুলীনের প্রথম ছেলে যতীশ; পালটি ঘরে বিবাহ না করিলে কুল-রক্ষা হয় না। আমরা বড়ো কুলীন নই, তাই যতীশের বাপ—তিনি গোঁড়া হিন্দু কী না, তাই তিনি এ বিবাহে সম্মত হন নাই। যতীশের যেন মনে মনে খুব ইচ্ছা যে সুকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয় কিন্তু বড়োই পিতৃভক্ত; বাপেব কথার অন্যথা কত্তে পারে না।" মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমরা যতীশকে তবে পাব না! অমন ছেলে কিন্তু হবে না!"

ইহার পরে মা বাবা কী কথা বলিলেন, বলিতে পারি না। কারণ বাবার কথা শুনিয়া আমাকে যেন সহস্র বিছা একেবারে দংশন করিল! সে অসহ্য যাতনায় চিৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলে বাঁচিতাম! তাহা পারিলাম না! যতীশের সঙ্গে বিবাহ হইবে না, এ নিদারুণ শব্দ, শত বজ্রশব্দ হইতেও আমার পক্ষে ভয়ানক।

তা যতীশের সঙ্গে বিবাহ হইবে, এমন কথা আমাকে কেহই বলে নাই; কেবল আমিই জানিতাম যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কেমন করিয়া জানিতাম, তাহাও বলি। আমি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতাম; তাহাতে পড়িয়াছিলাম, রাজকন্যারা যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই সঙ্গে বিবাহ হইত। একদিন সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তীর মতো একটা বর ঠিক করিতে আমার বড়োই ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সে আজি এক বৎসর আগেকার কথা। আমরা তখন কলকাতায়, সিমলাস্ট্রিটের উপরে আমাদের বাড়ি। সদর বারান্দার উপরে চিক ফেলা। চিকের আড়াল হইতে আমি রাজপথচারী অগণ্য লোক-শ্রেণি দেখিতে লাগিলাম; সেই গাড়ি, ঘোড়া, বাইসিকেল, পালকি ও পদব্রজে কত লোক চলিতেছে, দেখিলাম, কত সুন্দর মুখও দেখিলাম; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিও রাম,

সত্যবান, অর্জুন অথবা নলের মতো দেখিলাম না। কাহাকে দেখিয়াও আমার স্বয়ম্বরা হইবার সাধ হইল না। তখন ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে ফিরিয়া শুনি মা পিসিমার কাছে বলিতেছেন, "যতীশের সঙ্গে যদি আমার সুকুর বিবাহ হয়, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয় বটে।" শুনিয়া যেন ঘোর-আঁধারে বিজলী দেখিলাম! সেই নবোদিত তপনের মতো সুন্দর, তেজস্বী, সরল ও পবিত্র যতীশ মূর্তি আমার মনে পড়িল। মধুপুরের পাহাড়ের উপরে, গৈরিক প্রান্তরে, স্নিগ্ধ নির্ঝরের উপকূলে সেই মধুমাখা কথা, সেই মনোহর গান, সেই প্রাণভরা ভালোবাসা মনে পড়িল। —আরও মনে পড়িল, সেই মূর্তি যেন রামের চেয়ে, সত্যবানের চেয়ে, অর্জুনের চেয়ে এবং নলের চেয়ে সুন্দর! তখন মনে হইল, যতীশের সহিত যাহার বিবাহ হইবে, সে মেয়ে বুঝি বা সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তী অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী।

আমি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, আমি সেই অবধি যেখানে দেব-মন্দির দেখিয়াছি, সেইখানে প্রার্থনা করিয়াছি, যেন যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। যখন পরের বিবাহ দেখিতে গিয়াছি, অমনি করিয়া যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছে, মানস-নেত্রে দেখিয়াছি; কতদিন ফুলের মালা গাঁথিয়া, তরুর শাখায় দোলাইয়া "যতীশের গলায় দিলাম" ভাবিয়াছি। সেই অবধি যতীশের চরণে আপনাকে বিকাইয়াছি! এখন আমার উপায় কী?

আজি এই মুহূর্তে নিষ্ঠুর জাগ্রতি আমার ঘুম ভাঙিয়া দিল। এখন আমার উপায় কী? আমি নীরবে চক্ষের জলে বালিশ ভিজাইতে লাগিলাম।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমরা কলকাতায়। —আমার মাথামুণ্ডু আর কী বলিব, বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। —যতীশের সঙ্গে নহে; অন্য ব্যক্তির সঙ্গে। পাত্র একজন হাইকোর্টের উকিল; তাঁহার পিতা বা অন্য অভিভাবক কেহ নাই, নিজেই কর্তা। পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, খ্যাতি এবং ওকালতিতে পসার যথেষ্ট। পরের বিবেচনায় আমার শুভাদৃষ্ট; আমার বিবেচনায় আমার সর্বনেশে অদৃষ্ট; আমার জীবন্ত সমাধি। এখন বিবাহের আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার ধর্ম রক্ষা হইতে পারে। প্রকৃত পাপ পুণ্য কিসে হয়, তাহা অবশ্য জানি না; তবে আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া উপদেশ শুনিয়াছি, যে মনে মনে পরপুরুষের প্রতি পতিভাবে চাহিলেও মহাপাপ হয়। আমি যদি এখন অন্যের সহিত বিবাহিতা হই, তাহা হইলে আমার পক্ষে যতীশ পরপুরুষ, অথচ আজি দেড় বৎসর পর্যন্ত মনে মনে আমি তাঁহাকেই পতিভাবে উপাসনা করিতেছি। এখন যে আমার ইহকালও যায়, পরকালও যায়, আমার উপায় কী? সামাজিক মঙ্গলের তুলনায় একজনের জীবন তুচ্ছ কথা, তাহা জানি। যতীশ ব্যতীত অন্য কোনো সুপাত্র আমার স্বামী হইলে আমি নিজেও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকিব, সেই নির্দোষ পুরুষকেও দগ্ধ করিতে থাকিব। তবে সামাজিক মঙ্গলের চরণে আত্মবলি দিয়া (বঙ্কিম বাবুর লবঙ্গলতার মতো) অপ্রার্থিত স্বামীকে লইয়া গৃহধর্ম নির্বাহ করিতে পারি। তাহাতে আত্মসংযম ও ত্যাগস্বীকারের সম্পূর্ণ অনুশীলন হইলেও উপরে যে সর্বান্তঃযামী বিশ্বতশ্চক্ষু বহিয়াছে, সে চক্ষু যে আমার পাপের চিত্র দেখিয়াছে। আমি মরিলেও যে "মা" বিশ্বজননী আমাকে তাঁহার স্নেহের কোলে স্থান দিবেন না। একজন জ্ঞানী সুবোধ ব্যক্তি এ অবস্থায় পড়িলে কী করিতেন জানি না; আমি বঙ্গীয় বালিকা, আমার মনে হইল, এ অবস্থায় আত্মহত্যাই আমার উপায়।

তা আত্মহত্যার কী পাপ নাই? কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কী করিব? যতীশের উপরে আমার যে ভালোবাসা তাহা দুর্দমনীয়, তাহা অপরিহার্য্য। সেই সমুদ্রতুল্য অপ্রমেয় ভালোবাসা

লুকাইয়া রাখিয়া অন্যের পত্নীত্ব স্বীকার করিব! জীবন্তের রাবণের চিতা বুকে বহিব? সে কাজ কখনও করিতে পারিব না।— আমার এই কথা শুনিয়া লোকে "সোশিয়ালিস্টিক" বলিবে; কিন্তু আমি এত কপটতা, এত চালাকি খেলিয়া, "সমাজের মঙ্গল" করিতে পারিব না,—"মা" পৃথিবী! ক্ষমা করিও।

তা আমার বাবাকে মা'কে দারুণ শোক দিয়া যাইব? আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটলে, তাঁহারা কত ব্যথা অনুভব করেন, আর সেই আদরের মেয়ে আমি নিতান্ত হৃদয়হীনের মতো মৃত্যুকে সাধিয়া আলিঙ্গন করিলে, তাঁহারা কত ব্যথাই পাইবেন। আমার ছোটো ভাই ললিত কত কান্নাই কাঁদিবে। মরিতে পারিব কী?

পারিব বই কী! আমি আমার সতীত্ব লইয়া পালাইলে, মা বাপের গৌরব ভিন্ন অগৌরব হয় না। আমি যে সদ্বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশের অপমান করা হয় না। ললিত বেঁচে থাকুক, উহার বিবাহ হইবে, বৌ আসিবে, তখন মা বাবার শোকের অনেক শান্তি হইবে।

এইরূপ বহু তর্কবিতর্কের পর অবশেষে আমি আত্মহত্যা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। ঠিক মুহূর্তে ঝি আমার হাতে একখানা ডাকের পত্র দিয়া গেল।

হাতের লেখা দেখিয়া চিনিলাম। হাত কাঁপিতে লাগিল; গা কাঁপিতে লাগিল; খামখানা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম; পত্র এই—

"স্নেহের সুকু! প্রায় দুই বৎসর তোমাদিগকে দেখি নাই, এ হতভাগাকে এতদিন একটু পত্র লিখিলে না। যাহা হউক আমার পিতৃদেব অতীব পীড়িত; তাহার চিকিৎসার জন্য আমরা স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কলকাতায় আছি। তোমরা কলকাতায় আছ, তাহা জানি। সুকু! যদি বল, তাহা হইলে একদিন তোমাদিগকে দেখিয়া আসি। হয়ত সেই দেখাই শেষ দেখা হইতে পারে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী যতীশ।"

একী! বাবা বলিয়াছিলেন, আমাকে বিবাহ করিতে ওঁর আন্তরিক ইচ্ছা; সে কথা সত্য বই কী! যতীশ আমারই। যতীশ আমারই উপাস্য দেবতা! আমি আনন্দে মরিতে পারিব! পত্রের উপর বাসারা ঠিকানা লেখা ছিল, কিন্তু আমি আজি পত্রের উত্তর দিতে পারিলাম না।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ইংরাজেরা বলেন, যে সকল দোষে বাঙালি "মানুষ" হইতে পারে না, দীর্ঘসূত্রিতাই তাহার মধ্যে প্রধান। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় পুরুষেরা দীর্ঘসূত্রি তা দোষে দূষিত কী না, সেকথা আমি অবশ্য জানি না; তবে আমি এইটুকু জানি, যে দীর্ঘসূত্রিতা দোষ আমাদেরই—বাঙালির মেয়েদেরই একচেটিয়া। খোকার দুধ ঠান্ডা হইয়া যাইতেছে, আর খোকার মা ঝিনুকটি হাতে করিয়া, দুই পা ছড়াইয়া সেজ পিসির সঙ্গে গল্প করিতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছ? আত্মীয়েরা কমলাকে তাড়া দিতেছেন, কমলা হয়ত তখন তাড়াতাড়ি বিমলার নূতন গঠিত হার ছড়াটির সমালোচনা করিয়া লইতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছে? তাই বলিতেছি, আত্মহত্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও আমার মরিবার যে বিলম্ব হইতেছে, তাহার জন্য পুরুষেরা যাহাই বলুন, আমার বঙ্গবাসিনী ভগিনীরা, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট ভরসা।

কিন্তু কেবল দীর্ঘসূত্রিতার জন্য নহে, একে বঙ্গবাসিনী তাহাতে বালিকা; আত্মহত্যা করিবার কথায় ভয়ও করে, সুবিধাই পাই না, কাজে কাজেই আমাকে উপহাস করিতে করিতে হৃদয়হীন দিনরাত্রিগুলা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সুতরাং আমার গায়ে হলুদ হইল। আত্মীয়া কুটুম্বিনীতে গৃহ পূর্ণ হইল। বিবাহের সময়ে কিরূপ আলো, কীরূপ বাজনা, কীরূপ সমারোহ হইবে; আমার গহনা ও পোষাক কীরূপ হইবে, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। আর বিলম্ব করা অসম্ভব, তাই আমি আত্মহত্যার উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উদ্ভাবিত নানা উপায়ের মধ্যে একটি উপায় সহজই হইল। মা'র পেটে বেদনা হইলে, সেখানে মালিশ করিবার জন্য বাবা এক শিশি ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা "বিষ"। বাবা মা'কে বলিয়াছিলেন, "শিশিটা সাবধানে রেখ, ওটা ভয়ানক বিষ"। একটুখানি ঔষধ ব্যবহার করিয়াই মা আরাম হইলেন। মেয়ের বিয়ের ব্যস্ততাবশত বাবা ও মা সেই বিষের কথা ভুলিয়া গেলেন। একটা তাকের উপরে শিশিটা পড়িয়াছিল, অগ্নি-শিখা দেখিয়া পতঙ্গ যেমন আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আমিও সেই রকম আনন্দে বিষের শিশি চুরি করিলাম। বিষের শিশি হাতে করিয়া, আমার বুকে যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। খাইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়, তাহা জানি; তবু কেমন যেন খাইতে সাহস হইল না। বাক্সের মধ্যে শিশিটা রাখিয়া চাবি দিলাম। ঠিক করিলাম, বিবাহের রাত্রে সকলে যখন আমাকে একা ঘরে রাখিয়া জামাতা অর্চনা করিতে যাইবেন, তখনই আমি বিষ খাইব। তার পরে যখন বিবাহের জন্য আমাকে লোকে জাগাইতে আসিবে, তখন সেই উৎসাহপূর্ণ অসহিষ্ণু আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া নিস্পন্দ দেহখানি অনন্ত শান্তির কোলে ঘুমাইতে থাকিবে। নিন্দাশূন্য, প্রশংসাশূন্য, বিবাহশূন্য রাজ্যে তাহার প্রাণ জন্মের মতো চলিয়া গিয়াছে।

সবতো ঠিক হইল, কিন্তু প্রাণাধিক যতীশকে একবার বলিয়া যাইতে হইবে। যে কথা এ জন্মে বলি নাই, সে কথাও তাঁহাকে শুনাইতে হইবে। যে মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহার আর লজ্জাই বা কী, ভয়ই বা কী?

তখন নিভৃত কক্ষে, পত্র লিখিতে বসিলাম। কী পাঠ লিখিব, আপনি অথবা তুমি লিখিব, এই সব মীমাংসা করিতে করিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণের পরে যাহা স্থির হইল, তাহাই লিখিলাম—

শ্রীচরণেষু

আপনার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে পারি নাই! ক্ষমা করিবেন। এ জগতে আপনাতে আমাতে আর দেখা হইবে না। বোধহয় আপনি আমার বিবাহের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু প্রিয়তম! বহু দিন আগে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আপনার চরণে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমি বিবাহের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আত্মঘাতিনী হইব, ইহাতে লোকে আমাকে যাহা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন না। আপনার স্নেহের সুকু তাহার সতীত্ব লইয়া চলিয়া যাইবে, আপনি লোকের কথা শুনিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবেন না। আর কী লিখিব! যদি জন্মান্তর থাকে, তবে জন্মান্তরে যেন কায়মনোবাক্যে আমি আপনারই দাসী হইতে পারি।

ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

অভাগিনী সুকু।"

উপরে নাম ঠিকানা লিখিয়া, ঝির হাতে দিয়া পত্র ডাকঘরে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্র রওনা করিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ছি! ছি! এ কী পত্র লিখিলাম। কিন্তু তিনি যে আমাকে "পাহাড়ে মেয়ে" ভাবিবেন! লজ্জায় আমি মরিতে লাগিলাম! কিন্তু আমার অদৃষ্টের নিয়ন্তা যাহা ঠাওরাইতেছেন, তাহা কেবলমাত্র তিনিই জানেন!

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

আজি আমার বিবাহ। লোকে জানিতেছে "বিবাহ", আমি জানিতেছি, আজি আমার শেষদিন। আমাদের বাড়ির পাশেই ফুলবাগান। আমার ছোটো ভাই ললিত ও আমি সেখানে বেড়াইতেছিলাম; আমি মনে মনে মরিবার কথা ভাবিতেছিলাম, তাই ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

বাগানের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর। প্রাচীরে জানালা। সহসা দেখি, রাস্তার দিকে জানালায় একজন অপরিচিতা রমণী। সে একটা ছোটো ঝুড়ি হাতে করিয়া নিতান্ত অপরিচিতার মতো

আমাকে বলিল, "চারি টাকার জিনিস চারি আনায় বেচিব, নাওনা গো দিদিমণি?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কে গা?" সে উত্তর করিল, "আমি সুখ'র মা। তোমারি যোগ্য জিনিস এনেছি, নাও গো নাও। পেটের জ্বালায় চারি টাকার মাল, চারি আনায় দিব, দোহাই তোমার নাও। তা পয়সা কিছুক্ষণ বাদে দিলেও চলবে। লক্ষ্মীটি আমার নাও, নাও।" সুখ'র মা আমার চির অপরিচিতা হইলেও তাহার কথাবার্তায় আমরা দুই ভাই বোনে বড়োই প্রীত হইলাম। বাগানে আমার অভিভাবকেরা থাকিলে হয়ত সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কোনো রূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমরা তাহাকে দয়ার চক্ষে দেখিলাম, সে নির্দোষ! বিশেষত চারি টাকার কী জিনিস চারি আনায় বেচিবে, ইহা দেখিবার জন্য আমরা বড়োই ব্যগ্র হইলাম; ললিতের পকেটে একটা সিকি ছিল, সে আমার সম্মতিক্রমে বাগানের দরজা খুলিয়া সুখর মাকে ভিতরে আনিল।

প্রথমতঃ বিক্রেয় জিনিস না দেখাইয়া সুখর মা আমার ও ললিতের নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমরা উভয়ে নাম বলিলে সে নামের খুব সুখ্যাতি করিল। আমরা আগ্রহাতিশয়ে তাহার বিক্রেয় জিনিস দেখিতে চাহিলে, সে চুপড়ী নামাইয়া, ছেঁড়া কাগজ, করাতের গুঁড়ি সরাইয়া দেখাইতে বসিল।

তাহার বিক্রেয় বস্তু, প্রথম একশিশি "কুন্তলীন" তৈল, মূল্য এক টাকা; দ্বিতীয় একশিশি "গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন" তৈল, মূল্য দুই টাকা; তৃতীয় একশিশি "এসেন্স দেল্‌খোস্‌" মূল্য এক টাকা। আমরা কুন্তলীনের ছিপি খুলিয়া সুন্দর, নির্মল তৈলের মনোমোহন সৌরভে মুগ্ধ হইলাম।

কুন্তলীন তৈলের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তৈলটি অদ্যাপি দেখি নাই, তাই আমার কাছে তৈলের গন্ধ বড়োই মিষ্ট লাগিল। সহসা ললিত একটুকু গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন আমার নাসিকাগ্রে ধরিল; নবস্ফুট গোলাপের সৌরভে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। দেখিয়া সুখ'র মা বলিল "ঐ চেপ্‌টা শিশিতে যে তেল আছে ওতেও খোস্‌বয় খুব"; সেটা বাস্তবিক তৈল নহে—এসেন্স দেল্‌খোস্‌। আমরা চতুষ্কোণ শিশি খুলিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলাম; মরি! মরি! কী অপূর্ব সৌরভ! আমাকে মুগ্ধ দেখিয়া ললিত বলিল, "অডি কলোন, ল্যাবেণ্ডার চেয়ে এর সুগন্ধ মিষ্ট, মনোহর, কেমন নয় দিদিমণি?"

এই চারি টাকার জিনিস চারি আনায় বিক্রয় করিতেছে, ইহাতে অনেক সন্দেহ ঘটিতে পারে। কিন্তু আমরা বালক বালিকা, সন্দেহ করিতে পারিলাম না। বরং এই চারি টাকার এমন রমণীয় সুগন্ধি দ্রব্য চারি আনায় কিনিলে আমাদের জুয়াচুরি করা হইবে, মনে হইতে লাগিল। গত আষাঢ় মাসে, বাবা রথের বাজারখরচ চারি টাকা দিয়াছিলেন, ললিতকে সেই টাকা কয়টি আনিতে বলিলাম; আমি বাগানে রহিলাম।

আমাকে একা দেখিয়া সুখ'র মা বলিল, "ও সব জিনিসের দাম দিতে হবে না, দিদি- মণি। ও সবই তোমার জন্য। এই চিঠিখানায় সব আছে। আমি তবে আসি।" আমার হাতে পত্র দিয়া, এবং আমাকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া, সুখ'র মা প্রস্থান করিল। বিস্ময়ে সোৎসুকে আমি পত্র খুলিলাম; লেখা চিনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িলাম, — পত্র এই—

"স্নেহের সুকু! তোমার পত্র পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তুমি বালিকা হইলেও দেবী। ভাবিয়াছিলাম, তোমার বিবাহ দেখিয়া তার পরে আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইব। তাহা হইল না। আমি সত্য বলিতেছি তুমিও মরিবে, আমিও মরিব।

প্রিয়তমে! আমি আজি তোমার কাছে একমাত্র ভিক্ষা চাহিতেছি, তুমি জীবন ত্যাগ করিও না। আমি আজ প্রাণ ভরিয়া জনমের মতো তোমার পবিত্র সরল মুখখানি দেখিয়া লইব। তোমার সহিত যাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই শ্রীশবাবু আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সহিত আমি 'বরযাত্রী' হইয়া যাইব।

"কুন্তলীন" দুই শিশি এবং "এসেন্স" এক শিশি দিলাম, ইহার সৌরভ আমার বড়ো ভালো লাগে; আর মাথার অসুখে ইহা হইতে আমি বড়োই উপকার পাই, সেই জন্য ইহা তোমাকে দিলাম; হতভাগার শেষ উপহার বলিয়া গ্রহণ করিও। ইতি।

হতভাগ্য যতীশ।"

পত্র পড়িয়া বড়ো কান্না আসিল। আজ আর মরা হইবে না। উনি আমাকে ঘৃণা করেন নাই, বাঁচিলাম।

॥ উপসংহার ॥

"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্" কথাটি বহু পুরাতন হইলেও অমূল্য। আজিকার দিনে আত্মহত্যার বড়োই বাড়াবাড়ি হইয়াছে; যাহারা ওই ভয়ানক কাজ করেন। তাঁহারা যদি রাগের বা দুঃখের প্রথম আবেগটা একটু সম্বরণ করিতে পারেন, যদি "অশুভস্য কালহরণম্" মনে করেন, তাহা হইলে হয়ত আমার মতো অনেককেই ওই মহাপাপে পড়িতে হয় না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদের বাড়িতে বিবাহের ধুম পড়িয়াছে। আমি পলকে পলকে মৃত্যু পিপাসা সংযত করিতেছি, আমার উপাস্য দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। যখন বর আসিল, যখন আনন্দোচ্ছ্বাসে, বাদ্যহিল্লোলে আলোকতরঙ্গে জনসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন আমি—বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা, চন্দন ও অলক্ত রাগ-রঞ্জিতা, আমি সঙ্গিনীদিগের কোলে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলাম।

সংজ্ঞা পাইয়া দেখি, যে বাবা কত রকম ঔষধ আমার মুখে ও নাকে দিতেছেন। মা কাঁদিয়া বলিতেছেন, 'অমন হলে কেন মা? ঠাকুর যে মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার জন্য আমি যে সেই হারাধন পাব মা।" সে কী?

যখন আমাকে বিবাহের সভায় লইয়া গেল, তখন বাবা গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাপ যতীশ। আমার যে চিরদিনের কামনা, তাহা ভগবান আজি পূর্ণ করিলেন। এখন তাঁর কৃপায় তোমরা চিরজীবি হও।" যতীশ কে? বর? আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি কী বিষ খাইয়াছি? বিয়ের মোহে কী স্বপ্ন দেখিতেছি? তখন অবস্থা, উপযোগিতা সবই ভুলিয়া, ঘোম্‌টা খাটো করিয়া চাহিয়া দেখি, আমার সেই অভীষ্ট দেবতা বর সাজিয়া আসনে বসিয়াছেন! এ কী সেই আমার অদৃষ্ট চক্র?

বিবাহের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে, কেবল উনি আর আমি বাসর ঘরে রহিলাম; মা আর কাহাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না। উনি আমার হাতখানি নিজের কমল করে লইয়া ডাকিলেন, "সুকু!" সেই চির পরিচিত অথচ চির নূতন কণ্ঠস্বর! আমি কথা কহিব কী, চোখের জলে ভাসিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল; জানিয়া উনি আমার মাথায় একটু কুন্তলীন দিলেন, আর সেই দেল্‌খোস মাখা সুবাসিত রুমালখানি দিয়া, আমার মুখ চোখ মুছাইয়া দিলেন। আমার শরীর বেশ একটু স্নিগ্ধ হইল; তখন উনি বলিতে লাগিলেন, "এ সবই ঈশ্বরের কৃপা। তোমার পত্রখানি শ্রীশবাবুকে দেখাইয়া আমি সকল কথা তাঁহাকে বলি। শ্রীশবাবু অতি সদাশয় মহাত্মা। তিনি অনুতপ্ত হইয়া তখনই আমার বাবার কাছে যান। বাবাকে সবিশেষ বলিয়া, এ বিবাহ না হইলে আমাদের দুজনের জীবন যাইবে, তাহাও বলেন। ঈশ্বরের কৃপায় আর শ্রীশবাবুর বাক্যকৌশলে বাবা সবই বুঝিলেন; বলিলেন, 'কুলের চেয়ে আমার ছেলের জীবন বহুমূল্য।" তার পরে আমার শ্বশুর মহাশয়কে ডাকিয়া বাবা সব বলিলেন; আমার শ্বশুর সম্মত হইলেন। তাই শ্রীশবাবুর পরিবর্তে আমিই বর সাজিয়া তোমার বাসরে আসিলাম।"

আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। কোথায় আত্মহত্যা, আর কোথায় প্রিয়তমের সহিত চির মিলন! ওঁর কোলে মাথা রাখিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। শ্রীশবাবুর মহাপ্রাণতা আমার চিরস্মরণীয়।

আত্মোৎসর্গ

সুশীলা সেন

বিভার স্বামী বিলাতে সিভিল সার্ভিস পাশ করিতে গিয়াছেন। বিভার সহিত যতীশের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স বারো ছিল, এখন সে সতেরো বৎসরের হইয়াছে। এই বৎসরেই বিভার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। বিভার পিতা শিবচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন গভীর বিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার স্বভাব তেমনি শান্ত, সেবাপরায়ণ এবং নির্মুক্ত ছিল। কতকগুলি এম এ ক্লাসের ছাত্রকে তিনি সংস্কৃত পড়াইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। জামাতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার ভালো লাগে নাই। তিনি বলিতেন, "আমাদের এই দেশের মাটি যেমন, একটুখানি আঁচড় কাটিলেই সোনা ফলে, আমাদের দেশের লোকের মনও তেমনি, এমন নম্রতা ও সহিষ্ণুতা তাহার ভিতর আছে যে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট ভাব এবং জ্ঞান তার ভিতরে অতি সহজেই ধরা পড়ে। বিদেশে গেলে, বিশেষত বিলাতে গেলে, আমাদের ছেলেদের মনের সেই গুণটুকু নষ্ট হইয়া যায়, কেমন একপ্রকার হৃদয়হীন ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে।" দেশের উপরে শিবচন্দ্রের গভীর ভক্তি ছিল। অতিথি সৎকার, দরিদ্রসেবায় তিনি তাঁহার গৃহাশ্রম পবিত্র এবং আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের প্রেমময়ী গৃহিনী এ বিষয়ে তাঁহার যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন। প্রতিদিন পুণ্য প্রভাত সময়ে প্রাতঃস্নান করিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত শিবচন্দ্র যখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে দেবপাঠ করিতেন, তখন মনে হইত যেন আবার সেই সুদূর অতীতের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে— আর্য ঋষিগণের কণ্ঠ নিঃসৃত বেদমন্ত্রে যেদিন ভারতবর্ষের এই নিস্তব্ধ আকাশ প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্বশুরের অনিচ্ছা এবং নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যতীশকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। সে নিজেদের পুঁজিপাটা যাহা ছিল সব বিক্রয় করিয়া, ধার করিয়া বিলাতে চলিয়া গেল। তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা সর্বস্বান্ত হইয়া দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতীশই তাহাদের একমাত্র সন্তান। তাঁহারা ভাবিলেন যাহাই হোক, যদি ছেলেটি মানুষ হইয়া আসে, তাহা হইলে সব দুঃখ সার্থক হইবে।

পিতৃগৃহের স্নেহছায়ে, শান্তি ও আনন্দে বিভোর দিনগুলি কাটিয়া যাইত। বিভা তাহার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা; শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, বিভা সকলের ছোটো। পিতা মাতা ও ভাইদের নয়নের আনন্দ সে ছিল। শিবচন্দ্র তাহাকে রীতিমতো লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বিভাকে তাহার শ্বশুর শাশুড়ির নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সেখানেও বিভা যত্ন ও আদর পাইত।

তখন কলিকাতায় খুব স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। শিবচন্দ্র নিজে চিরকালই "স্বদেশি" ছিলেন; আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতেই তিনি স্বদেশি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। বিভার দাদা মিটিং

করিতে, বয়কট করিতে খুব মাতিয়া উঠিল। একদিন বিভার বড়ো দাদা একখানি বঙ্গজননীর ছবি কিনিয়া আনিয়া, যে ঘরে বিভা ও তার মা শুইতেন সেই ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল। ছবিখানি অশিক্ষিত হস্তাঙ্কিত হইলেও বিভার মনকে বড়োই স্পর্শ করিল। অন্নপূর্ণারূপে জননী জন্মভূমি অন্ন-বস্ত্র-হস্তে সন্তানদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহার আপন সন্তানগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার সেই সস্নেহ দান উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুঃখিনী জননী বিমুখ সন্তানদিগের প্রতি সতৃষ্ণ স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন! বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ছবিটি দেখিত—অশ্রুজলে তাহার চোখ ভরিয়া উঠিত।

৩০ আশ্বিনের পুণ্যদিন আসিল, বিভার মা ঠিক করিলেন সকলে মিলিয়া আজ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বাড়িতে ফলাহার করিবেন। গঙ্গার ঘাটে সেদিন কী দৃশ্য! দলে দলে বালক, যুবক, বৃদ্ধ নগ্নপদে,—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান!

এই গান করিতে করিতে চলিয়াছে। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পর পরস্পরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিতেছে। বিভার মনে হইল সেদিন, সেই শুভ্র উষার আলোকে, গঙ্গার ঘাটের উপর কীসের যেন একটি আবির্ভাব জলস্থলকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। নব সূর্যের কিরণরাশির ভিতরে তাঁহারা যেন জননীর হাসি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মনের ভিতরে একটি অব্যক্ত মধুর ভাব লইয়া তাঁহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

বিভার "স্বদেশি"র দিকে পক্ষপাত দেখিয়া দুই একটি সমবয়সী বালিকা তাহাকে বলিয়াছিল, "বিভা, তুমি তো খুব স্বদেশির ভক্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তোমার বর সাহেব সেজে বিলাতি বুট পরে এসে যখন দাঁড়াবেন, তখন তোমার এত ব্রত নিয়ম সব কোথায় থাকবে?" বিভা বলিত "হাজার সাহেব সাজলেও বাঙ্গালির ছেলে চিরকাল বাঙ্গালিই থাকবে।" সখীরা হাসিয়া বলিত, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

আপাদমস্তক সাহেব সাজিয়া, সাহেবি কেতায় নির্দোষরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া, যতীশচন্দ্র সিবিলিয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই বিভাকে লইয়া নিজের কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়, বিলাতি দোকান হইতে অসংখ্য বিলাতি ব্যবহার্য দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। রাঁধিবার সরঞ্জাম পর্যন্ত খাস বিলাতি হইল। বিভা মৃদুস্বরে একবার বলিল "এত বিলাতি জিনিস কেন কিনিতেছ, এসব জিনিসই ত দেশি পাওয়া যায়, আমার বাবা একটিও বিলাতি জিনিস কেনেন না।" যতীশচন্দ্র মুখ হইতে চুরুট না খুলিয়াই অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন. "রামঃ, দেশি জিনিস আবার মানুষে কেনে!" উত্তর শুনিয়া বিভা চুপ করিয়া গেল।

সিরাজপুরে আসিয়া, সাহেব মহলে এক প্রকাণ্ড বাংলা বাড়িতে বিভা নির্বাসিত হইল। তাহার শ্বশুর শাশুড়িকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিল, যতীশ তাহা উড়াইয়া দিল। পুত্রের প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা নিজে আসিয়া একবার পুত্রকে দেখিয়া আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন। সিবিলিয়ান পুত্রের নিকট হইতে মাসে মাসে কিছু টাকা এবার তাঁহারা বহুপুণ্যের ফল স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন! বিভা দেশ বুঝিয়াছিল, তাঁহারাও এখানে টিকিতে পারিবেন না। এই মুর্গি, মাংস, অনাচার—তাহার ভিতরে তাঁহারা কী করিয়া থাকিবেন? তাহার নিজের সমস্ত অন্তরাত্মা এই অনাচার, বিলাসিতা, ধর্মহীনতায় বিমুখ হইয়া উঠিত, কিন্তু তবু সে কিছুই বলিতে পারিত না। যতীশ চিরকালই ক্ষমতাপ্রিয় ছিল, আজকাল সিবিলিয়ান হইয়া সে আরও হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিভা স্বামীকে নীরবে ভয় করিয়া চলিত। তাহার মা তাহার সঙ্গে কিছু বাসন ও দেশি ব্যবহারের জিনিস দিয়াছিলেন,

বিভা গোপনে সেইগুলি ব্যবহার করিত। একবার যতীশ বিভাকে দেশি মোটা ফিতায় চুল বাঁধিতে দেখিয়া, টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ও দোকান হইতে সিল্কের ফিতা আনাইয়া দিয়াছিল। বিভা সেইদিন হইতে ফিতা দিয়া চুল বাঁধা পরিত্যাগ করিল।

নির্জন মাঠের মাঝখানে, বাংলা বাড়ির প্রকাণ্ড ঘরে, কী জানি কেন, বিভার দিন আর কাটিত না। অথচ, কী যে তাহার অভাব, কী যে দুঃখ, তাহা সে বলিতে পারিত না। সতীশ স্থানীয় বাঙ্গালিদের সহিত কখনও মিশিত না। সেজন্য বিভারও প্রতিবেশিদিগের সহিত বিশেষ পরিচয় হয় নাই। সে রোজ সন্ধ্যার সময়, ফিটানে করিয়া যতীশের সঙ্গে হাওয়া খাইতে যাইত। আজ এখানে পার্টি কাল ওখানে পার্টি, পোষাক পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের অন্ত ছিল না। কিন্তু বিভার এসব ভালো লাগিত না। যতীশ যখন কাছারিতে চলিয়া যাইত সে আপনার শুইবার ঘরের জানালাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। সম্মুখে দিগন্ত বিলীন, তৃণহীন মাঠ পড়িয়া আছে। সেই জনশূন্য দ্বিপ্রহরে, মাঠের দিকে তাকাইয়া, বিভা তাহার আজন্ম পরিচিত স্নেহময় পিতৃগৃহের কথা মনে করিত। মায়ের অক্লান্ত সেবানিষ্ঠা তাহার মনে পড়িত। পিতার সেই পূজার ঘরটি সে নিজে স্বহস্তে মুছিয়া পরিষ্কার করিত। ঘরের দেওয়ালের সেই মাতৃভূমির ছবিখানির কথাও সে বার বার মনে করিত। সেই ছবির নীচে দাঁড়াইয়া, এক পুণ্য প্রভাতে সে সজল নয়নে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে জননীর দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু কোথায় আজ সে প্রতিজ্ঞা, প্রবল সভ্যতার স্রোতে তাহার স্বামী ভাসিয়া চলিয়াছে, কে তাহাকে জননীর দুঃখের কথা বলিয়া তাহার কাজে টানিয়া আনিবে? হায়, বিভার যদি সেইটুকু সাধ্য থাকিত!

পূজার সময় আসিয়াছে—বিভার মা প্রবাসী কন্যার জন্য পূজার কাপড় ও অন্যান্য উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় বিভা তাহার মাতৃদত্ত নূতন কাপড়খানি পরিয়াছিল। যতীশ গাড়িতে উঠিয়াই বিভাকে বলিল, "এ কী কাপড় পরেছ? সিল্কের কাপড় পর নাই কেন? আবার কী একটা ছাই এসেন্স মেখেছ, দেখি?" বিভা কম্পিতকণ্ঠে বলিল "মা আমার জন্য এই কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছেন, কাপড়ের সঙ্গে এক শিশি দেলখোস দিয়াছিলেন, তাহাই একটু রুমালে মাখিয়াছি।" যতীশ বলিল "এ সমস্ত জঘন্য জিনিসগুলি তুমি কেন ব্যবহার করো, আমি বিলাতি ছাড়া অন্য কোনো এসেন্স ছুঁই না" বিভাগ একবার তর্কের ছলে বলিল "আমার কিন্তু বিলাতি এসেন্সের গন্ধ ভালো লাগে না।" কিন্তু যতীশের সঙ্গে তর্ক করা সহজ নয়, সে চুপ করিয়া গেল।

আবার ৩০ আশ্বিন ফিরিয়া আসিল। বিভা নিরাশহৃদয়ে ভাবলি, আজিকার দিনটা বৃথাই যাইবে, যতীশ এসব নিশ্চয়ই nonsence বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সকাল হইতে বিভা দেখিল এখানেও দলে দলে ছেলে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। কতকগুলি বালক বিভার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিল, যতীশ তখন চা খাইয়া বাহিরে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে হইতে সকলের চেয়ে ছোটো একটি বালক বাড়িতে ঢুকিয়া, বিভাকে প্রণাম করিয়া বলিল "মা, আজ ৩০ আশ্বিন, আজ আমাদের মায়ের অনুরোধ, আপনারা অনুগ্রহ করে আজ চুল্লি জ্বালাইবেন না, আজ বাঙ্গালি মাত্রেই ফলাহার করিয়া থাকিবেন।" বিভার দুই চোখে জল আসিল, কী করিয়া ইহাদের জানাইবে, সেও ইহাদের মতোই স্বদেশি, এখানে সে বিদেশির মতো আছে বটে, কিন্তু তার বাপের বাড়িতে সে কত স্বদেশির অনুরক্ত ছিল। কিন্তু না বলিয়া পাঁচটি টাকা লইয়া বিভা সেই বালকের হাতে দিয়ে বলিল "তোমাদের এখানকার স্বদেশি সমিতিতে এই টাকা দিলাম কিন্তু আমার নাম তোমরা কাহাকেও জানাইও না, এই অনুরোধ।" সম্মত হইয়া বালকেরা ফিরিয়া গেল। বালকদের নিকট হইতে কিছু রাখি চাহিয়া বিভা কলিকাতায় দাদাদের পাঠাইয়া দিল। নিরানন্দ গৃহে ৩০ আশ্বিনের পুণ্য দিন, আসিল, চলিয়া গেল।

রাত্রে সেদিন বাতাস বন্ধ হইয়া বড়ো গরম পড়িয়াছিল। তাহার উপরে পাখাটানা কুলিটা

ক্রমাগত ঢুলিতেছে। নিদ্রার ব্যাঘাতে বার বার কুলিটাকে ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেছে। অবশেষে এক সময়ে থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া গিয়া প্রহারের চোটে কুলিটাকে বারান্দার উপর হইতে নীচে উঠানে ফেলিয়া দিল। পাথর দিয়া কপাল কাটিয়া যাওয়াতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আপনার মলিন বসনে রক্ত মুছিয়া লইয়া, নিরীহ কুলি আবার আসিয়া পাখা টানিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রহার বিভার আপনার অঙ্গে যেন বাজিল। বিনিদ্র নয়নে, নিস্তব্ধ হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অবশেষে যখন দেখিল যতীশ বেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে নিঃশব্দে উঠিয়া জানালার কাছে বসিল। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ, ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত হইয়াছে। দূরে দূরে দুই একটি গাছ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নৈশ বায়ু পাতার ভিতর দিয়া সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিকটবর্তী একটি বাড়িতে ছেলেরা গান করিতেছিল। বিভা শুনিতে পাইল বালকের কণ্ঠে কে গাহিতেছে।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে
কে বৃথা আশা ভরে, চাহিছ মুখ' পরে।
সে যে আমার জননীরে!

বিভার দুই চক্ষু দিয়া রুদ্ধ অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন ওই জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠের মাঝখান দিয়া অপমানিতা, পরিত্যক্তা, জননী একাকিনী সন্তানদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন! যেন মনে হইল নৈশ বায়ু তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ, শুভ্র অঞ্চলপ্রাপ্ত উড়াইয়া দিতেছে! হায়, জননী যাইও না। অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করিয়া একবার ফিরিয়া এস!

সেইদিন হইতে বিভার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। পিতা তাহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। এক বৎসর পরে বিভা বাড়ি আসিয়াছে, কিন্তু সে বিভা আর নাই। মা তাহাকে বলিলেন "বিভা, তুই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস।" বিভা বলিল "কী জানি মা, সিরাজপুরের জল-হাওয়া বোধহয় আমার সহ্য হল না।" বাড়ি আসিবার আনন্দে বিভা দুদিন স্ফূর্তিতে বেড়াইল, কিন্তু ক্রমে সে শয্যা লইল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন রোগ আরোগ্য হইবার নহে।

রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া বিভা কত কী যে ভাবিত তাহার শেষ নাই। দাদারা এক-এক দিন আসিয়া তাহাকে এক-একটি খবর দিয়া যাইত। কোনোদিন আসিয়া বলিত, অমুকের বিনা দোষে জেল হইল। কোনোদিন বলিত, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, কত লোক যে না খাইয়া মরিতেছে, তাহার হিসাব নাই। শুনিয়া বিভা শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। স্বদেশের দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় গলিয়া যাইত।

একদিন বিভা দেখিল, তাহার দাদারা তাড়াতাড়ি জল খাইয়া কোথায় যাইতেছে—উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" তাহারা উত্তর করিল "কী হয়েছে শুনিস্নি? কাল সন্ধ্যায় গোলদিঘিতে পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের ভয়ানক মারামারি হয়ে গেছে। একটা বুড়ি সেই ভিড়ের মাঝখান দিয়া যাইতেছিল, পুলিশের অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, কাছে দুটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বুড়িকে বাঁচাইতে যায়। তাতে তাদের সঙ্গে সাহেবের মারামারি হয়। ছেলে দুটিকে হাজতে লইয়া গিয়াছে—আজ তাদের বিচার হবে।" দুই তিন দিন যাতায়াত করিয়া একদিন ম্লান মুখে তাহার দাদারা ফিরিয়া আসিল। বিভা বিজ্ঞাসা করিল, "কী দাদা, কী হইল?" তাহারা বলিল, "তাদের দু'জনেরই জেল হয়েছে, ১০০্ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে, তা না দিলে এক মাস করে জেল।" বিভা জিজ্ঞাসা করিল "দাদা তারা কী ১০০ টাকা জোগাড় করতে পারবে না?" তাহারা বলিল "সম্ভব নয়, তাদের দুজনের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ।" বিভার মেজদাদা বলিল "বাবাকে বলিলে তিনি এখনই তার যা আছে সব দিয়ে দিবেন, কিন্তু

তারপরে তিনি বড়ো কষ্টে পড়িবেন, সেইজন্য তাঁকে বলি নাই। তিনি ত কখনও ধার করিবেন না।" দাদারা আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিভা তাহাদের ডাকিল, বলিল "দাদা, শোন, আমার একটি মুক্তার নেক্‌লেস্ আছে তার দাম প্রায় ২৫০্ টাকা। সেই নেক্‌লেস্‌টি বিক্রয় করে তুমি এদের খালাস করে আন।" বোনের কথা শুনিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল—কিন্তু তাহারা বলিল "না, বিভা, যতীশবাবু টের পাইলে তুই মুস্কিলে পড়বি।" বিভা বলিল, "না, না, তিনি জানিবেন না।" সজল নয়নে, রুগ্ন বিভা এত অনুরোধ করিতে লাগিল যে শুধু তাহাকে সুখী করিবার জন্যই দাদারা নেক্‌লেস্‌টি লইতে রাজি হইল।

অনেকদিন পরে সে রাত্রে বিভা ঘুমাইয়াছিল। কিন্তু তার পরদিন হইতে তাহার জীবনের আর কোনো আশাই রহিল না। কাশিতে কাশিতে একবার কতকটা রক্ত উঠিল, তাহাতেই নাড়ি বসিয়া গেল। পিতা মাতা, ভায়েরা বিভার সেই শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। কী একটি অপার্থিব শান্তি তাহার মুখের উপরে বিরাজ করিতেছিল।

একবার তাহার মা শুনিতে পাইলেন অস্ফুটস্বরে সে কী বলিতেছে, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শুনিলেন ক্ষীণস্বরে বলিতেছে, "আহা, আর মের' না, মরে যাবে।" আর একবার ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলিল,—

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনি এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।"

সেইদিনই বিভার আত্মা, এই ভগ্ন-শরীর-পিঞ্জর ছাড়িয়া দিব্যধামে উড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি ছেলে গান করিতে করিতে বিভাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জেল-মুক্ত ছেলে দুটি বিভাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছিল। বিভার দাদা তাহাদের বিভাকে দেখিবার জন্য উপরে ডাকিয়া আনিল। অসীম শান্তির কোলে বিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাতৃরূপের অনন্ত অমর সৌন্দর্য তাহার সেই মৃতমুখও অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। স্তম্ভিত হৃদয়ে, ভক্তিপূর্ণ নয়নে তাহারা দেখিতে লাগিল; একবারও তাহাদের মনে হইল না যে তাহারা মৃতের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মনে হইল যেন এই দেবীমূর্তি বিধাতার হস্ত হইতে এখনই রচিত হইয়া আসিল, স্বর্গের নিঃশ্বাস পাইলে এখনই বুঝি জাগিয়া উঠিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বিভার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

মা গো যায় যেন জীবন চলে
জগত মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।

যতীশচন্দ্র খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ছুটির অভাবে তিনি বিভাকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। মনের শূন্যতা দূর করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি বিলাত ফেরতের কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলেন।

নীলাম

হিরন্ময়ী দেবী

॥ ১ ॥

অতুল হরিবাবুর স্ত্রীর দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিপুত্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালককে হরিবাবুর স্ত্রী আপনাদের বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল করুণাই যে তাঁহার এই আশ্রয় দানের কারণ তাহা নহে। আরও একটি কারণ ছিল। হরিবাবু কলিকাতায় ৫০্ টাকা মাহিনায় কর্ম করিতেন। গৃহিণী একমাত্র শিশুকন্যাকে লইয়া হরিবাবুর পৈতৃক স্থান বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন। হরিবাবু বাসা খরচ বাবদ বাটীতে যে টাকা পাঠাইতেন তাহাতে সংসার বেশ একরকম সচ্ছলে চলিত। তবে গৃহে পুরুষ না থাকায় অনেক ছোটোখাটো কাজে কর্মে অসুবিধা হইত। তাই কতকটা করুণা কতকটা সুবিধার জন্য হরিবাবুর স্ত্রী অতুলকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন। অতুল গৃহিণীর আবশ্যাক মতো কাজকর্ম করিয়া দেয়। গৃহিণীও অতুলের আহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু আহারাদি ভিন্নও যে দশম বর্ষীয় বালকের আরও কিছু প্রয়োজন সেটা তাঁহার মনে আসিত না। গৃহিণী যখন সুকুমারীকে বুকে লইয়া ছাইপাঁশ অর্থহীন কথায় আদর করিতে, সুকু যখন মাতার গলা জড়াইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া তাহা হাসিমুখে শুনিতে শুনিতে তদনুরূপ উত্তর দিত, তখন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃত জননীর কথা মনে করিয়া বালকের চক্ষু যে জলে ভরিয়া যাইত, সেইরূপ মাতৃ-স্নেহের অভাব অনুভব করিয়া সে যে আড়ালে গিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত বাল্যহৃদয় দমন করিত তাহা তিনি দেখিতেন না।

কোনো কোনো দিন বালিকা সুকু খেলিবার জন্য অতুলকে খুঁজিতে গিয়া দেখিত অতুল কাঁদিতেছে, বালিকা তখন সন্দেশের আধখানা দিয়া কী নূতন পুতুলের ভাগিদার করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটি দিয়া চক্ষু মুছাইয়া বলিত দাদা কাঁদিস নে। অতুল সুকুকে কোলে লইয়া পাখির বাসা পাড়িয়া দিতে যাইতেন।

॥ ২ ॥

অতুল অনেক কষ্টে এন্ট্রেন্স পাশ করিয়া ২০্ জলপানি পাইয়া এবার কলিকাতায় পড়িতে যাইতেছেন। হর্ষবিষাদে অতুলের হৃদয় আচ্ছন্ন। হরিবাবুর উপর আর নির্ভর করিবার আবশ্যাক নাই তাই অতুল সুখী। কিন্তু সুকুকে ছাড়িয়া যাইবেন কীরূপে? সুকুর সন্দেশ বা পুতুলের পরিবর্তে দরিদ্র অতুলের হৃদয় ভিন্ন আর দিবার কী ছিল? কিন্তু হরিবাবু তো আর তাহার হৃদয়ের পরিবর্তে তাহাকে কন্যা দান করিবেন না। যদি ঈশ্বর দিন দেন তখন্ যাহা হয় হইবে। এখন নিরাশ প্রেম হৃদয়ে ঢাকিয়া সুপ্ত বালিকার মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া অতুল প্রাতঃকালের গাড়িতে কলিকাতা

যাত্রা করিলেন। দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় অতুল এল. এ পাশ হইয়া জলপানি পাইয়া ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহার মনের নির্বাপিত প্রায় আশাদীপ একটু জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন সময় হরিবাবুর পত্র পাইলেন যে জমিদার পুত্র নবকান্তর সহিত সুকুমারীর আগামী মাসে বিবাহ। বৈবাহিকেরা ধনবান সুতরাং ধনীর কন্যা তাঁহারা চাহেন না; সুন্দরী বধূ চাহেন। সুকুমারীর ন্যায় সুন্দরী গ্রামে আর কেহ নাই।

অতুলের আশা যদিও বড়ো বেশি ছিল না তবুও এ কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। নিজের জন্য শুধু নহে সুকুমারীর জন্য আরও। নবকান্তও কলিকাতায় অতুলের সহিত এক স্কুলে পড়িতেন। অতুল তাহার স্বভাব জানিতেন। তাঁহার স্বভাব নানা প্রকারে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুকুমারী তাহার হইবে না তিনি জানিতেন কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্ণপ্রতিমা কী ধূলিসাৎ হইবে। হরিবাবু যে জানিয়া শুনিয়া কন্যাকে এরূপ পাত্রে সমর্পণ করিবেন তাহা অতুলের বিশ্বাস হইল না। অতুল নিজে যাইয়া হরিবাবুকে এ বিষয়ে বলিবেন স্থির করিয়া সেইদিনই বৈদ্যবাটী গমন করিলেন। হরিবাবু ও গৃহিণী অতুলের কথা শুনিলেন শুনিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন বাবা! আপনার কপালে সুখ, বয়স ধর্মে অমন হয়; বিয়ে হলেই জামাই শুধরবে। অমন ঘর কী ছাড়া যায়!"

অতুলের কথার ফল হইল না। মহা আড়ম্বরে সুকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

॥ ৩ ॥

অতুলের ডাক্তারিতে এখন বেশ পসার হইয়াছে। অতুল কলিকাতার একজন গণ্যমান্য ধনী লোক। তবে অতুল এখনও অবিবাহিত। মাসে দুই এক বার যখন অতুল বৈদ্যবাটীতে হরিবাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে যান গৃহিণী তখন তাহাকে বিবাহের জন্য চাপিয়া ধরেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করাইতে পারেন না। গৃহিণী যে কথার কথা মাত্র তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করেন তাহা নহে, অতুল যথার্থই এখন তাঁহার পুত্রস্থানীয়। কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন আশা করিয়াছিলেন; সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ধনীর বধূ দরিদ্র পিতামাতাদের সহিত বড়ো সম্বন্ধ নাই। তবু মেয়ে সুখে থাকে তো তাহাতেই সুখ। কিন্তু বড়ো মানুষের ঘরের কথা লুকান থাকে না, —গৃহিণী দাসীর মুখে খবর শুনিতেন জামাতা মেয়েকে অনাদর করে, মদ খাইয়া অপমান করে, ইহাতে গৃহিণীর চক্ষের জলে দিন কাটিয়া যাইত! কিছুদিন পরে হরিবাবুর মৃত্যু হইল। গৃহিণীর আর আপনার কেহ রহিল না। কিন্তু আপনার কেহ থাকিলেও অতুল অপেক্ষা যে গৃহিণীকে বেশি যত্ন করিতে পারিত তাহা বোধহয় না। এই যত্নের ফলে যে স্নেহ একদিন অতুল চাহিয়া পাই নাই তাহা পাইল। গৃহিণী তাহাকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইলেন। মাঝে মাঝে মনে করিতেন যদি সুকুর সহিত অতুলের বিবাহ দিতাম তবে কী ভালোই হইত! কিন্তু সেরূপ ভাবিয়া এখন আর ফল নাই, মনের আগুন মনেই নির্বাণ করিতেন। অতুলের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ লইয়া ঘর সংসার করিতে পারিলেই এখন তিনি সন্তুষ্ট হন। অন্য বিষয়ে কোনো কথা তাঁহার অতুলকে দুবার বলিতে হয় না—কিন্তু এবিষয়ে অতুল বড়ো একগুঁয়ে, কিছুতেই তাঁহার কথা শুনেন না।

অতুল এবার গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন গৃহে সুকুমারী তাহার পুত্র ও দুইটি কন্যা রহিয়াছে। বিবাহের পর সুকুর সহিত তাঁহার এই প্রথম দেখা; অতুল চমকিয়া উঠিলেন। সুকু বিবাহের পর এই প্রথম পিতৃগৃহে আসিয়াছে আর কোথাও স্থান নাই। তাই স্বামী এখানে পাঠাইয়াছেন।

নবকান্ত যথেচ্ছাচার খরচে অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন; তাহার পর কিছুদিন পূর্বে এক জমিদারের সহিত খুনের মকর্দমায় অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে এমন কী বিষয় বন্ধক দিয়া ঋণ করিয়া

মকর্দমা চালাইতে হইয়াছে। এখন খুনের অভিযোগ হইতে যদিও নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু মকর্দমা খরচে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, এমন টাকা নাই যে সুদ দিয়া পর্যন্ত এখন পাওনাদারকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, পাওনাদার মকর্দমা করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া লইতেছে। সপ্তাহ পরে বিষয় নীলাম হইবে, কিছু পূর্ব হইতেই সর্বস্বান্ত গৃহহীন নবকান্ত স্ত্রীপুত্র শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছেন।

গৃহিণী অতুলকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—বলিলেন "বাবা রক্ষা করো তুই, আর আমাদের কে আছে? আমার যেমন কপাল—নইলে কেন এমন হবে। এমন জামাইও করেছিলুম! তখন তুই বলেছিলি ওখানে বিয়ে দিও না, তো কর্তা ত তোর কথা শুনলেন না! আহা যদি তোর সঙ্গে বিয়ে দিতুম!"

সুকু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না। স্বামী সহস্র দোষ করুন স্বামীর নিন্দা অসহ্য। তবু যেন মা যা বলেন সহিতে হয় কিন্তু অতুল যে বিবাহের পূর্বে স্বামীর নিন্দা করিয়াছিল, মা যে অতুলের সহিত বিবাহ হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন—এতদূর সহিল না;—তবে ইহাতে মায়ের উপর যত না রাগ হউক অতুলের উপরই বেশি রাগ হইল। আর সুকু কী এমনি হতভাগিনী ভিখারিনী যে স্বামী-নিন্দুকের সাহায্য লইবে? সুকু বলিল "মা চুপ করো—অত গোল করা কেন? বাপের বাড়ি এসেছি বলে কী আমরা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি—আমাদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না—সে যার ভাবনা তিনি ঠিক করবেন।"

অতুল সুকুর হৃদয় ভাব বুঝিলেন; বুঝিলেন,—অতুলের নিকট সাহায্য লইতে যদিবা সুকুমারী কিছু মনে না করিতে কিন্তু গৃহিণীর ও কথার পর আর লইবে না। একটু পরে ব্যথিত হৃদয়ে অতুল সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যা হইয়াছে। এখনও ঘরে দীপ জ্বলে নাই। যে গৃহ প্রতিদিন শত দীপে আলোকিত, শতকণ্ঠ-কলরবে পূর্ণ হইত আজ তাহা অন্ধকাব নীরব নির্জন। কেবল একজন লোক এই গভীর নির্জন প্রাসাদের প্রেতাত্মার মতো একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরের অন্ধকার বেশি কী তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বেশি তাহা তাঁহার মুখ হইতে বুঝিতে পারা কঠিন। পিতৃ পিতামহের চিরন্তন আবাস তাঁহার দোষে কাল পরহস্তগত হইবে, স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে. সেই জন্য কী নবকান্তের হৃদয়ে অনুতাপের অন্ধকার, মুখে যাতনার ছায়া? কিম্বা এখনও নবকান্ত নিজের দোষ বুঝেন নাই। যাহারা তাঁহার ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার হৃদয়ে বিজাতীয় বৈরীভাব জ্বলিয়া উঠিতেছে?

হঠাৎ পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—কী বিপদ—এক দণ্ড কী সুস্থির থাকিতে পারিবেন না—শ্যাম তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল! আজ বিপদের দিনে নবকান্তকে সকলে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কেবল বৃদ্ধ শ্যাম অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। সে নবকান্তকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। যদি প্রাণ দিয়াও সে নবকান্তের পূর্ব সৌভাগ্য ফিরাইতে পারিত তবে অকাতরে তাহা করিত। তাহা পারে না, তাই মলিন ছায়াটির মতো নবকান্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। কিন্তু এ স্নেহের মূল্য নবকান্তের কাছে নাই। যদি অশ্রু মুক্তা হইত বা টাকা হইত তবে নবকান্ত তাহার মর্যাদা বুঝিতেন। ইহাতে তিনি কেবল বিরক্ত হন মাত্র। এই একটু আগে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন আবার বুঝি আসিতেছে! নবকান্ত ক্রোধভরে চাহিয়া দেখিলেন শ্যাম নহে, অতুল দাঁড়াইয়া আছেন। এ পরিবর্তনে নবকান্তের ক্রোধের যে সমতা হইল তাহা নহে বরং বাড়িয়া উঠিল। সেই ছেলেবেলাকার অতুল—যে তাঁহার শ্বশুরান্নে পালিত, সেই দরিদ্র অতুল আজ ধনবান আর তিনি আজ নিঃস্ব। দোষটা যেন অতুলেরই। কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। একটু পরে

শ্যাম বাতিহাতে আসিয়া বলিল—"একবার ঘরে আসতে আজ্ঞা হোক, আমি সমস্ত ঠিক করে রেখে এসেছি।" নবকান্ত রাগিয়া বলিলেন—"দেখ, ফের যদি বিরক্ত করবি তাহলে তোকে চাবিবন্ধ করে রাখব।" শ্যাম বলিল—"আরে পিত্তি পড়ে গেল যে, সেই দুটো কখন মুখে পড়েছে না পড়েছে! ভগবান, তোমার মনে এই ছিল!" নবকান্ত বলিলেন—"তুই এখন যাবি কী না যাবি? যদি অমন করে বকবি তাহলে আমি আজ খাব না! যা বলছি।" শ্যাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"তা আমি যাচ্ছি, আপনি একটু পরে আসুন।"

শ্যাম চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অতুল বলিলেন—"বড়ো অন্ধকার, বাতিটা এখানে রাখিয়া যাও ত হে।" শ্যাম তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল—"অতুল বাবু! আজ সব অন্ধকার, মশায়, সব অন্ধকার—" নবকান্তের তাড়া খাইয়া শ্যামের আবার কথা বন্ধ করিতে হইল। অতুল তাহার হাত হইতে বাতি লইলেন, সে বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেল। ভৃত্য চলিয়া যাইবার একটু পরে নবকান্ত রূঢ় স্বরে বলিলেন—"কোনো দরকার আছে? বিষয়টা কীরূপ বোধ করি খবর লইতে আসিয়াছ? কাল কিনিতে চাও বুঝি?" অতুল কোনো উত্তর করিলেন না, পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া নীরবে তাঁহার হাতে দিলেন। প্রথমে একটু ইতস্তত করিয়া নবকান্ত তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িয়া বিস্মিত হইলেন, যাহা পড়িলেন বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন আসল অভিপ্রায়টা কী বল দেখি?

অভিপ্রায় যে কাগজে অস্পষ্টভাবে লেখা ছিল এমন নহে, তবে নবকান্ত তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সেই নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ের মধ্যে স্বার্থপূর্ণ লুক্কায়িত গূঢ় উদ্দেশ্য সন্দেহ করিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অবশ্য ইহাতে নবকান্তের দোষ দেওয়া যায় না। তাহার অভিজ্ঞতায় সংসারের প্রকৃতিই এই। ইহার পর দুই জনে কথোপকথন চলিতে লাগিল; একটু পরে অতুল চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে অতুল বলিলেন,—"কিন্তু আমার অনুরোধটি মনে রাখিবেন—একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না"। নবকান্ত যে সব সময় সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতেন তাহা নহে, তবে অতুলের এ অনুরোধটি চিরকালই রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরদিন চৌধুরীদের বিষয় নীলাম হইবে, অনেক লোক জমা হইয়াছে—এমন সময় খবর আসিল, নীলাম বন্ধ। চৌধুরী মহাশয় ঋণ শোধ করিয়াছেন।

মনের অগোচরে

হিরন্ময়ী বসু

"অনেক দিন পর দেখা হল, তাই না?" শিপ্রা নিজেকে সহজ করতে চাইল।

অমিয় খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল শিপ্রাকে। একটু থমকে, একটু হেসে বলল, "অনেক দিন নয় অনেক বছর পর।"

"কোথায় চলেছ এত লাগেজ নিয়ে?"

অমিয় হাসল, বলল, "তুমি কোথায় চলেছ?"

"বারে, আমি তো আগে জানতে চাইলাম।"

"আরও আগে তোমার জানতে চাওয়া উচিত ছিল শিপ্রা।"

ভ্রূ কুঁচকে বলল, "একী? আমার নাম ধরে ডাকছ কেন? তুমি তো এর আগে চিরদিনই শিপুদি বলতে আমাকে।"

অমিয় বেশ জোরেই হেসে বলল, "হ্যাঁ তা প্রায় বছর বারো আগে। তখন আমার বয়েস ছিল বাইশ আর তোমার বছর ছাব্বিশ কী সাতাশ। তাই না? তখন আমি ছিলাম তোমার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু। সবে কলেজের পড়া শেষ করেছি আর তুমি ছিলে কোনো স্কুলের নামকরা দিদিমণি।"

"তাতে কী হল?"

"না তাই বলছি, দিদিমণি হিসাবে তোমাকে দিদি ডাকতুম না কিন্তু তোমার ভাই প্রদীপের খাতিরে ডাকতুম। কিন্তু এখন আমি সো এণ্ড সো কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার। পদ-মর্যাদায় আর বয়েসের মর্যাদায় অনেকটা এগিয়ে গেছি, ফরেন ঘুরে এসেছি বার দুই। কাজেই কোনো সংকোচের বালাই আজ আমার নেই। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কী পাল্টায় না? দিদি বলব তুমি আশা করলে কী করে?"

শিপ্রায় চোখের দৃষ্টি পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে ম্লান দেখালো। বিষণ্ণ উদাস সে দৃষ্টি।

প্রথম শ্রেণির সরু টানা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল দুজনে। অনেক মানুষের ভিড়, অনেকের আনাগোনা। যেন একটা মিছিলের শেষ প্রান্তে ক্লান্ত দুই কমরেড পতাকা নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করছে।

শিপ্রা অসহিষ্ণু গলায় বললে, "না এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। তুমি আমার কামরায় এসো পরে। গল্প করা যাবে।"

আমিয় আবার উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল "গল্প? দিদিমণি আপনি বুঝি এখনও আঙ্গুর ফল টক গল্পটা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন? না ছাত্রীদের এখন পিটারের ক্রাইষ্টকে তিনবার অস্বীকারের তাৎপর্য বোঝাচ্ছেন?"

"কী ফাজলামি হচ্ছে অমি? যাও তোমার কামরায় ঢুকে পড়, সকালে কথা হবে।"

বম্বে মেল অনেকখানি এগিয়ে গেল। রাতের গাড়ি, ডিনার প্রায় সকলে সেরেই আসে, তাড়াতাড়ি যে যার কামরায় ছিটকিনি ফেলে শুয়ে পড়ে।

শিপ্রায় লোয়ার বার্থ। পাশের বার্থে একজন মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। ছেলেদের দেখতে যাচ্ছেন বম্বের নেভাল হোস্টেলে। উপরের একটা বাঙ্ক খালি। তার উপরটিতে একজন গুজরাটি অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মহিলা।

কামরার চারপাশে চেয়ে দেখে খুব আরাম পেল শিপ্রা। আর যাই হোক বেশি কথা বলতে হবে না। নিরিবিলি নিজের মনে থাকতে পারবে।

অনেকগুলো মাসিক পত্রিকা উপন্যাস আর প্রবন্ধের বই ছিল সঙ্গে। তারই একটা খুলে বালিশে ঠেসান দিয়ে শুয়ে পড়ল শিপ্রা।

"মনের অগোচরে পাপ নেই" বইটা চমৎকার লিখেছেন ভদ্রলোক। অনেকটা প্রবন্ধের মতো কিন্তু যুক্তিগুলো যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি রসালো।

বইয়ের পৃষ্ঠায় আর এক উপন্যাস কী পড়তে শুরু করল শিপ্রা? সেই জীর্ণ বারো বছর আগের সুন্দরী তন্বী শিপ্রা আর বলিষ্ঠ ঋজু অথচ লাজুক সেই ছেলেটা? কী যেন নাম তার? ছোটো ভাই প্রদীপ আলাপ করিয়ে দিল, আমার বন্ধু অমিয় সেন।

সেবার পুরীর সাগর-সৈকতে সেই পরিচয় বড়ো নিবিড়, বড়ো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। শিপ্রা বাড়ির বড়ো মেয়ে, তারপরে আরও দুটি বোন আর ভাই মাত্র একটি। সেই ভাইয়ের বন্ধু, কাজেই তার আব্দারও বড়ো কম সইতে হল না। কিন্তু মুস্কিল একটা বেধেছিল বইকী!

শিপ্রাকে রূপসী বলা চলে না হয়ত। কিন্তু চেহারা রং অঙ্গসৌষ্ঠব সব মিলিয়ে সে সুন্দরী। আর সব মেয়েদের ওটা থাকে কিনা জানা নেই শিপ্রায়, কিন্তু তার ছিল, তার দিকে ছেলেদের আকর্ষণ সব সময় সে অনুভব করত। ছোটো বড়ো মাঝারি আধা বুড়ো সব শ্রেণির পুরুষই যেন শিপ্রাকে দেখলে একটু চঞ্চল হয়ে উঠত।

শিপ্রা যখন পুরীতে তখন তার বয়েস অনুপাতে তাকে অনেক ছোটো দেখাত আর অমিয়কে তার বয়স অনুপাতে অনেক বড়ো দেখাত—মানে দুজনকে পাশাপাশি সত্যিই সুন্দর মানাতো। কিন্তু ছোটো ভাইয়ের বন্ধু, তার উপর শিক্ষয়িত্রী সুলভ মনোভাব আর বোনেদের বড়ো, মা বাবার মুখ-চাওয়া মেয়ে সংসারের দায়িত্বও ছিল প্রচুর। সব মিলিয়ে শিপ্রা নিজের মনে কোনো ছবি আঁকতে ভরসা পায়নি। কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নেই। তাই আজ এই কামরায় একাকী বাঙ্কে শুয়ে ওর মনে হচ্ছে হয়ত বা মনের অগোচরে ওর অন্তর্লোকে কোনো একটা সুখের আদল ধরা পড়েছিল। হয়ত কোনো একজনের সঙ্গিনী হবার বাসনা সুপ্তির ভেতর, সৌন্দর্যলোকের আস্বাদ পেতে চেয়েছিল কিন্তু সঠিক জানা ছিল না।

প্রতিদিন সমুদ্র-স্নান যেন বাতিক হয়ে দাঁড়াল। আর সুইমিং কস্টিউম পরে যে ছেলেটি সবার আগে হাত বাড়িয়ে শিপ্রাকে বলত "শিপুদি তুমি আমার হাত ধরো, আমি আগে তোমাকে ঢেউ খাইয়ে আনি, তারপর সাঁতার কাটব।"

চিকচিকে ভিজে বালিতে পায়ের দাগ ফেলে দুজনে এগিয়ে যেত। ছোটো ছোটো ঢেউগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হোত. তারপরে বড়ো ঢেউ সামনে এলেই অমিয় বলত, "শিপুদি বসে পড়। না হলে লাফ দাও।"

শিপ্রা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ত, ওর মাথার ওপর দিয়ে ঢেউটা প্রবল বেগে ছুটে যেত, তারপর দ্যাখে জল বড়ো জোর হাঁটু পর্যন্ত। ওরা আরও এগুতো।

বেশ সাহস বেড়ে গেছিল শিপ্রার, তাই থার্ড ব্রেক পর্যন্ত অমিয়র হাত ধরে ঢেউ খেত। বেশির

ভাগ বসে পড়ত কিন্তু একদিন আর বসল না। ঢেউয়ের তালে তালে লাফিয়ে উঠল। অন্য দিনের মতো পায়ের তলায় বালি পেল না—জল গভীর, টাল সামলাতে পারল না। অমিয়র শক্ত মুঠিতে হাতটা ধরা ছিল তাই রক্ষা। প্রায় ঘুরপাক খেয়ে বেসামাল শাড়ি ব্লাউজ সমেত একেবারে অমিয়র বক্ষলগ্ন হয়ে পড়ল। সেই নোনা জলের অফুরন্ত সাদা ফেনার কোমল শয্যায় একটা বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ওকে বেঁধে ফেলেছিল অমিয়। তা নইলে সেদিন শিপ্রা ভেসেই যেত।

সেই আলিঙ্গন কী শুধু অসহায়কে বিপদের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা? শিপ্রার পরে মনে হয়েছিল সেটা ছিল অমিয় সেনের প্রতিশ্রুতির প্রথম পাঠ।

এত লজ্জা পেয়েছিল শিপ্রা যে তারপর যে কদিন ছিল আর সমুদ্রে স্নান করেনি, বোনেদেরও করতে দেয়নি। কিন্তু বোনেদের আনন্দে বাধ সাধল কেন? একথাও পরে মনে হয়েছিল পাছে ওরা অমিয়র উষ্ণ স্পর্শ পায়,—পাছে ওদের মনেও অমিয় একটা প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে প্লাবন ঘটায়। না, শিপ্রা চায়নি—আর কেউ অমিয়র অত ঘনিষ্ঠ হোক। অথচ নিছক একটা সাধারণ ঘটনা ছাড়া ওটা আর কিছুই ছিল না। শিপ্রা বহুবার নিজের চোখেই দেখেছে কত মেয়ে বউ ঢেউ খেতে গিয়ে নুলিয়াদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। সেটা যদি আলিঙ্গন না হয়, সেটায় যদি দোষ না থাকে তাহলে স্নানার্থীর কাণ্ডারী হিসাবে অমিয়রও কোনো দোষ ছিল না—শিপ্রারও নয়।

তবু সূত্রপাত হল বুঝি সেই থেকেই। কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নেই, তাই শিপ্রাও বুঝতে চাইল না—আর অমিয় সেনও বোঝাবার চেষ্টা করল না।

কলকাতায় ফিরে আবার স্কুল, সংসারে ভাই বোনদের তদারক, সব ভারই বয়ে চলল শিপ্রা আর সেই সঙ্গে অমিয়কেও বাদ দিতে পারল না।

একবার বলল, "শিপুদি সবাই কেমন বোনা সোয়েটার পরে, তুমি প্রদীপকে বুনে দিলে—কিন্তু আমাকে এত পর ভাবো যে সেই সঙ্গে আমার জন্যে একটা বুনতে পারলে না।"

লজ্জা পেল শিপ্রা, সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ঠিক আছে, বুনে দেবো, কী রং তোমার পছন্দ? হাইনেক না কলার?"

অমিয় বলল, "যা খুশি তোমার। আমাকে যেটা মানাবে। কাল আমি পশমের টাকা দিয়ে দেব।" শিপ্রা ভ্রূ কুঁচকে বলল, "সোয়েটার চাইতে পারলে—আর পশমের দাম দেব বলতে মুখে আটকাল না?"

লাজুক ছেলেটা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "না অনেক দামি জিনিস তুমি দিতে পার—সোয়েটার নিয়ে কী করব? ও আমার চাই না।"

শিপ্রাও নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে রইল, "কী চাই তাহলে বল, আমি তাই দেবো, কিন্তু না বললে কী দামি জিনিস কিনব বল? গতবার তোমার জন্মদিনে পেন দিলাম—পছন্দ হল না—এবার তাহলে ক্যামেরা দেব।"

"গুড গড" হেসে ফেলল অমিয়। "না, না না, ওসব কিছুই তোমায় দিতে লাগবে না শিপুদি, যদি কোনোদিন সবচেয়ে দামি জিনিসটা দিতে পার সেদিন দিও।"

অনেক দিন পর সোয়েটার বুনে দেওয়ার পর শিপ্রা চিন্তা করেছিল দামি জিনিসটা কী হতে পারে? অমিয়র মতন বাচ্চা ছেলেকে কী দামি জিনিস দেওয়া যায়? পয়সার তো অভাব নেই ওদের। মায়ের এক ছেলে, বিধবা মা বিরাট ধনী, ছেলের মুখের কথা পড়ার আগেই প্রয়োজন মিটে যায়। তাহলে?

আজ আর নিজের কাছে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই শিপ্রার।

অমিয় হয়ত শিপ্রার কাছে একটু অন্তরঙ্গতা, একটু স্নেহমিশেল ভালোবাসা চায়। মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ভেতরকার দিদিমণি কড়া চোখে চেয়েছিল, নৈতিক অধঃপতন **কখনই সম্ভবপর** নয়। ছোটো ভাইয়ের বন্ধু—ছ' বছরের মতো ছোটো, তার স্পর্দ্ধা তো কম নয়।

সাবধান হয়ে গেছিল শিপ্রা কিন্তু মনের গভীরে ততদিনে অমিয় স্থান করে নিয়েছে, টের পায়নি শিপ্রা।

স্পোর্টস-এ খুব ভালো ছিল অমিয়—সাঁতরে আরও ভালো। একবার বাহাত্তর ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর নৌকায় ওকে তুলে নিলে—প্রথম ব্র্যাণ্ডি-মেশানো গরম দুধ শিপ্রার হাত থেকে খেয়েছিল অমিয়। ছেলেরা সব হৈহৈ করে উঠেছিল, "ওরে বড়দিকে ডাক, শিপুদিকে ডাক, ওনার হাতে নইলে খাবে না অমিয়।"

বড়দি নামটাই খারাপ। সব সময় সর্বত্র বড়দি আর বড়দি। শিপ্রা যে বড়ো সেটা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে কানে ঠোক্কর দিয়ে শোনানো হয়। বড়োদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, ইচ্ছা থাক বা নাই থাক—সবাই যাতে সমীহ করে তার একটা ভঙ্গী বজায় রাখতে হবে তার কর্তব্য? তার বালাই নিয়ে শিপ্রার জীবন আজ গোধূলির রক্তিমাভা হারিয়ে সূর্যাস্তের ম্লান ধূসরতায় রাত্রির তপস্যায় মগ্ন।

দিন চলছে, দিন চলবে—কিন্তু কৈ সামনে তো কোনো উজ্জ্বল দিনের আমন্ত্রণ নেই, কোনো উষ্ণ আশ্বাস নেই?

রুটিন বাঁধা কাজ, কাজের শেষে পরিশ্রান্ত দেহটাকে আর যেন সহ্য করতে পারে না শিপ্রা। সংসারে বড়দির সৌভাগ্য জর্জরিত। শ্রদ্ধা আর সমীহে বীতরাগ মনটা সংসারের দেনা পাওনার হিসাব আজও মিলাতে পারে না। যে সংসারকে নিঃশেষ করে দিয়েছে তার বিনিময়ে সে নিজে কী পেল?

বাবা গত হয়েছেন, গোটা সংসারের দায় অদায় সব হাসিমুখে বহন করেছে শিপ্রা। বোনেদের ভালো বরে ঘরে দিয়েছে, প্রদীপেরও বউ এনেছে।

সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা বধূ কিন্তু শিপ্রার সংসারে একাধিপত্যটা সুনজরে দেখেনি। শিক্ষিতাদের ভেতর উচ্চ রোলে বিবাদের স্থান কম কিন্তু অন্তর্ঘাতী বিষময় বাক্য দুটি একটি প্রয়োগেই কার্যসিদ্ধ হয়।

দু' একদিন দু' একটা ছোটোখাটো ব্যাপারে ছোটোখাটো ইঙ্গিতেই শিপ্রা বুঝল তার অনেক দিনের বড়োত্ব এবার ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে—যদি না সম থাকতে সরে পড়ে। বাড়ির মালিকানা-স্বত্ব প্রদীপের কিন্তু শিপ্রার কথা ভেবেই বোধহয় ওর বাবা একটা পাকা ব্যবস্থা করে গেছিলেন। যতদিন শিপ্রা অবিবাহিত থাকবে ততদিন বাড়িতে তাকে দুটি কামরা ব্যবহারের জন্য দিতে হবে।

নববধূর প্রথমেই নজর পড়ল—শিপ্রা আর ওর মার দক্ষিণের ঘর দুটোয় সামনে ছাদ, তাতে বড়ো যত্নে শিপ্রা টবের সাহায্যে ছাদ-বাগান করেছে। রকমারি ফুল। ডালিয়া, রজনীগন্ধা, বেল, লতানো যুঁই আর অজস্র গোলাপ।

নতুন বউ চম্পাকলি দু'এক মাস কাটাবার পরেই সোজাসুজি শিপ্রাকে বলল, "বাড়ির ভেতর সেরা ঘর আপনাদের আর আপনার ভাইয়ের ঘরটা এত চাপা। বাবা, আমার যেন দমবন্ধ হয়ে যায়। একটা ঘর এপাশে আমাদের থাকলে বেশ হত।"

শিপ্রা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি—গলার স্বরটা আটকে গেছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভাঙ্গা গলায় বলেছিল, "বেশ তো, তোমরা না হয় এ পাশেই চলে এসো, আমরা পূবের ঘরে যাবো।"

বউ তাতেও খুশি হয়নি, বলেছিল, কিন্তু বড়দি ওদিকের বড়ো ঘরটাই হলঘরের মতো ওটা আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা ড্রইংরুম করার। ওর বন্ধুরা আসে, আমারও আসে, তাই মাঝর লবিটা বড়ো ছোটো লাগে।

এবার শিপ্রার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। বড়ো ঘরটা চাওয়া মানে ইঙ্গিতে বলা শিপ্রা ও তার মায়ের একটা ঘরেই কুলিয়ে যাবে আর ওইটুকুনই তাদের প্রাপ্য।

প্রতিবাদ করতে ঘৃণা বোধ করেছিল শিপ্রা। এবার কাঁদেনি হেসে উঠেছিল, বলেছিল, "বাঃ, তোমার আইডিয়াটা খুবই চমৎকার চম্পা। তুমি মানে, তোমরা যেটা পছন্দ তাই করবে, আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই ভাই।"

চম্পাকলি মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেছিল—তারপর আমতা আমতা করে বলেছিল, "না মানে, আপনার ভাই বার বার বলে দিয়েছে এ সংসারে আপনিই বড়ো, আপনার বিনা অনুমতিতে কিছু করা চলবে না।"

তবু একটু শান্তি পেয়েছিল শিপ্রা, যাই হোক প্রদীপটা তাহলে এখনও একটু সমীহ করে, হয়ত তার বড়দিদির জন্য অন্তরে একটা কোমল স্থান আছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে শিপ্রা ম্লান হেসে বলেছিল, "ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না, আগামী ছুটির দিন ঘর বদল করে ফেলব।"

"কিন্তু মানে আপনার ভাই জানতে পারলে বকাবকি করবে।"

"না, না তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।"

চম্পাকলি হেরে গেল—পেয়ে উঠল না বড়দিন মনের জোরের সঙ্গে। আর বড়দি সব হারিয়েও নিজেকে বড়ো করার লোভে উঁচু করে দেখানোর মায়ার নিজের স্বত্ব আর আমার থেকে নিজেকে মুর্খের মতো বঞ্চিত করেছিল।

ঘর বদল হল। শিপ্রার মা হতবাক, কিন্তু মায়ের সাহস নেই মেয়ের মুখের ওপর কথা বলার। কোনোদিনই ছিল না কারণ আগাগোড়া তাঁর সুখ সুবিধা, কাপড় জামা হাত খরচা সবই শিপ্রা দিয়ে এসেছে। মাসে শাসন করেছে, আবার দুহাতে জড়িয়ে ধরে—শিশুর মতো চুমো খেয়ে ভুলিয়েছে। সেই মেয়ের ওপর স্বামীর অবর্তমানে একটি কথাও আর বলেন না মীরাদেবী। নিজের ঠাকুর দেবতা আর সংসার নিয়েই সময় কাটান।

ছেলের অফিসের ভাত আছে, বউয়ের রকমারি জলখাবার আর নিত্য তার বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনের মনোরঞ্জন আছে। ঠাকুরের আর ঝির খবরদারী করা আছে, নিজের হবিষ্যি ফুটোনো আছে। তাহলে আর সময় কোথায়?

তা সত্ত্বেও ঘর বদলের পর শিপ্রাকে বলেছিলেন, "হাঁরে শিপু, বউমা কী আমাদের এখানে আর থাকতে দিতে চায় না? কেন রে? আমি তো সব কাজই করি, ওদের কোনো কষ্ট নেই তো!"

শিপ্রা আর সামলাতে পারেনি। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বড়ো সখের বাগান ওর—বড়ো সাধের ঘর দুখানা। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে ঘরে সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে নিজেকে যার কোটরে নিরাপদে ছেড়ে রেখেছিল সেই ঘরের ওপর ওর মায়া কী কম ছিল? আজ ঘর গেল কাল এ বাড়ি থেকেও যেতে হবে।

এমনি এক অশান্ত মানসিক দুর্যোগের ভেতর হঠাৎ একদিন ঝড়ের মতো এসে হাজির হল অমিয়। ফরেনে চলে যাচ্ছে, তার আগে শিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে এল।

ঘর বদল দেখে সেও স্তম্ভিত। তারপর খুব একচোট হেসে বলল, "ভালোই হয়েছে, এই ঘরের মায়া কাটাতে না পারলে তোমার আর বাইরের দিকে নজর যাবে না শিপুদি। সব ফেলে রেখে চলো আমার সঙ্গে বিদেশ ঘুরে আসবে। পুরোনো সেন্টিমেন্টগুলো ঝেড়ে ফেলে নিজেকে এবার একটু স্বাধীনতা দাও, প্লিজ শিপুদি আর এই গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আটকে রেখো না।"

শিপ্রা শুধু বলেছিল, "এতদিন ভাইবোনদের দেখলাম, সংসার দেখলাম, এখন মা-কে কোথায় ফেলে দেবো অমিয়? মা যতদিন আছেন নিজের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে কোনো সাধ আহ্লাদই আমার পূর্ণ করার ইচ্ছা নেই।"

অমিয় উত্তরে বলেছিল, "ভালো কথা, দিদিমণির উপযুক্ত কথা, কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলতে এসেছি যখন বলেই যাবো। তুমি, তুমি কী আমার কথা একবারও চিন্তা করো

না? কোনোদিন করোনি? সত্যি বলো। তোমার আদর্শের দোহাই দিয়ে বলছি শিপুদি নিজের বিবেকে হাত রেখে বলো আমাকে তুমি তোমার ছোটো ভাই ছাড়া আর কিছুই কোনোদিন ভাবোনি?"

শিপ্রা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, "কি বলছ কী?"

অমিয় উত্তর দিয়েছিল, "যা সত্যি যা স্বাভাবিক যা ন্যায় আর সুন্দর, আমি সেই কথাই বলছি। আমার মা তোমাকে প্রথম দিন দেখে কী বলেছিলেন মনে আছে?"

হ্যাঁ, শিপ্রার মনে আছে, সর্বসময় মনে থাকে। তিনি বলেছিলেন, "আমার ভয় ছিল মা কাকে আবার বন্ধু করে বসেছে। যে পাগল ছেলে আমার—যেটি বলবে করা চাই। যাক আজ আমি শান্তি পেলাম স্বঘরে এমন মেয়ে যে সে পছন্দ করে রেখেছে ভাবতেও আমার আহ্লাদ হচ্ছে।"

শিপ্রা কটমট করে অমিয়র দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিল, "আপনি ভুল করছেন মাসিমা। আমি অমিয়র মেয়ে-বন্ধু নই, আমি ওর দিদি-বন্ধু, অমিয় আমার চেয়ে অনেক ছোটো। আমার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু।

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট প্রগতিশীলা। বয়সের তারতম্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কোমল আন্তরিক হাসি হেসে বলেছিলেন, "তোমাদের দুটিকে সুন্দর মানায় মা, ও দুচার বছর ছোটো-বড়োতে কিছু যায় আসে না। অমির যখন চায় তখন তুমি রাজি হলেই আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে আসব।"

কিন্তু সে সুযোগ দেয়নি শিপ্রা। অত্যন্ত আহত, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিল। আর বসেনি, কিছু খায়নি, গটগট করে বার হয়ে এসেছিল।

তারপর মাস ছয়েক অমিয় মুখদর্শন করেনি।

দর্শন জিনিসটা এমন যে সামনাসামনি না হলেও মনের মুকুরে অতি সঙ্গোপনে প্রায় অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে আর এক দর্শন। এ দর্শন নিভৃতের, এ দর্শন মানসলোকের। অবচেতনের প্রতিফলন।

সেখানে শিপ্রা মানসিক যুদ্ধে পরাজিত। বার বার একটি সুকুমার মুখ তাকে বিব্রত করেছে। বার বার কানের কাছে ভেসে উঠেছে "তোমাদের দুটিকে বড়ো সুন্দর মানায় মা।"

তবু আত্মবিশ্বাসে শিথিল হয়নি শিপ্রা। কর্তব্যে কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি। নিজের দায়দায়িত্ব থেকে ছুটিও নেয়নি। এই ঘটনার পর কত দিন, কত মাস পার হয়ে গেছে, তখনও ছোটো বোনের বিয়ে বাকি।

ওই বিয়ে উপলক্ষেই আবার প্রদীপ ধরে এনেছে অমিয়কে। "রমার বিয়ে আর তুই থাকবি না—তাহলে দিদিকে ম্যানেজ করবে কে? সবাইকে বকে ধমকে নাজেহাল করবে।"

অগত্যা অমিয় আবার এসেছে সহজ এবং স্বাভাবিক। আর কোনোদিন কোনো অবাস্তব প্রশ্ন করেনি, কোনো ভাবেই উত্তক্ত করেনি শিপ্রাকে।

তারপর কত মাস কেটে গেছে, বছর ঘুরেছে, শীতের জীর্ণবাস বসন্তের পদতলে খসে পড়েছে। গাছে গাছে জেগেছে নব পল্লব নব মঞ্জরী।

শিপ্রার ফুলবাগানে আর ফুল ফোটেনি। তার ছাদবাগানের লাল টবগুলো শুধু কাঁকর মাটি বুকে নিয়ে রুক্ষ উদাস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। না, ফুলবাগানের সাধ মিটে গেছিল শিপ্রার। ভাই-বউয়ের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাদে নেমে গাছের পরিচর্যা করতে মন চায়নি। গাছের ফুল যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, মনের ফোটা ফুল কী তত শীগগির রং হারায়? কেন হারায় না—এই প্রশ্নই নিজেকে সেদিন অনেকবার করল শিপ্রা যখন অমিয় তার বিদেশ যাত্রার আগে এসে হানা দিল।

কোনো আশ্বাস কোনো প্রতিশ্রুতি কিছুই দিতে পারেনি শিপ্রা অথচ আগের মতো দম্ভের বড়াই

তার ছিল না। আদর্শ আদর্শ করে চেঁচালেই কী আদর্শ পালন হয়। ওটা তো একটা মানসিক বিলাস। বিলাস না হলে মানুষ আদর্শের পেছনে ছুটত না। কেউ চায় নাম, কেউ যশ, কেউ অর্থ, কেউ বিদ্যা। আদর্শের দোহাই দিয়ে একটা উচ্চ শিখরে লক্ষ্য স্থির রেখে অবিশ্রান্ত ছোটো—যতক্ষণ না সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনো যায়, যতক্ষণ না লক্ষ্যের বস্তুটির নাগাল পায়।

কিন্তু শিপ্রার লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সে এত বেশি উদাসীন যে আয়ত্তে আনা দূরের কথা আদর্শের ভঙ্গুর একটা মূর্তিকেই সে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল। আসলে আদর্শ বলে কিছু ছিল না। ছিল অহমিকা আর মিথ্যা সংস্কার।

আশ্চর্য এই যে শিপ্রা ভেবেছে, অনেক ভেবেছে। ফিলজফির মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। ফ্রয়েড আর রাসেল নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—কিন্তু কূলে ভিড়তে পারেনি। হয়ত পারত কিন্তু ওই যে এক রাশ দায়-দায়িত্ব। শিকলের মতো পায়ে জড়ান—এপাশ ফেরো ঝম্‌ঝম্‌, ওপাশ ফেরো ঝম্‌ঝম্‌। বড়দি নামের মাহাত্ম্য আর সবার উপরে অভিভাবকত্ব দুই মিলিয়ে আষ্টেপৃষ্টে ওকে বেঁধে রেখেছিল। মন মুক্তি চাইলেও পরিবেশ ওকে মুক্তি দেয়নি। শেষ অবলম্বন মাকে আশ্রয় করে শিপ্রা যুক্তি খাড়া করেছিল। অমিয়কে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

অনেকদিন আর কোনো খোঁজখবর ছিল না অমিয়র। বিদেশ থেকে কয়েকটা চিঠি অবশ্যই সে দিয়েছিল কিন্তু আশাপ্রদ উত্তর দেয়নি শিপ্রা।

তারপর নিজের স্কুল, গোছা গোছা খাতা দেখা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা আর বাৎসরিক পরীক্ষার ভেতর ডুবে গেছিল। একমাত্র আনন্দ, একমাত্র রিক্রিয়েশান ছিল স্কুলের কমনরুমটা। এমন একটা জায়গা যেখানে "সকলের তরে সকলে আমরা" ভাব। ব্যতিক্রম কী তার ভেতরেও ছিল না? ছিল, কিন্তু সে নগণ্য। শিপ্রা সকলকেই ভালোবাসত, তাই ওর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। ও ভাবত প্রত্যেকেই ওকে ভালোবাসে কিন্তু সেখানেও কী একেবারেই আঘাত পায়নি? পেয়েছে, নিকটতম ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ত ওর বিপক্ষে অপর একজনের কাছে রসাল ভাষায় নিন্দা করেছে কিম্বা তুচ্ছ কোনো কারণে ওকে সইতে হয়েছে কর্তৃপক্ষের অবিচার। কিন্তু তাতে শিপ্রা আঘাত পেলেও মনের গভীরে সে সব রেখাপাত করেনি। দুচার দিনেই ভুলে গেছে, শুধু ভুলতে পারেনি নিজের অন্তরের অন্তরতম স্থলের দীনতা।

এই দৈন্য অতি গোপন, অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল। জীবনে, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে একটা বলিষ্ঠ আশ্রয়ের লোভ আছে, একটা উষ্ণ বক্ষের নিবিড় আলিঙ্গনের তৃষ্ণা আছে অথচ প্রায় সারাজীবনই শিপ্রাকে তার এই গোপন দৈন্য ঢেকে ভালোমানুষ দিদিমণি সেজে আর সংসারের বড়দি সেজে থাকতে হল।

বইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল শিপ্রার এক লাইনও পড়া হয়নি। অমিয় এতক্ষণে তার কামরার শয্যায় হয়ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তার একবারও মনে পড়ছে না—শিপ্রার কথা। আবার এও হতে পারে শিপ্রার মতো সেও গত কয়েকটা বছরের স্মৃতি রোমন্থন করছে।

বইয়ের দিকে কিছুতেই মন বসাতে পারল না শিপ্রার, বই বন্ধ করে মাথার কাছে বেড লাইট নিভিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কম্বলটা টেনে নিল বুক পর্যন্ত।

হঠাৎ ওর মনে হল আজ এই কামরায় ওর একা থাকার কথা নয়। এটা কুপে হওয়া উচিত ছিল আর সেখানে থাকত কেবল দুটি প্রাণী। একজন তো শিপ্রা, অপরজনের নাম আজ উচ্চারণ করতে আর দ্বিধা করল না শিপ্রা। অপরজন নিশ্চয়ই অমিয়। হ্যাঁ, অমিয় ছাড়া আর কেউ নয়, অন্য কোনো পুরুষ নয়।

এতদিনে এত বছর পরে শিপ্রার কী মতিভ্রম ঘটল? এতদিনে জীবনের এই আটত্রিশ বছর বয়সে কী কিশোরীর চাপল্য তার ভেতর জেগে উঠল? কিন্তু আর একজন? সেও তো তরুণ নয়,

তবে হ্যাঁ তার বিয়ের বয়েস উতরে যায়নি। পুরুষের বিয়ের বয়স পঞ্চাশোর্ধ হলেও ক্ষতি নেই। হামেশাই দেখা যায় পাত্রের বয়েস চৌত্রিশ আর পাত্রী আঠারো কিম্বা কুড়ি। সেটা দোষণীয় কেউ ভাবে না। আর সে জায়গায় দু'চার বছরের বড়ো পাত্রী হলেই মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড! নিন্দা টিটকিরি আত্মীয় বর্জন অনেক কিছু চলে। কিন্তু উড়িষ্যায় কিম্বা পশ্চিমের কোনো কোনো জায়গায় পাত্রী বয়েসে বেশ দুচার বছরের বড়ো হলেও কোনো পক্ষের কোনো ক্ষতি হয় না। তাদের বিবাহিত জীবনেও কোনো চিড় খায় না। কিন্তু এতদিনে এত যুক্তির অবতারণা কেন করছে শিপ্রা?

হয়ত এতদিনে সংসারের ভারমুক্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেয়েছে। মা, যিনি ছিলেন শেষ দায়িত্ব, তিনিও আজ বছর দুই আগে শিপ্রাকে মুক্তি দিয়েছেন। আর সেই মুক্তির আস্বাদ প্রাণভরে গ্রহণ করার জন্যেই শিপ্রা মায়ের মৃত্যুর মাস দুই পরেই মহিলা হোস্টেলে চলে যায়। ঘর ঘর করে যে মায়া সে তো বহু দিনই কেটে গেছিল, ইদানিং চম্পার সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ ছিল। তার কারণ অবশ্য মীরা দেবী। দুবার স্ট্রোকে তাঁকে একেবারে অথর্ব করে দেয়. প্রায় বছর খানেক শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। সে সময় চম্পাও পিত্রালয়ে—শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে সরে পড়েছিল। পাছে এক গ্লাস জল হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হয় কিম্বা কাছে দুদণ্ড বসতে হয়। মাঝে মাঝে এ বাড়ি এলেও মায়ের কাছে এক মিনিটও বসেনি, কোনোদিন আর তাঁর বড়ো আদরের নাতিকে একটিবারও শয্যার কাছে আসতে দেয়নি, পাছে তার কোনো রকম দূষিত গ্যাস লাগে।

অবাক হয়ে ভাবত শিপ্রা এরা কী মানুষ? মেয়েমানুষ তো নয়ই কিন্তু এতটুকু মনুষ্যত্বও কী নেই?

মাকে হারিয়ে শিপ্রা একদিকে যেমন সর্বহারার বেদনা অনুভব করল অপরদিকে তেমনি মুক্তির স্বাদও পেল। প্রথমটা বড়ো খালি খালি ঠেকত, বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হত না। কে আছে শিপ্রায়? কার কাছে ফিরবে? তখন অবশ্য চম্পা বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাল। সে জানত শিপ্রাকে কাছে রাখতে পারলে এবার তার ষোলো আনা লাভ হবে। কিন্তু শিপ্রায় আর প্রবৃত্তি হল না সংসারে জড়িয়ে পড়ার। এবার যে মুক্তি-পরোয়ানা দিয়ে গেছেন মা। তারই সদ্ব্যবহার করল, চলে গেল হোস্টেলে।

আর সেই সময়েই বিশেষ করে মনে পড়ল অমিয়র কথা, অমিয়র মায়ের কথা।

প্রায় চার পাঁচ বছর পর শিপ্রা এবার নিজে থেকে চিঠি দিল অমিয়কে। একটা নয়। উত্তর না পেয়েও পর পর তিনটে।

অমিয় তখন পুনায় মস্তবড়ো চাকুরে। বছরে একবার বিদেশ ঘুরে আসে। শিপ্রার একটাও চিঠি সে পেল না। কলকাতার বাড়ি সম্পূর্ণ ভাড়া দেওয়া, মাকে সে নিজের কাছেই রেখেছে।

আজকের অমিয়র সঙ্গে সেই লাজুক ছেলেটার কোনো মিল নেই।

হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ল শিপ্রায়। তখন অমিয় আই-এস-সি পাশ করে থার্ড ইয়ারে পড়ছে। একদিন স্কুলে গিয়ে হাজির টিফিনের সময়। শিপ্রাকে বেয়ারা খবর দিল। একজন ভদ্রলোক ডাকছেন শুনে প্রথমটায় বুক কেঁপে উঠল। কে বাবা ভদ্রলোক? শিপ্রার কাকা না মামা না পাড়ার কোনো বদ ছেলে?

আপিস ঘরে ঢুকে অমিয়কে দেখেই শিপ্রার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। কান গরম হয়ে উঠল। বেশ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কী দরকার?"

অমিয় অপূর্ব হেসে ওর হাতে একটা ক্যালেণ্ডার আর একটা ছোটো প্যাকেট দিল।

অনিচ্ছায় নিল শিপ্রা, তারপর বলল, "কী আছে, কী মহামূল্য জিনিস? স্কুলে দিতে আসতে হল?'

অমিয় বেশ কাছে সরে এসে বলল, "বড্ড মন খারাপ করছিল শিপুদি আর তাছাড়া এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।"

এমন মুখ করে বলল অমিয়, যে রাগ করা আর হল না। উপরন্তু দুটো রাজভোগ আনিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

কমনরুমে সে কী হৈ হৈ! "কে এসেছিল রে শিপ্রা? কে হয় তোমার শিপু? কী সুন্দর দেখতে ছেলেটা! তোমার ভাই বুঝি? না আর কেউ?"

শত প্রশ্নের উত্তর দেবার পর শিপ্রা হাতের প্যাকেটটা খুলে একটা বড়ো স্ল্যাব ক্যাডবারিস চকলেট সকলকে ভাগ করে দিয়েছিল। আর বার বার বলেছিল "কী যে সব বলছ তোমরা, আমার চেয়ে অনেক ছোটো বাচ্চা ছেলে একটা। দেখতে ওই রকম লম্বা চওড়া।"

আজকের অমিয় কী আবার বলবে—শিপ্রা তোমার জন্য মন খারাপ করছিল তাই একবার দেখতে এলাম। এই রাতে এই চলন্ত গাড়ির দরজার সামনে একবারও কী আসবে না অমিয়?

শিপ্রার এ চাওয়া কী অন্যায়? এ চাওয়া কী লোভাতুর হৃদয়ের কাঙ্গালপনা? না একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কামনা!

আজ ঠিক এই মুহূর্তে শিপ্রার মনে হচ্ছে অমিয়কে। সে অনেক বছর আগে প্রায় বারো বছর আগে সমুদ্র সৈকতে তার প্রথম যৌবনের অর্ঘ নিঃশেষে দান করেছিল। দৈহিক নয়, মানসিক। দেহসর্বস্ব মনোবিকার কোনোদিনই ছিল না শিপ্রার, ছিল না অমিয়র। সেই কারণেই বোধহয় শিপ্রা নিজেকে বুঝেও বোঝেনি আর অমিয় নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ভালোবাসা ছিল, প্রেম ছিল, ভালো লাগা ছিল, কিন্তু মজবুত কোনো বাঁধন ছিল না। দৈহিক আকর্ষণ বা উন্মাদনাও ছিল না তাদের।

কিন্তু আজ ইচ্ছা করলে অমিয় তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিঃশেষে শিপ্রাকে গ্রহণ করতে পারে, শিপ্রার সব বাধা আজ সরে গেছে। এতদূর সরে গেছে যে বম্বেতে এক বান্ধবীর বাড়ি দুমাসের জন্য বেড়াতে যাচ্ছে। শিপ্রার এই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও বিবাহ করে দিব্যি শান্তিতে সংসার করছে। শিক্ষয়িত্রীদের ভেতর কজনের তো বিয়ে হয়ে গেল। প্রতিজনের বিবাহে শিপ্রা উপহার দিয়েছে আর খাওয়া দাওয়ার প্রশংসা করে "চমৎকার বর হয়েছে" বলে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু এমনই ভাগ্য ওর যে মৃণালের বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি। মৃণাল ওর চেয়ে অনেক ছোটো, স্কুলে ঢোকার পর থেকেই শিপ্রাকে সে ভীষণ ভালোবাসতে শুরু করে। শিপ্রাও ওকে স্নেহ করত। বড়ো সুন্দর মেয়ে মৃণাল, তেমনি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। মাত্র বছর দুই চাকরি করল মৃণাল। তারপর ওর মাসির কাছে বম্বে গেল ওই পুজোর ছুটিতে আর সেই মাসেই বম্বেতেই ওর বিয়ে হয়ে গেল। তবু মৃণাল নিতে চেয়েছিল শিপ্রাকে। কার্ড পাঠায়নি, চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তখনও শিপ্রার শেষ অর্গল মুক্ত হয়নি—মা তখনও বেঁচে এবং অত্যন্ত অসুস্থ।

সেই মৃণালের পীড়াপীড়িতে এবার মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে অনন্ত আকাশে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে শিপ্রা। আরও আনন্দ, গভীর আনন্দ, গভীর তৃপ্তি, সে আজ নিজেকে স্বীকৃতি দিয়ে পেরেছে, নিজের অবচেতনে যে স্বপ্ন এতদিন লালন করেছে আজ তা রূপ গ্রহণ করেছে। আজ আর শিপ্রার লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই নেই। সত্যকে সে স্বীকার করতে পেরেছে আর নিজে যখন পেরেছে তখন অমির কাছে স্বীকার করতেও সে আর কুণ্ঠিত নয়। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

সারাটা রাতই বোধহয় শিপ্রা আবোল-তাবোল চিন্তা করে কাটাল।

ভোরের আলো পুবের বুকে রংয়ের ঢেউ তোলার আগেই উঠে পড়ল শিপ্রা। হয়ত, হয়ত এখুনি অমিয় এসে হাজির হবে, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে চাইবে।

তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে বসল শিপ্রা আর বার বার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল।

এই বুঝি অমিয় এল, এই বুঝি ডাকল তাকে। কিন্তু অমিয় এল না আর শিপ্রাকেই তার খোঁজে যেতে হল।

তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। আশ্বিনের রোদের একটা মাদকতা আছে, তার ওপর যার মনে রং ধরেছে তার কাছে আরও মিষ্টি। শিপ্রা নিজেই গেল অমিয়র কামরার দরজায়। আস্তে নয় বেশ জোরে ধাক্কা দিল।

ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। শিপ্রা বলল, "মিঃ সেন কী এখনও ঘুমুচ্ছেন?"

না ঘুমায়নি, অমিয় ব্রেকফাস্ট সেরে আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিল।

শিপ্রাকে দেখে ঠাণ্ডা চোখে চাইল, তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "কী ব্যাপার? এত সকালে? কিছু দরকার আছে না কী?"

কী বলবে শিপ্রা?

প্রৌঢ় লোকটি উপরের বাঙ্কে উঠে আবার শুয়েছেন। তিনি বাঙ্গালি কী মাদ্রাজি কী গুজরাটি কিছুই ধরতে পারে নি শিপ্রা, তবে চেহারায় বাঙ্গালি।

গলাটা ঝেড়ে সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, "না দরকার কিছু নেই, এমনি খবর নিতে এলাম।"

এবার সোজা হয়ে বসল অমিয়। এতক্ষণ শিপ্রা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, ওকে বসতে বা ভেতরে আসতে বলেনি অমিয়। এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, "আরে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভেতরে এসো, বসো।"

নিজের বিছানার একাংশ দেখিয়ে দিল।

ততক্ষণে শিপ্রার উৎসাহ নিভে গেছে ধূসর গলায় বলল, "না থাক তুমি পড়ো।"

আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল শিপ্রা। অমিয় একবারও বলল না, "যেও না। এই শিপু, আমি রেগে যাব কিন্তু।" আবার ভাবল কামরায় অপর একজনের উপস্থিতিতে ওকে অনুরোধ করতে লজ্জা পেয়েছে অমিয়। মন কিন্তু সে প্রবোধ বাক্য মানল না।

সারাদিনে আরও বার দু'তিন দেখা হল অমিয়র সঙ্গে, অমিয় যেন কেমন পাশ কাটাতে চাইল।

শিপ্রা একবার জিজ্ঞেস না করে পারল না, "কী ব্যাপার অমি, মনে হচ্ছে আমাকে দেখলেই তুমি যেন ভূত দেখছ!"

অমিয় হেসে উঠল, বলল, "রাইট ইউ আর, তুমি এখন আমার কাছে আর তুমি নেই শিপ্রা—তোমার কাঠামোটা দেখছি আর ভয় পাচ্ছি।

"কেন? খুব বুড়িয়ে গেছি?"

"আরো না না, বয়সের বালাই আমার কোনোকালে ছিল না সে তো তুমি জানো। কিন্তু তোমার সেই দীর্ঘমেয়াদী ভালমানুষীর জেহাদ ঘোষণা, নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাবটা, অবজ্ঞা আর আত্মবঞ্চনার কাঠামোটা যেন বরদাস্ত করতে পারছি না। আজ আমরা একই মিছিলের ভাগিদার হতে পারি কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো পরিচয়ের বালাই না থাকাই ভালো, তাই না? নাও ইট ইজ টু লেট টু রিক্‌নসাইল।"

শিপ্রার মুখটা বড়ো বিষণ্ণ আর পাণ্ডুর হয়ে উঠল, কেন যে অমির সঙ্গে দেখা হল?

কম মানসিক যন্ত্রণা—কম প্রত্যাখান তো সে পায়নি, আজ তার বলবার দিন এসেছে, বলবে বৈকি। তা বলুক কিন্তু সেই সঙ্গে একটিবার শুধু প্রশ্ন করুক, শিপ্রা তোমার ভুল কী ভেঙ্গেছে?

কিন্তু সে প্রশ্ন একবারও করল না অমিয়। রূঢ় ব্যবহারও করল না বরং রাতের ডিনার একসঙ্গে খাবার আমন্ত্রণ জানাল, কিন্তু শিপ্রা রাজি হল না।

আবার হাসল অমিয়, বলল, "ওই তো শিপুদি, আজও তোমার ভয় গেল না?"

শিপ্রার কানে খট্ করে লাগল "শিপুদি"। সেই আদরের ডাক। কিন্তু কেন? কেন অমিয় শুধু শিপু বলছে না, ও কী বুঝতে পারছে না শিপ্রা কতটা এগিয়েছে?

কী করেই বা বুঝবে অমিয়? দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যবধান। কত পরিবর্তন ঘটে মানুষের।

তবু অমিয় বম্বেতে নামার আগে শিপ্রার কামরার কাছে এসে দাঁড়াল। বিছানাপত্তর গুছিয়ে নিতে সাহায্য করল। বলল, "তুমি বম্বেতে কদিন থাকবে শিপুদি? আমি অবশ্যই একদিন দেখা করব।"

নিজেকে এখন বেশ সহজ করে নিয়েছে শিপ্রা, পোড়-খাওয়া মন অল্পে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? সংসার, গোটা পরিবার যার সঙ্গে চিরকালটা বিরোধ করল, যার মন বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করল না তার কী এত সহজে বিচলিত হওয়া সাজে!

শিপ্রা তার ডায়েরি খুলে ঠিকানাটা বলল, "সাই-সেকশান, অম্বরনাথ।"

চমকে উঠল অমিয়, বলল, "কৈ দেখি দেখি!"

শিপ্রা বলল, "তুমি চেনো নাকি ভদ্রমহিলাকে? খুব বড়ো অফিসারের বউ, ওরাও সেন। কিন্তু মৃণাল ওর স্বামীর নাম দেয়নি, লিখেছে ওর নামেই ওখানে সবাই চিনবে।"

তারপর কতকটা নিজের মনেই বলল যেন, "আর চিনবে নাইবা কেন? যা গুণী মেয়ে তেমনি সুন্দরী, চেনবার তো কথাই।"

অমিয়র হাত থেকে ফস করে কামরার মেঝের পড়ে গেল ডায়েরিটা।

শিপ্রা আবেগের সঙ্গে বলল, "কী দস্যি ছেলে বাবা—ফেললে তো?"

অমিয়র মুখে কথা নেই, যেন বোবা বনে গেছে। কৈ একবারও তো শিপ্রার নাম কোনোদিনও করেনি মৃণাল, সমবয়সীদের নাম করেছে দু একটা কিন্তু শিপ্রা বয়স্কা। তাই তার কথা মুখে আনেনি। বেচারি শিপ্রা! বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, "শিপুদি, তোমাকে আর কিছুই ভাবতে হবে না, ওটা আমার বাড়ির ঠিকানা!"

"তোমার বাড়ি?" আনন্দে যেন ফেটে পড়ল শিপ্রা, বোকা শিপ্রা—অনভিজ্ঞ শিপ্রার একবারও কী মনে হল না, তাহলে মৃণাল ওখানে কেন? মৃণালের পদবি সেন হল কেন?

মালতীর মালা

সরলা দেবী

রেঙ্গুনে পার্ক স্ট্রিটের দুধারে বড়ো বড়ো গাছের সারি দিয়া সাজান প্রকাণ্ড বাঁধান রাস্তাটার উপর শ্রাবণের বাদলধারা যেন মায়াজাল বিস্তার করিয়া দিয়াছিল।

দেখিলে আপনা হইতেই মন উদাস হইয়া পড়ে।

তাহারই একদিকে ফুটপাথের উপর ডাইনে বাঁয়ে পোড়োজমির বেড়া দেওয়া চারতলা বাড়ির তিনতলার এক কামরায় ঊষা স্বামীর অফিসের জলখাবার কৌটায় ভরিতেছিল।

শুইবার ঘরে কোট্ প্যান্ট পরিতে পরিতে মোহিত হাঁকিয়া কহিল, "ওগো শুনছ।"

"কী?"

"আজ তুমি দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিও।"

"কেন শুনি?"

"এ যে বাদল নামল, আজ আর কোথাও বেরুনো যাবে না দেখছি সন্ধেবেলায়।"

"তাই কী?"

"নিরুপায়ের উপায় তুমি। তোমার সঙ্গেই দেখছি সন্ধেটা আড্ডা দিয়ে কাটাতে হবে। তুমি আবার আলো না জ্বলতে জ্বলতে যে ঘুম লাগাও তাই সাবধান করে দিচ্ছি।"

"আহা মরে যাই। আমি অত তোমার দয়ার ধার ধারি না। কেন তোমার আজ "বেঙ্গল ক্লাব" "ফেয়ার স্ট্রিটের মেস" কী অপরাধ করলে?"

"বারে, তুমি কী চাও আজও কালকের মতো বেড়াতে গিয়ে ভিজে কাকটি হয়ে ফিরে এসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মরি। তার চাইতে তুমি একটু দয়া করে দুপুরে ঘুমিয়ে নিও, সন্ধেটা জমবে ভালো।"

"ইস, তা বই কী! আজ আমি দুপুরবেলা বুবুদের বাড়ি বেড়াতে যাব, কাল থেকে কথা দিয়ে রেখেছি। তারপর সন্ধে হলেই ঘুমুব, তুমি একলাটি বসে বসে হাই তুলবে-- তুমি রোজ বেড়াতে গেলে আমি যা করি। আজ হবে শোধ-বোধ।"

হাসিয়া মোহিত কহিল "আচ্ছা, তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নেবার ওষুধ আমার জানা আছে।"

॥ ২ ॥

বাড়িওলা মজিদ সাহেবের পৌনা স্ত্রী মা হেনকে ঊষা বুবু বলিত। মা হেন ঊষাকে বলিত দিদি। চীনাবাজার মজিদ সাহেবের আবাস ভবন। সেখানে তাঁহার স্বজাতীয়া প্রৌঢ়া স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী বর্তমান।

মজিদ সাহেব মান্দালয়ে একবার ব্যবসায় উপলক্ষে গিয়া বন্ধুকন্যা মা হেনের রূপে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুর অগোচরে বিবাহ করিয়া বসেন এবং গোপনে আনিয়া স্পার্ক স্ট্রিটের এই বাড়িতেই আছেন।

অবশ্য বিবাহটা হইয়াছিল একটু নতুন রকমে। মা হেন কড়ার করিয়া লইয়াছিল যে সে নামাজ পড়িবে না এবং নিষিদ্ধ বস্তুও খাইবে না।

আর রাত্রে মজিদ সাহেব আসিয়া যে সকল পাত্রে চা, কফি, লেমনেড সরবৎ ইত্যাদি পান করিত, মা হেন, সেই সকল পাত্রগুলি পৃথক স্থানে রাখিয়া দিত, নিজে ব্যবহার করিত না।

কারণ মা হেন হিন্দু। মা হেন বৈষ্ণবী। নবদ্বীপের বড়ো বড়ো বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ একসময়ে স্বাধীন বর্মা নৃপতির সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কৌলিন্য মর্যাদায় কিছুমাত্র ছোটো হন নাই। রাজা থিব'র পিতৃপিতামহের হুকুমে তাঁহারা এক এক বর্মা তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পর মুস্কিল বংশধরদের লইয়া। তাহারা তো আর নবদ্বীপের "কাব্যতীর্থ" "স্মৃতিতীর্থদের" মধ্যে নিকট আত্মীয় বলিয়া স্মৃতি ফিরাইতে পারিল না।

অতএব বর্মা রাজার অনুগ্রহে তাহারা পৌনা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। না হিন্দু না বৌদ্ধ, না বাঙ্গালি না বর্মা।

এই তো গেল হেনের পিতৃ পিতামহের ইতিহাস।

॥ ৩ ॥

ঊষা যখন বুবুদের বাসার দরজায় ঘা দিল, বেলা তখন আড়াইটা। জরির বুটি দেওয়া বেগুনি রংয়ের লুঙ্গীর উপর ফিরোজা রংয়ের ফুলহাতা এঞ্জী পরিহিতা, কানের হিরার ফুল, খুলিয়া দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

'আইয়ে দিদি, বৈঠিয়ে। আজ হামারা নসিব বহুত আচ্ছা হ্যায়। আজ মালুম হোতা পূবকা সবুজ পচ্ছিমমে উঠা হ্যায়।"

ঊষা হাসিমুখে প্রবেশ করিয়া মা হেনের নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ এই যে সে আসিবে মনে করে প্রায়ই, কিন্তু হইয়া উঠে না।

তাহার পর নানারূপ আলাপ করিতে করিতে মা হেন সহসা প্রশ্ন করিল, "আজ সকাল থেকে উঠে অবধি কী কী কাজ করলে বল?"

ঊষা উর্দ্দঘেঁষা হিন্দিতে যে জবাব দিল তাহার মর্মার্থ এই—

"কী আর এমন করব বল ভাই! ছেলে নেই—পুলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ গড়িয়েই দিন কেটে যায়। কালকে থেকে যে বৃষ্টি, আজ সকালে তো কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। উনি কিন্তু এমন মানুষ, ভোর না হতেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রোজ নিজে হাতে দু'কাপ চা করে তারপর আমায় ডাকাডাকি করবেন। আমি যত বলি যে আমি এখন চা খাব না, বেলায় খাব, সেকথা কে শোনে? দুজনে গল্প করে চা না খেলে ওঁর চলবেই না! কাজেই আজও টানটানির চোটে উঠতেই হল।

"তারপর চা খেয়ে উনি গেলেন বাজার, আমি রান্না করতে লাগলুম। বাজার থেকে এসে আমায় রান্নার জোগাড় দিতে লাগলেন, হয়ত ছুরি করে আলু ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন, নয়ত আমি যখন মাছ কুটছি তখন হয়ত কড়ার নেড়ে দিতে লাগলেন!

"আজ আবার দেখ না দিনে ঘুমুতে হুকুম দিয়ে গেছেন।"

"কেন?"

"কেন আবার, জল-বাদলায় বেরুতে পারবেন না, তাই আমাকে আড্ডা দিতে হবে।"

"তোমরা বেশ আছ ভাই, এক একদিন যখন দুজনে গান গাও, আমার শুনতে বেশ লাগে, আমি বারান্দায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাক।"

"আমার কথা তো বেশ শুনে নিলে, এইবার তোমার কথা বল সকাল থেকে কী করছে?"
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা হেন কহিল, "আমি আর কী করব ভাই, জানই তো আমার একঘেয়ে জীবন।"

এই বলিয়া মা হেন্ উষারই নিকট হইতে শেখা একটি কীর্তনের সুর ধরিয়া কহিল—

"হরি গেলেন মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথে পড়িয়ে আছি হয়ে মালতীর মালা
আমি পড়ে যে আছি গো—
মালতীর মালা হয়ে আমি পড়ে যে আছি
কৃষ্ণ উপেক্ষিতা হয়ে পড়ে যে আছি গো—"

বুবুর বাহু ধরিয়া কাতর কণ্ঠে উষা কহিল, 'কেন, ভাই এমন করে বলছ, তুমি তো উপেক্ষিতা নও।"

'না, তা নই, কিন্তু এমন ধারা একঘেয়ে জীবন যে আর ভালো লাগে না ভাই। রাত ১২টায় সাহেব এল, ভোর পাঁচটায় চলে গেল, তারপর ৯টা অবধি ঘুমুলুম। তারপর মাগি চা নিয়ে ডাকল, উঠলুম, চা খেয়ে ঘর-দোর আসবাবপত্র ঝাড়লুম, গোছালুম রান্নার কাজ সব মাসিই করে। আমাকে কিছু করতে দেয় না, বলে—আগুনের তাতে গেলে আমার রং ময়লা হয়ে যাবে, সাহেবের মন থাকবে না।

"কী আর করি?"

"গা ধুয়ে সাজ সারলুম। খাওয়া দাওয়ার পর মাসি বসল চুরুট তৈরি করতে, আর আমি আমার এই লুঙ্গীটায় পুঁতির ফুল বসাচ্ছিলাম আর তুমি এলে। দেখ তো ভাই কেমন হয়েছে?"

"সুন্দর! আমায় একটু কাগজ পেন্সিল দাও না ভাই, ডিজাইনটা এঁকে নিই।"

নক্সা আঁকিয়া উষা কহিল, "আজ তবে উঠি ভাই, চারটে বাজে, ওঁর আবার জলখাবার তৈরি করতে হবে, উনি ঠিক পৌনে পাঁচটায় আসেন।"

॥ ৪ ॥

বাসায় পা দিয়াই মোহিত কহিল, "জলদি করো ম্যান জলদি।"

বিস্মিত কণ্ঠে উষা কহিল, "কেন?"

"তোমার রাগ দেখে বৃষ্টি যখন থেমে গেল, আর আমিও যখন বলেছি সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গেই কাটাব, তখন চল বায়োস্কোপে যাই। 'গ্লোবে' একটা বাংলা বই এসেছে।"

"আচ্ছা, ৬টা বাজতে তো এখনও দেরি আছে! আমি ততক্ষণ রাত্রের খাবারটা তাড়াতাড়ি সেরে রাখি। তুমি ধড়াচূড়া ছেড়ে হাত-পা ধোও, চা রেডি।"

ছাই রংয়ের কটকি শাড়ির জরিপাড় আঁচল দোলাইয়া উষা স্বামীর পাশে পাশে পথ চলিতে শুরু করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মা হেন বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাদেরই দিকে নির্মিমেষে চাহিয়া আছে।

উষার চিত্ত ব্যথিত হইল।

বায়োস্কোপেও উষার মন বসিল না, তার মনে বাজিতে লাগিল সখীর সকরুণ দৃষ্টিভঙ্গি আর তার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

৯টায় বাসায় ফিরিয়া উষা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইল মা হেন গাহিতেছে—

"বিপথে পড়িয়ে আছি, হয়ে মালতীর মালা।"

সাহেব কত রাত্রে আসিবে কে জানে? যখন আসিবে তখন হয়ত যত্নে আঁকা সুরমা, তেনাখা চোখের জলে ভাসিয়া যাইবে।

ঘড়ি-চুরি

সরলাবালা দাসী

॥ ১ ॥

সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, এজন্য সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হই নাই। শেখরবাবু তখন রাস্তার দিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন; আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়াছিলাম। তখন সবেমাত্র চায়ের পিয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটি আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়াছিল।

ঘরখানি ইংরেজি ফ্যাসানের। ঘরের মেঝে মাদুর মোড়া, চেয়ার টেবিল কৌচে ঘরখানি পরিপূর্ণ, একপাশে একটি আলমারী, সেটি নতুন পুরাতন নানাবিধ পুস্তক সংবাদপত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই ঘরটি শেখরবাবুর বসিবার ঘর।

শেখরবাবুর পূর্ণ নাম সুধাংশুশেখর বসু। আমরা উভয়ে বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছি, একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং আজ পর্যন্ত তাঁহাকে যেমন ভালোবাসি এমন আর কাহাকেও বাসি কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমন দুর্বোধ্য যে, আমিও এতদিনেও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখন কাহারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না। কিন্তু সকলের সঙ্গেই অমায়িকভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জন ও উপাধি অর্জন করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর শেখরবাবু পুলিশের ডিকেটটিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যে কয়েক বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শেখরবাবু বইখানি রাখিয়া দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু আসছেন দেখছি। তুমি বোধহয় ওঁকে চেন।"

শেখরবাবু মধুর হাস্যের সহিত মহেন্দ্রবাবুর সংবর্দ্ধনা করিলেন, তাহার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আজিকার সকালটা বড়োই বাদলা, খানিকটা চা আনিতে বলিব কী?"

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটা বড়ো দরকারি কাজের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি বোধহয় জানেন আমি এখন পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের ডিটেকটিভ। এই ভদ্রলোকটি একটি ঘড়ি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেটি চুরি গিয়াছে, এ পর্যন্ত তাহার কোনোই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

শেখরবাবু আগন্তুক ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বসুন মহাশয়, ব্যাপারটি কী ঘটিয়াছে সমস্তই আপনি বিস্তারিত করিয়া বলুন।"

"ব্যাপার এমন বিশেষ কিছু নয়। যেটি হারাইয়াছে সেটি অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঘড়ি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক ক্ষতির কথা এই যে সেটি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। আপনি ঘড়িটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।" শেখরবাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ঘড়ি চুরি সম্বন্ধে কী বলিতেছিলেন?"

"ঘড়িটি আমার দাদার নিকট থাকিত। সম্প্রতি দাদা রাজবাড়ি যাইবার সময় ঘড়িটি একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মেরামত করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার কাছে রাখিয়া যান। ঘড়ি মেরামত হইয়া গেলে, আমি তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ফেরৎ ডাকে তাঁহার যে পত্র আসিল, তাহা পড়িয়াই আমি অবাক হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটি অতি অল্পদামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি।" "এই দেখুন, তাঁহার পত্র।" বলিয়া তিনি একখানি খামে ভরা পত্র শেখরবাবুর হাতে দিলেন।

শেখরবাবু খামখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আপনার দাদা বোধ-হয় রেলওয়ে অফিসে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ, তিনি রাজবাড়ির স্টেশনমাস্টার। আপনার সঙ্গে কী তাঁর পরিচয় আছে?"

"না, খামখানি দেখে এইরকমই অনুমান হচ্ছে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "খাম দেখে অনুমান হচ্ছে?"

শেখরবাবু খামখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন না, খাম দেখে কিছু বুঝা যায় কিনা?"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খামখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভায়োলেট কালিতে লেখা নাম ও ঠিকানা, আর এখানকার ও রাজবাড়ির পোষ্টমার্কা, ইহা ভিন্ন খামে এমন কোনো চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কী কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।"

"পোষ্টমার্কাটি ভালো করিয়া দেখিয়াছেন।"

"হ্যাঁ, পোষ্টমার্কে রাজবাড়ির পর R S. লেখা আছে বটে, কিন্তু অন্য লোকেও তো স্টেশনে চিঠি দিয়া যাইতে পারে।"

"চিঠিখানা কোন্ সময়ে সেখান থেকে রওনা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছেন?"

"ঠিককথা, চিঠিখানা দেবিতে রওনা হয়েছে, কিন্তু 'লেট ফি'র ছাপ নাই।"

শেখরবাবু বলিলেন, "এর থেকেই অনেকটা অনুমান হয় নাকি যে, যিনি চিঠি লিখেছিলেন, তিনি লেট ফির না দিয়েও চিঠিখানা পাঠাতে পারেন?"

"তিনি স্টেশনের কর্মচারী না হয়ে পোস্টাল কর্মচারীও তো হতে পারেন।"

"ঠিক কথা। ভায়োলেট রংয়ের কালি সচরাচর কোথায় ব্যবহার হয় বলুন দেখি।"

মহেন্দ্রবাবু আশ্চর্য হইয়া শেখরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "শেখরবাবু আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই কালি কপিং ইঙ্ক নামে রেলস্টেশনে ব্যবহারের জন্য আজকাল চলিত হইয়াছে।"

শেখরবাবু বলিলেন, "রেলের স্টেশনে দরকারি কাগজপত্রের নকল রাখিবার জন্য যে কালির ব্যবহার, তাহা ডাকঘরে লইয়া গিয়া তাহাই পত্রে ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার।"

॥ ২ ॥

চিঠিখানি এতক্ষণ খামের মধ্যেই ছিল, এখন শেখরবাবু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্বে একবার নাকে আঘ্রাণ লইলেন, তারপর কাগজখানি মহেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কাগজটা দেখে আপনার কী মনে হয়?"

"বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফসিট। কাগজখানি ছিঁড়িবার সময় বোধহয় তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেন না পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্ঠা ভায়োলেট কালিতে লেখা, অপর পৃষ্ঠায় কালো কালো দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধহয়, কোনো একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।"

শেখরবাবু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "বেশ মহেন্দ্রবাবু, আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, যে চিঠির এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে সেই চিঠিখানি স্ত্রীলোকের কী পুরুষের? আপনার কী বোধহয়?"

"চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখার যে দাগ পড়িয়াছে সেটা বাংলা লেখার ছাপ বলিয়া বোধহয় বটে কিন্তু তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের চিঠি বলিয়া ঠিক করা অনেকটা কষ্টকল্পনা। পুরুষেও তো বাংলায় পত্র লিখিয়া থাকে।"

"নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু চিঠিখানি যে পুরুষের লেখা নয় সে বিষয়ে কষ্টকল্পনা ব্যতীতও অনেক পরমাণ পাওয়া যায়। চিঠিখানি একবার নাকের কাছে ধরুন দেখি।"

"বাঃ, চমৎকার গন্ধ।"

"গন্ধটা দেলখোসের গন্ধ। ডিটেকটিভ বিভাগে কাজ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধের পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক। দেলখোস প্রভৃতি যে সকল গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। লিখিবার সময় কালি ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছাপ পড়িয়াছে, এরূপ অপরিষ্কার লেখাও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেব পক্ষেই অধিক সম্ভব। তাহার পর হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই লেখার এই উল্টা ছাপ দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি ইহা স্ত্রীলোকের লেখা।"

হরিভূষণ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এই ডাকের কাগজ দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, বউদিদি, এইরকম ডাকের কাগজ ব্যবহার করেন। সম্ভবত তাঁহারই চিঠির আধখানা কাগজে দাদা এই চিঠি লিখে থাকবেন। কিন্তু আপনার এই অদ্ভুত ক্ষমতা এই সমস্ত বৃথা বিষয় লইয়া অপব্যবহাব হইতেছে, ইহাতে চুরির কোনো সন্ধান হইতেছে না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "চুরি সম্বন্ধেও কত সাহায্য হইল কী! এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি রাজবাড়ি স্টেশনে পার্শেল পৌঁছিয়াছে ও সেখানে আপনার দাদাও উপস্থিত ছিলেন, অতএব সেখান হইতে ঘড়ি চুরি যাইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। আপনি ঘড়ি কীরূপে কাহাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন?"

হরিভূষণবাবু বলিলেন, "ঘড়িটা রেজিস্ট্রি কী ইনসিওর করিয়া পাঠান নাই, বেয়ারিং পার্শেল কখন খোওয়া যায় না জানিতাম, তাই বেয়ারিং পাঠাইয়াছিলাম, ঘড়ি আমি নিজে হাতে প্যাক করিয়া আমাদের বাড়ির বিশ্বাসী ঝির হাতে দিয়া পোষ্টাফিসে পাঠাইয়াছি। পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহা ঝির জানিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তারপর ঘড়ির সঙ্গে আর আমার কোনো সম্বন্ধ নাই।"

শেখরবাবু হরিভূষণবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দাদার চিঠি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "আপনার দাদা লিখিয়াছেন চলন্ত ঘড়ি পড়িয়াছিলেন, আপনি কী এখানে ঘড়িতে চাবি দিয়া দিয়াছিলেন।"

"হাঁ, আমার মনে কেমন একটা খেয়াল হইয়াছিল যে এখান হইতে দম দিয়া পাঠাইলে ঘড়ি চলন্ত অবস্থায় পৌছায় অথবা কোনো সময় বন্ধ হয় তাহা পরীক্ষা করিব, সেইজন্য আমি ঠিক দশটার সময় দম দিয়া দিই, এবং দাদাকেও ঘড়ি চলিতেছে অথবা কয়টা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলাম।"

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেখরবাবু, আপনি বোধহয় ঝির উপরেই সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু আমি ঝির ও তাহার আত্মীয়গণ কলকাতায় যে যেখানে আছে তাহাদের এমনভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি যে, তাহারা চুরি করলে নিশ্চয় ধরা পড়িত।"

হরিবাবু বলিলেন, "আমারও মনে হয় না যে বামা চুরি করিয়াছে। সে আমাদের অতি বিশ্বাসী ঝি। বিশেষত পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহাই সে জানিত না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "অবশ্য আপনি কাহাকেও বলিয়া দেন নাই যে পার্শেলের ভিতর ঘড়ি পাঠাইতেছেন, কিন্তু পার্শেলের ভিতর একটা চলন্ত ঘড়ি পাঠাইলে, যাহার হাতে পড়ে সেকী আর বুঝিতে পারে না?"

"ঘড়িটা প্যাক করার পর ওকথা আমার মনে হইয়াছিল, সেই জন্য পাঠাইবার আগে কানের নিকট ধরিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম কিছুই শুনা যায় না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "ঘড়ির শব্দ অনেক সময় কানে শোনা অপেক্ষা স্পর্শের দ্বারা বেশি বুঝা যায়। আপনি যদি পার্শেলটা চারিদিকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে কোনো না কোনো অবস্থায় ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইতেন। এই দেখুন, এই ঘড়িটার উপর এই ছড়িখানি ছোঁয়াইয়া রাখিলাম অন্য দিকটা আপনি দাঁতে করিয়া ধরুন। শব্দ পাইতেছেন?"

হরিবাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তাহার পর দাঁতের ছড়িটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে আগে বলি নাই, ছড়ির সঙ্গে আমি একটা থার্মোমিটাবও পাঠাইয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে তো এ বিষয়ে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে থার্মোমিটারের খাপের একদিক ঘড়িতে ও অন্যদিকে টিনের কৌটার গায়ে লাগিয়াছিল, সেই দিকে হয়ত হঠাৎ চোরের হাত পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই সে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই সব প্রমাণে বরের উপরেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু বামা ঘড়ি পাওয়ার ১৫ মিনিট পরেই পোস্টাফিসে দিয়া আসিয়াছে এ খবর আমি ঠিক জানিতে পারিয়াছি। যদিও ঘড়ি ডাকে দিতে যাইবার সময় তাহার ভাইপোর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তথাপি তাহাব দ্বারা এ কাজ হয় নাই সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তবে কাহার উপর সন্দেহ হয়?"

"আমার অনেকটা এইরকম বিশ্বাস হইয়াছিল, আর এখনও মনে হয় হরিবাবুই পাঠাইবার সময় একটা গোলমাল কবিয়াছেন।"

হরিবাবু ম্লান ভাবে হাসিলে, বলিলেন, "আজকাল পুলিশে যাওয়া বিষম বিড়ম্বনা। যিনি অভিযোগ করিতে যাইবেন পাকে প্রকারে তাঁহাকেই অভিযুক্ত হইতে হইবে। মহেন্দ্রবাবু যেরূপভাবে আমাদের বাড়ি খানা-তল্লাসী কবিয়াছিলেন, তাহাতে উনি যদি আমার বিশেষ বন্ধু না হইতেন তবে উহাব সঙ্গে আমার বিষম মনোবিবাদ হইত।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধেই আমাদের এইসব অসন্তোষকর কার্য করিতে হয়।"

"যে ঘড়িটি পাওয়া গিয়াছে সেটি কোথায়?" হরিবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটা দাদা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন।"

"কবে পাঠাইয়াছেন?"

"তিনি ঘড়ি পাইয়াই যখন দেখিলেন তাঁহার ঘড়ি নয়, তখন যে ট্রেনে তাঁহার চিঠি ফেলিয়াছিলেন সেই গাড়ির গার্ডের হাতে আমাব নিকট ফেরত দিবার জন্য ঘড়িটি দিয়াছিলেন। গার্ড আমাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

পোস্টাফিসে সন্ধান করে কী জানিতে পারিবেন?" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "পোস্ট অফিস থেকে চুরি যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। পোস্টমাস্টার রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট

জানিতে পারিলাম যে তিনি দুটোর সময় দার্জিলিং মেলে দিবার জন্য পার্শেল রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলেন।”

শেখরবাবু বলিলেন, “তিনি ১২টার সময়েও তো ডাক রওনা করিয়া নির্দোষ হইতে পারিতেন।”

তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বড়ো ছেলের নাম রাজকৃষ্ণ নয়?”

আমি বলিলাম, “হ্যাঁ, তিনি তো পোস্টাফিসে কাজ করেন।”

শেখরবাবু ভাবিতে ভাবিতে ঘড়িটির চারিদিক মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে একটু চিন্তিতভাবে হরিবাবুকে বলিলেন, “আপনার ঘড়িটি ফেরৎ পাইলেই আপনি বোধহয় সন্তুষ্ট হন। চোরকে ক্ষমা করিতে বোধহয় আপনার আপত্তি নাই। কারণ যে চুরি করিয়াছে তাহার বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহাকে জেলে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।”

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়োই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। চোর ধরা না পড়িলে ঘড়িটি কী করিয়া পাইবেন বুঝিতে পারিতেছি না, আর আপনি কোনো অনুসন্ধান না করিয়া এ সমস্ত কথা কী প্রকারে জানিলেন!

শেখরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “এই ঘড়িটাই চোরকে দেখাইয়া দিতেছে।”

মহেন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া ব্যগ্র-ভাবে ঘড়িটি হাতে লইলেন ও খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

“ঘড়ির উপর কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে এবং ঘড়ির রিংয়ে একটু সুতা বাঁধা আছে দেখতে পাচ্ছি, চিহ্নের মধ্যে তো এই!”

শেখরবাবু বলিলেন, “উপরের দাগ কিছুই নয়, ঘড়ির সঙ্গে এক পকেটে টাকা কী অন্য রকম পদার্থ ছিল দাগ দেখিয়া তাহাই বুঝা যায়। বরং ঘড়ির ভিতরে যেখানে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয় সেখানে যে দাগ পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে ঘড়ির অধিকারীর মদের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। মাতালদের হাত কাঁপে বলিয়া চাবি দিবার সময় ঘড়িতে এইরূপ দাগ হয়। তবে রিংয়ে যে সূত্র আছে সেটিও একটি সূত্র বটে, কিন্তু সর্বপ্রধান সূত্র এখনও আপনি ধরিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পোস্টমাস্টার বাবুকে কাল চারিটার সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঘড়ির সম্বন্ধে মীমাংসা করিব। আপনাদের কাহারও তাঁহার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।”

॥ ৩ ॥

পরদিন বেলা ৪টার সময় পোস্টমাস্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখরবাবুর সদাপ্রসন্ন মুখখানি আজ একটু বিমর্ষ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণবাবুকে বাড়ির সংবাদ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পকেটে হাত দিয়া যেন আশ্চর্য ভাবে বলিলেন, “আমার ঘড়িটা কোথায় গেল?” তারপর রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, “আপনার ঘড়িটি দিন তো সময়টা দেখি।” রাজকৃষ্ণ বাবু ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটা একটা কাল রং-এর কারে বাঁধা ছিল। শেখরবাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়া কারের গিরা বাঁধা জোড়ার জায়গাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, “আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কলকাতায় আসিয়া ও নতুন চাকরিতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়োই দুঃখিত হইয়াছি। একথা নিশ্চয় জানিবেন যে, পাপ কখনও লুকানো থাকে না। আমাদের কর্তব্য আপনাকে রাজদ্বারে

সমর্পণ করা, কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশ সংশোধিত হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণ বাবুর ঘড়িটা অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দেবেন।"

পোস্টমাস্টার বাবু ইতস্তত করিতে লাগিলেন, একটু পরে বলিলেন, "আপনারা যে কেন আমাকে এরূপ বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। এই ঘড়িতে যে রেশমটুকু বাঁধা আছে সেটা ওইকারের, আর ঘড়ি পাঠাইবার সময় তাড়াতাড়িতে আপনি খুলিতে না পারিয়া কারটি কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর দেখুন, ফণিবাবু যে ঘড়ি পাঠাইয়াছেন সেটি তখন চলিতেছিল, চলন্ত অবস্থাতেই তিনি ফেরৎ পাঠান, এখানে আসিয়া একটা বাজিয়া ঘড়িটি বন্ধ হয়, কাল আমি ঘড়িটিতে চাবি দিয়া দেখিয়াছি ঘড়িটি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় রাখে। অতএব একটার সময় ঘড়িটির চাবি দেওয়া হইয়াছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন পোস্টাফিসের খাতাপত্রে প্রকাশ এবং আপনিও স্বীকার করিয়াছেন ঘড়ি দুটা পর্যন্ত আপনার কাছেই ছিল, তাহার পর তাহা মেলে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি একটার সময় ঘড়িটি চাবি দিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রমাণ যে কোনো আদালতে আপনাকে দোষী করিবে তাহা বুঝি এখন বুঝিয়াছেন।"

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্র এবং হরিবাবু উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "শেখরবাবু ব্যাপার কী? সেই অল্পবয়স্ক চোর ও চোরাই ঘড়ির কোনো সন্ধান পাইয়াছেন নাকি?"

শেখরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চোরটির সন্ধান আপাতত দিতে পারিতেছি না, ঘড়িটির সন্ধান পকেটেই আছে"—বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন।

মাতৃহীনা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ছোটোবেলা থেকে আমার মা নেই। লোকে আমায় বলত 'মা-খেকো',—মানুষের এত বড়ো দুর্ভাগ্যের উপর এতখানি নির্ম্মম উপহাস মানুষ যে কেমন করে করে, আমি ত তা ভেবে পাই না। এই মায়ের অভাবে যে কী বোধ হয় আমার মতো আর কেউ তা কখনো অনুভব করত না, অথচ আমিই ছিলেম আমার ভাগ্যের জন্যে দায়ী। বাবা আমার মা-বাপ দুই-এর অভাবই পূর্ণ করেছিলেন। আমার আদর-আব্দারের অন্ত ছিল না। লোকে বিরক্ত হত, —'মাওড়া' মেয়ের অত কেন? বাবা হাসতেন, বলতেন, "আহা, করুক! সে থাকলে তাই সইত—না হয় আমিও সইলেম।" তবু যত বড়ো হচ্ছিলেম, আমার মনের অভাব ততই বেড়ে উঠছিল। কিছুতে যেন সুখ পেতেম না। খেলার সাথীরা যখন "মা" বলে ডাকত, আমার মন তখন তৃষিত হয়ে উঠত, ওই ডাকটির জন্যে! মা! মা! মা! কী মিষ্টি এই নামটি! আমার কেবল কান্না পেত। রাগ হত, কেন আমার মা নেই! মা-ডাকের কিছু অভাব পূর্ণ করবার জন্যে আমার জেঠিমা কী খুড়িমা কেউ ছিলেন না। আমার শুক্‌নো বুকের ভিতরটা যেন তাই থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠত। যশোদা আমায় মানুষ করেছিল—তবে আমি মা বলে ডাকতে শুরু করায় সে বাধা দিলে, "ছি দিদিমণি, যাকে-তাকে কী মা বলতে আছে! বিয়ে হোক, রাঙ্গা শাশুড়ি হোক, তাকে মা বলে ডাকবে।" সেই দিনটি থেকে বিয়ের জন্য মনে-মনে বড়োই সাধ জন্মাল। বিয়ে জিনিসটা যে কী, তা তখন ভালো করে জানতুম না। তার সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখার সে বয়সও নয়। বিয়ের প্রধান যা স্বামী তাঁর কথা তখন জানতেমও না, ভাবতেনও না—কেবল জানতেম, বিয়ের সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা যৌতুক আমার পাওনা আছে—সে মা!

ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল। সংসারের সঙ্গে ছোটোখাটো পরিচয়ও আরম্ভ হল—তবু আমার মানসের মানসী প্রতিমাকে, আমার ভবিষ্যৎ শাশুড়িকে আমি এতটুকু মলিন হতে দিলেম না। খুব উজ্জ্বল রঙে-রাঙতায় মুড়ে মাকে আমার দুর্গাপূজার প্রতিমার মতোই আমার বুকের ভিতর আমি পূজা করতেম। শাশুড়ি সম্বন্ধে কেউ আমায় ঠাট্টা করে কোনো অন্যায় কথা বললে আমি তা সইতে পারতেম না। মুখরার মতো তখনি ঝগড়া বাধিয়ে দিতেম লোকে বলত, "দেখ, দেখ! রানুর এখন থেকেই শাশুড়ির উপর কত দরদ—ওরে, অত ভক্তি করিস নে রে— শেষে রাখতে পারবি নে।"

বারো উত্তীর্ণ হয়ে তেরোয় পা দিতেই আমার জন্য পাত্র খোঁজা শুরু হল। আমি বাবার বড়ো আদরের ছোটো মেয়ে, তাই আমার জন্যে একটু বিশেষ করেই যাচাই-বাছাই চলছিল। বাবার মনের মতো আর হয় না। শেষে তাঁর পছন্দ-মতো একটি পাত্র মিলে গেল। কলকাতায় বাড়ি৷ন বেশ সচ্চরিত্র। একশো টাকা মাহিনার চাকরি করেন। ঘরে ভাতকাপড়ের অভাব নাই, অবস্থা ভালো। চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা আছে। বিধবার একমাত্র সন্তান। এইখানটায় বাবার

মন একটু খুঁত খুঁত করছিল। আমারও যে না হয়েছিল এমন নয়,—আমার এতদিনের এত সাধের দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়ে গেল। তা হোক মনের ভিতরকার যে মনোময়ী মা—তাঁর সাজের বদলে কিছু এসে যায় না। তবে অনেক দিনের ঘসা-মাজা নাড়া-চাড়ায় যে উজ্জ্বল মূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁকে নিজের হাতে নিরাভরণা করতে মনে একটা ব্যাথাও লাগল। মনকে প্রবোধ দিলেম, নসুর মা ত বিধবা, কাঞ্চনের মাও ত তাই! কী আর হবে তায়, তবু মা ত। বাবা একদিন কাছে ডেকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "রানু, এবার বাবা ছেড়ে মার কাছে যাচ্ছিস। মা পেয়ে বাবাকে ভুলে যাবি নে ত রে?" আমি বাবার কোলে মাথা রেখে বললেম, "না বাবা, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারব না—কিছুতেই না।" বাবার আমার মনের ভাব তখন অম্‌নি ধারাই ছিল বটে, তবে তার মধ্যে ওই যে বাবা মিষ্টি করে বললেন, "মা পাচ্ছিস"—এই কথাটি আমার কানে এমন মধুর সুরে বেজে উঠল যে তেমন মধুর কোনো শব্দ বুঝি আমার কান দুটো কখনো শোনেনি। ওগো, সত্যই হবে এবার আমি মা পাবো। মা ডাকের সাধ আমার এ-জন্মে পূর্ণ হবে তাহলে।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথায় বর্ণনার কিছু নাই। অধিকাংশ বাঙালি গৃহস্থঘরে মেয়ের বিয়ে যেমনভাবে হয়, আমার বেলাতেও কোনোদিকে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। সেই আত্মীয়কুটুম্বের সমাগম, গহনা কাপড় আলো বাজনা, ফুলের মালা, ছাপানো কবিতা— আপ্যায়নের সহিত একখানি অপরিচিত সুন্দর মুখ শুভদৃষ্টির মধুর মিলন,—সবই তাই। তাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, কিছু তফাৎ ছিল। সেই সুন্দর মুখের যিনি অধিকারী, তিনি আজ মন্ত্র পড়ে আমায় নিজের বলে গ্রহণ করে তাঁর মাকে 'মা' বলবার পূর্ণ অধিকার আমায় দিয়েছিলেন। আর তাঁর সেই মহৎ দানের বিনিময়ে আমি আমার তের বছর বয়সের কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি ভক্তিভরে তাঁর পায়ে ঢেলে দিলেম। মাতৃহীনাকে যিনি মা দিলেন, তাঁকে অদেয় কিছু থাকে কী! ভালো করে এসব মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা তখন মনে মনেও করতে পারিনি, তবে মনের নদীতে যেন এমনি ভাবেরই একটা আলোড়ন উঠেছিল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এলেম; বাবাকে ছেড়ে ভাইদের ছেড়ে এই আমার প্রথম বাইরের সংসারে পা ফেলা। তাই ভয়ে ভাবনায় চোখে জল ঝরছিল। তবু একটা নূতন আশায় মনের ভিতরটা থেকে থেকে, যেন আনন্দে দুলে-দুলেও উঠছিল,—মাকে দেখতে পাব!

আমাদের গাড়ি এসে দোরে দাঁড়াতেই, শাঁখ বেজে উঠল। একজন গহনাপরা মোটা সোটা আধবয়সী স্ত্রীলোক আমায় নামিয়ে নিতে এলেন। বয়স আমার তেরো হলে কী হয়, দেখলে লোকে ষোলোর কম বলত না। যিনি নামিয়ে নিতে এসেছিলেন, তিনি খুড়শাশুড়ি। হাত ধরে নামাতে হল। আমি তৃষিত চোখে চেয়ে রইলেম, লোকে আমায় বেহায়া বলবে কিনা, সে উপদেশ মনেও ছিল না। শুনেছিলেম শাশুড়ি বিধবা, তাই তাঁকে চিনে নিতে দেরি হল না। স্বামীর মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের অনেকখানি মিল। ছোটোখাটো, গৌরবর্ণ আধাবয়সী। চেহারাখানি দেখলেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাকতে মনে কুণ্ঠা আসে না। খুড়-শাশুড়ি বললেন, "দিদি, বউমার মুখে সন্দেশ দাও। সোনার জলে মা লক্ষ্মীর মুখ দেখো ভাই! সোনার চাঁদের বউকে যেন সোনার চোখে দেখতে পার।" শাশুড়ি গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমরা দেখ ছোটো বউ,—মিথ্যের মুখোস পরা আমার কর্ম নয়।" চারদিকের লোকজনদের বিস্মিত লজ্জিত মুখের পানে চেয়ে না দেখেই তিনি তখনকার কোনো দরকারি কাজে চলে গেলেন। স্বামী আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। আমি ছেলেমানুষ, তাঁর হেয়ালি কথার অর্থ না বুঝে খুশি হয়ে দুধে-আলতায় এসে দাঁড়ালেম। এমন করে আমার নবজীবনের অভ্যর্থনা হয়ে গেল।

বিয়ের পর যে কয়দিন সেখানে রইলেম গোলমালেই দিন কেটে গেল। মা বলে ডাকবার মতো এতটুকু অবসরও শাশুড়ি আমায় পেতে দিলেন না। দিন-রাতই এমন তাঁর কাজ, আর কাজ!

খাওয়ানো দেখা-শোনা ঘরগুছোন পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই সবেতেই এমন ব্যস্ত হয়ে থাকতেন তিনি, যে আমার কাছে, আসবার কী বসবার তাঁর সময় হতো না। শুনতে পেলেম একদিন মাস্-শাশুড়ি শাশুড়িকে বলছেন, "পদ্ম, তোর বউ-ভাগ্যি ভালোই হবে, মেয়ে বড়ো সুবোধ! মা কী কচ্চেন, মার খাওয়া হয়েছে কিনা, পিসিদের কাছে খবর নেয়। আহা, ছোটোবেলায় মা মরা। ও তোকে মা বলে নিতে পারবে।" শাশুড়ি দালানে বসে লুচির ময়দা মাখছিলেন, আমি যে ঘরের এক কোণে বসেছিলেম, তা বোধ হয় ওঁরা জানতেন না।

শাশুড়ি বললেন, "তা যদি হতো দিদি, তা হলে মানুষের পেটে ভগবান সন্তান দিতেন না, গাছপালাতেই ফলাতেন। তুমিও যেমন পাগল।" বাকি কথা শোনা গেল না। যেটুকু গেল তার অর্থও যে ভালো করে বুঝলুম না, তা নয়। তবু তাঁর বিরক্ত বিরস কণ্ঠস্বর আমার বালিকা-চিত্তেও একটা আঘাতের দোলা দিয়ে গেল। মনে হল, আমি ওঁকে খুশি করতে পারিনি। কী উনি আমার কাছে চেয়েছিলেন? কী কল্লে ওঁকে আমি খুশি করতে পারি? আমায় যদি বুঝিয়ে দেন, বলে দেন, প্রাণপণেই যে আমি তা করতে রাজি আছি।

বছরখানেক পরে শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে এলেম। বাবা সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। শাশুড়ি সবাইকে ডেকে দেখালেন। কুটুম্বের সুখ্যাতি কল্লেন—আমার সম্বন্ধে তাঁর একই ভাব। আমায় তিনি মা বলে ডাকতে দিলেন না। প্রথম প্রথম আমি তাঁর মানা না মেনে মা বলেই ডাকতেম। তিনি যেন শুনতে বা বুঝতে পারেননি, এমনিভাবেই থাকতেন, উত্তর দিতেন না। কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলে না, একদিন স্পষ্ট করেই তা বুঝিয়ে দিলেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "গুরুজনের কথা মানো না, বাপেও ভালো শিক্ষা দেয়নি। আমার বাছা স্পষ্ট কথা, মিথ্যে আমি বলতে পারি না, সইতেও পারি না। মুখে যতই মা-মা করো, মনে-মনে তুমিও জানো আমিও জানি, সত্যি ত তা নয়। সেজন্যে কেউ তোমায় দুষবেও না। তখনকার লোকে ঠাকুর-ঠাকরুণ বলত—মিথ্যের উপর ঘেন্না ছিল কি না!—এখন যত ফাঁকি তত ঢং। মা-মা আমায় করো না।" তর্ক করবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি আমার ছিল না। সাহস বা শক্তির অভাব আরও বেশি। অগত্যা চুপ করে আদেশ পালন করাই সহজ পথ। তা ছাড়া সত্য কথাই আমি বলব। এরপর মা-ডাকের লোভও আমার কমে গিয়েছিল। তৃষ্ণা শুধু শীতল জলেই মেটে এমন নয়, অভাবেও মিটে থাকে!

শাশুড়ি লোক মন্দ ছিলেন না। পাড়া-প্রতিবেশি তাঁর সুখ্যাতি করত। এমন পরোপকারী মানুষ হয় না। দাসী-চাকররাও খুশি ছিল তাঁর মিষ্টি কথা আর খাওয়ানোর যত্নে। ছেলেদের প্রতি ভালোবাসার তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁর স্নানের জল গরম থেকে জামা-ব্রশের পর্যন্ত তিনি তদারক করতেন, কেবল যত অপরাধ কী এই অধম আমার! মিথ্যা বলব না, তিনি আমার খাওয়া-পরার কোনো দুঃখ রাখতেন না। তাঁতিনী এলে "করোনেশান" "ইয়ারোপ্লেন" প্রভৃতি নামজাদা পাড়ের শাড়ি কিনে দিতেন। সেমিজ ব্লাউজওলা এসেও এমনি ফিরে যেত না। কিন্তু মানুষ কী শুধু খাওয়া-পরারই কাঙাল। পাখিকে খাঁচায় পুরে ক্রমাগত ছোলা মটর আর ভালো ভালো ফল খেতে দেওয়া যায়, তাতে তার মনের অভাব কী মেটে? আমার কতদিনের কত যত্নে নিজের হাতে গড়া সাধের অট্টালিকা যে ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেল, সে খবর ত কেউ নিলেন না। ছেলেবেলার আশা-ভরা প্রাণ নিয়ে মা বলে যাঁর কাছে এলেম, তিনি আমায় মাতৃস্নেহে কাছে ত টেনে নিলেনই না বরং অপরাধিনী করে পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিলেন! মা আমায় আদর করে একদিনও কাছে ডাকেননি। "বউমা' বলেও ডাকতেন না। আমার উপর ভালোবাসার এতটুকু বুদবুদও সে স্থির জলে কখনো ভাসতে দেখিনি। যা তিনি দিতেন না তা আমার কাছেও চাইতেন না; বরং সেধে দিতে গেলে বিরক্তই হতেন, রাগ করতেন। বাড়ির পাঁচজনের মতো আমিও একজন থাকি। খাই পরি, ইচ্ছা হলে চুল বাঁধি, কাজ করি, ইচ্ছা না হয় করিও না। এ সবে নিষেধও নাই, অনুরোধও

নাই। ছিল কেবল এক জায়গায়। সে তাঁর ছেলের বিষয়ে। ছেলের খাবার করা, ছেলেকে খেতে দেওয়া—এসব তিনি নিজের হাতে করতেন। কাকেও তাতে ভাগ নিতে দিতেন না। মা আমায় যে চোখেই দেখুন, আমি যে তাঁকে সেই প্রথম যেদিন সবুজ বেনারসী শাড়ির আঁচলে গ্রন্থিবাঁধা তাঁর ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে মনে মনে বলেছিলেম, "তুমি আমার মা, আমার চিরদিনের মা, আমার ক্ষুধিত তাপিত চিত্তের বেদনাহারা অমৃত-ভরা সুখের উৎস মা—" সে কথা ত আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। তাঁর হাতে পাওয়া অবিচারের আঘাত খেয়ে-খেয়ে মন আমার এখন আর তেমন করে সাড়া দেয় না, তবু কর্তব্যের কাছে তিনি এখন যে আমার মা, আর চিরদিনই সেই মা-ই থাকবেন।

স্বামী আমায় ভালোবাসতেন, আদর-যত্ন করতেন। তবু তিনিও ত মায়ের ছেলে, বাইরেব উচ্ছ্বাসটা তাঁর একেবারেই ছিল না। কতখানি গভীর জলে তরঙ্গ ওঠে, আর কোনখানে ওঠে না, এ-সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খবর ত রাখতেম না, তাই নিজেকে বড়ো একা বড়ো অসহায় বলে মনে হতো! মাকে তিনি ভালোবাসতেন ভগবানের প্রতিভূ রূপে, তাই মার মনে পাছে ব্যথা লাগে সর্বদাই ছিল তাঁর এই ভয়। আমার সম্বন্ধেও তাই এত সঙ্কোচ সাবধানতা। বুঝতুম সব, আবার এও বুঝতুম না মা যে শুধু তাঁর একলারই মা-- আমার যে তিনি সব হয়েও কেউ নন।

এমনি করেই তিন-চার বছর কেটে গেল। অসিত আমার কোলে এল। শাশুড়ি এবার ডাকার দায়ে অব্যাহতি পেলেন। "অসির মা" বলেই আমার পরিচয় হল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। তা-বড়ো সংসারে একান্ত অসহায় আমার সহায় হল, সঙ্গী হল, আনন্দ আশা সবই হল—আমার এতটুকু ছেলে অসিত! তোমরা শুনে হাসচ, ভাবচ, এসব কবিত্বের কথা। আসলে সত্যিই তাই, — তবু মানুষ যে মানুষ। শুধু সংসারে সংগ্রাম করেই সে বেঁচে থাকতে পারেনা, মাঝে মাঝে শান্তিরও তার দরকার হয়। বাইরের অভাব যাই থাক্, মনের অভাব মন নিয়েই মেটাতে সাধ যায়-- হয়তো কারও মেটে, কারও মেটে না।

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে এখন আমার মনের নদীতে ভাঁটা পড়ে এসেছে। আমি যে মাতৃহীন, এ অভাব আর আমার মনের কোণেও উঁকি মারে না। মনে হয়, জন্মজন্মান্তর ধরে এমনি করে ঝরা ফুলের মতো প্রকৃতির কোলেই আমি পড়েছিলাম। সংসারের লেনদেন নিয়েই আমার কারবার। তিন ছেলের পর দুই মেয়ে হওয়ায় মা তাদের নাম রেখেছিলেন--সাধনা আর আরাধনা। নাতি-নাতনিরা ছিল তাঁর গলার হার। তারা এক মুহূর্ত চোখের আড় হলে তিনি সংসার অন্ধকার দেখতেন। তাদের নাওয়ান তেল- মাখান চুল-আঁচড়ান সব তিনি নিজেব হাতে করে দিতেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দেখে নূতন করে হেজলীন-পাউডার ব্লুম রিবনের ব্যবহার শিখলেন। নৈলে তাঁর নাতি-নাতনিদের লোকে যদি তারিফ না করে। তারা যা-কিছু করে মার চোখে তাই ভালো, তাই অদ্ভুত। তাদের বাহাদুরি আর গুণপণার ইতিহাস শুনে-শুনে বাড়ির লোকের ত কান ঝালাপালা হয়ে উঠত। মার কিন্তু বলে আশ মিট্‌তনা —সন্ধ্যার পর জপের মালা হাতে মাদুর পেতে মা তাঁর নাতি-নাতনিদের নিয়ে গল্প শোনাতে বসতেন। সে এক রূপকথার রাজ্য। কোথায় কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র—নদীর ভিতর সাতমহলা বাড়ির ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা, সাতভাই চম্পার আদরিণী বোন পারুলবালা, আরও যে কত দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনি—মা শুনিয়ে যেতেন, সে সব শুনতে শুনতে এই এত বয়সেও পাশের ঘরে অন্ধকার বিছানার মধ্যে ছোটো খুকিকে বুকে চেপে ধরে আমার ব্যাকুল মন কে জানে কী অতৃপ্ত বেদনার ভারে লুটিয়ে পড়তে থাকত। মনে হত সুধা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জন্মভরে কেবল তৃষ্ণা সয়েই কাটিয়ে দিলেম!

একদিন পাড়ার এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসে মাকে বললেম, "অসির বিয়ে খুব

ছোটোবেলায় দিতে হবে। ওদের মতো অম্‌নি একটি টুকটুকে ছোট্ট বউ আমায় এনে দিয়ো কিন্তু।" মা বললেন, 'দুর্গা! না বাছা, আমি বেঁচে থাকতে তোমরা অসির বিয়ে দিয়ো না। যে দুঃখ আমি পেলুম তা আমি তোমায় দেব না।" শুনলে একবার কথার শ্রী! মুখে একটা তীব্র উত্তর এসেছিল, কষ্টে জিহ্বাকে সংযত করে নিলেম, তবু ব্যথার উপ অস্ত্রচ্ছেদের মতো—বেদনার মধ্যে আনন্দের আভাসও বুঝি একটুখানি পেয়েছিলেম। যে দুঃখ উনি পেলেন আমায় তা দিতে চান না। তবু এতটুকু অন্তরের টান আমার উপর ওঁর আছে। এক একসময় মনে হয় — আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন ছুটি পেলেই হয় — উনি খুশি হন। ঠিক বুঝতে পারি না। একদিনের কথা বলি। পুরোনো ঠাকুর বাড়ি গেছে, — মা ঠাকুর-ঘরে, স্বামী খেতে বসেছেন। আমি সামনের দালানে বসে পান সাজছি। অসিত স্কুলে যাবে, ভাতের জন্যে ঠাকুরকে তাড়া দিচ্ছে। স্বামী খেতে খেতে নুন চাইলেন। ঠাকুর খোকার ভাত বাড়ছিল, আমায় বললে, "বহুমা, বাবুকো জারা নুন দেনত।" এ নূতন লোক, এ-বাড়ির অলি-গলির সব সন্ধান ত জানত না! উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখলেম, নুনের জন্যে উনি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন—দেবে অখন ভেবে নিশ্চিন্তে হতে পারলেম না, পান ফেলে ওঠে এসে একটু নুন এনে পাতে দিলেম। লিখতে যতখানি সময় গেল, কাজে হয়ত এতটা সময় যায়নি। আমরা যে সেবিকার জাত। সেবা করাই যে আমাদের পরম ধর্ম বলে চিরদিন শিখে এসেছি। ওর খাওয়া হচ্ছে না, সেইটেই আগে মনে হল, পাতে নুন দিয়ে সরে এলেম! স্বামী মুখ নীচু করে খাচ্ছিলেন। মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আমেজ ফুটেছে কি না ফুটেছে হঠাৎ শাশুড়ির কণ্ঠস্বর কানে এলো, "এই যে খাবার কাছে সবাই আছে। আমার যেমন পাপের মন, নুন চাইলি শুনে তাড়াতাড়ি জপ ছেড়ে উঠে এলেম।" স্বামী বললেন, "কেন তুমি উঠে এলে মা—ওরা ত সব রয়েছে, যে হয় দিত।" মা বললেন, "আর আসব না বাছা, এবার থেকে ওরাই খাওয়াবে। বুঝতে পারিনি, অন্যায় করেচি।" শাশুড়ি সেখানে আর একটুও দাঁড়ালেন না, অপেক্ষাকৃত জোরে জোরে পা ফেলে আবার পূজার ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত জপের সূত্র ফের খুঁজে পেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁর ছেলের পাতের নুন যে নিজের স্বাদ হারিয়ে তিত হয়ে গেছল, সে আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেম। তারপর থেকে শাশুড়ি আর একদিনও তাঁকে হাতে তুলে কিছু খেতে দেননি! প্রথম কিছুদিন খাবার সময় কাছেও আসতেন না, ছেলের অনুনয়-বিনয় কান্নাকাটি রাগারাগিতে শেষে মা এসে বসতেন, কিন্তু নিজের হাতে পাতে কিছু তুলে দিতেন না। স্বামীর শিক্ষামতো আমি সে সময় সেদিকেই থাকতেম না। ঠাকুরকে সব জিনিস ছুঁতে দেওয়া হতো না, তবু হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও শাশুড়ি তাঁর জেদ বজায় রেখেছিলেন। তিনি জপের মালা হাতে নিয়ে এসে বসতেন; কাজেই নিজে কিছু পারতেন না, নন্দ আমার মেজ ছেলে, একদিন পাতে দই দিতে গিয়ে সবটুকু দই মেঝেতে উল্টে ফেলে দিল। স্বামী রাগ করে বললেন, "দই আমি আর খাব না। আমার জন্য দই আর পেতোনা মা—দই আমি আর খাব না।" মা শান্ত মুখে জবাব দিলেন—"না খাস্ ত পাতব কেন।" এই দই খাওয়াটি যে মা ও ছেলের চিরদিনের অভ্যাস! ছেলের যদিই চলে মার যে চলে না, তা স্বামীও জানতেন। অর্ধেকগুলি ভাত তিনি এই 'দই দিয়েই খেয়ে থাকেন। স্বামী দই ছেড়ে দেওয়ায় শাশুড়িও আর দই স্পর্শ করতেন না। আমার মুখে মার খাওয়া হচ্ছে না খবর পেয়ে উনি সেধেই বললেন, 'দই দেওয়া ছেড়ে দিলে মা — জানো, শেষ-পাতে দই না হলে আমার খাওয়াই হয় না।" মা যে তা ভালোই জানতেন, সে তাঁর কদিনের ব্যথাকাতুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেদিনের রাগ তাঁর অনেক আগেই পড়ে গেছল। ছেলের খাবার কষ্ট তিনি সইতে পারছিলেন না, এখন কেবল জেদের মামলা চলছিল। ছেলের উপর ভালোবাসার ত তাঁর অভাব ছিল না। কেবল সে ভালোবাসার উপর শনিগ্রহরূপিণী এই আমার আবির্ভাবই তাঁর স্নেহ-রাজ্যে বিপ্লব বাধিয়ে ছিল বই ত নয়।

সেদিন মেয়ে আবদার ধল্লে—সন্ধেবেলা গা ধোবে। অনেক করে "মা আমার, — মামণি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলে ভুলিয়ে আমসত্ত্বর লোভ দেখিয়ে তবে ছাড়ান পেলেম। মেয়ে চলে গেলে মা দালান থেকে বললেন, "দুধের সাধ কী ঘোলে মেটে! — সোনা যে পেলে না, তার গিল্টি পরা কেন? মা ত দেখনি, অসির মা, তাই যাকে-তাকে মা ডাকতে তোমার লজ্জা করে না।" মনে হল বলি, ভগবান দেননি, মানুষেও দিলে না— কাজেই ঘোলে স্বাদ মেটাচ্চি, তবু চিত্রগুপ্তের দরবারে গিয়ে বলব যে গব্যরসের স্বাদ পেয়েচি কখনো —থাক্ — কাজ কী আর তর্ক করে!

এইবার আমার সকল অপরাধের চরম শাস্তি হয়ে গেছে। মা আজ কাশীবাসিনী— এটা তাঁর ধর্মোন্নতির জন্যে, তাঁর স্বেচ্ছার ফল নয়। এ আমার অপরাধের দণ্ড। কী আমি করেছিলেম—সেই কথাই বলব!

সেদিন, যেদিনকার ঘটনা আমার জীবন-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেদিন সকালবেলা মেজ পিশ্ শাশুড়ির ছেলে অপূর্ব আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এলো। — লবঙ্গর "সাধ", এখনি যেতে হবে। সে আমাদের নিয়ে যাবে। ছেলেরা ত সব নাচতে শুরু করে দিলে। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে হবে। স্বামী বললেন, "বেশ ত, কাল থেকে সেখানে বাগান দেখে সন্ধ্যার সময় সব ফিরলেই হবে।" মা তাঁর নাতি-নাতনিদের সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি হলেন। আমাকেও যাবার কথা বলছিলেন। কিন্তু ছোটো খুকির রাত থেকে জ্বর হয়েছে বলে আমি যেতে চাইলেন মা। মাও বললেন, "থাক্—কর্মবাড়িতে অনিয়ম হবে, কাজ নেই। বরং বিপিন বাবুকে ডেকে একবার ভালো করে দেখাও, সর্দিও রয়েছে, ভালো নয়।" মা চলে গেলেন। আমার মনটা ভার হয়ে রইল। গেলাম না খুকির অসুখের দোহাই দিয়ে -- মাও তাই বুঝে গেলেন, — কিন্তু ওগো আমার অন্তরবাসী অন্তর্যামী, তুমি ত জান আমার মনের কথা — যে পাপের সলুই আমার মনের ভিতর জন্মেছিল, সে যে সাপ হয়েই শেষে আমায় দংশাবে — তা কী আমি জানতে পেরেছিলেম। মাতৃ- গর্বকে আমি মিথ্যা দিয়ে বাড়াব না। খুকির জন্য সত্যই আমার মনে ভাবনা হয়নি— হয়েছিল দুর্জয় অভিমান। নইলে বাঙালি গৃহের অন্তঃপুরবদ্ধা কুলনারী আমি, উৎসব-গৃহের স্বজন-মিলন আনন্দ উৎসবের লোভ কী আমার মনেও জাগেনি? জেগেছিল বই কি! তবু যে গেলেম না — সে কেবল জব্দ করতে। তাঁর আদুরে নাতি-নাতনিদের জন্যেও আমার অভাব লাগে কি না, মা দেখুন। তাছাড়া সেখানে সবাই জিজ্ঞাসা করবে, কিগো শাশুড়ি এখন বউ বলে ডাকে? মা বলতে দেয় ত? কাজ নেই আমার এত কৈফিয়ৎ কাটার। স্বামী ভাত খেতে বসে বললেন, "আজ কোরিস্থিয়ানে "মধুর মুরলী" প্লে হচ্ছে, — যাবে? সকালবেলা পানু এসে একখানা রিজার্ভবক্সের টিকিট দিয়ে গেল। ছেলেদের হাঙ্গামা নেই— চল না — ঘুরে আসা যাক্।" মনে মনে লোভ হচ্ছিল। তবু বললেম, "খুকির অসুখ তাছাড়া মা যদি শোনেন?" স্বামী হেসে বললেন, "নাই বা বললে মাকে। বিপিনবাবু ত বলে গেলেন, খুকির এমন কিছু নয়। যশোদা রাখবে এখন ওকে, কতক্ষণেরই বা মামলা!" কথা ঠিক! কতক্ষণই বা! ও ত যশোদারই কাছে বেশি সময় থাকে। নেহাৎ কাঁদে, ফুড খাইয়ে দেবে'খন। তবু মন বলছিল কাজ নেই, মা যদি জানতে পারেন — মেয়েছেলে থিয়েটার দেখতে যাওয়া। লোভ বলছিল, এ আর এমনই কী অপরাধ। চিরদিনই কী ভয়ে চোর হয়ে থাকতে হবে। তুই ত এখন পাঁচ ছেলের মা — কোণের বউটিও নোস্। লোভ আর সংযম — শক্তি যে কার বেশি সে খবর অনেকেই জানেন, আমিও জানতেম, তবু স্রোতে ভেসে যাবার মতো মনের কাছে না জানারই ভান করেছিলেম। কিন্তু হে আমার পাষাণ ঠাকুর, তুমি যে তা ভালো করে জেনেছিলে, তাই না এ দারুণ পরীক্ষায় ফেললে। নাহলে এ মুগ্ধা কুরঙ্গিনীকে স্বামীর কণ্ঠ দিয়ে এমন আশ্বাসের মোহনবাঁশী শোনাবে কেন? তোমরা

যে মোহনবাঁশীর মধুর সুরে অবলা ব্রজের বালা লজ্জা-ভয় কুল-মান সব ভুলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে অকুলে ভেসেছিল — সে বাঁশীর সুরে না ভুলবে কে! স্বামী বললেন, "চল!" তাঁর উপর সব ভাবনার ভার সঁপে দিয়ে আমিও উঠলাম। কিন্তু এ ডাক যে অকূলের ডাক সে খবর কী তখন জানতেম?

থিয়েটারে অভিনব উপাখ্যানের সৌন্দর্য-মাধুর্য উপভোগ দূরে থাক্, ঘরের কথাই ভাবছিলেম বেশি। খুকিটা কেমন আছে? কী করছে? কাঁদবে কি না, কে জানে? মন তাই থেকে থেকে চমকে উঠছিল। "মধুর মুরলীর" নায়িকা সেজেছিল বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস গওহর। তার হাবভাব লীলাচাতুর্য অভিনব দৃশ্যাবলি লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। — আমার কিন্তু বেশি ভালো লাগছিল, ওই সঙ্গে জড়ানো অন্য উপাখ্যানের নায়ক এক মাতৃভক্তকে গল্পটির সব কথা বলবার এ সময় নয় — ভালো মনেও নেই তবু সবকিছুর মধ্যেও তার ভীষণ পরীক্ষা আমার মনেব উপর আজও ছাপ মেরে রেখেছে। বিধি রুষ্ট হওয়ায় যখন তার দুর্গতির চরম অবস্থা, এমনি সময় মার কুঁড়ে ঘরে গেল আগুন ধরে, — একমাত্র ছেলেটি গেল জলে ডুবে, সে কী তাঁর ভীষণ পরীক্ষা! কাকে রাখবে — কাকে ছাড়বে! মাতৃ-ভক্তিরই জয় হল — জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশি বছরের বুড়িকে সে কোনারকমে বার করে আনলে। আর তার তরুণকান্তি বারো বছরের ছেলে অতল জলে তলিয়ে গেল। কিন্তু না, তা গেল না — যাঁর পরীক্ষা, তিনিই যে বিচারক! তাই ছেলেকোলে ভিজে জলের ভিতর থেকে সেই শ্যামকান্তি নবজলধর ভুবনমোহন মূর্তি তাঁর ভক্তকে নিয়ে উঠলেন। আনন্দে দুচোখ হু হু করে জল ঝরছিল। স্বামীকে বললেম, 'থাক্, আর দেখব না, বাড়ি চল।" স্বামী বললেন — "জগন্নাথ-দর্শনের বদলে পুঁইশাক দেখা! বৃথা তোমায় টেনে আনলেম, চল।"

কড়া নাড়তেই ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত দিলেম। গা যে পুড়ে যাচ্ছে! ওরে বাপরে, কত জ্বর! তার উপর যশোদা যা খবর দিলে, শুনে ত আমি বসে পড়লেম। যশোদা বললে — আমরা চলে যাবার খানিক পরেই মা ফিরে এসে ছিলেন, খুকির জ্বর দেখে গেছলেন, তাই থাকতে পারেননি। আমরা থিয়েটারে গেছি শুনে ছেলোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আধ ঘণ্টা পরেই চলে গেছেন। অপূর্বই তাঁকে নিয়ে গেছে। মেলগাড়ি না কী — তাইতে না কী কাশী গেছেন। ঠাকুর — সে কথার সাক্ষী হল। মা তবে আমাদের ছেড়ে গেছেন। এত বড়ো অন্যায় কেমন করেই বা সইবেন। কাশীতে মার পিসিমা ছিলেন — নিশ্চয় মা সেইখানেই গেছেন। খুকি একটু সামলালে আমরা সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেছলেম। মা এলেন না — বলেছেন, সাধনার বিয়ের সময় আসবেন। স্বামী আসবার সময় চোখে জলে ভেসে বললেন — "একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না, মা?" মা বললেন, "একটা নয় আশু, তোর একশোটা অন্যায় আমি ক্ষমা করছি, করবও, কিন্তু তোদের সংসারের ভেতর আমায় আর টানিস নে — আমি আর পাচ্ছিলুম না। বিশ্বনাথ আমায় জুড়ুতে দিন একটু।"

মা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করতে পেরেছেন — তিনি যে ওঁর ছেলে। কিন্তু আমায়! লোকে আমায় হয়তো নিন্দা করে। শাশুড়ি আমার জন্যে তাঁর সাজানো সংসার, সঙ্গে সন্তান সব ছেড়ে আজ কাশীবাসিনী। ছেলেরা রাগ করে, আমার জন্যেই তাদের ঠাকুমা চলে গিয়েছেন। স্বামী মুখে স্পষ্ট না বলুন কিন্তু মনটা তাঁর ভার হয়েই থাকে — কেন আমি এত কালেও তাঁর মন নিতে পারলেম না — তাঁর মা ত যেমন-তেমন মা নন! সব সত্যি! কিন্তু ওগো, তোমরা সবাই আমায় বলে দিতে পার, আমি রাগ করব কার উপর? আমার মার সঙ্গে দেখা হবার শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্তটিকে —! না চির-মাতৃহীন করে যিনি আমায় এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপর?

পিঞ্জরের বাহিরে

সত্যবাণী গুপ্ত

ভাই ললিতা,

অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাই নি; আমিও তোমায় চিঠি লিখতে পারি নি। আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে; আমি অনেক রকম নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেই সমস্ত খবর তোমায় ছাড়া আর কাকেই বা বলি? তাই তোমায় সব কথা খুলে বলবার জন্যে মনটা আমার ব্যাকুল হয়েছে।

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মা, আর ছোটো ভাই-বোন দুটির অভিভাবক আমিই। এখন বুঝতে পারছি মেয়েমানুষ বাস্তবিকই অবলা। কবিরা তাদের লতার সঙ্গে তুলনা করে—সদাই দুর্বল, পর নির্ভর; একটু তাত লাগলেই আমলে নেতিয়ে পড়ে, একটু আঁচ লাগলেই মুষড়ে যায়, একটু ধাক্কা খেলেই ধুলায় লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আমি তাদের নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করি—তটের বন্ধনের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তার গতি শোভন সুন্দর; ততক্ষণই প্রাণের ও প্রাচুর্যে, আনন্দের ও সৌন্দর্যের হাস্যধারা; ততক্ষণই তার সম্মুখে অনন্তের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা; কিন্তু যেই সে কূল ছাড়িয়ে উপচে ছড়িয়ে পড়ে, অমনি সে নিজেকে তো হারায়ই, পরকেও ডোবায়,—চারিদিককার আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রাণের খেলা নষ্ট ভ্রষ্ট করে ফেলে। এমনই অক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মেছি, বিশেষত এই বাংলাদেশে। আমার মতন এমন একজন অক্ষমার ঘাড়ে একটি অসহায় সংসারের ভার ভগবান চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, পরের উপর নির্ভরের আশা ছেড়ে পরের ভর সইতে হবে!

অন্নের সন্ধানে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে। কিন্তু কোথায় অন্ন, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয়, আমি কী ছাই জানি? আমরা অন্নপূর্ণা ততক্ষণই যতক্ষণ পুরুষেরা অন্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখে। আমরা চিরকাল পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থাকি, যারা আমাদের পোষে তারা তাদের খেয়াল-মতো যখন খুশি একটু ছাতু ছোলা দুধ জল দিয়ে যায়, আর আমরা দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে শিশ দিয়ে গান করি আর গানের সমের সঙ্গে চুনকুড়ি দি। পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থেকে প্রাণটা যে হাঁপিয়ে না ওঠে এমন নয়; শিকের ফাঁকে ফাঁকে মুক্ত আকাশের নীল চোখের ইশারা আর তরুপল্লবের হাতছানি দেখে মনটা খুবই উড়ু উড়ু করে। কিন্তু কোনোদিন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও উড়তে সাহস হয় না, বুক দুরদুর করে, পাখা যেন অবশ হয়ে আসে। যিনি আমাদের খাঁচার মালিক, তিনি যদি কোনোদিন দয়া করে খাঁচার দরজা খুলে ধরে উড়ে যেতে বলেন তখন মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। ভয় হয় অত বড়ো ফাঁকা জায়গায় আমি এতটুকু ভীরু প্রাণী কোথায় পাব একটু আশ্রয়, আর কোথায় পাব ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল। অপরিচয়ে সোজা

পথটাকেও বাঁকা লাগে, নিরীহ জিনিসটাকে দেখেও ভয় লাগে, স্বাভাবিক ঘটনাকেও বিপদের সূচনা বলে আশঙ্কা হয়। তাই যদি কোনোদিন আমাদের মালিকের অভাব হয় অমনি আমরা পিঁজরের ভিতর বসে বসে ঠায় শুকিয়ে মরি, বাইরে বেরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেও পারিনে।

আমি ভাই, অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি, বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়েই আমরা সব চেয়ে বেশি ভয় লেগেছিল ওই পুরুষগুলোকে দেখে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের সঙ্গে তো আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। বাপ-খুড়োদের কোলেই আমরা জন্মাই, আর ভাই-ভাইপোদের আমরা কোলেই পাই; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের পাতাতে হয় না। পরিচয় পাতাতে হয় যে-একটি অচেনা লোকের সঙ্গে, তাকে দেখে প্রথম-প্রথম ভয় লাগলেও সে একলা বলে সাহস থাকে। কিন্তু একেবারে পুরুষের হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাদের দশাটা হয় সিংহের খাঁচার মধ্যে রোমান গ্লাডিয়েটরের মতন—যত বড়োই বীর আর সাহসী হোক, মৃত্যু তার অনিবার্য, পরাভব তাঁর জানা কথা। আমার ভারি আশ্চর্য লাগে যে সেকালের রাজকন্যারা কেমন করে স্বয়ম্বর সভায় নিজেদের বর বাছাই করতে যেত। ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত না? দাড়ি আর চৌগোঁপ্পা চুমরে চারিদিকে আমিষ-লোলুপ মার্জারের মতন অতগুলো পুরুষ প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাছাই করব কাকে? ভয়ে লজ্জায় সেদিকে তাকাতেই তো পারা যাবে না। অথচ তারা প্রত্যেক লোলুপ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই আছে। আমার তো মনে করতেই গা শিউরে ওঠে! সত্যি ভাই, পুরুষগুলো কী বিচ্ছিরি করেই যে তাকায়।

আমি শেয়ালদা স্টেশনে টিকিট বিক্রি করবার একটা চাকরি পেয়েছি। সামান্য মাইনে। রোজ তো আর গাড়ি করে আপিসে যেতে পারিনে, কাজেই ট্রামে করে আপিসে যেতে হয়। যেদিন ভাই প্রথম ট্রামে করে আপিসে যাব বলে বেরুলাম, সেদিন মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল তা অন্তর্যামীই জানেন। ফাঁসিকাঠে চড়বার সময় মানুষের মন বোধহয় এমনি করে।—পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠোঁট শুকিয়ে উঠছিল, মুখ অকারণ লজ্জায় কেমন ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে পড়ছিল, বুক দুরদুর করছিল। আমি জোর করে তো নিজেকে একরকম টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম থামবার থামের কাছে ফুটপাথের ধারে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম।

পথিক পুরুষদের মধ্যে অমনি একটা চঞ্চলতার ঢেউ জেগে উঠল। ভাগ্যিস ভগবান মাথার পেছন দিকে চোখ দেননি। সামনে পেছনে পুরুষদের বাঁদরামি লক্ষ্য করতে হলে একেবারে ক্ষেপে উঠতে হত। একদিকে যে অনেকখানি অদেখা থেকে যায় সেটা মস্ত বাঁচোয়া।

ট্রামে উঠেও কী ছাই নিস্তার আছে? আমি ট্রামের পাদানে উঠ্‌বামাত্রই ট্রামযাত্রী পুরুষগুলো অমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, আমি কোন্ কামরায় না-জানি ঢুকি।

পুরুষগুলো ভাই এমনই হাস্যকর জীব যে তাদের দেখে আমাদের গাম্ভীর্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে; তার ওপর আবার ওরা নানান রকম ভঙ্গী করে লোক হাসায় যে কেন তা বলতে পারি নে।

প্রথম নজরেই তাদের বিকট মূর্তির বিচিত্র রূপ ভারি কৌতুককর মনে হয়। কারো মুখে গোঁফদাড়ির নিবিড় জঙ্গল, তার ভেতর চোখ দুটো বনবিড়ালের মতো ওত পেতে বসে থাকে। কারো দাড়ি কামানো, শুধু গোঁফ জোড়া একজোড়া ঝাঁটার মতো মুখের দরজার মোটা কপাট জোড়ার ওপর ঝোলানো রয়েছে, যেন কুনজর না লাগে। কেউ বা দাড়িগোঁফ সমস্ত চেঁছেছুলে নির্মূল করে আমাদের মুখের অনুকরণ করতে চায়—কিন্তু চাষাড়ে চেহারা শুধু দাড়িগোঁপ কামালেই বা মোলায়েম হবে কেন? কাউকে কাউকে মন্দ দেখায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই মাকুন্দ মতন বিশ্রী লাগে। কারুর বা দাড়িগোঁফ দুই ছাঁটিয়া মাফিকসই করিয়া রাখা—তাদের তত মন্দ লাগে না। পুরুষ বেচারারা দাড়িগোঁফগুলো নিয়ে যেন মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে, ঠিক করেই উঠতে পারছে না জঙ্গলমহল রাখবে, ছাঁটবে, না কাটবে।

তারপরে মাথার টেড়িরই বা কত রকম রূপ। তোলা, লতানো, ঢেউখেলানো, কোঁকড়ানো; সিঁথি মাঝে, ডাহিন দিকে, বাঁ দিকে; কারুর সারা মাথায় টাক, সামনের দুটিখানি পাতলা চুলেই টাক ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় টেড়ির ক্ষীণ আভাস দেখা যায়; কাহারো মাথার সামনে টেড়ি, পশ্চাতে টিকি! এই দৃশ্যটি দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে অসভ্যগুলোর মধ্যে আমিও আর একটু হলে অসভ্য হয়ে পড়তুম।

পোষাকেরই বা কতরকম বিচিত্রতা। ওরা এখনো ঠিক করতেই পারেনি কেমন সজ্জা ওদের ঠিক মানায়। কারো পুরো দস্তুর সাহেবী সজ্জা—কিন্তু পাজামাটা হয়তো সরুঙ্গে, কোটটা ঢলঢলে, টাইটা বাঁকা, কলারটা শার্ট ছেড়ে ঠেলে উঠে পড়েছে, হ্যাটটা কতকেলে পুরোনো ময়লা—তবু সাহেব সাজতে হবে! কারো ধুতির ওপর চাপকান, তার ওপর চাদর, মাথায় কিছু নেই; কারো গায়ে কোট, কারো শার্ট, কারো পিরান। কারো জামা ঘামে তেলে একেবারে ভিজে উঠেছে, দুর্গন্ধে কাছের লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ছেড়ে ধুতে দেবার তাড়া নেই, কারো জামার কাপড়ে পানের পিক ছিটিয়ে পড়েছে, কানে- গোঁজা দাঁতখোঁটা খড়কের মুখে চিবানো পানের কুঁচি আর ছোপ লেগে আছে। ওরই মধ্যে দু-একজনকে বেশ ভদ্রলোকের মতন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও মধ্যে দুটি শ্রেণি আছে—এক একেবারে ফুলবাবু, আতিশয্যে উগ্র; অপর শ্রেণি সাদাসিধে, বেশ শান্ত-দর্শন।

ট্রামে যখন উঠি তখন একটু সরে বসে আমায় একটু জায়গা দেওয়া যে দরকার, এ বোধটাও পুরুষ বর্বরদের থাকে না, সবাই হাঁ করে দৃষ্টি দিয়ে যেন আমায় গিলতে থাকে; আমি যেন সদ্য চন্দ্রলোক থেকে নেমে এসেছি। ওদের চোদ্দ পুরুষে কখন যেন মেয়ের মুখ দেখেনি। পুরুষগুলোর তখনকার সেই গদগদ আত্মবিস্মৃত চঞ্চল ভাব দেখলে আমার সেকালের স্বয়ম্বরসভার একটি পরিষ্কার ছবি মনের সামনে ফুটে ওঠে। কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় একটুও যে অত্যুক্তি করেন নি, তা আমি এখন বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছি।

লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে জায়গা করে যদি বসা গেল, তবেই যে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তা নয়; পরে যারা ট্রামে চড়তে আসে তাদের মধ্যেও নানারকম মনস্তত্ত্বের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।—কেউবা যে কামরায় আমি থাকি ঠিক সেই ভরা কামরাতেই ভিড় বাড়াতে আসে, অন্য কামরা খালি থাকলেও সেদিকে যেতে চায় না; কেউবা সামনের কামরায় উঠে এমন জায়গা বেছে নেয় যেন ঠিক আমার সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে বসতে পারে; কেউবা ঠিক পিছনের কামরায় উঠে ঠিক আমার পিঠের কাছে বসে নানান ভঙ্গীতে হেলান দেবার দুশ্চেষ্টা করতে থাকে; কেউবা গাড়িতে উঠেই এমন একটা অতিসম্ভ্রমের তটস্থ ভাব দেখিয়ে ছিটকে তফাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে, যেন স্ত্রীজাতিটার প্রতি তাঁরা এমন অতিসম্ভ্রমশীল যে প্রায় উদাসীন বললেও হয়—যেন এক-একটি শ্রীচৈতন্যের অবতার। তাদের সেই অশোভন ব্যবহার দেখে আমার হাস্যসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অতি ব্যাপারটাই যে খারাপ! যারা অসম্ভ্রম প্রকাশ করে তারা যেমন পুরুষচরিত্রের বর্বরতার একটা দিক অতিসম্ভ্রমশীলেরাও তেমনি ভণ্ডামির আর একটা দিক প্রকাশ করে মাত্র! কদাচিৎ দু-একজনকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নারীকে দেখতে যে তাদের ভালো লাগে, নারীর সঙ্গ যে তাদের মধুময় লাগে, তা লুকোতেও চেষ্টা করে না, অথচ কর্দয্য অশোভন ভাবে প্রকাশও করে না,—তারা নারীকে ভালোও বাসে, সম্ভ্রমও করে। এমন একটি পুরুষের কথা পরে বলব, সে লোকটিকে আমার লেগেছে ভালো। ভালো লেগেছে শুনে তুমি হাসছ বোধহয়? কিন্তু ভালো-লাগা ভালো-বাসা নয়, এটা আমি আগে থাকতেই তোমায় বলে রাখছি।'

ট্রামে চড়বার সময় যেমন, নামবার বেলাও তেমনি আমাদের দেখে পুরুষদের অশেষ রকম লীলা-চতুরতা প্রকাশ পায়। কেউবা আমার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার পায়ের ওপর দিয়ে কোঁচার ফুলটি বুলিয়ে চরণ ধুলির নিছনি নিয়ে যায়।

আমি যখন নামি তখনও ওদের নানারকম লীলা লক্ষ্য করি। আমি নেমে গেলে সকল জানলা থেকেই মুখ ঝুঁকে পড়ে, দেখতে চায় আমি কোন্ পথে কোথায় যাই—আমার চারিদিকে যেন একটা মস্ত রহস্য জড়িয়ে আছে, সকলেরই চেষ্টা উঁকি মেরে সেই লুকানো কাহিনিটা জেনে নেবে।

পুরুষগুলো যে অমন তার জন্যে প্রকৃতিই দায়ী। প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিগুলোকে প্রকৃতিস্থ করতে পারেনি বলে বেচারাদের ওপর করুণা হয়, রাগ করা চলে না। বিশেষ তো আমাদের দেশের পুরুষদের ওপর। বেচারিরা অপরের বাড়ির স্ত্রীলোকদের মুখ তো কখনো দেখতে পায়ই না, নিজের স্ত্রীরও যে খুব বেশি পায় তাও তো মনে হয় না। দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি লোলুপতা তো স্বাভাবিক।

পুরুষ যে নারীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী ও মনোযোগী এতে নারীর মুখে পুরুষের ওপর যতই চটুন, মনে কিন্তু বেশ সন্তুষ্টই হন; কারণ তাঁরা যে বন্দিতা, আরাধিতা, এ কথা জানলে খুশি হওয়া স্বাভাবিক। আমি যে খুশি হই তা আমি স্পষ্টই স্বীকার করছি। পুরুষেরা যে আমাদের অতটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম দেখায় তার আর-একটা কারণ আমার মনে হয় যে, তারা প্রবল; আমরা দুর্বল, তারা আশ্রয় আমরা আশ্রিতা; সংসারের সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করে আপোষ মীমাংসা করে চলতে হয় বলে তাদের একটা সহ্যগুণ আর ভদ্রতা চরিত্রগত হয়ে গেছে বলেও কতকটা। এটা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি যখন আর একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু সে যদি পুরুষ হত তা হলে আমাকে দেখতে পেয়েই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। পুরুষের এই ভদ্রতা যে শুধু আমাদেরই বেলায়, তা নয়; সে স্বজাতির প্রতিও যথেষ্ট খাতির দেখিয়ে চলে। যেখানে অনেক অপরিচিত মেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে গা ঠেকলে কী কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষা থাকে না; যার ত্রুটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা ঘটেছে সেও ক্ষমা করতে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে কোন্দল বাধিয়ে কলরব করতে লেগে যায়। কিন্তু ট্রামে আকসারই দেখি, একজন পুরুষ হয়ত অপরের পা মাড়িয়ে ফেললে, কিংবা অপরের গায়ে টলে পড়ল, তাতে সে ব্যক্তি শুধু একটি নীরব নমস্কার করলেই সকল গোল মিটে যায়। এক বাড়িতে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক থাকলে ঝগড়ার চোটে চালে কাক চিল বসতে পারে না; কিন্তু এক মেস নিঃসম্পর্ক পুরুষ দিব্য বনিবনাও করে মানিয়ে সকলে থাকে দেখা যায়। এত যে তারা ভালো মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে ভাব করে থাকে, মাঝখানে একটি মেয়েলোক এসে পড়তে আর তখন ভাব থাকে না—ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারে না। বাস্তবিক মন আর ঘর ভাঙাতে স্ত্রীলোক যত পটু, পুরুষ তেমন নয়। সে বিষয়ে রমণীর কুখ্যাতি একেবারে জগৎ-জোড়া! মেয়েরা স্বজাতিকে সুনজরে তো দেখেই না, পুরুষকেও যে খুব খাতির করে চলে তাও নয়। যতটুকু দয়া সে যেন অনুগ্রহ, কাঙালকে একটু তাচ্ছিল্যের দান! এতে আমাদের কিন্তু ভালো আছে—পুরুষগুলো আমাদের কাছে চিরকালই ভিখারির মতন অবনত হয়েই পড়ে থাকে—কিন্তু গৌরব নেই।

তারা অতৃপ্ত বলেই আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, তাদের জীবনের সম্বল; আমাদের একটু দেখতে পাওয়া, একটু মিষ্টি কথা শোনা, তাদের পরম লাভ বলে মনে হয়। দুজন আলাপী পুরুষ এক সঙ্গে মিলেছে কী অমনি আমাদেরই কথা। মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকটা অংশ যে গোপন রাখা দরকার, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুও ওই গোঁয়ারগুলোর ঘটে নেই। রবিবাবু যে তাঁর স্বজাতির জবানীতে স্বীকার করেছেন যে—

> "আমরা মুর্খ কহিতে জানিনে কথা,
> কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি!"

সেটা কবির অত্যুক্তি একটুও নয়, একেবারে খাঁটি স্বরূপোক্তি। ওদের ব্যবহার দেখে লজ্জা যেন

লজ্জা পেয়ে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু আমি লজ্জায় মারা যাই। ওরা যদি কোথাও বেশ সহজ হতে পেরেছে! ওরা রেল-স্টেশনে টিকিট নেবার ঘুল ঘুলগুলি দিয়ে এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যে, ট্রেন ছেড়ে যাবে, কী কেউ পকেট কাটবে, তার খেয়ালই থাকে না। অনেক বাবুকে দেখি আমার হাত থেকে টিকিট কিনে নোট-ভাঙানি টাকা পয়সা ফেরত নিতে ভুলে যান। মূর্খগুলো জানে না যে ওতে ওদের আমরা ঘৃণাই করি।

পুরুষদের আর একটি ভারি মজা দেখি যে তারা আমাদের কোনো একটু তুচ্ছ কাজ করে দিতে পেলে যেন বর্তে যায়। আমার সঙ্গে যদি কোনোদিন কিছু জিনিসপত্তর থাকে, তা হলে আমি নামবার সময় অন্তত চতুর্ভুজ উদ্যত হয়ে ওঠে; তার মধ্যে যে ভাগ্যবান আমার সেবা করবার অধিকার পায় তার তখনকার কৃতার্থ মুখের ভাব, আর অন্য সকলের তার দিকে সপ্রশংস অথচ ঈর্ষা-আকুল চাওয়া বাস্তবিক দেখবার জিনিস।

এমনি করে একটি লোক তার সহযাত্রীদের ভারি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

এই ঈর্ষাটা পুরুষচরিত্রের ভারি একটা চিরন্তন দিক। পশুজগৎ থেকে আরম্ভ করে মনুষ্যজগৎ পর্যন্ত সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে রমণীর করুণা যে পায় তার সঙ্গে, ব্যর্থ যারা তার সকলে এক্‌কাট্‌ঠা হয়ে লাগে কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দগুলো বোঝে না যে একজন ছাড়া আর সকলের নিরাশ তো হতেই হবে; যে ভালোবাসা পেয়েছে সে না পেয়ে আর একজন পেলেও সেই একজনেরই লাভ। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অজ বেচারাকে ইন্দুমতীর ভালো লেগেছিল বলে সমস্ত রাজাগুলো একেবারে ক্ষেপে মারমুখো হয়ে উঠল। কেন রে বাপু? বেচারার অপরাধ? সে যদি শ্রীকৃষ্ণের মতন রুক্মিণী-হরণ বা অর্জুনের মতন সুভদ্রাহরণ করত তাহলে না হয় ওরা বলতে পারত যে অজ অন্যায় করেছে, ইন্দুমতীকে পছন্দ করার সুযোগ দিলে না, হয়তো তার শ্রীহস্তের বরমাল্য তাদের কারো গলায় পড়তে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী তো তাদের সে ক্ষোভটুকু করবারও অবসর রাখেনি।

আহাম্মকেরা এইটুকুও বুঝতে পারে না যে যাকে তারা প্রার্থিত রমণীর সম্ভাব্য ভালোবাসা থেকে দূরে রাখতে চায়, তাকে নির্যাতিত দেখে সেই রমণীর অসম্ভব ভালোবাসাও করুণায় যে সম্ভব হয়ে আসে। তাকে দূর করতে গিয়েই তাকে আরও নিকট করে তোলে!

এমনি করেই ওরা ভাই, দ[illegible]ক্রে আমায় একজনের অনুরক্ত করে তুলছে। এই অনুরাগটা বিপন্ন আশ্রিতের প্রতি করুণা ছাড়া আর কিছু নয়; ভালোবাসা মনে করলে ভুল করবে।

এ আমার ট্রামের সহযাত্রী। প্রায় রোজই ট্রামে দেখা হয়। হঠাৎ একদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটে গিয়েছিল। একদিন আমার আপিস যেতে বড়ো বেলা হয়েছিল। যখন ট্রাম ধরতে গেলাম তখন আপিসে যাবার ঠিক মুখোমুখি সময়। ট্রামগুলো একেবারে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলো পাদানের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। অমন গাছে ঝোলা অভ্যাস তো আমাদের নেই; পুরুষগুলো পূর্বপুরুষের যে নিকটে জ্ঞাতি গোঁফদাড়ি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ; আমরা বিবর্তনে এগিয়ে এসেছি বলে, আমরা অমন গেছো কসরৎ পারিও না, পারলেও লজ্জা নামক মনুষ্য ধর্মটা আমাদের পুরা মাত্রাতেই আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একখানা ট্রামে কেউ ঝুলছে না দেখে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। একটিও জায়গা খালি নেই। মনে করলাম, পুরুষগুলো রমণীর সেবা করবার কাঙাল, এখনি কেউ-না-কেউ উঠে আমায় জায়গা করে দেবে। কিন্তু একটাও একটু নড়ল না।

কেউ উঠল না দেখে যখন আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে কী করব ঠিক করতে পারছিনে, তখন দু কামরা দূর থেকে একটি তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে— আপনি এইখানে আসুন, আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি।

তার কথায় আমার যে কী আরাম হল তা আর বলতে পারিনে। আমি যেন এক খাঁচা বুনো ভালুকের করল থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গেলাম।

ট্রামের ঘন্টা বাজিয়ে ট্রাম থামিয়ে সে আমাকে নিজের জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে গাড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ তখন একগাড়ি লোকের ওপর জয়ের আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আর বাকি লোকগুলোও তার দিকে এমন করে তাকাতে লাগল যেন বলতে চাচ্ছে—এঃ! বড্ড জিতে গেল!—এ জিত তো তারাও জিততে পারত। কিন্তু যারা থাকে সুযোগের টিকি ধরবার জন্যে, তাদের সুযোগ ফস্কেই যায়; যে বুদ্ধিমান, সে সুযোগের সামনের ঝুঁটি ধরেই সুযোগকে কাবু করে ফেলে। এ দেশটা কেবলই পেছু ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকির মতো করেই গেল।

এখন আমি ট্রামে ওঠবার সময় একবার সব কামরায় উঁকি মেরে দেখি সে আছে কী না। যদি তাকে দেখতে পাই তা হলে সে যে কামরায় থাকে সেই কামরায় গিয়ে উঠি, আর কেউ জায়গা না দিলেও সে আমায় জায়গা ছেড়ে দেবে, মাত্র এই আশায়। আমি যে রোজ তারই কামরা বেছে উঠি, এটা সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে; আমি ওঠবামাত্রই সে একমুখ হাসি নিয়ে ধী ও শ্রীর জ্যোতিতে ভরা চোখ দুটি আরতির যুগল প্রদীপের মতো আমার দিকে একবার তুলে ধরে, পরক্ষণেই নিজের হাতের বইখানির ওপর নামিয়ে রাখে। এইখানে আসল পুরুষের পরিচয় পেয়ে আমিও আমার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা সাজিয়ে ধরি।

ওদের একটি দল আছে ভারি মজার। ওরা জগৎসংসারের কাউকে রেয়াৎ করে ছেড়ে কথা কয় না—সকলেরই নিরিখ করতে ব্যস্ত। এরা বোধহয় সাহিত্যিক, কারণ সাহিত্যের আলোচনাই বেশি শুনি। এদের একজন নাকি কবি। তাঁর দুনিয়ার দুচার জন লোক ছাড়া আর কারো লেখা বড়ো একটা ভালো লাগে না—সে এমনি খুঁৎখুঁতে আর একগুঁয়ে যে, যা গোঁ ধরে তা ওর বন্ধুরা শত যুক্তি তর্কেও টলাতে পারে না। এরা দেখি সবাই স্ত্রী- স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু এই কবিটির মতো ভারি অদ্ভুত ধরনের; উনি বলেন বাইরে বেরুবে শুধু সুন্দরী তন্বীরা; মোটা, কালো, কুৎসিত যারা তাদের অবরোধে বন্ধ থাকাই উচিত। একথা শুনে আমার মিল্টনের কোমাসের যুক্তি মনে পড়ল—Beauty ın Nature's brag, প্রকৃতির গর্বের ধন সৌন্দর্য, যাদের তা আছে তারা লুকিয়ে থাকবে না; ঘোমটায় মুখ ঢাকবে যারা কুৎসিত। কিন্তু যিনি একথা বলেন, তিনি যে খুব সুপুরুষ তা তো মনে হয় না। মানলাম না হয় উনি কবি, সৌন্দর্যের উপাসক। কিন্তু সৌন্দর্য কী শুধু চোখেই ধরবার জিনিস? রমণী কী শুধু ফুলের মতোই রমণীয়, না হলে সুন্দর বলে স্বীকৃত হবে না? ইংরেজিতে একটা কথা আছে—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। রূপসী না হলেও তো সুন্দরী হতে বাধে না। যাদের রং বা চেহারা দৈবগতিকে নয়নরঞ্জন হয়নি তাদের কী পৃথিবীটা দেখে জানবার শিখবার আনন্দ পাবার দরকার নেই? জগতের সংস্পর্শে সংঘর্ষে না এলে তারা মানুষ হবে কেমন করে'—দেহ ও মনের স্বাস্থ্য বল সঞ্চয় করবে কোথা থেকে? আমার মনে প্রশ্নটাই যেন কেড়ে নিয়ে তার এক বন্ধু বল্লে—"তবে তোমার আমারও বাইরে বেরুনো উচিত নয়; তুমি যেমন মেয়েদের বলছ, মেয়েরাও তো তেমনি বলতে পারে—হোঁদলকুৎকুতে রকমের পুরুষদের মুখদর্শন আমরা করব না।' কবির যুক্তি—'তা কেন? আমরা চিরকাল বাইরে আছি, বাইরেই থাকব, বিশেষত আমাদের যখন জীবিকা অর্জন করতে হয়।" আহা কী আহ্লাদে যুক্তি! যদি রোজগারের কথাই বলেন, তা হলে আমাদের দেশের কত মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের মেয়ে উপবাসে থাকে, তাদের কী বাঁচবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে না? তারা বাইরে বেরুতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে বেরোয় না বলে', বর্বর পুরুষগুলোর চোখে নারী জাতির স্বাধীনতা সয়ে যায়নি বলে'! পুরুষদের ভালো লাগে না বলে তারা খাঁচায় বন্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় তো একেবারেই বেরোয়! পথে বাড়ির মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের পুরুষপুঙ্গবদের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে অবলাকে পথে

বসান, তখন মাথাটা খুব উঁচু করেই চলতে পারেন বোধ- হয়! বেহায়াদের এইসব কথা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলতে একটু লজ্জাও করে না।

এই নিয়ে ওদের প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যায়। আমার বন্ধুটি—বন্ধু বলছি, শুধু নাম জানিনে বলে, এটা লোকটাকে বোঝাবার জন্যে একটা সংজ্ঞা যা চিহ্ন মাত্র, অন্য কিছু ভেবো না যেন। বন্ধুটি একেবারে জ্বলে ক্ষেপে উঠে খুব জোর দিয়ে বলে—"মেয়েরা যদি বাইরে না বেরোয় তো মরুভূমিতে আর কতকাল চলা যাবে?" সে যে আমাকে শুনিয়েই কথাটা বলে তা আমি খুব বুঝি। আমি যেন তার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। বন্ধুর কথা শুনে তার বন্ধু একটি তরুণ সুকুমার যুবক একদিন বলে উঠল—"আমাদের লোককে বলবার কোনো অধিকার নেই। আমরা নিজেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে কিছু কী করছি?" আমার বন্ধু অমনি বলে উঠল—"আরে এখন করব কী? আগে স্ত্রী হোক তারপর তো স্বাধীনতা দেব। বিয়ে হোক আগে তখন দেখবে আমাদের দৃষ্টান্ত ২৫ বছরের মধ্যে পথঘাট সুন্দরীতে ছেয়ে যাবে!" বোঝা গেল বন্ধুর বিয়ে হয়নি। সুন্দর যুবাটি বলে উঠল—"আরে পঁচিশ বছর পরে যখন চোখে ছানি পড়ে যাবে তখন সুন্দরীতে পথ ছাইলেই বা আমাদের কী!" তখন ব্যাপারটাকে চটপট আগিয়ে আনবার পরামর্শ চলতে লাগল। সেই সুন্দর যুবাটি বল্লে—"এস, এক কাজ করা যাক। রবিবাবুর 'আমরা ও তোমরা' গানটা গেয়ে নগরসঙ্কীর্তনে বেরিয়ে পড়া যাক! সুন্দরীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করে বলে যাক—

'তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!'

মেয়েদের একবার বিদ্রোহী করে তুলতে পারলে একদিনে সব অবরোধ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যাবে!" বন্ধু বল্লে—"বিদ্রোহ করবে মেয়েরা? পুরুষদেরই বড়ো স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আবার মেয়েদের!"

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ছোটো করে দেখার ভাবটা আমার ভালো লাগল না। এর জন্যে আমরাই অনেকখানি দায়ী। আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে কী চেষ্টা করেছি? যা আমাদের হোক, তা আমরা দাবি করে আদায় করতে কী জানি? আমরা অবলা, পিঁজরের পাখি!

আমাদের পরে যে সমস্ত মেয়ে অবরোধের বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন হবে, তাদের অবস্থাটা আমরা অনেক সহজ ও নিষ্কণ্টক করে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কণ্টকবোধের বেদনা আমাদের সর্বাঙ্গে দারুণ লজ্জার লালিমায় ফুটে ফুটে উঠছে। অগ্রদূতের ভাগ্যই এইরকম, দুঃখ করা বৃথা!

আজ তবে আসি ভাই, পত্র বিরাট ও ডাকের সময় নিকট হয়ে এল।

ইতি—তোমার স্নেহাসক্ত লাবণ্য।

॥ ২ ॥

ভাই লাবণ্য,

তোর মজার চিঠি পড়ে আমি এমন হেসেছি যে তোর পিতৃবিয়োগের দুঃখটা অনুভব করবার অবসরই পাইনি। তুই পুরুষদের যে চিত্র এঁকেছিস সেটা এমন মজার হয়েছে যে পুরুষগুলোকে না পড়াতে পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে করছি চিঠিখানা নকল করে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেব—তোর বন্ধুর সাহিত্যিক দল দুনিয়ার লোকের নিরিখ পরখ করে ফেরেন, তাঁদের নিজেদেরও নিরিখটার পরখ হয়ে যাওয়া ভালো।

তুই অবলা মানুষ, পুরুষের ভিড়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া কী তোকে সাজে? এক কাজ করো না, তোর বন্ধুর শরণাপন্ন হ না। তোরও ভালো লেগেছে তাকে, তারও ভালো লেগেছে তোকে. তোদের বিয়েও এক একটা করতে হবে, তবে না হয় শুভকার্যটা তোরা দুজনেই সেরে

সেকালের রোমান্স

সরলাবালা সরকার

'রোমান্স' জিনিসটা চিরকালের। তবে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তার ধরনটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

আমার এই কাহিনি এমন এক প্রেমের কাহিনি, যে-কাহিনির নায়িকার বয়স তেরো বৎসর। মেয়েটির নাম বিজয়িনী, ডাক নাম বিজু।

আট বৎসর বয়সেই বিজুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; বাবা ছিলেন সরকারি বড়ো চাকুরে, তাই তাঁকে দেশে দেশে বেড়াতে হত, বিজুও বাপের সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়েছে। শ্বশুরবাড়ি বাংলাদেশের এক পল্লিগ্রামে। বিয়ের চার বছর পরে সে একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছে, আর এসেই সে তার স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়া, এটা অবশ্য একটা নতুন কথা, কেন না বিয়ের মন্ত্রই হচ্ছে 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।' সুতরাং হিন্দু বিবাহমন্ত্রই যখন প্রেমের গ্রন্থিবন্ধন, তখন নতুন করে আবার প্রেমে পড়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, কেন না বিয়ের পর বিজুর সঙ্গে তার স্বামী বিনয়ের খুব কমই দেখা হয়েছে, আবার যদি বা দেখা হয়েছে সে কথা বিজুর বিশেষ মনেই নেই।

পশ্চিমে থেকে থেকে বিজুর স্বভাবটা এমন হয়েছিল যে সে বাঙালির ঘরের বউ হয়ে কী করে যে একগলা ঘোমটা টেনে একেবারে ভালো মানুষটি হয়ে থাকবে বিজুর মা সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই যখন বিজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার পর তিনি তাঁর বেয়ানের পত্রে জানলেন যে, 'বিজু বড়োই সরল ও লক্ষ্মীমেয়ে' তখন তাঁর মন অনেকটা হালকা হল। কিন্তু শাশুড়ি একথাও লিখেছেন, "পশ্চিমে থেকে বাংলাদেশের আদব- কায়দা কিছু শেখেনি সেজন্য ভাববেন না, দু দিনেই সব শিখে নেবে।"

বিজুর শ্বশুরবাড়ি গ্রাম্য জমিদারের বাড়ি। শ্বশুর—জেলার বড়ো উকিল, কিন্তু ছেলেরা কেউই বিদ্বান নয়। বিজুর স্বামীর বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু সে এনট্রান্স পাস করার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ছেলেদের মোড়লগিরি করছে। চাষিদের সঙ্গে তার বিষম ভাব, এমন কী মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে লাঙ্গল চযেও দেয়। চাষিরা বলে, 'ন বাবুর মতো আর মানুষ হয় না, ওঁকে তো দ্যাবতা বললেই হয়।" কিন্তু বাড়িতে তার উৎপাতে বউ-ঝিরা সবসময় তটস্থ থাকে, কোনো সময় তার কী খেয়াল হয় কে জানে! তাই বিজয়িনী শ্বশুরবাড়ি এলে মেজবউ একদিন বলেছিল, "এবার তো নবউ আসছে, এবার তুমি জব্দ হবে, তার সঙ্গে এমন করে লাগতে পারবে না।" এখন এক পারিবারিক নাটক অভিনয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় আসছি।

১২৫১ সাল। তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবার। দরদালানে একসঙ্গে প্রায় চব্বিশ জন খেতে বসেছে, খুড়তুতো, জেঠতুতো, পিসতুতো ভাইয়েরা, ভাগনে এবং শ্যালকও আছে, গুরুজনদের

মধ্যে আছেন ছোটোকাকা ও পিসেমশাই। বধূরা এবং মেয়েরা পরিবেশন করছে, গৃহিণী আছেন রান্নাঘরে।

পরিবেশনে বিজুর খুবই উৎসাহ। মাছের থালায় দুই হাতই জোড়া, তাই মাঝে মাঝে তার ঘোমটা সরে যাচ্ছে। মেজো ননদ এসে মাঝে মাঝে ঘোমটা ঠিক করে দিচ্ছেন। গৃহিণীর আদেশে, নবউকে কিছু বলা চলবে না তবে সহবত অবশ্য শিখিয়ে দিতে হবে।

বিজুর স্বামী বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "মেজদা, দেখ, বড়ো মুড়োটা দেখছি আমারই পাতে পড়েছে। তোমরা কখানা করে মাছ পেয়েছ দেখি, আমার পাতে দেখ বড়ো বড়ো পাঁচখানা মাছ।"

মেজদাদা বললেন, "বিনয়, থাম দেখি। বড়ো মাছটা তুইই তো ধরেছিলি তবে মুড়োটা তোর পাতে পড়বে না কেন?"

বিনয় বললে, "পরিবেশন করছে কে, ও নবউ বুঝি? ঘোমটা দিয়ে আছে বলে আগে চিনতে পারি নি, আমি বলি বুঝি মেজবউদি। তবে তো আমার পাতে তালা শুদ্ধ মাছই পড়বে। মা, মা, ওকে কেন মাছ পরিবেশন করতে দিলে?"

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, "বিনু, আবার কী নষ্টামি জুড়েছিস? কেন ওকে ওরকম করিস? আমিই তো বলেছিলাম তোর পাতে বড়ো মুড়োটা দিতে। কাল আবার অভয়কে দেব। পুকুরে কী মাছের অভাব হয়েছে?"

বিজয়িনী আড়ষ্ট, থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে। তোর চোখের জলে ঘোমটা ভিজে গিয়েছে। শাশুড়ি এসে তার হাত থেকে থালাটি নিয়ে বললেন, "ছিঃ, কাঁদে না, যাও মা, হাত মুখ ধুয়ে এস।"

মুড়োটি বিনয় খায় নি, পাতেই পড়ে আছে। *সেজবউ ফুস ফুস করে বললে, "দেখলে তো ভাই, নঠাকুরপো মুড়োটা নবউয়ের জন্যে পাতে রেখে গেল।"*

কথাটা শাশুড়ির কানে গেল, বললেন, "পাতে রেখেছে তাতে হয়েছে কী? যাও মা, বিনুর পাতে গিয়ে বোসো। স্বামীর পাতের মাছের মুড়ো খেলে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেজপিসিমা বলেন, শোন নি?"

দু ঘণ্টা পরে। বিজয়িনী ডাঁসা পেয়ারার সন্ধানে পেয়ারা গাছের তলায় গিয়েছে। গিয়ে দেখল, বিনয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

বিনয়কে দেখে বিজুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে গোটা কতক পেয়ারা পেড়ে দেবে?"

বিনয় বললে, "গোটা কতক? ও বাবা, আস্পা তো কম নয় দেখছি। বল না কেন, গাছে যতগুলো পেয়ারা আছে সবই পেড়ে দাও।"

বিজয়িনী : "সব পেড়ে দিতে বলব কেন? সবগুলো তো আর ডাঁসা পেয়াবা নয়?"

বিনয় : "আচ্ছা, পেয়ারা পেড়ে দেব। তার আগে বল দেখি ঘাটে তোদের চুপি চুপি কী পরামর্শ হচ্ছিল?"

বিজুর মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বললে, "ছাড়, মার ঘরে যাব, মা ডেকেছেন পাকা চুল তুলে দিতে।"

কিন্তু বিনয় জোর করে তার হাত চেপে ধরল, বললে, "সেটি হচ্ছে না। কী পরামর্শ হচ্ছিল না বললে ছেড়ে দেব না। বল, শিগগির বল পরামর্শটি কী? বনভোজন হবে? ও না, বোধহয় চাষিদেব খেজুর গাছের রস চুরি করা হবে, তাই না?"

বিজু বললে, "রস চুরি করব কেন, তুমি ভারি বাজে কথা বল। রোজ তো এক কলসি করে জিরেন রস চাষিরা দিয়ে যায়।"

"তা হলে কী হবে, কৃষ্ণযাত্রা? হ্যাঁ, এইবার ঠিক ধরেছি।"

বিজু বললে, "তাই বুঝি, বেহুলার ভাসান তো করা হবে। দেখো নি সেদিন। কী সুন্দর বেহুলার ভাসান গান করেছিল মুসলমানপাড়ার ছেলেরা?" বলতে বলতে চমকে উঠল, "ওমা! কী হবে? দিদিরা যে বারণ করেছিল বলতে?"

সন্ধ্যায় সময় কোনো কাজ থাকে না। রান্নার পাট দিনে দিনেই চুকিয়ে রাখা হয়, কেবল সময়মতো গরম ভাতটি নামিয়ে নেওয়া, আর সেও রাত্রি দশটা এগারোটায়। কাজেই সন্ধ্যাতে প্রায়ই কড়ি খেলার আসর বসে, দশ-পঁচিশ, ছক্কা-পাঞ্জা, বাঘবন্দী খেলা। তার মধ্যে দশ-পঁচিশই প্রধান খেলা। দশ- পঁচিশের ঘরে ঘরে যে চারটি করে কড়ি বসানো হয় তার জন্য কত রং-বেরঙের কড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে, আবার দানের সাতটি কড়িও বাছাই-করা বড়ো বড়ো কড়ি।

কিন্তু আজ আর কড়িখেলা নয়, আজ হবে বেহুলার ভাসানের গান। দর-দালানের উপরের বড়ো ঘরটা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করাই থাকে, কেবল একবার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য খোলা হয়। দেয়ালে বড়ো বড়ো ছবি আছে সেগুলোও মাঝে মাঝে মুছে পরিষ্কার করা হয়। চাবিটা থাকে ভাঁড়ার-ঘরের তাকের উপর। আজ সেই ঘরেই বেহুলার ভাসান করা হবে।

বেহুলার ভাসানে কান্নার পালা অনেক আছে, আবার তার মধ্যে সং এনে হাসির খোরাকও জোগান দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ি বাঁধা রামসিং জমাদারের সে কী ভঙ্গি, সে কী লাঠি ঘুরানো, যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে। আবার যেই শুনেছে একটা "ম্যাঁও" শব্দ, অমনি "ডাকু আয়া, ডাকু আয়া" বলে তার পালানোর ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেরা হেসে কুটি কুটি হয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে লোকের আমোদবোধের বিশেষ, প্রবণতা ছিল।

বেহুলার নৌকায় 'গোদা' গিয়ে উঠেছিল, বেহুলা যখন স্বামীর দেহ নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন কলার ভেলায় করে; নৌকা নয়, কলার ভেলা। সেই 'গোদা'কে নিয়েও সং দেওয়া হত। গোদা পায়ে তুলো আর পাট জড়িয়ে 'গোদ' তৈরি করেছে, আর থপ্ থপ্ করে হাঁটতে হাঁটতে গোদা-পা তুলে তার তিন বউকে শাসাচ্ছে, "মারব এই গোদা পায়ের লাথি।" আবার গানও করছে নেচে নেচে,—

"আমায়, 'গোদা, গোদা' করিস নে গোদা বড়ো ভাগ্যিমান।
গোদার ডোলে গরু, শামুখে ধান।"

একটা ছোটো বাছুরকে ধান রাখা ডোলের ভিতর করে নিয়ে এসেছে, আবার একটা শামুখে ধান ভরে এনেছে। সেই শামুখটা সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বলছে "দ্যাখ তোরা আমার কত ধান; গোলায় আর কত ধানই করবে, আমার শামুখের ধানে সম্বৎসর ওড়ন ফোড়ন, অতিথ-পতিত, এসো জন বসো জন সব কুলান হয়ে যাবে।" আবার বেহুলার নৌকা ধরবার জন্যে মাটিতে উপুড় হয়ে সাঁতারেব অভিনয়।

এই অভিনয়গুলিই বিশেষ করে দর্শকদের মন আকর্ষণ করত, তাই মাঠে ঘাটে গান শোনা যেত—

"গোদা গোদা করিস নে গোদা বড়ো ভাগ্যিমান।"

আজ গোদা সেজেছে সেজো বউ, পায়ে তুলো জমিয়ে গোদ করা হয়েছে, আবার শামুখে ধান ভরেও আনা হয়েছে, কিন্তু ডোলটি খালি ডোল, বাছুর তাতে নেই।

এদিকে রামসিং-জমাদারবেশি মেজবউ লাঠি ঘাড়ে পাঁয়তারা কষতে কষতে এমন এক লাফ দিয়েছে যে জানলাব শার্সি ভেঙে চুরমার এবং ঠিক সেই সময়েই বিনয় ঘরের মধ্যে এসে হাজির।

অভিনয়কারিণীগণ এর পর যেভাবে লাঞ্ছিতা হলেন, তা বর্ণনা করা যায় না।

দুজন দুজন করে চুলের বিনুনীতে বিনুনীতে বেঁধে এক এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "ঠিক এইভাবে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, তারপর ছুটি হবে।"

বিজু কোথায়? বিজুকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। সেই বিশ্বাসঘাতিনীই যে সমস্ত সন্ধান দিয়েছে তা বুঝতে কারও আর বাকি রইল না।

বেচারা বিজয়িনী! এই কাণ্ডের পর সে একেবারে একঘরে হল। তার সঙ্গে আর কেউই কথা বলে না—সে সকলের পিছনে পিছনে বেড়ায়, কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

শাশুড়ি ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন, বললেন, "হল কী তোদের? বিজু অমন মুখ কালি করে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? রান্নাঘরের দুয়োর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, তোরা ওকে কাজে ডাকিস নি বুঝি?"

সেজ মেয়ে বিমলা বললে, "না, ওকে আমরা আমাদের কোনো কাজেই ডাকব না। ও ভারী দুষ্টু, যে কথাটি হবে সেইটি গিয়ে ন-দার কানে তুলে দেবে। এদিকে দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি যেন উলটে খেতে জানে না।"

বিজয়িনী কাঁদছিল, বললে, "মা, আমি তো ওর কাছেই যাই নি, আমি তো তোমার ঘরে আসছিলাম, তোমার পাকা চুল তুলতে, ও যে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

সেজ ননদ মুখ নাড়া দিয়ে বললে, "নিয়ে গেল তো নিয়ে গেল, ওকে সব বলে দিতে গেলি কেন?"

বিজয়িনী অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলছিল : "আমি তো বসতে চাই নি, আমি তো বলতে চাই নি—ও যে, ও যে—" বলতে বলতে কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরের দিন। মায়ের অনুরোধে বউয়েরা ও মেয়েরা অপরাধিনীকে ক্ষমা করেছে সঙ্গে নিয়ে বাগানে গিয়েছে। বিজু একেবারে কৃতার্থ।

বাগানের মাঝখানে একটা ঝোপড়া তেঁতুলগাছ। বিজু মনের আনন্দে অনবরত বকে চলেছে। "জান ভাই, জান ভাই, উনি হাত গুনতে পারেন, তোমাকে দেখে সব বলে দেবেন, সব ঠিক মিলে যাবে। এই যে গাছটা দেখছ, এটা কী গাছ বল দেখি?"

ননদ বিমলা বললে, "ওটা তো তেঁতুলগাছ, তুই কখনও বুঝি তেঁতুলগাছ দেখিস নি।"

বিজু বললে, "না ভাই, ওটা তেঁতুলগাছ নয়। উনি বলছেন, ওটা এক রকমের তালগাছ। দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে।"

এই অদ্ভুত কথায় সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বিজুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগল, "দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে। উনি বলছিলেন যে, তোমরা গাছটাকে তেঁতুলগাছ মনে করো, কিন্তু আসলে ওটা তালগাছ। কী জন্যে যেন ওর পাতাগুলো তেঁতুলগাছের মতো হয়ে গিয়েছে, উনি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি।"

মেজ-জা ধমক দিয়ে উঠল, "থাম দেখি নেকি, অত 'উনি, উনি' করিস নে। তোর 'উনি' সগ্‌গ্ থেকে নেমে এসেছেন। আমরা তো মানুষ নই, আমাদের তো চোখ নেই।"

কিন্তু বিজয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওই গাছে তাল ধরবেই। সে বললে, "আচ্ছা, দেখো, তালের সময় গাছে তাল ধরে কী না!"

বিজয়িনী যখনই বিনয়কে এড়িয়ে চলে, চতুর বিনয় তখনই বুঝতে পারে নিশ্চয় কিছু পরামর্শ চলছে। আর তখনই সে "বিজু, বিজু" ডাক ছাড়ে। সেই "বিজু বিজু" ডাক শুনলে বিজয়িনী আর দূরে থাকতে পাবে না। বিনয়েরও আর বিজয়িনীর গোপন কথা বের করে নিতে কষ্ট হয় না।

তাই আজকাল গোপন-সভায় বিজয়িনীর আর প্রবেশের অধিকার নেই। বিজু যতই কাকুতি-মিনতি করুক কেউই তাকে দলে নেয় না, বলে, "বিজু তো! ন-ঠাকুরপো কাছে এলে ওর কী জ্ঞান থাকে? দেখ না, যে দিকে ন-ঠাকুরপো, ওর নজরটি কেবল সেই দিকেই আছে।"

গ্রীষ্মের দুপুর, বিনয় ঘরের মেঝেয় শীতলপাটি পেতে শুয়ে আছে। ছেলেদের খাওয়া হয়ে

গিয়েছে, এইবার মেয়েরা পাতে খেতে বসবে। বিজয়িনী কী একটা কাজে ঘরে এসেছিল, বিনয় ডাকল, "বিজু, বিজু, এদিকে আয় দেখি।"

বিজয়িনী এগিয়ে এসে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, কী চাই তোমার?"

"খেতে ডাকছেন? বলিস কী? তোর যে চোখ লাল হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। এদিকে আয় তো! ও বাবা! এ যে বিষম জ্বর! শো শো, শীগগির খাটের ওপর শুয়ে পড়। আমি লেপ এনে তোর গায়ে ঢাকা দিচ্ছি।"

সেই দারুণ গ্রীষ্মে বিজয়িনী লেপ গায়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করছে। শাশুড়ি শুনলেন, বউয়ের জ্বর এসেছে। ছেলের মুখে সংবাদ পেয়ে শাশুড়ি ঘরে এসে বধূর অবস্থা দেখলেন, বললেন, "দুখানা লেপ দেখছি গায়ে চাপিয়েছে, খুব কী শীত করছে?"

বিজয়িনী বললে, "না মা, ভয়ানক গরম হচ্ছে।"

শাশুড়ি ব্যাপারটি তখনই বুঝতে পারলেন, বললেন, "ওঠো, ভাত খেতে চল। বাছা রে, একেবারে ঘেমে তিরখুস্তি। বিনু, হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে, বউটাকে খুন না করে বুঝি তোর শান্তি হবে না?"

বিনয় দুয়ারের কাছে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও গিয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিল কেন, আমার কী দোষ? নিজের জ্বর হয়েছে কী না সেটুকু বুদ্ধি নেই?"

বিজয়িনী তবুও উঠতে রাজি হয় না, বলে, "উনি বলেছেন খুব জ্বর হয়েছে।"

শাশুড়ি রেগে উঠলেন, "বলুন উনি। জ্বর হয়েছে না ওর মাথা হয়েছে। আয় এদিকে, ওকে উঠতে বল, আমি চলে যাচ্ছি।"

সেদিনের এই ঘটনায় বিজয়িনীকে অনেক ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু উপহাসের কারণটি যে কী বিজয়িনী, বুঝতে পারে নি।

ইতিমধ্যে একদিন চিঠি এল দুঃসংবাদ নিয়ে, বিজয়িনীর বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

চিঠি পড়ে গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি তো জানেন বিজয়িনী তার বাবাকে কতখানি ভালোবাসে। সময় ও সুযোগ পেলেই সে সকলকেই বাবার গল্প শোনায়। বিশেষ করে শাশুড়ির যখন পাকাচুল তুলতে বসে তখন অনর্গল বকে যায়, কেননা সে বুঝতে পারে শাশুড়ি মনোযোগ দিয়েই তার কাহিনি শোনেন এবং শুনতে ভালোবাসেন।

গৃহিণীর মনে পড়ছিল, সরলা বালিকার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই হাসিমাখা মুখের ভাব। বাবার কথা বলতে বলতে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। অবশ্য বাপের বাড়ির সকল খুঁটিনাটি ঘটনাই সে বলত। মার কথা, ভাইবোনদের কথা, ঝগড়ু সহিসের বউয়ের কথা, এমনকী মেনি বেড়ালটা কথাও বাদ দিত না। কিন্তু বাবার কথা বলতে গেলেই তার মুখ সবচেয়ে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত, গৃহিণী তা লক্ষ্য করেছেন বৈ কী!

আজ যখন বিজয়িনী শুনবে তার বাবা আর নেই, তখন তার কী অবস্থা হবে সে-কথা যেন মনে করাই যায় না।

গৃহিণী ছেলেকে ডেকে তার দুই হাত ধরে মিনতি করে বললেন, "লক্ষ্মী বাবা, রাত্রেই যেন মেয়েটাকে এই দারুণ খবর শোনাস নে।"

খাওয়াদাওয়ার পর যে যার ঘরে শুতে গেল। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হয়ে বিজয়িনীর শোবার ঘরের দিকে কান পেতে থাকলেন।

বিজয়িনীর স্বামীর কাছে এলেই খুশি হয়ে উঠত, আর অনর্গল নানা কথা বলত। স্বামী সে কথায় কান দিচ্ছে কি না সে দিকে তার খেয়াল থাকত না। আজও ঘরে এসে আনন্দময়ী মহা আনন্দের দিনে কী কী ঘটছে অর্থাৎ মেজদিদি. সেজদিদি ও ঠাকুরঝি যখন পুকুরঘাটে গিয়েছিল,

তখন মেজদিদি কীভাবে পা পিছলে পড়ে গেল, সেজদিদি ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতরাবার সময় ঘড়াটা হঠাৎ কী করে ডুবে গেল, আবার সেজদিদি ডুব-সাঁতার দিয়ে কী কৌশলে ঘড়াটি তুলল ইত্যাদি বর্ণনা দিতে দিতে নিজের মনেই মাঝে মাঝে হেসে অস্থির, তখন বিনয় হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব তো হাসিখুশি হচ্ছে, এদিকে কী চিঠি এসেছে জান? তোমার বাবা মারা গিয়েছেন।"

"কী বললে?" বিজু চমকে উঠল, "বাবা মারা গিয়েছেন বলে চিঠি এসেছে? তোমার পায়ে পড়ি, কী হয়েছে বল। আমার বাবা নেই? আমার বাবা?"

বিজুর গলা দিয়ে "বাবা গো!" শব্দের আর্তনাদ শুনেই গৃহিণী ছুটে এলেন।

দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন তিনি : "দোর খোল, শীগগির দোর খোল, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বউটাকে তুই নিকেশ না করে ছাড়বি নে দেখছি।"

সেই আনন্দ-প্রতিমা কেমন যেন হয়ে গেল। তার মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না। গৃহিণী কোনো রকমে তাকে দিয়ে চতুর্থী করালেন, ভাবলেন বধূকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মা-ও তো শোকাতুরা, মা মেয়েকে দেখে হয়তো কিছু শান্তি পাবেন, আর বিজুও মায়ের কোলে গিয়ে একটু জুড়বে।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন? বিজু বিষম জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ল, তার আর উঠবার শক্তি নেই। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানের মতো হয়ে থাকে, কিন্তু বিনয় কাছে আসলেই যেন বুঝতে পারে, তখন চোখ খুলবার চেষ্টা করে।

গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছেন, বিজুর বাপের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

বিনয় ছটফট করে বেড়ায়, বিজয়িনীর কাছে বেশিক্ষণ বসতে পারে না। বাড়ির সকলেই পালা করে রাত জেগে, সকলেরই মুখ মলিন, বাড়ির আনন্দের উৎস যেন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

গৃহিণী সব সময়ই বধূর ঘরে আছেন, তাঁর রান্নাবান্নায় আর মন নেই। মাঝে মাঝে বিনয়কে বলেন, "তুই গিয়ে ওর কাছে একটু বোস, তা হলে হয়ত হুঁশ আসবে।"

হুঁশ এল, কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায়? স্বামীর হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে বিজয়িনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "তুমি,—তুমি তো আমায় ভালোবাসতে না।"

এইটিই তার শেষ কথা।

বিনয় যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। মার কোলে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কেবলই বলতে লাগল, "মা, মা, সে কিনা বলে গেল, আমি তাকে ভালোবাসতাম না!"

পূজার-ছুটি

সরোজকুমারী দেবী

॥ ১ ॥

হরিহরপুরের জমিদারদের ছোটো তরফের গৃহিণী নৃত্যকালী যখন পালিতা কন্যার বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে বৎসরাবধি বিবিধ চেষ্টার পরও বার বার নিরাশ হইয়া দিন দিন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেইসময় একদিন প্রভাতে সহসা বাড়ির পুরোহিত হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সহাস্যমুখে সংবাদ দিলেন "মা একটা সুসংবাদ আছে। কিরণের জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

গৃহিণী আশাপূর্ণহৃদয়ে উৎসুকনেত্রে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কথার অবশিষ্ট অংশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সবিস্তারে যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—

গতকল্য তাঁহার কোনো প্রয়োজনে তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসিত হইয়া পুষ্করিণীতটে গিয়া একটি অচেনা যুবককে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে দেখেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত গ্রামের বাঁড়ুয্যেরা তাহাদের মেয়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য ছেলেটিকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মেয়েটি কালো বলিয়া যুবকের বিবাহে ইচ্ছা নাই। শীঘ্রই সে ফিরিয়া যাইবে। তখন তিনি কিরণের কথা তাহাকে বলায় সে মেয়েটিকে আগে দেখিতে চাহিয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটি দেখতে কেমন? কত বয়স হবে?

ভট্টাচার্য্য অতি উৎসাহের সহিত বলিলেন—মা! আমি আজ বিকালে তাকে এখানে আনব। তুমি মেয়ে দেখাবার জোগাড় করে রাখ। সে এলেই দেখতে পাবে, আমি তোমার কেমন জামাই আনছি।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাঁড়ুয্যেরা তাকে ঘরজামাই করে রাখতে এনেছিল। আমাদের এখন যে-রকম অবস্থা তাতে আমি তার সকল ভাব ত নিতে পারব না, সেটা ত ভেবেছেন?

ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাঁহার শিখাসমেত মস্তকটি আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন—মা! তুমি আমাকে কি এতই বোকা ঠাওরেছ নাকি? আমি সে-সব বিষয় না ঠিক করে কি মেয়ে দেখাবার কথা দিয়েছি? আমি তাকে স্পষ্টই বলেছি যে আমরা ঘরজামাই রাখতে পারব না। নিজেকে নিজের উপায় করে নিতে হবে। তবে তুমি যেমন পিতৃমাতৃহীন—তেমনি এখানেই চিরকাল থাকবে, আমরাই তোমাদের দেখাশোনা করবো এবং পরে সুবিধামতো তোমায় বাড়িঘর করে দেবো এই পর্যন্ত। সে তাতে রাজি আছে।

এইবার গৃহিণীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথামত ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

॥ ২ ॥

যেদিন একমাত্র নরেন্দ্রকে লইয়া ১৭ বৎসর বয়সে নৃত্যকালী বিধবা হইয়াছিলেন সে আজ আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। নরেন তখন এক বৎসরের। তখন তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী সংসার ছিল। কিরণের পিতাই সংসারের ও সম্পত্তির সর্বময় কর্তা ছিলেন ও পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পত্রকে পরমস্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন। নরেনের জন্মের ৫ বৎসর পরে কিরণের জন্ম। তাহাকে ১০ দিনের রাখিয়া সূতিকাগৃহেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তদবধি কিরণ কাকিমার স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে, তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকে। বড়োবাবু দ্বিতীয়বার কলিকাতায় বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের পর হইতেই তাঁহার বিবিধ পরিবর্তন হইতে লাগিল। এখন তিনি প্রায়ই কলিকাতাতেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে ২/৪ দিনের জন্য গ্রামে আসেন। ক্রমশ তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সন্তানাদি হইতে লাগিল। নরেন ও কিরণের প্রতি স্নেহের মাত্রা দিন দিন কমিতে লাগিল। বড়োবাবু দু-এক বার তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় গ্রামে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী কিছুতেই আসেন নাই। তিনি বলিলেন— বাবা! ওই বনজঙ্গল—ওখানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে, ও জায়গায় কী কোনো ভদ্রলোকে থাকতে পারে? আমি বিয়ের আটদিনেই শ্বশুরবাড়ির যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আর জীবনে সে-মুখো হব না। তার উপর আবার ম্যালেরিয়া আছে! আমার এই কচি বাছাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে যমের মুখে তুলে দি আর কী!"

যত দিন যাইতে লাগিল গ্রামের লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল বড়োবাবু নরেনকে পথে বসাইবার মতলবে আছেন। বিষয়ের আয় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় স্ত্রীর গহনা ও কোম্পানির কাগজ হইতেছে, আর-সমুদয় খরচের জন্য চারিদিকে দেনা করিতেছেন। নৃত্যকালীও এসব কথা শুনিতেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে যিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন তিনি কি কখন তার এমন সর্বনাশ করিতে পারেন? কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতেন যে বাড়ির প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ড প্রত্যেক অনুষ্ঠান আগে যেমন সমারোহে সম্পন্ন হইতে এখন ক্রমশ কমিতে কমিতে তাহা নামমাত্র রীতিরক্ষার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোল দুর্গোৎসব অতিথিশালা ইত্যাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন শোচনীয় দশা দেখিয়া নরেন একদিন জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গম্ভীরমুখে বলিয়াছিলেন—'এখন আমাদের সময় বড়ো মন্দ যাইতেছে।' নরেন ইহার উপর আর একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিরণের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছিল. নৃত্যকালী বারবার এ বিষয়ে তাহার পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহা বিফল হইত। কিরণ দিন দিন তাহার পিতার মন হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে যখন সকলেরই মনে বড়োবাবুর প্রতি অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদিন সহসা কলিকাতায় বড়োবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শোকের তীব্রতা মন্দীভূত হইলে যখন গ্রামের ভদ্রলোকগণ ও উভয় পক্ষের উকিল মোক্তার বিষয়ের অবস্থা দেখিতে গেলেন, তখন দেখা গেল সমস্ত সম্পত্তি ঋণে জড়িত—নগদ টাকা কিছুই নাই, ভালো ভালো পরগনাগুলি সব বন্ধক পড়িয়া আছে, অবস্থা অতি শোচনীয়। কলিকাতা হইতে বড়োবাবুর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় যে উকিল আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—বিষয়ের যখন এরূপ অবস্থা, তখন উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে উপস্থিত কিছুদিনের জন্য সমস্ত বিষয় কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকুক, তিনি বিষয়ের আয় হইতে নির্দিষ্ট যে বৃত্তি দিবেন তাহাতেই এই দুই পক্ষের সংসার চলিবে। আয়ের অবশিষ্ট অংশ হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে। পরে যখন বিষয় ঋণমুক্ত হইবে, তখন বড়োবাবুর পুত্রগণ ও নরেন্দ্র বিষয় ভাগ করিয়া লইবেন।

নৃত্যকালী এ ব্যবস্থায় কিছুতে সম্মত হইলেন না! তিনি বলিলেন আমি এতদিন নরেন্দ্রকে লইয়া অতি সামান্যভাবে দিন কাটাইয়াছি: আমার বংশের যে আয়—আমাদের উভয়ের সমস্ত খরচপত্র সম্পন্ন হইতে তাহার অর্দ্ধেকও লাগে নাই। আমার একমাত্র সন্তানের ভাত পৈতা পর্যন্ত

ভাশুর বাড়িতে দেন নাই, খরচ বেশি হইবে বলিয়া। বিষয়ের উপর এত দেনা হইবার কোনো কারণ ছিল না। আমার শ্বশুরের এত নগদ টাকা ছিল তাহার কিছুই দেখিতেছি না। অথচ বিনা কারণে বিষয় দেনায় ডুবিয়া আছে। আমি এ দেনার অংশ লইতে পারিব না। আমার বিষয় হয় ভাগ করিয়া দেওয়া হোক—বড়োবাবুর অংশ হইতে দেনা শোধ হইবে, নতুবা যাঁহারা এখন মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আদালতে আমায় বুঝাইয়া দিবেন কেন এত দেনা হইল।

মধ্যস্থগণ আর একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নৃত্যকালী বলিলেন, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তবু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া মরিব। আমার ধনবল নাই, লোকবল নাই; আমার সন্তান বালক, কিছুই জানে না—আমার যে পরিণাম কী হইবে তাহা তা বুঝিতেই পারিতেছি। তবু আমি ইহা নীরবে সহ্য করিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।

যথসময়ে উভয়পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু কিরণকে লইয়া নৃত্যকালীর বিপদ হইল। তাহার বয়স ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে যায়, বিবাহের কোনো সুবিধা হইল না। এ বংশের মেয়েদের কখন বিবাহ দিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দেওয়া রীতি নাই, অথচ বড়োবাবু কিরণের জন্য টাকাকড়ি কিছুই রাখিয়া যান নাই, নৃত্যকালীর নিজের অবস্থাও এখন মন্দ। এ অবস্থায় কীরূপে পূর্ব প্রথামত সকল ভার লইয়া নিজে কিরণের বিবাহ দেন ইহাই মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। শেষে তিনি এমন একটি পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন, যে চিরকাল তাঁহাদেরই নিকট থাকিবে অথচ একবারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে উপার্জন করিতে পারিবে; তাহা হইলে বংশের মানও থাকে অর্থাৎ কিরণ চিরদিন পিতৃগৃহেই থাকে, এবং এখন কিরণের ও তাহার স্বামীর ভার তাঁহাদের বহিতে হয় না। তারপর তাহাদের মোকদ্দমা চুকিয়া গেলে কিরণ তাহার পিতার অংশ হইতে ন্যায়ানুসারে কিছু তো পাইবেই, আর তখন তিনিও সাধ্যানুসারে তাহাকে সাহায্য করিবেন। বৎসরাবধি এরূপ পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে যখন তিনি কিরণের বিবাহের আশা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন এমন সময় হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্বকথিত সুপাত্রের সন্ধান আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

॥ ৩ ॥

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিশোরী কিরণের লজ্জারক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ললিত একেবারে-মুগ্ধ হইয়া গেল। কন্যাপক্ষ বিবাহের যে যে শর্ত করিলেন সে নির্বিবাদে সমস্ত মানিয়া লইল। এই তরুণ যুবকের অনিন্দ্য সুকমার রূপ দেখিয়া গৃহিণীর অন্তরেও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিবাহের আর কোনো বাধা রহিল না। হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য শুভ দিন দেখিয়া ললিতের সহিত কিরণের বিবাহ দিলেন। গৃহিণী স্নেহে গর্বে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে বলিলেন—আমাদের যেমন মেয়ে তেমনি জামাই হয়েছে!

বস্তুত এই যুবকটি অল্পদিনের মধ্যেই এই অপরিচিত স্থানের সকলেরই একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও নৃত্যকালী তাহার বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ; নরেন তো তার সঙ্গ এক তিল ছাড়িতে চায় না, স্নান আহার বিশ্রাম ভ্রমণ মাছধরা সকল সময়েই ললিতকে সঙ্গে না রাখিলে কিছুতেই তার চলে না। গ্রামের যুবকবৃন্দ এই কলিকাতার ছেলেটির অসাধারণ বাক্‌পটুতায় ও মধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া নির্বিবাদে আপনাদের পরাভব মানিয়া লইয়া তাহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় নৃত্যকালী ললিতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের বৈষয়িক দুর্দশার কথা তুলিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দরিদ্রের ধন কিরণকে তোমার হাতে দিয়েছি। ওর সুখ-দুঃখের সকল ভার তোমার। আমি তো তার কিছুই করতে পারলাম না। নিজেই অকালে

ভাসছি। কখনো কল পাব, কী ছেলেটার হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে, কিছুই ঠিক নেই। যা হবার আমাদের হবে, কিরণকে তুমি দেখো। বাছার মুখ চাইতে সংসারে আর কেউ নেই।

ললিত বলিল—মা! আপনি কিছু ভাববেন না। আমি অল্পবয়সে মা বাপ হারিয়েছি। ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এতদিন আমায় মানুষ করেছেন। আমি সংসারী হয়ে আপনাদের সহায় পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমরা পুরুষমানুষ—নিজের সংসার প্রতিপালনের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হতে যাব কেন? আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরে যাব, আর একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখব। আদালত হতে আপনাদের ন্যায্য সম্পত্তি ফিরে পানতো ভালোই, না হয়তো আমরা দুই ভাইয়ে উপার্জন করব, আপনার কিসের ভাবনা? আপনি মিছে ভেবে শরীর মন খারাপ করবেন না। আপনি আশীর্বাদ করলে নরেন ও আমি নিজেরাই নিজের উপায় করে নিতে পারব।

জামাতার কথা শুনিয়া নৃত্যকালীর দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় খোলা জানালার ধারে বসিয়া ললিত একখানি বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে পড়িতেছিল ও কিরণ কাছে বসিয়া পান সাজিতেছিল ও মাঝে মাঝে একদৃষ্টে ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামীর প্রতি প্রেমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার কাছে ললিত সর্বসৌন্দর্য্যের সার, তার মুগ্ধদৃষ্টির সমক্ষে ললিত সর্বগুণের আদর্শ। বাড়ির লোকে যখন শতমুখে ললিতের প্রশংসা করে তখন সেকথা যেন তার কানে অমৃতবর্ষণ করিতে থাকে আর স্বামীর মুখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হয় না। যাহাকে দেখিতে এক সাধ, লজ্জার দায়ে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবারও উপায় নাই। যখন সে সামনে থাকে তখন চক্ষু আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। যখন সে ঘুমাইয়া থাকে বা অন্যদিকে চাহিয়া থাকে সেই অবসরে কিরণ লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাকে দেখিয়া লয়। আজ পাঠনিরত স্বামীর মুখের দিকে যখন সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে তখন সহসা বই বন্ধ করিয়া ললিত তাহার দিকে চাহিল। চারিচক্ষু মিলিত হইবামাত্র কিরণ লজ্জায় মুখ নত করিল। ললিত হাসিয়া ডাকিল—কিরণ!

সে উত্তর দিল না। ললিত আবার বলিল—কী দেখছিলে বল ত?

কিরণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ললিত বলিল—আঃ! এ সময় পড়তে মোটেই ভালো লাগছে না। কিরণ! কাছে এসো।

কিরণ পানসাজা শেষ কিয়া ধীরে ধীরে ডিবাটি লইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ললিত তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু মৃদু গাহিল—

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর আয লো কাছে আয়! খোলা জানালা হইতে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণ ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীচের বাগান হইতে নানাফুলের মিশ্র সুবাস বাতাসে মিশিয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছিল। ললিত কতক্ষণ কিরণের মুখখানি উভয়হস্তে তলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—কিরণ! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক উত্তর দেবে ত?

কিরণ একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, বলিল—কী কথা?

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—কিরণ! তুমিতো জান আমি নিঃস্ব দরিদ্র, আমার কিছুই নেই। আমি অবশ্য তোমায় সুখী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিন্তু মনে করো এখানে তোমরা যে ভাবে আছ যদি এমন ভাবে তোমায় না রাখতে পারি, তা হলে, তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে না তো? আজ আমার প্রতি তোমার যে ভাব তখনও ঠিক তেমনি থাকবে তো?

কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া গেল, সে সহসা এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

ললিত তাহার হাত দুটি ধরিয়া সস্নেহে বলিল—বল কিরণ! তোমায় যা বিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দাও।

কিরণ তখন উত্তেজিত স্বরে বলিল—তুমি কী আমাকে এতই নীচ মনে করেছ? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে কী টাকার জন্য? তুমি আমার স্বামী বলেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি ধনবানই হও আর দরিদ্রই হও আমি চিরদিন তোমায় এই ভাবেই পূজা করব। তুমি আমায় যে ভাবে রাখবে আমি তাতেই সুখী হব। কিন্তু যদি—যদি কখনও—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর সে কিছুই বলিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললিত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—এ কি কিরণ! এ কি ছেলেমানুষী তোমার! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি বইতো নয়? ছি! চুপ করো! তোমার চোখে জল দেখলে আমার বড়ো কষ্ট হয়। চুপ করো।

কিরণ স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি আমায় যত দুঃখেই রাখো না তাতে আমার কোনো কষ্ট হবে না, কিন্তু যদি কখনও তোমার স্নেহ হারাই তা হলে আমি আর বাঁচতে পারব না।

আবার সে ললিতের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ললিত সেই সরলা বালিকার এই অকৃত্রিম প্রেমের উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিল। ইহাকেই সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল? তাহার মুখে কোনো সান্ত্বনার কথা আসিল না। সে কেবল গভীর স্নেহের সহিত তাহার বালিকা পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ রোদনের পর কিরণ একটু শান্ত হইলে ললিত অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বিলল—কিরণ! রানি আমার! আমায় মাপ করো! আমি নিষ্ঠুরের মতো তোমায় কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছি। বল আমায় মাপ করলে?

কিরণ উত্তরে কিছু না বলিয়া দুইটি সুললিত কোমল বাহুতে ললিতের দেহ বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের উপর নিজের অশ্রুসজল মুখখানি রাখিল; তখনও তাহার কচি ওষ্ঠাধর দুটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

॥ ৪ ॥

যদি এইভাবেই কাটিতে পারিত তাহা হইলে কোনো পক্ষেই কিছু অশান্তির কারণ ঘটিত না। কিন্তু জগতে সব বিষয়েরই দুইটা দিক আছে এবং বিপরীত দিকটা সকলের সমান রুচিকর হয় না। ললিতেরও তাহাই হইল। সে আমাকে আশা দিয়েছিল বিস্তর—আর নিজেও মনে করিয়াছিল যে সে অনেক কিছুই করিবে। কিন্তু মানবের চিত্তের কি অভাবনীয় পরিবর্তন! কার্য্যকালে তাহার দ্বারা কিছুই হইল না। সে কলিকাতার একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে দশটা আশ্রিতের মধ্যে থাকিয়া অযত্নে উপেক্ষায় কোনো রূপে মানুষ হইয়াছে। বিশেষ ভাবে কাহারও নিকট হইতে যত্ন বা আদর পাওয়া তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। এখানে আসিয়া সকলের নিকট হইতে এত অধিক স্নেহ যত্ন পাইয়া ক্রমে তাহার চিত্তের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। বাড়িতে যাহাকে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে না এখানে সে ইতর ভদ্র সর্বসাধারণের নিকট রাজসম্মান পাইতেছে—সে কী যে-সে লোক, জমিদারের জামাতা! দিন দিন সে এত সুখী ও বিলাসী হইয়া পড়িতে লাগিল যে খানসামায় তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া না দিলে তার স্নান হয় না। আঁচাইবার সময় গাড়ু গামছা লইয়া চাকর না দাঁড়াইয়া থাকিলে সে বিরক্ত হয়।

প্রথম প্রথম কলিকাতায় গিয়া চাকরি করার কথা ঘন ঘন তার মনে উঠিত। কিন্তু সেখানে আবার দিদির বাড়িতে সেই পূর্বমত ভাবে থাকা ও পথে পথে কাজ খুঁজিয়া বেড়ানোর দৃশ্যটি মনে উদিত হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত ও ভাবিত সেইতো যাইতেই হইবে—তা আর দুই চারিদিন যাক তখন যাওয়া যাইবে। কিন্তু এমনি তার আলস্যপ্রিয় প্রকৃতি যে এ দুই চারিদিন শেষ হইতে হইতে ক্রমশ ছয় মাস হইয়া গেল কিন্তু তাহার বাহির হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল

না। এদিকে নরেনের যে মামলা চলিতেছিল তাহাতে প্রতিপক্ষের কথাই ন্যায্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছিল। উপর্য্যুপরি দুই তিনটি মামলায় নরেন হারিল। গ্রামের অনেকেই বিপক্ষদলে যোগ দিয়াছিল! কেবল ২,৪ জন প্রাচীন ধর্মভীরু কর্মচারীর সাহায্যে ও নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নৃত্যকালী মোকদ্দমা করিতেছিলেন। সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছিল। নানা দুঃখে দুশ্চিন্তায় অভাবে নৃত্যকালী চতুর্দিক হইতে জড়াইয়া পড়িয়া দিন দিন উত্যপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। নরেনতো পথে দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়, তার উপর ললিতের আচরণ দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইযা উঠিতেছিলেন। জামাই মানুষ—জোর করিয়া কিছু বলাও যায় না। সে তো সব দেখিয়া শুনিয়াও বেশ আরামে দিন কাটাইতে পারিতেছে! একে ত পিতৃমাতৃহীন নিঃস্ব দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছেন, তাহার উপর নিজের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও গেল, ইহার উপর জামাতা যদি বাক্‌সর্বস্ব অলস ও অকর্মণ্য হয় তবে কিরণের দশা কী হইবে।

বিকালে রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া নৃত্যকালী তরকারী কুটিতেছিলেন, কাছে বসিয়া তাঁহার চিরদিনের সুহৃৎ বিনুঠাকুরঝি গল্প করিতেছিলেন।

বিন্দু পল্লির মজুমদার-বাড়ির কন্যা, অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়েই বাস করিতেন। যখন নৃত্যকালী একাদশ বর্ষ বয়সে কাঁদিতে কাঁদিতে এই অপরিচিত বৃহৎ পুরীতে নববধূরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে বিন্দুর সহিত তাঁহার সখীত্ববন্ধন দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। সেই হইতে সুদিনে দুর্দিনে অন্ততঃপক্ষে দিনান্তে একবারও দেখা না হইলে দুইজনেই হাঁফাইয়া উঠিতেন।

বিন্দু বলিতেছিলেন—যেদিন বড়োকর্তা দেশের এত মেয়ে থাকতে কলকাতায় বিয়ে করলেন আমরাতো তখন হতেই জানি যে এইবার গাঙ্গুলিদের এতদিনের বনেদী ঘর উচ্ছন্নে যাবার পথ করা হল। যে মেয়ে এতকালের মধ্যে শ্বশুরের ভিটায় একদিনের জন্যে পা দিল না, সেকি কখন শ্বশুরবাড়ির কদর বোঝে? আমরাতো ছোটোবেলা হতে দেখে আসছি বড়োকর্তা কী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? সেই মানুষকে কী মন্ত্র দিয়ে কী করেই ফেললে। একদিনের জন্যে মেয়েটার মুখ চাইতে দিলে না, ছেলেটাকে পথে বসাল? ছি! ছি! ছি! একি কম ঘেন্নার কথা?

নৃত্যকালী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—আমি আর কার দোষ দেবো বল ঠাকুরঝি? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। সংসারে এসে একদিনের জন্যে সুখী হতে পারলাম না। ভাশুর মরেও গেলেন, আমাকেও মেরে গেলেন। আমার দুধের বাছা নরু, ভালো মন্দ কিছু জানে না। এই কচি বয়সে তার মাথায় কী ভাবনার বোঝা-ই পড়ল বল দেখি? আজ ৬-৭ মাস শহরে ছোটাছুটি আর উকিল মোক্তারের বাড়ি ঘুরে ঘুরে আর ভাবনা চিন্তায় সে একেবারে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। একটা একটা মামলায় হার হচ্ছে আর তার-বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। বাছার আমার খাওয়ায় রুচি নেই, কোনো সাধ আহলাদ নেই, অষ্টপ্রহর ভাবনায় কালি হয়ে গেল। ঘোরে ফেরে আর এসে কচি ছেলের মতো আমার গলা জড়িয়ে বলে, মা! জেঠামণি আমার কী করে গেলেন? তার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

বিন্দুও কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—এ বয়সে লোকের ছেলে নেচে খেলে বেড়ায়, দুঃখের বার্তা জানে না—এই কচি বয়সে বাছার এত দুর্দশা—সবই তোমার কপালের দোষ, তা ছাড়া আর কী বলব?

নৃত্যকালী আবার বলিলেন—আরও দেখ, বিয়ে দিয়ে একটা পরের ছেলে ঘরে নিয়ে এলাম সেও কপালগুণে এমন হল? এইতো আমাদের অবস্থা দেখছে। এখন কোথায় নিজের চেষ্টাচরিত্র নিজে করবে, তা না বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদেরই গলগ্রহ হয়ে বসে আছে। দু পাঁচ দিন কথায় কথায় বলেও দেখেছি, কথায় যেমনটি, কাজে তা কিছুই নয়, মেয়ের ভাগ্যে যে এর পর কী হবে তাও জানি নে।

বিন্দু বলিলেন—দেখ ছোটোবউ! তুমি রাগই করো আর যা করো এ কথাটি আমি তোমার মেনে নিতে পারি নে। তুমি এ বিয়ে দিয়েই অন্যায় করেছ। ও জামাই যদি নিজে রোজগার করে ধরকন্না করবে মনে করত তা হলে কী কখন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি ঘরজামাই হয়ে থাকতে আসত? এটাতো তোমরা বুঝলে না? ভালো করে দেখা না, শোনা না, পাঁচজনের পরামর্শ নিলে না, হঠাৎ একটা কাজ করে বসলে। সে এখন দিব্যি আরামে আছে, কেন কষ্ট করতে যাবে? জানে, মেয়ের জন্যে আমার সকল উৎপাতই এরা সহ্য করবে।

কিরণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শাক বাছিতেছিল। পিসিমার এত তীব্র সমালোচনা শুনিয়া তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। দুঃখে অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। সে আপনাকে সামলাইবার জন্য শাক বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পিসিমা তাহার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন। গৃহিণীও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মেয়ের রকম দেখছ একবার? আমিই কেবল ওর ভাবনা ভেবে মরছি, ও কী তা বোঝে? ও এখন আর সে কিরণ নেই। জামাইকে একটি কথা বললে মেয়ে একেবারে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।

তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আর না হবেই বা কেন? এখনতো আর সে ছেলেমানুষটি নেই—বড়ো হয়েছে, স্বামী চিনেছে, এখন ওর সামনে তার স্বামীর নিন্দা করলেতো তার কষ্ট হবেই। আমাদেরই এটা অন্যায়।

গৃহিণী মুখে এ কথা বলিলেন বটে কিন্তু কার্য্যত সকল সময় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। তিনি মনে মনে জামাতার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন সুতরাং এখন তাহার ছোটো বড়ো সকল ত্রুটিই তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। পূর্বে যাহা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এখন সেইসকল সামান্য বিষয় লইয়া তিনি সর্বক্ষণ গজগজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। তবু সে প্রাণপণে ললিতকে এসকল অশান্তির বিষয় জানিতে দিত না। দুই একবার কথাপ্রসঙ্গে সে স্বামীকে কাজকর্মের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, ললিত তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই।

সেদিন প্রভাত হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ও মাঝে মাঝে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নরেন কলিকাতায় গিয়াছে। জেলাকোর্টে তাহার মোকদ্দমা হার হওয়ায় সে তাহার পক্ষীয় উকিলের পরামর্শে সর্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্টে আপিল করিয়াছে। এইখানেই তাহার ভাগ্যপরীক্ষা শেষ হইবে।

নৃত্যকালী রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছেন ও কিরণ তাহার সাহায্য করিতেছে। অর্থাভাবে একে একে দাসদাসীদের বিদায় দিতে হইয়াছে। ঝি দুইজন আগেই গিয়াছিল; আজ পুরাতন ভৃত্য রামচরণকে প্রভাতে জবাব দিয়াছেন। তাহার ছয় মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছিল; নৃত্যকালী বহুকষ্টে টাকাগুলি শোধ করিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বলিলেন—"বাবা! এখন আমার সময় বড়ো মন্দ—তুমি এখন যাও—যদি কখনও দিন আসে তবে আবার তোমায় ডেকে পাঠাব!" ভৃত্যও তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। ঘোর দারিদ্র্য ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অভাবের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া নৃত্যকালীর অন্তর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। দুইজনের কাহারও মুখে কথা নাই। দু'জনে চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীরবে আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন।

ললিত সকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। বেলা বারোটার পর সে ফিরিয়া আসিল। প্রতিদিন তাহার ও নরেনের স্নানের জোগাড় করিয়া রাখা ও উভয়কে স্নান করান রামচরণের নির্দিষ্ট কার্য ছিল। আজ যে সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ললিত তাহা জানিত না। সে স্নান করিতে গিয়া কিছু প্রস্তুত দেখিতে না পাইয়া বিরক্ত হইয়া রামাকে ডাকিতে লাগিল ও তাহার গাফিলতির জন্য অত্যন্ত

তিরস্কার করিতে লাগিল। গৃহিণী আজ সকাল হইতেই উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, সহসা তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রন্ধনশালা হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তেল মেখে পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দিয়ে এলেইতো হয়! এখানে আর রামা না হলে চান্ হয় না! বোনের বাড়ি কটা চাকর রাতদিন হামেহাল হাজির থাকত?

কিরণ ললিতের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে যাইতেছিল; এই কথা তাহার কানে যাইবামাত্র সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ললিত যদি দ্বিতলের বারান্দা হইতে মার কথা শুনিতে পাইয়া থাকে তাহা হইলে সে কীরূপে আর তার কাছে মুখ দেখাইবে।

ললিত শ্বাশুড়ির কথা শুনিতে পাইয়াছিল। পূর্বে সে কখনও কখনও ভাবভঙ্গীতে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে বটে কিন্তু অদ্যকার এ কঠোর আঘাতের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নৃত্যকালী নীচে আরও অনেক কথাই অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু আর কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না, কেবল তাহার কানে বাজিতেছিল—বোনের বাড়ি কটা চাকর হামেহাল হাজির থাকত? সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে যে অতি দীন হীন অপরের গলগ্রহমাত্র একথা এতদিন তাহার স্মরণে ছিল না। কী করুণ মোহেই আচ্ছন্ন হইয়া ছিল! অপরে কৃপা করিয়া একমুঠি অন্ন তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে আর সে তাহাই তাহার করিয়া এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে—জগতের সমক্ষে তাহার পরিচয় এই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মস্তক হইতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল! যে এত ঘৃণিত, এত হীন, সে আবার পরের ভৃত্যের সেবা পাইতে বিলম্ব হইলে তাহাকে শাসন করিতে যায়! এ অপমান তাহার উপযুক্তই হইয়াছে! কাহারও দোষ নাই, তাহার নিজেরই সব দোষ। তাহার মধ্যে যে পুরুষত্বের অভিমান সুপ্তভাবে ছিল তাহা এই কষাঘাতে আজ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে! ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনও নিজের স্থান করিয়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি তবেই আবার এ মুখ দেখাইব, নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ! এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র ললিত তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে কিরণ দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পথ আগলাইয়া পড়িল ও কাঁদিয়া বলিল—আমার মাথা খাও, রাগ কোরো না! মায়ের কী মাথার ঠিক আছে? মা যেন দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছেন! মাপ করো, রাগ কোরো না! রামা নেই; আমি তোমার নাইবার জল তুলে এনে দিচ্ছি, লক্ষ্মীটি নাইবে চল!

কিন্তু ললিতের তখন ঘোর অপমানের উত্তেজনায় মাথার স্থিরতা ছিল না। সে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কিরণ! যদি কখন মানুষ হতে পারিতো আবার দেখা হবে, নয়ত এই পর্যন্তই শেষ হল। তোমার অযোগ্য স্বামীকে ভুলে যাও।

কথা শেষ হইতে-না হইতে ললিত চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ ৫ ॥

দিন কাহারও জন্য আটকাইয়া থাকে না। নৃত্যকালীর সংসার ললিত চলিয়া যাওয়ার পরও চলিতেছে বটে কিন্তু কিরণ বুঝি থাকে না। সেদিন দ্বি প্রহরে সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ললিত চলিয়া গিয়াছে সেই হইতে সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কেহ ডাকিলে কথা কয় না, স্নানাহারে রুচি নাই, লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে এক একবার চাহে আর স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকে। সেদিন যখন ললিতের রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, নৃত্যকালী তাহার ৪-৫ জন প্রজাকে দিকে দিকে জামাতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও উপরে গিয়া মূর্চ্ছিত কিরণকে বহু যত্নে সুস্থ করিলেন; সেই দিন কেবল সে একবার কথা কহিয়াছিল। যখন সকলে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল কোথাও জামাই বাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সেই সময় সে উচ্ছসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া নৃত্যকালীর গলা জড়াইয়া বলিয়াছিল—তিনি রাগ করে চলে গেছেন, মা! আর ফিরে আসবেন না। মা! কী হবে?

নৃত্যকালী তখন তাহাকে সান্তনা করিবেন কী, আপনি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে কিরণ একবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কী সে মনে মনে ভাবে কাহাকেও কিছু বলে না, দিন দিন যেন ছায়ার মতো বিছানায় মিশাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে ত্রিতলের ছাদে গিয়া দূর পথের শেষে দিকে চাহিয়া আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকে। সে যদিও কাহাকে কিছু বলে না, তবু নৃত্যকালী বুঝিতে পারেন যে প্রতিদিনে প্রতিমুহূর্তে সে যেন কাহার একটি কথার বা একটু সংবাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে। তিনি তাহার অবস্থা দেখেন আর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদেন—আহা বাছারে! তোকে কিনা অবশেষে আমি হাতে করে মেরে ফেললাম। আহা সে যে তাঁর কত যত্নের কত আদরের ধন! সে যে বড়ো দুঃখী! অজ্ঞানে মা হারাইয়াছে, বাপ থাকিতেও কখন একদিনের জন্য বাপের স্নেহ জানে না, কখন কাহারও কাছে আদর যত্ন পায় নাই, স্বামীর স্নেহ ও ভালোবাসায় সে দুই দিনের জন্য সুখী হইয়াছিল, ক্রোধের বশে তিনি তাহার একি সর্বনাশ করিলেন? আবার ললিতের উদ্দেশেও তিনি প্রতিসন্ধ্যায় দেবমন্দিরে মাথা কুটিয়া আসেন—ওরে নিষ্ঠুর! ওরে পাষাণ! যে তোর জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যা! আমার উপরে না হয় তুই রাগ করিতে পারিস, কিন্তু এমুখ কী করিয়া ভুলিলি?

চারিদিকে ললিতের অনেক অনুসন্ধান হইল; কলিকাতায় চারিদিকে, তাহার ভগ্নীর বাড়িতে, কোথাও তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। গ্রামের যে প্রবীণ কবিরাজ কিরণের চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি নৃত্যকালীকে বলিলেন—মা! আমি ঔষধ দিতেছি বটে কিন্তু ইহা মানসিক ব্যাধি, ঔষধে কিছু হইবে না। যদি শীঘ্র আপনার জামাতার সন্ধান না পাওয়া যায় তবে ইহার জীবনসংশয়। ইহার জীবনশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

নৃত্যকালীর সংসার বিন্দুঠাকুরঝি দেখিতেন, নৃত্যকালী কিরণকে লইয়া উপরে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দিন দিন তঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এই পরিবার যখন এইরূপে চতুর্দিক হইতে রোগ শোক অভাব দুঃখের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন একদিন সহসা দেবতার আশীর্বাদের মতো সুসংবাদ লইয়া হাসিমুখে নরেন আসিয়া বলিল—মা! হাইকোর্টের মামলায় আমাদের জিৎ হয়েছে! জজসাহেব বলেছেন—বলিতে বলিতে কিরণের শীর্ণ ম্লান মূর্তির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে অবাক হইয়া বলিল— একি মা? বোনটির কী হয়েছে?

যে মামলার ফলাফলের উপর তাঁহাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল তাহাতে জয়ী হইয়াছেন শুনিয়া আজ নৃত্যকালীর আহলাদ হইল না। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—ওরে নরেন, তোর যা কিছু আছে সব ললিতকে লিখে দেবো, তুই তাকে ফিরে আন্। তার জন্যে আমার সব যেতে বসেছে!

নরেন যখন একে একে সব কথা শুনিল, তখন তার চোখ দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কিরণের কাছে আসিয়া ডাকিল—বোনটি!

কিরণ মুখ তুলিয়া চাহিল—তার মাথাটি ঘুরিয়া গিয়া নরেনের বুকে পড়িল। দাদার স্নেহের কোলে মুখ লুকাইয়া কিরণ বহুদিন পরে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। নরেন নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে তাহাকে বলিল—তই কিছু ভাবিসনে বোনটি! আমি যখন এসেছি তখন তোর কোনো ভাবনা নেই। আমি আবার শীঘ্র কলিকাতায় যাব। যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ি আসব। সে কতদিন লুকিয়ে থাকবে?

তিনচার দিন পরে একদিন বিকালে কিরণ নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হাসিতে হাসিতে নরেন আসিয়া বলিল—বল দেখি বোনটি! আজ কী এনেছি?

কিরণ কিছু না বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে দাদার বদ্ধমুষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। কোনো বিষয় জানিতে বা কথা কহিতে তাহার কোনো কৌতূহল বা উৎসাহ ছিল না। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া নরেন হাসিয়া বলিল—বলিতে পারলিনে? আচ্ছা আমি বলছি—বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—ললিত

খবর দিয়েছে—তোকে চিঠি লিখেছে। আমি তো বলেছিলাম কতদিন সে লুকিয়ে থাকবে? কিন্তু তুই এমনি ছেলেমানুষ, দেখ দেখি ভেবে কী হয়ে গেছিস?—বলিয়া গভীর স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কোলের উপর চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া নরেন বাহির হইয়া গেল।

কিরণের সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতে লাগিল। তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্মে সিক্ত হইয়া গেল। কতক্ষণ সে অর্দ্ধমূর্ঝিতের ন্যায় জানালা ধরিয়া ঝুঁকিয়া রহিল। এও কী আবার সম্ভব? যাহার আজ ছয় মাসের কোনো সংবাদ না পাইয়া সে একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই সংবাদ আসিয়াছে! তবেতো তিনি কিরণকে একদিনের জন্যও ভোলেন নাই? মৃদু মৃদু বাতাসে তাহার অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি খানা খুলিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

মির্জ্জাপুর

আমার কিরণ! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। যেদিন দুর্জ্জয় অভিমানের বশে তোমায় ফেলে চলে এসেছিলাম তার পরে কতদিন কেটে গেছে। আমি কিন্তু একদিনের জন্য তোমার সেই কাতর মুখখানি ভুলতে পারিনি। জানি আমি আমার সংবাদ না পেয়ে তুমিও যে কি কষ্টে দিন কটাচ্ছ। কিন্তু আজ সেসব কথার দিন নয়। যেদিন আবার আমরা দুজনে মিলব সেই দিন দুজনেই পরস্পরের কথা বলব ও শুনব। আর সে দিনটির যে বেশী দেরী নেই সে কথা মনে করেও আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করছে।

সেদিন আমি অকলে ভেসেছিলাম; ভগবানের কৃপায় কূল পেয়েছি। যাত্রাকালে তোমার মুখ দেখেছিলাম তাই যাত্রা শুভ হয়েছিল। আমার কোনো কষ্ট হয় নি। আমি প্রথমে কলিকাতাতেই আসছিলাম। ঘটনাক্রমে গাড়িতে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় তিনি বললেন, মির্জাপুরে তাঁর বৃহৎ কারবার; কলিকাতাতে ও অন্যান্য স্থানে শাখা আছে। তিনি নিজে মির্জাপুরে থাকেন ও মাঝে মাঝে আর সব স্থানে গিয়ে অস্ত্রাবধান করে আসেন। মির্জাপুরে তাঁর একটি ইংরেজিতে-জানা লোকের দরকার। সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও ইংবেজিতে চিঠিপত্র লেখা, এইসব কাজের জন্য তিনি উপস্থিত ১৫০ টাকা বেতন দিতে ও বাড়ি দিতে সম্মত আছেন। আমায় তিনি বললেন যে এই কাজটি করতে পারে এমন কোনো লোক আপনার সন্ধানে আছে কী? আমি বললাম লোক নেই বটে, তবে আমি নিজে করতে প্রস্তুত আছি। তারপরে তার সঙ্গে এই সুদূর পশ্চিমে চলে এসেছি।

তুমি হয়ত এইবার রাগ করে বলবে তবে এতদিন কেন সংবাদ দাওনি? কেন দিইনি তা লিখছি। তোমার বোধহয় মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় মা বিন্দু পিসিমার কাছে দুঃখ করছিলেন যে এমন দুঃসময়ে বিবাহ দিলাম যে আমার কিরণকে একখানি গহনা দিতে পারলাম না। সেই কথা মনে পড়ায় আমি এ ছয় মাস অপেক্ষা করে বেতনের টাকা জমিয়ে দিদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি সেখান থেকে নতুন ফ্যাসানের গহনা গড়িয়ে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের হাতে এবারে গিয়ে তোমায় সাজাব সাধ আছে। এই সাধটুকুর জন্যে এতদিন এত কষ্ট সহ্য করেছি। এক এক সময় মনে হত আমি কি নিষ্ঠুর—যে আমাগত প্রাণা সরলা আমি ভিন্ন জানে না, তাকে আমি বিনাদোষে কি যাতনাই দিচ্ছি। কতদিন তোমার মুখ মনে পড়ে নির্জন ছাতে একলা বসে কত যে কেঁদেছি তা আর কি বলব। আমার কিরণ! এইবার আমাদের সব দুঃখের অবসান হয়েছে। বৈশাখ মাসে এসেছি—আজ আশ্বিন মাস পড়ল। আর ১৫ দিন পরে আমার পূজার ছুটি পড়বে। এই ছুটিতে গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। তার পর থেকে আমাদের বাধাহীন মিলনের পথে আর কোনো অন্তরায় থাকবে না।

এখানে আমি যে বাড়িটি পেয়েছি যাদিও ছোটো কিন্তু বড়ো সুন্দর; চারিদিকে বাগান, মাঝে লতাপাতা-ঘেরা ছবিটির মতো বাড়িখানি। আমি মনের মতো করে বাড়িখানি সাজিয়েছি। আর আমাদের নূতন সংসারের সবই গুছিয়ে রেখেছি। এখন কেবল দিন গুণছি কবে আমার হৃদয়ের রানিকে আমার এ গৃহস্থালীর মধ্যে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করতে দেখব। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি—তোমার বিহনে আমার এসব সজ্জা অঙ্গহীন অশোভন হয়ে রয়েছে—এস আমার লক্ষ্মী—তোমার মঙ্গল চরণস্পর্শে আমার এ শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে যাক!

মাকে আমার প্রনাম জানিও। তাঁর আশীর্ব্বাদেই আমি আমার কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছি। নরেনের কী খবর? তার মোকর্দমার কী হল? তুমি আমার অন্তরের ভালোবাসা জানবে। আজ তবে আসি। আর ১৫ দিন পরে আবার আমাদের দেখা হবে। ইতি—

তোমার ললিত

দেখিতে দেখিতে এ শুভসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। গৃহিণী হাসিয়া কাঁদিয়া গ্রামের প্রত্যেক দেবমন্দিরে নানা উপচারে পূজা পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের লোক এ খবর ভালো করিয়া জানিবার জন্য জমিদার বাড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কিরণের রুগ্ন শরীরে অপ্রত্যাশিত আনন্দের কোপ সহ্য হইল না। রাত্রি হইতে তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে অতিশয় কম্প দিয়া প্রবল জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কবিরাজ নাড়ি দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন এ জ্বর ত্যাগের সময় কী হয় বলা যায় না। নরেনকে বলিলেন—তুমিতো ললিতের ঠিকানা পাইয়াছ, তাহাকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দাও, যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যেন সংবাদ পাইবামাত্র চলিয়া আসেন। নরেন। বালকমাত্র—পরুবদিন ললিতের চিঠি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে ভাবিয়াছিল এইবার তাহাদের সমস্ত কষ্ট ও উদ্বেগ দূর হইল, আজ এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া সে একবারে বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—কবিরাজ মশায়! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ও কথা বলবেন না, আমার বোনটিকে বাঁচান।

দুইদিন অচেতন থাকিবার পর তৃতীয় দিনে কিরণের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নরেন ও কবিরাজ মহাশয় তাহার শয্যার পাশে বসিয়া ছিলেন। নৃত্যকালীর উচ্চক্রমণ ও নানাছন্দের বিলাপ কোনোমতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিন্দু তাঁহাকে কিরণের ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়াছিলেন। কিরণ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া নরেনকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—দাদা!

নরেন কাছে আসিয়া বলিল—কেন বোনটি?

"দাদা! পূজোর ছুটি হয়েছে কী?"

নরেন চোখ মুছিয়া বলিল—হয়েছে বই কী বোনটি! ললিত এল বলে!

কিরণ আর কথা বলিল না। শান্তির গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই সময় উদ্দাম ঝড়ের মতো ছুটিয়া ললিত ঘরে প্রবেশ করিল। বারান্দায় তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে! এমনি করেই কী মেরে ফেল্‌তে হয়রে? আমার সোনার প্রতিমা কিরণ—

বিন্দু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

ললিত কোনোদিকে না চাহিয়া পাগলের মতো ডাকিল—কিরণ! কিরণ!

তাহার উদ্‌ভ্রান্ত বিকৃত কণ্ঠস্বর কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিরণের তখন পূজার ছুটি হইয়া গেছে।

চৈত্র, ১৩২১

পুরস্কার

ইন্দিরা দেবী

ভালো ছেলে বলিয়া স্কুলে সুশীলের প্রশংসা থাকিলেও বাড়িতে তাহার দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না। ছেলে হইয়া বাঁচে না, তাই "অনেক দুঃখের সুশীল" বাবা ও ঠাকুরমার নিকট বেশিমাত্রায় আদর পাইয়া, দুষ্টু ঘোড়ার মতো দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিবেশি বা সহপাঠী, কোনো বালকের সহিতই তাহার সদ্ভাব ছিল না। তাহার বোন লীলাকেও তাহার সমস্ত আবদার ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত, লীলার মতো সহিষ্ণু সঙ্গীও তাহার দ্বিতীয় ছিল না। লীলা বড়ো শান্ত মেয়ে; তাহার ঘন পক্ষ্ম পরিবেষ্টিত বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটিতে তাহার হৃদয়ের নির্মলতা ফুটিয়া উঠিত। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি করুণা ও ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। দাদার নিকট অকারণে লাঞ্ছিত হইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করিত না; পাছে মা জানিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করেন, সেই ভয়ে কাঁদিতেও সাহস করিত না। সুশীল অন্যায়রূপে দাসদাসীদের প্রতি অত্যাচার করিলে সে সঙ্কুচিতভাবে মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং ইহা কদাচিৎ সুশীলের চক্ষে পড়িলে এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য সে 'যথাবিহিত' শাস্তি গ্রহণ করিত; তবু ও দাদাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। মা যদি সুশীলের উপর রাগ করিয়া কোনোদিন তাহাকে সুশীলের নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন, তবে তাহার পক্ষে তাহা শাস্তি স্বরূপই হইয়া উঠিত। সুশীল যে লীলাকে ভালোবাসিত না এমন নয়; কিন্তু সে ভালোবাসার মর্মগ্রহণ করা সকলের পক্ষে সহজ হইত না। সে নিজে ভগ্নীর প্রতি যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করিত, তাই বলিয়া অন্য কেহ কিছু বলিবে কেন? তাই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা খুড়িয়া অনর্থ করিয়া তুলিত। জলখাবারের পয়সা জমাইয়া জলছবি, চিনে মাটির পুতুল, লজঞ্জুস প্রভৃতি আনিয়া ভগ্নীকে উপহার দিত; আবার রাগের সময় সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেও ত্রুটি করিত না। লীলা তাহার পুতুলগুলির শোচনীয় পরিণামে মনে মনে ব্যথিত হইলেও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না; এবং ক্রোধোপশমে সুশীল যখন গঁদ ভিজাইয়া, —গালা গলাইয়া, পরম গম্ভীর মুখে চূর্ণবিচূর্ণ পুতুলগুলির সংস্কার কার্যের নিস্ফল চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিত, তখন লীলা অত্যন্ত প্রশংসামান চক্ষে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দেখিত।

মার অনুরোধে সুশীল লীলার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। লীলাও প্রথম প্রথম দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত 'কয়ে আকার কা' আর 'ক',—'কাক' প্রভৃতি বানান ক্রমশ বালীর কাগজের খাতায় মোটা সরের কলম দিযা রুল টানিয়া আঁকা বাঁকা অক্ষরে যথেষ্ট কাটাকুটি করিয়া ও কালি ফেলিয়া "সুশীল সুবোধ বালক" প্রভৃতি পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল; এবং পুস্তকোল্লিখিত সুশীল বালককে আপনার অগ্রজের আসনে বসাইয়া মনে মনে পরম প্রীতিমিশ্রিত গর্ব অনুভব

করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার উৎসাহ কমিয়া আসিল, তথাপি দাদাকে খুশি করিবার জন্য একদিনের জন্যও সে লেখাপড়ায় আলস্য করিল না। সমস্ত দুপুর বেলাটা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কোনো গতিকে আঁকাবাঁকা অক্ষরে এক পৃষ্ঠা মাত্র লেখা শেষ করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে তাহা দাদাকে দেখাইত, কিন্তু 'আহা' কী লেখার ছিরি! যা তোর কিচ্ছু হবে না।' ইত্যাদি রূপে ভর্ৎসিত হইয়া সে ম্লানমুখে খাতাখানি রাখিয়া দিত; এবং পরদিন যথাসময়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লিখিতে বসিত। উৎসাহটা আরম্ভে যতটা থাকিত, বসিলে ততটা থাকিত না।

অবশেষে ছয় মাস কাল নিন্দিত, প্রহারিত ও অনবরত পাঠে গলদঘর্ম হইয়াও যখন দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল না; এবং ধারাপাত পড়িয়া এক টাকায় ৮টা আধুলি ও ৬ দ্বিগুণে ৭০ প্রভৃতি বলিয়া লীলা অঙ্ক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল; তখন প্রবল অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সুশীল একদিন তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ইতিপূর্বে এত বড়ো মূর্খ সে আর দেখে নাই, লীলার ভবিষ্যতে যে আর কিছু হইবে, সে ভরসাও তাহার ছিল না, সুশীলের এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল তাহা নহে। কিন্তু দাদার কথা লীলার কখনও অবিশ্বাস হইত না, তাই সে আপনার হীনতার বা মূর্খতার বিষয় ভালো করিয়া অনুভব করিতে পারিল, এবং অচির কালের মধ্যেই লেখাপড়া ছাড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

লেখাপড়ায় মন না থাকিলেও সংসারের কাজকর্মে তাহার আলস্য ছিল না। দাদার কাপড় ঠিক করিয়া রাখা, স্কুল হইতে সুশীল ফিরিয়া আসিলে তাহার বইগুলি গুছাইয়া রাখা, মার হাত হইতে জলখাবারের রেকাবিখানি লইয়া আসন পাতিয়া দাদাকে খাইতে দেওয়া, এবং ছুটির দিন মাকে লুকাইয়া সুশীল যখন কাঁচা আম পাকা নোড়ের সন্ধানে দুপুরের রোদে আঁক্‌শী হাতে বাগানে বাগানে ঘুরিত, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকা; প্রভৃতি ছোটো, বড়ো, অনেক কাজই তাহাকে করিতে হইত। সকালবেলা ঠাকুরমার পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া একখানি ছোটো ডালায় চন্দন চর্চ্চিত ফুলগুলি লইয়া 'পুণ্যি পুকুর' 'হরির চরণ' ইত্যাদি ব্রত করিয়া দাদা বাবা মা ঠাকুরমা সকলের মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত। এবং সুশীলের আহারের সময় প্রবীণা গৃহিণীর মতো 'ওটা খাও' 'এটা খেলে না' বলিয়া অনুনয় করিত। অভ্যাসের বশেই হউক, আর যে কারণেই হউক, লীলাকে না হইলে সুশীলের একদণ্ডও চলিত না। অথচ সে যখন কোনো সস্নেহবাক্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে যাইত, অমনই অর্দ্ধপথে 'যা যা তোর আর গিন্নিপণা করতে হবে না', বলিয়া থামাইয়া দিত।

॥ ২ ॥

দেখিতে দেখিতে লীলা নয়-উত্তীর্ণ হইয়া দশে পড়িল। আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, তাই হেমাঙ্গবাবু কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিশপুরের রায়েদের বাড়ি হইতে একদিন তাহাকে দেখিতে আসিল। বাঙালির মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই অভিভাবিকাদিগের নিকট শ্বশুরবাড়ির প্রতিকূলে নানারূপ ভীতিপ্রদ মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া একটি আদর্শ ঠিক করিয়া রাখে। লীলারও যে এ বিষয়ে অল্প অভিজ্ঞতা না জন্মিয়াছিল এমন নহে, তাই মা যখন জরি জড়াইয়া, আঁট করিয়া, তাহার সুবাসিত কুন্তলীনরিক্ত, ঘনকুঞ্চিত, কেশরাশিকে কবরীবদ্ধ করিয়া, অলঙ্কারবস্ত্রে তাহাকে যথাসাধ্য মণ্ডিত করিযা তাঁহার মনের মতো সাজাইয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রীকে, বিলুপ্ত করিয়া তুলিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলেন, তখন লীলা অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে মার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া জানাইল, সে বিবাহ করিবে না। কন্যার কথায় কন্যার আসন্ন বিরহ বেদনা মার মনেও জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার চক্ষুপল্লবও অল্প আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছিঃ

মা, ওকথা বলতে নেই, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে চিরদিন সেই ঘর কর।" মেয়ে জন্মিলে যে বিবাহ অনিবার্য, তাহা যে ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তাহাও তিনি তাহাকে বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। সুশীল এতক্ষণ ভগ্নির সজ্জাপ্রিয়তা ও জননীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল; এবং চুল বাঁধিবার জন্য মা লীলাকে আটক করিয়া রাখায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল। মার কথায় সে প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল, 'সে হবে না লীলা কিছুতেই বিয়ে করিবে না।' মা রাগ করিয়া বলিলেন, 'এমন অলক্ষুণে ছেলেও তো দেখিনি। ও কথা বলতে নেই।' সুশীল মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'তুই উঠে আয়, তোকে বিয়ে কর্তে হবে না'—ইত্যাদি।

॥ ৩ ॥

তথাপি লীলাকে বিবাহ করিতে হইল। পাত্রপক্ষ খুব বড়োমানুষ। ছেলেটি 'দোজবরে' হইলেও বয়স বেশি নয়। 'দোজবরে' বলিয়া অল্প পয়সায় শুভকার্য সমাধা হইল। লীলা নয় উত্তীর্ণ হইয়া দশে পড়িয়াছে মাত্র; এ বয়সে মেয়ে রাখা যায় না এমন নয়, তবে উপস্থিত ত্যাগ করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই বুদ্ধিমান হেমাঙ্গবাবু অল্প পয়সায় কন্যাদানের এমন শুভ অবসর ত্যাগ করিলেন না, অগ্রহায়ণের প্রথমেই একটা ভালো দিন দেখিয়া শুভকার্য সম্পন্ন করিলেন। সুশীল প্রথম প্রথম আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কেহই যখন সে বিষয়ে মন দিল না তখন সে কাগজের মালা ও ফানুস তৈয়ারি কার্যে মনোযোগ দিল। লীলা এ কয়দিন ম্লানমুখে ছায়ার মতো দাদার পশ্চাতে ফিরিতেছিল, দাদার তখন সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।

বিবাহের পরদিন নবজামাতা ও কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিতা চন্দন চর্চিতা বধূবেশিনী লীলার কম্পিত শীতল হস্ত জামাতার হস্তে রাখিয়া 'আমার ধন তোমায় দিলুম' বলিতে বলিতে রুদ্ধ কণ্ঠে হেমাঙ্গবাবু যখন মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিলেন, তখন সমাগত সকলের চক্ষুই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। লীলাও সকাল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুশীল অত্যন্ত গম্ভীরমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া এই বিদায়দৃশ্য দেখিতেছিল। ক্রন্দনাকুলা লীলা যখন মা, বাবা ও দাদার চরণ বন্দনা করিয়া পালকিতে আরোহন করিল, তখন সুশীলের সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া অশ্রুরাশি চক্ষু রুদ্ধ করিয়া দিল। অশ্রুজলের কুয়াশার মধ্য দিয়া, লীলার পালকি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে অন্য মনে পড়িবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত দিন কোনো কাজে, খেলায়, সে মন দিতে পারিল না; আপনাকে অত্যন্ত একা অসহায় মনে করিতে লাগিল। চারিদিকের সমস্ত দ্রব্য সেই ক্ষুদ্র বালিকার সহস্র স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় অভ্যাসবশত দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িল, আজ আর দুইটি উজ্জ্বল, আনন্দোৎফুল্ল ঘন পল্লবমণ্ডিত, কালো চোখ, তাহার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া নাই; —পড়িবার ঘরে পাঠ্যপুস্তক অযত্নে বিক্ষিপ্ত, কেহই তাহা গুছাইয়া রাখে নাই; উৎসবের অবসানে বিদায়প্রাপ্ত রশুনচৌকির দল আপনার ইচ্ছামতো বিদায়ের সুর বাজাইয়া যাইতেছিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া সুদূর প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন অসমতল 'মেটো' রাস্তায় কদাচিৎ দুই একজন পথিক, ও অদূরবর্তী শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে মৎসলোলুপ দুই একটা উলঙ্গ ধীবর বালককে দেখা যাইতেছিল। সুশীল দৃষ্টি ফিরাইয়া লীলার পুরাতন মলাট ছেঁড়া, আঁকাবাঁকা অক্ষরে পরিপূর্ণ বালীর কাগজের খাতাখানি লইয়া অন্য মনে পাতা উল্টাইতে লাগিল, সহসা একটা জায়গায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লীলা তাহার চিরপরিচিত বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, 'দাদা আজ আমায় এক শিশি দেলখোস দিয়েছে; গন্ধ কেমন জানি না, দাদা যখন দিয়াছে তখন খুব

ভালোই হইবে।' তলায় তাহার নাম। অতি বৃষ্টির অবসানে ডাল নাড়া দিলে, যেমন ঝর্ ঝর্ করিয়া পত্রসঞ্চিত সমস্ত জল ঝরিয়া পড়ে, সুশীলের যত্নরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি তেমনই ঝরিয়া পড়িল। এই কয়টা কালীর অক্ষরে তাহার বালিকা ভগিনীর হৃদয়ের ছবি সে আজ পূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখিল, তাহার প্রত্যেক অক্ষরে যে বিশ্বাস, যে স্নেহ ও সরলতা, যে কৃতজ্ঞতা, ফুটিয়া উঠিতেছিল, জন্মাবধি একত্র অবস্থানেও সে যে কেন তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, তাহাই ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইল। কষ্টের মধ্যে এমন আনন্দও সে জীবনে কখনও পায় নাই।

বিদায়ের দিন লীলার অশ্রুপরিপ্লুত, বিষণ্ন মুখচ্ছবি, স্নেহমণ্ডিত মহিমাময়ী দেবীর মুখশ্রীর মতো তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুশীল ত্রস্ত হস্তে চক্ষু মুছিয়া লীলার অসমাপ্ত ডায়ারীর নীচে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখিল, "লীলা খুব লক্ষ্মী মেয়ে সে এবার ফিরিয়া এলে আর কখনও তাহাকে কিছু বলিব না, এবার হইতে তাহাকে খুব ভালোবাসিব।"

বিয়ে-পাগলা বুড়ো

বেগম রোকেয়া

শুনিয়াছি, সারদা বিল পাসের সঙ্গে সঙ্গে "কচি মেয়ের সহিত বুড়ো বরের বিবাহ নিষিদ্ধ" বলিয়া আর একটি বিল পাস হইবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাশ হইলে শরিয়তের নামে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইত কিনা, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। অদ্য দুই তিন জন বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধের বিবাহের ইতিহাস পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিব। আশা করি, ইহা পাঠে তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না!

॥ ১ ॥

পূর্ববঙ্গের একটি পল্লিগ্রামে একজন সত্তর বর্ষীয় বর ক্রমে সাতজন বিবিকে নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিয়া অষ্টমবার বিবাহ করিতে চাহিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা বেচারার দুর্নাম রটনা করিয়াছিল যে, বুড়াটা বউ-খেকো; কাজেই আর কেহ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হয় না। মাতবর সাহেব বৃদ্ধ হইলেও বিবিধ খেজাবের কল্যাণে তাঁহার মাথার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল; দাড়ি-গোঁফ কলপ-রঞ্জিত করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ মুখশ্রী বেশ সুন্দর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে বাক্স-ভরা রূপার গয়না, একটা সোনার সিঁথি এবং হলুদী মাকড়ী, সিন্দুক-ভরা কাপড়, তবু কোনো হতভাগা তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

অবশেষে পাড়ার কতিপয় যুবকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বহু কষ্টে একটি পাত্রী ঠিক করিয়া মাতবর সাহেবকে জানাইল যে, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেল না; একটি বাল-বিধবা আছে। বয়স একটু বেশি, ২২-২৩ বৎসর, আর একটু হৃষ্ট-পুষ্ট লম্বা গোছের মেয়ে। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা ভালোই, কুমারী যখন পাওয়া যায় না, তা আর কী করা।"

ঘটকেরা বলিল, "বিধবা বটে, তবে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল। তদবধি পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; এখন মুরুব্বিরা তাহাকে পাত্রস্থ করিতে চায়। যদি আপনি পছন্দ না করেন, এ তবে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিলেন, "না, না, এ-সম্বন্ধ ছাড়া হইবে না। বয়স একটু বেশি হওয়ায় সুবিধাই হইবে, ভালোমতে ঘর গেরস্তি করিতে পারিবে।"

যথাকালে মাতবর সাহেব বরবেশে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে। ঘটকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধুমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে।

কনের সম্পর্কের এক নানী এবং পাড়ার ছেলের দল বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া আচার-পদ্ধতি পালন করিতেছে— এ নিয়ম, সে নিয়ম, নিয়ম আর শেষ হয় না। ছোকরাগুলি মুখ টিপিয়া হাসে,

আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নানীবিবির সহিত কথা কহিয়া সেই উপদেশ-মতো কাজ করে। বরের সম্মুখে বড়ো মোটা খেরুয়ার পর্দা, সেই পর্দার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীলোকদের চাপা হাসি শোনা যাইতেছে। বর অধীরভাবে শুভদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; বিলম্বের জন্য মনে মনে গ্রাম্য আচার-পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতেছেন। তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট ক'নের অলঙ্কারের মৃদু ঝনঝনি শুনিতেছেন; আর সতৃষ্ণ নয়নে ক'নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাত্রীর হাত-পা সব মোটা বেনারসি শাড়িতে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না; কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে। চুলের বেণীটা ক'নের পিঠ বাহিয়া ফরাশের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট যে, আর কিছু না হইলেও আমার বউ যেন কেশর-রানি! এ গ্রামে এমন ঘন লম্বা চুল আর কার আছে?

অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্যের পর দর্পণ আসিল, এখন শুভদৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার সময় পর্দার অপর পার্শ্বস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এদিকে বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন;— বউএর মুখে ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ! বউ খিল খিল করিয়া হাসিয়া এক টানে মাথার পরচুলাটা খুলিয়া বরের সম্মুখে রাখিল। হতভম্ব বর তখন দাড়ি-গোঁফশোভিত ক'নেকে চিনিলেন যে, সে তাহার সম্পর্কে নাতি কালুমিয়া। সে দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, "নানা ভাই! শ্যাষে আপনে আমাইরে বিয়া করলেন?" মাতবর সাহেব অতি ক্রোধে কী বলিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "তোমরা যে এমন নাদান, তা জানতাম না।" আর সক্রোধে সেই বাদলা জড়ানো সুন্দর বেণীটাকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন। পরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

॥ ২ ॥

পাটনায় এক ৬৫/৭০ বৎসরের কাজি সাহেব ক্রমাগত কয়েকটি স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও "জরু-খাওকা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সহজে আর জরু ধরিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার মেহদী-রঞ্জিত দাড়ির জালে কোনো সুন্দরীই ধরা পড়িল না।

অবশেষে কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরোক্ত কাজি সাহেবের জন্য ঘটকালী করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন। কন্যা সহজে পাওয়া যায় না; কারণ শহরে যে কয়টি বিবাহ-যোগ্যা পাত্রী ছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে একজনের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা সংগ্রহ করা গিয়াছে; কন্যা পক্ষকে ছয় সাত মাস পর্যন্ত অনেক পর্বী-তেহারী দিতে হইল; চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।

এই প্রকারের অনেক খরচ-পত্র, কাণ্ড-কারখানার পর কোনো এক শুভ দিনে বিবাহের তারিখ ধার্য হইল। যথাকালে বর প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নীচে আনীত হইলেন। এই বিবাহসভায়ও এ রছম সে রছম নানাবিধ মেয়েলী রছম (অর্থাৎ স্ত্রী-আচার) শেষ হইলে পর বর কনের শুভদৃষ্টি হইবার সময় প্রভাত হইয়া গেল। বর সানন্দে দেখিলেন, বালিকা বধূর কপালে নানাবিধ রঙ্গের চাঁদ-তারা চুমকি অওটা হইয়াছে, গাল দুটি আফ্‌সা জড়িত হইয়া ঝকমক্ করিতেছে। সে কী সুন্দর! বধূর সৌন্দর্য উথলিয়া পড়িতেছে। পাটনার নিয়ম অনুসারে ক'নেকে একজন মিরিয়াসিন কোলে তুলিয়া বাসর-ঘরে চলিল, বরের আচকানের সম্মুখের দামনের সহিত ক'নের বেনারসি দোপাট্টার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বর সেই গ্রন্থি ধরিয়া ধীরে ধীরে পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা পাত্রী মিরিয়াসিনের কোল হইতে লাফাইয়া নামিয়া দিল দৌড়। বেচারা কাজি সাহেবের হাতে ক'নের ওড়নার কোণের গ্রন্থি ছিল, সুতরাং অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইল। দৌড়াইবার নির্দিষ্ট পথ পূর্ব হইতেই ঠিক করা ছিল; তদনুসারে পায়ের অলঙ্কারসমূহ ছড়া, মল,

ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমু ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল, বাহিরের পুষ্করিণীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া,-- সেখানে রাখাল ছোকরাগুলি করতালি দিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল। পরে বাগানে দৌড়াইতে গেল, সেখানে মালিরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর পাত্রী গেল নহবৎখানায়, সেখানে বাজনদারেরা তবলা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহারা করতালি দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল, "বা! বেটি বাঃ! দৌড়তি হুয়ী দুল্‌হিন তোমহে মোবারক বড়ে মিঁয়া! আজী ভাগতী হুয়ী দুল্‌হিন্ তোমহে মোবারক বড়ে মিঁয়া!!"

চারিদিকে খুব খানিকটা চক্কর দিয়া ক'নে গিয়া উঠিল কর্তার বৈঠকখানায়। সেখানে অনেক সাহেব-সুবো অভ্যাগত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া আকুল— লুটাপুটি। তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাত্রী একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। বেনারসি শাড়ি দোপাট্টা সব খুলিয়া ফেলিলে দেকা গেল যে, একটি দিব্যকান্তি বালক!! আহা বেচারা কাজী সাহেব!

॥ ৩ ॥

ভাগলপুরের এক স্টেশন-মাস্টার বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র ইত্যাদি বর্তমানেও পঞ্চম বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টারের কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি মুজফ্‌ফরপুররের অধিবাসী। বহুকাল ভাগলপুরে ছিলেন বলিয়া সেখানকার লোকেরা তাহাকে বিলক্ষণ চিনে এবং তাঁহাকে স্টেশন-মাস্টার বলিয়া ডাকিতেই ভালোবাসে।

মুজফ্‌ফরপুরে খাঁ সাহেবের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। স্ত্রী-পুত্র সেইখানেই থাকে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা সব ছোটো ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মেয়েরা বিবাহিত ছিল, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং ছেলেদের বিয়ে-থা দিবার সময় কুটুম্ব সাক্ষাতের সমাদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের গৃহ যখন বধূ, জামাতা, বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই সময় তাঁহার তৃতীয় খানম দেহত্যাগ করিলেন। এবার তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, "দুই-চার বৎসর পরে পৌত্রের বিবাহ দিয়া বধূ আনিবেন নিজে আর বিবাহ করিবেন না।" কিন্তু খাঁ সাহেব বলিলেন, "ঘর সামলাইবে কে? বড়ো বউ, মেজ, সেজ এবং ছোটো বউ এরা তিন চারি বা ততোধিক সন্তানের মাতা হইয়াছে সত্য; কিন্তু হাজার হউক তবু তাঁহারা ছেলে মানুষ বই তো নয়। এত বড়ো সংসার দেখিবে কে?" বন্ধুদের সহানুভূতি না পাইয়া শেষে তিনি অতি গোপনে এক দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পত্নীরূপে ঘরে আনিলেন। বউয়েরা সে সময় পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বাড়িতে কেহ ছিল না।

বউয়েরা বাড়িতে আসিয়া জানিতে পারিল যে, তাহাদের নতুন শাশুড়ি আসিয়াছেন। তাহাদের দেখিয়া শাশুড়ি তাড়াতাড়ি কামরার দ্বারে অর্গল দিলেন। বউয়েরাও আড়ি পাতিয়া রহিল। যেই একবার দ্বার খুলিল, অমনি সেজ বউ একেবারে শাশুড়িকে কোলে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল। ছেলেমেয়ের দল দুলাইন দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এ বলে "দুলাইন দাদী", ও বলে "দুলাইন নানী!"

ফল কথা, চতুর্থা খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না, কেবল পৌত্রী দৌহিত্রীদের সঙ্গে তাশ খেলে আর গল্প করে। এইজন্য খাঁ সাহেবকে পঞ্চম বার বিবাহ করিতে হইতেছে। পোড়া মুজফ্‌ফর পরে বিবাহের সুবিধা না হওয়ায় তিনি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা, দু'ই পাইলেন।

যথাসময়ে খাঁ সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল, শুভদৃষ্টিও হইল। বাসর-ঘরে পাত্রীকে লইয়া

যাওয়া মাত্র তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সেবা শুশ্রূষার জন্য স্ত্রী লোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাজেই খাঁ সাহেবকে বাহিরে যাইতে হইল।

খাঁ সাহেব কয়েক দিন শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করিয়া শেষে অন্যত্র বাসা লইলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একবারও নববধূকে দেখিতে পান নাই, কারণ সর্বক্ষণ হাকিম, ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভিড় থাকিত।

অবশেষে স্থির হইল যে, দুলাইনের পারিবারিক হাকিমের চিকিৎসা হইবে। সেজন্য প্রতিদিন সকালে হাকিম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা * পাঠাইতে হইবে। চাকর-বাকর ঠিকমতো কথা শুনে না, কারুরা নিয়মমতো হাকিমের নিকট প্রেরিত না হওয়ায় রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগত্যা খাঁ সাহেব নিজেই প্রতিদিন সকালে আসিয়া কারুরা লইয়া হাকিম সাহেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।

হাকিম সাহেব প্রত্যহ স্মিতমুখে ৫ টাকা দর্শনী লইয়া কারুরা দেখিতেন। আর দুলাইনের আরোগ্য বিষয়ে খাঁ সাহেবকে আশ্বাস দিয়া নানাবিধ দুর্মূল্য ফল— যথা, আঙ্গুর, বেদানা, বিহী— বিশেষত যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। খাঁ সাহেব জগৎ ছানিয়া সেই সব ফল পথ্য আনাইয়া শ্বশুর বাড়িতে হাজির করিতেন।

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইলে একজন চাকর একটু রুক্ষ্মভাবে খাঁ সাহেবকে বলিল, "কী আপনি রোজ রোজ কারুরা লইতে আসেন? এখানে আর কারুরা নাই, আমাদের সকলেরই কারুরা পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। আর দরকার নাই।" তিনি তখন একবার অন্দরে গিয়া দুলাইনকে দেখিতে চাহিলে, সে বলিল, তাঁহার দুলাইন বলিয়া কোনো পদার্থ এ বাড়িতে নাই।

এ কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আত্মসংযম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি সে কে?" উত্তর হইল, "সে বাজারের অমুক নর্তকী ছিল, সেদিন সে ভাড়ায় আসিয়াছিল — চলিয়া গিয়াছে।"

খাঁ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক উকিলের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন যে, এইসব বেইমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা করা যায় কিনা। উকিল সাহেব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনার লাঞ্ছনা যথেষ্ট হইয়াছে; এখন আদালতে নালিশ করিয়া আরও খানিকটা লাঞ্ছনা কিনিয়া অর্থ নষ্ট করিতে চাহেন কী? আপনি বরং ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিয়া যান।"

বৃদ্ধ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "জরা খেয়াল করেন কি বাত— মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া— কোয়ী হাতভী না আয়ী, আওর মালাউন বদ বখ্‌তোনে মুঝসে নওকরোঁকো কারুরা তক ঢোলায়া! হু— হু— হু!!

মা

অনুরূপা দেবী

মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার একমাত্র সন্তানটিকে জন্ম দিয়া যখনই রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই তাহার পিতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার দুশ্চিন্তাপীড়িত চিত্ত ভাবনার ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

গুলজান শিশুর ধাত্রী। সে তাহার উল্‌কিরঞ্জিত শ্যামল অনাবৃত বাহুর উপরে তাঁহার শুভ্র মল্লিকা ফুলের মতো সুন্দর শিশুটিকে দোলাইয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিতে বলিতে সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

"মা রাজা কা পটলন না রাজাকা ঘোড়া,—
মুলুকমে বাবুয়াকা কোই নেই জোড়া।
আগে যায় রোসনাইয়া, পিছে যায় হাতি,
মেরি গদিপর চলে বাবুয়া, মাথে লাল ছাতি।"

মিসেস ম্যাকোহন জ্বরতপ্ত ললাটে উত্তপ্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত সাধের ধন তাঁহার—তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও অমনি করিয়া কোলে লইয়া আদর করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গুলজান তাহাকে তাহার সোলার বিছানায় শোয়াইয়া সাবধানে নেটের ছোটো মশারিটি তাঁহার উপরে টানিয়া দিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার বিবাহিত তিনটি বৎসর এই বিদেশি সঙ্গিনী গুলজানের সেবা যত্ন ও আন্তরিক হৃদতায় তাহার সহিত প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে যেন তাঁহার এ সংসারের একমাত্র সহায়রূপেই দেখিতেছিলেন। রোগ যতই বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল বিদায়ের কাল নিকটতর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী তাঁহার হতভাগ্য সন্তানের জন্য ইহাকেই তত নির্ভর করিয়া ধরিতেছিলেন। ছেলেটি যেন গুলজানের প্রাণ। তাহারি বয়সী তাহার নিজের ছেলে ইয়াসিনের চেয়েও সে যেন তাহাকেই অধিকতর ভালোবাসে।

গুলজান ভূমে বসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল; বিষণ্ণ চক্ষু তাঁহার জ্যোতিহীন উৎসুক নেত্রের সহিত মিলিত করিয়া কহিল "মেমসাহেব!"

"প্রতিজ্ঞা করো গুলজন যে আমি মরে গেলে তুমি আমার যাদুকে আমার জেসুনকে ছেড়ে যাবে না? যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ইয়াসিনের মতন ভালোবাসবে?" দুর্বল হস্ত গুলজানের পরিপুষ্ট স্থূল বাহুর উপরে স্থাপন করিয়া স্নেহকাতরা জননী ধাত্রীর মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। যেন এই অনুরোধটি রক্ষিত হইতে তিনি যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য

প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। গুলজান তাহার 'ছোটো বাবা'কে তাহার ইয়াসিনের মতো ভালোবাসা দিতে হৃদয়ের সঙ্গেই প্রস্তুত আছে, তাহার জন্য তাহাকে আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না। কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাতর চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে গুলজান বলিয়া গেল, "আমার নামে শপথ, আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। নিজের ছেলের চেয়েও বেশি যত্নে তাকে পালন করব।"

মিসেস ম্যাকোহনের নেত্রজ্যোতি প্রদীপের শেষরশ্মিটুকুর মতো পরম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

॥ ২ ॥

মেমসাহেবের মৃত্যুর পর কাপ্তেন সাহেব গুলজানকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটাকে বড়োই ভালোবাসো দেখতে পাই। ওটাকে আমি তোমাকে দিলাম। দশ টাকা করে তুমি বেশি পাবে, ওর সব ভার তোমার। আমায় কোনো রকম বিরক্ত করো না—ও কি! কেঁদে যে অস্থির হলে! যাও যাও, আমি কান্নাকাটি দেখতে পারিনে যাও—"

কে জানে কেন ছেলেটার জন্মদিন হইতেই কাপ্তেন সাহেবের তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুকী বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। একটা রাস্তার কুড়নো ছেলের উপর লোকের যেটুকু মায়া জন্মায় নিজের সন্তানের উপর সেটুকুও মমতা ছিল না। পত্নীর প্রতি ভালোবাসার অভাবই বোধহয় এ ভাবের মূলগত কারণ।

গুলজান বেতনবৃদ্ধির জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। বাছাকে সে নিজের কাছে পাইয়াছে, ইহাই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার।

বৎসর ঘুরিয়া গেল। জেসুন ও ইয়াসিন দুইটি বিভিন্ন জাতীয় শিশু একখানি স্নেহতপ্ত অঙ্ক জুড়িয়া এক সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটি সবল শাখা দুইটি কোমল লতাকে যেমন সমান স্নেহে বক্ষে ধরিয়া থাকে গুলজানের চিত্তও সেইরূপ তাহার দেহসম্ভূত ও প্রতিপালিত শিশু দুটির মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্যবোধ করিত না।

মেজর লরির স্ত্রীর সহিত ছেলে দুটিকে লইয়া গুলজানকে কাপ্তেনসাহেব পাহাড়ে পাঠাইলেন।

পাহাড় হইতে ফিরিবার দিন মিসেস লরি তাহাকে নূতন প্রভুপত্নীর সংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "কাপ্তেন সাহেব তোমায় পূর্বে জানাতে নিষেধ করেছিলেন তাই এতদিন বলিনি।"

গুলজানের বর্ণ সাধারণ নিম্নশ্রেণির ভারতীয় স্ত্রীলোকের মতো কালো ছিল না। তাহার শ্যামবর্ণ মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, গৃহে বিমাতা আসিয়াছে। যদি সে বাছাকে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লয়?

ট্রেন হইতে নামিবার সময় তাহার পা কাঁপিতেছিল; শিশুকে সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনিচ্ছুক ভাবেই নামিল।

স্টেশনে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না, বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে বারান্দায় সে কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাঁহার নূতন স্ত্রীকে দেখিল। নূতন গৃহিণী সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্না। প্রথম দর্শনেই তাঁহার বেশভূষা ও ধরনধারণে গুলজানের চিত্ত তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হায়! তাহার মেমসাহেব সেই নম্রশান্তকরুণহৃদয়া নারী তিনি কখনও এমন দামি পোযাক এমন উজ্জ্বল হিরার আংটি পরিতে পান নাই। নূতন মিসেস ম্যাকোহন ঈষৎ হাসিয়া শিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গুলজানের বুকটা অমনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। শিশু কিন্তু বিমাতার কোলে গেল না, সে দুই হাতে ধাত্রীর কুর্তাটা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিল। কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন,

"কোনো দরকার নেই ক্লেরা। ওটাকে আমি আয়ার হাতেই দিয়েছি। ছেলের হাঙ্গাম তোমায় বইতে হবে না, চলো আমরা বেড়িয়ে আসি"—

তাহার বুকের দুলালকে পাছে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে গুলজানের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—মনিবের কথা শুনিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশুকে সে চুম্বনের পর চুম্বনে বিব্রত করিয়া তুলিল।

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। গুলজান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো তাহার অধিকার এখানে প্রতি মুহূর্তেই অস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহিণী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সপত্নীসন্তান সাধারণত বিমাতার স্নেহভাজন হইতে পারে না, বিশেষ আবার যেখানে স্বয়ং শিশুর পিতাই তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন। জেসুন তাহার সৌখিন বিমাতার চক্ষুশূল হইতেছিল।

একদিন গুলজান নিজের ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মিসের ম্যাকোহন তাঁহার মেহগনি ক্রস দিয়া শিশুরে প্রহার করিতেছেন। ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া সে প্রভুপত্নীর হস্ত হইতে ক্রসখানি টানিয়া লইয়া সবেগে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীব্র ভর্ৎসনাসূচক স্বরে উচ্চারণ করিল--"মেমসাহেব!"

তারপর আহতপৃষ্ঠ রোদনকম্পিত শিশুকে কোলে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিসেস ম্যাকোহন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "পাজি ছেলেটাকে তুমি যে রকম নষ্ট করচ তাতে শীঘ্রই সে ডাকাতের দলে ঢুকবে দেখছি। আর না!—আমাকে শোধরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গুলজান সব কথা দাঁড়াইয়া না শুনিয়াই চলিয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের ভিতরে নিজের ব্যবহারের ফল, আসন্ন বিপদের একটা ছায়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শিশুকে পুরাতন ভৃত্য ফৈদুর কাছে রাখিয়া একটু মিছরি হাতে দিয়া সে সশঙ্কচিত্তে প্রভুপত্নীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, "মেমসাহেব! নিজের ব্যবহারেব জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হচ্ছি, দয়া করে এবার মাপ করুন, আর কখনও আমি এ রকম করবো না। ছেলেটা আমার প্রাণ তাই হঠাৎ বড়ো রাগ হয়ে গেছলো।'

মিসেস ম্যাকোহন হিন্দি ভাষা ভালো বুঝিতেন না, তথাপি যেটুকু বুঝিলেন তাহাতে তাঁহার সংকল্প শিথিল হইল না। স্থির কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার মাহিনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্চে, তুমি এখনি যাও, ছেলে তোমার নয়, আমি ওকে সোজা করবার ব্যবস্থা করচি।"

গুলজান মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। আর্তভাবে সে প্রভুপত্নীর পদতলে বসিয়া দুই হাত যুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মেমসাহেব আমায় তাড়িয়ে দিবেন না। মৃত মেমসাহেবের কাছে আমি সত্য করেছি কখনও তাঁর ছেলেকে ছেড়ে যাব না। হয় দয়া করে আমাকে রাখুন, না হয় আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন।"

"এ মাগির তো স্পর্ধা কম না!" ঘৃণার সহিত গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। কাপ্তেন সাহেব গুলজানের কণ্ঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কী ক্লেরা?"

ক্লেরা কহিল. "আমি ওকে মাইনে চুকিয়ে দি· য় চলে যেতে বলচি, কিন্তু উনি বলচেন কিছুতেই যাবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব ভ্রূভঙ্গি করিয়া দ্বারের উপরে মুষ্টাঘাত ও ভূমে পদাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তুমি যখন যেতে বলছো তখন নিশ্চয়ই যেতে হবে, যাবে না কি!"

মুহূর্তে গুলজানের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া দুই চক্ষু আগুনের মতো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির কণ্ঠে কহিল,—

"হ্যাঁ সাহেব. আমি যাচ্ছি।" তারপর সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশু তখনও অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিল, পৃষ্ঠের কোমল চামড়া রাঙা হইয়া রহিয়াছে, মিছরি সে

স্পর্শও করে নাই। ফৈদু শিশুকে প্রত্যার্পণ করিবার সময় ধাত্রীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

কাপ্তেন সাহেব অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নূতন সঙ্গিনীর সহিত ক্লাবে চলিয়া গেলেন। চার ঘণ্টার পূর্বে তাঁহারা ঘরে ফিরিবেন না। গুলজান মনিবপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে আসিল। একবার সে শিশুকে ভূমে নামাইয়া নিজের ছোটো সিন্দুকটি খুলিয়া তাহার সঞ্চিত টাকাপয়সাগুলি দড়ির গেঁজের মধ্যে পুরিয়া কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধিয়া লইল,তারপর দুটি শিশুকে দুই কোলে লইয়া ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ঊর্ধ্বে চাহিয়া মনে মনে কহিল, "মেমসাহেব! তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—সে সত্য রাখার জন্য আজ গুলজান এই পাপ করতে বাধ্য হল। তুমি স্বর্গে থেকে সাহায্য করো। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলেকে নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে দিতে পারব না।"

শিশুর সহিত গুলজানের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ প্রচার হইলে কাপ্তেন সাহেব কোনো রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই স্ত্রীকে কহিলেন, "আঃ যেতে দাও না ক্লেরা, কী হবে সেটাকে নিয়ে? তোমার আমার চেয়ে সে স্ত্রীলোকটা বরং ছেলেটাকে পেয়ে ঢের বেশি খুশি থাকবে।"

কথাটা সত্য। তথাপি লোকে কী বলিবে? এই ভাবিয়া মিসেস ম্যাকোহনের বিবেক এই নিষ্ঠুর যুক্তির বিপক্ষে জাগরিত হইয়া উঠিল।

একটা আয়া দুই কাঁধে দুইটা সমবয়স্ক শিশু—তাহার একটি সাদা ইয়োরোপীয় এবং অপরটি পশ্চিমী মুসলমান শিশু—লইয়া পলাতক, ইহাদের ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে, এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ একটি দুটি তিনটি ছেলে কোলে-কাঁখে-করা স্ত্রীলোক পথে ঘাটে অনেক দেখা গেল। শুভ্র শিশু সংযুক্ত নারী কোথাও মিলিল না।

॥ ৩ ॥

গুলজান গোরখপুর হইতে পলাইয়া হাঁটাপথে পশ্চিমবঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদ্মাপারে নিজের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতার কাছে আশ্রয় লওয়ার পর যোলো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইয়াসিন এখন সুশ্রীসকল যুবাপুরুষ। এখন সে মাতুলের গাড়িঘোড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার। গুলজান তাহার জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করিতে এখনও শ্রান্তি বোধ করিত না। সে মায়ের চেয়ে দাসীর মতোই তাহার সেবা করিত। ছেলেও মা ভিন্ন কাহাকেও চিনে না, এখনও সে মায়ের কোলের শিশু, আদরের দুলাল।

শরীরের শক্তিতে মনের তেজে ইয়াসিন নিজের কার্যে বেশ একটু উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কী ছিল তাহা সে নিজেই জানিত না কিন্তু এইটুকু সে লক্ষ করিয়াছে যে তাহার মুখে চাহিয়া দেখিলেই তাহার ইংরাজ আরোহীর চোখে একটা বিস্ময়পূর্ণ স্নেহ- করুণার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত এবং সে ভাড়াটা বেশ ভালো রকমই লাভ করিয়া আসিত। আর ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার যে, ওই সকল সুপরিচ্ছদধারী সুন্দরমূর্তি নর-নারীদের দেখিলে তাহারও প্রাণের মধ্যে কী যেন একটা আকুলতা উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিত;তাহাদের সান্নিধ্য সে পাথরের চুম্বক আকর্ষণের মতো কিছুতেই যেন ছড়াইয়া লইতে পারিত না।

একদিন গুলজান দেখিল, ইয়াসিন নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি-বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময়ব্যাকুলনেত্রে নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। গুলজানকে দেখিয়া সে ইঙ্গিতে কাছে আসিতে বলিল। কম্পিতপদে গুলজান নিকটে আসিলে সহসা যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "মা, এর মানে কী আমায় বলো, কেন আমার গা এত সাদা? আমি শুনেছি, আজই শুনেছি—লোকে

বলে—ওঃ আমি বলতে পারিনে—সে কী ভয়ানক কথা—বলে আমি তোমার জারজ। আমি সাহেবের ছেলে?"

সর্পাহতের মতো গুলজান হইয়া রহিল, তাহার মুখে বাক্য সরিল না। সুদীর্ঘ দিনে যে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল সহসা তাহা মেঘোচ্ছিন্ন সূর্যকিরণের মতো ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর সন্দেহে ইয়াসিন উন্মাদের মতো লাফাইয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিল।

"সত্যি, তবে সত্যি। আমি তবে সাহেবের ছেলে?"

যন্ত্রচালিতের মতো গুলজান উত্তর করিল, "হ্যাঁ"।

"রাক্ষসি।" ইয়াসিন বাঘের মতো গর্জিয়া উঠিল, "কেন আমায় নুন খাইয়ে মারিসনি?"

গুলজানের সর্ব শরীর কাঁপিতেছিল। আত্মপরিচয় জানিয়া লইয়াছি, এইখান হইতেই সে তবে নিজের জন্য পথ নির্বাচন করিয়া লউক। সে যে কোন্ পথ বাছিয়া লইবে ইহাও সে জানিত। কম্পিতস্বরে কহিল, "বাছা, আমার সব কথা না শুনে তুমি রাগ করো না, আগে সবটা স্থির হয়ে শুনে যাও"—এই বলিয়া সে সমস্ত কাহিনিটি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল। সে বলিল, "তুমি সাহেবের ছেলে এ কথা সত্য কিন্তু আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি। আমার গর্ভজাত সন্তান ইয়াসিনের যোলো বৎসর পূর্বে মৃত্যু হয়েছে; তুমি মেমসাহেবের পুত্র। তোমার বাপ তোমার মাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, তোমার প্রতিও তাঁর একটুকু স্নেহ ছিলনা, তোমার মা মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণেই আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন যে জীবন থাকতে আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।"

তারপর সে অত্যন্ত মৃদু ও হৃদয়ভেদী স্বরে তাহাদের পলায়নের কাহিনি বিবৃত করিতে লাগিল, শুনিয়া ইয়াসিন কিছুই বলিল না। সে যেন অকস্মাৎ একটা প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

গুলজান কহিতে লাগিল—"শুনলুম আমাদের ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে যে কি হবে আমার জানাই ছিল, মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। গোরখপুরের শালের জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁহারই কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম। তিনি বললেন—দুজন সঙ্গে থাকলে ধরা পড়বে, একজনকে ত্যাগ করে যাও। পরামর্শ উচিত মতোই কিন্তু করা বড়ো কঠিন। কাকে ত্যাগ করব? কোথায় রাখব? বিশ্বাস করবার কে আছে যে পুরস্কারের লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবে না? আমি তোমার মাকে স্মরণ করলুম। বললুম—"আমার সমস্যা দূর করে দাও, নিজের ছেলের মায়ায় আমি যেন তোমার ছেলেকে ফেলে না যাই। তার বিমাতা বড়োই নিষ্ঠুর।" বোধহয় তোমার মা সে কথা স্বর্গে থেকে শুনেও ছিলেন। সেই রাত্রেই ফকিরের আশ্রমে আমার নিজের ছেলেকে ফেলে তোমাকে তার কাপড় পরিয়ে ও একরকম রং মাখিয়ে নিয়ে আবার পথে বার হলুম। ইয়াসিনের ক্ষীণ ক্রন্দন ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে আমার কানে বাজতে লাগল, জ্বরে সে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্য যে সবার চেয়ে বড়ো! ঈশ্বর যে সকলেরই উপরে বাপ! আমি যে তোমার মাকে কথা দিয়েছিলুম! এখানে আসবার পর চিঠি লিখে খবর নিয়েছিলুম, সেই রাত্রেই সে মারা গ্যাছে। আমি মনে করি তুমিই আমার ইয়াসিন।

এখন তুমি বড়ো হয়েছ, তোমার পথ ঠিক করে নাও—তবে আমার প্রতি এইটুকু দয়া করো, যেখানে থাকো আমাকে তোমার বাড়ির দাসী করে রেখো।"

ইয়াসিন অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ সে স্বপ্নমুগ্ধের মতো এক পা এক পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটিও কথা কহিল না। গুলজানও তাহাকে বাধা দিল না। নিজে সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল।

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া আবার ইয়াসিন গৃহে ফিরিয়া আসিল। গুলজানও জানিত যে সে আর একবার আসিবে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইংরাজটোলায় আজ ইয়াসিন অনেক ঘণ্টা কাটাইয়াছে। খোলা জানালার নেটের পর্দা বাতাসে কাঁপিয়া সরিয়া যাইতেছিল, ভিতরে শুভ্র

আস্তরণবিস্তৃত টেবিল ঘেরিয়া চৌকিগুলি সাজান, হাস্যকৌতুকোচ্ছ্বসিত সুপরিচ্ছদাধারীগণ সেই চৌকি দখল করিয়া রহিয়াছে। রৌপ্য চামচের টুন্ টান্ শব্দে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সুপ্রচুর সদ্‌গন্ধে বায়ু পূর্ণ করিয়া মধ্যাহ্নভোজন চলিতেছে। সন্ধায় কোনো গৃহে মধুরস্বরে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, কোনো উদ্যানপথে শ্রান্ত প্রণয়ী দুইখানি ব্যগ্রহস্তে বাঁধা পড়িলেন। কোথাও বা ঠেলাগাড়িতে শিশুকে বসাইয়া পার্শ্বে জনক-জননী স্নেহহাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ইয়াসিনের প্রাণের ভিতরে ব্যাকুলতা অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এই দীনহীন অশ্বপালক—ছিটের মেরজাই গায়ে নাগারা জুতা-পরা নগণ্য ঘৃণিত ইয়াসিন; সে কিন্তু উহাদেরই মতো ইংরেজসন্তান, ইহারা তাহার আপনার লোক! সেও এইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই মুহূর্ত হইতেই ক্রয় করিতে সক্ষম। শুধু একবার ছুটিয়া গিয়া ওই যে—ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার আদালত হইতে শতপ্রাণীর মুণ্ডদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া টমটম চড়িয়া ফিরিতেছিলেন তাঁহাকে সব কথা বলিবার মাত্র অপেক্ষা!

কিন্তু—না, না, একি সে ভাবিতেছে! সে পাগল হইয়া যাইবে না কি? সে তো গুলজানের কথা ভাবিতেছে না? ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহার কাহিনির সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন? এবং তারপর পরের ছেলে—ইংরেজের সন্তানকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে চুরি করিয়া আনার জন্য তাহাকে যখন চালান দিবেন? উঃ না। ঈশ্বর তাহাকে এই দুরন্ত লোভ হইতে রক্ষা করুন!

গভীর অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পল্লিতে ক্বচিৎ কোনো ক্ষুদ্র জানালার ভগ্ন কপাটের ফাঁক দিয়া কেরোসিনের প্রচুর ধূম্রের সহিত ক্ষীণালোক রেখা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভিতরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তীব্রস্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছিল। অস্ফুট নক্ষত্রালোকে গুলজান দাওয়ায় চারপায়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইয়াসিন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, গুলজানকে ফাঁসাইয়া সে নিজেকে কাপ্তেন ম্যাকোহনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না—কিছুতেই না।। পথে দুইজন ইংরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেও কৌতূহলী হইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ তুলিয়া তাহাদের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একজন ইংরাজ অপরকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! নিশ্চয়ই এ ছেলেটি একজন ছদ্মবেশী ইউরোপিয়ান্!" বাঘের মতো গর্জিয়া উঠিয়া সে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল, গর্জন স্বরে কহিয়া উঠিল, "চুপ রও।"

ইংরাজ দুজন উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। রাত্রের বাতাস কেবলি বিলাপের নিঃশ্বাসের মতো ঘরে ও বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দু একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠশব্দ আর্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাধ্বনির মতো শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান ডাকিল—"ইয়াসিন।—জেসুন বাবা।"

জেসুন তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—"মা।"

লতা

উর্ম্মিলা দেবী

॥ ১ ॥

লতা আজ আর এ সংসারে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের করুণ ইতিহাসটুকু আজ আমি সকলের নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলাম না। লতা অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, আজ তাহার কথা স্মরণ হইলে আমার বুকের খানিক অংশ শূন্য বলিয়া মনে হয়।

শিশুকাল হইতেই লতার স্পভাবটি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। যে বয়সে ক্ষুদ্র শিশুগণ হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া, ঝগড়া মারামারি ও দৌরাত্ম্য করিয়া পাড়া মাথায় করে, সে বয়সেও লতা খেলাধুলা ছাড়িয়া নদীর পাড়ে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালোবাসিত।

ক্ষুদ্র নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারই তীরে লতাপাতা ঘেরা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি। গৃহে বৃদ্ধা বিধবা ঠাকুরমা ও বিধবা মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। লতার এক কাকা ছিলেন, তিনি বিদেশে চাকুরি করিতেন। পর পর তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর লতা জন্মিয়াছিল। জীবিত সন্তানের শুভাগমন উপলক্ষে যখন গৃহ আনন্দোৎসবে মগ্ন তখন সকল আনন্দ নিরানন্দে মগ্ন করিয়া তিন দিনের মধ্যে লতার পিতা দেহত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সকলেই তাহাকে 'অপয়' অলক্ষণা নামে অভিহিত করিত, কেবল তাহার সদ্য বিধবা দুঃখিনী মাতা তাহাকে দ্বিগুণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেন। আহা! জন্মিয়া যে একদিনের জন্যও পিতৃস্নেহ পাইল না তাহার মতো অভাগিনী জগতে কে আছে, মানুষে কোনো প্রাণে তাহাকে দোষী করে! পিতার মৃত্যুর জন্য কী সে দায়ী? তাঁহার অভাবে অন্য কাহারও অপেক্ষা কী তাহার ক্ষতি কিছু কম হইয়াছে, এইসব চিন্তার পর দুঃখিনী বিধবা চক্ষের জলে ভাসিয়া লতাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন।

ক্ষুদ্র লতা একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর মুখে অদ্ভুত গাম্ভীর্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। কেহ কখনও লতাকে উচ্চ হাস্য করিতে শোনে নাই, তাহার সুন্দর মুখখানিতে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহা ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া যাইত। সে একা একা খেলিতেই ভালোবাসিত, পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাহার সহিত খেলা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। মা যখন বলিতেন, যা না লতা ওদের সঙ্গে খেল্‌গে যা, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লতা উঠিত। সে মার কথায় অবাধ্য কখনও হইত না। কিন্তু পাড়ার শিশুরা যখন দেখিত লতাকে লইলে তাহাদের খেলা মোটেই জমে না তখন তাহারা লতাকে ছাড়িয়া দিত, লতাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সে প্রায়ই নদীতীরে বসিয়া গালে হাত দিয়া কী ভাবিত। ক্ষুদ্র নৌকাগুলি পাল তুলিয়া বাতাসের বেগে উড়িয়া যাইতেছে, দুধের মতো সাদা হাঁসগুলি পালে পালে সারি সারি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলি কলরব করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, — লতা বসিয়া এইসকল দেখিতে ভালোবাসিত। পরপারের ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণির মধ্য দিয়া অপরিসর রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া দলে দলে স্ত্রীলোকগণ কলসী কক্ষে জল তুলিতে ও স্নান করিতে আসিত। তাহারা জলে নামিয়া ঝাঁপি-ঝাঁপি করিত, হাসি গল্প, কলহ বিবাদ করিত, কেহ কেহ বা এ উহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে। লতা বড়ো বড়ো চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া তাহাদের রকম সকল দেখিত। মাঝে মাঝে সে আঁচল করিয়া ফুল তুলিয়া আনিত, জলে পা ডুবাইয়া ঘাটে বসিয়া ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথিত; গাঁথিতে গাঁথিতে অর্ধগ্রথিত মালা তাহার শিথিল হস্তচ্যুত হইয়া কখন যে পড়িয়া যাইত তাহা সে নিজেই জানিত না।

তাহার এই সকল ভাব দেখিয়া, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ "বোকা মেয়ে" "হাবা মেয়ে" নামে তাহাকে অভিহিত করিত। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে বড়ো ঘেঁষিত না। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা এই অলক্ষণা নাতনিটিকেই তাহার পুত্রের মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া, প্রথম হইতেই তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভাবের পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না লতা যদি অন্যান্য শিশুদিগের মতো হাসির লহর তুলিয়া দুষ্টামী ও নানারূপ ফন্দী করিয়া তাহার ঠাকুরমার চিত্ত জয় করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে কী হইত বলা যায় না— কিন্তু লতারও সে বিষয়ে কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। তাহার ক্ষুদ্র শিশু প্রাণে এই নিকটতম আত্মীয়ার সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাবই লক্ষিত হইত। তাহাকে অত্যধিক আদর যত্ন করিবার অপরাধে তাহার মাতার প্রতিও তাহার ঠাকুরমা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পঞ্চম স্বর সপ্তমে তুলিয়া তিনি যখন বধূর উদ্দেশে বলিতেন,—"বলি হ্যাঁগা বউমা! মেয়ের আব্দার এত কেন তোমার কী একটু লজ্জাও নেই বাছা! যে অপয়া মেয়েটা তোমার অমন দেবতার মতো স্বোয়ামীকে খেলে তাকেই আবার এত যত্ন আত্তি, ধন্য যা হোক! কলিকালে কতই দেখব! আমাদের কালে হলে অমন অলুক্ষুণে মেয়ের দিকে কেউ ফিরেও চাইত না।" তখন ক্ষুদ্র শিশু ঠাকুরমার কথার অর্থগুলি না বুঝিলেও, মাতার অঞ্চলের আড়াল হইতে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। শ্বশ্রূর কর্কশ বাক্যে বধূর শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে বড়োই আঘাত লাগিত। সে কোনো কথার উত্তর দিত না, পাছে চক্ষে অশ্রু দেখিলে শ্বশ্রূ আরও বিরক্ত হন এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি লতাকে কোলে তুলিয়া কার্যান্তরে প্রস্থান করিত। হৃদয়ের বেদনা যেদিন অসহনীয় হইত সেইদিন সে ঠাকুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুমোচন করিত। সজল নয়নে যুক্ত করে বলিত, "ঠাকুর! পিতৃহীনের পিতা তুমি, আমার এই পিতৃহীনা শিশুর মঙ্গল করো।"

ক্ষুদ্র লতা আর কিছু না হইলেও ইহা বুঝিত ঠাকুরমা তাহার স্নেহময়ী মাতাকে তিরস্কার করিতেছেন। তাই ঠাকুরমার প্রতি তাহার মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিত।

লতার গাম্ভীর্যের বাঁধ ভাঙ্গিত তাহার মাতার নিকট। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের রাত্রে যখন তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যার উপর তাহার মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন তখন লতার মনের বাঁধন খুলিয়া যাইত। মাতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথাগুলি মায়ের কাছে বলিত। তারপর নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিত।

॥ ২ ॥

এইরূপ লতা কৈশোরে পদার্পণ করিল। তাহার স্ফুটনোন্মুখ দেহে লাবণ্য উথলিয়া পড়িত নির্নিমেষনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মাতা মনে মনে বলিতেন—"আজ তুমি কোথায় প্রভু।

যে পাঁচদিনের শিশুকে আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলে আজ তাহাকে দেখিলে যে তোমার হৃদয় গর্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইত।"

দ্বাদশবর্ষীয়া লতা নিঃশব্দে গৃহকার্য করে, ঠাকুরমার পূজার ফুল তোলে, গৃহকর্মে মাতার সহায়তা করে, গোপীনাথের পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। এখনও তাহার বদনে তেমনই গাম্ভীর্য, —নয়নে তেমনই উদাস দৃষ্টি! তাহার ঠাকুরমাও এখন তাহার উপর সদয়।

লতার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়, কিন্তু বিবাহের চেষ্টা ও উদ্যোগ করে কে? তাহার খুল্লতাত বিদেশে থাকেন, দুই তিন বৎসর অন্তর বাড়ি আসেন। কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধা শ্বশ্রূর কখনও বনাবনি হইত না, সুতরাং পুত্রের কর্মস্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। পুত্রও মাসে মাসে খরচের অর্থ প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, মাতা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং পিতৃহীনা লতাকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার কোনো চেষ্টাও করেন নাই। তিনি তাঁহার মুখরা স্ত্রীটিকে একটু ভয় করিয়াই চলিতেন। আর বিশেষত গৃহে বিগ্রহের সেবা তো বন্ধ করিলে চলে না। লতার মাতা ও পিতামহী তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া কোনো উত্তর না পাইয়া, হতাশ হইয়া যখন প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন তখন বিধি সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

প্রসাদপুরের জমিদার হরকান্ত চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মলকান্ত এক বন্ধুর সহিত শিকারে আসিয়া একদিন দৈবক্রমে লতাকে দেখিয়া গেল। সদ্যস্নাতা মুক্তকেশী লতা তখন নদীতীরে পা ছড়াইয়া দিয়া গোপীনাথের পূজার জন্য মালা গাঁথিতেছিল।

তিনদিন পর জমিদারগৃহ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যখন লোকজন আসিল, তখন লতার মাতা রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া হাতা বেড়ী ফেলিয়া দিয়া তিনি গোপীনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন কী আজ সত্যই রাজরাণী হইতে চলিল, পরলোক হইতে তাঁহার দেবতা কী আজ সকলই জানিতে পারিতেছেন? তাহা না হইলে বুঝি তাঁহার সুখ সম্পূর্ণ হইবে না।

জমিদার গৃহে বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লতার কাকা ছুটি লইয়া আসিলেন। লতার কাকিমা কত যত্ন করিয়া লতাকে সাজাইতে বসিয়া গেলেন। লতাদের পক্ষ হইতে না হইলেও, জমিদারের পক্ষ হইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জমিদার মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যাপক্ষের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিলেন।

বিদায়ের পূর্বক্ষণে জামাতার হস্তে কন্যার হস্ত তুলিয়া দিয়া লতার মাতা ছল ছল চক্ষে যখন বলিলেন,—"দুঃখিনীর দুঃখের ধন তোমায় দিলাম বাবা! তাকে যত্ন করো—আর কী বল্‌ব"—

অশ্রুজলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। নির্মলকান্ত তখন কোনো কথা না কহিয়া, দুই হস্তে শ্বশ্রূর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। তাহার চক্ষুও তখন সিক্ত। আর লতা? লতা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মাতার অশ্রুবিবর্ণ মুখের দিকে কাতর নেত্রে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারপরে লতা বহু সমাদরে, ঢাক, ঢোল সানাই মুখরিত, আলোকমালায় সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীতে, পুরনারীরা শঙ্খরোলমধ্যে শ্বশুরালয়ে গৃহীত হইল।

প্রাঙ্গণে পালকি লাগিতেই সহাস্যবদনা শ্বশ্রূমাতা অগ্রসর হইয়া, "এস-এস আমার মা লক্ষ্মী এস—আমার ঘর আলো কর্‌বে"—বলিয়া সাদরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। স্ত্রী আচার হইয়া গেল, জমিদারবাবু আসিয়া হীরকমণ্ডিত কণ্ঠহার দিয়া বধূমাতার মুখ দর্শন করিলেন। আনন্দ গদ্ গদ্ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন,—"আজ দশ বৎসর মা-হারা হয়েছি—আজ আবার মা ফিরে পেলাম। কেমন মা—এই বুড়া ছেলের মা হতে পার্‌বে তো?" লজ্জারক্ত নববধূ লতা অবনত মস্তক আরও অবনত করিল!

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর প্রথম আলাপ হইল। ফুলশয্যার স্ত্রী-আচারাদি সমাপনান্তে আত্মীয়গণ

গৃহত্যাগ করিলে পর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা, অবগুণ্ঠিতা লতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিয়া, নির্মল তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার দিকে চাহিল। লতাও চকিতে একবার স্বামীর প্রতি চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি অবনত করিল। হাসিয়া নির্মল বলিল,—"কেমন লতা! আমাদের বাড়িতে এসে তোমার কোনো কষ্ট নেই তো?" লতা বড়ো বোকা মেয়ে, স্বামীকে যে লজ্জা করিতে হয় তাহা সে একেবারেই জানিত না। বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, লতা বলিল—কষ্ট কই কষ্ট কিছু নেই তো! তবে মার জন্য বড়ো মন কেমন করে—বলিতে বলিতে লতার বড়ো বড়ো চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সাদরে তাহার অশ্রুমোচন করিয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নির্মল বলিল,—

"শীগ্যিরই তো মায়ের কাছে যাবে লতা! কেঁদনা ছিঃ—লক্ষ্মীটি! তুমি কাঁদ্‌লে আমার বড়ো কষ্ট হয়।"

অষ্টমঙ্গলা হইয়া গেলে, লতা পুনরায় পিত্রালয়ে গেল, নির্মলও এবার সঙ্গে গেল। সেদিন লতার বড়ো আনন্দ! মাতার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে—আবার সঙ্গে স্বামী! লতা এই কয়দিনেই স্বামী চিনিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালির মেয়ে বড়ো শীঘ্র স্বামীর মর্ম বুঝিতে শেখে। পক্ষকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া নির্মল বাড়ি ফিরিল। যাত্রার পূর্বে লতার নিকট বিদায় লইতে গিয়া, তাহাকে বাহুবেষ্টনে লইয়া, সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া যখন নির্মল বলিল,—"তবে যাই লতা! আর শীঘ্র দেখা বোধহয় হবে না। আমি শীগ্যিরই কলকাতায় চলে যাব। বাবার ইচ্ছা, এম. এ. টা পাশ করা পর্যন্ত আর বাড়ি না আসি। আমিও মনে করি তাই ভালো। এই মুখখানার প্রলোভন বেশি। সে প্রলোভন আপাতত ত্যাগ করতে না পারলে পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমায় ভুলো না লতা, চিঠি লিখো— আর আমার বাবা ও মায়ের যত্ন করো।" তখন স্বল্পভাষিণী লতা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল। নির্মল তাহার অশ্রুমোচন করিয়া দিয়া তাহার ফুল্ল কুসুমতুল্য ওষ্ঠাধরে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করিল। তারপর দুই বৎসর লতা কখনও পিত্রালয়ে কখনও শ্বশুরালয়ে থাকিয়া একটি একটি করিয়া দিন গুনিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাটাইয়া দিল।

প্রথম বৎসর নির্মল নিয়মিত পত্র লিখিত, দ্বিতীয় বৎসর পত্রব্যবহার কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। লতা বুঝিল পরীক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া এই সংযম। সেও অনাবশ্যক প্রশ্নপূর্ণ পত্র লিখিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিল না।

॥ ৩ ॥

দুই বৎসর পর এম. এ. পাশ করিয়া নির্মলকান্ত হুগলি কলেজের প্রফেসরী পাইয়া গৃহে ফিরিল। জমিদারের পুত্র হইলেও সে নিষ্কর্মী বসিয়া থাকিতে একেবারেই নারাজ। যেদিন দীর্ঘ দুই বৎসর পর নির্মলকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিল সেদিন লতা যে কিভাবে সময় কাটাইল তাহা সে নিজেই জানিল না।

জমিদারগৃহে বধূর গৃহকর্ম করিতে হয় না। তাস খেলিয়া গল্প করিয়াই তাহাদের সময় কাটাইবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য বালিকা আজকালকার মেয়েদের মতো সেয়ানা নয়। সে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীর অনুরোধ "বাবা মার যত্ন করো"। সে মাথায় পাতিয়া লইয়াছিল। তাহার নিপুণ হস্তের সেবা পাইয়া বৃদ্ধ জমিদার একেবারে শিশুর মতোই বধূর হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া, "মা মণি!" বলিয়া ডাকিতেন তখন সহস্র কার্যে আবদ্ধ থাকিলেও লতা সব ফেলিয়া আসিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইত। তিনিও আদর করিয়া

তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া, "আজ তোমার এই লোভী ছেলেটির জন্য কী রেঁধেছ—মা?" কিম্বা "অমুখ ব্যঞ্জনটা রেঁধ মা মণি! ওটা তোমার হাতে যেমন হয় তেমন আর কারও হাতে হয় না।"।—"আজ আমার পুজোর সাজ তুমি করনি—না মা? আমি আগেই জানি। আমার মায়ের হাতে কী অমন বিশ্রী সাজ হতে পারে? আজ আমার ভালো করে পূজাই হয় নি। কাল থেকে সব কাজ ফেলে তুমি আমার পুজার সাজ করবে— কেমন মা মণি?" লতা অমনি আনন্দোৎফুল্ল বদনে মৃদুস্বরে বলিত—হ্যাঁ।

লতা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা,—অল্প বয়সেই রন্ধনাদি গৃহকর্ম করিতে শিখিয়াছিল। সে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্বশুর ও সকলকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইত। জমিদারের প্রকাণ্ড পুরী, নিকট ও দূর সম্পর্কীয় বহুবিদ আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ থাকিত। লতা সাধ্যমতো তাঁহাদের সকলেরই পরিচর্যা করিত। তাঁহারাও তাহার সেবায় প্রীত হইয়া তাহাকে "লক্ষ্মী—বউ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

নির্মলকান্ত দীর্ঘ দুই বৎসর পর বাড়ি আসিতেছে, জমিদারগৃহে আজ আনন্দোৎসব। ভোর হইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাল লইয়া জেলেরা আসিয়া পুকুরে জাল ফেলিল। জমিদার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বড়ো বড়ো কয়েকটি মাছ রাখিয়া অন্যান্য সব মাছ পুনরায় ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। জমিদার গৃহিণী স্বয়ং অদ্য রন্ধনশালায় উপস্থিত আসিয়া রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং "মা-লক্ষ্মী! এটা কর" "ওটা করো" বলিয়া লতাকে উপদেশ দিতেছেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের তরঙ্গ ওঠে, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? তিনি সকল কর্মে ব্যবহৃত থাকিলেও, শকটের শব্দ শুনিবার জন্য তাঁহার কর্ণদ্বয় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। মদন গোয়ালা জমিদার বাড়ির বংশানুক্রমিক গোয়ালা। ফরমাইসি দই লইয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল,

'মা ঠাকরুণ, দই এনেছি গো। এই দইখানা দাদাবাবুর জন্য ভিন্ন করে পেতেছি— তিনি মোর দই খেতে বড়ো ভালোবাসে। আহা দুবছর দাদাবাবুর মুখ দেখিনি। তিনি কখন এস্‌বে গো?"

সহাস্য বদনে গৃহিণী বলিলেন,—

"এই এল বলে। বেলা দশটার টেরেনে আসবার কথা—বাড়ি পৌঁছুতে বোধহয় এগারোটা হবে। তা দশটা বোধহয় বাজে।" দূরসম্পর্কীয়া এক ভাগিনেয়বধূ বঁটি পাতিয়া আলু কুটিতেছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "রাঙ্গাবউ। দই ক খানা ভাঁড়ারে তুলে রাখ বাছা! কামিনী মদনকে খানকয়েক পুকুরের মাছ দিয়ে দাও তো মা!"

লতা ভাঁড়ার ঘরের এক কোণে বসিয়া শাশুড়ির নির্দেশমতো. ঠাকুরের বালভোগের ক্ষীর ছানা মাখন ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইতেছিল। সে ধীরে ধীরে শ্বাশুড়ীর নিকটবর্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—

"দু খানা দই নিরামিষ ঘরে দিয়ে এলে হয় না মা?"

শাশুড়ির হাসিয়া বলিলেন,—

"ঠিক বলেছ মা লক্ষ্মী! আমার কী সব কথা ছাই এখন মনে থাকে? যাও তো মা, রাঙ্গা বউকে বলে এস। আর সন্দেশ বুঝি এখনও আসেনি, এরা যে কী করে, সময়মতো কিছুই আর এদের দিয়ে হয় না।"

মৃদুস্বরে লতা বলিল,—"আমি দেখছি মা"। লতা সংবাদ লইয়া জানিল সন্দেশ বহুক্ষণ আসিয়াছে। সে দুই হাঁড়ি দই ও কিছু সন্দেশ নিজ হস্তে নিরামিষ ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া শাশুড়িকে জানাইল সন্দেশ আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

লতাও নিশ্চিন্ত হইয়া তখন তাহার নিয়মিত রন্ধনকার্যে নিযুক্ত হইল। আজ স্বামী প্রথম তাহার

হাতের রান্না খাইবেন,—লতা কত রকম করিয়া কত ব্যঞ্জন রাঁধিল তবু তাহার তৃপ্তি নাই। কেবলই মনে হইতেছে "এটা ভালো হয় নাই" "ওটা ভালো হয় নাই।" যত্ন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বড়ো সুখ। এ সুখের স্বাদ যে কখনও পায় নাই তাহার বড়ো দুঃখ। লতা রাঁধিতে রাঁধিতে এই কথাই ভাবিতেছিল।

এমন সময় বহির্বাটিতে কোলাহল উঠিল, "ছোটো বাবু এসেছে, ছোটো বাবু এসেছে।" লতার বুকের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল, সে স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য দেবতার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর তার সময়টা যে কেমন করিয়া কাটিল তা, সে জানিল না। নির্মলকান্ত আহারে বসিলে তাহার শাশুড়ি যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী! তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও," তখন সহস্র চেষ্টায়ও সে উঠিতে পারিল না। তাহার পা দু খানা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। বামুন ঠাকরুণ আসিয়া ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল। রাঙ্গাবউ আসিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর কী হয়েছে নতুনবউ; উঠতে কী পারিস না; যা না ওই ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখে আয়। সে ঘরে এখন কেউ নেই। যা জন্ম সার্থক করে আয়।" সে কোনো উত্তর দিল না,—তাহার বাক্‌শক্তিও যেন কে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। রাঙ্গাবউ তাহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল,— অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আহারে বসিয়া নির্মলের চঞ্চল চক্ষু দুটি যেন কিসের আশায় ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক করিতেছিল। কিন্তু চক্ষুর আশা পূর্ণ হইল না, নিরাশ হইয়া তাহা আবার ভাতের থালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময়েই মাতা ডাকিলেন,—"মা লক্ষ্মী, তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও।" কিন্তু হায়! মা লক্ষ্মীর পরিবর্তে বামুন ঠাকরুণ গেল।

আহারান্তে আচমন করিয়া নির্মলকান্ত বলিল,—"আমি তবে এখন একটু বৈঠকখানায় যাই মা। অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে রয়েছে। বাবার কী খাওয়া হয়নি?"

"না—তার এখনও পূজো হয়নি। তুমি বেশিক্ষণ বাইরে থেকোনা বাবা। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে হবে।" ঈষৎ হাসিয়া নির্মল বলিল,—'আচ্ছা মা।"

বাহিরে যাইবার সময়ও তাহার সোৎসুক দৃষ্টি সকলগুলি দরজার আড়ালে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া গেল, কিন্তু যাহার সন্ধানে সে দৃষ্টি ফিরিতেছিল সে তখনও রান্নাঘরে অসাড় হইয়া বসিয়া আছে।

বামাদাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল, "বলি হ্যাঁগা বৌদি, অমন করে পাথরের মতো আর কতক্ষণ বসে থাকবে? মা যে তোমায় ডাকতে লেগেছে—কত্তাবাবুর খাওয়ার ঠাঁই হয়েছে"—তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে লজ্জিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিল,— শ্বশুরের আহারের দ্রব্যাদি লইয়া যখন সে আহারের স্থানে উপস্থিত হইল তখনও তাহার পা দুখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শ্বশুর আহারে বসিলে সে অভ্যাসমতো পাখাহস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল। কিন্তু আজ সে বড়োই অন্যমনস্ক, ব্যজনী থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল।

আহারান্তে নিত্যকার মতো শাশুড়ির পদসেবা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন,—"আজ আর দরকার নেই মা, আজ তুমি বরং তোমার মার কাছে চিঠি লেখ গিয়ে—অনেকদিন তো চিঠি লেখনি।" লজ্জায় লতার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল,— সে শাশুড়ির কথার অর্থ বুঝিয়াছিল।

কম্পিত পদদ্বয় টানিতে টানিতে লতা তাহার শয়ন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। ঈষৎ মুক্ত দ্বারাভ্যন্তর দিয়া সে দেখিল স্বামী শয্যায় শয়ান। সে একটু ইতস্তত করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। শয্যাপ্রান্তে নির্মল নিমীলিত নেত্রে শয়ান, দেখিয়া বোধ হইল নিদ্রিত। লতা অতি সন্তর্পণে গিয়া শয্যার অপরপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে এখন কী করিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না,—একটু

অভিমানও যে না হইল তাহা নয়। সে অঞ্চলপ্রান্ত খুটিতে খুটিতে আকাশ পাতাল কত কী ভাবিতে লাগিল। সহসা শয্যা ঈষৎ নড়িয়া উঠিল,—পরক্ষণেই দুখানি বিশাল বাহুর কঠিন বেষ্টনে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবেশ বিহ্বল লতাকে বুকে টানিয়া লইয়া, স্বামী চুম্বনের পর চুম্বনে সেই সুন্দর মুখখানা প্লাবিত করিয়া দিলেন। আনন্দে অর্ধমূর্চ্ছিতপ্রায় লতা নিমীলিত নেত্রে সেই আনন্দ উপভোগ করিল।

॥ ৪ ॥

লতাকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন সে স্বামীর সহিত হুগলিতে আসিয়াছে। পুত্রের অযত্ন হইবে বলিয়া জমিদার ও তাঁহার গৃহিণী বধূকে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার স্বামী হুগলিতে ওকালতি করিতেন। নির্মলকান্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি বি. এ. পাশ করিয়া বি. এল. পড়েন ও নির্মলকান্ত এম. এ. পাশ করিয়া প্রফেসর হন। ইহাদের এই বন্ধুত্বের সূত্রে লতার সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার পূর্ববর্তী জীবনের আশৈশব সকল কথা আমি কতক লতার নিজমুখে এবং কতক লতার মাতার মুখে শুনিয়াছিলাম।

প্রথম পরিচয়েই আমি লতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়,—তাহার সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি পবিত্র ভাব ছিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অটল গাম্ভীর্য ছিল, যে নিতান্ত লঘু প্রকৃতির মানুষও তাহার নিকট নত মস্তক হইত। অন্য দিকে তাহার প্রকৃতি শিশুর মতো সরল ছিল। আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলিতেন,—"নির্মলের স্ত্রী যেখান দিয়ে হেঁঠে যায় সেখানটা যেন পবিত্র হয়ে যায়।" সত্যই তাহাকে দেখিলে ওইরূপ মনে হইত।

শিশুকাল হইতেই আমার দৃষ্টি সকল বিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। আমি ক্রমে লতার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাহার সমগ্র সদ্‌গুণের মধ্যে একটা গুণের অভাব দেখিয়া আমি প্রাণে বড়ো আঘাত পাইলাম। সেটি কী? সেটি মানুষের সকল প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্বলতার প্রতি ক্ষমার অভাব। তাহার কোমল হৃদয় সেখানে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইত। সে সেখানে বিচার যুক্তি তর্ক কিছুই মানিত না। তাহার সহিত মাঝে মাঝে এই বিষয় লইয়া বাক্ বিতণ্ডা হইত। আমি বলিতাম—

"লতা! ক্ষমা জিনিসটা বড়ো সুন্দর, সে জিনিসটা আমাদের প্রাণকে বড়ো সুন্দর বড়ো উচ্চ করে। মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করাই উচিত।"

লতা বলিত,—

"কেন দিদি, ভগবান সকলকেই বিবেক বলে একটা জিনিস দিয়াছেন। তা সত্ত্বেও যে বিপথে যাবে তাকে কেন ক্ষমা করব?"

আমি বলিলাম,—

"লতা, মানুষ কী অবস্থায় কী অভাবে কোন্ পথে যায় তা আমরা কী করে জানব। মানুষের জীবনে কত প্রতিকূল অবস্থা আসে, কত প্রলোভন আসে, বন্ধুরূপে কত শত্রু আসে। অত্যন্ত সরলচিত্ত মানুষ না হলে সে সকল উপেক্ষা করতে পারে না। ভেবে দেখ সে সময়ে যদি একজন মানুষকে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই ত্যাগ করে তবে কী সে ক্রমেই নরকের পথেই অগ্রসর হয় না! আমার মনে হয় সে সময়ে তাকে তার দুর্বলতা থেকে অতি সহজে তুলে নেওয়া যায়।"

লতা বলিত,—

"তুমি যা বলছ তা বুঝতে পারি কিন্তু পাপকে যদি কেবল ক্ষমাই করব তবে পাপের সংহার কোথায়?"

আমি হাসিয়া বলিতাম,—

"লতা, আমি একথা বলছি না যে পাপের সংসর্গ মানুষ ত্যাগ করবে না কিম্বা পাপকে ঘৃণা করবে না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার না করে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। লতা! আমার বাবা অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন,—তাঁহার শিশুর মতো সরলতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর যে উদারতা ছিল,—তা আর কারো মধ্যে বড়ো দেখতে পাই না। তিনি বলতেন,— "মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা করে তাকে বুকে তুলে নিতে পারলে তাকে নরক থেকে উদ্ধার করা যায় কিন্তু তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে থাকলে সে আরও নীচে নেমে যায়। একথা কখনও ভুলো না রমা।" তাঁর সে সব অমূল্য উপদেশ কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পেরেছি। তবু যে দু একটা কথা বলি সে তাঁর সেই জ্ঞানসাগরের দু একটি বুদবুদ মাত্র।"

লতা আমার কথা বুঝিয়াও বুঝিত না। তার ওই এক কথা ছিল,—"ওসব মুখের কথা দিদি! কাজে কী কেউ তা পারে? কাল যদি তুমি শোন তোমার স্বামী একটা অত্যন্ত নীচ কার্য করেছেন তুমি কী তাকে এক কথায়ই ক্ষমা করতে পারবে? তাহলে আর আত্মসম্মান বলে জিনিস এ সংসারে কোথায় রইল দিদি?"

লতার এইভাবে আমি বড়ো ব্যথিত হইতাম এবং এই জন্য সে জীবনে বহুতর অশান্তি ভোগ করিবে এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। হায়! তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কী ভীষণভাবে সফল হইবে।

॥ ৫ ॥

দুই বৎসর পরের কথা। আমার মাতার প্রাণসংশয় পীড়ার কথা শুনিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। আমার ক্রোড়ে তখন ছয় মাসের একটি ক্ষুদ্র শিশু। মা আমার প্রায় আট মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহার মধ্যে আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই। হুগলি হইতে স্বামীর নিয়মিত পত্রে সকলের সংবাদ পাইতাম। লতাও মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। পত্রগুলির প্রতি পংক্তিতে তাহার পরিপূর্ণ সুখের আভাষ ফুটিয়া উঠিত। আমি পত্রগুলি পড়িয়া বড়োই সুখী হইতাম। সত্য কথা বলিতে কী লতাকে আমি ছোটো ভগিনীর মতোই ভালোবাসিতাম। আমার হুগলি ত্যাগের দুই মাস পর লতার পত্রে একটি শুভ সংবাদ পাইয়া বড়োই প্রীত হইয়া ছিলাম!

মার শ্রাদ্ধাদি কার্য শেষ হইয়া গেলে, সুদীর্ঘ নয় মাস পরে গৃহে ফিরিলাম।

শুনিলাম লতাকে লইতে তাহার পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে। আগামী পরশু ভালো দিন। সেই দিনে রওনা হইবে। বৈকালে লতাকে দেখিতে গেলাম। লতার মুখে এবার নতুন সৌন্দর্য দেখিলাম। তাহার অবস্থানুযায়ী ম্লান ও পাণ্ডুর মুখে একটি নতুন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মাতৃত্বেব প্রথম নিদর্শন! আমাকে দেখিয়া লতা হাত ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমার পাশে বসিয়া, আমার গলা ধরিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে রহিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বাপের বাড়ি যাচ্ছিস নাকি?"

মৃদু হাসিয়া লতা বলিল,—

"হ্যাঁ দিদি, মা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। উনি প্রথমে দিতে চাননি,—কিন্তু শ্বশুর শাশুড়িও যেতে লিখেছেন। ওঁর একা একা বড়ো কষ্ট হবে। তোমাদের উপর নির্ভর করেই যাচ্ছি, তোমরা খোঁজখবর নিও। আমারও যেতে মন সরছে না দিদি"—বলিয়া লতা হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—

"তাকি আর জানি না ভাই! তোরা আবার একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকবি! তুই গেলে নির্মল বাবুকে কী করে সামলাব জানি না। লোকটা পাগল হয়ে না গেলে বাঁচি।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতা বলিল,—

"যাও দিদি, তুমি বড়ো দুষ্টু।"

রাত্রে গৃহে ফিরিলাম। লতা যাওয়ার পূর্বে আর একবার তাহাকে দেখা দিবার জন্য বার অনুরোধ করিল। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বারবার তাহার মুখ চুম্বন করিল। আমি তাহার পরদিন আবার যাইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিলাম।

পর দিন সন্ধ্যার সময় অন্যান্য গৃহকার্য শেষ করিয়া শ্বশ্রুমাত্রার জলযোগের সমস্ত গুছাইলাম। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক হইলে তাঁহাকে জলযোগ করাইয়া লতার নিকট যাইব স্থির করিয়াছিলাম। তাহা হইলে একটু বেশিক্ষণ লতার নিকট বসিতে পারিব বলিয়াই ওই বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এমন সময়ে লতাদের বেয়ারা ভজু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "আপনি শীগ্যির আসুন. মাজীর বড়ো বেমার।" আমি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কী হইয়াছে ভজুকে ভালো করিয়া প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হইল না, —শ্বশ্রূমাতার অনুমতি লইয়া তখনই লতাদের বাড়ি গেলাম। ভজু আমাকে একেবারে লতার শয়নগৃহে লইয়া গেল। গিয়া দেখি লতার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, —ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিকট শুনিলাম প্রভাত হইতে লতা শুইয়া ছিল,—আহারাদি করে নাই। বৈকালেও ঝি আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিল। ঝি গৃহকার্য করিতে লাগিল,—কিছুক্ষণ পর নির্মলকুমারকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া সে গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পর সে কোনো গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে দেখিল নির্মল সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। লতার গৃহে আসিয়া দেখিল অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতিত। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে কৃতকার্য না হইয়া আমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল। ঝির কথায়ও বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার স্বামীকে সংবাদ দিবার জন্য ভজুকে পাঠাইয়া দিয়া, লতার ভূলুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

॥ ৬ ॥

দীর্ঘকাল শুশ্রূষার পর লতা চক্ষুরুন্মিলন করিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর দুই বাহু দ্বারা আমার গলদেশ আকর্ষ'' করিয়া আমার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া,—"দিদি!" বলিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই া বলিলাম, "কী হয়েছে লতা? অমন করছ কেন বোন?"

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লতা বলিল,—"দিদি! উনি আমায় ত্যাগ করেছেন— না-না দেবতার নামে মিথ্যা কথা বলব না। আমি হতভাগিনী ক্ষণিক মোহের বশে অন্ধ হয়ে পাগল হয়ে তাঁকে হারিয়েছি।"

একি শুনিলাম। আমার আশঙ্কা কী এত শী শ এইভাবে সত্যে পরিণত হইল? না—না অসম্ভব! এ যে একেবারেই অসম্ভব! আমি কী শুনিতে কী শুনিয়াছি। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম,—

"লতা, সব কথা বুঝিয়ে বলো বোন, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!"

লতা উঠিয়া বসিল, দুই হস্তে চক্ষু মার্জনা করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। লতা ধীরে ধীরে আমাকে সকল কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে কখনও শূন্য নয়নে সে আমার প্রতি চাহিল,—কখনও অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে সে অশ্রু মার্জনা করিয়া পুনরায় বলিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে বলিয়া লতা সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। নির্মলকান্তের আলমারী ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিয়া যাইবে মনস্থ করিয়া আলমারী খুলিল। কাপড়গুলি নাড়িতে চাড়িতে একখানা অর্ধচ্ছিন্ন পুরাতন পত্র তাহার হস্তগত হইল। পত্রখানি নির্মলকুমারের নিকট একটি স্ত্রীলোকের লেখা। পত্রখানা পরে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহার মর্ম এইরূপ,—

"নির্মল বাবু!

তুমি আর এস না কেন? কাল সন্ধ্যার সময় আসবে বলে গেলে আর এলে না। আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলুম। তুমি আমায় ত্যাগ করলে কেন? তোমার পায়ে পড়ি দেখা দিয়ে যেও।

ইতি তোমার হতভাগিনী
"বিনোদ"

পত্রখানির তারিখ লতার বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরের।—

পত্রখানি পড়িয়া লতার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। এ কি! সে যে তাহার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে! তবে এ কি? লতা যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পত্রখানা হাতে লইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় হাসিতে হাসিতে নির্মল গৃহে প্রবেশ করিল। লতাকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল,—"একি গো! অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তোমার সব গোছান হল?"

লতা কোনো কথা না বলিয়া, পত্রখানা নির্মলের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া, পাশ কাটাইয়া, দ্রুতপদে আপনার শয়নগৃহে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর নির্মল গৃহে প্রবেশ করিল,—লতা তখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। নির্মল শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—

"লতা আমার একটা কথা শোন, আমার দিকে চাও। সব কথা শুনলে তুমি বুঝবে এতে তোমার রাগ করবার কিছু নেই।"

লতা ফিরিল, কিন্তু স্বামীর বাহুপাশে কিছুতেই নিজেকে ধরা দিল না। বিশাল চক্ষু দুটি নির্মলের চক্ষুর প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিল,—"কি বলবে? বলবার কিছু আছে কী? বলবার কিছু থাকলে অনেক আগে নিজেই বলতে।" নির্মল বলিল,—

"অনেক কথা বলবার আছে। ধীরেন্দ্র নামে আমার সহপাঠী বন্ধুর নাম হয়তো আমার মুখে শুনেছ। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল, লেখাপড়ায়ও সে খুব ভালো ছিল। হঠাৎ সে এই বিনোদিনীর কুহকে পড়ে অধঃপাতের পথ পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে। এমন কি তাকে বিয়ে করবে বলেও নাকি স্থির করে। আমি দেখলাম এক ধীরেন্দ্রর সঙ্গে সমস্ত পরিবারটি যায়,—আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি তখন বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।"

লতার দিকে চাহিয়া নির্মল দেখিল লতা একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিল। নির্মল বলিতে লাগিল—"প্রথমে সে আমাকে বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দিল। আমি তবুও হাস ছাড়লাম না। ধীরেনের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম। কিছুদিন পর দেখলাম বিনোদিনীর মন একটু একটু নরম হয়েছে। তারপর সে ধীরেনকে ত্যাগ করতে সম্মত হোল, আমি তাকে কিছু অর্থ দিতে গেলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করলে দেখে বড়ো আশ্চর্য হলাম। আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হল—আমি সেদিন থেকে আর তার কাছে যাই নি। তারপর সে ওই চিঠিখানা লিখেছিল বটে কিন্তু লতা তোমায় সত্যি বলছি, আমি সে চিঠির কোনো উত্তর দিই নি বা তার কাছে যাই নি। এখন সব বুঝলে তো।"

শুষ্ককণ্ঠে লতা বলিল,—"না একটা কথা এখনও বুঝি না। কি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তুমি আর যাও নি?"

একটু ইতস্তত করিয়া নির্মল বলিল,—

"বিনোদিনী আমাকে একটু একটু ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে বলে সন্দেহ হয়েছিল।"

শিহরিয়া উঠিয়া দুই হস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া লতা বলিল,—

"ছিঃ ছিঃ একথা আমার কাছে বলতে তোমার একটু লজ্জা হল না, একটা পতিতা স্ত্রীলোক তোমাকে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছে। আর তুমি সেই চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছ। ধিক্ তোমাকে।"

বিস্মিত হইয়া নির্মল বলিল,—"পত্র যত্ন করে রেখেছি কে বললে? আমার তো ও পত্রের অস্তিত্ব ছিল না। কী করে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে আলমারিতে স্থান পেয়েছিল তাও আমি জানি না।"

লতা আপন কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"আমি যখন আমার প্রাণের সমস্ত প্রেম সঞ্চিত করে তোমার জন্য অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, তুমি তখন একটা পতিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রেমের খেলা খেলছিলে? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ আঘাত পাবার আগে আমার মরণ হল না কেন?"

কাতর কণ্ঠে নির্মল বলিল,—"তুমি এ কি বল্ছ? লতা—লতা, আমিতো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে হত, তা নইলে সে আমার কে?"

কঠিন কণ্ঠে পাষাণী লতা বলিল,—"কে তা আমি জানি না—তবে এটুকু জানি সে তোমার কেউ না হলে এ ঘটনা তুমি আমার কাছে গোপন করতে না। নিজেই বলতে, জিজ্ঞাসাও করতে হোত না।"

নির্মল বলল,—"এই সব ঘটনার পর ধীরেন আমায় হাতে ধরে অনুরোধ করেছিল একথা যেন প্রকাশ না পায়। বন্ধুর কাছে কী করে বিশ্বাসঘাতক হব লতা। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার কাছে বলতে পারি নি। এ যে আমার নিজের কথা নয়,—পরের কথা বলবার যে আমার কোনো অধিকার নেই। তুমি বুঝতে পারছ না লতা?"

দৃঢ় স্বরে লতা বলিল,—"না—আমি আর কিছু বুঝতে চাই না,—যা বুঝেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

ব্যথিত স্বরে নির্মল বলিল,—"লতা! তুমি কি সেই লতা! এত কঠিন তুমি! উঃ ভাবিতেও পারি না। লতা, একটু বুঝতে চেষ্টা করো, না হলে আমাদের সুখ সূর্য অস্ত যেতে বেশি দেরি হবে না। কী আর বলব?"

॥ ৭ ॥

লতা বলিতে লাগিল,—

"উনি চলে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই মনটাকে যেন স্থির করতে পারলাম না। যতই ভাবি ততই যেন চিঠিখানা আমার চোখের সামনে আমায় বিদ্রূপ করে নাচতে লাগল। আর উঠতে ইচ্ছা হল না, খেতে ইচ্ছে হল না। উনি আজকার দিনটা আগেই ছুটি নিয়েছিলেন, স্নানাহার করে—ভগবান জানেন কী খেলেন—উনি এই পাশের ঘরে গেলেন। মাঝে মাঝে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন— শব্দ কানে গেল। আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। বিকালে উনি আবার এলেন,—বিছানার পাশে এসে ডাকলেন, "লতা!" আমি চুপ করে

রইলাম। দিদি? আমি পাগল হয়েছিলাম, না হলে কী সেই আদরের ডাক উপেক্ষা করতে পারতাম? কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন,—"এখনও রাগ করে থাকবে? সেই অটল বিশ্বাস এক মুহূর্তে এই ভীষণ অবিশ্বাসে কী করে পরিণত হল। এত কঠিন কী করে হলে! লতা! একবার বুকে এস—একবার বল সব ভুলে গেছ। সব অন্ধকার ঘুচে যাক।" দিদি, পাষাণী আমি, নিষ্ঠুর আমি, নারী নামের অযোগ্য আমি, তবু চুপ করে রইলাম। তিনি বাহু প্রসারিত করে আমায় বুকে টেনে নিতে এলেন,—আমি সরে গেলাম। মানুষের আর কত সয়? আর একটা তুচ্ছ নারীর জন্য কেনই বা সহ্য করবেন, দরিদ্রের কুটীর থেকে তুলে নিয়ে মাথার মণি করেছিলেন,—আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন। সব কথা ভুলে গেলাম।

লতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"এত ঘৃণা! এত করে বোঝালাম তবু বিশ্বাস হল না? এত প্রেম এক মুহূর্তে ঘৃণায় পরিণত হল একটা কল্পনাপ্রসূত কথা নিয়ে। তবে তাই হোক, আমি চল্‌লাম। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না। যদি ভগবান রক্ষা করেন ও তোমার ভুল তুমি বুঝতে পার তবেই দেখা হবে, নচেৎ নয়।" এই বলে তিনি টলতে টলতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। একি হইল। এই করিলাম। আমি কি পাগল হইয়াছি? সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হইয়া দেবতার মতো স্বামীকে অপমান করিলাম! এমনটা হইবে তাহা তো ভাবিতে পারি নাই। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম, কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম, —"ওগো, ফিরে এস! আমি সব ভুলে গেছি।" কিন্তু হায়, শূন্য ঘরে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া আমারই কানে ফিরিয়া আসিল। তিনি তৎপূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ভাবিলাম তাঁর ঘরে গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনি, কিন্তু পা চলিল কই? অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল,—পরক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। দিদি! দিদি! তিনি কি আমার ক্ষমা করিবেন না? একবার তাঁকে ডাক না দিদি, পায় ধরিয়া ক্ষমা চাই।"

আমি তাহাকে সাধ্যমতো আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম,—"নির্মলবাবু এখন একটু বাইরে গেছেন, বোন, তিনি এলেই তোমার কাছে আসবেন। তোমার ক্ষমা করবেন বৈকি! তোমায় কত ভালোবাসেন তাকি জান না?"

"জানি দিদি, জানি—তাইতো এত সাহস পেয়েছি।" লতার অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। আমার স্বামী আসিলেন। তাঁহাকে নির্মলের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া লতার নিকট আসিয়া বসিলেন। অনেক কষ্টে তাহাকে একটু দুগ্ধ পান করাইলাম, সমস্ত দিন অনাহারে সে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—দুগ্ধ পান করিবার অল্প পরে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

শ্রাবণ মাস,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সেই বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। আমি আমার হৃদয়ে বিরাট অন্ধকার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর লতা জাগিল, চক্ষুরুন্মিলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"তিনি কী এসেছেন দিদি?"

আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম,—"না, এখনও আসেন নি, এই এলেন বলে।"

লতা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল,—তাহার সেই নিঃশ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! সরলা বালিকার অদৃষ্টে কী আছে কে জানে? আমার স্বামীর ফিরিয়া আসিলেন, —তিনি প্রথমেই স্টেশনের নির্মলের সংবাদ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন নির্মল এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়া পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম,

আমার স্বামী বলিলেন, "কিছু ব্যস্ত হয়ো না, আমি কাল নিজে এলাহাবাদ গিয়ে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।"

লতাকে আর কিছু জানাইলাম না,—বিপদের উপর বিপদ লতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি আর তাহার নাই। আমি আর গৃহে ফিরিতে পারিলাম না। খোকাকে রাত্রে একটু দেখিবার কথা স্বামীকে বলিয়া দিয়া লতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। চিকিৎসক ও ধাত্রীর জন্য লোক পাঠাইলাম।

সমস্ত রাত্রি ক্লেশভোগের পর, ঊষার তরুণ আলোক যখন সবেমাত্র আকাশপ্রান্তে উঁকি দিয়াছে, সেই সময়ে লতা, অসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। লতার পুত্র ঠিক যেই মুহূর্তে এই পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মালগাড়ির সহিত ঊর্ধ্বগামী পাঞ্জাব মেলের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া বহু যাত্রী প্রাণ হারাইল। পরদিন সংবাদপত্রে মৃতের তালিকায় সর্বপ্রথম নির্মলকান্ত রায়ের নাম প্রকাশিত হইল। লতার সব ফুরাইল। দুঃসংবাদ পাইয়া লতার মাতা ছুটিয়া আসিলেন। শোকার্ত জমিদার দম্পতির স্থানত্যাগের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। লোক পাঠাইয়া তাঁহার বধূর তত্ত্বাবধান করিলেন। লতা ছিন্ন লতিকার মতোই দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন একমাসের ক্ষুদ্র শিশুটিকে মার কোলে তুলিয়া দিয়া, শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন লতা পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে মহাযাত্রা করিল।

স্নেহের সার্জারি

নিরুপমা দেবী

ডাক্তার নবীনচন্দ্রের বয়স কিছুতেই আর বাড়ে না, সেই যে কবে সে ২৫ বৎসরের হইয়াছে আজিও সেই পঁচিশ আর পঁচিশ। পরিহাসপ্রিয় রমেশ বলে, "নবীনের এক এক ঠ্যাঙে পঁচিশ বচ্ছর, হাত পা সব ধরলে ওর বয়েস আশীর কম নয়।" কিন্তু আমরা জানি সে কথা মিথ্যা কারণ সে আমাদেরই বন্ধু। হয়তো তাহার বয়স ত্রিশ না পঁয়ত্রিশ কিন্তু সে কথা মনেই হয় না, কারণ এমনই তাহার বালকের মতো স্বভাব, এমনই তাহার সদানন্দ ব্যবহার যে তাহার নিকট দাঁড়াইলে অনেক ২০ বৎসরকেই ৪০ বৎসর মনে হইতে পারে। না আছে তার কাপড় চোপড়ের ঠিক, না আছে তার সময় অসময়ের নিয়ম, না আছে তার কথাবার্তার বাঁধুনি। যাহা আছে তাহা কেবল একটা বিরাট ছাতফাটান হাসি।

কিন্তু কে জানিত যে তাহার এই উদার আকাশের মতো হাসির মধ্যেও কোথায় এক কোণে একখানা ছোটো কালো অশ্রুভরা মেঘ লুকান ছিল। হঠাৎ একদিনের কেমন একটা কথার বাতাসে সেই ছোটো মেঘখানি হইতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া বন্ধুদের পরিহাসকে গলাইয়া মৌন গভীর দুঃখের ভারে সকলকেই পীড়িত করিল।

ঘটনাটা এই—রমেশ একদিন বন্ধুদের মধ্যে প্রস্তাব করিল নবীন ডাক্তারের বয়েস যখন কিছুতেই বাড়ে না, তখন ওর বিয়ে দিতেই হবে। ও যে চিরদিন সোঁদা থেকে ২৫ বছর ২৫ বছর বলে বড়াই করবে তা হবে না। বিয়ে করে পাঁচটা ছেলে পিলে হলে ওর বয়েস কেমন না বাড়ে দেখতে হবে।

কালিদাস বলল, "আরও একটা কথা, ওর পয়সা আছে, অথচ অভিভাবক নেই; ওর দাদা সেদিনও দুঃখ করছিলেন, যে এত কষ্ট করে এত খরচ করে ডাক্তারি পাশ করিয়ে শেষে কিনা বিনে পয়সার ডাক্তার হয়ে দাঁড়াল। ওর ঘাড়ে একটা সংসার একটা পুরাদস্তুর মুরুব্বি জুটিয়ে দিতে না পারলে যে সংসার আর টেকে না।"

সতীশ বলিল, "আর এও যে বেজায় অন্যায়, আমরা সব চারদিকে ট্যাঁ-ট্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ নেই-নেই, দাও-দাও শুনতে শুনতে দিব্বি বুড়ো হতে চল্লাম, মুরুব্বি হয়ে মুখে দাড়ি, পেটে ভুঁড়ি, মাথায় টাক বানিয়ে ফেল্লাম আর ওই থাকবে পঁচিশ বছরের ছোকরা?

রমেশ বলিল, "না তা হবে না, ওর বিয়ে দিতেই হবে—আর আমি সম্বন্ধও ঠিক করেছি।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—যার বিয়ে তার কিছু ঠিক নেই, তোমরা না ঘুমিয়ে মেয়ে পর্যন্ত ঠিক করে বসে আছ? সে পাত্রী কোথাকার শুনি?"

পাত্রীটির নাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির হইল, শুনিলাম সে কোথাকার এক লেডি ডাক্তার, এবং রমেশ বিশ্বস্তসূত্রে এমন কী প্রায় প্রত্যক্ষসূত্রে অবগত আছে যে এই ডাক্তারটির সঙ্গে নবীনের নাকি

পরিচয়ও আছে। লভ্ এফেয়ার নাকি? নবীনের মধ্যে লভ্?—হাসির চোটে ঘর ফাটিবার জোগাড় হইল। কিন্তু রমেশ হটিবার পাত্র নয়, সে সতেজে বলিল, "ওর পঁচিশ আর এই ডাক্তারের নিশ্চয়ই ষোলো কিংবা বড়ো জোর কুড়ি বৎসর, এর বেশি হতেই পারে না; কারণ তার বয়েসও নিশ্চয়ই আর বাড়ে নি। অতএব এ বিয়ে দিতেই হবে।"

আমাদের মহাসভায় গম্ভীরভাবে ঠিক হইয়া গেল, এই বিবাহ দিতেই হইবে কিন্তু নবীনের কাছে একথা পড়িবামাত্র—একটা প্রকাণ্ড হাসিতে ঘরটা কাঁপিয়া উঠিল, তারপর প্রশ্ন হইল "বিয়েতো করবই, কিন্তু পাত্রী কই? আমি ভাই মোটে পঁচিশ বছরের, তেমনি একটা মানানসই কনে ত চাই—শেষে যেন বর বড়ো কী কনে বড়ো করতে গিয়ে কনেই না বড়ো হয়ে যায়।"

রমেশ বলিল, "কনেও ষোলোর বেশি নয়।" নবীন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওরে বাবা, ও যে ধাড়ী! আমার সঙ্গে মানাবে কেন? যদি শেষে তার আমাকে পছন্দ না হয়।"

সতীশ বলিল, "বিয়ে হবে ডাক্তারি মতে, তাতে আবার তোমার দাদা গোঁড়া ব্যারিষ্টার। এই ডাক্তারি আর ব্যারিষ্টারীর মণি-কাঞ্চন যোগের বিয়েতে ষোলোতেই হয়ত কুলুবে না। তুমি কী হিঁদুর ঘরের মত তিল-কাঞ্চন দিয়ে বিয়ের শ্রাদ্ধ সারতে চাও। সে হবে না এতে হিঁদুমতেই যদি হয় তবু তোমার মতো বৃষোৎসর্গে, ষোলো কেন, ষোলো দুগুণে বত্রিশ হলেও কম হবে।"

নবীন তাল ঠুকিয়া বলিল, "বহুত আচ্ছা—কনে কোথায় আছে বলো, তার নাড়ী দেখে আসি। আমি ডাক্তার আমার ত আগে তার নাড়ীর খবর নিতে হবে? তারপর দাদা গিয়ে আর লোহার সিন্ধুকের খবর নিয়ে এলেই ব্যস্ সব গোল চুকে যাবে।"

রমেশ বলিল, "তুমি এখনও নাবালক, তোমার এবিষয়ে কিছু করবার এখনও অধিকার হয় নি। তবে তোমার এই যে কজন সাবালক গার্জেন আছেন তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন এখন। আর নাড়ী দেখতে সেখানে যেতে হবে না, সেও একজন তোমারি মত এম্ বি। সেই হয়তো এসে কোনোদিন তোমার বুকে ষ্টেথেস্কোপ বসিয়ে বুকের খবর নেব।"

হঠাৎ নবীনের সমস্ত হাসি কোথায় উড়িয়া গেল। সে পাংশুবর্ণ মুখে বলিল, "মেয়ে ডাক্তার? এম্ বি? কোথাকার? রমেশ আমাদের দিকে চোখ টিপিয়া বলিল, "সে যেখানকারই হোক, তোমার তাতে কী? তোমায় কেবল বিয়েটা করে ফেলতে হবে।"

নবীন হঠাৎ উঠিয়া 'উঃ বড়ো গরম" বলিয়া বাহিরে গেল—তারপর ছুট—ছুট—ছুট। 'ও নবীন' 'ও ডাক্তার'—আর ডাক্তার। সেইযে সে পলাইল, সন্ধ্যা পর্যন্ত আর তাহার দেখা নাই।

সতীশের বৈঠকখানায় তখন ঘোর রবে পাশা আর তাস চলিতেছিল। আমার আসিতে দেরি হওয়াতে পাশার 'উপর-চাল' বলিতেছিলাম; এমন সময় রামদীন দরোয়ান আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিল। পত্রখানা নবীনের লেখা, সে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, বিশেষ দরকার।

ডাক্তারের বেয়াদবীতে চটিয়া আমি বলিলাম, "দেখ দিখি, এই এমন দুঁদে বাড়ির মোয়াড়ায় কে এখন উঠতে পারে? সে রাস্কাল আসতে পারলে না?" বন্ধুমহলে এই পত্র লইয়া দু একটা মধুর শব্দ উচ্চারিত হইবার পর আমি বলিলাম, 'থাকগে, আমি এই এলাম বলে।"

দ্রুতপদে নবীনের বাসায় পৌঁছিলাম। সে আমারই জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক উচ্চ হাসি হাসিল বটে, কিন্তু সেই হাসিটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাহার জন্য আমি হাসিতে পারিলাম না। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কী হয়েছে বল?"

সম্মুখের হলঘরে তাহার ব্যারিষ্টার দাদা বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত চান পান ও গল্পগুজব করিতেছিলেন। আমরা উভয়ে তাহার পার্শ্বের একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

নবীন তাহার কক্ষের আলোটা একটু কমাইয়া দিয়া বলিল, "সকাল বেলায় যে কথা হচ্ছিল

তারই বিষয় দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডেকেছি। যে লেডি ডাক্তারের কথা বলছিলে, সে কে?"

আমি তাহার নাম পর্যন্তই জানিতাম, তাহাই বলিলাম। নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার অন্য কিছু বলবার নেই, কেবল এইটুকু জানতে চাই, এর খবর তোমরা কোথা থেকে পেলে?"

আমি বলিলাম, "রমেশ তার স্ত্রীর কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে এই বিষয়ে হাত দিয়েছে! কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন? এর মধ্যে কী ব্যাপার লুকোনো আছে যদি—"

নবীন বলিল, "লুকোনো যা আছে, তা লুকোনোই থাকবে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আজ এতদিন পরে কেন তা জাগল তাত জানিনে? রমেশের স্ত্রীই বা কেন তাকে অনুরোধ করল? যা কোনো দিন শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেছিলাম, তা দেখছি কিছুতেই শেষ হতে চায় না। যাকগে, তোমায় দুটো গোপন কথা বলব—কেন বলব তার কারণ জানতে চেয়ো না, কেবল এইটুকুই অনুরোধ। একথা নিয়ে আর আলোচনা করো না, আশাকরি আমার জীবনকে এই সম্মানটুকু তুমি দেখাবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম; নবীন তাহার পাঠদ্দশার একটা অধ্যায় আমার নিকট বর্ণনা করিল। ব্যাপারটা সে ডাক্তার মানুষ বলিয়াই বোধহয় অনেকটা সংক্ষেপে সারিল। কিন্তু আমার মনে তাহার ঝঙ্কার আর কিছুতেই থামিতে চাহিল না, তাই তাহার জীবনের সহিত আমার যেটুকু সম্বন্ধ অকারণে ঘটিয়া গেল তাহাই আজ এতদিন পরে বাহির করিতেছি।

সে যাহা বলিল তাহা এই,—

সে যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, তখন মাধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। আলাপ হওয়াটা এমন কিছুই নয়, কারণ নবীনের মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে যাহাতে সে নিমিষের আলাপেই একেবারে পরিচিত হইয়া পড়ে। নবীন এই আলাপের সূত্রে মাধুরীর বাটীর অন্যান্য সকলের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়ে। মাধুরীর পিতার কী একটি ব্যাধির সময় রাত্রি জাগিয়া সেবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের কোনো একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকেই লাগাইয়া দিয়াছিলেন। নবীন তাঁহাকে নিজের নিপুণ সেবায় এবং সরল হাস্যে এমনই বশ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহাকে নিজের সন্তান ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন না, সময় অসময়ে তাহাকে ডাকাইয়া ডাক্তারি ছাড়াও এমন সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ লইতেন যাহার উপদেশ চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো পুস্তকেই ছিল না।

যাহাই হোক নানা কারণে এই মাধুরী আমাদের নবীনের জীবনের সঙ্গে ক্রমশ এতই জড়িত হইয়া গেল যে শেষে নবীনের জ্যেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনের ডাক্তারি পাশের পর নবীন যাহাতে বিবাহের ফাঁশ পরিয়া পুরাদস্তুর সংসারী হয় সে বিষয়ে মাধুরীর পিতার সঙ্গে ঠিকঠিক করিয়া ফেলেন।

এই ভাবে বৎসর খানেক চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহাতে নবীন ও মাধুরীর সমস্ত সুখের স্বপ্ন বৈশাখের প্রথম মেঘের মতো শুধু একটা ঝড় উঠাইয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল। বাকি রহিল কেবল একটা ইস্পাতের মতো চকচকে ফর্সা আকাশের ন্যায় হাসি।

নবীন তখন পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে হাউস সার্জন হইয়া বসিয়াছে। হঠাৎ একদিন মাধুরী তাহাকে বাড়িতে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধুরীর ছোটো পত্রখানায় লেখা ছিল "এমন সব ওষুধ নিয়ে আসবে যাতে অপারেশন না করে, এরিসিপেলাস সারান যায়— অস্ত্র করতে পাবে না বলে রাখছি। তুমি সার্জারিতে মেডেল পেয়েছ, কিন্তু সে কথা ভুলে যেতে হবে। তোমার মেডিসিনের জ্ঞানের এই চরম পরীক্ষা—আর সে আমার কাছে তা যেন মনে থাকে। আমি এই জন্য আমার রুগিকে কলেজে নিয়ে যাইনি।"

নবীন তাহার এই বহুদিনের আগেকার পত্রখানা আমার কম্পিতহস্তে দেখিতে দিল। আমি পড়িয়া বলিলাম, "ইনিওত' তখন কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়েন, তবে এ বিষয়ে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন কেন?

নবীন বলিল, "সব কথা না শুনলে বুঝতে পারবে না। এই মাধুরী ডাক্তারি পড়লেও এর মনের মধ্যে সব স্থানটাই ছুরী কাঁচি ফরশেপে ভরে যায় নি। আমি কিন্তু বুদ্ধি করে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং সেই সঙ্গে ওষুধপত্র নিয়ে ওদের ওখানে উপস্থিত হলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। একটি বছর খানেকের ছোট্ট পদ্ম ফুলের মতো ছেলে মাধুরীর কোলের ওপর রোগের যন্ত্রণায় কী যে কাতরোক্তি করছে তা বর্ণনা করা যায় না। আমি দেখলাম যে তখনি যদি অপারেশন না করি তা হলে একটা দিনও আর কাটবে না। কিন্তু আমি যেতেই মাধুরী বললে, "এরিসিপেলাসে এর সমস্ত পিঠটা ভরে গিয়েছে, কিন্তু তুমি অপারেশন করতে পাবে না।"

"আমি কিন্তু ডাক্তারি কর্তব্য ভুলতে পারি নে। সব দেখে বল্লাম, 'এখনি একে অপারেশন করতে হবে নইলে এর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী হব।' মাধুরী কেঁদে ফেল্লে— সে যে কী করুণা তার চোখে দেখলাম! সেই যেন ওর মা—উঃ—যাক সে কথা। মাধুরী আমায় কিছুতেই অপারেশন করতে দিলে না, বল্লে, এই এমন সুন্দর শরীরে সে কিছুতেই ছুরি চালাতে দেবে না, তা সে যাই হোক। এর মা তার কোলে দিয়ে বলেছে, 'যেমনটি দিলাম তেমনটি ফিরিয়ে দিও যেন ভাই', সেও তাই দেবে। যদি না পারে কিসের জন্য এত মড়া ঘেঁটে সারা দিনরাত খেটে বই মুখস্থ করে মরছে। সে বেশ করে বুঝিয়ে দিলে যে সেই ফুলের মতো শরীরে আমি কোনো আঘাত করতে পারব না।"

নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তার পর সংক্ষেপে বলিল যে ওই শিশুকে লইয়া তাহাদের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার জন্য তাহারা উভয়েই প্রস্তুত ছিল না। সেই রোগাক্রান্ত শিশুটি যেন হঠাৎ মাধুরীকে নবীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া এমন একস্থানে লইয়া গেল, যেখান হইতে কোনো অনুরোধ-উপরোধ ভয় প্রদর্শন কিছুই আর মাধুরীকে বাস্তবের মধ্যে আনিতে পারিল না। মাধুরী দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিল যে যদি ভগবানের ইহার মৃত্যুই অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে এই শিশু তাঁহার নিকট ইহার কুসুম-সুকুমার দেহকে অক্ষত লইয়াই যাইবে।

নবীন অনেক বুঝাইল, বলিল, "দেহটা ত কিছুই নয়, প্রাণ বলিয়াই উহার আদর, নহিলে উহা ত জড়পিণ্ড। মড়ার দেহই বা কী আর জীবন্ত দেহই বা কী—কিছুই নয়।" মাধুরী তখন জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল, যে "যাঁহারা মরা ঘাঁটে, দেহটাকে যাহারা জড়ের সঙ্গে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না, তাহারা মড়ারই মতো প্রাণহীন। ভগবান কেন সেই সব শকুনের হস্তে মানুষের মরণ বাঁচনের ভার দিয়াছেন?"

যখন মাধুরী কিছুতেই বুঝিল না, তখন নবীন পুরাদস্তুর ডাক্তারি চালে বুঝাইয়া দিল,"এর যদি কিছু হয়, তাহলে তুমিই দায়ী।"

মাধুরী হঠাৎ সেই শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সজল চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আমি—আমি—কেবল আমিই দায়ী? আর কেউ নয়, তুমিও নও? তাহলে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই-- যাও তুমি। আমি কিছু চাই নে, এই একে কোলে নিয়ে আমি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলব—আমিই এর মা, তোমার সাধ্য থাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কেটে কুটে মেরে ধরে একে বাঁচাও। আমি এর গায়ে একটুও আঘাত লাগতে দেব না—এতে সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র জাহান্নামায় যায় যাক।"

ডাক্তারি শাস্ত্র জহন্নামে যাক আর নাই যাক, শিশু বাঁচিল না। দুই দিন যমে মানুষে টানাটানির পর শান্তি পাইল। কিন্তু মাধুরী সেই দিন হইতে আর এক মাধুরী হইয়া গেল। সে নবীনের নিকট

হইতে এতদূরে চলিয়া গেল যেখানে নবীনের আর কোনোরূপ পৌঁছিবার আশা নাই। মাধুরী এম্ বি পাশ করিল, সসম্মানে ডিপ্লোমা লইয়া কোথায় তাহার পিতার সহিত নবীনের জীবনাকাশ হইতে অস্তমিত হইল। সেই হইতে আজ পর্যন্ত নবীনের নিকট সময় তাহার গতি হারাইয়া স্থির হইয়া আছে।

আমি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলাম, 'তা এতে তার সঙ্গে তোমার এতখানি অমিল হবার মতো ত কিছুই পেলাম না। সে হাজার হলেও মেয়ে মানুষ—তার যদি ভুলই হয় তাই বলে তাকে ত্যাগ করতে হবে?''

নবীন। ত্যাগ ঠিক আমিই করি নি, ত্যাগ আপনি ঘটে গেল। তবে আমিও যে তার সঙ্গে ঠিকমতো মিলবার চেষ্টা করেছিলাম তাও বলতে পারি নে। তখন নূতন জীবন— কর্তব্য জ্ঞান'টাও খুব সতেজ। কী করতে কী করে বসলাম, সেও দূরে গেল, আমিও সরে দাঁড়ালাম। সেও আমায় ক্ষমা করতে পারলে না, আমিও না;—ডাক্তার হয়ে এত বড়ো একটা অকর্তব্য করলে কী করে তাকে ক্ষমা করব, এই কথাটাই তখন আমার মনে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে আমি ক্ষমা করলেও আমার ডাক্তারি শাস্ত্র আমার ডাক্তারি কর্তব্যনিষ্ঠা তাকে ক্ষমা করবে কেন? যেখানে মায়া দেখানই নির্দয় হওয়া সেখানে যে জেনে শুনে এরকম হল তাকে যে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলাম না। সে তো শুধু মেয়ে মানুষ নয় সেও যে চিকিৎসা-বিদ্যার্থী একথা সে ভুলে গেল কেন?

আমি। কিন্তু তুমি ত' তাকে ডাক্তার বলেই বিয়ে করতে যাচ্ছিলে না, তাকে মেয়েমানুষ বলেই জীবনের সাথী করতে যাচ্ছিলে? তবে কেন তাকে ছেড়ে দিলে?

নবীন। তখন তা বুঝিনি ভাই। তখন তাকে কেবল চিকিৎসা বিদার্থী এবং আমায় স্নেহের ছাত্রী বলেই মনে করেছিলাম। তখন ত বুঝিনি, যে মড়াই কাটুক আর অস্ত্রই ঘাঁটুক মানুষ মানুষই থাকে, মানুষের ভিতরকার লোকটা কিছুতেই বদলাতে চায় না, সময় হলেই সে বেরিয়ে পড়ে। সে চলে যাওয়ার পর হতে কত রকমে বুঝছি যে আমিও কেবল ডাক্তার নই, আমিও শুধু কর্তব্যজ্ঞান নই—আমিও মানুষ। তাই সেদিন যে সেই শিশুর ফুলের মতো দেহটা কেবল ছুরিকাঁচির ক্ষেত্র বলে দেখেছিলাম সেই অন্যায়ের প্রতিফল সারাজীবন ধরে ভোগ করছি। মাধুরী ভুল করেনি, ভুল করেছিলাম আমি। ডাক্তারের দিক হতে আমি ঠিক, কিন্তু সব ডাক্তারির ওপরে যা, সেই স্নেহের ডাক্তারির দিক থেকে ভালোবাসার দিক থেকে মাধুরীই ঠিক। দেহতো কেবল দেহ নয়, ও যে দেহীরই প্রকাশ, ওত শুধু জড়পিণ্ড নয় ও যে প্রাণেরই বাহিরে এসে দাঁড়ান, ও যে অনুপমের উপমার মধ্যে মাধুরীর মধ্যে প্রকাশ হওয়া, ও যে অধরের ধরা দেওয়া। ওকে আমি অমান্য করেছিলাম তারই পাপে আমার জীবন হতে সমস্ত মাধুরী চলে গিয়েছে। দেহটার চিকিৎসা করি, দেহই আমাদের সব কিন্তু দেহটাকে আমরা যত অবজ্ঞা করি এমন আর কেউ নয়। না, না ভাই মাধুরী ঠিকই করেছে; আমি তার উপযুক্ত নই. তার সঙ্গে, যেখানে মিল্‌লে ঠিক মেলা হত সেখানে যে আমি উঠতে পারি নি।

নবীন নীরব হইলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম "তা হলে এ মাধুরী যে সেই মাধুরী তা তুমি কী করে জানলে?

নবীন এইবার গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাই বা হল এ সেই মাধুরী—তবে নামটায় যে যন্ত্রণা আর যে সুখ লুকান ছিল, তাই তোমায় বল্লাম। এখন তোমায় অনুরোধ তুমি রমেশ আর দাদাকে বলে এসব ব্যাপার থামিয়ে দাও। রমেশ দাদার সঙ্গে সব ঠিকঠাক করবার যোগাড় করেছে। দাদাও আমায় সাটেপটে ধরেছেন। বউ ঠাকরুণ কাকুতি মিনতি করছে কিন্তু ভাই আমি পারব না। এইভাবেই আমার জীবন কাটবে—আর কাউকে আমার জীবনে পেতে চাইনে।

আমি। যদি সেই মাধুরীকেই পাও।

নবীন হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর দুইবার ঘরময় ঘুরিয়া, বলিল "না তাকে আর পাওয়া যাবে না—হয়ত' আর সে যে মাধুরীই নাই, সংসারের ফেরে কি যে সে হয়েছে কে জানে? না আর নয়—আর নয়।"

এমন সময় নবীনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভা আসিয়া ডাকিল "কাকা—" নবীন তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল, "শুধু, আমাদের একটু চা দিলি নে।" শোভা তাহার কোমল মুখখানি অভিমানে বাঁকাইয়া বলিল, "যে তুমি সারাদিন গোমরা মুখে রয়েছ।"

আরও কিছুক্ষণ বালিকার সহিত আলাপ করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম, যে এই ইচ্ছাকৃত বেদনার শেষ কোথায় দেখিতে হইবে।

॥ ২ ॥

এদিকে ঘটনাও ক্রমশ জমিয়া আসিতে লাগিল। রমেশের স্ত্রী বহুদিন হইতে কী একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছিল, নানাস্থান ঘুরিয়া এবং নানারূপ কিছুতেই কিছু হয় নাই। শেষে রমেশ কোথা হতে এক লেডি ডাক্তারকে আনাইয়া তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়াছে। এই ডাক্তারটি নাকি তাহার স্ত্রীর বাল্য এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু—রমেশের স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে দু-একদিনের জন্য হাওয়া বদলাইতে এবং বন্ধুর চিকিৎসা করিতে করিতে এখানে আসিয়াছেন।

আমারও অমনি মাথার টনক নড়িল, এইতো সুযোগ! আমি রমেশের সহিত পরামর্শ করিয়া নবীনের খোঁজে বাহির হইলাম। তাহাকেও কয়েক দিন হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। তাহারও বাড়িতে তাহার দাদার কন্যা শোভার হঠাৎ কী একটা পীড়ার চিকিৎসায় সে বিশেষ ব্যস্ত—ইহা ছাড়া তাহার নিজের বিনা পয়সায় রুগিপত্র হাসপাতাল পরিদর্শন ত আছেই।

সন্ধ্যার সময় তাহাকে খালাস পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমি তাহার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইল। দেখিলাম নবীনের হস্‌পিটাল এসিস্‌ট্যান্ট তাহাকে কাতরভাবে বুঝাইতেছে যে এই সামান্য ফোড়াটার জন্য মেয়েটাকে এতদিন ধরিয়া কেন কষ্ট দেওয়া হইতেছে, সামান্য একটু অস্ত্র করিলেইত সব চুকিয়া যায়! নবীন কিন্তু ক্রমাগতই মাথা নাড়িতেছে। সে বলিতেছে যে আর একদিন থাকিলেই ফাটিয়া যাইবে, সে যে প্ল্যাসটার দিয়াছে তাহাতেই কাজ হইবে।

আমি প্রশ্ন করিলাম, "কার ফোড়া হয়েছে।"

নবীন বলল, "শোভার।"

আমি। ফোড়া পেকে থাকে ত' কেটে দাও না।

নবীন। না তা পারব না—আমি সার্জারি এখানে করতে দেব না।

আমি। পরের ওপর ত' খুব ছুরি চালাও।

নবীন। আমি চালাইনে, তারা চালিয়ে নেয়।

আমি। তাহলেই হল, যাক, তুমি না পার ইনি ত' পারবেন, তুমি এর ওপর ভার দাও না।

নবীন। না ভাই তা যে পারছি না।

আমি কিছুক্ষণ তাহার সহিত তর্ক করিলাম। শেষে মনে মনে একটা মৎলব আঁটিয়া এসি্‌টান্টকে বলিলাম, "মহাশয় আজ যান, কালকে দরকার হলে ডেকে পাঠাব।" এসি্‌টান্ট চলিয়া গেল। নবীন তখন উঠিয়া ক্ষণকাল সেই কক্ষের মধ্যে পায়চারি করিল। হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

"তুমি জান না ভাই, যেদিন মাধুরী আমায় ছেড়ে গেল তারপর থেকে আমার যেন সবই ওলট

পালট হয়ে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম জোর করে সব উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু আমার অজ্ঞাতে কখন যে আমার মনটা লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শভীরু হয়ে গিয়েছিল বলতে পারিনে, কিন্তু কাটাকাটির নাম শুনলেই সেটা কেঁপে উঠত। ছুঁরি কাঁচি ফরসেপ দেখলেই সে কুঁচকে যেত, আমি জোর করে তাকে কর্তব্যে লাগাতাম কিন্তু কোথা হতে একরাশ অশ্রু এসে আমার চোখ ঢেকে ফেলত। যে সব রুগিকে ক্লুরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন করতাম তাদের সেই নীরব নিথর দেহও যেন আমার কানে কাতর স্বরে চিৎকার করে বলত—না—না—না। প্রথম প্রথম সে স্বর চিনতাম না তারপর ক্রমশ সেই স্বর চিনিতে পারিলাম—সে স্বর সেই বিদ্রোহী মাধুরীর। সে দেশকালকে অতিক্রম করে প্রত্যেক কর্তব্যের নিষ্ঠুরতার সময় বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে এসে বলত —আমায় কেউ না, আমি তোমারই, আমি তোমার বুকের মধ্যে বসে আছি, তোমার বুকের মধ্যে তোমার বুকের রক্তের তালে তোমার দেহের মধ্যে জীবনের গতির সুর হয়ে জেগে আছি, তুমি আমায় চিনছ না?

নবীন ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া যেন তাহার জীবনের সুরটি শুনিতে লাগিল। আমি কোনো কথা না বলিয়া তাহার মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এই ডাক্তার বন্ধুটির মনের মধ্যে এ কিসের কোমলতা, এ কিসের মাধুরী প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনকে এমনভাবে কর্তব্যভীরু করিয়া তুলিয়াছে।

নবীন উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিল,—

"প্রথম প্রথম মন কাঁপ্‌ত, তারপর হাত কাঁপতে লাগল। তখন মেডিকেল কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু মেডিসিনের বিদ্যে দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করিতে লাগলাম। সারাদিন বৈ ঘাঁটতাম, বড়ো বড়ো ডাক্তারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতাম; এমন কী এক সময় মনে করেছিলাম হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করব। কিন্তু দাদা তা দিলেন না—পেটের টান বড়ো টান, তাই দাদার অনুরোধে এইখানে এসে এখানকার হাসপাতালের চাকরি নিলাম। কিন্তু যখনই বড়ো বড়ো অপারেশনের দরকার হয়েছে তখনি প্রথমেই উপদেশ দিয়েছি কলকাতায় যেতে। যারা তা পারেনি তাদের হয়ত কর্তব্যের অনুরোধে অপারেশন করিছি, কিন্তু তাও বেশি নয়। আমার এসিস্টান্টকে দিয়ে যেখানে কাজ চলেছে, সে কাজটা তাকে দিয়েই করিয়েছি—এমন কী ডাক্তার সাহেব যে কাজটা হয়ত মনে মনে অনিচ্ছুক হতেন তাও তাঁকে দিয়ে পাকে প্রকারে করিয়ে নিয়েছি। বিশেষত ছোটো ছেলেমেয়ে দেখলে ত আমি কিছুতেই আর এগুতে পারিনে—সেই যে একখানি কোমল বুকে একটি কাতর রমণীর অবুঝ মাতৃহৃদয়ের না—না' ধ্বনি আমার সব বিদ্যে শক্তি কেড়ে নেয়। সেই মায়ের হৃদয় সমস্ত হৃদয়ে মিশে গিয়েছে। তাকে আর আমার পুরুষের হৃদয় থেকে পৃথক করতে পারছিনে ভাই! কী করে আমার এই শোভাকে ওই সামান্য ফোড়াকাটার যন্ত্রণা দেব তা যে কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আমার দুর্বলতা যে ক্রমশ আমার প্রাণঘাতী হয়ে উঠল। আমার বুকের ব্যথা ক্রমশঃ আমার হাতপায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, শেষে এখন দেখছি সারা জীব-জগতে ছড়িয়ে পড়ে।"

নবীন আবার বেড়াইতে আরম্ভ করিল। আমিও অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হইল, "এই ত সময়—এইবার ত' তাহাকে ডাকিতে পারি। মাধুরীর জন্য সমস্তই যেন প্রস্তুত হইয়াছে এখন কেবল তাহার আসিয়া দাঁড়ানটুকুরই মাত্র প্রয়োজন। তারপর সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে।"

আমি সময় বুঝিয়া প্রস্তাব করিলাম, "ওহে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে, সে নাকি বিনা অপারেশনে চিকিৎসা করতে পারে—এ বিষয়ে সে একজন স্পেশালিস্ট তাকেই ডাক না।"

নবীন মৃদু হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার নয়—কবরেজ বোধহয়। বিনা অস্ত্রে ফোড়ার ঠিক চিকিৎসা ডাক্তারিতে কই?"

আমি। না—না ডাক্তার—যদি বলত তাকে কালকে ডেকে আনি।

নবীন। তাহলে কালকে কেন ভাই আজই আন না—আমার যা কিছু বিদ্যে ছিল ফুরিয়েছে, মেয়েটা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে—আমারই দোষে, আমি কিছুতেই অস্ত্র করতে দিচ্চিনে। তার মা কত বলছে, দাদা বকছেন, আমি কেবল শোভার ভীত মুখখানা দেখে কিছুতেই ছুরি চালাতে পারছিনে।

আমি। তুমি কী মনে করো ডাক্তারি বিদ্যের সবটাই তোমার আয়ত্ত হয়েছে? হয়তো কেউ কেউ এমন জিনিষ—

নবীন—যাক যাক আমি আর কিছু শুনতে চাইনে, তর্ক করব না, তুমি তাঁকে ডেকে আন।

আমি মহা বিপদে পড়িলাম। কোথাও কিছু ঠিক নাই কেমন করিয়া এরই মধ্যে সব বন্দোবস্ত করি। শেষে বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলাম, "আজ তিনি আসবেন না, তাঁরও হাতে একটা মস্ত রুগি, আর মোটে আজ এসেছেন এরই মধ্যে—"

নবীন বাধা দিয়া বলিল, "তিনি যদি বাস্তবিক ডাক্তার হন তাহলে তোমার ভয় নেই, ডাকলেই আসবেন। আমার এ কেস্ ত খুব গোলমেলে নয়, আধ ঘণ্টাও লাগবে না—তুমি যাও। না হয় চল আমিও যাই।"

বিপদ ঘনাইয়া উঠিল। কী জানি কী করিতে কী হইয়া বসে—ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নবীনের কথামতোই মাধুরীকে লইয়া আসিবার জন্য আমি একাই বাহির হইলাম। কে জানিত যে এমন ঘটনা ঘটিবে? এ মিলনের মধ্যে আমি ভগবানেরই হাতে দেখিতে পাইলাম। রমেশের স্ত্রীর ব্যাধির উপলক্ষে মাধুরীই বা এখানে আসিবে কেন? আর ঠিক সেই সময়ে নবীনের ভাইঝিরই বা অসুখ করিবে কেন? ভগবানের খেলা নয় ত কী? আমি সাহসে ভর করিয়া রমেশের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম।

রমেশ তখন উপরে তাহার অতিথিসৎকারে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের কথা নীচের তালা হইতে শোনা যাইতেছিল। আমি চাকরের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলাম। রমেশ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমার নিকট সমস্তই শুনিল। শেষে ভীত হইয়া বলিল, "তাইত" কী করা যায় দাঁড়াও আমি একবার ওপর থেকে আসি।" আমি বলিলাম "সেই ভালো, এ বিষয়ে যিনি নাটের গুরু তাঁর পরামর্শ নেওয়াই আগে উচিত।"

রমেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, তার পশ্চাতে একটি তরুণী। কিন্তু তরুণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছাড়াও এমন একটা গম্ভীর মর্যাদা তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছিল যে আমি তাঁহার দিকে ভালো করিয়া না চাহিয়াই উঠিয়া নমস্কার জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কী হয়েছে?"

আমি। সেটা আপনি ডাক্তার, নিজেই দেখে ঠিক করবেন। আমার বলা বাহুল্য।

রমেশ ইতিমধ্যে তাহার গাড়োয়ানকে গাড়ি জুড়িতে বলিল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তিন জনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রমেশের মনে কী হইতেছিল জানি না, কিন্তু আমার বুক ধড় ফড় করিতেছিল। এই দুই জন অতি পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে আমরা দুই জন একান্ত অপরিচিত, আমাদের সম্মুখে না জানি কী ঘটিয়া বসিবে!

গাড়িখানা নবীনের বাটীর সম্মুখে থামিতেই আমি নামিয়া পড়িলাম কিন্তু রমেশ নামিবার পূর্বে বলিল, "শুনুন, জানিনে আমরা কী করে বসলাম, কিন্তু এর পর যাই হোক অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা আমাদের কোনো বন্ধুর উপকারের জন্যই আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। আপনি যে বাড়িতে যাচ্ছেন তাঁকে আপনি চেনেন, অন্তত আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সেই রকমই শুনিছি এবং তার পরামর্শেই একাজ আমরা করেছি। কিন্তু যদি—"

মাধুরী তাহাকে বাধা দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি জেনে শুনেই এসেছি।"

মাধুরী যখন গাড়ির অন্ধকার হইতে নবীনের বাটীর গাড়ি-বারান্দার আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। এই তরুণী সমস্ত জানে, সমস্ত বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সে তাহার হারানো মানুষটির খোঁজে আসিয়াছে। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলাম।

এদিকে গাড়ির শব্দ পাইয়াই বোধহয় নবীন ও তাহার ভ্রাতা উভয়েই উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। নবীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্র অবাক হইয়া একবার মাধুরীর দিকে আর একবার আমাদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মাধুরী কোনো কথা না বলিয়া একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করিল। ব্যারিষ্টার তখন অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "একি এ যে মিস বোস্! একে কোথায় পেলে তোমরা?"

রমেশ বলিল "ইনি আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু, তাঁকে দেখতে আর কতকটা Change-এর জন্য এখানে এসেছেন। শোভার জন্য, প্রসাদ (আমার নাম) গিয়ে আমায় খবর দেওয়াতে আমি এঁকে ডেকে আনলাম। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।"

নবীন এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী ও রমেশ নবীনের দাদার সঙ্গে হলে প্রবেশ করিল।

নবীন গম্ভীরভাবে বলিল,—"এ তুমি কী করলে?"

আমি। আমি করিনি ভাই, ভগবান করেছেন। সত্যি বলছি এতে আমার এতটুকু কৃতিত্ব নেই। চল ভেতরে যাই, পরে সব কথা হবে।"

নবীন যন্ত্রচালিতবৎ হলে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য সকলে ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তখন একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, "তুমি যাও, ডাক্তার, আমি এখানে রইলাম।" নবীন নড়িল না। একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "না—না সে কিছুতেই হবে না—তোমরা একাজ ভালো করনি।"

আমি নবীনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভালো হোক মন্দ হোক আজ আমার অনুবোধ তুমি শান্ত হয়ে তোমার শোভার যাতে ভালো হয় তাই করো। তুমি এ দুদিনে কী হয়ে গিয়েছ নবীন, তোমার সেই প্রাণখোলা হাসি কোথায় গেল। জীবনটা তোমার কাছে খোলা মাঠে দৌড়ানোর মতোই সহজ ছিল, হঠাৎ কেন সেটাকে এত গম্ভীর এত জটিল করে তুলছ। হাসি দিয়ে সব ঝেড়ে ফেল ভাই—"

নবীন হঠাৎ হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এই অশ্রুই এতদিন তাহার হাসির ঠাণ্ডা বাতাসে জমাট বাঁধিয়াছিল। সহসা আজিকার বাতাসে তাহা গলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমিও থাকিতে পারিলাম না, যে ব্যাপারে নিজেকে এতখানি জড়িত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার শেষ দেখিতেই হইবে— আমি ভিতরের সিঁড়ি দিয়া উপরে গেলাম। নবীনের বাটীর অন্দর বাহির সমস্তই আমার জানা ছিল।

উপরে গিয়া রোগির কক্ষের বাহির হইতে শুনিলাম মাধুরী বলিতেছে—"না—আপনারা বড়ো অন্যায় করেছেন, মিছিমিছি কেন এই ছোটো মেয়েকে এত কষ্ট দিচ্ছেন। কালকেই অপারেশন করে দেন, সব সেরে যাবে—জ্বর থাকবে না, যন্ত্রণা কমবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, নবীন যে কিছুতেই Operation করতে দিচ্ছে না। ও ডাক্তার, ওর চেয়ে কী আমরা বুঝি?

নবীনের ডাক পড়িল কিন্তু কোথায় নবীন? মাধুরীকে তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীর কাছে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রমেশের সহিত বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিলে, "নবীন কই?"

পার্শ্বের একটা কক্ষ হইতে সে বাহির হইয়া বলিল, "দাদা, আপনি মিস্ বোসকে যেতে বলুন, আমার রুগি আমি দেখ্ব।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "কী ছেলে মানুষী করছ? উনি যখন এসেছেন তখন যাতে কোনো গোল না হয় তাই করো। ওঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করগে যাও।"

নবীন চুপ করিয়া রহিল, আমি তাহাকে রোগীর কক্ষের দিকে ঠেলিয়া দিয়া তাহার কানে কানে বলিলাম, "তোমার বয়স ত' আর সত্যি সত্যি পঁচিশ নয়—কেন বাঁদরামি করছ?"

নবীন ধীরে ধীরে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। রমেশ এদিকে নবীনের দাদাকে বলিল, "বড়োদা, এই আমাদের অবসর, আমাদের সেই পরামর্শ অনুসারেই ওকে এখানে আনিয়েছি এখন যাতে এই বিয়েটা হয়, বউ ঠাকরুণকে বলে ঠিক করে ফেলুন।"

বঙ্কিমচন্দ্র মহা উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আঃ তাহলেই যে বাঁচি।"

রমেশ তাঁহার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল। আমি পুরুষমানুষকে যাহা করিতে নাই সেই দুষ্কর্ম করিলাম, দরজার গোড়ায় চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

শুনিলাম বউ-ঠাকুরাণী বলিতেছেন, "শোভার সম্মুখে সব কথা ত' হবে না, ওঘরে কিংবা নীচে গিয়ে তোমরা পরামর্শ করো। আমি শোভার কাছে রইলাম।"

বৌঠাকরুণের বুদ্ধিকে শত ধন্যবাদ দিয়া আমি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইলাম। যে খানসামাটি নীচে বসিয়াছিল তাহাকে বলিলাম "তুমি বাহিরে যাও।"

মাধুরী ও তৎপশ্চাতে নবীন নামিয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ মাধুরী ফিরিয়া হাসিভরা মুখে বলিল, "একদিন যে অপরাধের জন্য আমার শাস্তি হয়েছিল, আজ সেই অপরাধই করা হচ্ছে, কিন্তু আমারই জয় হয়েছে, তুমি হার মেনেছ। এখন থেকে স্বীকার করো এই তোমার স্নেহের ধনের দেহটিকে যে চক্ষে দেখ সেই দেখাও মিথ্যে নয়। ডাক্তারের চোখে দেখাই শেষ দেখা নয়।"

নবীন মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে—"

মাধুরী। এখনো শাস্তির শেষ হয়নি, এই শোভার ফোড়া আমিই কাটব,—তুমি মেড্যালিষ্ট, সার্জারিতে ফাষ্ট, তোমায় হাত গুটিয়ে দেখতে হবে।"

নবীন একবার মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে তোমারও হার হয়েছে। ডাক্তারের কর্তব্যটাও ফেলনা জিনিষ নয়, এটুকু ত' তুমি স্বীকার করেছ।"

উভয়ে নীচে নামিয়া হলে প্রবেশ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলাম। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কী ঠিক হল?"

মাধুরী বলিল, "ঠিক আর কী হবে, ওতো একটা সামান্য ফোড়া ওর জন্য ব্যস্ত হবার কিছু দরকার ছিল না, ইনি নিজের ভাইঝি বলে না কাটতে পারেন, আর কাউকে দিয়ে সামান্য একটু operation করে দিলেই চলবে। বলেন ত' না হয় কাল এসে আমিই করে দিয়ে যাব।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "নবীন কি বল? নবীনের বড়ো আদরের মেয়ে তাই ও এত গোলমাল করেছে, তুমি যদি আস মিস বোস, তাহলে– "

"বেশ তাই আসব, এখন তবে আসি।'

রমেশ ও মাধুরীর সহিত আমি ও নবীন উভয়ে বাহিরে আসিলাম। মাধুরী গাড়িতে গিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কী হে আমাদের সাহায্য আর দরকার হবে, না একলাই কাল সমস্ত শেষ করতে পারবে?"

নবীনও একচোটে খুব হাসিয়া লইয়া বলিল, "না হে, একলাই পারব, তবে অপারেশনের সময় আমি থাকব না বোধহয়।"

রমেশ বলিল "তোমারও বুক ধড়ফড়ানি রোগ হয়েছে তার চিকিৎসার ভার এঁকেই দেব, কি বল?"

আর একদিন মধুর প্রভাতে হঠাৎ নবীন ডাক্তারের গাড়ি আসিয়া আমার বাটীর সম্মুখে লাগিল। আমি তখন মক্কেল-বেষ্টিত অবস্থায় বসিয়া ছটফট করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে সেই গাড়ি হইতে নবীন নামিয়া আসিয়া বলিল "আজ ছুটি নাও ভাই, কাজ ত' রোজই আছে।"

আমিও বাঁচিলাম ঘাড়ে একখানা চাদর ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলাম "কী হে ব্যাপার কী?"

নবীন। তুমি এই নাট্যের একজন এক্‌টর, তোমাকে না দেখালে আমার মন শান্ত হবে না।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া নবীনের গাড়িতে গিয়া চড়িয়া বসিলাম। গাড়িখানা এখানকার বড়ো হাসপাতালে গিয়া থামিল। আমরা উভয়ে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। দেখিলাম, মাধুরী সেই রোগীগণের মধ্যে, সেই বেদনা ও কাতরোক্তির মধ্যে সেবা ও স্নেহ, আশা ও আশ্বাসের মতো রমণীয় পূর্ণ সৌন্দর্যে এবং জননীর পূর্ণ মহিমায় বিরাজিতা। একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ অপরিষ্কার কৃষ্ণকায় শিশুকে কোলে লইয়া সে সযত্নে একটা feeding bottle হইতে কী একটা পেয় বস্তু পান করাইতেছিল। ছেলেটির দরিদ্র মাতা একদৃষ্টিতে এই সেবিকার কার্য দেখিতেছিল। দূর হইতে মাধুরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি নবীনকে বলিলাম, ডাক্তার, পুরাণে যে লিখেছে আদর্শ সতীকে জননী হবার জন্য, কার্তিক গণেশের মা হবার জন্য, আগুনে পুড়ে কায়া বদল করতে হয়েছিল সেটা একটা মস্ত সত্য। সেই মরণের বেদনা তারপর তপস্যার দুঃখ না সহ্য করলে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শিবকেও পূর্ণ মঙ্গল হবার জন্য অনেক দিন মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে মড়া ঘাড়ে করে ঘুরে মরতে হয়েছিল। তোমাদের উভয়ের দুঃখ সহ্য করার মধ্যে সেই কথাটার, সেই সনাতন সত্যেরই ছোটো সংস্করণ দেখতে পেলাম।"

নবীনচন্দ্র সজল চক্ষে মাধুরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আশীর্বাদ করো আমাদের এই পুনর্মিলন দুঃখেরই হোক আর সুখেরই হোক যেন সত্যের হয়, প্রেমের হয়, মঙ্গলের হয়।"

আমিও মনে মনে বলিলাম—"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

জননী

উষা রায়

রান্নার দাওয়ায় বসে পাটকাঠি জ্বেলে পেয়ারাপাতা সেদ্ধ বসিয়েছে সতী। রাত থেকে দাঁতের গোড়াটা ফুলে ঢোল। অনবরত শুলোচ্ছে। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। পেয়ারা পাতা সেদ্ধ জল দিয়ে কুলি করলে তবে যদি ফুলো ব্যথা দুই কমে। রাত পোহাতেই তাই হাতের সব কাজ ফেলে পাতা সেদ্ধ করার তোড়জোড়। দাওয়ার চালে বসে একটা নাম না জানা পাখি কুঁই কুঁই শব্দে একটানা ডেকে চলেছে। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় যন্ত্রণা কাতর সতীর কানে ডাকটা বড়ো অমঙ্গলের হয়ে ধরা দেয়। কান পেতে শোনে ডাকটা। স্বরটা ঠিক বোঝে না। রেগে গিয়ে বাইরে এসে একটা মাটির ঢেলা তুলে পাখিটার দিকে তাক ছুঁড়ে দিলো সতী। মরছি দেখছিস দাঁতের শুলোনিতে, আর উনি এলেন সোহাগ জানাতে। কুঁই কুঁই করে ডেকে কি বলতে চাইছিস? গেরস্থের খোকা হোক? না তুই মলে আমি বাঁচি? কি বলছিস ভালো করে বল। সতী অন্যদিন এইভাবেই কথা বলে। আজ কিন্তু আঁচলের প্রান্ত দিয়ে দাঁতের গোড়াটা চেপে ধরে কাতরাতে কাতরাতে ঘরে ঢোকে। ভোরের আলো আঁধারিতে ঘরের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা নিস্তব্ধতা, তারই মধ্যে দুহাঁটুতে মাথা গুঁজে তিন মাথা করে ভুজঙ্গকে ঘটের মতো উবু হয়ে বসে থাকতে দেখে প্রথমটায় একটু থতমত খায় সতী. এরপর সজাগ দৃষ্টিটা বুলিয়ে ভুজঙ্গকে দেখে খানিক যেন খুশি হয়। আরে এ মানুষটা এমন নিঃসাড়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো কখন? টের পাওয়া যায়নি তো। নিশাচর না সাপ? পায়ের পাতার শব্দ হয় না। চুপিচুপি দাওয়ায় এসে সিঁধ কাটে।

এরপর একটা শ্বাস টেনে নিজের খুশিটা আড়াল করে ভুজঙ্গকে শুনিয়ে বলে, মানুষটি তো তুমি এমন সাড়হীন নয় গো বাপু, তবে কী লজ্জা পেয়েছো? গত বারো তেরোটা দিন এ ভিটেমাটি মাড়াওনি। আনাচে কানাচেও পেখমটি দেখা যায়নি কার্তিক ঠাকুরটির। পদির সংসারে মজা লুটছিলে? তা এমন তো কতই থাক। ফিরে এসে এমন লজ্জায় রাঙা বউটি হয়ে মুখ ঢাকো না তো। এ আবার কী ঢঙ তোমার? পারেও বটে। এত কথা বলেও সতী থামে না। ভুজঙ্গর আরও কাছে সরে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—সাতসকালে কী মনে করে বলো তো ঠাকুর? পদি খেঁদিয়েছে মনে লয়।

খাটে রোজকার মশারি টাঙানো। চারপাশ নিখুঁত করে গোঁজা। এই মুহূর্তে আর বিমলার কথা ভাববার মতো অবস্থা নেই আমার। কুম্ভকর্ণের ঘুম আমার চোখে। সারা শরীরে ক্লান্তি। মশারির গোঁজা সরিয়ে ভেতরে মাথা ঢোকালাম। ঢুকিয়েই চমকে উঠলাম। কুম্ভকর্ণের চোখ নিয়েই দেখলাম, বিছানার যেদিকটায় বিমলা শোয়, সেদিকটায় বিমলা নেই। আছে শুধু মাথার খুলি, কয়েক খণ্ড হাড়। মানে বিমলার দেহযন্ত্রের বিক্ষিপ্ত ছড়াছড়ি। ঘুম কেঁচে গেল। অবাক চোখে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম সেগুলো।

দেখলাম যন্ত্রাংশগুলো সবই আছে—মাথা-চোখ-নাক-কান-গলা-একজোড়া বুক, নাভি-তলপেট-হাত-পা-কোমর ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই শুধু জোড়া বুকের মধ্যে ধুকপুক করতে থাকা হৃদয়টা, যে হৃদয়ে থাকে ভালোবাসা, প্রেম এইসব নরম অথচ গভীর অনুভূতিগুলো। ওগুলো গেল কোথায়? সমস্ত পার্টসগুলো উল্টেপাল্টে বারকয়েক দেখলাম। কিন্তু না, কোথাও নেই। পার্টসগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে, কী আশ্চর্য, দেখতে পেলাম একগোছা স্ক্রু আর একটা স্ক্রু ড্রাইভার একপাশে রাখা আছে।

এই ছড়ানো ছিটানো বিমলাকে দেখে খুব মায়া হল। মায়া বড়ো কঠিন। সেই কঠিন মায়ায় পড়ে আমি ওর সমস্ত পার্টসগুলো জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করলাম। তেতো লাগল। শুনেছি সব মেয়েমানুষের দেহের স্বাদ এই বয়সে তেতো হয়ে যায়।

তা হোক, তবু তো বিমলা আমার বিয়ে করা বউ। রোজ রাতে আমার জন্য খাবার সাজিয়ে জেগে থাকে। ভোরবেলা বেরোবার সময় চা জলখাবার করে দেয়। আমারও উচিত ওকে দেখা। আমি বেশ ভালোভাবে দেখতে শুরু করলাম। মন দিয়ে দেখতে দেখতে, হঠাৎ কী মনে হল, বিমলার পার্টসগুলো এক একটা করে স্ক্রু ড্রাইভার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জোড়া দিতে লাগলাম। হাজার হলেও কারখানার মজদুর তো, যন্ত্রপাতি নিয়েই কাজ কারবার আমার, তাই বেশ লেগে যেতে লাগলো পার্টসগুলো। শেষ স্ক্রুটা যেই টাইট দেওয়া হয়ে গেল অমনি, শ্রীহীনা মধ্যযৌবনা বিমলা তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলো।

—এ্যই, তুমি খেয়েছো? ছিঃ ছিঃ আমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে...

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

—তুমি ঠিক করে খেয়েছো তো।

—হ্যাঁ। তবে আজ রুটির সঙ্গে বেশি চিবিয়েছি সর্বহারার বিপ্লব বইটা। ওটা চিবিয়ে চিবিয়ে আজই শেষ করেদিলাম।

—ওমা কেন? পরিমলদা তো কাল সকালেই বইটা নিতে আসবেন।

—কেন নিতে আসবেন কেন? ওটা তো আমাকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিমলা গলায় ঝঙ্কার তুলে বলল, জানি না, তবে উনি নাকি আবার কাকে বইটা দেবেন রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রাম, শ্রেণি শত্রু, মূল্যবোধ এইসব তার মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য। তোমার মধ্যে তো জাগল না, তাই...

কথাগুলো শুনে আমার হাসি পেল, কিন্তু হাসলাম না। দাঁত চিবিয়ে বললাম, তোমাকে জোড়া না দিলেই ভালো হত।

ভুজঙ্গর সাড়হীন শরীরটার দিকে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কটা ছুঁড়ে দিয়ে দেয়ালে অবাঞ্ছিত টিকিটিকিটার দিকে তাকিয়ে গজরায়, পিথীমীতে কত রঙের মনিষ্যি আছে বটে। তুমি এক, আমি আর এক।

সতীর কথায় তীরবিদ্ধ শিকারের মতো মাথা তোলে ভুজঙ্গ। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে আবার চুপ করে যায়। শুধু ওর ঠোঁট নড়ে কিন্তু কথা বার হয় না। এতে সতীর রাগ অভিমান দুই বাড়ে—পদি রানী তোমার বিয়ে করা বউ। সেই ইস্তিরির হক্ আছে তোমায় আটকে রাখার। সতীর নাই। তুমি মাঝে মধ্যি সতীর কাছে আসো, এই যা তার উপরি পাওনা, বহু জন্মের তপিস্যি। এটা বোঝ বলেই দুদিন অন্তর গা ঢাকা দিয়ে নিজির দর বাড়াও। দরকার নাই ঠাকুর তোমার ওই দরে। তুমার দর নিয়া তুমি থাক গিয়ে। আমি একাই থাকি।

ভুজঙ্গ এলে সতী খুশি হয়। সেই খুশির রঙও চিনতে পারে না ঠিকই, তবে ভুজঙ্গ এলে মনে হয় নিজের কেউ একজন এলো কাছে। মাঝবয়সি সুঠাম হিলহিলে চেহারার ভুজঙ্গ যখন শরীর দুলিয়ে হাসি-মস্করা করে কিংবা নিজের সুখ দুঃখের গল্পগাছা করে, খারাপ লাগে না সতীর। রসিক মানুষটাকে আদর যত্ন করে, খেতের লাউটা, মুলোটা রান্না করে খাওয়ায়। সতী মনে করে

মেয়েমানুষের জন্মই তো হয়েছে অন্যকে যত্ন আত্তি করার জন্যি। এটা আর নতুন কি। তবে ভুজঙ্গর মুখে রসের কথাগুলো নতুন বৈকি। মন নাড়িয়ে দেয়। ভুজঙ্গকে যত্ন করে সতী তাই আনন্দ পায়। একা মানুষ, আশপাশে একটা পিছুটান নেই। ভুজঙ্গ সেই অভাবটা পূরণ করতেই যেন দু একদিন কাটিয়ে যায় সতীর কাছে।

দিন গুজরানের জন্যে সতীর দুটো পাঁঠী আছে। তাদের দুধ বেচে, আর ঘরের লাগোয়া একফালি জমিতে লাউটা কুমড়োটা ফলিয়ে একরকম চলে যায় দিন। এছাড়া ইদানীং সতীর ঘরে মানুষ আসে। ভুজঙ্গর সামনেই তাকে নিয়ে ঘরের আগল দেয় ও। ভুজঙ্গ সতীর উঠোনে বসে আপন মর্জিতে বিড়ি ফোঁকে আর ঝোড়া ঝুড়ি বোনে। ওটাই ওর এখনকার পেশা। সতীর ওপর ভুজঙ্গ কখনও অধিকার ফলায় না। বরং সতীর সঙ্গে গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে দার্শনিক বনে যায়, উদাস ভঙ্গিতে বলে,—জানিস তো, এ জগৎ সমসারে কেউ কারুর লয়। না হলি পদির ব্যাভারটা দেখ্। ও বলতি চায় আমারে উর কুন দরকার নাই। আরে বাপু গরজাটা কি তালি শুধু আমার একার? তুই মলি গিয়ে মোর ধম্ম সাক্ষী করা ইস্তিরি, আর আমারে তোর দরকার নাই? সগ্গে গিয়া ভগমানেরে কি কৈফিয়ৎ দিবি? এরপরে একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে—আসল বেত্তান্তটা কী বলতো, উর পেট ভারি, বুক ভারি, তাই ওই গুমর, আমারে দরকার নাই। ভুজঙ্গ পাঁজর বার করা তামাটে বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—আমি ত পদিরে টাকাপয়সা কিছু দিতি পারি নাই, উর বাপের পয়সাই উর বুকের বল। আর পেটের বল—চার চারটে ছানাপোনার মা। কিন্তুক ওই ছানাপোনা তো আমারই জন্যি পালি, সে বিত্তান্তটা ভাব একবার। অথচ বালবাচ্চার জন্যি আমি কিন্তুক বাপ হয়িও গব্ব করতি পারি নাই। বাপ বলি ছানাপোনারা আমার কাছে ঘেঁসে না, ভক্তি ছেদ্দা করে না। উ সব পাযানি মায়ের শিক্ষের ফল। বড়কাটা ত ডাগরটি হল বছর দশেকের। কিন্তুক বাপ কারে কয়, চিনে না, এমনই ভাব।

এসব কথার পর খানিক গুম হয়ে থাকে ভুজঙ্গ। সতী আগ্রহী শ্রোতার মতো সে সব শোনে। প্রশ্ন তোলে না। একটা মানুষের ভেতরে অনেক কথা, সে সব উগরে দিয়ে হালকা হচ্ছে মানুষটা। সতীর নিজের তো সেরকম গল্প গাছা নেই, বা থাকলেও তা নিয়ে ভ্যাদর করলে যদি ভুজঙ্গ বিরক্ত হয়ে এ পথ আর না মাড়ায়। সতী তাই নিজেকে নিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে না। দুঃখ আমার, তার জন্যে দোসর খুঁজে লাভ কী?

ভুজঙ্গ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ পরম উৎসাহে বলে ওঠে,—তবে কি জানিস, পদির মেয়েটা বড়ো সন্দরপানা হয়েছে রে—বেটি আমার বাপের মতো রূপের হয়েছে। এক কালে যাত্রাদলে নিমাই সাজতাম। চেহারাখানা কেমন নজরকাড়া ছিল আন্দাজ করো। মেয়েটা তেমনি পুতুল পুতুল হয়েছে। ওই এক রত্তি মেয়ে, এরই মধ্যি হাত পা ছোঁড়ার ধুম কি? আনবোখনে একদিন, দেখিস কেমন চুলবুলোটি হয়েছে। উ বেটির জন্যি গব্বে আমার বুকটা দশহাত হয়।

সতীর বুকটাও কিন্তু একথায় হা হা করে ওঠে। অমন সুন্দর পুতুলপারা মেয়েটাকে একবার বুকে চেপে ধরার জন্য বুকটা হাকড় পাকড় করে। বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে বলে এনোখনে একদিন। দেখে চক্ষু সার্থক হবে। নিজির তো হলোনি।

—কিন্তু খাওয়াবি কী? তোর বুকে তো দুধ নাই। মেয়ের আমার গলা শুকিয়ে যাবে। একরত্তি মেয়ে।

সতী দমে না, উৎসাহের সঙ্গে বলে—কেনে পাঁঠীটার দুধ ভালো করে জ্বাল দিয়ি রাখব। ওই দুধেই তো বদন মালোর ছেলেটা কেমন ডাগর পানাটি হয়ে উঠেছে। মাটা তো ওই ছেলে বিয়োতে গিয়ে সগ্গে গেলো। সেই ছেলে বাঁচলো আমার পাঁঠীর দুধ খেয়ে। ওর দুধের গুণ আছে গো। বদনের ছেলেকে যে দেখে সেই বলে।

—তা কথাটা মন্দ বলিস নাই। আনবোখনে একদিন। ঠিক আনবো।

ভুজঙ্গর এই আশ্বাসে সতী খুশির হাসি হাসে। মনে মনে বলে তিন তিনটে বেটার পর ওই বেটি বিয়িয়েছে পদি। বড়ো সুখ কপালি মেয়ে মানুষ ও। ওর দেমাক তাই সাজে, ভগমান ওকে ছাপর ফুঁড়ে দেছেন।

কোনো কোনো দিন ভুজঙ্গ সতীর দাওয়ায় এসে হাত পা ছেড়ে বলে,—আর পদির সম্সারে ফিরে যাবো নারে। তোর দুওরেই পড়ে থাকবো। মেয়েমানুষ চোপড়দিন মুখ ঝামটা দিলি কুন বেটা ছেলে মন বসে সম্সারে? ভুজঙ্গর গলায় দলা পাকানো কষ্টটা টের পায় সতী। ভুজঙ্গর চোখে এক অসহায় যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সতী নিজের মধ্যে ওই কষ্টটা টেনে নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে।

ভুজঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে চনমনে হয়ে ওঠে। সহজ ভঙ্গিতে বলে—তবে কিনা ওই বেটির লগেই পড়ে থাকা। না হলি কেউ খান্ডানি ইস্তির লগে পড়ি থাকে? আমি কি পদির সম্সারে মাগনায় খাই?, হাত নাড়ি পাত পাড়ি। ওই ভিটেয় পা রাখি ওই বেটির জন্যি।

সতী হাসে। ভুজঙ্গ আগেও অনেকবার ও কথা বলেছে। তখন দোহাই দিতো ওই ছেলেদের। এখন মেয়ের কথা বলে।

—হাসছিস যে বড়ো। ভুজঙ্গ বিরক্ত হয়। দেখিস ইবার, মোকে অত দুব্বল ভাবিস, না। ওই বেটির মায়াতেই মান খুইয়ে পড়ি আছি। হাজার হোক আমি বাপ, মোর বেটাবেটির লগে দায় নাই? মান্ষে বলবে কি?

সতী হাসিটা প্রসারিত করে। পাড়াপ্রতিবেশী বলে ও মেয়ে ভুজঙ্গর নয়। ভুজঙ্গ নিজেও কী ওই বিতান্তটা বিশ্বেস করে?

—পদি আবার কী বলে জানিস? বলে ও বেটি নাকি মোর নয়। বুঝ কথাটো। আমি হলাম গিয়ে তোমার সোয়ামি, আর ও বেটি আমার নয়? এমন আজগুবি বেতান্ত শুনেছিস কখনও? আরে বাপু তোর বাপের পয়সা আছে বলি কী সব মিথ্যা হয়ি যাবে?

সতী এ ফয়সলায় যায় না। ভুজঙ্গকে ছাগলের দুধ দিয়ে ঘন করে চা করে দেয়। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ওর মনের তাত কমায়। আর ভাবে সত্যি যদি ভুজঙ্গ মেয়েটাকে নিয়ে আসে একদিন, খানিক নেড়ে চেড়ে দেখে পদির মেয়েটাকে। কোলে নিলে জ্বালা ধরা বুকটা একটু ঠাণ্ডা করে। নিজের বলি একটাকেও তো গব্বে দরার ক্ষেম্তা হল নাই। আজ নয় বাজারের মেয়েমানুষের দলে চলে গেছে ও। কিন্তু আগে তো সেরকমটি ছিল না। সোয়ামি ছিল, ঘর সংসার ছিল। গেরস্থের সাঁজবাতি ছিল। শক্ত সমর্থ মানুষটা বিয়ের চার বছরের মাথায় প্রাণটা দিলো সাপের কামড়ে। তাই ওই চার বছরে কী গব্বে আসতে নেই পদির বেটির মতো হাত পা নাড়া সুন্দরপনা পুতুল একটা? এমন কি ঘরের পাঁঠীটাও বিয়োচ্ছে পিতি বছর দুটো করি। কিন্তুক্ মালকিনের অবস্থা দেখো। কোঁক নয় তো, যেন শীতের আমড়া গাছ। ফল নাই ফুল নাই, ডাঁরা খাঁড়া।

এখন এই সাত সকালে ভুজঙ্গকে নিজের ঘরে বসে থাকতে দেখে সতী খানিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ভুজঙ্গকে আর কোনো সাড়াশব্দ করতে না দেখে আবার রান্নাঘরে চলে যায়। পেয়ারা পাতার জলটা দিয়ে আর একবার কুলি করতে হবে। আবার খানিক বাদে ফিরে এসে ভুজঙ্গকে দেখে একটু ইতস্তত করে। এখনও ঘটের মতো বসে আছে মানুষটা। শরীরের কালো মাথাটাই শুধু চোখে পড়ছে। ঢেউখেলানো ঘন চুলে দু চারটে রূপালি রেখা। সতীর মনটা কেমন উদাস হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বাঁশের আলনা থেকে গামছাখানা টেনে নিয়ে পুকুরে ডুব দিতে চলে যায়। আর উঠোন পেরুবার মুখেই হীরু মালোর বছর আষ্টেকের মেয়েটাকে ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রমাদ গোনে। হীরুর বাড়ি রোজ তিনপো করে ছাগলের দুধ দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আজ সব কিছুই গণ্ডগোল। পাঁঠীটার বাচ্চা দুটো সব দুধ খেয়ে নিয়েছে। আর একটা তো গাভীন, তার দুধ পাওয়ার কথা নয় এখন।

সতী খুব মোলায়েম কণ্ঠে স্নেহ মিশিয়ে বোঝাতে চায়, — ওরে ও মা, কাল নিজির দাঁত গুলোনিতে মরেছিলাম। ধাড়িটাকে বাঁধা হয়নি। সব দুধ শত্রুগুলান খেয়ে নিয়েছে। বেলা পড়ুক, যেটুক্ দুধ হবে, দিয়ি আসবোখনে। বড়ো ভুল হয়ে গেছে মা।

মেয়েটার সামনের দাঁত দুটো পড়ে গেছে। ফোকলা দাঁত ফোলা ফোলা গাল দুটো, সতীর বড়ো আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা হবার নয়। মেয়েটা চোখ বড়ো করে। সতী সিঁটিয়ে যায়। বয়েস কম হলি কী হয়, ও মেয়ে বড়ো কথায় কাটে। অথচ হীরুর পরান ওই মেয়ে। হীরুর মাছের কারবারের বাড়বাড়ন্ত ওই মেয়ের পয়ে। ফলে ও মেয়েকে কিছু বলা মানে হারুর কাছে ঝাড় খাওয়া।

—তা যদি শত্রুগুলানে দুধ খাওয়ানোর এত আহ্লাদ—, (মেয়েটা মুখ খুলেছে। পূবের প্রথম রোদ মেয়েটার কালো মসৃণ কপালে), দুধটুকু আর না বেচলেই হয়। এমনি করলি আমাদের চলে কী করি? তোমার হাজারও বায়নাক্কা তো। বড়ো বড়ো পা ফেলে মেয়েটা চলে গেলো। এই মেয়ে বাড়িতে মা ঠাকুমার কাছে পাঁচ খান্ করি লাগাবে। হীরুর আদরে মেয়েটা বেয়াড়া হচ্ছে।

ঝটপট পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে তখনও ভুজঙ্গকে একইভাবে বসে থাকতে দেখে অস্থির গলায় বলে ওঠে—নিজি মরচি নানান জ্বালায় আর বাবুর ঢঙ দেখো! বোঝা যাচ্ছে পদির কাছে ভোগটা ভালোই খেয়েছে। এখন এসেছে কেষ্ট ঠাকুর সতীর সেবা যত্ন খেয়ে মনে দেহে বল পেতে। কিন্তুক গোঁসাই আজ যে সতী মরচে। তার আবদার কে শোনে তার ঠিক নেই। সম্সারে এটাই নেত্য।

সতী আপন মনে হাতের কাজ সারে আর গজগজ করে। হঠাৎ ভুজঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে সতীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে,—এই দেখ পদি আমায় মেরেছে। চ্যালাকাঠের বাড়ি দিয়ে মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে। দেখ মাথা আলু হয়ে ফুলে গেছে।

ভুজঙ্গ সতীকে ছেড়ে নিজের মাথা দেখায়। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সতী আহত ভুজঙ্গকে দেখে। পদি তার সোয়ামিকে যথেষ্ট হেনস্তা করে তা জানা। তবে যত নিষ্ঠুরতাই হোক না সতীর কিছু করার নেই। ভুজঙ্গ এখনও একজন জোয়ান মরদ, সে যদি পদ্মরানীর হাতে মার খেয়ে এভাবে কাঁদে তো কাঁদুক।

— আমার অপরাধ কী জানিস? মেয়েটাকে নিয়ি তোর কাছে আসছিলাম। ভুজঙ্গ একটু ধাতস্থ হয়ে বলে, মোর কপাল। উ বেটি আমার, কিন্তুক কারুকে দেখাতে পারি নাই। ওই পোলাটা পানু মাইতির পোলা, বেটা দিনরাত পদির লগে পড়ি আছে। ওর খিদ্মদ্ খাটছে। সেটাই আমায় মেয়ে চোর বলি এমন চোরের শাস্তি দিল। আবার শাসায় পুলিশি দিবে। আমারে পুলিশ কী করবা? আমি পদির সোয়ামি, উ বেটির বাপ। ছেলে মানুষের মতো চোখ মুছে আবার বলে যায় ভুজঙ্গ—একদিন নিশ্চয় নিয়ি আসবো উ বেটিরে। আমারে তুই চিনিস নাই, কথার খিলাপ পাবি নাই মোর কাছে। লিশ্চয় আনবো।

সতীকে এরপরেও কোনো উত্তর না দিতে দেখে নিজের কথার সততা জানান দিতে বেশ জোর দিয়ে বলে—ভুজঙ্গ মানে জানিস তো, সাপ। সেই সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে পদ্মরানী। ছোবলটা খালি তবেই বুঝা যাবে? ও সোহাগের পেনো কী করে দেখা যাবি। আমারে বলে, তুই কার বেটি নিচ্ছিস? ও তোর বেটি নাকি? বুঝ, বেতাস্তটা বুঝ!

॥ ২ ॥

চূর্ণী নদীর ধারে পান্সিটা বাঁধা আছে সকাল থেকে। আজ ঘন ঘোর বাদলা। আকাশের রং কালো। সকাল থেকে ঝিপ্ ঝিপ্ বৃষ্টি, চারিদিক ঝিমধরা আঁধার। সন্ধে ঘনাতে এখন ঢের দেরি। তবু এই আঁধার গায়ে মেখে একটা চাদরে নিজেকে ঢেকে বড়ো বটগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সতী।

ভুজঙ্গ সকালবেলাই বলে গেছে, দিনটা আজ নষ্ট চাঁদের। ইদিন চুরি চামারিতে দোষ নাই। মোর নিজির বেটিকে চুরি করে আনবো অজ। ঘাটে ডিঙি বাঁধা থাকবে। তোরে আর ওই বেটিরে নিয়েই গাঁঙে ভাসবো। ভিন গাঁয়ে ঘর বাঁধবো। তোর শরীরে তাকত আছে, আমার খাটনির গতর আছে। ডর কিসির? তিনটি পরানির আবার ভাবনা।

বৃষ্টিটা বিকেল থেকেই ধরেছে। কিন্তু আকাশের মুখ ভার। নদীর জল কালো। এই অবস্থায় ভুজঙ্গ ডিঙি নিয়ে যাবে কোথায়? সতীর ভাবনা বাড়ে। ভুজঙ্গ অবশ্য সকালবেলাই আর একটা সুখবর দিয়ে গেছে। পদির আজ ধুম জ্বর। হুঁশ নাই। ভগবান মোর দিকি মুখ তুলি তাকিয়েছেন। পেনোটাও গেছে বোনাই বাড়ি। এই তো মৌকা।

ঘাটে বাঁধা ডিঙিটার দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবে সতী। ডিঙিটা দুলছে মোচার খোলার মতো। ভগমান মুখ তুলি চেয়েও মনে লয় মুখ ফিরায়ে নিতি চায়।

ঘাটে জন মানষির চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ তিনজন মানুষ এসে দাঁড়ায় বটে। তাদের মধ্যে একজনকে দেকে সতী শিউরে ওঠে। লতিফ মিঞা। নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফাটে, এমনই নিষ্ঠুর। সেই মানুষ এখানে এখন কেন! কার সর্বনাশ করার জন্যি তিন সাগরেদ একজোট হয়েছে এখেনে। হঠাৎ একজনের কথা সতীর কানে ধাক্কা দেয়। 'কি বলেছিলাম কি না, আজ ঘাটে পারানি কেউ থাকবে না। আমার কথা বিশ্বেস হলো?

লোকটার গলার স্বরে সতীর বুক দুর দুর করে। এ তো পানো মাইতি। পদীর রসের নাগর। নিজেকে আর একটু আড়াল করে।

—চলো চলো, আজ আর কিছু হবার নয়। আসছে কাল সব ব্যবস্থা হবে। আজ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

একটু ইতস্তত করে ওরা ফিরে যায়। যাক এই সময় ভুজঙ্গ মেয়ে নিয়ে এসে পড়েনি, এই বাঁচোয়া।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। সতী মহা চিন্তায় পড়ে। ভুজঙ্গর পাত্তা নেই। মানুষটা কী শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে গেলো নাকি? এবার ধরা পড়লে নির্ঘাৎ হাজত বাস। কিংবা মেরে হাড়গোড় ভাঙবে।

এই সময় শরীরের ওপর দিকটা ছাতার মতো ঝুঁকিয়ে বুকের মধ্যে মেয়েটাকে আড়াল করে সতীর সামনে এসে দাঁড়ায় ভুজঙ্গ। মেয়েটাকে দু হাত দিয়ে ওর দৃষ্টিপথে মেলে ধরে বলে,—দেখ্ দেখ্ কেমন সন্দরপানা হয়েছে মোর বেটি। আষ্টে পিষ্টে কাপড় জড়িয়ে রাখা মেয়েটার নাক আর চোখদুটো কেবল খোলা। সতীর হাতে হাত দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় ভুজঙ্গ। — কী বুঝমান বেটি দেখ্। বুকে করে নিয়ি এলাম একফোঁটা রা কাড়েনি। জানে রা কাড়লে বাপটা ধরা পড়ি যাবে। সাধে কী আর বলি, ই বেটি মোর না হয়ি আর কারুর হতি পারে নাই।

এরপর ভুজঙ্গ খিলখিল করে হেসে বলে ওঠে—থাক পদ্মরানী উর বেটাদের নিয়ি। আমি মোর বেটিকে নিয়ি সম্‌সার ত্যাগ করলাম। আমারে আর ধরতি লাড়বে।

ভুজঙ্গর হাত থেকে মেয়েটাকে নিয়ে সতী নিজের বুকে চেপে ধরে। তারপর ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে। ভুজঙ্গ তাড়া লাগায়—চল্ ই সময় গাঙে ডিঙি ভাসায়। যেতে হবে অনেক দুর। ঘর দুয়ার আমার দেখা আছে। ঠাঁই নেবো বদির গাঁয়ে। জনমনিষ্যি টেরটিও পাবা নাই।

সতীর কানে তখন কোনো কথাই ঢোকে না। জীবন্ত পুতুলটাকে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিতে থাকে। সুখ ব্যাপারটা সতীর উপলব্ধিতে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়।

সুরো

মাধুরীলতা দেবী

॥ ১ ॥

"হ্যাঁরে, রোদে, এখনো যে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস—আপিস যেতে হবে না?"

"হবে না মনে করেই একটু গড়াচ্ছি।"

"গড়াচ্ছি! বলতে লজ্জা করে না! আমি বু—আমি এই বয়—আমি—আমি তোর দাদা হয়ে কখনো এত বেলা অবধি গড়াই দেখেছিস?

"তোমর যে দাদা দিন দিন বয়স কমছে আর আমার বাড়ছে কাজেই তুমি এখন যত ভোরে উঠতে পার আমি কী তা পারি? তাছাড়া আজ শরীর তেমন ভালো নেই। কেমন গা মাটি মাটি করছে।"

"গা মাটি মাটি করছে! আমার যেদিন গা মাটি মাটি করে আমি কী বেরোই না?"

"তোমার বেরলেই বা কষ্ট কী? উকিলগুলো বকে মরে তুমি বসে ঝিমোও; তার পরে যা খুশি একটা রায় দিয়ে বিচারের শ্রাদ্ধ করো।"

"যাঃ, আর বাঁদরামি করতে হবে না, কাজটা যদি হাতছাড়া হয়, আমি ঘরে বসিয়ে তোমার পেট ভরাতে পারব না। যা দিন কাল পড়েছে সংসার চালানো ভার, এত যে উপায় করছি কোথায় ধুলোর মতো উড়ে যাচ্ছে, চোখেও দেখতে পাই না।"

"বাস্তবিক! তার উপর আবার লড়াইয়ের হাঙ্গামে এসেন্স, সাবান, পাউডার, কলপ প্রভৃতি বিলাতি সৌখিন জিনিসগুলোর এমন অসম্ভব দাম চড়ে গেছে, আমি ত ভেবেই পাই না দাদা কি করে নিত্য নতুন জোগাড় করছ!"

"কী বল্লি রে ছোঁড়া! কলপ? কলপ? কবে তুই আমাকে কলপ লাগাতে দেখেছিস্? যত বড়ো না মুখ তত বড়ো কথা! ওরে জগুয়া, গাঁঠ গুলোয় ভালো করে তেল ডলে দেত।"

জগু। "হাঁ বাবু, তাই ত দিচ্ছে। এই পুরুবিয়া হাওয়া লাগলে বুড্‌ঢা লোগ্‌কা বদন্ হাঁত সব দুখ্‌তা। সে হামি জানে।"

"নাঃ, এরা আমাকে বাড়িছাড়া কর্‌লে দেখছি! আমার গায়ে ব্যথা হয়েছে এ কথা তোকে কে বল্লে রে ব্যাটা? আমার চিরকাল ভালো করে তেল মাখা অভ্যেস। যা স্নানের ঘরে গরম জল রেখে আয়।"

"এই গরমে গরমে জল ? ওহো, বুঝেছি, সেদিন নবীন বাবু বলে গেল যে গরম জলে নাইলে গায়ের চামড়া কুচ্‌কে যায় না, তাই বুঝি দাদা আজকাল গরম জলে চান করো?"

"তাই বুঝি দাদা এখন গরম জলে চান্ করে! বেশ করিরে! খুব করি। তোর তাতে কী? ভালো চাস্ তো খাটিয়া ছেড়ে উঠে যা! সারারাত এই ছাতে পড়ে থাকিস্ বলেই তো সকালবেলায় গা মাটি মাটি করে।"

"এত তাড়া কীসের? তুমি যতক্ষণে চান করে বেরোবে আমার তার মধ্যে দশবার চান করা ভাত খাওয়া অবধি সারা হয়ে যাবে।"

ন মরে বালকাকা মায় ন মরে বুঢ়উকা জোয়

গিরিজাসুন্দরীর মৃত্যুতে এই প্রবাদ বচনটি খাটিয়া গেল; শিশু কন্যা কালীতারা ও প্রৌঢ় স্বামী হরপ্রসাদ দুজনেই সমভাবে তার অভাব অনুভব করিল। কালীর তিন দিদিই বিবাহিতা, তারা কেহই ছেলেপুলেভরা সংসারে তাকে স্থান দিয়া আর ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে রাজি হইল না। তখন হরপ্রসাদ ভাবিল বোদেটার বিবাহ দিলে সব গোল চোকে, আমি টাকা চাই না, দেখতে শুনতে ভালো একটি গরিব গৃহস্থের মেয়ে আনব, সে আমাদের সবাইকে টেনে করবে। টাকা চাই না সুন্দর মেয়ের আর অভাব কী! উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাইয়া হরপ্রসাদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেখিতে গেল; বোদের আর বিবাহ হইল না—দশম বর্ষীয়া বালিকা সুরসুন্দরী কালীতারার জননীর পদ গ্রহণ করিল।

সুরো মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী; সে অকপট চিত্তে ভক্তির সহিত বাপের বয়সী স্বামীর সেবা করিত। বামুন ঠাকুর ডাক দিতে না দিতে সে পানটি ছেঁচিয়া গম্ভীরভাবে সামনে বসিয়া পাকা গিন্নিটির মতো এটা খাও, ওটা খেলে না কেন, আজ বুঝি রান্না ভালো হয় নাই, ঝালের মাছটায় কাঁচা হলুদের গন্ধ বেরোচ্ছে ইত্যাদি নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ব্যঞ্জনের বাটিগুলি হাতের কাছে সরাইয়া দিত। অপরাহ্নে ফল ছাড়াইয়া বেদানার রস ছাঁকিয়া, মিষ্টান্ন সাজাইয়া ভৃত্যের হাতে স্বামীর জলযোগের জন্য পাঠাইয়া দিত। আদালত-ফেরৎ হরপ্রসাদের ঘর্মাক্ত কাপড়গুলি বাতাসে দিয়া কাচা কাপড়,মুখ ধুইবার জল হাতে হাতে জোগাইয়া দিত আর সন্ধেবেলায় কালীর সহিত বাজি রাখিয়া পাকা চুল তুলিত। বোতাম বসাইতে অল্প অল্প মেরামতের কাজে সুরো কদাচ আলস্য করিত না। তার ছোটো বুদ্ধিটিতে যা ভালো বুঝিত খুশি মনে পালন করিত। পশ্চিমী বাঙালির মেয়ে লজ্জা সরমের বড়ো ধার ধারিত না; স্বামীকে দেখিলে বারো আনা পিঠ খুলিয়া ষোলো আনা মুখ ঢাকিবার জন্য ঘোমটা টানা কর্তব্য, সুরো সে শিক্ষা পায় নাই। শিশু বয়সেই তার বাপ মা মরিয়াছে; বড়ো বাইয়ের ঘরে সর্বদা পরিজনড়িতরতা, অক্লান্তকর্মিণী, মিষ্টভাষিনী ভাইবউকেই সে আদর্শ বলিয়া জানিত এবং যতদুর সম্ভব তাহার উপদেশ মতো চলিতে চেষ্টা করিত।

সুরোর যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদেরও এক অদ্ভুত যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল; তার কাঁচাপাকা চুলগুলি প্রথমে কটা ক্রমে একেবারে কালো হইয়া গেল; সে দাড়ি গোঁফ ফেলি দিল এবং রাত থাকিতে উঠিয়া রোজ ক্ষৌর করিতে লাগিল; তার টোলখাওয়া গাল দুটি দাঁতের চাড়া পাইয়া সামলাইয়া উঠিল আর তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বোদে হাসিয়া অস্থির হইল। সুরোকে আর পান ছেচিতে হয় না, দাঁতের ব্যথা সেরে গেছে আমার লক্ষ্মণকে আর কষ্ট করে পান ছেঁচতে হবে না বলিয়া হরপ্রসাদ সুরোর চিবুক ধরিয়া আদর করিত। কালী বা সুরোকে মাথায় হাত দিতে দেয় না, বলে, যেদিন মাতা ধরবে টিপে দিও, শুধু শুধু হাতে তেল লাগিয়ে লাভ নেই। ছাতের এক কোণে টিনে ঘেরা নুতন তৈরি স্নানের ঘরে হরপ্রসাদ কয়খানা সাবান নিঃশেষ করিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইত সে রহস্য ভেদ করিতে কাহারো সাহসে কুলায় নাই—বোদেরও না। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হইলে সে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করে, তাহারাও হঠাৎ হরপ্রসাদকে চিনিতে পারে না, এবং বুড়ো বয়সে নাতনীর যোগ্য মেয়েকে বিবাহ করিলে ভীমরতি কী ভীম আকার ধারণ করে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হরপ্রসাদের দিকে দেখাইয়া দেয়। একমাত্র নব্য উকিল

মহলে ডেপুটি হরপ্রসাদের খাতির ধরে না—নলিন চৌধুরীর কাঁধে হাত দিয়া সেই ছোক্‌রার দলে পরিবেষ্টিত হইয়া সে বুঝিতেই পারে না লোকে তাকে দেখিয়া হাসে কেন?

॥ ২ ॥

ছুটির দিনটা পূর্ণ মাত্রায় রসালাপে যাপন করিবার জন্য পাছে কোনো ব্যাঘাত ঘটে সেইজন্য হরপ্রসাদ নিজের গ্রামসম্পর্কীয় এক মাসির খোঁজ লইতে বোদের সহিত কালিকে প্রত্যেক রবিবারে পাঠাইয়া দিত। দুই এক রবিবার পার হইলে ব্যাপার বুঝিতে বোদের বাকি রহিল না; দাদার উপর তুষ্ট থাকিলে একেবারে সন্ধ্যা কাবার করিয়া ফিরিত আবার কখনো তফাতে গাড়ি রাখিয়া আচম্‌কা আসিয়া একমতরফা প্রেমালাপে বাধা দিয়া দাদার অভিশাপ অর্জন করিত।

সুরো ভাঁড়ার ঘরে তোলা উনানে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় মস্ত একগাছা বেলফুলের গোড়ে মালা লইয়া হরপ্রসাদ ডাকিল, "সুরো, ও সুরো, দেখ তোমার জন্য কী এনেছি।"

সুরো। "কী গা?"

হর। " 'কী গা'! আহা, প্রাণ ঠান্ডা করে দিলে! সেদিন না বল্লুম যে নলিনের বউ 'ভাই' বলে সাড়া দেয়?"

সুরো। "সে সদয় দিগ্‌গে। কী এনেছ দেখি! ওঃ, ফুলের মালা! একটু জল আছড়া দিয়ে রেখে দাও না কাল অবধি গন্ধ থাকবে।"

হর। "আচ্ছা, সুরো, তোমায় না মানা করেছি গরমে উনুনতাতে বসে কিছু কোরো না, তোমার কষ্ট হয় মনে করলে ওসব আমার মুখে রোচে না, তার চেয়ে আমি বেশি খুশি হই যদি তুমি এখন ওসব ফেলে সেদিনকার সেই ঢাকাই কাপড়খানি পরে দেখাও, কিনে দিলুম তা একবার পরলেও না। এত অছেদ্দা করো কেন?"

সুরো। " কী মুস্কিল! ছিঁড়ে যাবে বলে ঘরে পরি না, তার জন্যে এত রাগ? তুমি যাও না আমি এইগুলো সেরে নিয়ে এই এলুম বলে।"

হর। "এলুম, এলুম, কর্ত্তে কর্ত্তে বোদেরাও এসে পড়বে।"

সুরো। " তা আসুক না, বেশ তো।"

হর। "অত তর্ক না করে ওঠই না। এই জগু! জগুয়া রে! এদিকে আয়! শীগ্‌গির বামনাকে ডেকে দে, তাকে কী করতে রাখা হয়েছে যে মা-জীকে গরমে খাবার তৈরি করতে হবে! যা, চট করে আসতে বল।"

চাকরদের সম্মুখে স্বামীর অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ হইবার ভয়ে সুরো তাড়াতাড়ি পাচককে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিল। অনেকদিন পর্যন্ত সে মনে মনে অনুভব করিতেছে যে হরপ্রসাদ বেতনভোগী ভৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবান্ধব সকলকার কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, আর সে কাহার জন্য? তার জন্যই ত এই বৃদ্ধটি যুবকের বেশে সময় নাই অসময় নাই লোক-আনাগোনার রাস্তায় যেখানে-সেখানে তার হাত চাপিয়া ধরে, মাথার কাপড় টানিয়া খুলিয়া দেয়, গায়ে এসেন্স ঢালিয়া দেয়—এই সেদিন ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়া তবে না সকালে অত ঠাট্টা করিল! কী করিয়া বুঝাইবে যে সে পুরাতন স্বামীর সেবা করিয়া যত তৃপ্ত হইত এই নতুন স্বামীর সেবা তার মনে তেমন প্রীতি সঞ্চার করে না। হরপ্রসাদের কতাবার্তা, আদর, ভালোবাসা সবই তার মনে হয় যেন কার কাছে ধার করা, এসব ছিব্‌লামী তার স্বামীর যোগ্য নয় এ কথা কে তাঁকে বলিবে? তার রূপের, তার নবপ্রস্ফুট যৌবনের অর্ঘ্য লইয়া সে তাঁকে দেবতা জানিয়া পূজা দেয় তবে কেন তিনি নিজেকে পরের কথা শুনিয়া তাহার চোখে খাটো করিতে চেষ্টা

করিতেছেন? সে পরটি যে কে তাহাও সুরো বেশ জানিত ও বড়ো রাগ হইলে তার মুন্ডপাত করিত—অবশ্য মনে মনে।

কত কথাই আজ বলিতে হইবে স্থির করিয়া সুরো আস্তে আস্তে হরপ্রসাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে এক গাল হাসিয়া, মালা ছড়াটি তাহার গলায় পরাইয়া হাত ধরিয়া যখন কাছে টানিয়া লইল। সুরো মাথা হেঁট করিয়া অঞ্চলের প্রান্ত খুঁটিতে লাগিল, যা বলিতে আসিল কিছুই বলিতে পারিল না।

হর। "সুরো. প্রাণ আমার, তুমি ফুল ভালোবাসো বলে আমি কত দুর থেকে নিজে গিয়ে ফুলের মালাটি আনলুম আর তুমি আমাকে তার বদলে কিছু দিলে না ভাই?"

সুরো। "কী চাও? পাখার বাতাস দেব? গরম হচ্ছে?"

হর। "আঃ! ওই এক কথাতে সব মাটি করে দিলে! এত করে মনে মনে সব জপ্‌তে জপ্‌তে এলুম সব ভন্ডুল হয়ে গেল! পাখার বাতাস কী আমি চেয়েছিলুম? নলিনের বউ বলে, 'প্রাণনাথ'—"

সুরো। "সে যা খুশি বলুক, ও সব আমার ভালো লাগে না।"

হর। "কেন তোমার ভালো লাগে না ভাই? আমার ত বেশ লাগে। কী বলেছিলুম, ওই নলিনের বউ বলে, প্রাণনাথ! হৃদয়েশ্বর!'—"

সুরো। "দেখ, কাল থেকে তুমি আর নলিনের বাড়ি যেও না, সত্যি সত্যি যদি ওর বউ ও সব ছাইভস্ম বল্‌ত তাহলে কী ও তোমার সামনে সে কথা বল্‌তে পারত? তোমাকে নিয়ে তামাসা করে বোঝ না? নাও, ছাড় কে এসে পড়্‌বে!"

হর। "আসে আসুক! ভালো কথা। কী ছিলুম, হ্যাঁ, তুমি নলিনের উপর এত চট কেন? সে তোমার কত খবর নেয়, সেইতো বলে দিলে ফুলের মালা নিয়ে এসে তোমায় পরিয়ে দিত; সেদিনকার কাপড় খানা সেই তো পসন্দ করে কেনালে; তাকে দিয়েই ত তোমার তেল, এসেন্স আতর সব আনাই; আমাকে দেখ না, যেদিন থেকে ওর সঙ্গে মিশছি আমার যেন ২০ বছর—এই বলছিলুম যে আমার—আমার—বুঝলে কী না—বড়ো ভালো ছেলে ও। সুরো, আমার আঁধার ঘরের আলো—"

সুরো। "ও কথাটাও কী নলিন তার বউকে বলে?"

হর। "অ্যাঁ! অ্যাঁ! তার বউকে? কে বল্লে তোমাকে?"

সুরো। "যেই বলুক না কেন, অন্যের কাছে শেখা বুলি আমার উপর ঝেড়ে আর আমাকে লজ্জা দিও না।"

হর। "ছি সুরো! ভাব করতে গেলুম কেঁদে ফেল্লি। আচ্ছা, ওটা আর বলব না—হল? লক্ষ্মী সোনা আমার—মাইরি বলছি ভাই এ কথাটা কেউ শিখিয়ে দেয় নি—অত দূরে সরে যেয়ো না, আমি কী বাঘ না শোর যে তোমাকে খেয়ে ফেলব।"

সুরো। "হ্যাঁ গা, সেদিন যে বল্লে যে এবার ছুটিতে গয়া কাশী দেখিয়ে আনবে তার কী হল?"

হর। "বাপরে! এই চাঁদমুখ কী আমি দেশ বিদেশে নিয়ে ঘুরতে পারি তাহলে দ্বিতীয় সীতা হরণ হয়ে যাবে।"

সুরো। "কেন,তুমিও দশানন বধ করে সীতাকে ফিরিয়ে আনবে!"

হর। "আর কী ভাই, সেদিন—ওর নাম কী—আর কী সে জোর—কী বলছিলুম ভালো—আর কী সে যুগ আছে, এখন ঘোর কলি! বধ করতে গেলেই নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বধ হতে হয়। অত ব্যস্ত কেন? নাতি পুতি হোক্ তারা তীর্থ ধর্ম করাবে।"

সুরো। "বেশ। ওই বুঝি ঠাকুরপোরা এল! যাই কালীকে খেতে দিগে, অনেক দেরি হল।"

হর। "আঃ! বসই না, যাবে এখন, আমার কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচো। আঃ জ্বালালে দেখ্‌ছি! বোদেটা উপরে আস্‌ছে বুঝি!"

গলার মালা খুলিয়া সুরো সরিয়া বসিতেই বোদে দরজার কাছে হাঁকিল, "দাদা!"

হর। "দাদা! কী বল্ না ছাই!"

বোদে। "মেজাজ এত গরম কেন? আচ্ছা দাদা, এতকাল তো আমরা কেউ জানতুমও না যে এই বিদেশে আবার এক মাসি আছে, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে খবর পেলে? এক কাজ কর না, আমরাই বা গাড়ি ভাড়া করে অতদূর যাই কেন তার চেয়ে মাসিকে কাছে রাখলেই তো তুমি সবসময় তাঁর তত্ত্বাবধান করতে পার। সেই হলেই বেশ হয়, বউদি কী বলো?"

হর। "বউদি কী বলো! কীসে বেশ হয় আমাকে আর শেখাতে হবে না। যা, কালীকে বল খাবারের জায়গা করতে, খিদে পেয়েছে।"

বোদে। "মালাটা আমি নিয়ে চল্লুমঁ।"

হর। "প্রাণঠান্ডা করে দিলে!"

॥ ৩ ॥

কালীতারার বিবাহ হইয়া সে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে। কলিকাতার বাইরে একখানি বাড়ি কিনিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত হরপ্রসাদ সপরিবারে থাকে। এইবার স্ত্রীর নেশা ছুটিয়া তাকে বাড়ির নেশায় ধরিয়াছে; ঘরে ঘরে পাথর বসাইতে হইবে, দক্ষিণের বারান্দাটা বাড়াইতে হইবে, জানালাগুলো বড়ো করা দরকার, কোথায় সস্তাদরে মার্বেল, কাট কাঠরা বিক্রয় হইতেছে স্নান নাই আহার নাই রৌদ্রের তাপে সে সারা শহর হাঁটকাইয়া বেড়ায়। এখন সে বেশ দস্তুরমতো বৃদ্ধ---নলিন তার ঘাড় হইতে নামিতেই সেও অল্পে অল্পে নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া জাহির করিতে আপত্তি করিল না এমন কী আবশ্যক সময় ভিন্ন দাঁত জোড়াটির পর্যন্ত খবর লয় না।

এই পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধ স্বামীটিকে পাইয়া এতদিনে সুরো প্রাণ খুলিয়া স্নেহ প্রস্রবণ ঢালিয়া দিতে পারিল। সন্তানহীনার সমস্ত পুঞ্জীভূত সন্তানস্নেহ অপরিমিত ধারায় হরপ্রসাদের উপর পতিত হইল। সে এক দন্ড স্বামীকে চোখের আড়াল করিতে চায় না। কোনো কাজে কোনোদিন বাড়ি ফিরিতে দেরি হইলে সে বোদেকে মোড়ের কাছে দাঁড় করাইয়া একবার বারান্দায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়, যতই বোদে সান্ত্বনা দেয় যে দাদাকে ছেলেধরায় ধরে নাই নিশ্চয়ই, সে আশ্বাসবাক্য সুরো কানেও তোলে না। হরপ্রসাদের আর বেশভূষায় দৃষ্টি নাই কিন্তু সুরো ছাড়ে না, তাঁতিনী ডাকাইয়া নিজে সুন্দর সুন্দর পাড়ের কাপড় বাছিয়া রাখে; শীতকালের উপযুক্ত নানারঙের পশমের টুপি, মোজা, গেঞ্জি, গলাবন্ধ বুনিয়া রাখে ও সেগুলি পরাইয়া স্বামীকে কেমন মানাইয়াছে, বারন্দার কোনো না কোনো ছুতা করিয়া বাইরে গিয়া দেখিয়া আসিত। ছোটো বউ ঠাট্টা করে যে দিদি বড়ঠাকুরের টাকের বাকি দুগাছি চুল আঁচড়ানোর চোটে আর টিঁকিতে দিবে না। নিদ্রিত স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তার সমস্ত দেহ পুলকিত হইত। অযাচিতভাবে দিনের মধ্যে যখন-তখন হরপ্রসাদের পাশে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইতে থাকে, নয় তো মাতার কোনো চুলটি স্থানচ্যুত হইয়াছে সেটি ঠিক করিয়া দেয়, কোঁচা পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া যাইবে বলিয়া তুলিয়া ধরিতে বলে। বোদে স্ত্রীকে বলে যে, দাদা আগে পায়ের ধুলো নিত কিনা তাই বউদি এখন মাথায় হাত দিয়ে দাদাকে আশীর্বাদ করে। যে যাই বলে সুরো গ্রাহ্য করে না, সে তার বৃদ্ধ স্বামীটিকে শিশুর মতো চোখে রাখে। খাওয়ায়,পরায়, কখনো আমার অবাধ্যতা করিলে মৃদু ভর্ৎসনাও করে। একদিন হরপ্রসাদ যুবক সাজিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া স্ত্রীকে আঘাত করিয়াছিল। আজ সেই স্ত্রী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো ব্যবহার করিয়া তাকে আরও কত হাস্যভাজন করিয়া তুলিতেছে এ কথা সুরোর সম্মুখে কেহ আঁচেও বলিলে সে মহা খাপ্পা হইয়া উঠিত।

হরপ্রসাদও যে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ না করিত তা নয়। স্ত্রী যে কাজ করিতে বারণ করিত বিশেষ

করিয়া সেইটাই করিয়া সে আপনার পৌরুষাভিমান প্রচার করিত। সুরো কী তাকে কচি খোকা পাইয়াছে! সব কথায় কী তাকে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে! সময় সময় সুরোরও চেতনা হইত, ভাবিত, একী করিতেছি, আমি স্বামীর অধীনে থাকিব তা না তাঁকে নিজের অধিনে আনিতে চাই, আবার ভাবে, কই না, অধীনে তো আনিতে চাই না, আমি কী চাই তা তো নিজেই বুঝিতে পারি না। বোধহয় কিছুই চাই না, শুধু নিজের সর্বস্ব দান করিয়া, দুই হাতে তাঁর আশীর্বাদ ভরিয়া লইয়া, জন্ম জন্ম তাঁকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করিতে চাই।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বছর কাটিল। এ বছরে বসন্তের মহামারী পাড়ায় পাড়ায় দেখা দিয়েছে। হরপ্রসাদের মনে বসন্তের এমনি ভয় ঢুকিল যে গায়ে একজায়গায়ে মশাকামড়ের দাগ লাগিলে সাতবার করিয়া সে ডাক্তার ডাকিয়া পরীক্ষা করাইত। একদিন রাত্রে সুরোর কপালে কি একটা দাগ দেখিয়া সমস্ত রাত আলাদা বিছানায় সে কাটাইল।

এমন সময় একদিন সর্বাঙ্গে ব্যথা করিয়া সুরোর জ্বর আসিল। বোদে হরপ্রসাদকে লুকাইয়া তেতালায় চিলের ছাদের ঘরে সুরোর জন্য জায়গা করিয়া দিল। সেখানে তার সর্বাঙ্গ ভরিয়া বসন্ত দেখা দিল। বোদে হরপ্রসাদকে বলিল, পটলডাঙ্গায় তার বিধবা বোনটির বড়ো অসুখ, বউদিদি তাঁকে দেখতে গিয়েছেন, কিছুদিন দেরি হবে।

হরপ্রসাদের এমনি অবস্থা স্ত্রী নহিলে সে এক পা নড়িতে পারে না। যতই সুরো সুরো করিয়া সে ব্যস্ত হয়, খাবার সামনে লইয়া সুরোর অনুপস্থিতিতে যতই খুঁৎখুঁৎ করে, কই ছুটিয়া কেহ তো আসে না। হৃদয়ের ভিতরটা অসুখ ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। হরপ্রসাদ একবার পটলডাঙ্গায় গিয়া তার স্ত্রীর খোঁজ লইবে মনে করিল কিন্তু সে পাড়ায় বসন্তের প্রকোপ বেশি শুনিয়া সাহস হইল না।

এদিকে বোদে পুরাতন ভৃত্য জগুয়ার উপর দাদার ভার দিয়া বউদিদির সেবায় নিযুক্ত হইল। না ছিল তার ভয়, না ছিল ঘৃণা। আহার নিদ্রা ছাড়িয়া সুরোর বিছানার পাশে বসিয়া কী করিয়া তার একটু যন্ত্রণার উপশম হইবে তারই উপায় বাহির করিত। সুরো বোদেকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বোদে শুনিল না বলিয়াই সুরো প্রাণে বাঁচিল। অমন প্রাণের সঙ্গে শুশ্রূষা করিবার লোক তার আর কেহ ছিল না।

সুরো তো বাঁচিল কিন্তু তার দিকে চাহিয়া বোদের চোখে জল আসিল। আহা অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা, তার এ কী পরিবর্তন! দেখিলে যেন চেনা যায় না। সুরোও প্রথম দিন এমন চেহারা দেখিয়া মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল মরণ হইলে তার স্বামীর দশা কী হইবে! আহা না জানি এতদিন তিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন! আজ একবার ঠাকুরপোকে বলিব তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিতে। একবার দেখিয়া প্রাণ ঠান্ডা কবি!

বোদে হরপ্রসাদকে ডাকিল, দাদা, চলো, তোমাকে বৌদিদির কাছে নিয়ে যাই।

হর। কোথায়?

বোদে। উপরের ঘরে আছেন।

হর। না, যাব না।

বোদে। সে কী কথা, যাবেনা কেন?

হর। আমি যাব কেন? সে কী আসতে পারে না?

বোদে। তাঁর বড়ো অসুখ করেছিল, এখনো কাহিল আছেন।

হর। মিছে কথা। একদিনের জন্যে তার তো অসুখ করতে শুনিনি।

বোদে। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, তাঁর অসুখ করেছিল, তুমি ভাব্‌বে বলে বলিনি।

হর। যা, যা, আর মিছে বল্‌তে হবে না। আমি কী আর বুঝিনে! ইদানীং তার কী আর কাজে

মন ছিল? খাওয়াতেও আস্‌ত না, তেল মাখিয়েও দিত না,—জগুর হাতে পড়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে তবু তার মনে একটু ব্যথা লাগে না। আমি ওর সঙ্গে আর কথা বল্‌ব না।

এই ক'দিন যে কাজের অনিয়ম হইয়াছিল হরপ্রসাদের পীড়িত কল্পনায় তাহা সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন নমাস ছমাস ধরিয়াই এই রকম ব্যাপারটা ঘটিতেছে।

বোদে যত অনুনয় করে হরপ্রসাদের গোঁ ততই বাড়িতে থাকে। বোদে বউদিদিকে আসিয়া বলিল, দাদা রাগ করিয়া আছেন।

বারান্দায় বসিয়া হরপ্রসাদ অপ্রসন্ন মনে তামাক খাইতেছিল। এমন সময় সাম্‌নের রাস্তা দিয়া হরিবোল শব্দে মরা লইয়া গেল। কাল রাত্রি হইতে ঘোষেদের বাড়ি হইতে কান্নার রব উঠিয়াছে। সকাল হইতে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়াছিল আবার জাগিয়া উঠিল। হরপ্রসাদের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

এমন সময় শীর্ণ মলিন সুরো ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

হরপ্রসাদ চমকিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। এ কে? এ যে ব্যাধি মূর্তিমতী। এ যে মৃত্যুর দূতি! বোদে, বোদে। আমার ঘরে এ কে ঢুকল রে? সরে যা! সরে যা! সুরো! সুরো! আমার সুরো কোথায় গেল?

নিয়তি

কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাকাঠীর জীবনমোহন চৌধুরী যশোহরের জনপ্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, লোকে বলিত তাবার প্রবল প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, বঙ্গদেশের আর্য্য সমাজ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী ছিল, তাহা ছাড়া ক্রিয়া কর্মে তাঁহার বড়োই ব্যয়বাহুল্য দেখা যাইত। জীবনমোহনের একমাত্র পুত্র প্রাণমোহন, তাহার ঐকান্তিক যত্নে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। যথা সময়ে তাহার বিবাহ দিয়া বৃদ্ধ জীবনমোহন পৌত্রমুখ দর্শনের আশায় ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হইবে না হইবে না করিয়া প্রাণমোহনের পত্নী যখন একটি কন্যা প্রসব করিলেন, তখন তিনি যেন চাঁদ হাতে পাইলেন, আদর করিয়া পৌত্রীর নাম রাখিলেন মাধুরী। বৃদ্ধ বয়সে জীবনমোহন বিষয়কর্ম বড়ো একটা দেখিতেন না, সুশিক্ষিত পুত্রের হস্তে বিস্তৃত জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্তমনে পৌত্রীকে লইয়া জীবন যাপন করিতেন। মাধুরী তাঁহার নয়নের তারা হইয়া উঠিয়াছিল, মাধুরীর জন্য তাঁহার কাশীবাস করা হয় না। কেহ যদি বলিত যে বড়ো বাবুর একটি পুত্র সন্তান হইত তাহলে ভগবান কর্তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাড়াতাড়ি তাহার কথা চাপা দিয়া বলিতেন "ও কথা বল না, একা মাধু আমার শত পুত্রের কাজ করিবে।" মাধুরী সত্য সত্যই মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিল; যে তাঁহাকে একবার দেখিত, সে নয়ন ফিরাইয়া লইতে পারিত না। প্রতিদিন প্রভাতে মাধুরী যখন বৃদ্ধ পিতামহের হস্ত ধারণ করিয়া বিশাল পুষ্পোদ্যানে খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাকে দেখিলে অপ্সরী বা দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হইত। জীবনমোহন দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত জ্যোতিষগণের দ্বারা পৌত্রীর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে তিনি সর্বদাই চিন্তিত ও অসন্তুষ্ট থাকিতেন। বিদ্যাকাঠী গ্রামে কোনো লোভে কোনো জ্যোতির্বিদ্ গ্রহাচার্য্য আসিলে তাহার আর সমাদরের অবধি থাকিত না। এইরূপে মাধুরীর শত শত জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। একবার বিক্রমপুরনিবাসী কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় এক ব্রাহ্মণ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তখন মাধুরী পিতামহের পার্শ্বে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ তখন সভাতলে বসিয়া, কাগজ কলম লইয়া জন্মপত্রিকা করিতে লাগিল, কিন্তু কী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, আর তখনি কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন ত্রস্ত জীবনমোহন তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্তোষজনকে কোনো উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ যখন অধীর হইয়া ধরিয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণ বলিল "বাবু নিয়তি কেহ খণ্ডাইতে পারে না, অর্থব্যয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নে যদি লোকে নিয়তির হাত এড়াইতে পারিত তাহা হইলে জগতে দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যু থাকিত না।" মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তখনও বলিতেছিল, "শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আমাদের উদর পূরণের উপায়। গণনার যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে,

আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অর্থের জন্য আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; বিদায়, পাথেয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিল। তাহার পর সে কৃষ্ণকায় জ্যোতিষীকে বিদ্যাকাঠী গ্রামে কেহ দেখে নাই। জীবনমোহন তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশাল আর্যাবর্তের বক্ষোদেশে সে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা কেহ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। মাধুরীর বয়স যত বাড়িতেছিল জীবনমোহনের বিষণ্ণতাও তত বাড়িতেছিল। পুত্রের নিকটে মাধুরীর ভবিষ্যতের কোনো কথা বলিয়া বৃদ্ধের মনের তৃপ্তি হইত না, কারণ পুত্র নব্যতত্ত্বে দীক্ষিত, তিনি কুসংস্কারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

মাধুরীর বিবাহের বয়স হইল। প্রমদাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল যে অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ছলে একটি দরিদ্রের পুত্র ক্রয় করিয়া লালন পালন করেন, কিন্তু জীবনমোহন তাহাতে অমত করিলেন। প্রমদাসুন্দরী গৌরীদানে শ্বশুরের অমত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেখিতে দেখিতে মাধুরী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জীবনমোহন পৌত্রীর বিবাহের জন্য যত্নবান হইলেন। প্রাণমোহন কোনোদিনই মাধুরীর বিবাহের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহার বিশ্বাস ত্রয়োদশবর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে কুমারীর বিবাহ হওয়া উচিত নহে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজে কর্তৃত্ব করিয়া, কুলাচার্য্য গ্রহাচার্য্যগণের উদর পূরণ করাইয়া, অবশেষে জীবনমোহন মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্র কলিকাতা নিবাসী, ধনীর সন্তান, কলিকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের ছাত্র, প্রিয়দর্শন এবং মিষ্টভাষা। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখা দিল। যথাসময়ে মহাসমারোহে জীবনমোহন সৎপাত্রে পৌত্রীকে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মাধুরীর দুইটি অলঙ্কার বাড়িল,—সীমন্তে সিঁদুর ও মস্তকে অবগুণ্ঠন।

তখন কলিকাতা মহানগরীতে মহামারী দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতের শেষে গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠে গঙ্গাতীরে শবদাহের স্থানাভাব হয়। একদিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় টেলিগ্রাম পাইয়া পিতাপুত্র কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে, শমন একটি সুকুমার জীবনের সহিত মাধুরীর জীবনের সকল সুখ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রে মস্তকে হাত দিয়া বৈবাহিকের প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। তখন অন্তঃপুর হইতে পুত্রশোকাতুরা মাতা উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাদিগকে গালি দিতেছিল। শুষ্কমুখে মাধুরীর শ্বশুরগণ পরিত্যাগ করিয়া জীবনমোহন ও প্রাণমোহন বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধ পুত্রকে জানাইলেন যে তিনি এখন আর দেশে ফিরিতে পারিবেন না, তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইবেন। ভগ্নহৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া প্রাণমোহন একমাত্র কন্যার সর্বনাশের কথা প্রকাশ করিলেন। মাধুরী কিছুই বুঝিল না, কারণ সে বিবাহের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্বামীকে দেখে নাই, স্বামী কে তাহা বুঝিতে শিখে নাই, স্বামীর অভাব কি তাহা অনুভব করে নাই। প্রমদাসুন্দরী ভূতলে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কন্যাও কাঁদিতে বসিল; আর, তাহার অশ্রুজল দেখিয়া বিদ্যাকাঠী গ্রামের কেহই অশ্রুজল রোধ করিতে পারিল না।

জামাতার শোক প্রাণমোহনের বুকে বড়ো বাজিল। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁহার আনন্দ বা শোক লোকে জানিতে পারিত না, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও কেহ ছিল না। চৌধুরীদিগের গৃহে প্রমদাসুন্দরীই গৃহিণী, প্রাণমোহনের মাতা বহুপূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

যেমন করিয়া সকলের দিন কাটিয়া থাকে মাধুরীর দিনও তেমনি করিয়া কাটিতে লাগিল। ক্রমে মাধুরী বিবাহের কথা ও স্বামীর কথা ভুলিয়া গেল। মাধুরীর মাতা প্রাণ ধরিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি খুলিতে পারেন নাই, কিশোরী কন্যাকে হিন্দু বিধবার জীবনব্রত অবলম্বন করাইতে পারেন নাই। তবুও তাঁহাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইতেছিল।

এক বৎসরের অধিককাল তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত করিয়া জীবনমোহন যখন দেশে ফিরিলেন তখন আগের ন্যায় হাসিমুখে সালঙ্কারা নববধূর মতো মাধুরী তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেল। তাহার দাদাবাবু এতদিন তাহাকে কি করিয়া ভুলিয়াছিলেন তাহা সে তখনও বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহাকে দেখিয়া জীবনমোহনের বিষণ্ণমুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল তখন মাধুরীর মুখ শুকাইয়া গেল, চিরাভ্যস্ত অভ্যর্থনা ভুলিয়া গিয়া সে ধীরে ধীরে পিছাইয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া জীবনমোহন মাধুরীর বেশ পরিবর্তন ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা লইয়া বড়োই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাধুরীর অঙ্গে সধবার চিহ্ন রাখার জন্য জীবনমোহন তিরস্কার করিলেন। মাধুরীর মাতা ভূমিশয্যা হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। পুরোহিতের উপদেশ অনুসারে মাধুরী অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল, ললাটের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল, একবেলা হবিষ্যি ভোজন করা আরম্ভ করিল; সাত দিনের মধ্যে ফুলের মতো সুন্দর মাধুরী যেন শুকাইয়া উঠিল। সে প্রথম প্রথম তাহা করিয়া বৃদ্ধ পিতামহকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিধবা হইলে মাছ খাইতে নাই, সাদা থান পরিতে হয় কেন, স্বামী কে ইত্যাদি সে সমস্ত প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধকে সেই বালিকা ব্যাতিব্যস্ত করিয়া দিত।

কন্যার পরিবর্তন দেখিয়া প্রমদাসুন্দরী শয্যাগ্রহণ করিলেন, মাধুরীকে দেখিতে হইবে বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসা ত্যাগ করিলেন।

মাধুরী একে একে সব শিখিল, সব বুঝিল এমন কী বাল্যসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল।

জীবনমোহন মাধুরীর শিক্ষা শেষ করিয়া দিয়া তীর্থভ্রমণে চলিয়া গেলেন। মাধুরী বড়ো বিপদে পড়িল। একাকী তাহার দিন আর কাটে না। পিতামহের উপদেশ মতো যতক্ষণ সময় পাইত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িত, সংসারের কাজ তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইত না, প্রমদাসুন্দরী নিজেও কিছু দেখিতেন না, আত্মীয়গণ সমস্তই সম্পন্ন করিতেন। মাধুরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পিতামহের প্রত্যাবর্তনেব অপেক্ষায় রহিলাম।

চৌধুরীদিগের অন্নে অনেক লোক প্রতিপালিত হইত। প্রাণমোহনের পিতা গ্রামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষকবর্গ প্রাণমোহনের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্বে জীবনমোহন এক অনাথ ব্রাহ্মণ সন্তানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্র গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সেইখানেই শিক্ষক হইয়াছিল। জীবনমোহন অনেকবার তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। কান্তি আত্মীয়-স্বজন ও অর্থের অভাব জানাইয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। প্রাণমোহনের ইচ্ছা ছিল যে মাধুরীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু জীবনমোহনের মতো না হওয়ায় তাঁহার আশা সফল হয় নাই। মাধুরী বিধবা হইবার পরে প্রাণমোহন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কান্তির সহিত মাধুরীর পুনরায় বিবাহ দিবেন। জীবনমোহন দ্বিতীয়বার তীর্থপর্যটনে নির্গত হইলে প্রাণমোহন একদিন স্ত্রী ও কন্যার নিকটে নিজের মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রমদাসুন্দরী পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন, মাধুরী কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল পিতামহের নিকট শুনিয়াছে হিন্দুর কন্যার একেবারের অধিক বিবাহ হয় না, সে কীরূপে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। প্রাণমোহন প্রথম দিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু বারবার বলিয়াও যখন কন্যার মতো করাইতে পারিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে মাধুরীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

সেইদিন হইতে মাধুরী অন্ধকার দেখিল। কথা গোপন রহিল না, ক্রমে গ্রামের লোক কানাঘুষা করিতে লাগিল, দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল প্রাণমোহন চৌধুরী বিধবা কন্যার বিবাহ দিবে। আত্মীয় স্বজন অনেকেই ধর্মভয় ও সমাজের ভয় দেখাইয়া প্রাণমোহনকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু

তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বড়ো বেশি কথা কহিতেন না। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। কান্তি বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল, প্রাণমোহন যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তখন সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, নীরবে মুখ নত করিয়া রহিল। প্রাণমোহন ভাবিলেন বিবাহে তাহার সম্মতি আছে। তখন তিনি বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইবেন।

মাধুরী যখন বুঝিল যে পিতা তাহার বিবাহ দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তখন আকুল হইয়া পিতামহকে সংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইল। জীবনমোহন কোথায় গিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তিনি অর্থের আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পত্র লিখিতেন মাত্র, তারপর আর কোনো ঠিকানা পাওয়া যাইত না। মাধুরী অনেক সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইল না।

প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রাণমোহন বঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল; গৃহে উৎসব আরম্ভ হইল। বিবাহের দিন প্রভাতে যখন নহবৎ বাজিয়া উঠিল তখন মাধুরী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সমস্ত দিনে কেহ আর তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। সন্ধ্যাসমাগমে প্রাণমোহন যখন কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, কান্তি যখন বরবেশে সভায় উপস্থিত হইল, তখন মাধুরীকে আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যাকুল হইয়া প্রাণমোহন স্বয়ং গ্রামের চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আকস্মিক বিপদ আশঙ্কা করিয়া প্রমদাসুন্দরী শোকশয্যা ত্যাগ করিলেন ও কন্যার সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইলেন, কান্তি বরবেশ ত্যাগ করিয়া মাধুরীর সন্ধানে নির্গত হইল।

ক্রমে বিপদ বুঝিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সরিয়া পড়িল, আলোকমালা নিবিয়া গেল, গ্রামের লোকে বাদ্যধ্বনির রজনী শেষ হইবার কিঞ্চিত পূর্বে প্রাণমোহন হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু কান্তি আর চৌধুরীদিগের গৃহে ফিরিল না।

শেষ রাত্রিতে জেলিয়ারা খালে মাছ ধরিতে গিয়া একটা গুরুভার পদার্থ টানিয়া তুলিল। জাল উঠাইয়া সভয়ে দেখিল যে উহা একটি রমণীর মৃতদেহ। তাহারা যখন ঘাটে নৌকা লাগাইল তখন দেখিল কে যেন তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ক্রমে ঘাটে লোক জমিয়া গেল, কোথায় হইতে কান্তি আসিয়া যখন মৃতাকে মাধুরী বলিয়া ডাকিল তখন লোকে জানিল প্রাণমোহন চৌধুরীর কন্যা মরিয়াছে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। তখন সেই ঘাটে নিরুদ্বেগে বসিয়াছিল একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সে যেন মাধুরীর মৃতদেহেরই অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে প্রাণমোহন সংবাদ পাইলেন। তাঁহার মুখে শোকের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, মুখ যেন আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রমদাসুন্দরীর রোদনধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে কোথা হইতে তীরবেগে একখানা পান্‌সি আসিয়া ঘাটে লাগিল। একজন বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন, জনতা দেখিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ জীবনমোহন চৌধুরীকে পথ ছাড়িয়া দিল। মৃতদেহ দেখিয়া বেদনাক্লিষ্টকণ্ঠে বৃদ্ধ একবার শুধু ডাকিলেন "মাধু"! তাহার পর নির্বাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইল না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল—"বাবু আমি সেই গণনার বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

যাত্রা-সঙ্গী

গিরিবালা দেবী

এম-এ, এম-এস্‌সি পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। যাদের জানিবার তারা জানিয়াছে।

বেণু বাবার কাছে বায়না ধরিল, "এবারে আমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করো বাবা, তোমাদের ওজোর আপত্তি আমি আর শুনচি নে।

বাবা আশ্বাস দিলেন, "হবে, বেণু, ব্যস্ত কী? আগে গেজেট বেরুক, তোমার মার মতো নাও, তবে না যাবে?"

বেণু আবদার করিতে লাগিল, "না বাবা, এখন থেকে পাস্‌পোর্টের চেষ্টা না করলে দেরি হয়ে যাবে। গেজেট দিয়ে আমাদের দরকারই বা কী? পাশ ত হয়েচি। মাকে তুমি বলগে, আমি বলতে গেলে ওই এক কথা—'একলা যেতে দেব না।' এদেশের মায়েরা একলার ভয়েই সারা হলেন। তোমায় সত্যি বলচি বাবা, মার ঘ্যান ঘ্যান আমার ভালো লাগে না।"

"ভালো না লাগলেও তাঁর মতো তোমার নিতে হবে বেণু। তিনি সেকেলে, অল্পশিক্ষিতা হলেও তোমার মা, তাঁকে অগ্রাহ্য করে কিছু করতে গেলে চলে কী? তোমার- আমার মত যাই হোক, তবু তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে।"

বেণু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তাহলে চল বাবা, মার কাছে যাই। এখুনি বুঝিয়ে বলিগে। শোন বাবা, তুমি কিন্তু আমার পক্ষে কথা কয়ো। খবরদার, মার পক্ষ নিও না।"

বেণুর বাবা প্রিয়তোষবাবু হাসিলেন, "আমি ত বরাবরই তোমার পক্ষে আছি বেণু, তুমি আমাদের সন্তান; তোমার উপরে আমার সমস্ত আশা ভরসা। আমার এত বড়ো কারখানা, সাবান সেন্টের কারবার দেখার লোক চাই। তোমার ছোটো ভাই, বাবুল, কাবুল দুটো নেহাৎ নাবালক; কাজেই ব্যাবসা চালাবার যোগ্যতা তোমাকেই অর্জন করতে হবে। সেইজন্যে আমার ইচ্ছা তোমায় বাইরে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনি। তা চল, তোমার মার সঙ্গে আগে কথাবার্তা ঠিক হোক।"

তাদের এত বড়ো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষদেশে বাবা তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী জানিয়া বেণুর গর্বের সীমা রহিল না। সে আনন্দে উদ্দাম হইয়া প্রিয়তোষবাবুর হাত ধরিয়া মার নিকটে চলিল।

মস্ত বাড়ি, মস্ত গাড়ি, মস্ত কারবারের মালিকের গৃহিণীকে কোনো দিক দিয়া মস্ত বলা চলে না। বিরাজমোহিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছোটোখাটো মানুষটি, চালচলন নিতান্ত সাধারণ। স্বভাবটি যেমন কোমল, হাসিটি তেমনই মধুর।

বেণুর বাবার সহিত বেণুকে দেখিয়া তাঁর অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে বেণু, পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে এসেচিস? বিলাত যাবার কথা ত? না, নতুন কিছু?"

বেণু মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, "নতুন আবার কী? তুমি ত আমায় বলেই রেখেছিলে, আমি এম-এস্ সি পাশ করলে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে। এখন অমত করলে তা চলবে না মা। কেবল আমারই ইচ্ছা নয়, বাবাও পাঠাতে চাচ্ছেন?"

প্রিয়তোষবাবু মাথা চুলকাইয়া সায় দিলেন, "হ্যাঁ, বেণুকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা দরকার। বাবুল, কাবুল ছোটো, ব্যাবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বেণুকেই আমি তৈরি করে নিতে চাই।"

"তুমি যা চাইছ, তাতে আমি অমত করব কেন? তবে আগেও আমি যা বলেচি, এখনও তাই বল্‌চি, সঙ্গীছাড়া একলা বেণুকে যেতে দেব না।"

প্রিয়তোষবাবু কাশিয়া জবাব দিলেন, "হাঁ, তা তুমি বলেচ বটে, বরাবর বলেচ সঙ্গীছাড়া যেতে দেবে না। তা বেণু, তুমি তোমার যাত্রা-সঙ্গী বেছে নাও। আমার টাকার অভাব নেই। দুজনার খরচ অনায়াসে বহন করতে পারব। তোমায় তৈরি করে আনা কারবারের কাজ, খরচও কারবারের। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, একলা যখন পাঠাতে চাচ্ছেন না; কাজেই একজন যাত্রা-সঙ্গী চাই।"

বেণু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, "আমি যেন মা'র বাবুল কাবুল হয়েছি। দিনরাত আঁচলের নীচে লুকিয়ে রাখা। বড়ো হয়েছি, চার চারটে পাশ করেছি, এমনই নাকি? আমি একলা যাব, একলা আসব, কারুকে আমার দরকার নেই। আজ বলচেন যাত্রা-সঙ্গী চাই, কাল বলবেন ভোজন-সঙ্গী চাই। পরশু ধরবেন শয়ন-সঙ্গী না হলে চলবে না। এত কথা আমি শুনব না; যাব কী, যাব; একলা যাব।"

বেণুর উত্তেজনায় প্রিয়তোষবাবু গলিয়া গেলেন। একে তিনি সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, তায় বেণু তাঁর অতি আদরের, অতি স্নেহের। বেণুর স্বাধীন মতবাদের বিরুদ্ধে মা সময় সময় অন্তরায় হইলেও তিনি কখনও হন নাই। নদীর তরঙ্গের মতো স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীল গতিতে বেণুকে বহিয়া যাইতেই সাহায্য করিয়াছেন। নিষেধের উপলখণ্ডে কোথাও বাধে নাই। এখন বাধার সৃষ্টি করিলে সে মানিবে কেন?

প্রিয়তোষবাবুর কিন্তু দুই দিকেই সমান দুই জায়গাতেই দুর্বলতা, তিনি বেণুকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। আবার বেণুর মাকে ব্যথা দিতে পারেন না। নিরুপায় ভালোমানুষটি মহাসমস্যায় পড়িয়া কেশবিরল মস্তকে কেবলই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

স্বামীকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া বিরাজ হাত বাড়াইয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তার মুখখানি বুকে চাপিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "বেণু, রাগ করে কী? রাগ করো না। তুমি যেতে চাইছ নিশ্চয় যাবে। তোমার অনেক বন্ধু, অনেকেই তোমায় ভালোবাসে, তাদের ভেতর থেকে যাকে তোমার ভালো লাগে, বিশ্বাস হয়, সাথী হিসাবে বেছে নাও। তোমার পাশের উপলক্ষে একদিন বরং সকলকে চায়ের নেমতন্ন করি।"

এতক্ষণে প্রিয়তোষবাবু অকুল সমুদ্রে যেন কূল পাইবেন। তিনি সাগ্রহে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা ত করতেই হবে। বেণুর পাশের খাওয়া না দিলে চলবে কেন? এম-এস্ সি পাশ কী সোজা কথা? কজনা পারে? গেজেট বেরুলেই আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে খাইয়ে দিও।"

বেণু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইল, "ভারী ত পাশ, সেকেন্ড ক্লাশ পেয়ে, এত ঘটা কিসের? আমি চাইনে কাউকে ডাকতে, চাইনে চা খাওয়াতে।"

বিরাজ বেণুকে সান্ত্বনা দিলেন, "এ কী কথা বেণু? তোমার ফল খুব ভালো হয়েছে। এর চেয়ে খারাপ হলেও আমি দুঃখিত হতাম না।"

বেণু কহিল, "তুমি ত বলবেই মা; কম নম্বর পেয়ে আমার যে কী হয়েচে তা আমিই জানি। কত খেটেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম, তোমার বাপের বাড়ির দেশের ছেলে রণজিতের সমান হতে। তা হল না, ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে সে-ই রইল।"

মা বলিলেন, "তাতে দুঃখ কী বেণু? পরীক্ষার ফলাফল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কত ভালো ছেলে কত নম্বর পায়, মন্দ ছেলে হঠাৎ উতরে যায়। পরীক্ষার ফলের জোরে রণজিতকে করে খেতে হবে। তোমার ত সে ভাবনা নেই।"

প্রিয়তোষবাবু কহিলেন, "তা ঠিক, তুমি মন খারাপ করো না বেণু, বেশ করেচ, সুন্দর করেচ। রণজিতের কথা ছেড়ে দাও, ও কী ছেলে! ছেলে নয় বিদ্যুৎ, অমনটি আর চোখে পড়ে না। কী ধার, কী বুদ্ধি! তেমনি কী সৎস্বভাব। ওর বাবা ললিত ছিল আমার বাল্যবন্ধু; আহা, বেচারা অল্প বয়েসে মারা গেল। রণজিতকে অনেক দিন দেখি না; এখন আসে না বুঝি? বেণু, তুমি তাকে ডাক না কেন? সে ত তোমারও বন্ধু।"

বেণু ঝাঁঝের সহিত উত্তর করিল, "না বাবা, সে আমার বন্ধু নয়। যার অত অহঙ্কার, অত তেজ সে কারুর বন্ধু হতে পারে না। মার বাপের বাড়ির দেশের লোক, তোমার বন্ধুর ছেলে, তাই তোমরা দুজন মিলে ওকে যতটা বাড়াও, আসলে ও ততটা নয়। ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে মাটিতে পা পড়ে না। অমন কাজ উনি ভিন্ন আর যেন কেউ পারে নি।"

প্রিয়তোষবাবু এ আক্রোশের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। বিরাজমোহিনী নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে গেজেট বাহির হওয়া মাত্র একখানা গেজেট লইয়া বেণুকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন নবীন ব্যারিস্টার মিঃ চৌধুরী। বেশভূষার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, বাক্যালাপে বিচক্ষণ, ধনী পিতার ধনগৌরবে গৌরবান্বিত। চৌধুরীর ওজন করা হাসি, ওজন করা শিষ্টাচার শেষ হইতে না হইতেই সদ্যপ্রকাশিত গেজেট হস্তে আগমন করিলেন মিঃ রায়। ছেলেটি বলিষ্ঠ, দেখিতে ভালো, অল্প দিন হইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। চাকরির বাজার মন্দা বলিয়া এখনও কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজিতে হইতেছে। চৌধুরীর ন্যায় আভিজাত্যের পরিপক্ক না হইলেও রায় অভদ্র নহে। দিব্য হাসি-খুশি সপ্রতিভ।

রায়ের অভিনন্দন অভিবাদনের মধ্যে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে আবির্ভূত হইলেন মিঃ মজুমদার। লোকটির যেমন ছুঁচালো চেহারা, তেমনই ধারালো কথাবার্তা। বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বীমা সম্বন্ধে বহু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

মজুমদার এটাচিকেস হইতে সযত্নে আনীত গেজেটখানি বাহির করিয়া সহাস্যে আরম্ভ করিলেন, "আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আনন্দজ্ঞাপন করতে এসেছি; ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার সাফল্য যে এতদূর এগিয়ে যাবে, আশা করি নি। যে দুর্বল শরীর নিয়ে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে এ হল গিয়ে আশাতীত ফল।"

বেণু সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি ভুল করেছেন মিঃ মজুমদার, এবার আমার শরীর ভালোই ছিল। অসুখ হয়েছিল বি-এস সি পরীক্ষার আগে।"

চৌধুরী হাসিলেন, "কোথায় ভালো ছিলেন? মোটেই না। নিজে বুঝতে পারেন নি, আমরা পেয়েছি।"

রায়ের বয়স কম, কথা বলে কম, তবু দুইজনার কথার পৃষ্ঠে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। মৃদুস্বরে বলিল, "পরীক্ষার পড়ার চাপে শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকে না। অসুখ হলেও অনুভূতি চলে যায়।"

মজুমদার অভয় দিলেন, "শরীর এবারে ভালো হয়ে যাবে। ঝঞ্ঝাট ত মিটে গেল। শুনলাম, আপনি নাকি লণ্ডনে যাচ্চেন? মা একলা যেতে দেবেন না। ঠিকই ত, ছেলেমানুষ, একা কী অতদূরে যায়? আপনার সঙ্গি হবার সৌভাগ্য আমাকে যদি দেন, তাহলে কোনো ভাবনা থাকবে না। লণ্ডনই বলুন, আর নিউ ইয়র্ক, জর্মনী, প্যারিস, বার্লিনই বলুন, আমি ছয় ছয়টা বছর তন্ন তন্ন করে ঘুরে এসেছি, কোথাও বাকী রাখি নি।"

রায় বলিল, "আমিও ছিলাম চার বছর, দেখাশোনা বেড়ানো আমারও ঢের হয়েছে। অনুমতি পেলে আমিও আনন্দের সঙ্গে আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।"

চৌধুরী সগর্বে রায় দিলেন, "বছরের কথা কী বলচেন মশায়? প্রচুর টাকা না থাকলে ওদেশে যাওয়া বিড়ম্বনা। ছিলাম বটে দু বছর, তার ভেতরে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে যাই নি, এমন কোনো উৎসব ছিল না, যাতে আমি যোগ দিই নি। ও অঞ্চলের সবাই আমার নাম রেখেছিল ধনকুবের। আমিও যেতে পারি বেণুর সঙ্গী হিসাবে। কাজের জন্যে আমার যাওয়ারও দরকার হয়েচে।"

বেণু তার সম্মুখে উপবিষ্ট তিনটি মূর্তির পানে চোখ তুলিয়া বলিল, "বেশ ত. আপনাদের ভেতরে যে-কেউ হোক যাবেন আমার সাঙ্গে। আমার কদিন ভাববার সময় দিন; ভেবে চিন্তে পরে বলব।"

বেণুর আশ্বাসে তিনখানি মুখে আশার আলো জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। ইহারা তিনটি বেণুর অবসর-সঙ্গি, চায়ের টেবিলের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইহাদের আশা অফুরন্ত, আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত। ইহারা জানে, বেণুর বাবার মস্ত বাড়ি, মস্ত গাড়ি, মস্ত বড়ো কারবার কারখানা। বেণুর বাবার বড়ো আদরের, বড়ো স্নেহের।

সত্যিকারের বেণুর জন্য যতটা না হোক. তাদের বাহ্যিক সম্পদের সৌরভে লুব্ধ ভ্রমরের মতো অনেকেই আসিল অভিবাদন জানাইতে, অভিনন্দন দিতে। হাসি, গল্পে, মিষ্টান্নে চ'এ সমারোহ পড়িয়া গেল।

একে একে সকলের পালা শেষ হইল; শেষ হইল না কেবল রণজিতের পালা; সে না আসিল অভিনন্দন দিতে, না আসিল খবর লইতে।

একদিন বিরাজমোহিনী বলিলেন, "রণজিতের একটা খোঁজ নিতে হয় বেণু, কোথায় কী ভাবে রয়েচে। মাঝে শুনেছিলাম, চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত। ছেলে পড়িয়ে মেসের খরচ চালাচ্চে। আহা, বড়ো ভালো ছেলে, দুঃখী মায়ের বুক জোড়া মাণিক। বেঁচে থাকুক।"

বেণু তিক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাদের দেশের ছেলে তুমি মাথায় তুলে নাচগে মা, আমার দায় পড়েছে খোঁজ নিতে। আমাদের কারখানায় কত লোকের চাকরি হয়; আমার বাবা কত লোকের উপকার করেন। বাবার কাছে এসে দাঁড়াতে যার মাথা কাটা যায়, সে ছেলে পড়িয়ে খাবে না ত খাবে কে?"

বিরাজ বেণুকে বুঝাইয়াছিলেন--দুনিয়ার সকলেই এক ধাতের নয়, করুণার ভিক্ষা সকলেই লইতে পারে না। যারা আত্মনির্ভরশীল, আত্মনিষ্ঠ তারাই প্রকৃত মহৎ।

মার মহত্ত্বের উদাহরণ লইয়া বেণু চিন্তা করে নাই। কোথাকার কে, বাবার বন্ধুর ছেলে, মার বাপের দেশের লোক, তাকে দিয়া বেণুর কীসের প্রয়োজন? সেই একদিন আসিয়াছিল; অযাচিত অনাহুতভাবে বেণুর সহিত মিশিয়াছিল। তার আগ্রহে বেণুর রসায়নশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ।

তারপর কোথা দিয়া কী হইল, বেণু তা জানে না। জানিবার মধ্যে এইটুকু জানিয়াছে, দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছের মানুষ দূরে যায়। এমনই যাওয়া-আসা লইয়া সংসার। ইহার নিমিত্ত বেণু ব্যস্ত নহে, ব্যাকুল নহে। বেণুর কী আর কেহ নাই? যারা আছে, তাদের সাজানো হাসি, সাজানো বাক্যের অন্তরাল হইতে স্বার্থের কঙ্কাল মূর্তি উঁকিঝুঁকি দিলেও স্তব স্তুতির মূর্ছনা কিছু মন্দ শোনায় না। ইহাতে বেণুর আর কিছু হোক বা না হোক, লোকের অন্তরের অন্তস্থল শাস্ত দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বেণু এখন অনেক জানে অনেক চেনে।

এত বেশি জানিবার চিনিবার সুযোগ পাইয়া বেণু স্তাবকের দলদের জন্য মনে মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে প্রবল বিরাগে, বিতৃষ্ণা, অকথ্য ঘৃণা। যাকে বিদ্বেষ করে, অবহেলা করে, সামান্য

সংবাদটা পর্যন্ত লইতে চাহে না, তাহার জন্য হৃদয়ের গোপন গহনে কী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেহ জানে না। জানে শুধু বেণু।

সেদিন সন্ধ্যায় অকাল-বর্ষার রিমঝিমি সুরের গুঞ্জনে বেণুর চিত্তে জাগিল সুপ্ত সঙ্গিতের রেশ। হাঁ, আর একটা কথা বলা হয় নাই। পরীক্ষায় বেণু দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বর পাইলেও গান গাহে প্রথম শ্রেণির। বন্ধুমহলে এবার বেণুর সঙ্গীত-সাধনায় মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের গলার মালা খুলিয়া বেণুর গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সম্মানে বেণু নাকি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাহে না।

অনেক দিন পর বেণু তার বেহালার তার বাঁধিয়া মুক্ত জানালার নীচে গিয়া বসিল। সামনে মেঘে মেঘে মেঘময় আকাশ, পাতায় পাতায় বাদল ঝরিতেছে—টিপ-টিপ টুপ-টাপ। সজল শীতল বাতাস অব্যক্ত বেদনায় কাঁদিয়া সারা।

বেণুর গলাটা কেবলই ধরিয়া আসিতেছিল। সেই ধরা গলায় বেণু গাহিতে লাগিল—

"আমি, নিতি নিতি কত রচিব শয়ন, আকুল পরাণ রে,
নিতি নিতি কত করিব যতনে কুসুম চয়ন রে।
কত শরত যামিনী বিফলে যাবে, বসন্ত যাবে চলে,
কত উদিয়া তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাবে ছলে।"

বেণুর গলায় আজ যেন কী হইয়াছিল? গাহিতে গাহিতে থামিয়া গেল। মুখর বাতাসে চালিত বৃষ্টির ছাট আসিয়া সর্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। বেণু উঠিল না। বারিসিক্ত নয়নে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দ্বারের ভারী পর্দা সরাইয়া বিরাজমোহিনী আসিয়া ডাকিলেন, "বেণু!"

বেণু চমকিয়া ঘাড় ফিরাইল; মা একাকী আসেন নাই, তাঁর পিছনে রণজিত। বেণুর মনের মধ্যে কী হইতেছিল, কে জানে? বাহিরে মুখের একটি রেখাও পরিবর্তন হইল না।

বেণু রণজিতের পানে চোখ তুলিয়া শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এতকাল পর কী মনে করে আসা হয়েচে? আগের মতো এলে গেলে পাছে আমাকে পড়াতে হয়, পাছে আমি বেশি নম্বর পেয়ে ভালো ছেলের নাম ডুবিয়ে দিই, সেই ভয়ে পালিয়ে থাকার কারণ আমার জানতে বাকি নেই।"

রণজিত নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চা আনিবার ছুতায় মা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বেণুর কী সোজা রাগ, সোজা অভিমান? তার অশেষ বিদ্বেষের পাত্রকে নিকটে পাইয়া সে কী সহজে ছাড়িতে পারে?

কোলের বেহালাটাকে মেঝেয় নামাইয়া বেণু রণজিতের সামনে মুখোমুখি বসিয়া কহিল, "এখানকার ফল যাই হোক, লণ্ডনের পি এইচ ডি আমায় হতেই হবে। তুমি এ পরীক্ষায় আমায় সাহায্য না করলেও আমি অপদার্থ হয়ে থাকব না। ভারী ত পাশ করেছ, ভারী ত জান, এত গুমোর কিসের? তোমার মতো আর কী কেউ নেই? না, থাকতে পারে না?"

রণজিত ধীরে জবাব দিল। "কে বলেছে নেই, থাকতে পারে না? আছে বলেই না আমি সরে রয়েচি। পরীক্ষার সময় আমায় যদি তোমার মতো অত দরকারই ছিল বেণু, তবে ডাকো নি কেন?"

বেণু গর্জিয়া উঠিল, "ডাকব কেন? আমার কিসের দায়? না ডাকলেও আমার কাছে কত জন আসে। তারা নেহাৎ হেলাফেলার নয়।"

"জানি বেণু, হেলাফেলার লোক আসে না। আমার চেয়ে উঁচুদরের জনসমাগমেই না আমি সরে গিয়েচি। আমি আর যাই হই, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আলাদীনের স্বপ্ন দেখি না। তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব অসম্ভব, অসমান সমুদ্রে নালায় যতটা প্রভেদ, তেমনই।"

বেণু বিগলিত হইল। নরম গলায় কহিল, "কীসের প্রভেদ? যারা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসে, তারা কোনো দিক দিয়েই তোমার সমান হতে পারে না। তোমার সবচেয়ে বড়ো দোষ, তুমি নিজেকে ভারী ছোটো করো, নিজের অধিকার জোর করে নিতে পারো না। যাদের যোগ্যতা নেই কাণাকড়ির, তারাই আসে। ঘেন্নায়, লজ্জায় আমি যে মরে যাই, তা কী তুমি দেখতে পাও না?"

"কেমন করে দেখব বেণু? দেখবার সাহস হয়নি। থাকুক ওসব কথা; তুমি কবে যাচ্ছ? মা তোমায় একলা যেতে দেবেন না, কাকে নিয়ে যাবে?"

বেণু চিন্তিত মুখে বলিল, "এখনও তা ঠিক করিনি। তোমারও পিএইচডি দেওয়া দরকার। ওটা দিয়ে ফেলে ডিএসসি টাও দিও। আমি জানি, তুমি পারবে, কোথাও আটকাবে না। একবার লণ্ডনে গেলেই হয়।"

বণজিত ক্ষোভের হাসি হাসিল, "তুমি পাগল বেণু, আমি যাব লণ্ডনে? আমার টাকা কোথায়? আমি এখানেই চেষ্টা করব, যা হয় হবে।"

বেণু বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "তোমার বড়ো দোষ, নিতে জান না? তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তুমি আমার মার বাপের বাড়ির দেশের লোক, তোমার আবার টাকার অভাব? বাবাকে বলো তিনিই টাকা দেবেন।"

রণজিত ঘাড় নাড়িল, "তা হয় না বেণু, যেখানে অধিকার নেই, সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির প্রবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি। তোমার বাবার টাকা আমি নিতে পারব না।"

বেণু কহিল, "না নিলে বাবার টাকা, আমার টাকা ত নেবে? আমার নিজের হাজার কয়েক টাকা জমেছে। আমার সমস্ত খরচ বাবা দেবেন, তোমার আমার ক্যাবিনে সাথী করে নিয়ে গেলে ভাড়া ঢের কম লাগ্‌বে।"

রণজিত চমকিয়া উঠিল, "তুমি কী বলচ বেণু? এক ক্যাবিনে বন্ধু পরিচয়ে দুইজন যেতে পারে না। নিয়ম নেই। কারা যায়, যেতে পারে, তা কী তুমি জান না?"

বেণু মিষ্টহাসি হাসিয়া কহিল, "কে বললে জানি নে? জানি বলেই না তোমায় যাত্রাসঙ্গি করছি। তোমার নেবার ক্ষমতা নেই. আমার দেবার শক্তি আছে। সেই শক্তিতেই আমি তোমায় নিয়ে যাব। তোমার সাধ্য নেই. আমায় বাধা দাও।"

হাঁ, আর একটা কথা, এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বেণু ছেলে নয়, মেয়ে।

একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'

জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাত্তির তিনটে হবে। নীতি উঠে বসল বিছানায়। মনে হল স্বপ্ন, না, জেগেই ছিল? কিন্তু তিনদিন ধরেই ওই প্রকাণ্ড হাঁ-করা চাঁদের মুখের মতো হাসিভরা একটা মুখ ওকে যেন মনের মধ্যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যেন কী বলতে চায় অথচ বলছে না। শুধু বিশ্রী ব্যঙ্গভরা একটা হাঁ-করা হাসি ওর দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের মুখের মতো কাত হওয়া মুখটা। তার সমস্ত গালটা হাসিতে বিভাসিত। যেন মানুষের মুখের স্বাভাবিক হাসি।

নীতির পাশে ভাইবোনরা ঘুমুচ্ছে। তাদের গভীর শান্তি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। নীতি ভাবল চাঁদ কী উঠেছে? আজ কী তিথি? চাঁদটা কোন্ দিকে? উঠেছে, না উঠবে? জ্যোৎস্না কী আছে? কিন্তু কলকাতায় জ্যোৎস্না— তার আনাগোনার জায়গা খুবই সঙ্কীর্ণ। মাঝের তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথিগুলোতে একটু আধটু অলো জানালার পাশে বারান্দার পাশে আর ছাতে আসে তাতে চাঁদকে যে সব সময় দেখা যাবে তা নাও হতে পারে। শুধু জ্যোৎস্নার আভাসটাই উঁকি মারে।

নীতি জানালার বাইরে একবার তাকালে। তারপর বিরস মনে টেবিল আলোটা জ্বেলে স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্র বিছানায় ছড়িয়ে বসল। আর চাঁদের হাসির চালাকির কথা ভাববার দরকার নেই—চাকরি তো আছে।

খাতা দেখে। সংশোধন করে। নম্বর ফেলে।—ভালো বা মন্দ মন্তব্য লেখে। আর মাঝে মাঝে সকৌতুকে হাসে ছাত্রীদের ভুল দেখে।

হঠাৎ পাশের ঘরে দরজার খিল খোলার শব্দ হল। মা উঠলেন হয়তো। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল—পৌনে পাঁচটা!

এতক্ষণে শরীরের কথা মনে হল। ওঃ পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

আর খাতা দেখে না। প্রায় শেষ করে এনেছে।

শুয়ে পড়ে। এবার জানালা দিয়ে আশ্বিনের শেষরাত্রের হাওয়া আসে। আর হ্যাঁ, কাত হয়ে পড়া চাঁদকেও পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পেল।

হঠাৎ ওই সমস্ত অস্বস্তিকর ভাবনাগুলোকে কঠিন ভাবে নেড়েচেড়ে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল।

কোত্থেকে, কেমন করে, কবে, কেন ওই প্রকাণ্ড হাসির গহ্বরওয়ালা ব্যঙ্গ হাসিভরা চাঁদের মুখ ওর মনে বাসা বাঁধল। জাগল চাঁদ তো আজ বা কালই দেখছে। হয়ত মার কোলে থেকে 'আয় চাঁদ আয়' শুনেছে।

কিন্তু মনে মনে একটু হেসে ফেলল। মার কোলে? তিন ভাই চার বোনের একজন। মার কী কোনো মেয়ে নিয়ে আর 'আদিখেত্যার' অবসর ছিল! আগে পরে আরও বোন আর ভাই।

যাক্, সে তলিয়ে ভাবতে বসল সেই কবেকার কথা। যখন থেকে ওই মনের মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁক ওই 'হ্যাঁ'টা বাসা বেঁধেছে। তাকে দেখে নিয়ে হয় ঝেড়ে ফেলতে হবে, নয় কী করা যায় তাই করতে হবে।

॥ ২ ॥

হ্যাঁ, ওর ইস্কুলটা বেহালায়।

সেদিন ট্রামে ফিরছিল। মেয়েদের সিটের পাশের জায়গাটা খালি ছিল। বিকেলের রোদ্দুরে আকাশভরা আষাঢ় মাস। সে জানালার বাইরে তাকিয়েছিল।

সহসা কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি একটু বসতে পারি?'

মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, হ্যাঁ বসুন। সারাদিনের ক্লান্তিতে গরমে চোখ যেন জ্বালা করছিল। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে ভাবছে। চোখ বুজেই কিম্বা না-দেখা চোখে সে বসেছিল।

যে পাশে এসে বসল, সে হঠাৎ একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' ভাবে বললে, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কী নীতি মৈত্র?'

নিজের নাম শুনে সে চমকে উঠে মুখ ফেরালো।

ক্ষীণকায় পাশের লোকটিও তার মুখটি দেখে চমকালো।

এবারে বললে, 'তুমি—তুমি নীতি? আপনি নীতি মৈত্র তো?'

নীতি বললে, 'তুমি! আপনি? তুমি অমল ঘোষ? তোমাকে যে চেনা যায় না এমন হয়ে গেছ...।'

অমল একটু হেসে বলল, 'তোমাকেও তো ওই কথাটাই বলতে পারি।'

নীতি শুকনো ভাবে একটু হাসলে। কিছু বললে না।

দুজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ঝাপসা ছবির মতো অনেকগুলো দিন আর ঘটনা তরতর করে চোখের সামনে ভেসে এলো। দুজনের মনে দুভাবে।

নীতির থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে দুজনের আলাপ হয়। ভাব হয়। ভালোবাসে পরস্পরকে। ভালো লাগাটা ভালোবাসার পরিণতি লাভ করে।

তারপর পিতার ক্রোধ, জননীর বিরাগ, প্রতিবেশীদের ইঙ্গিতময় নিন্দার গুঞ্জন, সব জড়িয়ে একটা জটিল অবস্থা।

অসবর্ণ বিয়ের কথা তারা বলে। প্রচণ্ড রাগে তাতে পিতা জননীকে দিয়ে বলেন, 'ওসব বিয়ে হতে গেলে কোমরে টাকার জোর থাকা চাই। বুঝলে, টাকার জোর বড়ো জোর। টাকার জোর থাকলেই ওসব 'প্রেম ট্রেম' করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়। ওসব খেয়াল ছাড়তে বল। ওই করার জন্যে ওকে আমি কলেজে পড়াই নি। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে আমার মাথা কিনতে বলো।'

ছোটো বাড়ি।—পাশের ঘরে সরব কথা। মাকে আর বলতে হল না কিছু। ভাইবোনে সবান্ধবে বসে নীতি সব কথাই শুনতে পেল।

মা এসে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমি কী করে মুখ দেখাব পাড়ায়—সমাজে সকলেরি কাছে। তোরা এই করে আমাদের মুখ ডুবিয়ে দিবি...।'

নীতি লজ্জায় ধিক্কারে যেন মরে গেল। কিন্তু নাঃ। নীতি প্রেমের জন্যে আত্মহত্যাও করেনি। পালিয়েও যায়নি বাড়ি থেকে। ভালো করে মন দিয়ে পড়ে বি. এ. পরীক্ষা ভালোভাবেই পাশ করল।

তারপর বি. টি.। তারপর চাকরি। বাবার সংসারের কিছু ভার নেওয়া।

ট্রাম চলেছে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে। নামবার সময় হয়ে এলো। তার চোখটা পাশে বসা অমলের দিকে পড়ল।

সেও ভাবছিল ওই রকম সব কথা। পড়ায় ভালো। তার ভাগ্যে এসে পড়েছিল পিতার মৃত্যু, ফিফ্‌থ ইয়ারেই পড়া বন্ধ। মা ভাই বোন, সংসার। সকলের ভার। জীবিকার সন্ধান...।

একটা ষ্টপে ট্রাম থামল।

কিছু কথার আগেই একটি মেয়ে এসে সিটের পাশে দাঁড়াল। অমল উঠে দাঁড়াল।

ধর্মতলা এসে পড়ল। এবার নামতে হবে। নীতি এদিক ওদিক তাকাল। অমল কোন্ দিকে? নেমে গেল কী? না। অমল নামছে। সেও নামল।

সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন্ দিকে?'

নীতি বললে, 'বেলেঘাটা। তুমি?'

'শ্যামবাজার'। দুজনে নামল।

'এদিকে তোমার কি আপিস?' নীতি বলে।

'খিদিরপুর ডকে একটা কেরাণীগিরি' একটু হেসে অমল বলে। 'তুমি'?

'আমিও বেহালায় একটা স্কুলের টিচার।'

প্রতিদিনের একই পথের যাত্রী! এতদিন দেখা হয় নি। আশ্চর্য! দুজনেই ভাবে।

অমল। '—আচ্ছা। আজ যাই। তুমি কটায় বেরোও? কিছু কথা হল না আজ।'

নীতি। '—বড্ড ভিড় হয়ে যায় তাই প্রায় একটু সকালেই বেরুই। মাঝে মাঝে বাসেও উঠি।'

॥ ৩ ॥

তারপর থেকে এখন প্রায়ই দেখা হয়। যেন দেখা হবার জন্যেই দুজনেই সময়ের একটু বেশি আগে আসে। দু একটা কথা কয়। হাসে।

নীতি ভাবে যেন কতদিন হাসেনি। কারো সঙ্গে গল্প করেনি।

দু একদিন পরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেই বাড়িতেই আছ?'

অমল বললে, 'হ্যাঁ'।

নীতি জানত অমলের বিয়ে হয়েছে। একটু দ্বিধা করে বললে, 'কে কে আছেন বাড়িতে? ভাইরা মা কোথায়? ছেলেমেয়ে আছে?'

অমল বললে, 'মা আছেন। আর কেউ নেই, একটি ছেলে আছে শুধু।'

'—বউ কোথায়?'

একটু থেমে বললে, 'এই বছরখানেক হল হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি?'

নীতি চুপ হয়ে গেল।—তারপর বললে, 'আহা! বাচ্চাটি?'

'সেও নেই।'

'বাড়িতে তবে শুধু মা আছেন?'

'হ্যাঁ, আর বড়ো ছেলেটি আছে।'

অমলা কথা শেষ করে বললে, 'নিজের কথাই বলছি, তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।' 'সিঁথির দিকে তাকালো। সরু সাদা সিঁথেটা।' বিয়ে করনি দেখছি?'

সে শুকনো ভাবে একটু হেসেছিল। কিছু বলে নি।

অমল একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইবোনদের বিয়ে হয়েছে? প্রীতি, বীথি, গীতি? প্রীতি তো তোমারি মতো দেখতে অনেকটা। বেশ সুন্দর ছিল, না?'

ওর মতো? সুন্দর দেখতে! নীতির চোখবসা ক্লান্ত মুখে একটা শীর্ণ হাসি উঁকি মেরে যায় যেন। মুখে বললে, 'হ্যাঁ, ওদের বিয়ে হয়েছে। দাদারও বিয়ে হল। শুধু গীতি বাকি।'

'ও!' অমল অবাক হয়। '—প্রীতির কোথায় বিয়ে হল? বর ভালো হয়েছে?'

নীতি ওর দিকে ফিরে একবার তাকালো। তারপর বললে, 'হ্যাঁ খুব ভালো বর ঘর। পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে। সুধাংশু মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। দাদারও হয়েছে একটি দত্ত বাড়ির মেয়ের সঙ্গে। অসবর্ণ, ওরাও একসঙ্গে পড়ত। ভাব হয়েছিল। সুধাংশুরা খুব বড়ো লোক। এরা বড়ো লোক নয়। কিন্তু দাদা তো রোজগার করে।'

যেন নীতি রোজগার করে না। অমল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অস্বর্ণ? দুটো অসবর্ণ বিয়ে দিলেন ওর বাবা মা? না, তাঁরা হয়তো নেই!

নীতি চুপ করেই ছিল। দুজনেই এককথাই ভাবছিল। সেই নিজেদের কথাই কী?

অমল এবারে বললে, 'মা বাবা আছেন? মত দিলেন এই সব বিয়েতে?'

ট্রাম ধর্মতলায় এসে পড়েছে। নামতে হবে। নীতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ! খুব বড়ো লোক তারা। বাবার অমত হয়নি। চল নামি।'

...তার মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটল কী? অমল ভাবে।

॥ ৪ ॥

নীতি শুয়ে শুয়ে আবার ভাবে! হ্যাঁ, খুব বড়োলোক জমিদার সুধাংশুরা। প্রায়ই গাড়ি করে আসত। জমিদারীর মাছ ফল আম কাঁঠাল গুড় মিষ্টি সন্দেশ পাঠাত ঝাঁকা ঝুড়ি ভরে, থালা ভরে। বাড়িতে উৎসব পড়ে যেতো। তাকে নিমন্ত্রণ করা হত। সেও আবার সকলকে সিনেমা থিয়েটারেও নিয়ে যেতো। মাছ এলে সেদিন বাবা রান্নার মেনু করে দিতেন। রাত অবধি বসে তার সঙ্গে সকলের খাওয়া-দাওয়া হত।

বিয়ের প্রস্তাব আসার আগেই তাঁরা মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ছেলে নিজেই কর্তা।—বিধবা মা কোনো আপত্তি করবেন না। আভাস দিয়েছিল প্রীতি।

* * * * * *

ছেলের প্রস্তাবে মা আর বাবা বললেন, 'এত ভাগ্য প্রীতির হবে কে জানত।...'

তারপর ঘোর ঘটা করে পাশের বাড়ির ছাদ সামনের বাড়ির উঠোন বাহিরের ঘর সব নিয়ে মহা জাঁকজমক করে প্রীতির বিয়ে হয়ে গেল।—বাবা জামাইকে হিরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। প্রীতিকেও গহনাপত্র দিলেন। কিছু ধারদেনাও হল। কিন্তু সে তো 'হাঘরে' বরের হাতে দিতে গেলেও নগদে গহনায় দিতেই হত।...

এবার নীতির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে করতে ভাবে, কিন্তু এবার আর মা কেঁদে বলেন নি, কি করে মুখ দেখাব লোকের কাছে। বেশ মুখ মাথা উঁচু করেই লোকজন খাওয়ালেন। গর্বিত ভাবেই মুখ দেখালেন মা। প্রতিবেশীদের কাছে জামাইয়ের ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে কাহিনি বিস্তৃত করেই বলতে লাগলেন। তারা বিতৃষ্ণ ঈর্ষাতুর শুকনো মুখে শুনতে শুনতে নেমন্তন্ন খেল। খেয়ে বাড়ি গেল। নিন্দে করতে বা জাতের খোঁটা দিতে পারল না। অত বড়ো লোক, কম কথা! ...কত বড়ো গাড়িখানা, গলিতে ঢুকতেই পারে না।

॥ ৫ ॥

আর চাঁদটা নিজের খুশিমতো নীতির অবসর হলেই 'হাঁ' করে হেসে যায় তার মনে। সেটা বেশির ভাগই নীতির রাতের নিশুতি অবসরে। যখন বাবা মা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন। ভাই ভাজ পাশের

ঘরে গুনগুন করে গল্প করে। ভাইয়ের ভালো কাজ হয়েছে। সংসার সচ্ছল হয়েছে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা যাওয়া করে। বাড়িতে হাসিগল্পের ধুম। চায়ের আসর সন্ধ্যারাতে জমে। যখন নীতি খাতার বোঝা ছড়িয়ে খাতা দেখে। চাঁদটাও হাসে মনের ভেতরে।

পাশের ঘরে—এবার বাবা মা জাগলেন। নীতি শুয়ে ছিল, সেও এপাশ ওপাশ করে ক্লান্ত মুখে উঠে বসল।

ঝি এসে কড়া নাড়ল।—তারপর উনোনে আগুন পড়ল।—ভাজ উঠলো। মা রান্নাঘরে গেছেন। চায়ের কেতলী বসেছে। নীতি মনে মনে সব দেখতে পাচ্ছে। কার জন্য বিস্কুট, কার জন্য রুটি, কার জন্য জিলিপী আসবে। সিঙ্গাড়া আসবে কোন্‌দিন তাও সে সব জানে।

তারপর প্রকাণ্ডহাঁড়ি করে সিদ্ধচালের ভাত বসবে; আলুভাতে আর হয়তো কুমড়া ঝিঙেও ভাতে দেওয়া হবে। হয়তো ডাল ভাতে। বাবা বাজারে যাবেন। মাছ আসবে তরকারি আসবে। ততক্ষণে নীতির স্নান কাপড় পরা হয়ে যাবে। ডাল ভাতই খেতে পাবে। মাছ কুটে বেছে দিতে ঝিয়ের সময় হয় না। বউদিকেই কুটতে হয়। সে ছোটো ছেলে নিয়ে সব দিন ঠিক সময়ে আসে না।

মা বলেন, 'একখানা মাছ ভাজা হলে হত। রোজই ডাল ভাত আলুভাতে বেগুন পটল ভাজা দিয়ে খাওয়া...।'

কিন্তু তাই খেতে হয়। খেতে দেন। সে আর কিছু বলে না। বেহালা তো কম দূর নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসে ট্রামে শরীর 'তক্তা' হয়ে যায়।

মনে মনে হাসে—'তক্তা!' হ্যাঁ তক্তাই তো! সংসারকে দাঁড়াতে বসতে আশ্রয় দিতে সে তো 'তক্তার' কাজই করছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন কী রকম মনটা ভালো হয়ে যায়। সে ডালভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিনের চেয়ে কুড়ি মিনিট আগেই। অমলকে ধর্মতলায় পেয়ে যাবে তাহলে।

ভাই বলে, 'এত আগে ছুটছিস কেন?'

বাবাও বলেন, 'এখনো তো নটাই বাজেনি।'

তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। 'যা ভিড় হয়ে যায় জানইতো।'

দুজনে দেখা হয়। হয় ফেরবার পথে, নয় যাবার মুখে।

দুজনেরই যে একই কথা অনেক বার ভেবেছে। আবারো ভাবে। কেউ কাউকে যদিও বলে না।

আবার একদিন অমল বলল, 'ছেলেটার পড়াশোনার জন্যে ভাবনায় পড়েছি। মা বুড়ো হয়েছেন, সামলাতে পারেন না, রাস্তায় বেরিয়ে যায়। নিজের তো কিছু হল না, ছেলেটিকে যে কী করে দেখি শুনি। একটা ভালো বোর্ডিং-এর সন্ধান দিতে পার? কিংবা ভালো মাষ্টার?'

নীতি বললে, 'আচ্ছা সন্ধান দেখব। কিন্তু বোর্ডিং-এ অনেক খরচ হবে। কত বড়ো হল?'

'এই ছয় হয়েছে।'

'বড্ড ছোট্ট না বোর্ডিং-এর পক্ষে?'

'কিন্তু বাড়িতে আর তো সামলাবার লোক নেই।'

॥ ৬ ॥

বাড়িতে বোনেরা এসেছে। হৈ হৈ উৎসব পড়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। বরদের অর্থাৎ জামাইদের নিয়ে।

নীতি শুকনো চোখে বসা ক্লান্ত মুখে এসে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে চা আর যা হোক দুটি রুটি অথবা অতিথিদের জন্য আনা ভালোমন্দ খাদ্য খেয়ে উঠে পড়ে।

কোনো দিন পর্বতপ্রমাণ খাতার বোঝা নিয়ে বসে। কোনো দিন ক্লান্ত মুখে চোখ বুজে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, ভাই টাকা রোজগার করে। বাবাও অর্জন করেন কিছু...। কিন্তু তার মতো এই অবসাদ, ক্লান্তি কষ্ট তাঁদের তো হয় না!

ভাই পরমোৎসাহে বউকে নিয়ে সিনেমা চলে যায়। নয়তো বউয়ের বাপের বাড়ি, মাসী পিসির বাড়ি যায় কিংবা যেখানে খুশি।

বাবা রকে বসে রাজনীতি সমাজনীতি করেন। পরম উদারভাবে এককালে তাঁরই নিন্দিত ধিক্কৃত অসবর্ণ বিবাহকে এখন সমর্থন করে নিজের ঔদার্য প্রকাশ করেন।

বোনেরা যখন আসে মার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির জা ননদদের 'শ্রাদ্ধ' করে। কিংবা বাড়ির ঝি চাকরদের পিণ্ডদান করে অথবা সেজেগুজে তারাও সান্ধ্যভ্রমণে বেরোয়।

সে তখন খাতা দেখে, নয়তো কোনো ছাত্রীকে পড়াতে যায়। চুপি চুপি এক একবার ভাবে যদি এম এ টা দিত। আরো ভালো করে পাস করতে পারত। তাহলে এই খাতা দেখার বিরাট খাটুনিটা থেকে অব্যাহতি পেত।

নাঃ, এম. এ. পড়া হয়নি।

॥ ৭ ॥

আশ্বিনের সূর্য অস্তোন্মুখ। ধর্মতলা এলো।

দুজনেই ধর্মতলায় নামল। দুটো বাস না ট্রাম থেকে।

নীতির স্কুল গরমের ছুটির পরে খুলেছে। অনেক দিন দেখা হয়নি।

অমল এগিয়ে এল হাসিমুখে। সকালে ওঠবার সময় দেখা হয়নি। বিকালেও ভিড়েতে কেউ কাউকে খুঁজে পায় নি।

দুজনে দাঁড়াল একটু পথে। খুব ভিড়।

তারপর অমল বললে, 'একটু পরেই যাব না হয়—চল একটু ঘুরি ময়দানে।'

নীতি বললে, 'চল।'

অমল। 'কার্জন পার্কে বসবে? বেশ ঠাণ্ডা। যদিও ভিড়।'

'তা হোক। ভিড় আর কোথায় নেই—পথে পার্কে ঘরে। বাড়িতেও তো ভিড়।'

অমল কিছু বলে না। তার বাড়িতে ভিড় নেই।...

নীতির মনে হয় একটা ছোটো শোবার ঘর। একগাদা বিছানা। ছোটো বোন ছোটো ভাইয়ের পড়ার একটা জায়গা। নিজের একটা টেবিল। মাটিতে রাত্রে তিনটে বিছানা পড়বে। তাকে টেবিলে নিজের বই। ভাইবোনদেরও বই আছে।

ঘাসের ওপরে বসে একটা একপাশে জায়গা দেখে।

নীতি বললে, 'তোমার ছেলের জন্য বোর্ডিং-এর খোঁজ করেছিলাম। ওইটুকু ছেলের জন্যে বিলিতি বোর্ডিং খুব বেশি চায়। দেশিতেও কম নয় অথচ পড়া বা খাওয়াও ভালো নয়। মুস্কিল। আর একটু বড়ো হলে না হয় অত খরচ করতে।'

অমল বললে 'তা তো বুঝি। কিন্তু কেউ যদি দেখবার মতো বাড়িতে থাকত। মার পক্ষে তো দুরন্ত ছেলের ভার নেওয়া সম্ভব নয়। তা পার তো একটি ভালো মাষ্টার দেখো, যদি কোনো মেয়ে পড়াতে পারেন।'

'দেখব। কিন্তু সে তো ওদিকের কাউকে পেলেই ভালো হয়। এদিকের মানুষ অতদূর যাওয়া আসার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যাবে না হয়তো। তা' একদিন ছেলেকে নিয়ে এসো না। দেখতে ইচ্ছে করে।'

'খোকাকে?' তারপর একটু হেসে বললে, 'কিন্তু কোথায় নিয়ে আসব?'

নীতি বললে, 'তাইতো! তা একদিন ময়দানেই নিয়ে এসো না।'

'সে বাড়ি ফিরে গিয়ে তো আর হয় না। তাহলে একদিন ছুটির দিন আনব।'

'তাই এনো। দেখা যাবে পড়াশোনা ও কেমন করে?'

'পাড়ায় একটা ছোটো স্কুলে পড়ে। ভালো পড়া কী আর হবে?'

'তবু এনো। চল বাড়ি ফেরা যাক।'

সন্ধ্যা শেষ হল। বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি?

দুজনেই অন্যমনে ট্রামে ওঠে। একজনের ভাইবোন বাপ মা সব আছে বাড়িতে। আর একজনেরও মা ছেলে আছে। কিন্তু বাড়ি মনে হচ্ছে না যেন সেটা দুজনেরই। যেখানে স্বজন আছেন। শয্যা আছে। খাদ্য আছে। তবে?

॥ ৮ ॥

একটা রবিবারের বিকালে অমল ছেলেকে নিয়ে এসে ময়দানের পথে দাঁড়াল।

নীতিও নামল বাস থেকে। হাতে একটা চকোলেট খেজুরের প্যাকেট। কাগজে মোড়া।

ছেলে বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠ মুখে বলটা নিল। চকোলেটের মোড়ক খুলল। ছাড়িয়ে দু' একটা খেল।

তারপর বললে, 'তুমি কে?'

তার বাবা বললে, 'মাসী হয়।'

নীতি হাসল। বললে 'তুমি কে?'

ছেলে বললে, 'আমি অনিল। বাবা খোকা বলে। আমি এবারে বল খেলি।'

বল গড়িয়ে দেয় যেদিকে ইচ্ছে। কুড়িয়েও আনে! আবার অমল নীতি যেদিকে বসেছে সেদিকেও ছুঁড়ে ফেলে।

একটা বেলুনওয়ালা এলো। একটা চিনেবাদামওয়ালা। ঝালমুড়ি ফেরিওয়ালা আসে। কাজুবাদামওয়ালা আসে।

নীতি বেলুন কিনল। বাদাম কিনল। খোকা বেলুন ওড়াল এবং ফাটালো। আর খুব হাসল। নীতি ওর হাসি দেখে ওর সঙ্গে হাসে। অমলও হাসে।

অমল বললে. 'মাসী আর বেলুন কিনে দেবে না।'

খোকা নীতির দিকে চেয়ে বলে, 'দেবে না আর? সত্যি'? শুনতে নীতির ভারি ভালো লাগে। ওরা বসে বাদাম ছাড়ায় আর একটা দুটো করে খায়। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল।

অমল উঠে দাঁড়াল, বললে, 'এবারে যাই, মা ভাববেন, খাবার সময় হল খোকার।'

অন্ধকার থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে ছেলে ফিরে এলো। নীতিও দাঁড়াল।

॥ ৯ ॥

মা বসেছিলেন রান্নাঘরে, আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। এক বোন এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। আঁতুড় হবে।

নীতি খেতে বসে। মাও বসেছেন।

মার লাল-পাড় শাড়ি। পরিষ্কার চুল বাঁধা সিঁদুর টিপ কপালে। আগের মতো মুখে আর চিন্তার রেখা নেই। তিন ভাই-ই বড়ো হয়ে গেছে। দুজন ভালো কাজ করে। একজন পড়ে। ছোটো বোনেরই শুধু বিয়ে হয়নি।

আর নীতির। হঠাৎ আজই যেন নীতির মনে হল আর নীতিরও তো বিয়ে হয়নি।

মা ওকে ভাত দেন। দিয়ে নিজে বসেন।

নীতি ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে মুখে তোলে অন্যমনস্কভাবে। কত কী ভাবছে। কূল মেলে না যার। একটা ভাবনা থেকে আর একটা। তারপর আর একটা। খেই হারিয়ে যায়। মূল সূত্রটা কী আবার ভাবতে বসে। মূল সূত্রটা কী অমল? অমলের অসহায়তা! না তার সুন্দর ছেলেটি! যে বললে অবাক হয়ে, 'আর বেলুন দেবে না?' অথবা সেই চাঁদের হাঁ-করা ব্যঙ্গভরা হাসি। যা রাত্রে ওকে ঘুমের সময় ঠাট্টা করে কী বলে কে জানে।

নীতি মুখ তুলে বললে, 'মা!'

মা খাচ্ছিলেন। বললেন, কিরে খেতে পারছিস না? রোজই আজকাল রাত করে ফিরিস। খাটুনি বেড়েছে? আর একটু ঝোল নিবি! নেবু দেব?'

মা ঝোল তুললেন কাঁসি থেকে। আর কি একটা ছোট্ট বস্তু বড়ির মতো। মাছ না বড়ি?

নীতি সকালে মাছ খেতে পায় না। এটা সকালের ক্ষতিপূরণ।

সে থালা সরিয়ে নিল। বললে, 'আর কিছু লাগবে না মা।'

অবাক হয়ে মা বললেন, 'তবে ভাতগুলো কি করে খাবি?'

'আর পারব না খেতে।'

মা শঙ্কিত মুখে বললেন, 'শরীর ভালো নেই?' এবার ভাবনা হল। রোজগারী মেয়ে।

নীতি বললে, 'না ভালো আছি। আমি আর চাকরি করব না মা।' তারপর খুব আস্তে বললে, 'এবার তোমরা আমার বিয়ে দাও।'

সবটাই মা শুনতে পেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না। এমনই আশ্চর্য কথা দুটোই।

চোখ বড়ো করে বললেন, 'চাকরি করবি না! তাহলে কি করবি?'—বিয়ের কথাটা বুঝতেই পারলেন না।

এবারের নীতি মুখ তুলল। কথাটা একবার বলা হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় বার মুখে আনা বা বলার জন্য বেশি সাহসের দরকার হয় না! সেটা বেরিয়ে ঘরের বাতাসে মিশে গেছে তখন।

বললে, 'তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।'

মা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিয়ে! নীতি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলছে—নিজের!

কিছুক্ষণ পরে মুখে কথা এলো। 'তোর বিয়ে? এই বয়সে? পাত্র কোথায় পাব! এত বয়সের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?'

নীতির গলায় সাহস এসেছে। 'পাত্র তোমায় খুঁজতে হবে না। আছে মা।'

পাত্র আছে! নীতি সব ঠিক করে ফেলেছে তাহলে!

মা আবার হতবুদ্ধি সুরে বললেন, 'পাত্র আছে! কে পাত্র? খরচপত্রের কী হবে? বিয়ের তো খরচ আছে একটা। তার কী হবে?'

নীতির গলা স্পষ্ট হয়ে বললে, 'পাত্র অমল ঘোষ। খরচপত্র? আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আছে। বেশি লাগবে না।'

মা স্তম্ভিত। সেই অমল ঘোষ। কায়স্থ! কায়স্থ বলার অসবর্ণ বলার আর মুখ নেই। উপায় নেই। কিন্তু দোজবরে। বললেন, 'দোজবরে।'

নীতি স্পষ্ট গলাতেই বললে, 'হ্যাঁ মা দোজবরে। ছেলেও আছে একটা! কিন্তু তখন আগে সেতো দোজবরে ছিল না। এবারে দোজবরেতেই দাও। নইলে তেজবরে হয়ে যাবে।'

মার মুখে কথা এলো না! নীতির বিয়ে হয়ে চলে যাবে।..একটা আয়। মোটা আয় বন্ধ হয়ে যাবে। চাকুরি কী করবে না সত্যি? আর করলেও তাঁদের কী লাভ। মনে ভয় জাগে। বললেন, 'দেখি ওঁর কী মত হয়।'

নীতি উঠল। বললে, 'বাবাকে শুধু দিন ঠিক করতে বলো। মতামতের আর কিছু নেই। খরচের টাকা আমার আছে।'

অনেক রাত। শোবার ঘর অন্ধকার। ভাইবোনেরা ঘুমোচ্ছে।

জানালা খোলা! মনে হল চাঁদটার কথা। এখনো সে আজ ওঠেনি। কী তিথি কে জানে।

মনে হল না আর চাঁদের হাসির কথা। নীতি ঘুমিয়ে পড়ল সেদিন।

॥ ১০ ॥

অমল ট্রাম থেকে নামল। দেখতে পেল একটু দূরে নীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেল সেদিকে। বললে, 'আমার আসতে আজ দেরি হয়েছে? কাজ ছিল একটু, আর ভিড়ে তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে। তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো?'

'বেশিক্ষণ নয়। চল একটু গঙ্গার ধারে যাই। যাবে?'

দুজনে হাঁটে। পথিক মানুষ। আপিস-ভাঙা ভিড়; যানবাহনের ভিড়। নীরবে এগোয়।

সামনেই গঙ্গা। ঘাটের সিঁড়ি। জোয়ার এসে কখন নেমে যায় সে হিসাব ওরা রাখে না।

নীতি নেবে গেল, বললে, 'এসো না। একটু গঙ্গাকে ছুঁই আজ—।'

সিঁড়ির কাদা মাড়িয়ে গঙ্গাজল হাতে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। ওর দেখাদেখি অমলও তাই করল।—যেন দুজন ছোটোবেলায় ফিরে গেছে হঠাৎ। নীতি বলে, 'এসো বসি একটু।'

অমল বললে, 'বড়ো কাদা।—'

নীতি বললে, কিন্তু এইখানেই একটু শুকনো দেখে বসব আজ।'

দুজনে বসে। পায়ের কাছে জল। বসার জায়গা শুকনো। নীতি একটু কাছাকাছি হয়ে বসল। অমল অবাক। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশটা লাল। কোনোখানে ঘোর লাল। কোনোখানে কালো হয়ে আছে। গঙ্গার জলও কোথাও কালো কোথাও রঙিন।

দুজনে নীরব। হঠাৎ নীতি বললে, 'তোমার সেই টীচার দেখতে বলেছিলে। পাইনি। অত দূর কেউ যেতে চায় না।'

অমল বললে, 'যাক্‌গে। কী আর করা যাবে।'

নীতি একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ভাবছি আমি যদি পড়াই।'

পাশাপাশি বসা দুজন। তার দিকে চেয়ে অমল আশ্চর্য আনন্দে বললে, 'তুমি? এত ভাগ্য ওর হবে? কিন্তু তোমার সময় হবে সেই বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার। এই ভিড়ে যাওয়া আসা!'

নীতি জলের দিকে চেয়েছিল। ওর দিকে তাকায়নি। একটু চুপ করে থেকে বললে, যাওয়া আসা করতে হবে না।'

অমল আশ্চর্য। তারপর হেসে বললে, 'তার মানে? মজা করছ?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে নীতি বললে, 'মাকে বলেছি কাল, আমি শ্যামবাজারে গিয়ে থাকব এখন থেকে। এই মাসেই একটা ভালো দিন দেখতে। তুমি তোমার মাকে বলো ব্যবস্থা করতে।'

গঙ্গায় সন্ধ্যার অন্ধকার। অমল নীতির অত কাছে বসার মানে বুঝতে পারল এবার। সে তার একখানি হাত নিজের দু হাতে জড়িয়ে নিল।

কতক্ষণ গেল। কখন পায়ের কাছে কুলকুল করে জোয়ারের জল এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটের সিঁড়িতে ঢেউ দিতে লাগল। নীতির শাড়ির পাড় জুতো জলে ভিজে গেল।

পিতৃদায়

শান্তা দেবী

'পৌষ মাসের শীতের সকাল বেলাই স্নান করে এসে অলকার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। পরনের কালোপেড়ে শাড়িখানাই পাকিয়ে-পাকিয়ে গায়ের চারিধারে জড়িয়ে সে উত্তরে হাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে মনে করছিল। উঠোনের এক কোণে তখন সবে রোদ এসে পড়েছে। পোষা বিড়ালটা সেইখানে চোখ বুজে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে দেখে অলকার কী মনে হল জানি না, সেও গিয়ে সেইখানে তুলসী মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে একঢাল চুলের আগায় একটা গিঁট বেঁধে বিড়ালটাকে কোলে করে পা ছড়িয়ে দিল। পুষির মাথায় নরম হাতের থাবড়া দিতে-দিতে অলকা নিজেও সঙ্গে-সঙ্গে দুলছিল আর সেই-সঙ্গে তাব শাশুড়ির দেওয়া আঁচলের কোণের চাবিটা তার বুকের উপর ঝম্ ঝম্ করে তাল দিচ্ছিল।

বৈঠকখানা-ঘরের পিছনদিকের বারান্দা দিয়ে অন্দরের উঠোনে ঢুকে ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ বালাপোষখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে সদ্যস্নাতা কন্যার রাঙা মুখখানির দিকে তাকিয়ে যেন নিজেও খানিকটা সতেজ হয়ে উঠে বল্লেন, কিগো রানি, অলকমণি, সকালবেলা উঠে বুড়ো ছেলের খোঁজখবর না নিয়ে পুষি মেনিকে আদর দেওয়া হচ্ছে যে দেখছি।"

বাবার সামনে এমন ছেলেমানুষীটার ধরা পড়ে যাওয়াতে রাগান্বিত হয়ে অলকা পুষিকে এক ঠেলা দিয়ে দূর করে হেসে বলল, "না বাবা, আজ কীনা সইয়ের সঙ্গে ভোরবেলা দীঘিতে স্নান করতে গিয়েছিলাম, তাই তুলসীতলায় একটু রোদ পোয়াচ্ছি। সই বলেছিল--ভোর পাঁচটায় নাকি পৌষ মাস বড়ো দীঘির জলে কেউ স্নান করতে পারে না।"

বাবা মেয়ের রাঙামুখে ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাতখানা বুলিয়ে বলল, "তা বেশ মা, এখন তোমার খাতাপত্রগুলো একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দাও দেখি। আর কাউকে দিয়ে তো আমার এ কাজ হয় না।"

গৃহিণী রাজেশ্বরী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘড়া-কাঁকালে রাগান্বিত হয়ে বিরক্ত মুখে ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, "বলি হ্যাঁগা, সকাল বেলাই উঠে তো মেয়েকে নিয়ে খুব আদর সোহাগ হচ্ছে, এদিকে জলটি আনতে দোরের বার হতে-না হতে লোকে যে আমার হাড়-মাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। মেয়ে কী তোমার আজও কোলে করে আদর করবারই মতন আছে? বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে মেয়ের বয়স তের আর পার হয় না, বল্লে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তাদের কী আর মাথায় এক কড়ার বুদ্ধি নেই। বলে, পরের মেয়ের বয়সের হিসেব করতে আবাগীদের এক বেলারও ভুলও হয় না। এই বেলা খুঁজে-পেতে একটা দেবে তো দাও, নইলে আমায় এই সানে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। লেখাপড়া নিয়ে শ্যামলা মাথায় ধিঙ্গি হয়ে বেড়ালে, কী কথায়-কথায় ঝাঁকি দিয়ে নাক ঘুরিয়ে দাঁড়ালেই তো আর মেয়েমানুষের চলবে না।

কর্তা বল্লেন, "বড়ো মেয়ের বিয়েতেই তো হাতে মালা হবার জোগাড় হয়েছিল, এরি মধ্যে আবার পয়সা কোথায় পাব? শুধু হাতে খুঁজতে বেরলে তো আর বর মেলে না।"

গিন্নি বল্লেন, "সব তো বুঝি! কিন্তু তার বিয়ের সময় এ মেয়ে যে জন্মায় নি, এমন তো আর নয়। তবে তখন থেকে এইটি মনে ভেবে দেখিনি কেন যে গলায় আর এক বোঝা ঝুলছে, তাকেও একদিন পার না করলে লোকে ঘরে আর পাও দেবে না, মরণকালেও হাঁড়িমুদ্দফরাসে ছোঁবে না!"

অভিমানে গৃহিণীর চোখ ছলছল করে উঠল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। মা-বাবার কথায় অলকার প্রফুল্লমুখ অপমানের ঘায়ে যেন কালি হয়ে গেল। সেও ঘাড় হেঁট করে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু ত্রৈলোক্যনাথ। শীতের বাতাস যেখানে গাছের মাথায়-মাথায় নিঃশেষে উজাড় করে পাতার মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল, তাঁর শূন্যদৃষ্টি তখন সেইভাবে উদাসভাবে চেয়ে রইল। তিনি নিশ্চয় জানতেন, তাঁর এ আদরিণী মেয়েটির মুখ সহজে হেঁট হয় না। সে সব দুঃখকষ্ট হাসিমুখেই সইতে পারে, কেবল পারে না তার নারী-মহিমার অপমান সইতে। তাঁর দুঃখের সংসারে অলকার হাসিমুখের আলোক-ছটাই দারিদ্র্যের অন্ধকারকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। জমিদার-বাড়ির মেয়ের বিয়েতে শুধু কাচের চুড়ি আর লালপেড়ে শাড়ি পরে যেতে না লজ্জা বোধ করাতে যে মেয়ে দৃপ্তমুখে মাথা উঁচু করে তার নিরলঙ্কার দেহের সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়ে সতেজে গিয়ে পাল্কিতে উঠেছিল, আজ সেই মেঘের কালি-পারা মুখ দেখে বৃদ্ধের মনে কেবলি তার সেই সেদিনকার সগর্ব হাসিটুকু ফুটে উঠছিল। তিনি বুঝেছিলেন কত বড়ো কঠিন অপমানে সে আজ বিমুখ হয়েছে। তাই বৃদ্ধ পিতার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই সেই মুখ ভুলে অন্য কাজে লাগতে পারছিল না।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মান-অভিমানের পালা এ বাড়িতে চার-পাঁচ বছর ধরেই চলছে, কিন্তু মেয়ের সামনে বড়ো বেশি হয়নি। ত্রৈলোক্যনাথের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে এমন ঘরে হয়, যেখানে একদিনের জন্যেও তার মানের একচুল হানি না হয়। কিন্তু হাতে একটা কানাকড়িও না থাকাতে কল্পনাটা এতদিন ধরে তাঁর মনের ভিতরেই থেকে গিয়েছে। বড়ো মেয়ের বিয়েতে বড়ো ঠকেছেন, তাই এবার পণ করে বসে আছেন, কিছুতেই ঠক্‌বেন না। অথচ বিধাতা তাঁর পণকে নিঃশব্দে পরিবার করে মেয়ের বয়সটা আশ্চর্য-রকম বাড়িতে তুলেছেন। আজ মেয়ের সামনে এমন নির্লজ্জ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে তিনি সেটা পরিষ্কার দেখতে পেলেন। মনে হল—তাই তো আমার অলকমণি সে বড়ো হয়ে উঠেছে, আর তো তার কাছে কিছু লুকোনো যাবে না। অথচ তার জন্যে আমাদের অপমান সে কিছুতেই সইবে না। মেয়ে যে রকম আশ্চর্য জেদী, না জানি কী করে বসে! আজকাল যেরকম দিনকাল। সত্যিই, যেমন করে হোক আসচে মাঘ-ফাল্গুনের মধ্যে একটা কিছু করে ফেলতে হবে।

কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ত্রৈলোক্যনাথ শিউরে উঠলেন। বালাপোষখানা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ হাতের কাছের গাড়ু গামছা ফেলে রেখেই অন্য মনে আমতলার রাঙা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

॥ ২ ॥

অরুণকুমারের বন্ধুর বাড়ি সেই গ্রামে। বড়োদিনের ছুটিতে সে কলেজের বইখাতাগুলোকে একটু বিশ্রাম দিয়ে দু-চারদিনের জন্যে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শহরে ছাত্রমহলে তার বেশ নামডাক। ছাত্রসভায় যেদিন যুদ্ধে সে একপক্ষের মহারথী হয়ে দাঁড়ায় সেখান বাক্যজালের ঘনঘটায় অপরপক্ষের দৃষ্টি কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারে না। স্বপক্ষের দল মধ্যে অনেকে তার আড়াল থেকে মেঘনাদের মতো দুটোচারটে বড়ো অস্ত্র প্রয়োগ করে তর্ক শেষ হল কাঁপিয়ে কল কল

করতে করতে বিপক্ষদের শুকনো মুখের দিকে সগৌরবে দৃষ্টিপাত করে বড়ো রাস্তার উপরের কোনো পরিচিত দোকানে গিয়ে দ্বিতীয় আর একটা সভা জমকিয়ে বসে। এখন মুখের কাজ দুইভাবেই চলে। কথার অবকাশে যে সময় পাওয়া যায় টেবিলের উপর সাজানো গরম-গরম লুচিতা' তখনি পূর্ণ করে তোলে। অরুণের ভাষার, তাদের ভাবের ও সাহসের প্রশংসা বন্ধুরা যেখানে কথায় কথায় মত প্রকাশ করে উঠতে না পারে, সেখানে পরস্পরকে চাপড়িয়ে ও হাসির ফোয়ারা তুলেই সেটা সেরে নেয়, অরুণের বুক তখন দশহাত ফুলে ওঠে। সাময়িক এই আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করবার পক্ষে আর সকলে যখন পিছনে হাঁটে অরুণ তখন চট করে একবার পড়ে' সবার আগেই দস্তখতটা করে আসে। মাঝে মাঝে যুবক বন্ধুদের ভীরুতার জন্যে দুটোচারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেয় না তা নয়। এ ছাড়া অরুণের আর অন্য গুণও ছিল। সে আধুনিক সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব টাটকা রকমের অনেক খবর রাখত। তার মতো লোক খুঁজলে দুটোচারটেও মেলে কী না সন্দেহ। নিজে যে সে বড়ো কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল কী সামাজিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা করেছিল তা নয়; তবে সনাতন যুগে যে যেখানে যা কিছু নতুন কথা বলেছে সে সবের খবর রয়টারের তারের আগেই অরুণের কাছে এসে পৌঁছিত। তরুণ অরুণের মতোই আমাদের অরুণ প্রথমে তাঁর সংহতির নতুন খবরের আলোকে উদ্ভাসিত করতেন। তাব একটা বড়ো দুঃখ ছিল যে এতরকম বিষয়ের উপর টান থাকা সত্ত্বেও হাতে কলমে সে আজ অবধি কিছুই করে দেখাতে পারে নি। তার যা কিছু কীর্তি সবই কল্পনালোকের স্বপ্নপুরীতে হাওয়া খেয়ে নধর সুন্দর হয়ে উঠছে, বড়ো জোর মাঝে মাঝে মা সরস্বতীর কাঁধে ভর দিয়ে ছাত্রের মতো একবার চকিতের দেখা দিয়ে যায়; মর্ত্তলোকের কঠিন মাটির উপর সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোর সামনে আজও তারা কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। তাই শুধু 'থিওরির' মহাপুরুষ অরুণের মনে কেবলই বড়ো-রকম বেদনা অহর্নিশি খোঁচা দিয়ে তাকে চাঙা করে তুলেছে। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে প্রকৃত যশ পাওয়া তার পক্ষে শক্ত; কেননা তার দীপ্তিমান যৌবনের পক্ষে স্থির ধীর বৃদ্ধের মতো বসে দশ পাতা লেখা অসম্ভব, তা' যতই কেন না তার বিন্যাসের মধ্যে ভাবরসের প্রাচুর্য আর ভাষার বিন্যাস থাকুক। আব সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো গবেষণা করা তো আরোই কঠিন; কারণ বড়ো বড়ো পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত চুনোপুটি পর্যন্ত লোকের বই সে পড়েছে সবগুলোই বেশ জলের মতোই সে বুঝেছে এবং সভাসমিতিতে সেসব কথা অনেক উদ্‌গার করেছে, কিন্তু তার উপরে নতুন কিছু আর তো সে খুঁজে পায় না। সব কথাই তো তারা সেখানে বলে শেষ করে দিয়েছে। কাজেই করবার মধ্যে যদি থাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিম্বা সৎসাহসের কাজ। এটা বোধহয় সকলেই অনায়াসে বুঝবেন যে মনস্তত্ত্ব দেহতত্ত্ব যার ব্যাবসা, সে কী আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নবীন কলকজা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে? কাজেই সে স্থির করেছিল বিনাপণে দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ কিম্বা ওই জাতীয় কিছু একটা সোজাসুজি উপায়ে নিজের অসাধারণত্ব প্রকাশ করবে। এতে খুব বেশি বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য, কোনোটারই দরকার হবে না। ভগবান দয়া করিয়া তাকে যে পুরুষ জন্ম দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে বিজয়গৌরবও সেই আজন্ম-লব্ধ পৌরুষেই অনায়াসে লাভ করা যায়। অক্লেশে এই যে মহাকীর্ত্তি স্থাপন সে করবে বিশ্বের দরবারে দুন্দুভি বাজিয়ে কোনো হিতৈষী বন্ধু যদি সেটা তাকে নাই করে দেয় তবে সেটাও না হয় অরুণ স্বয়ং একটা ছদ্মনামে খবরের কাগজের পাতায়-পাতায় তুলে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বেচারা অরুণ সে যে এত বড়ো ত্যাগ-স্বীকারটা করবে তার বিনিময়ে সে কেবল খবরের কাগজের রূপরস-শব্দগন্ধ-স্পর্শহীন ফাঁকা বাহবাটুকুই পাবে? অন্তত জয়মালাটা রূপসী ষোড়শীর পদ্মহস্তে তার কণ্ঠে এসে যদি না পড়ে তবে তো সবই বৃথা। তার অন্তরের সৌন্দর্য-পিয়াসী তরুণ প্রাণটি এটুকু দাবি ছেড়ে দিতে পারছিল না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের জোরে সে তো মুখের একটা

কথা ফেল্লেই সোনায় রূপায় মোড়া একটি পত্নী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মোটামুটি খোরাকপোষাকটা পেয়ে যেতে পারে। এমনকী ও ছাপটুকু না থাকলেও কোন্ কম-সম দু-চার হাজার সে না পেত? তাই যখন সে মানসচক্ষে তার অদূর ভবিষ্যতের বিবাহবাসর কল্পনা করে তখন সেই তরুণী বধূর অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণ-আভরণ ঝিলিক দিয়ে না উঠলেও তার লজ্জারুণ মুখ আর ক্ষীণ দেহলতার অপূর্ব সুষমাতেই সভা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে ওই লোভটুকু গোপন রেখে দরিদ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার ইচ্ছায় তার এই বয়সেই অরুণ অন্তত বার দশেক কনে দেখতে গিয়েছে। কিন্তু বিধি এমনি বাম যে খোঁপায় জরি-মোড়া নোলক-নাকে বিবাহবাজারের এই সুলভ পণ্যগুলির মধ্যে সে আজও তার কল্পনালোকের মানসী বধূর একটুখানি আভাস পায় নি। এদের কারো মধ্যে যদি বা একটুখানি সহজ শ্রী উঁকি দিতে দেখা যায়, তাও প্রসাধনের কঠিন শাসনে আধমরা হয়ে আছে। অগত্যা অরুণকে হতাশ মনে কোনো একটা বাজে ছুতা দেখিয়ে দশ-দশবারই ফিরতে হয়েছে। বন্ধুমহলে ঠাট্টা তামাসার ধুয়া উঠলে সে মুখ উঁচু করে বলত, "আরে দূর, ওসব ফন্দিবাজের বাড়ি আবার বিয়ে করে, টাকার ঘড়া মাটিতে পুঁতে গরিব সাজবার চেষ্টা। আমি যার মেয়ে বিয়ে করব সে আমার মতো সোজাসুজি নির্ভীক হবে, তবে না। আর মেয়েটাও নেহাৎ অমন ছিঁচকাঁদুনে ধাঁচের হলে আমার জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এমনি করে অরুণের খ্যাতিলাভের দিনটা ক্রমেই ভবিষ্যতের ছায়ালোকে মিলিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় নিতান্ত নিরাশ হয়ে সে একদিন বন্ধুমহলের আদর-অভ্যর্থনা ঠাট্টাতামাসা এবং শহরের নানা উত্তেজনা ছেড়ে তার অমন অবসরহীন জীবনেও একটা ছোটোখাটো অবসর নিয়ে পাড়াগাঁয়ের শান্তশ্রীতে মনটা একটু জড়িয়ে নিতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বিধি যে কার উপর কখন কেমনভাবে সদয় হয়ে ওঠেন তা তো বলা যায় না।

॥ ৩ ॥

বাঙালি পাড়ায় হঠাৎ একটি পাত্রনামক জীবন যদি নতুন দেখা দেন তা হলে পাড়ার এ-মোড় থেকে ও-মোড়ের মধ্যে তার খবর প্রচার হতে দু-দশ মিনিটই বোধহয় যথেষ্ট হয়। বিশেষত তিনি যদি যোগ্যপাত্র হন তবে তো কথাই নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ সংসারে চেনেন শুধু নিজের বইগুলি আর অলকমণি। গিন্নি যে কখন কীসের জন্য তাঁর উপর খড়্গহস্ত হন আর কেনই বা অকস্মাৎ হাসিমুখে পুরাতন প্রেম জাগিয়ে তুলে সেকালের মতো মান-অভিমানের পালা শুরু করেন তা বুঝে ওঠা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর। তাই তিনি সরস্বতীর সেবা করে আর অলকার সেবা পেয়ে তৃপ্ত হৃদয়ে ঘরেই দিন কাটান। কেবল মাঝে মাঝে গৃহিণী যখন কথার ঘায়ে চেতনা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে অলকার সত্যিকারের বয়স অনেক বছর আগেই তেরোর কোঠা পার হয়ে গেছে তখন ভদ্রলোককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বিশুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। দিনকতক অনেক খোঁজাখুঁজি করে যাকে পাওয়া যায় কন্যা তাকেই দেখানো হয় বটে এবং তাঁদের মেয়ে পছন্দও হয় কিন্তু মেয়ের বাপের শীর্ণদেহ আর শূন্যমুষ্টিটা কোনোমতেই তাঁরা বরদাস্ত করে যেতে পারেন না। অগত্যা ঘরের মেয়ে ঘরে রেখে তাঁদের বিদায় করে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আবার ঘরের মধ্যে অচল আসন গ্রহণ করেন।

তাই সেদিন শীতের সকালে ম্লান মুখে আমতলার পথ দিয়ে যেতে যেতে ভট্চায্যি মশায়ের মুখে নবাগত পাত্রটির রূপগুণ বর্ণনা শুনে ত্রৈলোক্যনাথ যখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "কোন্ ছেলেটি হে?" তখন দীর্ঘ শিখা দুলিয়ে ভট্টাচার্য বল্লেন, "রামঃ! মেয়ের বাপ হয়েছে কী করতে?

পা বাড়ালেই যে হরিষখুড়োর বাড়ি এসে পড়ে; সেখানে আজ তিন দিন ধরে অমন সাগর ছেঁচা মাণিকের মতো ছেলেটা এসে রয়েছে আর তুমি কোন্ মুলুকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে হে? আবার শুনছি নাকি ছেলেটা সভাসমিতি করে লেখাপড়া করে দিয়েছে যে বিয়েতে টাকা নেবে না। এই বেলা গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে পায়ে ধরে পড়, এ যাত্রা উদ্ধার হয়ে যাবে, মেয়েও সৎপাত্রে পড়বে।"

ত্রৈলোক্যনাথ গলায় কাপড় দিয়েছিলেন কী না বলা যায় না, তবে অরুণ এই নিয়ে একাদশ বার দেখতে বেরিয়ে পড়ল। ত্রৈলোক্যনাথ এবার সত্যি বুঝেছিলেন যে প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে মেয়ের বয়স বাড়তে থাকবে এবং তাই নিয়ে তার সামনেই নিত্যনতুন সব অভিনয় হবে, কাজেই তিনি আদরিণী অলকমণির মান রক্ষার জন্য আজই কন্যা দেখাবার প্রস্তাব করে বসেছিলেন। অপরিচিত বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে অরুণও বিশেষ কিছু আওয়াজ করলে না; সেও বোধহয় ভেবেছিল অজানা মুহূর্তে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখা যাক না। রোমান্টিক রকম কিছু একটা ঘটে যেতেও পাবে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় মেয়ে দেখানো হবে। মেয়ের মা খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন উথলে উঠল, যদি টাকা থাকত তবে বিয়েতে মেয়েকে জমিদারের মেয়ে বিধুর মতো হালফ্যাশানের পুষ্পহার, হাতে আটগাছা বসন্তবাহার চুনি গড়িয়ে দিতেন; তা কপালে তো আর অত সুখ লেখা নেই, যাব দুগাছা আঙ্গুরদানার ফারফোর ফাঁপা বালা গড়িয়ে দিলেই হবে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহিণী বাইরের ঘরের কুলুঙ্গির ছেঁড়া মলাটের আবর্জনাগুলো একটানে বিদায় করে দিয়ে, কর্তার তক্ত পোষের ছেঁড়া তোষকখানার উপর নিজের গায়ের পুরোনো শালখানা ঢাকা দিয়ে, ঘরখানাকে একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টায় লেগে গেলেন। ঘরদোর গোছানো খাবার করা হতে না হতে অরুণ এসে উপস্থিত।

মা ডাকলেন, "আয় মা অলক, তোর চুল ক'গাছা বেঁধে দি। সন্ধে হয়ে এল গা ধুয়ে নীলাম্বরী কাপড় পরে আয়।"

মা জানতেন, কেউ দেখতে এসেছে বল্লে মেয়ে কখনই সাজসজ্জা করতে রাজি হবে না, তাই সত্যিকারের খবরটা মেয়ের জানা থাকলেও — এইটুকুর বলেই তার প্রসাধন দিতে হয়। আজ কিন্তু অলকা বলে বসল, — যে খুব হবে এখন চুল বাঁধতে ভালো লাগছে না। আমার মাথা ধরেছে।

মা মনে মনে ভাবলেন—থাক্, আমার মায়ের অমনি রূপ পক্ষীরাজ ঘোড়ায় যাবে। তবে কলাল ঢেকে চুলটা বেঁধে দিলে মস্ত কপালটা আর — নাকটা একটু কম দেখাত। যাক. ভাগ্যে থাকে ত এইতেই হবে। টাকার থাকলে কী আর কিছু ভাবতাম। মেয়ে এতদিনে তবে রাজরানি হয়ে মোতির মালা গলায় দিয়ে সোনার খাটে পা ঝুলিয়ে দিন কাটাত।

বৈঠকখানা ঘর থেকে ডাক এল, "মা অলক, পান নিয়ে আয় দেখি মা।"

ঘরের ভিতরে অরুণ তখন সুখস্বপ্নে বিভোর। একটি সুন্দর উজ্জ্বল মসৃণ মুখ আর একজোড়া ডাগর সলজ্জ হাসি আবছাযাভাবে কেবলি তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছে। মেয়েটি এক হাতে নীলাম্বরীর একটুখানি কোণ মুখের কাছে টেনে ধরে ঘাড় হেঁট করে আর এক হাতে পানের ডিবেটা তার কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রণয় কাব্যের গোপন পুলকের স্পর্শেও প্রথম দর্শনের লজ্জার মধুর মিশ্রণে তার তরুণ কোমল মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে, মাধুরী যেন ফেটে পড়তে চায়। পায়ের মলের মৃদু শব্দ সেই রূপমাধুরীর সঙ্গে একটুখানি মোহন সুরের আমেজ বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অরুণের এই স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে অলকা এসে দাঁড়াল। অলঙ্কারের নুপুর নিক্বণ কী মাথাঘসার স্নিগ্ধ গন্ধ তার আগমনী ঘোষণা করেনি। দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের

মতো সে হঠাৎ উদয় হয়ে স্বপ্নবিভোর অরুণকে সচকিত করে তুললে। অরুণের দিকে পাশ ফিরে পানের ডিবেটা তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে সে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াল যেন শুধু ডিবেটা দেবার জন্যই তাকে নেহাৎ একবার এসে পড়তে হয়েছে। ঘরে যে আর একজন নবাগত তৃতীয় প্রাণী রয়েছে সেটা অলকার চোখে পড়েও যেন পড়েনি। এই প্রাণীটির আগমনের সঙ্গে যে বিশেষ করে তারই একটা সম্পর্ক আছে —?— করে তার মনে তরুণ স্বভাবসুলভ যে লজ্জা আসন বিস্তার করবার চেষ্টা করছিল, তার এই স্পর্দ্ধায় অলকা আরও লজ্জিত হয়ে উঠছিল। এই দরিদ্রের মেয়েটির গৌরব কী অহঙ্কার করবার কোনো কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু তার তেজস্বী মনটি পরাভবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারত না। এমনকী লোকের চোখের কুতূহলী দৃষ্টি যে তার বাহিরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের দৈন্য কী দুঃখের দিকে একটু কটাক্ষ করবে তাও তার অসহ্য ছিল। তাই সে নিজের স্বাভাবিক লজ্জাতেও লজ্জিত হয়ে শক্ত সারথির মতো উচ্ছ্বসিত লজ্জার রাশ টেনে ধরে রেখেছিল। জোর করেই সে মাথাটা খাড়া হয় রেখে সশব্দে চাবির গোছা পিঠের উপর ফেলে ঘর থেকে বাহিরে যাবার শূন্যমুষ্টিটাতেই ত্রৈলোক্যনাথ বল্লেন, "অলকা, অরুণবাবুকেও না হয় তুমিই মেয়ে ঘরে রেখে —?—

অচল আসন ভঙ্গিমায় ঘাড় ফিরিয়ে অরুণের হাতের কাছে পানের ডিবেটা

- ? - তাই সেল। প্রসাদদাত্রী দেবীর মতো সে অকম্পিত হস্তে অরুণের হাতের ভট্‌চাযিদেরই পানের ডিবেটা তুলে দিলে; কৃপাভিক্ষুর মতো, দেবীর করস্পর্শে, অরুণেরই হাত কেঁপে উঠল। কৃপাভিখারিণী হলেও অলকা যে মহিমাময়ীর মতো অরুণের এত ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাতে অরুণের মনটা আপনি যেন কেমন নত হয়ে পড়ল। অগ্নিবরণা অলকার নিরাভরণ হাতের লাল কাঁচের চুড়ি দুটিই আজ তার চোখে পদ্মরাগ মণির মতো জ্বলে উঠল। মনে মনে এতদিন সে যে কুসুমকোমলা আনতমুখী কিশোরীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের আশার পথ চেয়েছিল,—অলকার প্রশস্ত কপাল, খাঁড়ার মতো নাক, আর আগুনের মতো জ্বলজ্বলে রং তার কাছে দিয়েও ঘেসে না। অরুণের প্রতি অনুরাগ কী বিরাগ, বিবাহকল্পনায় লজ্জা কী ভয়ের লেশ—সে মুখে কোথাও একটু ছায়া ফেলতে পারেনি। আগুন যেমন বিশ্বগ্রাস করেও সেই এক রক্ত মূর্তিতে বিরাজ করে, কোনো পরিবর্তনের দাগও তার গায়ে পড়ে না। তেমনি এই মেয়েটির মনে সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় আনন্দ কী নিরানন্দ যারই স্রোত বয়ে থাকুক না কেন বাইরে তার কোনো প্রকাশই হয়নি। কিন্তু কেন জানি না এই মেয়েটিই আজকার মতো অকস্মাৎ অরুণের হৃদয় জুড়ে বসল। তার কল্পনার কিশোরীর রূপ কোথায় মিলিয়ে গেল; একটি আঙুলও না হেলিয়ে রাজলক্ষ্মীর মতো এই তরুণী সে সিংহাসন আলো করে আপনার দখল জানিয়ে দিলে।

অরুণের ভাবুক মন ভেবে কোনো কাজ কখনও করে না। ভাবের প্রবাহ যখন তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে মহানন্দে সে তখন সেইদিকেই ভেসে চলে যায়। নিজের মনকে সে কখনও কোনো কাজে বিশেষ বাধা দেয়নি। এই অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র গৃহস্থের বয়স্থা কুমারীটি যেই তার মনে একটা তরঙ্গ তুলে দিয়ে সগর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, অমনি সে বলে উঠল, "তবে আর কী! আমার তো কোনো আপত্তির কারণ দেখছি না, আপনি যা মনে করবেন তাই হবে।" তখনও অলকার আঁচলের কোণটা দরজার আড়ালে মিলিয়ে যায়নি, এরই মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। খবরটা বোধহয় সে শুনেই গিয়েছিল।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অরুণের মনে গর্বও কম হয়নি। সে শুনেছিল,—অলকা আজ যে লাল কাঁচের চুড়ি আর কালাপেড়ে শাড়ি পরে দেখা দিতে এসেছিল, বধূবেশে তার সজ্জা এর চেয়ে বড়ো বেশি হবে না। বড়োজোর শাড়িখানার রং লাল হবে এবং যে সোনারূপাটুকু না হলে মেয়ের বিবাহ হয় না, সেইটুকুর স্পর্শ তার অঙ্গে থাকবে। সভায় বরাভরণ কী দানসামগ্রীর ঘটাও যে খুব হবে এমন কথা এই জীর্ণ কুটিরখানির অধিবাসীদের দেখে মনে করা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় বহা

কল্পনার রথে চড়ে এলেও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অরুণ ভাবছিল—এতদিনে আমি একটা কীর্ত্তি স্থাপন করতে চল্লাম। দরিদ্রের অরক্ষণীয়া কন্যাটিকে এক কথায় উদ্ধার করে দিচ্ছি, একী কম কথা! ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে ভগবান যে এদের হাতে এককণা সোনাও দেননি, সে আমার পরম ভাগ্য। কারণ, আমি না চাইলেও, যার আছে সে তার মেয়েকে শূন্যহাতে পরের বাড়ি পাঠাত না। কিন্তু কন্যার হাত যত পূর্ণ হয়ে উঠত, আমার যশের জয়ধ্বজা সোনার ভারে ততই ধূলায় লুটিয়ে পড়ত। আজ সে বাধাহীন আনন্দে আকাশে মাথা তুলে উড়তে পারবে।

অলকার অতলস্পর্শ মনের মধ্যে সেদিন বেশ তোলা-পাড়া লেগে গিয়েছিল। বিবাহ যে শুধুই সানাই বাঁশি শাঁখ আর ফুলের মালার মেলা নয়, শ্বশুরবাড়ি যে নিছক কাঁদাবার একটা কল নয়, একথা বোঝবার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নবযৌবনের বাসন্তী রঙে দেহ তার কল্পনা উজ্জ্বল। বালিকার পিতৃগৃহমুখী মন শুধু আর তার নয় বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে পরগৃহের সব দায়িত্ব ভাবনা ও বিভীষিকাও তার মনে প্রবেশ করেনি। মানুষ যে বহুরূপী, তার মন যে নদীর জলের স্রোতের মতো কত বাঁকে বাঁকে ঘুরে চলে সেসব কথা আজও অলকার অজানা। আজ মুহূর্তের জন্যে যে মানুষটিকে সে দেখেছিল, যার কথা সে আড়াল থেকে একটিবার মাত্র শুনেছিল, তাঁর সহৃদয়তায় অলকার মন তখন পরিপূর্ণ। অলকার মনে হচ্ছিল, এই মানুষটি যেন তার আজন্মপরিচিত, তার রূপ গুণের যেন তুলনা হয় না। এইটুকুতেই যে মানুষের সমস্ত পরিচয় হয়ে যায় না সে কথা অলকা আজ ভুলে গিয়েছিল; যাকে আজ সে বরণ করতে দাঁড়িয়েছে, তার রূপও যে অলকারই মনের রঙে রাঙা তাও সে আজ বোঝেনি।

অরুণের প্রতি অলকার মন সম্ভ্রমে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হলেও সেই সঙ্গে তার মধ্যে একটা গোপন ব্যথা তাকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল। যার কাছে আজ সে একবার মাথাও নোয়ায়নি, এমনকী পাছে কোনো মনের কথা ধরা পড়ে এই ভয়ে যার দিকে সে ভালো করে একবার তাকায়ওনি, সেই নিতান্ত পরের কাছেই হয়ত পিতা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে করুণা ভিক্ষা চেয়েছেন। হয়ত সেই কাতর ভিক্ষার বলেই আজ তার এ সৌভাগ্য। ছি, ছি, ছি! লজ্জায় অলকার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল, অপমানে দুঃখে ক্ষোভে তার রাঙা মুখ ফেটে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তার পিতা কন্যার বিবাহ ক্রয় করবার উপযুক্ত মূল্য দিতে অক্ষম। এই কথা আজ আনন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাকে বলে যাচ্ছিল,—অরুণের গৃহে তোমার অধিকার নেই। অরুণ মহৎ বটে, কিন্তু তোমার দেনা পরিশোধ না করে কোন্ মুখে তুমি সে মহত্তের গলায় চিরপ্রেমের মালা দেবে? শুধু প্রেমে হবে না, মূল্য চাই যে।

অলকা দরিদ্রের মেয়ে বলেই বোধহয় আজ পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে কারও ভালোবাসার উপহারও গ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে হত করুণা যেন ভালোবাসার ওড়না তার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছে। এমন কী যে সে আজন্ম প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে এসেছে সেই সই তার সই পাতানোর উপলক্ষ্য করে তাকে আঁচলাদার হয়ে কাপড় দিয়েছিল, সেবার ভাবনায় তিনদিন তার ঘুম হয়নি। কেবলি মনে হত বিজয়ার সময় সই বোধহয় তার পুরোনো ঢাকাই পাড় বসানো ঝিনুকের শাড়ির ছলটা ধরে ফেলেছে, তাই এই দয়া! নিজের হাতে শিউলি ফুলের রং করে সেই কাপড়খানারই একটু চেহারা ফিরিয়ে সইকে ফেরত দিয়ে তবে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। দেবার সময় বলেছিল. "সই এ কাপড়খানা প্রায় তোমারই খানারই মতন, কেবল সুন্দর দেখাবে বলে আমি যা একটু রং করে দিয়েছি।"

॥ ৪ ॥

ত্রৈলোক্যনাথের অলকমণির বিবাহ। মায়ের এত সাধের পুষ্পহার কী বসন্তবাহার চুড়ি কিছুই গড়ানো হল না। এমন কী চিড়িতন চুড়ি কী আঙুরপাতা বালাও জুটল না। জমিদার-কন্যা বিধুর

সভা-উজ্জ্বল-করা গহনার বাহার আজ তাঁকে কেবলি উন্মনা করে তুলছিল। ওই মেয়ের গায়ে অত হিরে মোতির ছটা, আর আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মতো মেয়ের গায়ে কিনা সোনার আঁচড়টুকুও পড়ল না। অলকার গহনা হল—আটগাছা ডায়মণ্ড কাটা রূপোর মল, আর একজোড়া হাল্কা-রকম ইহুদি মাকড়ি। হাতে চারগাছা দিল্লি দরবার কাঁচের চুড়ির সঙ্গে এক জোড়া শাঁখা পরিয়েই কনের অলঙ্কার শেষ হয়ে গেল। কোথায় রইল মোতির মালা, কোথায়ই বা হিরার মালা। শুনিয়েছিলেন অরুণের বাবা খুব মস্ত বড়োলোক, লাখপতি বল্লেই হয়। অরুণ এখন সেখানে খবর দিতে কিছুতেই রাজি হল না। একেবারে জয়শ্রী ও জয়মাল্য সঙ্গে করে বিজয়গৌরবে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সকলকে এমন একটা চমক দেবে যা আর কেউ কখনও দেয়নি। আগে থেকে এমন কীর্তিটা সে ফাঁস করতে চায় না। তাই আজ একমাস হল সেখানে সে বিশেষ কোনো খবর দেয় না। কেবল মাসের গোড়ায় একবার জানিয়ে রেখেছিল যে সে কিছুদিনের মতো দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

হাতে টাকা নেই, কাজেই অরুণ নিজেও কিছু দিতে পারেনি। তবে শাশুড়ি জামাই দুজনেরই আশা ছিল অমন রূপের বউ পেলে শ্বশুর কোন্ পাঁচ দশ হাজার টাকার গয়না না দেবেন।

ছোটো উঠোনে জন পঞ্চাশ ষাট লোকের মাঝখানে গোটা দশেক আলো জ্বেলে কোনো রকমে অলকার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েরা সানাই বসাতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু টাকা কে দেবে? তাই ঘন ঘন উলু দিয়ে আর জোড়া শাঁখ বাজিয়েই সে সাধটুকু মেটাতে হল।

অরুণের মনটা আজ কেমন যেন একটু খুঁৎখুঁৎ করছিল। শীতের সন্ধ্যায় একে দেশটাই কেমন ম্লান, গাছপালাগুলো নিঃঝুম, বেড়াল কুকুরগুলো জড়োসড়ো হয়ে কোণে কোণে পড়ে আছে, মানুষের চেহারাও এখন কেমন যেন ফাটা চটা। তার উপর আলো সানাই লোকলস্কর কিছুরই সমারোহ নেই, বিয়ে বলে মনে হয় কী করে? বড়োলোকের ছেলে কল্পনায় দরিদ্রের বিবাহটা যেমন করে এঁকেছিল, দেখলে বাস্তব তার চেয়ে ঢের বেশি ম্লান বিষণ্ণ। সে ভাবত কনের গায়ে গয়না না থাকলেও পুষ্প-আবরণের অভাব হবে না। সানাই না বাজলেও বাসর আলোয় উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে থাকবে। গালিচা না থাকলেও পদ্মহস্তের নিপুণ আলপনায় স্নিগ্ধ দেখাবে। কিন্তু গরিবের বাড়ি অত করে কে? কোনো রকমে একটু পিঁড়ির উপর আলপনা দিয়ে আবার তখনি অন্য কাজে ছুটতে হচ্ছে। সব দিক থেকে দারিদ্র্য আজ ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়।

অরুণ আজ নিজেও তাই একটু ম্লান মুখেই বিবাহ সভায় এসেছিল। শুভদৃষ্টি মাল্যদান সব হয়ে গেল; অরুণের মন খুব যে খুশি হয়ে উঠল তা মনে হল না।

কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবসানে যখন অলকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল, তখন তার চোখের সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরুণের মন আবার যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আজ প্রায় একমাস হল অরুণের সঙ্গে অলকার বিয়ের কথা হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের ঘাটে পথে নির্জনে দেখাও হয়েছে, কিন্তু অলকা একদিনও ত তার দিকে ভালো করে চায়নি, কথা বলা তো দূরে থাক। যদি বা কখনও চেয়েছে তাও নেহাৎ পথের পথিককে চেয়ে দেখার মতো। আজ প্রথম তাকে নিতান্ত আপনার জেনে সে তার কৃতজ্ঞতার উৎস চোখের দৃষ্টিতে ভরে এনেছিল। অন্যের সামনে তার সে অসীম কৃতজ্ঞতা সে জানাতে চায় নি। শুভদৃষ্টির দৃষ্টি তার একেবারেই নিরর্থক শূন্যদৃষ্টি। দরিদ্রর প্রেম কী কৃতজ্ঞতা সভার সামনে কেন সে স্বীকার করবে? উদাসিনী তেজস্বিনী অলকা তাই আজ একমাস পরে আপনার জেনে নিজের অনধিকারের দাবির কথা ভুলে গিয়ে কল্যাণী বধূর বেশে স্বামীর পায়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিয়ে এসেছে। অরুণের বিমুখ মন তাই দেখে ক্রমে প্রসন্ন হয়ে এল।

দিন সাতেক শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে অরুণ মহা ফাঁপরে পড়ল—কী করে হঠাৎ বউ নিয়ে বাড়ি গিয়ে হাজির হবে? অথচ এখন না গেলেও নয়, বিয়ে যখন করেছে তখন নিয়ে একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যে বেচারা এত কাল কেবল কথার ব্যাবসা করে কথায় কথায় বিশ্বসংসার ছেয়ে বেড়িয়েছে, সত্যি কাজ করবার শক্তি তার বড়ো বেশি বাকি ছিল না, এমনকী একটা উপায় ভেবে বের করবার মতো মস্তিষ্কের জোরও তার ছিল কী না সন্দেহ। তার মনে হচ্ছিল,—এই সাতটা দিন যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে, তেমনি নিশ্চিন্তে নিছক আনন্দসুধায় জীবনটা যদি ভরে থাকত, যদি কোনো ভাবনা কোনো চিন্তা না থাকত, তবে সে তার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন যশোগীতির বাসনাও তুচ্ছ বলে ভাসিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু সে তো হবার নয়। এ বিশ্বে নিরালায় লুকিয়ে আনন্দ সম্ভোগ করবার জায়গা কোথাও মিলবে না।

অলকার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ছেড়ে, ওই পাষাণপ্রতিমার অন্তরের সুধা-নির্ঝরে শুধু ক্ষণিকের মতো স্নান করে' তাকে উপায়ের সন্ধানে একদিন কলকাতা যাত্রা করতে হল। যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করে গেল—অলকাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখবে।

সত্যিই প্রতিদিন সকাল বেলা স্নান আহারের পর অলকার নামে একখানা করে চিঠি আসত। যেমন তার এত স্থির জানা ছিল যে একদিনও বোধহয় ডাকহরকরাকে ডেকে চিঠি দিতে হয়নি। কোনো না কোনো কাজের ছলে অলকা ঠিক সেই সময়টা বাইরের ঘরে হাজির হত। তার দুর্ভাগ্যের যতই কিছু নিদর্শন ছিল সে এত দিন ধরে লোকের চোখের আড়াল করে রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে; কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনেও,—কোনো মানুষ যে তাকে অতখানি ভালোবাসে সে সৌভাগ্যের কথা সে লোককে জানতে দিতে চায় না। রোজ যে তার চিঠি আসে এবং তার জন্য সে এত ব্যগ্র একথা তার বাড়ির লোকেও জানত কী না জানিনা। এমন কী যে পিয়ন নিত্য সেই আনন্দের বার্তা বহন করে আনত, সেও বোধহয় অলকার প্রাত্যাহিক উপস্থিতিটা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করত।

অলকার আনন্দখানি ওই চিঠিখানি সারাদিন সে নীরবভাবে তার বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাকত। অনেকসময় যখন পাড়াসুদ্ধ ঘুমের কোলে ক্লান্ত শরীর আনন্দে বইতে দিত, যখন তাদের মেটে ঘরে পাশের খাটে তার পিসির কোলের ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে লেপের তলায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন, তখন প্রদীপের ওই অতটুকু আলোকের স্পর্শে সেই ঘুমন্ত চিঠিখানি শতকণ্ঠে তাহার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথা নিয়ে জেগে উঠত। ঘুমোবার আগে রোজ অলকা ওই সুখস্পর্শটুকু নিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ত।

এমনি শান্তভাবে বুকের মধ্যে কোমল সুখের অনুভূতি নিয়ে যখন অলকার দিন কাটছিল, তখন একদিন হাজার দুই টাকার নানা অলঙ্কার সঙ্গে করে হাসিমুখে অরুণ এসে হাজির। বাবার একজন পুরাতন বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে সে তার প্রেয়সীর জন্য বহু আভরণ সংগ্রহ করে এনেছে।

আর দেরি করা চলবে না। কালই অলকাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। সারাদিন বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে-কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে একরকম অনাহারে দিন কাটিয়ে পরদিন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের জন্য ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা চিন্তা না করে ম্লান মুখে অলকা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। কন্যার বিদায়ের চিরন্তন ব্যথা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আপনার ঘরের কোণে নীরবে বসে রইলেন। সরস্বতীর সহস্র রূপও আজ ম্লান সেই অশ্রুধৌত মুখের শোভা ভোলাতে পারলে না। শুধু ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছিলেন, আর ভাবছিলেন আমিও একদিন এমনি করে মাকে কাঁদিয়ে এসেছি।

অলকার শ্বশুর মস্ত বড়োলোক। দুতিন পুরুষের সঞ্চিত ধনের উপর তিনি নিজে যা রোজগার করেছেন, তাতে এক পয়সাও না উপার্জন করে আরও চারপাঁচ পুরুষ পরম নিশ্চিন্তে আরামে খেতে পরতে পারে।

অনেককালের বনিয়াদী ঘর বলে সে বাড়ির আদব-কায়দাও একটু উঁচু রকমের। মেয়েমহল আর পুরুষমহল সেখানে কোনোদিনও কাছাকাছি হয়েছে বলে বাইরের লোকে টের পায় না। যে মায়ের কোলে জন্মেছে, সেই মাকে দশবারো বছর যেতে-না-যেতেই ছেলেরা মধুপান বলে, হাজার ঠাট্টার সম্পর্ক হলেও বয়সে ছোটো বলে ভাজকে দেওররা কোনোদিন হেসে দুটো কথা বলে না। মেয়েদের বাইরের সম্মান সে বাড়িতে খুব বেশি। কাদের সঙ্গে কী বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঁধা আইনকানুন আছে বল্লেই চলে। চৌধুরী বাড়ির কোনো মেয়ে বউ কখনও পুরুষের বকুনি খেয়েছে বলে প্রায় শোনা যায় না।

তা ছাড়া এ বাড়ির কুটুম্বিতাও প্রায় গোনা গাঁথা কয়েকটা বাড়ির সঙ্গে ছাড়া হতে দেখা যায় না। বুনো, জংলী অসভ্য লোকেদের উপর এদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তাই অচেনা অজানা মানুষকে চৌধুরীদের বড়ো তাচ্ছিল্য।

ঘণ্টা চারেক আগে একখানা টেলিগ্রামে খবর দিয়ে এহেন বাড়িতে বউ নিয়ে অরুণ যখন এসে উঠল, তখন বাইরে প্রশান্ত মূর্তি হলেও ভিতরে ভিতরে বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের মনে যেন আগুন জ্বলছিল। চৌধুরী-পরিবারের এমন অপমান আজ পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। অরুণ এই বাড়িরই ছেলে, বাইরের নানা আন্দোলনের স্রোতে সে কথাটা ভুলে গেলেও বাড়িতে পা দিলেই এ বাড়ির সমস্ত বিধান তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ বাড়ির চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে তার এক বিন্দুও গোলমাল হয়নি। অপমানের প্রচ্ছন্ন আগুনই যে তাদের মধ্যে জ্বলছিল, তা নয়, আর একটা কীসের আভাসও যেন তাদের মুখের চেহারায় পাওয়া যাচ্ছিল। অরুণ ভেবে পাচ্ছিল না, বাড়িতে এমন কী দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে সমস্ত বাড়ির উপরেই একটা ঘন অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। কাউকে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতেও তার সাহস হচ্ছিল না, কারণ এতদিন পরে বাড়ি ফিরে আসার পরও কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা কয়নি। দরোয়ান-চাকরেরা নিঃশব্দে গাড়ির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল। একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আর একটি দাসী এসে বউকেও ঘরে নিয়ে গেল, তবে তার মধ্যে কোনো আদর-অভ্যর্থনার চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু অরুণকে কেউ ঘরে ঢুকতেও বল্লে না।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অরুণ দেখলে, তিনি শয্যাশায়ী। আজ একমাস হল সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা পক্ষাঘাতে অচল হয়ে আছে। তবে জ্ঞান বেশ টনটনে, কথা বলবার শক্তিও ভালো রকম। বাবাকে প্রণাম করে অরুণ জানতে পারলে, যাঁর কাছে সে দুই হাজার টাকা ধার করেছিল সেই বন্ধুই তাঁর রোগের চিকিৎসক। অরুণের ধারের কথাটা তবে জানা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিতার রোগশয্যার কথা সে ইতিপূর্বে ঘুণাক্ষরেও জানতে পায়নি। অরুণ বলবার কোনো কথা না পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

আজ অরুণের অবস্থা যেন দুকুলহারা। খবরের কাগজে তার সুকীর্ত্তির খবর দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাবার সাহস কিম্বা ইচ্ছা আজ তার আর বিশেষ নেই। বাড়ির লোকের চোখে তো সেটা দুষ্কীর্তি বলেই ঠেকেছে, তার উপর কঠিন পীড়াগ্রস্ত পিতার এত দিন খোঁজখবর নেয়নি বলে লজ্জায় তার মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল। কলেজের ছেলেদের সামনে তার যে বক্তৃতার স্রোত বিনা বাধায় হু হু করে বয়ে যেত, যে তর্কযুক্তির জালে অপর পক্ষকে সে আধমরা করে ফেলত, সেসব আজ এমন নিঃশেষে কোনো অতলে যে ডুব দিয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের কাজটাকে যতখানি সমর্থন করা

নিতান্তই, সেটুকুও আজ সে পেরে উঠছে না। তা ছাড়া সমর্থন করবেই বা কার কাছে? কেউ তো তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেনি।

অলকা সারাদিন নিরানন্দ বাড়ির এক কোণে দুই একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে একটু আধটু ভাব করে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় মনটাকে একটু খুশি করবার জন্যে এবং অরুণকেও একটু আনন্দ দেবার জন্যে তার নতুন অলঙ্কারগুলি পরে, ভালো করে এলো খোঁপা বেঁধে ছোটো একটি সিঁদুরের টিপ কেটে একখানা সোনালিরঙের শাড়ি পরে নিজের ঘরে যাবার উদ্যোগ করেছিল। তার সাজসজ্জাটা বাড়ির ছোটো মেয়েরাই বিশেষ উৎসাহে করে দিয়েছিল। কারণ তারা জানত বাড়িতে নতুন বউ এলে সারাদিন তাকে ঘিরে আনন্দ করতে হয়; বধূবিশেষকে নিয়ে যে করতে নেই, এ বুদ্ধিটা তাদের মাথায় ঢোকেনি, এবং তাদের এ বিষয়ে কেউ কোনো উপদেশও দিয়ে যায়নি। ছোটো একটি ভাসুরঝির হাত ধরে সলজ্জ হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে এ বাড়িতে তার একমাত্র আপনার অরুণের ঘরে গিয়ে যখন সে উঠল, তখন রাত প্রায় দশটা। মেয়েটি তাকে রেখে চলে যেতে অলকা দেখলে অরুণ টেবিলের পাশে কী একখানা কাগজ নিয়ে মহা চিন্তাকুল হয়ে বসে আছে।

সেখানা অরুণের পিতা চৌধুরী মহাশয়ের জবানী পত্র। পত্রে তিনি অরুণকে জানিয়েছেন যে যখন তাঁর মত না নিয়েই অরুণ তার জীবনের এত বড়ো একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে তখন বুঝতে হবে যে সে এখন সব বিষয়ে উপযুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর অনুরোধ যে পিতার কাছে পাবার আশায় যে ঋণটা সে করেছে, সেটা যতদিন না নিজে শোধ করে ততদিন যেন সে এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে এবং কোনো কাজে তাঁর পরামর্শ নেওয়া যখন সে দরকার মনে করেনি, তখন গলগ্রহের মতো পিতার উপার্জিত অন্ন ধ্বংস করতেও বোধহয় সে লজ্জা বোধহয় সে লজ্জা বোধ করবে। বউমা দরিদ্র গৃহস্তের নির্দোষী কন্যা, ইচ্ছা করেন তো এই বাড়িতেই কিছুদিন কাটাতে পারেন। দরিদ্রকে অন্নদান এ বাড়ির সনাতন ধর্ম; পুত্র যাঁকে কন্যাদান থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁকে কন্যার ভরণপোষণের জন্য পীড়া দিতে চৌধুরীবংশ কখনও অগ্রসর হবেন না। সুতরাং এতে যদি বৌমার অপমান হয় তবে তিনিও স্বামীর সঙ্গ নিতে পারেন।

অলকা চিঠির খবর কিছুই জানত না। তার ইচ্ছা ছিল আজকের তার এমন মনোমোহন সাজ দেখে খুব তারিফ করে অন্তত দুটো কথা বলে। সে হাসিয়া এগিয়ে এসে অরুণের কাঁধের উপর হাত রেখে বলে তাকে "কাগজখানা নিয়ে কী এমন ভাবনা ভাবছ যে একবার ফিরে তাকাবারও অবসর হল না।"

অরুণ কী করে এই সংবাদটা স্ত্রীকে দেবে সে সময় অনেক সুশোভন বক্তৃতা ঠিক করবার ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু বড়োলোকের ছেলে সে, আজও তার কলেজের কোনো পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, অর্থোপার্জন কাকে বলে সে সব কিছু তাকে একদিনও ভাবতে হয়নি, আজ অকস্মাৎ গোপন ঋণের বোঝাটা এমন নির্দয়ভাবে ঘাড়ে চেপে বসাতে তার আর কোনো কথা মনেই আসছিল না। অগ্নিবরণা অলকার রূপ আজ তার চোখে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অলকার কথার উত্তরে সে হঠাৎ বলে বসল, "ভাবছিলাম অন্য কোথাও বিয়ে করলে আজ আমি পাঁচ-দশ হাজার টাকার মালিক হতাম, আজ তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে, দু হাজার টাকা ঋণ মাথায় তুললাম আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘর সব হারালাম।"

অলকা চমকে উঠে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল। এমন কঠিন কথাগুলো বলবার ইচ্ছা অরুণের মোটেই ছিল না; কিন্তু যখন বলে ফেলেছে তখন আর উপাই নেই। দারিদ্র্যের দুঃখ তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। চিঠিখানা অলকার গায়ে ফেলে দিয়ে সে সেইখানেই চুপ করে বসে রইল।

চিঠি পড়ে অলকার যৌবনস্বপ্ন এক মুহূর্তের মধ্যে টুটে গেল। নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল। ছি, ছি, কি! নির্লজ্জ, কী কাঙাল সে। শুধু দয়া করে, শুধু দয়া করে, শুধু দরিদ্রের

দুঃখ মোচন করবার জন্য যে তাকে বিবাহ করেছে, তার কাছে সেইটুকু উপকার পেয়েই তুষ্ট না থেকে, সে শুধু পথের কাঙালের মতো ভালোবাসা ভিক্ষা করতে গেছে! সাজসজ্জার ছলনায় ভুলিয়ে ফুসলিয়ে দয়ালুর কাছ থেকে তার সর্বস্ব আদায় করে নিতে এসেছে। ভিখারীর পভে সে, তার এত স্পর্দ্ধা। অলকা ভুলে গেল যে, কাউকে ভোলাতে সে আসেনি; আনন্দ পেয়ে আনন্দ দিতেই সে এসেছিল। কিন্তু এই তীব্র বেদনা তাকে নিজের উদ্দেশ্যেও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তার সমস্ত আচরণ প্রসাধন তাকে ঘিরে ধরে ধিক্কার দিচ্ছিল; সোনালি শাড়িখানা যেন বেড়া-আগুনের মতো জ্বলে উঠে তার প্রতি অঙ্গ জ্বালাময় করে তুলছিল।

অলকা বল্লে, "তবে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

অরুণ বল্লে, "তুমি থাক না, তুমি বউ, তোমার তো অধিকার আছে। কিন্তু ঘরের ছেলে আমি, পরের দুঃখ সইতে পারিনি, তাই যত দোষ তো আমারই।"

অলকা খাড়া দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, "আমার আবার কিসের অধিকার? আমার খাওয়া-পরার দাম আগাম না দিয়ে কেবল নিরন্নের শুকনো মুখ দেখিয়ে অমনি ঢুকেছি, এখানে থেকে পিতৃঋণ আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা বলবার সময় অলকার মুখে একটু দুঃখের রেখা কী চোখে একবিন্দু জলও দেখা যায়নি, আগুনের জ্বালার এত সমস্ত মুখটাই রাঙা হয়ে উঠেছিল। যদি তার মুখে একটু বেদনা ফুটে উঠত, যদি চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের দাবি নিজের অধিকার ব্যক্ত করত, তাহলে হয় তো অরুণ দুঃখের মধ্যেও তাকে সঙ্গিনী করে সুখ পেতে চাইত, হয়ত বা তাতে ফলও পেত। কিন্তু আজ যশোগীতি ধ্বনিত হবার আশাও টুটল, প্রেমের আলোও বুঝি নিভে গেল, রইল শুধু অপমান, দারিদ্র্য আর দুঃখ। কেন তবে সে অন্যের মুখের দিকে চাইবে?

নিজেকে চাপা দেবার শক্তিটা, রুদ্র তেজের আগুনটা অলকার মন থেকে তখনকার মতো যদি সরে যেত, তবে হয়ত বা সবই অন্যরূপ ধরত, এই আঘাতে তার হৃদয় ছিন্ন না হয়ে ব্যাকুল আগ্রহে শেষ অবলম্বনটুকু আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু অলকার সমস্ত মন সে মুহূর্তে তাকে ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল,—তোমার কোনো অধিকার নেই, যেচে আর অপমানের ভার বাড়িও না। তাই সে সেই কুমারী অলকার মতো দৃপ্তমুখে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে চাইলেও না। অরুণ মুখে কিছু বল্লে না, মনে মনে ভাবলে, "ভিখিরীর মেয়ের এত তেজ!"

* * * *

পরদিন অলকা আর অরুণ একসঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হল। বাড়ির লোকে ভাবলে—একসঙ্গেই যাচ্ছে।

অলকাকে রেখে যখন ঋণশোধের পথ খুঁজতে যাবে তার আগে অলকা শুধু একটা অনুরোধ করেছিল, "দেখ, তোমার উপর আমার কোনো অধিকার না থাকলেও, একটি অনুরোধ আমার রেখ। রোজ না হোক, দুচারদিন অন্তর অন্তত একখানা শুধু খামের উপর আমার নাম লিখে পাঠিও। কারণ তোমার কাছে আমার অধিকার নেই বল্লেও আর কারুর কাছে সেটা স্বীকার করতে আমি পারব না।" এ ছাড়া আর কোনো কথাই অলকা বলেনি। অরুণ ভাবলে,—আমার খবরের জন্য নয়, কেবল নিজের মান বজায় রাখবার জন্যেই এ অনুরোধ! ঠিক সেই মুহূর্তে কোন্‌টা যে অলকার মনে বেশি ছিল, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। যা হোক অরুণ রাজি হয়েই গেল।

॥ ৭ ॥

প্রতি সপ্তাহে দু-চার বার এক লাইন লেখা কিম্বা শূন্য কাগজভরা একখানা খাম অলকার নামে আসত এবং অলকার তরফ থেকে কেবলমাত্র কুশল প্রার্থনা করে সেইরকম চিঠি অরুণের নামে

প্রায়ই যেত। এবার ডাকহরকরা প্রতিদিনই ডেকে চিঠি দিয়ে যায়। এবারও অলকা সকলের চোখের আড়ালে চিঠি খোলে, কিন্তু সে অন্য কারণে। মাঝে মাঝে চিঠি পেতে দেরি হলে বার বার শূন্য চিঠির তাগিদ দিয়ে অলকা চিঠি আনিয়ে তবে ছাড়ে।

তার অত তেজ, অত মান যে কোথায় গিয়েছিল জানি না। চিঠি খুলে বসলেই সেই প্রথম দেখা অরুণের প্রশংসমান দৃষ্টি তার মনে পড়ে যেত, ইচ্ছা করত অনধিকারের সমস্ত শাস্তি নিয়েও একবার সেখানে ছুটে চলে যায়, একবার দেখে আসে নির্মমের মতো এই অর্থহীন শূন্য চিঠি পাঠাবার সময় তার মুখখানা কেমন হয়। এ তারই অনুরোধ হলেও অরুণ ইচ্ছা করলে দুটো কথা লিখতে পারে না? আগেকার সেই চিঠির মতো না হোক,তার শতাংশের একাংশ আনন্দও কী দিতে নেই। একদিন চিঠি এল,—এরকম ছেলেখেলা করবার সময় অরুণের নেই। সে নিজের অঙ্গীকার থেকে মুক্তি চায়। তাকে এখন জীবনসংগ্রামে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে।

শূন্য চিঠির নিষ্ঠুর খেলাও অল্প দিনেই শেষ হয়ে গেল। ভাষাহীন তাগিদে আর ফল ফলে না। অলকার মান বুঝি আর বাঁচে না। কিন্তু যেমন করে হোক সে তার উপায় করবেই।

চোখের জলে অনেক খাম কাগজ নষ্ট করে একদিন সে একটা উপায় স্থির করলে। নিজের হাতেই খামের উপর অরুণের হাতের লেখা নকল করে একাধারে অরুণ আর অলকা দু-জনের কাজই সে এবার থেকে করবে।

পাড়ার যে নিরক্ষর ছেলেটিকে ধরে সে চিঠি ডাকে দেওয়াত, এখন তার কাজ আরও বেড়ে গেল। কারণ এখন পালা করে দুজনের চিঠিই তাকে ডাকে দিতে হয়।

পুরোনো চিঠি কখানা খুলে কতদিন অলকা মনে করত,—একখানা এই চিঠি খামে করে নিজের নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কী জানি কেন সে সেগুলো খোয়া যাবার ভয় তার প্রায়ই হত। তবু সেইগুলো নতুন করে ডাকঘরের ছাপ নিয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে হয়তো সেই হারানো দিনের আনন্দ আবার জেগে উঠতে পারত!

হাত তুলে খামে ভরতে গিয়ে কত দিন সে ফিরে এসেছে। ভেবেছে, এমন করলে চলবে না—আমাকে পাথরের মতো কঠিন হতে হবে! স্বামীর সেই সব চিঠিতে আর তাঁর মুখের কথাতেও অলকা একদিন শিক্ষা পেয়েছিল যে মানুষের মন বদলায়। তখন সেটা তত্ত্বকথার মতো ছিল; নিজের ক্ষেত্রেও যে একদিন লাগবে তা সে ভাবেনি। শুনেছিল মানুষের মন নদীর স্রোত; সে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু মন যদি চিরকাল এক জায়গায় নাই থাকে, যদি একদিনের পরিচয় চিরদিনের না হয়, তবে মানুষ অত নিষ্ঠুরের মতো অন্যের মন নিয়ে খেলা করে কেন? কেন সে বলে অন্যের সেসব দিনের কথা শুধু সেইসব দিনেরই? নিজের মনে মীমাংসা করে উঠতে পারত না। যদি নদীর স্রোতই মানুষের মন হয়, তবে দুটো নদীর স্রোত কেন একইভাবে বয় না? দুটা মানুষের মন কেন একই সঙ্গে বাঁধে না? ভগবানের এ বড়ো অবিচার! তিনি যদি মনটা গতিশীল করেছেন, তবে তার গতি অমন এলেমেলো কেন? সে কেন তাল কাটিয়ে অমন বেতালা চলে যায়?

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা করত, স্বপ্নের বিভীষিকার মতো সব দূর হয়ে যাক। কিন্তু সে জানত, বিধির বিধান অতি বড়ো কঠোর, এ বিধানে অসম্ভব সম্ভব হয় না। তবু মানুষের মন তারি পথ চেয়ে থাকে, নিজেকে সে ওই তুচ্ছ আশার মোহেই ভুলিয়ে রাখে।

নিজের এইসব দুর্বলতায় অলকা নিজের উপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। কেন সে পরের জন্যে অমন করে কেঁদে মরবে? তার নারী-গৌরব অত বড়ো ঘা সে কিছুতেই সইবে না।

ভাবতে ভাবতে অলকার শরীর মন উদাত্ত বজ্রের মতন হয়ে উঠেছিল। এ বজ্র যে কার পড়বে, কার সর্বনাশ করবে, তা সে নিজেই ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে হত হয়ত, আর কাউকে

না পেয়ে নিজেকেই সংহার করবে, নিজের অন্তরের অমূল্যধন স্নেহ প্রেম সব সে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে।

যখন তার অন্তর চাইত স্নেহে প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠতে তখন সে বসে বসে মনে মনে সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে মনের সঙ্গেই লড়াই লাগিয়ে দিত। বাস্তবিক স্নেহ প্রেম ভালোবাসা এ-সবের প্রয়োজন কী? কেন, এমনি কী দিন চলে না? মানুষ যদি নিজের কাজগুলো করে ফেলে কেউ যদি কারুর জন্যে না তাকায়, কেবল প্রয়োজন বুঝে কর্তব্য দেখে করে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী? লোকে বলে বটে অমন করলে আর সৃষ্টি চলে না। তাই অলকা কখনও কখনও ভাবত—আচ্ছা, নাই বা চলল সৃষ্টি। এতদূর পর্যন্ত ভাবতেও তার বাধা পড়ত না—মনে হত, হ্যাঁ, হয়ত এসবের প্রয়োজন আছে। হয়ত স্নেহ প্রেমই জগতের কেন্দ্র। দুরন্ত ঝড়ের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ। তবে ওই প্রেমকে মানুষ ঠেলতে পারে না, প্রেমে যে বেদনা আছে তারি তীব্র মধুর আনন্দ শূন্য হৃদয়ের দুঃখহীন নিশ্চিন্ততার চেয়ে বরণীয়। কিন্তু থাকলই বা প্রয়োজন, সৃষ্টি জগতের কেন্দ্র! জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী! যে জগৎ তাকে অস্পৃশ্যের মতো দূরে ঠেলে রেখেছে, জগতের সঙ্গে ছন্দে তালে ঐক্য রেখে সে কেন চলতে যাবে! সে সৃষ্টিছাড়াই হবে। কেউ যা হতে পারেনি, আর পারবেও না, তাই সে হবে। আর এত করে ঠেকা দিয়ে, তালি দিয়ে নিজের অবস্থাটা জগতের ছাঁচে ঢালাই নিটোল সুন্দর করতে চাইবে না। এইরকম সব ভাবনা ভেবে ভেবে অলকা দেখত মনটা যেন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে, কোনোরকম ভাবের কী রসের লেশ খুঁজে পেতে বের করা কষ্টকর। নিজের মনের এই শুষ্ক কঠিন বেদনায় সে বেশ একটা নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করত। তার পাষাণ প্রাণে বেদনা দিয়ে কেউ কাঁদাতে পারবে না। এমনি করেই মাথাটাকে চিরদিন উঁচু করে চলা ভালো। নত হবার আর কোনো ভয় থাকছে না।

অলকা তার মনটাকে কেবল বিচারবুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে পাগলের মতো আনন্দহীন কঠিন করে তুলতে পারলেই সে বাঁচত। বিচারবুদ্ধির উপরে প্রয়োজনের অতীত কোনো একটা হৃদয়ের রাজ্য আছে, আজ সেটাকে অস্বীকার করতে পেলেই তার মুক্তি। সে রাজ্যের বেদনা ও ব্যথার আনন্দ আর পরাজয়ের সুখ আজ তার অসহ্য। সে নিজে এখানে জয়ী হতে চেয়েছিল, স্বেচ্ছায় যেখানে সে মাথা নত করেনি, ঘাড় টিপে সেখানে তাকে ধুলিশায়ী করে দিলে সে সইতে পারবে না। আনন্দে যদি সে পরাজয় স্বীকার করতে পারত তবেই ছিল তার সুখ। ফলে ফুলে শস্যক্ষেত্রে সকল শোভার মধ্যে সেই যে হৃদয়রাজ্যের সুখভোগের জন্য ডালি সাজানো, সকল জিনিষের রঙে, সকল গানে গন্ধে যে রাজ্যের অধিকার, অলকা আজ হৃদয়ের রাজ্য ছেড়ে মুক্ত হতে চায়। সে চায় শুষ্ক কঠিন হৃদয়ে শুধু সত্য আর প্রয়োজন দেখতে।

এমনি ভাবের সময় মানুষের মিষ্টি কথার, প্রিয়জনের আদরের মূল্য বুঝে উঠতে পারত না। তার স্বামীর লেখা পুরোনো চিঠিগুলো তখন তার কাছে অর্থশূন্য হাস্যকর জঞ্জাল মনে হত। সে ভেবে পেত না, সময় নষ্ট করে' অকারণে এই রকম কতকগুলো পাগলামির উচ্ছ্বাস করে মানুষের কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষের এই যে চিরন্তন বিরহবেদনা, যা নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে কবিরা কত গান গেয়ে গেছেন, একদিন সেই সবের মাধুর্যে সে ডুবে থেকেছে, তাতে কত আনন্দই পেয়েছে, কাব্যের মতো অত বড়ো সত্য আর কোনো জিনিসকে ভাবেনি। কিন্তু আজ ভাবছে—তার মধ্যে আছে কী? আশ্চর্য্য এই, এত বড়ো একটা মিথ্যা কী করে অনাদিকাল ধরে তেমনিভাবে মানুষের মনকে ঘিরে আছে! তার অন্ধ চোখ কী কোনোদিনই খুলবে না? ঝড়ঝঞ্ঝার কঠোর নিষ্ঠুর মূর্তিই তো জগতে সত্য। তাই তো চোখে কানে ঠেকে, আর কিছুই তো নেই।

অলকা এত তর্কযুক্তি করেও কিন্তু নিজেকে পরাস্ত করতে পারছিল না। মনটা তার কঠিন হয়ে

উঠেছিল বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই সে সেই দুঃখের রাজ্যেই ছুটতে চাইত। কঠিন নিগড়ে বাঁধা হয়ে দুঃখহীন লোকে থাকতে সে কেমন হাঁপিয়ে উঠত। দুঃখ নির্বাণ করবার এ উপায়টা সে ভালো করে মানিতে নিতে পারছিল না।

॥ ৮ ॥

সেদিন সকালে অলকার চিঠিখানা বেশ ভারি ভারি ঠেকছিল। তা ছাড়া সেটা যে তার নিজেরই জাল নয়, তা এক নিমেষেই অলকা বুঝে ফেলেছিল। আজকে যে তাকে কী থাকতে পারে অলকা অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সারাদিন চিঠিখানা লুকিয়ে রেখে রাত্রে দেখলে—স্বামী তাকে মস্ত একখানা চিঠি লিখে ফেলেছেন। অতবড়ো চিঠি দেখেই আনন্দে অলকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কী মনে করে তখনি আবার আগের মতো ঔদাস্যমাথা স্থির নিশ্চল হয়ে গেল।

অরুণ এতদিনের অনাদরের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে, দারিদ্র্য তার হৃদয় এতদিন কঠিন চাপে-চেপে রেখেছিল; আত্মীয়বন্ধু সব সে ভুলে গিয়েছিল। আজ পিতা তার অপরাধ ক্ষমা করেছেন; এই দীর্ঘকালে দুহাজারের মধ্যে পাঁচ শত টাকা মাত্র শোধ হয়েছে,তবু তার চেষ্টা ও পিতৃ আদেশে অচলা নিষ্ঠা দেখে পিতা খুশি হয়ে সব দোষ মার্জনা করেছেন। তাই অরুণ দুদিনের মধ্যে অলকাকে নিতে আসছে। এবারে আর কোনো অনাদর হবে না। তার দারিদ্র্যের অপমান মুছে যাবে।

বারো চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠিতে এই কথাগুলিই নানাভাবে নানা সুরে সাজানো ছিল। অলকা চিঠি শেষ করে একবার হাসলে। তারপর আর না দেখে তুলে রেখে দিলে।

জামাই শ্বশুর-শাশুড়িকেও মেয়ের দ্বিরাগমনের খবর দিয়েছিলেন। এত বড়ো মেয়ের যে দ্বিরাগমন করতে হল এই তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল। যাক তবু যে এতদিনে বেয়াই-এর বউ নেবার সময় হল এই ঢের।

জামাই এলে পাড়ার যত মেয়ে মিলে মহা কলরবে অলকাকে সাজাতে বসল। সে কী পাতাকাটা চুল টেপার ঘটা। আলতা ক..জলেরই বা কী বাহার! সিঁদুরের টিপ সাত জনে সাত রকম পরিয়েও পছন্দ করে উঠতে পারছিল না। শাড়ির বাহারও কম হয়নি। অলকা মনে মনে হাসছিল। সেদিনকার তার প্রসাধনের অপমানের ব্যথা আজও তো সে ভোলেনি।

ঘরে ঢোকবার আগে আড়ালে সমস্ত সাজ ঘুচিয়ে ফেলে শুধু একখানা কালাপেড়ে আর চারগাছা কাঁচের চুড়ি পরে অলকা স্বামীসন্দর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলে।

অরুণ কাছে এগিয়ে আসতেই তার পায়ে প্রণাম করে অলকা বল্লে, "আমাকে রেখে যাবার দিন তুমি কেন জানি না আমার গয়নাগুলো চাওনি, আমিও তখন লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে হতে দিতে পারিনি, পাছে লোকে আমার অপমানের ক... জেনে যায়। আজ আমি এইসব ধরে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও।"

অরুণ গহনার পুঁটুলি ঠেলে ফেলে বল্লে, "ওকী। আমি তো ও নিতে আসিনি। আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

অলকা বল্লে, "সে তো এখন হবার জো নেই। যদি কোনোদিন ঋণ শোধ করতে পারি তবেই যাব। তুমি পিতৃআদেশ পালন করে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ, আমি পিতৃঋণ শোধ না করে তোমার সংসার দখল করি কী বলে?"

নদীর স্রোতের মতো আজও মানুষের মন বদলেছিল, কিন্তু সে অন্য দিকে।

সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান

শৈলবালা ঘোষজায়া

'রায় গিন্নি—রায় গিন্নি, ওগো শান্তিপুরের গিন্নি—'

বছর ত্রিশ বয়সের একটি যুবক, হরিনামের ঝুলি হাতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ঢুকিয়া, —বিকট সিংহনাদের কাছাকাছি উৎকট উচ্চনাদে হাঁকিলেন।—'ও, শান্তিপুরের গিন্নি!'

বাড়ির কোণে, খোড়ো চালের গোয়াল ঘর হইতে ঝির সঙ্গে দুধের বোকনা হাতে করিয়া একটি বৃদ্ধা বাহির হইয়া বলিলেন, 'কী গো, গৌর-গোপাল যে এস, এস কত ভাগ্যি!'

গৌর-গোপাল মহোদয়ের কোনোখানেই এতটুকু গৌরত্বের চিহ্ন ছিল না, এবং গোপালত্বের মধ্যে ভগবান বাসুদেবের কংস-ধ্বংস-কালীন উগ্র সংহার মূর্তিটার-আঁচ যৎকিঞ্চিৎ অতিরিক্ত থাকিলেও, অন্য বিশেষ কিছু সাদৃশ্য ছিল না। চেহারা লম্বায় বেশ দীর্ঘ, চওড়াতেও বোধহয় একসময় মানানসই রকম ভালো ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। মুখের গঠন সুশ্রী, কিন্তু ভাব বড়ো বিশ্রী-কর্কশ দম্ভময়,—সোজা কথায় 'ধরাখানা সরা' জ্ঞানের তুল্য মূল্য উৎকট মুরুব্বিয়ানা জ্ঞাপক, —যা-হোক একটা কিছু বটে! পরনে কালা- পেড়ে কাপড় ও থ্রি-কোয়াটার হাতাওয়ালা লংক্লথের পাঞ্জাবি! পায়ে খড়ম, গলায় তিনকণ্ঠি মালা, বিষ্ণু-ভক্তির অব্যর্থ প্রমাণ-স্বরূপ, নীরব সাক্ষ্যে শোভা পাইতেছে।

ঠানদিদি সম্পর্কীয়া, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার আহ্লাদ গদ গদ আহ্বানে গৌর-গোপালের দম্ভ অলঙ্কৃত মুখ যেন অতিরিক্ত দম্ভের উগ্র-আতিশয্যে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সগর্বে রোয়াকে পৈঁঠার দিকে পা বাড়াইয়া অনাবশ্যক উচ্চতায় কণ্ঠ চড়াইয়া প্রবল নিনাদে বলিলেন, "ভাগ্যি কী আর সাধে হয় রে বাপু, তোমার গুণে হয়; তুমি এখনও বেঁচে আছ তাই তোমাদে[illegible]লদের বাড়িতে দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে আসি, নইলে তুমিও যেমন!—আজকালকার [illegible] ক কার খবর রাখে বলো তো, হুঁঃ।"

বিপুল আত্মশ্লাঘাময়ী আত্মমহিমার গর্বে দিশেহারা-গোছ একটা অসাধারণ অবস্থার কাঁধে ভর দিয়া, শ্রীযুত গৌর-গোপাল যেমন রোয়াকের পৈঁঠায় পা দিবেন, অমনি হঠাৎ নজর পড়িল, —খড়-কুটি -জঞ্জালে অপরিচ্ছন্ন পৈঁঠার উপর, গৃহপালিত বাঁছুরের বিষ্ঠার সঙ্গে কতকগুলি ছাগ-বিষ্ঠাও শোভা পাইতেছে! তৎক্ষণাৎ আঁৎকাইয়া উদ্যত-চরণ সামলাইয়া, ক্ষোভে-ক্রোধে বজ্রনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "এ্যাঃ! ছি-ছি-ছি! বলি তোমরা হিন্দু না কী গো? বাড়ির ভেতর ছাগল-নাদি ছড়ানো! একটা ছাগলনাদি মাড়ালে, গঙ্গা-স্নানের সকল পুণ্যক্ষয় হয়, আর তোমাদের বাড়িঘর এতো? তোমরা কোনখানে হিঁদু বল তো? এ যে হাড়ির বাড়ি হয়ে রয়েছে।"

পাপ পুণ্যের হিসাব-জ্ঞানে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন গৌর-গোপাল মহাশয়, ছাগ-বিষ্ঠার প্রভাবে,

পুণ্য লোকসানের আশঙ্কায় যত ক্রুদ্ধই হউন, কিন্তু স্বাস্থ্য তত্ত্বে অন্তত,—সাধারণ ক, খ জ্ঞানটা যাঁহার আছে, এমন কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া যদি সে বাড়ির চারিদিকে ভালো করিয়া চোখ বুলাইতেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন, শুধু ছাগল-নাদি মাত্র নয়, গৃহ-পালিত গোরু বাছুরগুলিও এমন সুচারু বন্দোবস্তে গৃহ পালন করা হয়—যাহাতে সেই উপকারী জন্তুগুলি গৃহস্থের উপকার যত করিতে পারুক বা না পারুক, গৃহস্থের স্বাস্থ্যকে 'টাট্-কাজবাই' করিতে বাধ্য হয়,—অনেক উপায়েই। জন্তুগুলির মলমূত্রের ক্লেদবাষ্প এমনভাবেই মানুষের আহার নিদ্রা বসবাসের স্থানের, ঘনিষ্ঠ-সংলগ্ন! শুধু তাই নয়, তার উপর উপরন্তু আছে খড়-কুটি, ঘাস, পচা-খোলভরা জাবার দুর্গন্ধ এবং বাড়ির সমুদায় আবর্জনা ও ক্লেদপূর্ণ প্রকাণ্ড আস্তাকুঁড়ের অসহ্য উৎকট-দুর্গন্ধ-বাষ্প। তা সেগুলার জন্য স্বাস্থ্য বিষাক্ত হইয়া মানুষগুলা যতই ভুগিয়া মরুক, গঙ্গাস্নানের পুণ্য তো হ্রাস হয় না, তাই যথেষ্ট! কিন্তু সমস্যা-আতঙ্ক শুধু ওই ছাগ বিষ্ঠা লইয়াই।

গৌর-গোপালের ভর্ৎসনা-নিনাদের উগ্র ধাক্কায় বৃদ্ধা গৃহিণী তৎক্ষণাৎ চটিয়া উঠিলেন, তাঁহার ঝি-চাকর এবং পুত্রবধূদের উপর! গৃহিণীর আদরের-পোষ্য ছাগলগুলি, নিরঙ্কুশ প্রতাপে বাড়ির সর্বত্র রাজত্ব করিয়া বেড়াইবে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, কেহ বাধা দিতে চাহিলে বা অসন্তোষ জানাইলে,—পারিবারিক সম্পর্কের পদমর্যাদা অনুসারে তাহাকে লঘুগুরু দণ্ড লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আজ গৃহিণী তাহাদের উদ্দেশেই ছাগলের সমস্ত দোষ উৎসর্গ করিয়া, পৈঠা অপরিষ্কার থাকার জন্য যে তাহারাই দায়ী—সেটা মুক্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিলেন! কলিকালে ঝি চাকর বধূরা যে তাঁহার ধর্ম কর্ম পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল, সেজন্যও চেঁচাইতে ত্রুটি করিলেন না।

গোরুর রাখালটা গোয়াল ঘর হইতে ঝাঁটা হাতে ছুটিয়া আসিয়া পৈঠা পরিষ্কার করিয়া দিল। গৃহিণীর আদেশে একজন ঝি জড়োসড়োভাবে আসিয়া মহামান্য গৌর-গোপালের জন্য পীড়া পাতিয়া দিল। গৌর বসিয়া মালা ঝাঁকাইয়া কালোয়াতী সুরে কীর্তন শুরু করিলেন, "তোমার বউরা কেমন ভদ্দর লোকের মেয়ে বল দেখি? চাকর-বাকরের 'ওপীক্ষেয়' গোরু বাছুরের সেবা ফেলে রাখে? হত আমাদের বাড়ির বউ, তাহলে তিন দিনে টিট্ করে দিতাম! আমাদের বড়োবউ আর ছোটোবউ কাজ কম্ম সেরে রাত বারোটায় গোয়াল ঘরে গিয়ে, গরম জল দিয়ে গোরুর গা-চুঁচে দেয়,—তবে গিয়ে বিছানায় গড়াতে পারে। আমার শাসন এমন নয় বাবা!—"

শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ধাতের মিল থাকিলে, আসর জমে ভালো। গৌর-গোপালের বধূ-শাসন-শক্তির পৌরুষ-প্রভাবের মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহিণী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের শাসন আছে—তা বউরা ভালো থাকবে না? তোমাদের সে ছোটোবউ মরতে যাচ্ছে অমন সূতিকে রোগ হয়েছে, তবু ধুঁকে ধুঁকে সংসারের রান্না থেকে গোরুর সেবা থেকে বাসনমাজা ঘর নিকানো সব করছে। ওই করেই তো অত শিগ্গী টম করে মোল,—ডাক্তারও বল্লে। কৈ করুক দেখি আমার বউরা তেম্নি!—তা আর করতে হয় না, গতর গেছে। তাতে আবার সব 'রাংএর রাধা' বারমাসই রোগ। তোমাদের বাড়ির বউ আর আমাদের বাড়ির বউ,—বলে কিসে আর কীসে!"

বাস্তবিকই অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনের মধ্যে নানা অনাচারে জীবন যাপনের ফলে, পল্লিগ্রামের সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য যেমন হইয়া থাকে, এ বাড়ির সকলের স্বাস্থ্যও তাই। কিন্তু সে স্বাস্থ্যহানির জন্য, লাঞ্ছনা ভোগ করে শুধু চির অবহেলার পাত্রী—বধূরা। বিশেষত অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে, অপেক্ষাকৃত ভালো আবহাওয়ার মধ্যে যাহাদের শৈশব কাটিয়াছে, সেই পরের মেয়েগুলি এ বাড়িতে আসিয়া আগেই স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, তার জন্য দায়ী তাহারাই। বাড়ির মুরুব্বিরা যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিবিধ দিকে চোখ দেন না, সেজন্য কোনো কথাই চলিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা বধূ নয়, বাড়ির কর্তা। সুতরাং স্বেচ্ছাধীন স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা একছত্রী সম্রাট।

যাহা হউক আধ ঘণ্টার উপর, এবাড়ি ও বাড়ির বধূদের দোষগুণের তীব্র সমালোচনার পর, —গৃহিণী বলিলেন, "তোমাদের বাড়িতে আজ রাঁধলে কী?"

গৌর-গোপালের অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে আর একটি মহৎগুণ ছিল, তিনি কখনও 'ছোটো কথা' বলিতে পারিতেন না। সুতরাং রান্নার সম্বন্ধে, এমন এক প্রকাণ্ড ফর্দ দাখিল করিলেন, যেটা তাঁহাদের অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ভক্তির পাত্র কখনও অবহেলার জিনিস নয়, অতএব গৃহিণী অকপট ভক্তিভরে তাও সত্য বলিয়া মানিলেন।

সহসা গৌর তাঁহাদের গরিব ব্রাহ্মণ বিধবা রাঁধুনীটির উদ্দেশে একটা ইতর কটুক্তি করিয়া বলিলেন, "বেটী আজ বাড়ি চলে গেল। বুঝলে রায়গিন্নি, বেটীর আজকাল ভারি দেমাক হয়েছিল, আজকালকার দিনে ছোটোলোকদের যত তেজ কি না! কী বলবো, দাদা যে বড়োবউকে এবার চাকরিস্থানে নিয়ে গেল; নইলে ছোটোবউ আঁতুড়ে যাবার সময় আমি কী রাঁধুনী রাখি?"

লম্বা চওড়া জাঁক-জমক ভরা, বিশেষণ লাগাইয়া গৌর-গোপাল, প্রচণ্ড পুরুষত্ব-বিকাশক, অশ্রাব্য অকথ্য গালিগালাজ ঝাড়িয়া, তাঁহাদের রাঁধুনীটির উদ্দেশে যে অভিযোগ ঘোষণা করিলেন, তাহা সহজ ভাষায় অনুবাদ করিলে এই অর্থ দাঁড়ায়,—গৌরের প্রথম পক্ষের একপাল ছেলের ঝক্কি পোয়াইয়া, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আঁতুড় তুলিয়া এবং অতিরিক্ত সাংসারিক কাজের খাটুনীর চাপে গরিব ব্রাহ্মণ বিধবার সম্প্রতি মাসখানেক স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, সে ছুটি চায়।

কিন্তু গৌর-গোপাল মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া, তাহার মাহিনা আটকাইয়া রাখেন, কিছুতেই ছুটি দিতে রাজি হন নাই, তাই গৌর-গোপাল রাঁধুনীর উপর চটিয়া, তাহাকে সাগু বার্লি পর্যন্ত খাইতে দেন নাই। কাল রাত্রে রোগ যন্ত্রণাতুরা অনাহার-অবসন্না, অসহায়-আশ্রিতা কাতর আর্তনাদে যখন বার বার চেঁচাইয়াছে, "ও বাবা গৌর, একবার ওঠো বাবা, আমায় একটুখানি জল দিয়ে যাও বাবা—" তখন 'বাবা গৌর' পাশের ঘরে সস্ত্রীক পুত্র কন্যা লইয়া গভীর আরামে বিছানায় শুইয়া, সেই আর্তনাদ শুনিতে শুনিতে নিঃশব্দে 'অপার্থিব মজা উপভোগ' করিয়াছেন! যেহেতু ছোটোলোকদের তেজ ভাঙ্গিবার —ইহাই সদুপায়!

গৌর-গোপালের বীরত্ব গৌরবে গৃহিণী সকৌতুকে সায় দিতে ক্রটি করিলেন না,— কিন্তু তবু কী জানি কেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার মুখ দিয়া একটা প্রশ্ন বাহির হইল, "তার পর শেষকালে উঠে অবিশ্যি জল দিলে?"

"ক্ষেপেছ তুমি!" বজ্র-নিনাদে সদর্পে গৌর বলিল, "গৌর সিংগীকে সে ছেলেই পাও নি রায় গিন্নি! আমি আবার উঠে তাকে জল দেব? কী গরজ? আমি সব চুপ করে পড়ে পড়ে শুনেছি, আর মনে মনে হেসে কুটি কুটি হয়েছি। সাড়া দিতে আমার বয়ে গেছে!"

গৌর-গোপালের অসাধারণ মহত্বে গৃহিণী আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন,—পুরুষের পৌরুষ বলে তো ইহাই!—হায়, তিনি কবে তাঁহার বাড়ির অবাধ্য দাস দাসীদের এমন কী সুবিধা হইলে পুত্রবধূদের পর্যন্ত এমনি সুকৌশলে জব্দে ফেলিয়া, গৌর-গোপালের মতো প্রভুত্ব শক্তিকে ধন্য করিতে পারিবেন?

গৌর বলিলেন, "আজ সকালে তার বাড়ির লোক এসে গোরুর গাড়ি করে নিয়ে গেল।"

গৃহিণী বলিলেন, "মাইনে দিলে?"

একটু থামিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে গৌর বলিলেন, "ছোটোলোক ব্যাটারা,—মাইনে কী ছাড়ে? দিয়ে দিলুম কিছু,—তবে সব নয়।"

॥ ২ ॥

এইসব ধরনের বহু বহু শ্রুতিমধুর উপাদেয় আলোচনার পর সন্ধ্যার ঝোঁকে গৌর রায় গিন্নির বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র টহল দিতে বাহির হইলেন।

পথে একদল নিম্ন-শ্রেণির স্ত্রীলোক সমস্ত দিনের দিনমজুরি খাটিয়া, বাড়ি ফিরিতেছিল। গৌর মালা হাতে পাথের পাশে দাঁড়াইলেন, কদর্য লালসামাখা, লোলুপ কটাক্ষে প্রত্যেক স্ত্রীলোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ বজ্রনাদী কণ্ঠস্বরে ঝিঝিট-খাম্বাজ ভরিয়া,—নিজের ভদ্রত্বের মর্যাদা ভুলিয়া, অসঙ্কোচে তাহাদের উদ্দেশে গাহিয়া উঠিলেন :

লাল জবা চাঁপা ফুল এধার ওধারে।
কোথা ফেলে গেলি, ভরা ভাদরে।।

ইহারা ছাদপেটা প্রভৃতি কাজের সময় এক ঘেয়ে ঐকতানে ওই রকম সব গান গাহিয়া থাকে। এ গান তাহাদের চির পরিচিত; 'বাবু' মহিমা অলঙ্কৃত মহাপুরুষের মুখে নিজেদের নিজস্ব গান শুনিয়া তাহারা আহ্লাদে কৃতার্থ-জীবন হইয়া গেল। ইহাদের পাড়ায় গৌরবাবুর প্রসার অপরিসীম; প্রত্যহই সন্ধ্যার পর সেখানকার স্ত্রীলোক বিশেষের বাড়িতে গৌরবাবুর গোপন-পদধূলি পড়ে। সুতরাং সেই পথের মাঝে,—তাহাদের সঙ্গে গৌরবাবুর এমন দরের রসিকতা রসালাপের তুফান ছুটিল, যাহা ভদ্র-সমাজের ধাতে অসহ্য!

ফোর্থ ক্লাসের বিদ্যায় বছরে দু-মাসের বেশি ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি না জুটিলেও, —গৌর-গোপালবাবু,—বাবু তো বটে! ভগবানের রাজ্যের অন্নবস্ত্রের কাঙ্গালি দুর্দশা পীড়িত হতভাগ্য গরিবদের তিনি মর্মান্তিক ঘৃণা অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া চলিলেও এবং রায়গিন্নির মতো সমজদার শ্রোত্রী ও শ্রোতামহলে নিজের পৌরুষ কীর্ত্তনে, হাজার বাহবা লাভে দম্ভস্ফীত হইলেও—ইতর ইন্দ্রিয়পূজার স্বার্থে ইহাদের শ্রেণি-বিশেষের জনকয়েকের জন্য তাঁহার নাড়ির টান বেশ টনটনে সজাগ আছে!

যাহাই হউক রসিকতার তুফানে চুবন খাইয়া জন্ম সার্থক করিয়া, মেয়েগুলি নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। গৌর বাবুও মালা ঝাঁকাইয়া কৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক কী একটা গান গাহিতে গাহিতে নির্জন সন্ধ্যাপথ মুখরিত করিয়া অন্যদিকে চলিলেন।

॥ ৩ ॥

কিছুদূর আসিয়া একটা পথের মোড় ফিরিতেই দেখা গেল, সন্ধ্যার আবছায়া-ঢাকা, পুকুর ঘাটের পথ হইতে গ্রাম্য পুরোহিতগোষ্ঠীর মেয়ে, বিধবা সরলা ব্রাহ্মণী এক ঘড়া জল কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে সপ্ সপ্ করিয়া আসিতেছে, সঙ্গে তাহার পাঁচ বছরের শিশু পুত্র। গৌর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গলা খাঁখারি দিয়া ডাকিলেন, "কে রে সরলা?"

বয়সের হিসাবে মেয়েটি গৌরগোপালের মতো ব্যক্তির পক্ষে তুই-তো-কারীর যোগ্য মোটেই নয়; কিন্তু গৌর বাবু, 'বাবু মানুষ',—তায় মেয়েটির পিতৃগোষ্ঠীর সামান্য যজমান, এবং গ্রামসুবাদে মেয়েটির কাকা সম্পর্কীয় মুরব্বি, তাই নিজের মুরুব্বিয়ানাটুকু ষোলোআনা ফলাইয়া, অতি হিতৈষীজনোচিত মমতা দেখাইবার জন্য, 'তুই-তো-কারীটা' মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মেয়েটিও বড়ো দুঃখী; দরিদ্র পুরোহিত পিতার সংসারে বড়ো দুঃখেই দিন কাটে। গৌরকাকার মতো অবস্থাপন্ন হিতাকাঙ্খী প্রতিবেশিদের একটা মৌখিক হিতৈষিতাও, সে হতভাগীর কাছে বড়ো বেশি মূল্যবান। অবজ্ঞার 'তুই' সম্বোধন, সে স্নেহ-সৌভাগ্য মনে করে।

সরলা নিকটে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকা, কাপড় কেচে আসতে বড়ো দেরি হয়ে গেল। তুমি কাল হুগলি গিয়েছিলে?"

গৌর অলক্ষিতে একবার পথের এদিক ওদিক চাহিয়া, একটু নীচু সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ বাপু গেছলুম, রামকেষ্ট সা বল্লে, এই শনিবার দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। দ্যাখো বাপু, আর কথার নড়চড় করে আমায় খাত্তাই' এ ফেলো না, বুঝলে। আমি কথা দিয়ে এসেছি, তোমায়

শনিবার দিন হুগলি নিয়ে গিয়ে, রেজিস্ট্রী করিয়ে দিতে পারলে, তবে আমার দায় উদ্ধার! কী বলো, ভদ্দর লোকের কথাই জাত।"

সরলা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আড়াইশো টাকার ওপর আর কত বাড়িয়ে দেবে?"

গৌর সগর্বে বলিলেন, "পুরোপুরি তিনশোই ঠিক করে এলুম। তোমার গৌরকাকা সে ছেলেই নয় বাবা. যে ঠকে ফিরবে। কতদিনের পতিত, এঁদোপড়া দোকান ঘর, ও কী টাকা দিয়ে কেউ নিতে চায় রে বাবা, ভাগ্যে আমি ছিলুম তাই রামকেষ্ট সাকে রাজি করিয়েছি। আমি না থাকলে, কারুর বাবার সাধ্যি নাই যে তোর ওঘর বিক্রি করায়। এই তো এতদিন পড়েছিল, কেউ পেরেছিল বিক্রি করতে? দেখলুম না কী নেহাৎ তুই কষ্ট পাচ্ছিস তাই,—একটা পয়সার অভাবে ছেলেটার রোগে ওসুদ পর্যন্ত জুটছে না তাই....।"

সরলা কৃতজ্ঞ চিত্তে হিতৈষী কাকার কর্মতৎপরতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকার ধর্মের জয় গান করিয়া—শেষে একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "বিধবা বামণীকে তুমি যে কী দয়া করলে কাকা, সে বলবার নয়। তোমার ছেলেদের বাড় বাড়ন্ত হোক, কিন্তু সা-মশাইকে বলে কয়ে, আরও যদি ২/১শো বাড়াতে পারতে তবেই ন্যায্য দাম হত। তখনকার দিনে, তোমার জামাই ও ঘরখানা আটশো টাকায় কিনেছিল। আমার কপাল পুড়েছে। তাই এত কমে আজ বেচতে হচ্ছে, তবু যদি পাঁচশো টাকাও পেতুম—"

বাধা দিয়া উগ্র অসহিষ্ণুভাবে গৌর বলিলেন, "সে কী আর সা' মশাইকে বলতে বাকি রেখেছি রে বাপু? তোরা মেয়ে মানুষ, ঘরের কোণে বসে থাকিস পৃথিবীর খবর কী জানিস বল? আমি কী চেষ্টার ক্রুটি করেছি...।"

গোটা কতক কড়া ধমকে সরলার প্রার্থিত ন্যায্য দামের আশা ইহজন্মের মতো ঠাণ্ডা করিয়া গৌর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "ও বিষয়ের দাম এখনকার দিনে ওর বেশি আর হবে না, এখন বিক্রি করবার ইচ্ছে কি না তাই বল্?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সরলাকে উত্তর দিবার অবকাশমাত্র না দিয়ে গৌর অধিকতর উগ্রভাবে পুনশ্চ বলিলেন, "আর বিক্রির ইচ্ছেই যদি না ছিল, তবে আমাকে মাঝে রেখে মিছামিছি ধাষ্টেমো করলি কেন? যদি দিবিই না, তবে এ ঢলাঢলি করা কেন? মেয়ে মানুষের জাতের মাথায় সাত ঝ্যাঁটা! মেয়ে মানুষের কথায় থাকাই আমার ঝক্মারি!"

ভয়ে সরলার প্রাণ উড়িয়া গেল। হিতৈষী কাকা দর্পিত-অনুগ্রহে যেটুকু দয়া করিতেছেন, সেটুকুও বুঝি যায়। ভীতি-জড়িত স্বরে বলিল, "না কাকা, তুমি রেগো না। আমি ওই টাকাতেই দেব, শনিবারেই তোমার সঙ্গে হুগলি যেয়ে রেজেস্ট্রি করে দিয়ে আসব। তোমার কথা কী ঠেলতে পারি," ইত্যাদি।

প্রসন্ন হইয়া কাকা বলিলেন, "তাই বল বাবা, কথার খাত্তাই কী সহজ কথা? তুই কী মনে করিস, আমি জোচ্চুরি করে তোকে ঠকিয়ে দিচ্ছি? তোর যাতে দুপয়সা হয়, সে কী আমি দেখব না...। তা হলে আমার ধর্ম আর কৈ?"

রকমারি বচনের বুক্নী ঝাড়িয়া গৌরগোপাল নিঃসংশয়ে সরলাকে বুঝাইয়া দিলেন,—হরিনামের মালা হাতে শপথ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—তিনি একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী দরিদ্র বন্ধু, মহাত্মা লোক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার দুঃখে, তাঁহার বিশ্ব-প্রেমিক প্রাণটা নাকি নেহাৎ গলিয়া গিয়াছে, তাই তিনি সরলার উপকারের জন্য এত কষ্টে শহরে হাঁহাহাঁটি করিয়া রামকৃষ্ণ সাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া খরিরদার জুটাইয়াছেন, নচেৎ সরলা খাইতে পাইল আর না পাইল সে খোঁজ রাখিবার তাঁহার—কী-ই বা গরজ? আর কী-ই বা বহিয়া গেল?

নিঃস্বার্থ পরোপকারী হিতৈষী কাকার জন্য অজস্র কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া সরলা বাড়ি গেল। গৌর অন্যত্র আড্ডা জমাইতে চলিলেন।

॥ ৪ ॥

তারপর দুদিন কাটিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যায় গৌর-গোপাল নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া, প্রতিবেশিদের কান জ্বালাইয়া বিরাট উচ্চনাদে কীর্তন গাহিতেছিলেন :—

"গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
ও তার, হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।"

হঠাৎ মস মস শব্দে জুতা পায়ে দুইজন ভদ্রলোক বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।—একজন রায় গিন্নির ছোটো ছেলে নিতাই বাবু আর একজন গ্রামের একটি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। দুজনেই হুগলি কোর্টে কী কাজ করেন।

রায় গিন্নির কাছে গৌরের প্রসার প্রতিপত্তি যতই থাক, রায় গিন্নির এই ছেলেটিকে গৌর বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। হঠাৎ ইহাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে চমক খাইয়া গৌর শশব্যস্তে যেমন উঠিবেন, অমনি দেখিলেন, বিধবা সরলা ব্রাহ্মণীও তাহাদের পিছু পিছু বৈঠকখানায় ঢুকিল।

গৌরগোপালের 'গৌরপ্রেমের ঢেউটা' হঠাৎ যেন কঠিন পাহাড়ের বুকে আছাড় খাইয়া, দম আটকাইয়া সটান পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল। তিনি অবাক হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

নিতাই বাবু, একবর্ণও অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, সোজাসুজি বলিলেন, "রামকেষ্ট সার কাছে, সরলার হুগলির দোকানঘরখানা কত টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছ গৌর?"

গৌর শুষ্ককণ্ঠে বিষম খাইয়া কাসিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের সুরে বলিলেন, "কোন্ রামকেষ্ট সা?" নিতাইবাবু বলিলেন, "হুগলির আড়তদার।"

উদাসভাবে গৌর বলিলেন "অ! তা সে তো সরলাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে, আমায় জিজ্ঞেস করার মানে?"

নিতাই বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "রামকেষ্ট সা এটার দাম কত দিতে চেয়েছে, তুমি বল।"

"সরলাকেই জিজ্ঞেস করো না, ও তো জানে। আমি তো আর লুকোচুরি খেলিনি, যে রাখ রাখ ঢাক ঢাক করব।—ওই বলুক না।"

সঙ্গী ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কেন? তুমি নিঃস্বার্থ পরোপকার, গরিবের বন্ধু—তুমিই বলো না। দালালি তো ভাই, তুমিই করছ। রামকেষ্ট সা নাবি তিনশো টাকার বেশি এতে দেবেন না? তোমায় বলেছেন তো তিনি?"

কট মট চক্ষে চাহিয়া গৌর রুষ্টস্বরে বলিল "কী tricks খেলবার মতলবে তোমরা এসেছ বলো তো?—চালাকি করবার জায়গা আর পাওনি নয়, তাই—"

ভদ্রলোক ব্যঙ্গসুরে বলিলেন, "রামঃ! তুমি কী পিতৃহীন নাবালক ছেলে, না মুরুব্বিশূন্য অশিক্ষিতা নির্বোধ বিধবা মেয়ে, যে তোমার সঙ্গে tricks খেলে চালাকি করে—এক নিঃশ্বাসে চারশো টাকা হজম করে, বেমালুম পার পেয়ে যাব? দ্যাখো তো ভাই, রামকেষ্ট সার এই চিঠি আর দলিল, এ ভদ্রলোক তিনশো টাকা দিচ্ছে না—সাতশো টাকা দিচ্ছে?"

ভদ্রলোক চিঠি ও রেজেস্ট্রির জন্য প্রস্তুত দলিলখানি খুলিয়া গৌরবাবুর সামনে ধরিলেন, দলিলখানির লিখন কর্তা স্বয়ং গৌরবাবুই ছিলেন,—হস্তাক্ষর অস্বীকারের পথ নাই! গৌরবাবু আড়ষ্ট হইয়া আড়চোখে চিঠিখানার দিকে চাহিলেন, রামকৃষ্ণ সাহা নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া নিতাই বাবুর উদ্দেশে জানাইতেছে যে, "সরলাদেবীর দোকান ঘর খরিদ বাবদ তিনি সাতশো টাকা দিবেন, মধ্যস্থ গৌরবাবুর সঙ্গে এই কথাই পাকাপাকি ঠিক হইয়া গিয়াছে। গৌরবাবুর দালালি ফি তিনি আলাদা দিবেন। আগামী কাল শনিবারে,—রেজেস্ট্রি হওয়া চাই। গৌরবাবুকে বলিলেন।"

নিতাইবাবু বলিলেন, "কী গৌর, সাত শ টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে মালিক শুধু তিনশো টাকা পাচ্ছে বাকি চারশো কী তোমার কমিশন?"

সরলা অসহ্য দুঃখে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া মাথা চাপড়াইয়া পাগলের মতো আর্তনাদ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ কাকা, আমি যে বিশ্বাস করে সব তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আমি এক পয়সার কাঙাল,—বড়ো হতভাগী,—আমার মতো কাঙাল গরিব বিধবা পেয়ে কেমন করে গলায় ছুরি দিতে বসেছিলে কাকা?"

অন্যায় অত্যাচারের দাসত্বে যে কাপুরুষ নিজের সমস্ত মনুষ্যত্ব বেচিয়া খাইয়াছে, সে যখন শক্ত পাল্লায় ঠেকিয়া ন্যায়ের গুঁতা খায়, তখন তাহার অত্যাচারী স্বভাব হাতের কাছে যে দুর্বল জীবটাকে পায়, সেইটার গলা টিপিয়াই নিস্ফল আক্রোশ চরিতার্থ করিতে চায়! —গৌরগোপাল ধর্মাভিমান কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান সব হারাইয়া ক্ষিপ্ত পশুর মতো হঠাৎ সরলার উপর লাফাইয়া গর্জিয়া হাঁকিলেন, "নিকাল '—' বেটী, দূর হ আমার বাড়ি থেকে।"

নিতাইবাবুর সঙ্গী ভদ্রলোকটি গৌরগোপালের পথরোধ করিয়া বলিলেন, "তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তোমার বাড়ি এসেছি বাবা, দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নিরপরাধ অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর জানোয়ারের মতো—পিশাচের অত্যাচার করাটায়—তোমার গঙ্গাস্নান আর মালা ঠকঠকানি পুণ্যের কী বাড়বাড়ন্ত হয়, সেটা তোমার ধর্মশাস্ত্রের পাতা খুলে একবার আমায় দেখিয়ে দাও তো বাপ! জন্মটা সার্থক করেই আজ বাড়ি ফিরি তাহলে।'

শৃঙ্খলাবদ্ধ বানরের মতো নিস্ফল ক্ষোভে দাঁত খিঁচাইয়া খ্যাঁক ম্যাক করিয়া গৌর পাগলের মতো উপর্যুপরি বলিল, 'বেরো সব, বেরো আমার বাড়ি থেকে, দূর হ দূর হ আমার বাড়ি থেকে, এখনি বেরো।'

ভদ্রলোক হাসি মুখে বলিলেন,—বহুত আচ্ছা, বহুৎ ধন্যবাদ। তোমার গৌর প্রেমের ঢেউ' এবারে নির্বিবাদে ব্রহ্মাণ্ডটাকে রসাতলে তলিয়ে দিক, আমরা খুশি হয়ে তারিফ করব। আপাততঃ নমস্কার।'

তিনজনে বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

—সে রাত্রে গৌর বাবুর বৈঠকখানায় আর গৌর প্রেমের ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস তরঙ্গ বহিতে শোনা গেল না এবং তারপর বহুদিন পর্যন্ত তিনি গঙ্গাস্নান, পুণ্য কীসে ক্ষয় হয়, আর কীসে অক্ষয় হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ উপদেশ করিতে, রায় গিন্নীর বাড়িতে পায়ের ধূলা দিতে পদার্পণ করেন নাই, এইরূপ শোনা যায়।

মা

বিহঙ্গবালা দাসী

॥ ১ ॥

গোপেশ্বর মাতার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "ওমা, বলো না।"

মা বলিল, "কি বলব রে?"

পুত্র জেদ ধরিয়া বলিল, "না তুমি বলো।"

"কী বলব তার ঠিক নেই, না তুমি বলো।"

পুত্র মাতার আরও একটু নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বরেন মিত্তিরদের বাড়ি জিম্‌ন্যাসটিক, ম্যাজিক হবে মা—"

মা বলিল, "তা ত হবে।"

মাতার উদাস উত্তর শুনিয়া পুত্র অস্থির হইয়া উঠিল "বাঃ গো, তুমি শুধু বল্‌লে তা ত হবে।"

মাতা পুত্রের সঙ্কোচ দেখিয়া এবং মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া মনে মনে হাসিল এবং বলিল, "তবে কী বলব বলো?"

মাতা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না দেখিয়া গোপেশ্বর অভিমানভরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোনো প্রত্যুত্তর করিল না। কিন্তু এরূপ ভাবে বেশিক্ষণ থাকাও যায় না, সময় নষ্ট হইয়া যায়। আহা ওদের বাগানে এতক্ষণ না জানি কী সব কাণ্ডকারখানাই হইয়া গেল। কিন্তু মাকে না বলিয়াই বা সে যায় কী করিয়া। গোপেশ্বর সমস্ত সঙ্কোচ সরাইয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "মা, আমি জিম্‌ন্যাসটিক দেখতে যাব; তুমি আমায় যেতে দেবে?"

মাতা দৃঢ় অথচ ধীর স্বরে বলিল, "না।"

জননীর মুখে এই বজ্রের মতো আদেশ-বাণী শুনিয়া গোপেশ্বরের শূন্যে অট্টালিকা নির্মাণ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কিন্তু ম্যাজিক লণ্ঠনের মনোরম অত্যাশ্চর্য ছবিগুলা— যাহা সে এ পর্যন্ত দেখে নাই, শুধু কর্ণে শুনিয়াছে মাত্র— বড়ো উজ্জ্বলভাবেই তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; আর সব চেয়ে সেই সু-উচ্চ বার্‌টা— উঃ সেটাতে না জানি কী চমৎকারই খেলা করিবে! গোপেশ্বর মাতার আদেশবাণীর কাছে আজ প্রথম প্রতিবাদ করিল, "মা, কেন না?"

মাতা তেমনি স্বরে বলিল, "না, গরিবের ছেলেকে ওসব দেখ্‌তে নেই।"

গোপী কুল পাইল, ওঃ এইজন্য! বলিল, "কেন? নিধু, কেলো, বিপিন, সত্য ওরাও তো গরিবের ছেলে মা, ওরাও ত যাচ্ছে।"

"যাক্ গে।"— অন্যমনস্কভাবে মাতা উত্তর করিল, কিন্তু পুত্রের উৎসাহ দেখিয়া প্রমাদ গণিল। এত উৎসাহে বাধা দেওয়াও ত ঠিক নহে। কিন্তু না, বরেন মিত্তিরদের বাগানে, তার স্বর্গগত স্বামীর

স্মৃতিকে— না কখনই তা হইতে পারে না। তাহার মুখ দিয়া আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়িল, "না, তাঁর ছেলের গায়ে ওদের বাতাস লাগাও খারাপ।"

অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা সারদা অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল। তাহার একবার মাকে ভ্রাতার হইয়া দুইটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু মায়ের কাছে তেমন করিয়া প্রতিবাদ করা তাহারও ভরসায় কুলায় না: কিন্তু ভ্রাতার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একবার অনুযোগ করিল, "যাক গে না মা, ছেলেমানুষ যেতে চাইছে।"

মাতা আবার একটি ক্ষুদ্র 'না' উচ্চারণ করিল; কিন্তু এবার তাহার কাছে ভ্রাতা-ভগিনী কেহই একটি কথাই বলিতে পারিল না। পুত্র মস্তক নত করিল, কন্যা মনে মনে বলিল, "মা যে কী বুঝে, মা-ই জানে।"

॥ ২ ॥

নিধু বলিল, "কী রে গুপে, যাবি ত জিম্‌ন্যাসটিক দেখতে?"

গোপেশ্বর বিষণ্ণ মুখে বলিল, "না ভাই, আমি যাব না।"

বিমল বলিল, "সে কী রে! যাবিনি কী?"

গোপেশ্বর বলিল, "না ভাই, মা বারণ করেছে।"

ক্যাবলা বলিল, "উঃ ভারি যে মাতৃভক্ত হয়ে উঠেছিস রে!"

গুপির কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল।

মান্‌কে বলিল, "ওঃ ভারি ত! আমারও মা অমন কত বারণ করে।"

বিপিন বলিল, "কারই বা মা বারণ করে না। মায়েরা ভাই কোথাও যেতে দিতে ভালোবাসে না। আমার মাও আমাকে যেতে দিত না, বাবা বল্লে কাকার সঙ্গে যেতে— তাই।"

বীরেন বলিল, "তা' হলে তুই আমাদের সঙ্গে যাবি নি? তবে যাঃ পালা। হ্যারে নিদে, বলা আসেনি?"

নিধু অদূরে বলা ওরফে বলাইচাঁদকে আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওই যে বলা, নাম করতেই এসে পড়েছে অনেকদিন বাঁচ্‌বে রে।"

মাণিক বলিল, "কী রে বলা চাটিম কলা, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি নাকি?"

তুখোড় ছেলে বলাই হুঙ্কার দিয়া বলিল, "আমি যাব না বলিস কী রে? ওরে শুনিছিস শনিবারে আবার থিয়েটার হবে মিত্তিরদের বাগানে।"

বালকের দল চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কে বললে রে? সত্যি নাকি?"

বলাই বুক ফুলাইয়া বলিল, "সত্যি না ত কী মিথ্যে, আর আমি দেখে এলুম গরুর-গাড়ি বোঝাই করে কল্‌কাতা থেকে কী সব এল ভাই।"

বিপিন বলিল, "এরে চ চ, দেখি গিয়ে।— গুপি তুই, মুখটা অমন করে রইছিস কেন ভাই? যেতে পাবিনি বলে? চল না, আস্তর থেকে একবার দেখে আস্‌বি।"

যদিও গুপি কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না। কিন্তু বালক-সুলভ চপলতা তাহাকে বড়ো চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিধু বলিল, "চল না গুপে তোর মা ত এখন দেখতে পাচ্ছে না।"

বলাই বলিল, "চুপিচুপি চল, কেও টের পাবে না।"

জিম্‌ন্যাসটিকের সু-উচ্চ বার্‌টাই সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয়। সেটা ত একেই গোপেশ্বরকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে আবার বন্ধুদিগের আহ্বান। গোপেশ্বরের ঘাড়ে যেন আজ ভূত চাপিল। সে যন্ত্র-চালিতের ন্যায় বন্ধুদিগের সহিত চলিল। উদ্যানে প্রবেশ করিতেই গোপী কিসের একটা তীব্র গন্ধ অনুভব করিল। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে দেখিল তাহাদেরই সমবয়সী কিম্বা

তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ কতকগুলি বালক কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ অশ্লীল ভাষায় ইয়ার্কি করিতেছে। ইহা দেখিয়া গোপী শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গীগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। গোপেশ্বরও তাহাদের সহিত ঘুরিতেছিল, কিন্তু তাহার পদদ্বয় যেন কাঁপিতেছিল— একে মাতৃআজ্ঞা অবমাননা, তায় কদর্য স্থানে। ম্যাজিক আরম্ভ হইতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। গোপেশ্বর সঙ্গীদিগের সহিত যন্ত্র-চালিতের ন্যায় যাইতে যাইতে উদ্যান বাটিকার একটি কক্ষে তাহার দৃষ্টি পড়িল। কি বীভৎস দৃশ্য! পানোন্মত্ত যুবকবৃন্দের বিকট চিৎকারে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। একটা তীব্র গন্ধে তাহার গা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। তাহার মনে সহসা একটা আতঙ্কের উদ্রেক হইল। গোপেশ্বরের জিম্‌ন্যাস্‌টিক দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে তিরোহিত হইল। আর তাহারা তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারিল না। মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল সে মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও আসিয়াছে। গোপেশ্বর সত্যকে সম্মুখে পাইয়া বলিল, "সত্য, আমি ভাই যাই।"

সত্য বলিল, "সে কী রে! এখনি ত আরম্ভ হবে, দেখবি না?"

গোপেশ্বর তীব্রস্বরে বলিল, "না, আমি চল্লুম"— বলিতে বলিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। যাইতে যাইতে মাতার অস্ফুট বাক্যগুলি মনে পড়িয়া গেল— "তার ছেলের গায়ে ওদের বাতাস লাগাও খারাপ।" ভাবিল মা কী করে যে সব জানিতে পারে। ঘৃণায় গোপীর সমস্ত শরীরটা রি-রি করিতেছিল, সে পুকুরে একটা ডুব দিয়া গৃহে ফিরিল।

সারদা বলিল "হাঁরে গুপি, এই সন্ধেবেলা তুই নেয়ে এলি? দেখ্‌ছ মা, ছেলের রকম দেখ্‌ছ।"

মা বলিল "বোধহয় কিছু মাড়িয়ে-টাড়িয়েছে।"

সারদা বলিল, "মাড়িয়েছিল বলে এই সন্ধেবেলা কী নাইতে হবে গা? হাত পা ধুয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিলেই হত। একমাথা চুল,— সারা রাত ভিজে থাক্‌বে; বেশ যা হোক।"

মা বলিল, "হয়ত বড়ো" ঘেন্না করছিল তাই নেয়েছে। না হলে ও ত ও-রকম করে না বাপু!" মাতা আজ পুত্রের আনন্দ ও উৎসাহকে কীরূপে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, তাহা এখনও মনে জাগিয়া আছে, তাই মাতা আজ পুত্রের পক্ষে।

পুত্র চমকিত হইয়া উঠিল,— হয়ত ঘেন্না করেছিল। সত্যই ত তাহার ঘেন্না করিয়াছিল। গুপির মনে প্রশ্ন উঠিল, "মা হলে কী সব জানতে পারে?"

খাইতে বসিয়া গুপির মুখে অন্ন উঠিতেছিল না। যতক্ষণ না সে মাকে সব কথা বলিতে পারে. ততক্ষণ সে স্বস্তি পাইতেছিল না। কিন্তু কী করিয়া সে বলে, বড়ো লজ্জা করে যে। লাজুক ছেলে গুপি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না।

মাতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতেছিল পুত্র কী বলিতে চাহে, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। মাতা মনে করিল বুঝি জিম্‌ন্যাসটিক দেখিতে যাইবার জন্য আর-একবার অনুরোধ করিবে।

গোপেশ্বর অন্যদিন শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে আজ কিন্তু তাহার কিছুমাত্র নিদ্রা আসিতেছিল না। কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছে দেখিয়া, মা ডাকিল, "গুপি।"

"কেন মা?"

"ঘুম আস্‌ছে না রে?"

"না মা।"

সারদা হাসিয়া বলিল, "কী করে ঘুম আসবে মা, ওর মনটা এখন জিম্‌ন্যাসটিক কর্‌ছে; না রে গুপি?"

"না দিদি, ও-সব দেখতে আর আমার একটুও ইচ্ছা যাচ্ছে না।" ক্ষণকালের জন্য সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গোপেশ্বর আস্তে আস্তে বলিল, "মা, তুমি কী করে সব জান্‌তে পার?"

মা হাসিয়া স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "কী জান্‌তে পারি রে বোকা?"

সারদাও মায়ের হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "গুপে যা মাঝ্‌খান থেকে এক-একটা কথা বলে মা, শুন্‌লে হাসি পায়।"

মাতৃবাক্য বিশ্বাসী পুত্র বালক গোপেশ্বর বলিল, "তুমি হাস্‌ছ দিদি, মা কিন্তু সব জান্‌তে পারে।"

সারদা বলিল, "কী জান্‌তে পারে বল্ না।"

"আমি মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে—"

সারদা বলিল, "ও হরি, এই বুঝি তোমার বিদ্যে হচ্ছে। মা বারণ কর্‌লে তবুও গেলি কী বলে?"

গোপেশ্বর আস্তে বলিল, "গিয়ে আমার কীরকম ঘেন্না কর্‌ছিল, মা তা জানে। আমি আর কিন্তু কখ্‌খনও যাব না দিদি, তুমি দেখো।"

মাতা পুত্রের গায়ে একটি হাত রাখিলেন। গোপেশ্বর মাতার আর-একটু নিকটবর্তী হইয়া, মায়ের মুখের নিকট মুখ আনিয়া, গলার স্বর আরও একটু নম্র করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "মা, আমি তোমায় না বলে ওদের বাগানে গেছিলাম, তুমি রাগ কর্‌বে মা?"

স্বল্পভাষিণী মাতা কোনো কথা বলিল না, শুধু পুত্রকে স্নেহভরে আপনার বক্ষের খুব নিকটে টানিয়া লইল। গুপির বুক হইতে একটি বোঝা নামিল— মা মার্জনা করিয়াছে। সে মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া দিদিকে বলিল, "আমি আর ত মাকে না বলে কখনও কোথাও যাব না।" মনে মনে বলিল, "কখ্‌খন না, কখ্‌খন না।" আনন্দের আতিশয্যে গুপির আজ কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। সে অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। মা ও দিদিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিল। গোপেশ্বর বলিল, "এই ত ফোর্থ ক্লাসে পড়ছি, আমার পাশ দেবার আর তিন বছর আছে না মা?"

মা বলিল, "হ্যাঁ।"

গোপেশ্বর বলিল, "আচ্ছা দিদি, এই তিনটে বছর যদি তিন দিনে কাবার হ'ত—"

দিদি বলিল, "তুই বলনা, তা' হলে—"

গোপেশ্বর বলিল, "তা' হলে বেশ হ'ত।"

দিদি বলিল, "তা' হলে তুই একলাফে বড়ো হয়ে উঠতিস।"

গুপি বলিল, "তা' ত; আর অমনি শীগ্‌গির শীগ্‌গির পাশ করতুম।"— খানিক থামিয়া গুপি আবার বলিল, "আচ্ছা মা, বছরগুলো এত বড়ো হয়েছে কেন?"

মা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "জানি না।"

গুপি বলিল, "জান না— তুমি আবার জান না। তুমি সব জান, বলছ না তাই।"

সারদা বলিল, "মা অত বকতে পারে না তোর সঙ্গে। মা বলে সারাদিন খেটেখুটে একটু শুয়েছে, তা না তুই সেই অবধি বক্‌বক্ করতে আরম্ভ করেছিস্।"

মায়ের ঘরে দু'টো গরু বাছুর আছে। দুটা পয়সা সুসার করিবার জন্য ধান-চালের কাজগুলাও মাতা স্বহস্তে করে, এবং সাংসারিক নানারকম হাড়ভাঙ্গা কাজকর্ম সারিয়া রাত্রে যখন সে পুত্র-কন্যাকে লইয়া শয়ন করে তখন পুত্র কন্যার বিশৃঙ্খল কথাগুলো বিশ্রামের চেয়েও বিরামদায়ক। তাই মা বলিল, "বকুক্ গে।"

গোপেশ্বর বলিল, "মা, তুমি গল্প করো না।"

মা বলিল,"কী গল্প?"

"বাবার গল্প। বাবা আমায় কী হতে বলে গেছে মা?"

মা বলিল, "আর একটু বড়ো হও তখন বল্‌ব।"

গোপেশ্বর জেদ ধরিয়া বসিল, "না, তুমি এখন বলো, আমি মনে মনে ঠিক করে রাখি। দিদি, তুমি বলনা, মা বল্‌ছে না।"

উদারহৃদয় পিতার চরিত্র বর্ণনা-করিবারই উপযোগী। সারদাও পিতার কথা বলিতে বা শুনিতে ভালোবাসিত। তাই মায়ের হইয়া সারদা বলিল, "আমার বেশ মনে পড়ে তুই তখন ছোটো। বাবা বল্‌ত, 'ছেলেকে যে কী করে মানুষ কর্‌তে হয় তা আমি দেখাব। ছেলে মেয়ে ত নিজের হাতে গড়া পুতুল, তাদের যেমন করে গড়ে তুল্‌বে তারা ঠিক তেম্‌নি ভাবে গড়ে উঠ্‌বে।' মাকে শুনিয়ে বল্‌ত, "তুমি দেখ আমার ছেলে-মেয়েকে কী রকম করে তয়েরি করি। লেখাপড়া ত শেখাবই; তা ছাড়া আমার গুপি যখন দেশের কাজ করে' দশের উপকার করে' লোকের প্রীতিভাজন হয়ে আমার দেশের সুসন্তান বলে পরিচিত হবে, তখন সে যে আমারই ছেলে, আমি যে তারই বাপ, এ কথা মনে করে গর্ব অনুভব কর্‌ব।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে উৎসাহে গোপেশ্বরের বুক দশহাত হইয়া উঠিল। এই কথা সে মায়ের মুখে, দিদির মুখে কতবার শুনিয়াছে, তবুও এই কথাটাই তার সবচেয়ে ভালো লাগে। সে কী সেরূপ হইতে, তার পিতার কথা অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। মা একদিন তাহাকে বলিয়াছিল সে যদি খুব ভালো ছেলে হয় তাহা হইলে তাহার পিতা স্বর্গ হইতে তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। গুপি উত্তেজিত ভাবে বলিল, "তারপর, তারপর দিদি?"

দিদি বলিল, "তার পর ভাই, বাবা এমন সরল মানুষ ছিল যে আমি ত বাবার মতো এমন লোক একটাও খুঁজে পাই না। বাবা কোনো কথা মনে রাখ্‌তে পার্‌ত— না, যেকথা যখনই মনে হত তখনই মুখফুটে সে-কথা বল্‌ত। মা সেইজন্য বাবাকে বল্‌ত, 'তুমি বড়ো বেশি আশা করো, অত আশা করো না। আজ যদি বাবা থাক্‌ত গুপি!"

পিতার নামে বিধবা কন্যার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। গুপিরও মনে হইল, "থাক্‌ত যদি বেশ হইত; কেন রহিল না।" পিতার নামে পুত্রেরও চক্ষু ছলছল করিতেছিল, এক্ষণে তাহা আর বাধা মানিল না।

মাতা দুইপাশে ছেলে মেয়ে লইয়া মধ্যে শয়ন করিত, বুঝিতে পারিল পুত্র কন্যা নীরবে রোদন করিতেছে। মাতা দুইটি হস্ত বিস্তার করিয়া দুইদিকে দুইজনের গায়ের উপর স্থাপন করিল, কাহাকেও কোনো কথা বলিল না বা বুঝাইতে চেষ্টা করিল না। শুধু দুইখানি স্নেহ-কোমল হস্ত নিঃশব্দে পুত্র-কন্যার অঙ্গের উপর স্থাপন করিল। তাহার স্নেহ-ভরা নীরব স্পর্শ যেন ভাষা ধরিয়া উভয়কে বলিতেছিল, "ওরে আমার পিতৃহারা পুত্র-কন্যা, ভয় কী? এই যে আমি তোদের মা রয়েছি।"

॥ ৪ ॥

বাড়ির মাঝখানে পার্টিসান হইয়া গিয়াছে। ওবাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইলে এবাড়ির সমস্তই দেখা যায়। এবাড়ির খড়ো চাল তাও জরাজীর্ণ। পরদিন ওবাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া মেজখুড়ি ডাকিলেন, "বউমা।"

গুপির মা গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "কেন মা, মেজ-খুড়ি?"

মেজখুড়ি বলিলেন, "বলিনি এমন কিছু, তবে না বোলেও আবার থাক্‌তে পারি-নি। অসৈরনগুলো দেখ্‌তে পারি-নি, কাজেই বল্‌তে হয়। বল্‌ছিলুম কী, কাল ছেলেটাকে পাঠালে না কেন? এ বাছা তোমার কী রকম গোঁয়ার্তুমি? গেরাম সুদ্ধ লোকের ছেলেরা গেল জিম্‌ন্যাসটিক দেখ্‌তে, তুমি তোমার ছেলেটাকে পাঠালে না— এর মানেটা কী? কেউ কী আর বুঝ্‌তে পারে না— তোমরা ডুবে ডুবে জল খাও, মনে করো শিবের বাবাও জান্‌তে পার্‌বে না। জলে বাস করে কুমিরের

সঙ্গে বাদ সাধা! গ্রামের মধ্যে ওরাই হল বড়োলোক, জমিদার বল্‌লেই হয়; ওদের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে যাওয়া? না হয় একটু চরিত্র খারাপ; তা বড়োমানুষের ছেলেদের অমন একটু হয়।"

গুপির মা বলিল, "বিবাদ ত আমি করিনি খুড়িমা।"

মেজখুড়ি মুখ ভার করিয়া বলিল, "না করাই বা হল কোন্‌খানটা? সব ছেলে গেল, কেবল তোমার ছেলে গেল না; এ কথা যদি মিত্তিরদের বাড়ির কেউ জান্‌তে পারে, তা হলেই ত একটা বিবাদ হল। আবার হল না কেমন করে? যাই বলো, যাই কও বাছা, এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

মেজখুড়ির পুত্রবধূ অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "কেন পাঠাবে বলো। ওর হল ভালো ছেলে; আমাদের খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশে যদি খারাপ হয়ে যায়।"

মেজখুড়ি মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দেখে আর বাঁচিনি। একবারখানি গেলেই কী সোনার ছেলে রাং হয়ে যেত।" মেজখুড়ির আরও যা মনে আসিল তাহাই বলিয়া গেলেন। গুপির মা সমস্ত ভর্ৎসনা মাথা নত করিয়া শেষ পর্যন্ত শুনিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহদ্বারে সারদা দাঁড়াইয়া রাগে গসগস করিতেছিল। মাতা গৃহে প্রবেশ করিতেই বলিল, "আচ্ছা মা, তুমি চুপ করে রইলে?"

মা হাসিয়া বলিল, "কী কর্‌ব?"

"কী কর্‌বে! আমাদের ছেলেকে আমরা পাঠাই না-পাঠাই সে আমরা বুঝ্‌ব; মেজঠাকুমার অত ট্যাক্‌ট্যাকানি কথা কেন বলো দিকিনি?"

মা বলিল, "বলুক্‌ গে। যারা বড়ো হয় তারা অমন বলে।"

"বলে অম্‌নি। দোষ নাই ঘাট নাই শুধু শুধ অম্‌নি যা ইচ্ছে তাই বল্‌বে। কেন? আমার ওসব সয়না বাবু।"

মা বলিল, "সয় না বল্লেই কী হয় মা, সইতে শিখ্‌তে হয়।"

সারদা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, তোমার কিছু রাগ হচ্ছে না?"

মা বলিল, "কার উপর রাগ কর্‌ব? ভগবান যাকে মাটি করেছে তাকে মাটি হয়েই থাক্‌তে হয়। বজ্রটা যখন বুকে সইল তখন দুটো কাঁটার ঘা কী সওয়া যায় না মা?- মানুষের দুটো কথা?"

সারদা মায়ের ক্রোধশূন্য মুখের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত হইল। সে মনে মনে বলিল, "তাই তো, বজ্র যখন বুকে সহিল, তখন দুটো কাঁটার ঘা, লোকের দুটো কথা সয় না? কেন?" সারদা মনে মনে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল তাহাদের স্বামী নাই, পিতা নাই, অর্থও নাই, সামর্থ্যও নাই, আছে শুধু একটি ভাই, তাও নাবালক। তাহারা সম্পূর্ণ সহায়সম্পত্তিহীনা। হইলেও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার মনে পড়িল, "কেন? তারা তো কারো খায় না, কেউ ত তাদের সাহায্য কর্‌ছে না। খাক না খাক আপনার ঘরে বুকে হাত দিয়ে তারা পড়ে আছে; তবুও তাদের ওপর লোকের এত আক্রোশ। কেন?"

মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কী ভাব্‌ছিস্‌ সারি?"

সারদা বলিল, আচ্ছা মা, আমাদের ওপর লোকের এত আক্রোশ কেন বল দিকিনি? তুমি মা বরেন মিত্তিরদের ওখানটা দিয়ে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছ, সেইজন্যে ঘোষপাড়ার ভেতর দিয়ে একটু ঘুরে জল নিয়ে আসি, তাও কথা। 'দেমাক' 'অহঙ্কার' নানান কথা শুনিয়ে শুনিয়ে সব বল্‌বে। আমরা কার কী করিছি? এবার যদি কেউ ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলে আমি তাদের কড়া বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেব।"

মা বলিল, "ছিঃ, ওসব মৎলব কর্‌তে নেই। যে যা বলুক্‌ গে না, আমাদের গায়ে ফোস্কো পড়ছে না ত। সহ্য গুণ বড়ো গুণ, সহ্য কর্‌তে শেখো।"

সারদা বলিয়া উঠিল, "তা বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সয় না—" বাধা দিয়া মা হাসিয়া বলিল, "ও একটা প্রবাদ কথা। মরাকে যদি কেউ মারে মড়ার তাতে আর কী ক্ষতি হল। যে

মার্‌লে সে না হয় হাতের সুখ করে নিলে। আমরাও সেইরকম মরা, আমরা ত মরেই আছি; আমাদের যদি কেউ মারে সে না হয় হাতের সুখ করে নিলে। আমাদের তাতে কিছু ক্ষতি হবে না মা।"

সারদা মায়ের কথাগুলি মনোনিবেশ পূর্বক শুনিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে মায়ের বিকারশূন্য মুখের দিকে তাকাইয়া স্তম্ভিত হইল, মা বলে কী! সে মনে মনে বুঝিতে চেষ্টা করিল, মা যা বলিয়াছে তা ঠিকই ত। কিন্তু সে পারে না কেন? সারদার মনে হইতে লাগিল একবার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে মাকে বলে, 'মা আমি কেন তোমার মতো সইতে পাবি না? আমায় শিখিয়ে দাও না মা সহ্য কর্‌তে।' কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

মা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দিত হইল।

॥ ৫ ॥

রায়পুকুরই পল্লির মধ্যে সবচেয়ে নির্জন। গৃহিণীরা রায়পুকুরের ঘাটটিই যুবতীদিগের জন্য নির্বাচিত করিয়া দিয়াছেন। রায়েদের এখন কোনো চিহ্নই নাই,— অতীত গৌরবের স্মৃতি-স্বরূপ এই জীর্ণ পুরাতন ঘাটটিই রায়েদের নাম বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রীষ্মের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে পল্লি-যুবতীগণ জল আনিবার ছল করিয়া দল বাঁধিয়া এই নির্জন ছায়া শীতল রায়পুকুরের ঘাটে বসিয়া জটলা করিত। আজও তাহারা তাহাদের যৌবনসুলভ কলহাস্যে রায়পুকুরের ঘাট মুখরিত করিতেছিল। মোহিনী বলিল, "কী লো অনঙ্গ, তোর যাবার নোটিস এসেছে নাকি?"

অনঙ্গমঞ্জরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই, আর আস্‌বে না? এতদিন এসেছি!"

ললিতা বলিল, "এরই মধ্যে এতদিন হয়ে গেল লা অনঙ্গ? এই ত মোটে দেড় মাস এসেছিস।"

বড়োবোন লবঙ্গলতা স্মিতহাস্যে বলিল, "ওদের ওই রকমই রে ললিতা। এই দেড় মাসের ভেতর ওদের বোধহয় দেড়শ'খানা চিঠি লেখালেখি হয়েছে।"

সলজ্জ সহাস্য মুখে অনঙ্গ বলিল, "হ্যাঁগো বড়দি, নিজেদের কম কসুরটা যায় কিনা।"

বিরাজ বলিল, "হ্যাঁ এইবার পথে এস; নিজের কথাটা কেউ বল্‌তে চায় না।"

লবঙ্গ বিরাজের দিকে ঈষৎ রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিল, "এবার শুন্‌বি তা হলে বিরাজ—"

এমন সময় শ্যামাসুন্দরী আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিতে করিতে বলিল, "নাঃ, মুখপোড়াদের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়া গেছে। এখানে আমরা দুপুর বেলা আসি তাও মুখপোড়ারা খবর রেখেছে গা।"

মোহিনী কলসীটা জলে ভাসাইয়া দিতে দিতে বলিল, মুখে আগুন, মুখে আগুন।"

অনঙ্গ আপনার বরাঙ্গখানি জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বলিল, "যমের ভুল, যমের ভুল।"

মালতী কক্ষ হইতে কলসীটি ভূমে নামাইয়া রাখিয়া বলল, "ঘাটের মড়াদের জ্বালায় ঘাটে আসা দায়।"

বিরাজ উহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বলিল, "তোরা যেমন ভয় করিস্ ওরাও তেমনি জো পায়।"

লবঙ্গ বিরাজের বয়সী। সেও বিরাজের কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "সেই তো, ভয় কর্‌বার দর্‌কার কী? ঘাটে আস্‌বি, জল নিবি, আপনার মনে গোঁ ভরে সমান হয়ে চলে যাবি। তা নয়, তোরা হুড় কর্‌তে কর্‌তে আস্‌বি, হুড় করতে করতে যাবি, যেতে যেতে আবার ফিরে ফিরে চাইবি ভয় কর্‌বি 'এরে মুখপোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে,' 'ওইর মুখপোড়া আস্‌ছে'। ও রকম কর্‌লে ত ওরা আরও জো পেয়ে যাবে।"

সারদা বলিল, "কার কতা বল্‌ছ গা বিরাজ-দি?"

বিরাজ বলিল, "তুই জানিস নি? জান্‌তেও যেন না হয়। ওই যে লো— নামটা আবার কর্‌ব। অনামুখোদের নাম কর্‌লে আজকের দিনটাই মাটি হয়ে যাবে।"

আজ সারদা ইহাদের সহিত আসিয়াছিল, যদিও সে বড়ো একটা ইহাদের সহিত আসিত না। তাহার সাবধানী মাতা তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিত। আজ যখন গোপালদা'র বউ আসিয়া ডাকিল, 'সারি-ঠাকুরঝি, জল আন্‌তে যাবি?" মাতা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সারদাও মাতার কাছে শুইয়াছিল, কিন্তু তাহার চক্ষে ঘুম আসিতেছিল না। গোপালদা'র বউয়ের আহ্বানে সারদা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "যাব বউদি চল।" সমবয়স্কার সহিত একত্র হইতে কাহার না সাধ যায়।

মোহিনী বলিল, "আহা সারি ন্যাকা যেন!"

গোপালের বউ বলিল, "ও কী করে জান্‌বে ভাই, ও ত আমাদের সঙ্গে আসে না।"

মোহিনী বলিল. "ও সত্যি বটে!"

শ্যামাসুন্দরী বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বিরাজ যা বলেছে তা মিছে না। ভয় কর্‌লেই চেপে ধরে।"

বিরাজ বিজয়ীর মতো বলিল, "মোহিনী জানে সেদিন কী রকম শুনিয়ে দিয়েছিলুম।"

মোহিনী বলিল, "অত রূপ নিয়ে তোমার সাহসকে ধন্যি।"

মালতী হাসিয়া বলিল, "আমি ত দেখেছি বিরাজ-দি, তুমি যখন ছোঁড়াকে ক্যাঁট ক্যাঁট করে বল্‌ছিলে, তখন— মাইরি বল্‌ছি বিরাজ-দি, মাইরি বল্‌ছি— ছোঁড়া তোমাকে যেন রাহুর মতো গ্রাস করছিল।"

সহাস্য মুখে গোপালের বউ বলিল, "বিরাজ, অত রূপ তবু এত সাহস হল কী করে ভাই? আমরা ত কালোকুচ্ছিত তবুও ভয়ে কেঁপে মরি।"

মালতী বলিল, "বরেন মিত্তিরের ওটা বন্ধু না কে; ও মুখপোড়াটাকে কিন্তু ভাই বেশ দেখ্‌তে।"

মালতীর কথা শুনিয়া সঙ্গিনীর দল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দূর দূর দূর হ'। ভালোকে ভালো বল্‌ব না ত কী বল্‌ব বল্‌ দিকিনি?"

তরঙ্গ হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল, "তোর বর কাল বলে'।"

সারদা অদূরে জলের ধারে একটি ভগ্ন সোপানের উপরে বসিয়া জলে কলসীটি ডুবাইয়া ধরিয়া সঙ্গিনীগণের রহস্যালাপ একমনে শুনিতেছিল। তাহার পিঠের উপর আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশি বাতাসে উড়িতেছিল। তাহার বিষণ্ণ নয়ন দুটি যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্যে সমুজ্জ্বল, স্তি অধরে হাসির মৃদু রেখা।

"সারি!" মা ডাকিল, "সারি!"

সারদা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, একি মা! এই সে দেখিয়া আসিল মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইল, বাবাঃ মার কী সতর্ক ঘুম! মাতা সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বলিল, "এত রোদে জল নিতে এসেছিস্‌ গা তোরা?"

গোপালের বউ বলিল, "এখানে ত বেশ ঠান্ডা কাকিমা, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।"

সারদা মাতার কথায় ভরসা পাইয়া বলিল, "বউদি ডাক্‌লে, তাই মনে করলুম এক কলসী জল নিয়ে আসি বউদির সঙ্গে।"

মা তেমনি স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "তা বেশ করেছিস্‌।" কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া মাতা কন্যাকে ডাকিলেন "আয়।" কন্যা একটু ইতস্তত করিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত বুঝিলেন।

সারদা পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, এই দেখে এলুম তুমি ঘুমিয়েছ, এরই মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল?"

মাতা কোনো উত্তর দিল না, তাহার মুখে শুধু একটু বিষণ্ণ হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেথায় যদি কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থাকতেন তাহা হইলে বুঝিতেন, সে হাসি কান্নার চেয়ে করুণ। মা মনে মনে বলিল, যেদিন শ্মশান সেজে তুমি আমার বুকের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছ, সে দিন থেকে তোমার মায়ের ঘুমের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচেছে।

মাতা পুত্রী পশ্চাৎ ফিরিতেই যুবতীগণের চোখে চোখে ইঙ্গিত চলিতেছিল। তাহারা যখন অদৃশ্য হইয়া গেল তখন ঘাটে আবার গুঞ্জন উঠিল, "দেখ্‌লি মাগির দেমাক!"

শ্যামাসুন্দরী বলিল, "অত তা বলে ভালো নয়।"

মোহিনী বলিল, "বিধবা মেয়ে ত কারো হয় না, ওনারই হয়েছে।" এইরূপে তাহারা আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল।

॥ ৬ ॥

মাতা গৃহে আসিয়া সারদাকে বলিল, "সারি, মহাভারতখানা নিয়ে আয় তো গা।"

কন্যার মনে তখন সঙ্গিনীগণের সরস কথাগুলি জাগিতেছিল, মহাভারত কী তখন ভালো লাগে?— সারদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাভারতখানি লইয়া আসিল এবং অন্যমনস্কভাবে ক্রমান্বয়ে পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। মাতা অলক্ষ্যে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথা পাঠ করিয়া লইল। কিন্তু কী করিবে উপায় নাই। তাহার মাতৃহৃদয় মর্মান্তিক বেদনায় হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল, উপায় নাই, উপায় নাই।" একবার তাহার স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া পৃথিবী ফাটাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, "ওগো, তুমি একী পরীক্ষার মাঝে আমায় ফেলে চলে গেলে! আমি যে আর পারি না গো পারি না।"

স্বামী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন সে আকুল হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ওগো তুমি তোমার ছেলে-মেয়েকে কার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছ?"

দীপ নিভিবার পূর্বে একবার যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখন তাহার মরণোন্মুখ স্বামীর মুখও ঠিক তেমনিভাবেই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্পর্দ্ধা ভরে বলিয়াছিলেন "আমার উপযুক্ত সহধর্মিণীর হাতে!" আজ সে কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার নারী-হৃদয় অভিমানে ভরিয়া উঠিল, কখন না, কখন না; সে যে বড়ো অনুপযুক্ত। সে তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রু প্রাণপণে সম্বরণ করিল।

সারদা মলিন মুখে তখনও পাতা উল্টাইতেছিল। যে স্থানটা পড়িতে যায় সেই স্থানটাই ভালো লাগে না। সারদা বলিল, "মা, কোন্‌খানটা পড়্‌ব?"

মাতা তখন আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়াছেন। মা বলিল, "সাবিত্রী- উপাখ্যানটা পড়্।"

সারদা বলিল, "ওটা তো প্রায়ই পড়ি মা।"

মাতা কন্যাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল. ওইটা তুই বেশ পড়্‌তে পারিস, তাই আমার বড়ো ভালো লাগে।"

সারদা ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়া সাবিত্রী উপাখ্যানটা পড়িতে আরম্ভ করিল। সাবিত্রী যখন বালিকা একদিন নারদ আসিয়া সাবিত্রীর পিতার নিকট তাহার বৈধব্যের কথা কীরূপে উত্থাপিত করিল; কীরূপে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইল; শ্বশ্রূগৃহে আসিয়া সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ির কীরূপে মনোরঞ্জন করিল; তারপর শ্বশুরের রাজ্যনাশ, বনবাস, সারদা একে একে বর্ণনা করিতে লাগিল। বনে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, রাজকন্যা রাজবধূ হইয়া সাবিত্রীর বনে বনে ভ্রমণ; কাষ্ঠ আহরণ. ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়া সতী সাধ্বী পত্নী কীরূপে পতির পাশে পাশে ফিরিত, তারপর

কাষ্ঠে আহরণ করিতে গিয়া সত্যবান একদিন কীরূপে পীড়িত হইল; ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইল, সাবিত্রীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া সত্যবান প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এইখানে সারদা থামিল। এতক্ষণে মাতা-পুত্রীর নয়নদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে বন্যার ন্যায় অজস্রধারে বহিতে লাগিল। সারদার মনে পড়িল তাহারও এমনি একদিন গিয়াছে। যখন এই কথা মনে পড়িল তখন কিছুতেই তাহার অশ্রু রুদ্ধ হইতে চাহে না। মাতা অশ্রু মুছিয়া কন্যার দিকে চাহিল, দেখিল শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা রুক্ষকেশা রোরুদ্যমানা, সারদা তাহার সম্মুখে যেন একখানি প্রাণময় জীবন্ত পরিতাপ। সারদার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুর উৎস ছুটিতেছে। হাস্য-কৌতুকের মাঝখান হইতে কন্যাকে ক্রন্দনের মাঝে নিক্ষেপ করিয়া মাতা মনে মনে বলিল, কাঁদ মা কাঁদ, কেঁদে কেঁদে পৃথিবীকে প্লাবিত করে দে। কাঁদ অভাগিনী কাঁদ, হাসিতে যোগ দিস্‌নে মা। তুই ত এ জগতের নস; তুই যে মা স্বর্গের পুণ্যপ্রভা, দেবতার পূজার অর্ঘ্য। হাসি তোর জন্যে নয়, তুই শুধু প্রাণ খুলে মন খুলে কাঁদ্। তোর চোখের জল তোর মনের আবিলতা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক্, আর বিধবার কান্নার স্রোতে অশ্রুর স্রোতে এদেশে ভেসে যাক; নিষ্ঠুর জগৎ নিষ্ঠুর সমাজ দেখুক্ বিধবার চক্ষে কত অশ্রু, বক্ষে কত বল!

সারদা অশ্রু মুছিয়া আবার পাঠ আরম্ভ করিল। সাবিত্রী দুর্গম অরণ্য-মধ্যে পতির মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যম লইতে আসিয়া পশ্চাৎপদ হইল— সতীত্বের পূর্ণ জ্যোতির সম্মুখে যমের অবাধ গতিও স্থগিত রহিল; প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিল। ভারতের আদর্শ নারী সাবিত্রী প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যমকে পরিতুষ্ট করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া যম বর দিল শ্বশুরের রাজ্য;— স্বামীর পুনর্জীবন। বিশ্বে সতীর অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইল, ধর্মের কাছে ধর্ম নত হইল, শক্তি শক্তির পরিচয় পাইল। পাঠ শেষ করিয়া সারদা শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল,— কী দেখিতেছিল কে জানে। বুঝি ভাবিতেছিল, "তখনকার দিনে এখনকার দিনে এত বিভেদ কেন? তখন দেবতা ডাকিলে সাড়া দিত, এখন দেয় না কেন?"

॥ ৭ ॥

"দিদি কী হবে?"

কী যে হবে দিদিও তাহা জানিত না, তাই দিদিও বলিল, "কী হবে?"

মাতা রোগ-শয্যায়। এখন ভ্রাতা ভগিনীর অবলম্বন, এবং ভগিনী ভ্রাতার অবলম্বন। শুষ্ক মুখে ভাই-বোনে মাতার শিয়রে বসিয়া ভাবিতেছিল, কী হবে। মা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "সারি!"

সারদা মাতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "কী মা?"

মা একবার ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া লইল, দেখিল শুষ্ক মলিন মুখে তাহার পুত্র কন্যা বসিয়া আছে। তাহাদের এই সকাতর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মাতা মনে মনে বলিল, 'ভয় কী? তোদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব?' মুখে বলিল, "তোদের এত মুখ শুকিয়ে গেছে কেন রে? খাস্‌নি বুঝি সমস্তদিন।"

সারদা বলিল, "না মা, আমরা ত খেয়েছি।"

মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ পরে ডাকিল, "গুপি।"

পুত্র মায়ের মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "মা, আজ কেমন আছ মা?"

"ভালো আছি।"

"কই ভালো আছ মা? তুমি ত রোজই বল ভালো আছি।"

মা কোনো উত্তর করিল না। রোগের যাতনা অপেক্ষা পুত্র-কন্যার মলিন বদন মাতাকে আরও যাতনা দিল। তার পুত্র কন্যা চায় মাতাকে ভালো দেখিতে;— আহা বাছা আমার রে!

সারদা বলিল, "মা, বীরু ডাক্তারকে একবার ডাকাব?"

মা বলিল, "না মা, ওসবে কাজ নেই। হিন্দুর ঘরের বিধবা হয়ে জেনে শুনে কী ডাক্তারি ওষুধগুলো গেলা যায়।"

"তবে একবার রতন বদ্দিকে ডাকই না মা?"

মা ভাবিয়া বলিল, "ডাকা।" তাহাকে যে সারিতেই হইবে। না, না, তাহাদের ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াও সে সুখী হইতে পারিবে না। জগতে তাহারা জননী ভিন্ন আর কিছুই যে জানে না। তাহার বিধবা কন্যা, তাহার বালক পুত্র, তাহাদের মাতৃহারা করিয়া এই প্রলোভনময় সংসারের পিচ্ছিল পথে অসহায় ভাবে একা ফেলিয়া তাহার তো যাওয়া উচিত নয়;— না, না, কিছুতেই নয়। যম আসিলেও তাহাকে ফিরিতে হইবে।

গ্রামের মধ্যে রতন বদ্যি ওরফে কবিরাজ নীলরতন সেন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার খাই কিছু বেশি,— সপ্তাহে ওষুধের দাম দুইটাকা, তা ছাড়া বাড়িতে আসিলে ভিজিট আছে। গৃহে অর্থের অনটন; ঘরে আর কিছু নাই। সারদার হাতের দুইগাছি শাঁখা ছিল; সারদা বাক্স খুলিয়া সেই দুইগাছি বাহির করিল। এই শাঁখা দুগাছিকে সারদা বড়ো যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যদি কখনও গুপির বউ হয় তাহলে এই দুগাছি সে তাহাকে যৌতুক দিবে। বিধবা ভগিনীর বড়ো আশার জিনিস, তাহার এয়োতের চিহ্নস্বরূপ এই শাঁখা দুগাছি তাহার ভ্রাতৃজায়ার হাতে পরাইয়া আপনার অপূর্ণ মনের সাধ পূর্ণ করিবে। সারদা নাড়িয়া-চাড়িয়া শাঁখা দুগাছি দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণে কখন তাহার অজ্ঞাতে বিন্দু অশ্রু আসিয়া জমা হইল। তাহা তাহার বড়ো আশার সামগ্রী!—কিন্তু তাহার রুগ্ন মা। গুপি যদি বাঁচে এমন কত শাঁখা গড়াইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু মা গেলে তো আর মা হবে না। এই কথা যখন তাহার মনে পড়িল তখন সে আর মুহূর্ত বিলম্ব করিল না। গোপেশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, "গুপি, তুই মার কাছে একটু বস, আমি চট করে ওবাড়ি থেকে একবার আসছি।"

গোপেশ্বর বলিল, "কেন দিদি?"

সারদা বলিল, "ও-বাড়ির ন-দি বলেছিল শাঁখা কিনবে যদি আমার দুগাছা কেনে তো জিজ্ঞাসা করে আসি।

মা ঘুমায় নাই, তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় পড়িয়াছিল, সারদার কথা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কীরে সারি?"

সারদা কিন্তু কিন্তু করিয়া বলিল, "ওই শাঁখাটার কথা বলছিলুম।"

মা বলিল, "বিক্রি করিসনি।" শাঁখা দুগাছা যে কন্যার কত আদরের মাতা তাহা জানিত, তাই বলিল, "বিক্রি করিস্‌নি।"

সারদা বলিল, "কী হবে মা, ও দুগাছা থেকে?" কী যে হবে তাহা কন্যা অপেক্ষা মাতা বেশি জানিত। মাতা মনে মনে বলিল, হায়রে তবু তাহাকে বাঁচিতে হইবে। সারদা বলিল, "মা ও-বাড়ির ন-দি যদি ওটা কেনে ত বেশি লোকসান যাবে না। আর বাঁধা দিলে সুদ দিতে হবে ত আবার মাসটি গেলেই, তার চেয়ে বেচে ফেলা ভালো।"

মাতা নিরুপায় ভাবে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই করো।"

কন্যা ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতাকে বলিল, "গুপি, তুই তা হলে একবার কবিরাজ-বাড়ি যা।"

গোপেশ্বর বলিল, "কোন্‌ কবিরাজ-বাড়ি যেতে বলছ দিদি? ওই—"

সারদা বলিল, "না, না, তুই ওই রতন বদ্যির বাড়ির যা; ও হাতুড়ের কাছে আর যাস্‌ নি। ও তো এতদিন দেখ্‌লে কিছুই তো হল না।"

গোপেশ্বর কবিরাজ ডাকিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কবিরাজকে একেবারে সঙ্গে করিয়া

লইয়া আসিল। রতন কবিরাজ আসিয়া তাহার মাতাকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রতন বৈদ্যের হাতযশ ছিল; তাহার চিকিৎসায় মাতা দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া পুত্র কন্যা ভগবানের উদ্দেশ্যে মনে মনে শতবার নমস্কার করিল। মাতা যেদিন পথ্য খাইল গোপেশ্বরের সেদিন আনন্দের সীমা নাই। সেদিন দিদির খাওয়া হইতেই বলিল, "দিদি, আমি বাসনগুলো মেজে আনি, তুমি মায়ের কাছে বসগে যাও।"

সারদা বলিল, "দূর! তুই কী কখন পারিস্-ছেলেমানুষ।"

গোপেশ্বর বলিল, "বা গো, আমি বুঝি পারি না তুমি মনে করছ। সেই ত ক'দিন কল্লুম, খারাপ হয়েছিল কী?"

সারদা বলিল, "সে দায়ে পড়ে দিয়েছিলুম ভাই। তুই মার কাছে বস্‌গে যা, আমার এখনি হয়ে যাবে।"

গুপি মায়ের কাছে আসিয়া একেবারে মায়ের কোলের ভিতর মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। আঃ কী শান্তি। তাহার মনে হইতেছিল, বুঝি এই ক্রোড় সে আর-একটু হইলে— ওঃ তাহা হইলে? মাতা সাদরে পুত্রের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "গুপি!"

"কেন মা?"

"ক দিন ইস্কুল কামাই হয়ে গেল, না রে? সামনে এগজামিন আসছে ভালো করে পড়া করো, — আমি ত একটু সেরেছি।"

পরদিন হইতে মাতা দেখিল, পুত্র তাহার দ্বিগুণ উৎসাহে পড়া আরম্ভ করিয়াছে।

॥ ৮ ॥

পূর্ব ঘটনার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গোপেশ্বর এখন পরিণতবয়স্ক যুবক, কলিকাতা রিপন কলেজের একটি মেধাবী ছাত্র। এবার বি এ দিয়া বাড়ি আসিয়াছে। আসিয়া সে যে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। ছায়াশীতল নির্জন পল্লিতে এবং শুধু এক মাতৃ-সন্নিধানে সে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার কী ওই কোলাহল-ময় জনবহুল কলিকাতা নগরী ভালো লাগে? কিন্তু উহাই যে উন্নতির স্থান, সাধনার সুবিশাল ক্ষেত্র। গোপেশ্বর শান্তিময়ী জন্মভূমির কোমল ক্রোড়ে, মাতার স্নেহের অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়া নবজীবন লাভ করিল। মাতা প্রবাস-আগত পুত্রকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, পুত্র সহাস্য মুখে মাতার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যাইতে লাগিল।

আজ বাহিরে বড়ো দুর্যোগ। সমস্ত দিন ধরিয়া টিপটিপিনি বৃষ্টি আবার প্রবল বেগে বাতাসও বহিতেছে। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া মাতা পুত্র ও কন্যায় মিলিয়া তখনও কথা হইতেছিল। সারদা বলিল, যে এইবার গুপির বিয়ে দাও।"

মা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ এখনই তো বিয়ে দোব। বউকে এনে খাওয়াব কী?"

সারদা বলিল, "কেন আমরা যা খাচ্ছি তাই খাবে।"

মা বলিল, "পরের মেয়েকে এনে শাক ভাত খাওয়াব? দাঁড়া, আর দিন কতক যাক্, গুপি আগে রোজগার করতে শিখুক।"

বিবাহের নামে গোপেশ্বর লজ্জিতভাবে কথা ঘুরাইয়া লইল, "উঃ বাইরে আজ কী দুর্যোগ! কলকাতায় মা ঠিক এমনি এক দুর্যোগের দিন এমন একটা মজা হয়েছিল!"

মা ও দিদি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "কী হয়েছিল রে?"

গোপেশ্বর সহাস্য মুখে বলিল, "সে ভারি মজা দিদি। সে দিন ঠিক এমনি দুর্যোগ, আমাদের মেসের বামুন এল না, আমাদের বাসার মেম্বাররা খাবার নিয়ে এসে তো খেলে; আমিও ভাব্‌লুম আমিও কিছু নিয়ে আসি;— এই মনে করে পড়তে বসে আর-সব ভুলে গেছি। তারপর পড়া

ছেড়ে যখন উঠ্‌লুম, বাইরের দিকে চেয়ে দেখি ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু খিদেও পেয়েছে। ছাতাটা নিয়ে মনে করলুম কিছু নিয়ে আসি। বলে তো বেরিয়ে পড়্‌লুম। খানিক দূর গিয়ে, জান দিদি, এম্‌নি জোরে বাতাস হতে লাগ্‌ল, আমার ত সেই ভাঙ্গা সাততালি লাগান ছাতাটার মাথাটা উড়ে গেল, আর আমি সেই ভাঙ্গা বাঁটটি হাতে করে ঠক-ঠক করে কাঁপ্‌তে কাঁপতে বাসায় ফিরে এলুম। এদিকে খাওয়াকে খাওয়াও হল না, ওদিকে ছাতাটাও গেল। মজা নয়? ছাতাটা কিন্তু আর দিন কতক আমার চল্‌ত।"

মা ও দিদি হাসিতে লাগিল। মা বলিল, "সেদিন সারা রাত উপোস করে রইলি?"

গোপেশ্বর বলিল, "তা আর কী করব মা? কাজেই!"

দিদি হাসিতে হাসিতে বলিল, "এমনি ছেলে তুমি!"

কথা কহিতে কহিতে সহসা মাতা উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, "হ্যাঁরে বাইরে কে দরজা ঠেলছে না?"

সারদা বলিল, "না, না, ও বোধহয় বাতাস। এত জলঝড়ে কে রাত্রে দরজা ঠেল্‌বে?"

গোপেশ্বর কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, কে ডাক্‌ছে বলে বোধ হচ্ছে।"

মাতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হারিকান লণ্ঠনটি লইয়া প্রাঙ্গণ পার হইয়া দরজা খুলিয়া দিয়া দেখিল, একী বিনোদ যে! গোপীর মা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কী হয়েছে বিনু?"

রুক্ষ-কেশ মলিন-বেশ বিশুষ্ক-বদন প্রতিবেশী-পুত্র বিনোদলাল বলিল, "খুড়িমা আজ বড়ো বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমার গুপিকে আজ রাত্রের মতো আমায় ভিক্ষা দাও। আমি বড়ো ভরসা করে এসেছি খুড়িমা, তুমি আমায় বিমুখ করো না।" বলিয়া সে বিবৃত করিল, তাহার বৃদ্ধ পিতা দুই ঘন্টা পূর্বে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, বাবা তোরা ত আমায় গঙ্গায় দিতে পারলি নি, তা দেখিস, বাবা তোর বুড়ো বাপকে যেন বাসি মড়া করিস্‌ নি। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকালের শেষ অনুরোধ, উপযুক্ত পুত্র হইয়া পিতার শেষ কামনা কেমন করিয়া অপূর্ণ রাখিবে ভাবিয়া আকুল হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, এই দুর্যোগে কেহ আসিতে চাহে না। সে একা বলিলেই হয়; ছোটো ভাই ফণী সে চৌদ্দ পনেরো বছরের বালক, আর পিতৃশোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে বলিতে বিনোদের দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে বিষণ্ণভাবে যাত্রার দৃষ্টিতে গুপির মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুড়িমা, আমি বড়ো আশা করে সর্বশেষে তোমার কাছে এসেছি, জানি তুমি আমায় বিমুখ করবে না।"

গোপেশ্বর বিনোদের মুখে সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে মায়ের মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল। মাতা সমস্ত কথা শেষ পর্যন্ত শুনিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও।"

গোপেশ্বর এতক্ষণ শুধু মাতার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে জননীর অনুমতি পাইয়া লাফাইয়া উঠিল। গামছাখানি স্কন্ধে ফেলিয়া গোপেশ্বর বলিল, "চল বিনোদ দা। আগেই আমাদের বাড়িতে আস্‌তে হয়।"

বিনোদলাল কোনো উত্তর দিতেই পারিল না, কৃতজ্ঞতায় তখন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সে মনে মনে বলিল, "ভুল হয়ে গেছে ভাই, ভুল হয়ে গেছে। আগে তো জানতুম না এই পর্ণকুটিরের অন্তরালে তোমাদের মাতাপুত্রের এত বড়ো হৃদয় লুকানো আছে।"

সারদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মায়ের কাণ্ড কারখানা দেখিল, কিন্তু কোনো কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সমস্ত রাত মাতা-পুত্রীর চক্ষে একবারও ঘুম আসিল না। বাহিরে বাতাসের শন্‌শন্‌ বজ্রের কড় কড়, ঝটিকার হুহুঙ্কার। প্রকৃতি যেন আজ প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরিয়া বিশ্বকে উলটপালট করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। মাতা জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে একবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, উঃ কী ভয়ঙ্কর! ওগো রণচণ্ডী একী তোর তাণ্ডব নৃত্য! ওগো

থামা, থামা, থামা, আজকের মতো থামিয়ে দে। গাছের শাখাগুলো মট মট করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। উদ্বিগ্ন মাতা নিদ্রাহীন চক্ষে সারা রাত বহু কষ্টে কাটাইল।

॥ ৯ ॥

যখন প্রভাত হইল আকাশ তখন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া সকলকার মুখে মুখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল, গুপির মা কাল ঝড়-জলের রাত্রে সাওখুড়ি করে ছেলেকে মড়া ফেল্‌তে পাঠিয়েছে। মেজখুড়ি স্নান করিতে করিতে গুম হইয়া শুনিয়া বলিল, বটে। বাড়ি আসিয়া আহ্নিক পূজা ফেলিয়া রাখিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে মুখ বাজাইলেন এবং হুঙ্কার দিয়া ডাক দিলেন "হ্যাঁগা বউমা।"

গুপির মা সে আহ্বানের তাৎপর্য বুঝিল, কোনো উত্তর না দিয়া গৃহ হইতে শুধু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণতলে মেজ-খুড়ির ঠিক সম্মুখীন হইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল। মেজ-খুড়ি বলিল, "বলি ব্যাপারখানা কী? আমরা কী সব মরিছি? এত গিন্নেপনা? কেন? সাপের পাঁচ-পা দেখেছ নাকি? একলা ঘরের একলা গিন্নি হয়ে এই দুর্যোগের রাত্তিরে দেশ সুদ্ধ লোক কেউ গেল না, আর তুমি কিনা ওই একরত্তী ছেলেটাকে মড়া ফেল্‌তে পাঠালে, বুড়ো কেশো রোগা ক্ষয়কাশ না যক্ষাকাশ কে জানে; সেসব ছুঁতেই দিতে নেই ছেলেপুলেকে। বাবাঃ সাহসকে ধন্যি! বুকের পাটাকে বলিহারি! এ-সব কী মেয়েমানুষ?"

মেজ-খুড়ির পুত্রবধূ কাপড় শুখাইতে দিতে আসিয়া গুপির মায়ের দিকে একবার ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এদেরই বলে মেয়ে গুন্ডা। শুন্‌লে না মা সেদিন তোমার ছেলে কী বল্‌ছিল।"

শাশুড়ি বলিল, "শুনেছি সব, গুন্ডামি বলে গুন্ডামি। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে, শিবরাত্তিরের পলতের মতো ধিকধিক কর্‌ছে। এসবকে কী মা বলে! এমন সব ডাকিনী মায়েদের পেটে কেন যে ছেলে হয় তাও জানিনি। এই তো আমাদেরও বউয়েরা রয়েছে!"

আত্মসুখ্যাতিতে গর্বে-স্ফীত হইয়া বধূ বলিয়া উঠিল, "আমরা বুক ঠুকে গলা বাজিয়ে খুব বল্‌তে পারি আমাদের মতো এমন মেয়ে আজকালকার দিনে পাবে না।"

মেজখুড়ি বকিয়া বকিয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলেন। গুপির মাও পুনরায় ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। সারদা দাওয়ার একপার্শ্বে নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দ্বিপ্রহরের পর বিনোদের সহিত সুস্থশরীর গোপেশ্বর প্রাঙ্গণে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

উৎকণ্ঠিতা মাতা ত্রস্তপদে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আয়।"

বিনোদ শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে গুপির মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার গুপিকে নাও খুড়িমা।"

সারদা স্নান করিয়া আসিয়া সেই অবধি ঠাকুর ঘরে রহিয়াছে, এখনও বাহির হয় নাই। ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর-একবার সে ঠাকুরের পায়ে ভক্তিভরে প্রণত হইল এবং নির্মাল্য লইয়া ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিতা শুদ্ধাচারিণী সৌম্যমূর্তি বিধবা ভগ্নী আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদী নির্মাল্য ভ্রাতার কপালে স্পর্শ করাইল।

বিনোদ বলিল, "খুড়িমা, আজ তোমরা যা উপকার কর্‌লে আমি বোধহয় জীবনে তা শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আমার বুড়ো বাপের শেষ অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে পেরেছি শুধু তোমার গুপিরই দৌলতে; তা না হলে আজ তাকে বাসিমড়া কর্‌তে হত।"

গোপেশ্বর মাতাকে সাক্ষী করিয়া বলিল, "দেখ্‌ছ মা, বিনোদদা সারা পথ আস্‌তে আস্‌তে কেবল ওই কথাই বল্‌ছে। বিনোদদা আমাদের এমনই পর মনে করে।"

মাতার দুইচক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তখন বুক তাহার ভরিয়া গিয়াছে, সে স্বর্গগত স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "স্বামী তোমার ছেলে-মেয়েকে তোমার মনের মতো করে তোমার উপযুক্ত করে গড়্‌তে পেরেছি কী?"

সন্ধ্যার পর গোপেশ্বর দিদিকে বলিল, "দিদি, আমার গাটায় হাত দিয়ে দেখ তো।"

সারদা ভ্রাতার গায়ে হাত দিয়া সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল "উঃ গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে।"

সে ত্বরিত পদে বন্ধনগৃহে মাতার নিকট আসিয়া বলিল "ওমা, গুপির বুঝি খুব জ্বর এলো গো।"

মাতা তখন সদ্যধৌত বাসনগুলি গুছাইয়া রাখিবেন বলিয়া বাহির হইতে গৃহে লইয়া যাইতেছিল। কন্যার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাহার হাতের বাসনের গোছা ঝনঝন করিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কী রে?"

মাতা ছুটিয়া পুত্রের কাছে আসিয়া দেখিল গুপি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার চক্ষু জবাফুলের মতো লাল রক্তবর্ণ দেখিয়া মাতার বুকের রক্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। এখন উপায় ! এই রাত্রিকালে সে কাহার কাছে যাইবে? সংসার-সংগ্রামে বিজয়িনী নারী আজ সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিল। রাত্রিও বাড়িতে চলিল, গুপির জ্বরও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। দুর্বলতায় মাতৃহৃদয় তখন ভরিয়া গিয়াছে; সংযমের সমস্ত তন্ত্রীগুলি একে একে এলাইয়া পড়িয়াছে। সে যে মায়ের প্রাণ! স্বর্গের সমস্ত সুষমা দিয়া, মর্ত্তের সমস্ত মাধুর্য্য দিয়া, সংসারের সমস্ত অনাবিল কোমলতা দিয়া মায়ের প্রাণ যে গঠিত। মেজখুড়ির বাক্যগুলি যেন সশব্দে কানের কাছে বাজিয়া উঠিল। মাতা শিহরিয়া উঠিল। তবে কী সে নিজে হাতে না, না, কখন না, কখন না, কখন না, এমন হইতে পারে না। ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যে এমন অবিচার কখনও হইতে পারে না। মাতা পূর্ণ বিশ্বাসে রুদ্ধ নিশ্বাসে পুত্রের শিয়র-দেশে অটল অকম্পিত ভাবে বসিয়া রহিল। সারদা মাতার মুখে এই ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন দেখিয়া নির্বাক ভাবে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। একটি কথা কহিবার মতো তাহার শক্তি তখন ছিল না।

প্রত্যূষে তরুণ সূর্যের কনক কিরণ যখন তাহাদের ভাঙ্গা জানালার ফাটল দিয়া উঁকি মারিল, তখন গোপেশ্বরের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। মাতা নিশ্চিন্তভাবে একটি নিশ্বাস ফেলিল, যে নিশ্বাসকে সে রুদ্ধ করিয়া সমস্ত রাত্রি প্রতীক্ষা করিতেছিল সেই নিশ্বাসকে ধীরে ধীরে শূন্যের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া কন্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাহার দিকে চাহিবারও অবকাশ হয় নাই। এই লতার মতো কোমল বিধবা কন্যাটি যে তাহার মাকে মাত্র অবলম্বন করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সারদার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মাতা স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "সারি, গুপির জ্বরটা এখন বেশ ছেড়ে গেছে, না রে?"

সারদা বলিল, "হ্যাঁ মা, গাটা এখন বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন একটু ঘুমুচ্ছে, না মা?"

মা বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমুক। তুই ওর কাছে বস্, আমি ঘাট থেকে একবার আসি।"

মাতা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে গোপেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিতেই শুধু দিদিকে দেখিয়া বলিল, "দিদি, মা কোথায়?"

সারদা বলিল, "মা ঘাটে গেছে।"

চঞ্চল যুবক গোপেশ্বর সবলে বিছানায় উঠিয়া বসিতেই দিদি হাঁ, হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে অমন ধড়মড় করে উঠিস্‌নি, পড়ে যাবি।"

গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কাল আমার বড্ড জ্বরটা হয়ে গেছে, নাঃ? গাটা একেবারে বাতাস করে দিয়েছে।"

সারদা বলিল, "বাবা, জ্বর বলে জ্বর! মা সুদ্ধ ভয় পেয়ে গেছ্‌ল।"

গোপেশ্বরের পূর্বরাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে জ্বরের ঘোরে মায়ের মুখের দিকে যখন চাহিতেছিল, তখন মায়ের মুখের পরিবর্তন ঠিকই সে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার মহীয়সী মাতার প্রশান্ত মুখমন্ডলে বুঝি তাহা বড়োই বেমানান বোধ হইয়াছিল। গোপেশ্বর মনে মনে বলিল, "দিদি, মা ভুল করেছিল। আমাদের মার মতো মা যার তাঁর ছেলে মেয়ের ভয়ের কারণ তো কিছুই নেই। আমাদের দেহ যে মাতৃ-আশীর্বাদের বর্মে আঁটা দিদি। কোনো অমঙ্গল তো আমাদের স্পর্শ কর্‌তে পারে না।" সারদার মনেও ঠিক এমনি একটা কথা উঁকি মারিতেছিল।

মাতৃগর্বে পুত্র-কন্যার বুক তখন পরিপূর্ণ। মা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে এই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পুত্র উঠিয়া বসিয়া আছে। স্মিতবদনে মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছিস্ রে গুপি?"

গোপেশ্বর বলিল, "বেশ আছি মা। কাল অতটা ভেজা হয়েছিল কিনা, সেটা তো বার হওয়া চাই মা।"

মা বলিল, "হ্যাঁ।"

পুত্রকন্যার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি তখন মায়ের মুখের উপর নিবদ্ধ। মায়ের প্রশান্ত বদনে তখন অপূর্ব জ্যোতি ফিরিয়া আসিয়াছে।

স্মৃতিরক্ষা

সীতা দেবী

॥ ১ ॥

শম্ভুচরণের বাল্যকালে সে যে পরে অতবড়ো একজন আচারনিষ্ঠ হিন্দু হইয়া উঠিবে তাহার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নাই। গোব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি তাহার একেবারেই সাধারণ ছেলের চেয়ে বেশি ছিল না এবং নিষিদ্ধ দ্রব্য খাইতেও তাহার উৎসাহের অভাব কখনও চোখে পড়িত না। পাড়ার শুচিবায়ুগ্রস্ত মজুমদারগৃহিণীর তপস্যার বিঘ্নকারীরূপে ইন্দ্রদেব যে কয়টি দেবদূত পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শম্ভুর জায়গা সবার শেষে নিশ্চয়ই ছিল না।

শম্ভুর বাপ মা নিতান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যতটা করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল তার বেশি উৎপাত সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা কোনোদিনই করিতেন না। এবিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত বিশেষ সজাগ ছিল না। ভাত খাওয়া এবং ঘুমাইতে যাওয়ারই মতো না ভাবিয়া তাঁহারা অবশ্য-কর্তব্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মাদি করিয়া যাইতেন। অতএব শম্ভুর যৌবনের অত্যুগ্র হিন্দুয়ানীটা তার পৈত্রিক সম্পত্তিও ছিল না।

পলাশপুর গ্রামটি ছোটো। তাহাতে এন্‌ট্রাস পর্যন্ত পড়িবার কোনো সুবিধা ছিল না। কাজেই গ্রাম্য সরস্বতীর কৃপা নিঃশেষে শোষণ করিয়া লই[illegible] নব বিদ্যালাভের জন্য তাহাকে সুদুর কলিকাতা যাইতে হইল। সেখানে তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় খুড়া তাহার ভার লইলেন।

কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর এক স্যাঁৎসেঁতে ছোটো দোতলা বাড়িতে শম্ভুর কয়েকটা বছরই কাটিয়া গেল। এগুলোর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। খুড়াখুড়ীর আদর অথবা অনাদর কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নহে। স্কুলের পড়াটাও আর পাঁচটা ছেলের যতখানি সুবিধাজনক লাগে শম্ভুরও তাহাই লাগিত।

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় আসার দরুণ শম্ভুর বয়স একটু বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। এন্ট্রান্স পাশ করিতেই তাহার কুড়ি বছর পার হইয়া গেল। এতদিন তাহার জীবনটা নেহাৎই একঘেয়ে ভাবে কাটিতেছিল, বিধাতা এইবার ক্ষতিপূরণের ভার লইলেন।

কলেজে উঠিয়াই শম্ভু টেরী মুছিয়া টিকি রাখিল, একজোড়া খড়মও জোগাড় করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যাআহ্নিকের ঘটা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং সকালে উঠিয়া খুড়াখুড়ীকে প্রণাম করাটাও একটা নিত্যকর্ম্ম করিয়া তুলিল। ভাসুরপোর এহেন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া খুড়ি ব্যস্ত হইয়া দেশে জাকে চিঠি লিখিলেন, "দিদি, তোমার ছেলে দিনদিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে, ওর শিগগির বিয়ে দাও; তা না হলে ও কোনোদিন সন্ন্যাসী হয়ে বিয়ে যাবে।" খুড়া এসে সওদাগর আফিসের বড়োবাবু-ও-

ছোটোসাহেব-লাঞ্ছিত কেরানী, তার উপর তিনটি অবিবাহিতা কন্যার পিতা, কাজেই তাঁহার ভাইপোর বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। কিন্তু তাঁহার ছেলে অতুলের এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি দেখা যায় নাই। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া এবং এক ক্লাসে পড়িয়া—তাও আবার ক্লাশে অতুলই সর্ব্বদা শম্ভুর উপরে থাকিত—মেজদা যে কেবল একজোড়া খড়ম, একটা টিকি এবং কতকগুলো অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা কথার তোড়ে পাড়ায় এতখানি নাম কিনিয়া ফেলিবে, এ অতুলের ন্যায়পরায়ণ মনে অত্যন্তই অন্যায় বলিয়া ঠেকিল। এও সহ্য করিতে পারিত, যদি মা তাহাকে মেজদার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অহরহ সদুপদেশ না দিতেন। অতুল নিজে সংস্কৃত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল না। সে একদিন সন্ধ্যায় নিজেদের সংস্কৃত ক্লাশের 'ফার্স্টবয়' সুরেশকে আনিয়া লুকাইয়া শম্ভুর সংস্কৃত শুনাইয়া দিয়া, পরদিন সগর্বে প্রচার করিল যে শম্ভু আগাগোড়া ভণ্ডামী, কারণ স্বয়ং সুরেশ বলিয়াছে শম্ভুর উচ্চারণ তো সমস্ত ভুল হয়ই, তার উপর অধিকাংশই তার স্বরচিত। তাহাতেও, মাতাকে এবং পিসিমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সে একদিন বাড়িতে খবর দিল যে মেজদার অকস্মাৎ ধর্মবুদ্ধি হইবার কারণ একমাত্র এই যে একদিন ক্লাশের বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে হোটেলে খানা খাইতে গিয়াছিল, তাহাতে ছাগ মাংস খাইতে গিয়া জিব কাটিয়া ফেলায় সকলে তাহাকে এত ঠাট্টা করে যে সে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সাধু সাজিয়াছে। শম্ভুর কানে একথা আসাতে সে কী রসনা সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমাগুণে তাহার যশ ও অতুলের অযশ বাড়িল বই কমিল না।

শম্ভুর হিন্দুয়ানিতে তাহার পরকালের সুবিধা কত হইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহকালে যে একটা কিছু হইল তাহা চোখেই দেখা গেল। শম্ভুর মা ছোটো জায়ের চিঠি পাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিল, ফলে গ্রীষ্মের ছুটিতে শম্ভু বাড়ি আসিবামাত্র নিকটেরই গ্রামের বেচারাম চক্রবর্তী সদলবলে আসিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন এবং মাসখানেকের মধ্যেই ভদ্রলোকের একটি ক্ষীণকায়া অল্পভাষিণী কন্যা এবং সঙ্গে তিন টাকা এই বাড়িতে আসিয়া পড়িল।

ইহার পর শম্ভুর কলিকাতা-বাস বড়োই কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহার শরীর আর ভালো থাকিতেই চায় না। শহরের জলবায়ু তাহার পক্ষে বিষের মতো অতিষ্টকারী হইয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য যে কত ভালো তাহা সে সময়ে অসময়ে প্রচার করিতে লাগিল।

বিধাতা এবারেও দয়া করিলেন। পরীক্ষার একদিন আগে পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে কলিকাতা ছাড়িতে হইল, এবং দিন দশ পরে পিতা পরলোক ক্রিয়া করাতে কলিকাতা আসার পথও চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া গেল। পিতার মৃত্যু ও পড়াশুনা অকালে শেষ হইয়া যাওয়াতে শম্ভুর মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাকে অবিমিশ্র দুঃখ বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না।

শম্ভুচরণ এখন বাড়ির কর্তা। তাঁহার পিতা জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া শুনিয়া চালাইতে পারলে খাইবার পরিবার ভাবনা থাকে না। শম্ভুচরণ সেইকাজেই মন দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার নিষ্ঠা আরও বাড়িয়া উঠিল। স্ত্রীর বাক্সে নিতান্ত আধুনিক দুখানা নভেল দেখিয়া তাঁহাকে এমনি শাসন করিলেন যে ভদ্রমহিলার নভেল পড়ার সখ চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইল এবং প্রতিবেশিনী সরলাকে যে কলিকাতা হইতে লেস্-লেস্ গোলাপি সেমিজ আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে-কাঁদিতে প্রত্যাহার করিলেন।

শম্ভুচরণের প্রথম যখন কন্যা হইল তখন তিনি প্রসূতির যথোচিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন মণি। পত্নীর প্রতি ভরসা করিয়া অন্তত আর-একটি সন্তান হয় কী না তাহা দেখিবার সাহস তিনি করিতে পারিলেন না। শিশু-কন্যার মা কিন্তু এ নাম স্বীকার করিলেন না। পরম হিন্দু স্বামীর ঘরে যে ক্ষুদ্র মানুষটি তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাকে এ-রকম একটা ছেলের নামে ডাকিতে তাঁহার মন কিছুতেই উঠিল না। কন্যার মা মেয়ের নাম রাখিলেন উমা এবং এই নামটাই তার হইয়া গেল।

ক্ষুদ্র উমা সংসারে কিছুদিন বাস করিয়াই বুঝিয়া লইল যে মা ছাড়া তাহার আশ্রয়স্থল কেউ নাই। পারতপক্ষে বাবার কাছে সে যাইতে চাহিত না, কারণ তিনি উমাকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িবার চেষ্টা বিশেষভাবে করিতেন। অল্পবয়স হইতেই উমার একটা ধারণা হইয়া ছিল যে তাহার যা-কিছু করিতে ভাল লাগে সে সবই করে না, কারণ সবেতেই বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয় এমন কি বাপের সামনে খাইতে দিলেও সে সাহস করিয়া খাইতে পারিত না, সেটাও হিন্দুকন্যার করা কর্তব্য নয় সে বিষয়ে যে মনের সন্দেহ দূর করিতে পারে না তাহার মা স্বভাবতঃই কম কথা বলিতেন, স্বামীর ব্যবহারে সে কমকথা আরও কমিয়া গিয়াছিল। উমার তার এই অল্পভাষিণী মায়ের কাছে বক্তৃতার অবধি ছিল না। তাহার শিশু ভাইকে নিতান্তই শিশু মনে করিয়া সে কোনোদিন তাহাকে নিজের খেলার সাথি করিতে চাহিত না। বালকজাতির সম্বন্ধে তাহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। পুতুল খেলিতে গেলে যে-জীব বেনে-বউ-এর ছোপানো কাপড় দিয়া বল তৈয়ারি করে এবং রাঁধিবার হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া গুলিডাণ্ডা খেলিতে চায়, তাহাকে কোনো মেয়ে কবে শ্রদ্ধা করিতে পারে? কাজেই উমার মা-ই উমার একমাত্র সম্বল ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার উৎপাত চুকিয়া গেলেই তাঁহাকে উমার সঙ্গে খেলিতে বসিতে হইত। পুতুল-খেলার সাথি তো হইতে হইতই, এমন কী মাঝে-মাঝে পুতুলও সাজিতে হইত। স্বহস্তে বিচিত্র-সেলাই-করা পুতুলের তোষোকখানি পাতিয়া দিয়া উমা বলিত, "মা তুমি আমা থুতী, তুমি ছোও।" মাকে সেই রুমালের সমান তোষোকে একবার অন্তত শুইতেই হইত, তা না হইলে ক্ষুদ্র জননীটির আর অভিমানের সীমা থাকিত না।

এই-রকম করিয়া উমার জীবনের সাত আট বছর কাটিয়া গেল। একদিন সে সকালে উঠিয়া দেখিল বাড়িতে মহা ধূমধাম, বাহিরে বাজনা বাজিতেছে, লোকজনের কোলাহলে বাড়ি একেবারে সরগরম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইল সে ইহাই দেখিয়া যে আজ সকলেই তাহার প্রতি মনোযোগী। রাত্রি হইয়া আসিল, পাড়ার যত কিশোরী ও তরুণী মিলিয়া তাহাকে লাল কাপড়, সোনার গহনা, ফুলের মালা, কত কী দিয়া সাজাইতে বসিয়া গেল। উমার ইহাতে খুশি ছাড়া অখুশি হইবার কোনো কারণ ছিল না, মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সে এত আদর কোনো দিনই পায় নাই। এমন সময়ে ঘরে মা আসিয়া ঢুকিলেন, মেয়ের লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মুখশ্রী তাঁহার চোখে পড়িল, মাকে দেখিয়া উমাও সাজের গর্বে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল। মায়ের মুখে হাসি দেখা গেল না, তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শম্ভুচরণ গৌরীদান করিতেছিলেন। স্বর্গের সিঁড়ির প্রায় সব কটা ধাপ এক লাফে ডিঙাইবার ইচ্ছায় তিনি এক মহা কুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। সকল দিক দেখিতে গেলে এমন ভালো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। বর টাকা অল্পই লইবেন এবং তার পত্নীর সংখ্যা ও বরের বয়সও যে খুব বেশি তাও নয়, শম্ভুচরণের অপেক্ষা বছর চারের যদি বড়ো হয়। ইহাই ও পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত বয়স। এমন জামাই পাইয়াও গৃহিণী যদি স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতার গুণে কাঁদিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি আর কী করিবেন? মেয়েমানুষের দুফোঁটা চোখের জল দেখিয়া তিনি কি এমন স্বর্ণসুযোগ ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

লগ্ন রাত বারোটারও পরে। সজ্জিতা উমা পিঁড়ির উপর ঢুলিতে-ঢুলিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মা পাশের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বিয়ে-বাড়ীর কোলাহলে যোগ দিতে তাঁহার আর ক্ষমতা ছিল না।

হঠাৎ একটা তুমুল বাজনার শব্দে এবং সেইসঙ্গে অনেকের গলায় তাহার নাম একসঙ্গে শুনিয়া উমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অর্দ্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় সে বুঝিল যে এইবার তাহার বিবাহ হইতেছে। সাত পাক ঘোরানো প্রভৃতিতে তাহার কোনো আপত্তি হয় নাই; তবে মাথার উপর একখানা চাদর ঢাকা

দিয়া যখন সকলে তাহাকে ভালো করিয়া চোখ চাহিতে বলিল, তখন সামনে তাকাইয়া একজোড়া লাল লাল চোখ দেখিতে পাইয়া সে ভয়ে চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

উমার শ্বশুরবাড়ি বেশি দূরে নয়, সেখানে তাহাকে বেশি দিন থাকিতেও হইল না। যে কদিন ছিল তাহাতেই তাহার প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়াছিল, বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার পুতুলের সংসার আবার তাহার অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইল। সেই কালো মুখে লাল চোখের ভীষণ দৃষ্টির বিভীষিকাও ক্রমে তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বেশি রাতে বাড়ির অন্য-সকলে যখন খাইতে বসিত, উমা তাহার ঢের আগেই ঘুমাইয়া পড়িত বলিয়া তাহার মা তাহাকে সন্ধ্যা বেলাই খাওয়াইয়া দিতেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া সে খাইতে বসিয়াছে, মা ঘরের ভিতর তখনও কাজে ব্যস্ত। উমা মুখের দুই-রকম ব্যবহারই একসঙ্গে করিয়া চলিয়াছিল। ভাত খাওয়া তো হইতেই ছিল; তাহার সঙ্গে-সঙ্গে রাধারাণীর নুতন মাকড়ীর গড়ন, সইয়ের জরিপেড়ে কাপড়, শৈলীর আশ্চর্য্য নির্বুদ্ধির জন্য তাহার মায়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য সব-রকম খবর দিতে দেরি করিতেছিল না।

এমন সময় বাইরে কর্তার খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে উমার বাক্যস্রোতও একেবারে বন্ধ হইল, মা দরজার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কর্তা এই দিকে আসিতেছেন।

"একবার এদিকে শুনে যাও ত গো।"

স্বামীর ডাক শুনিয়াই গৃহিণী বাইরে আসিয়া বলিলেন "রোসো, উমাকে এই মাছের ঝোল দিয়ে আসছি।"

"থাক, আর মাছ দিতে হবে না, এ দিকে এসো।"

উমার মা কম্পিত পদে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। স্বামীর সব কথা কানে পৌঁছিবার আগেই মাটিতে পড়িলেন। উমা অবাক হইয়া একদৃষ্টে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। শম্ভুচরণ দ্রুতপদে আসিয়া মেয়ের হাত টানিয়া পিঁড়ি হইতে উঠাইয়া দিলেন।

ভয়ে উমার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল এবং সে বুঝিল যে তার খাওয়াটাও বাস্তবিক অন্যায়, তা না হলে বাবা অমন করিবেন কেন? তাহার বাপ সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই মা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উমা কাঁদ-কাঁদ মুখে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি কেঁদ না, বাবা অমনি শুধু-শুধু সবাইকে বকেন। এর পর আমি ভাত সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে খাব এখন, তা হলেই বাবা দেখতে পাবেন না।"

॥ ২ ॥

রাত্রির অন্ধকার তখনও একেবারে দূর হইয়া যায় নাই। ভোরের ধূসর আলোর সবেমাত্র একটুখানি আভাস পাওয়া যাইতেছে। শম্ভুচরণের বাড়ির খিড়কী-দরজা দিয়ে একটি তরুণী লঘুপদে বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির দূরেই নদীর ঘাট, মেয়েটি সেইদিকে চলিল আলোয় তার চেহারার আর-কিছু বোঝা গেল না, দেখা গেল বিধবার সাদা কাপড় আর কালো কোঁকড়া একরাশ চুল।

নদীর ঘাটে তখনও একটিও পল্লিবাসিনীর আগমন হয় নাই। উমা নিজের মনে অনেকক্ষণ জলে পা ডুবাইয়া রহিল। পূর্বাকাশ ক্রমে রাঙা হইয়া উঠিল। বৈরাগী ঠাকুরের বৈতালিক খঞ্জনির শব্দ কানে যাওয়া মাত্র সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া গোটাকতক ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। এক কলসী জল তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া আসিয়া দেখিল মায়ের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। ফিরিয়া গিয়া রান্নাঘরের কাজে গেল, কারণ এ কাজটা এখন তাহারই। উমা যাহাতে একবারে অবশ্যকর্তব্য

কোনো কাজে অবহেলা না করে সে দিকে শম্ভুচরণ অতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ঘরের কর্ম সারা হইয়া গেলে উমার যেটুকু সময় থাকিত তখন শুধু তাহাকে লইয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মচারিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেশভূষা আহারবিহার কিছুতেই তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার নির্মলকুলে কোনো ছিদ্র দিয়া কখন শনি প্রবেশ করিবে তাহা তো বলা যায় না। একটা সামান্য মেয়ের প্রাণ অপেক্ষা কুলগৌরব অনেক বড়ো জিনিষ এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। তাহার ছোটো ভাই বিষ্ণুচরণ রান্নাঘরের উঠানে একটি গাছ লাগাইয়াছিল, তাহা অজস্র ফুলে আলো হইয়া আছে। ভোরের বাতাসে শিশিরের সঙ্গে ফুলগুলি টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, উমা রান্না চড়াইয়া আসিয়া গাছ তলা হইতে ফুলগুলিকে সযত্নে কুড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ সশব্দে একটা দরজা খুলিয়া গেল, একজন গৌরস্থলাঙ্গী মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন। হাই তুলিয়া হাতকচলাইতে-কচলাইতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, উমার দিকে চোখ পড়িবামাত্র কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ লা উমি, সকালে উঠেই ও কি ন্যাকামি, আজ আর রান্না-বান্না চড়বে না?" উমা ব্যথিত তাড়াতাড়ি গাছতলা হইতে উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল "মা, রান্না ত আমি অনেকক্ষণ বসিয়েছি, ভাত ফুটছিল, তাই একটু বাইরে এসে বসেছিলুম।"

মা গজেন্দ্র-গমনে আবার গিয়া ঘরে ঢুকিলেন। এটি শম্ভুচরণের দ্বিতীয় পক্ষ, উমার মা মেয়ে বিধবা হইবার এক বছরের মধ্যেই মারা যান। বিধবা বালিকা কন্যার ব্রহ্মচর্যের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া শম্ভুচরণ দুই মাস কাটিতে-না-কাটিতেই প্রতিবেশি নরোত্তম ভট্টাচার্য্যের বয়স্কা কন্যা শতদলবাসিনীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। তিনি স্বামীর ঘরে আসিয়াই উমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন, আর বছর ফিরিতে-না-ফিরিতেই সংসার-রক্ষার ভার উমাকে গ্রহণ করিতে হইল। অতবড়ো মেয়ের শুধু বসিয়া থাকা ভালো নাকি? তাহা হইলেই লুকাইয়া নভেল পড়িতে শিখিবে এবং মনে যত কুচিন্তার উদয় হইবে। বিধবা মেয়ে লইয়া ঘর করা যে কী যন্ত্রণা তাহা পরে কী বুঝিবে, যাহার করিতে হয় সেই জানে। এদের শাসনে না রাখিলে কী আর রক্ষা আছে?

আঁচলে শিউলিফুলের রাশ লইয়া উমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল, তার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বিমাতার ব্যবহারটা তাহার এত দিনেও অভ্যস্ত হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার বাক্যের জ্বালা এতদিনেও তাহার সহিয়া যায় নাই। তাহার নিজের মা মারা যাইবার পর হইতে গত আট বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয় আর পরলোকগতা মাকে মনে করিয়া তাহার চোখের জলও শুকাইতে চায় না।

উমার কোলের ফুলগুলি আগুনের তাপে কখন শুকাইয়া উঠিয়াছিল সে দিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না, সেও যেন তাদেরি একটি বড়ো বোন, একরাশ রূপ লইয়া অকালে মায়ের কোল হইতে খসিয়া পড়িয়া সংসারের তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে।

গৃহিণীর ডাকে উমা চোখের জল মুছিয়া বাহিরে আসিল। বেশি কিছু নয়, মা বলিলেন, "ও উমি, বেশি করে চাল নিস, আর-একজন লোক খাবে।" উমা ঘরে ঢুকিয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই মার সেই ভাই আসবে। বাবা, তার জন্যে ত বেশ বেশি করেই চাল নিতে হবে। ভাত যে হয়ে গেছে, আবার চড়াতে হবে।"

এমন সময় বই বগলে করিয়া লাফাইতে-লাফাইতে বিষ্ণুচরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শম্ভুচরণের আমলের মিডল ইংলিশ স্কুল এখন হাইস্কুল হইয়াছে, কাজেই বিষ্ণুচরণকে বিদ্যালাভ করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিতে হয় নাই। সে আসিয়াই ধপ করিয়া বইখাতা চৌকাঠের উপর ফেলিয়া বলিল, "দিদি ভাই, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ভাত দিতে হবে, আজ আমাদের নতুন মাষ্টার আসবে কিনা তাই আমরা সব আগে থেকে গিয়ে হাজির হব।"

উমা থালায় ভাত বাড়িতে বাড়িতে বলিল, "এত সকালেই খাবি? এখনও যে কিছু রান্না হয়নি। তোদের আবার নতুন মাষ্টার কবে এল?"

"আহা তাও ছাই জানো না? আজই এসেছেন, আর তিনি যে আমাদের বাড়িতেই থাকবেন, জমিদার বাবুর চিঠি নিয়ে সকালে যখন এলেন তখন আমি নিজের চোখে দেখলাম।" বিষ্ণুচরণ সহপাঠীদের কাছে নতুন মাষ্টারের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য খবর সবার আগে দিবার লোভে কথা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি মস্ত-মস্ত ডেলা পাকাইয়া গরম ভাত গিলিতে আরম্ভ করিল।

দুপুরে শম্ভুচরণ স্নানাদি শেষ করিয়া অতিথিকে লইয়া খাইতে বসিলেন। বাড়িতে আর লোক নাই, গৃহিণী অসুস্থা, উমাই পরিবেষণ করিতে চলিল। বাপের খড়মের শব্দ পাইয়াই সে একবার বাহিরে উকি মারিয়া নতুন মাষ্টারকে দেখিয়া লইল। স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টার হরিশবাবু পীড়িত হইয়া পড়ায় কিছুদিন ছুটি লইয়াছেন, তাঁহারই জায়গায় এই নতুন মাষ্টারের আগমন। বৃদ্ধ হরিশ বাবুকে উমা ভাল করিয়াই চিনিত, সে যে তাঁহার রাঙাদিদি। কিন্তু তাঁহার পদে একি মাষ্টার আসিল? এর বয়স ত চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হইবে না।

শম্ভুচরণ অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তুমি ঘরের ছেলে, এত লজ্জা কিসের? উমা ভাত নিয়ে এসো।"

শম্ভুচরণ স্বভাবত এমন মিষ্ঠভাষী এবং অমায়িক প্রকৃতির মানুষ নন, কিন্তু আজ তাঁহার মধুর ব্যবহারের একটু কারণ ছিল। বিশ্বনাথ স্থানীয় জমিদারের ভাগিনেয়। স্বয়ং শম্ভুচরণও ওই জমিদারেরই একজন প্রজা, তা ছাড়া নানা দিকেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। জমিদার মামা থাকিতে বিশ্বনাথের চাকরি করার কী দরকার অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু জন্মাবধি কী চেহারা এবং চরিত্র জমিদারের ভাগ্নে হইবার অনুপযুক্ত ছিল। সযত্নে রক্ষিত ফুলের বাগানে এক-একটা আগাছা যেমন বিনা যত্নে নিজের মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, বিশ্বনাথের দশা ছিল সেই রকম। বিধবা জননীর সঙ্গে আবাল্য জমিদার এ মানুষ হইয়াও সেখানকার হাওয়া তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই, সিল্ক-সাটীনে সজ্জিত মোটাসোটা জমিদার পুত্রদের দলে তাহার দীর্ঘাকৃতি রোগা শ্যামবর্ণ চেহারা কিছুতেই মানাইত না। নিজের কোঁচার ফুল এবং টেরী ঠিক রাখার অপেক্ষা তাহার দৃষ্টি গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া এবং হাডু-ডু খেলার দিকে বেশি ঝোঁক। কাহারও উপর সর্দারি করা অথবা কাহারও সর্দারি করা, কোনোটাই তাহার অভ্যাস ছিল না।

এই ভাবে দিন কাটাইয়া যখন একদিন সে যে এম-এ পাশ করিয়া অন্তত কলেজে পড়াটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন হইতে বাড়িতে সে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। চাকরির জন্যে বিদেশে যাইবার জোগাড় করাতে বিধবা মা আকুল হইলেন, মামাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সব দিকে বাধা পাইয়া অভ্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে যত মুচী ও মুসলমানের ছেলেকে নিজের ঘরে আনিয়া পড়াইতে বসিয়া গেল। মানুষের শাসন সমাজের শাসন কোনোটাই তাহার কাছে কোনো কিছু গ্রাহ্যের জিনিষ ছিল না, কাজেই জমিদার বাবুকে রোজ হাঁড়ি ফেলা নিবারণ করিতে হইলে অন্য রাস্তা দেখিতে হইবে। কাছাকাছি সকল গ্রামের সকলে তাঁহার অনুগত, তাহারা সাহায্য করিতে ক্রটী করিতেন না। ইতিমধ্যে পলাশপুর ইস্কুলে মাষ্টারের কাজ হইল। জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ কাজটা ভাগিনের জন্য জোগাড় করিলেন এবং শম্ভুচরণের বাড়িতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার বাড়ির সকলেরই মনের মতো হইল। বিশ্বনাথ বসিয়া-খাওয়া হইতে নিস্তাক পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তারপর ঠিকহইল যে ছেলে নিকটেই থাকিবে, সপ্তাহে একদিন ইচ্ছা করিলে বাড়ি আসিতেও পারিবে এবং পরিচিত গৃহস্থের বাড়িতে থাকিবে, কাজেই তাঁহার প্রমাণ বিশ্বনাথ ভাত খাইতে ভুলিয়া গেলেও তাহারা ডাকিয়া খাওয়াইবে। মামা খুশি হইলেন একটা আপদের শান্তি হইল বলিয়া। শম্ভুচরণ মনে মনে খুশি হইয়াছিলেন, কারণ খানিকটা জমি

ব্রহ্মোত্তর করিয়া লইবার চেষ্টা তিনি কিছুদিন যাবৎ বিশেষভাবে করিতেছিলেন; এই সংসারে তাহার কিছু সবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বিশ্বনাথকে সাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

বিষ্ণুচরণ এমন আশ্চর্য্য নতুন ধরনের মাষ্টারকে তার এত কাছে পাইয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল। উমা প্রথমে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের আহারে সে ক্রমে মনে মনে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল। যেন এক আলাদা রাজ্যের মানুষ। কোনো নিঃসম্পর্কীয় পরপুরুষের সঙ্গে তাহার যদিও কিছু সংস্রব কখনও ছিল না, তবুও গাঁয়ের সকল ছেলেকে সে চোখে অন্ততঃ দেখতে পাইত এবং যতটুকু দেখিয়াছিল তাহাতে তাহাদের প্রতি উমার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। ওই লোকগুলির মনে টেরী চুরুট এবং পরালোচনা ছাড়া আর-কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু বিশ্বনাথের এ তিনটার কোনোটাও ছিল না। চুলের সুঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ ছিল; আর যে-মানুষ ভাত খাইতেই ভুলিয়া যায়, তাহার মনে করিয়া চুরুট খাইবার কথা নয়। ইস্কুলের কাজ করিয়া সে যেটুকু সময় পাইত, তাহা হয় বই পড়িয়া নয় ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিয়া কাটাইয়া দিত।

উমাকে রোজই পরিবেশন করিতে হইত। সে ঘোমটার আড়াল হইতে প্রায়ই লক্ষ্য করিত এই রোগা ছেলেটি ভালো করিয়া খায় না, বিশেষ করিয়া শম্ভুচরণের পাশে তাহাকে নিতান্তই অল্পাহারী মনে হইত। বিশ্বনাথ যাহা খাইত তাহাও নিতান্ত দায়সারাভাবে, কোনো বিশেষ তরকারির প্রতি মনোযোগ দেওয়া অথবা তরকারির আস্বাদ অনুসারে খাওয়া তাহার দ্বারা হইবার জে ছিল না। উমা নিজের হাতের রান্নার প্রতি এতটা উপেক্ষা দেখিয়া মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিত, কারণ তাহার বাপভাইয়ের হাজার দোষ থাকিলেও এ দোষটা ছিল না। উমা ইচ্ছা করিত এই অন্যমনস্ক ছেলেটিকে ঠেলা দিয়া নিজের খাওয়া সম্বন্ধে একটু সচেতন করিয়া তোলে।

শম্ভুচরণ একদিন খাইতে বসিয়া মাছের তরকারিটা বড়োই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। উমা চাহিয়া দেখিল বিশ্বনাথ ঠিক আগেরই মতো খাইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে বিশেষ কোনো তৃপ্তির চিহ্ন নাই। কর্তা বলিলেন, "উমা, বিশ্বনাথকে আরও একটু মাছ দেও ত।" বিশ্বনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না দরকার নেই।" উমা নিষেধ সত্ত্বেও খানিকটা তরকারি তাহার পাতে ফেলিয়া দিল। বিশ্বনাথ হঠাৎ সহাস্য মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন দিলেন? মিথ্যে ফেলা যাবে।"

উমার সঙ্গে তাহার এই প্রথম কথা। উমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া ভাবিল, "মাগো, ছেলেটা যেন কী! কী-রকম হাসলে, যেন ও খেলে কী না-খেলে তাতে আমার কতই বয়ে যাচ্ছে।" ঠিক করিল কাল হইতে না চাইলে উহাকে কখনই কিছু দেওয়া হইবে না। জমিদারের ভাগ্নে কি না, তাই গরিব মানুষের রান্না পছন্দ হয় না।

কিন্তু কাল হইবামাত্র সে আবার যথাসাধ্য সযত্নে রাঁধিতে বসিল। বিশ্বনাথের হাসির অপরাধ সত্ত্বেও তাহার মনে এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিল যে আজ তাহাকে যাহা দেওয়া হইবে সব সে যেন ভালো করিয়া খায়। বিষ্ণু যখন আসিয়া বলিল, "দিদি, আমার সঙ্গে মাষ্টারমশায় তাঁকেও ভাত দিতে বললেন, রুটিন কিনা বদলে গেছে, বাবার সঙ্গে খেলে তাঁর দেরী হয়ে যাবে," তখন উমা রান্না শেষ না হওয়ার জন্য দুঃখিত হইয়া যাহা ছিল তাহাই বাড়িয়া দিল। বাকি রান্নার জন্য তাহার আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

কিন্তু আজ এ লোকটির হইল কী? কিছু রান্না হয় নাই, তবু আজই ইহার এত খাইবার উৎসাহ কেন? কাল উমার তরকারিকে অবহেলা করিয়া বিশ্বনাথের একটু অনুতাপ হইয়াছিল। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার ব্যবহারটা ঠিক হয় নাই, বেচারি ছেলেমানুষ তাহার রান্নার অপমানে নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়াছে। তাই আজ সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে জোর করিয়াই চাহিয়া খাইবে। অন্য জিনিষের অভাবে আজ সে যখন বলিয়া বসিল "আর একটু ডাল দিন," তখন

উমা তাহার বাটিতে এতখানি ডাল ঢালিয়া দিল যাহা পেটুক দামুর পক্ষেও অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইত।

রান্নাখাওয়ার মধ্য দিয়া যে পরিচয় আরম্ভ হইল তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। উমার বাবা জমির ভাবনায় ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কন্যার ব্রহ্মচর্য্যপালনের তত্ত্বাবধান তত ভালো করিয়া করিতে পারিতেন না। উমার মা নভেল পড়ার জন্য কঠিনভাবে শাসিত হইয়াও মেয়েকে লিখিতে-পড়িতে শিখাইয়া গিয়াছিলেন। পিতার অনবসরে উমা দুপুরে নিজেই রামায়ণ পড়িতে বসিত, বইখানার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশত নয়, আর কোনো বই হাতের কাছে ছিল না বলিয়াই।

বিষ্ণু একদিন 'হাফ্-হলিডে' পাইয়া সকাল-সকাল বাড়ি আসিয়া দিদির হাতে রামায়ণ দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কী যে দিদি দিনের পর দিন একই বই পড়ো, আমার কাছে মাষ্টার মশায়ের কেমন সুন্দর একখানা বই আছে, সেইটে দেবো এখন, পড়ে দেখো, রামায়ণের চেয়ে ঢের মজার।" মজার বইখানি আরকিছু নয়—বঙ্কিমের আনন্দমঠ। উমা বই লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল, গৃহিণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার আনন্দমঠ। উমা বই লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল, গৃহিণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার কানে আসিবার আগে কিছুতেই উঠিতে পারিল না।

সন্ধ্যাবেলা বইয়ের অধিকারী ঘরে ফিরিয়া বইয়ের খোঁজ করাতে বিষ্ণু অম্লান বদনে বলিল, "আমি সেটা দিদিকে পড়তে দিয়েছি।" বিশ্বনাথ অনাবশ্যক উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তোমার দিদি বই পড়েন নাকি? আচ্ছা আমার কাছে আরও ঢের বাংলা বই আছে. সব তাঁকে দিও।" বই দিদির কাছে খুব বেশি না পৌঁছিলেও বিষ্ণু অনুমতি পাইয়া সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিল।

বিশ্বনাথের অন্যমনস্ক মন এই মাস দুয়ের মধ্যেই এ বাড়ির অন্তত একটি লোক সম্বন্ধে ক্রমেই বেশ সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই যে সুন্দর মেয়েটি সারাদিন মুখ বুজিয়া সংসারের সকল খাটুনি খাটিয়া যায় আর সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির সকলের গঞ্জনা সহ্য করে, ইহার জন্য বিশ্বনাথ মনে ভারি একটা বেদনা অনুভব করিত। তাহার জন্য শম্ভুচরণ অথবা তাঁহার পত্নী উমাকে কতদিন কঠোর শাসন করিতেন, কারণ বিশ্বনাথকে এখন তাঁহারা একজন বলিয়াই মনে করিতেন, তাহার সামনে মুখ ঢাকিয়া কথা বলাটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ দেখিতে পাইত উমার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে, রৌদ্রতপ্ত ফুলের মতন শুকাইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ফলতার তার সারা অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত, সে তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে সরিয়া যাইত। প্রতীকারের চেষ্টায় যে উমার প্রতি অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল কিন্তু দুর্বলের প্রতি অত্যাচারটা বসিয়া-বসিয়া দেখা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এটা শুধু দুর্বলের করুণাবশতঃই যে নয় "এই-রকম একটা সন্দেহ তাহার নিজের মনেও জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কী মনের তাপ সোজাপথ না পাইয়া মাঝে-মাঝে অত্যন্ত অন্যভাবে বাহির হইয়া পড়িত। বিষ্ণুচরণ এবং তাহার বৈমাত্রের ভাই বিশ্বনাথের সঙ্গে একই ঘরে শুইত। কাজ করার ত্রুটী লইয়া একদিন গৃহিণী উমাকে আক্রমণ করিল "হ্যাঁ লা, পরের ছেলে বাড়িতে রয়েছে তার এ কাজ করতে নেই? হাতপা কী এই বয়সেই খসে পড়ল তোর?" বাল বাহুল্য পরের ছেলে বিশ্বনাথ এ স্থলে উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাহার কানে কথাটা পৌঁছিল। সে ঘরে আসিয়া খাট হইতে বিছানাটা ছুড়িয়া ফেলিল, বিষ্ণু তাহার দিকে অত্যন্ত অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আমার বিছানায় শুতে ভারী গরম হয় আজ থেকে শুধু-খাটেই শোব।"

উমার মনও অল্পদিনেই এই বাহিরের লোকটিকেই বাড়ির মধ্যে একমাত্র আপন বলিয়া চিনিয়া ফেলিল। সে যে সর্বদাই কোনো-প্রকারে উমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত, তাহা উমার চোখ কোনো এড়াইত না।

গৃহিণীর পুত্রকন্যা নানু এবং টুনুর ভোরে উঠিয়া খাবার জন্য চিৎকার একটা নিত্যকর্ম ছিল। দ্বাদশীর দিন উপবাস ক্লিষ্টা উমা সকালে উঠিয়া খাবার করিতে পারে নাই, তা লইয়া বাড়িতে তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। উমার কাছে খাবার চাইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বিশ্বনাথ অন্দরের একটু কাছে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। তাহার অপমান করিতে লাগিল ওই হাঁ-করিয়া-চিৎকার-পরায়ণ ছেলে দুটার গালে খুব জোরে দুই চড় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু চিৎকার বন্ধ করার সেটা প্রকৃষ্ট উপায় নয় জানিয়া সে না বলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বাহির হইল এবং প্রায় তিন মাইল মাঠে ঘুরিয়া আসিল।

শীতের দ্বাদশীর ভোরে উমা জোর করিয়া নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিল। মায়ের গালাগালি শুনবার অপেক্ষা তাহার উনানের আগুনে পুড়িয়া মরাও সুখের মনে হইতেছিল। দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময়ে বাহিরে বিশ্বনাথের গলা শুনিয়া সে থমকিয়া গেল। যে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি নানুকে ডাকিতেছিল, "এই নানু টুনু, দেখ তোদের জন্যে কি এনেছি, আর সেই যে বড়োপ্‌কুরে কাল পদ্মের কুঁড়ি দেখে এসেছিলাম না, সেগুলো আজ ভোরে ফুটে কি সুন্দর হয়েছে, চল তোদের তুলে দিই গিয়ে।" নানু এবং টুনুর ইহাতে আপত্তি কিছুই ছিল না, তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। উমা নিজের ঘরের মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে, সেও যে একটা রক্তমাংসের গড়া মানুষ তাহা তো সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে যে মানুষটিকে কী মা মেয়ের দুঃখ দেখিয়া এখানে এনে দিয়াছেন? সে গলবস্ত্র হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল, সে প্রণাম যে কাহার উদ্দেশ্যে তা সে নিজের মনেও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল না।

স্নান করিয়া রান্নার জন্য এক কলসি জল লইয়া ফিরিবার পথে উমা দেখিল, বিশ্বনাথও একটা কি কাঁধে করিয়া সেই পথেই ঘাটের দিকে চলিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়াই আবার উমার চোখ সজল হইয়া উঠিল। এই একটুখানি অযাচিত করুণা তাহাকে কেন এত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া একবার এই মানুষটিকে প্রণাম করে, কিন্তু সঙ্কোচে অগ্রসর হইতে না পারিয়া জড়সড় হইয়া সে পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ একটু ইতস্তত করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই সকালেই জম টানতে বেরিয়েছেন কেন? আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি।"

উমা শেষ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তা না হলে ইস্কুলের ভাত দেব কী করে?"

"অমন মানুষ খুন করে ভাত খাওয়া আমার কোনোদিন অভ্যাস নেই, তাছাড়া আজ আমার একটু জ্বর হয়েছে, ভাত হয়ত খাবই না." এই কয়েকটা কথা বলিয়াই সে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

উমা ত্বরিতপদে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বিশ্বনাথের হঠাৎ জ্বর হওয়ার কারণ সে আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল।

সুখের দিনে দেখা হইলে হয়ত এ-দুটি মানুষ পরস্পরেব জীবনে কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইত না, কিন্তু দুঃখের বাঁধন তাহাদের বড়োই কাছাকাছি আনিয়া ফেলিল।

॥ ৩ ॥

"উমি, শুনছিস, আরাম ছেড়ে উঠে একটু সকাল-সকাল উনুনে আগুন দে, আজ সুরেশ আর দিদি আসবে, এসে কী শেষে মুখে জল দিতে পাবে না?"

উমা ঘরে বসিয়া কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, তা সেই জানে! ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, রান্নাঘরে গিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বিশ্বনাথ ইস্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয় ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একটি লোক তাহার খাটে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে তামাক খাইতেছে। তাহার মাথার সামনে টেরী এবং পিছনে টিকি, পরিধানে খুব সৌখীন ধুতি এবং পাঞ্জাবি। লোকটার দিকে একবার চাহিয়াই বিশ্বনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ হুঁকা নামাইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিল "এই বুঝি তোদের নতুন মাষ্টার? খান ত ছেলে পড়িয়ে, কিন্তু জমিদারবাড়ির চাল ছাড়তে পারেননি, মানুষকে যেন চোখেই দেখেন না।"

গৃহিণীর এই ভাইটির নানা-কারণে বাড়ি ফিরিতে অনেক রাত হইত। এখানে আসিয়াও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ছেলে-পিলেদের খাওয়া হইয়া গেলে গৃহিণী উমাকে বলিলেন সুরেশের খাবার আমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখ, বিশ্বনাথেরও রাখ, দুটি এক-বয়সী, বেশ একসঙ্গে খাবে এখন।"

রাত দশটার পর সুরেশের যখন সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়ি একেবারে চুপচাপ, উমা সব কাজ সারিয়া নিজের রাত্রির আহার মুড়ি ও গুড় লইয়া খাইতে বসিয়াছে। সুরেশ আস্তে-আস্তে দরজার কাছে আসিয়া দুপাটী দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "কী গো, আছ কেমন, এবার যে আর চিনতেই পারলে না।"

উমা চমকাইয়া উঠিল, তীব্রদৃষ্টিতে একবার দরজার দিকে চাহিয়াই খাওয়া ছাড়িয়া সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি খেলিয়া গেল, সে সরিয়া গিয়া দিদির ঘরে হাজির হইল।

ডাক পড়াতে বিশ্বনাথ আসিয়া দেখিল এই নরপুঙ্গবটির সঙ্গে আজ তাহাকে খাইতে হইবে। স্বয়ং গৃহিণী আজ পরিবেষণকারিণী। যে কারেণেই হোক ভাইয়ের সামনে উমাকে তিনি বাহির করিতে চাহিতেন না।

সুরেশ খাবারের থালা সামনে আসিতেই চিৎকার করিয়া উঠিল, "এ কী, ভাত কেন? রাত্রে যে আমি ভাত খাই না তা এরি মধ্যে ভুলে গেলে নাকি? এত রাতে ভাত খেলে কাল সকালে আর আমায় উঠতে হবে না।"

গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, তাঁহার বিধবা ভগিনী কপাটের আড়াল হইতে বলিলেন, "সুরুর আমার যে শরীর, ওর কী কোনো অনিয়ম সয়, মেয়েকে দুখানা লুচি করে দিতে বল্লে না কেন?"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা কী আর আমি বলিনি দিদি?

বড়োমানুষের বউ কী আমার কথা কানে তোলেন? ও মুখপুড়ি গেল কোথায়? এর মধ্যেই পিণ্ডি গিলতে বসেছে, আর-কেউ খেলে কী না-খেলে সে দিকে চোখ নেই? উঠে আয় বলছি এখুনি। শুরু, আর-একটু বোসো ভাই, আমি লুচি এখুনি ভাজিয়ে দিচ্ছি।"

উমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে ভাঁড়ারঘরে গিয়া ঢুকিল। গৃহিণীর দিদি তাহাকে দেখিয়াই আবার মুখ খুলিলেন, "ও বাবা, মেয়ের রাগ দেখ! একেবারে ফরকাতে-ফরকাতে গিয়ে ঘরে ঢুকল। বিধবা মানুষের আর সারাদিন অত নিজের আরাম নিয়ে থাকলে চলে না! আমরা আছি, সারাদিন মুখ বুজে কাজ করছি, কথাটি বলিনে।"

বিশ্বনাথ একবার উমার মুখের দিকে চাহিল, দু'এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া ভদ্রতার খাতির সম্পূর্ণ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে শুনিতে পাইল দুই ভগিনীর বক্তৃতার স্রোত উমাকে লক্ষ্য করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বিশ্বনাথ সারারাত ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিল শেষ রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। প্রায় দেড় ঘন্টা বেড়াইয়া নদীর ধার দিয়া বাড়ির দিকে চলিল। এখনও লোকজন আসে নাই বোধ হয়। কিন্তু ঘাটের নীচের ধাপে সাদা কাপড় পরিয়া কে বসিয়া, কালো চুলের রাশ কঠিন পাথরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখ দেখা যায় না। বিশ্বনাথ ঘাটের প্রথম সিঁড়িতে নামিয়া ডাকিল "উমা।"

উমা এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মতো বসিয়াছিল। বিশ্বনাথের ডাক কানে পৌঁছিবামাত্র সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। কথা বলিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। সে মুখ না তুলিয়াই বুঝিতে পারিল বিশ্বনাথের চোখের দৃষ্টি তাহার খোলা চুলের রাশে ঝরিয়া পড়িতেছে।

একটু পরে বিশ্বনাথ জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার ডাকিল, "উমা!" এবারও উমা উত্তর দিল না। হঠাৎ তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয় কাঁপিয়া উঠিল। দেহে তার এ কার স্পর্শ? চুলের রাশ ভেদ করিয়া যেন শরীরে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

উমার মাথায় হাত রাখিয়াই বিশ্বনাথ বলিল, তোমার এ যন্ত্রণা আর আমি চোখে দেখতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি বড়োলোক নই, কিন্তু আমাদের বিবাহ হলে তোমার অন্তত মনের শান্তি থাকবে।"

উমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া আসিল। সেই মুহূর্তেই সে উঠিয়া বসিয়া একবার ভয়চকিত দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া বিদ্যুতের মতো ছুটিয়া চলিয়া গেল। তার ঘরে পৌঁছিবামাত্র মূর্চ্ছিতের মতো মাটিতে লুটাইয়া গেল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিবামাত্র একটা প্রচণ্ড ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। ছি, ছি; নিজেকে সে কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে! তাহার আবাল্য ব্রহ্মচর্যের আর তার বাবার এত শিক্ষার ফল কী এই? হিন্দুবিধবা হইয়া সে একটু কষ্ট সহিতে পারে না, আর তার এই দুর্বলতা লোকের কাছে সে এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছে! ব্রাহ্মণের ঘরে ব্রাহ্মণবংশের বধূ সে, একজন তাহার কাছে স্বচ্ছন্দে বিবাহের প্রস্তাব করিল! ছি. ছি, এ কথা শুনিবার আগে তাহার মরণ হইল না কেন? আর, যে তাহাকে এমন কথা বলিতে পারিল, সেই বা কেমন?

উমা মনের সমস্ত রাগ ঘৃণা পুঞ্জীকৃত করিয়া অপরাধী বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে চিত্তকে কঠিন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়রে অপমানিত ব্রহ্মচর্যের অহঙ্কার! আমার দুঃখে বিশ্বে একমাত্র যে-মুখ ব্যথায় কাতর হইয়া উঠিত সেই মুখ উমার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিবামাত্র তাহার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে যতই অন্যায় করুক, উমার মন যে তাকে দণ্ড দিতে একেবারেই অসমর্থ। নিজের চিত্তের দুর্বলতার এই আর-একটা পরিচয় পাইয়া উমার মন নিজেরই বিরুদ্ধে আরও কঠিন হইয়া উঠিল। নিজের দুঃখ এত করিয়া জাহির করিয়া সেই তো এই ভীষণ অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়াছে। দোষ তো আরকাহারও নয়! শাস্তি যেন সে একলাই বহন করে। তাহার প্রায়শ্চিত্তে যেন সব পাপ দূর হইয়া যায়।

হঠাৎ তাহার জানলার কাছে বিশ্বনাথ আসিয়া দাঁড়াইল। ধূলি-লুণ্ঠিত উমার দিকে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল, "উমা।" উমা মাথা তুলিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল "যাও, যাও, আমায় আর পাপের পথে টেনো না।"

বিশ্বনাথের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আর-একজন লোক এতক্ষণ উভয়ের অলক্ষিতে দুজনকে খুব মন দিয়াই দেখিতেছিল, সেও এখন সরিয়া গেল।

গৃহিণীর দিদি তখন সবে বিছানা উঠিয়াছেন। মালা হাতে করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিবামাত্র সুরেশ দাঁত বাহির করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, এত হাসি কেন?"

"নাঃ, হাসি আর কিসের। এই কতই দেখছি, চিরকাল আমিই পাজী বদমায়েস জানতাম, এখম দেখি সবাই এক গোয়ালের গরু।"

দিদি হরিনাম একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কেন রে, কী হয়েছে?"

"কি আবার হতে বাকী আছে, এই যে তোমাদের সাধু বিশ্বনাথ,......." সুরেশ জমকাইয়া বসিয়া বক্তৃতা সুরু করিল।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন কালো মেঘের ছায়ায় আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। বাতাসের চিহ্নমাত্রও ছিল না, সমস্ত প্রকৃতি যেন কীসের ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

শম্ভুচরণের বাড়িতে একটা কিসের যেন চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সকলেই নিজের-নিজের-নিজের কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে কাজগুলায় মন কাহারও ছিল না। কেবল নানু আর টুনু উঠানে অকৃত্রিম মনোযোগ-সহকারে কাদার ঘর গড়িতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া গৃহিণী হঠাৎ তাঁহার ঘরের সভা সঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার দিদি ঘর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "তা হলে ওই ঠিক রইল ত?" গৃহিণী উত্তর দিলেন, "ঠিক না করে আর করি কি? সব দিক ত দেখতে হবে।"

ঝড়টা দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির সবকটা দরজা জানলা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। কেবল উমা নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ গৃহিণী কী জানি কেন তাহাকে সকল কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাঁহার দিদি আজ রান্নাঘরে গিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

আকাশ বাতাস যেন দারুণ আক্রোশে গর্জন করিতেছিল। উমা একেবারে অনাবৃত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। নদীর পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, আবার কী মনে করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের কাজে ডুবিয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকার পথ আজ তার বন্ধ, বাহিরের এই প্রলয়রূপ তাই আজ তাহার মন ভুলাইয়া পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

বাড়ির ঝি বামা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা তোমাকে ডাকছেন।" উমা তাঁহার ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল তাঁহারা দুই বোনে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। উমা ঘরে ঢুকিবামাত্র গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "তোমার জিনিষপত্র কি আছেন। গুছিয়ে নাও বাছা, কাল ভোরের গাড়ীতেই তোমাকে বিদায় হতে হবে।" উমা বজ্রহতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল "কেন মা, আমায় বিদায় করছ কেন? আমি কোথায় যাব, কার সঙ্গে?"

গৃহিণীর দিদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ন্যাও বাপু আর ন্যাকা সাজতে হবে না, তোমার সব বিদ্যেই জানা গিয়েছে। আমি পৈরাগ হয়ে কাশী যাচ্ছি। তুমিও সেইখানে যাবে। পৈরাগে মাথা মুড়িয়ে ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে সব পাপ ধুয়ে যাবে, তারপর কাশী বাস করবে, বিধবা মানুষের এছাড়া আর আছে কী? তোমার বাবাই বলেছেন, বাছা, আমার দিকে অমন করে তাকালে কী হবে? আমি তো আর সাধ করে তোমার মতো গুণবতীকে ঘাড়ে নিচ্ছি না।"

উমা নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাট আসিয়া ঘরের মেঝেয় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সে আস্তে-আস্তে জানলার কাছে গিয়া বসিল। বিদ্যুতের আলোয় একবার চাহিয়া দেখিল সামনের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। ও-ঘরের দরজা যে তাহার কাছে চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া গিয়াছে এই কথাটাই নিজের অলক্ষিতে তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। বিচ্ছেদের দুঃখ আর সেই দুঃখ-পাওয়ার অপরাধ দু-ই যেন তাহার মনে গঙ্গাযমুনার মতো মিশিয়া গিয়া প্রয়াগতীর্থ রচনা করিয়াছিল।

বাহিরে একটা কিসের গোলমাল ঝড়ের শব্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। শম্ভুচরণ দ্রুতবেগে ভিতর-বাড়িতে ছুটিয়া আসিলেন। উমা তাহার বিমাতার গলার স্বর শুনিতে পাইল, "হ্যাঁগা কী হয়েছে, অমন করছ কেন?"

পিতা উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা। পরের বোঝা ঘাড়ে করে আমি এখন মরি। জমিদারের কাছে কী জবাবদিহি করব এখন?"

গৃহিণী বলিলেন, "কে জানে বাপু, আজ ত তার যাবার কথা, তাই হয়ত গেছে, সকাল থেকে দেখিনি।"

দেখবে কোথা থেকে, এজন্মে তাকে দেখতে পেলে হয়। বাড়ি যাবে ত নৌকা করে, তা হলে তো হয়ে গেছে, একখানা নৌকা ডুবেছে বলে শুনে এলাম। কর্তা যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে চলিয়া গেলেন।

বিমাতার সামান্য কটু কথায় যে-উমার চোখে জল আসিত, সে আজ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মতো যেন আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মাঝ রাত্রে বিষ্ণু ছুটিয়া তাহার ঘরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ও ভাই দিদি, বিশ্বনাথ-দা জলে ডুবে গিয়েছেন। সে আমাকে বললে, আমি ভিজতে ভিজতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সবাই বললে নৌকা উল্টে যাবার পর তিনি একটা ছোটো মেয়েকে জল থেকে তুলতে গিয়ে একেবারে তলিয়ে গেলেন।" বিষ্ণু সেই ভিজে মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উমা দুই হাতে জানলার লোহার গরাদ জোর করিয়া ধরিয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভোর হইবার আগেই সুরেশ ও তাহার দিদি স্নান করিয়া বাহির হইবেন। গৃহিণী উমার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মেজের উপর বিষ্ণুচরণ পড়িয়া ঘুমাইতেছে,

... আর কেহ নাই। ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল খুঁজিলেন, কোথাও সে নাই। তখন নিজের ঘরে অসিয়া ঠেলা মারিয়া শম্ভুচরণকে তুলিয়া দিলেন।

গোলমালে ক্রমে বাড়ির সকলেই উঠিয়া পড়িল। ঘরের বাহিরের কোনো জায়গাই খুঁজিতে বাকি রহিল না। অবশেষে বামা ঝি চোখ মুছিতে-মুছিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, যে একটু আগে কে যেন খিড়কীর দোর খুলে বেরিয়ে গেল আমি তখন ঘুমের ঘোরে ভাবলাম বুঝি বেড়ালটা।"

আঁধারের ঘোমটায় তখনও চারিদিক ঢাকা। শম্ভুচরণ একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া বলিলেন, "যেখানে থাকুক সে, আমি তাকে খুঁজে আনছি, কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবেনা।" তিনি বাহির হইয়া যাইবামাত্র বিষ্ণুচরণও অন্ধকারে তাঁহার পিছনে চলিল।

শম্ভুচরণ নদীর ধারের এবং পথের সমস্ত ঝোপ ঝাড় দেখিয়া শেষে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লণ্ঠন লইয়া এধার-ওধার তাকাইতে লাগিলেন। ঘাটের সিঁড়ির একেবারে শেষে, জলের প্রান্তে একটা সাদা কি দেখা গেল। শম্ভু নামিয়া আসিয়া দেখিলেন উমাই বসে। পায়ের কাছে মৃত্যুর স্রোতের মতো নিবিড় কালো জল গর্জন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, মাথার উপর মেঘের কালো আবরণ, ঝড়ের হাওয়া তাহার ক্ষীণ তনুকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাগলা হাওয়ার টানে যেন সন্ধ্যাতারা আকাশের কোল ছাড়িয়া পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

শম্ভুচরণ গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন "উমা, উঠে এস, যাবার সময় হয়েছে।" উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শম্ভুচরণের পিছন পিছন চলিল। বাড়ির কাছে আসিবামাত্র বিষ্ণু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" শম্ভুচরণ তাড়াতাড়ি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দিদির সঙ্গে কথা বোলো না, ঘরে যাও।"

ভোর হইবার আগেই, উমা আজন্মপরিচিত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ট্রেনের সংকীর্ণ মেয়েদের গাড়িতে আমার স্থানের অকুলান হওয়াতে তাহার সঙ্গিনী অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। উমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ চোখে বাহিরে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে পলাশপুর চোখের আড়াল হইয়া গেল।

॥ ৫ ॥

ত্রিবেণীর ঘাটে লোকের ভিড় এখনও কমে নাই। তবে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যাত্রিণীরা ঘরে ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তিনটি বাঙ্গালির মেয়ে ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনজনই বিধবা। একজন সে কি তাহার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছিল। অন্য দুজনের মধ্যে একজন স্থূলাঙ্গী পৌঢ়া, মুখ অতিশয় গম্ভীর, আর একটি তরুণী, তার বিস্ফারিত চোখ যেন পৃথিবীর দিকে কিছু না বুঝিয়াই তাকাইয়া আছে।

প্রৌঢ়া ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন, "পাণ্ডা মিন্সে গেল কোথায়? নাপিত আনতে গিয়ে তার আর দেখা নেই, বাড়ি ফিরব কখন?" তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই মোটা-সোটা পাণ্ডাজী এক ইন্দুস্থানী নাপিত সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সে নিজের থলি খুলিয়া চট্‌পট্‌ চিরুণী, ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি বার করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো মেয়ে, এগিয়ে এস, আর দেরী কোরো না, রাত হয়ে এল।"

যমুনার কালো জল গঙ্গার সাদা জলে মিলিয়া যেখানে কল্লোল তুলিয়াছিল, তরুণী একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল, সে নড়িল না। প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। নাপিত কাঁচি বাহির করিল, তরুণীর ঘন কালোচুলের রাশ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, সে হাত দিয়া তাহা তুলিয়া ধরিল।

নাপিতের হাত তাহার চুল স্পর্শ করিবামাত্র সমস্ত শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। "আমার চুলে কেও হাত দিও না," বলিয়া সবলে নিজের চুল নাপিতের হাত হইতে ছাড়াইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার সঙ্গিনীর মুখ কালো হইয়া উঠিল, পাণ্ডা একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল।

ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর মতো চকিত চোখে একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে শুধু হিংস্র কঠোর চাহনি, বিশ্বসংসারে তাহার জন্য আর একবিন্দুও করুণা অবশিষ্ট নাই।

পাণ্ডা তাহার কাছে আসিবামাত্র সে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আকাশ-ভ্রষ্ট তারার মতো তীরবেগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার রক্তহীন শুভ্রমুখ যমুনার কালো জলে একবার শ্বেতপদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিল, তারপর যম-ভগিনীর গভীর আলিঙ্গনে সে চিরদিনের মতো তলাইয়া গেল।

১৩২৪, কার্ত্তিক

পরাজয়

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

॥ ১ ॥

সাতকড়ি মণ্ডলের বৃদ্ধা মা যখন মারা গেল, তখন বাঁশ জোগাড় করবার জন্যই সাতকড়ি বড়ো ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মৃতা মায়ের জন্য শোক করার অবকাশও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

মন্দা স্বামীকে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, 'সকাল হতে তো আছড়াপিছড়ি করছ, কিন্তু তো মা আর ফিরবেন না; এখনকার যা কাজ, তা তো করতে হবে। সকলকে খবর দাও, মাকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করো।'

বিমর্ষ-মুখে সাতকড়ি বলিল, 'তাই তো ভাবছি মন্দা। মনেকে রাখালের কাছে বাঁশের জন্যে পাঠিয়েছিলুম। রাখাল তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, তার বাঁশঝাড় হতে সে নাকি বাঁশ কাটতে দেবে না। এ সময়েও সে কী রকম শত্রুতা সাধছে দেখ। ও ভেবেছে, ও আর কখনও মরবে না, কারও সাহায্য ওকে নিতে হবে না।'

ক্রোধে তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, সে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া নিষ্ফল আক্রোশে একবার চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইল।

আশ্চর্য হইয়া গিয়া মন্দা বলিল, 'এ সময়েও সে তার ঝাড় হতে বাঁশ কাটতে দেবে না?'

সাতকড়ি গর্জন করিয়া বলিল, 'তবে আর বলছি কী? আচ্ছা, থাকতে দাও। আমিও দেখে নেব, আমি যদি এর শোধ খুব ভালো করে না নিতে পারি, তবে আমার নাম সাতকড়িই নয়।'

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন সে এখনই রাখালকে জব্দ করিবার জন্য ছুটিবে।

মন্দা তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল, 'ও কী, মড়া ফেলে উঠে যাচ্ছ কোথায়, বোসো।'

সাতকড়ি আবার বসিয়া পড়িল। নিরুপায়ভাবে স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বলিল, 'বেটা কোঠা-ঘরে বাস করে কি না, কুড়ে-ঘরের দাম বোঝে না। এখন চালি বাঁধবার জন্যে যে বাঁশের দরকার। অগত্যা ঘর থেকে না নিলে উপায় নেই। যে যে এসেছিল, সবাই বাইরে বসে রয়েছে, ওদের ডেকে তাই বলে দি।'

মন্দা এক মুহূর্ত কী ভাবিল, তাহার পর মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আমি এখানে মড়া ছুঁয়ে বসছি, তুমি ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, রাখাল ঠাকুরপোর বাঁশঝাড় হতে বাঁশ কেটে আনো।'

সাতকড়ি আশ্চর্য হইয়া গিয়া বলিল, 'সে কী, সে মনেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে, আবার তারই বাঁশঝাড় হতে বাঁশ কাটতে যাব? তুমি কী মনে করো, মন্দা, সে হুকুম দেবে? অনেক দিন হতে আমায় জব্দ করবার সুবিধা সে খুঁজে আসছে, ভগবান এবার সে সুবিধা তার যখন জুটিয়ে দিয়েছেন, সে কিছুতেই ছাড়বে না।'

মন্দা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'সে আমি দেখে নিচ্ছি। তোমায় বলছি, তুমি রাখালের বাঁশঝাড় হতে বাঁশ আনতে পাঠাও, রাখাল ঠাকুরপোর হুকুম নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এই সময় সে বাড়ি থাকে না, মাঠে ধান কাটতে গেছে দেখেছি, তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও।'

সাতকড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তাও কী হতে পারে? একে সে আগেই বলেছে বাঁশ দেবে না, তারপর সে এখন বাড়ি নেই, এ সময় তার ঝাড়ে হাত দিলে সে শেষকালে নালিশ করবে না? হয়তো বাড়ি বয়ে আসবে লাঠি নিয়ে— তখন?'

মন্দা বলিল, 'তখন আমি দেখে নেব। যাতে সে নালিশ না করে, তোমার মাথায় লাঠি না পড়ে, সে চেষ্টা আমি করব। তুমি সে জন্যে ভেব না। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে চলবে না, দেখতে পাচ্ছ— সামনে মায়ের মড়া পড়ে আছে। যাও, আর একটু দেরি কোরো না।'

সত্যই তখন ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় ছিল না, বর্তমানের বিপদ উদ্ধারই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। পরের জিনিস বিনানুমতিতে গ্রহণ করিতে দরিদ্র, মূর্খ সাতকড়ি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। মন্দা তাহাকে বর্তমান দেখাইয়া উৎসাহ দিল।

রাখালের অনুপস্থিতিতে তাহার ঝাড়ের বাঁশ কাটা হইয়া গেল এবং চালি প্রস্তুত করিয়া সাতকড়ি মায়ের মৃতদেহ লইয়া দাহ করিতে গেল।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরিয়াই রাখাল শুনিতে পাইল, সাতকড়ি তাহার ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

দপ করিয়া তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একে সকাল হইতে এই বেলা দুইটা পর্যন্ত সে জলবিন্দু মুখে দেয় নাই, মাঠের দুরন্ত রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কৃষাণদের দিয়া কাজ করাইয়াছে, তাহাতে বাড়ি ফিরিয়াই এ সংবাদ পাইয়া সে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কী?

রাগের মাথায় সত্যই সে একটা মোটা লাঠি লইয়া সাতকড়ির বাড়ির দিকে ছুটিল।

ঘাটের পথে দেখা হইল মন্দার সহিত। সে এক রাশি বাসন মাজিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল।

মন্দা থমকিয়া দাঁড়াইয়া এই লোকটির পানে তাকাইয়া রহিল। সে যে কী উদ্দেশ্যে লাঠি লইয়া ছুটিতেছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

হঠাৎ পথের উপর তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাখালও থমকিয়া দাঁড়াইল।

সে আর অগ্রসর হইল না দেখিয়া মন্দা নিজেই তাহার নিকটে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা যাচ্ছ, ঠাকুরপো?'

রাখাল সে কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সাতুদা বাড়ি আছে?'

মন্দা উত্তর দিল, 'আজ আর কোথায় যাবে? খাওয়া-দাওয়া তো নেই, বারান্দায় বোধ- হয় শুয়ে পড়ে আছে। কী দরকার তাকে?'

যেন কিছুই হয় নাই, এমনভাবেই সে প্রশ্ন করিল। তাহার সে প্রশ্ন শুনিয়া রাখালের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে আর একটি কথা না বলিয়া অগ্রসর হইল।

মন্দা বাধা দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আগে বলো, তাকে তোমার কী দরকার, বললে বোধহয় বিশেষ দোষ হবে না। কী বলো, ঠাকুরপো?'

তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিতে দেখিয়া রাখাল মুখ বিকৃত করিল। হাতের লাঠিটা দেখাইয়া রূঢ়ভাবেই সে বলিল, 'কী জন্যে বুঝতে পারছ না? এই লাঠি দিয়ে আজ তার মাথা ভাঙব। সেই মতলব নিয়েই আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার হাতের ওই পাঁচ হাত লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি সেই দুর্বল মানুষটির মাথায় পড়লে সে আর এক দণ্ড বাঁচবে না, তা তো জানো? কাজেই সে মরা মানুষটাকে মেরে আর নিজেও নাই মরলে। যে দুদিন সে বেঁচে থাকে, তুমি বেঁচে থাকো, তাই করো।'

রাখাল চলিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তীব্র দুইটি চোখের দৃষ্টি মন্দার মুখের উপর ফেলিয়া বলিল, 'বাঁচায় লাভ কী?'

মন্দা হাসিল, 'লাভ অনেক। মানুষ বাঁচে কী জন্যে বলো দেখি? পাঁচজনের মধ্যে একজন হয়ে থাকবার জন্যেই তো, পাঁচটা ভালো কাজ করবার জন্যেই তো?'

হঠাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া রাখাল বলিল, 'না, পাঁচজনের একজন হয়ে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি পথ ছাড়ো মন্দা, আমায় যেতে দাও।'

মন্দা তাহার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল, 'আচ্ছা, তাকে মারবে কেন, সেই কথাটা আগে বল।'

রাখাল বলিল, 'আমার বিনা হুকুমে আমার ঝাড় হতে বাঁশ কেটে আনবার জন্যে। ভয় নেই মন্দা, তোমার স্বামীকে আমি একেবারে খুন কবব না। তাহলে তো সবই ফুরিয়ে যাবে, তোমার খাওয়া-পরা পর্যন্ত উঠবে। সেইজন্যেই আমি তাকে এমন শাস্তি দিতে চাই, যাতে তাকে চিরদিন তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। বুঝতে পারছ তাকে কী করব? তার একখানা হাত আর একখানা পা জন্মের মতো অচল করে দেব।'

তাহার মুখখানা জিঘাংসার আনন্দে বীভৎস হইয়া উঠিল।

মন্দা শান্তকণ্ঠে বলিল, 'তাহলে সে শাস্তিটা যে আমাকেই দিতে হয়। বাঁশ তো সে কাটায়নি, আমি কাটিয়েছি, রাখালদা।'

'তুমি কাটিয়েছ—?' বিস্ফারিত-নেত্রে রাখাল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। এতক্ষণ যে শক্তি লইয়া সে ছুটিতেছিল, সে শক্তি তাহার যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মন্দা বলিল, 'হ্যাঁ, আমিই কাটিয়েছি। এর জন্যে যদি শাস্তি দিতে হয়, তাহলে আমায় দাও। এই তো বেশ সময়, কোথাও কেউ নেই, দুপুরবেলা চিৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না। ভয় নেই, আমি চিৎকার করব না। মনে পড়ে রাখালদা, সেই একদিন, সেদিন এই গঙ্গার ধারেই তুমি আমার সামান্য একটা দোষ ধরে বেত দিয়ে মেরেছিলে? সেদিনও তো আমি কাউকে ডাকিনি, আমার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার হয়নি।'

রাখাল কেবল বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল। খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'মনে পড়ে মন্দা, সেদিন মাঝখানে সাতুদা এসে দাঁড়ায়নি। সেদিন আমি তোমার রাখাল ঠাকুরপো ছিলুম না। আমি ছিলুম রাখালদা, তুমি ছিলে মন্দা।'

মন্দা বলিল, 'সেদিনকার মতো আজও আমায় মের যাও, রাখালদা। কেউ শুনবে না, কেউ দেখবেও না, আমি এক প্রাণীকে বলব না।'

রাখাল হাতের লাঠিটাকে দূর-নদীবক্ষে ছুড়িয়া ফেলিল। লাঠিটা একবার ডুবিয়া গিয়া আবার ভাসিয়া উঠিল এবং স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

মন্দা বিস্মিত-নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কী করলে, রাখালদা?'

রাখাল একবার দূর-নদীর পানে তাকাইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওটা ফেলে দেওয়াই ভালো বলে মনে করলুম, মন্দা। জানোই তো, গোঁয়ার মানুষ কখন কী করে বসব, তার ঠিক নেই, হাতের কাছে সেই জন্যে ওরকম জিনিস না রাখাই ভালো বলে মনে করি।'

সে ফিরিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, 'স্নান খাওয়া হয়েছে?'

চলিতে চলিতে রাখাল বলিল, 'এখনও হয়নি, এইবার হবে।'

খানিক দূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল, মন্দার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, 'কিন্তু এইবারটা মাপ করলুম বলেই বারে বারে যে মাপ করব, তা মনেও কোরো না, মন্দা। এ পর্যন্ত অনেকবার অনেক কিছুই মাপ করে এসেছি, সে কেবল তোমার জন্যে; কিন্তু এই শেষ হয়ে গেল, মনে রেখো। এর পর হতে তোমার ও ম্যালেরিয়ায় দুর্বল স্বামীটিকে বারণ কোরো, যেন আমার সঙ্গে না লাগতে আসে। এবার যেদিন দেখব, সেইদিনই এক চড়ে ওর মাথাটা উড়িয়ে দেব। লাঠিই যেন নেই, হাত দুখানা আছে, মনে রেখো।'

সবল দুইটি বাহু আন্দোলিত করিয়া সে সগর্বে চলিয়া গেল, একবারও পিছন পানে ফিরিয়া চাহিল না।

মন্দা স্তব্ধভাবে এই লোকটির পানে কেবল চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বাসনের গোছা তুলিয়া লইল, ধীরে ধীরে আবার সে নিজের বাড়ির দিকে চলিল।

॥ ৩ ॥

সে আজ অনেক কালের কথা।

সেদিন মন্দা ছিল মন্দা ও রাখাল ছিল রাখাল। তাহাদের মাঝখানে সাতকড়ি আসিয়া দাঁড়ায় নাই, মন্দা সেদিন বউদি, রাখাল— রাখাল ঠাকুরপো হয় নাই।

হরিদাসমাটি গ্রামখানি বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এইখানে তাহারা এতটুকু বেলা হইতে মানুষ হইয়াছে। এই পথে ছুটাছুটি করিয়াছে, গঙ্গার ওই নীল জলে সাঁতার দিয়া জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

মন্দার পিতা চরণদাস লোকটি বেশ ভালো ছিল, সকল লোক তাহাকে বেশ খাতির করিত। মন্দা যখন আট বৎসরের, তখন তাহার মা মারা যায়, এবং লোকের জিদে পড়িয়া বিশেষ করিয়া মেয়েটার কষ্টের দিকে তাকাইয়া চরণদাস আবার বিবাহ করে।

কৈবর্তের ঘরে এত বড়ো কুমারী কন্যা বড়ো একটা থাকে না। মন্দার বিমাতা দেখিতে সুশ্রী হইলেও তাহাদের বংশে নাকি কী কলঙ্ক ছিল, যাহাতে তাহার বিবাহ হওয়াই মুশকিল হইয়াছিল। অবশেষে প্রৌঢ় চরণদাসের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

তারা স্বামীর আলয়ে পদার্পণ করিয়াই এই মেয়েটাকে দেখিয়া জ্বলিয়া গিয়াছিল। চরণদাস প্রায়ই বাড়ি থাকিত না, সে নিকটবর্তী বন্দর বহরমপুরে দোকানে কাজ করিতে যাইত, সন্ধ্যার অনেক পরে ফিরিত। তারা এই ছোটো মেয়েটিকে নির্যাতন করিত বড়ো কম নহে। মাসের মধ্যে পনেরো কুড়ি দিন সে বাড়িতে ভাত পাইত না, সেই সময়ে তাহাকে আহার দিয়া, আদর দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল রাখাল।

গ্রামের মধ্যে যতগুলি ছেলে ছিল, রাখাল ছিল তাহাদের সর্দার। কী স্বাস্থ্যে কী সুচেহারায়, কী স্বভাব-চরিত্রে, কী বলে-বুদ্ধিতে সে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থাও সর্বাপেক্ষা ভালো ছিল। রাখালের পিতা কন্ট্রাক্টরি কাজে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। সে রাখালের বাল্যাবস্থায় মারা যায়, বিধবা মা রাখালকে মানুষ করে। রাখাল স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিল, তাহার পর মা মারা যাওয়ায় আর তাহার পড়া হয় নাই।

ইহার পর সে ব্যায়ামে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। গ্রামের সকল ছেলেকে সে ইহাতে লইয়াছিল, কিন্তু তাহারা [illegible] শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে নাই, রাখাল তাহাদের ধিক্কার দিয়াছিল, [illegible] ছাড়ে নাই।

গ্রামের কাহারও কোনো বিপদ ঘটিলে সে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার উপকার করিত। জীবনের ভয় তাহার ছিল না, কোনো বিপদকে সে ভয় করিত না। লোক তাহাকে গোঁয়ার বলিত, যে কাজ সে করিব বলিয়া ইচ্ছা করিত, কিছুতেই সে কাজ হইতে সে নিবৃত্ত হইত না। অল্পেই সে বড়ো বেশি রকম রাগিয়া উঠিত; লোকের যেমন ভালো করিত, তেমনই অপকারও সে করিতে পারিত, এইজন্য সকলেই তাহাকে ভয় করিত।

মন্দাকে সে স্নেহ করিত, ভালোও বাসিত। মন্দার উপর তাহার নির্যাতনও বড়ো কম ছিল না। তাহার হাতের অনেক চিহ্ন আজও মন্দার দেহে অনেক স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

মন্দা মেয়েটিও নীরবে তাহার সকল অত্যাচার সহিয়া যাইত, প্রহার লাভ করিয়াও সে রাখালের তোষামোদ করিত। এই মেয়েটি না হইলে রাখালের এক দণ্ড চলিত না। সকল বিষয়ে সে রাখালকে যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু সাহায্য করিত।

পাড়ার সকলে, এমন কী, গ্রামের সকলেই জানিত, মন্দার সহিত রাখালের বিবাহ হইবে। মন্দার পিতা চরণদাস একদিন রাখালের কাছে মন্দার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিল, রাখাল বলিয়াছিল, কিছুদিন যাক, তাহার পর সে ভাবিয়া দেখিবে।

সে ভাবিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়ের বাপ হইয়া চরণদাস আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; কেন না, মন্দা বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। সে তখন রাখালের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অন্য পাত্র দেখিতে মন দিল।

সাতকড়ি এই গ্রামেরই ছেলে, অবস্থা তত ভালো নহে। কিছু জমি-জমা আছে, এবং সে মজুর খাটিয়াও দিনে আট আনা উপার্জন করে। চরণদাস সাতকড়ির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবামাত্র সে সম্মত হইল এবং একদিন মন্দার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

তখন রাখাল হরিদাসমাটিতে ছিল না, মাসখানেক আগে সে কলিকাতায় মাসির বাড়ি গিয়াছিল। মন্দার বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। চরণদাস যে মন্দার সহিত অপর কাহারও বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারে, ইহা তাহার ধারণার অতীত ছিল।

কিছুদিন পরে সে যখন ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, মন্দার সহিত সাতকড়ির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন সে ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কী করিবে, ঠিক না পাইয়া ক্রোধের বশে নিজেই নিজের কতকগুলি জিনিসপত্র ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করিল।

প্রথমটা রোখ পড়িল চরণদাসের উপরে। চরণদাস দুই দিন অপেক্ষা করিল না কেন? মন্দা কী ঘর ভাঙিয়া পলাইয়া যাইত? সে যখন চরণদাসকে জব্দ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় চরণদাস মরিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইল এবং মন্দার বিমাতা জমি-জমা বাড়ি বিক্রয় করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

রাখাল গর্জিতে লাগিল। চরণদাসকে জব্দ করিতে পারিলে তাহার জিঘাংসা-নিবৃত্তি হইত। সাতকড়িকে সে যখন গান গাহিয়া কার্যে আসা-যাওয়া করিতে দেখিত, তাহার বুকটা তখন জ্বলিয়া যাইত। মনে হইত, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সাতকড়ি সুখী হইয়াছে, অথচ সে চিরদুঃখী হইয়া দিন কাটাইতেছে। যদি তখন সাতকড়ি আসিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে মন্দার বিবাহ তখনই হইত না।

চরণদাসের উপর যে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা ক্রমে সাতকড়ির উপরে বর্ষিত হইল। সাতকড়িকে জব্দ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

হঠাৎ তাহার উপর রাখালের এইরূপ বিদ্বেষের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সাতকড়িও আশ্চর্য হইয়া গেল। যে রাখাল চিরদিন সাতকড়িকে ভক্তি করিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সে এখন হঠাৎ এরূপ নির্মম হইয়া উঠিল কেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু মন্দা সব বুঝিয়াছিল, বুঝিয়া সে কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল।

॥ ৪ ॥

এবারকার ম্যালেরিয়ায় গ্রামের সকলেই ভুগিতেছিল, ইহাদের মধ্যে সাতকড়ির উপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ বড়ো বেশি রকম চলিতেছিল। আগে সে প্রত্যহ জন খাটিতে যাইত, দিন যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সংসার সুন্দর চলিয়া যাইত। এখন সে কাজ বন্ধ হইয়াছে, শরীরে শক্তি নাই, সে খাটিতে পারে না।

এবার অদৃষ্ট তাহার বড়োই মন্দ। সেইজন্য এবারকার দারুণ বর্ষায় ধানগাছগুলির বেশি ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিঘাখানেক জমিতে যে ধান্য জন্মিয়াছে, তাহাতে কী করিয়া সংসার চলিবে, ইহা ভাবিয়া সাতকড়ির মনে এতটুকু শান্তি ছিল না।

প্রতি বৎসর জমিতে যে ধান জন্মে, তাহা বৎসরের মতো গোলাজাত করিয়া বাকি ধান বিক্রয় করিয়া সে খাজনা দেয়। এবার যে কী হইবে, তাহা ভাবিয়া সাতকড়ি ঠিক করিতে পারিতেছে না।

এ অঞ্চলের যত জমি, সব রাখালের। সে সকলকে জমি ভাগ করিয়া দিয়া মোটামুটি খাজনা কুড়াইয়া জমিদারকে খাজনা দেয়। কাজেই যাহারা চাষাবাদ করে, তাহাদের সকলকেই রাখালের বাধ্য হইয়া থাকিতে হয়। যে যে বৎসর খাজনা না দিতে পারে, রাখাল নিজ হইতে তাহার খাজনা জমিদারকে দেয়। পরে সুবিধামতো নিজের প্রাপ্য আদায় করে। সাতকড়ির খাজনা সে আগে কয়েক বৎসর এইভাবে দিয়াছে। তাহার পর এই পাঁচ বৎসর জমিতে প্রচুর ধান জন্মিয়াছিল বলিয়া সাতকড়িকে খাজনার জন্য ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু এবার যে কী উপায় হইবে, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

সেই রাখাল— যাহাকে একদিন সে নিজের ভাইয়ের মতো স্নেহ করিত, সে আজ তাহার চিরশত্রুর কাজ করিতেছে। অথচ সে যে কেন এভাবে শত্রুতা করিতেছে, তাহা সাতকড়ি জানে না। আজ যখন তাহার সম্মুখাগত দিনের পানে তাকাইয়া প্রাণ শুকাইয়া উঠে, তখনই রাখালের কথা মনে হয়। মনে হয়, একদিন এই রাখালই বলিয়াছিল, 'সাতুদা, তুমি কোনো কিছুর জন্যে একটুও ভেব না। রাখাল যতদিন বেঁচে আছে, তত- দিন তুমি নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাও।'

মনে পড়ে, একবার তাহার কঠিন ব্যারাম হইয়াছিল, তখন গ্রামে এত লোক থাকিতেও কেহ দেখে নাই। সে সময় রাখাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার মাথার কাছটিতে বসিয়া থাকিত, নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া শহর হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখাইত। আজ সেই রাখাল বাড়ির সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, সাতকড়ি এত অসুখে ভুগিতেছে, শুনিয়াও একটিবার আসা দূরে থাক. পথে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। তাহার বিকৃত মুখের পানে তাকাইয়া সাতকড়ি আর একটি কথা বলিতে পারে না।

কিন্তু সে সব যাক— সেদিনকার সে অপমানের কথা, সে শত্রুতার কথা সাতকড়ি জীবন থাকিতে ভুলিবে না। মা মারা গিয়াছে, একখানা বাঁশ চাহিতে গিয়া তাহাকে কী লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইয়াছে। সেকথা সাতকড়ি ভুলিবে না, ইহার প্রতিশোধ সে-ও যে কোনো প্রকারে দিবেই।

রাত্রিতে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সাতকড়ি সকালে উঠিয়া বারান্দায় রৌদ্রে বসিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

তারণ মণ্ডল পথ দিয়া যাইবার সময় উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিল, 'জ্বরটা ছেড়েছে, সাতকড়ি?'

ক্ষীণকণ্ঠে সাতকড়ি উত্তর দিল, 'বোধহয় ছেড়েছে।'

তারণ জিজ্ঞাসা করিল, 'এমন অসুখে পড়লে, এখন ধান কাটাবার কী ব্যবস্থা করছ হে? ধান যে সব নষ্ট হয়ে গেল।'

সাতকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; বলিল, 'কী করব দাদা, ভগবান এবার যে সব রকমেই মেরেছেন. উপায় তো কিছু দেখছি নে। নিজের সামর্থ্য নেই, পয়সা একটিও হাতে নেই যে, জন ধরে ধান কাটাব। কী যে করি, তাই ভাবছি।'

তারণ নিকটে আসিয়া গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল, 'আবার এক নতুন হুকুম জারি হয়েছে, শুনেছ, সাতকড়ি?'

তাহার কথা বলার ভঙ্গি শুনিয়া সাতকড়ি ভয় পাইল; বলিল, 'না, আমি তো কিছু শুনিনি।'

তারণ ফিসফিস করিয়া বলিল, 'গেল বছর যারা জমিদারের খাজনা শোধ দিতে না পেরেছে, তারা বাকি খাজনা না দিলে ধান কাটতে পারবে না, জমিদার এই নতুন হুকুম জারি করেছেন।'

সাতকড়ির মাথায় কে যেন সজোরে লাঠি মারিল। তাহারও তো গত সনের খাজনা দেওয়া হয় নাই। নিজে সে জমিদার মহাশয়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনুমতি লইয়াছিল, আগামী বৎসরে সে দুই সনের খাজনা একবারে মিটাইয়া দিবে। গত বৎসরে তাহার দান প্রচুর হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় অর্ধেক ধান আগুন লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সে বিক্রয় করিতে পারে নাই, সম্বৎসরের খোরাকিও তাহাতে কুলায় নাই।

বিবর্ণমুখে সাতকড়ি বলিল, 'সর্বনাশ, আমার যে গেল সনের খাজনা বাকি পড়েছে।'

চিন্তাপূর্ণ-মুখে তারণ বলিল, 'তবেই তো মুশকিল। এখন এক কাজ করলে চলতে পারে। রাখালকে একবার ধরতে পার? ওর হাতেই এ সব রয়েছে, ও একবার জমিদারকে বললেই তিনি শুনবেন।'

বলিতে বলিতে গলার স্বর খাদে নামাইয়া সে চুপি চুপি বলিল, 'বুঝেছ তো, এ সব ওই মেটার কাণ্ড। গায়ে হাতির মতো জোর আছে আর দুপাতা পড়েছে, বাপও হাজার কত টাকা রেখে গেছে, বেটা মনে ভেবেছে, না জানি কী হয়েছে; নইলে জাতভাইদের এমন করে সর্বনাশ করতে আসে?'

রাখালের নাম শুনিয়াই সাতকড়ির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল, 'নাঃ, ওর কাছে আমি যাব না, আমার যদি সব যায়, আমি যদি পথে পথে ভিক্ষে করি, তবু ওর কাছে আমি যাচ্ছি নে, মিস্ত্রি।'

তারণ প্রবোধ দিয়া বলিল, 'তা বললে তো চলবে না, ভাই। বিঘেখানেক জমিতে ধান হয়েছে কত, তোমাদের দুজন মানুষের প্রায় চার-ছয় মাসের খোরাক। একটু খোশামোদ না করায় সব হারাবে? এই তো অনেকেই রাখালের কাছে যাচ্ছে, রাখাল তাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছে। সেসব কথা ভুলে যাও, সাতকড়ি, এখন যা বিপদ সামনে এসেছে, তার কথাই ভাব।'

সে চলিয়া গেল।

সাতকড়ি জড়ের মতোই বসিয়া রহিল, তাহার মাথার মধ্যে এই একটি কথাই গর্জিতে লাগিল। এক বিঘা জমির ধান বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আজ রাখালের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে হইবে, রাখালের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ ধান তাহাদের জীবন রক্ষা করিবে।

মন্দা শীতের ভোরে বাসি কাজ সারিয়া নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর জন্য খাদ্য তৈয়ার করিতে গিয়াছিল। এক বাটি সাবু আনিয়া স্বামীর পার্শ্বে রাখিয়া বলিল, 'আগে এটুকু খেয়ে নাও দেখি, কাল তো কিছুই খাওনি। ভোরে যখন উঠি, তখনও আজ জ্বর ছিল, দেখি, এখন জ্বর আছে কী না?'

সস্নেহে সে স্বামীর ললাট স্পর্শ করিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাতকড়ি বলিল, 'এখন খাব না, মন্দা।'

আশ্চর্য হইয়া গিয়া মন্দা বলিল, 'খাবে না কেন? এই যে ভোরবেলা বললে, বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে, শিগগির কিছু আমার চাই।'

রুদ্ধকণ্ঠে সাতকড়ি বলিল, 'তখন ক্ষিদে ছিল, এখন আর নেই। আর খাব কী মন্দা, আমার মরণ হলেই এখন বাঁচি, আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই।'

হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, অঞ্চলে রুগ্ণ স্বামীর অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে দিতে মন্দা বলিল, 'কেন, হঠাৎ কী হল যে একথা বলছ?'

সাতকড়ি অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে তারণের কথাগুলি বলিয়া বলিল 'এ আর কিছু নয়, মন্দা। একমাত্র আমার জন্যই রাখাল জমিদারের কাছ হতে এই অনুমতি নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, ঠিক করে বলো মন্দা, পাঁচ বছর তোমার বিয়ে হয়েছে, এই পাঁচ বছর ধরেই কী রাখাল আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করছে না? কিন্তু তোমায় বিয়ে করার আগে সে বরাবরই তো আমার বাড়ি আসত, আমায় নিজের ভাইয়ের মতো দেখত। আমি ভাবছি, তোমায় আমি বিয়ে করেছি, এই আক্রোশেই সে এরকম করছে না তো?'

মন্দার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার মনে হয়, তা নয়।'

'তা ছাড়া আর তুমি কী বলতে চাও, মন্দা?'

সাতকড়ি ব্যগ্রচোখে মন্দার পানে চাহিল।

মন্দা ধমকের সুরে বলিল, 'তুমি মিছে বোকো না। দেখছি, যত সব আজগুবি ভাবনা মাথায় এসে জুটেছে। নাও, সাবুটা খাও। আমার সঙ্গে তো রাখালদার কথাবার্তা চলে, একদিন আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করব, কেন সে এরকম করে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধছে।'

সাতকড়ি সবেগে বলিয়া উঠিল, 'সে তোমায় আমি কক্ষনও জিজ্ঞাসা করতে দেব না, মন্দা। সে কে? মনে ভাববে, আমি তাকে খোশামোদ করবার জন্যে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তা হবে না। আমার ধান জমি-জমা সব যাক, আমার বাড়ি-ঘর সব যাক, আমি গাছতলায় বাস করব, ভিক্ষে করে খাব, সে:ও আমার ভাল, আমি রাখালের খোশামোদ কখনও করব না।'

মন্দা বলিল, 'ভালো, তাই হবে, এখন তুমি খাও, আগে শরীর বাঁচাও, তারপরে সব হবে।'

দ্বিরুক্তি না করিয়া সাতকড়ি সাবুটুকু খাইয়া ফলিল।

॥ ৫ ॥

শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল, ইহার উপর দারুণ চিন্তা— বৎসরের আহার্য তাহার চোখের সামনে নষ্ট হইয়া গেল। রাখাল নিজের জন দিয়া সাতকড়ির জমির ধান কাটাইয়া নিজের বাড়ি লইয়া গিয়াছে, সাতকড়ি এ সংবাদও পাইয়াছিল।

মন্দাকে ডাকিয়া ক্ষীণস্বরে আসিয়া বলিল, 'শুনেছ মন্দা, রাখাল সব ধান নিজের বাড়ি নিয়ে গেছে?'

উদগতপ্রায় অশ্রুধারা গোপন করিয়া মন্দা বলিল, 'শুনেছি।'

সাতকড়ি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, 'এ কেবল আমায় জব্দ করা। আচ্ছা তাই হোক, সাতকড়িকে কেউ কোনো দিন জব্দ করতে পারেনি, পারবেও না। তোমার জন্যই ভাবছি, মন্দা। এরপর তোমার কী হবে? মনে কোরো না, সে কেবল জমি দখল করে নিশ্চিন্ত হবে, এবার বাড়ি-ঘর দখল করবার চেষ্টা করবে।'

মন্দার চোখের জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া গেল, তাহার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, খানিক স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া মন্দা বাহির হইয়া গেল।

আকাশে গভীর কালো মেঘ জমিয়া বসিয়াছে। কাল রাত্রিকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শুধু বাহিরেই জলস্রোত বহিয়া যায় নাই, সাতকড়ির ভাঙা ঘরের চাল দিয়া অজস্রধারে জল ঝরিয়া ঘরের মেঝে, বিছানা সব ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে, কাল সমস্ত রাত্রি মন্দা রুগ্ণ স্বামীকে পাহারা দিয়াছে, নিজের গায়ের কাঁথাখানি পর্যন্ত তাহার গায়ের উপর চাপাইয়া দিয়া এই শেষ অগ্রহায়ণের দুরন্ত শীতে নিজে কষ্ট পাইয়াছে।

গৃহ হইতে বাহির হইয়া মেঘাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। আজও বৃষ্টি আসিবে, সে বৃষ্টিধারার আক্রমণ হইতে সে তাহার রুগ্‌ণ স্বামীকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া?

মন্দা আর ভাবিতে পারিল না, পথে নামিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ধরাবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গঙ্গার ওপারে সূর্য যে স্থানে ডুব দিয়াছে সে স্থানে কে যেন সিন্দুর মাখাইয়া দিয়াছে। সেই লালে আকাশের লাল আভা এপারে যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই রঙিন করিয়া তুলিয়াছে।

রাখাল তখন কোথায় বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। হঠাৎ মন্দাকে নিজের বাড়িতে দেখিয়া সে একবারে আশ্চর্য হইয়া গেল।

'এ কী, মন্দা—'

দৃঢ়কণ্ঠে মন্দা বলিল, 'হাঁ, আমিই। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু জেনো, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তোমার কাজই আমায় তোমার বাড়িতে আজ পাঁচ বছর পরে টেনে এনেছে।'

রাখাল শান্তকণ্ঠে বলিল, 'তা আমিও বুঝেছি। আচ্ছা, বোসো, যা বলতে এসেছ, বলো, যদিও আমি কাজে বার হচ্ছিলুম— না হয়, সে কাজ আজ থাক।'

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী কাজে যাচ্ছিলে, আমাদের ভিটেটুকু যাতে যায়, আমরা গাছতলায় দাঁড়াই, সেই জন্যেই তো?'

একটু হাসিয়া রাখাল বলিল, 'ধরে নাও তাই-ই।'

মন্দা খানিক স্তব্ধভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আশ্চর্য, সে কথাটা বলতে তোমার মুখেও বাধল না!'

রাখাল হাসিমুখে বলিল, 'বাধবার তো কোনো দরকার নেই, মন্দা। জানোই তো, মিছে কথা বলতে আমি চাই নে, কোনো দিন বোধহয় বলিওনি। আজ কেবল তোমার মন রক্ষা করবার জন্যেই মিছে কথা বলবার দরকার নেই।'

মন্দা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সবই তো নিয়েছ, আজ বাদে কাল ভিক্ষে করে তবে তো পেট চালাতে হবে, এখন মাথা গুঁজবার ঘরটুকু গ্রাস করলে গাছতলা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।'

রাখাল বলিল, 'তাতেই বা দুঃখ-কষ্ট কীসের, মন্দা? স্ত্রী যদি স্বামীর পাশে থাকে, হোক না সে গাছতলা, হোক না সে ভিক্ষার ভাত, সে-ও কি ভালো নয়?'

মন্দার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল, 'নিশ্চয়ই, স্বর্গে বাস করার চেয়ে স্বামীর পাশে যদি গাছতলাতেও থাকতে পাই, সে-ও আমার ভালো।'

রাখাল আবার হাসিল, 'তবে আর বলতে এসেছ কেন, মন্দা? বলে কোনো ফল হবে না। আমি দেখতে চাই, তোমাদের সীমা কত দূর, আর কত দূর তোমরা সহ্য করতে পারো। জানো, কেউ কেউ এমন পিশাচও থাকে— যারা অনর্থক লোককে কষ্ট দিয়ে আমোদ পায়। আমি সেই ধরনের লোক। যাদের একদিন যত ভালোবাসতুম, তাদের তত কাঁদিয়ে আমি আরাম পাই। আমি পৃথিবীতে এসেছি কারো উপকার করবার জন্যে নয়, অপকার করবার জন্যে।'

তাহার কথা শেষ দিকটা অকস্মাৎ অত্যন্ত কোমল পর্দায় উচ্চারিত হইল। মন্দা বলিল, 'যদি তাই জেনে থাকো, বুঝে থাকো, তবে যাতে তোমায় দিয়ে লোকের ভালো হয়, লোকের আশীর্বাদ কুড়াতে পারো, তাই করো না কেন?'

অন্যমনস্কভাবে রাখাল বলিল, 'তাতে আমার লাভ কী? পৃথিবীতে একদিন আমি সব দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পৃথিবী আমায় কিছু দেয়নি, বরং আমার যা কিছু ছিল, সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। না, আমি আশীর্বাদ কুড়াতে চাই নে, অভিশাপই আমার ভালো।'

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তারপর উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, 'না, তুমি বাড়ি যাও, মন্দা। রাত হয়ে এল, তোমার স্বামীর অসুখ, উঠবার ক্ষমতা নেই, যদি কোনো দরকার পড়ে, কেউ নেই, কে দেবে? চলো, আমি তোমায় তোমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, এই অন্ধকারে একলা পথে চলা উচিত নয়।'

মন্দা বলিল, 'আমি একলাই যেতে পারব, তোমায় আর কষ্ট করে যেতে হবে না।'

আর একটা কী কথা বলিতে গিয়া সে থামিল, ধীরে ধীরে সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

রাখাল বলিল, 'কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, সাতুদা তোমায় আমার কাছে পাঠালে কী বলে? শুনেছি, সে নাকি কঠোর পণ করেছে, আমার কাছে কিছুতেই হাত পাতবে না, কোনো দিন কোনো অভাব অভিযোগ জানাবে না।— তবে?'

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নত মুখ সগর্বে উন্নত করিয়া তেমনই গর্বভরা সুরে মন্দা বলিল, 'না, তোমার সাতুদা আমায় পাঠায়নি। সে জানেও না, আমি তোমার এখানে এসেছি। কোনোদিন হয়তো জানতেও পারবে না, যদি আমি তাকে কোনো কথা না জানাই। এটুকু জেনো, রাখালদা, সেই রুগ্‌ণ মানুষটির ভেতরে আজও যে আত্মমর্যাদা-জ্ঞান, যে অভিমান আছে, তা খুব কম লোকেরই থাকে।'

রাখাল বিস্মিত-নেত্রে অন্ধকারে বিলীনপ্রায় এই তেজস্বিনী সতীর পানে তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া গিয়া বারান্দায় চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া গুন গুন করিয়া গান ধরিল।—

'কেউ কারও নয় দেখ না চেয়ে
কবে ফুটবে আঁখি,
এই বেলা মন চল রে সোজা
হরি বলে ডাকি,
কী ছার আর—'

॥ ৬ ॥

সেদিন জমিদারের লোকজন সত্যই ঘর দখল করিতে আসিল। সেই দিন সাতকড়ির কেবলমাত্র জ্বরটা ছাড়িয়াছে। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন পরে জ্বর ছাড়ায় রুগ্‌ণ সাতকড়ি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল।

মন্দা কতক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সে বেড়ার ফাঁক দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল, তাহাদের মধ্যে রাখাল নাই। মন্দা বেশ বুঝিল, এ সময় রাখাল দেখা দিবে না; কিন্তু সে যে অন্তরালেই কোথায় গা-ঢাকা দিয়া আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্দা সজোরে অধর দংশন করিল।

বৃদ্ধ বিহারী মণ্ডল আসিয়া মলিন-মুখে বলিল, 'কী করা যায়, মা! ওদের থামিয়ে রাখবার জন্যে কী উপায় করা যায়, বলো দেখি?'

মন্দা কী বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

বিহারী মণ্ডল কেশবিরল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'ওঁরা নাকি তিন বছরের খাজনা পাননি, বার বার জানানো সত্ত্বেও সাতকড়ি খাজনা দেয়নি, অথচ—'

'তিন বছর—', মন্দা একবারে অবাক হইয়া গেল।

বিহারী মণ্ডল বলিল, 'তাই তো বলছে, মা! আমি তো তাই শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। কেন না, আমি জানি, গেল বছরটাই মাত্র খাজনা দেওয়া হয়নি, অন্য অন্য বছরের খাজনা পাই-পয়সা হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, কাগজপত্র সব কোথায়, সেগুলো পেলেও তো হত?'

মন্দা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'মাসখানেক আগে যে বাকসে সব কাগজপত্র ছিল, সেই বাকসটাই যে চুরি গেছে।'

বিহারী মণ্ডল নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অনেকক্ষণ পরে বলিল, 'তবে উপায়?'

মন্দা বলিল, 'উপায় ভগবান। আপনি ওদের বলুন, আমি দিন দশেক সময় চাই, দশ দিন পরে আমি নিজেই এ ঘর ছেড়ে আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যাব। ওদের কাউকে একটি কথাও বলতে হবে না। ওঁকে দুটো ভাত দিলে তবু একটু শক্তি পাবেন, কিন্তু আজ এই ভোরবেলা মাত্র জ্বর ছেড়েছে, এমন সময়ে কী করে কোথায় নিয়ে যাই, বলুন দেখি? একটু নড়াতে গেলে প্রাণটুকু যে বার হয়ে যাবে, আমি তুলব কী করে?'

তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

বিহারী মণ্ডল একবার এই শীর্ণা সতীর পানে তাকাইল। আজ চল্লিশ দিন রোগের সহিত সে দিবারাত্রি যুদ্ধ করিয়াছে, দিন-রাত্রি তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, একমাত্র লক্ষ্য— কেমন করিয়া তাহার স্বামীকে সে বাঁচাইবে? এক হাতে সে সেবা করিয়াছে, পথ্য প্রস্তুত করিয়াছে, ঔষধ আনিয়াছে, স্বামীকে সাহস দিয়াছে, সান্ত্বনা দিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী মণ্ডল বাহিরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গোমস্তা বাহির হইতে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া গেল 'পনেরো দিন সময় দিলুম, এর মধ্যে উঠে যাওয়া চাই; যদি না যাও, তবে—'

মন্দা আর শুনিতে পারিল না, দুই হাতে চোখ চাপা দিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িল।

গৃহমধ্য হইতে সাতকড়ি বড়ো ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিল, 'মন্দা, ও কী, কে কথা বলে?'

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, স্বামীর বিছানার পাশে বসিয়া, তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মন্দা বলিল, 'ও কিছু নয়, বাইরে কে বুঝি কাকে কী বলছে? কিছু দেব, খাবে?'

কিন্তু দুই দিন যাইতে— যেদিন সাতকড়ি পথ্য করিবে সেই দিনই সে প্রতিবেশী লক্ষ্মণের মুখে সব শুনিতে পাইল।

সাতকড়ি দুই হাতে কম্পিত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল।

মন্দা ভাত আনিয়া বলিল, 'ওঠো, দুটো ভাত খাও, এখনই শুয়ে পড়লে যে?'

সাতকড়ি ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, 'আমায় সেদিন কী কথা লুকিয়েছিলে, মন্দা? আমি লক্ষ্মণের মুখে আজ সব শুনতে পেলুম।'

মন্দা অন্তরে চমকাইয়া উঠিয়া ও মুখে দিব্য শান্তভাব দেখাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, সেসব আমি তোমায় বলছি, তুমি উঠে আগে খেয়ে নাও, তারপর সব বলব।'

সাতকড়ি বলিল, 'আগে বলো, সেদিন কেন লুকিয়েছিলে?'

তিরস্কারের সুরে মন্দা বলিল, 'তখনও তোমার কেবলমাত্র জ্বর ছেড়েছিল, তখন কী কিছু বলা যায়? তুমি দুটো ভাত খেলেই আমি তোমায় সব বলতুম। আজ ভাত খাও, তারপর আমি তোমায় বলছি।'

সাতকড়ি আহারে বসিল।

আহার সমাপ্ত হইলে তাহার মুখ-হাত ধোয়াইয়া অঞ্চলে মুছাইয়া দিতে দিতে মন্দা সব কথা বলিয়া গেল, একটি কথাও গোপন করিল না।

সাতকড়ি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হিসাব করিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, 'সে পনেরো দিনের মধ্যে তিন দিন কেটে গেছে, আজ গেলে চার দিন চলে যাবে। কিন্তু এই পনেরো দিনের মধ্যে কোথায় যাব, মন্দা? কোথায় গিয়ে আমরা আশ্রয় নেব? আমার চোদ্দ পুরুষের গাঁ, ভিটে ছেড়ে আমি কোথায়—'

বলিতে বলিতে সে ক্ষুদ্র বালকের মতোই উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে দিতে মন্দা বলিল, 'ছিঃ, কেঁদো না। দুজনের থাকবার ঢের জায়গা হবে। তোমার শরীরও কিন্তু চিরদিন এরকম থাকবে না। আবার ভালো হয়ে খাটতে পারবে। ভাবনা কী, দুঃখ কীসের? ভগবান এত লোককে খেতে দিচ্ছেন, আমরা দুজনেই সত্যিই কিছু গাছতলায় পড়ে থাকব না, একটা আশ্রয়ও জুটবে, দু-বেলা খাওয়াও জুটবে।'

রুদ্ধ-কণ্ঠে সাতকড়ি বলিল, 'জুটবে, বেঁচে থাকলে সবই পাব, মন্দা। কিন্তু আমার ভিটে— আমার চোদ্দপুরুষ যে ভিটেয় কাটিয়ে গেছেন, সে ভিটে তো আমি পাব না।'

স্বামী ও স্ত্রীর চোখের জল একসঙ্গে মিশিয়া গেল। উভয়েই অদূর-ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

'মন্দা, একবার রাখালের কাছে গেলে হয় না?'

মন্দা চমকাইয়া উঠিয়া স্বামীর পানে চাহিল। উদাসভাবে প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

সাতকড়ি বলিল, 'লক্ষ্মণ বললে, এ সমস্ত কাজের ভার নাকি রাখালের হাতে, তাকে একবার ভালো করে বললে হত না, মন্দা? হাতে পায়ে ধরলেও যদি ভিটেটুকু বাঁচে, একবার তাই বলে দেখো, মন্দা। আমার সব সে নিক, শুধু আমায় আমার পিতৃপুরুষের ভিটেয় থাকতে দিক। মরি যদি, যেখানে আমার বাপ-পিতামহ শেষ শুয়ে গেছেন, সেইখানে শুতে পাব।'

মন্দা কঠিন-মুখে কেবল মাথা নাড়িল। তাহার কঠিন মুখভাব সাতকড়িকে একবারে দমাইয়া দিল। তবু সে শেষ একবার অনুরোধ করিল,— 'মন্দা—'

তাহার কোলের উপর মুখখানা রাখিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে মন্দা বলিল, 'না গো, আমি তা পারব না, আমি তা পারব না। তুমি জানো না, সে কালসাপ, আমায় বিয়ে করেছ, তাই তোমায় ছোবল দিয়েছে। তোমায় সে জব্দ করছে। তুমি জানো না, তার বুকের মধ্যে এখনও সে আমার ছবি রেখেছে, আমায় সে এখনও পাওয়ার আশা করে।'

সাতকড়ির চোখের জল তাহার অজ্ঞাতে শুকাইয়া উঠিল। তাহার দুইটি চোখ ধক-ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে পত্নীর মাথার উপরে কেবল হাতখানা রাখিল মাত্র, মুখে একটি কথা ফুটিল না।

॥ ৭ ॥

বাজার হইতে বাড়ি ফিরিবার পথে রাখাল শুনিতে পাইল, মন্দা আজই সাতকড়িকে লইয়া হরিদাসমাটি গ্রাম ছাড়িয়া যাইতেছে।

কথাটা সে বিশ্বাস করিল না। সে বেশই জানিত, মন্দা বা সাতকড়ির যাইবার মতো আর স্থান নাই। সাতকড়ি মাঝে মাঝে দেশবিদেশ বেড়াইয়া আসিলেও মন্দা তাহার বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই গ্রামের সীমা— বড়ো জোর শহরের এধারকার জায়গা ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই। আর সাতকড়ি কেবলমাত্র অন্ন পথ্য করিয়াছে। তাহার নিজের এখনও এক পা চলিবার ক্ষমতা নাই; তাহার উপর মন্দার হাতে এক পয়সা নাই, সে ওই রুগ্‌ণ দুর্বল স্বামীকে লইয়া যাইবে কোথায়?

কিন্তু কথাটা যে সত্যই, তাহা শীঘ্রই জানা গেল। পথ দিয়া বিহারী মণ্ডল যাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মন্দার চলিয়া যাওয়া নিশ্চিত জানিতে পারিয়া রাখাল একবারে বসিয়া পড়িল।

এই প্রথম সে ভাবিয়া দেখিল, সে কতখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এ যুদ্ধে হারিয়াছে কি জিতিয়াছে, আজ সে প্রথম বিচার করিয়া দেখিল। সংসারে আসিয়া সে পদে পদে হারিয়াই চলিয়াছে, যাহাকে পরাজিত করিয়া সে জয়ীর কৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, আজ দেখিল, জয়ী হইয়াছে সেই, তাহার সব গিয়াও তাহার মন্দা আছে, কিন্তু রাখালের সব থাকিয়াও মন্দা নাই।

কিন্তু সে তো ইহা চাহে নাই। সে চাহিয়াছিল কেবল একটু জব্দ করিতে, যাহাতে সাতকড়ি বা মন্দা নিজে আসিয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হয়, সেই জন্য। অনেকে তাহাদের অগোচরে তাহাদের হইয়া রাখালকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু রাখাল তাহাদের অনুরোধে আরও কঠিন হইয়াই উঠিয়াছিল।

এই কিছুদিন আগে মন্দা তাহার মুখের ওপর স্পষ্ট জানাইয়া গিয়াছে, সে নাকি রাখালের মতলব বুঝিয়াছে, সাতকড়িকে কোনোরকমে সরাইয়া সে এখন মন্দাকে চাহে। এইকথা শুনিয়া রাখাল আরও আগুন হইয়া উঠিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক, মন্দা ও সাতকড়িকে জব্দ করিয়া নিজের দুয়ারে তাদের আশ্রয়প্রার্থী করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইল কই? মন্দা যে সত্যই তাহাকে পরাজিত করিল!

সে মন্দাকে ভালোবাসিত, আজও বাসে; কিন্তু সে ভালোবাসাকে মন্দা এমনভাবে ধরিয়া লইল, তাহার সম্বন্ধে এমন কুৎসিত ধারণা করিল? এই কথাটাই অহরহ তাহার মনে জাগিতেছিল, সে মন্দার জন্য যে আসন নির্দিষ্ট করিয়াছিল, সে আসন আর কোনো নারী অধিকার করিতে পারে নাই, পারিবে না; কিন্তু তাহা বলিয়া সে তো মন্দাকে কোনো- দিন পাইতে চাহে নাই। মুহূর্তের জন্যও কলুষিতভাবে সে মন্দার দিকে চাহে নাই। তবু মন্দা এমন কথা ভাবিয়া লইল কীরূপে?

ব্যাপারখানা কী, দেখিয়া আসিবার জন্য রাখালের মনটা ছটফট কবিতে লাগিল, কিন্তু সে যাইতে পারিল না। অথচ গৃহে টিকিতে না পারিয়া সে ছিপখানা হাতে লইয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিল।

কতবার মাছ আসিয়া টোপ খাইয়া গেল, রাখালের সে দিকে দৃকপাত ছিল না। তাহার মনে পড়িতেছিল, অনেক দিন আগেকার কথা। সেদিন মন্দা ঠিক এইখানটায় বসিয়াই তাহার বঁড়শিতে টোপ গাঁথিয়া দিত, জলে চার ছড়াইয়া দিত। রাখাল বাম হস্তের সাহায্যে নয়ন মার্জনা করিল।

হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া সে ফিরিয়া দেখিল, মন্দা একটি মাটির কলসি লইয়া আসিয়াছে।

ছিপ ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্দা থমকিয়া দাঁড়াইল। মন্দা থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে নিজেই চলিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল।

'রাখালদা, শুনেছ, আমরা আজ চলে যাচ্ছি, জমিদারকে আজ জানিয়ে দিয়ো, কাল যেন তিনি এসে বাড়ি দখল করে নেন।'

জলে নামিয়া সে ঢেউ দিয়া কলিতে জল ভরিয়া লইল।

রাখাল খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিল, 'সাতুদার এইরকম দুর্বল শরীর, এ অবস্থায় কোথায় তাকে নিয়ে যাবে মন্দা?'

একটু হাসিয়া মন্দা বলিল, 'যাবার জায়গার কী অভাব আছে, রাখালদা? দুনিয়ায় কেউই আশ্রয়হারা হয়ে না খেয়ে মরে না, ভগবান আশ্রয়ও জুটিয়ে দেন, খাওয়াও জুটান।'

মর্মপীড়িত রাখাল বলিল, 'আমি তা বলছি নে, মন্দা। আমি শুধু এই বলছি, তোমরা আমায় কেন একবার বললেন না—'

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মন্দা বলিল, 'তোমার কাছে যাব— কেন, সাহায্য চাইব? কখনও নয়, মরেও যদি যাই, তবু তোমার দোরে কোনোদিন যাব না।'

ধীরে ধীরে মন্দা চলিয়া গেল। রাখাল আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকারে সে যখন নিজের বাড়ির বারান্দায় বসিয়া উদাসভাবে পশ্চিম আকাশের পানে তাকাইয়াছিল, সেই সময় একখানা গোরুর গাড়ির চাকার শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া চক্ষু নামাইল।

প্রচুর ধূলা উড়াইয়া সম্মুখের পথ দিয়া একখানা গোরুর গাড়ি যাইতেছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিতে পাইল, গাড়ির দরজার কাছে বসিয়া মন্দা, তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া সাতকড়ি।

মন্দা গাড়োয়ানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিল, 'রুগ্ণ মানুষ, একটু সাবধানে গাড়ি চালাস, বাবা। যেন বেশি ঝাঁকি না লাগে। ট্রেন তো রাত আটটায়, এখনও ঢের সময় আছে, বেশি তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই।'

রাখাল বদ্ধদৃষ্টিতে গাড়ির পানে তাকাইয়া রহিল। গাড়ি চলিতে চলিতে পথের বাঁকে অন্ধকার যেখানে জমাট বাঁধিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস রাখালের সমস্ত দেহটাকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে দুই হাতে আর্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া একটি মাত্র শব্দ বাহির হল, 'মন্দা!—'

বিমাতা

অপর্ণা দেবী

জানি না, কোন্ পাপে তাঁহাকে হারাইলাম। না হইলে তিনি ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তবে আবার চলিয়া গেলেন কেন? হায়। মা হারাইয়াও মা ত পাইয়াছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কৈ?

সে অনেক দিনের কথা! আজিও যখন তাহা মনে পড়ে গা কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে। আমার যখন আট বছর বয়স, আমার ভাই শঙ্কর তখন ছয় বছরের। মা আমাদের দুটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ কিছুই বুঝিলাম না, সকলের কান্না দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শুধু বাড়ির বুড়ো ঝি আমাদের বুঝাইল যে, আর মা আসিবেন না, আর আমরা দুষ্টামি করিলে বকিবেন না, আমরা কাঁদিলে বুকে করিয়া আদর করিবেন না, আর আমরা মাকে দেখিতে পাইব না। বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, শঙ্করের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ভাবিলাম, কোথায় গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন। আর যে ফিরিবেন না, তা বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু হায়, মা আর ফিরিলেন না।

দিনে অনেক বদল হয়, সবারি যা হয়, আমাদেরও তাহাই হইল। বাবার ভালোবাসায়,ঠাকুরমার আদরে ও পিসীমার যত্নে, আমরা যেন সব ভুলিতে পারিলাম, মার অভাব বড়ো মনে পড়িত না, কেবল শঙ্কর যখন এক একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—"দিদি! মা কোথায়?" তখন কোনো উত্তর দিতে পারিতাম না, কাঁদিয়া ফেলিতাম।

তারপর ঠাকুরমা জোর করিয়া বাবার বিবাহ দিলেন।

সে দিন আমার বেশ মনে আছে। সেই সন্ধেবেলা ঢাক-ঢোল বাজিতেছে, সানাইয়ের সুর আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে, সন্ধ্যার আলো ও শাঁকের আওয়াজের সঙ্গে আমার নতুন মা আমাদের ঘরে আসিলেন। এমন শান্ত চেহারা—দেখিলেই যেন তাঁহার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে। আগে কেন তাঁহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না? বুঝিলে বুঝি বা এত বছর পরেও আমাকে এমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এ স্মৃতি, এ কাহিনিকে বাঁধিয়া রাখিতে হইত না।

কপালে যাহার যা না থাকে, তা তাহাদের সহিবে কেন? নতুন মার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আঁচল ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইতাম। তিনি আমাদের কত আদর করিতেন, কত গল্প বলিতেন, কত পুতুল দিতেন, কিন্তু আমাদের কপালে তাহা সহিল না। বুড়ো ঝি ও পড়শিরা ঠাকুরমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল, মার কাছে আমাদের যেন যাইতে না দেওয়া হয়।—"বাবা! সৎমা কি কখনও আপনার হয়, ও মিট্‌মিটে ডান্, ছেলে খাবার রাক্ষস—এই প্যারীদিদির বোনপোকে তার সৎমা বিষ দিয়ে মার্‌লে, সেও অমনি কত যত্ন আদর দেখাত।" পাড়ার রাঙা পিসী বলিল, 'ও দিদি, তুমি জান না, ওই আমাদের তরীকে ভাতের ভেতর কিসের শেকড় দিয়েছিল"— এইরকম কত দৃষ্টান্তই তাঁরা দেখাইয়া দিলেন—মা আমাদের আদর-যত্ন

করিলে হইবে কি, তাঁর মন ত বিষে ভরা। শেষে কি জানি যদি বিষ দেয়! ঠাকুরমা এইসব শুনিয়া আমাদের মার কাছে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আমাদের মন কেমন করিত, মার কাছে যাইবার জন্য কান্নাকাটি করিতাম। তখন পিসীমা আমাদের বুঝাইলেন—"পর কি কখন আপনার হয়, ও ত আমাদের মা নয়, এখন নতুন নতুন ব'লে তাই অমন আদর করছে, এরপর কোনোদিন শেষে কি কাণ্ড করবে তখন!"—এমনি করিয়া কত রকম ভয় দেখাইলেন। যখন পিসীমা, ঠাকুরমা, বুড়ো ঝি এই সব ভয় দেখাইত, তখন প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত, সত্যি না মনে করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু তবু কেমন তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত।

এমনি করিয়া আস্তে আস্তে আমরা তাঁর কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। দিনে দিনে আমাদের এমন হইল যে, ভয়ে আমরা তাঁর ত্রিসীমানা মাড়াইতাম না, কি জানি যদি মারে, যদি সত্যিই ঠাকুরমা যা বলে—তা যদি সত্যি হয়—যদি বিষ খাওয়ায়।

হায়! তাঁর সেই ছল্‌ছল্‌ দৃষ্টি আমি কখনও ভুলিব না। যেন চোরের মতো বেড়াইতেন, সর্বদাই যেন কী চুরি করিয়া মহা অপরাধী হইয়াছেন, সদাই যেন ধরা পড়িবার ভয়। আমাদের সঙ্গে লুকাইয়া কথা বলিতে কত চেষ্টা করিতেন, কত আদর করিতেন, দুর্ভাগা আমরা তখন তাহা বুঝি নাই। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসিতেন, অমনি আমরা ঠাকুরমাকে বলিয়া দিতাম। ঠাকুরমা ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেন, 'রাক্ষুসী ডাইনী'—মা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। একদিন শঙ্কর ও আমি সিঁড়ির ধারে খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ শঙ্কর আমাকে দৌড়িয়া ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মা তখন বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, শঙ্কর পড়িয়া যাইতেই, তিনি "ষাট ষাট" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া লইলেন। শঙ্কর তাঁহার কোলে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করের কান্না শুনিয়া ঠাকুরমা দৌড়িয়া আসিয়া মার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন, মাকে মুখঝাম্‌টা দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বৌ, না হয় আছই সৎমা, তাই ব'লে কি দুধের ছেলের উপর একটু মায়া হয় না! ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আবার এখন লোক-দেখান সোহাগ করা হচ্চে।—ফের যদি তুমি ওদের সামনে এস, তবে ভালো হবে না বলছি।— আহা!—দাদুর আমার কপালটা একেবারে গেছে, ও মা! এমন ডাইনী ঘরে এনেছিলাম গো।"—মা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের ঘরে গেলেন। রাঙা পিসী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, "ওমা! আবার কান্না হচ্ছে—সতীন-পুতের জন্য দরদ ত' কত, ওরে আমার দরদী রে, বলে—

'বেয়ানের মার আদরে,
সেজে পাটীতে না ধরে'—

"কালে কালে কতই দেখব।" রাঙা পিসী মুখ ঘুরাইয়া ঠাকুরমার পিছনে পিছনে চলিলেন।

আর একদিন মার বাপের বাড়ি হইতে মিষ্টি আসিয়াছিল, মা লুকাইয়া আমাদের তাহা দিতে গেলেন। মিষ্টির লোভে আর তাঁর কাছে যাইতে একটু দেরি করিলাম না। তিনি আমাদের হাতে দুটি সন্দেশ সবে তুলিয়া দিয়াছেন, আমরাও যেমনি তা মুখে দিতে যাইব, অমনি কোথা হইতে বামাদাসী আসিয়া বলিলেন, "বৌ ঠাকুরুণ, বড়ো যে সন্দেশ দিচ্ছ! আমি এখুনি ঠাকুরণকে ব'লে দিচ্ছি।" আর কোথা যায়, ঠাকুরমা সেই সন্দেশের কথা শুনিয়া, বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাকে বলিলেন, "হুঁ—সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ওরে আমার সন্দেশ-দিয়োনি রে!' বামাকে বলিলেন,—"ভাগ্‌গিস্‌ বামা তুই দেখ্‌তে পেয়েছিলি, নইলে আজ কী সর্বনাশই হ'ত।" মাকে বলিলেন, "ফের যদি তুমি বউ আবার এইসব করো ত ভালো হবে না বলছি।" মা মুখে কাপড় দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদেরও কিন্তু সন্দেশ না পাইয়া ঠাকুরমার উপর বড়ো রাগ হইয়াছিল।

এখন কত কথাই মনে আসিতেছে। তিনি বাড়ির বউ হইয়াও কেউ না হইয়াই থাকিতেন।

কখন কাহার সঙ্গে এ সব লইয়া একটা কথাও কন নাই, মুখ বুজিয়া শুধু কাজ করিয়া যাইতেন। বাবার কাছেও কোনোদিন এ সব কথা বলেন নাই; চুপ করিয়া থাকিতে আসিয়াছিলেন, চুপ করিয়াই গেলেন।

সময় কাহার জন্য বসিয়া থাকে না, সুখে-দুঃখে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটিয়া যায়, আমাদেরও কাটিল। আমি বারো বছরে পড়িলাম। আমার বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক কথা কাটাকাটি ও হাঁটাহাটি গোলমালের পর একজন ডাক্তারের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল।

পাকা দেখার দিন আমার এক সই আসিয়া আমাকে সাজাইয়া দিল, মা একবারও কাছে আসিলেন না। রাঙাপিসী তাহা দেখিয়া, ইচ্ছা করিয়াই মাকে শুনাইয়া একজনকে বলিলেন, "কৈ গো, কনের মা কোথায়? তাঁর যে আজ দেখাই নেই। ও মা, মেয়ের বিয়ে!" আর একজন মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'ওমা, জান না, সতীন-ঝি চ'লে যাচ্ছে, সেই দুঃখে সে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।' কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। পাকা দেখা হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল।

সেই দিন রাত্রে মা আমাকে ডাকিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। কত ভালো কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন। অমন মিষ্টি কথা আর কার মুখে কখন শুনি নাই। কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁর কাছে থাকিতে হইল না। কোথা হইতে ঠাকুরমা আসিয়া মাকে খামকা বকিয়া উঠিলেন—"আর তিনটে দিন ত ও আমাদের কাছে আছে, এইটুকুর জন্যে আর ওকে অমন করা কেন? একরত্তি মেয়ে, তাকে আর ও সব কুমৎলব শেখান কেন? পরের ঘরে গিয়ে বাঁচ্‌বে, তাও প্রাণে সইছে না?' এই কথায় আমি আর সেখানে থাকিলাম না, ঠাকুরমার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।

তারপর যথাসময়ে গায়ে হলুদ হইয়া গেল। সে সময়ও মা আমার কাছে আসিলেন না। কিন্তু দেখলাম যে, তিনি খিড়কির জানলার ভিতর দিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখিতেছেন।

তারপর দিন আমার বিবাহ। সানাইয়ের মিষ্ট আলাপ, কর্মবাড়ির সোরগোল, ছেলেমেয়েদের কলকল, পাড়ার লোকের হাঁকডাক, সব মিলাইয়া সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সন্ধ্যার পর যখন আমাকে সাজাইয়া তুলিল, লগ্নের তখন অনেক দেরি। রাঙাপিসী. পাড়ার মেয়েরা আর সবাই গহনা দেখিবার জন্য আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। কে কোন্‌টা দিয়াছে, এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা সব দেখাইয়া বলিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ একজন বলিল,—"কনের মা কি দিল গো?" ঠাকুরমা মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন.—"সে আবার কি দেবে?" রাঙাপিসী বলিলেন, "সত্যিই ত, আহা! আজ যদি ওদের মা বেঁচে থাক্‌ত, মা নেই ব'লে তো—বাছারা আমার বেঁচে আছে, এই ঢের, 'ষাট ষাট' ওরা আমার বেঁচেবর্তে থাকুক, শ্বশুরঘর আলো করুক।" স্ত্রী-আচারের সময় মা আসিলেন, দেখিলাম, কাঁদিয়া তাঁহার চোখ লাল হইয়াছে, তিনি কান্না চাপিতে পারিতেছেন না।

পরদিন সকালে আমি শ্বশুরবাড়ি চলিলাম, আমাকে দেখিবার জন্য যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। যাইবার সময় মা আসিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাঙাপিসী বলিয়া উঠিলেন, 'শুভযাত্রার সময় আর চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করো কেন?' মা উঠিলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় তিনি আমার হাতে একটি ছোটো টিনের বাক্স দিলেন। ঠাকুরমা বারান্দা হইতে তাহা দেখিলেন। তখনই বামাদাসী দৌড়াইয়া আসিয়া আমারে কানে কানে বলিল, 'দিদিমণি, ও পান খেয়ো না, ঠাকুরমা মানা করেছেন।" তার পরই আমাদের গাড়ি ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম যে, মা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখে জল ধরে না, তবু যেন তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা কীরকম করিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। বাবা স্টেশনে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িলে তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে সেই টিনের বাক্স খুলিলাম, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, তাহার ভিতর এক ছড়া

মুক্তার মালা। মালাছড়াটা বাবা মাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। সকলের সামনে না দিয়া কেন যে তিনি চুপিচুপি দিলেন, তা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

তারপর অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হইয়া উঠে নাই। বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেন।

একদিন সকালে উঠিয়া শাশুড়ির সঙ্গে তরকারি কুটিতেছিলাম। উনি সেখানে আসিলেন, তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলাম। উনি মাকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া কী বলিলেন, আমার বুকটা যেন কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, কার ত' কিছু হয়নি। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, বেয়াই তার করেছেন, তোমার ভায়ের বড্ড বাড়াবাড়ি ব্যাম, তোমায় যেতে হবে।"

সে দিন রাত্রেই ওঁর সঙ্গে আসিলাম। শঙ্করকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাকে যেন চেনা যায় না। বিছানার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। বিছানার কাছে বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম, 'শঙ্কর!' শঙ্কর একবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার তখনি চোখ বুজিল। রাঙাপিসী কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তুমি ত খুব রক্ষা পেয়েছ, এখন ওই রাক্ষুসীর চোখ পড়েছে এর ওপর, কি যে হবে, জানিনে না—মা কালী করুন, এখন ভালো হয়ে ওঠে, তবে ত'।

রাক্ষসীটি যে কে', তার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। শুনিয়া আমারও যত রাগ পড়িল সেই রাক্ষসীর উপর। মনে হইল, ভালো করিয়া গোটাকতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। মার ঘরের দিকে চলিলাম। যাইবার সময় আঁচলটা পায়ে বাধিয়া পড়িয়া গেলাম। ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে নাই, সকল জায়গায় খুঁজিলাম। বাকি রইল ঠাকুরবাড়ি। বাড়ির ভিতরে পুকুরের সামনে নারিকেল গাছ-ঘেরা মন্দির। সেইখানে খুঁজিতে চলিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখি, দরজা ভেজান। একবার মনে হইল, রাক্ষুসী আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসে নাই ত? শুনিতে পাইলাম, কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। তখন আর কোনো সন্দেহই রহিল না। রাক্ষসী নিশ্চয়ই আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসিয়াছে। কথাগুলো একবার ভালো করিয়া শুনিবার জন্য দরজায় কান পাতিয়া দম বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। দরজায় ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, মা হাঁটু গাড়িয়া গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—"মা, আমার খোকাকে ভালো ক'রে দাও মা, আমি বুক চিরে রক্ত দেব।" আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল! এই কি না রাক্ষুসী! আমার কান্না আসিতে লাগিল। এতদিন পরে যে মাকে চিনিতে পারিলাম বলিয়া কী জানি কার উদ্দেশ্যে মাথা সেই দরজার চৌকাঠে আপনি নুইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া শঙ্করের কাছে আসিয়া পড়িলাম। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিল—'হবে হবে, ভালো হবে।' কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—'ভালো করে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব।'

আশ্চর্য! তারপর হইতেই শঙ্কর ভালো হইয়া উঠিতে লাগিল। মা তাহাকে দেখিতে একবারও ঘরের মধ্যে আসিতেন না, বাহির হইতে দেখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেন।

ক্রমে শঙ্কর সারিয়া উঠিল। ঠাকুরমা আজ এর পূজা, কাল তার পূজা দিলে লাগিলেন, আমি বুঝিলাম যে, এ পূজা সত্যিই কার!

ক্রমে ছ'মাস পরে শঙ্কর একেবারে ভালো হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা সে দিন তাহার আরোগ্য উপলক্ষে কাঙালি খাওয়াইতেছিলেন। আমরা তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ আমার কানে সেই কথা বাজিয়া উঠিল—'ভালো করে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব।'—তাইত! কী করিয়াছি! এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন? ছুটিয়া মন্দিরে গেলাম—গিয়া দেখিলাম, ছিন্ন লতিকার ন্যায় মা আমার সিংহবাহিনীর পদতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা—পার্শ্বের ছোটো একটি বাটিতে ভরা রক্ত!!

যাত্রী

নীহারবালা দেবী

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌চে।—এই জীবনের সন্ধ্যা—তার পরে? তার পরে কী আছে গো আমার, তার পরে কী আছে? অন্ধকার রাত্রি কী? অথবা তিমিরাবসানে দ্বীপ্তার্ককিরীটী বিচিত্র-বর্ণচ্ছটা বিভাসিত সপ্তবর্ণানুরঞ্জিত আলোয় আলোময় নয় প্রভাত! কী আছে এই নিবিড় আঁধার-ঘোরের ওপারে?

এ সন্ধ্যা কেবল আমারই আসেনি,—আমি এই জীর্ণ কুঁটীরতলে খোলা জান্‌লার কাছে শুয়ে পড়ে যে মরণের প্রতীক্ষা করছি এ তো শুধু আমারই আস্‌ছে না। কত রাজ-রাজ্যেশ্বর, কত সম্রাট সুখ-ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন আঁক্‌ড়ে পড়ে থেকেচেন, তবু এই কাল-সন্ধ্যার কালো আবরণ তাঁদের ঢেকে দিতে কসুর করে নি। আমার তো এ মুক্তি!

মরণ! মরণ! ওগো এর চেয়ে ভীষণ সুন্দর আর কিছু নেই। এই যে পলে পলে নীরব পা ফেলে এ আমার কাছে এগিয়ে আস্‌চে। জীবনে কখনো তো কারুর অভয়বাহুর আশ্রয়তলে এই লতার সঙ্গে উপমেয় নারীজীবন বিশ্রাম পায়নি। তাই আজ প্রিয়তমের সর্বসন্তাপহর গভীর ঘন আলিঙ্গনের মতো মৃত্যু আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে আসচে। এস, এস! আমার প্রাণ বল্‌ছে—

"অসতো মা সদ্‌গময়ো
তমসো মা জ্যোতির্গময়ো
মৃতোর্মামৃতঃ গময়ো"

নিয়ে যাও গো, আমাকে মৃত্যু উত্তীর্ণ করে অমৃতে নিয়ে যাও।

সুবৃহৎ একটা নিদাঘ-দিনের মতো বিশ্বদাহী দাবদাহ জ্বালাভরা, আগুনভরা আমার জীবনটা বয়ে গেছে,—সে যে কী জ্বালা, তা আর এই সন্ধ্যার কোলে এলিয়ে পড়া শ্রান্তিভরা বিকৃত বিবর্ণ জ্যান্ত-মরা দেহটা দেখে কতটা বোঝা যাবে বল!

একদিন এই দেহখানিই সুন্দর ছিল। আজ যার রূপের সঙ্গে চাম্‌চিকে বা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা চল্‌তে পারে তারই তুলনা একদিন বসোরা গোলাপের পল্লবের সঙ্গে চল্‌তো।

বিশ্বাস করা না-করাতেও আজ আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু তবু এ কথা সত্যি কথাই যে, সে সব থাক্‌তেও আমি তার জন্যে কখনো গৌরব মনে করিনি বরং তাকে অত্যাজ্য আপদই মনে করে এসেছি।

দুয়োর খুলে আস্তে আস্তে ঘুরে ঢুক্‌লো ছোটো ছেলে মণি, তার মুখ শুক্‌নো, চোখ বসে গেছে, সেই সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, এখন ছেলের বাড়ি মনে পড়লো!

অভিমানে আমার গলা যেন বুজে আস্‌ছিল। বল্‌লে না তো কথা! আমি এমন করে আধমরা হয়ে ঘরে পড়ে আছি, আর ওদের এমন কাণ্ড! মণি আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্‌লে, "আজ কেমন আছ মা, আর জ্বর বাড়েনি তো?"

কথা বললুম না।

সে বল্‌লে, "রাগ করেছ বুঝি মা, কিন্তু আমি যদি কথা বলি ভয়ে তো কাঠ হয়ে যাবে, যে দুদিন বাঁচ্‌তে, তাও হয়ত আর বাঁচ্‌বে না—"

উঠে বস্‌তে চেষ্টা করলুম, পারলুম না, এলিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লুম, "সে কী কথা রে? এমন কী কথা!"

"মেজ্‌দার আর সেজদার আজ জেল হয়ে গেল, ছ'মাস করে।"

"এ্যাঁ!"

"সত্যি মা।"

"কী অপরাধে? না, না, অপরাধ তো ঢেরই ছিল, তারা ধরা পড়্‌লো কিসে?"

"সেই নেকলেস চুরি!"

"ও! তা বেশ হয়েচে।"

প্রকান্ড বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লুম। চোখের সুমুখে আমার দুটি ছেলের মুখ যেন অসহায়ভাবে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তারা জেলে গেল। না গিয়ে উপায় কী ছিল? চুরি কর্‌লে তার শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে।

হায় অন্ধ মাতৃমমতা! এ ভুলে যায় যে সন্তান ঘৃণিত হয়েছে।

হলই বা তারা আমার পেটের ছেলে। ভগবানের আপন কৃপাবারি এমনি ধারাবর্ষণেই লোকের পাপের গ্লানি ধুয়ে শুচি করে দ্যায়। আমি যাদের মানুষ করতে পারি নি সর্বলোকের ঈশ্বর যিনি, তিনি তাদের ঠিকমতো চালিয়ে নেবেন বই কী!

বড়ো ছেলেকে তো মানুষ করতে পারবো না বলেই নিঃস্ব হয়ে পরের ঘরে পোষ্যপুত্র দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম যে মানুষ হবে। তা বড়োলোকের ঘরের পোষ্যিপুত্তুররা যা করে থাকে সে তাই হয়েছে! আর বেশি খুলে কি ভাবা যায়।

আমি তার মা, আমার গর্ভে তাকে স্থান দিয়েছিলুম, মনে করলেও লজ্জা করে যে! হায় সন্তান!

সন্তানের প্রার্থনা না করতেই সন্তান পেয়েছিলুম, তাই ত ছেলেরা আমার মুখ পুড়িয়ে আমাকে এমন করে দাগা দিলে। হায় মর্‌তে তো বসেইছি, এই মরণ যদি আরও দুদিন আগে আস্‌তো!

॥ ২ ॥

আমার বোন্‌-ঝি বা সতীন-ঝি বীণা এসে ডাকলে "কেমন আছ গো, ছোটো মাসি?"

বললুম "কে, বীণা? আয় মা আয়,—আজও মরণ হচ্চে না তাই বেঁচেই আছি।—ওটি কে? বাঃ চমৎকার মেয়েটি তো!"

বীণার সঙ্গে, একটি তরুণী মেয়ে এসে দরোজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল,—বোধহয় আমার পায়ের কাছে মণি বসেছিল বলেই সে সঙ্কোচ করছিল।

আমি মা; আমার মণি আমার কাছে বালক থাকতে পারে; কিন্তু তার উনিশ কুড়ি বছর-বয়সের একটা নেশা আছে তো! দেখলুম মণিরও অবনত মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে।

বীণা বললে, "ওটি আমার দেওয়ের মেয়ে, ওর মামার বাড়ি এসেচে। আয় না লতি, লজ্জা কি,—আয়!"

"আমার কাছে? না, না, ওই ওখানেই বসো মা, আমার যে ছাই রোগ, আমার কাছে কী কারু আস্‌তে আছে?"

বীণা একটু ক্ষুব্ধ গলায় বল্‌লে, "এখনো রক্ত ওঠে কী?"

"ওঠে বৈ কী,—তা উঠুক, যত শীগ্‌গির শেষ হয় ততই ভালো, আমার নিরু আর অতুলের কথা তুই শুনেছিস তো।"

"শুনেছি,—তা দেখো এবারে তা শুধ্‌রে আসবে।"

"কিন্তু কী লজ্জা!"

"তা আর কী করবে বল। আচ্ছা ছোট মাসি মধুপুরে আমার শ্বশুরের একখানি বাড়ি খালি পড়ে আছে, তুমি দিন কতক হাওয়া বদ্‌লে এস না কেন? যাবে?"

হাসলুম। "যাবই তো! যেতে বসেচি যখন তখন যেতেই হবে। তবে পৃথিবীর হাওয়া আর নয়, এবারে লোকান্তরে হাওয়া খেতে যাচ্চি।"

"যাও। কী কথার যে কী উত্তর দাও।"

"ঠিক উত্তর, বীণা। আমার মণি অসময়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে যে সামান্য চাকরিটুকু জুটিয়েছে সেই তো সম্বল! ওর ওপর আর কী চাপ দিতে পারি? ছেলে বলতে তো এখন ওই একটাই?'

বীণা এক চমকে মণির ছলছলে মুখখানি চেয়ে দেখলে। মণি তার কোঁচার কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে চলে গেল। যাবার সময় দেখলুম, আমার এ মায়ের চোখ নিশ্চয়ই মিথ্যে দেখেনি, আমি ভালো করেই দেখলুম মণির মুখের চাপা হাসির ছটা লেগে তরুণী লতিকারও নত চোখে এক ঝলক বিদ্যুত খেলে গেল।

তবে কী এরা পরস্পর পরিচিত?

আর এই যে নত নয়নের তলো গোপন দৃষ্টির মিলনখেলা, এ তো কেবল মাত্র পরিচয়েরই চিহ্ন নয়।

ওহো! বুঝেছি,—তাই বুঝি মণি আমার এমন কোমল; এমন কর্তব্যনিষ্ঠ, এত ধীমান! প্রেমের আলো লেগেই তার প্রাণের দেবতার দুয়োর খুলে গিয়েচে!

কিন্তু ওরে দুঃখিনীর ধন, এ তুই কোন্ ফাঁদে পা দিয়েছিস রে,—ওরা যে বিভবের অহঙ্কার করে, তোকে কী বরণ করবে ওরা? আমি বুঝেছি লতিকা কবিরাজমশায়ের ভাগ্নী, মণি তো নিত্যই আমার ওষুধপত্তরের জন্যে সে বাড়ি যাওয়া-আসা করে।

লতিকা মুখ নাবিয়ে বসেছিল। দেখলাম মেয়েটি সুন্দরী, অত্যুগ্র যৌব-ছটা তবে গা ঠিকরে বেরুচ্ছিল। টলটলে মধুভরা ফুল যেমন পাপ্‌ড়ি মেলে' ফুটে থাকে, তেমনি একটি মিষ্টি স্নিগ্ধ শ্রীতে তাকে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা লোকের মেটে না, তাই আমারও তা। মিট্‌ল না।

এই জীবসৃষ্টির আধখানা অঙ্গ চিরদিনই ফুলের সঙ্গে লতার সঙ্গে উপমিত হয়ে এসেচে, এই নিয়েই তো পূর্ব পশ্চিম সকল দিক্‌কার কল্পনা জগৎ মাতোয়ারা।

কোন্ আদিযুগের প্রতিভাকুশল কবিকল্পন এই ফাঁদ দেখেই মনোভাবের তৃণের পঞ্চবাণ ফুলে ফুলে ভরিয়ে রেখেছিলেন। সে যদি ঈশানের চোখের আগুনে ভস্ম হয়েই শেষ হয়ে যেত, তা হলে সৃষ্টির এত সত্যি নিয়ে লুকোচুরি কী করে চল্‌তো কে জানে!

ফুল সে ফুটবেই। আর বর্ণ গন্ধ সে তো ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করবারই জন্যে। এই অতি পুরাতন তথ্যই না যুগে যুগে চিরনতুন হয়ে কাব্যকে অলঙ্কার পরিয়ে আসচে!

বীণাকে আমার মা মানুষ করেছিলেন। বিয়েও মা-ই দিয়েছিলেন। আমার স্বামী তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত;—তিনি মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেন নি।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে বিধবা হয়ে বীণা তার শ্বশুর বাড়িতেই কর্ত্রী হয়ে থেকে আস্‌চে—আমরা কোনোদিন তার খোঁজ খবর বিশেষ নিতে পারিনি। এখন সে বড়ো জায়ের বাপের বাড়ি এসেছিল, তার জায়ের মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখ্‌তে!

আমাকে মধুপুরে যাবার জন্যে বার কতক ব'লে বীণা উঠে চলে গেল।

অবসর পেয়েই আমার হতভাগ্য ছেলেদুটোকে মনে পড়ল। সেখানে সেই নিষ্ঠুর মনুষ্যহীন প্রহরীগুলো তাদের মানুষ ব'লে জ্ঞান করছে না। এই কুমাতার নারীমর্যাদাকে আক্রমণ ক'রে তারা তাদের গালাগালি করছে, এ আমার কত পাপের শাস্তি ভগবান!

জীবনের সেই প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে এই যে চিরদিন মাথা পেতে সব বাঁধাগৎ সহ্য করে আসছি, হিন্দুর মেয়ের আজন্ম সংস্কারের চাপে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি, আজ এ পাচ্চি কী আমার সেই পুণ্যের ফল?

নব যৌবনে আমিও অম্লান পল্লবে প্রভাত-রৌদ্রের শুভ্রতা মেখে ফুটেছিলুম, কিন্তু আমার সে বর্ণডালাতে আগুন লেগে গিয়েছিল।

কৌমার জীবন অন্তে আমার দ্বিতীয় অঙ্কে হ'তে হ'ল চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী,—থাক সে কথা আর নূতন ক'রে তুলে কী হবে? ব্যর্থতার বেদনা? তা সে তো এই ঘুচ্‌তে বসেছে—শেষ হ'য়ে এল ব'লে।

বড়ো ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর দিয়েচি। শুন্‌তে পাই লোকে যখন তার খোসামোদ করে তখন বলে রাজপুত্তুর, আর আড়ালে গাল দেবার সময়ে বলে "আরে সেই তো ঘুঁটে কুড়ুনি যে লোকের বাড়ি ধান ভেনে খায়, তারই ছেলে ত ও আর কত ভালো হবে।"

হায় লোকে তা বোঝে না যে, সৃজন পালন, এ বড়ো সোজা কথা নয়! একটুখানি বুঝে দেখার ভুলে জাতীয় জীবনে কী কলঙ্কের নিশানই তৈরি হয়ে দাঁড়ায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকৃত হয়ে।

॥ ৩ ॥

সারারাত কেটে গেল। একটি মিনিটের জন্যেও ঘুম এসে এই যাতনার এতটুকু বিরাম হতে দেয়নি। আকাশ ভরা তারার দিকে চেয়ে চেয়ে রাত ভোর হয়ে গেল।

কাশিতে এ কি যাতনা। বুকের ভিতর যেন বিষফোঁড়া টাটিয়ে আছে।—এই যক্ষা।— উঃ! কতদিনে এ যাতনার শেষ হবে, এই দুচোখ জুড়ে চিরনিদ্রা নেমে আস্‌বে যে কবে? অন্তহীন ঘুম। বাঃ—সে কতদিনে ঘুমুতে যাবো, কবে?

এই রোগ,—ধর্‌তে গেলে এ আমার নিজের হাতে তৈরি করতে হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছি—দেহের যন্ত্রপাতিগুলোকে এতটুকু বিশ্রাম দিইনি,—ছেলেদের মানুষ কর্‌তে হবে ব'লে নিজের আহার নিদ্রা গ্রাহ্যই করিনি,—এ আমার তারই ফল।

তবু পারলুম না গো, পারলুম না,—মণি ছাড়া সব ছেলেগুলো মানুষ নামের কলঙ্ক হল, মানুষ হল না।

সন্তানকে মানুষ করতে না পারা,—এ যে মা-বাপের কী দুঃখ, তা মা বাপ না হলে আর কে বুঝবে?

মণি আমার রাত্তিরের যাতনা দেখে ভোর না হতেই বেরিয়ে গিয়েছিল, কবিরাজ- মশাইকে সঙ্গে করে ফিরে এল। করিরাজ নিত্যকার মত একটু হাত দেখলেন, আর চারটে বাঁধাগৎ আউড়ে চলে গেলেন। মণিকে একা পেয়ে আমি ডাকলুম, "মণি!"

"কী মা?"

"ওই মেয়েটিকে তুই চিন্‌তিস মণি—?"

"চিনতুম,—কেন সে কথা?"

"কি ক'রে চিন্‌লি বাবা, ও তো এখানকার মেয়ে নয়?"

"এখানে ও অনেক দিন থেকে আছে। যাই হোক ওকে দিয়ে কী হবে?"

একটু ইতস্তত করছিলুম। যদি কাঁচা থাকে তো সেদিন আমি ঘাঁটাঘাঁটি করে সেটা পাকাতে যাই। কিন্তু বিপন্নভাবে কথা বলার ভঙ্গী দেখে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, সে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে!

ছেলে মনে করলে আমি যাতে আর না এগিয়ে যাই তাই করা যাক্, তাই সে বললে, "মা, বড়ো দাদা তো আজকাল বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করচে শুনচি।"

"করুক গে বাবা, ও কথায় কান দিয়ে তো কিছু করতে পারবো না—"

"আমার ভারি কষ্ট হল শুনে।"

"কী হবে তার জন্যে কষ্ট করে? তাকে তো আমি পরকেই দিয়েছি, তারা ছেলের দাম ধ'রে কিছু টাকাও আমাকে দিয়েছিল, তবে আর তার কথা কেন?"

"হুঁ!"

মণি চুপ ক'রে রইল। আমিও আর কথা তুলবার সুবিধে পেয়ে উঠেছিলুম না। অনেকক্ষণ পরে আবার কথা তুললুম, বললুম, "ওই মেয়েটিকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে মণি, ওদের আমি বলবো?"

"তুমি পাগল হয়েছো মা!"

"না বাবা, আমি পাগল-টাগল কিছু হইনি রে—"

"কী বল মা, তোমার এ ঘরে লোকে মেয়ে দিতে যাবে কী দেখে? ওইসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, কাল সারা রাত্রি তুমি ঘুমোওনি।"

"এই তো আর দুদিন বাদে একেবারেই ঘুমুবো বাবা, আর জাগতে হবে না, তুই ছাড়া আর কারু সঙ্গে দেখাও হবে না, তবু যদি যাবার সময় দেখে যেতে পারতুম যে—"

"ছি, মা!"

মুখে বললে মণি "ছি মা" কিন্তু ওই যে তার আর কোণের হাসি-টুকু আমার চোখে ধরা পড়ে গেল।"

ওরে, এ যে প্রণয়তাপে বিকশিত চিত্তগগনের বিচিত্র ফুলের রং,—এ রং বুকের রক্ত ফেনিয়ে ফোটে,—এ তো অবহেলার ধন নয়।

এই ক্ষয়-রোগ-জীর্ণা ভীষণ আকৃতির বৃদ্ধা আমি,—একখানা আয়না সামনে ধরলে হয়তো নিজের রূপের শ্রী দেখে নিজেই আর্তনাদ ক'রে উঠতে পাবি। একখানা হাত যদি কষ্টেসৃষ্টে চোখের সুমুখে তুলে ধরি, তা হ'লেই যে শিউরে উঠি।

তবু একদিন তো আমিও তরুণ ছিলুম। তবে কিনা গাছ থেকে কুঁড়ি তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলে যেমন সে মুকুল ফোটেও না ঝরেও না, শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, তবু থাকে, আমারও হয়েছিল তাই।

এখন এই মৃত্যুর চুম্বনে যদি এই কাঠখানার মাঝেও শেষ একবার প্রাণের স্পন্দন জাগে!

সমস্ত হাত পা জ্বালা করে জ্বর বেড়ে গেল! রোজই তো জ্বর বাড়ে, কিন্তু এদিনের মতো টেম্পারেচার এত বেশি ওঠে না, আর তো বেশি দেরি নেই কিনা?

রোজই যখন দিনের আলো অস্তচূড়োয় নিবতে শুরু করে, তখনই আমার মন আর রোগ দু-দুটি নিশাচরের মাতামাতি আরম্ভ হয়! সময় সময় ভাবি—রোগের জ্বালায় জ্ঞান হারানোও বুঝি এর চেয়ে ঢের ভালো!

এ আর পারা যায় না,—পারা যায় না!

মৃত্যুর মতো ভীষণ সুন্দর যে, যে প্রিয়তমের মতো হ'য়ে চুম্বনস্পর্শে সকল দাহ জুড়িয়ে দিতে আসচে,—মায়ের মতো যে অভয় অঙ্কে তুলে নিয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে, এ তারই প্রতীক্ষা, এই যা আশা!

আমি বড়ো ছট্‌ফট কর্‌চি দেখে' মণি ডাক্তার ডাক্‌তে ছুটে গেল। একা প'ড়ে আছি,—এমন করে ছট্‌ফট্‌ কর্‌চি কেন কী জানি। বড্ড যন্ত্রণা হচ্চে!

শেষ হবো কী আজই? অন্তত বেশি দেরি আর হবে না। আহা মণিকে ভারী দুঃখ দিতে হচ্চে, আমি মরে গেলে ও বেচারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।—

॥ ৪ ॥

দুপুর বেলা বীণা এসে বসলো বললে, "মণি চল্‌, আমি আজ তোকে খাইয়ে দিইগে।"

মণি গেল না। ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না, আমি চিড়ে ভিজিয়ে ফলার খেয়েছি, আর কিছু খাব না।"

বীণার সঙ্গে আজও সেই লতিকা ছিল। সে মণির কথা শুনে একটুখানি চোখ তুলে চাইলে, —তরুণী নারীর চোখের করুণ মধুর চাহনি সে।

আমি ঠিক করলুম যে, এই মৃত্যুশয্যায় পড়ে মরণের আগে আমি আমার সন্তানের জন্যে এই প্রথম একটা ভিক্ষা স্বীকার করে যাব, পাই না-পাই সে আলাদা কথা।

বীণা বললে, "কাল তো কব্‌রেজ-মশায় বল্‌ছিলেন বড্ড নাকি যাতনা গিয়েছে। আজ কেমন আছ, ভালো মাসি?"

"তেমনি। তুলসী তলায় নামাতে যেটুকু দেরি। আমার সাম্‌নে ভালো করে না বললে কী হয়, আমি শুনেছি যে, আজকের সন্ধ্যাই আমার শেষ সন্ধ্যা।"

"না,—তা কেন হতে যাবে।"

"তা আমি নিজের শরীর দিয়েই বেশ বুঝতে পারছি। বাতাস যে দুষ্প্রাপ্য ধন মনে হচ্ছে। নিশ্বাস টানতে এমন কষ্ট আর তো কোনোদিন হয় না।"

মণি আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করছিল, লতিকা আস্তে আস্তে সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার হাতে পাকাখানি তুলে দিয়ে মণি আমার পায়ের গোড়ায় এসে বস্‌লো।

ছেলের মুখ পানে চেয়ে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, সে নত চোখে একটা কাঠি দিয়ে ঘরের মাটিতে আচড় কাট্‌ছিল।

আমি বীণাকে বল্‌লাম, "দ্যাখ্‌ বীণা, আমার মণির জন্মের উনিশ বছর পরে আমার এই রোগ হয়েছে, এটি কিছু বংশগত রোগ নয়,—অতিরিক্ত দেহমনের খাটুনিতেই হয়েচে, ডাক্তারেরাও তাই বলেচে। তবে আমার মণির সঙ্গে লোকে এজন্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে না কেন?"

"কেন,—কে বলেছে তোমাকে একথা?"

"তা যেই বলুক।"

আবার ভয়ানক কাশ্‌তে আরম্ভ করে দিলুম। কাশি আর তার যাতনা থাম্‌তেই আধঘণ্টা কেটে গেল। সারা গা ভিজে উঠলো।

মণি মলিন মুখে বললে, "কেন তুমি কথা বলছ যাও মা, কথা বোলো না।"

খানিক বাদে দম নিয়ে বললুম, "যতক্ষণ পারি বলি বাবা। আচ্ছা বীণা, তা হলে মণির বিয়ে আমার রোগের জন্যে আটকায় না তো।"

"তোমার কথা যে বুঝতে পারছিনে মাসিমা। মণি যে বলছিল চাকরিতে প্রমোশন না পেলে বিয়ে এখন করবে না।

"তা বলুক। আচ্ছা তোকে বুঝিয়ে বল্‌চি শোন—"

বল্‌তে গিয়েও আবার অনেকক্ষণ ভেবে দেখলুম, ভিক্ষা চাইব কি না!? লতিকা বীণার নিজের সন্তান যদিও নয়, সে আমাকে আশ্বাস দিতে পারবে না; তবু, একটু চেষ্টা করবে বললেও এই

সুদূর যাত্রাপথে ওই দুটি তরুণ মুখ আমি চাঁদের আলোর মতো আনন্দের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তি দেখে চোখ মুদ্‌তে পারি!

অনেকক্ষণ কথা কইলুম না। সমস্ত শরীর যেন গভীর শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। হঠাৎ একটা কোথাকার ঘড়ির টং টং আওয়াজে তন্দ্রা টুটে গেল। মণিকে বললুম, "কটা বাজলো?"

মণি বললে, "চারটে!"

বীণা বললে, "মুখ শুকিয়ে উঠচে,—একটু দুধ খাবে?"

"না।"

"কেন খাওনা একটু—, দে মণি একটু দুধ।"

"না, না, শোন বীণা, আমি মরবার আগে আজ তোর কাছে একটা ভিক্ষে চাইব।"

আর্তগলায় ব্যথাবিবর্ণমুখে মণি চেঁচিয়ে উঠে বললে, "না!"

"চুপ করো মণি, আমি প্রলাপ বক্‌চিনে, আমাকে একটু বলতে দে বাবা!"

আমার গলার স্বর বড়ো ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে যা বলতে চাই, ওরা তা শুনতে পায় না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে!

আমার মুখের কাছে কান নাবিয়ে এনে বীণা বল্‌লে "কী বল্‌বে মাসিমা, বল।"

"আগে বল রাখবি কথা?"

দেখ্‌লুম, বীণা একটু শিউরে কেঁপে উঠ্‌লো। মণি মুখ ফিরিয়ে বসেছিল, আমি তার মুখ দেখতে পেলুম না, চারিদিক কেমন ঝাপ্‌সা মনে হচ্ছিল।

বললুম, "বীণা, আমার মণির জন্যে যদি এই লতি—"

"ওঃ বুঝেছি মাসিমা, কিন্তু ওর যে সম্বন্ধ সব ঠিক হয়ে গেছে, আর তো ভাঙ্গা চলবে না—পাকা দেখা সব হয়ে গেছে।"

প্রবল একটা নিশ্বাস পাঁজরের হাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ঠিক হয়ে গিয়েছে? সে পাত্তর কি—"

"তেজবরে, কিন্তু বড়োলোক, খুব– "

শুন্‌তে চাইনে, শুন্‌তে চাইনে, আর আমি চাইনে শুন্‌তে!

পায়ের আর মাথার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, উঃ কী বিবর্ণ মোমের মতো সাদা দুখানি তরুণ মুখ! হায় লতিকা,—সুমুখের কামাধন মন্দারতরু ছেড়ে কী পোড়াকাঠের আশ্রয় নিয়ে ব্যর্থ হ'তেই জন্মেছিলে!

দেহের সমস্ত বাঁধন যেন পট্‌পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে আল্‌গা হয়ে গেল। আমার চারিদিক বেড়ে যেন সন্ধ্যা-তিমির ছেয়ে আসচে!

দূর,—অতিদূর থেকে যেন কানে এসে বাজচে -"তুলসীতলায়,—ওরে তুলসীতলায়।"

অনাদৃতা

অমিয়া চৌধুরী

মালতীর পালকি যখন প্রকাণ্ড লাল বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন হেমন্তের বেলা অবসান প্রায়।

"পালকি করে এলে না কী?" বলিতে বলিতে গৃহিণী উমা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। মালতী পালকি হইতে বাহির হইয়া বড়ো জাকে প্রণাম করিল। পালকির খোলা দরজায় একখানি বালক মুখ দেখা গেল। মালতী সেদিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আয়, নেমে আয়।"

উমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন, "কে গা"?

"আমার ভাই, বড়দি।"

"ভাইটিকে সঙ্গে করে এনেছ বুঝি? বাপ রে—সৎভাই এর অত দরদ?" অতি ক্রোধে উমা আর বেশি কহিতে পারিলেন না দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মেজবধূ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বড়োজা চলিয়া যাইতেই সে ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইল, কহিল, "মুখখানি তোর মতোই ছোটো বৌ, তবে কালো দেখছি, তোর সৎমা কালো ছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, আচ্ছা কী করি বলত মেজদি।"

"কীসের কী? ও বড়দির এক কথা। চল, ঘরে চল।"

মালতী বিষণ্ণচিত্তে দ্বিতলে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল, মেজবউ তাহাকে বসিতে দিল না; কহিল "সন্ধে হয়ে গেছে, শীগগীর মুখ হাত ধুয়ে আয়। তুই আসতে অত দেরি করলি কেন? শ্যামবাজার তো দশদিনের পথ নয়; উনি মারা যেতেই এলে পারতিস।"

"রইলাম এই দুটো দিন, বাপের বাড়ি যাওয়া তো এই শেষ হল। এতদিন বাপ ছিলেন না, —তাও ছোটোমা মার মতোই ভালোবাসতেন, জুড়োবার স্থান একটা ছিল।"

"সে তো সত্যি কথাই; এদিকে ঠাকুর পো তো রেগে বসে আছে।"

"কেন, রাগের কিসের?"

"এতদিন গিয়ে বসে রইলি; যাকগে তোর ভাইটির নাম কী?"

"বিজয় কুমার।"

"এসো বিজয়, আমার সঙ্গে এসো।" বলিয়া মেজবধূ বালককে টানিয়া লইল। মালতীর দুই ভাশুর; দুই জনেই উকিল। মালতীর স্বামী সত্যেন্দ্র মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। তাহারা ধনী বটে কিন্তু বাড়িতে লোকের সংখ্যা অল্প। কারণ গৃহিণী উমা নিরাশ্রয় আত্মীয়বর্গ দ্বারা গৃহ পূর্ণ করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সুতরাং অনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে আনিয়া মালতী যে অপরাধ করিল তাহা উমার কাছে একান্ত অমার্জনীয় বলিয়া বোধ হইল। সেদিন রাতে সত্যেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "আবার এআপদ জুটিয়ে আনলে কেন?" প্রায় পনেরো দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর

সাক্ষাৎ! এমন নীরস সম্ভাসনের জন্য মালতী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে নীরবে নত মুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র টেবিলের উপর ছড়ানো জিনিসপত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া কহিতে লাগিল, "নিজে তো এক পয়সা আজও উপার্জন করতে পারিনি; এর মধ্যে তোমাকে বিবাহ করেছি এই ত বিষম সমস্যা, তার উপরে শালার অন্নবস্ত্রের ভারটাও যদি দাদার উপরে চাপাতে হয় তবে আর লজ্জার সীমা থাকে না। ওকে এনে কিন্তু ভালো করলে না।

"কোথায় রেখে আসতাম?"

"কেন, তোমার কাকারা আছেন ত,"

"তাঁরা রাখতে চাইলেন না যে।"

"আমরাই বুঝি রাখতে বাধ্য? কোন্ আইনে শুনি?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল "কী?"

"কী আর? নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দিতে আমরা পারব না? আমরা তো অক্ষম নই।"

"ভয়ানক দয়াবতী হয়ে উঠেছ যে! পরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে সবাই দয়ার প্রচার করতে পারে, কিন্তু এ যে কত বড়ো অন্যায়;—থাক গে। কোথায় সে বিজয়কুমার?"

"সে পিসিমার ঘরে কম্বলে শুয়েছে।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় শুইয়া পড়িয়া গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে লইতে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "দরিদ্রের ঘরে বিয়ে করা এক মহা পাপ।"

অন্ধকারে মালতী হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, কোনো কথা কহিল না।

পরদিন সকালে মালতী ভাঁড়ার ঘরে তরকারি কুটিতে ছিল। সদ্যস্নাতা বড়োবধূ পিঠের উপর দীর্ঘ সিক্ত কেশগুলি ছড়াইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মালতী চোখ তুলিতেই তিনি কহিলেন, ""কী গো ভাইকে তো আদর করে নিয়ে এলে; মায়ের শ্রাদ্ধ পিণ্ডির খরচটা কে দেবে শুনি?" মালতী নিরুত্তর, উমা তীব্র হাস্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "ঠাকুরপো চার বছর ধরেই ফেল হচ্চে;তা না হলে হয়তো সৎ শাশুড়ির শ্রাদ্ধের খরচটা দিত। কিন্তু টাকাটা দিতে যে কাকে হবে, সে আমি জানি; রোজগার করা এমনি পাপ বটে।"

মালতী নতমস্তকে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, মেজবধূ চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের থালা আনিয়া বড়োজার সম্মুখে নামাইয়া রাখিল। উমা সেদিকে চাহিয়া কহিলেন, "আধঘণ্টা হল প্রায় স্নান করেছি, এত তাড়াতাড়ি চা টা করে নিয়ে এলে মেজবউ?" মেজবধূর নাম লক্ষ্মী। সে স্বভাবেও লক্ষ্মী বটে; তবু উমার কাছে তাহাকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু লক্ষ্মী বড়ো লোকের কন্যা। মা বাপের বড়ো আদরের। সে অনেক সময় বাপের বাড়িতে থাকিত বলিয়া, উমা তাহার উপরে ইচ্ছামতো অধিকার খাটাইতে পারিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার মেজ দেবর শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার একেবারেই বনিবনাও হইত না। সে ভয়ে তিনি লক্ষ্মীকে একটু এড়াইয়া চলিতেন। দরিদ্র-কন্যা মৌন-স্বভাবা মালতী তাঁহার সমস্ত ক্রোধের উপলক্ষ হইয়া বিরাজ করিত। সত্যেন্দ্র মালতীর লাঞ্ছনা চোখে দেখিয়াও কোনো প্রতিকার করিবার চেষ্টা মাত্র করিত না। এই জন্য সত্যেন্দ্রের উপরে উমার এক ধরনের স্নেহ ছিল, সে অবশ্য স্বার্থপরের স্নেহ।

চা আনিতে দেরি হওয়াতে উমা যখন বিদ্রূপ করিলেন, লক্ষ্মী কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। উমা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচটা কে দেবে, তাই জানতে এসেছিলুম।"

লক্ষ্মী কহিল, "সংসার থেকে—"

সংসারের টাকাটা আসে কোত্থেকে শুনি?" এমন সময় শচীন্দ্রের পদশব্দ শোনা গেল,

লক্ষ্মী ঘোমটা টানিয়া দিল এবং মালতী মোটা থামের আড়ালে সরিয়া পড়িল। শচীন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "সংসারের টাকাটা আসে ব্যাংক থেকে। টাকা তুলে আনতে হয় তো বলো, এনে দেব। কার শ্রাদ্ধ?"

উমা মুখ কালো করিয়া কহিলেন, "তোমার দাদার টাকাটা আর সংসার খরচে দেওয়া হয় না বুঝি।"

"হ্যাঁ ডাক্তারের লম্বা-লম্বা বিল, সাহের বাড়ির, কাপড়ের ফর্দ্দ আর রতন স্যাকরার খাঁই মিটিয়ে যা বাকি থেকে যায় তার থেকে কিছু কেড়ে কুড়ে দাদা সংসারে দেন তা জানি। কিন্তু বাজে খরচ দিতে তাঁকে তো কেউ বলছে না। শ্রাদ্ধে যা খরচ হবে তা আমি ব্যাংক থেকে এনে দেব এখন," বলিয়া শচীন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। উমার বাক্য স্রোতের জ্বালায় সেদিন সকলের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। যদিও সেদিন রবিবার ছিল গৃহকর্তা উপেন্দ্র অন্তঃপুরে বড়ো দর্শন দিলেন না। বড়ো বধূর রুগ্ন ছেলে মেয়েগুলোই মায়ের হাতে কয়েকবার প্রহার লাভ করিল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল। উমা মালতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাড়িশুদ্ধ লোকের খাওয়া শেষ হল; বামুনদিদি এখন তোমার জন্য হাঁড়ি কোলে করে বসে থাকবে না কী? এক বাড়িতে অমন রকম রকম মেজাজ নিয়ে চলবে না।

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "কাজ তো হয়ে গেছে বড়দি। বিজুকে খাইয়ে আসছি। বামুনদিদি, আমার ভাত একপানে ঢাকা দিয়ে হেঁসেল তুলুক না।" বলিয়াই সে বিজয়ের আহারের আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। উমা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

মালতী বিজয়কে খাওয়াইয়া নীচের কলঘরে হাতপা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় উপর হইতে বড়ো বধূর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল "ছোটো বউ!" মালতী প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল। উমা রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, "ছোটো ঠাকুরপোর জলখাবারটা পিসিমার ঘরে আছে, বোন উপরে নিয়ে এসো শিগগীর।" মালতী তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিল। পরনের কাপড় খানা প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। নীচেই তাহার একখানা শাড়ি রৌদ্রে শুকাইতেছিল; সে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পিসিমার ঘরে আসিয়া জলখাবার গোছাইতে বসিল। এই সমস্ত কার্য শেষ করিতে মিনিট পনেরো সময় লাগিয়াছিল। খাবারের থালা খানা হাতে লইয়া উপরের সিঁড়িতে অর্ধেক উঠিয়াই সে স্বামীর উগ্রকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। মালতী থামিয়া পড়িল, শুনিল, সত্যেন্দ্র কহিল, কেন কীসের কাজ?

উমা উত্তর দিলেন, "কাজ ত কত সেই থেকে ভাইকে খাওয়া নিয়ে সাধ্য সাধনা চলছে।"

"তবে থাক, আমার দরকার নাই" বলিয়া সত্যেন্দ্র বাহিরে আসিল, এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মালতী দুই চক্ষুর ব্যাকুল অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া স্বামীর চোখের দিকে চাহিল; সত্যেন্দ্র তাহার কোনো মর্যাদা রক্ষা করিল না। বড়ো বধূ কক্ষ মধ্য হইতেই ডাকিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো আ ঠাকুরপো, খেয়ে গেলে না? আহা খেয়েই যাও রাগ করে একদিন না খেয়ে কী হবে বল তো?

সেদিন আর মালতীর খাওয়া হইল না। তাহার ত্রুটিবশত স্বামীর আহার হয় নাই, এই আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া সে আর আহারে বসিতে পারিল না। লক্ষ্মী একবার অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, মালতী কহিল, 'না মেজদি আমার পেট ব্যথা করছে," "ওগো সব বুঝি। গেরস্তের ঘরে অত রাজকন্যার মতো অভিমানী হলে চলে না।"

এই ঘটনার তিন চারদিন পরে একদিন সকালবেলা মালতী বিষণ্ণমুখে উমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উমা তাহাকে দেখিয়া কোনো কথা কহিলেন না। অগত্যা মালতী মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়োদি।"

উমা কহিলেন কেন?

"কাল রাত্রে বিজুর বড়ো জ্বর হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, পিসিমা বলছিলেন—"

"তা আমি কী করব?"

"একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"ভালো জ্বালা হল দেখছি। বাড়ির সবাই মিলে যত হাড় হাবাতে জুটিয়ে আনুক, আর আমি মরি জ্বালাতন হয়ে।"

"আমি এমন হলে পারব না বলছি।" মালতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন, "যাও না একটা বন্দোবস্ত যা হয় করগে; সবাই আমার ঘাড়ে চাপালে তো ভারি বিপদ দেখছি। কেন ছোটোঠাকুরপো কৈ? সে পারবে না কুটুম্বকে একটু অসুধ দিতে? তবে ডাক্তারি বিদ্যে শেখা কী করতে?

মালতী স্বামীর কক্ষে আসিয়া দেখিল, সত্যেন্দ্র স্নানান্তে পরিপাটী বেশ পরিয়া আয়নার সম্মুখে চুল আঁচড়াইতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল।

মালতী আস্তে আস্তে কহিল, "একটা কথা শোনো।" সত্যেন্দ্র চিরুনি খানা রাখিয়া ভিজা তোয়ালে লইয়া হাত দুখানি মুছিতে মুছিতে কহিল, "কী কথা।"

"বিজুর বড়ো জ্বর হয়েছে, কাল রাত্রে।"

"তারপর?"

তুমি একবার দেখবে চল।

সত্যেন্দ্র বিব্রত হইয়া পড়িল। চোখে চশমা পরিতে পরিতে কহিল, "আমি? আমি তো এখন কলেজে যাচ্ছি। দশটা বাজে প্রায় আমার আর সময় নেই। হারানবাবুকে ডাকাও না।

হারানবাবু ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসক। মালতী কহিল "ডাকান তো আমার ইচ্ছায় হবে না।"

"তা হলে আমি আর কী করব?"

"তুমি কাউকে বল না ডেকে আনতে।"

তা কী করে হয়? বাড়ির সবাই ভাববে বিজয়ের জন্য আমার আর ভাবনার অন্ত নেই, আমি অত আহলাদেপনা দেখাতে পারব না। বড়ো বউই বা কী ভাববেন?"

"বড়োবউকে বলগে।" বলিয়া সত্যেন্দ্র দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মী আসিয়া কহিল, "ছোটো বউ, আজ আর স্নান করবি না নাকি। কত বেলা হয়েছে দেখ দেখি।" মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই যাই; বিজুকে নিয়ে যে বড়ো ভাবনায় পড়লাম মেজদি।" লক্ষ্মী কহিল, "ভাবনা কীসের? তোর ভাসুরকে বলেছি; হারানবাবুকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন।

মালতী ছলছল কৃতজ্ঞতা ভরা দুই নেত্রে লক্ষ্মীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল, "আমি তো মেজদি, তোমাকে কোনো কথা বলিনি।" লক্ষ্মী সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল, সে কহিল, "ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন যে ভাই না বল্লে ও সব আপনি দেখতে পাই।"

একদাগ ঔষধ পেটে পড়তেই বিজয়ের জ্বর সারিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে সে শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। মালতী লক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, "ভাগ্যে মেজদি এখানে ছিলে," লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "থাকছিনা আর বেশি দিন" মালতী শঙ্কিত হইয়া বলিল "কেন ভাই?"

"মা পত্র দিয়াছেন, দাদা নিতে আসবেন আমাকে।"

"মাগো, আমি একা কী করে থাকব মেজদি।" মালতীর ব্যাকুলতাকে লক্ষ্মী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এই বাড়িতে সে ছাড়া মালতী যে কত অসহায় কত বিপন্ন সে তাহা জানিত।

যদিও সে বড়ো মধুর বাক্যবাণ হইতে মালতীকে বাঁচাইতে পারিত না। তথাপি সেই মালতীর একমাত্র সান্ত্বনা স্থল। স্বামীর কাছে তো সে বালিকা বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত না। তাই লক্ষ্মী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "অঘ্রানের তো শেষ এসে পড়ল। এই পৌষ মাসটা শুধু থাকব। বেশি দিন নয়।" মালতী ব্যগ্র হইয়া কহিল "দেরি করো না ভাই, মাঘ মাস পড়তেই চলে এসো নিশ্চয়। আমি থাকতে পারব না।"

"শীগ্রীরই আসব। এই কয়টা দিন থাকিস সয়ে সয়ে। তবু তো বিজু এবার একটি সঙ্গী আছে।"

মালতী ম্লানমুখে কহিল, "ওকে এনে তো আমি বড়দির চক্ষুশূল হয়েছি।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "কবেই বা তুমি বড়দির চোখের মণি ছিলে।"

"না ভাই, তামাসা নয়, সত্যি বল না, বিজুকে নিয়ে কী করব? এমন জানলে— অর্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া মালতী থামিয়া গেল। বড়ো বধূর ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা ভিজিটের টাকাটা কে দিলে শুনি?" মালতী বা লক্ষ্মী কেহই উত্তর দিলে না। গৃহিণী সকল সন্ধান না লইয়া আসেন নাই। দুজনেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার কাংস্য কণ্ঠ সজোরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তাহলে মেজ ঠাকুরপো আজকাল টাকা পয়সা ঘরে আনছে বুঝি? আমি সে খবর পাব কী করে? তাকে বলো মেজবউ দুটো একটা টাকা পায়তো যেন ভূতের কাজে না দিয়ে সংসারেই দেয়। এতবড়ো সংসারটা অমনি চলে না। বাপের বাড়ি যাচ্ছো পরামর্শটা দিয়ে যেয়ো। আজকাল ছেলেরা বাপের কথা না শুনুক, বৌ এর কথা শোনে।"

উমার উচ্চ কণ্ঠের কথা পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবিষ্ট শচীন্দ্রের কর্ণে স্পষ্টই প্রবেশ করিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন "ভিজিটের টাকা নিয়ে যা বলবার তা আমাকেই বল না, ওদের কেন বৃথা কথা শোনাচ্চ।

উমা অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "তোমাকে তো আমি কিছু বলছি না।"

"এই যে একরাশ কথা বল্লে, সে—কাকে? বাবা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন বলেই তো আর ভিজিটের টাকা দুটো ও সেখান থেকে তুলে আনতে পারি না। আর তোমার কাছে চাইতে যাওয়া মানে আবার একরাশ কথা শোনা তার চেয়ে নিজেই দিলাম, আপদ চুকে গেল। "তা দাও গে না; তোমার টাকা যেমন ইচ্ছে খরচ করবে আমার তাতে কী? কিন্তু বলি ঠাকুরপো তুমি কী সর্বক্ষণই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক না কী?"

"যদি থাকি তো তোমার স্বভাবের গুণেই," বলিয়া শচীন্দ্র আপনার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে লক্ষ্মী বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। উমার সকল বিরক্তি ও ক্রোধের বর্ষণস্থল হইয়া, মালতী ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কাজ কর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত। নিজেকে কোনো কথা ভাবিবার অবসর দিত না। তবুও কোনো কোনো দিন তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত। সংসারে তুচ্ছ খুঁটি-নাটি ব্যাপারে মন কিছুতেই বাঁধা পড়িতে চাহিত না। তাহার বাল্যের সুখ কল্পনাগুলি পুরাতন সঙ্গীর মতো যেন প্রাণের ভিতর ফিরিয়া আসিত। তাহাদের ব্যাকুল বাসনাকে মালতী কোনোমতেই থামাইয়া দিতে পারিত না। একদিন বিকালবেলা, সমস্ত কাজের শেষে কাপড়খানি কাচিয়া চুল বাঁধিয়া মালতী দ্বিতলের শয়নকক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌষের অপরাহ্ণ তখন জ্যোতিঃহারা সূর্যের রক্ত আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে একটুখানি খোলা -জমি; সেই স্থানে কয়েকটা নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ গৃহ-স্বামীর যত্নে বাড়িয়া ক্রমে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, শীতের বাতাসে বৃক্ষগুলির সুচিক্কণ পত্ররাশি কম্পিত হইতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মালতী আপনার জীবনের ব্যর্থতার বিষয় ভাবিতে ছিল। তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়? বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চারি বৎসর কেবল বড়োবধূর বাক্য-জ্বালা সহিয়াই কাটিল। সংসারে কোনো বিষয়ে তাহার তিলমাত্র অধিকার জন্মে নাই। কিন্তু গৃহের দাসীত্ব করিতে তাহাকে প্রয়োজন।

স্বামী প্রেম বলিয়া সে যাহাকে জানে, তাহাও আজ পর্যন্ত একদিনের জন্য তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কখনও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। সেই তো তাহার সকল ব্যাথার মূল। সেই একটি স্থানে যদি স্নেহ ও সান্ত্বনার প্রাচুর্য্য থাকিত, তবে বড়োবধূর সমস্ত অত্যাচার মালতী সহাস্য মুখে সহিতে পারিত। কিন্তু তাহারই বিশেষ অভাব ছিল। মালতী আপন চিন্তায় ডুবিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার কর্ণে তীক্ষ্ণ আহ্বান আসিয়া বাজিল "ছোটো বউ।" "যাচ্ছি বড়দি"। বলিয়া মালতী ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল বড়ো জা দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা; আর সম্মুখে অপরাধীর মতো নত মস্তকে দণ্ডায়মান বিজয়কুমার। মালতীকে দেখিয়া বড়োবধূ কহিলেন, "হ্যাঁ গো, একি ছোটোলোকের কাণ্ড বল দেখি? চারটে পয়সা চুরি করে খেলে?"

"কী হয়েছে বড়দি?"

"কখনো কিছু করতে বলি না। চারবেলা তো গোগ্রাসে ভাতের পিণ্ডি গিলচে। আজ কী কুবুদ্ধি হল আমার, তোমার গুণধর ভাইকে চার আনার রসগোল্লা আনতে দিয়েছিলাম; তার থেকে ছোঁড়া চার পয়সা চুরি করেছে।"

"কে বিজু?"

"সে নয় তো আর কে? যেমন শিক্ষে! দুলি আর মানি বড়ো কাঁদছিল; তাই ভাবলাম এখুনি আনিয়ে দিই; তা খুব শাস্তি হল আমার।"

"হয় তো ঠকে এসেছে বড়দি।"

"মিছে কথা বাড়িয়ো না ছোটো বউ,—ঠকবার ছেলে তোমার ভাইটি নয়। বাজার করবার অভ্যেসটা তো আর নতুন নয়। নবাবের ছেলে তো নয়, যে, জন্মে দোকান বাজার চোখে দেখেনি।" উমা নীচে গিয়া একজন ভৃত্যকে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন, সে জানিয়া আসিয়া কহিল, দোকানি চার আনার খাবার দিয়াছে। বিজয়কুমার যে চুরি করিয়া খাইয়াছে আজ তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। মালতী বিজয়কে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল। "কেন চুরি করে খেলি হতভাগা?"

বিজয় চোখ মুছিতে লাগিল।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চাপা কণ্ঠে কহিল "আমার ভাই হয়ে চুরি করে খেলি? রসগোল্লা খাবার জন্য প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল,—আমাকে বলিসনি কেন? আজ রাত্রে আর খেতে পাবি না, যা আমার কাছ থেকে সরে যা।" বলিয়া তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। মালতী দুঃখে কাঁদিতেই লাগিল।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভাইটিকে সে বড়ো ভালোবাসিত; তাই তাহাকে প্রহার করিয়া,সে নিজেই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্র তাহার অশ্রু চিহ্নিত মুখ দেখিতে পাইল। সে বুঝিল. একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাছে স্ত্রীর বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, বড়োবধূ বা বাড়ির অন্য লোকের কাছে উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে সে মালতীকে কোনো প্রশ্নই করিতে পারিল না। নীরবে জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দিন রাত্রে বিজয়কুমার না খাইয়াই শুইয়া পড়িল। গৃহিণী দেখিয়াও কথা কহিলেন না। কিন্তু মালতীও যখন খাইবে না বলিল, তখন তিনি রাগিয়া উঠিলেন কহিলেন, "ভাই বোনে যুক্তি করে উপোসী রইলো না কী? এ সেই চুরির শোধ হচ্ছে বুঝি? তা মন্দ নয়। কিন্তু বলি ছোটো বউ, অত রাগই বা কীসের? রাত পোহালেই যখন পিণ্ডি গিলতে হবে, তখন আবার মান অভিমান কেন?" মালতী কোনো উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র টেবিলের নিকটে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। স্ত্রীকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল, "খেয়েছ?"

"না"।

"যাওনা, খেয়ে এসো; রাত হয়েছে ত।"

"আজ খাব না।"

সত্যেন্দ্র অনুমান করিল, সেই বিকালে অশ্রুবর্ষণের সহিত এই উপবাসের কোনো সম্বন্ধ আছে। সে নিরুত্তরে ধূমপান করিতে লাগিল, মালতী টেবিলের অপর প্রান্তে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার অভুক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া, সত্যেন্দ্রের মায়া হইতে লাগিল, মৃদু স্বরে কহিল, "খাবে না কেন?"

"ক্ষিদে নেই"—বলিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

আবার অশ্রুবর্ষণের উপক্রম দেখিয়া সত্যেন্দ্র আসন্ন আরাম ভঙ্গের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ সারাদিন খেটেছি বড়ো ঘুম পেয়েছে শুইগে। তুমি শোবে না?"

"যাচ্চি।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় প্রবেশ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুখ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল। মালতী আলো নিবাইয়া অন্ধকারে বসিয়া রহিল। মনের বেদনা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না।

দিন পাঁচ ছয় পরে উমার লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজার আয়োজন করিতে করিতে তিনি একবার ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। সহসা ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল, দেখিলেন বিজয়কুমার পূজার ঘর হইতে পশ্চাতের দ্বারপথে পলায়ন করিতেছে। উমা করস্থিত ফুলের সাজি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিজয়"। কেহই উত্তর দিল না। আজ দুই দিন হল মালতীর জ্বর হইয়াছে, সে ঘরে শুইয়াছিল উমা দ্রুত চরণে মালতীর কক্ষ দ্বারে আসিয়া কহিলেন, "ওগো শুনচো?"

মালতী ক্লান্ত স্বরে কহিল, "কী হয়েছে?"

"হয়েছে আমার মাথা, পূজার সাজানো নৈবেদ্য হতে কী যেন চুরি করে নিয়ে পালাল।"

মালতী ভীত হইয়া কহিল, "কে?"

"তোমার বাপের গুণবান বংশধর, আবার কে? মুখ পোড়া বাঁদরের ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি পড়েছে, এবার আর রক্ষে নেই কেমন মা বাপের ছেলে গা এই বয়সে চুরিবিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছে।"

"মা বাপের কথা কী বলচ বড়দি।"

"বলছি ভালো বাপ মায়ের ছেলে চোর হয় না।"

মালতী বিবর্ণ মুখে উমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোমার বাপ তো মিছে কথা বলতে আর ঠকাতে কম করেন নি,—তাঁর ছেলেই তো বিজয়কুমার, সে আর ভালো হবে কী করে?" "ছেলে মানুষ জন্মে শিক্ষা পায়নি, তাই একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তাই বলে একশোবার আমার বাপকে গাল দিচ্ছ কেন বড়দি?"

"ওমা গো, মুখ তো খুব বেড়েছে ছোটো বউ। চোরের হয়ে আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে এলে? একই শিক্ষে কিনা, আচ্ছা আজও আমিও দেখছি।"

অল্পক্ষণ পরেই গৃহিণীর আশ্রিত সুযোগ্য ভ্রাতুস্পুত্র হরিদাস বেত্র হস্তে বিজয়কে শাসন করিতে আসিল, বিজয় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং মালতী আপন কক্ষে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সেইক্ষণেই গৃহ-প্রত্যাগত সত্যেন্দ্র অসুস্থ পত্নীকে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "অমন করে বসে আছ যে?"

মালতী ব্যগ্রস্বরে কহিল, "তুমি একবার বাইরে গিয়ে দেখ। বড়ো দিদি তার ভাইপোকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়াচ্ছেন। তুমি বাধা দাও গে তোমার পায়ে পড়ি।"

"আমি—?"

পারবে না? এতটা অন্যায় সহ্য হবে তোমার? হরিকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়ানো— সে তো শুধু আমাকে নয় আমার মা বাপকে শুদ্ধ অপমান করা হবে, এ অপমান থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও।

সত্যেন্দ্র তাহার চিরমৌনী পত্নীকে এত কথা কহিতে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল "বিজু কী অন্যায় করেছে, সে অনুসন্ধান না নিয়ে—"

মালতী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিদাস বেত উঠাইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে মালতী আসিয়া দুই হাতে ভ্রাতাকে সরাইয়া দিল। ক্রোধে বিস্ময়ে আত্মহারা উমা কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "ছোটোবউ ওকি হচ্ছে"? "নিয়ে যাচ্চি একে। যথেষ্ট কথা শুনিয়েও তৃপ্তি হল না বড়দি। তাই যাকে তাকে নিয়ে এলে মার খাওয়াতে?

মালতীর মুখে এই কথা? উমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না তীক্ষ্ণ, কটু কণ্ঠে সমস্ত গায়ের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, 'আমার ভাইপো বুঝি মানুষ নয় ছোটোবউ?"

"মানুষ হলেও বিজুকে মারবার তার কী অধিকার?" বলিয়া মালতী ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল। উমা সমস্ত মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। সেদিন আহার কালে উপেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলে উমা সকালের ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এত অপমান আমি সইব না, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

উপেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা দুই জা-এ যখন একসঙ্গে ঘর করতে পার না তখন কাজে কাজেই তোমাকে বাপের বাড়ি যেতে হয়। বৌমার তো একটা বাপের বাড়িও নেই যে, সেখানে ছুটে গিয়ে রাগ দেখাবেন।"

আবার দিন কাটিতে লাগিল, মালতী এখনও অসুস্থ একদিন সে লক্ষ্মীর একখানি বিস্তারিত পত্র পাইল, পত্রে প্রথম অংশ এইরূপ—

"স্নেহের মালতী তোমার ভাশুরের পত্রে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বড়ো চিন্তিত হইলাম। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে লিখিয়াছেন অথচ কেন তাহা খুলিয়া লিখেন নাই। তোমার জ্বর ছাড়াও আর কিছু কাণ্ড ঘটেছে নিশ্চয়। কী হইয়াছে? দুটো দিন সহিয়া থাক বোন, পৌষ মাসটা শেষ হইলেই আমি আসিব। আমাদের দেশের বউগুলির কী দশা ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। আমার মাসতুত ভাই অমলকে জানত? অমল গতবার বি-এ ফেল করিয়াছিল, এবার তো পরীক্ষাই দিল না। নন-কো-অপারেশন করিতেছে। কিন্তু তাহার চোটটা ইংরাজকে বিন্দু মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই; অন্য দিকে সর্বতোভাবে নিরপরাধ বধূ ও তার পিতৃ পরিবারের যন্ত্রণার বিষয় হইয়াছে। অমল পরীক্ষা দেয় নাই; রোজগার করে না, এ সকলই বধূর দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমার মাসীমারা ছেলের রূপগুণ ও বংশ মর্যাদার জোরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলেন। সে শিক্ষার মর্যাদাটা তাঁহারা খুব দিতেন, উপযুক্ত শিক্ষা যে মানুষের মনে অধিকতর আত্মবোধ ও সম্মান জ্ঞান জাগাইয়া দেয় এই সহজ কথাটি যাহারা না বুঝে, তাহাদের লইয়া বড়ো বিপদ। মাসীমার বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। দিবারাত্র তাহাদের বাড়ি অশান্তি কলহ লাগিয়াই আছে। সমস্ত বিষয়ে বাক্যহীন বউটাকে উপলক্ষ দাঁড় করানো হয়। অমল 'নন্-কো-অপারেশন' করিতেছে। কিন্তু সে খুব সুবোধ ছেলে, পিতৃ-মাতৃভক্ত; বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মতো পৌরুষ তাহার একবিন্দু নাই। দেখিয়া শুনিয়া দুঃখও হয় আবার হাসিও পায়। যে ছেলে আপনার সহধর্ম্মিনীকে অযথা অপমানের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। সে আবার একটা বিশাল দেশকে উদ্ধার করিবার কল্পনা স্বপ্নেও করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ছেলেরা বিবাহ করে কেন বল দেখি? ঝি বা রাঁধুনি তো টাকা দিলেই পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ

করিবার জন্য আমাদের দেশের কলেজে পাশ করা ছেলেগুলো পবিত্র বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

এইরকম তীব্র বিদ্বেষে চিঠিখানি আগাগোড়া পূর্ণ। মালতী মনে মনে কহিল, "দেবতার মতো স্বামী পেয়েছ—মেজদি তাই অত কথা বলতে পেরেছ; আমি আজ কালের ছেলেদের দোষ দিই কী করে? আমার স্বামীও তো এ সম্প্রদায়ের বাহিরে নন।" মালতীর জ্বর সারিয়া সারিতেছিল না। কিন্তু মাঘমাসটা পড়িতেই লক্ষ্মীর আসা সম্বন্ধে তাহার মনে যে একটু আশা জাগিল, সেই আশার জোরে সে একটু সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। সেদিন সকালবেলা মালতী রোগশয্যা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার শরীর মন এখন বড়ো দুর্বল। থামের গায়ে অলস দেহভার স্থাপন করিয়া সে শীত প্রভাতের উষ্ণ মধুর রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছিল। এমন সময়ে নীচে প্রাঙ্গণে বিজয়কুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে রেলিং এর ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বিজয় উমার কনিষ্ঠ পুত্র রণুকে ক্রোড়ে লইয়া বাজার করিয়া ফিরিতেছে। তাহার দুই হাত নানা আকারের কাগজের ও শালপাতার মোড়কে পরিপূর্ণ। মালতীর অজ্ঞাতে বিজয়কে আজকাল এই সব কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বুঝিয়া নির্বাক বিস্ময়ে মালতী বিচলিতা হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল,বিজয় প্রাঙ্গণের কলতলায় বাসন পরিষ্কার করিতে করিতে বামুনদিদির সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। সে উঠিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, সেদিন দুপুরবেলা সে দাসীকে দিয়া বিজয়কে আপনার কক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। দাসী আসিয়া কহিল, "বিজয়ের ভারি জ্বর হয়েছে যে! সে মাথা তুলতেই পারচে না।" মালতী কহিল, "কোথায় সে?" দাসী কক্ষ নির্দেশ করিয়া চলিয়া গেল। মালতী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল; কম্পিত পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র অন্ধকার, অপরিষ্কৃত কক্ষ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়েই পাশের ঘর হইতে বড়োজার কর্কশ কণ্ঠস্বর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। উমা নবাগতা ভ্রাতৃজায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছিলেন, "জ্বালিয়ে খাচ্চে আমাকে। আবার না কী জ্বর হয়েছে শুনছি।"

"কে ছেলেটা?"

"কে জানে কোথাকার কে? পথ থেকে ধরে এনে ঘরে ঢুকানো—তোমার নন্দাই খুব পারেন। কিন্তু তার যত ভালো তো সামলাইতে হয় এই আমাকে, কী বল ভাই?"

"সত্যি, তো! মা বাপ ছেলেটার নেই?"

"হরি বোল! মা বাপের যদি ঠিক থাকবে, তবে আর পরের ঘরে পড়ে আছে? ওদের আবার ঘর 'পর' আছে?"

মালতীর দুই কর্ণে কে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। সে আর ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র আসিয়া পত্নীকে এই অবস্থায় দেখিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "কাঁদচ যে অত?"

মালতী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কখনো কিছু চাইনি—আজ জোড় হাত করে বলছি তোমায়, এর একটা প্রতিকার করো, তুমি। আমি আমার পিতৃ অপমান আর সইতে পারি না যে। আমি তোমাদের বউ, এই অধিকারে আমার বাপকে শুদ্ধু গিন্নীর গাল খেতে হচ্চে। কিন্তু বউ-এর কোনো অধিকার আমায় দিয়েছ বল দেখি? তিলে তিলে শুধু আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ না?"

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কী করচ? কেউ শোনে যদি" "এখনো সেই ভয় তোমার? কেউ শোনে যদি, তোমার একটু নিন্দে হবে—এই ত? সেইটুকু সইবার মতো তেজ তোমার নেই? তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার সকল দুঃখে পাথর চাপা দিয়ে রাখব, আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, এমন পাষাণ তুমি—মাগো।"

"কেন ঠাকুরপোকে অত কথা শোনাচ্ছ ছোটোবউ? তোমার মরা বাপের বড়ো ভাগ্যি যে আমার বাড়িতে তোমার ঠাঁই দিয়েছি। কীসের জোরে অত কথা শোনাও, আজ বাড়ি ছেড়ে যাও না, আজই নতুন বউ বরণ করে আনি।" উমা যেন দ্বারের সন্নিকট হইতে অশনি সম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন। মালতী দুই চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আরো সহ্য করতে বল আমায়? আমাকে কী তোমরা মানুষ মনে করো না। আমি"—বলিতে বলিতে তাহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া তরল অগ্নিস্রোতের মতো অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র বিব্রতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, এমন কাণ্ড সে কল্পনাও করে নাই, মালতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "তুমি যাও, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। দেবতার আসনে যাকে বসিয়েছিলুম, তাকে এত ভীরু, কাপুরুষ দেখলে সহ্য হয় না—তুমি যাও।" সত্যেন্দ্র বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। মালতী উপাধানে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাতে অবসন্ন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মালতী দেখিল, লক্ষ্মী তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে। মালতী সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল "ফিরে এলে ভাই। আর যেয়োনা মেজদি।" লক্ষ্মী স্নিগ্ধ স্বরে প্রাণের মায়া ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, আমি আর তোমাকে ফেলে যাব না।" মালতী একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিজু কেমন আছে মেজদি জান?"

"তার জ্বর কমেছে?" তার জন্য এখন ভেবো না, তুমি ঘুমাও। মালতী চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইতে চাহিল কিন্তু একটু পরেই চমকিয়া চোখ খুলিল। লক্ষ্মী তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কহিল, "কী ছোটো বউ, কষ্ট হচ্চে?" "না।" বলিয়া মালতী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, মিনিট দশ পরে সে সহসা ভয়ানক চমকাইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। লক্ষ্মী বাহু দ্বারা তাহার কম্পিত দেহ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ওকি, কোথায় যাও বোন? ঠাকুরপোকে ডাকব কী?" "না—না" বলিতে বলিতে সবেগে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

"ছোটো বউ।"

"মেজদি"।

"কেন অমন করচিস ভাই?"

"আমি এখানে থাকতে পারচি না; চারিদিকে যেন আগুন লেগে গেছে।" বলিয়া মালতী নিঝুম হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী পাখার বাতাস করিতে করিতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

সাতদিন পরে মালতীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীর একান্ত স্নেহ যত্নে একটু একটু করিয়া সে সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল। একদিন বিকালবেলা বারান্দায় বসিয়া কোলের উপর কাগজ রাখিয়া সে কী লিখিতেছিল; এমন সময় লক্ষ্মী ওদিকে তাহার ঘর হইতে ডাকিল।

"ছোটো বউ।"

"কেন মেজদি?"

"আর হিমে বাইরে বসে থেকো না,—ঘরে যাও।"

"এইটুকু লিখে যাচ্চি"—

"অত আজ আর নাই লিখলে বোন মাথা ধরবে যে।"

"না কিছু হবে না।" বলিয়া মালতী দিনান্তের শেষ আভার ন্যায় একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র যখন শয়নগৃহে আসিল, মালতী উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া পড়িল, তারা রুক্ষ কেশভার স্বামীর পদতল প্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া রহিল। সত্যেন্দ্র তীব্র জ্বালা মিশ্রিত সুরে কহিল, "আজ আবার ভক্তি উছলে উঠল যে?" মালতী কোনো উত্তর দিল না। সত্যেন্দ্র কহিল, "সেদিন তো ভীরু কাপুরুষ বলে খুব একচোট বকে নিয়েছে,—আজ

আবার কাপুরুষের পায়ের উপর এসে পড়লে? দরকার নেই,—দরকার নেই, আমাকে আবার অত ভক্তি দেখানো কেন?"

মালতী উত্তর না দিয়া পা ছাড়িয়া দিল, সত্যেন্দ্র শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া লেপটা টানিয়া লইল এবং তাহার ঘুম আসিতেও দেরি হইল না। মালতী ঠাণ্ডা মেঝের উপরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘর অন্ধকার,—সেই অন্ধকারে বসিয়া সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তারপর সে উঠিল। আস্তে আস্তে পালঙ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মুক্ত বাতায়ন পথে শীত রজনীর কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না সত্যেন্দ্রের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী দৃষ্টি নত করিয়া সেই তৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় এই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পায় নাই। কতদিন এই সুপ্ত সৌন্দর্য তাহার তরুণ মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিবাহিত জীবনে যখন দুঃখ প্রবেশ করে নাই, তখন তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত আশা, এই একটি ব্যক্তিকে ঘিরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইত। আজ সেদিন কোথায় গেল? মালতীর মনে হইল তাহার দুর্বল বক্ষ যেন কেহ কঠিন লৌহযন্ত্রে দলিত, পেষিত করিয়া দিতেছে। সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না। একবার হাত দিয়া নিদ্রিত স্বামীকে স্পর্শ করিল, তারপর ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

তখন প্রভাতের রৌদ্র উজ্জ্বল হয় নাই, সত্যেন্দ্র লক্ষ্মীর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল। "মেজ বউ," "ঠাকুরপো নাকি?" মেজ বউ ব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"দরজাটা খোল শীগ্‌গীর—।"

লক্ষ্মী দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতেই সত্যেন্দ্র ভীতি বিবর্ণ মুখে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে মেজ বউ—তোমাদের ছোটো বউকে ঘরে খুঁজে পাচ্ছি না। বাড়ির কোথাও সে নেই।"

লক্ষ্মী রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া পাংশুমুখে চাহিয়া রহিল। শচীন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিলেন, তোমরা সব পাগল হয়েছে নাকি? স্নানের "ঘরে টরে"—

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল 'না কোথাও নেই; সব জায়গা খোঁজ করেছি। দেউড়ির দরজা খোলা ছিল, ভগবানসিং নিজে বল্লে—"

লক্ষ্মী কোনোমতেই কহিল, "শ্যামবাজারে চলে যায় নিত"? শচীন্দ্র কহিলেন, "এরকমভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কী? আচ্ছা দেখছি"—বলিয়া তিনি ত্বরিত পদে নীচে নামিয়া গেলেন। যদি মালতী ঘরেই বসিয়া থাকে এই আশায় মুগ্ধ হইয়া সত্যেন্দ্র আবার তাহার শূন্য শয়ন কক্ষের দিকে ফিরিয়া গেল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল, বিছানায় পায়ের দিকে একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি পত্রখানা তুলিয়া লইল। খামের উপর মালতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে সত্যেন্দ্রনাথের নাম লেখা আছে সুতরাং কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া ফেলিল এবং বিছানার উপরে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

"শ্রীচরণেষু—আমি তোমাদের কাহাকেও না জানাইয়া আজ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা আমার সন্ধান করিলেও আমাকে পাইবে না। যদি পার তবে বিজুকে একটু আশ্রয় দিও। অথবা তাকে পথের কুকুরের মতো রাস্তায় তাড়াইয়া দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। কারণ আমি যে দেশে চলিলাম সেখানে কোনো দুঃখই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে দেশ বহু দূরে।

"ভাবিয়াছিলাম, চুপ করিয়া সহিয়া থাকিব। কিন্তু কিছুতেই সহিতে পারলাম না। তাই অনেক ভাবিয়া দেখিলাম। কেরাসিন-নায়িকার দলবৃদ্ধি করা অপেক্ষা আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমার কাছে ভালো মনে হইল। আমি সেই পথেই যাত্রা করিলাম। ভগবানের কাছে

প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ঠিক স্থানে পৌঁছে দেন। "তুমি ভ্রমেও ভাবিও না যে, বড়োদিদির লাঞ্ছনা অসহ্য হওয়াতে আমি এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বড়োদিদির অপরিসীম অত্যাচার আমি সহাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতাম যদি তুমি আমার মান অপমান, সুখ-দুঃখের প্রকৃত সাথী হইতে। তুমি তো একদিনের জন্য তাহা হও নাই। তুমি সর্বদাই সকলের কাছে আপনার মর্যাদা বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকিতে। কিন্তু একথা কখনও ভাবিয়াছ কী যে আমারও আত্মমর্যাদার জ্ঞান আছে; এবং আমি আকাশ হইতে মাটিতে খসিয়া পড়ি নাই। মা-বাপের কোলেই আমি জন্মিয়াছিলাম। এবং তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি অপেক্ষা এক তিল কম নহে? যাঁহাদের কন্যাকে পত্নী পদ দিয়াছ, সেই আমার স্বর্গস্থ পিতা মাতার অপমান যখন তোমার পুরুষের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন আমিই বা তোমার পরিবারের কথা ভাবিব কেন? আমার গৃহত্যাগে তোমাদের পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে, এই কথা ভাবিতে আজ আমার ক্রুর আনন্দ হইতেছে। নিজের জীবন বলি দিয়া আমি সকল অপমান অবহেলার চূড়ান্ত করিয়া যাইব। আমার দিক হইতে তোমাদের সমস্ত সুখ সম্মান, সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই অথচ আমার দিকটা তোমরা একেবারেই ভাবিবে না,—এ কথাটা আমি সহ্য করিতে পারি না। মানুষ মাটি বা পাথর নয় যে প্রয়োজন মতো তোমরা তাহা হইতে কিছু কাটিয়া লইবে কিন্তু তাহাকে কিছু ফিরাইয়া দিবে না। নারী দেহেও যে প্রাণ আছে তাহা তোমরা ভুলিয়াছ, নিজে নারী হইয়া আমি তো তাহা ভুলিতে পারি না।

"হিন্দু রমণী মুখ ফুটিয়া কখন স্বামীকে ভালোবাসা জানায় না। স্বামী যদি নিজের সহৃদয়তা দ্বারা স্ত্রীর ভালোবাসা না বুঝেন তবে স্ত্রীর সাধ্য নাই সে অনির্বচনীয় ভাব তাঁহাকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দিবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি তা এখনও যে সে ভালোবাসার একবিন্দু হ্রাস হইয়াছে এমন নহে তবু আজ শেষ বিদায় ক্ষণে "বাসি" বলিয়া কোনো লাভ নাই, তাই বলিতেছি, "বাসিতাম"। প্রতিদানহীন প্রচণ্ড প্রেম দিবারাত্রি আগুনের মতো আমার মনের মধ্যে জ্বলিত, সে অসহ্য দহনে আমার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য কর্তব্য বুদ্ধি সব জ্বলিয়া গিয়াছে। আজ আমি আপনার বশে নাই। একদিন ছিল, যখন দেবতার আসনে তোমাকে বসাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। আজ দেখিলাম তুমি সংসারের অপর সাধারণ দশজনের মতোই; সমস্ত মলিনতা পঙ্কিলতার বীজ তোমার মধ্যে সুপ্ত আছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার দেবতার এই মলিন মূর্তি চোখে দেখিয়া, আমার আর সংসার বাসের প্রবৃত্তি নাই। তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না—তোমার সঙ্গে মিলিয়া তোমার সংসার করিব কী করিয়া? তোমার সহিত পাছে কপটতা করিতে হয় সেই ভয়ে তোমার জীবনের পথ হইতেই সরিয়া যাইতেছি। তুমি আবার বিবাহ করিবে নিশ্চয়। কিন্তু চিরবিদায়ের দিনে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি আর কাহাকেও এমন দুঃখ দিও না। আর উপার্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিও তাহা হইলে বড়োদিদির বাক্যবাণ সহিতে হইবে না। আমাকে বিবাহ করিয়া অনেকসময় বড়োদিদির নিকটে অন্যায় কথা শুনিয়াছ—সে সকল হইতে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। তুমি না কী দেশোদ্ধারের সংকল্প করিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি কী করিবে সে কথায় আমার আর প্রয়োজন নাই। তবে সংসারে আমার ন্যায় হতভাগিনীর সংখ্যা বিরল নহে। তাহাদের জন্য বলিতেছি—অত বড়ো দেশোদ্ধারের কথা না ভাবিয়া, সেই অভাগিনীদের তাহাদের অন্ধকার জীবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হয়। যদি নিজের হৃদয় দিয়া কখনও নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা করো তবে দেখিবে, এই চিরলাঞ্ছিত নারী জাতির মনের মধ্যে কত গভীর গোপন দুঃখ বহন করিয়া হাসিমুখে সুব্যবস্থায় তোমাদের সংসার পরিচালনা করে, ঈশ্বর চরণে আমার প্রার্থনা তিনি যেন একদিন তোমার অন্ধ চোখ খুলিয়া দেন।

"এখন তবে বিদায়। বৃথা আমার অনুসন্ধান করিও না। আমি বহু বহু—দূর তীর্থে যাত্রা করিলাম।

ইতি—মালতী।"

বিস্ময় বিমূঢ় সত্যেন্দ্রের হাত হইতে পত্রখানা কাড়িয়া লইয়া মেজবউ এক নিঃশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া ফেলিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া একটি ক্ষুব্ধ আহ্বান কম্পিত অধরে ফুটিয়া বাহির হইল।

শচীন্দ্র বিজয়কুমারকে একটা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করিয়াদিলেন।

গৃহত্যাগিনী মালতীর নাম সে গৃহে আর উচ্চারিত হইল না। উমা তাঁহার অবিবাহিতা, বয়স্থা পিতৃব্য কন্যার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

পর বৎসর লক্ষ্মী শচীন্দ্রের সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে এক বিপুল আশা বক্ষে লইয়া অসংখ্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু কাহারও সন্ধান মিলে নাই। অগত্যা কল্পনাতীত, মর্মান্তিক কথাই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইল। মালতীর নাম সে আর মুখে লইল না;—শুধু একখানি পবিত্র সুন্দর মুখ চিরদিনের মতো তাহার হৃদয়ে আঁকা হইয়া রহিল।

'ভারতবর্ষ'-১৩২৮ সন

মহালয়ার উপহার

লীলা মজুমদার

শিবু, শিবুর মা, আর শিবুর বউ তিন নম্বর হোগলাপট্টি লেনের দোতলায় তিনখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত।

একটা ঘরে শিবুর মা শুতো, সেটা সব থেকে বড়ো ও ভালো, কারণ বুড়ি ভারি খিটখিটে। আরেকটাতে শিবু আর শিবুর বউ শুতো, সেটা মাঝারি সাইজের। আর সব থেকে ছোটটাতে শিবু, শিবুর মা আর শিবুর বউ তিনটে কাঁঠাল কাঠের পিড়িতে বসে কানা তোলা বড়ো বড়ো কাঁসার থালায় ভাত খেত, বড়ো বড়ো কাঁসার বাটিতে ঝোল খেত: আর বড়ো বড়ো কাঁসার গেলাসে জল খেত কিন্তু নুন আর লঙ্কা রাখত থালার পাশে সান বাঁধানো মেঝের উপর।

আগে খেত শিবু আর শিবুর মা, দরজার দিকে পিঠ করে পাশাপাশি বসে। তারা উঠে গেল খেত শিবুর বউ, দরজার দিকে মুখ করে। কিন্তু শিবুর বউ সব থেকে বড়ো মাছটা নিজের জন্য তুলে রাখত। শিবু জানত না বলে রাগ করত না।

শিবু রোজ রাত্রে খেয়েদেয়ে, মুখে একটা পান পুরে, একটা শাবল, একটা শেড লাগান লণ্ঠন আর এক থলে হাতিয়ার হাতে নিয়ে চুরি করতে বেরুত। কারণ শিবু ছিল অসাধারণ সাহসী, পুলিশ টুলিশ কেয়ার করত না। তা ছাড়া শিবু অসম্ভব রকম দৌড়তে পারত, আর টিকিটিকির মতন জলের পাইপ বেয়ে নিমেষের মধ্যে তিনতলায় উঠে যেতে পারত।

যাই হোক, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শিবু নিজের ঘরে যেত রেডি হবার জন্য, আর শিবুর বউ অমনি রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ করে খেতে বসত।

শিবুর মা নিজের ঘর থেকে ডেকে বলত—হ্যাঁরে শিবে! জামা ছেড়ে উঁচু করে ধুতি মালকোঁচা মেরে পরেছিস তো?

শিবু বলত—"সে আর তোমায় বলে দিতে হবে না।"

শিবুর মা বলত—"গাঁয়ে আচ্ছা করে তেল মেখে নিতে ভুলিস না।"

শিবু বলত—"আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ।"

শিবুর মা তবু বলত—"শাবল লণ্ঠন, থলে সব নিয়েছিস?"

শিবু বলত—"কী মুশকিল!"

তখন রান্নাঘর থেকে শিবুর বৌ ভাত-খাওয়া গলায় বলত, "দেখে শুনে আনবে, ছেঁড়া ফাটা না হয় যেন।"

শিবু বলত—"জ্বালালে দেখছি।"

আর শিবুর মা আর শিবুর বউ একসঙ্গে জলত—"দুগ্‌গা দুগ্‌ গা! হরিনারায়ণ!"

শিবুও অমনি চট করে অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত।

শিবুর মা তখন নিজের ঘরে আবার ফিরে খাটের নীচে, ট্রাঙ্কের পিছনে, আনাচে কানাচে দেখত সব জিনিস ঠিক আছে কি না। তার ঘরভরা কত জিনিস : রূপোবাঁধানো গড়গড়া, দাঁড়ানো ঘড়ি, গ্রামোফোনের চোং, মেম্‌দের হ্যাণ্ডব্যাগ, পাউডারের কৌটো—এইসব। এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়ের যা উপদ্রব!

বুড়ির ছিল সজাগ ঘুম। শিবু বাড়ি ফিরতেই যেই সিঁড়ির আলগা রেলিংটা ক্যাঁচক্যাঁচ করত, তার ঘুম যেত ছুটে, আর যা কিছু ভালো জিনিস বুড়ির আগেই গাপ করত! বউয়ের ওদিকে অ্যায়সা ঘুম যে সকালে চা তেষ্টা পেলে ঠেলা না দিলে ওঠে না। সেও উঠেই কতক জিনিস বাক্সে তোলে—মালা, আংটি, রুমাল, সিগারেট কেস। আর যদি বাকি যা থাকে শিবু তাই বিক্রি করে সংসার চালায়।

তবে দিনে দিনে শিবুও চালাক হয়ে গেছে। সেও অর্ধেক জিনিস আগেই গছিয়ে আসে।

এমনি করে পুজোর সময় এসে গেল।

মহালয়ার দিন। শিবু রাতে খেতে বসে ভাবছে যে একটা মোটা রকমের দাও মারতে না পারলে তো আর এই মা-টিকে আর গিন্নীটিকে ঠেকানো যাবে না।

এমন সময় একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। শিবুর বউ অমনি জিভ কেটে ঘোমটা দিলে। লোকটার একটা চোখ আছে, আরেকটার উপর সবুজ একটা তাপ্পি মারা। নাকটা কার ঘুঁষি খেয়ে থ্যাবড়াপানা হয়ে গেছে, থুতনিটা বুলডগের মতন, মাথার চুল কদমছাঁট, গায়ে একটা কালো হাফপ্যান্ট আর সাদা হাতাওয়ালা গেঞ্জি। শিবুর তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে জল খেয়ে, গেলাসটা ঠিক মধ্যিখানে রেখে, লোকটিকে বলল—"গুপী! কি মনে করে?" গুপী কোনো কথা না বলে ডান হাতের বকবার আঙুল বেঁকিয়ে শিবুকে ডাকল। শিবু উঠে বাইরে গেল। এতক্ষণ শিবুর মা ও শিবুর বউ এক হাত করে ঘোমটা দিয়ে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিল, এবার তারা আবার এদিকে ফিরল। শিবুর মা মস্ত এক গ্রাস ভাত মুখে পুরল আর শিবুর বউ নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে গুপী শিবুর কানের কাছে মুখ দিয়ে জোরে ফিসফিস করে বলল—"শিবে তুই রাজা হবি! আজ তোর কপাল খুলে যাবেরে শা—! চিংড়িহাটার জমিদারের বাড়ি চিনিস তো? সেই যেখানে আমার মামাতো ভাই চাকরি করে? সেই যে দোতলার লোহার সিন্দুকে ইয়া ইয়া পায়রার ডিমের মতন মণিমুক্তো আছে। আজ কেউ বাড়ি থাকবে না। গিন্নী রেগেমেগে ছেলেপুলে, সেপাই, ডালকুত্তা আর বাপের গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। জমিদারবাবুও রেগেমেগে মাছ ধরতে চলে গেছেন। কাল সব ফিরে আসবে যে যার রাগ পড়লে। আজ রাতে বুঝলি কিনা—" শিবু বলল—"গয়না নিয়েই না চলে গেছে?"

গুপী বলল—"সে তো শুধু বাপের বাড়ির গয়না, আসলগুলো এখানে!"

শিবু—"তোর তাতে কী?"

গুপী—"তুই কাজ বাগাবি, তিন ভাগ তোর। আমি খবর এনেছি, একভাগ আমার। রাজী?"

শিবু বলল—"রাজী।"

গুপী চলে গেল।

মায়ের বউয়ের উৎসাহ দেখে কে! "ওরে শিবে, দেরি করিস না। পায়রার ডিমের মতো দুটো একটা আমরা নেব।"

শেষ পর্যন্ত তোড়জোড় করে শিবু বেরুল।

গভীর রাত্রে চিংড়িহাটার চেহারা বদলে গেছে। বাড়িগুলো আরও কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে,

মাঝের গলিগুলো আরও সরু, আরও লম্বা হয়ে গেছে। থেকে থেকে বিরাট ষাঁড় দিব্যি নিশ্চিন্তে পথ জুড়ে শুয়ে আছে, অন্ধকারে তাদের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানুষের সাড়া নেই, খালি পথের ধারে ডাস্টবিনের পাশে মড়াখেকো খেঁকী কুকুর পিছনের ঠ্যাঙের ফাঁকে ল্যাজগুঁজে আকাশের দিকে মুখ করে বিশ্রী করে ডাকছে। আকাশে একটু মেঘ, আর চারদিকে অন্ধকার।

এমন সময় শিবু এসে সেখানে পৌঁছল।

মস্ত বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু শিবুর নাড়িনক্ষত্র সব জানা ছিল। পিছন দিক দিয়ে উঠে গিয়ে উঠোনের পাঁচিল টপকে শিবু একগাদা ঘুঁটের উপর পড়ল। সামনে একটা কাঁচের জানলা, তাকে শিক দেওয়া নেই; অন্যদিন এখানে ডালকুত্তা বাঁধা থাকে।

শিবু তখন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করল। বাঁ হাতে একটা আঠা লাগান কাগজের একটা দিক জানালার কাঁচে সেঁটে দিল, তারপর ডান হাতে একটা ন্যাকড়া জড়ান হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা দিতেই কাঁচটা ভেঙে গেল। কোনো আওয়াজ হল না, ভাঙা কাঁচটা কাগজে আটকে ঝুলে রইল। শিবু তখন সেই ফুটো দিয়ে হাত গলিয়ে ছিটকিনি তুলে জানলা খুলে ফেলল আর এক নিমেষে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

একেবারে নিঝুম ঘুটঘুটে অন্ধকার, শিবু খুব সাবধানে এগুতে লাগল। আলোর ঢাকনিটা একটু তুলে দেখল চওড়া শ্বেত পাথরের ছক কাটা বারাণ্ডা, তার এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, তার ধাপে ধাপে খোঁচা খোঁচা কী সব গাছপালা পেতলের হাঁড়িতে বসানো।

জনমানুষের সাড়া নেই।

শিবু উপরে উঠবার জন্য সবে এক পা তুলছে এমন সময় নাকে এল কীসের একটা কেমন চেনা চেনা সোঁদা সোঁদা আঁশটে গন্ধ। শিবু ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখচোখের চেহারা অবধি বদলে গেল। শিকার দেখলে বেড়ালের যেমন হয়।

নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে একেবারে ভাঁড়ার ঘরের সামনে হাজির। দরজায় মস্ত তালা মারা কিন্তু শিকলির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা চোখ-ভোলানো একটা আট সেরি কাতলা মাছ ঝুলে রয়েছে।

শিবুর মন থেকে আর সব কিছু মুছে গেল। এ যে সাত রাজার ধনের বাড়া কাতলা মাছ! শিবু কাতলা মাছের দড়ি কেটে নামিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে সোজা দরজা খুলে, আবার সেটা সযত্নে ভেজিয়ে রেখে, একেবারে সটান তিন নম্বর হোগলাপট্টি।

সিঁড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শুনে শিবুর মা দৌড়ে এসে বলল—"কই, পায়রার ডিমের মতন?" তারপর মাছ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, "অ শিবে! এমনটি পনেরো বছর দেখিনি? সের দশেক হবে নারে?"

বউও জেগেছিল, ধুপধাপ করে দৌড়ে এসে বললে—'পায়রার ডিমের মতন সত্যি?" তারপর মাছ দেখে গালে হাত দিয়ে বলল—"আরে বাবারে! এমনটি যে জন্মে দেখিনি! বড়ো বঁটিটা বের করতে হবে দেখছি!"

শিবু মাছটা তার হাতে দিয়ে বলল—

"তিন ভাগ আমার, এক ভাগ গুপীর। ও খবর এনেছে।"

তাসের ঘর

আশাপূর্ণা দেবী

কথাটা ভুলিল তরঙ্গিণী সকালবেলা কুটনো কুটিতে বসিয়া। মমতা জ্বলন্ত উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল—চাল-ধোওয়ার গামলাটা নিয়ে কুটনো কুটিতে বসেছ ঠাকুরঝি। দাও দিকি চট্ করে।

ঠাকুরঝি কথাটায় কান না দিয়া আঙ্গুলের আগায় যোড়ের সুতা জড়াইতে জড়াইতে কহিল—দাদা কাল কত রাতে বাড়ি এল বউ?

মমতা থমকিয়া কহিল—কই কাল তো আসেননি ভাই। বিয়ে বাড়ির হাঙ্গামে খেয়ে দেয়ে নটার গাড়ি ধরা কী সহজ? ভোরের দিকে একটা ট্রেন আছে বলছিলেন, তাতেই বোধ হয়—

তরঙ্গিণী চোখে মুখে বিস্ময় ফুটাইয়া বলিল—দাদা আসেন নি কাল? বল কী বউ! আমি যে নিজের কানে শুনলাম—

কী শুনলে?

ভারী ভারী গলার আওয়াজ, ভাবলাম ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে বোধহয়। রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে, ফিরে গিয়ে হিমিকে বললাম, 'তোর বাবা বোধহয় বাড়ি এল—নারে হিমি?'

মমতার বড়ো মেয়ে হিমানী কাছে বসিয়া হেঁট মুখে শাক বাছিতেছিল, পিসির কথার উত্তরে সাড়াও দিল না, মুখও তুলিল না।

তাহার পানে এক নজর চাহিয়া অল্প বিরক্তভাবে মমতা বলিল—আজগুবি গল্পগুলি পরে হবে, এখন দাও গামলাটা, ভাতের জল ফুটে গেল।

ভাত সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া তরঙ্গিণী নাছোড়ভাবে কহিল—তা ছাড়া স্পষ্ট দেখলাম যে বউ, ভবানীর ঘরের দেওয়ালে তোমার জানানালা থেকে ছাড়া পড়েছে; দুজন মানুষের ছায়া—নারে হিমি? ও, ও উঠলো কিনা জল খেতে।

বারে বারে কন্যাকে সাক্ষ্য মানায় মমতার হঠাৎ খেয়াল হইল তরঙ্গিণীর ইহা নিছক কৌতূহল মাত্র নয়, খুঁচাইয়া জেরা করিবার মতো। রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যায়।

তবে বোধ করি ভূত দেখে থাকবে ঠাকুরঝি—দেখো রাম নামের মাদুলিটা হারিও না যেন—বলিয়া কঠিন মুখে রুষ্ট হাসি হাসিয়া গামলাখানা উঠাইয়া লইয়া গেল।

তখনকার মতো কথাটা ওইখানেই চাপা পড়িল। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গেলে হয় তো গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু কথাটা 'পাঁচ কান' করিবার ইচ্ছা মমতার ছিল না। তরঙ্গিণীকে বলা আর 'দৈনিক আনন্দবাজারে' ছাপাইয়া দেওয়ার মধ্যে বড়ো বিশেষ প্রভেদ নাই। সময়ই বা কোথা? সেজ দেওয়র আটটায় ভাত খায়, হিমুর স্কুলের 'বাস' আসে সাড়ে আটটায়। তাহার পর, পরে চলিতে থাকে, সাড়ে দশটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না।

স্কুলের ছেলে কয় টাকে চালান করিয়া দিয়া তবে ছুটি, তখনও দুই দণ্ড পা মেলিয়া বসিয়া, চা খাওয়া, জল খাওয়া, গল্পগাছা করা চলিতে পারে।

প্রায় নয়টার সময় তরঙ্গিণীর দাদা সুধাংশু আসিয়া পৌঁছিল।

পকেট হইতে এক তাড়া 'প্রীতিউপহার' বাহির করিয়া ভগ্নির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—তরু, দেতো একটু তেল, নেয়ে নিই। খাওয়া আর হচ্ছে না—যাক দরকারও নেই, যা সাংঘাতিক রাত হল কাল বাপস্! ভদ্রলোকে যায় রেলের রাস্তায় নেমন্তন্নে? রাম বলো! কই গামছা?

আধ মিনিটে স্নান সারিয়া উপরে উঠিয়াই হাঁক পাড়িল—আমার কাপড় কোথা গেল? খোকা—বলতো আমার কাপড় কই?

মমতা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, খোকন, বলতো আলনাতেই তো আছে সরু মুগাপাড় ধুতিখানা—যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, দেখতে পেলে হয়।

লোভ হইল এই ছুতায় উঠিয়া গেলে হয় একবার, প্রায় আঠারো উনিশ ঘন্টা দেখা নাই, বিরহ লাগে বৈকি। কিন্তু লজ্জা করে, অল্প বয়সের চাইতে এখন বেশি বয়সের বাধা আলো দুর্লঙ্ঘ্য।

সুধাংশু অবশ্য ততক্ষণে আর একখানা কাপড় সংগ্রহ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর আর আধ মিনিট ভাতের থালার সামনে একবার বসিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ ব্যক্তিটি রসিক। এই শান্তিপূর্ণ নিরীহ সংসারটির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপর কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সহসা বোধকরি রহস্য প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল—

মমতার ছোটোবোনের ভাসুরপো নিমাই ম্লানমুখে আসিয়া কহিল—বড়ো মাসীমা, মা বললেন আপনাকে এখুনি একবার যেতে—খুড়িমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

মমতা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল—তাই নাকি। কখন থেকে রে নিমাই? খুব বুঝি বেশি কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ বোধহয়। মা পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

মমতার ছোটো বোন সবিতার শ্বশুরবাড়ি এবাড়ি হইতে অধিক দূর নয়। তাহার বড়ো জা ভীরু স্বভাবের লোক, আগেই বলা ছিল সবিতার প্রসবকালে মমতাকে লইয়া যাইবেন।

ভিজা হাত গামছায় মুছিতে মুছিতে মমতা বলিল—তা হলে একখানা রিক্শা ডাক্ না বাবা।

ছোটোকাকা গাড়ি নিয়ে এসেছেন যে। আপনাকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার বাড়ি যাবেন। নিন তাড়াতাড়ি।

মমতা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া কহিল— তাহলে তুমি একবার এদিকে এসো ঠাকুরঝি, সবই হয়ে গেছে, মোটা চালের ভাতটা হবে শুধু, আর চচ্চড়িটা চড়ান রইল নামিও। মা বোধহয় আহ্নিকে বসেছেন, বোলো ব্যাপারটা—কখন ফিরতে পারি বলা যায় না। ভালোয় ভালোয় যাতে হয় তাই বলো—কইরে নিমাই চল বাবা, দুর্গা! দুর্গা!

তরঙ্গিণী ভ্রাতৃবধূর গমন পথের পানে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুট সুরে মন্তব্য করিল—'ঢলানি!'

অথচ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তরঙ্গিণী এমন উক্তি মুখে আনিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

বিজলী ছেলের দুধের বাটী লইতে আসিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বড়দি কোথা গেলেন ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি নিজের জন্য ও মায়ের জন্য দুইটি বড়ো পাথরের গ্লাসে চা ছাঁকিতে ছিলেন, মুখ না তুলিয়া কহিলেন—

এ সংসারে কে কখন আসে যায়, সব খবর তো রাখা দায় মেজবউ! রাখলেও বিপদ।

'ভূত দেখার' উপহাসটা তখনো হজম হয় নাই।

বিজলী কথাটার তাৎপর্য্য না বুঝিলেও দাঁড়াইবার সময় ছিল না, ছেলে কাঁদিতেছে।

সুশীলাবালা আহ্নিকপূজা সারিয়া এতক্ষণে নীচে নামিলেন, তৃষ্ণার্তের মতো পাথরের গ্লাসের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—বড়োবৌমাকে দেখছিনে কেন তরি?

—বাবা, তোমার বড়োবউমার হিসেব দিতে দিতে গেলাম। বোনাই-বাড়ি গিয়েছেন গো, বুনের দেওর আদর করে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন।

সুশীলাবালার নাকি মেয়ের চাইতে বউয়ের উপর টানটা অধিক, এমনি একটা বদনাম ছিল: বিশেষ করিয়া বড়োবউমাকে যে অত্যন্ত সুনজরে দেখিতেন একথা মিথ্যা নয়।

শুধু তিনি বলিয়াই নয়—সদা হাস্যমুখী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণা বধূটিরও যেমন গুণের সীমা ছিল না, তেমনই ঘরে পরে এমন কেহ ছিল না যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারে।

হাসিয়া গল্প করিতে, যত্ন করিয়া খাওয়াইতে, রোগের সেবা করিতে, তাহার জুড়ি ছিল না। লজ্জা সরমের হয়তো একটু কমতি ছিল, কিন্তু তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কাছে 'বেহায়া' নামটা ঘেঁসিতে সাহস পাইত না।

কন্যার রাগে হাসিয়া ফেলিয়া সুশীলাবালা প্রশ্ন করিলেন—তোর তাই হিংসা হচ্ছে না? বোনের ব্যাথা উঠেছে বুঝি? আহা তা যাবে বই কী, কথায় বলে—মা বোন। মা নেই, কাছের গোড়ায় বোন রয়েছে যাবে না?

তবে আর কী, ধেই ধেই করে ছুটতে হবে যার তার সঙ্গে, তোমার আস্কারাতেই গোল্লায় গেল। বুকের পাটা কত।

খালি গ্লাসটা নামাইয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাতা বললেন—অমন কথা বলিসনে তরু, বউমা আমার লক্ষ্মী।

—কাজ নেই অমন লক্ষ্মীতে, লক্ষ্মীর গুণ জানলে আর—তরুঙ্গিণী মুখখানা বাঁকাইল।

অতঃপর 'গুণ জানাজানি' হইয়া গেল, সারাদিন ধরে অপরাধিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতে আলোচনার ঝড় বহিতে থাকিল এবং বিজলী ভিন্ন প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতে কষ্ট হলেও করিতে দ্বিধাবোধ করিল না, বড়োবউয়ের স্বভাব চরিত্র সন্দেহজনক। দুর্ভাগ্যবশত এমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যাহার উপর আর কথা চলে না।

আঠারো বৎসর যাবৎ মমতা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা, সুনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে, মুহূর্তের অবিবেচনায় তাহার ভরাডুবি করিয়া বসিল।

হিমাংশু বউকে সাবধান করিতেছিল—'দিদি, দিদি, করে অত গলে পড়া চলবে না বুঝলে? উনি যদি সাবধান না হন অগত্যা আমাকেই পথ দেখতে হবে।

বিজলী উত্তেজিত হইয়া বলিল, মাগো তোমরা বাড়িশুদ্ধ সব পাগল হয়ে গেলে নাকি? এই কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?

—প্রবৃত্তি হয় না-ই বটে, তবে মেয়েমানুষকে বিশ্বাসও নেই।

বিজলীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—তবে আমাকেও ঘাড় ধরে বিদায় করে দাও না— বিশ্বাস কী, মেয়েমানুষ বৈতো নয়!

দরকার হলে তাও পারি, আমি দাদা নই।

অতিমাত্রায় পত্নীপ্রেমিক বলিয়া সুধাংশুর বরাবরই একটু অখ্যাতি ছিল।

বিজলী বিরক্তি গোপন করিতে পারল না, কহিল—দাদার মতন হলে, তরে যেতে। সে যাক, তোমার বোনটিও তো মেয়ে বই পুরুষ নয়, বিশ্বাস কী? যদি মিথ্যা করে বলে থাকে?

—লাভ তার?

—দিদির ওপর ওর চিরকাল হিংসে।

—কাপড়জামাগুলো হিংসে করে কুড়িয়ে এনেছে বোধ করি?

বিজলীর আর উত্তর জোগায় না।

রহস্যই বটে।

সবিতার আক্কেল দেখ, আজিকার দিন ছাড়া আর দিন পাইল না। দিদি থাকলে বিজলী কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া রহস্যের মূলসূত্র বাহির করিয়া ছাড়িত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। যিনি জট পাকাইবার তিনি বসিয়া বসিয়া পাকাইতেছেন। কে ছাড়াইবে?

সুশীলাবালা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—আমি তখনি জানি ও মেয়ে একদিন কী সর্বনাশ ঘটাবে। মেয়ে মানুষ অত বাচাল! মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প, 'হা হা করে হাঁসি, কে বা জানে আপন, কেবা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, জল খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়েমানুষ অত লোকমজানে হওয়া কী আর সুলক্ষণ?

মমতার ছেলেটার অনেক ভাগ্য তাই ম্যাট্রিক একজামিন দিয়া বড়ো পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। হিমানীর সম্মুখে কেহ 'রাখিয়া ঢাকিয়া' বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিল না।

* * * * *

যাহাকে লইয়া এক তুমুল আন্দোলন, সে বেচারী সারাদিন দুশ্চিন্তায় অনাহারে যমেমানুষে টানাটানি করিবার পর শিশু ও প্রসূতিকে নার্সের হেফাজতে রাখিয়া গঙ্গাস্নানান্তে যখন বাড়ি ফিরিল রাত্রি তখন অনেকটাই হইয়াছে।

স্নানান্তে উহাদের বাড়ি হইতে আহার করিয়া তবে ফিরিবার কথা ছিল, ফিরিবার পথে মমতাই জোর করিয়া বাড়ির দুয়ারে নামিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর উপর সূক্ষ্ম একটু অভিমানের সহিত উৎকণ্ঠাও জাগিতেছিল। নিশ্চিত জানিত সুধাংশু আসিয়া খবরটা শুনিলে, সবিতার বাড়ি ছুটিবে। কী জানি, গত রাত্রের অনিয়মে শরীর ভালো আছে কিনা!

সবিতার সেই ছোটো দেওর পৌঁছাইতে আসিয়াছিল, হাসিয়া কহিল—দেখছেন তো মমতাদি, বাড়িতে আপনাকে কারুরই দরকার নেই। সকলেই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। বেশ হয়েছে, খেতে পারেন না। সারাদিন জলস্পর্শ করলেন না—বউদি ভারী দুঃখিত হবেন কিন্তু।

—রাগ, দুঃখ করতে মানা করো ভাই, আমি একদিন চেয়ে খেয়ে আসবো, সব ভালো লোক।

বাড়ির চাকর আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই নজর পড়িল বাহিরের ঘরে কে ক্যাম্প খাট পাতিয়া শুইয়া আছে। বিস্মৃত হইয়া কহিল—শুয়ে কে রে সুবোধ?

—আজ্ঞে বড়োবাবু।

—বড়োবাবু। সেকি নীচে কেন রে?

কেন তাহা সুবোধও জানে না, বিছানা নামাইয়া আনার হুকুম তামিল করিয়াছে মাত্র। বুদ্ধি খাটাইয়া কহিল—আপনি আসিবেন বলে বোধহয়।

মর্ মুখ পোড়া—মৃদু হাসিয়া ভিজা কাপড়খানা চাকরের হাতে দিয়া মমতা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আন্দাজি শায়িত ব্যক্তির পিঠে হাত রাখিয়া বলিল—আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছ বুঝি? সেই জোগাড়ই হয়ে উঠেছিল আর কী— আসতে দেবে না কিছুতে। আমার তো আবার জানই, রাত্তিরে বুড়োটিকে ছেড়ে থাকতে পারিনে—লোকের ঠাট্টা তামাসায় কান না দিয়ে চলেই এলাম।

সুধাংশু পিঠটা সরাইয়া লইল মাত্র, কথা কহিল না।

মমতা ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—বুড়ো বয়সে অভিমান তো কম নয়। হয়েছে, ওঠ। একবার গেলে না ও বাড়ি—কী কষ্টই পেলে 'সবিটা'—হলেন তো এক মেয়ের 'ঢিপি'—ভোগান্তির এক শেষ।

এত কথার একটিও উত্তর না পাইয়া বিস্মিত মমতা বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর হাতখানা কোলের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহস্বরে বলিল—কী হয়েছে গো, শরীর ভালো নেই?

—বিরক্ত করো না, বাড়ির ভিতর যাও। হাত ছাড়িয়া পিছন ফিরিয়া শুইল সুধাংশু।

মমতা আহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাগের কারণ কী! আপনার লোকের বিপদে আপদে মানুষে যাইতে পাইবে না নাকি?

কিন্তু এ সব মান অভিমানের পালা লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া এ বয়সে খেলো হইবার মতো স্বভাব তো স্বামীর নয়। ব্যাপার কী? আরো কোমল অনুনয়ের স্বরে কহিল—যাচ্ছি, কিন্তু তুমি সত্যিই এখানে শোবে নাকি? ওঠ ঘরে চল।

—ওঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমার সঙ্গে কথা কইবারও নয়, যাও সরে যাও।

অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত শরীরে স্বামীর এরূপ অভূতপূর্ব নিষ্ঠুর আচরণে মমতার চোখে জল আসিল, ধরা পড়তে না দিয়া কহিল—অপরাধটা শুনতে পাই না?

—অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে, তার সঙ্গে তর্ক করবার রুচি আমার নেই। চালাকি শিখেছিলে বটে, তবে শেষরক্ষা হল না।

মমতার এতক্ষণে মনে হইল—তরঙ্গিণীর সকালবেলার জেরার সহিত ইহার সংযোগ থাকতেও পারে। কিন্তু—ছিঃ ছিঃ। মাতালের মতো টলিতে টলিতে উঠিয়া অপরাধের প্রমাণ খুঁজিতে হঠাৎ চোখে পড়িল খাটের পাশে একখানা কাদামাখা অর্দ্ধমলিন খদ্দরের ধুতি ও তদনুরূপ একটি পাঞ্জাবী জড় হইয়া পড়িয়া আছে।...ব্যাধতাড়িত পশুর মতো পুলিশের তাড়া খাইয়া যে ছেলেটা গতরাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য এঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে যে নিজেকে নিরাপদ করতে এক ফাঁকে পরিচ্ছদগুলো বদলাইয়া লইয়াছিল সেই খবরটাই মমতার জানা ছিল না। হয়তো যখন বাহির করিয়া দিবার আগে-কেহ জাগিয়া আছে কিনা দেখিতে গিয়েছিল—

স্তব্ধ অনড় মমতার কেমন করিয়া যে বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল সে কেবল তিনিই জানিলেন, যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া সকলের সুখ দুঃখের হিসাব লইতেছেন।

* * * * *

রুদ্ধশ্বাস বিজলী শুনিতে শুনিতে চমকিয়া বলল, বল কী দিদি, তোমর মামাতো ভাই। বোমার মামলার নেই নিখিলেশ। জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে?

—হ্যাঁ।

বিজলী বড়োজাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কেন তুমি চুপ করে থাকবে দিদি, কেন সবাইকে বলবে না বুঝিয়ে? শুধু শুধু নিজেকে শাস্তি দেবে?

মমতা শুষ্ক হাসি হাসিল—সে কাল হলে বলতাম মেজবউ, আজ আর হয় না।

—কেন হয় না দিদি ধর্ম কি নেই? এই অবিচারটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে?

—তবে চল্ তোকে উকিল খাড়া করে, করযোড়ে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিগে।

—এত দুঃখেও ঠাট্টা-তামাসা আসে দিদি? ধন্যি বটে, ভূতেই পেয়েছে তোমায়, বিনা প্রতিবাদে এই মিথ্যাটা মেনে নেওয়াই কী বুদ্ধির কাজ হল?

—কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সব সময় সহজ নয় মেজ বউ। এতদিন যাকে পরম সত্য বলে জেনে এসেছি, দেখছি কী মিথ্যেই সেটা। আজ যদি মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষতি কী?

—ক্ষতি তোমার মুণ্ডু—হিমুর মা তুমি বিনি দোষে এই অপমানটা লইবে?

—অপমান যা হয় তা আর ফেরে না বিজলী, কী বোঝাব ওদের? যদি বলে — "বিপদে পড়ে এখন একটা গল্প রচনা করে এলে", সে অপমান সইবে না।

বিজলী বোকা, বিজলী অবুঝ, চোখের জল তাহার সস্তা। বলে—তাই কী হয়?

কিন্তু হইবে না কেন, আঠারো বছর ঘর করার পর মমতা সম্বন্ধে যাহাদের একথা বিশ্বাস করতে বাধে নাই, ওটুকু তাদের কাছে বেশি কী?

*   *   *   *   *

যে হতভাগ্য ছেলেটা দুইদণ্ড আশ্রয় লইতে আসিয়া তাহার চিরদিনের আশ্রয় ভাঙিয়া দিয়া গেল, বিজলীর মতো মমতা তাহার উপর রাগ করিতে পারে না।

যে ভঙ্গুর ঘরখানা নিয়তির একটি ফুৎকারে ধুলি গুঁড়ি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মমতার আর মমতা নাই।

যাইবার বেলাতে সুধাংশু বলিয়াছিল—এরকম ভাবে চলে গেলে আমাদের মান, সম্ভ্রম কোথায় থাকবে বুঝতে পারছো?

মমতা উত্তর করিয়াছিল—পারছি, কিন্তু ও জিনিসটা যে শুধু তোমাদের একলারই নেই, সেটাও ভুলতে পারছি না।

—মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হবে তা জানো?

—হয়তো হবে—কিন্তু আমার নয়। এ সংসারের উপর আমার আর কোনো দায় নেই।

মানুষের মন কঠিন হলেও দুর্বল বই কী! সুধাংশুর চোখে জল আসিতে চায় কেন?

—কোথায় যাবে ঠিক করেছ মমতা?

মমতা তাকায় নাই, মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিল—ঠিক কিছু করিনি। এত বড়ো পৃথিবীটায় একটা মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখবো ঠিক করেছি।

পাশের ঘর

আশালতা সিংহ

"মালীকে তুমি বকবে না বলে পণ করেছ নাকি? আজ দু-দিন থেকে আমার ফুলদানিতে বাসি ফুল রয়েছে। একবার চেয়ে দেখে না, এত যে গোলাপ ফুটেছে একটা তোড়াও কোনোদিন বেঁধে দেয় না।" সপ্তদশবর্ষীয়া মালতী চঞ্চল চরণে মায়ের নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিল। রাগে তাহার সুন্দর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বেণী দুলিয়া উঠিতেছে, কর্ণাভরণ ঝিকিমিকি করিতেছে, হাতের চুড়িবালার রিনিঝিনি শব্দ উঠিতেছে। মা মেয়ের ক্রোধে উত্তেজিত অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "রাগিস নে মালু, গোয়ালটা আজ দিনকতক হল ছুটি নিয়েছে। মালীকে দিয়ে আমি গরুর জাবনা কাটাচ্ছি, ঘাস-জল দেওয়াচ্ছি। এই কদিন সে বেচারা বড়ো সময় পায়নি যে ফুলের তোড়ার তল্লাস করবে।"

মালতী কহিল, "ওই ন্যাস্টি গরুর পালের জন্যে তুমি খামকা মালীকে আটকে রাখবে? এদিকে বাবার এত সখের ফুলবাগান, তার দশা যাই হোক না কেন?"

"না রে, ফুলের বাগানের দশা কিছুই হবে না। মালী ছুটি পেলেই জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে রাখে। কিন্তু হ্যাঁ রে, তাও বলি. তোরা কী একটু বাগানের কাজ করতে পারিস নে? পড়িসনি শকুন্তলার কথা, আগেকার দিনে রাজার মেয়েরাও ঝারি-হাতে ফুলের গাছের গোড়ায় জল দিতেন।"

"বিকেলে যে আমার রাজ্যের কাজ, আমার কলেজের টাস্ক আছে, গা-ধোয়া, চুল বাঁধা শেষ হতে না হতেই উর্মিলারা দল বেঁধে আসবে ব্যাড্‌মিন্টন খেলতে। ভদ্রতা আর চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস রয়েছে। তাদের শুধু শুধু ফিরিয়ে দিই কেমন করে। খেলতে খেলতে কত দিন সন্ধে হয়ে যায়। আমার মিউজিকের লেস্‌ন্ নেবার সময় হয়ে আসে। কখন সময় পাই বলো?"

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে পাশের ঘর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মিহি গলায় কে ডাকিল, "মালতী! মালতী!"

"ওই দেখ. মিলি আর উর্মিলা এসেছে। চল্‌লুম। তুমি যেন কুমুদাকে দিয়ে পেয়ালা- চারেক চা আমার বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিও। যত শীগগির হয়।"

মালতী বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।

মিলি উর্মিলা আর লটি ততক্ষণ উর্মিলার ব্লাউজের অভিনব কাঁটছাঁট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মিলি কহিল, "কী করছিলে ভাই এতক্ষণ। যদিও ভদ্রতা নয় তবুও শেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে থেকে তোমাকে ডাকলুম।"

মালতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সরি (Sorry), আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে।"

লটি হাসিয়া উর্মিলার গায়ে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কার কথা ভাবছিলে ভাই? ভাবনায় এত অন্যমনস্ক যে আমাদের ডাক শুনতে পাওনি।"

"কার কথা আবার ভাবব বলো, তোমরা একটা কিছু বানিয়ে না বললে সুখ পাও না।"

"আশা করি আমাদের বানিয়ে বলবার অবসর যেন আর বেশি দিন না থাকে। অচিরে সমস্তই সত্য হয়ে উঠুক।"

"আমরাও তাই আশা করি।"

মালতী উত্তর দিল না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

"ও কি, রাগ করলে নাকি ভাই? আমরা কিন্তু মনে করেছিলুম মিঃ দের অধ্যবসায় এবারে সফল হয়ে আসছে। আমাদের বাড়িতে পার্টিতে তোমার মাও সেদিন এই ধরনের কী একটা চৌধুরী মাসিকে বলছিলেন। আমি আড়ি পেতে শুনেছি।"

এইবারে মালতী কথা কহিল, "আমার মা যা খুশি তার বলতে পারেন, তাঁর ইচ্ছামতো। কিন্তু আমার মনে হয়—"

"তোর কী মনে হয় রে?"—উর্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আমার মনে হয় মেয়েদের জীবনযাত্রায় পুরুষকে যে একান্ত প্রয়োজন এই মনোভাবটাই ভুল।"

"ওরে বাস্ রে, তুই যে মস্ত কথা বল্‌লি। জানি নে বাপু এ-সব কথার উত্তর। তোর মতো আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তাও অতি করি নে আর সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব নিয়েও অত আমরা মাথা ঘামাই নে। কিন্তু দেরি কী, এবার চল্ ব্যাড্‌মিন্টন খেলবি নে?"

মালতী তাহার বন্ধুদের সহিত কথা কহিতেছিল এবং ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। কুমুদার এতক্ষণ চা আনিবার কথা। কিন্তু এখনও আসিল না। আঃ, আজ বিরক্তিতে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিয়াছে।

"আমি এখনই আসছি ভাই, তোমরা দয়া করে একটু অপেক্ষা করো।"

ভিতরে চায়ের তাগাদা দিতে আসিয়া দেখিল, বাবা সেই মাত্র কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটা সোফায় বসিয়া জিরাইয়া লইতেছেন। অদূরে স্টোভে চায়ের জল চড়ানো। মা চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন। কিন্তু দূরে বা নিকটে কোথাও দাসী কুমুদার চিহ্ন অবধি নাই।

মালতী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "কুমুদা কোথায় গেল? মা দেখছি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ঝি-চাকরগুলোকে একেবারে মাটি করে দেবে।"

তাহার মা মিনতি করিয়া কহিলেন, "রাগ করিস নে মা। কুমুদা আজকের মতো ছুটি নিয়েছে। কালীঘাটে তার কী মানত আছে শোধ দিতে গেছে। তুই অনেকক্ষণ চা চেয়ে গেছিস, আমি তখন থেকে ছটফট করছি। কিন্তু তোর বাবা এসে পড়লেন। মানুষটা তেতেপুড়ে এল। জুতো-মোজা খুলে নিলুম, দু-দণ্ড হাওয়া করতে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ওই তো দেখি চায়ের জল ফুটছে, তা তুই এক কাজ করো না মা, ততক্ষণ চা ভিজতে দে। ক পেয়ালা তৈরি করে নে। তোর বাবাকেও এক পেয়ালা দিস্। আমি ততক্ষণ চট্ করে ওঁর জন্যে ডিমের কচুরি কখানা ভেজে নিই।

মালতী অনেক চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, "মা, তোমাদের ভদ্রতাবোধ কী একেবারে নেই? আমার বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এখানে আমি ডিমের কচুরি আর চা করি। আর তারা হাঁ করে কড়িকাঠ গুনতে থাক।"

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির মায়ের সঙ্গে দেখছি বুড়ির একদণ্ড বনে না। কেন তুমি ওকে রাগিয়ে দাও গো। যা যা বুড়ি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগাছা করো গে। তোর মাকে

দিয়ে চা তৈরি করিয়ে আমি দু-মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাহারা রইলুম। একটুও দেরি হতে দেব না।"

মালতী রাগ করিয়া কহিল, "তোমার না থাকতে পারে কিন্তু আমার ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট রয়েছে। দাঁড়াও, আমি ওদের বলে আসছি, আর আমার ছবির এ্যালবামটা বার করে দিয়ে আসছি। ততক্ষণে সেইটে দেখতে দেখতে ওদের সময় কাটবে। আমি এসে চা করছি। কিন্তু বাবা দেখো, আমি বলে দিলুম, ঝি-চাকরকে মা এত প্রশ্রয় দেয় যে শেষ পর্যন্ত সবাইকে বিগড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে না। কুমুদা গেল কালীঘাটে মানত শোধ করতে, কেন গেল? কেনই বা এসব কুসংস্কারকে আমল দেওয়া?"

মালতীর মা এবারে একটু ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন করে বলাতে নেই। কুমুদা দুঃখী মানুষ হলেও তারও তো জীবনে এমন অনেক বিশ্বাস থাকতে পারে যা তার কাছে কুসংস্কার নয়, পরম ধর্ম।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।" মালতী চলিয়া গেল।

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির প্রকৃতিটা একটু অসহিষ্ণু। একটুতেই রেগে ওঠে। কিন্তু রাগলে ওকে চমৎকার দেখায়।"

কচুরি ভাজা শেষ করিয়া একটা প্লেটে সাজাইতে সাজাইতে মালতীর মা কহিলেন, "মিছে নয়, তুমি হাসি-তামাশা করছ বটে, কিন্তু ভয়ে এক এক সময় আমরা হাত-পা ওঠে না।"

"কেন?"

"তোমার ওই মেয়েটির কথা ভেবে। কী আদরই দিয়েছ ওকে, আর কেমন করে মানুষ করলে। আমি শুধু ভাবি মাঝে মাঝে তোমার ওই নাকতোলা মেয়ের বিয়ে হলে কেমন করেই বা সে সুখী হবে, আর কেমন করেই বা পাঁচজনকে সুখী করবে।"

"তোমার এ ভাবনা মিছে। বুড়ির মনটি আসলে খুব কোমল আর স্নেহশীল। আর দেখো আমার মনে চিরকালের একটা ক্ষোভ রয়েছে, বুড়ির বিষয়ে আমি আর কারও কথা শুনব না। ওকে আমার মনের মতো করে মানুষ করব। বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে।"

স্বামীর এ-কথায় গৃহিণীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল, স্বামী প্রথমে ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করেন। আইন পাস করিবার চার-পাঁচ বছর আগেই তাঁহাদের প্রথম কন্যা কমলার জন্ম হয়। কয়েক বছর আদালতে বাহির হইয়া কিছুই যখন সুবিধা হইল না তখন জ্যোতিষচন্দ্র সংকল্প করিলেন বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিবেন। স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ অনেক কথা হইতে লাগিল কিন্তু আসলে তখনও তাঁহার বাবা জীবিত, তাঁহার মতো কোনোমতেই পাওয়া গেল না। তিনি আচারনিষ্ঠ সেকেলে ভাবাপন্ন ছিলেন। অত্যন্ত কড়া, রাশভারী লোক। কিন্তু জ্যোতিষ বাবার কাছে উৎসাহ না পাইয়া স্ত্রীর অলংকার কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহায্যে একরকম জোর করিয়াই ব্যারিস্টারি পড়িতে গেলেন। সেই হইতে পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিবার আগেই তাঁহার বাবা মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু মারা যাইবার আগে তিনি জ্যোতিষের বড়ো মেয়ে কমলার অত্যন্ত অল্প বয়সে খব কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া দিলেন। প্রবাসী জ্যোতিষকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা জানাইলেন না। তাহার মতামত নিলেন না। হয়তো এ তাঁর পুত্রের উপর একপ্রকার প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত কাজই হইয়াছিল। অবশ্য নাতনির বিবাহে তিনি ধুমধাম খরচপত্র করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কুলীন এবং সম্পন্ন বনিয়াদি বংশের ঘরে তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা হইল না। ক্রমশ দেখা গেল সে-পরিবারে বাহিরে ঠাট্-চমকের চেয়ে ঋণের বোঝাই বেশি। যে ছেলেটির সহিত কমলার বিবাহ হয়, সে

বিয়ের সময় আই-এ পড়িতেছিল, কিন্তু কিছুতেই পাস করিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েকবার ফেল করিয়া বাড়িতে আসিয়া বসিল।

জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং রক্তবর্ণ মুখে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে কহিলেন, "এত সামান্য কারণে যে বাবা আমার উপর এমন করে প্রতিশোধ নেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। যদি জানতুম, তাহলে কখনও যেতাম না।"

সেই হইতে কমলার জীবন আর কমলার অদৃষ্ট পিতামাতার মনের উপর ভারের মতো চাপিয়া রহিয়াছে। প্রতিকারহীন বেদনায় তাঁহাদের দিন-রাত্রি নিঃশব্দে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। প্রতিকার করিবার তেমন কিছু ছিল না। কমলার শ্বশুর বিলাত-ফেরত বৈবাহিকের বাড়িতে বধূমাতাকে কখনও পাঠাইতেন না। ম্যালেরিয়ার সময়টাও নয়। ম্যালেরিয়ার সময়ে তাহার এক পাল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লইয়া কমলা জ্বরে জ্বরে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত, এমনি করিয়া ভুগিতে ভুগিতে তাহার দুই-তিনটি ছোটো ছেলেমেয়ে অত্যন্ত অকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পিতামাতার সস্নেহ আগুল আহ্বানে বাপের বাড়ি যাইতে বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পায় নাই। বছর দুই হইল তাহার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। অতটা কড়াকড়ি শাসন আর নাই।

বড়ো মেয়ে অমন করিয়া দূরে চলিয়া গেল, চিরজীবনের জন্য অশেষ দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মাঝে নিমজ্জিত হইয়া রহিল, এই কথা যত মনে পড়িয়া যায়, ছোটো মেয়েটিকে তাহার বাবা ততই আকুল আগ্রহে বুকের মাঝে টানিয়া নেন। মালতীর তাই বাবার কাছে আদরের সীমা নাই। মাও আদর করেন। কিন্তু তাঁহার মনের মাঝে ভবিষ্যৎদর্শী শঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় আছে। তিনি মনে জানেন, মা বাবার কাছে বাপের বাড়িতে যতই আদরযত্ন হোক, মেয়েমানুষের ভাগ্যবিধাতা তাহার ভাগ্যে ঠিক কী যে লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে! আর কমলার জন্য তার মায়েরও মনে দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে দৈবের উপর বিশ্বাস বলিয়া একটা বস্তু জড়িত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে তত তীব্রতর করে না। তিনি এক-এক সময় ভাবেন, 'কমলার অদৃষ্টই অমনি। কে জানে আমাদের হাত থাকলেও হয়তো জীবনে ওর অমনি কষ্টই হত। অদৃষ্ট ছাড়া গতি নেই মেয়েমানুষের।'

জ্যোতিষ অমন করিয়া ভাবিতে পারেন না। তাঁহার বলিষ্ঠ পুরুষ-হৃদয় এই অন্যায়, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রিকে তপ্ত, ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর সেই আতপ্ত রোষ এবং ক্ষোভ হইতে যত মেঘ জমা হয় সে সকলই স্নেহধারারূপে ছোটো মেয়েটিকে অভিষিক্ত করিতে থাকে। হাজার বার তিনি আপন মনে বলেন, 'একে আমি সুখী করব। আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে একে সুখী, আনন্দময়ী করে তুলব।'

* * * * *

পরের দিন—

মালতীর কলেজের 'বাস' বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রস্তুত হইয়া খাতা এবং বই হাতে লইয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াইল। কেবল চুলে একটা সোনার ক্লীপ্ আট্‌কাইয়া লইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরনাধারার মতো তাহার গুন্‌গুন্ গানের সুর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল—

চাঁদিনী রাতে বলো কে গো আসিলে...

পরক্ষণেই তাহার তীক্ষ্ণ তিরস্কারের স্বর শোনা গেল, "মা, মালী কী আজও বাগানের কাজ করেনি? আজ মনিকাদের জন্যে আমার দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে যাবার কথা ছিল। তাকে আমি সকালেই সে-কথা বলেছি। ...নাঃ, তোমাদের ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা এত বিশৃঙ্খল ... আর দেরি করা

আমার পক্ষে অসম্ভব। কী অপ্রস্তুতেই না আমাকে আজ পড়তে হবে।"

মালী একপ্রকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রকাণ্ড দুইটা ফুলের তোড়া আনিয়া বাসে চড়াইয়া দিল। এতক্ষণ সে প্রাণপণে তাড়াতাড়ি করিতেছিল, কিন্তু তবুও কপাল-গুণে খানিকটা দেরি হইয়া গিয়াছে। দিদিমণির কাছে বকুনি খাওয়া তাহার কপালে অনিবার্য।

মালতীর বাবা খাইতে বসিয়াছেন, মা সামনে বসিয়া হাতপাখায় করিয়া মাছি তাড়াইতেছেন। পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—চিট্‌টি!

বেয়ারা চিঠি লইয়া আসিল। জ্যোতিষ হাতমুখ ধুইয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে খামখানা খুলিলেন, পত্রখানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ছিল। সে সমস্ত সংশোধন করিয়া এইরূপ পড়িলেন :

শ্রীহরি সহায়

১২ই আশ্বিন

সাং রসা। পলাশডাঙা

অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদন,

মা, আজ দুই বৎসর হইতে আমার বড়ো ছেলেটিকে লইয়া ভুগিতেছি। তাহার পেটে লিভার ও পিলে দুই প্রকাণ্ড হইয়াছে। এখানে মহকুমা হইতে ডাক্তার আনিয়া অনেকবার দেখাইয়াছি। কোনো ফল পাই নাই। তোমার জামাইও বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। আমার মনে বড়ো সাধ ছিল, কলিকাতায় তোমাদের ওখানে লইয়া গিয়া একবার বড়ো ডাক্তার দেখাই এবং হাওয়া পরিবর্তন করি। কিন্তু জানোই তো তোমার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে একটা দিনের জন্যও যাইবার উপায় ছিল না। তাঁর অবর্তমানে যাইবার উপায় হইয়াছে। ওঁর মতো করাইয়াছি। এখন তোমার একটি ভালো দিন দেখাইয়া লোক পাঠাইলেই আমার যাওয়া হয়। সে বাটীর কুশল সংবাদ অনেক দিন পাই নাই। তুমি ও পিতাঠাকুর মহাশয় আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

সেবিকা কন্যা কমলা।

চিঠি-পড়া শেষ হইয়া গেল। জ্যোতিষ কহিলেন, "আজই কমলাকে আনবার ব্যবস্থা করি।... কিন্তু কে যাবে? আচ্ছা এক কাজ করি, মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দিই, আর জামাইকে লিখে দিই সঙ্গ করে নিয়ে আসুক। এই আশ্বিন মাসে, ওখানে ভরিত ম্যালেরিয়ার সময়। কালবিলম্ব না করে যেন ওরা চলে আসে।"

ইহারই দিন তিন-চার পরে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াগাড়ির মাথায় গুটি-তিন-চার স্টিল ট্রাঙ্কের বাক্স, ছোটোবড়ো গুটিকতক পুঁটলি-পোঁটলা, এক নাগরি খেজুর গুড়, একটা বড়ো চাঙাড়িতে বড়ো বড়ো কদমা বাতাসা এবং আরও বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমেত কমলা তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া পৌঁছাইল। এ-বাড়িতে তাহাকে যেন বে-মানান দেখায়। সে নিজেও বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। দীর্ঘ বারো বৎসর সে পিতৃগৃহে আসে নাই। রাশভারী শ্বশুরের বর্তমানে পিতৃগৃহে যাইবার কল্পনামাত্র তাহার কাছে সুদূর স্বপ্নের মতো ছিল। মালতী দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসল। এই তাহার দিদি। অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু গৌরবর্ণ অত্যন্ত পাণ্ডুর। কৃশ দেহরেখা। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখখানিতে একটি সলজ্জ দীনতার ভাব। পায়ে আলতা। লালপাড়ের একটি সাদা ফরাসডাঙা শাড়ি সাদাসিধা ধরনে পরা। এই বয়সের এমনি অনেক সুন্দরী মেয়েকে মালতী দেখিয়াছে জর্জেট ক্রেপ সিল্ক পরা, উজ্জ্বলতায়, অজস্র হাসি আমাদের বন্যায় ভাসমান। কিন্তু সে সকলের চেয়ে অন্যরকম এই ম্লান দীননয়না তাহার প্রায় অপরিচিতা দিদির পানে একবার চাহিবামাত্র তাহার মনের ভিতর কী রকম করিয়া উঠিল।

সে নামিয়া আসিয়া দিদিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া কমলার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "দিদি, এসো।"

মালতীর পাশের ঘরে তাহার দিদির থাকিবার স্থান হইয়াছে। বহুদিন পরে কমলা আপন পিতৃভবনে আসিয়াছে, তাহাকে তাহার মা-বাবা কত দিন নিজের কাছে পান নাই। তাহার বাবা তাহার প্রতি পিতৃকর্তব্য পালন করিতে পান নাই, তিনি যখন সুদূর বিদেশে ছিলেন তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার কোনো অপাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মা আপনার স্নেহবুভুক্ষিত অন্তরে কত দিন মেয়েকে টানিয়া লইতে পান নাই। তাই এতদিন পরে সে আসাতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে উৎসুক। তেতলায় মস্ত খোলা ছাদ। স্নানের ঘর, পাশাপাশি দুইখানি শয়ন-কক্ষ এবং ঢাকা বারান্দা, তেতলার এই দুইখানি পাশাপাশি ঘরে কমলা ও মালতী থাকে। বারান্দার একাংশে ফুলের টব সাজানো। সেইখানে বসিয়া মালতী কোনো কোনোদিন জ্যোৎস্না উদাস সন্ধ্যায় কোনো নির্জন অপরাহ্নে এস্‌রাজ বাজায়। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ, বনবাণী, মহুয়া পড়ে। বারান্দার অপরাধ কিন্তু সবুজ স্ক্রীন্ দিয়া আড়াল করা। সেখানে কমলার গৃহস্থালি। রাত্রিবেলায় বুঁচিকে উঠাইয়া দিতে হয়, নয়ত প্রায়ই বিছানা নোংরা করিয়া ফেলে। স্বামী বিজয়নাথের আজ মাস ছয় হইতে শক্ত ম্যালেরিয়া হইয়াছে, কুইনাইন পেটে পড়িবামাত্র বমি আরম্ভ হয়। স্ক্রীন্-দেওয়া এই ঢাকা বারান্দায় জলের বালতি, ঘটি গামছা তোয়ালে বেড্‌প্যান সমস্ত সরঞ্জামই রাখিতে হয়।

* * * * *

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। মালতী আপন মনে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ হইতে পড়িতেছিল :

মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
হে মোর স্বপনবিহারী
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।...

শরতের সুনীল আকাশে বহু দূর দিগন্ত অবধি মেঘের লেশ নাই, জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিতেছে। নির্জন কাণ্ডের বাতায়নে বসিয়া তরুণী আপন মনের ঘনায়মান স্বপ্নের অঞ্জন মাখাইয়া পড়িতেছিল "মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।"

তখন পাশের ঘরের একাংশে সংসারের সুখ-দুঃখ লইয়া যে আলোচনা হইতেছিল সেখানে স্বপ্নের ঘোর মাত্র ছিল না। কমলার স্বামী বিজয়নাথ বলিতেছিল, "কালকে মাসের পয়লা, অগস্ত্যযাত্রা যেতে নেই। তার পরের দুটো দিন অশ্লেষা, মঘা, তাও বাদ গেল। তার পর ৪ঠা কার্তিক আমাকে যেতেই হবে।" কমলা নতমুখে কহিল, "কার্তিক মাসে ওখানে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ায় পড়ে আছে সবাই। এ সময়ে ওখানে নাই বা গেলে। তা ছাড়া মা বাবা যখন এত করে বারণ করছেন।"

"তোমার মা বাবার কী বলো, সংসারে কোনো অভাব নাই, অনটন নাই। পাখার হাওয়ার তলায় দিব্যি আছেন। এদিকে আমাদের যে এখনও লাটের কিস্তি যায়নি। জমি-জমা যা ক্ষুদ কুঁড়ো আছে, তাও কী শেষে নীলেম হয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলেই পেট ভরবে?"

কমলা কোনো উত্তর করিতে পারিল না। এমন সময়ে তাহার ছোটো ছেলে কানাই জাগিয়া উঠিল, "মা খিদে।" তাহার আজ সাত আট দিন হইতে খুব জ্বর হইয়াছে। উপবাসে আছে। পথ্যের মধ্যে জলবার্লি আর খইয়ের মণ্ড খাইয়াছে।

"মা, আমি খাব।"

"তুই কী স্বপ্ন দেখছিস কানাই? এই মাঝরাত্রিতে খাবি কী রে, ঘুমো ঘুমো। ওই শোন্ এখনই চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। তোর কী ভয়ডর নেই রে প্রাণে। নে নে, ঘুমো।"

কানাই ততক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিটিমিটি করিয়া বৈদ্যুতিক আলোটার পানে চাহিয়া বলিতেছে, "এখানে চৌকিদারের হাঁক কোথা পাবে। সে তো সেই পলাশডাঙায় হাঁকত। দাও, দাও, আমাকে দাও, সেই তখন পটলা সুজির রুটি খেলে, আমাকে কিছু দাওনি।"

কমলার রাত্রি-জাগরণ ক্লান্ত মৃদু সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী বাবা আমার। সোনা মাণিক আমার।... ঈস গা জ্বরে যেমন আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছে। আবোলতাবোল বকো না বাবা। চুপ করে ঘুমাও।" কিন্তু অবোধ বালকের প্রলাপ তাহাতে লেশমাত্র কমে না।

কমলার স্বামী বিজয়নাথ রাগিয়া গিয়া কহিল, "এই হতভাগা ছেলেগুলোর জ্বালায় রাত্রিবেলায় পর্যন্ত একটু ঘুমোবার জো নেই। মরণ হলে বাঁচি ওদের।"

"বালাই, ষাট। অমন করে বলতে নেই।" কমলা সভয়ে মনে মনে সহস্রবার ঠাকুর- দেবতার নাম লইয়া রুগ্ন বালকের শিয়রে হাত রাখিল।

পাশের ঘরে মালতীর কবিতা-পড়া কখন থামিয়া গিয়াছে। কাল রবিবার, কলেজে যাইবার কিংবা পড়াশোনার তাড়া নাই। তাই সে ভাবিতেছিল, এস্‌রাজটা পাড়িয়া বসিবে কি না, কিন্তু পাশের ঘরের বিচিত্র কলরব তাহাকে আকৃষ্ট করিল। কমলা তখন অশান্ত জ্বরপীড়িত ছেলেকে শান্ত করিতেছে, "ছি বাবা কাঁদে না। বাবা যদি একটু বকে তাহলে কী কাঁদতে হয় ধন। আসলে উনি তোমাকে কত ভালোবাসেন।"

মালতীর মনের উপর দিয়া তাহার দিদির ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দিদি মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন রাত্রিতে ভালো করিয়া ঘুমাইতে পায় না। সকাল হইতে উঠিয়া স্বামীর আর ছেলেদের পরিচর্যা, ছেলেদের নিত্য রোগ। স্বামী অর্ধশিক্ষিত সংকীর্ণমনা। কিন্তু তবুও তার মুখে কী পরিতৃপ্তির আভাস! সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত দিদি নিজের কথা বোধ- হয় এক মিনিটের জন্যও ভাবে না। পাশের ঘরের কথোপকথন শুনিতে আর ভালো লাগে। মনে হয় তাহার সম্পূর্ণ অজানা এক জগতের যবনিকা যেন আস্তে আস্তে উঠিতেছে।

...কমলার স্বামী বিজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ও কি আবার যাচ্ছ কোথায়? এই তো দু-ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে ছেলেটা ঘুমলো, এইবার নিজে একটু ঘুমিয়ে নাও। কতক্ষণই বা ঘুমুতে পাবে, এখনই আবার একটা-না-একটা কেউ উঠে পড়বে।"

"...এখনই আসছি। যাই দেখে আসি একটিবার গিয়ে কুমুদা কেমন আছে। তারও আবার তিন দিন থেকে জ্বর হয়েছিল কিনা। আজই সবে ছেড়েছে। একটু সাবু আর খান দুই পটলভাজা করে দিয়ে এসেছিলুম, দেখে আসি খেতে পেরেছে কি না।"

মালতীর মনে পড়িয়া গেল, বাড়ির দাসী এই কুমুদার যে আবার একটা অস্তিত্ব আছে এমন কথা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। এই কুমুদা একদিন মানত রাখিতে গিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া কালীঘাটে গিয়াছিল ছুটি লইয়া, সেজন্য মায়ের সঙ্গে সে কত কলহ করিয়াছিল। ঝি-চাকরের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া মাকে শুনাইয়াছিল সে লম্বা বক্তৃতা। মালতীর এস্‌রাজ বাজানো আর হইল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দূর তারার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তার দিদি কমলা জীবনে কী পাইয়াছে যে এমন সহজে এত দুঃখ, এত অশান্তি এত খাটুনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে বহন করিয়া চলিতেছে। কোনো অসন্তোষ নাই, মনে কোনো ভার নাই। নিজের কথা সে অহরহ ভাবে না, বরঞ্চ নিজের কথাটাকে অনেকের কথায় অনেকের কল্যাণে একেবারে চাপা

দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। তার দিদির জীবন হইতে প্রতিফলিত হইয়া একটু নূতন আলো যেন তার মনের উপর আসিয়া পড়িল। আসিয়া পড়িয়া অনেক গর্ব অনেক ধারণাকে যেন আস্তে আস্তে গলাইয়া দিয়া ভাঙিয়া গড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে মৃদু গুঞ্জনে তখনও কথাবার্তা চলিতেছে, বিজয়নাথ আস্ফালন করিতেছে, "সৌরিশ সরকারকে আমি দেখাব মজা, বুজলে কমলা। আমাদের বারিত্ পুকুরের সীমানা দিয়ে হেঁটে গেলে আমি তার পা ভাঙব। পুকুরে সরা তো দূরের কথা। মনে নেই, তোমার সাজার উঠোনের এক কাঠা জমি নিয়ে আমাকে কত কথাই না শুনিয়েছিল। বাছাধন টেরটি পাবেন এইবারে দাঁড়াও বাইরে থেকে আসি মুখ হাত ধুয়ে একবার। এসে অমনি শুয়ে পড়ব।"—বিজয়নাথ দরজাটা খুলিল। পাশের ঘর—মালতীর কক্ষ হইতে তখন এস্‌রাজের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী এইবারে এস্‌রাজটা টানিয়া লইয়াছে। বিজয়নাথ মুখ হাত ধুইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিল। রুগ্ন সুপ্ত পুত্রের পাশে বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে কমলা অনেকক্ষণ সেই সুর শুনিল। ক্ষণকালের জন্য তাহাদের মন হইতে বারিত্ পুকুরের সীমানা, সৌরিশ সরকারের স্পর্ধা, এক কাঠা জমি লইয়া মামলা করিবার প্রয়াস সমস্তই মুছিয়া গেল।

বনান্তরাল

হাসিরাশি দেবী

ছোটো কয়েকখানা ঘর...যাকে বস্তিও বলা চলে এবং এইটারই তদারক ক'রে যে মানুষটা ভাড়া খাটিয়ে খায় তার নাম পশুপতি—পশুপতি কর্মকার।

পশুপতির বয়সের অঙ্ক কষা মূর্খতা, তবে দেহটা সবল, সুস্থ ও সম্পূর্ণ। মুখখানা কঠিন, আর ওরই মধ্যে থেকে কোঠরাগত চোখ দুটো এখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে যে, মনে হয় এক নজরেই যেন মানুষের সমস্ত অন্তরটিকে আবিষ্কার করে ফেলবে। অন্তত সে ক্ষমতা ওর আছে।

এই পশুপতির বেশ-বাসের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। সদা সর্বদা গায়ে থাকে একটা হাতকাটা বেনিয়ান, কাঁধে একটা গামছা, পকেটে পান বিড়ির কৌটা—সে আগে লুঙ্গিই পরতো, উপস্থিত পরছে হাপপ্যাণ্ট।

মোটামুটি ভাবে সাজ-পোষাকের বহর ওর এই-ই, কিন্তু বিচার করতে গেলে, প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষটিকে নেহাৎ মন্দ বলা চলে না। কারণ, আশ্রয় সে যাদেরই দিক—কোনোদিন যে তাদের ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি একথা হলফ করে বলবে সবাই।

এ হেন পশুপতি কর্মকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সেদিন যে লোকটি এসে দাঁড়ালো সে তারুণ্যের সীমা অতিক্রম না করলেও, অসুস্থতায় যেন জর্জরিত। চোখে মুখেও যেন একটা অসহায় কাতরতার ভাব। বাইরে থেকেই ও দরোজার কড়া নেড়ে ডাক দিলে :

—"কে আছেন বাড়িতে?...শুনছেন?...ও—"

খোলা জানালাপথে পশুপতির তামাটে বিশ্রী মুখখানা ভেসে ওঠে একবার-তারপর বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে :

—"কাকে-চাই?"

পশুপতির সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটার দিকে তাকায় নবাগত; তারপর একটু কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে বলে :

—"চাই, এ বাড়ির বাড়ি-ওয়ালাকে। খবর পেলাম নাকি ঘর খালি আছে-মানে তাই..."

পশুপতির চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে একবার। বলে—

—"ঘর খালি আছে কিনা, এই তো শুধোচ্ছ? —"

—"আজ্ঞে।"

—"তা আছে। কিন্তু তুমি তো দেখ্‌ছি ভদ্দরলোকের ছেলে। লেখাপড়া কিছু শিখেছো বলে মনে হয়-আর কথা হচ্ছে কী-এখানে খোলার বস্তি। যত সব ছোটোলোকের বাস এখানে!"...

—"ছোটো লোক?—"

লোকটা তাকায় যেন একটা ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপনের ভঙ্গিতে!

কিন্তু সে ভঙ্গি গায়ে না মেখেই একটু উপেক্ষার হাসি হাসে পশুপতি। বলে :

—"হ্যাঁ, তা ছোটোলোক বৈকি! লেখাপড়া না শিখলেই লোকে তাকে ছোটোলোক বলে থাকে। তারপরে, কেউ মিস্তিরী, কেউ কামার, কেউবা ছুতোর।...অনেক জায়গায় অনেক খিটকেল করে তবে পেটের ভাত যোগাতে হয়! কাজেই এসব লোককে ছোটোলোক ছাড়া কী বলা যায়, তুমিই বলো।...কিন্তু সে কথা থাক্-ঘরগুলোও বাসের উপযুক্ত নয়-মাইরি! এঘরে কী তুমি-মানে তোমার মতো নিরীহ মানুষ কী বেঁচে থাকতে পারবে দাদা?—"

কেমন একটা মমতার স্পর্শ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে পশুপতির কণ্ঠে।....

মানুষটিও সচকিত হয়ে ওঠে। কাতর কণ্ঠে বলে :

—"পারবো, খু-উব-পারবোঁ। আর না পারলেও তো আমার আর কোনো ও উপায় নেই। কাজেই—"

নিরুপায়ের যে সমস্যাটা ওর সে কণ্ঠস্বরে মুখর হয়ে উঠতে চায়, পশুপতি তাকে ফিরাতে পারলে না। বললে :

—"বেশ, পার তো এসো। আপত্তির কোনো কারণ নেই, তবে—"

হঠাৎ মুখ তুলে সে প্রশ্ন করলে :—

—"তা হলে ভাই তোমার নামটা?—"

—"নাম!—"

একটুখানি থেমে ও জবাব দিলে :

—"আমার নাম অশ্বিনী, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।"

হাত বাড়িয়ে পশুপতি বাইরের দিক্‌কার একখানা ঘর দেখালে। ঘরখানার ওপোরে খোলার চাল, আর নীচে ছাঁচের বেড়ার ওপোর চুনবালি ধরিয়ে, যার ওপোর চুনকাম কার হয়েছে হালফিল—সেই ঘর।

আলো, আর হাওয়া-হীন ঘরখানা ইঙ্গিতে দেখিয়ে পশুপতি বললে :

—"কিন্তু, ঘর বলতে তো মাত্তর খালি আছে ওইটেই—ওতে হবে তোমার?..."

অশ্বিনীর মুখে নিশ্চিন্ততার আভাষ প্রকাশ পায়। জবাব দেয় :

—"খু-উ-ব। আপনি কিছু ভাববেন না পশুপতিবাবু। ভাড়া আমি ঠিক রেগুলার দিয়ে যাব, ওর জন্যে কিছু গণ্ডগোল হবে না কোনোদিন। তবে কিনা..মেয়েছেলে থাকবে!...."

চিন্তা স্রোতটা যে ওর কোন্‌খানে আঘাত পাচ্ছে তা বুঝতে বিলম্ব হল না—পশুপতির। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে সে বললে....

—"ওঃ-তার কিছু ভাবনা নেই দাদা! মেয়েছেলে, মানে ইজ্জত নিয়ে সব ব্যাটাছেলেকেই ঘর করতে হয়! আর বাইরের ঘর? তাতে হয়েছে কী?—এই পশুপতির বাড়ি এ তল্লাটের কোনো লোক মাথা গলাতে আসবে না এখানে, এ তুমি জেনে রেখ!"—

বুকের ওপোর পেশিবহুল হাত দু'খানা আড়াআড়িভাবে রেখে ও হাসে—রহস্যজনক হাসি।

অশ্বিনী ওর সে হাসির অর্থ বুঝল কিনা, বোঝা গেল না কিছু, কেবল চোখ দুটো একবার মিট্ মিট্ করে বললে :

—"আচ্ছা, আমি তাহলে ওদের নিয়ে আসি এখনি। আপনি যদি দাদা কাইণ্ডলি—মানে ঘরটা খুলে একটু ধুয়ে-টুয়ে..মানে..."

পশুপতি আবার হাসে। বলে :

—"এতে আর দয়ামায়ার সম্বন্ধ কোতায় দাদা? বাড়ি ভাড়া দিয়েই খাচ্ছি—'যকন্...মানে তকন' আর ওসব ক্যানো?...আরে হ্যাঁ..."

সংসার আর সভ্যতার সঙ্গে যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাল ঠুক্‌তে চায় ও।....

অশ্বিনী বার হয়ে যায় চিন্তাক্লিষ্ট মুখে।...

বেশিক্ষণ নয়, বোধহয় আধঘণ্টার মধ্যেই একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে নামে অশ্বিনী। সঙ্গে একটা ঘোমটা টানা মেয়েছেলে, আর একটা টিনের ফুলদার স্যুট্‌কেশ!...

স্যুট্‌কেশটা নিজেই হাতে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল অশ্বিনী।...পেছনে এল বউটা।...

বারান্দায় উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছিল পশুপতি, আর পাশে দাঁড়িয়েছিল যোগমায়া।...

দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, রংটা শ্যাম। ভ্রূ দুটি ললাটের মাঝখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন, কেবল সুগোল মুখখানির মধ্যে সুপুষ্টু অধরোষ্ঠ দুখানিই আকর্ষণীয়। নাকের একপাশে একখানা ওপেল বাঁধানো নাকচাবী, নীচের হাতে সোনার রুলী, গলায় মোটা বিছে, পরণে বিচিত্র পাড়ের ছাপানো শাড়ি।

কর্মকারের বিবাহিতা স্ত্রী সুখদার স্বর্গারোহণ হয়েছে প্রায় বারো বৎসর আগে, আর যোগমায়া এসে পশুপতির ঘর সংসার আলো করেছে মাত্র সাত মাস।"...

সম্বন্ধটা এই রকমই।..তা হলেও পশুপতির ওপোর যোগমায়ার মমতার অন্ত নাই।

নিজের কাঁচাপাকা চুলের ওপোর মাথাটার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে শুধোলে...

—"বাইরের ঘরখানা পর্যন্ত ভাড়া দিলে, তো বন্ধুবান্ধব এলে বসাবে কোতায়?..."

পশুপতি মিট্‌মিটিয়ে হেসে জবাব দিলে :

—"কেন,—শোবার ঘরে!..."

ঠোঁট ওল্টালে যোগমায়া...

—"এঃ -আমি কী যত তোমার ইয়ার বক্‌সিদের সামনে বেরুব নাকি?-ও আমি পারবো না।..."

যোগমায়া আরও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না, দেখলে বিদ্রূপের হাসিতে বঙ্কিম হয়ে উঠেছে পশুপতির ভ্রূ।...

কলতলায়-মানে জল আনতে এসে আলাপ জমে উঠল।

কমল শুধোলে :

—"তা তোমার বাপের বাড়ি কোতায় ভাই?..."

—"বাপের বাড়ি?..."

একটু অন্যমনস্ক হয়েই মেয়েটি জবাব দেয়...

—"সে—অনেক দূর-গাঁয়ে।...বাঁকুড়া জেলায়-কিন্তু সেখানে আমরা থাকিনি কোনোদিন।"

—"কতদিন বে' হয়েচে?..."

—"বছরখানেক হবে।..."

—"আহা! তা বাপ মাকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়!"

—"হুঁ!..."

—"বর কী কাজ করে?"...

এবার এসে দেখা দেয় গুইরামের পরিবার। বলে :

—"সর্‌ সর্‌ তোরা, আমায় জল নিতে দে! একুনি খেয়ে আপিসে যাবে। সর্‌..."

কলসিতে জল ভরা হয়েছিল নবাগতার, কাঁখে উঠিয়ে নিয়েই সে যাকে দেখে মুখের ওপোর ঘোমটা টেনে দিলে, সে আর কেউ নয়, অশ্বিনী। অশ্বিনী বাজার করে ফিরছে;—

একহাতে ওর একটা মস্ত ইলিশ, অন্যহাতে বাজারের ব্যাগ থেকে উঁকি মারছে পুঁইশাকের একপ্রান্ত, আর কুমড়োর ফালির একটুকু।...

ওপাশের বারান্দা থেকে কুড়ুনে হাঁক দেয়—

—"কী দাদা, মাছটা কত হল?..."

চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে অশ্বিনী যে কী উত্তর দিলে, তা ভালো বোঝা গেল না। তার বদলে কোণের ঘর থেকে গর্জন শোনা গেল যোগমায়ার :

—"কী আমার সংসার রে!...এটা আনতে ওটা নেই। আবার আনতে বললেই চোখ রাঙানো! কেন গা বাপু?...আমিইবা এত সইতে যাই কেন? কার জন্যে? পারবো না, এ সংসারে সংসার করতে পারবো না আমি, এই বলে দিচ্ছি!..."

কিন্তু যাকেই উদ্দেশ্য করে সে কথা বলুক, তার তরফ থেকে কোনো জবাব শোনা গেল না।

তাস পেটাতে পেটাতে রাখোহরি শুধোয় :

—"বলি, ঘর তো ভাড়া দিলে, কিন্তু মানুষটা তোমার চেনা তো?"

হুস্ হুস্ করে হাতের মধ্যেকার জ্বলন্ত বিড়িটায় টান দিতে দিতে জবাব দেয় পশুপতি :

—"কেন, কী আবার হল তোর?..."

—"ওই তোমার এক কথা।"

রাখোহরি টেনে টেনে বলে :

—"রাগ ধরে মাইরি। ভালো কথা বলতে গেলেও মন্দ ভেবে নাও তুমি। নেহাৎ তোমায়, মানে একটু ভালোবাসি বলেই ভাবনা হয়! নইলে দুনিয়ায় কে কার তারই ঠিক নেই, তা আবার ভাড়াটের সঙ্গে বাড়িওয়ালার ভাব।..."

—"তা যা বলেচিস্ দাদা,...একখানা কথা!"

টেনে টেনে হাসতে থাকে কমলের স্বামী যষ্ঠী! তারপরে জোরে তাস পিটিয়ে চেঁচায়!

—"লেঃ লেঃ,—খেলবি তো খ্যাল্! আর না খেলিস্ তো উটে যা!..."

নেশাখোর নিতাই তার একথায় চটে ওঠে। বলে :

—"উটে যাব, মাইরি আর কী? ভাড়া দিয়ে তবে একানে থাকে; উট্‌বো বললেই উট্‌বো? আমি উটে গেলেই ঘরখানা বুঝি এসে দখল করবে, কারবারটা মন্দ নয়! এঃ..."

শুয়ে পড়ে সে গান ধরে :

—ও সই, ভামরা তোমার ফুলের বনে—

এ ভোমরা...

তাস্ খেলা চলতে থাকে ওকে বাদ দিয়েই। অবকাশে অবকাশে কথাও চলে নবাগত অশ্বিনীর সম্বন্ধে!

—"কোথায় যেন দেখেছি ওকে।"

—"ঠিক্! আমিও মনে করতে পারছিনে, তবু মুখটা যেন চেনা!..."

—"আর, বউ বলছিল..."

জীবন বলে—"নতুন বিয়ে করেছে, সে, তাই বউয়ের কথায় তার অনন্ত আস্থা।"

উদ্‌গ্রীব বন্ধু মহলকে আর একটু উৎসুক করে তুলে জীবন বলে :

—"বউ বলছিল, অশ্বিনীবাবু লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকে হলে কী হয়—বউটার সম্বন্ধে কেমন কেমন ঠেকে যেন! মনে হয় বিয়ে করা বউ নয় ওর!"

জীবন আর ওর বউয়ের এই আবিষ্কারে সকলে একটু উৎসাহিত-একটু চকিতও হয় বোধকরি। কেবল পশুপতি হাতের বিড়িটাকে আছড়ে ফেলে বলে :

—"দুর শালা!.."

বেলা হয়েছে।...

উনুনে ভাতের হাঁড়িটাকে চাপিয়ে দিয়ে যোগমায়া সবেমাত্র গোটাকুড়ি পানের খিলি সেজে বাটায় তুল্ছে, এমনি সময়ে দরোজার বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা আহ্বান কানে এলো,—

—"ও মা, মাগো!..."

চম্‌কে উঠে তাকালো যোগমায়া; দেখলে, দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীর সঙ্গে আসা সেই মেয়েটা। কপালের কাপড় ওর চোখের ওপোর পর্যন্ত ঢাকা, গায়ে একটা ছেঁড়া সেমিজ, নীচের হাতে শাঁখা। হাত দুখানা মেয়ে ধরেছে ও—সে হাতের মুঠোয় কয়েক আনা পয়সা। বললে :—

—"ওনার জ্বর এসেছে; তাই বললেন, যদি একটু সাবু কী বার্লি আনিয়ে দাও..."

ঘোমটা সরে দেখা যায় অশ্বিনীর বউয়ের উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা।...যোগমায়া দেখে—পশুপতি সেইদিকেই তাকিয়ে আছে..সে তাকানোটা কেমন যেন অসহ্য—বোধহয় যোগমায়ার কাছে। বিকৃত মুখে জবাব দেয় :

—"তা আমার কাছে ক্যানো, আরও তো লোক রয়েচে বাসায়।"

উঠে এসে পশুপতি বলে—

—"তোর এক কতা যোগা, জ্বর এয়েচে, অসুক মানুষটার একটু উবগারে লাগবো না?... ওগো, তুমি পয়সা রেখে যাও—রেখে যাও...ও অশ্বিনীর বউ—"

অশ্বিনীর বউ একটু আশ্চর্য হয়েই ঘোমটার ভেতর থেকে যুগলমূর্তির দিকে তাকায় যেন, কিন্তু পয়সা রেখে যেতে ভোলে না।...

রুদ্ধ আক্রোশে আহত অজগর একটা যেমন ফোঁস ফোঁস শব্দ করে—তেমনি একটা ফোঁশফোঁশানীর আওয়াজ আসছিল অশ্বিনীর ঘর থেকে।...

রাত্রি অনেক।...দূরে, কোথায় যেন কোনো একটা কুকুর চীৎকার করেই চুপ করে গেল। পুলিশের বাঁশীর ধ্বনিও কানে এল একবার—কিন্তু পশুপতি সেদিকে মন দিলে না; দরোজা খুলে বাইরে এসেই সে থমকে দাঁড়িয়েছিল ওই শব্দটা শুনে। কিন্তু আগিয়ে যেতে পারলে না আর। সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রগুলো যেন সংখ্যাতীত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই তাকিয়ে থাকার সঙ্গে জিজ্ঞাসার চিহ্নে আত্মপ্রকাশ করছে সপ্তর্ষির দল। ওরা যেন একযোগে ওর কাছে জানতে চায়—ওই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দের ইতিবৃত্ত! যা আজ কানে আসতেই পশুপতিও কেমন যেন থম্‌কে গেছে! মনে পড়ছে ওমনি করে—হাঁ, ওমনি করে একদিন আর একজনও তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদেছিল।

...সে তার স্ত্রী, যে স্ত্রী হঠাৎ একরাত্রে মারা গিয়েছিল;...লোকে বলেছিল—মরেছে হার্টফেল করে। কিন্তু সে কথা যাক্।...

আজ, আজ অশ্বিনীর বউ কাঁদছে কেন?...তবে, তবে কী! অসম্পূর্ণ একটা প্রশ্ন মনে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে পশুপতি। কিন্তু বাধা পায় তখুনি। পেছন থেকে যোগমায়ার মাংসল বাহু দুখানা ওকে বেঁধে ফেলে কঠিন বন্ধনে। বলে :

—"তবে রে মিন্সে! লুকিয়ে পরের ঘরের পরিবার দ্যাকা! আমি বলি গ্যালো কোতায় আর উনি কিনা..হেঃ হেঃ..." নিষ্ঠুর একটা হাসি অর্ধ পথেই থেকে গেল যোগমায়ার মুখে। ফিরে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতের মুঠিতে যোগার মুখখানা চেপে ধরলে পশুপতি—তারপর তাকে হিড় হিড় করে ঘরে টেনে এনে দরোজা বন্ধ করে দিলে।...

দিন দুই কেটে গেল।...পশুপতির ঘর থেকে যোগমায়ার আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি বটে, কিন্তু বাইরে, অশ্বিনীর ঘরের ফোঁসফোঁসানিটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে।...

বউটার অসুখ। বিছানায় পড়ে সে কাৎরায়। বোধহয় কাঁদেও—তবু কাউকে ডাকে না। পশুপতিও আর এ পথে হাঁটে না—প্রতিবাদীরাও নয়!—

সবাই যেন ওদের এড়িয়ে চলতেই চায়।...

কাজ সেরে দুপুরে ফিরছিল গুইরাম। অশ্বিনীকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে যেতে দেখে—শুধোলে:

—"কোথায় চলেছো অশ্বিনীবাবু?...

অশ্বিনী জবাব দিলে :

—"আর বল কেন ভাই, পরিবারের অসুখ, তাই ডাক্তার ডাকতে।—জেরবার হয়ে মলাম একেবারে। একমাস হল না ঘর ভাড়া নিয়েছি। এরই মধ্যে একেবারে...মানে যাকে বলে..."

হঠাৎ সে ডান হাতখানা মেলে ধরে গুইরামের সামনে; প্রার্থনার সুরে বলে :

—"কিছু আছে ভাই? ধার দিতে পার উপস্থিতের মতো? মাইনেটা পেলেই শোধ দিয়ে দেব!"...

—"ধার?"—

গুইরাম ছেঁড়া পকেট হাতড়িয়ে পাঁচসিকে পয়সা বার করে দেয়। বলে :

—"আর তো নেই।—"

—"না থাক্।"—

চলতে চলতে অশ্বিনী বলে :

—"এখন এতেই হবে।..."

দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে, ক্রমে মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। কেবল ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে গুইরাম। মনে পড়ে ওর-কাল-গত কাল কে যেন ওই লোকটার কাছে পাওনা টাকা চাইতে এসেছিল! তা ছাড়া পথের মোড়ের ওই মুদির দোকানে ওর মাসকাবারের জিনিস এসেছে ধারে-মুদি টাকার কথাটা সেদিন তুলেছিল-গুইরামেরই সামনে।...সমস্ত কথাটা ভাবে গুইরাম।...কিন্তু এর শেষ পায় না। নেকাপড়া জানা নোক, ভদ্দর নোক...কিন্তু, কিন্তু...সমস্ত অন্তরে যেন একটা বিক্ষোভ জাগে।...

ভোর হয়ে এসেছে, শীতের ভোর।...

দরোজার বাইরে থেকে করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপোরে উঠে বসল পশুপতি। তারপরে দরোজা খুলে বার হয়ে এল।...

কিন্তু একী?...চারিদিকে লাল পাগড়ি দেখা যায় কেন? পশুপতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সরে যাবার সুযোগ পায় না। সামনে এসে দাঁড়ায় ওদের বড়োকর্তা। শুধোয় :

—"তোমার নাম পশুপতি কর্মকার—"

—"আজ্ঞে!—"

—"হরিহর সাহু বলে কাউকে ভাড়া রেখেছিলে? তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে-নাম-মীরা গুহ!—"

বিস্মিত পশুপতি জবাব দেয় :

—"কই স্যার? না..."

—"মিথ্যে কথা বল্‌ছো, আমি জানি..."

কর্তা হুম্‌কি দেন। অপ্রস্তুত হয়ে পশুপতি বলে :

—"হুজুরের দিব্যি-মাইরি নয়। তবে অশ্বিনী চৌধুরী বলে একজন ভদ্দর নোক তার পরিবারকে নিয়ে ভাড়া আচেন বটে-ওই ঘরে..."

ঘরখানা আর দেখিয়ে দিতে হল না, বড়োকর্তা নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঘরের দরোজা খোলা-কেউ কোথাও নাই-কেবল কয়েকখানা ছেঁড়া জামা, জুতো আর কাগজের টুক্‌রো এধারে ওধারে ছড়িয়ে সকালের আলোয় পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ক্রমশ।...

গুইরাম বলে :

—"ল্যাও ঠালা! গরিবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে।...তখন বলেছিলুম কিনা..."

যষ্ঠী বলে :...

—"হল তো!"...

কেবল চুপ করে বসে থাকে পশুপতি-আর দূর থেকে হাসতে থাকে যোগমায়ার চোখ-দুটো।...

জীবনের টিপ্পনী কানে আসে। সে বলে :

—"বউ বলেছিল ঠিকই, ও ওর বিয়ে করা বউ নয়। নেকাপড়া জানা মেয়েমানুষ, বউ হয় কখনো?—"

পশুপতির চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে হঠাৎ।...একটা কথা ওর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আসে যেন কিন্তু বলে না। উঠে যায়;—যেতে যেতে শোনে ওরা একযোগে বলছে :

—"দেখতে একদিন পাবই, তখন টাকা আদায় করব কেমন করে তা..."

পশুপতি তা জানে। কিন্তু ভাবে...অশ্বিনী যেই হোক, আর যে অপরাধেই সংসারের শান্তিভঙ্গ করে বেড়াক, সঙ্গিনী সে পেয়েছে তারই যোগ্য। তাই তার নালিশ নেই-কৈফিয়ৎ দেবার নেই কারো কাছে।

কিউ

শান্তি দেবী

কন্ট্রোলের সারিতে আজ তিন দিন কামিনী এসে দাঁড়াচ্ছে. কিন্তু তিন দিনই তার চোখের সামনে দোকানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আতঙ্কের মতো। আজ তিন দিন! কামিনীর পেটে একটা দানা পড়েনি। শুধু কী তারই? জ্বরে ধুকে ধুকে হরিহর পাঁচদিন আগেও কাজে বেরিয়েছে, দু আনা চার আনা যা পেরেছে ঘরে এনেছে তাতে যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে, আর কলের জল খেয়ে তারা তাদের পেটের জ্বালা শান্ত করেছে খানিকটা! ভাগ্যি কলের জলের দাম লাগে না! নইলে—ভাবতেও কামিনীর গলাটা শুকিয়ে ওঠে।

সামনে দিয়ে সিভিক্ গার্ড রুলের গুঁতোয় লাইন ঠিক করে চলে—"এই ঠিক হয়ে দাঁড়াও এধারে।"

কামিনী আর্তস্বরে বলে, "তিনদিন ফিরে গেছি বাবু, আজ চাল পাব তো?"

"সরে দাঁড়াও", গম্ভীর গলায় তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সিভিক গার্ড পরণ পরিচ্ছদে কামিনীর চেয়ে মার্জিত, গয়না-পরা একটি মেয়েকে কামিনীর আগে দাঁড় করিয়ে দিল।

ফিক্ করে হেসে মেয়েটি বলল, "জানতুমই দাদাবাবু যেকালে আছে সেকালে যখনই যাই আমার চাল নেয় কে? তারপর একটু ফিস ফিস করে বলে, "দু সের কিন্তুক আজ দিতে হবে দাদাবাবু, ইন্দুর আবার আজ সেই ব্যথাটা বেড়েছে, তার একসেরও আমার ঠেঁয়ে দিও বুঝলে?" আঁচল থেকে একটা পান বের করে বলে, "খাবে নাকি দাদাবাবু, ভালো জর্দা আছে।"

আপ্যায়িত সিভিক গার্ড মেয়েটির হাত থেকে পান নেয়। সামনে পেছনে সব মেয়েরাই অসহিষ্ণু, অত চাল, তবু তারা সবাই পায় না কেন? এক বুড়ি আর একজনের কানে কানে বলে, "বলি জানিস নাকি? চাল যে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।" অমনি একটা গুঞ্জন ওঠে, "ওমা আমরা সেই কখন থেকে হা পিত্যেশে বসে আছি আর তলে তলে এই কাণ্ড।" একটা দশ বারো বছরের মেয়ে চারদিকে চেয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে অমনি এক বিধবা তার গায়ে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়, "আচ্ছা মেয়েতো, আমি এসেছি সেই কখন আর তুই এখুনি এসে আগে দাঁড়াতে চাস? বলি ও হারামির বেটী—"কথায় কথায় বচসা বাড়ে গোলমালে লাইন থেকে ছিটকে কতক কতক এদিক ওদিক হয়ে যায়, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারীরা মেয়ে বলে রেয়াৎ করে না, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আবার লাইনে এনে সবাইকে দাঁড় করে। হুমকি দিয়ে ওঠে সিভিক গার্ড, "মেয়ে মানুষ হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করো, লজ্জা করে না।?" ছোটো ছেলে কোলে একটা মেয়ে এগিয়ে আসে, "পেটে জ্বালা ধরলে লজ্জা থাকে না বাবু, পুরুষ হয়ে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তোমাদের লজ্জা করে না তো কই।"

"চোপরাও বজ্জাত মাগি", হুঙ্কার দিয়ে ওঠে কর্তব্যপরায়ণ সিভিক গার্ড।

ঠেলাঠেলি আর গলা ধাক্কায় কামিনীর দেহটা যেন ভেঙ্গে পড়তে চায় তবু আজ কামিনী মরিয়া, চাল আজ তার চা....ই। ছেলেটা শুকিয়ে আমসি হয়েছে হরিহর জ্বরে ধুকছে। তাদের দেশটাই না হয় সমুদ্রের কোপে পড়েছিল, সব দেশেই কী আগুন লেগেছে? চাল নেই, ডাল নেই, কেরোসিন নেই, কাপড় নেই, নেই বলতে পোড়াদেশে কী কিছুই নেই? শহরে এসেছিল তারা লোকের কথায়, এখানে নাকি এলেই চাকুরি! আর খুঁটে নিতে পারলেই খাবার অভাব হয় না। এত আর সমুদ্রের লোনা জলে ধোয়া পরিষ্কার গ্রাম নয়—কিন্তু কই? কোথায় খাবার? ময়লা ফেলবার টিনের বেড়াগুলির মধ্যে যে এঁটো পাতাগুলো পড়ে তার মধ্যে পর্যন্ত এক কণা ভাত লেগে থাকে না। কামিনী শুনেছে যে পশু ছাড়া মানুষও ওর থেকে খাবারের কণা সংগ্রহ করে পেট ভরাত। কী যে কাল যুদ্ধ--সেদিন আর নেই!

কামিনীর মনে পড়ল সেইদিনের কথা, পুরো একদিন নয়, এক ঘণ্টাও নয়, কয়েক মুহূর্ত! কয়েক মুহূর্ত যে এমন অঘটন ঘটতে পারে তা কে জানতো? কিন্তু কেউ না জানলে হবে কী? কথায় বলে প্রকৃতির মার। তাই সমুদ্রের জল যখন প্রচণ্ড বাতাসের বেগে ফুলে, ফেঁপে,পাগলা হাতির পালের মতো গর্জন করতে করতে মানুষের সাত পুরুষের ভিটেমাটি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করা ফসলের ক্ষেত, ঘরের পোষা জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি সব নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে গেল, তখন কাপড়ে বাঁধা পরস্পরের দেহ ছুঁয়ে কামিনী আর হরিহর বুঝল তারা বেঁচে আছে, মাটিতে আছে, ভেসে যায়নি। এমন যে বাঁচা! তার পরেও তাদের না হল শোক না হল আনন্দ, কেবল দুজনের মুখের ওপর দুজনের দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল করে ইতস্তত ঘুরতে লাগল। ব্যাপারটা যেন ভেল্কি!

এমন সময় খানিকটা দূরে কী যেন একটা নড়ে উঠল, হরিহরের দিকে চেয়ে কামিনী বলেছিল, "ওমা, ওখানে ওটা কীগো? বড়ো মাছ, টাছ উঠে এসেছে বুঝি?"

কাপড়ের গাঁট খুলতে খুলতে হরিহর বলছিল, "দুত্তোর মাছের নিকুচি করেছে, ভাগ্যি খড়ের গাদাটা ছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম, এমন সময় আবার মাছের সখ দেখ—"

কামিনীর চোখ কিন্তু সেই নড়ন্ত জীবটির দিকেই নিবদ্ধ ছিল, গাঁট খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে গেল, "দেখ এসে কাদের ছেলে যেন—।" এগিয়ে গিয়েছিল হরিহরও, মাছ নয়, কুকুর নয়, বেড়াল নয় কামিনীর দুই বাহুর ওপর সেদিন খাবি খাচ্ছিল একটা অসহায় মানব শিশু। হরিহরের কিন্তু ইচ্ছে ছিল না যে কামিনী ছেলেটাকে রাখে—একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "রেখে দে কামিনী, যাদের ছেলে তারাই নিয়ে যাবে, আমরাই এখন কোথায় যাব তার ঠিক নেই।" সেদিন কামিনী হরিহরের কথা শোনেনি। অসহায় শিশুটিকে নিজের উষ্ণ নিটোল বুকে চেপে ধরে সন্তানহীনা কামিনী সদ্য সন্তান লাভের একটা অনুভূতি অনুভব করেছিল। তারপর দিনের পর দিন তারা মৃত মানুষ আর পশুর ভাসমান অসংখ্য মৃতদেহের ভীষণ একতার মধ্যে দিয়ে, বিষাক্ত গন্ধের মধ্যে দিয়ে এসেছিল অপেক্ষাকৃত জনসঙ্কুল গ্রামে; কতকগুলো দিন তাদের কেটেছিল ভিক্ষা আর মিনতি করে, বিনিময়ে কোথাও সদয় ব্যবহার পেয়েছে কোথাও পেয়েছে নির্দয় নির্মম অবহেলা। তবু নৌকো নিয়ে যে বাবুরা গিয়েছিল তাদের দয়ায় তারা অনেক লোক তখনকার মতো বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে আজ ছয় মাস কামিনীর আর হরিহরের মধ্যে মূর্তিমান বিবাদ ওই ছেলেটি। আহা অতটুকু নিঃসহায় শিশু, হয়ত ওর হতভাগা মা বাপ কোথায় কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে, তাকে কামিনী ফেলে দেবে কোথায়? যদি তার নিজেরই হত! পারত কী হরিহর এমন করে বলতে? তবুও এতদিন যা জুটেছে আগে হরিহরকে দিয়ে পরে যা হয় দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কামিনী—তাও ছেলেটাকে যেটুকু দেয় তাতেই হরিহর চটে যায়, বলে, "হুঁ আপনি শুতে

ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডেকে আন মধ্যখানে শোওয়াই, দেব যেদিন টান মেরে রাস্তায় ফেলে—।" টুকরো টুকরো কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিল কামিনী, সিভিক গার্ডের ধমকানি শোনা যায়, "আরে! এ যে দেখছি কানে শোনে না, এই—চাল নেবার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে নাকি?"

সচকিত হয়ে ওঠে কামিনী, আঁচল পেতে বলে, "হেই বাবা, দয়া করে দুঃখীর দিকে তাকাও।" চুমকি হেসে সিভিক গার্ড আর চাল বিক্রেতা দৃষ্টি বিনিময় করে।

তিন দিন পরে আজ কামিনী চাল পেয়েছে। হোক না তা লাল টকটকে, হোক না অর্দ্ধেক ধান আর ছটাক-খানেক কম, তাতে কী! তবু চাল! তবু তার সৌরভ কামিনীর নাক পর্যন্ত উঠে আসছে। মনে হয় যেন কতদিন কামিনী চাল দেখেনি—একদিন ছিল যেদিন তাদের গোবর মাটি দিয়ে নিকোনো ধব ধবে উঠোনে ধান শুকাত। সিদ্ধ ধানের হাঁড়ি কামিনি নাবাতে পারত না, হরিহরকে ডাকত, "ওগো, একটু ধরবে এসো না, হাঁড়িটা যে বড্ড ভারি—"

হরিহর হাসত, বলত, "ছেলে নেই, পুলে নেই, কার জন্যে যে তুই খেটে মরিস কামিনী! এত চাল করে হবে কী?"

কামিনীও হাসত, মুখটা নীচু করে বলত, "বারে! তুমি না বলেছিলে এবার ধান বেচবো না, চাল করে বেচলে লাভ হবে বেশি; তারপর সেই বাবা বদ্যিনাথের ওখানে গিয়ে ধন্না দেব, আরও যেন কী কী করবে?"

'ওহো।" হো হো করে হেসে উঠত হরিহর, "এসব কথা তো তোর ভুল হয়না কামিনী, যত ভুল বুঝি শুধু আমার বেলাতেই, না?"

অপ্রতিভ কামিনী অকারণেই হয়ত ধান সেদ্ধর ন্যাতাখানা দিয়ে মুখ মুছত বার বার।

চাল! চাল সেকি কম নাড়াচাড়া করেছে? কোথায় গেল সে সব ভোজবাজির মতো মিলিয়ে, এক ফোঁটা খাবার জল শুদ্ধু গ্রামে তাদের ছিল না।

চালের আঁচলটা সাবধানে ধরে কামিনী বস্তিটাতে ঢুকল, এরি একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিয়েছে, পায়রার খোপের মতো একখানা করে ঘরে একটা করে সংসার—প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, সন্তর্পণে কামিনী ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের এককোণে ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, পাশে হরিহর এপাশ ওপাশ কচ্চে। কামিনী ঘরে ঢুকতেই সে খেঁকিয়ে উঠল, "বলি রোজ চাল আনবার নাম করে তুই যাস কোথায় বল দেখি? এদিকে জ্বর গায়ে পড়ে থাকি তার ওপর রেখে যাস ওই কাঁদুনে ছেলেটাকে; তবু দেখছি আজ এখন কাঁদছে না, হু যেন নবাব পুত্তুর, কাঁদলেই অমনি খাবার মুখের কাছে এসে যাবে—বলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চাল পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ", বেশি কথা বলবার সামর্থ্য আর ইচ্ছা কামিনীর নেই। ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে দেখে কামিনী উনুন জ্বালতে গেল। কতকগুলো ডাবের খোলা পানওয়ালার দোকানের সামনে থেকে কুড়িয়ে শুকিয়ে রেখেছিল, তাই দিয়েই কোনো রকমে চাল তার সেদ্ধ হবে।

ভাত চড়িয়ে কামিনী হরিহরের কাছে গিয়ে বসল, একখানা হাত তার কপালে দিয়ে বলল, "জ্বর তো তোমার নেই এখন, মাথা তো ঠাণ্ডা।"

"আরও জ্বর থাকতে বলিস তুই? বলে একদিন উপোষ কল্লে জ্বর পালাতে দিশে পায় না তা তিন তিনটে দিন শুধু জলের ওপর—" তারপর কামিনীর দিকে চেয়ে একটু ক্রুর হাসি হেসে বলে, "জ্বর থাকলেই বোধহয় খুশি হতিশ তুই নয়? দিব্যি গরাসে ভাত তুলে নিজে খেতিস আর তোর সোহাগী ছেলের মুখে দিতিস, কেমন?" উত্তেজনায় হরিহর ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

"চুপ করে শুয়ে থাকত, ভাত হলে আগে তোমার পেট ঠাণ্ডা করো তারপর যা হয়...." বাকি কথাটা কামিনীর গলায় আটকে গেল, শুধু চোখের কোণটা একটু চিক্ চিক্ করে উঠল।

মুখ নীচু করে উনুনের পাশে গিয়ে বসল কামিনী একটা কাঠি হাতে করে। মাটির হাঁড়ি, আর বাঁশের কাঠি, এই তার রান্নার সরঞ্জাম। খান কয়েক শালপাতা ঘরের এক কোণে জড়ো করা হয়েছে, ও হতেই খাবার কাজ চলবে।

ভাত ফুটছে—ফুটন্ত ভাতের ঘ্রাণ ছোট্ট ঘরখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাতের যে এমন সুঘ্রাণ বেরোয় তা আগে হরিহরের জানা ছিল না, প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে দীর্ঘতর করে হরিহর সেই ঘ্রাণ টেনে নিতে লাগল।

"হল ভাত?" তার ধৈর্য্য আর মানে না।

শান্ত স্বরে উত্তর দিল কামিনী, "হল বলে," ভাতের গন্ধে তারও তিন দিনের উপোষী নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

"হল বলে", ভেংচি কেটে হরিহর বলল, "কত দেরি তাই বল্ না?"

হরিহরের কথার মাঝখানেই কামিনী ধপাস করে হাড়িটা নামিয়ে বলল, "বসো।"

শালপাতায় ফেন শুদ্ধ ভাত আর খানিকটা নুন ছড়িয়ে দিয়ে কামিনী এবার ছেলেটার দিকে এগিয়ে চলল। সেই কখন ওই কচি ছেলেটাকে সে রেখে গেছে, একবার ছোঁবারও অবসর পায় নি।

হন্যে কুকুরের মতো একলাফে ভাতের পাতাটার সামনে গিয়ে বসল হরিহর।

"একী!" ছেলেটার গা এমন ঠাণ্ডা কেন গো? ডুকরে উঠল কামিনী শক্ত আর ঠাণ্ডা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

তার দিকে একবার চেয়ে পরম তৃপ্তির আভায় হরিহরের মুখখানা ঝলসে উঠল। তারপর গ্রাসের পর গ্রাস ভাত সে মুখে তুলে দিতে লাগল যেন এবার আর কোনো বাধা নেই সামনে, সে একাই এই ভাতগুলোর অধিকারী।

দুকূলহারা

প্রতিভা বসু

এইবার ঘাবড়ালেন বিন্দুবাসিনী। না, আর বোধহয় থাকা গেলো না। আবার ঢেউ উঠেছে ত্রাসের। শোনা গেছে পাসপোর্ট নামক কী একটা তৈরি হচ্ছে দেশে, আর কেউ পাকিস্তান ছেড়ে যেতে পারবে না হিন্দুস্থান, একেবারে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হিন্দুদের সব গুম্ খুন ক'রে ফেলবে ওরা।

'তাই নাকি?'

'তাই নাকি?'

ভয়ের শিরশিরানি উঠলো পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের মধ্যে। তারপর ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, সব পেরিয়ে দৌড় দৌড় আর দৌড়। মোটঘাট মাথায় নিয়ে কেউ, কেউ দুই ট্যাকে দুই বাচ্চা নিয়ে, কেউ বা একা একা, যে যেখান দিয়ে পারলো ছুটলো। কোনো রকমে সীমানাটুকু পার হ'তে পারলেই হয়। ক্ষ্যাপার মতো, উন্মাদের মতো, শ্বাস টানতে টানতে প্রাণের ভয়ে পালালো সব।

গালে হাত দিয়ে বিমর্ষমুখে বিন্দুবাসিনী ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলেন এখন তিনি কী করবেন? এরপরেও কী থাকা উচিত? কিন্তু যাবেনই বা কোথায়? কে আছে তাঁর? কী আছে? একলা একটা মানুষই তো নয়, তিনি নিজে, বিধবা পুত্রবধূ, আর এমন কপাল যে তার ঘরেও দু-দুটো মেয়ে। একটা জোয়ান ছেলে থাকলেও না-হয় একটা ভরসা ছিলো। এখানে এই বসতবাটিতে বাস করে কিছু কষ্টে তো নেই তারা। নেই নেই করেও লোহার সিন্দুকে সোনা আছে চল্লিশ ভরি, বেনারসি আছে তিনখানা, রুপোর বাসন আছে দুই সেট, তামা কাঁসা পেতলও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। চুনবালি খ'সে গেলেও কেমন রমরমে কোঠাবাড়ি, দালান। পাঁচখানা বড়ো-বড়ো হলের মতো ঘরে আটখানা পালঙ্ক আছে সিংহমুখ পায়ার। বৈঠকখানায় দুটি সিংহাসন-চেয়ার আছে, গালিচা আছে আনন্দে উৎসবে পাতবার জন্য। ঘরজোড়া সতরঞ্চি আছে তিনটি, ফরাসের চাদর আছে, ঝাড়লণ্ঠন আছে, গ্যাসলাইট আছে। কোনো একদিনের স্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতি হ'য়ে তোষাখানার অন্ধকারে শুয়ে আছে তারা। বহাল তবিয়তেই আছে। বিন্দুবাসিনী বছরে তিনবার বার করেন সেগুলো, রোদ্দুরে দেন, ঝাড়েন, পোঁছেন, আবার তুলে রাখেন। একমাত্র পুত্র, বংশের একমাত্র তিলক নীরদবরনের বিয়ের সময় সব ঝাড় জ্বালিয়েছিলেন দেড়শো মোম দিয়ে। সব প্রজাদের খাইয়েছিলেন পরিতুষ্ট ক'রে, গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুস্থানীয়দের জন্যে সিংহাসন-চেয়ার দুটো পাতা হয়েছিলো কার্পেটের উপর। মেয়ের বাড়ির কুটুম্বরা ফরাসের সাদা চাদরে শুয়ে গড়িয়ে আলস্য যাপন ক'রে খুশী হ'য়েছিলো বড়ো ঘরে মেয়ে পড়েছে ব'লে।

তারপর অবিশ্যি সব আলো একদিন নিবে গেল এই বাড়ির। বাপ-বেটা আড়াআড়ি ক'রে মারা গেল এক বছরের মধ্যে। তারপর আরও কাণ্ড ঘটলো দেশ ভাগ হ'য়ে। কালের প্রভাবে তাঁর নিজের শোক যদিবা উপশমিত হল, তবু বিন্দুবাসিনীর মনে হয় এই নতুন আতঙ্ক তার চাইতেও বেশি শোকাবহ। মারামারি, কাটাকাটি, অকারণ ত্রাস, কত কিছুই দেখলেন, গ্রাম শূন্য হ'য়ে গেল চোখের সামনে, ভয়ে ত্রাসে উৎকণ্ঠায় কত দিন কত রাত মুখে ভাত দিতে পারলেন না, রাত্রে ঘুমুতে পারলেন না। উতলা হ'য়ে তল্পিতল্পা গুছোলেন, তারপর মুসলমান প্রজাদের আশ্বাসেই আবার খুলে ফেললেন সব। ভয় যেমন এখানে আছে, তেমন তো যেখানে যাবেন সেখানেও ভয় লেগে থাকবে তাঁর পেছনে? ভয় ছাড়া কোথায় একটি নিরাপদ ঠাঁই অপেক্ষা ক'রে আছে তাঁদের চারটি অসহায় স্ত্রীলোকের জন্য? তবু এখানে নিজের বাড়িতে ঘরেতে, জমিতে জায়গাতে, ছোট্টো তালুকদারির আদায়ে ওয়াশিলে একমাত্র মুসলমানের ভয় ছাড়া আর তো কোনো ভয় নেই। আর মুসলমানের ভয় যে অন্তত তাঁর জীবনে কত অমূলক তার প্রমাণ তো তিনি আজকে পর্যন্তও পাচ্ছেন!

ভেবেচিন্তে, হালচাল দেখে তাঁর প্রজাশ্রেষ্ঠ জামির মিঞাকেই তিনি ডেকে পাঠালেন।

'কী, মা?' জোয়ান শরীরে আভূমি আনত হল জামির।

'জামির, আর তো ভরসা হয় না বাবা। সব তো চ'লে গেল। আমাকে কী করতে বলো তুমি?'

জামির মাথা নীচু ক'রে রইলো, জাবাব দিলো না।

বুকটা কেঁপে উঠলো বিন্দুবাসিনীর। জামির চুপ কেন? জামিরের জোরেই তো ভয়ডর সামলে তিনি টিঁকে আছেন গ্রামে।

'মা', অনেক পরে মুখ তুললো জামির, 'আপনিবরং সন্ধ্যাবেলা সবাইরে ডাকেন একবার। বছির, কালুশেখ, জালালুদ্দিন—'

'কেন, জামির?' বিন্দুবাসিনীর গলা কেঁপে উঠলো, 'তুমিই তো আমার একা একশো, তুমি ছাড়া আর আমার এখানে কী জোর আছে।'

জামিরের ছোটো ছোটো চোখ জলে ভরে উঠলো। এত বড়ো কাঁচা-পাকা বাবরিতে, দাড়িতে একটা ঝাঁকানি দিল সে, 'সব আল্লার মরজি মা। সব আল্লার মরজি। কিন্তু খোদার কসম, আমি কারো কথায় কান দেই নাই, আমার মন আজ পর্যন্ত এতটুকু হেলে নাই, না পয়সার লোভে না তাগো গরম-গরম বক্তৃতা শুইনা।'

বিন্দুবাসিনী স্থির হ'য়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।'

মেহেদিরাঙা দাড়িতে জামির হাত বুলালো। 'মাগো, বাইরে থেইকা যে বড়ো বড়ো মিঞারা সব আইছে দ্যাশে। তারা মারামারি করতে কয়, লুটপাট করতে কয়, কইতে শরম লাগে, কয় যে সব হিন্দু মাইয়ালোকগো ধইরা ধইরা নিকা কর, বুড়া গুঁড়া মানিস না।'

বিন্দুবাসিনীর দাঁতে দাঁত ঠেকলো। বললেন 'তোমরা কী বলো?'

'আমরা?' জামির হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো— 'আমরা আর মাইনষের মধ্যে আছি নাকি? দ্যাশের ভালো ভালো মৌলবিরা পর্যন্ত সেই লগে মাথা লাড়ে। কমু কী! না মা, আপনে চইলাই যান। গ্রামের পনেরো আনি লোকই অরা হাত কইরা ফালাইছে টাকা দিয়া। পারলে আপনে আইজই চইলা যান। যাইট। দিদিমণিরা সব সোমত্ত হইয়া উঠছে, বউমারই বা বয়সটা কী? এই তো সেদিন গুমটা দিয়া আইল এই বাড়িতে।' হাতের পিঠে চোখ মুছলো জামির।

এর পরে আর কার ভরসায় মনকে প্রবোধ দেবেন বিন্দুবাসিনী? সারাদিন সারারাত ধ'রে পুঁটুলি বাঁধলো শাশুড়ি বউ। জামির বললো, 'লইয়া যাইতে দিব না কিছুই। গয়নাগাটি যা পারেন

চাইরজনেই পিন্দা লয়েন শরীরে। আলগা টাকা, জিনিস, সোনা যত কম পারেন সঙ্গে লয়েন। মনে কইরা লন ঐ সব ছাচ কণ্ডেই ফুরাইয়া যাইব।'

ইস্টিশনে কেমন ভিড়, ক'জন মরছে, ক'জন পড়ে থাকছে, ক'জন হেঁটে হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছে সীমানা, কার ট্রাঙ্ক-বাকস ছিনিয়ে রেখেছে বদমাশ পুলিশের লোক— সব কিছুরই একটি ভয়াবহ মর্মান্তিক বিবরণ দিল সে। বললো, 'বুঝছেন মা, আইজকালকার বাজার খারাপ মাইনষেই ছাইয়া গেছে। কী আপনাগো হিন্দু আর কী আমাগো মোছলমান দু-ই সমান। আমার পরানডাও দেইছেই করে এই সব দেইখা শুইনা।'

অতএব দুই নাতনি আর পুত্রবধূ নিয়ে রওনা হলেন বিন্দুবাসিনী। মস্ত মাঠের মধ্যে দুই দিকে দুই দড়ি দিয়ে লম্বা ক'রে যাবার রাস্তা তৈরি ক'রে দিয়েছেন সরকার। হাজার হাজার লোক ঢুকছে সেই দড়ির ফাঁকে। চেপ্টে যাচ্ছে শিশু, চাপা পড়ছে গর্ভবতী স্ত্রীলোক, কারো মাথার ট্রাঙ্কের গুঁতোয় ভেঙে যাচ্ছে আরেকজনের মাথা, ফাঁকে-ফিকিরে কে কার বউ-ঝির শরীরে হাত দিচ্ছে, কোমরে গোঁজা সঙ্গে নেবার নির্দিষ্ট পাথেয়টুকু শুষে নিচ্ছে কেউ, এরই মধ্যে ছেঁচড়ে-মেছড়ে দু'দিনের অস্বাভাবিক কষ্টে প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় পাকিস্তানের মাটি ছেড়ে হিন্দুস্থানের মাটিতে বিন্দুবাসিনী পা রাখলেন। এক, দুই, তিন চার। না। কেউ প'ড়ে থাকেনি বা ম'রে যায়নি। তারপরে গ্রামেরই আরও দশ-বারোটি রিফিউজি পরিবারের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগলেন পাকা সড়ক ধ'রে। দলের সবাই মোটামুটি প্রায় চাষিশ্রেণির। তার মধ্যেই যা ইতরবিশেষ। এরা প্রথমে বনগাঁ ইস্টিশনে এসে তল্পিতল্পা নামিয়ে এক রাত বাস করলো, তার পরের দিন কতকগুলি ভুইফোঁড়ের চোখরাঙানিতে টিকতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে মস্ত এক আমবাগানে এসে থামলো তারা। প্রকাণ্ড চাতাল বাঁধানো জায়গা। কে জানে, সৈন্যদের ছাউনি পড়েছিল হয়ত যুদ্ধের সময়। সেই চাতালেই নামানো হ'ল ছেঁড়া কাঁথা, টিনের স্যুটকেস, লেপ তোশক বালিশ মাদুর। যার যার সামান্যতম পুঁজি। বিন্দুবাসিনীর ট্রাঙ্কটিও নামানো হল সেখানে। নাতনি দু'টি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, পুত্রবধূ বললো 'মা, আর পাবি না।'

বিন্দুবাসিনী বললেন, 'এই তো সবে শুরু।'

সঙ্গের প্রায় সব জিনিসই তিনি খুইয়ে এসেছেন। কোমরের লম্বাটে থলিতে তিনশো টাকা ছিলো তা গেছে, লজ্জার মাথা খেয়ে শাশুড়ি বউ গলায় হার প'রে এসেছিল সতেরো ভরির— তা গেছে, দুই নাতনির হাতে ঢলঢলে ঘোলোগাছা চুড়ি মকরমুখ বালা, কোমরে সোনার পটি, কানে ভারি পার্শি মাকড়ি, গলায় মবচেন— প্রায় কিছু নিয়েই তিনি পৌঁছতে পারেননি হিন্দুস্থানে। অমন সোনার বাড়িঘর, জিনিসপত্র বাসনকোসন খাটপালঙ্ক সবই তো ফেলে এসেছেন কোনো অনিশ্চিতের অন্ধকারে। কেবল সোনাটুকু আনতে চেষ্টা করেছিলেন পথের সম্বল হিসেবে, তাও গেল। সঙ্গে পুরুষ নেই, যে যা বলেছে তাই সই। ভয়ে চকিত হ'য়ে সব খুলে দিয়েছেন বিন্দুবাসিনী। নিক, নিক। প্রাণে বাঁচি তো, মানে বাঁচি তো। কোনোরকমে একবার হিন্দুদের আশ্রয়ে পৌঁছলে আর কীসের ভয়? কত স্বেচ্ছাসেবক, কত দয়ালু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে-সেখানে ছড়ানো। পৌঁছনোমাত্র সব অন্ধকার স্বচ্ছ হ'য়ে যাবে। অতএব কেবল স্ত্রীলোকের বহন করবার যোগ্য ছোট্ট ট্রাঙ্কটিই প্রায় খালি হ'য়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে সীমানা পার হল তাদের সঙ্গে। কী লাভ।

'আমার কাকা তো আছেন কলকাতা ঝামাপুকুর লেনে, তাঁদের একটা খবর পাঠালে কী আমাদের নিয়ে যান না এসে?' উত্তরা চোখের কোণ আঁচল দিয়ে মুছলো। বিন্দুবাসিনী বললেন, 'চিঠি তো তিনখানা লিখেছিলে, জবাব দিল কই?'

তা তো সত্যিই। কতবার কত বিপদের কথাই তো জানিয়েছে উত্তরা, একবারও তো তাকে আহ্বান করেননি তিনি। রিফিউজিদের কে ঠাঁই দিতে চায়।

কান্নাভাসা মুখ আঁচলে ঢেকে বউ চাতালের সিমেন্টেই গা ঢেলে দিলো। মিলু বুলুর মুখে কথা নেই। ভয়ে লজ্জায় অসম্ভ্রমে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তারা। বিন্দুবাসিনী মন শক্ত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন কী উপায় করা যায়। মাথাটা ঘুরে উঠলো, তিনিও চাতালে শুলেন।

সন্ধে হ'য়ে এলো। কার্তিকের হিম নামলো বাগানে। খোলা মাঠে শরীরে নামলো বরফের স্রোত।

বারোটি পরিবারের গড়পড়তা চার বারো আটচল্লিশটি বাচ্চা সেঁটে রইলো— মেয়েদের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। শিশুরা স্তন টেনে টেনে শুকনো চামড়া ছিঁড়ে দিল। স্ত্রী-পুরুষের শ্রান্ত ক্লান্ত সারাদিনের অনাহারক্লিষ্ট একেকটি দেহ একেকটি কাটা গাছের মতো ধড়াস ধড়াস পড়ে গেল মাটিতে।

'এর চেয়ে বাড়িতে থেকে আমাদের মরাও ভালো ছিলো মা', বউ আবার ফুঁপিয়ে উঠলো নির্ঘুম চোখে। অনেক রাত্রিতে ছোটো নাতনি দশ বছরের তাজা মেয়ে বুলু গুটিগুটি এগিয়ে এলো ঠাকুমার কাছে। দুই হাতে তাকে বুকের উত্তাপে টেনে নিতে গিয়ে চমকে উঠলেন তিনি— 'এ কী! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। ইশ! নিশ্বাস যে আগুন।' ভয়ে ত্রাসে বুলুর মা উঠে বসলো গায়ে আঁচল জড়িয়ে। ও-পাশে মিলু ঘুমুতে ঘুমুতে এগিয়ে গেছে কার বিছানার কাছে, অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে তাকে টেনে আনতে গিয়ে অনুভব করলো এগিয়ে যায়নি; কে যেন আস্তে আস্তে ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে নিচ্ছে কাছে। হাতের সঙ্গে-হাত ঠেকে হঠাৎ একটি রূঢ় কড়া পুরুষ-হাত আঁতকে স'রে মিশে গেল ঘন অন্ধকারে। কেঁপে উঠেউত্তরা মেয়েকে সাপটে কাছে টেনে নিয়ে এলো।

পরের দিন সকালে রিলিফের লোকেরা এলো। লিখে নিলো নাম, ধাম, ঠিকানা। প্রত্যেক শিশুকে দুই ছটাক দুধ দিলো, সাবালকদের দিলো চিঁড়ে-গুড়। আশ্বাস দিলো কেউ, কেউ ধমকালো, কেউ কেমন কেমন চোখে তাকালো। বিন্দুবাসিনী আর তার বউ ও দুই মেয়ে নিয়ে ভিক্ষুকের মতো পাত্র হাতে গ্রহণ করলো সেই আহার্য।

সারাদিন জ্বরে ধুঁকলো বুলু, সারাদিন কেঁদে কেঁদে নাকমুখ ফুলিয়ে ফেললো মিলু, অন্যান্য সহযাত্রীরা তারই মধ্যে যার যার জায়গায় খড়ি দিয়ে তার তার সীমানা এঁকে হাঁড়ি-কড়া নিয়ে সংসার পাতলো। ছেলেপুলেরা সারা আমবাগান মুখরিত করলো খেলাধুলোর আনন্দে, মেয়েরা উকুন বাছতে লাগলো পরস্পরের, কেউ কেউ কাঠকুটো কুড়িয়ে খিচুড়ি বসালো। ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে তাদের বড়ো বড়ো ছেলেরা কিম্বা স্বামীরা খোঁজ-খাঁজ ক'রে চাল ডাল কিনে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। পুরুষেরা বেরুলো কাজকর্মের সন্ধানে। রিফিউজি সার্টিফিকেট নেয়া আছে, তারা যে ক্যামফো মেরে আসেনি সেই কথা প্রমাণ আছে, আছে ছাড়পত্রের যোগাড়, চাষী ব'লে সরকারের কাছে চাষের জমির আবেদন, আরও কত কী! কেউবা এর মধ্যে ঘরামির কাজে গিয়ে বহাল হল দ্বিগুণ রোজায়, কোনো জোয়ান মেয়ে হঠাৎ কোনো বাড়ির ঠিকের কাজ পেয়ে গেল, ছোটো ছোটো ছেলেগুলো পানের দোকানে বিড়ির দোকানে ঘুরতে লাগলো ফুটফরমায়েসের আশায়, ছেঁড়া-ফ্রক উকুনমাথা ছোটো মেয়েগুলো ভিক্ষে করতে বেরুলো পথে। কেবল বিন্দুবাসিনীই খুঁজে পেলেন না কোনো পন্থা।

আবার রাত হল, আবার সকাল, আবার রিলিফের লোক, আবার সেই চিঁড়ে-গুড় আর দুই ছটাক নীলচে দুধ সরকারের। তারই মধ্যে একটুখানি এই যা তফাৎ যে মোটাসোটা, সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু, পরনে খদ্দর, কাছাছাড়াগেরুয়া চাদর গায়ে এক সন্ন্যাসী ভদ্রলোকও এসেছেন সঙ্গে। প্রশান্ত চোখে তাকালেন সকলের দিকে, আস্তে আস্তে করুণ হ'য়ে এলো তাঁর চোখ। ঝুঁকে প'ড়ে মোহাচ্ছন্ন বুলুকে স্পর্শ করলেন, তারপর জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ ক'রে মাথা নাড়লেন। আর এইটুকু সহানুভূতিতেই বিন্দুবাসিনীর চোখ সজল হ'য়ে এলো। শোনা গেল রিফিউজিদের সুখ-সুবিধের

জন্যেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেবাধর্মই তাঁর ব্রত। একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছেন এজন্যে। বউ বলল, 'মা, ওঁকে আমাদের কথা বললে হয় না?'

বিন্দুবাসিনীও সে বিষয়েই চিন্তা করছিলেন। নাতনির জ্বরতপ্ত মাথাটি তার মার কোলের উপর রেখে আস্তে আস্তে তিনি উঠলেন।

একটু নিভৃতে গিয়েই বললেন সব কথা। চোখ বুজে ভদ্রলোক শুনলেন সব মনোযোগ দিয়ে। পরের দিনই বেলা দু'টোর সময় একখানা জিপ এসে দাঁড়ালো আমতলার কাঁচা রাস্তায়, এক ঝাঁক শিশু আর পুরুষ দৌড়ে গিয়ে ভিড় করলো সেখানে। কী জানি কী নতুন আলো, নতুন আশা বহন ক'রে এনেছে এই গাড়ি কে জানে। বুলু তখন হেঁচকি টানছে নিঃশ্বাসের কষ্টে, চোখ মুছে বিন্দুবাসিনী আর উত্তরা দুই মেয়ে নিয়ে উঠে বসলো সেই গাড়িতে।

সূর্য পশ্চিমে হেললো, দুরন্ত জিপ বনগাঁয়ের আম জাম জারুলে ঢাকা মসৃণ পিচের রাস্তা বেয়ে দু'পাশের নীচু জমিতে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ভুট্টার জঙ্গল পেছনে ফেলে কলকাতা পৌঁছুল। আশ্রমটি একেবারে নিরালা নিভৃত একটি কোণে। স্থানটি কলকাতার কোন্ অংশ কে জানে, গঙ্গা একেবারে দেড় হাত দূরে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। মিষ্টি একটি হাওয়ার ঝাপটা লাগলো চোখে মুখে।

'এই আমার আশ্রম,' সন্ন্যাসী ভদ্রলোক বিনয়ে অবনত হলেন, 'দেখুন ভালো লাগে কিনা। কয়েকদিন কাটান, তারপর সুযোগ-সুবিধে মতো—'

বিন্দুবাসিনী কৃতজ্ঞচোখে তাকালেন শুধু। কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না তাঁর। নাতনিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বিছানা পেতে শুইয়ে দিলেন, কাতর হ'য়ে এক ফোঁটা ওষুধ প্রার্থনা করলেন। 'নিশ্চয়'— ভদ্রলোক তখুনি নিয়ে এলেন ডাক্তার, টিপে-টুপে মাথা নেড়ে ওষুধ দিলেন তিনি।

কত কষ্টের পর একটুখানি আরাম, আমতলার নিরাশ্রয় মাঠের বদলে এমন সুন্দর দালান-কোঠা বাড়ি। ওইটুকু আয়াসেই হাজার দুর্ভাবনা সত্ত্বেও অধিক রাত্তিরে বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এলো একটু শাশুড়ি বউয়ের চোখে। আর ঘুম ভাঙলো কাক ডাকলে। দু'জনেই উঠে বসলো ধড়মড়িয়ে, দু'জনই একসঙ্গে হাত রাখলো বুলুর বুকে। নিঃস্পন্দ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে সে। না, আর কোনো কষ্ট নেই তার, কোনো উত্তাপ নেই, কোনো যন্ত্রণা নেই। মহানিদ্রা শান্তি দিয়েছে তাকে। উত্তরা আর্তনাদ করে উঠলো, চকিতে ঘুম ছুটে উঠে বসলো মিলু, বিন্দুবাসিনী জানালা দিয়ে ভোরের আকাশে তাকালেন।

দিন সাতেক পরে কেশবানন্দ বললেন— এখানে সেই সন্ন্যাসী ভদ্রলোককে সকলেই এই নামে ডাকে— 'এই নিন আপনার ইয়ারিং বিক্রির পঁচিশ টাকা। কিন্তু এই সামান্য টাকাতে আর ক'দিন চলবে। তার চেয়ে আপনার বউমাকে কোনো একটা কাজে ভর্তি করে দিন।'

বুদ্ধি তো ভালোই, কিন্তু ও কী কাজ করবে? ও কী লেখাপড়া জানে? একটু ইতস্তত ক'রে বিন্দুবাসিনী বললেন, 'ঘরসংসার করা ছাড়া ও তো আর কিছু—'

'তাই তো! সেসব কাজের কথাই তো আমি বলতে চাইছি। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর দু'টি মা-হারা মেয়ের জন্য কোনো একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা চাইছিলেন উনি—'

'ঝি! ঝিয়ের কাজ। ছি—'

'না, না, তা কেন? গবর্নেস্। ইংরিজিতে গবর্নেস্ বলে। অত্যন্ত শিক্ষিত মেয়েরাই কলকাতা শহরে এসব কাজ করেন। কেননা মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, ভদ্রতা-সভ্যতা, আদবকায়দা— এসবই তো শেখাতে হয় তাঁদের।'

তবু বিন্দুবাসিনীর দ্বিধা কাটলো না।

উত্তরা লাফিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, মা, কিছু আপত্তি করবেন না আপনি। এ কাজ আমি নেবো।'

'শেষে কী তুমি—' বিন্দুবাসিনীর গলা ভেঙে এলো, উত্তরা বললো, 'আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করছেন। কাজ ক'রে মাইনে নেবো তাতে কী সম্মান যায়? এখানে এভাবে, এমন নিঃসম্বল হয়ে আর ক'দিন থাকতে পারবো আমরা?'

তা তো সত্যিই। এর উপরে আর বলবার কী থাকতে পারে?

দু'দিন পরে কেশবানন্দ সব ঠিকঠাক ক'রে উত্তরাকে নিয়ে গেলেন কাজে ভর্তি ক'রে দিতে। ফিরে এলেন একা একা।

'একা যে? বউমা? বউমা কই?' বিন্দুবাসিনী ছুটে এলেন।

'বউমা রইলেন। আজ থেকেই লেগে গেলেন কাজে। খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর কাজ। মাইনে অতি চমৎকার! আপাতত পঁচাত্তর, একমাস পরে আরও দশ টাকা বাড়িয়ে দেবেন বললেন। আপনি কিছু ভাববেন না মা, একটুও মন খারাপ করবেন না— এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারতো?'

'বিন্দুবাসিনী মুখ নীচু ক'রে রইলেন।

'এই যে, এই নিন,' হঠাৎ মনে পড়লো। গেরুয়ার আঁচল থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু আগাম নিয়ে এলাম।'

'আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো'— বিমনা বিন্দুবাসিনী হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে নিতে বললেন। চোদ্দ বছরের ভরা যৌবন বাড়ন্ত মিলু কাছে এসে দাঁড়ালো— 'মার ঠিকানা কী?'

ঈষৎ থমকালেন কেশবানন্দ, তারপর সহাস্যে বললেন, 'বড্ড মন কেমন করছে, না? আচ্ছা দাঁড়াও—' একটু চিন্তা ক'রে— 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি পর্শু কি তর্শু নাগাদ হয় তোমার মাকে নিয়ে আসবো এখানে নয় তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো। গাড়িটা চ'ড়ে টুক্ ক'রে যাবে আর আসবে, তারপর ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে শুয়ে রাত্তিরে সব বলবে, আর ঠাকুমা তখন আমার আশ্রয় ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে, নিজের জন্য নতুন বাড়ির খোঁজে লেগে যাবেন।' নিজের রসিকতায় নিজেই উদার গলায় হেসে উঠলেন। বিন্দুবাসিনীও হাসলেন একটু।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলেন কেশবানন্দ, 'আমি বলবো কী মা, কর্তাটি চমৎকার। বউমা সুখে থাকবেন। ওঁর বাপের বয়সী ভদ্রলোক তো।'

তা বাপের বয়সী বৈকী। রাজীবলোচন সরকার তো আজকের লোক নন। এই কেশবানন্দই তো তাঁর কাছে এ কাজ করছে আজ ষোলো বছর। ডান হাত বাঁ হাত। ঢুকেছিলো যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে চুল পাকালো। মাঝেমাঝে পেছন ফিরে তাকায় কেশব। মা নেই, বাপ নেই, জ্যাঠার অন্নে প্রতিপালিত সচ্চরিত্র অনাথ বালক। লেখাপড়ায় পরিষ্কার মাথা, বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ। কিন্তু কী লাভ হ'তো সেই চরিত্র নিয়ে গ্রন্থকীট হ'য়ে বেঁচে থেকে? দু'মুঠো অন্নের জন্য তো দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হ'তো? বাজে!

রাজীবলোচন উদ্ধার করেছেন তাকে, সুখের রাস্তা বাৎলে দিয়েছেন। ঢুকেছিলো সামান্যতম কর্মচারি হ'য়ে চব্বিশ টাকা মাইনেতে! আর আজ? কেশবানন্দ কোথায়? ব্যাঙ্কে যার লক্ষ টাকা জমা আছে, যার অবলাবান্ধব সমিতির আয়ই মাসে দু'হাজার টাকা, সরকারি সাহায্য যার হাতের মুঠোয়। চোরাকারবারের প্রসিদ্ধ ধনী রাজীবলোচনের যে প্রধানতম— প্রধানতম কী?

এখানে এসে কুট্ ক'রে একটা পিঁপড়ের কামড় লাগে বিবেকে। সহসা কত ভয়, কত ত্রাস, কত চোখের জল ছবি হ'য়ে ভেসে ওঠে চোখে। আশ্চর্য! ওখানে গিয়েই যেন কী বুঝে ফেলে ওরা। তাকিয়া ঠেস দেওয়া কর্তার অসম্বৃত সিলকের লুঙ্গি আর হাতকাটা গেঞ্জি দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে পর্দা ধ'রে, আর সেদিকে তাকিয়ে কর্তা, যাকে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই কেশবানন্দের নিত্যি নতুন শরীর যোগান দিতে হয়, তার চোখ আতুর হ'য়ে ওঠে লোভে।

রেফিউজিরা এসেই আরও সুবিধে হয়েছে। অভাব কী? বোকাগুলো! বাঙালগুলো! ওদের ভোলাতে যদি এক দাঁতের বুদ্ধিও খরচ করতে হয়! একটু মিষ্টি কথা বললেই কেমন নির্ভর ক'রে বিশ্বাস করে, উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কেমন পায়ে পায়ে চলে আসে নতুন আশায় আলোকিত হ'য়ে। মূঢ়! নির্বোধ! এদের তো এই-ই হবে। এই-ই হওয়া উচিত।

এই তো উত্তরা। একত্রিশ বছরের আঁটোসাঁটো জোয়ান মেয়ে। কালো হ'লে কী হয়? কী সুন্দর, কী লাবণ্য, যেন উনিশ বছরের যুবতী। এলো তো? অচেনা ব'লে কতটুকু দ্বিধা করলো সে? বাঁ হাতে চোখের জল মুছে ডান হাতে বাবা ব'লে হাত ধরলো অনায়াসে। আর কেশবানন্দ? রেফিউজিদের যিনি ত্রাণকর্তা, আশ্রয়দাতা, কেমন অকাতরে আহুতি দিয়ে এলো তাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন সরকারের কামনার যজ্ঞে। বাঘের মুখে ভয়ার্ত হরিণের দৃষ্টি কে কবে দেখেছে? কিন্তু তা যে কেমন কেশবানন্দ তা জানে।

পরের দিন সকালে কেশবানন্দ অপিসঘরে গিয়ে পারাবত ফিল্‌ম কোম্পানিতে বন্ধু শশিশেখরকে জরুরি ফোন করলো। আর দুপুরেই সে টেরি বাগিয়ে পান খেয়ে ভয়েলের পাঞ্জাবি গায়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ছুটে এলো অবলাবান্ধব সমিতিতে। পারাবত ফিল্‌মে সে মেয়ে জোগাড় করে। দরজা ভেজিয়ে মুখোমুখিচেয়াবে বসিয়ে কেশবানন্দ বললো, 'তোমাদের "বাস্তুহারার বেদনা"র নায়িকা পেয়েছ?'

'আর শালা নায়িকা। কচি খুকি জোগাড় করতে দম বেরিয়ে গেল আমার। সবে যুবতী, গোলাপসুন্দরী এখন কোথায় পাই বলো দেখি?'

'আমি দিতে পারি।'

'মাইরি?'

'কিন্তু শর্ত আছে অনেক। শোনো—' খুব নীচু গলায় একটি একটি ক'রে সব শর্ত শোনালো সে। শশিশেখর বললো, 'বহুৎ আচ্ছা, মেয়ে দেখাও।'

দেখা হ'লো মেয়ে, শশিশেখর লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল।

তার পরের দিন মিলুর কাছে তার মাকে দেখাতে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন কেশবানন্দ। বিন্দুবাসিনী বললেন, 'বউমাকে একদিন নিয়ে আসবার কথা বলবেন দয়া করে।'

'নিশ্চয়ই। দেখুন না আজই নিয়ে আসি কিনা। একটুও অস্থির হবেন না আপনি। ভয় কী? ভাবনা কী? আমি তো আছি।'

জামরঙের তাঁতের শাড়ি পরা, কালো চুলে ঘেরা ফর্সা ফুটফুটে মুখ নাতনীর দিকে তাকিয়ে জলভরা চোখে বিন্দুবাসিনী অস্ফুটে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

হুস ক'রে খোলা জিপ গলি ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় এসে পড়লো। বেলা দশটার কলকাতা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মিছিল, লক্ষ লক্ষ যানবাহনের স্রোত, হাঁ হ'য়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো মিলু। কত বেঁকলো, কত ঘুরলো,কত অলিগলির প্যাঁচ খুলতে খুলতে এক সময় চমক ভাঙলো তার। গাড়ি থেমেছে, নামতে হবে। কিন্তু এ কী! এ কী অদ্ভুত ধরনের চোরাগলির অন্ধকার। জরাজীর্ণ বাড়িগুলো কঙ্কালের মতো হাঁ ক'রে আছে দু'পাশে। কাঁচা নর্দমার পচা গন্ধ উঠছে থেকে থেকে। এখানে, এই বীভৎস রাস্তায় থাকেন নাকি তার মা? বুকটা যেন কেঁপে উঠলো আতঙ্কে।

রাস্তা থেকে কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, চোরের মতো পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সেই সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে উপরে এলেন কেশবানন্দ। সরু, নোংরা, পানের পিক্ ফেলা চিক ঘেরা রেলিংওলা লম্বা বারান্দা, বারান্দা ঘিরে একটার পর একটা ঘর। একদম শেষের ঘরে এসে ঢুকলো তারা। হন্তদন্ত হ'য়ে বিছানা থেকে উঠে বসলো এলোমেলো শশিশেখর।

'আরে এসো, এসো, বোসো, বোসো।' কোমরে কাপড় আঁটলো সে। মিলু শিহরিত হলো। 'মা। মা কই।' গলায় যেন কান্না ফুটে বেরুলো তার।

'তুমি বোসো, আমি এখুনি ডেকে আনছি মাকে।' কেশবানন্দ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, ত্রস্তহাতে তৎক্ষণাৎ ঘরের খিল এঁটে দিল শশিশেখর। মিলু ভয়ে ছুটে এলো দরজার কাছে। শশিশেখর সহাস্যে ডান হাতের মুঠোয় তার আর্তনাদ-উদ্যত মুখটি চেপে ধ'রে বাঁ হাতের আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে এলো বুকের কাছে।

কাল থেকে মিলুকে রাখবার জন্যই এই পাড়ায় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। কিছুকাল তার ট্রেনিং পিরিয়ড চলবে তো। বিষদাঁত না ভেঙে, কান্না না থামিয়ে এইসব বুনো জংলি দিয়ে তো কাজ হবে না? তিন দিনে এ পাড়ার স্ত্রীলোকেরা ঠিক করে দেবে ওকে। এমন কত কত সতী দেখেছে শশিশেখর, কয়েক দিনেই সব টিট্। সব শেয়ালের এক রা।

ততক্ষণে আশায় আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন বিন্দুবাসিনী। কে জানে মেয়ের সঙ্গে তার মা-ও হয়তো আসবে। একবার ঘরে গেলেন, একবার বাইরে এলেন, ছাতে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যতদূর দৃষ্টি চলে। নাতনী ফিরে না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই তাঁর।

আর ওদিকে পুরো বেগে জিপ চালিয়ে ছুটে আসতে আসতে কেশবানন্দ ভাবলেন, সব ব্যবস্থাই খুব ভালো হ'লো, এখন বুড়িটাকে কোনোমতে বিদায় করতে পারলেই হাতের ময়লা ঝাড়তে পারি। মা আর মেয়ের জন্যই ওই বাহুল্যটাকে ন'দিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হল।

আশ্রমে এসেই দরাজ গলায় ডাক ছাড়লেন, 'কই, মা কই? শিগ্গির চলুন।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন বিন্দুবাসিনী— 'কোথায়?'

'আপনার বউমার কাছে, আর কোথায়। মায়ায় পড়ে বুড়ো বয়সে আমারও কম শাস্তি হয়নি।' প্রশান্তমুখে হাসলেন তিনি।

'বউমার কাছে?'

'মেয়েকে তো ছাড়লেনই না, না খাইয়ে, মাকেও চাই। বুড়ো কর্তা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন নিয়ে আসুন মার যখন মর্জি। আমি ভেবেছিলুম নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে সসম্মানে একদিন নিয়ে আসবো, তা আজ না-হয় অমনিই আসুন। ভালোই হল। আপনিও বাড়িঘর লোকজন সব দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হোন। তাছাড়া আর একটা সুবিধের প্রস্তাবও করেছেন সেই ভদ্রলোক। মস্ত বাড়ি তো, উনি বললেন তাঁর গাড়ি রাখার উপরের ঘরটা যদি পছন্দ করেন আপনি তা হলে সেটা উনি ছেড়ে দিতে পারেন বিনা ভাড়ায়।'

বিন্দুবাসিনী আর দেরি করলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন গাড়িতে। পেছনে বসতে যাচ্ছিলেন, কেশবানন্দ বললেন, 'সামনেই বসুন না, আবার এক্ষুনি তো নামতে হবে, এসব গাড়িতে নামাওঠায় যে কষ্ট।'

বেলা এগারটার ঝলমলে রোদ্দুরে আবার ছুটলো খাকি রঙের জিপ। লম্বা লম্বা রাস্তা পেছনে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললো। কী বিরাট শহর কলকাতা। কী অগণিত জনস্রোত। প্রথমটা বিন্দুবাসিনী তাঁর নাতনীর মতোই হাঁ ক'রে দেখতে লাগলেন, শেষে ক্লান্ত শরীরে পিঠে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রা এলো। আস্তে আস্তে গাড়ি শহরের রাস্তা ছাড়িয়ে লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে চ'লে এলো। আরও অনেক মাইল ডিঙিয়ে ঝোপঝাড় জঙ্গল কত কিছু পেরিয়ে কোনো এক নির্জন প্রান্তরে এসে তারপর মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠলো একটু। হঠাৎ বিন্দুবাসিনীর তন্দ্রাচ্ছন্ন আলগা শরীরে যেন ধাক্কা দিলে কে। চলন্ত গাড়ি থেকে অত জোরে ছিট্‌কে প'ড়ে যেতে যেতে বাঁচবার আশায় আকুল আগ্রহে হাত বাড়ালেন তিনি কেশবের দিকে, একটি অস্ফুট প্রার্থনাও ফুটলো হয়তো, কিন্তু বোঁ বোঁ শব্দে মোড় ফিরে চরম শক্তিতে কোথায় কতদূরে ধুলো উড়িয়ে

মিলিয়ে গেল গাড়ি। মস্ত একখণ্ড পাথরের উপর এসে আছড়ে পড়লো তাঁর কাঁচাপাকা চুলে ভরা সুডোল মাথাটি, ভারি শরীর মাটিতে লুটোলো। এক ঝলক কাঁচা রক্ত রঙিন ক'রে দিলে সেই বহুকালের ধূলিধূসরিত তামাটে পাথর। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বিন্দুবাসিনী কাকে দেখলেন। স্বামীকে? ছেলেকে? সদ্যমৃত নাতনীকে? কাকে? কে? কে এসে দাঁড়ালো তাঁর মৃত্যুশিয়রে? তবে তারা কই? তাঁর বউমা? উত্তরা? তাঁর বুকের মানিক, চোখের আলো একমাত্র নাতনী মিলু, মৃণালিনী! কোথায়? কতদূরে! কতদূরে তাদের ফেলে যাচ্ছেন তিনি।

রোদ বাড়লো, তেজ বাড়লো, আকাশের মাঝখান থেকে রঞ্জনরশ্মি ফেললো জ্বলন্ত সূর্য। পাথরের বালিশে মাথা রেখে মাটির বিছানায় শুয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইলো বিন্দুবাসিনীর সুগঠিত সুঠাম দেহ। অনেক, অনেক বেলায়। কত দূরের কোনো গ্রাম থেকে একটা নেড়ি কুকুর এসে শুঁকতে লাগলো তাঁকে। আর তারও অনেক পরে, যখন সূর্য পাটে নামলো তখন সারি সারি পিঁপড়েরা বেরিয়ে এলো রক্তের গন্ধ পেয়ে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। দেখতে দেখতে বিন্দুবাসিনীর নাকে মুখে চোখে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তারা।

জতুগৃহ

সুলেখা দাশগুপ্ত

একটা বাড়ি বদল করা কি চাট্টিখানি কথা। স্বামী-স্ত্রী দুটো মানুষ হিমশিম খেয়ে গেল। খাট পালঙ্ক খোলো, টানো, নামাও। বইপত্তর। বোঝাই করো ঠেলায়। আবার নামাও এসে নতুন বাড়ির দরজায়। সাজাও। গোছাও। পাতো।

এ তো হল শেষের পর্ব। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর। তখন গোছ গাছ করে হাত পা টান করে শুয়ে পড়তে পারো। এর পূর্ব পর্ব আরো সাংঘাতিক—অর্থাৎ কিনা বাড়ি খোঁজা।

রিপন স্ট্রিট আসতে বাধা দিয়েছিল আত্মীয় বন্ধু সবাই। অঞ্চলটা নাকি ভালো নয়। ভালো মন্দ বিচার করতে গেলে কী ওদের চলে? বন্যার জল যেমন তরতর করে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, পূব বাঙ্গলার মানুষ, ওরাও তেমনি প্লাবনের মতো এসে; প্লাবনেরই মতো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। যে যেখানে মাথা গোঁজবার মতো জায়গা পেয়েছে সেখানেই মাথা গুঁজেছে। বন মানেনি। জঙ্গল মানেনি। মুসলমান পাড়া, খ্রিস্টান পাড়া বাছেনি। স্থান অস্থান বিচার করেনি। বাস করা তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পর যে সব পল্লিতে কলকাতার বাঙ্গালি সমাজ পা ফেলতে চায় না ভয়ে, সে সব স্থানেও নির্ভয়ে নরেশবাবু যোগেশবাবুর দল এসে পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

হেমন্তও তার ছোট্ট সংসারটা নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে রিপন স্ট্রিটের এই ম্যানসন বাড়ির এক ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল, যার বেশির ভাগ বাসিন্দেই হলো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নয়ত খ্রিস্টান, পার্শি, সিন্ধি, গোয়ানীজ।

ভারী খুশি সুমনা। দোতলা ফ্ল্যাট। বড়ো বড়ো দুটো ঘর। রাস্তার উপর দিব্যি একটা ঝোলানো বারান্দা। স্নানের ঘর আর রান্নাঘর—তা যতই ছোটো হোক বন্দোবস্তটা প্রায় রাজসিক। নয়ত কি—সিমেন্ট বাঁধানো উনোনে দাঁড়িয়ে রাঁধার ব্যবস্থা। বাথরুমে বেসিন! অকল্পনীয়। ভাড়া একশ টাকা। আনন্দে ঘুর ঘুর করে সুমনা বলে, বালিগঞ্জে ভবানীপুরে হলে এমনি একটা বাড়ির ভাড়া হতো দু'শ, না গো? বলে, জান, আমরা থাকতে জানিনে মোটেই। দেখছ, এরা কেমন থাকতে জানে সুন্দর ভাবে। যেন চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে!

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সুমনা। দরজা জানালায় সুন্দর সুন্দর রং বেরংএর পর্দা। ফুলদানীতে ফুল। মাতা মেরি আর যিশুর মূর্তি সবার ঘরে। সে সব মূর্তির সামনে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অনির্বাণ আলো জ্বলে। ডিনারের পর শিশুকণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসে। অদ্ভুত একটা করুণ সুর দুলতে থাকে বাইরের অন্ধকারে। সুর চেনে না, শব্দ বোঝে না, তুব কেন জানি মনে হয় সুমনার, কথাগুলো ওর বড়ো চেনা। 'প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে—' এই কথাগুলোই যেন বলছে সুরটা।

সেও ফুল রাখে। লেসের পর্দা টানায়। মাঝের বড়ো হল ঘরটাকে এ্যাংলো পরিবারগুলোর মতই বসবার ঘর করে, আবার খাবার ঘরও করে। একদিকে সোফা কৌচ সাজিয়ে, আর একদিকে খাওয়ার জন্যে টেবিল চেয়ার পাতে।

বোনরা বলে, সুমনা তুই একেবারেই ট্যাস হয়ে গিয়েছিস। আমাদের মেয়েরা খেতে পারে বসবার ঘরে বসে!

তবু তো তারা জানে না ছেলে মেয়ের জন্য নাইট গাউন তৈরি করিয়ে এনেছে সুমনা। শোবার আগে দিনের পোষাক বদলে তাদের নাইট গাউন পরিয়ে দেয়। হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দুহাত জোড় করে প্রার্থনাও করায়, 'হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের সব চাইতে বড়ো বন্ধু হও। আমাদের সারথী হও। আমরা যেন ভালো ভাবি, ভালো করি, ভালো হই।' এখান থেকে কথা নিয়ে শব্দ নিয়ে প্রার্থনাটা নিজেই তৈরি করে নিয়েছে সুমনা।

হেমন্ত হাসে। বলে, এবার মাসিরা এলে বলতে হবে।

সুমনা গ্রাহ্য করে না। প্রার্থনা ওর ভীষণ ভালো লাগে। বলে, যার যেটা ভালো নেব না কেন! প্রার্থনার মতো কিছু আছে নাকি? রবীন্দ্রনাথ রোজ প্রার্থনা করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ করতেন—

—ওঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন। আমাদের যেমন পূজা ওঁদের তেমনি প্রার্থনা।

—গান্ধিজি? তিনি তো ব্রাহ্ম ছিলেন না। খ্রিস্টানও নয়, তবে তিনি প্রার্থনা করতেন কেন রোজ?

তুমি করো? মিটিমিটি হাসে হেমন্ত।

করি ই—তো। যেন চটে জবাব দিচ্ছে এমনি ভাবে কথাটা বললেও সত্যি প্রার্থনা সুমনাও করে। অবশ্যি ছেলেমেয়ের মতো হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নয়, শোবার আগে মনে মনে—'হে করুণাময় ঈশ্বর আমি যেন ভালো ভাবি, ভালো করি, ভালো হই।'

হেমন্তর আমোদ উপভোগ করা গণ্যই করল না সুমনা। বলল, তোমারও করা উচিত।

এখানে এসে একটা ব্যাপারেই সুমনা যা মুশকিলে বা বেকায়দায় পড়ে গেল তা ওই কথা বলা নিয়ে। ওকি ইংরেজি বলতে পারে? না, হিন্দী জানে! মেমগুলো টুকিটাকি কাজ করতে করতে ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখ রড়লে হাসে। হাসে সুমনাও। বাস্ ওই পর্যন্ত। ভাষার অভাবে আর এগোনো যায় না। কিন্তু ছোটোদের বন্ধুত্ব গড়তে ভাষা অন্তরায় হয় না। ছেলে মেয়ে দিলীপ মিমি দিব্যি জমিয়ে নিল ফ্ল্যাটগুলোর সমবয়সীদের সঙ্গে। ভাষার অসুবিধা এতটুকু বোধ করলে না ওরা। হিন্দি ইংরেজি বাংলার জগা খিচুড়ি ভাষায়, আলাপ হলো, পরিচয় হলো, ঝগড়া হলো, প্রীতি হল। তেতলার ম্যাক আর পিটার দুভাই আর দোতলার ওদের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের জেনেভার সঙ্গে ভাব জমে গেল সব চাইতে বেশি।

ওরা এসে সুর করে ডাক দেয়, মি...ই...মী, ডি...ই...লীপ। মিমি দিলীপ বেরিয়ে আসে। চলতে চলতে মিমি বলে, তোমরা আমাদের নাম ঠিক মতো বলতে পারো না কেন? অমন সুর করে ডাকো কেন? দাদার না কী ডিলীপ? দিলীপ তো। তারপর অমনি সুর করে ডাকা ওদেরও এসে গেল। ম্যাককে ম্যা...এ্যা...ক, পিটারকে পি...ই...টার, জেনেভাকে জে...এ...নেভা বলে মাঝে শব্দটা ভেঙে সুর করে টেনে ডাকতে শিখল ওরাও।

ম্যানসন বাড়ির বিশাল ছাদে বাতে ফোলা পা নিয়ে থপ্‌থপ্ করে বুড়ো মেমগুলো হেলে দুই হাঁটে—স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে। ছোটোরা দড়ি লাফায়। দৌড়োদৌড়ি করে। দিলীপ মিমিদের দলটিরও খেলার জায়গা এটা। কিন্তু আজ এদের খেলা জমেনি। কথা জমেনি। ছাদ প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। এখনও আলো আছে বটে কিন্তু এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে। ছাদের কোণ ঘেঁষে শুস্ক মুখে বন্ধু ম্যাককে ঘিরে করুণ মুখে বসে আছে ওরা। ম্যাককে ওর বাবা আজ নির্দয় মার

মেরেছে। ওর নাকটা ফুলে উঠেছে। পিঠে চাবুকের লম্বা লম্বা দাগ বসে গেছে লাল হয়ে। ম্যাকের ছোটো ভাই পিটার বিমর্ষ হয়ে বসে আছে ম্যাকের পিঠ ঘেঁষে। ওর জন্যই তো ম্যাক মার খেল। ও টেবিলে জল ফেলেছিল বলে ডাডি ওকেই তো মারতে এসেছিলেন। ম্যাক ডাডির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলেই না ডাডি—

হঠাৎ ম্যাকের ভীষণ হিংস্র কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল ছোটো ছোটো মুখগুলো।

ওই রাস্‌কেলটাকে আমি গুলি করব। ম্যাক একটা ইয়ইয় একবার দূরে ফিকছিল কাছে টানছিল নিবিষ্ট মনে। সেটা পকেটে ভারতে ভরতে ফের দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওকে আমি গুলি করব।

কাকে?

বাবাকে।

বাবাকে!!

হ্যাঁ, ওই ধুমসো মোষটাকে।

বাবাকে অমন ভাবে বলতে হয় না ম্যাক। করুণ কণ্ঠ মিমির।

বাবা না হাতি। আমাদের বাবা এটা নয়। বাবা হলে কি এভাবে মারে। ফোলা নাকটা দেখাল ম্যাক। জামা তুলে চামড়া কেটে বসে যাওয়া চাবুকের দাগ দেখাল। বলল, দিয়েছি আমিও মোষটার হাত মুচড়ে। কাল হাত ঝুলিয়ে অফিসে যেতে হবে।

এতক্ষণে কিছুটা আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল ম্যাকের চোখে মুখে।

বিভ্রান্ত কণ্ঠে মিমি বলল, তবে তোমরা ওকে বাবা ডাকো কেন?

ডাকি মাটা ওকে আবার বিয়ে করেছে যে।

মিমি ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইল ম্যাকের দিকে।

দিলীপ কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাবা কবে কোথায়?

সেটাও একটা হোঁৎকা মেয়েকে বিয়ে করেছে। আর এই শুয়োরটাকে বিয়ে করেছে মাটা। আমাদের নিয়ে রোজ ঝগড়া করে মার সঙ্গে। হাতিটা আমাদের তাড়াতে চায়। ফুঁসতে থাকে ম্যাক।...চলে যেতাম, শুধু পিটারটার জন্য যেতে পারছিনে—

ভেতরটা যেন মোচড়াতে থাকে মিমির। ছাদের চারদিকে তাকায় সে—অন্ধকার হয়ে আসছে। দূর আকাশে সন্ধ্যা তারাটা জ্বলজ্বল করছে...শ্লেট রং আকাশে গোটা কয় মোটা মোটা সোনা গলানো দাগ...জেনেভার দিকে তাকালো—

জেনেভা বলছে, তোমার বাবা লোকটা মোটেই ভালো নয়। আমার বাবা কিন্তু খুব ভালো। আমাকে ভালবাসে। আদর করে। কত কি এনে দেয়...

ফুঃ—জেনেভাকে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল ম্যাক। বললো, ওই কিছুদিন অমনি মধুর ব্যবহার করবে। সবে তো তোর ম্যাকে সে দিন বিয়ে করে নিয়ে এলো। আমাদের সঙ্গে ও মোষটা প্রথম প্রথম ভালো ব্যবহারই করেছে। থাক না কিছু দিন। তারপর তোরও আমাদের মতই অবস্থা হবে।

ঢোক গিলল দিলীপ: তোমাদের কারু আপন বাবা নয়?

কেঁদে ফেলল মিমি। দিলীপের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল দাদা নীচে চল।

বিরক্ত মুখে হাত ঝট্‌কা দিল দিলীপ ঃ দাঁড়া না।

না, দাঁড়াব না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে, চোখ কচলাতে কচলাতে নীচে ছুটে চলল মিমি। ঘরে ঢুকে সুমনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল মা, তুমি আর বিয়ে করবে না। কখনো বিয়ে করবে না...আমরা এ বাবার কাছে থাকব।

বলে কি মেয়ে! হতভম্ব হয়ে গেল সুমনা।

হেসে উঠল হেমন্ত হো হো করে। ব্যাপারটা সে আঁচ করতে পেরেছে।

সুমনা মেয়ের মুখটা তুলতে চেষ্টা করতে করতে বলল, ছিঃ ছিঃ এসব কি কথাবার্তা! মার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয়—ছিঃ ছিঃ।

কে কার কথা শোনে। মিমির পরিত্রাহি প্রাণ বেরিয়ে আসা চিৎকারে ঘুরের দেয়াল ফাটতে লাগল।

হাসতে হাসতে হাতের বই রেখে উঠে এলো হেমন্ত। মেয়েকে কোলের কাছে টেনে এনে মেয়ের ঘামে আর চোখের জলে ভেজা লাল মুখটা আদর করে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, না না, তোমার মা করতে চাইলেই আমরা সহজে রাজী হব কেন। দুষ্টু চোখে তাকাল হেমন্ত সুমনার দিকে।

বাঃ! ছেলেমেয়ের সঙ্গে মাকে নিয়ে কি অপূর্ব ঠাট্টা। মার সম্মান নইলে উথলে উঠবে কি করে। মেয়ের হাত ধরে একটা ক্রুদ্ধ টান দিল সুমনা: এ সব কথা কোথায় শুনে এলে বল—

মার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে আসবার অভিনয় করতে করতে মেয়েকে বুকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে হাসতে লাগল হেমন্ত।

ক্রুদ্ধভাবে সুমনা বলল, দাঁড়াও তোমাদের ছাদে যাওয়া আমি বন্ধ করছি। মাগো, একি জায়গা গো।...তারপর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক ছাড়ল ঃ দিলীপ...

ছেলের কাছে সব শুনে গুম্ হয়ে রইল সুমনা। রাত্রে বিছানায় গা দিয়ে প্রথম কথাই বলল সে স্বামীকে, এ বাড়ি ছেড়ে দেবো আমি।

—পাগল আর কাকে বলে!

—পাগল হলাম কিসে শুনি?

—পাগলামো নয়? এমনি বাড়ি এ ভাড়ায় পাব কোথায়?

—এমনি বাড়ি আমি চাইনে। মন্দ বাড়িতেই থাকব আমি।

—আচ্ছা মুশকিল! এজন্য কেউ বাড়ি-বদল করে!

করে। ছেলেমেয়েকে ভালো শিক্ষা দিতে হলে সব থেকে আগে দরকার তাদের ভালো পরিবেশে রাখা।—তুমি এ কথা মান না!

—তা মানি।

—তবে?

—বাড়ি পাওয়া কি কঠিন—এতো তোমার না জানা নয়।

—এর চাইতেও কঠিন কাজ সন্তানের জন্যে আমাদের করতে হয়।

পাশ ফিরল হেমন্ত; স্ত্রীকে সাদরে হাতের বেড়ে কাছে টেনে এনে বলল, বাইরের পরিবেশ নয়ে এত ভাবছ কেন? ঘরের পরিবেশ সুন্দর থাকলেই হল।

—কখনই হল না। ঘর বার দুটোই সমান সুন্দর হওয়া চাই।

তারপর থেকে লক্ষ্য করে সুমনা, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য জোরে কথা হতে দেখলেই ছেলে মেয়ের মুখ শুকিয়ে ওঠে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। আর ঝগড়া হলে তো কথাই নেই। জড়িয়ে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। আজকাল স্কুল থেকে ঘরে ঢুকেই ওকে খুঁজতে থাকে মিমি। সামনে পেয়ে গেল তো ঠিক আছে। নইলে ব্যাগ ফেলেই গিয়ে শোবার ঘরে উঁকি দেবে। স্নানের ঘরের দরজায় আঘাত করতে করতে মা মা করে পাগলা ডাক আরম্ভ করবে। একটা বিরক্তিকর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল সুমনা।

সেদিন সুমনা একটু বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, ড্রেসিং টেবিল ধরে এসে দাঁড়ালো মিনি ঃ বেরুচ্ছে মা?

—হ্যাঁ রে একটু বেরুচ্ছি।

—কখন ফিরবে?

—তাড়াতাড়িই ফিরব মা। তবে আমার যদি দেরি হয়, তোমরা খেয়ে নিও কেমন?

—না না—তুমি না এলে খাবো না। তুমি এলে পর খা...বো...

—লক্ষ্মী মেয়ে। হরির মা তোমাদের খেতে দেবে। বাবা সামনে বসবেন। তোমাদের জন্য পায়েস—

—না, পায়েস খেতে চাই না আমি। কেন দেরি হবে তোমার। না—দেরি হবে না। কোথায় যাচ্ছ তুমি—

আয়না থেকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিতে তাকিয়ে রইল সুমনা।

মিমিও তাকিয়ে রইল মার দিকে। সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে। যেন মার ভেতরটা দেখতে চাচ্ছে সে। যেন ভেতরে কি একটা মর্মান্তিক কষ্ট হচ্ছে ওর। বড়ো বড়ো ড্যাবডেবে চোখ দুটোর একোণ ওকোণ জলটানা।

মেয়ের গালে ঠাস করে হয়ত এক চড়ই কষিয়ে দিত সুমনা যদি তার চোখে জলটানা ভাবটা না থাকত—যদি তার ভেতরের কষ্টটা ফুটে না রেরুত। রেগে গিয়ে প্রবেশ করল সে শোবার ঘরে। হেমন্তর দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলে উঠল, তোমার কি; অপমানটা তো তোমার গায় লাগছে না। লাগছে আমার গায়।

হক্‌চকিয়ে উঠে বসল হেমন্ত ঃ কী হল?

কতবার বলছি তোমায় বাড়ি ছাড়ার কথা? কানেই তুলছ না। এখানে থাকলে এ সব দেখবে, আর এমনি করবে। ওদের মধ্যে থাকলে ছেলে মেয়ের আতঙ্ক কখনই যাবে না আমি বলে দিচ্ছি।

—ইস—তিক্ততা প্রকাশ করল হেমন্ত। আমার জন্য বাড়ি কী সেজে বসে আছে? চাইলেই কী বাড়ি মেলে? ভালো মেজাজের মানুষ হেমন্তর গলাও রুক্ষ হল।

রাগ চড়ে গেল সুমনারও। এক কথায় দুকথায় উত্তরোত্তর কথা কাটাকাটিটা গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় কলহে। দরজাটা বন্ধ করে দিল হেমন্ত। দিলীপ মিমি কাঁপতে লাগল বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বাদে এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সুমনা ঃ বেশ ঠিক আছে। তাই যাবো আমি। আমি ওদের নিয়ে বড়দির ওখানেই চলে যাব—

বিকারের ঘোরে যেন চেঁচিয়ে উঠল মিমি ঃ না—না আমরা যাবো না—দু হাত প্রসারিত করে বেরিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলতে লাগল, না আমরা যাবো না। না তুমি যাবে না। আমরা এখানে থাকব। বাবার কাছে থাকব—এই বাবার কাছে থাকব...

রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেলল সুমনা। বললো, দেখ, বসে বসে দেখ এ সব। শোন, দুকান ভরে শোন এসব কথা।

অগত্যা তারপর সকাল সন্ধ্যা বাড়ি অন্বেষণ পর্ব আবার আরম্ভ করতে হল হেমন্তকে। বাড়ি ঠিক করে ফের খাট পালঙ্ক খুলতে বসতে হল। বই পত্তর নামাতে হল। ঠেলা গাড়িতে বোঝাই করতে হলো। নতুন বাড়ির দরজায় এসে নামাতে হল। তারপর মালপত্র টানাটানির ভারী কাজগুলো করে দিয়ে হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ে বলল, দশ বছরের ভেতর বাড়ি বদলের কথা বললে নির্ঘাত খুন।

সুমনা মাথা কাৎ করে খুশি মনে সম্মতি জানাল।

যদিও একতলা তবু বাড়িটা সুমনার পছন্দ হয়েছে। ছোট্ট দোতলা। বাড়ি। ওপরে একজন রয়েছেন আর নীচে ওরা। ওপর তলার ভদ্রলোকটিরও ওদেরি মতো দুটি ছেলেমেয়ে। সুন্দর ঠাণ্ডা শান্ত পরিবেশ। সামনের ছোটো ঘাস জমিটুকুর উপর ওরা খেলা করে। তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে সুমনা।

কিন্তু ওদের মার সঙ্গে সুমনার একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল তবু আলাপ হল না। একজন স্পষ্টতই যদি পরিচয় করতে না চায়, তবে আর পরিচয় হয় কি করে। ওদের মা বোধহয় কাজ

করে। তার সকালের যাওয়াটা প্রায় প্রতিদিনই সে দেখে, ফেরাটা না দেখলেও। ভাবলেশহীন মুখে সোজা টানটান বুকে হেঁটে পার হয়ে যায় ওদের পথটা। কোনদিকে তাকায় না। ডানদিকে মুখটা একটুও ঘোরালে ওর চোখে চোখ পড়তই।...ওরই বয়সী হবে...চেহারা কিন্তু ভালই...মেয়েটি মার মতো হয়েছে। ছেলেটি হয়েছে বাবার মতো। ছেলে মেয়ে অনেক সময় মার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত যায়। বোধহয় মা সামনের দোকান থেকে লজেন্স টজেন্স কিনে দিয়ে যায়। যা কিনে আনে ডেকে দিলীপ মিমিকে দেয় চিনু মিনু।

সেদিন হেমন্তকে অফিসে আর পুত্র কন্যাকে স্কুলে পাঠিয়ে সবে সেলাই-এর কল নামিয়ে সেলাই করতে বসেছে সুমনা—হন্তদন্ত হয়ে ওপর তলার ঝি ছুটে এলো শিগগির একবার আমাদের ওপরে চল মা। আমাদের চিনু খেতে বসেছিল হঠাৎ ফিট্ হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেছে। কেউ নেই বাড়ি...শিগগির এসো।

সেলাই ফেলে ওপরে দৌড়লো সমুনা। গিয়ে দেখল, চিনু মিনুর ডাল ভাত মাখা প্লেট পড়ে রয়েছে টেবিলো। হয়ত এক আধ গ্রাস মুখে দিয়েছিল ওরা—তারপরই চিনু ফিট্ হয়ে পড়ে গেছে খাড়া চেয়ার থেকে। মাথায় চোট লেগেছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলছে আর গোঁ...গোঁ শব্দ করছে সে। মিনু দাদার মুখের উপর পড়ে দাদা-দাদা করে ডাকছে আর কাঁদছে।

জ্ঞান ফেরাবার প্রাথমিক চিকিৎসা যেটুকু জানত—অর্থাৎ নাকে মুখে জলের ঝাপ্টা দেওয়া—যেটুকু করতেই ফল হলো। চোখ মেলল চিনু। ঝি-তে আর ওতে মিলে ভেজা জামা কাপড় বদলে চিনুকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে বাইরে এসে সুমনা বলল, এবার তুমি মিনুকে খাইয়ে দাও। আর ওর মাকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার। ফোন রয়েছে, কোথায় কাজ করেন জানো? আমি ফোন করে দিই।

কাকে খবর দেবে মা? ওদের মাকে! হা, ঈশ্বর! সুমনার আরো কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, কিন্তু বলি তোর যেমন খুশি চলতিস। যেমন খুশি ঘরে ফিরতিস। কোনো কম্মটায় বাধা হচ্ছিস তোর। আসতিস ছেলে মেয়ে দুটো একটু তোকে পেত—বলি তোর চলে যাবার দরকারটা কী ছিল!

সুমনা গলা গিয়ে কিছুতেই শব্দ বের করে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারলে না ঃ ব্যাপারটা কী?

ঝি বলে চলল, তুমি নতুন এসেছ তাই জাননা। সমস্ত পাড়া জেনে গেছে ওদের মা চলে গেছে। সে নাকি আবার বিয়ে করছে! আজ সকাল থেকে বাবুর অপিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত মা, বাবুতে আর মায়েতে ফোনে কী রাগারাগি তোমাদের ওই ডারভেস না কী করা বলা তা নিয়ে। ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে বোঝা তা। খেতে বসে ভাত নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করছিল—তারপরই এই শব্দ আর মেয়ের কান্না শুনে ছুটে এসে দেখি—নইলে মা দশ বছর ধরে রয়েছি ছেলের ফিটের ব্যামো দেখিনি। মেয়েটা মা সমস্ত রাত ঘুমোয় না...

সুমনা শুধু তাকিয়ে রইল ঝি-র মুখের দিকে।

কোনও এক মলি দত্ত

বাণী রায়

শূন্যে হাতখানা পড়ল।

একটু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা সামান্য কিছুক্ষণ। মলিনা দত্ত একটু চিন্তা করলেন।

প্রত্যহ খাটখানা সারিয়ে নিতে ছুতোর মিস্ত্রী ডাকবার কথা মনে হয়, আবার মিলিয়ে যায় বিস্মরণে। রাত্রে শুতে যেয়ে রোজ অনুভব করেন আজও হয় নি।

পিতৃদত্ত জোড়াখাটখানায় মাতার সহশয়নে অভ্যস্তা ছিলেন চিরকুমারী মলিনা দত্ত। মাতা গত হয়েছেন বহুদিন আগে। পিতা গত হয়েছেন কয়েক বছর হল।

তারপর বাড়িতে একা তিনি। পুরাতন চাকর একটি আছে। তারও অথর্ব-প্রায় অবস্থা। ছুটি দিলেই হয়। কিন্তু তাহলে থাকবে কে? সহোদরা দিদি বিদেশে। তাঁর ছেলেমেয়ে কলকাতায় কলেজে পড়ে। হস্টেলে থাকে তারা। কাছে রাখতে মলিনা রাজি হননি। ভাইঝি যমুনার ভার নিতে ভয় হয়। বেপরোয়া কন্যা।

খাটের মাথার কাছে কারিকুরি-করা মাথালের সঙ্গে লাগানো ছোটো খানিকটা হাতল। বিছানা থেকে উঠবার সময়ে কোমলাঙ্গী বা বিলাসী ভর রেখে পা মেঝেতে দেবেন। সেটাই মধ্য দিয়ে চিড় খেয়েছে। হাতের ভর সইবে না আর। চট করে ভেঙ্গে যাবে।

কয়েকদিন ধরেই সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠছেন মলি দত্ত ওরফে মলিনা দত্ত। হাতলটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। প্রথম স্মৃতি মাতার পাশে এই প্রাচীন খাটখানিতে শয়নের। তাই জীর্ণ হলেও বুড়ো চাকর রুইদাসের মতো সযত্ন আদর তার। পেনসন মেলেনি। পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতার নির্দেশে সমস্ত কিছুর মালিকানা পেয়েছেন। দিদির অনেক থাকলেও দিদি অসন্তুষ্ট। অবশ্য উইলের নির্দেশে মলি দত্তের তিরোভাবের পরে বাড়ির উত্তরাধিকার আসবে যমুনার ওপর। ভাবতেও ভালো লাগে না।

ডাক্তারবাবু বলেছেন : সর্বদা ওজন কমিয়ে চলতে। অনেকদিনের হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। হৃৎস্পন্দনের অনিয়মিত যতি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়। সকালে আস্তে একতলায় নেমে কাছের পার্কে একমাইল মতো আন্দাজে সমতল ভূমিতে হাঁটা প্রয়োজন। নিত্যকার করণীয় কর্ম মলি দত্তের।

তাড়াতাড়ি কী পরলেন, কী নিলেন চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়লেন মলি দত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে। আজ দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই।

একে শীতের সকাল। তায় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। ছাতা হাতে মলি দত্ত এসেছেন। পা-টিপে টিপে চলতে হচ্ছে। না এলেই পারতাম। শরীর ভারী হয়ে গেছে। পা-টা পিছলে গেলে বিপদ। আগের মতো ভারসাম্য এখন রাখা সম্ভব হয়না। নিজের আরামদার স্বরটি মনে হল। পুরনো খাটের পাশে আছে ফুলদার একখানি সোফা। সকালে ফিরে গেলে টিপাই টেনে রুইদাস চায়ের ট্রে রাখে। মায়ের আমলের হাল্কা ডিমের খোলার মতো চায়ের কাপ। চা-খাওয়া যেন হয় উৎসব।

কেন এই শীতে এলাম? শরীরটা ভালো লাগছে না। ভোরবেলা। বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময়ে কেমন যেন বুকের মধ্যে চিনচিন করছিল। খাটের হাতলে জোর না দেবার কথা মনে থাকে না ভোরবেলা। ঘুমেজড়ানো মনে অত সযত্ন সন্তর্পণ কর্মপদ্ধতি স্থান পায় না। জোরই দিয়েছিলেন হাতলে, মনে আছে। জোর দিয়েই মনে পড়ে গেল। বুকের মধ্যে চিনচিনানির জন্যই বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন একটু। তক্ষুণি মাথাটা কেমন ঘুরে গেল বনবন কর। গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন নেচে উঠল চোখের সম্মুখে শূন্যে হাত পড়ে বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল। আঁকড়ে ধরলেন খাটের বাজু খানিকটা চেষ্টার পরে। কিছুক্ষণ সারা বিশ্ব অন্ধকার হয়ে গেল অকস্মাৎ— তালগোল পাকিয়ে সাদা নিরালম্ব শূন্যতা।

কতক্ষণ মনে নেই।

সামলে নিয়েছেন ভাগ্যে। আজই ছুতোরমিস্ত্রীকে খবর দিতে হবে। আর অবহেলা করা চলবে না।

ডাক্তারবাবুকেও জানাতে হবে। আর একবার যে হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, সেও এমনি করে শুরু হয়।

ভাগ্যি সামলে নিয়েছেন।

পতন ও মূর্ছা দুটোই ধাতে পোষায় না।

হঠাৎ যমুনার কথা মনে পড়ে গেল। প্রেম ভাসিন নামক পাঞ্জাবি যুবকটির সঙ্গে বড়ো বাড়াবাড়ি করছে। সহশিক্ষার কলেজে দিতে নিষেধ করেছিলেন মলি দত্ত। কিন্তু মেয়ে পড়ায় নাকি দিগ্‌গজ হবে, তাই সেই বিশেষ ধারালো কলেজটি ছাড়া চলবে না।

আরে, তার আগেই যদি লোফারকে বিয়ে করে ফেলে?

হাত মুঠো করলেন মলি দত্ত।

বাবার একমাত্র নাত্নী ছিল চোখের মণি বাবার। তাই বাড়িখানি নাত্নীর নামে মলির পরে দিয়ে গেছেন। ব্যাঙ্কের টাকা ও শেয়ারগুলো আছে নাতির নামে। সে-ও অবশ্য মলির অন্তর্ধানের পরে।

দেরি আছে। আটত্রিশ বছরের চিরকুমারী মলি দত্ত সহজে মরছেন না। তাই বোধহয় যমুনার এত আক্রোশ? বাড়িখানি পেলে নীচে ভাড়া বসিয়ে ওপরে পাঞ্জাবি লোকটাকে নিয়ে থাকতে পারে এখনই। রোজগারের কোনো দরকার হয় না।

দেবনা! দেবনা! বাবার নাত্নীকে লোফার বিয়ে করতে দেব না। আমি ত্যাগ করিনি, ওঁর মুখের দিকে চেয়ে? বাবা দুচক্ষে বিবাহ বিপ্লব দেখতে পারতেন না। তবু তো আমার ক্ষেত্রে অসবর্ণ মাত্র ছিল। আর এখানে?

তাই যমুনা আছে হস্টেলে। মাসি তার দায়িত্ব নেয় নি।

সন্তর্পণে পা ফেলে চলছেন মলি দত্ত। জীবনে বড়ো মায়া তাঁর। কার জন্য জানি না এখনও জীবনকে ধরে রাখতে সাধ যায় দীর্ঘদিন। এখনও যেন আশা শেষ হয়ে যায় নি। আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা তিনি দেখেন নি।

দিদি বিরক্ত। অনেক টাকা জামাইবাবুর। তথাপি তিনি মলির সর্বস্বের মালিক হওয়াটা সহ্য করতে পারেন না। বোনপো বোনঝি দিন গুনছে মাসির তিরোভাবের। বহু টাকা পাবে কিনা।

কিন্তু দেরি আছে। ওদের জব্দ করবার জন্যই দীর্ঘদিন বাঁচবেন মলি দত্ত। যমুনা ওর মায়ের বাড়ি বসে গেছে, একথা ভাবতে ভালো লাগে না তাঁর। সেই অতি পরিচিত, অতি প্রিয় অন্তরঙ্গ কোণা, বারান্দা, ঘর ভরে উদ্ধত হৃদয়হীন যমুনার লীলা চলছে, তিনি কল্পনায় দেখেই শিহরিত।

রাস্তায় কুয়াশা-অন্ধকার। লোকজন দেখা যাচ্ছে না। ক্রমাগত চলছেন মলি দত্ত নানা কথা ভাবতে ভাবতে। বহু পথই চলেছেন।

বাবাকে কতদিন দেখি না। গলার কাছে একটা শক্ত ডেলা উঠে এল। মৃত্যু যদি বাবাকে দেখায়, তবেই মৃত্যু মহীয়ান হয়ে উঠবে! অন্যথায় সে কী?

নিরালম্ব শূন্যতা?

সমস্ত জীবন মলি দত্তের এখন নিরালম্ব শূন্যতায় পরিব্যাপ্ত। শূন্য এই পথচলা শূন্য, শূন্য সব।

বাড়ি ফিরে যাই তাড়াতাড়ি। আজই ছুতোর ডেকে খাট সারাব, ডাক্তারবাবুকে দেখাব। একটু হলেই ভোরবেলায় গিয়েছিলাম আর কী।

ভাগ্য ছিল. কোনোমতে উদ্ধার পেলাম।

॥ দুই ॥

বাড়ির দরজায় হনহন করে এলেন মলি দত্ত।

দরজা খোলা। এত সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও এই সাত-সকালে দরজাটা হাট করে খুলে রেখেছে. দেখ। বুড়ো হয়ে রুইদাস একদম কাজের বার। এতই বুড়ো হয়ে গেছে যে মনে হয় যে-কোনো সময়ে লয়প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ওকে ছুটি দেওয়া চলে না। সেই যে তেতলার চিলেকোঠার ঘরটিতে থাকে, তাতেই ভরসা। যমুনা যা বেপরোয়া, হয়তা ওর অনুপস্থিতির সুযোগে একদিন একটা করে তালা এঁটে দখল স্বত্ব ঝুলিয়ে দেবে।

যমুনার ভাই শতদ্রুও তেমনি। আচ্ছা নাম রেখেছে দিদি। পাঞ্জাবে স্বামীর কাজ। পঞ্চনদের দেশে। তাই কী ছেলেমেয়ের নাম নদী দিয়ে রাখে কেউ?

অন্যমনস্কভাবে দরজার পাল্লার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। ব্যাঙ্কের সুদের ইনকাম ট্যাকসের আওতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় কিছুদিন ধরে ইনকাম ট্যাকসের উকিলের বাড়ি ছোটাছুটি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। দরজাটা এত রং-চটা হয়ে গেছে লক্ষ্য করেননি। ভেতরে শ্যাওলা ধরেছে খোলা উঠোনে, তাই তো।

চা হয়েছে নাকি?

উঁকি দিলেন রান্নাঘরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠবার আগে। ঠিকে-ঝি বিনোদা উনুনে আগুন দিয়ে দেয়, রুইদাস চা করে ওপরে দিয়ে আসে।

একটি পাজামা গেঞ্জিপরা লিকলিকে চাকর শ্রেণির লোক বার হয়ে এল। এ কোথা থেকে জুটল?

ঠিক, বিনোদার লোক। কিছুদিন হল বিনোদার যা উড়ু-উড়ু ভাবগতিক হয়েছিল দেখে সন্দেহ হয়। বাড়িতে লোক এসেছে আজ নির্লজ্জের ধাড়ি। বিনোদা কোথায়— কটমট করে তাকালেন মলি দত্ত। অ্যাঁ? লোকটা যেন অবাক হল। হাবামত একটু লোকটা। কে জানে বোধহয় ভান করছে, বা বিনোদার নামই জানেনা। ওদের প্রেমে আবার নাম কোনো কাজে লাগে না?

ঝি কোথায়? এবার বল্লেন মলি দত্ত।

বাজারে গেছে।

এত সকালে বাজারে? তাছাড়া বাজার করে তো রুইদাস। হঠাৎ আলোক পেলেন মলি দত্ত। রুইদাস বোধহয় অসুস্থ। সকালে মলি উঠে চট করে বার হয়ে গিয়েছিলেন। সদর তখন খোলা ছিল। বোধহয় কোনোমতে বিনোদাকে দরজা খুলে দিয়ে চলে গেছে ঘরে রুইদাস। ওপরে যেয়ে খবর নেওয়া দরকার।

হাবামত লোকটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে ওঁর দিকে চেয়ে থেকে চলে গেল রান্নাঘরের মধ্যে। সেখানে চটপট করে কী যেন সবেগে ফুটে উঠল।

এই লোকটাকে দিয়ে রান্না করাচ্ছে? রুইদাস ভালো করেই জানে উনি যার তার হাতে খান

না। অসুখ হয়ে পড়েছে বলেই যে-কোনো একটা লোককে দুম্ করে রান্নাঘরে বসিয়ে দেবে? কেন? মলি দত্ত গ্যাসে নিজেরটা করে নিতে পারেন। নিয়েও থাকেন, কারণ আজকাল প্রায়ই রুইদাসের রোগ হয়। অবশ্য কয়েকদিন ধরে শরীরটা মলি দত্তের যে ভালো যাচ্ছে না, জানে রুইদাস। দিদির কষ্ট হবে ভেবেই সে লোক এনেছে নিশ্চয়। এত সকালে লোক পেল কোথায়? নিশ্চয়, এই সুযোগে বিনোদা নিজের নাগরটি ঢুকিয়ে দিল। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে রুইদাস এমনি করল?

রাগতভাবে মলি দত্ত হন্‌হন্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। সোজা তেতলার চিলেঘরে যেয়ে ব্যাপারটা দেখবেন।

পথে বসার ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ শোনা গেল। নিশ্চয় মলি দত্তের বন্ধুবান্ধব কেউ সকালে উঠেই আড্ডা দিতে এসেছে। চিরকুমারী হলেই তার কাজকর্ম, সময়-অসময় থাকে না নাকি?

বিরক্ত মুখে ফিরলেন মলি দত্ত। তেতোলার ছাদের সিঁড়ির মুখ থেকে। ভদ্রতাব দাবি মানতেই হয়।

বসবার ঘর থেকে পরম সপ্রতিভ মুখে এক মোটাসোটা বছর ত্রিশের মহিলা বার হয়ে এলেন। কোলে ক্রন্দনমান শিশু।

আয়া, এবার বেবিকে নিয়ে যাও। দেখো, ঠাণ্ডা লাগে না যেন। দুদিন বার হয় নি, আজ থাকছে না। তাড়াতাড়ি ফিরো।

কোথা থেকে উদয় হল আয়া। বেবিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে মলি দত্ত দেখলেন। যেন নিজের বাড়িঘর। লোকের বাড়ি বেড়াতে এসে কী করছে দেখ না। কিন্তু এটি কে মুখখানা চেনা-চেনা। গলার স্বরটিও পরিচিত। হয়তো ছেলেবেলায় দেখেছিলেন। এখন বড়ো হয়ে বেড়াতে এসেছে বন্দুদের মেয়ের এত বয়স হবে না। অন্য কেউ।

ঘরে কেউ আছে নিশ্চয় যে এদের সঙ্গে এনেছে। তিনি একা থাকেন বলে প্রায়শ বন্ধুরা নিজের নিজের আত্মীয়সহ সাক্ষাৎকারে এসে থাকেন। মলি দত্ত বিস্মিত হলেন না। তবে একটু বিব্রত বোধ করলেন। নিঃসন্তান চিরকুমারীর ক্রন্দনপরায়ণ বাচ্চা দেখে যা হয়। বাচ্চার আবার খাদ্য জোগাড় করতে হবে এখন। বেড়াতে এসেছে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা নিয়ে। এত সকালে খাইয়ে আনেনি বোধহয়। তবু মা বুদ্ধি করে কাছেই পার্ক দেখে পাঠিয়ে দিল বাইরে।

এতক্ষণ নূতন মহিলার দৃষ্টি পড়ল মলি দত্তের দিকে। 'কাকে চান আপনি?' মাপা ভদ্রতার কণ্ঠে প্রশ্ন এল। মলি দত্ত অবাক হয়ে ভাবলেন, আমাকে চেনে না দেখছি। কার সঙ্গে এল?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?

আমি মিসেস নিয়োগী। এই বাড়ির কর্ত্রী।

এবার মলি দত্তের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। যত গল্প শুনেচেন বা পড়েছেন ডিটেকটিভ বা ডাকাতির মনে উদয় হল। কয়েকদিন আগে পিস্‌তুতো বোনের বাড়ি মোটর-ডাকাতির কথাও মনে এল।

ব্যাপার সঙ্গীন দেখা যাচ্ছে। কেন ভোরবেলা দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে গেলাম? টেলিফোন শোবার ঘরে। উঁকি দিয়ে দেখা গেল দরজা বন্ধ, ঘর রুদ্ধ আছে। রুইদাস তাহলে এই বড়ো কাজটা করেছে ঘরটা বন্ধ রেখে। কিন্তু সে কোথায়? নিহত, অথবা আবদ্ধ?

মলি দত্ত মাথা ঠাণ্ডা করে ভাববার ও কাজ করবার চেষ্টা করলেন।

মিসেস নিয়োগী বললেন,— ঘরে বসবেন, চলুন। কী দরকার আপনার? আমার কাছে, না আমার স্বামীর কাছে এসেছেন?

স্বামী?

সভয়ে মলি দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্বামী মানে মিস্টার নিয়োগী কী বাড়ি আছেন?

হ্যাঁ, উনি এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। উনি সাদার্ন রেলের ট্রাফিক অফিসার।

সরকারি চাকুরে আর যা-হোক অন্যের বাড়ি অনধিকার প্রবেশ করে বিছানায় শুয়ে নিদ্রা যাবে না।

তবে, ভান বা মিথ্যা নিশ্চয়। তাঁর বাড়িতে এরা কে? বসবার ঘরে ঢুকে বিস্মিত মলি দত্ত। সমস্ত ঘর ওলট-পালট ভুল ঠিকানায় এলেন না কি? না, এই তো ওঁর সোফাশেটি অর্গান। কিন্তু, আরও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে অন্যভাবে সাজানো। ওঁর অনেক জিনিসপত্তর ছবি ইত্যাদি সব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এত অল্প সময়ে এত পরিবর্তন? নিজেদের জিনিসপত্র এনে ঘরটার রূপ বদলে কারা মলি দত্তের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুফান তুলে দিল?

কী করা যায়? কী করা যায়? নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করলেন মলি দত্ত বাড়িটার নাম্বার কত?

কেন, ১০নং বিল্‌ওয়ান রোড। আপনি কত নাম্বার খুঁজছেন?

কোনো সন্দেহ নেই। এই নাম্বার, এই রাস্তা ঠিক আছে। 'কতদিন এখানে আছেন আপনারা?' এলোমেলো চিন্তা গুছিয়ে নেবার আশায় সময় কাটাতে চাইলেন মলি।

বছর দশেক হবে।

মলি চমৎকৃত, তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? সকালে তো মাথা ঘুরে বিশ্বজগৎ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, মোটামুটি সবই তো ঠিক আছে। প্রতারণাঘটিত ব্যাপারই তাহলে। গাড়ি বোঝাই করে ওর মালপত্র সরিয়ে নিজেরা বসে গেছে।

নিশ্চয় রেফিউজি। জবরদখল করেছে একা নারীর বাড়ি পেয়ে। এবার মামলা না ঠুকলে উঠবে না। হায় ঈশ্বর, শান্তিপ্রিয় মলি দত্তের জীবনে সহসা এমন দুর্যোগ দিলে?

এবার মিসেস নিয়োগী সন্দিগ্ধ,— আপনি যদি কোনো কোম্পানি থেকে কিছু নমুনা দেখাতে এনে থাকেন, দয়া করে তাড়াতাড়ি বার করুন। আমার স্বামী ঘুম থেকে উঠে এক্ষুণি অফিসে যাবেন। রান্নার লোকটি একদম বোকা আর আনাড়ি। আমাকে খাবার দিতে হবে তাঁর।

ভদ্রতাসহ উঠতে বলা। বুঝলেন মলি দত্ত। কিন্তু শক্ত হয়ে বসলেন। নমুনা দেখতে চাও বটে? তুমি কত বড়ো ধড়িবাজ রেফিউজি, দেখে নেব।

নমুনা আনি নি কিছু। এক সময়ে এই বাড়িটা চেনা ছিল। তেতালার চিলেকোঠার চাকরটি কোথায়?

ও, কিন্তু, তেতালায় চাকর কেউ নেই তো। ওটা আমাদের মালগুদাম।

মেয়েটি ভদ্রঘরের মতো দেখতে, মুখখানিও চেনা-চেনা। অথচ এমন ধাপ্পাবাজ। হয়তো বাড়িতে কোনোদিন ভিক্ষা চাইতে এসেছিল, সামনের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করত, তাই চেনা লাগছে। রাতারাতি ভালো জামাকাপড় পরে বাড়ির কর্ত্রী সেজে বসেছো? মলি দত্ত বুঝলেন থানাপুলিশ না করে এমন জবরদখলীদের নড়ানো যাবে না। উকিলবাবুকে যদি একটা টেলিফোন করতে পারতেন।

মিসেস নিয়োগী অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন,— নমস্কার। আমি আর বসতে পারছি না। এক্ষুণি আমার আয়া বেবিকে নিয়ে ফিরবে। আপনি উঠুন।

হুঁ! বেশ ভদ্রঘরের চাল শিখেছ! আয়া, বেবি! সকলকে সাজিয়ে এনেছ দিব্যি। আবার আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছ, এত আস্পর্দ্ধা।

গলার সুরটা পর্যন্ত এতই নকল যে চেনা চেনা লাগছে। চারপাশে অষ্টপ্রহর শোনা সোসাইটি

গার্লদের মতো। সকালে অগোছালো হলেও বেশভূষা চমৎকার। অবশ্য এসব না করলে বাড়ির মালিক সাজা যাবে না। চালচলন দেখে কে বলবে জবরদখলের রেফিউজি?

হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। স্বামীও সুপ্ত, হাবা চাকর নীচে। কাছাকাছি দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

সতেজে বলে উঠলেন মলি, আচ্ছা, লোক আপনি? আমারি বাড়িতে বসে আমাকে ওঠাচ্ছেন?

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। মুখখানা সাদা হয়ে গেল। কেমন যেন এক দৃষ্টে মলি দত্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ওষুধ ধরেছে দেখে মলি দত্ত আশ্বস্ত হয়ে আরও তেজে সজোরে বললেন,— হাজতে যাবেন, না সোজাসুজি মালপত্র তুলে বিদায় হবেন?

মিসেস নিয়োগী দরজার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। মলি দত্ত সজাগ ছিলেন। তড়াক্ করে উঠে দরজা রোধ করলেন, কোনো ফল হবে না। যদি চেঁচাতে যান, মুখ চেপে ধরবো। চুপ করে বসুন ফের।

মিসেস নিয়োগী কাঁদ কাঁদ সুরে বললেন,— আপনি এমন করছেন কেন? কোথায় থেকে এসেছেন শুনি? লুম্বিনী পার্ক?

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল মলির। একটি চমৎকার ইংরেজি গল্পের কথা মনে পড়ল। তার জীবনও কী একই পরিস্থিতি ভিন্ন কারণে, ভিন্ন প্রকারে? পুনরাবৃত্তির ছকে তিনিও পড়ে গেলেন বুঝি?

চিৎকার করে উঠলেন মলি দত্ত, আমাকে পাগল সাজানো হচ্ছে না?

দরজার কাছে চটির শব্দ। স্লিপিংস্যুট পরা এক বছর ছত্রিশের ভদ্রলোক। সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে এসেছেন, বোঝা যায়। কী হয়েছে এঘরে? এত চেঁচামেচি কেন?

মিসেস নিয়োগী এবার কেঁদে ফেললেন,— হিমাংশু, তুমি এসেছ? বাঁচালে। দেখ, এই পাগল আমাকে আটক করেছে।

তাই নাকি?— ঘরে এলেন হিমাংশু নিয়োগী, অন্যের বাড়ি চড়াও হয়ে এসব কী হচ্ছে? ভালো চান তো চলে যান ভদ্রলোকের মেয়ে দেখছি। নইলে থানায় খবর দিতে বাধ্য হব।

দিন না, আমিও তাই চাই। থানা? থানায় যাবার মুখ আছে আপনাদের? অন্যের বাড়ি জবরদখল করেছেন। আমার বাড়ি বসে আমাকেই থানা দেখাচ্ছেন?

হিমাংশু ভালো করে দেখলেন চেয়ে, তারপরে স্ত্রীকে বললেন,— ডার্লিং, একে উত্তেজিত করো না। যা বলে সায় দিয়ে যাও। দেখি কী করা চলে। হ্যাঁ, আপনারই বাড়ি, স্বীকার করছি! তারপর?

মলি দত্ত বিমূঢ় হলেন। এ কী কথা? এমনটি তো হবার নয়। তাঁর মাথা সত্যই খারাপ হল না কী?

চাপাসুরে মলি বললেন,—মাথাটা কেমন করছে। জল।

মিসেস নিয়োগী বিগলিত হলেন, স্বামীকে বলেন,— আহা বেচারি। কোথায় থেকে পালিয়ে এসেছে বলতে পারছে না। আজকাল প্রায়ই এমন দেখা যাচ্ছে পথেঘাটে।

জল দিলেন তিনি।

জল খেয়ে ও মাথায় দিয়ে মলি সুস্থ হলেন। পরিস্থিতি আর তাঁর বোধগম্য নয় বুঝে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, এই বাড়ি সত্যিই আপনাদের? ভাড়া করেছেন?

না তো। আমার স্ত্রী বাড়িখানি তাঁর আত্মীয়ার কাছ থেকে পেয়েছেন। বিয়ের আগেই আমাদের। হিমাংশু উত্তর দিলেন। মিসেস নিয়োগী বললেন, বলছিল বাড়িটা চেনা। হয়তো মাসির কোনো বন্ধু। হয়তো চেনা বাড়িটাই পাগল হয়ে খুঁজে নিয়েছে। কী বিপদ!

মাসির বন্ধু?

আপনার মাসি কে?

কেন, মলি দত্ত। দশ বছর আগে বাড়িখানা পেয়েছি, বললাম তা।— অনিচ্ছুক স্বরে উত্তর।

অ্যাঁ! আপনি— তুমি— নাম কী তোমার?

যমুনা। ওঁর বোনঝি হই।

রুদ্ধশ্বাসে মলি বললেন,— যমুনা? যমুনা! এত বুড়ো হয়ে গেলি? প্রেম ভাসিন্‌কে শেষপর্যন্ত বিয়ে করিস নি? কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু? যমুনা, আমাকে চিনতে পারছিস্ না?

না তো। যমুনার স্বরে বিস্ময়।

তাহলে, আমাকে কে চিনবে? আমি দাঁড়াব কোথায়?

বাড়িঘর বদলে গেছে। সকলে বদলে গেছে। নিরালম্ব শূন্যে ত্রিশঙ্কু তিনি ঝুলছেন। কেউ না চিনলে রাতারাতি মলি দত্ত যে নাস্তি হয়ে যাবেন।

কে চিনবে?

রবি তলাপাত্র। যে ফিরে গিয়েছিল কেবলমাত্র ছোটোজাত হবার অপরাধে। মলির জীবনের অনন্ত বসন্তের দ্বার সেদিন থেকে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু কথা ছিল, কথা ছিল অনন্ত বসন্তের রুদ্ধদ্বারের ওপাশে চির বদ্ধকৃতাঞ্জলি রবি দাঁড়িয়ে থাকবে। চিরদিন রবির দ্বার খোলা থাকবে।

রবি? রবি আসুক, রবি এসে পাশে দাঁড়াক। রবি, রবি! যাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে পাশে এলে আর নাস্তি হয়ে যাবেন না মলি। আর একা অপরিচিত জগতের চিরবিস্ময়ের রূঢ় আঘাত দূরে সরিয়ে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে না। নিঃসঙ্গতা সঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে। সমস্ত শূন্য একমাত্র পূর্ণ করে দিতে পারে রবি, যাকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন ভুল করে সঞ্জীবিত করে তুলবে রবি। তিনি বাঁচবেন রবির মধ্যে। রবি তলাপাত্র— এই নাম্বারে টেলিফোনে করে এক্ষুণি ডাকুন। সে আমাকে চেনে।

মাসির বন্ধু রবিদাকে এ চেনে ভালো করে। টেলিফোন পর্যন্ত মুখস্থ। যমুনা অবাক হল।

তাই হয়। উন্মাদের মাথায় একটা-দুটো বস্তু গেঁথে থাকে। যাহোক, যা বলছে করে যাও। কোনোমতে শান্ত রেখে এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া, রবিবাবু হয়তো চিনতে পারেন। আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।

হিমাংশু স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন।

রবিবাবুর বাড়ি নিকটে। চট্ করে গাড়ি চড়ে এসে গেলেন। একে চেনেন? দুই বিপন্ন স্বামী-স্ত্রীর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে রবি তলাপাত্র মাথা নাড়লেন।

রবি এমন হয়ে গেছে? মাথাভরা পাকাচুল, পঞ্চাশের কম লাগে না বয়স। রবি তাঁকে চিনল না।

কী করা যায়, বলুন তো?

কী বলব বলো? যার বন্ধু, সেই নেই যখন,—

রবি মৃদু বিষণ্ন স্বরে উত্তর দিলেন।

সেই নেই? মলি দত্ত নেই? অসম্ভব!

আমি নেই! মিথ্যা কথা। ষড়যন্ত্র করেছ সকলে মিলে।

এই তো আমি— রয়েছি, রয়েছি। পা ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন মলি।

কিন্তু, কে তাঁকে চিনবে? নাস্তি থেকে অস্তিতে কেমন করে ফিরবেন তিনি? প্রেম যখন তাঁকে ভুলে গেছে?

মাথাটা কেমন করে যে। যাই, আমার শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিই। মায়ের স্নেহময় কোলের মতো সেই পুরনো ভাঙা খাটাখানাতে শুয়ে পড়ি। সেখানে তো আশ্রয় আছে।

দরজা খোলা ছিল। শোবার ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন মলি দত্ত।

এবার মুক্তি, এবার শান্তি!

॥ তিন ॥

আঃ—আঃ—আঃ!

রুইদাস চায়ের ট্রে দরজার কাছে নামিয়ে রাখল।

বার বার ঠেললেও দরজা খুলছেন না দিদি। কদিন থেকেই শরীর খারাপ বলছিলেন। আজ ভোরবেলা বেড়াতেও বার হননি।

বিনোদাকে দরজা খুলে দিয়ে চা তৈরি করছে রুইদাস। বিনোদা নীচে বাসন বাজতে বসেছে। দিদি কী খাবেন শুনে বাজারে যাবে রুইদাস এখন।

বয়স হয়ে গেছে। আর পারা যায় না। কিন্তু তাহলে দিদিকে দেখার লোক থাকবে না।

দরজায় ঘা দিতে লাগল রুইদাস।

মিলি দত্তকে বার করা হল। দরজা খোলা পেয়ে নয়, দরজা ভেঙে।

মলি দত্তকে নয়, তাঁর মৃত দেহকে। খাটের হাতল ভেঙ্গে মেজেতে পড়েছিলেন খাটের নীচে। মলি দত্ত সামলে নিতে পারেন নি।

এক মুহূর্ত অনন্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। অনন্তকে, ভবিষ্যৎকে হাতের বেষ্টনের মধ্যে পেয়ে গেলেন কোনো এক মলি দত্ত।

অন্তঃসলিলা

সাবিত্রী রায়

বহুদিন পর দেবব্রত আজ আবার ধীরে ধীরে পা চালায় কফিহাউজের দিকে। ঝাড়াপোঁছা ঝকঝকে পরিচিত সিঁড়িটার মাথায় পা দিতে না দিতেই ভিতর হতে প্রসন্ন চোখে আহ্বান আসে, 'এই যে দেবব্রত। খবর কী? আজকাল যে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।'

একটা চেয়ার মৃদু ঠেলে দেয় পুরোনো লেখকবন্ধু, শিবনারায়ণ ব্যানার্জি। 'তারপর, তোমাদের কাগজের কদ্দুর। নূতন কোনো বই বের হচ্ছে নাকি রাধারানি থেকে?' শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'একটা নূতন কনট্র্যাক্ট হচ্ছে শিগগিরই—শকুন্তলা দেবীর উপন্যাস।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে শিবনারায়ণ, 'মেয়েদের লেখা আবার উপন্যাস। নির্ঘাত 'লস' দিতে হ'বে রাধারানি পাবলিশারকে। তা ছাড়া আনকোরাও নিশ্চয়ই, নাম তো শুনিনি কখনও।'

'ওঁর তো আরও খান দুই বেরিয়েছে ছোটোগল্পের।'

'ও আবার গল্প নাকি। টেকনিকের কোন বৈশিষ্ট্য আছে তা'তে?'

দেবব্রত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, 'একমাত্র টেকনিকটুকুই তো গল্পের প্রাণ নয়—আত্মাও নয়।'

এবার তর্ক শুরু হয়। শকুন্তলা সেন কোনো অতলে ডুবে যায় তর্কের জোর ঘূর্ণিপাকে। একেবারে উপকথা রূপকথার যুগ হতে আটচল্লিশ মাসের পুজোসংখ্যায় এসে ভেড়ে তর্কের পালতোলা তরি।

আরও জনা-দুই বন্ধু এসে বসে ছোট্ট টেবিলটি ঘিরে। বেয়ারা নূতন করে কফি দিয়ে গিয়েছে দ্বিতীয়বার। ধোঁয়া উড়ছে। কফির বাষ্পীয় উগ্রগন্ধ ধোঁয়ার সঙ্গে মিশছে সিগারেটের কড়া গন্ধ, বাষ্পহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কাঁচের বড়ো বড়ো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘলা আকাশের বেশ খানিকটা বড়ো অংশ। হাওয়াটাও ভেজা ভেজা। বলা চলে, প্রায় কন্টিনেন্টাল পরিবেশ। তর্ক তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

শিবেশ রায় সিগারেটের ছাইটুকু টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলে শেষ টান দিয়ে নেয়। তারপর প্রথম কথা বলে এতক্ষণ পর, 'তবে আশার কথা এই যে, আজকাল সাহিত্যিকদের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। কলমে কালি যখন আছে লিখে যাই যা খুশি—এ স্বেচ্ছাচারিতার যুগ কেটে যাচ্ছে। এই তো সেদিন ৩১/এতে বেশ একটা ভালো আলোচনা হ'ল। ছোটোগল্প লেখার ফায়দা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলেছেন আমাদের সাহিত্যিক মহারাজ। লেখার মস্ত একটা প্রয়োজনীয় কায়দাই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো ছেঁটে ফেলতে শেখা।'

'অতি ঠিক কথা। আগাছা নিড়ান না দিলে ফুলচারার সৌন্দর্যই আড়াল হয়ে যায় বাজে গাছের চাপে।' আরও একজন ঘরে ঢোকে। রঞ্জন রায় ডাক দেয়, 'এই যে প্রফেসার, দূরে দূরে কেন। তোমার বউ এন্‌তার লিখছে হে। এরকম ঘষতে ঘষতেই হাত পেকে যাবে।'

দেবব্রত লজ্জিত বোধ করে শকুন্তলা সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তিতে। শকুন্তলার লেখার একজন উৎসাহী পাঠক সে। ব্যথিত হয় সে এতটা রূঢ় মন্তব্যে।

সাহিত্যিকদের কফির আসর শেষ হয়। রাস্তায় নেমে পড়ে সবাই। প্রফেসার যায় না—কারও জন্য অপেক্ষা করছে। দেবব্রতও উঠে না—বসে বসে সিগারেট পোড়ায়। চোখের সামনে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র বেশভূষা, হাসি ও চিন্তারেখা আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে। এও এক ধরনের রঙ্গমঞ্চই। হালকা সবুজ রংয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা—শাখায় শাখায় কুঞ্জনরত বিহঙ্গ-বিহঙ্গী। ঘরভর্তি সাজানো চকচকে চেয়ার টেবিল—উর্দিপরা মানুষের ত্রস্ত ছুটোছুটি।

নূতন আর একটি দল এসে দখল করছে সাহিত্যিকদের পরিত্যক্ত চেয়ারগুলি। উগ্র এসেন্সের গন্ধ।

একটা মোহময় রেশ বিস্তার করছে দেব্রব্রতের চিন্তামগ্ন মনে। সাহিত্যিকদের কথাই ভাবছে সে। বয় এসে শূন্য পেয়াল পিরিচগুলি সরিয়ে নিয়ে যায়। চমক ভাঙে দেবব্রতর—এবার উঠতে হয়।

প্রফেসারও বেরিয়ে আসে একসঙ্গে।

'আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার। কাল কিন্তু আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। একটা লেখা দেবার কথা আছে এবারের সংখ্যায়।'

ঠিকানাটা আবার একটু মিলিয়ে নেয়।

পরের দিন ঠিকানা পকেটে নিয়ে বের হয় শকুন্তলার লেখা আনতে। ঘুরতে ঘুরতে সরু, একটা আবছা অন্ধকার গলির ভিতরে এসে পড়ে। এই রাস্তাই কী? রোয়াকে বসা একটি লোকের কাছে একটু খোঁজ নেয়। এই গলিই। দেবব্রত এগিয়ে চলে। একটু অসতর্ক হয়ে হাঁটলেই গায়ের জামাটার ছোঁওয়া লেগে যায় দুপাশের বাড়ির দেওয়ালে। অসাবধানী পানের পিকের দাগে নানা আকারের চিত্র আঁকা দেওয়ালে দেওয়ালে। কোথায়ও বা সর্দি বসা পাকা কফ লেগে আছে।

দেবব্রত চোখ বুলিয়ে চলে বাড়ির নম্বরগুলিতে। মনটা বেশ কিছু দামে গিয়েছে এরই মধ্যে—এই গলিতে শকুন্তলা দেবীর আস্তানা!

একটা বহু পুরোনো আমলের স্যাঁতসেঁতে বাড়ি সম্মুখে রেখে হঠাৎ থেমে গিয়েছে অপরিসর গলিটা। দেবব্রতকেও থামতে হয় অগত্যা। চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করছে নম্বরটা—৮/৭বি। এই বাড়িতেই থাকেন শকুন্তলা দেবী, নবীনা লেখিকা। শকুন্তলাকে দেখে নাই সে। চেহারাটা দেখে নাই, কিন্তু ভিতরটা দেখা হয়ে গিয়েছে। এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত মানুষ দশ বছরের পরিচয়েও হয় না। শ্রদ্ধা করে সে শকুন্তলা দেবীকে।

ভিতর হতে দুয়ারের খিলটা খুলে যায়। মস্ত এক শব্দ করে একটি মেয়েমানুষ বের হয়ে আসে, কতকগুলি তরকারির খোসা আর কুচো চিংড়ির আঁশ এনে ঢেলে দিয়ে যায় গলির একধারে। ভিতরে ঢুকবার সময় লক্ষ্য করে দেবব্রতকে।

'কাকে চাই?'

'শকুন্তলা দেবী থাকেন এ বাড়িতে?'

'ওইদিকের বারান্দা ঘুরে সোজা চলে যান।'

নির্দেশমতো সোজাই চলে আসে সে। আবার একটা ভেজানো দুয়ারের সামনে এসে আটকে যায়। একটু ইতস্তত কড়ে কড়া নাড়ে।

বছর সাতেকের একটি ফ্রকপরা মেয়ে বের হয়ে আসে—'বাবা তো পড়াতে গেছেন। বসবেন কি একটু?'

'শকুন্তলা দেবী আছেন?'

'মা রান্না করছেন। আপনি ভিতরে এসে বসুন।'

ভিতরে ঢুকে একেবারেই দমে যায় দেবব্রত। আধা অন্ধকার ঘরখানার মাঝখান দিয়ে একটা প্রশস্ত পর্দা টানানো—পার্টিশনের কাজ করা উদ্দেশ্য। আরেকদিকে দুইখানা তক্তপোশ জোড়া দেওয়া। তার উপর রাত্রির শয্যা গোছানো রয়েছে—রং-ওঠা একটা পুরু সুজনী দিয়ে ঢাকা। স্তূপীকৃত বালিশের বিপুল উচ্চতা বড়ো বেশি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছে যেন এ বাড়ির জনসংখ্যা। একপাশে একটি নবজাত শিশুর শয্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিশ কাঁথা অয়েলক্লথ। দেওয়ালে টানানো অসংখ্য দেবদেবীর আর গুরুদেবের ছবি। উপরে জানালার তাকে তাকে বই, খাতাপত্র, পুরোনো পত্রিকার পাঁজা।

মেয়েটি ঘুরে আসে, 'ওকি, আপনি দাঁড়িয়েই আছেন। বসুন না লক্ষ্মীটি। মা এক্ষুনি আসবেন। পত্রিকা এনে দেব?'

ছোট্ট মেয়েটির কথার আপন করা সুরে অনেকখানি হালকা হয়ে যায় মন। দেবব্রত তাকিয়ে দেখে, অপরিমিত যত্নে বেড়ে ওঠা কৃশ একটি ছোট্ট মেয়ে—কিন্তু সুস্থ একটি প্রাণ রয়েছে উজ্জ্বল চোখদুটিতে।

পর্দার ওপাশের প্রতিটি কথাই স্পষ্ট শোনা যায় এপাশে—আধাবয়সি মহিলাদের পরচর্চা—খানিকটা কুৎসা। ওপাশ হতে ডাক আসে, 'খুকি।'

'যাই, ঠাকুরমা।' মেয়েটি ছুটে চলে যায়। দেবব্রত অগত্যা পড়া-পত্রিকাখানাতেই চোখ বুলাতে থাকে। কিন্তু পর্দার আড়ালের কর্কশ কথাগুলিই কানে এসে ঘা মারতে থাকে বারে বারে।' মেয়েটাকে একটু ধর দেখি, চালগুলো ঝেড়েনি।'

পার্শ্বস্থিতা আত্মীয়ার নিকট মনের কিছু তিক্ততাও ঝেড়ে ফেলে বর্ষীয়সী মহিলা চাল ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, 'আগের মতো কী আর ঝাড়তে পারি। কিন্তু কী করব—রেশনের চাল। একে তো কাঁকর, তার উপর পাঁচমিশালী!' সমবেদনা জানায় পার্শ্ববর্তিনী—'তোমার কী আর এখনও সংসারের কাজকর্ম করার বয়স আছে। এখন পুজো সন্ধ্যা নিয়ে দিন কাটাবার সময়।'

'অমন ভাগ্যিই কী না। এখন মরতে পারলেই একমাত্র শান্তি।' অদৃষ্টকে বারে বারে ধিক্কার জানায়—

পর্দা ঠেলে ঢোকে শকুন্তলা, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।' লজ্জিত সুরে বলে সে, 'কিন্তু লেখাটা তো টুকে রাখতে পারিনি। আপনি বরং একটু দেখে যান—কষ্ট করে এলেনই যখন।'

শকুন্তলা জানালার উপরের তাক হ'তে একপাঁজা পুরোনো রং-ধরা খাতা টেনে নামিয়ে একমনে খুঁজতে থাকে সদ্য লেখা গল্পটি। দেবব্রত চোখ পড়ে একবার শকুন্তলার হাতের দিকে—সবেমাত্র মশলা পিষে এল, তারই চিহ্ন হলুদ রং-ধরা হাত দু'খানায়।

পর্দার ওপাশে শিশুকণ্ঠে কান্না শুরু হয়। কান্নাটা ক্রমেই চিৎকারে পরিণত হতে থাকে। মনে হয় যেন এখনই বুঝি লাংগস ছিঁড়ে যাবে। মৃদু অধৈর্যের সঙ্গে নীচু গলায় বলে শকুন্তলা, 'পুড়িয়েই ফেলল নাকি ওরা উনুন ধরাতে?'

ওদিকে পর্দার ওপাশ হতে চাপা গলার কড়া ঝাঁজ এসে ধাক্কা খায় পর্দাব গায়ে, 'ডাক না তোর মাকে। মেয়েটা চেঁচিয়ে গলা ফেটে মরছে—কানেও কী যায় না। ছেলেপুলের মায়ের কী আর

দিনরাত কলম নিয়ে বসে থাকলে চলে।' একটু স্বর নামিয়ে যেন স্বগতোক্তি করে মহিলাটি, 'বিদ্বান ছেলের বিদুষী বউ। যত জ্বালা হয়েছে আমার।' নীচু গলায় বলা হলেও সবটুকু কথাই শোনা যায় পর্দার এপাশেও। একটা থমথমে চাপা শ্লেষে ভরে থাকে কোঠাখানা। দেবব্রত নিমেষের জন্য একটু তাকায় শকুন্তলার দিকে—একটা লজ্জার কালিমায় ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে মুখখানা।

একটু অপ্রস্তুতের মতো বলে ফেলে সে, 'আমি ন হয়, আর-একদিন এসে নিয়ে যাব।'

'এই তো পেয়েছি। আপনাকে কষ্ট করে পড়তে হবে। এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে লেখাটা।'

খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে চলে যায় সে। শিশুর কান্না তবু থামে না। আবার সেই একই ঝাঁঝালে কণ্ঠস্বর, 'বাবা, মেয়ের কান্নায় তো আর পারি না। এক মেয়ে জন্মেছে, তার রোগই ছাড়ে না। আর রোগ ছাড়বেই বা কী করে। এমন স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে ভালো মানুষেরও রোগ ধরে যায়। রোদের বংশও নেই।'

দেবব্রত খাতাখানায় মন দেয়। পাঁচ বছর আগেকার পাঠ্যাবস্থার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা—রোমান ইতিহাসের ক্লাস নোট...ক্রীতদাস বিদ্রোহ...জুলিয়াস সিজারের হত্যা।

তারপরে নূতন লিখতে শেখা বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রথম পাঠ—'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।'

সবশেষে শুরু হয় গল্পের আরম্ভ—'ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার মানুষের মিছিল।'

দেবব্রত মন গুছিয়ে আনে গল্পে। বেশ বড়ো গল্প।

'চা, কাকু।' ছোট্ট মেয়েটি চায়ের পেয়ালা রেখে যায় চৌকির উপরে। মিষ্টি হাসির অজস্রতা কচি চোখে। যেন একটি সোনালি রোদের রেখা জোর করেই ঢুকে পড়েছে এ আবদ্ধ ঘরে। ওপাশে আবার অদৃষ্টকে কশাঘাত শুরু হয়ে যায়। 'ভাল বুঝি পোড়া লাগল। কী যে আমার বরাত। তোর মা বুঝি গেছে কলতলায় মেয়ের কাঁথা কাচতে। ডাক দে খুকি।' সঙ্গে সঙ্গে একঝলক পোড়া গন্ধ উড়ে আসে।

'কাঁথা কাচতে একটু পরে গেলে চলে না? পার্শ্ববর্তিনী মৃদু মন্তব্য করে।

'না গিয়েই বা করবে কী। একটু বেলা হতে না হতেই যা ভিড় লেগে যায় কলতলায়। এক বাড়িতে সাত ভাড়াটে। একখানা মাত্র ঘর, চল্লিশ টাকা ভাড়া। এই তো এরা সব খেয়ে গেলে এই ঘরটুকুকেই ধুইয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে বসাবে আমার রান্না। তারপর রাত্রিতে আবার এর উপরই বিছানা পড়বে। এইটুকু ঘরে মানুষ তো আর কম হয় না। হারানের ছেলেরাও তো এখানে থেকেই পড়ে।'

'তোমার তো তবু বউ-ই রান্নাটুকু করে দেয়।' পার্শ্ববর্তিনীর মনের জমানো খেদ বের হয়ে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু গৃহস্বামিনী খুশি না হয় তার কথায়। অপ্রসন্ন সুরে বলে, 'আমি তো বলি বউকে, তোমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়, আমার আতপচালটুকু আমিই ফুটিয়ে নেই। আমরা মূর্খ মানুষ, আমাদের তো আর সময়ের মূল্য নেই তাদের মতো।'

বিদ্বেষ-চুয়ানো প্রতিটি উচ্চারণে ধরা পড়ে অনুচ্চারিত বহু অনুযোগ।

দেবব্রত কানভাঙা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় সন্তর্পণে। ভিতর হতে আবার ডাক শোনা যায়, 'খুকি, তোর কাকার আসনটা পেতে দিয়ে যা।'

এইমাত্র স্নান করে আসা অল্পবয়সের এক ভদ্রলোক একবার পর্দা সরিয়ে একটু দেখে যায় আগন্তুককে। একটা অর্থভরা হাসির কণা চোখের কোণায়।

ওদিকে তদারক শুরু হয় ভিতরে, কি রে সুকু, চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে? দেখতে তো তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। ভালো করে আর হয়ই বা কি করে— রান্নায় কি আর মন থাকে—'

তদারককারিণী ডাক দেয়, 'ও খুকি, তোর মাকে বল, আর চারটি ভাত নিয়ে আসতে।'

ভাত নিয়ে প্রবেশ করে বধূ। শাড়ির মৃদু শব্দ একটু। 'কি বউদি, গল্প লিখতে গিয়ে নিজেই আবার গল্পের নায়িকা হয়ে পড়ো না যেন। বিষ- ঝরা রসিকতা। দেবর সম্পর্ক যখন—রহস্য করার অধিকার তো আছে। অপর পক্ষ নিরুত্তর। পর্দার এপাশের ভদ্রলোকের উপস্থিতিটাই হয়তো বিঁধছে তাকে।

অস্বস্তি বোধ করে দেবব্রত। গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। গল্পের বলিষ্ঠ ইঙ্গিতময় রেশটুকু বারে বারে হোঁচট খায় লেখিকার পর্দার আড়ালের এ কুটিল ইঙ্গিতে। প্রফেসার সেন ঘরে ফেরে টিউশান সেরে, হাতে একটি বাজারের থলি।

এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেবব্রত।

'নমস্কার। অনেকক্ষণ যাবৎ এসেছেন?' ঘামে ভিজে যাওয়া গায়ের শার্টটি অতি যত্নের সঙ্গে খুলতে খুলতে বলে, 'আমার আবার কলেজের সময় হয়ে এল। কিছু মনে করবেন না, আমি স্নানটা সেরে আসি।' দড়িতে ঝুলানো একরাশ জামাকাপড়ের ভিতর হতে খুঁজে বের করে ধুতিখানা।

'আমিও এখন যাব।' হাতের খাতাখানা দেখিয়ে বলে, 'এ গল্পটি রবীন্দ্রসংখ্যায় ছাপাতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন—', মুখের কথা শেষ না হতেই উত্তর দেয় প্রফেসর 'গল্পটুকু পড়ার কী আর ফুরসৃত আছে।'

খুকি তেলের বাটি দিয়ে যায়। মাথায় তেল ডলতে ডলতে বলে, 'এককালে ছিল ওসব সাহিত্যের-টাহিত্যের উৎসাহ। এখন কলেজ আর টিউশান। আর আছে কালোবাজারে ছুটোছুটি। প্রফেসার চলে যায় স্নান সারতে।

ওপরে প্রফেসারের গল্প শোনা যায়, 'ডাক্তারবাড়ি যাওয়ার সময় আর হল না। দেখি রাত্রিতে যদি পারি।'

'কিন্তু ও তো বেড়েছে—কফও আছে বুকে,' শিশুর মায়ের উদ্‌বিগ্ন উত্তরটুকুও কানে আসে।

শকুন্তলা ঘরে ঢোকে—কোলে কাঁথায় জড়ানো রুগ্‌ণ শিশুটির চোখে জ্বরের ঘুম।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেবব্রত শকুন্তলার মুখের দিকে। গভীর বেদনার ছায়া চোখের গভীরে।

মমতায় ভিজে উঠে মনটা—কী চিন্তা করে বলে সে, 'খাতাখানি নিয়ে যাই, টুকে নেবার ব্যবস্থা আমি করব।'

এ ঐকান্তিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ দুটি—অসংখ্য ধন্যবাদ সে চোখে। একটু সংকোচের সঙ্গে বলে, 'আমি একবার চোখ বুলিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। আমারই উচিত ছিল লেখাটা ঠিক করে রাখা। কিন্তু মেয়ের জ্বর হয়ে পড়ায় আর পেরে উঠিনি।'

দেবব্রত অপেক্ষা করে। বসে বসে নতমুখে দেখে সে ঘরের মেঝেটা—বহুস্থানে সিমেন্টই উঠে গিয়েছে। দেওয়াল হতে সর্বক্ষণের জন্য একটা ভ্যাপসা গন্ধ বের হয়ে আসছে। আরেকটি ছেলে ঘরে ঢোকে। দেবব্রত চেয়ে তাকে—শকুন্তলার ভাই, সুব্রত। কোনো ভূমিকা না করেই বলে সে, 'দিদি, তুমি যে কিছু টাকা দেবে বলেছিলে আমাদের, সেটা আজ পেলে উপকার হয়।'

এ মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় শকুন্তলার মুখখানা। অপরাধীর সুরে বলে, 'টাকা তো দেব বলেছিলাম। ভেবেছিলাম—গতবারের লেখাটা দিয়ে বুঝি কিছু টাকা পাব। কিন্তু আমাদের মতো নূতন হাতের লেখা নাকি কাগজে ছাপানোটাই যথেষ্ট মূল্য দেওয়া।'

দেবব্রত তাকিয়ে দেখে আবার একটু লেখিকাকে। দুই হাতে দুই গাছা শাখের চুড়ি, পরিধানে মিলের মোটা শাড়ি—আভরণহীন কানের দুই পাশে চূর্ণ কুন্তল। 'দশটি টাকাও দিতে পারবে না? আমি ওদের আশা দিয়ে এসেছি—দিদির কাছে ঠিক পাব—কথা যখন দিয়েছে সে।' ব্যথিত সুরে বলে সুব্রত। 'অরুণদা যে থাইসিস নিয়ে বেরিয়েছিলেন জেল থেকে তোমাকে বলিনি কী? ইমিডিয়েটলি তাঁকে স্যানিটোরিয়ামে পাঠানো দরকার চাঁদা তুলে।' শকুন্তলার বিবর্ণ, মৌনী মুখের দিকে তাকায় দেবব্রত। ভাষাহীন বেদনার নীরব আর্তনাদে বুঝি ছিঁড়ে পড়ছে কোমল আত্মা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান একজন অ-দেখা কর্মীর প্রাণের মমতায়, আর স্নেহের ভাইয়ের আশাভঙ্গের ব্যথায় বিদীর্ণ দৃষ্টি।—তবু দশটি টাকাও দেবার শক্তি নেই তার!

অনুমান করে দেবব্রত হয়ত আরও কত বাকি টাকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, হয়ত বা ধার-দেওয়া বন্ধুরাও।

সুব্রত চলে যায় ম্লান মুখে।

দেবব্রতও উঠে পড়ে। আবার সেই অপ্রশস্ত নোংরা গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তন্ময় হয়ে ভাবে দেবব্রত, এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কী বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ!

গানা বেগানা

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন ছোটো ছিল, পিকলু ভাবত—হয় সে ছোটোকাকার মতো 'ক্ল্যাসিক্যাল, রাগপ্রধানে নাড়া বাঁধবে, নয়তো শিল্পী হবে। এখন ওর মনটা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—এ সব করে ছোটকা কী পেল? সুরের মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে থাকতে থাকতে একদিন বুঝতে পারল যে গানের লাইনটা ওকে পথে বসিয়ে অন্য কোনোখানে চলে গেছে। এখন পথই ভরসা। কেবল রাস্তায় চলার সময় যেটুকু চাপা সুরে রেওয়াজ করার অধিকার আছে ছোটকার। ট্রামে বাসে গুন্‌গুন্ করাটাও সহ্য করে ব্যস্ত মানুষের দল। ক্ল্যাসিক্যাল গান গুন্‌গুন্ করে গাইলে লোকে টিটকিরি দিয়ে বলে, 'ও দাদা, গলা ছেড়ে ধরুন—একটু শুনি; ঐতিহাসিক সুর—!' বলে গা টেপাটেপি করে, চোখ মটকে হাসে। আধুনিক গাইলে তবু 'অমুক কণ্ঠী', 'তমুক কণ্ঠী' বলে এখানে ওখানে চান্স পেত। কিন্তু না, সে ভাবে আবার উনি গাইবেন না, শুধু ক্ল্যাসিক্যাল ছাড়া ওর চলবে না। বাড়িতে একটা সেকেলে অরগ্যান আছে, যা বাজাবার কথা আজকাল কেউ ভাবতেই পারে না, সেটা ছোটকা মাঝে মাঝে এমন করে বাজাবেন, মনে হবে এ বাড়িতে কেউ মনপ্রাণ ঢেলে যিশুখ্রিস্টের বন্দনা করছেন।

এ হেন ছোটকা একদিন বাড়িতে বউদিদের টিভির সামনে বসে 'হি-হি, হা-হা' হাসি এবং পরমুহূর্তে নায়িকার দুঃখে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না আর সহ্য করতে না পেরে—

'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' গানটা গাইতে গাইতে লেকের দিকে চলে গেলেন। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে দেখছিলেন এদিকটায়, রাগপ্রধান তেমন পাত্তা না পেলেও, রবীন্দ্রসঙ্গীতটায় কেউ কেউ একটু কান দেয়। তখন বেচাকেনা কম, ফিরিওয়ালা, ভেলপুরী আর ফুচকাওয়ালারা অথবা স্কুল-কলেজ-পালানো ছেলে মেয়েরা হাসি মুখে শোনে, বলে, 'ঠিক যেন হেমন্তকুমারের মতো। আজ একটা জীন্‌স পরা মেয়ে 'হিহি' করে পাশের ছেলের গায়ে ঢলে পড়ে, 'দাদুর বয়স হলে কী হবে, গাইছেন যেন রূপকুমারের মতো।'

ঠিক তার কথাটার শেষ অক্ষরের ওপর কে যেন চোখ বলে উঠতেই সবাই চমকে উঠল এবং বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ও ওর মুখের দিকে চাইতে থাকল।

একটা ভয়ানক দেখতে লোক—ছোটকার মনে হল কোথায় দেখেছেন। পিঠে কুঁজ, কুচকুচে কালো রং। ঘাড়ে গর্দানে মানুষটা বড়োজোর সাড়ে চার ফুট লম্বা। সব চাইতে মারাত্মক তার চোখজোড়া—সাদা অংশে লাল ছোপ। তার মাঝখানে মণিদুটো রঙিন মার্বেলের মতো। ঠিক যেন সে 'হাঞ্চ ব্যাক অফ্ নাত্রাদ্রাম।'।

দেখতে দেখতে ভিড় ফরসা হয়ে গেল। খুব বেশি কথাও শোনা গেল না। ছোটকা আর কী করেন, ভদ্রতার খাতিরে বলে উঠলেন, 'আপনার নাম?'

'আমায় আপনি বলছেন কেন দাদা? আমার নাম চন্দ্রকান্ত খাসনবীশ। একটা কাজ দেবেন দাদা? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনাদের বাড়িতে আমি টিকে যাব।'

'আমায় দেখে এ কথা মনে হচ্ছে? তাহলে একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে যে চন্দ্রকান্ত খাসনবীশ।' বলে ছোটকা বেশ খুশি খুশি হাসিমুখে পায়চারী করতে লাগলেন। লক্ষ্য করলেন, চন্দ্রকান্তর উচ্চারণ এবং কথা বলার ভঙ্গি বেশ সভ্যভব্য।

'একটা রাগ-প্রধান গান ধর'—বলে ছোটকা ঘাসের ওপর প্রায় যোগাসনে বসলেন।

'কিরকম?' চন্দ্রকান্তও মাটিতে গড় হয়ে বসে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'রাগ-প্রধান না কীর্তন?'

'একটা পবিত্র রাগ-প্রধান হয়ে যাক। কতদিন শুনিনি।'

'বেশ।' বলে এক হাতে কান চেপে ধরে অন্য হাতটা খেলিয়ে দিয়ে চন্দ্রকান্ত গেয়ে উঠল—

'যমুনা কী তীর আমরি যমুনা কী তী-ই র...'

ক্রমশ তার গলা চড়তে লাগল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গিটকিরি মার তান—উঠছে, নামছে, গমক দিচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। ছোটকা ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো শুনছেন।

গানের শেষের টানটুকু কানে নিয়ে 'আহা-হা-হা কত পরে গানটা শুনলাম—বড়ো আনন্দ দিলে চন্দ্রকান্ত।' এগুলো বলতে বলতে চোখ খুলে ছোটকা তো হতবাক! লোকের ভিড় জমে গেছে ওঁদের ঘিরে। আগের মতো কেউ টিটকিরি কাটল না। একজন কেবল, 'এ যেন ভূতের গলায় হরিনাম।' বলে ভিড়ের পেছন দিকে চলে গেল।

হঠাৎ সকলে চনমনে হয়ে উঠতেই ভীষণ হাততালি, পড়ে গেল। এক বৃদ্ধ দূরে বসে বসে গান শুনছিলেন। বলে উঠলেন, 'ভগবান কাকে যে কী দিয়ে বসেন।'

এর সবটাই পিকলু পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং শুনছিল। এবার এগিয়ে আসতেই ছোটকা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, 'বাবা পিকলু, গান শুনলে তো! এ হল চন্দ্রকান্ত খাসনবিশ, আমাদের বাড়ি থাকবে। কাজের লোক খুঁজতে বলেছিলেন মেজবউদি, চন্দ্রকান্ত সব কাজ করে দেবে বলছে।'

পিকলু একেবারে হতভম্ব। এই লোক চাকরের কাজ করবে, তাদের বাড়িতে। চেহারা দেখেই তো কাকিমা-পিসিমা'রা বিদায় করে দেবেন। আবদুল করিম খাঁ'র মতো গান গাওয়া ভুতুড়ে চেহারার লোক ওদের চলবে না। পিকলুর মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।

'তুমি বরং নিয়ে যাও ছোটকা, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ঠিক আছে, অগত্যা। তুমিও এস পিকলু। এর সঙ্গে আলাপ হওয়া দরকার—ফ্যামিলির নতুন মেম্বার। এখন মেজবউদি না ব্যাগড়বাই করে দেয়।'

লেকের কাছেই ওদের বাড়ি, একটু সেকেলে ধরনের আধুনিক বাড়ি। এখনও সব একসঙ্গেই আছেন। মেজকাকা বলেন, 'ইউনিটি ইন্ ডাইভারসিটি' কথাটা এ ফ্যামিলিতে কীরকম আজও ধরে রাখা গেছে বল।'

পিকলুর মনটা যে বেশ উতলা তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। খুবই এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছে। ছোটকা গলা নামিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে চন্দ্রকান্তর কানের কাছে লম্বা লিকলিকে শরীরটা আর্ধেক নামিয়ে বলতে লাগলেন, 'পিকলু হ'ল পরিবারের জুয়েল—আসল হীরে। ওর বাবা আর মা—আমাদের বড়দা আর বড়বউদি একটা সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। ওর মার কোল থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে বেঁচে যায়। কখনও এ বিষয়ে ওর সঙ্গে কোনো কথা বলবি না। আমরা কেউ বলি না।'

'কেন?'

'কেন-ট্যান নয়, বলবি না, ব্যাস।'

'ঠিক আছে।'

বাড়ি তখন প্রায় 'হাউস ফুল' বউদিরা, পিসিমা, দাদা, কাকারা মিলে মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হচ্ছিল—হঠাৎ চন্দ্রকান্তকে নিয়ে ছোটকাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন আপনা- আপনি চুপ হয়ে গেল। ওর আসার কারণটা ছোটকা বলে দেবার পর নানা ধরনের ইলেকট্রিক কারেন্ট সমবেত পরিবারের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। নড়ে চড়ে উঠলেন সবাই যে যার মতো করে।

চন্দ্রকান্তকে নিয়ে ছোটকা ভেতরে ঘরবাড়ি দেখাতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সবাই হাঁই হাঁই করে উঠে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। পিকলুর বড়দা প্রায় মুখ ভেংচে বলে উঠল, 'করবে তো যত হ্যাকওয়ার্ক, সেকালে মা-মাসি-পিসিমা'রা যেটা করতেন। তার জন্যে আবার ইয়ে কুমারের তো চেহারা চাই? তাহলে কর সব বাড়ির কাজ, নয়তো নিজেদের পছন্দ মতো দেখে নাও, আমি এর মধ্যে নেই।' মেজকাকা বড়ো ছেলের পক্ষ নিয়ে বলে উঠলেন, 'আমিও নেই।'

ব্যাপার দেখে মহিলারা একটু নরম হলেন। সেজবউ চাকরি করেন। তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন, 'দেখাই যাক না।'

তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। পিক্‌লুকে ছোটকার এক বন্ধু একটা কুচকুচে কালো থোকা থোকা লোমে ঢাকা কুকুরছানা দিয়েছিলেন। কিছুদিন হল অতিরিক্ত রক্তচোষা পোকার আক্রমণ তাকে খুব কাহিল করে ফেলেছে। পিকলু তার নাম রেখেছে ঝুমঝুম। ঘরের কোণে চুপচাপ নির্জীবভাবে বসেছিল। হঠাৎ মুখ তুলে হাওয়ায় কী যেন শুঁকল। তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে ছোট্ট ল্যাজটা টুকটুক করে নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলে গেল চন্দ্রকান্তর কাছে। 'আহারে ছেলেটাকে কেউ দেখে না বুঝি।' বলে চন্দ্রকান্ত তাকে দু'হাতে তুলে পরখ করতে লাগল, 'রক্তচোষা এঁটুলী —নাঃ বেছে ফেলা দরকার।' বলেই পটাপট করে এঁটুলী মেরে ফেলল কয়েকটা।

ছোটকা বেগতিক দেখে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, 'আচ্ছা, চল চল।' কিন্তু ভাবি ভুলল না। বলল, 'কৃষ্ণের জীব, পরগাছার হাতে বেঘোরে মারা পড়েছে—কেউ দেখছে না? পাপ হবে না, দাদাবাবু?'

অনেক চেষ্টায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকান্তের হাত থেকে ঝুমঝুমকে পিক্‌লু নিয়ে নিতে তবেই সব কাজকর্ম বুঝে নিল সে। কাজে হাত লাগিয়ে পিকলুর দিকে চেয়ে গজ গজ করে বলতে থাকল, 'ঈশ্বর জীবের শত্রু হিসেবে যে জীব তৈরি করেছেন, তার মধ্যে এঁটুলী, তেলাপোকা, জোঁক—এইসব পড়ে। ওদের ঠিক সময় শেষ করতে না পারলে সুন্দর সুন্দর জীবগুলোকে ওরা সাবাড় করে দেবে।'

কাকিমারা চন্দ্রকান্তর কাজে খুব একটা খুঁত ধরতে পারলেন না। যা বুঝিয়ে বলেন তা নিখুঁতভাবে করে দেন। বাজারের টাকায় যে হাত সাফাই নেই তাও বেশ বুঝে গেলেন সবাই। ভালো ভালো মাছ, তরিতরকারী আনে অথচ বেশি খরচ হয় না।

চন্দ্রকান্ত দিন কয়েকের মধ্যে ঝুমঝুমকে সুস্থ করে তুলল। বাজার থেকে কার্বলিক সাবান আর ব্রাশ কিনে আনল। ছোটকাই পয়সা যোগালেন। পিকলুকে ফিস ফিস করে বললেন, 'যা চায় এনে দে। এ ফ্যামিলির একটা অ্যাসেট হয়ে উঠবে দেখিস।'

এতদিনে ঝুমঝুম সত্যিকারের একটা 'প্রাইজ' কুকুরের মতো দেখতে হয়েছে। চন্দ্রকান্তের পায় পায় ঘোরে। পিকলুকে দেখতে ল্যাজ নাড়ায় বটে, তবে তা যেন একটু 'ছোটোবাবু, ভালো তো' গোছের।

সেদিন সেজকাকিমা বসে তরকারি কুটছেন। দূরে বসে চন্দ্রকান্ত কী যেন বিড় বিড় করে বলছে বলে মনে হল পিক্‌লুর। কাছে গিয়ে দেখে ওর কোলে ঝুমঝুম, তার সঙ্গেই তার যেন কথা হচ্ছে, 'আত্মা চেনা কী অত সহজ রে পাগলা—অনেক ভেতর থেকে এ সব বোধ উঠে আসে।'

'আপন মনে অতসব কী বলছ চন্দ্রদাদা?'

'আর বলছি কী! আমি তো মানুষের আত্মা চিনি—এ বাড়িটা তোমাকে আর ছোটোবাবুকে দেখে ভেবেছিলাম অন্যরকম হবে। কিন্তু ওই দেখ, মেজবউদি তরকারি কুটছেন গুনে গুনে আলুর টুকরোগুলো রাখছেন। মাছের টুকরোর বড়োগুলো দেবেন নিজের স্বামী আর ছেলেকে। ওর আত্মাটি একেবারে পুঁটি মাছের তুল্য। তারপর ধর সেজদাদাবাবুর। স্বার্থপর ফুলবাবু, নিজে যা রোজগার করেন ফূর্তিফার্তায় বিকিয়ে দেন। জানটা সরষে দানার চাইতে ক্ষুদ্র। ওঁর স্ত্রীটি বোঝেন কিন্তু কিছু করতে পারেন না।'

'আর ছোটকা?' পিকলুর উদগ্রীব প্রশ্ন।

'ছোটকা হলেন পাগলাঝোরা, আর তুমি হলে আসল হিরে।'

'আর ঝুমঝুম?'

'তোমার আর আমার আত্মার ওজন মিলে ওরটা হয়। কেন জান, বিবেকানন্দ জানতেন তাই ওদের নিয়ে বলেছেন,—'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটাকে জানলার ধার থেকে তুলে নিয়ে চন্দ্রকান্ত কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠল, 'যাই নিদেনপক্ষে বিছানাগুলো তো সাফ করা যাক।'

পিকলুর সারা রাত ভালো ঘুম হল না। তন্দ্রায় তন্দ্রায় সকাল হতেই লাফিয়ে উঠে চলে গেল চন্দ্রকান্তর ঘরে। একি! কোথায় গেল চন্দ্রদাদা আর ঝুমঝুম। 'ছোটকা, ছোটকা, শিগ্‌গির এস, ওরা নেই?'

'কী হয়েছে বাবা পিক্‌লু?' বলে ছোটকা চন্দ্রকান্তর জন্যে বরাদ্দ রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট কুঠুরিটায় এসে দেখল, পিকলুর চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। হাতে একটা চিঠি, তাতে লেখা আছে চমৎকার গোটা অক্ষরে—

'অপরাধ নেবেন না ছোটোবাবু! আমি চলে যাচ্ছি। পিকলু আর খানিকটা আপনি আমাকে টেনেছিলেন। মানুষ চেনার নেশা আমার আর জীবজন্তুদের আপন হওয়া আমার স্বভাব। ঝুম্‌ঝুম্‌কে নিতে চাইনি। কিন্তু ওর কান্না শুনলে আপনাদেরও চোখে জল আসত। তাই সঙ্গে নিতে হল। সবাইকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি—

চন্দ্রকান্ত খাসনবীশ

পিকলু ছুটে বেরিয়ে গেল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের লেকের দিকটায়। গাদা গাদা লাল কৃষ্ণচূড়া হাওয়ায় মাথা ঝাঁকাচ্ছে—সত্যিই কী কানে আসছে আবদুল করিম খাঁ'র সেই গান—

'যমুনা কী তীর—আমরি...'

ফুল-দোল

শৈলজা মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

শুনিয়াছি পূর্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ চলিত। এখন সেস্থান শাল, তমাল, মহুয়া, হরিতকী, পলাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে, শীর্ণা সিঙ্গারণ নদীটি পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি বনের মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল-কুঠীর যে-সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বল-দর্পী বড়ো-সাহেব বাস করিতেন, সেগুলা এখন জীর্ণ পঞ্জরাস্থি-সম্বল অবস্থায় নতশিরে ধূলায় মিশিতেছে এবং সাহেবের পরিবর্তে সম্প্রতি সেখানে বন্য শৃগালের দল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক, উভয় সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়া লাল কাঁকরের যে প্রশস্ত পথখানি তাহারই পাশে নির্বিকার মহাদেবের মতো ধূলিশয্যা রচনা করিয়া পড়িয়াছিল,—সে যদিও আজ প্রকৃতির করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে তথাপি কচিদুর্ব্বাঘাসগুলি তাহার রক্ত-রাঙা বুকের উপর বাঁচিয়া থাকতে পারে নাই। কত শত নিরীহ শ্রমজীবীর রক্তে রাঙা এই পণরেখা,—নীলকুঠীর বহুবিধ অনাচার-অত্যাচারের কাহিনি আজিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাঁচিয়া আছে!

সেদিন অপরাহ্ণে এক সাঁওতাল যুবক পুনকা এবং এক সাঁওতাল যুবতী সুখী, ফুল তুলিবার জন্য এই বনে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একটা কয়লা-কুঠার কুলি-ধাওড়া হইতে তাহারা আসিয়াছে। আগামী কল্য তাহাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহারা আজ হইতে পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না-জানা কী একটা বনলতার গাছ উঠিয়াছে এবং ফুলে-ফুলে সারা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,—এমনকী, গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে সুখীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাঁশের ঝুড়িটা নামাইল এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপি রঙের ফুলগুলির পানে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এদিকে ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে সূর্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এই পুষ্প শোভিত ভগ্ন প্রাচীরের উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া, ধীরে-ধীরে সুখী তাহার খোঁপায় গুঁজিল। ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া এখনই তাহার ঝুড়িটা ভর্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া দিতে সে যেন একটুখানি সঙ্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন বেদনাময় সুন্দরীর বুকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা বাজিতেছিল।

ডানদিকের ঝোঁপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, পুন্‌কা তখন অন্য ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। সুখী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র পল্লবের ভিতর সে যে কোন্‌খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবিল, পুন্‌কা ফিরিতে-না-ফিরিতে এই সুন্দর ফুলগুলি দিয়া সে যদি তাহার ঝুড়িটা ভর্তি করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়তো অবাক হইয়া যাইবে।

সুখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তাহার ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা ফুলের খোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,—পট্‌ করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে হুল বিঁধিয়া দিতেই সুখী চমকিয়া উঠিল।

উঃ! বলিয়া হাতের আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল, পুন্‌কা, ও পুন্‌কা!...

পুন্‌কা বেশি দূরে যায় নাই। অনতিদূরে একটা ঝুম্‌কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার মাটিটা খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইহা তাহাদের উৎসবের একটা রীতি। আজ ফুল তুলিতে আসিয়া যদি কোনো বন্ধ্যা গাছ কাহারও নজরে পড়ে,—যদি দেখা যায় কোনো অযত্ন-বর্দ্ধিত গাছে ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হইলে তাহার তলায় মাটি ভালো করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া, তাহাতে জল সেচন করিতে হয়।

হঠাৎ সুখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া পুন্‌কা বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অস্তসূর্যের কনক-কিরণ পাতে সুখীর নিটোল-সুন্দর বলল মুখখানি হিঙুল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল। বন ফুল-সৌরভের স্নিগ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। পুন্‌কা আনন্দাতিশয্যে কহিয়া উঠিল, ই রে বাপ্‌!...ই যে মেলা ফুল সুখী!...বাঃ!...অ্যাঁ! ই কি, তুঁই অমন্‌ করছিস্‌ যে? হাতে তোর কী হল? বলিয়া পুন্‌কা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই সুখী বলিল, মোধ্‌ মাছিতে বিঁধে দিলেক্‌।—উঃ!

কই দেখি? বলিয়া পুন্‌কা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, ডান হাতের একটা আঙুল সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের তলার একমুঠা দুর্বাঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া পুনকা জোরে-জোরে সুখীর বেদনার্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া দিয়া বলিল, ব্যস! আর কিছুই কর্‌তে হবেক্‌ নাই,—এখনই ভালো হয়ে যাবেক্‌।—লে, বোস এইখানে।

ধীরে ধীরে সুখীর গলা জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর তাহারা পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

সুখী তাহার মাথাটা পুন্‌কার বুকের উপর এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, হুঁ, বড়ো জ্বলছে যে!

সুখীর হাতখানা তখনও পুন্‌কা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। এইবার আঙুলটা নিজের ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না, না,—জ্বলবেক্‌ নাই দ্যাখ্‌ তুঁই!

এই বসন্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর নব-যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি-কিশলয়ের উপর সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করিতেছিল।

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোটো পাখি অস্পষ্ট কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে উড়িয়া গেল।

পুন্‌কা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভালো হল।

সুখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। কহিল, হুঁ,—আর একটুকু।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন্‌কা সসঙ্কোচে ডাকিল, সুখী!

সুখী ধীরে-ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, উঁ।

—কাল ফুল-পরব্‌; লয়?

—হুঁ।

—কাল আমরা খুব ফূর্তি করব, কী বল সুখী? বলিয়া পুন্‌কা ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখীর মুখের নিকট নিজের মুখখানা লইয়া গেল।

সুখী ঈষৎ হাসিল মাত্র।

বনের ভিতর হইতে আম্রমুকুল এবং ঘাসফুলের তীব্র গন্ধ দম্‌কা বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

পুন্‌কা অর একটু বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখীর হাত দুইটা সাজোরে চাপিয়া ধরিল।

ধেৎ। বলিয়া সুখী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্‌কা, ফুল তুলি—না হলে রাত হয়ে যাবেক্‌।

—হোক কেনে! জোস্তা রাত বেটে। বলিয়া পুন্‌কা ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, তুই ভারি দুষ্টু। মাত্‌লা হলে হয়তো কিছুই বল্‌থিস্‌ নাই।

মাত্‌লা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী। বয়স বেশি হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো, এবং সেই জন্য সুখীর বাবা তাহারই সহিত সুখীর বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সুখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও পুন্‌কাকেই বিবাহ করে, তাই মাত্‌লার নাম শুনিয়া সুখী রাগিয়া উঠিল। একটা ফুলের খোপা পুন্‌কার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হাঁরে, খাল্‌ভরা!—উয়ার নাম কর্‌বি ত' এই আমি চল্লম্‌।

সুখী সত্যসত্যই অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল পুন্‌কা বলিল, যা কেনে, তুকে্‌ কে লেহর্‌ কর্‌ছে।

সুখী কিয়ৎদূর চলিয়া গেলে, পুন্‌কা জোরে জোরে বলিল, একা যাস্‌ না সুখী, ভালোয় ভালোয় বল্‌ছি,—শিয়াল্‌ খেপেছে, কামড়াঁই দিবেক্‌।

সুখী পিছন্‌ ফিরিয়া বলিল, আমাকে কাম্‌ড়াবেক্‌, বেশ কর্‌বেক,—তুর কী?

না, না, মিছে করে বল্‌লুম সুখী, আয়,—রাগ করিস্‌ না, ছি! বলিয়া পুন্‌কা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সুখী তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া অভিমানভরে কহিল, যা, তুর তার ভার লাগে নাই। আমি যাব।

পুন্‌কা আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল। সুখী জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

পুন্‌কা হাসিয়া বলিল, তুঁই আমার জোর্‌কে লারবি সুখী কেনে মিছে টানাটানি কর্‌ছিস। চল্‌-চল্‌ আর বল্‌ব নাই।

সুখী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হুঁ,—কিস্‌কে।

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। সুখীর মাথায় ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে ফিরিল।

নির্মেঘ নির্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।... পশ্চাতে তন্দ্রাতিভূত বনানী পড়িয়া রহিল।

বন পার হইয়া কতকগুলা বাঁশ ঝোপের ধারে ধারে তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে।

পুন্‌কা বলিল, আমার ভয় লাগে সুখী, কাল তুর বাবা হয়তো মাতলার সঙ্গে তুর বিয়ার ঠিক করবেক। উয়ার চাষ আছে, পাঁচ-ছ বিঘা জমি আছে, পঁচিশটা মুরগি আছে। আমার তো উ-সব কিছুই নাই। আমি যে বড়ো গরিব সুখী, তাথেই ভয় লাগে!

সুখী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য দূরে একটা শৃগাল দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—হুঁ দ্যাখ্ একটা শিয়াল।

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দুই জোড়া পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলিধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়া উঠিতেছিল।

একটা পথের বাঁকে আসিয়া পুনকা বলিল, তা হলে আমি যাই।...

—হুঁ, যা।

—কাল ঠিক আসব।

—হুঁ, আসিস।

দু'জনা দুই পথ ধরিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, পুনকা মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সুখীও তাহারই দিকে তাকাইতেছে। উভয়েই ফিক্‌ফিক করিয়া ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর কেহ কাহারও পানে তাকাইল না।

॥ দুই ॥

পুনকা ধাওড়ায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বেশ ভালো বলিয়া বোধ হইল না। দেখিল, তাহাদের কুটিরের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে,—তাহার ডান-পায়ের হাঁটুর উপর কী একটা গাছের কতকগুলা পাতা বাঁধিয়া পুরু করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুনকার বৃদ্ধা মাতা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহতস্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক দিতে শুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কী ব্যাপার ঘটিয়া গেল, জানিবার জন্য কৌতূহল জাগিতেই তাহার মা বলিয়া উঠিল,—তুর দায়ে বুড়া বাপ মার খেঁয়ে খেঁয়ে মরুক, আর তুঁই যা খুশি তাই কর।

—কেনে, কী হল?

পুনকার বৃদ্ধ পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল,—সেই কাবলিওয়ালা এসেছিল,—চারটি টাকা পাবেক, তাথেই।

—তাথেই তুখে ঠেঙ্গাই দিয়ে গেল নাকি?

—হুঁ কী করব বল। তুঁই ঘরে ছিলি নাই।

পুনকা বিষণ্নমবদনে চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া, সেই নিষ্ঠুর কাবলিওয়ালার এই নির্মম ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে গর্জিতে লাগিল। সে ঘরে থাকিলে হয়তো এই শক্তসামর্থ্যহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের সাহস হইত না।

পুনকাকে এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বুড়া বলিল,—ভেবে আর কী হবেক পুনকা, যা খাগা যা।

ঘরের এককোণে একটা হাঁড়িতে ভাত রাঁধা ছিল। পুনকার মা ভাতগুলা একটা বড়ো থালায় ঢালিয়া দুই ভাগ করিল।

পুনকা বলিল,—তুর ভাত কই?

—আমার আছে। লে তুরা এগুতে খেঁয়ে লে।—তুর বাবাকে ডাক।—বলিয়া তাহাদের দুই পিতাপুত্রের ভাতের থালা—দুইটা আগাইয়া দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার মায়ের তরে ভাত আছে কিনা দেখিবার জন্য পুনকা হাঁড়িটা তুলিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার মা হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুরা খা,— আমার আছে।

পুনকা বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের ভাগের অর্দ্ধেকগুলা ভাত থালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতেছিল। তাহার মা বলিল, —আমার মাথার কিরা পুনকা,—তুঁই সবগুলি খা। তুর পেট ভরে নাই।

—হুঁ, ভরেছে, আমি আর খেতে লারব।

—খুব পারবি পুনকা। আমার মাথার কিরা,—আমার রক্তে চান করিস যদি না খাস।

পুনকা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জোরে বলিয়া উঠিল,—তরকারী নাই, কিছু নাই, নুন দিঁয়ে আমি অতগলা ভাত গিলতে লারব-লারব-লারব্। হল?—বলিয়া পুনকা থালাটা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

মাতা পুত্রের এই দুঃখময় স্নেহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ পিতার মুখের গ্রাস পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলা গিলতে লাগিল।

দৈন্য-প্রপীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনকা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যুষে সে তাহার মলিন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধ-মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধ্যে কখন তাহাদের কুটির এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি সুন্দরভাবে ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া গোবরের নাত দিয়া তাহার উপর কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

হাঁটুর উপর হাত দুইটা সংবদ্ধ করিয়া পুনকা বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন।... কিন্তু পেটে যাহাদের এক বেলা দুমুঠা অন্ন পড়ে না, তাহাদের আবার উৎসব কীসের? সে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট শুনিয়াছে,—তাহারা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে বাস করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটিরে অভাব-অনটন ছিল না, যখন তাহারা এতখানি সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে সামান্য অর্থের দায়ে পড়িয়া পড়িয়া কাবুলিওয়ালার মার খাইতে হইত না, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া নাচিত, গাহিত, উৎসব করিত। অর্দ্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত পুনকার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে চাহিয়া উপহাস করিতেছে।... আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ দুর্বল পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া পড়িবে,—গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর কণ্ঠে বাক সরিবে না,—তবু আজ উৎসবের বিড়ম্বনা!...সঙ্গে সঙ্গে সুখীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার কথা।...

যদি সুখীর বাবা মাতলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে সুখীকে জয় করিতে হইবে।

ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পা দিয়া মাড়াইয়া পুনকা বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,—আজ পরবের দিনে আর খাদে যেয়ে কাজ নাই, পুনকা। কারু ঘরে চাল-ডাল ধার-ধোর করে এনে আজকার দিনটা চালাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়া উঠিল,—হাঁ, আর পরবের দিনে গুষ্টিসুদ্ধ কাবেলের মার খা।

পুনকা হন হন করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়া গেল।

॥ তিন ॥

বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার উপায় নাই, বেলা একটা, কী রাত্রি একটা। চারিদিকে গম্ভীর অন্ধকার থমথম করিতেছে,—মাত্র যে-সব স্থানে কুলিরা কাজ করিতেছিল, সেইসব জায়গায় এক-একটা কেরোসিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। উহাতে আলো হওয়া অপেক্ষা বরং পার্শ্বস্থ অন্ধকারটা বেশ ভালো করিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

আজ ‘পরবের’ দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলিকামিনেরা কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের নীচে গোলমাল কিছু কম। পুনকা যেখানে কয়লা কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। তাহার সহিত আরও দুই জন বাউরী কুলী কাজ করিতেছিল।

পুনকা দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা-কাটিয়াও তাহার রোজগার এখনও পাঁচআনার বেশি হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইটা কেমন যেন অবশ হইয়া আসিতেছে,—কাজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। যদি কোনো রকমে বৈকাল পর্যন্ত খাটিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত একটা টাকা রোজগার করিবে,—কিন্তু তাহাতেও তো তাহার কিছুই হইবে না অতি কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর দু’ বেলা খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালা? কথাটা ভাবিতেই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।—কাল তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সে মারিয়া গেছে,—আজ হয়ত তাহার বুড়ি মায়ের গায়েও হাত তুলিবে। এতক্ষণ হয়ত তাহারা কাহারও বাড়িতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, কিংবা হয়ত—

—আজ না উৎসবের দিন।... কথাটা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়লা-কাটা গাঁইতিখানা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, পুনকা তাহার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের উপর বসিয়া পড়িল। পাতাল-গহ্বরের সেই বিভীষিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক কঠিন কয়লাস্তরের গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানাজাতীয় ফুল যেন নিমেষেই ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যুঁই চামেলি চাঁপা করবী ভূমিচম্পা ঝুম্‌কা পলাশ মহুয়া বাবলা,—আরও কত কী!...তাহার মধ্যে আর একখানা কুসুম সুকুমার তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি! সে হয়ত’ এতক্ষণ চন্দ্রমল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী চাঁপায় করবী বাঁধিয়া, ঝুমকা-ফুলের কর্ণাভরণ এবং বাব্‌লা-ফুলের নাকছাবি পরিয়া, তাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর, সে কিনা আজ এই উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাণ দিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি হাসি গান উৎসব আনন্দ,—পেটের দায়ে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্ দিক দিয়া যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে, কে জানে? এ কী বেদনা,—এ কী দুর্ভোগ!...

নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য কয়েকটা থালায় ভাত বাঁধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলি রমণী গান গাহিতে গাহিতে সেইদিকেই আসিতেছিল। অগ্রবর্তিনীর হাতে একটা কেরোসিনের ‘মগ’ জ্বলিতেছে। কিন্তু পুনকার জন্য কে-ই বা আনিবে, কী-ই বা আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল, এই মেয়েগুলোর মাথা হইতে একটা থালা কাড়িয়া লইয়া পেট ভরিয়া খাই।

এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার আবরণহীন উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটা স-বুট পদাঘাত পড়িতেই পুনকার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হুমড়ি খাইযা পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল,—কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদূতের মতো তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্তেই তাহার কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উৎসবের আলোহাসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন ‘ফষ্’ করিয়া নিভিয়া গেল এবং সেই পাতালপুরীর আঁধার গুহায় কঠিন কয়লার স্তরগুলা বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

পুনকা ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাঁইতিটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব চলিয়া গেল, কিন্তু এবার তাহার গাঁইতি থামিল না। কঠিন কয়লার উপর তাহার ইস্পাতের গাঁইতিখানা ‘খং’ ‘খং’ শব্দে বারে বারে তীব্র আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল,—এই খাদের ভিতরে বহুবিধ আপদ-বিপদ, নিরীহ কুলিদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে তা গ্রাস করে না! তাহার মতো অনেক লোক এই পাতালপুরিতে

পেটের জন্য প্রাণ দিয়াছে,—এখন তাহাদের মৃত আত্মাগুলো জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের সঙ্গী করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার্ত প্রাণের শত ধন্যবাদে তাহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়।...এক মুহূর্তে কী সমস্ত ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে না? সে চাহিতেছিল, এমন একটা কিছু, যাহাতে মুহূর্তের মধ্যে প্রলয়েব সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পে সমস্ত বসুধা টলমল করিয়া উঠুক, উপরের গ্রাম নগর লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর খসিয়া পড়ুক, যাদের ভিতর আগুন ধরিয়া যাক, অগ্নি-বরণী নাগ-নাগিণীর মতো অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকুক! খাদের উপরে,—যেখানে জাগ্রত জগতের নব-নারীর মধ্যে সভ্যতা-অসভ্যতার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছে, যেখানে ধনী-নির্ধনের, প্রবল এবং দুর্বলেব, উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতেব সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে,—যেখানে দুর্বলের রক্তে রাঙা প্রবলের বিজয়নিশান, উৎপীড়িতের বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য সমস্ত নিভিয়া যাক,—উল্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ হইতে থাকুক,—তাহার মতো উপবাসী গরিবের দল যেখানে তপ্ত ধূলিশয্যায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক।

পুনকার হাতের অস্ত্র ঠং ঠং খং খং করিয়া অবিশ্রান্তভাবে কয়লা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহূর্ত বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,—কথা কহিবার সময় নাই। কান দুইটা আগুনের মতো গরম হইয়া উঠিয়াছে,—নাক দিয়া উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে, সর্ব শরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপর উৎসব শুরু হইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষরমণীর সর্বাঙ্গে ফুলের ছড়াছড়ি। বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে আমোদে আহ্লাদে, তাহারা যেন দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি আজ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে ফুলের দোল্‌না টাঙাইয়া পুরুষরমণী দুলিতেছে,—ছেলে মেয়েরা পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—সুবিন্যস্ত-কবরী যুবতীগণ ফুলের গহনা পরিয়া হেলিয়া দুলিয়া গান ধরিয়াছে। যুবকগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মালা দুলাইয়া আজ বাঁশিতে বেহাগের বেদনা সাধিতেছে। সকালের নৃত্য-গীত আনন্দ-কলরব যেন সপ্তমে চড়িয়াছে,—আজ যেন তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস সমস্ত সৌন্দর্য শোষণ করিয়া লইবে, কাহারও কোনো ক্ষুধা আজ অতৃপ্ত থাকিবে না।

সুখীর বাবা আজ মাতলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র সুখীব একটুখানি সম্মতির অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্তত করিতেছিল, কারণ, পুনকা যে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহার কোনো সংশয় ছিল না। সুখী জানিত পুনকা আসিয়াই মাৎলাব হাত হইতে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে,— সেও আর কোনো কথা না বলিয়া তাহার সহিত উধাও হইবে। এ বিবাহ সে কখনই হইতে দিবে না। পয়সা না থাকুক, পুনকার গায়ের জোর তো আছে! একটা আমগাছের তলায় বসিয়া সুখী এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেকক্ষণ হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না—গালাগালি খাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুনকা আসে না। সুখী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহাদের এত কথা হইল, এত প্রতিশ্রুতি, এত ভালোবাসা, এসব কী তবে কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কী পুনকা তাহার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে? কিন্তু সে-কথা সে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুনকার উপর তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, দুই হাত দিয়া তাহার নিজের চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলে, ফুলেব গহনাগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া পায়ে দলিয়া এখান হইতে পলাইয়া যায়? ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুখী পুনকার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই সে-দৃষ্টি মাৎলার উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে যাহাকে চায়, সে নাই।

উৎসবের উদ্দাম স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পুনকার আসিবার আর কোনো আশাভরসা নাই। মাৎলা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল,—উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সুখীর বাবা সুখীকে একবার যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া গেল।

পুনকার উপর দুরন্ত অভিমানে সুখীর আকণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে সে আর কোনো কথা ভাবিতে পারিল না,—ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মাৎলার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। এইবার সুখীর বাবা ঈষৎ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগমাঝির (দলপতি) সম্মুখে মাৎলার হাতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সুখীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত দ্রুত বহিতেছে; রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছে না।

মাৎলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পার্শ্বস্থ গাছের তলায় বসাইয়া বলিল,—লে, মদ খাই।

মাৎলার সঙ্গে বসিয়া উন্মাদিনীর মতো সুখী প্রাণপণে মদ গিলিতে শুরু করিল।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুনকার নিকট না পৌঁছিলেও সে এইরূপ একটা- কিছু অনুমান করিয়া লইতেছিল, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধ হইয়া গেছে।

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। পুনকা ভাবিল, তাহার উঠিয়া কাজ নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু হিম-শীতল না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ করিবে!

কিয়ৎক্ষণ পরে, কী একটা কথা মনে হইতেই পুনকা আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া, একহাতে কেরোসিনের 'মগ' এবং অন্য হাতে গাঁইতিটা কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে 'চানকের' দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাতিটা ফস্ করিয়া নিভিয়া গেল। পুনকা কিন্তু থামিল না, সেই অন্ধকারের মধ্যেই চেনা পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 'মেন গ্যালারির' লাইনের উপর একটা ফাঁকা টব-গাড়ি পড়িয়াছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে না পাইযা পুনকা হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়াং করিয়া গাড়িটা লাইনে উপর সরিয়া গেল। সেও মাথা গুঁজিয়া লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোনোরকমে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুনকা আবার হাঁটিতে লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। দু' তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার জন্য লিফট-কেজে'র উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচের ঘণ্টাওয়ালা 'কেজ' উঠাইবার ঘণ্টা দিতে-না-দিতে পুনকা ছুটিয়া গিয়া 'কেজে' প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই তাহাদের 'চানক্' বাহিয়া কেজ্খানা উঠিতে লাগিল।

কাঁধের গাঁইতিটা নামাইয়া, পুনকা একপাশে একটা লোহার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পার্শ্বস্থিত বাউরী যুবক পুনকার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,—এই পুনকা! তুর কপালে লোহু কিসের?

পুনকা বাঁ-হাত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়া লইতেই দেখিল, খানিকটা কাঁচা রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। বলিল,—উ কিছু লয়। টব-গাড়িতে কাটা গেল।

পুনকা অন্যমনস্কভাবে গম্ভীরমুখে 'কেজে'র বাহিরে তাকাইয়াছিল। কূপ-গহ্বরের মতো চানকের চারিদিকে কয়লা পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্ষাধারার মতোই ঝর্ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, তাহাদিগকে লইয়া লিফটখানা ঝড়াং করিয়া উপরের মুখে আসিয়া লাগিল। সর্বাগ্রে পুনকা বাহির হইল। খাদ-সরকারের নিকট 'টিপ' করাইয়া সে খাজাঞ্চির নিকট দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজগার মাত্র একটি টাকা লইয়া

পুনকা মাতালের মতো টলিতে টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলা শেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে।

রাস্তার দুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুলো দেখিলে মনে হয়, 'পরবে'র জের এখনও বোধহয় থামে নাই। দু' এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল।

অদূরে একটা বাগানের পাশে, চারিটা শালগাছের খুঁটি দিয়া ছান্‌লাতলার মতো একটা উৎসবগৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুকনো ফুলে সে স্থানটা একেবারে ভরপুর হইয়া আছে। পুনকা চলিতে চলিতে সেইখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কোঁড়া কুলিকামিন মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল।

পুনকা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইখানে কী হঁয়েছিল রে?

—বা, আজ তুদের পরবের দিনে তুঁই ছিলি কোথা?

—খাটতে গেইছিলি নাকি?

পুনকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হঁ।

যে লোকটা সর্বাপেক্ষা বেশি মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, সে টানা-টানা সুরে বলিয়া উঠিল, —আ, কি আক্কেল রে? মাৎলা আজ মদ খাওয়াঁই খাওয়াঁই ভূত করে' দিলেক।

পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বলিল,—আর মদ আছে তো দে কেনে উয়াকে একটুকু।

—না, না, একদম নাই মাইরি। দ্যাখ কেনে খালি হঁয়ে গেইছে।—বলিয়া মদের হাঁড়িটা সে একবার নাড়া দিয়া দেখাইয়া দিল।

মদ না খাইয়াই পুনকা টলিতেছিল। বলিল,—না, আমি মদ খাব নাই।—মাৎলা কেনে খাওয়ালেক রে?

—বা তাও জানিস না। সুখীর সঁথে যে উয়ার বিয়া হল।—বলিয়া লোকটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই বিকট হাসির হা হা শব্দ পুনকার বুকে ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোনো কথা শুনিল না। বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইতেই দেখিল, একটা গাছের তলায় আরও কতকগুলা ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইতে পুনকা হঠাৎ থামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

পুনকার সর্বাঙ্গ ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের সম্মুখে যেন বিরাট অন্ধকার থম থম করিতেছে। পথ নাই, ভাবিবার পর্যন্ত কোনো পথ নাই। একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, পুনকা ডান-হাতের তর্জনী দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলার উপর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুনকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। গোলাপি ফুলের উপর কাঁচা খুন জমাট বাঁধিযা গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে মাতালের মতো টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। কোমল ফুলগুলা পায়ের নীচে কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ঝুমকা ও বাবলা ফুল পুনকা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই ঝুমকাফুলটি সে বোধহয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাবলাফুলটি নিশ্চয়ই তার নাক-ছাবি। ফুলগুলি আপন হাতের মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুনকা কিয়দ্দূর চলিয়া আসিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের মধ্যে সে যেন একমুঠা জ্বলন্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া আছে। ফুলগুলা সে পথের ধারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্মভেদী দুঃখ-নিরাশা পুনকার বুকের তলে হাহা করিয়া উঠিতে লাগিল।

উৎসবশেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পের সমস্ত সুগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাঁশির সংগীত থামিয়াছে,—মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের আনন্দ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, —কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব বিশ্বপ্রকৃতি আকাশ-বাতাস, সব যেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওয়ি কানাকানি করিতেছে।

ধাওড়ায় ফিরিয়া পুনকা কাহাকেও কোনো কথা বলিল না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজগারের টাকাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একটা বিরাট কালো মেঘে চাঁদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই।

অন্ধকার,—শুধু গাঢ় অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে! কোনো দিকে কোনো পথের সন্ধান পাওয়া যায় না,—এই অন্ধকার আবর্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রলয়ের সহিত মুখোমুখি থাকা ব্যতীত আর কোনো উপায় নাই।

খাঁচার পাখির মতো একটা অশান্ত আক্ষেপ পুনকার বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

পুরনো গন্ধ

তৃপ্তি মিত্র

আর কদিন পরেই এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এ বাড়ি যত তাড়াতাড়ি হয় ছাড়তেই তো চেয়েছিল সংযুক্তা। তবে? যতই দিন এগিয়ে আসছে ছাড়তে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? অথচ যতদিন উইল-এর প্রবেট পেতে, সাকসেশন সার্টিফিকেট পেতে দেরি হচ্ছিল— কি হতাশ লাগছিল, মনে হচ্ছিল বাড়িটা বুঝি গিয়ে খাবে। মাঝে মাঝে রাগে হতাশায় বাবা-মার শোকও ভুলতে বসেছিল সংযুক্তা। চুল খুলতে খুলতে অন্যমনস্ক হল সংযুক্তা। আর কোনোরকম যত্নের তোয়াক্কা না রেখেই ঘাসে আবৃত চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়িগুলো আকাশে মুখ তুলে তাকিয়েছে। গেটের কাছে কেয়া ঝোপটার দিকে তাকাল ও। গত বছর প্রায় এই রকম সময়েই মা মারা গিয়েছিল। তার ঠিক এক মাস পরেই বাবা।

না, মা মারা যায়নি—কারা যেন মাকে খুন করেছিল। কারা?

মা রাজনীতি করতেন। খুন হবার কদিন আগেই তাড়া-খাওয়া দুটো ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন মা। বাড়ির কারুর কথা গ্রাহ্য করেননি। বিপক্ষ পার্টির কিছু ছেলে এজন্যে বাড়িতে এসে শাসিয়েও গিয়েছিল। আর তার ঠিক কদিন বাদেই—। খবরের কাগজে ছোট্ট করে খবরটা বেরিয়েছিল—সমাজসেবিকা করবী সিংহের মৃত্যুর কথা। মৃতদেহটা যখন ওই কেয়া ঝোপের কাছে পড়েছিল তখন ভীড়ের মাঝখানে যারা শাসিয়ে গিয়েছিল তাদের কজনকে দেখেছিল সংযুক্তা। কেশব ভূষণ আরও কজন। সংযুক্তা কাঁদেনি, কাঁদতে পারেনি। বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে।

বাবা জীবেশ সিংহেরও সেই অবস্থা। দোতলা থেকে তো তাঁকে নামানই যাচ্ছিল না। অর্পণামাসী বলেছিল—'করবীর কেউ শত্রু আছে তা ভাবা যায় না।'

মায়ের দেহটা যখন নিয়ে যাবে তখনই শচীকাকা এসে বললেন—'সোনা মা, একবার শেষ বারের মতো দেখে নে।' তখনই সংযুক্তা ডুকরে বুক-ফাটানো একটা চীৎকার করে উঠেছিল। 'সোনা'—মা ওকে 'সোনা' বলে ডাকত। কিন্তু বাবা চিরকালই সংযুক্তা বলেই ডাকতেন।

আজ প্রায় এক বছর হতে চলল। খুনী ধরা পড়ল না। অথচ সবাই জানে কারা খুনী। তারা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে।

মা মারা যাবার দুদিন পরেই বাবার স্ট্রোক হল। তার ঠিক এক মাস পরেই বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বাবাকে দেখতে আসবার ছুতোয় ভূষণ ওকে ডেকে নিয়ে বলেছিল—'শোনো সংযু, জানি আমাদের ওপরেই সন্দেহ হয়েছে তোমাদের, কিন্তু আমরা খুন করিনি। এই সুযোগে আসল খুনী কিন্তু পালাবে।' সংযুক্তা বলেছিল—'আসল কে তা জানো তুমি?' 'জানলে এতক্ষণ তো—না, জানি না।' তবে করবীদির নিজের দলের সঙ্গেও কিছুদিন যাবৎ বনিবনা হচ্ছিল না তারাও তো হতে

পারে। তবে আমার কথা বিশ্বাস করো সংযু, আমাদের দল এর মধ্যে নেই। সংযুক্তা বিশ্বাস করেছিল। ছোটোবেলার কৈশোরের অনেকগুলো ঘটনা স্মরণ করে সংযুক্তা মনে করেছিল, ভূষণ আর যাই করুক কোনো কারণেই সংযুক্তাকে মিথ্যা বলবে না। কিন্তু ভাবতে ভাবতে, চুলের জট খুলতে খুলতে সংযুক্তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেছে—ভূষণদের দল ছাড়া আর কেউ মাকে খুন করেনি। শচীকাকারও তো তাই ধারণা। রাস্তায় ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল তাই সংযুক্তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই। ও বাড়ি বেচে চলে যাবে শুনে ভূষণ দেখা করতে এসেছিল তখন ও বলে পাঠিয়েছিল, 'সময় নেই, দেখা হবে না।' কেবল এইটুকুই করতে পেরেছিল ও।

টেলিফোন বেজে উঠল। সংযুক্তা টেলিফোন ধরে বললে—'হ্যাল্লো, কে?'

—'আমি রে।'

—'ও শচীকাকা? বল, আবার কোনো প্রবলেম হয়নি তো?'

—'না, না, প্রবলেম নয়। তোর বাবার লাইব্রেরির সব বইগুলো একজন কিনতে চায়, দিবি নাকি?'

—'হ্যাঁ, মানে,—দিলেই হয়—বাড়িই যখন বিক্রি হয়ে গেল!'

—'জানি জীবেশের বইগুলো বিক্রি করতে তোর খুব খারাপ লাগবে, তবে সোদপুরে মামার বাড়িতে তো এত বই নিয়ে যেতে পারবি না।' সান্ত্বনার সুরে বলেন, শচীকাকা, 'আর যে কিনছে, একসময় সে আমাদেরই—মানে আমার জীবেশের আর করবীর ক্লাসমেট ছিল।'

—'তাহলে তো ভালোই। বাবার বইগুলোর অযত্ন হবে না। অন্তত। তাছাড়া স্কলারশিপ পেয়ে যদি বিদেশেই চলে যাই, তবে তো—সবই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, না শচীকাকা?' শেষের দিকে গলাটা কেঁপে যায় সংযুক্তার।

—'শোনো শোনো, আমি বলি কী যে বইগুলো তোর খুব ভালো লাগে, রাখতে ইচ্ছে করবে সেই রকম কিছু বই বেছে আলাদা করে রাখ। এক আলমারী বই তোর যে কোনো জায়গায় ধরে যাবে। দরকার হলে আমার ঘরেও রেখে দেব।'

—'তোমার ওইটুকু ঘরে আর একটা সুটকেসও ধরবে না শচীকাকা।'

—'ধরবে ধরবে, সে ব্যবস্থা করব।'

—'শচীকাকা—'

—'কি হল? আরে এই, কাঁদছিস নাকি?'

—'বাড়িটা ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে শচীকাকা।'

—'এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমারই কী কম খারাপ লাগছে। করবী জীবেশের স্মৃতি। আমাকে তো এখানেই থাকতে হবে। তবে এই অবস্থায় তুই তো একলা এ বাড়িতে থাকতে পারিস না। আর তালা-চাবি দিয়ে গেলে বেদখল!

—'না না, সে তো ঠিকই, তবে—'

—'জানি জানি, যুক্তি দিয়ে তো সব বোঝা বা বোঝানো যায় না।'

চোখের জল নিঃশব্দে মুছে সংযুক্তা বললে—'শোনো, তুমি ওকে হ্যাঁ বলে দাও। আমি কিছু বই বেছে একটা আলমারীতে রেখে দিচ্ছি।'

—'কত দাম দেবে জিজ্ঞাসা করলি না?'

—'কেন? তুমি জানলেই হবে।'

—'মানুষকে অত বিশ্বাস করা ভালো নয় রে।'

—'মানুষকে তো আর বিশ্বাস করি না। তোমাকে করি।'

—'সর্বনাশ! আমাকে জানোয়ার-টানোয়ার ভাবিস না তো?'

—'দেবতা ভাবি বললে বাড়াবাড়ি শোনাবে। তাছাড়া ভগবান-টগবান মানি না বলে সহজে কথাগুলো মুখে আসে না। তবে তুমি বোধহয় আলাদা জাতের মানুষ।'

—'ঠিক ঠিক, দেখলি না কেমন নাছোড়বান্দা হয়ে কমপ্লিমেন্ট আদায় করে নিলাম। যাকগে শোনো, ইন্দু মানে আমাদের সেই বন্ধু, দুহাজার টাকা দেবে বলেছে—প্রায় দেড় হাজার বই-এর জন্য দু'হাজার টাকা কিছুই নয়।'

—'ওই যথেষ্ট। এমনিতে তো বিলিয়ে দিতে হত, না হয় নষ্ট হত। তবু তোমাদের বন্ধু।'

—'না, ইন্দুটা বরাবরই কিপ্টে। যাই হোক, তাই বলছি, তা হলে—'

আরও দু একটা কথার পর ফোন নামিয়ে রাখল সংযুক্তা। দোতলা থেকে একতলায় লাইব্রেরি কাম বসবার ঘরে ঢুকে দেখল মামাতো বোন ময়না একমনে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছে।

—'ওরে বাবা, এখনও ওই বই চলছে!'

চমকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ময়না।

সংযুক্তা বলল—'বললাম না, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নে।'

—'উঃ সোনাদি যদি তুমি এই বইটা পড়তে না, নিশ্চয়ই বলছি ছাড়তে পারতে না।'

—'আমি ওই বই পড়তামই না।' তাচ্ছিল্য করে বলে সংযুক্তা।

—'সত্যি, পিসেমশাই-এর লাইব্রেরিতে এই বই কল্পনাই করা যায় না!'

—'শুনেছি বিয়ের পর মায়ের কিছুদিন খুব সখ হয়েছিল ডিকেটটিভ বই পড়ার। মাকে খুশি করতে বাবা কিনে আনতেন। যাকগে শোনো, শচীকাকা ফোন করেছিলেন, একজন সব বইগুলো কিনে নিতে চান। বললেন, পছন্দমতো বই বেছে রেখে দিতে। বাকিগুলো উনি নিয়ে যাবেন। তাই তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে এই কাজে হাত লাগাতে হবে।'

—'কে কিনবে?'

—'কে? ওই বাবা মা শচীকাকা সকলের ক্লাসমেট ছি। আর 'কে' দিয়ে কী হবে বল, বইগুলো যখন চলে যাচ্ছে—'

—'সত্যি আমাদের বাড়িতেও তো জায়গা নেই, না হলে এখান থেকে সোদপুর আর কতদূর, বলো! এগুলো নিয়ে যাওয়া কোনো সমস্যাই নয়।'

—'বাবা-মা গেল, বাড়িটা গেল—বই নিয়ে ভেবে আর কী হবে? তবে—'

—'কী তবে?'

—'না, মা মারা যাওয়ার দু-দিনের মধ্যেই তো বাবার স্ট্রোক হল। তারপর জ্ঞান হবার পর জড়িয়ে যেটুকু কথা বলতেন—মনে হত এই লাইব্রেরিতে নিয়ে আসবার কথা বলতেন, ওঁকে। মানে আমার তাই মনে হত। আর ঘরে মায়ের যে ছবিটা আছে, বারে বারে তাকাতেন সেদিকে। মাঝে মাঝে জল গড়িয়ে পড়ত দু-চোখ বেয়ে।'

—'এই সোনাদি, কাঁদছ নাকি? যা!'

—'না, কোনো মানে হয় না তবু যত দিন এগিয়ে আসছে ততই কেমন যেন লাগছে রে।'

—'জানি গো সোনাদি, কতদিনের বাড়ি তোমাদের। তোমার ঠাকুরদা বাড়িটা কিনেছিলেন, না?'

—'হ্যাঁ, তখন তো মোটে একটা চালাঘর ছিল।'

—'এই বাড়িটা তো ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন। আর বাগানের যত গাছ ঠাকুমা আর ঠাকুরদা তো মিলে লাগিয়েছিলেন। যাকগে এখন সেন্টিমেন্টাল হওয়াটা ঠিক নয়।'

—'তুমি বড্ড বেশি শক্ত মেয়ে। বাবাঃ! যেভাবে একলা এই বাড়িতে থেকে গেলে—আমি হলে ভয়েই মরে যেতাম—দু-দুজন মারা গেল, তার মনে একজনের আবার অপঘাত—'

—'একলা কোথায়, মাসীমা তো কতদিন থেকে গেলেন, আর তারপর তো তুই-ই এসে গেলি—' হেসে ফেললে সংযুক্তা, 'নেঃ চলো। খিদে পায়নি তোর?'

দুজনে মিলে স্নান-খাওয়া সেরে নিল। কম্বাইন্ড-হ্যান্ড রামের মা ছুটি চাইল—সিনেমা যাবে। দোতলার শোবার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াল দুজনে। গেটের পাশের সেই কেয়া ঝোপটার কাছে একটা কুকুর আর তিনটে বাচ্চা শুয়ে আরামে রোদ পোহাচ্ছে। দুটো বাচ্চা দুধ খাচ্ছে, একটার গা চেটে দিচ্ছে কুকুরটা। ময়না কুকুরটার কাণ্ড দেখে হেসে কুটি-পাটি।

—'ওঃ, মহারাণী কী আনন্দেই রোদ পোহাচ্ছেন! জানিস ঠিক এই জায়গাটাতেই মা খুন হয়েছিল। তখনও এইরকম শীত পড়-পড় সময়—' বলতে শুরু করে সংযুক্তা, 'খেয়ে উঠলে দুপুরে এমনি শীত-শীত করত—' ময়নার হাসি থেমে গেছে একদম। 'আর দশদিন বাদেই মায়ের মৃত্যুদিন, অথচ আজও খুনী ধরা পড়ল না। পড়বে কী করে? ওদের পিছনে যে বড়ো দাদারা আছে। পুলিশের সাধ্য আছে ওদের গায়ে হাত দেয়?'

ময়না বললে, 'আজ সকাল থেকেই যেন তুমি কেমন হয়ে আছ। সত্যি এ ঘটনা যে এই শহরতলীর কত ঘরে ঘরেই হয়ে গ্যাছে—'

—'হ্যাঁ, এই এরিয়াতেই এ-পার্টি ও-পার্টি করে কম হলেও পাঁচজন খুন হয়েছে, মাকে বলেছিলাম, ছেড়ে দাও ওসব। মাও বলেছিল, ছেড়েই দেবো—সকলের সঙ্গে আমার মতেও মিলছে না। কিন্তু জীবনের তিরিশটা বছর তো এই করেই কাটিয়েছি। ছাড়া বললেই কী পারা যায় রে? বাবাও একদিন মাকে বলেছিল, মিটিং-এ অমন উল্টোপাল্টা কথা বোল না, বিপদে পড়বে। মা রেগে বলেছিল, অন্যায় দেখলে আমাকে বলতেই হবে। তার দিন—সাতেকের মধ্যেই তো—!' বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সংযুক্তা।

—'যাকগে ও নিয়ে আর ভেবো না। কিছুই তো আর ফিরবে না। চল চল, বই বাছবে না?' বলে সংযুক্তার হাত ধরে টানতে থাকে ময়না।

—'দ্যাখ, কল্কে ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে গেছে।'

—'আর দেখেছ কত প্রজাপতি!'

—'কে জানে কারা আসবে? তারা এই বাগানটা রাখবে না কী করবে।'

—'ধরেই নাও রাখবে না। মাড়োয়ারী কো পার্নী হয় তো ছোটোখাটো একটা কারখানা খুলে বসবে।'

—'মা চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, ড্যামথাস, জিনিয়া কত কী লাগাত, এই সময় সব ফুটতে শুরু করত। নাঃ, চল লাইব্রেরিতে চল।'

দুজনে লাইব্রেরিতে এল। কত কত বই। রাজনীতি আর ইতিহাসের বই-ই বেশি। উপন্যাস ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কম নয়। দর্শন, বিজ্ঞান—কত কত। সংযুক্তা ঠিক করল সবরকম বই-ই কিছু কিছু রাখবে। শেক্সপীয়ার তো ছাড়াই যাবে না। রবীন্দ্রনাথও নয়। বার্টন্ড রাসেল, মার্কস—পছন্দ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সংযুক্তা—'না দেখে দিয়ে দিলেই হত। কোন্‌টা রাখব আর কোন্‌টা—ওমা! তুই আবার ওই ডিটেকটিভ বই নিয়ে বসে গেছিস?'

—'আর মাত্র চার পাতা বাকি। খুনী ধরা পড়ে গেছে। এখন কেবল গোয়েন্দার ভাষ্যটা বাকি। উঃ সৎমা কীভাবে ছেলেটাকে মারল! জেলাসী, বুঝলে জেলাসী! আসলে নিজেরই চোখ ছিল ছেলেটার ওপর।' ময়না আবার ডুবে যায় গল্পের মধ্যে।

সংযুক্তা বলে, 'উঃ, তোর এই এক গোয়েন্দা বই-এর নেশা!'

বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দেয় ময়না—'কলকাতায় কফি হাউস, তারপর সেইসব হোটেল ইত্যাদি জায়গায় ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেবার নেশার চাইতে এ নেশা অনেক ভালো। মানে নিরাপদ। নইলে কতবার যে হাসপাতাল যেতে হত।'

সংযুক্তা ধমকে ওঠে, 'এই, ওসব অসভ্য কথা এই লাইব্রেরিতে বসে বলবি না। ওরকম সব হলেই হল, না?'

—'জানো না তো আমার প্রাণের বন্ধু উজ্জয়িনীর কথা! যদি শুনতে!'

—'থাম। ওই চার পাতা শেষ করে তাড়াতাড়ি আর—আমাকে হেল্প করো।'

—'কী যে এক মিশনারী স্কুলে পড়লে, কিছুই শিখলে না।'

—'ওরে বাবা, তুই তাড়াতাড়ি শেষ করে আয় তো, মই দিয়ে ওপরে উঠে ওই বইগুলো নামাতে হবে।'

সংযুক্তা এক একটা বই দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যায়। ঘরের আলো কমে আসে। আলো জ্বালিয়ে দেয় ও। ময়নাও বইটা বন্ধ করে লাফিয়ে ওঠে, 'ব্যস, হয়ে গেছে বাবা! কি কাণ্ড! কী অসম্ভব চালাক ওই সৎমাটা! ভালোবাসার জেলাসী যে কোথায় টেনে নিয়ে যায় মানুষকে!'

—'গোয়েন্দা বই পড়ে জ্ঞান অর্জন না করলেও চলে।'

—'তাহলে বল কী করব?'

—'মইটা একটু চেপে ধরো তো। ওপরে উঠে রবীন্দ্র-রচনাবলিগুলো নামাই।'

—'আমি উঠছি, তুমি বরং মইটা চেপে ধরো।'

সংযুক্তা মইটা চেপে ধরে। ময়না উঠতে উঠতে বলে, 'তুমি যা নেবে, নেবে। আমি কিন্তু ওই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটা নেব।'

—'রাবিশ ডিপার্টমেন্ট বল।'

—'আমার নেশার ডিপার্টমেন্ট—' হেসে বলে ময়না। ওপরে টেলিফোন বেজে ওঠে। ময়না বলে—'এই সোনাদি, মইটা ছেড়ে ওপরে দৌড়িও না যেন।'

—'না, গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া স্বভাব নয় আমার। নাম, তাড়াতাড়ি নাম।'

ময়না দুধাপ নেমে লাফ দেয় মেঝেতে। সংযুক্তা বেসামাল হতে হতে সামলে নেয়। মইটা ফেলে দৌড়য় ফোন ধরতে। ময়না এগিয়ে যায় ডিটেকটিভ বই-এর দিকে। বলে, 'নেশার জিনিসটা আগেভাগে ঠিক করে রাখা ভালো।'

সংযুক্তা ফোন ধরে বলে, 'হ্যালো, শচীকাকা! আবার কী হল? কী? সত্যি? কেশরী? ওরা কেশরীকে ধরেছে?'

—'হ্যাঁ রে। ওর কাছ থেকে রক্তমাখা জামাকাপড় আর একটা ছোরা পাওয়া গেছে। সব লুকিয়ে রেখেছিল।'

উত্তেজিত হয়ে সংযুক্তা বলে, 'কীরকম ছোরা? মায়ের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু বলেছিল ছোরাটা দুদিকেই ধারালো ছিল।'

—'অত কী আর শুনেছি। জানা যাবে আস্তে আস্তে, পুলিশ সন্দেহ করছে ওই তোর মাকে—'

—'কিন্তু শচীকাকা, এ্যাদ্দিন ধরেও সেগুলো রেখেছিল বোকার মতো?'

—'কী জানি। তখন ওদের রাজত্ব। পুলিশ ওদের কথায় ওঠে বসে—কেয়ার করেনি হয়তো। তারপর ভুলে গেছে! এখন গণেশ পাল্টেছে—'

—'হ্যাঁ, পুলিশেরও সাহস বেড়েছে—'

—'থাকগে, যদি সত্যি সত্যি ও খুন করে থাকে মাকে তবে ওর শাস্তি হলে আমি খুশি হব।'

—'দুদিন আগে তুই-ই তো বলতিস ওদের দলের লোকই তোর মাকে খুন করেছে, সে ভূষণ যতই অন্যরকম বলুক।'

—'হ্যাঁ, সে তো সত্যি। কিন্তু এতদিন ধরে প্রমাণগুলো কেন রেখে দেবে—'

—'যাকগে, টেলিফোনে আর অত কথা নাই বা বললি। আমি আসছি।'

ফোন ছেড়ে দিল সংযুক্তা। ভয়ানক উত্তেজিত বোধ করছে ও। যদি ওর মাকেও না খুন করে থাকে, কেশরী কাউকে-না-কাউকে তো খুন করেছে। সে তো ওরা করতেই পারে। বুক ফুলিয়ে নিজেরাই তো এ ধরনের কত কথা বলেছে। যা হবার হবে। মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করল সংযুক্তা। এইবার একবার ভূষণকে সামনে পেলে হয়। একতলায় এসে রান্নাঘরের দিকে গেল ও। একটু চা খেতে হবে। ময়নাটাও অনেকক্ষণ চা খায়নি। স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে লাইব্রেরিতে এল সংযুক্তা। বললে, 'ওরে ময়না, খুব তো ডিকেটটিভ বই পড়িস, কেশরী ধরা পড়েছে মাকে খুনের দায়ে! কী করে এটা এখন প্রমাণ করা যায় বল্ তো?—কী হয়েছে, অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হাতে ওগুলো কী?'

ময়নার চোখমুখ কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ওর হাতে একটা চাদর,—বিবর্ণ, ছোপ ধরা। তার সঙ্গে একটা ছোরা আর চিঠি। ময়নার হাত থেকে জিনিসগুলো নিল সংযুক্তা। ভ্যাপসা-বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।

ছোরাটার দু'দিকই ধারালো। ময়না কোনোমতে হাত দিয়ে একটা জায়গা দেখালো। ডিটেকটিভ বইগুলো ছিল ওখানে, আর ঠিক তারই পিছনে ছিল এই জিনিসগুলো। সংযুক্তা বই-এর পিছনে হাত দিয়ে বার করে আনল একটা বিবর্ণ পাঞ্জাবি আর ধুতি। এই কাজ-করা-পাঞ্জাবিটা সংযুক্তাই সখ করে কিনে দিয়েছিল বাবাকে। পাওয়া যাচ্ছিল না এটা। চিঠিটা পড়ল সংযুক্তা। মা লিখেছিল শচীকাকাকে---

'শচী,

ও তোমাকে আর আমাকে নিয়ে কুৎসিত সন্দেহ করছে। কলেজ-জীবনে কবে সেই যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, এতদিন বাদে সেই কথা তুলে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। পার্টিতেও আমার নিষ্ঠা নিয়ে যে সমস্ত কথা উঠেছে, জেনো তার মূলে তোমার বন্ধু জীবেশ সিংহ। অন্য অনেক কথা তো জানই। আমি আর পারছি না। সোনার বিয়ে হয়ে গেলে বাঁচতাম। তাহলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম। এ মেয়ে কারুর প্রেমেও পড়ে না' হ্যাঁ, কাল জীবেশ বলল, "অত স্পষ্ট কথা বললে পার্টি নাকি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে!" ও যে কী ভাবে আর কী বলে কিছু বুঝতে পারি না। দেখা হলে এত কথা তো বলা যায় না। তাই চিঠিটা তোমার ঘরে ফেলে দেব।'

ইতি কবি।'

পুনঃ—'ওর সঙ্গে তুমি একটু কথা বলবে, ও কী চায়---জানবে একটু?'

চুপ করে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল।

লাইব্রেরিতে ঘড়িটার শব্দ বড্ড জোরে শোনা যাচ্ছে।

অনুভব

রানু ভৌমিক

একবার ডায়েল করেই ফোন পেলাম। বললাম, চিত্রাঙ্গদাকে একটু দেবেন।

—চিত্রাঙ্গদা? অপরেটার মেয়েটির কণ্ঠে ভয়। বিস্ময়। আপনি কি এম. ডি. মিস্ সি. চ্যাটার্জিকে চাইছেন?

অপ্রতিভ হলাম। খোদ মালিক এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিস্ সি. চ্যাটার্জিকে হাল্কা সুরে চিত্রাঙ্গদা বলেছি। ভাগ্যিস চিত্রা বলি নি।

—হ্যাঁ, ওঁকেই। প্রকশ্যে বললাম।

—ধরুন দেখছি, উনি ফ্রি আছেন কিনা। আপনার নাম?

—সর্বাণী।

দশ মিনিট অপেক্ষা করে ফোন নামিয়ে রাখব কিনা ভাবছি চিত্রাঙ্গদার গলা শুনলাম। কণ্ঠস্বর ছেলেবেলার মতোই সুরেলা।

—সর্বাণী? তুই? ভাবতেই পারছি না। কতদিন পরে?

—দু যুগ। হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম। বার বছরে এক যুগ হয়। ঠিক চব্বিশ বছর হয়েছে।

—বাণী, তোর ঠিকানা বল্। কাল দশটায় গাড়ি পাঠাব। নিশ্চয়ই আসবি, অনেক কথা আছে। ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি বল্। টুকে নি। অফিসে এখন হেভি কাজ।

—দিচ্ছি, কিন্তু তুই আয় আগে।

—না। একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার আছে। একান্ত গোপনীয়। তোর বাড়িতে হবে না। বিশ্বাস করো, অনেকদিন থেকে মনে মনে তোকে ডাকছিলাম। দেখা বলে সব বলব। কাল কটায় গাড়ি পাঠাব?

—দশটায় ওরা বেরিয়ে যায়...

—ঠিক এগারোটা। তৈরি থাকিস। আমার বাড়িতে খাবি। কাল অফিসে আসব না।

ছেলেবেলার চিত্রাঙ্গদার পাশের বাড়িতে বেশ কিছুদিন—প্রায় ছবছর ছিলাম আমরা। বাবা সরকারি অফিসার। বদলির চাকরি। অফিস থেকেই এ বাড়ির ভাড়া দেওয়া হত। তখন আমার বয়স সাত কী আট। এখানে এসেই দেখেছিলাম পাশের বাড়িতেই আমার সমবয়সী একজন আছে। সে মেয়ে কী ছেলে তা বুঝতে অবশ্য আমার কয়েকদিন লেগেছিল। যেদিন ও স্কুল-গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে আর ওর মা দোতলার জানলা থেকে ডাকলেন 'চিত্রাঙ্গদা' সেদিন বুঝতে পারলাম ও মেয়ে। বয়স কম হলেও এটুকু জানতাম যে চিত্রাঙ্গদা কোনো ছেলের নাম হতে পারে না।

বাবা সিনিয়র অফিসার। অফিস থেকে গাড়ি পেতেন। মাইনের অঙ্কও ছিল লোভনীয়। কিন্তু আমাদের গৃহস্থালি চলত সাবেকি চালে। থান পরনে, কদমছাঁট চুল ঠাকুরমা সারাক্ষণ তাঁর ঠাকুরকে 'সক্‌ড়ি'র হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেঁচামেচি করতেন। শাঁখা, সোনার চুড়ি, সিঁদুর মাথায় রান্নাঘর সামলাতে ব্যস্ত। যদিও রান্নার ঠাকুর ছিল। কাকিমা ঘর গুছোবার ভার নিয়ে অবিরাম গজগজ করছেন। বড়ো ছোটো মিলে কাজ করবার লোক অনেক বিয়েবাড়ির মতো হৈ হৈ সর্বদা লেগে থাকত।

এত গোলমাল ভালো লাগত না আমার। স্কুল থেকে ফিরেই ছাদে যেতাম। তাকিয়ে দেখতাম পাশের বাড়ির সবুজ মোটা পর্দা ঢাকা ঘরগুলি। শান্ত, নীরব। যেন বাড়ি নয়, একটা গাছ। দ্বিতীয় দিনে ওকে দেখেছিলাম। ওদের ছাদে একা বেড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়েছিল কয়েকবার। যেদিন জানতে পারলাম ওর নাম চিত্রাঙ্গদা সেই বিকেলেই ওদের বাড়ির দিকের ছাদের কার্নিশে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে ও এগিয়ে এল। মাত্র দু-হাতের ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা।

—এই! তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে? প্রথম কথা চিত্রাঙ্গদাই বলল।

—তোমাদের বাড়ি? কেন?

—আমি একা থাকি তো। ভাইবোন কেউ নেই। তুমি এলে বেশ খেলতে পারব। গল্প করতে পারব। তুমি আমার বন্ধু হবে?

ছেলেদের মতো চুল, ছেলেদের পোশাক পরনে সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেরা বিশেষত ঠাকুমা বন্ধুত্ব করতে দেবেন কিনা সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ ছিল। বললাম, তোমার বাড়ি যেতে পারব কিনা কাল বলব।

সৌভাগ্যক্রমে যখন এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম তখন বাবা উপস্থিত ছিলেন। আমরা খাচ্ছিলাম। ঠাকুরমা মালা হাতে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। ওঁর বিশ্বাস ছিল দাঁড়িয়ে থাকলে দেহের শুচিতা নষ্ট হয় না। মা যথারীতি রান্নাঘরে। কাকিমা পরিবেশন করছিলেন।

—মিঃ চ্যাটার্জির মেয়ে তো। বাবা বললেন। যাবি না কেন? ওরা বনেদী ভদ্রলোক। অবশ্য খুব বড়োলোক নয়। তবে পরিবারটি ভালো।

ঠাকুরমা চিত্রাঙ্গদাকে দেখেন নি। কাজেই কোনো মন্তব্য করলেন না। কাকিমা মুখ বেঁকালেন। কিন্তু বাবার আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস তাঁর নেই। অনুমতি পেয়ে গেলাম।

পরের দিন বিকেলে বললাম, যাব তোমার বাড়ি।

—আজই। এখনই এসো। ব্যগ্র কণ্ঠে বলল ও। মা বাবা বিয়েবাড়িতে গেছেন। আমি কামিনীর মাকে নিয়ে নীচে যাচ্ছি। তুমিও নীচে এসো।

কাকিমাকে জানিয়ে ওর বাড়ি গেলাম। দোতলায় ওর ঘর। সুন্দর সাজানো। লাগোয়া বাথরুম। প্রথমেই চিত্রাঙ্গদা 'চিত্রা' এবং সর্বাণী 'বাণী' হয়ে গেল।

—তোমার মাকে বলেছিলে? প্রশ্ন করলাম।

—কি?

—আমার আসবার কথা।

—হ্যাঁ। মা নিজেই বলেছেন, মিঃ ঘোষের মেয়ে তোমার সমবয়সি। শুনেছি, ক্লাসে প্রথম হয়ে প্রমোশন পায়। অবশ্য বাংলা মিডিয়াম। তুমি ওকে ডেকে এনো। একা থাকে তো। আসলে, মা চান না যে আমি অসিতের সঙ্গে মিশি।

—অসিত কে?

—আমার সঙ্গে পড়ে। এ পাড়াতেই থাকে। পড়ায় বিশেষ ভালো নয়। বাড়ির অবস্থাও খারাপ। তাই মার আপত্তি। মা বলেন, সমানে সমানে মেলামেশা করাই ঠিক। একদিন অসিত

স্কুলের পরে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। মা কোনো রুক্ষ কথা বলেন নি কিন্তু মুখের ভাব এমন করেছিলেন যে অসিত আর কিছুতেই আসতে রাজি হল না।

—আমার বাড়ির বড়োরাও এই সব কথা বলেন। থাকগে ওসব কথা, তুমি আমাদের মতো জামা পর না কেন?

—মা পরতে দেন না। আমাকে তো ভবিষ্যতে বাড়ি, ব্যাবসা দেখতে হবে। তাই মা বলেন পুরুষের কাজ করতে হবে তেমনি পোশাক পর, তেমনি ভাবে স্বভাব তৈরি করো।

প্রথম দিনই যা বড়োদের নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এর পরে আমরা স্কুলের গল্প করতাম। খেলতাম। গলপ্রে বই পড়তাম। পড়ার বই নিয়ে ওর বাড়ি যেতাম। একসঙ্গে পড়তাম। ও অঙ্কে কাঁচা ছিল। আমি ওর অঙ্ক করে দিতাম, ও আমার হোমটাস্ক ইংরেজি 'এসে' লিখে দিত। রাত নটায় কামিনীর মার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম।

চিত্রার মা খুব কম কথা বলতেন। ঠিক সাতটার সময়ে দুজনের জন্য দুধ, জলখাবার পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে ছ বছর কেটে গেল। বাবা বদলি হলেন।

দূরে গিয়ে প্রথম মাসে আমরা চিঠি লিখেছিলাম। তারপর থেমে গেল। কিন্তু শেষ চিঠি চিত্রাঙ্গদাই লিখেছিল। সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। স্ত্রী হলাম—মা হলাম...

আমার স্বামীরও বদলির চাকরি। অনেকদিন পরে কলকাতায় এসেছি। একদিন স্বামী বললেন, তুমি যে চিত্রাঙ্গদার গল্প করতে তার অফিস আমাদের বিল্ডিংএ।

—কী করে জানলে এই সেই। উৎসুক কণ্ঠে বললাম।

—কোম্পানির নাম মিলে যাচ্ছে। তোমার বাবার কাছে ওদের কোম্পানির নাম শুনেছিলাম। তাছাড়া তুমি পোশাকের বিবরণে যে রকম দিয়েছিলে—

—এখনও ছেলেদের পোশাক পরে নাকি?

—হ্যাঁ। সে জন্যেই তো ওকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল। নইলে এত বড়ো বাড়িতে কোথায় কোন্ অফিস আছে কে আর খোঁজ রাখে?

—তুমি আমাকে ফোন নম্বর এনে দিও। ফোন করব। যদি দেখি এ সে নয় ক্ষমা চেয়ে নেব। আর যদি মিলে যায়...

—খুব মজা? বাল্য-বান্ধবী। স্বামী হাসতে হাসতে বললেন।

পরদিন বেলা দশটায় গাড়ি এল। ছেলে মেয়ে স্কুলে। স্বামী অফিসে। কাজের মেয়েকে বিকেলের জলখাবার সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

চিত্রাঙ্গদার বাড়ি সেই একই রকম রয়েছে। সাদা দেওয়াল। সবুজ পর্দা। গাড়ি থামতেই চিত্রা নেমে এল। আর লাঠি হাতে এক বুড়ি।

—কামিনীর মাকে মনে আছে তোর? চিত্রা হাসতে হাসতে বলল, এই সেই কামিনীর মা।

—ভালো আছ? কামিনীর মার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম।

—ও কানে শুনতে পায় না। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে তুই ওকে চিনতে পেরেছিস। চল্। ওপরে চল।

সেই পুরনো ঘর। আসবাব বদলে গেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপযোগী আসবাব। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে বললাম, আগে মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—দেরি হবে। চিত্রা টানল। আগে বস্।

—কী দেরি হবে?

—বলছি যে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেরি হবে। আগে বুড়ি হবি মরবি—তবে তো দেখা পাবি।

—কবে মারা গেছেন?

—পাঁচ বছর। তুই একটু মোটা হয়েছিস তাতে অবশ্য তোকে ভালোই লাগছে।

—তুই আগের মতো স্লিম আছিস। বললাম ভদ্রতা করে। আসলে, রোগা আর শুকনো দেখাচ্ছিল ওকে।

—তুই কটার সময় খাস? প্রশ্ন করল চিত্রা।

—আমি? ওরা বেরিয়ে গেলে...এগারোটা নাগাদ।

—তাহলে, চল্ আগে খেয়ে নিই। কটায় ফিরতে চাস?

—ছটার মধ্যে ফিরলেই হবে। ছেলে মেয়ে জলখাবার খেয়ে খেলতে চলে যাবে। কিন্তু উনি ফিরলে...

—খেলার সাথি তোমাকে চাই। চিত্রা হেসে বলল।

—তুই আজকাল বেশ অশ্লীল হয়েছিস দেখছি। কপট রাগ দেখিয়ে বললাম।

—অশ্লীল আর হতে পারলাম কই? পারলে জীবন এত ট্রাজিক হত না।

বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, চিত্রা, তুই বিয়ে করলি না কেন?

—করি নি—কারণ কাউকে পাই নি। কাজেই, বিয়ে করে নি বলাই ঠিক।

—বাহ্! এত হেঁজিপেঁজির বিয়ে হচ্ছে—

—হেঁজিপেজি বলেই হচ্ছে। ওদের তো ভাবতে হচ্ছে না বিবাহ-প্রার্থী ভদ্রলোক জীবনসঙ্গিনী খুঁজছেন না বিয়ের ফাঁদ পেতে মহিলাকে হাতিয়ে নিয়ে বাড়ি,গাড়ি, ব্যবসার মালির হতে চাইছেন?

—সিনিকের মতো কথা বলিস না। ধমকে উঠলাম। ছেলেবেলায় তুই কী সহজ, সরল ছিলি!

—ঘা খেয়ে খেয়ে কঠিন গরল হয়ে গেছি। তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল চিত্রা।

—ন্যাবা রোগীর মতো তুই সব হলদে দেখছিস। তাই বিত্ত তোর সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—আমার পৃথিবীর রং সত্যিই হলদে। উজ্জ্বল লালচে হলুদ নয়। মরা সোনার মতো বিবর্ণ। দেখলে বিতৃষ্ণা জাগে মনে। কিন্তু অন্যের কাছে তার মূল্য আছে। পুরুষ-পোশাক বর্মে অনেককে ঠেকিয়ে দিয়েছিলাম। কাছে আসতেই ভয় পেয়েছিল তারা। তবু, কয়েকজন অত্যন্ত লোভী এগিয়েছিল। মুখোসের আড়ালে ঢাকা তাদের প্রকৃত মুখ চিনতে দেরি হয় নি আমার।

—কিন্তু এভাবে একা....সারাজীবন...

—কী করব? উঠে বসল চিত্রা। আমার কী মনে হয় না কেউ আমার পাশে থাকুক। অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে শূন্য দেওয়ালে যখন হাত ঠেকে যায় তখন কী প্রাণ হাহাকার করে ওঠে না? আর সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানিস বাণী? প্রেম পেয়েছিলাম—হেলায় হারিয়েছে।

—মানে? আমি উঠে বসলাম। ওর মুখোমুখি।

—তোকে অসিতের কথা বলেছিলাম।

—প্রথম দিন বলেছিলি।

—তুই চলে যাবার পরে ভীষণ একা হয়ে গেলাম। অসিতকে বাড়িতে অনেক পারতাম না। কিন্তু স্কুলে অবসর সময়ে আমরা সারাক্ষণ গল্প করতাম। সব কথা ওকে বলতাম। অনেক গুণ ছিল ওর। নীচু গলায় মিষ্টি সুর চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত ও। একটা গানের লাইন বারবার গেয়েছিল বলে আজও আমার মনে আছে।

—বল।

—'খোলো খোলো দ্বার, রাখিও না আর, বাহিরে আমার দাঁড়িয়ে।'

—দরজা খুললি না কেন?

—তখন আমার মনে প্রচণ্ড জেদ। বাড়ি ব্যাবসা রক্ষা করব। ছেলের কর্তব্য করব। এখন সেই অহঙ্কারের মাশুল গুনছি।

—তোদের ছাড়াছাড়ি কবে হলে?

—স্কুলের বারো ক্লাস শেষ হবার পর। আমি ভালোভাবে পাস করেছিলাম। ও কোনো রকমে। পরীক্ষার কিছুদিন আগে ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সামান্য চাকরি করতেন। নিজেকে বঞ্চিত করে ছেলেকে নামী দামী স্কুলে পড়িয়েছিলেন। আর ওর মা? প্রসবের সময় ডাক্তারবাবু যখন বললেন, দুজনকে বাঁচানো যাবেনা—তখন ওর মা ডাক্তারের হাত ধরে শপথ করিয়েছিলেন তিনি যেন সন্তানকে বাঁচাবার চেষ্টাই প্রথমে করেন। এত ভালোবাসার মধ্যে যে জন্মেছে তার মনে ভালোবাসা থাকবে না কেন?

—তারপর? তুই কলকাতার কলেজে ভর্তি হলি আর অসিত?

—অসিত জলপাইগুড়িতে দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেল।

—তা, তুই ওর খোঁজ করছিস না কেন?

—আমি জানি।

—তবে?

—প্রথম দিকে আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। বাবা অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। পরীক্ষা দেওয়া হল না। অফিসে যেতে শুরু করলাম। মাত্র এক বছর আগে আমি ওকে দেখলাম।

—কোথায়?

—গাড়ি চালিয়ে আসছি। রাস্তার পাশে গাছের নীচে কে একজন বসে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। বসার ভঙ্গী খুবই পরিচিত। গাড়ি পার্ক করে সামনে দাঁড়ালাম। ঠিক অনুমান। অসিত।

—কী করলি?

—বললাম, চিনতে পারছ। ও হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, চিত্রা। এমনভাবে বলল যেন এক ঘণ্টা আগেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। গাড়িতে ওকে তুলে বাড়ি নিয়ে এলাম। চা, খাবার দিলাম। ও শুধু চা খেল। চলে গেল।

—আর আসে নি?

—না। কিন্তু ওকে বহুবার দেখেছি। অফিস থেকে যেদিন ফিরতে দেরি হয় দেখতে পাই ও গাছের নীচে বসে আছে।

—তুই ডাকিস না কেন?

—আবার। ও আমার বাড়ি জানে। ফোন নম্বর জানে। ইচ্ছে হলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই বাধা আছে ওর। হয়ত বিবাহিত। হয়ত ওখানে রোজ বসে থাকে স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবে বলে।

—বিবাহিত হলে তোকে এড়িয়ে চলত না। বরঞ্চ পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে ভালো চাকরি চাইত।

—তবে? পরে এল না কেন? ও তো জানে আমি নিতান্তই একা।

—ওর মনে ভয়। তোর বিত্তের এই কঠিন দরজা পার হতে পারবে না। ওর নিজের মনেই দ্বিধা রয়েছে। নিজের প্রেমকে ও নিজেই সন্দেহ করছে।

—জানিস বাণী, আমি কাঁদতে চাই। পারি না। শুধু সারা শরীর জ্বলে যায়। যন্ত্রণায় পাগলের মতো হয়ে যাই।

উত্তর দিলাম না। ভাবছি... ভাবছি...

—তোকে যেভাবেই হোক সুখী করব। বললাম অবশেষে।

—কেন আমাকে এত ভালোবাসিস?

—বোধহয় তুই বড়োলোক বলে। ঠাট্টার সুরে বললাম।

—মোটেই নয়।

—কেন নয়? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দে।

—যুক্তি দিয়ে সব বোঝানো যায় না। অনুভব করতে হয়।

—তাহলে তুই বিশ্বাস করিস ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা যায়।

—করি, চিত্রা বলল।

—তবে, অসিতের প্রেম অবিশ্বাসের চোখে দেখছিস কেন?

—এখনও ওর ভালোবাসা আমার অনুভবে আসেনি। যেদিন আসবে সেদিন বাড়ি, ব্যাবসা সব বিক্রি করে দিয়ে ওকে নিয়ে চলে যাব এমন জায়গায় যেখানে অর্থ হয়ে দাঁড়াবে না—আনন্দের উপকরণ হবে।

ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং।

—ইস্ চায়ের সময় হয়ে গেল।

চা-পর্ব শেষে বললাম, পৌরাণিক চিত্রাঙ্গদার গল্প তোকে বলেছি। তোরই মতো। রাজরক্ষার জন্য পুরুষ বেশে বেড়াত। অর্জুনের প্রেমে পড়ল। রোদে পোড়া পুরুষালি এই নারীকে নিশ্চয়ই অর্জুনের পছন্দ হয়নি। ব্রহ্মচর্যের দোহাই দিয়ে পালিয়ে গেল সে। তারপরে, মদন ও বসন্তের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদা রূপসী হল। তখন আর অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের কথা মনে এল না।

—তাহলে মদন এবং বসন্তকে ডাক। পরিহাস করল চিত্রা।

—কলিযুগে মদন-বসন্ত মানে বিউটি পারলার। তোকে এমন সাজিয়ে দেবে যে তুই নিজেই নিজেকে চিনতে পারবি না।

—বটে! তারপর?

—একদিন গাড়িতে আমরা বেরুব। সঙ্গে থাকবে ছেলে, মেয়ে। ও যেখানটায় বসে তার একটু দূরে বসব আমরা। ছেলে, মেয়ে খেলতে খেলতে ওর কাছে যাবে। ওদের খুঁজতে আমরা।

—রীতিমতো নাটক। উদ্দেশ্য কী?

—অসিতের সঙ্গে পরিচয় করা। তারপর...

প্ল্যান মতোই ঘটনা ঘটল। খুকু গিয়েই অসিতের হাত ধরে বলল, দান।

এই ছোট্ট সুন্দর অপরিচিতা মহিলাকে হঠাৎ কী দান করা যায় ভেবে অসিত নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত বোধ করছিল। খুকুর দাদা পানু সমস্যার সমাধান করল। বলল, খুকু সব বলতে পারে। 'গ' বলতে পারে না। ও আপনাকে একটা গান করতে বলছে।

অসিত খুকুকে কোলে নিল। পানু পাশে বসল। খুকুকে আদর করে প্রশ্ন করল অসিত, আমি গান জানি তুমি জানলে কি করে?

—আমার মেয়ের ওই বিশেষ গুণ। বললাম আমি। পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা।

পেছনে ফিরে অসিত অপরিচিতা আমাকে এবং প্রায় অপরিচিতা চিত্রাঙ্গদাকে দেখল। চিত্রা শাড়ি পরেছিল।

—বসতে পারি? এগিয়ে প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু শাড়িগুলো দামি—। পরিহিতারা আরও দামি।

—দামি জিনিস মাটিতে পড়ে থাকলেও দামিই থাকে। হাসতে হাসতে বললাম।

খুকু অসিতের মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল, দান।

সঙ্গে সঙ্গেই অসিত শুরু করল, 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন। নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।

অসিত আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে। ও স্কুলের টিচার। ছুটি হলে চলে আসে এখানে। খুকু, পানু, অসিত। সন্ধে সাতটায় চলে যায়। ওর টিউশান আছে। চিত্রাও অফিস ফেরত

প্রায়ই আসে। খাবার ঘরে বসে। আমরা গল্প করি। স্বামী ফিরে এসে এখানেই বসেন। আড্ডা জমে ওঠে। মাঝে মাঝে অসিত এ ঘরে চলে আসে। আমাদের সঙ্গে গল্প করে। ও খুব সহজভাবে কথা বলতে পারে আবার খুব সহজেই নিমেষের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে।

এক রাত্রে অসিতকে বললাম, আজ তোমাকে খেয়ে যেতে হবে। একদিন ছেলে না পড়ালেও চলবে।

—ব্যাপার কি জান বাণী, আমি পুরনো যুগের লোক। দেখ না, গান রবীন্দ্রনাথের পরে আর এগুই নি। মন পড়ে আছে আরও পিছনে। বিনা নিমন্ত্রণে খাই না।

—বুঝলাম। আচ্ছা, রীতিমতো নিমন্ত্রণ করেই খাওয়ানো যাবে।

—যার তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি না। হাসতে হাসতে বলল অসিত।

—আচ্ছা। যার নিমন্ত্রণ তুমি ঠেলতে পারবে না। ... হাসলাম আমিও।

পরের রবিবার গাড়িতে চিত্রা, আমি, পানু, খুকু অসিতের বাড়ি গেলাম। খুকুই এ নাটকের নায়িকা। চিত্রাকে ম্যানেজ করেছে। অসিতকে নিমন্ত্রণ খুকুই করবে।

মধ্যবিত্ত পাড়া। কোণের আলাদা মতো এক ঘরে অসিত থাকে। দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক।

—এত সকালে?

—মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি। গম্ভীর কণ্ঠে বললাম।

—না। কাকু, তোমাকে নি...নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। খুকু বলল।

—বটে? কে রাঁধবে?

—আমি। গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে খুকু বলল।

—আচ্ছা। তাহলে যেতেই হবে। তোমরা বোস। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

ঘরে একটা মাত্র চেয়ার। চিত্রা বসল। বিছানা একটু গুছিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে বসব বলে বালিশ টেনেই থমকে গেলাম। আমার মুখ দেখে চমকে চিত্রা বলল, কি হয়ে বাণী?

ওর কথার উত্তর না দিয়ে খুকু পানুকে বললাম, কাকু কোথায় গেল দেখে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা।

চিত্রা ততক্ষণে বালিশের নীচের জিনিসটা দেখেছে। সাদা পাথরের একটি আংটি। ছোটো মাপের। এটা দেখে চমকে গিয়েছিলাম। চিত্রা মুষড়ে পড়বে জানতাম।

কিন্তু, ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। কী এক আনন্দের আলোয় ও যেন স্নান করে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য ওকে অপরূপা মনে হল।

—আংটিটা আমার, চিত্রা বলল।

—তোর?

—হ্যাঁ। স্কুল জীবনে অসিত নিজের লেখা কবিতার খাতা আমাকে দিয়েছিল। আমি ওকে এই আংটি দিয়েছিলাম। বাণী, আজ আমি অসিতের প্রেম অনুভব করলাম। আজ জানলাম, প্রেমের জন্যই প্রেম মানব-মনে জেগে থাকে।

এজাহার

মহাশ্বেতা দেবী

শিবরাম চক্রবর্তীকে নিবেদিত

ভরমো থানার দারোগা অত্যন্ত ফাঁপরে পড়ে যায় ভরা ভাদ্রে। চাকরির দশম বছরে তার এ রকম আতান্তর হবে সে ভুলেও ভাবেনি। ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে সে অবশেষে যায় বি. ডি. ও. বাবুর কাছে। বি. ডি. ও. বাবু—কী করা যায়! দ্বিবেদী ব্রাহ্মণ। আর দারোগা চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ। ক্ষমতাটা কার বেশি, মর্যাদা কার বেশি। ওহিসে সমঝ লো ভৈয়া। চতুর্বেদী অত বড়াই ভালোবাসে না। চতুর্বেদীর পূর্বপুরুষের অধিকার চারটি বেদে, আর দ্বিবেদীর পূর্বপুরুষ সিরিফ দুই বেদে অধিকারী।

তা মর্যাদা ধুয়ে খেলে দিন চলে না। দ্বিবেদীর বউ কলেজে পড়া মেয়ে, নাভির নীচে নাইলনের শাড়ি পরে। পায়ে পরে বল ও চটি। পায়ে মল পরে ফ্যাশানের জন্য। চুল রুক্ষ, কাঁধ অবধি ছাঁটা। রাতদিন পড়ে গুলশন নন্দার বই আর সিনেমার কাগজ। ওদের মেয়ের নাম পুপসি। কী নামের ছিরি! মেয়েটা মাকে 'মাম্‌স' আব বাপকে 'ড্যাডি' বলে। দেখে দারোগা তাজ্জব। না, দর্শনধারী বউ এনে দ্বিবেদী ওর ওপর টেক্কা মেরেছে।

দারোগার বউ শ্বশুরালে থাকে। যেমন মোটা, তেমন রাশভারি। বংশ দেখতে গিয়ে বয়েস দেখা হয়নি। বউ দারোগার সমান বয়সী। সে গায়ে কাপড় রাখতে পারে না চর্বির গরমে। চৌকিতে বসে হুঁকো টানে আর দাসী দিয়ে হাত-পা টেপায়। বই পড়ে না, সংসারের কাজ করে না। তবে দারোগার ছেলে-মেয়েরা 'পিতাজী' আর 'মা' বলেই ডাকে। জীবনেও সাবান মাখে না দারোগার বউ। বউ দর্শনধারী নয়।

দ্বিবেদী চালায় স্কুটার, চতুর্বেদী চাপে টাট্টু।

দ্বিবেদী জাতপাত মানে না, চতুর্বেদী মানে।

দ্বিবেদী কেতাব কেনে, চতুর্বেদী কেনে মোষ।

কোনো মিলই নেই তাদের সবই অমিল। তবু দারোগা দ্বিবেদীর কাছে যায়। কেন না হিসেবে মিলছে না তার। সব গেছে বিগড়ে। এমন ঘটনা ভরমোতে কখনও ঘটেনি।

দ্বিবেদী নিজের বাংলোর বাগানে বসে ব্লক আপিসে পিওনদের দিয়ে গাছে জল দেয়াচ্ছিল। চওড়া ইদারায় জল তোলার রশিটি চাকায় জড়ানো। চাকা ঘুরছিল, একঘেয়ে শব্দ হচ্ছিল।

সামনে বেতের টেবিলে চা।

আসুন আসুন। চা পিবেন?

না না।

কেন?

কখনই খাই না। আপনি বা কানো কেন? ভরমাতে থাকছেন, দুধ খান, দুধ।

দুধ তো আমার চলেই না।

কেন?

বদহজম হয়ে যায়।

খুবই আফশোসের বাত।

শরবত পিবেন?

না না।

বলুন কী ব্যাপার?

আপনি তো জানেন।

কী?

ওই যে কমিশন আসছে সে কথা?

দ্বিবেদীর মুখের চামড়ার নীচে কে যেন কী বদলে দেয়। নিমেষে অন্য মানুষ হয়ে যায় দ্বিবেদী।

তাতে আপনার কী?

কেন তাইতো বুঝলাম না। কী হয়েছে যে কমিশন আসছে? আর এ খুব লজ্জার কথাও হয়ে যাচ্ছে। ছি ছি ছি,— নারীধর্ষণ, মেয়েদের লজ্জার কথা নিয়ে এত শোর বা মচাচ্ছে কেন?

কেন আসছে কমিশন? এখন এটা খুব দরকারি আর জরুরি খবর। ধর্ষণের উপর নয়া আইনও পাস হচ্ছে।

হঠাৎ ভরমো থানায় কেন?

সেওপুর তো আপনার থানাতেই, তাই না?

সেই তো ভাবছি। সেওপুর, হাঁ, এখানে লগন সিং আর সত্তর সিং আর তাদের খেতীমজদুর সঙ্গে বিবাদ লেগে থাকে। বেটারা কামিয়ৌতি দেয় না আর। লগন আর ছত্তরও বুখে যায়। তার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা, হাঁ হাঁ, সে তো হয়ই।

দ্বিবেদী শিক্ষিতের উন্নাসিকতায় বলে, কামিয়া প্রথা তো খতম। কেন দেবে? আইন আছে না?

জী, আইনে তো খতম হয়নি। হল...

কীসে?

সে অনেক কথা। ভাইয়াসাহেবের আন্দোলন খতম হল। খুব তেজী ছেলে, স্কুলের মাস্টার, কিন্তু বহোত, হিংসাত মক আন্দোলন উঠাল। তাতেই লগনরা জব্দ থাকে আবার ক্ষেপেও থাকে।

দেখুন, বাস্তবতাকে মানতে শিখুন।

সে আবার কে? কোনো নতুন অফিসার?

আরে না না। কী করে বুঝাই! যা হচ্ছে, সে ঘটনাকে মেনে নিন।

এ কথা সত্যি যে নারীধর্ষণ খুব ঘৃণ্য কাজ।

হাঁ হাঁ কেন নয়? রাবণ যে সীতাকে অসৎ উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে গেল, তাতেই লঙ্কাপুরি ছারখার হল।

সে তো পুরাণের কথা। এখনকার কথা ভাবুন। ১৯৮০ সালের সীতাম্বরে কী হচ্ছে। এখন ধর্ষণ নিয়ে সবাই রুখে গেছে। সব কাগজে লিখছে। বহোত মিটিং-উটিং হচ্ছে। সব বেশ হচ্ছে আমার রাজ্য, আমার জিলা নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। এর মধ্যে কোন্ কাগজের লোক লিখে বসে আছে, সেওপুরে গত আট বছরে তিন বার যে হরিজন নির্যাতন হয়েছে তখন অনেক নারীধর্ষণ হয়েছে। লিখেছে, সেওপুরে কোনো হরিজন মেয়ে একটু বড়ো হলে মালিক মহাজন তাকে ধর্ষণ করে। এহি আদত। সেই জন্যে তো অনেকদূর শ্রাদ্ধ গড়াল, তাই না?

চতুর্বেদী আরও বোকা বনে যায় ও ভাবতে থাকে। তারপর বলে, কীসের কমিশন? কে পাঠাল?

এ কোনো সরকারি কমিশন নয়। তবে 'গণতান্ত্রিক অধিকারে রক্ষা' কমিটির কমিশন। বিচারক মবলঙ্কর। কিঙ্কর পাঠক—ইনি সাংবাদিক, চিন্তা বাই, রোজিদা গোমেস, এঁরা আসছেন।

এরা কারা?

সবাই খুব নামকরা লোক।

এদের মদত দিতে হবে?

নিশ্চয়। মানে, উচিত।

এইটাই তো বুঝছি না। গত আট বছরে তিন বার সেওপুরে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার ঘটেছে, আরে,—

চতুর্বেদী আন্তরিক সততায় বলে, লগন সিংরা তো চিরকালই খেতীমজদুর ঔর বাটাইদার ঔর সকলের সঙ্গে বিবাদ উঠাচ্ছে, টোলিও জ্বলছে, মানুষও মরছে। এ কী নতুন কিছু? একে হরিজন নির্যাতন বলছে কেন এখন? আগে তো আমি এ নাম এত শুনলাম না।

তবে এখন শুনুন।

সব কেমন উলটাপালটা এখন।

হরিজন মেয়েদের ধরমনাশও করছে?

আরে, যেমন ঘর জালায়, মানুষ মারে, তেমনি....

তবুও তো তা ধর্ষণ হল?

কেমন করে? আগে তো তা বলেনি কেউ?

হাঁ হাঁ, এ একটা ভাবনার কথা বটে।

আর কী বললেন? সেওপুরে এমন অনেক হয়েছে?

তাই লিখেছে।

আরে, ও তো হয়েই থাকে। লগন সিংরা খুব খায় দায়, শরীরে রক্ত চলে বহোত তেজে। যেন বন্দুকের গুলি চলছে। আর হরিজন মেয়েরা! কে যাচ্ছে ছাগল চরাতে, কে যাচ্ছে টাট্টি করতে, কে যাচ্ছে আর কোনো কাজে। তাতেই—!

তবুও তো তা ধর্ষণ।

না। তখনি তা ধর্ষণ হতে পারে, যখন কোনো নালিশ-উলিশ হল, থানায় খবর হল—জী! থানায় যতক্ষণ না লেখা হচ্ছে ততক্ষণ তো তা কেস হতে পারে না। সে তো আপনি বুঝবেন না। খুন খুন হবে না, ডাকাতি ডাকাতি হবে না, যদি না থানা তা বলে। এ ধর্ষণ নিয়ে তো কখনো কথা ওঠেনি?

খবর তো চলে গেছে অন্যরকম।

কী রকম?

পুলিশও মেয়েদের উপর খুব অধর্ম করে।

রাম রাম জী! এ আপনি কী বলছেন? পুলিশ কখনো তা করে না। তা করলে আপনার বউ, ডাক্তার বাবুর বউ। সবাই কী থানায় পাশ দিয়ে নিশ্চিন্তে বেড়াতে যেতে পারত?

কমিশনকে বলবেন।

কেন বলব না? পুলিশ গ্রামে যায় চৌকিদার-দফাদারের কাছ খবর পেলে। কোনো মেয়েছেলো ধরমনাশ হয়েছে? হাঁ হাঁ পুলিস তাকে আনে, এজাহার নেয়।

বাস, ওহি?

ঔর কা? সিরিফ এজাহার লেঁ।

তবে তো আপনার কোনো চিন্তা নেই।

কী ভাবতে ভাবতে চতুর্বেদী বলে, গত বছর সেওপুরে যা হল তারপরে তো মন্ত্রী-উন্ত্রী কতজন এসেছিল। তারা দেখে গেল সব। কখনো 'ধর্ষণ' এ কথাই তো বলেনি।

তাহলে তো চুকেই গেল;

কমিশন না এলেই হত।

আপনাদের মুশকিল হল, আপনাদের কোনো এডুকেশনের বালাই নেই; বাইরের কোনো খবর রাখেন না।

কী খবর রাখব?

এত কাগজের খবর, ওহি কাগজের খবর যে ইলাকা থেকে আদিবাসী জওয়ানী মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে ঔর কোথায় কামিয়া করে রাখছে, কোথায় রেন্ডী কাজ করাচ্ছে।

দ্বিবেদী জী! এক জবাব তো আগেই দিলাম যে সব আদিবাসী জওয়ানী মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলেও কিছু করার নেই আমার। থানার খবর মিলে তো যাব।

হাঁ হাঁ, যারা এমন কাজ করছে তারা কী থানায় ডায়েরি লিখাবে তারপর কাজে নামবে?

ঔর জবাব যা, তা আপনার পছন্দ হবে না। এসব মেয়েরা খুবই খচড়ী। জংলি জানোয়ার যেমন! কী বলব, স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে মদ খাবে, গান করবে, নাচবে। ঔর ছোটো ছোটো কাপড় পরবে। ঔর মরদের মতো, বেহায়ার মতো কুলি কাম করবে। কিছু ভালো আদত নেই।

আরে ওরা ওই রকমই।

তা যা বলুন। এখন হরিজন ঔর আদিবাসী নিয়ে নাচানাচি করা এক ফ্যাশান বনে গেল।

তাই বলবেন কমিশনকে।

নিশ্চই বলব। পুলিশের নামে এই বদনাম! কিছুই করে না পুলিশ। শুধু ফরিয়াদকে আনে, এজাহার নেয়। বিনা এজাহারে কী করে দাদ-ফরিয়াদ হতে পারে?

দ্বিবেদী যেন কী ভাবতে থাকে। তারপর বলে, মুসাম্মিন দুসাদীর কোনো খবর মিলল?

না। সে কথাই বলতে এসেছিলাম।

কম দিনের কথা তো নয়। এক মাসের বেশি।

তা হল। তার খোঁজ পেলে বা জানলে একটু পাত্তা চালিয়ে দেবেন। ওদের ভালাই করতে পারে কেউ? হাঁ, খুব আফশোসের বাত যে গত বছর যে হাঙ্গামা হয় তাতে লগন সিং গুলি জালায়। ঔর বুঢ়ন দুসাদ মরে গেল। তা নিয়ে কেসও হল। লগন সিং খালাস পেয়ে গেল, আদালতে কেস দাঁড়াল না। তা সরকার আছে, আইন আছে, সে সব মানবি তো? কুছু না মেনে তুই লগন সিংয়ের ঘাড়ে কোপ মেরে দিলি? লোকটা যদি মরে যেত?

মরেনি তো।

জী, মরার অধিক হয়েছে। ঘাড় বেঁকে গেছে, ঔর লগন সিং যখন পড়ে যায়, এমন জায়গায় মেরেছে যে কোনোদিন আর ঔরত সুখ উঠাতে পারবে না, জড় ভরতের মতো হয়ে গেছে।

সে কী মেয়েমানুষ না বাঘাইন? থানাতে আনলাম। সেখান থেকেও ভাগল আমার কনস্টেবলের চোখ কানা করে দিয়ে? তাকে না ধরলে তো লগনের ছেলে আমাকে আস্ত রাখবে না। কোথায় গেল?

জানি না। এ তো খুব চিন্তার কথা।

কী যে করি! রাজপুত লোক সব ক্ষেপে আছে। এখন লগনের ছেলে সমুন্দর সিং বলছে, তাদের জান বিপন্ন। কে কবে মেরে দেবে, ঔর আরও ভি বন্দুকের লাইসেন মাংছে। তো আমি

বললাম, তোমাদের লাইসেন এক বন্দুকের ঔর হক্-না-হক দশটা বন্দুক ফুটাও। কী করবে করো না কেন? আমি তো চোখ বুজে থাকি ঔর চোখ বুজেই চলে যাব।

বেআইনি বন্দুক রাখে?

অনেক।

কে কে?

কে রাখে না?

আপনি তো কেড়ে নিতে পারেন।

কৈসে? বন্দুক তৈরি তো এখন কুটির শিল্প। আর বন্দুকের কেনাবেচা এখন খুব সহজে হয়।

দ্বিবেদী এ অঞ্চলের গতিপ্রকৃতি জানেনা বা বোঝে না। প্রত্যেক জায়গা, ইলাকা, অঞ্চল, মহল্লা, থানা, ব্লক, পঞ্চায়েতসমষ্টির নিজস্ব কয়েকটি ব্যাপার থাকে। সে সব জায়গা জন্ম দেয় জঙ্গল, উঁচুনীচু জমি, খনিজ সম্পদ, উদ্ধত কারখানা, বর্বর ভূমিমালিক এ সবকে,—জমি রাখে দশজনের হাতে আর নব্বই জনকে রাখে খেতমজুর, কামিয়া, ভিখারি করে,—অঞ্চলে এনে দেয় মিশনারি, বিদেশপুষ্ট সেবাসঙ্ঘ, বর্ণোদ্ধত দম্ভী ও অত্যাচারী ব্রাহ্মণ দেবসেবক, বদমাশ সরকারি অফিসার, লুচ্চা ও খুনে রাজনীতিক মস্তান, সর্বব্যাপী ঠিকাদার চক্র,—সে সব জায়গার মধ্যে বেআইনি বন্দুক-গোলাগুলি-বোমার চাষ হবেই।

মালিক-মস্তান-ঠিকাদারের কাছে অনেক বন্দুক না থাকলে অঞ্চলটি বৈশিষ্ট্য হারায়, মানুষের মতো অঞ্চলেরও জাতপাতবর্ণকৌলীন্য থাকে।

ভরমো থানা কেমন?

আরে খুব বঢ়িয়া জায়গা। বেআইনি বন্দুক হাজার খানেক না হোক, আটশো তো বেকসুর।

ব্যস, জায়গাটি উঁচা জাতে উঠে গেল।

বন্দুক কাদের হাতে?

কেন? উঁচা জাতের হাতে?

ব্যস, তবে তো বঢ়িয়া জায়গা। আর কয়েক বছর আগে... কী যেন হয়েছিল....

জাত খোয়ে গিয়েছিল ভরমো থানায়। ভাইয়াসাহেব, দ্বারকানাথ, খুব বলোয়া উঠায়। খুব চলে। সে তোহ্‌রি থানার ব্যাপার। কিন্তু এখানেও ঢুকে যায় বেনোজল। নীচু জাত, অছুতের হাতে বন্দুক তো সেই উঠিয়ে দিয়ে গেছে। সে সব এখন চাপা পড়েছে বটে।

বেআইনি বন্দুক যে দীর্ঘকাল এ অঞ্চলে হাকিমহুকুম হয়ে আছে তা জানে না দ্বিবেদী। সে পেপারব্যাকে 'লোলিটা' পড়েছে এবং কয়েকটি ইংরিজি ছবে দেখেছে। বিয়ের সময়ে সে মোষ, জমিজমা, বোনের বিয়ের খরচ পণ নেয়নি! স্কুটার, ফ্রিজিডেয়ার (বিদ্যুৎ-কেরোসিন উভয়চালিত) এবং ভাইয়ের ডাক্তারি পড়ার খরচ নিয়েছে। ফলে সে জানে সে আধুনিক। চাকরি বিষয়ে তার মনোভাব হল, আইনে যা বলে তা সে বলে যাবে। তা কাজে হোক বা না হোক তা দেখতে যাবে না কিছুতে। এখন বেআইনি বন্দুক সম্পর্কে খোদ দারোগার সপ্রশ্রয় কথা শুনেই দ্বিবেদী বলে,

এ কী কথা?

কী হল?

বেআইনি বন্দুক আছে জানেন যখন, বন্ধ করুন?

চতুর্বেদী হেসে ফেলে, আপনি তো আইনের কথা বলছেন। কার কার কাছে আছে বেআইনি বন্দুক তা জানেন? এম. এল. এ. সাহেব, আপনার হাসপাতালে খানা জোগাবার ঠিকাদার, টাহারের বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরানা পন্থী সেবক হনুমান মিশ্র, আপনারা যে মডার্ন সাধুবাবার কাছে যান গম্ভীর-গাঁওয়ে সেই অমৃতরূপ স্বারমী, এঁদের কাছে।

এখন দ্বিবেদী বিচলিত হয়, সে কী?

জমি বাপের হয় না, বন্দুকের হয়। আমি যাব ওসব লোককে ঘাটাতে? রাম রাম জী! ঘাস গাছ পারে শাল গাছের সঙ্গে লড়তে? চুহা যাবে বাঘের সঙ্গে লড়তে? আমি চলি দ্বিবেদী জী। মুসাম্মিন দুসাদীর কোনো পাত্তা মিলে তো তাকে ধরিয়ে দিবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। আইনশৃঙ্খলা নিজের হাতে নেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। তাকে ধরুন। এ রকম মেয়েছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ তো ভয়ের কথা।

॥ দুই ॥

দারোগা তারপর যায় ভরমো স্টেশনে। স্টেশনটি ছোটো, লাইনে উঠে এসেছে চালু পাহাড়ের গা বেয়ে এবং কিছুদুর গিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে। ভরমোতে ট্রেনে আসা চলে, বাসেও। ইলাকায় ঘুরত আড়কাঠি। আদিবাসী নরনারীকে তারা লোভ দেখাতে ব্রিটিশ মালিকানার চা-বাগান, কফি বাগান, কয়লা খনিতে কাজের। সেখানে গেলে এই এত জমি পাবি। কী জমি! মাটিতে লাথি মারলে ধান বীজ ছড়ালে ধান হয়।

তারা মেয়েদের জন্য আনত দস্তার চুড়ি, পুঁতির মালা, শস্তার আয়না। পুরুষদের জন্য আনত মাথায় গোঁজার কাঠের কাঁকই, টুকটুকে লাল গামছা। আর সব চেয়ে আগে গ্রামপ্রধানকে সম্মান জানাতে সস্তার চুরুট আর রুপোর একটা টাকা দিয়ে। তখন চলে যেত আদিবাসী নরনারী। সে সময়ের কথা এখনো তারা গানে গানে গেয়ে পাথর ভাঙে, পথ পিটাই করে।

যেও না যেও না বহিন গো
কুলি লাইনে কলের গাড়ি ঝুকঝুক ডাকে, ঝুকঝুক ডাকে
নিওনা নিওনা দস্তার চুড়ি বহিন গো
পরো পা পরো পা কলের পুঁতির মালা
কাঠের বাসা দিও বহিন গো
এনে দিব মাটির গটা মালা।
যাব গো যাব গো বহিন গো
কুলি লাইনে কলের গাড়ি ঝুকঝুক ডাকে, ঝুকঝুক ডাকে
ঝুকঝুক ডাকে ঝুকঝুক ডাকে
ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক ডাকে।।

তারপর লাইনটি হয়ে যায় কুলিকামিয়া লাইন। লগনের এক জ্যেঠা যখন কেনে কয়লাখাদান চিড়মাতে।। খনিমালিক সেই প্রতাপ সিংয়ের যত বেঠবেগার কামিয়া ছিল তাদের নিয়ে যায় সেখানে। তাতেও কুলায় না কাজ। নিয়ে যায় আরও মানুষকে কামিয়া বানিয়ে। খুব জমে ওঠে কারবার। প্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে অংশীদার এক গুজরাটি। এই গুজরাটি চিমন পারেখই খনির ব্যাপারে টাকা বিনিয়োগ করেছে। অন্যান্য কাছের খনিগুলির রেটেই সে কুলিদের টাকা দেয়। প্রতাপ সে টাকা নিয়ে নিতে থাকে। বেঠবেগারের মেহনতের রোজগার তো মালিকেরই হবে। খাইখরচা বাবদ যা দেয়, তা মূল ঋণের সঙ্গে যোগ হয়ে ডিম পেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি সুদের। গুবরে পোকার রেটে। গুবরে পোকা একেকবার পাঁচ হাজার ডিম পাড়ে। এতে প্রতাপের হাতে অসংগত রকম টাকা জমে। গুজরাটির মনে জমে হিংসে। সে কুলি-ধাওড়ায় গিয়ে কুলিদের তাতায় এবং বলে প্রতাপকে সরাতে পারলে সে এদের রাজা করে দেবে। ছোটো খাদান, অল্প কুলি। সে বড়ো খাদান বিনবে, কুলিদের দেবে আচ্ছা মকান। খুলে দেবে তাড়িখানা এবং জরুর এক ছিনিমা হাউস বনাবে।

এভাবেই সে কামিয়াদের অন্ধকার মনের জমিতে আশার বীজ রোপাই করে। এ জমি প্রতাপের শোষণে শাসনে দীর্ণ, ফালাফালা। বীজ পড়ে মহীরুহ হয়। কামিয়ারা মুক্তির স্বপ্ন দেখে ফেলে। বালি নাগেসিয়া বলে, কামায়ৌতি থেকে তো বাঁচা যাবে।—এবং সে জনা দশেককে সঙ্গে নেয়। প্রতাপ যখন রাতে দরজা খুলে কুলিধাওড়ার কোনো না কোনো যুবতী মেয়ের বাধ্যতামূলক প্রবেশ প্রতীক্ষায় মদ খায়, বালি নাগেসিয়ারা ঢুকে পড়ে ও প্রতাপের মাথা নামিয়ে দেয়। অতঃপর বেরিয়ে এসে ঠিক করে, যে লঙ্কায় যাবে সেই রাবণ হবে। চিমন পারেখ কিছু সোনার বাঁধানো নয়। অচিরে সেও ফনা ধরবে।

বালি অতএব চিমনের কাছে যায় প্রতাপের মাথা নিয়ে। মাথাটি দেখে চিমন মূর্ছা যায়। সে অবস্থাতেই তার মুর্ছিত ও বিবশ মাথাই নামাতে হয়। পরের কাজটি চিমনের ধড় সারে। মাথা নেই, গরিয়ে গেছে বুঝে ধড়টি অসহায় হয়ে আছড়ে পড়ে। আছড়াবার কালে কেরোসিনের জলন্ত ল্যাম্প উলটে পড়ে হিসাবের খাতায় আগুন লাগে এবং কাগজপত্রে আগুন ছড়ায়।

বালিরা খাদানে কাজ করে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাও বলে, পুলিশ আসবে ও তাদের নকড়াছকড়া করবে। অতএব তারা রওনা দেয়। কয়েকমাইল দূরেই ধানবাদ। ধানবাদ স্টেশন থেকে কোনো ট্রেনে চেপে কোনো জায়গায় চলে যায় তারা। দেশ-ঘর চেনা দুনিয়া ছেড়ে যাবার দুঃখে বিহ্বল মানুষগুলি হাওড়া পৌঁছে কীভাবে আড়কাঠির হাতে পড়ে একদিন আসামের ও জলপাইগুড়ির চ-বাগানে পৌঁছায়, সে অন্য কথা। এসব ঘটে যায় স্বাধীনতার এক বছর কয়েক মাস আগে।

সে সময়ের কথা এখনো তারা গানে গানে গেয়ে সন্ধ্যা কাটায় কী না তাও জানা নেই। তবে ভরমোতে কাহিনিটি পল্লবিত হয়ে ছড়ায়। প্রতাপের পরিণাম লগন সিংদের ও অন্যান্য জমিমালিকদের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সবাই বলে, প্রতাপসিংয়ের কাহিনিতে আছে নীতিশিক্ষা। তা কখনো কেউ ভুলো না।

'রাঁচি গিয়ে কেউ মিড্‌ল প্রাইমারি পোড়ো না। গ্রামের বাইরে গিয়ে কিছুই পোড়ো না।'

—প্রতাপ রাঁচি গিয়ে মিড্‌ল প্রাইমারি পড়েছিল আর সেখানেই তার মাথায় 'কুইলা ইনডাসটি করেগা' রূপ বদখেয়াল ঢুকে যায়। গ্রামের স্কুলে চার ক্লাস পড়ে নাও, ব্যস্‌। হিসাব রাখলে। জমির কাগজ দেখলে, বেশি পড়বে কেন?

'জমি ছেড়ে অন্যদিকে মন দিও না।'

—প্রতাপ দিয়েছিল। ফলে ধড় এক বাড়িতে, মুণ্ড আরেক বাড়িতে, ছি ছি কী পরিণাম তার! না ভালো করে দাহ, না কিছু, ছি ছি।

'কামিয়াদের রেলগাড়ি চাপিও না।'

—প্রতাপ চাপিয়েছিল। ফলে কামিয়াগুলো বেহাত হয়ে গেল। প্রতাপের বউ- ছেলেদের নতুন নতুন লোক ধরে কামিয়া বানাতে হল।

প্রতাপের নামই করতে চায় না কেউ। আর দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, রবিদাস, ঘাসি, পারহাইয়া, নাগেসিয়া পরিবারে হঠাৎ 'বালি' নাম রাখার ধুম পড়ে যায়। এখন যেমন ঘরে ঘরে 'দ্বারকা-দ্বারি-দোয়ারি-দুয়ারা' নাম রাখার ধুম চলছে। এ সব খেতমজদুল ঔর জঙ্গলকুলি ঔর লাক্ষাচাষী ঔর কামিয়া লোকদের মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ।

বি. ডি. ও-র কাছ থেকে বেরিয়ে দারোগা যায় ভরমো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের কাছে।

ভরমোতে স্টেশন মাস্টারের তেমন কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। এদিকের অনেক স্টেশনের মতো ভরমো এক ন্যাড়াবোঁচা স্টেশন। সব ট্রেন দাঁড়ায় না এখানে। সেওপুর আর ভরমোর মাঝামাঝি আরেকটি সিমেন্ট কারখানা হবার কথা হচ্ছে। সেটি যদি হয়ে যায় তাহলে স্টেশন

মাস্টার বৈকুণ্ঠজী জরুর টাহাড়ের বিশ্বনাথজীর মাথায় রুপোর বেলপাতা চড়াবেন। সিমেন্টের দৌলতে তাঁর পকেটের হাল ফিরবে।

ভরমো জায়গাটির জাঁকজমক অন্য কারণে। এখানকার বাঁধানো বাজারতলায়, পাকা ঘরে বসে পাইকারি বাজার। সর্ষে, ডাল, লঙ্কা, আলুর। বছরে দুবার বসে গোহাটা। বহুদূর থেকে মানুষ এসে গরু, মোষ কিনে বেচে ঘরে ফেরে। এই ভরমোতে সবই আছে। ব্যাংক, কৃষি-উদ্যোগ আপিস, জঙ্গল বিভাগের নার্সারি, দোকানপাট, শুঁড়িখানা, বিলাইতি মদের দোকান, হেকিমি-কবিরাজ ও স্বপ্নাদ্য সালসার দোকান। আছে হোটেল, খাদি ভাণ্ডার। স্কুল, হাসপাতাল। ইঁদারার সঙ্গে পাম্প লাগানো আছে। পাশেই আছে গান্ধিজির একটি বিশাল, সিমেন্টের আবক্ষ মূর্তি। গান্ধিজির ঈষৎ হাসি হাসি মুখটি ফাঁক করা। হাত পাম্প চালালেই গান্ধিজির মুখ থেকে পানীয় জল বেরিয়ে আসে। উপরে সিমেন্টের হরফে লেখা আছে, 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে'। —'য়্যা' শব্দটি খুবই বড়ো করে লেখা। খুবই দুঃখের বিষয় যে এই মূর্তির পিছনেই সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত তাড়িখানা আর তাড়িখানার পাশের মাংসের দোকানের কোণ ঘেঁষে ঢুকে পড়লেই রেণ্ডী পট্টি। এটি দেখতে যে খুব মন্দ তা আগে কেউ বুঝত না। 'গান্ধি সেবিকা সংঘ' প্রতিষ্ঠানের প্রৌঢ়া ও উদ্যমী মহিলারা কয়েক বছর ধরে মহাত্মার জন্মদিনে এসে ধুলোর উপর বসে চরকা চালিয়ে দু ঘণ্টা সত্যাগ্রহ করে চলে যান। সেদিন তাঁর মৌনী থাকেন বলে কথা বলেন না। ফলে তাড়িখানার মালিক, মাংসের দোকানের কসাই আর রেণ্ডীপট্টির রেণ্ডীরা দু বছর খুবই বিভ্রান্ত ছিল। পরে তারা সব বুঝে ফেলেছে।

এইরকম নানা তামাশা সেই ভরমোতে হয়। এমনকী ত্রিশূলী লালার খাঁড়ি গুড়ের আড়তের সামনে পর্দা টাঙিয়ে জেনারেটরে 'রাইফেলওয়ালী' এবং 'মহাবীর হনুমান' ছবিও দেখানো হয়েছে। গুড় পুষ্ট পিঁপড়েদের কামড়ে দুবারই দর্শকরা ফুলে ঢোল হয়েছে ছবির অন্তে।

এই ভরমোই আসল ভরমো এবং তা বাসপথের পাশে। এখানে অনেক জায়গাতেই স্টেশন নগণ্য, বাসপথের দুপাশে জনপদের জাঁক। এই ভরমো, ভরমো বাজার নামে প্রসিদ্ধ। থানা দূরে, এখানে চৌকি পুলিশের।

দারোগাকে দেখে স্টেশন মাস্টার বলল, আসুন আসুন চতুর্বেদী জী। এক নালিশ আছে।

নালিশ?

আর্জি আছে, হাঁ হাঁ, আর্জি।

কৈসা আর্জি?

ভৈয়া, এখানে তো সবই রেখেছেন, কোনো অভাব নেই। ঘি বলুন, দুধ বলুন, ঘরে বসে পাচ্ছি।

চতুর্বেদী বলে, আজ আমি আপনার জন্যে করছি। কাল আপনি আমার জন্যে করবেন। এ আর বেশি কথা কী। বুনো জংলি জায়গায় দুজনে-দুজনকে দেখতে হবে। এবার বলুন, কী বলছিলেন।

একটা জিনিসের অভাব খুব টের পাচ্ছি।

কী, কী?

হিজড়া নেই।

হিজড়া? কী হবে?

সাত বছর আছি, পাঁচটা ছেলে মেয়ে তো এখানেই হল। জায়গা ভালো। ঔর দেবাংশীও বটে। আগে চার বছরে তিনটাই হল মেয়ে। এখানে চারটি ছেলে হয়ে গেল। কিন্তু হিজড়া না নাচলে বাচ্চার ভালো হয় না। হিজড়ার যে কত দরকার, কী বলি! ওরা ওষুধবিষুধ, তুকতাক খুব ভালো

জানে। আপনার ভাবীজী তো বলছেন, হিজড়া আনো, হিজড়া আনো, নইলে ছেলেদের খারাপ হবে।

চতুর্বেদীও খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে ও তখন তার মনে হয়, তার সাধের ও গৌরবের ভরমো থানায় এ এক মহা অঙ্গহানি। কুষ্ঠি, বেশ্যা, লুচ্চা, মস্তান সব আছে, হিজড়া নাই। হিজড়া সে কোথায় পায়? থানার হুকুমে গ্রামের ও বাজারের লোকজন দুধ, ডিম, মাংস জোগাতে পারে। থানার হুকুমে নপুংসক কী তৈরি হয়?

সে বলে, আমি দেখছি। আসলে কী জানেন? মানুষের ধর্মবোধ নেই। হিজড়া সন্তান জন্মালে থানায় খবর দিবি। কেউ দেয় না। এ তো জানা কথা যে কলিযুগে দশ বছরে যেমন আদমসুমার হবে, তেমন হিজড়া জন্মাবে। এ কথা আমি টাহাড়ের হনুমানজীর কাছে শুনেছি। তা হলে ভেবে দেখুন হিজড়া জন্মাচ্ছে কিন্তু খবর মিলে না। জনসাধারণ সহযোগিতা না করলে থানা কী করবে?

সে কথাও সত্যি।

ভেবে ভাববেন না। বলছেন যখন, তখন ব্যবস্থা একটা হবে, হিজড়া আনিয়ে দিব।

কে জানবে?

যদি কেউ জানে গুলাবি জানবে।

সে কে?

রেন্ডী থি। এখন নিজে কারবার করে না। অন্য রেন্ডীদের দেখাশুনা করে। খুব ঘুঘু মেয়েছেলে। কী জানে আর কী জানে না। ওষুধ করে।

যাক, বাঁচালেন।

ওকেই বলব।

এখন বলুন সমাচার।

চতুর্বেদী মুসাম্মিন দুসাদীর কথাটি বলে। বলে, নজর রাখছেন তো? ট্রেনে চেপে না ভাগে।

কী করে তা হতে পারে? আমি আছি না?

বাঁচলাম। এখন উঠি।

সে কী? এখনি?

আমার তো জানেন, সন্ধ্যাআহ্নিক না করে কিছু করার উপায় নেই।

হাঁ হাঁ, এও তো কথা বটে। আহ্নিক না করে আপনি হুইস্কিও খান না, ভুলে গিয়েছিলাম।

ওহি তো হোনা চাহিয়ে। তা যদি না পারো তবে নামের পিছন থেকে বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী উপাধি কেটে দাও। বেদকে অপমান করো না। বেদে লিখা আছে আহ্নিক না করে মদও খাবে না, রেন্ডীগমনও করবে না। সে কথা কে মনে রাখে বলুন?

স্টেশনমাস্টার গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার মিশ্র আবেগে তাড়িত হয়ে মেঝেতে থুথু ফেলে ও বলে, লোকে সিনেমায় সাধুসন্ত দেখে কিন্তু থানায় কে বসে আছে তাকে চেয়ে দেখে না।

নমস্তে জী, ভালো থাকবেন।

আপনিও।

চতুর্বেদী ভালো থাকে না। মন তার অস্থির, অশান্ত। এখন সে কোথায় যেতে পারে? যার কাছে যাওয়া দরকার, সে হল পল্টন সিং। লগনের বৈমাত্র দাদার ছেলে। বাপ মরতেই লগন আর দাদাতে প্রবল বেধেছিল এবং বাপের শ্রাদ্ধে কত খরচ হবে কে সে খরচ করবে,এ নিয়েও বাধে। পরিণামে দুজনেই বন্দুক উঠায়। দাদা মারা যায়।

তখন পল্টন মিসার জেলে। জেল থেকে ফেরে সে মস্তান তিন সঙ্গী নিয়ে এবং সমগ্র অঞ্চল থেকে নিয়মিত বাট্টা নেবার ব্যবস্থা করে। লগন ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে সম্পর্ক ভালো

করতে যায়। পল্টন সে সময়ে সব শুনে যায় ও বলে, আপনি এক সময়ে চাচা লাগতেন, মাসে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাবেন।

এখনো চাচা লাগি।

না। কীসের চাচা?

এ হেন মস্তানি কথা বলে পল্টন দু'দিন বাদে লগনের বাড়ির গরু-মোষের চাড়িতে বিষ দিয়ে সরে পড়ে টাকা নিয়ে। জনা আষ্টেক মস্তানকে সে নিজের বাড়িতে রেখে যায়। তারা বাকি শত্রুতাগুলি করবে। তার বাড়িই এখন ও অঞ্চলে বন্দুক কেনাবেচার জায়গা। সমগ্র ইলাকাই পল্টনের গ্রাহক। ফলে ইচ্ছা থাকলেও লগন কিছু করতে পারছে না।

পলটনের কাকা, লগনের আরেক বৈমাত্র ভাই ছত্তর সিং এসব ধান্দায় নেই। সে জমি ও কামিয়া ঠেঙানোতেই ব্যস্ত থাকে।

পলটন নিজে থাকে ভরমো বাজারে। মাঝে মাঝে সে গব্বর সিং হয়, যখন 'শোলে' দেখে। বস্তুত লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্য যেমন সেখানে—'শোলে' যখন যেখানে পলটন তখন সেখানে। বন্দুক-কারবারে এখন মোটা মুনাফা। পলটনের কাজ জোগাড় ও বেচা। কে কিনছে তা সে ভাবে না। সে যাদের বন্দুক বেচেছে, তাদের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে ভাইয়াসাহেবের দল যে লড়াই করে তাতে সে খুব খুশি।

তার খুশি হওয়া উচিত নয়, কেন না বন্দুক যাচ্ছে অবাঞ্ছিত লোকদের কাছে, এ কথা বলে চতুর্বেদী খুব বোকা বনেছে আগে আগে। পলটন বলেছে, আমি কী করব? উল্লুকা পাট্‌ঠের দল বন্দুক ছিনাতে দিল কেন?

এ তো সত্যনাশ হয়ে গেল। কী সব লোকের হাতে বন্দুক পড়ল, তারা হিংসার কাজে বন্দুক উঠায়।

এ কথায় পলটন একেবারে গব্বর সিংয়ের মতো খিকির হাসে ও তেমনি গলায় বলে,লছ্‌মন সিং আর মথুরা চৌধুরী কি রেন্ডীর বগলে কাতুকাতু দেবার জন্যে রাইফেল কিনেছিল নাকি?

এ কী বলছেন, ছি ছি!

কেন? রেন্ডীর বগলে আপনি কাতুকাতু দেন না?

আঃ!

হিংসার কাজে...হি হি হি!

কাজটা খুব খারাপ হল।

পলটন তৎক্ষণাৎ ঠাকুরসাহেব হয়ে গিয়েছিল ও সঞ্জীবকুমারীর গাম্ভীর্যে বলেছিল, না না। এর মধ্যেও ভালো কাজ হল একটা। ওরা একটা বন্দুক ছিনালে এরা একটার জায়গায় তিনটে কিনবে। আর পলটন সিং সে বন্দুক বেচবে। তাই এ সব কথা বলে লাভ নেই কোনো।

তারা এলে তাদেরও বেচবেন?

আমার হল কারবার। খদ্দের পাব, বেচব।

কয়েকটি বন্দুক বেচে যে নাফা ওঠে, তাই নিয়ে পলটন 'শোলে' ছবির পেছন পেছন ধানবাদ-রাঁচি-ডালটনগঞ্জ-বোখারো-রামগড়, ঘোরে। কয়েক মাস পরে টাকা ফুরালে ফিরে আসে। তার বড়োই বাসনা কোনোদিন ঘোড়ায় চেপে দোহাত্তা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢুকে ভরমোবাজার জ্বালিয়ে দেয়।

আর যখন 'শোলে' চলছে না কোথাও, তখন সে সাট্টা খেলে এবং রেন্ডীপট্টিতে ঢোকে অনেক মদ, অনেক খাবার নিয়ে। সেদিন সে সকলকে ডেকে আসর বসায়, সকলকে টাকা দেয়। পলটনকে রেন্ডীপট্টি খুব পছন্দ করে। কেন না পলটন তাদের নিয়ে দিলদারি করে। পলটনের পয়সায় এ

মেয়েরা রোলে ক্সের কাজ করা নাইলন পরেছে ও গায়ে মেখেছে 'আই লাভ ইউ' পাউডার।

পলটন হেন মস্তানের যাওয়া-আসা থাকার ফলে রেন্ডীরা পুলিশের জুলুম থেকে খানিক বেঁচেছে। গুলাবি এক কনস্টেবলের কাছে দোইথৌই করছে দেখে পলটন কৌতূহলী হয়।

কা ভৈল্ গুলাবি?

গুলাবি হাউমাউ করে বলে, সব নিয়ে গেল।

সব পয়সা?

তবে আর কী? বিনা পয়সায় মজা উঠাবে আর সব কটা সেপাই পয়সা নেবে। দারোগার চাই এক টাকা। আমার কী কারবার আছে এখন?

সবাই দেয়?

না দিলে জুলুম!

পলটন বলে, আমি দেখব।

পরদিন ও দারোগার কাছে যায় ও বলে, দেখুন চতুর্বেদীজী! হম হ্যায় পলটন সিং ঔর য়ো রেন্ডী লোগোঁকো আমি বচায় গা। ওদের উপর জুলুম চলছে।

কৈসে?

আপনার কনস্টেবলরা যাচ্ছে, মজা লুটছে, দাম দিচ্ছে না ঔর পয়সা খিঁচে নিচ্ছে। আপনিও নিচ্ছেন।

দেখুন, এ আপনার এক্তিয়ারি বিষয় নয়।

পলটন গব্বর সিং আর রবিনহুডের সম্মিলিত নতুন লোক হয়ে যায়। গব্বর ও রবিনহুড! দুই প্রবল ব্যক্তিত্ব। সে প্রচন্ড গর্জনে বলে, সবকিছু আমার এক্তিয়ারে পড়ে। এ জুলুম আর চলবে না। বেচারা অবলা মেয়েমানুষ সব! —বহু হিন্দি ছবি সে দেখেছে এবং এ অঞ্চলে আসে পুরনো সব ছবি। সেদিনই সে দেখেছে 'বরসাত'। নার্গিস-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে রাজকাপুরের বেশ্যা ঘরে গমন তার মনে পড়ে। কা অ্যাকটিং! সে বলে, এরা কী কেউ মা, বোন, মেয়ে নয়?

আরে আপনি যে—

ব্যস্ চুপ। আমার পিছনে কোনো পার্টি আছে একবার ভেবে নিন। আর কোনোদিন জুলুম উঠাবেন না। আমার মস্তানরা এখন ভরমোবাজার কন্ট্রোল করে। আমার কথা না শুনলে ফলাফল খুব খারাপ হবে।

ভৈরা! আমার সিপাইরা ডিউটি ফুরালে রেন্ডীপট্টি যেতে পারে। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে।

কা? গণতান্ত্রিক অধিকার? তবে ওদের পিটিয়ে সিধা করবার গণতান্ত্রিক অধিকার আমারও আছে। অঞ্চলে মন্ত্রী এলে প্রোটেকশন দেয় কে? আমি দিই না? আর এক পয়সা যে জুলুম করে যে উঠাবে তার গণতন্ত্র কেটে নেব।

এ কথা সে রেন্ডীপট্টিতে সগর্বে জানিয়ে দেয়। স্বভাবতই গণতন্ত্র কেটে নেবার প্রস্তাব রেন্ডীদের খুব আমোদ দেয়। এ কাজটি ব্যাপক হারে চালাবার বৈপ্লবিক প্রস্তাবও দেয় মোরি নামে একটি মেয়ে। পলটন 'শোলে' ছবির অমিতাভ বচ্চনের গলায় বলে, না না। সকলের গণতন্ত্র কাটা গেলে তোরা খাবি কী? কারবার খতম হয়ে যাবে না?

ফলে পলটন বনাব দারোগা ও থানা একটা আড়াআড়ি লেগে থাকে। সেপাইরা সবচেয়ে খচে থাকে মনে মনে। নয়াজামানার মস্তানরা নিজেরা থানাকে কিছু দেবে না। অন্য কেউ দিলে তাতে বাধা দেবে, এ বড়ো দুখের বাত। গুলাবি বোঝে, ব্যাপারটা ভালো হল না। সে দারোগাকে বলে আসে, ও যখন থাকবে না তখন আমরা কিছু দিয়ে যাব।

দারোগা বলে, তা দিতে হবে না।

দেব না?

না, থাকুক।

সেই পলটনের কাছে যাবে কী? চতুর্বেদী ভেবে পায় না। লগন সিংকে মারাত্মক জখম করার পর পলটন না কী মুসাম্মিনকে ধরে এনে চৌকিদারের হেফাজতে দেয়। তারপর কাকাকে গরুর গাড়িতে উঠায় বিবাদ ভুলে। সে জানলেও জানতে পারে। মুসাম্মিনকে সেই বলতে গেলে ধরে এনেছিল সেদিন, সেওপুরে।

থানায় ফিরে সে চমকে ওঠে। পলটনের কথা ভাবছিল, এতো পলটনই! আর এ লোকটা কে? মাস্টার মাস্টার চেহারা? যুবক বলা চলে না। বছর তিরিশ বয়েস। পাকানো, শান্ত চেহারা।

কী খবর পলটন জী? ইনি?

আমার সঙ্গে আসেননি।

এমন সময়ে?—

আপনি শুনেননি?

কী শুনব?

গুলাবির বোনঝি এসেছিল গ্রাম থেকে। তার চেচক হয়েছে, চেচক। তাই রেন্ডীপট্টিতে কেউ যাচ্ছে না।

হাসপাতালে নেয়নি কেন?

বেড়ে গেছে খুব। শুনছি গোটা গায়ে বেরিয়েছে। একুশ দিন হলে নিশ্চিন্ত।

আর কারো হয়েছে?

না না। গুলাবি একা আলাদা ঘরে তাকে নিয়ে আছে। কোনো ছোঁয়াচের ভয় নেই।

হঠাৎ এখানে?

পলটন কখনো বন্দুক ছাড়া চলে না। সে কিছুক্ষণ দারোগার দিকে চেয়ে থাকে। চতুর্বেদী হঠাৎ বোঝে, পলটন কোনো কারণে ভয় পেয়েছে। পলটন চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে। দাঁত বের করেও, হাসে না। তারপর হঠাৎ চাপা হিসহিসে গলায় বলে, মুসাম্মিন দুসাদীর খোঁজতালাস করছেন না কেন?

করছি,খুব তালাস করছি।

আমি চাই না ও কমিশনের সামনে আসুক।

আমিও চাই না।

সদরে কেউ আমার নামে চুকলি খেয়েছে। ব্যস্, ডিসিশন হয়ে যাবে যে,পলটনকে হটাও, গণেশকে বসাও।

কোন্ গণেশ?

গণেশ সিং। নাম জানেন না?

হাঁ হাঁ,কে না জানে?

আমার নামে কোই সোর মচালে পার্টিসে বাহার। আর গণেশ আমাকে জানে মেরে দেবে।

মারবে?

পুরানো বিবাদ আছে। কিন্তু আপনি অত আনন্দিত হবেন না। গণেশ আমার কাঁধে হাগে।

চতুর্বেদীর পক্ষে সমগ্র ঘটনাবলির চাপ খুবই মর্মান্তিক হয়। সে বলে, হাঁ হাঁ, বুঝে নিলাম। আপনার সঙ্গে তার বিবাদ, আর ইলাকায় এখন গণেশ সিং ঘুসে যাচ্ছেন, থুড়ি, যেতে পারেন। কিন্তু তাতে তো আমার কিছু করার নেই। গণেশ সিং ধানবাদ ছেড়ে এ ইলাকায় এলে তো আমার

কারণে আসছে না জী। সে আসছে, কেন কী তিন বিবাদী ইউনিয়ান এক সঙ্গে মিলে গেছে ঔর সে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এখন সেখানে থাকলে তার জানের উপর চোট উঠে তাতেই সে ঔর ইলাকা খুঁজছে আমি তো এই জানি। আপনার সঙ্গে তার বিবাদ কেন তা জানিনা। আর জানতে চাই না।

—ওঃ! সেইজন্যে আসতে চাইছে! পলটনের মুখ নিরানন্দ হাসিতে ফাঁক হয়। যেন শীতের মরা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয় বাগাড়ে ঘোড়ার কঙ্কালে আশ্ব দাঁতগুলি। গণেশও প্রাণভয়ে ইলাকা বদল করতে চাইছে এ চিন্তায় যতক্ষণ সে সান্ত্বনা পায় ততক্ষণ মেলা থাকে দাঁত। তারপর হাসিটুকু মিলায়। পলটন যেন নিজেকেই বলে, য়ে পলটন, তোহয় কী বা? তোকে তো মেরে দিবে। তারপর সে হারামি মরলো কি না তা দেখে কী করবি?

চতুর্বেদীর বড়োই দুঃখ হয়। সে বলে, পলটন জী! কত বড়ো বংশের ছেলে আপনি। এ সব ছেঁড়া ঝামেলা ফেলে রেখে যদি জমিজিরাত নিয়ে থাকতেন তাহলে দেশের শোভা বড়ে যেত, পদমর্শিরি খেতাব ভি মিলত আপনার। এত বুদ্ধি আর উদ্যম, এ তো কাজে লাগত।

বুড়ি ভৈসীর মতো কথা বলবেন না। আমি জমি নিয়ে থাকলে, যত বিঘা জমি ততগুলো বন্দুক—এ কাজটা করত কে? শালা সবাই চিনে জমি আর ভৈস, ভৈসাল বুদ্ধিতে চলে আর বুড়ি ভৈঁসীর লম্বরী টেংরি চুষে। কেউ মডার্ন হতে চায় না। সবাই চালাত আদ্যিকালের দোনলা বন্দুক। তাদের হাতে কোল্ট অটোমেটিক, ওয়েবলি অ্যান্ড স্মিথ ধরাল কে? পদমশিরি! ভৈঁসাল ইলাকার ভৈঁসাল দারোগা। পদমিশিরি নেই এখন, সে খবরও রাখেন না। ঔর পদমশিরি মেঁ কা ইজ্জত? য়ো রেন্ডীলোগের চামউকুন গণেশেরও তো পদমশিরি মিলেছিল। যখন চিড়মা খাদান বেল্টে 'নকশাল মদতদার' সোর উঠিয়ে তিরিশটা আদিবাসী কুলি মারল। পদমশিরি!

গজর গজর করতে করতে পলটন বেরিয়ে যায়। সেদিনই সে 'শোলে' ধরতে রামগড় গিয়ে 'শোলে'র দেখা না পেয়ে 'অমর আকবর অ্যান্টনি', টক্কর', এবং 'রাম ঔর শ্যাম'দেখে এসেছে। আর একুশ বার 'শোলে' দেখলেই তার একশো বার দেখা হয় ও নিজের জীবনের এক পবিত্র কর্তব্য সমাপন হয়। সে কাজ অসমাপ্ত। পরপর তিনটি ছবি দেখেছে সেদিন। তবু সে আজ অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জীবকুমার বা দিলীপকুমারের গলায় কথা বলে না। পলটন সিংয়ের নিজস্ব গলায় কথা বলে। তাতেই বোঝা যায় তার মন কত বিচলিত আজ।

চতুর্বেদীও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে চেয়ে থাকে পলটনের গমন পথের দিকে। মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে ও আন্তরিক সমবেদনায় যেন উপস্থিত লোকটির কথা ভুলে গিয়ে নিজেকেই বলে, হায় হায়! এক মানী বংশের ছেলের কী পরিণাম। সে মনে রাখল না জমির কথা, বনল বন্দুককারবারী মস্তান। সবাই বসে, চতুর্বেদীজী! ভরমোর মাটিতে এত মস্তান কেন? বুঝে না, বুঝে না কেউ? রাজপুত বংশের ছেলে সব। মাংস-ঘি-দুধ খায়। দেহে গরম কত। তেজ হোনে সে প্রকাশ হোনা চাহিয়ে। এখন সিংহ তুমি, কোথাকার কোন্ চুহার ডরে কাঁপছ। আরে! তুমি যদি মরে যাও, আর একুশবার 'শোলে' দেখবে কে? তোমার জীবনের মেশিন তো পুরা হবে না।

মেশিন নয়, মিশন।— চেয়ারে বসে থাকা লোকটি বলে।

চতুর্বেদী চমকে ওঠে।

তারপর বলে, ঠিক আছে। মেশিন আর মিশন আমার না জানলেও চলবে। অংরেজী ভাষা, মেলছের ভাষা, গৌখোরের ভাষার ভুল ধরবেন না।

ঠিক আছে। আমার মেশিন য়া মিশনটা সেরে যাই।—শান্ত লোকটি, শান্ত গলায় বলে, শুনুন।

আপনি, আপনি...

হাঁ, লোকে মাস্টার ভাবে। আর আমি মাস্টার তো বটেই। সবাই আমাকে মাস্টার সিং বলে।

শুনেছেন এ নাম? খুব সাদা হয়ে গেছেন। তার মানে জরুর শুনেছেন। আমি গণেশের ডানহাত। টাকাপয়সা আমি দেখি। আমার মুখ লোকে চিনে না, পলটন চিনেনি।

মাপ করবেন।

করেছি। গণেশ ইলাকায় আসছে। খুব শীগগির পলটনদের সকলকে সাফ করে দেবে। ও সব রেন্ডীবাজি আর গাঁওলী ছুঁচোবাজির দিন খতম। গণেশ বহোত নীতিবাদী হ্যায়। সে বর্ণহিন্দু ঔরতের ঔর গো-ব্রাক্ষ্মণ-পুলিশের উপর জুলুম সইবে না। পলটনদের লাশ পড়বে ঔর থানার মদত চাই। মদত মানে,থানার চুপ করে থাকা চাই। থানা মাসে মাসে বাট্রা পাবে। এহি লিজিয়ে পহেলা কিস্তি, এটা থানাকে জলপানি খেতে দিয়ে গেলাম। একলা খাবেন না, ঘোড়ার সহিসকে পর্যন্ত দেবেন। পাঁচশো আপনার। হাজার আছে।

জী!

পলটন যেন জানে না।

না, কখনো নয়।

পথে একটা শহুরে রেন্ডী দেখলাম? ও সব জঞ্জাল একানে চলবে না। বগলকাটা জামা আর নাইলন পরে কুর্ত্তা নিয়ে ঘুরছে? ও সব জঞ্জাল হঠান।

বি. ডি. ও-র স্ত্রী উনি।

বদলি হতে বলুন, নয় বউকে ঘড়ে রাখতে বলুন। বর্ণহিন্দু ঘরের মেয়ে এ ভাবে ঘুরলে... ... ... গণেশ খুব নীতিবাদী। ইলাকা সাফ রাখুন। জঞ্জাল জমালে পোকামাকড় হবেই।

জী।

আর ধানবাদ থেকে লাঠিয়াবাবার একটা ছবি আনিয়ে নিন। লাঠির উপর পদ্মাসনে বসে বাবা আকাশপথে দিল্লি যাচ্ছেন, নীচে কুতুবমিনার দেখা যাচ্ছে সেই ছবিটা। ঘটনাটা সত্যি আর উনি গণেশের গুরুও বটে। ওই ছবি থানায় থাকলে গণেশের মনে একটা ভালো ধারণা হবে। আর আমি আপনাকে যা বলে বিদায় জানাব, তা যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে গণেশ আপনার বাট্রা বাড়িয়ে দেবে। আমাদের কোনো 'নমস্তে' বা 'রাম রাম' নেই। আচ্ছা! ওঁ ব্রহ্মা প্রজাপতি ঋষি লাঠিয়াবাবা মহাঋষি ভারতযোগী নমোহ নমোহ!

চতুর্বেদীর হাতে লোহার আঙুলে ঝাঁকিয়ে দিয়ে মাস্টার সিং নিমেষে উধাও হয়ে যায়। চতুর্বেদীর মনে হয় সবই স্বপ্ন। স্বপ্নের শেষে জাগরণে হাতে টাকার খামটি যে বাস্তব? সে টাকা বুকপকেটে রাখে।

শুনুন!—মাস্টার সিং ফিরে আসে; বলে, কমিশনের সামনে মুসাম্মিনের উপর লগন, পলটন, সকলের জুলুমের কথা নির্ভয়ে খুলে মেলে বলবেন। গণেশের হুকুম। সব বলবেন, স—ব।

আবার সে অদেখা হয়। চতুর্বেদী মাথা নাড়ে মাথা নাড়ে। দু চোখ বেয়ে জল পড়ে তার। এ কি ধর্মরাজ্য ফিরে এল? না চাইতে টাকা! জেলার সন্ত্রাস গণেশ সিং পুলিশের উপর জুলুম সইবে না। এ কী স্বর্গ নেমে এল ভরমোতে! কালই পূজা পাঠাতে হবে টাহাড়ের মন্দিরে।

॥ তিন ॥

কমিশন আসে, এসে পড়ে। মবলঙ্কর, কিঙ্কর পাঠক, চিন্তাবাই, রোজিলা, গোমেস, কিঙ্করের চেয়ে তরুণতর কয়েকজন সাংবাদিক। সঙ্গে আসেন স্বয়ং মহকুমা হাকিম এবং সাধারণ্যে জানিয়ে দেন, দিল্লি থেকে সবুজ আলোর সংকেত দেখানো হয়েছে। নারীধর্ষণ খুবই শোচনীয়, লজ্জাস্কর এক সামাজিক অপরাধ। নারীধর্ষণকারীকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে এক নয়া কাহনও বনছে। এখন আর ৩৭৫ ধারায় অভিযুক্ত হবার পর অন্য কোনো ধারার ক-খ-গ-ঘ-এ আউড়ে বেরিয়ে যাওয়া

চলবে না। এতদিন এক আইনে ধরত, আর আইনে ছাড়ত। আজ অপরাধী তত সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না। যে যা জানে, নির্ভয়ে বলুক।

ভরমোতে সেচ খাল নেই। কিন্তু সেওপুর দিয়ে তিনটি নালা ও খালের প্রকল্প আছে। সে কারণে ভরমোবাজার ও স্টেশনের মাঝামাঝি আছে সেচবিভাগের বাংলো। সেই বাংলোতে কমিশন সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় হোটেল থেকে খাবার আসে। মহকুমা হাকিম বলেন, এখানে কখনো কোনো নারীধর্ষণ হয়নি বলেই জানি। কিন্তু কিঙ্করজী যখন লিখেছেন তখন স্বচক্ষে দেখে যান।

কিঙ্কর পাঠক পুরানো জমানার সাংবাদিক। তিনি যে কাগজে ছিলেন সে কাগজ থেকে বিতাড়িত হবার পর আর চাকরি করেননি। তাঁর কাজ হল অঞ্চল ও ইলাকার বিশেষ বিশেষ ঘটনা কেন্দ্র করে সমস্যার গোড়া পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলে বেগড়বেয়ে সব প্রবন্ধ রচনা। স্বভাবতই তাঁর লেখার উপর অঞ্চল-প্রশাসনের বেজায় রাগ। এও স্বাভাবিক যে তাঁর সংবাদদাতাদের খোঁজ পড়ে এবং মাঝে মাঝে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। ডেওরা গ্রামের হরিজন-খেতমজুর হত্যার স্থপতি জনৈক নির্বাচিত সদস্য এবং খবরদাতা ছিল জনৈক পুলিশ কেরানী। এসব ক্ষেত্রে চুপ করে গিয়ে অপরাধীকে দপ্তরীয় শাস্তি দেওয়া গিয়েছিল। মাধপুরায় সশস্ত্র আন্দোলনের খবর দিয়েছিল এক সদস্য। তখন কা কিবা যায়? বিশেষ এক জেলায় প্রথমে, তারপর আর দুটি জেলায় ব্যাপক বন্দুক ছিনতাই ও জোতদার মালিক হত্যার খবরদাতাদের খবর আজও মেলেনি। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসন রোজিলা গোমেসের শরণ নেয়। রোজিলার পার্টি প্রধানমন্ত্রীর সকল নীতির সমর্থন বামপন্থি পার্টি। রোজিলাদের চেষ্টার ফলে খবরগুলি 'ডাকু বদমাশের কীর্তি' হিসাবে বেরোয়। সমস্যা হল, বৃহত্তর ভারতে ও ভারতের বাইরে বোম্বাইয়ের এক ত্যাঁদড় কাগজের অতীব সম্মান। আর কিঙ্কর পাঠক এই কাগজের লেখক। সদস্য দল থেকে কিঙ্কর পাঠক এবং তার তিন বিশ্বাসী সাংবাদিককে বাদ দেবার জন্যে মবলঙ্কর ও রোজিলা খুব চেষ্টা করেছিল। এ জীবনে সব ভালো চেষ্টা সফল হয় না।

রোজিলা গোমেস নিগৃহীতা রমণীদের সঙ্গে ছবি তোলাবার জন্যে ক্যামেরাম্যান, তাদের কণ্ঠে হতাশ কান্নায় 'মা-বহিন কি কুছ ইজ্জত নায়' ধরে রাখার জন্যে টেপরেকর্ডার, তাদের সঙ্গে কাঁদবার সময়ে তাদের ও নিজের চোখ মোছার জন্যে নরম মোলায়েম সফেদ প্রোটেক্স্ টিসুর রুমাল নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই হতভাগা জেলাতে নেই কোনো নিগৃহীতা রমণী।

সবচেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার হল প্রশাসনিক সহযোগিতা। যেখানে নারীরা ধর্ষিতা হয়, যেখানে পুলিশ পুরুষরা অ-পুলিশ নারীদের ধর্ষণ করে, সেখানে প্রশাসন হিংস্র বিদ্বেষে ঠোঁট এঁটে থাকে। এখানে সবই উলটো।

সেচবাংলোর রোজিলা মবলঙ্করকে বলে, কিঙ্কর পাঠক এবার বোকা বনবে।

কেন?

কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি। যেখানে ধর্ষণ ঘটে, সেখানে পুলিশ চাপা দেয়। এখানে তোহ্রি, দেত্তগড় থানার পর থানা খাতা দেখিয়ে দিচ্ছে। কোনো কেস নেই। সেওপুরে গেলেও দেখবেন সেখানে কিছুই হয়নি।

মবলঙ্কর মুচকি হাসে। তার বয়েস বেশি, অভিজ্ঞতা অনেক। সে এমন এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, যার ভারতহিতৈষণা কাজের জন্যে ডলার আসে। সংস্থাটির রাজনীতিক রঙও আছে এবং এও সত্যি যে মবলঙ্কর হক্-না-হক্ রাশিয়া ভ্রমণে যায়। সে নিরামিষাশী, সূর্যাস্তের পর খায় না, মোটা কাপড় ও চটি পরে। জলচিকিৎসার এক অভিনব ও অনাচরিত নিয়মে সে শরীরের রক্ত সুস্থ রেখেছে। সারাদিনে সে জলপান ও জলবিয়োগ, স্নান ইত্যাদিতে বহু ঘন্টা খরচ করে। তার মতে সবচেয়ে ভালো ভুবনেশ্বরের জল। মবলঙ্কর রোজিলাকে বলে, কিঙ্কর পাঠক ছাগল নয়।

তাহলে?

প্রমাণ পাবে।

বলে মবলঙ্কর ছ বালতি জলসহ নিজেকে স্নানাগারে বন্ধ করতে চলে যায়।

চিন্তাবাই কৃতী ব্যারিষ্টার এবং মানুষটি ভালো। কিঙ্কর পাঠকের সঙ্গে তার পুরনো বন্ধুত্ব। টেবিলে খেতে বসে চিন্তাবাই বলে, ধর্ষণের ব্যাপারে হঠাৎ টনক নড়ল কেন বল দেখি? হঠাৎ, আকস্মিক,কেন?

কিঙ্কর মন দিয়ে রুটি থেকে ছাই মোছে ও বলে। রোজিলা বলুক। আমার খিদে পেয়েছে।

রোজিলা বলে, আপনারা আমাকে খোঁচাচ্ছেন। যতই খোঁচান, আমি বলব এটা অপরাধ। আইনমোতাবেক মোকাবিলা, নারী জাগরণ, নির্যাতিতা মেয়েদের পুনর্বাসন, এই সমাধান।

চিন্তাবাই হাসে ও গভীর তৃপ্তিতে গুড় দিয়ে রুটি খায়। বলে, তুমি হেরে যাবে। আমরা সবাই একমত, যে এটা শ্রেণিনির্যাতনের একটা অঙ্গ। হরিজন কেসে তো আমিই ডেওরা গিয়েছিলাম। চিরকালই পুলিশ আর জমিমালিক শ্রেণিনির্যাতনে, দমননীতিতে ধর্ষণ চালাচ্ছে। সেগুলোকে কী বলবে?

ধর্ষণ এখন দন্ডনীয় অপরাধ।

সাংবাদিক মৌলা বলে, ভালো। ধর্ষণের ব্যাপারটা আলাদা করে শাস্তি দেওয়া গেল। আপনি কী বলতে চান, হরিজনদের শস্য লুট করা, তাদের মারা, ঘর জ্বালানো চলতে পারে? শুধু ধর্ষণটা আলাদা করে নিতে হবে?

তা বলেছি?

কিঙ্কর বলে, রোজিলা! তুমি কী বলছ আমি বুঝেছি। একটা কেস্ ধরো, ভেওরা, ঘর জ্বলল, মানুষ মরল, ফসল লুট হল, মেয়েরা ধর্ষিতা হল। এ তো হয়েই থাকে। তাহলে কী আগুন লাগাবার অপরাধে 'ক' আইন, মানুষ মারার জন্য 'খ' আইন, ফসল লুটের জন্যে 'গ' আইন, ধর্ষণের জন্যে 'ঘ' আইন, চারটে আইনের আওতায় ফেলে প্রসঙ্গটি দেখব? না সমগ্র ভাবে দেখব?

এ কথার আমি জবাবই দেব না।

এ রকম হয়?

নিশ্চয়।

কেন হয়?

বর্ণ এবং শ্রেণিপীড়নের কারণে। কিন্তু নারীনিগ্রহ এক জঘন্য অপরাধ, তা মানবেন তো?

নারী নিগ্রহ, বালক শ্রমিক নিগ্রহ, ঘরের বাচ্চা ঝিকে ছ্যাঁকা দান, আমার তো কোনো নিগ্রহই পছন্দ নয়।

নারীনিগ্রহ খুব বেড়েছে।

চিন্তাবাই বলে, সে কী?

এবং সহসা সবাই বলতে শুরু করে। বোঝা যায় এ নিয়ে ওরা অনেক কথা বলেছে নিজেদের মধ্যে।

তেলেঙ্গানায় কী হয়?

তেভাগার পর কাকদ্বীপে?

নকশাল দমনের নামে? কবে জমিমালিক আর পুলিশ অসংখ্য মেয়েকে ধর্ষণ করেনি? এ তো দমননীতির প্যাটার্ন। তখন তো তোমাদের মাথাব্যথা দেখিনি?

বেশ, মানলাম। কিন্তু পুলিশের খাতায় কিছু রিপোর্ট তো থাকবে?

কী করে?

কে নালিশ করবে?

কেমন করে করবে?

পুলিশ কী ছেড়ে দেয়?

জমিমালিকের নামে নালিশ?

বেশ, মানলাম। সমাধান?

তুমি কী ভাব?

আইন বলবৎ করতে হবে।

কী করে? পুলিশ ছাড়া সে কাজ হয়?

তা হলে কি করবেন?

চিন্তাবাই মায়ের মতো মধুর হেসে বলে, ধরো আর মারো। ধরো আর মারো।

কিঙ্কর বলে, ভোজপুরে জগদীশপ্রসাদ ঠিক তাই করেছিল আর পাপ বন্ধ হয়েছিল। রাজনীতিক মুকাবিলাই সমাধানের পথ, রোজিলা। আর সেটা তোমানের রাজনীতি নয়।

রোজিলা এত রেগে যায় যে টেবিল ছেড়ে উঠে যায়।

চিন্তাবাই বলে, রেগে গেছে।

কিঙ্কর বলে, খোচোরগিরি করতে এসেছে।

চলো, ঘুমানো যাক। কাল কমিশন।

ওরা ভাবতেও পারে না কাল চতুর্বেদী এসে কী বলে যাবে। তাই ঘুমোতে যায়।

॥ চার ॥

চতুর্বেদীর জন্যই কিঙ্কর পাঠক তার নাটকীয় প্রশ্নটি তুলে রেখেছিল।

আপনার থানার খাতা তো খুবই সাফসুতরা। যেমন রাখতে হয়।

জী।

আমরা সেওপুর ঘুরে এলাম।

জী।

আপনি এখানে ছিলেন না।

জী।

খুনের কেসে গিয়েছিলেন।

জী।

কে খুন হল?

মহিন্দর রাই।

স্থানীয় লোক?

না।

শুনলাম,পলটন সিংয়ের ডান হাত ছিল এখানে?

বলতে পারি না।

পলটন সিং কোথায়?

গয়া।

গয়াতে কোনো কাজে?

না। 'শোলে' দেখতে। 'শোলে' পিকচার যেখানে যেখানে ঘুরে উনি সেখানে সেখানে যান।

কেন?

পিকচার দেখতে।

পিকচার দেখতে!

ওঁর জীবনে ওহি এক মেশি...মেশিন হ্যায়। শও দফে 'শালে' দেখে। বুঝি আশ্‌শি বার হয়েছে।

পাগল না কী?

না জী। বহোত্ ঠিকঠাক আদ্‌মি।

একটু আরাম করে বসুন। আপনার সঙ্গে আগে দু'একটা অন্য কথা বলি। আমাদের কাছে খবর আছে, কয়লা খাদানে ইউনিয়ন ঝামেলায় গণেশ সিং এখানে আসছে। গণেশের সঙ্গে পলটনের পুরানো বিবাদ আছে। পলটনকে ভয় দেখিয়ে এলাকা ছাড়ানোর জন্যে মহিন্দর রাইয়ের লাশ পড়ল না তো?

চতুর্বেদী নিরানন্দ হাসে ও শুকনো গলায় বলে, পুলিশের হাত পা বাঁধা থাকে। আপনাদের এক্তিয়ার আছে কল্পনা খাটাবার। দুইয়ে দুইয়ে চার করবার। আমি কী কিছু বলতে পারি? আমার কাছে যা আছে তা নিছক খবর। যা ঘটেছে সেই খবর। মহিন্দর রাইয়ের লাশ কাটাঘরে পাঠালাম তোহ্‌রি। ঔর শুনলাম, কোনো নালিশউলিশ বা রিপোর্ট নয়, শুধু শুনলাম, সেওপুরে পলটনের বাড়ি থেকে তার সঙ্গীসাথী উধাও।

পলটনের বন্দুক, গুলি, বোমা?

শুনলাম তো বাড়ি ফাঁকা। আর আপনি যা বলছেন, তা তো আমি জানি না। পুলিশ হলে সব জানা যায় না।

ঠাট্টা করলেন?

কিঙ্কর বলে, না রোজিলা, উনি ঠিক বলছেন। ওঁকে এখানে থাকতে হবে।

আর পলটন, গণেশ, গুপ্তাদের কথা মেনে চলতে হবে। এই জন্যেই তো আইন করে লাভ হয় না কোনো।

চতুর্বেদীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রোদে পোড়া সুন্দর কাটাকাটা মুখটির চামড়ার নীচে পর্দা পড়ে যায়। সে চুপ করে থাকে।

এখন বলুন, কী মদত দেবেন?

মাস্টার সিংয়ের সঙ্গে কথার পরও মনে গণেশের আগমন বিষয়ে যদি কোনো সংশয় থেকে থাকে, মহিন্দর রাইয়ের চিতানো মৃতদেহের বুকে গুলি ও কপালে ছুরিতে কেটে লেখা ঢ্যারা চিহ্ন দেখার পর সে সংশয় নেই। গণেশ তার শিকারদের কপালে এই চিহ্ন লিখে দেয়। 'এক আদমি এক গোলি' নীতিতেই সে হত্যা করে। পলটনের সেথোরা বোমা-বন্দুক-গুলি নিয়ে ফুটে গেছে। পলটন শীঘ্রই কোথাও না কোথাও মারা পরবে। 'শোলে' দেখতে দেখতে? দেখে বেরিয়ে? দেখতে ঢোকার পথে, বা সময়ে? এখন গণেশের নির্দেশ মানাই বুদ্ধির কাজ হবে এবং চতুর্বেদী বুদ্ধির কাজ করে এবং তার নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা প্রভৃত প্রশংসা পায়। পরিণামে তাকে অন্যান্য চক্রজালে জড়াতে হয়, কিন্তু সে অন্য কথা।

চতুর্বেদী বলে, কী মদত চান?

মৌলী বলে, সেওপুর বিষয়ে সব সত্যি কথা।

দিলীপ বলে, একেবারে আট বছর আগে থেকে।

অমৃত বলে, মুসাম্মিন্ দুসাদীর কথা বিশেষ করে বলবেন।

চতুর্বেদী ঘাড়ের ঘাম মোছে ও বলে, সব কথা প্রাইভেট থাকবে?

মবলঙ্কর বলে, রিপোর্ট বেরোবে।

কিঙ্কর বলে, আপনার ক্ষতি হবে না।

চিন্তাবাই বলে, বলুন।

রোজিলা টেপরেকর্ডার চালু করে, ব্যাগে রাখে। ছোটো ও শক্তিশালী টেপরেকর্ডার। খুব ভালো রিসিভিং এবং তাকে সম্পূর্ণ বোকা বনতে হয়। কেননা অমৃত টেপরেকর্ডার বের করে, বলে, কথাগুলো রেকর্ড করে নেব।—রোজিলাকে বলে, ব্যাগ থেকে বের করেই নিন। কিঙ্কর পাঠক একটি কাগজ সকলকে দেখিয়ে নেয় ও চতুর্বেদীর হাতে দেয়। বলে, এটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা কী চাইছি। আপনার বলতে সুবিধা হবে।

চতুর্বেদীর মনে জাগে অলীক অবিশ্বাস্যতার অনুভূতি। পলটন সিং কি নেই? কোথাও কোনো প্রেক্ষাগৃহে কী দর্শকরা বেরিয়ে গেছে আর চেয়ারে 'শোলে' ছবির কোনো চরিত্রের মতো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে পলটন? নইলে সে, চতুর্বেদী এখানে বসে ঝেড়ে কাশছে কেন?

দেখিয়ে, মুঝে ন ফাঁসা না।

মৌলা বলে, কুছ্ ন শোচিয়ে।

চতুর্বেদী বোঝে, মাসে পাঁচশো টাকার সঙ্গে সে নতুন কিছু পেয়েছে। ভয়। ভীষণ ভয়। পলটন জমিজিরাতি ঘরের ছেলে। তাকে চেনা যায়। জমিজিরাতি মস্তানরা বি. ডি. ওর হালফেশিয়ানি পটের বিবি বউকে দেখে খেপলে তা স্বাভাবিক হত। শিল্পাঞ্চলের নয়া মস্তানরা এসব নৈতিক গোঁড়ামির ধার ধারে না। চতুর্বেদীর পুলিশি অভিজ্ঞতা তাই বলে। কিন্তু মাস্টার সিং ও কথা বলল কেন? গণেশ তাহলে পুরোপুরি নয়া মস্তানও নয়। অন্য কিছু। অস্বাভাবিক কিছু। এখন তার মনে পড়ে কয়লাখাদানে আদিবাসী নরনারীকে মারার পরে গণেশের এক মন্তব্য। 'আর মজুরির লড়াইও উঠাবে না, আর ফুল পরেও নাচবে না। সব বদমাশি খতম।'

কে আসছে? কোন্ দানব?

চতুর্বেদী ঘাম মোছে ঘনঘন এবং নিজেকে যেন ফাঁসির হুকুম দিচ্ছে এমন গলায় বলে, সেওপুর এক মস্ত বড়ো সমৃদ্ধ গ্রাম। নাম সেওপুর, আসলে তা গ্রামপঞ্চক। বিহিলা, মাড়ি, মুরদোই, সেওপুর ও মছলপুর নিয়ে সেওপুর। সেওপুরে সব জমিজমার মালিক তিন ভাই। মখ্খন সিং, তার দুই বৈমাত্র্য ভাই লগন সিং, ছত্তর সিং। এই মখ্খন সিংয়ের ছেলে পলটন সিং ঔর যেদিন লগন মখ্খনকে গুলি করে মেরে দেয়, সেদিন থেকে দুই পরিবারে বনিবনাও নেই। এ কথাও বলা দরকার যে মখ্খন সিং মরার সময়ে পলটন সিং জেল খাটছিল। মিসা হয়ে যায়। পলটন গ্রামে থাকতো না। তখন সে আর গণেশ কুলি চালান দিত ঔর পলটন গণেশের রাখ্নিকে নিয়ে পালায়। তা থেকে বহোত হাঙ্গামা গড়ায়। সে কুনজখম বহোত হয়। পলটন জেলে যায়, গণেশ যায় খাদানে। কিন্তু সে সব দেওগড় থানাতে হয়। এখানে নয়।

সিংদের অনেক জমিজমা। ওদের গ্রামপঞ্চকে অনেক কামিয়া। দুসাদ, গঞ্জু, রবিদাস, ওরাওঁ ঔর নাগেসিয়া, ঘাসি। খুব জুলুমি আদমি ওরা। রায়তি, আধিভোক্তা, এমনকী ভূদানি জমিও কেড়ে নেয়, কামিয়া লোককে দিয়ে চাষ উঠায়, বাকি সব লোক ওদেরই খেতিহার মজদুর। ঔর অশান্তির এক বড়ো কারণ হল, কোনো কামিয়া বা খেতমজুর ঘরে, হরিজন বা আদিবাসী মেয়েদের তের চৌদ্দ বছর বয়স হলেই, ধরমনাশ করে দেয় ওরা। এ তো এক অধিকার বানিয়ে নেয় সবাই। লগন কোনো তিন ছেলের মাকেও ছাড়ত না।

১৯৭২ সালে লগন আর তার ভাই ছত্তর সিং তো এমন কান্ড করল যে ধৌলী গঞ্জু, একটা বারো বছরের মেয়ে মরে যায়। লগনরা লাশ জ্বালাবার খরচও দেয়নি। সেই উঠল প্রথম গোলমাল। মজদুর লোকরা, কামিয়া লোকরা কাজ বন্ধ করে দেয় আর লাশ নিয়ে থানায় আসে। আমি তখন নতুন এসেছি। লাশ পাঠাই কাটাঘরে। তা টাকা তো লেনাদেনা হয়ে গেল। কোনো রিপোর্ট বেরোল না। কেসও ফেঁসে গেল। কিন্তু ওরা লগনের খেত জ্বালিয়ে দেয়। কে দেয় তা বলতে পারি না।

লগন গুলি চালায়। ধৌলীর বাপ মরে যায়। ঔর গ্রাম থেকে পালায় গঞ্জুরা। এই গুলাবি, যে রেন্ডীপট্টিতে থাকে, তারই বোনের নাতনি ছিল ধৌলি।

না, তখনো কেস হয়নি। খুলেই বলছি, মায়লে সাহেব ঔর মহকুমা হাকিম আমার ওপর চাপ দেন। লগনও খুব প্রভাবী লোক। আমি ডরে গেলাম। লগন দেড় হাজার ভোট এনে দেয়, আমি ডরে গেলাম। ধৌলী মরে পৌষে। আর ফাল্গুনে যখন চুনাও হল, লগনের কথায় ওরা ভোট দেয়নি।

১৯৭৩ সাল থেকেই দ্বারকানাথ, ভাইয়াসাহেব ইলাকায় বহোত বলোয়া উঠায়। গ্রামপঞ্চকে তার ক্রান্তিদলের মদতেই ১৯৭৪ সালের পৌষে এক জোরদার আন্দোলন হয়। খেতমজুর আর কামিয়া লোক তাদের বেদখল খাস জমির ফসল কেটে নিজের ঘরে নেয় আর লগন বন্দুক উঠালে তারাও লড়ে। নয়দিন ধরে লড়াই চলে। লগনের ভাইদের, ওর, চার মস্তান মরে। এদের মরে সাতজন। ঔর পুলিশ গিয়ে শান্তি ফিরায় গ্রামে। পুলিশ চলে এলে লগনরা আবার ফসল তুলে নিয়ে যায়, আবার বহুত মেয়ের ধরমনাশ করে। আবার লড়াই হয়। লগন আর মখ্খনকেও ধরা হয়। কিন্তু সদর থেকে বেকসুর খালাস হয়ে ওরা ফিরে আসে।

তারপর সম্পর্ক ভালো হয়নি কখনো। বুঢ়ন দুসাদ ছিল খুব তেজী আর লড়াকু। গত বছর সে আবার সকলকে—হাঁ হাঁ, যে কথা বলতে ভুলেছি, ১৯৭৫ সালে কামিয়ৌতি বন্ধ করে দেয় সরকার। ঔর ১৯৭৬ সাল থেকে লগনদের কামিয়ারা কামিয়া-কাজ আর করেনি।

তাতেও সম্পর্ক খুব খারাপ হয়। কেন না কামিয়ারা মজুরি নিয়ে কাজ করার দাবি উঠায়। বুঢ়ন দুসাদ তো লীডার বনে যায়। ঔর বুঢ়ন এক কাজ করে।—

(এখানে তার কথা থামিয়ে সে জল খায় ও ঈষৎ বিস্ময়ে বলে, বুঢ়ন সে কাজ কেমন করে করল? কৈসে?)

বুঢ়ন গ্রামপঞ্চকে ঘুরে ঘুরে বলে, মালিকের জুলুম যত সইবে তত চলবে। কামিয়ৌতি বন্ধ করে দিয়েছে সরকার, কামিয়ৌতি দিব না। হাঁ হাঁ, আপনারা থানার জেনারেল ডায়েরিতে ওর নামে রিপোর্ট দেখেছেন, কাহে ন? কৈসে ন দেখিয়ে গা? রিপোর্ট তো হ্যায় হি হ্যায় ঔর পুলিশ হোতি হ্যায় পাবলিক সারভেন্ট। আচার-ব্যবহার, আদবকায়দা ঔর শিষ্টাচার তো এক আবশ্যকীয় জ্ঞেয়াতব্য হ্যায় পুলিশকে লিয়ে, ন? আপনারা জানবেন না, আমাদের পড়তে হয় 'পুলিশ হ্যা-ড বুক'। বহোত্ শিক্ষা মিলে উস্‌মেঁ। রিপোর্ট তো দেখবেনই। কেন কী লগন ঔর ছত্তর রিপোর্ট করে গেল। কী বললেন? লগন সিং থানাতে খাসি, চাল, ঘি, গুর, মকাই পাঠাত কী না? জী বুনা জংলী জায়গায় থোড়াবহোত্ দোস্তি তো বন যাতা। ঔর যদি কিছু পাঠিয়ে থাকে, তা দোস্তালির চিহ্ন। কী বললেন? অ্যাঁ?

কিঙ্কর পাঠক জিজ্ঞেস করে, বুঢ়ন দুসাদ যদি লগনের নামে রিপোর্ট করে যেত, তাও লিখতেন?

কাহে ন? দুসাদ-রবিদাস-গঞ্জু এমনকী আদিবাসী রিপোর্ট করলেও লিখতাম। ভারত তো সেকুলার হ্যায় ন? ধর্মনিরপেক্ষ? ঔর আমি তো বহোত উদার। পুলিশ! এ শব্দে 'পি' মানে পোলাইটনেস'। আমি তো অছুত- আদিবাসী মেয়ে থানায় এলে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখি না, ঘরে ঢুকতে দিই ঔর মাটিতে বসতেও বলি।

রোজিলা বলে, তাহলে একই সঙ্গে বুঢ়ন যখন রিপোর্ট দিতে আসে, লেখেননি কেন?

না না, এ সত্যি নয়। বুঢ়ন তো রিপোর্ট দিতে আসেনি। সে এক আর্জি লিখেছিল, বাপ্ রে! এক মাইল লম্বা কাগজে। কিধর মিলি? ঔর হাজার লোকের টিপ এনেছিল তাতে। সেটা কী লেখা যায়?

বলুন।

তখন বুঢ়ন আন্দোলন উঠায়, জোর করে পুরানা কামিয়া ধরে এনে কাজ করানো চলবে না।

মৌলা বলে, তা করছিল কি সিং-রা?

হম্ ন জানে। পুরানা কামিয়া কাজ করবে না। সব এখন খেতমজুর। গ্রামপঞ্চকে খেতমজুর হিসাবে চেনাজানা পুরানা কামিয়া নিতে হবে ঔর মজুরি দিতে হবে। বাহারের খেতমজুর ঢুকতে দিব না। তখন থানা ইন্‌স্‌পেকশানে আর পুরানা কামিয়াদের হাল-হকিকত চোখে দেখার জন্যে সরকার পাঠিয়েছিল—

রনধাওয়াকে?

হাঁ হাঁ। আপনারা তো জানবেনই। রনধাওয়া সাহেবকে সবাই জানে। উনি তো পুলিশের মাঝে প্রহলাদ, বাকি সবাই দৈত্য। রনধাওয়া সাহেবের জন্যে আমাদের অবশ্য খুব গরব, ভুল বুঝবেন না। (এখন চতুর্বেদীর হঠাৎ ভীষণ সন্দেহ হয়, কিঙ্কর পাঠকের নিজস্ব সংবাদদাতা রনধাওয়া নয় তো?) রনধাওয়া সাহেব মহকুমা হাকিমকে নিয়ে গ্রামপঞ্চকে ঘুটেরন ঔর সিংদের সঙ্গে বুঢ়নদের কোই আপস-রফা করিয়ে দেন। থানায় বলে যান, মালিক-খেতমজদুর হাংগামা উঠলে মজদুরের পক্ষে থেকে বিচার করতে; দনাদন গোলি না-চালাতে; মালিককে মদত না-দিতে। জরুরি অবস্থা চলছে। এখন পুলিশকে নতুন ভূমিকা নিতে হবে।

লাভ হয় কিছু?

কিছুদিন। রনধাওয়া যাবার পরেও। কেন কী ভাইয়াসাহেব বহোত অ্যাকশন শুরু কর দি'। তাকে মালিকলোক বহোত ভয় পেত। তারপর ভাইয়াসাহেব ক্রান্তিক্ষেত্র বদল করে চলে যায় যখন, সেই ১৯৭৮ সাল থেকে সিংবা ক্রমে ক্রমে কমাতে কমাতে ১৯৭৯ সালের গোড়া থেকে গ্রামপঞ্চকের লোকদের আর কাজে নেয়নি। বুঢ়ন সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর ঘুরতে থাকে ইলাকায়। ভালো লেবার। সবাই পছন্দ করত। ওরা কাজ করত, গ্রামে ফিরত। ঘর তো সেখানে।

সিংরা বাধা দেয়নি?

হাঁ হাঁ, কেন দেবে না? খুব বাধা দেয়। জঙ্গলমহাল দপ্তর, রেল ঠিকাদার। সারকেস কলিয়ারি মালিক, সবাইকে খাসি পাঠাত ঔর বলত ওদের কাজ দিও না। তাতেও বুঢ়নদের থোড়াবহোত দুখ বঢ়ে যায়। ঔর সম্পর্ক তো খুবই খারাপ হয়। এই নিয়ে আবার হাওয়া গরম হয়। আর বুঢ়ন থানায়, মহকুমা হাকিমকে জমিজরিপ আপিসে জানিয়ে ১৯৭৯ সালে ওদের বেদখল খাস আর ভূদানী জমি সিংদের কাছ থেকে উদ্ধার করে দিতে বলে। বলে, তারা দখল করবে। আগে দেখবে সরকার কী করে। আর হাকিম সিংদের নোটিস দেয়, জমি জরিপ বিভাগও নোটিস দেয়।

তারপর ১৯৭৯ সালের অগ্রহায়ণে বাইরের খেতমজুররা সিংদের কাজ করে না। তারাও নিজ নিজ ইলাকায় খাস জমির দখল খুঁজতে যায়। আর লগন সিং সন্ধ্যার পর তিরিশ বন্দুক, পঞ্চাশ মস্তান নিয়ে সেওপুর গ্রামপঞ্চকে হরিজন-আদিবাসী টৌলি জ্বালাল, বুঢ়নকে আর আরও ছয়জনকে মারল, রাতভোর মেয়েদের উপর ধর্ষণ চালাল তার লোকেরা।

কিঙ্কর পাঠকের চোখ খুবই ধূসর ও সুদূর হয়ে যায়। সে বলে, মন্ত্রীটন্ত্রী এলেন?

আপনি তো জানেন। আপনি আসেননি। কিন্তু লিখেছিলেন। (মৌলা ও অমৃতকে দেখায়) এঁরা, অথবা এঁদের মতো দেখতে কেউ এসেছিলেন।

হ্যাঁ, গ্রেট সেওপুর কার্নেজ।

লগনকে চালান দিই। লগন আদালতে ওঠে। কিন্তু ও ফিরে আসে খালাস পেয়ে।

প্রমাণ হয়নি?

না।

আপনারা কী সাহায্য করলেন যে কেস প্রমাণ হল না?

আপনার তো ছিল প্রাথমিক আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

চতুর্বেদী শুকনো ঠোঁট চাটে ও বলে, পলটন সিং। মস্তান রাজ। আমি কী করতে পারি? শাসকদলের লোক পলটন।

লগন, ছত্তর।

তারপর? মুসাম্মিন দুসাদী?

মুসাম্মিন দুসাদী আর অন্য নিহতদের বউ, মা, বাপ একশো টাকা করে পায়। মুসাম্মিন টাকা নেয়নি। আমাকে খুব গাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারপর সে ভরমোবাজারে কাজ খুঁজতে আসত। গুলাবি ওকে মাঝে মধ্যে খেতে দিত, থাকতে দিত বলে শুনেছি, জানি না। ভরমোবাজারে ওকে রেন্ডী হতে বলেছিল গুলাবি।

চতুর্বেদীর চোখ ঘসা কাঁচের মতো হয়ে যেতে থাকে।

মুসাম্মিন বলেছিল, যেদিন আর কাজ পাব না। আর সেওপুরে আমার আরও কাজ আছে।

কোন্ কাজ করত?

হ্যাঁ ক্রান্তি কাজ।

কৈসে?

সকলকে বলত, মনে জোর রাখতে হবে। বুঢ়ন নেই তো কী হয়েছে? আবার কাজ হবে।

আচ্ছা, একটা কথা। মন্ত্রীরা যখন এল, এত কথা উঠল, তখন আপনারা ধর্যণের কথা বলেছিলেন?

জী, ধর্ষণ করবে বলে তো করেনি। আগে এমনিই করত। তারপর ক্রান্তি দলের সঙ্গে জোতানাতা হবার পর তা কম থাকে। ঔর টোলি যখন জ্বালায় ঔর কিষাণ-খেতিহার-মজদুর মারে, তখন তো ও কাজ করেই থাকে। মাপ করবেন, তাতে যে ৩৭৫ ধারা হয়, তা তো আমি কখনো জানতাম না। ইদানিং শুনছি।

যাক, বলুন।

লগন খালাস পেয়ে গ্রামে আসে। তারপর...তারপর...মুসাম্মিন যখন ভোরবেলা মাঠে যায় টাট্টি ফিরতে... হাঁসুয়া তো ও কখনো কোমর থেকে নামাত না....লগন ওকে চেপে ধরে। আর ও লগনকে....কী বলি...ঘাড়ে....বহোত শরমের জায়গায়...হাঁসুয়া চলা দি।

তারপর?

পলটন গ্রামে ছিল। সে লগনকে উঠায় আর মুসাম্মিনকে ধরে। সেই চালান আনে।

সেদিনই?

না, পরদিন। মুসাম্মিন পালিয়েছিল।

লগন তবু বাঁচল?

বহোত কড়া জান্।

তারপর?

আমি তাকে থানা কাটকে রাখলাম। সে তো মানুষ নয়, বাঘাইন। আমার হেড কনস্টেবল নন্দ্‌কিশোরের, মৈথিলী ব্রাহ্মণ সে, তার চোখ উথাড়ে নিল। তারপর থানার জানলার সিসা ভেঙে উধাও।

থানায় তার উপর কোনো বেইজ্জতি হয়নি?

না।

কখনো নয়?

না। কৌন্ করেঁ?

কখনো নয়?

না।

কিঙ্কর পাঠক এবার ধারালো ঠোঁটে হাসে। তারপর বলে, মৌলা! দেখ তো সাক্ষ্য দিতে যারা এসেছে তারা বসে আছে কি না? পাশের ঘরে যাও।

দরজাটি খোলে মৌলা। মবলঙ্কর ও রোজিলা তো বটেই, চিন্তাবাইও এখনকার দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত থাকে না। দরজা দিয়ে ঢোকে মাকড়সার মতো অষ্টাবক্র,ক্ষিপ্রগতি, সাদা চুল এক বুড়ি ও একটি মেয়ে। কালো ও উদ্ধত শরীর, দু চোখে আগুন, রুক্ষ চুলে টেনে বাঁধা ঝুঁটি।

চতুর্বেদী চেঁচিয়ে ওঠে মুসাম্মিন! গুলাবি!

সে চেয়ার ঠেলে ওঠার চেষ্টা করে। মবলঙ্কর বললেন, কোথায় যাবেন? টেপটা রইল না?

না, মুসাম্মিন না।

মুসাম্মিন বলে, কেন দারোগা-জী?

গুলাবির বোনঝি....বসন্ত রোগ...একমাস তুই ওর কাছে....গুলাবি! খচড়ি! থানাকে চটিয়ে তুই এখানে থাকতে পারবি?

গুলাবি হাসে ও কথা না বলে বিড়ি ধরিয়ে মেঝেতে বসে। বলে, তোমরা কসুর নিও না বাবু। না খেয়ে থাকতে পারি, বিড়ি না খেয়ে থাকতে পারি না। না, না, দূরেই বসি।

মুসাম্মিন চেয়ারে বসে; হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, শয়তান! রেন্ডীর জুতোর গু-চাটা বদমাস! এতক্ষণ মিঠা মিঠা মিছা কথা বলে যাচ্ছে আমি শুনিনি? কুছ ন কিয়া থানামেঁ?

চতুর্বেদী চোখ ঢাকে, যেন ধ্বসে বসে পড়ে। অমৃত ও রোজিলা ক্যাসেট দেখে নেয়, আবার চালু করে। কিঙ্কর পাঠক বলে, তুমি বলো মুসাম্মিন।

চিন্তাবাই বলে, কিঙ্কর! কী করে খোঁজ পেলে? তুমি, তুমি একটি পাকা শয়তান।—চিন্তাবাইয়ের খুব আনন্দ হয়েছে তা বোঝাই যায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা , চিন্তা দিদি।

মবলঙ্কর ও রোজিলা বলে, আপনি গ্রেট।

আর মুসাম্মিন কথা বলে।

হাঁ হাঁ.... লগনের মুকাবিলা করব বলেই আমি গ্রাম ছাড়িনি। কেন ছাড়ব? গ্রামও ছাড়িনি, এই হাঁসুয়াও ছাড়িনি। ঔর সকল মেয়ে, শুনে রাখ্ দারোগা, গ্রামপঞ্চকে সকল মেয়ে হাঁসুয়া নিয়ে ঘোরে এখন। কাহে ন ঘুমেঁ। সে তো বলেই গেছে, ভাইয়াসাহেবের সাফ কথা,—মালিক লোক ইজ্জত নিতে আসবে, মার ডালো। এসব কথা বলেছে, শুধু এ কথা বলেনি যে কোনো দেহাতী মেয়ে থানায় এলে তাকে আগে এ নাশ করে ঔর বাদে সেপাইদের হাতে দেয়।

গ্রামে মালিক, থানায় এ। বল্ গুলাবি? কটা রেন্ডী এ বানিয়ে দিয়েছে? সব তো তোমরা লিখে নিচ্ছ না?

মেশিনে তুলে নিচ্ছি।

তাই?

হাঁ মুসাম্মিন।

আর এ কথাও বলেনি যে মালিক লোক একে মাসে মাসে টাকা খিলায়। বাবু! লগনকে তো মারলাম।

কিন্তু তারপর?

মুসাম্মিন আঙুলে কর গোনে। বলে, পলটন আমাকে ঝোপড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আর পহেলে পলটন, তারপর মহিন্দর, তারপর লছমন,—আমি তো, বেহোঁশ হয়ে যাই। পরদিন

আমাকে থানায় আনে আর দারোগা, চতুর্বেদী দারোগা বলে, রেখে যান। আমাকে তো এর ইজাহার নিতে হবে। পলটন ঔর তার মস্তানরা খুব হাসল। বলল, হাঁ হাঁ, নিন। আমরা তো দো-তিন দফে করে একেক জন ইজাহার নিলাম। খুব ভালো ইজাহার দেয়। একটু হাত-পা বেঁধে ইজাহার নিবেন, তাতে মজা উঠবে।

না, না, মিছে কথা।

মুসাম্মিন ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকে। চামড়ার নীচে বদলে যেতে থাকে ক্রমশ। বলে, আর কী বলব? আর কী শুনবে? ধরমনাশ করে বলাওতি করার নাম ইজাহার নেওয়া, সে কথা সেদিন প্রথম শুনলাম। আগে জপ পূজা সারল, দেও- দেওতার ছবিতে নমস্কার করল, তারপর খানা খেল। দারু পিল, আর—

বলো মুসাম্মিন।

আধা রাত নিজ ইজাহার নিল এ। তারপর, তারপর কী করেছিলি দারোগা?

না, না না—যা করেছি, মদের নেশায়। আমার জ্ঞান ছিল না।

তারপর, বাবু! আমাকে তুলে দেয় হেড কনস্টেবলের হাতে। বলে, আভি তু ইস্‌সে ইজাহার লে। তুই তো ব্রাহ্মণ। কাল অন্য সেপাইদের দিব।

তারপর?

আমি কী করব? আমি তো নাঙ্গা, আমার তো হাত-পা বাঁধা। তখন ও হেড সিপাহি লি ইজাহার। দফে দফে। হম্ বেহোঁশ।

তারপর?

জ্ঞান ফিরতে দেখি হেড সিপাহি ঘুম ঘুম। আমার হাত পা খুলে দিয়েছে। কাপড় পরলাম। সে আমাকে আবার ধরতে এল। তখন এই হাতে সিসা ভাঙলাম, রশি বাঁধা ঘা ঔর সিসা কাটা ঘা দেখ। সিসার টুকরা হাতে নিলাম। আর সে যেমন আমাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল, তেমন ওহি সিসা দিয়ে তার চোখ উখাড়ে নিলাম। জানোয়ারের মতো চিল্লাল আর আমাকে যেই ছেড়ে দিল, অমনি আমি জানলা দিয়ে ভাগলাম।

তারপর?

তখন ভোর হয় হয়। কেমন করে পালিয়ে, বুকে ছেঁচড়ে গুলাবির ঘরে পৌঁছাই তা নিজেই জানি না। হোঁশ ফিরতে এও বলেছিলাম কুছ্ দাওয়াই দে গুলাবি। ইজাহার লেনেবালা জান্‌বরগুলোর বাচ্চা যদি পেটে আসে।

আর কিছু বলবে?

না। আর কিছু নয়। হাঁ, এহি হুয়া। এহি হোতা। সব সময়ে হয়। সব তোমরা শুনলে। এখন তোমরা কি করবে? আসানী?

মুসাম্মিনের চোখে ও ঠোঁটে অনুকম্পার হাসি খেলা করে। হাঁসুয়াটি কোমর থেকে নিয়ে ও শাত বুলায়, ধার দেখে। বলে, চল্ গুলাবি।

রোজিলা বলে, কোথায়? মানে...

আমাদের ভাবনা আমাদের ভাবতে দাও। চল্ গুলাবি। না না, তুমি যা বলবে তা আমি জানি। ওই বাবু (কিঙ্করকে দেখিয়ে) বলেছে। না। রেন্ডী হব না, তোমাদের কলেয়ান মিশনে যাব না। আমার অন্য কাজ আছে।

মুসাম্মিন ও গুলাবি বেরিয়ে যায়। টেবিলে এক চেয়ারে অবসন্ন, মুর্ছিতপ্রায় চতুর্বেদী এবং সৎ ও অসৎ কয়েকটি লোক এবং দুটি টেপরেকর্ডার। ক্যাসেটে অগ্নিগর্ভ এজাহার। সামনে শীত। শুকনো ঘাসে আগুন দিয়ে জমি তৈরির সময়।

উত্তরঙ্গ

মায়া বসু

অবনীশ,

আজ রাতেও আবার বসেছি, কাগজ কালি কলম নিয়ে। একই উদ্দেশ্যে—তোমার সেই প্রশ্নটির জবাব দেওয়া।

এই নিয়ে কতবার যে লিখতে বসেছি, তার ঠিকঠিকানা নেই। কত রাতের ঘুম-না-আসা সময় আমার কেটে গেছে তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসে; কিন্তু কী লিখব? কলম কাগজ হাতের কাছে থাকলেই কি আর লেখা যায়? মাঝখান থেকে শুধুমাত্র সাদা কাগজে আঁচড় কাটাই সার হয়েছে।

কোনো কোনো চিঠিতে কী সব আবোল-তাবোল লিখেওছিলাম। কিন্তু রাত্রের লেখা সকালবেলার দিনের আলোয় দেখে, সেগুলোকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিয়েছি। তোমার কাছে সে চিঠি আর পৌঁছয় নি।

কিন্তু আর তো সময় নষ্ট করা চলবে না। অনেক সময় নষ্ট করেছি—তুমিও, আমিও। কিছু ভেবে, কিছু না ভেবে। কিন্তু তাতে বোধহয় তোমার আমার কোনো হাত ছিল না। এমন একটা জীবনে আসে, যখন এমনি করে সময়গুলোকে তরঙ্গের মতো বয়ে যেতে দিতে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো ভালো লাগে তার তীরে বসে ঢেউ গোনা।

তাই আজ রাতে মনস্থির করে বসেছি। সব ভাবনা চিন্তা সরিয়ে দিয়েছি মন থেকে। তোমার কাছে লিখবই এ চিঠি। প্রতিজ্ঞামুক্ত হতেই হবে যে আমাকে। যা ইচ্ছে লিখব, যা থাকে থাকবে, আর দেখব না। লেখা শেষ হয়ে গেলেও আর পড়ব না—রাত্রেও নয়, দিনের আলোতেও নয়। একেবারে লেখা শেষ করে, স্ট্যাম্প মেরে, তোমার নাম ঠিকানা লিখে সম্পূর্ণ করে রেখে দেব। ভোরবেলায় আমার সর্বপ্রথম একমাত্র কাজ হবে সেটাকে চোখ বুজে পোস্ট করা। কাল সকাল আমার জীবনে এমন একটি দিন—যে দিনে আমার আর কোনো কাজ নেই, থাকবে না। কেউ কোনো কাজ করতে আমাকে ডাকবে না। নিশ্চিন্ত অবকাশ মিলবে আমার জীবনে সর্বপ্রথম—কালকের ভোরবেলাটিতে।

তারপর। তারপর আর ভাবব না। সব ভাবনা চিন্তা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব শেষ করে দিতে চাই এই চিঠির মধ্যে—আজ রাত্রেই।

অন্যদিন এত রাত্রে আমাদের বাড়িটা নিঝুম হয়ে যায়। কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে যায় এ বাড়ির সবকটি প্রাণী—কেবল আমি ছাড়া। আজও আমি জেগে আছি, কিন্তু ওরা আজ ঘুমোয় নি। সবাই ব্যস্ত। আমাদের ছোটো বাড়িটায় আজ অনেক লোকজন। অনেক কাজকর্ম। শুধু আমার কাজ নেই। আমার একমাত্র কাজ তোমার কাছে চিঠি লেখা।

যত কাজই থাক না কেন, আজ কেউ আমাকে ডাকবে না। যত রাত পর্যন্ত খুশি আমি বসে বসে চিঠি লিখতে পারব। তাই এই চিলে-কোঠার ছাদের ঘরটায় এসে শুয়েছি। আমায় আজ কেউ বিরক্ত করবে না।

কাল.অমাবস্যা গেছে। আজ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ। সরু একফালি চাঁদ উঠেছে, চোখেই যেন দেখা যাচ্ছে না ওকে। যখন ওটা আস্তে আস্তে গোল হয়ে পূর্ণিমায় ঝলমল করবে, তখন আমি কোথায় থাকব অবনীশ?

অনেক দূরে—যেখানে তোমার এতটুকু ছায়াও আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। নতুন দেশে নতুন করে জন্ম হবে আমার। সেই শ্যামলীকে তুমি আর কিছুতেই চিনতে পারবে না অবনীশ।

কিন্তু আজ ভাবি, আমাকে কি কোনোদিনও চিনতে পেরেছিলে? বোধহয় না। সে চেষ্টাও কখনও কর নি। যে কাছে থাকে, যাকে মনে হয় বড়ো সহজ বড়ো সরল তাকে চেনাই শেষে সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই যাকে চিনতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ ভেবেছিলে, তারই হাতের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের বেদনা তোমাকে যে কত বড়ো আঘাত দিয়েছিল, তা আমি জানি। তা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে। তুমি আমাকে পাষাণী বলেছিলে। কিন্তু সত্যিই আমি তা নই।

এবার থাক্ এসব। আসল কথায় আসি। কিন্তু কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করি বল তো? বার বার খেই হারিয়ে যাচ্ছে। কোন্‌টা আগে লিখব, কোন্‌টা পরে—কিছুই ঠিক মনে আসছে না। জানি, অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। আগেরটা আসবে পরে, পরেরটা আগে। অনেক কথা হয়তো লিখতে মনেও থাকবে না। স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা যে সবার জন্যে। তবু তুমি মিলিয়ে দেখে নিয়ো। কোথাও ভুল হচ্ছে কি না।

তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার সূত্র সুলতা। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ও নিজে থেকে তোমার সঙ্গে আমায় আলাপ না করিয়ে দিলে জীবনে কখনও আমাদের আলাপ হত না। তার কারণ, আমি নিজে থেকে কারও সঙ্গেই আলাপ করতে মিশতে পারি না। কথা বলতেও পারি না—লাজুকের একশেষ।

আর তা ছাড়া তুমি কলকাতার নামকরা বড়োলোকের ছেলে। রূপে গুণে বিদ্যায় অসাধারণ। আর আমি? অতি সাধারণ ছাপোষা গরিব কেরানির মেয়ে। তবু যে আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল, সে কী শুধু আমার গানের জন্যই! গান আমি ভালোই গাইতে পারতাম—গায়িকা হিসাবে একটু খ্যাতিও ছিল আমার।

একটা জিজ্ঞাসা করব অবনীশ? কিছু মনে করো না। তুমি অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছ—অনেক সুন্দরী শিক্ষিতা তারা আমার চেয়ে। কী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে? গান ছাড়া, তোমাকে ভোলাবার মতো কী ছিল আমার?

আজিও ভাবি, কী জন্যে তুমি এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলে? আমাকে বিয়ে করতে তোমার এত আগ্রহ কেন হয়েছিল? মনে হয় তুমি যাকে চেয়েছিলে, যাকে ভালোবেসেছিলে, সে বুঝি আমি নই। আমাকে, আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে বাদ দিয়ে, বোধ- হয় তুমি আমার গানকে, আমার শিল্পীসত্তাকেই বেশি ভালোবেসেছিলে।

জানি, সমস্ত রাত জেগে বসে আকাশের ওই সংখ্যা তারাগুলোকে গুণে শেষ করে ফেলতে পারলেও এর প্রকৃত উত্তর জানতে পারব না। তাছাড়া কী হবে এখন জেনে।

সুলতা আমার বন্ধু—বড়োলোকের মেয়ে, তোমারই মতো উপরতলার বাসিন্দা। আমার গান ও ভারী ভালোবাসত। ওদের বাড়িতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত গান গাইবার। ওর দাদার বিয়ের বউভাতের দিন রাত্রে, ওদের বাড়ির সকলের অনুরোধে অনেক গান গাইতে হয়েছিল আমাকে। রাতও একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল তাই।

সুলতা তোমাকে অনুরোধ করেছিল, যাবার পথে তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে। তোমার সঙ্গে আমাকে একলা পাঠাতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নি সে। সেটা শুধু আমাকে পৌঁছে দেবার অন্য লোক পায় নি বলে নয়—তোমাকে ভালোবাসত বলেও নয়—আমাদের দুজনকেই ও মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত বলেই।

আমি সঙ্কুচিত লজ্জিত হয়ে বারবার আপত্তি করেছিলাম। সুলতা শোনে নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল আমার আপত্তি। ঠাট্টা করে বলেছিল, তোকে পৌঁছে দিতে গিয়ে ও যদি আমার আঁচল-ছাড়া হয়েই যায়, যাক না। পরীক্ষা হয়ে যাবে—আসল হিরে, না নকল। মন্দ কী? সারাজীবন যাকে আঁচলে বাঁধতে যাচ্ছি, সেটা কাঁচ না হিরে, বুঝতে পারব।

এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারি নি। তোমার সঙ্গে এর আগে অনেকবারই দেখা হয়েছে আমার সুলতাদের বাড়িতে। কথাও বলেছি দু-একটা। গানও শুনিয়েছি অনেক। আর গানের শেষে তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, মুগ্ধ দৃষ্টির স্তুতিতে নিজেও যে মুগ্ধ হয়েছিলাম এ কথাও সত্যি। কিন্তু এতে আমার খুব বেশি দোষ ছিল না।

ছেলেবেলা থেকে অভাবের সংসারে মানুষ হয়ে, অনেক কিছু থেকে আমরা বঞ্চিত। মনে মনে যেন স্থির জানতাম, বড়ো একটা কিছু পাওয়া আমাদের জন্যে নয়। তাই তোমার মতো তরুণের প্রশংসা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে, সুলতার ভাবী স্বামী জেনেও, হৃদয়কে সংযত করতে পারি নি। দোষ আমার খুব বেশি নয়।

আলো-ঝলমল বিয়ে-বাড়ির গেট পেরিয়ে এলাম দুজনে। তুমি তোমার গাড়ির ড্রাইভারের আসনে বসে পাশের সীটের দরজা খুলে দিলে। আমি উঠে বসলাম।

গিয়ার দিতে গিয়ে ছোঁয়াছুয়ি হল কতবার। গিয়ার না দিতে গিয়েও হল। কী এক অনিশ্চিত সম্ভাবনায় আমার সমস্ত শরীর মন থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল যেন তুমিও কাঁপছ।

সেদিন—সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে অবনীশ। সেদিন তুমি সোজাপথে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দাও নি। তোমার গাড়ি অনেক ঘুরপথে, অনেক এঁকেবেঁকে যতটা সময়ে পৌঁছবার কথা, তার চেয়ে অনেক দেরি করে আমাদের গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

নামিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হও নি। বারবার আপত্তি করা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিলে। আর আমি তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। নতুন করে সরু গলিটাকে মনে হচ্ছিল কী নোংরা, কী নোংরা। তুমি বড়োলোক, এমন রাস্তায় আসা তোমার অভ্যাস নেই। এখানে তোমাকে মানায় না। আমাদের বাড়িতে সেদিন তোমাকে আনতে কিছুতেই আমার মন চায় নি।

তবুও তুমি এলে দরজার কড়া নাড়লাম। মা এসে দরজা খুলে দিলেন। সুলতার কল্যাণে তুমি খুব একটা অপরিচিত ছিলে না আমাদের বাড়িতে।

মা চমকে উঠলেন। ডেকে আনলেন বাবাকে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দুজনে। তাঁদের কথায় বারবার এই কথাই ফুটে উঠতে লাগল—তোমার কত দয়া, কত মহত্ত্ব। গরিবের কুড়েতে পায়ের ধুলো দিয়েছ তুমি।

সেই আসাই তোমার শেষ আসা হল না কেন অবনীশ? আবার কেন তুমি এলে এই নোংরা সরু গলিটায়? কেন এলে আমাদের জীর্ণ পুরোনো বাড়িটায়? চারদিকের পাঁচিল তোলা দম-আটকানো ঘরের মধ্যে কেন আনলে বাইরের মুক্ত বাতাস? সব ভুলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলে আমার গান শুনে? তোমার তো কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু আমার? বলতে পার কী ছিল আমার? গরিবের মেয়ে, সকাল সন্ধ্যা ঘরের কাজ করে, ছোটো ভাই-বোনদের দেখেশুনে, পড়াশোনা আর গানবাজনা নিয়েই ছিলাম। আমল দিই নি কোনো অভাবকে, করি নি কোনো অভিযোগ। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, বুঝতে পেরেছিলাম—কী

একটা মস্তবড়ো অভাব, কী একটা শূন্যতা ভরা ছিল আমার মনে। তুমি এলে, পূরণ করে দিলে সব অভাব সব শূন্যতা।

দিন কাটতে লাগল। তোমার কী হল জানি না। কিন্তু সুলতার সঙ্গে সেই থেকে আর আগের মতো সহজভাবে, অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারলাম না। একটা ভয়ানক অপরাধ বোধের অস্বস্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

মনে হল, আমি ওর বন্ধুত্বের অমর্যাদা করেছি, ওর বিশ্বাসকে নষ্ট করেছি। অবনীশকে ও ভালোবাসত, একদিন ওর সঙ্গে সুলতার বিয়ে হবে এ কথা জেনেশুনেও আমি অবনীশকে কেড়ে নিচ্ছি। এ আমার উচিত হচ্ছে না—এ আমার অন্যায়, ভারী অন্যায় হচ্ছে।

কিন্তু আর একটা সত্তা আমার সমস্ত বিবেকবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। কীসের অন্যায়। কিসের পাপ। সুলতার অভাব কী! বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ে। ওর জীবন সুখে ঐশ্বর্যে আর প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। হাত বাড়ালে সমস্ত পৃথিবী ওর মুঠোর মধ্যে।

আর আমি। অর্থ মান মর্যাদা আভিজাত্য কী আছে আমার? রূপ—সাধারণ। গান ছাড়া, আর কী আছে আমার—যা নিয়ে দাঁড়াতে পারব অবনীশের পাশে!

আমার বাবার যা অবস্থা, তাতে কোনোমতে দুবেলা খাওয়া-পরাটাই চলে। আর কিছু নয়। তাতে আবার আমি একা নই, আরও কটা ভাই বোন আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল। কেন আমি পাব না অবনীশকে? বড়োলোকের মেয়ে বলে, টাকা আছে বলে, সুলতাই দখল করবে সব? হৃদয়টা কী বড়ো নয়? আমার ভালোবাসা কী বড়ো নয় তার চেয়ে? অর্থের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য না থাক, হৃদয়ের প্রাচুর্যে আমি সব অভাব লুকিয়ে দেব।

হায় রে, তখন বুঝি নি এর আর একটা দিক থাকতে পারে।

সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলাম, সুলতাকে আমি কতটা হিংসা করে এসেছি ছেলেবেলা থেকে। আমরা দুজনে সমান নই। ও ইচ্ছে করলে সব পায়, আমি কিছুই পাব না। রূপে গুণেও ও আমার চেয়ে অনেক বড়ো। এতদিন জানতাম, ও ভালো, নিরহঙ্কার—আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু তখন মনে হল সব ভান, সব মিথ্যে। ও দেখাতে চায়, ও কত বড়ো, আমি কত ছোটো।

অবচেতন মনের প্রচণ্ড ঈর্ষায় সব ছাপিয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, তোমাকে আমার চাই। স্বেচ্ছায় তুমি ধরা দিয়েছ যখন, কেন আমি নেব না তোমাকে? কেন আমি বঞ্চিত থাকব চিরদিন? যে সুধাপূর্ণ পাত্র আপনা থেকে মুখের কাছে এসেছে, তাকে ফিরিয়ে দেব—এত বড়ো মনের জোর আমার নেই। আমি চাই—চাই—সব চাই। এক চুমুকে শূন্য করতে চাই ওর সুধার পূর্ণ পাত্র। চাই যশ মান অর্থ—চাই তোমাকে।

তার পরের দিনগুলির কথা যদি ভুলতে পারতাম অবনীশ। যদি নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারতাম মন থেকে।

সেই দিনগুলিতে কি পৃথিবীর আর কেউ ছিল? না বোধহয়—শুধু তুমি আর আমি, আর আমার গান। নতুন রঙে রসে মাধুর্যে পৃথিবী যেন নতুন করে ধরা দিয়েছিল আমাদের দুজনের কাছে। সে কী সুখ? সে কী মোহ? সে কী ভালোবাসা? জানি না। সে এক বিচিত্র অনুভূতি।

থাক্, থাক্ সে কথা। চাপা থাক্ সেই স্মৃতি হৃদয়ের অতলে। হয়তো কোনোদিনও ভুলতে পারব না সেই কটি দিনের কথা।

বাইরে থেকে বোঝা যাবে না কিছুই। তবুও সে স্মৃতি থাকবে—যেমন করে, কবরের তলায় থাকে কফিন, তুষের ভেতরে থাকে ধিকি-ধিকি আগুন। দেখা যাবে না বাইরে, তবু থাকবে।

তোমাদের বাড়ির সকলের অমত সত্ত্বেও তুমি বিয়ে করতে চাইলে আমাকে। রাজি হলাম সানন্দে। বুঝি এরই জন্যে প্রতীক্ষা করেছিলাম এতদিন।

বাবা মা দুজনে সব দিক দিয়েই আমাদের সহাযোগিতা করছিলেন। সোনার হরিণকে ধরতে পারা কী সহজ কথা? তোমার মতো পাত্র জীবনের কল্পনার অতীত ছিল তাঁদের কাছে। তা ছাড়া যে ভাবেই হোক না কেন, বিয়েটা একবার হয়ে গেলেই তো বাজিমাত। কিছুতেই তোমার বাবা ছেলে-বউকে ফেলতে পারবেন না। তুমি স্বাধীন—তোমার মস্ত চাকরিটা আর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সটাও তাঁদের অজানা ছিল না।

সব ঠিকঠাক। দুজনে উড়ছি হাওয়ায়। অনিশ্চিত সম্ভাবনা সুনিশ্চিত পরিণতির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। চিরদিনের মতো তুমি আমার—আমি তোমার। আর কিছু জানি না, জানতে চাই না।

তোমার গাড়িতে তোমার পাশে বসে ঘুরছি এখানে ওখানে—লেকে ময়দানে, গঙ্গার ধারে, আরও কত জায়গায়। জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার সফলতা গান হয়ে আমার গলায় নির্ঝরের মতো ঝরেছে। তুমি শুনেছ মুগ্ধের মতো।

মনে আছে অবনীশ, সেই সন্ধ্যার কথা? বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার পর যেদিন তুমি সেই পাথর-বসানো আংটিটা আমার হাতে প্রথম পরিয়ে দিলে? তোমার কাছ থেকে সেই আমার প্রথম উপহার। তোমার ভালোবাসার আর প্রেমের স্বীকৃতি। কী করে বোঝাব, কী আনন্দ হয়েছিল সেদিন। তাই তার প্রতিদানে একটি চুম্বনে নিজেকে বুঝি নিঃশেষ করে তোমাকে দিতে পেরেছিলাম। তুমি সুখী হয়েছিলে, আর আমার সমস্ত রক্তে সমুদ্র দুলে উঠেছিল।

সেদিন তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে, অনেক রাত অবধি ঘুম হয় নি। বার বার আংটিটা মুখের কাছে, চোখের কাছে, বুকের কাছে এনে এনে আদর করেছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন আংটি নয়—এ তুমি। এ যেন আমি তোমাকেই পেয়েছি। আংটির ভেতরের ওই ঝকঝকে পাথরটা যেন পাথর নয়—তোমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। বিয়ের মাত্র আর কটা দিন বাকি।

এমন এক দিনে সুলতা এল আমাদের বাড়ি। অনেক দিন বাদে দেখা হল দুজনের। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর আমি আর ওদের বাড়ি যাই নি। সুলতাও আসে নি এখানে। এ কথা তুমি জানতে।

লজ্জায় সংকোচে মুখ তুলতে পারছিলাম না। সুলতা কিন্তু খুব সহজভাবে আগের মতোই কথা বললে আমার সঙ্গে। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম তুমি সব কথা খুলে বলেছ ওকে।

সুলতার সহজ স্বাভাবিক আচরণ দেখে মনে হল যেন এটাই স্বাভাবিক। অবনীশ আর আমার মেলামেশা, বিয়ে—এতে ওর কিছুই আসে যায় না। কোনো ক্ষতিই হয় নি। যেন সে বেঁচে গেছে। যেন সে বুঝতে পেরেছে, হিরে ভেবে যাকে আঁচলে বাঁধতে গিয়েছিল, সুলতা সেটা হিরে নয় আদবেই। একটা ঝুটো পাথর—বুঝি একটা কাঁচ মাত্র।

অনেকক্ষণ বসল সুলতা—ঠিক আগেকার দিনগুলির মতো। অনেক গল্প করল। হাসি ঠাট্টা দিয়ে মুছে নিল আমার মনের লজ্জা সংকোচ গ্লানি।

তারপর মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে বলল, চল্ আমার সঙ্গে একটু, এখুনি পৌঁছে দেব আবার।

অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

বারে, আমি তো তোর বিয়েতে থাকতে পারছি না। পরশু চলে যেতে হচ্ছে চেঞ্জে— বাবাকে নিয়ে। শুনেছিস তো, মাসখানেক ধরে বাবা ভীষণ ভুগলেন। বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে। তোর জন্যে একটা উপহার কিনব। ফিরে এসে তোর বিয়ের ভোজটা খাব, মনে থাকে যেন।

কোনো কথা, কোনো আপত্তি শুনল না সুলতা। জোর করে ওর গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল আমাকে।

অবনীশ, যদি সেদিন সুলতা না আসত? কী হত তা হলে? সারা জীবন এক দুর্বহ ভুলের বোঝা দুজনকেই বইতে হত।

সেই দিনই দোকান থেকে ফিরে এসে, তোমায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম, এ বিয়ে অসম্ভব। হতেই পারে না—কোনোমতেই না—কিছুতেই না।

সেই চিঠি পেয়ে তুমি আশ্চর্য হয়ে ছুটে এসেছিলে। অনেক বুঝিয়েছিলে। অনুনয়- বিনয় করে কারণ জানতে চেয়েছিলে।

কিন্তু আমার কথার নড়চড় হয়নি। বিনা কারণে আমার হাত থেকে এতবড়ো আঘাত পেয়ে তুমি পাগলের মতো অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলে। আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কোথা থেকে তোমার করুণ-বিষণ্ণ মুখের মিনতিকে, ব্যাকুল আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করার মতো শক্তি পেয়েছিলাম আমি? সে কি সুলতার কাছ থেকেই?

বাড়িতে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বাবা মা শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন—নেহাত অত বড়ো মেয়ের গায়ে হাত তোলা যায় না তাই। আমার নির্বুদ্ধিতায় যে কত বড়ো সর্বনাশ হল, তাই ভেবে তাঁদের বিলাপের অন্ত ছিল না। বারবার কপালে হাত চাপড়েছিলেন দুজনে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা একেই বলে—বার বার শুনিয়েছিলেন আমাকে।

তবু আমার মত বদলায় নি। সব দুর্যোগ লোকনিন্দা আর অপমান মাথা পেতে নিয়েছিলাম নিঃশব্দে। তোমাকেও দেখা করতে বারণ করেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব আমাদের বিয়ে ভেঙে যাবার কারণ।

তারপর, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে গেছে। অশান্ত সমুদ্র শান্ত হয়ে গেছে, ঝড় থেমে গেছে—অন্ততঃ বাইরে থেকে। প্রতিজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করেছি— পারিনি। কী করেই বা পারব? আমি কি নিজেই জানি?

কিন্তু আর তো সময় নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ এখন না লিখলে হয়তো আর কখনও লেখা হবে না। আজকের এই রাত আমার কুমারী জীবনের শেষ রাত্রি।

কালকের পর থেকে শুধু আমার পদবিটাই যে পালটাবে তা নয়, সব অদল-বদল হয়ে যাবে। আমার কাছে সেই তুমি থাকবে না—একটি অনাত্মীয় অপরিচিত পুরুষ মাত্র। তোমাকে এভাবে চিঠি লেখাও উচিত হবে না আমার। কাল রাতের পর থেকে আমি আর সেই শ্যামলী থাকব না—অন্য পুরুষের স্ত্রী, এটাই হবে আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।

তাই তোমাকে দেওয়া কথা রাখবার জন্যে আজ যেমন করেই হোক লিখতে হবে, হঠাৎ কেন আমার এই দুর্মতি হয়েছিল। অতদূর অবধি এগিয়ে গিয়েও কেন তোমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলাম।

চৌরঙ্গীর বিখ্যাত নাগরমলের দোকানের সামনে গাড়ি রেখে সুলতা আমাকে নিয়ে নামল। কাউন্টার ভর্তি কত কী সব হিরে মুক্তোর গয়না ঝকঝক করছে।

সুলতা নিজের গলা থেকে সোনার চেনে আটকানো একটা পাথর-বসানো লকেট খুলে রাখল কাউন্টারের ওপর। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল, দেখুন তো লকেটটা—এই দোকান থেকেই কেনা।

ম্যানেজার এক মুহূর্ত লকেটটাকে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সেও চিনল। আমিও। অবনীশই একদিন সুলতাকে উপহার দিয়েছিল ওই লকেটটা।

হ্যাঁ, এই হিরের লকেটটা আমাদের দোকানের। কেন বলুন তো?

খাতা খুলে দেখুন তো, কত দাম। অবনীশ মিত্র এটা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।—সুলতা তারিখটাও বলল।

খাতা খুলে ম্যানেজার দাম বলল, ওঁরা মস্ত বড়ো বাঁধা খদ্দের আমাদের। এখান থেকে অনেক টাকার মাল কেনেন।

দাম শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওইটুকু একটা লকেটের এত দাম! ওই কুচি কুচি কাঁচের মতো পাথরগুলো আসল হিরে। আসল হিরে দামি হয় জানতাম, তবে এত দামি—তা আমার মতো গরিবের মেয়ের পক্ষে কল্পনা করাই অসম্ভব!

সুলতা বলল, এটা বদলে, ওই দামের ভিতরে একটা সোনার সেট দিন তো— নেকলেস, চুড়, কানের ফুল, আংটি।

ব্যাকুল হয়ে সুলতার হাত চেপে ধরলাম, কী করছ সুলতা? এই হিরের লকেট অবনীশ তোমাকে উপহার দিয়েছিল। কেন বদলাচ্ছ তুমি? এ কিছুতেই হতে পারে না। তা ছাড়া এত টাকা দামের এতগুলো গয়না আমি কোনোমতেই নিতে পারব না। এমন জানলে আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই আসতাম না।

সুলতা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অদ্ভুত হাসি। বলল, আজ এই লকেটের দাম আমার কাছে কিছুই নয় শ্যামলী। হিরে কাঁচ সব সমান হয়ে গেছে। এটা আমি তো দিচ্ছি না। অবনীশের জিনিসই তোকে দিচ্ছি। এটা এখন তোরই প্রাপ্য, আমার নয়। অবনীশ হিরে ভীষণ ভালোবাসে, ওই আমাকে নিজে পছন্দ করে এটা কিনে দিয়েছিল, তুই তো জানিস। হিরের গয়না তুই অনেক পাবি ওর কাছ থেকে। হিরের লকেট তাই তোকে দেব না, বদলে সোনার একসেট গয়না দেব বলেই স্থির করেছি। তুই শুধু আমার ছেলেবেলার বন্ধু নয় শ্যামলী—সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। তুই এই গয়না না নিলে আমার ভারী দুঃখ হবে ভাই। লক্ষ্মীটি, আপত্তি করিস না। দেখি তোর আংটিটা—

আমার আঙুল থেকে তোমার দেওয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা খুলে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলল, এই মাপের নতুন ডিজাইনের কতকগুলো সোনার আংটি দেখান তো।

ম্যানেজার আংটিটা চোখের কাছে তুলে অভ্যাস মতোই বুঝি একবার চোখ বোলাল। আর আমি সহসা সব ভুলে, কী বলছি কী করছি না জেনেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এই আংটিটার দাম কত?

ম্যানেজার যাচাইয়ের দৃষ্টিতে আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আংটিটাকে। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, এটার দাম বেশি হবে না। ঝুটো পাথরের দাম নেই। সোনাও মরা। এটা আমাদের দোকানের মাল নয়। ঝুটো পাথর আমরা বেচি না।

কী হল—জানি না। কেন অমন হল—জানি না। হঠাৎ কেন যে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এল জানি না। শুধু মনে হল যেন রাশীকৃত নিরন্ধ্র অন্ধকার এক মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষে আমাকে গ্রাস করে ফেলল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এতটুকু আলোর লেশমাত্র রেখাও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

সুলতা দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে ওর বুকের মধ্যে ঃ কী হয়েছে শ্যামলী? শরীর খারাপ লাগছে?

কোনোমতে বলতে পারলাম, আজ এসব থাক্, ভাই সুলতা, ভয়ানক মাথা ঘুরছে, দাঁড়াতে পারছি না।

তখুনি সুলতা পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। আর তার একটু পরেই তোমাকে জানিয়ে দিলাম—এ বিয়ে হতে পারে না। অসম্ভব।

জানি না, কেন এ কাজ করলাম। সুলতাকে আসল দামি হিরে দিয়েছ, আর আমাকে তুচ্ছ একটু ঝুটো পাথর—তাই? না, তা নয়।

তোমাকে বিয়ে করলেই তো আমি হিরের গয়না পেতে পারতাম।

তবে?

কী জন্যে? কেন এ কাজ করলাম? কেন?

এর উত্তর বড়ো জটিল। বড়ো কঠিন। আমিও অনেক ভেবেছি। অনেক রাত না ঘুমিয়ে এর উত্তর খুঁজেছি। কেন করলাম এমন কাজ?

তোমাকে তো সত্যিই ভালোবেসেছিলাম।

কিন্তু সত্যি বলছি অবনীশ, নিজের হৃদয়কে বোঝা যত কঠিন, অনের হৃদয়কে বোধ হয় ততটা নয়।

তোমার আংটিটা ফেরত দিলাম না। কেন না তুমি বড়োলোকের ছেলে, ব্যাঙ্কে তোমার নিজেরই অনেক টাকা আছে। ওই ঝুটো আংটির দাম তোমার কাছে কিছুই নয়। তাই ওটা রইল আমার কাছে।

মাঝে-মাঝে দেখব ওটাকে। ওই আংটিটার মানদণ্ডে ধরা পড়বে আমার স্বরূপ—আত্মদর্শন হবে।

কাল আমার বিয়ে। বাবা অনেক খুঁজে পেতে আমাদের সগোত্র একটি গরিব পাত্র জোগাড় করেছেন। আমাদের অবস্থা তো জানই, কোনোমতে শাঁখাসিঁদুর দিয়ে পার করা। কাউকেই বলা হয়নি, তাই তোমাকেই জানাই নি।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। বিয়েতে যাঁরা এসেছেন, অর্থাৎ মাসিমা পিসিমার দল, তাঁরা হয়ত এখুনি এসে পড়বেন আমার ঘরে। হিন্দুর বিয়ে—অনেক রকম নিয়মকানুন আছে, জান তো। তাই ওঁদের আসবার আগেই এই শেষ অনিয়মটা, অর্থাৎ তোমার কাছে চিঠি লেখাটা এইখানেই শেষ করে ফেলি।

তুমি সুখী হও। সুলতা সুখী হোক। প্রার্থনা করো, আমিও যেন সুখী হতে পারি।

জীবনে সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা আমার এই রইল, জেনেশুনে চিরদিনের মতো যেটাকে আঁচলে বাঁধতে যাচ্ছি, সেটা হিরে নয়—কাঁচ।

শ্যামলী

ঘেন্না

সুলেখা সান্যাল

হাওড়া ছাড়িয়ে ওদিকে হুগলি পর্যন্ত যে স্টেশনগুলো পড়ে তারই একটা থেকে কোলকাতা-মুখো ট্রেন ছাড়ছে। কলরব করতে করতে একদল মেয়ে আসে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে। বেশির ভাগই বিধবা-মধ্যবয়সী। প্রায় হাঁটুর ওপর উঁচু করে পরা আধময়লা থান, সবায়েরই খালি গা, খালি পা। মাথায় আর কাঁখে প্রত্যেকেরই একটা করে বস্তা। সবুজ নিশান দেখাতে শুরু করছে গার্ডা অস্ফুট আর্তনাদ করতে করেত পায়ের গতি আরও বাড়ায় ওরা, "হেই বাবা লোকনাথ! পৌছে দিও বাবা।" হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে পড়ে কোনো মেয়ে-কামরায়, মাথার-কাঁখের বস্তাগুলোকে ফেলে দিয়ে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেয়, "পেয়েছি গো বাবার দয়ায়। ভেবেছিলাম, আজ বুঝি আর যাওয়া হোলনি।"

—"হ্যাগো? সদি কই গো?" একটু আরাম করে বসে কৌটো থেকে মিসি বার করে দাঁতে দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল হলো সুন্দরীর, "হা রে, তাকে কেউ দেখলিনি তোরা? এখনও এলোনি। মাগী হাঁটতেই কী পারে?"

ও পাশের বেঞ্চ থেকে যোগমায়া বলে, "বলিনি তখন, নিস্‌নে ও বাঙালকে ব্যবসার কাজে, শুনলিনি। ওর জন্যে তোকে বিপদে পড়তে হবে, এ আমি বলে দিলাম।"

সুন্দরী উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়েছিল জানলা দিয়ে, দু'টো বাঁশি পড়েছে ট্রেনের, এখনও এলো না, "হেই যা! গাড়ি যে ছাড়ল গো!"

একটু দূরে দেখা যায় সৌদামিনীকে, হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জানলা থেকে সুন্দরী প্রাণপণে চেঁচায়, "হেথা গো—এই সদি! দৌড়ো—দৌড়ো। গাড়ি পার্বিনি।" দৌড়য় সৌদামিনী, সারা গাড়িসুদ্ধ লোক যেন হাঁ করে তাকিয়ে ওর দিকে, ভেবে কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে।

হেঁচকা টান মেরে প্রায় চলন্ত গাড়িতে ওকে তুলে নেয় সুন্দরী আর চেঁচায়, "এমন ঝকমারিও করিছি গো তোকে কাজে নিয়ে, আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বিনি তুই।"

বসে নিঃশ্বাস ফেলে সদি, কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে আসছে। বড়ো বড়ো ভীরু চোখের দৃষ্টি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নেয়।

গাড়ির যাত্রীণীরা—এ-গ্রাম ও-গ্রামেরই ঘর-গেরস্থের কেউ বউ, কেউ শাশুড়ি। মুখ চেনা-চিনি এর সঙ্গে ওর, আনকোরা বাইরের লোক ছাড়া এ সবে আশ্চর্য হয় না ওরা। একজন জিজ্ঞেস করে, "একে আবার কোথায় পেলে গো সুন্দুরী? নতুন লোক যে!"

পাশের একজন গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, "বাঙাল গো বাঙাল—বুঝছোনি? হাঁটা-চলা-ফেরা দেখেই বোঝা যায়।"

সুন্দরী সৌদামিনীর ফেলে দেওয়া বস্তা ভালো করে বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে, তারপর ট্রেনটা জোরে চলতে শুরু করলে আঁচলে বাঁধা একরাশ মুড়ি কোলের ওপর রাখে, বলে, "খা—আজ তো আর সারাদিন পাবিনি খেতে।" ছল-ছল করছিল তখনও সৌদামিনীর চোখ, ভারী গলায় বলে, "আসার সময় ছেলেটা হাউমাউ করে কানতেছিল, বলে, 'আমি যাব'। ওরে ফেলে আসতি মন চায় না।"

—"থাকবে ঠিক। কেন, আমারও তো রয়েছে গঙ্গা আর বোঁচা, মানুষ লয় ওরা? তোর ছেলে বাপু বড়ো নেই আঁকড়া।"

—"ওরা যে বাঙ্গাল ক'য়ে খেপায় ওরে। কানতিছিল কাল রাত্তিরে, এখানে থাকতি চায় না।"

ওপাশে কয়েকজন মুচকি হাসে সৌদামিনীর পূর্ববঙ্গের টান শুনে—ওর ছলছলে চোখ দেখে।

রেগে গিয়ে সুন্দরী মুখভঙ্গি করে, "তা যাও, দেশেই ফিরে যাও তোমাদের। সুখে আছ—সইবে কেন? পড়েছিলে তো সেই ইস্টিশনে—সেই ছিল ভালো। তোমাকে দিয়ে আমার ব্যাবসা চলবেনি বাপু। এইতো সেদিন, শ্রীরামপুরের রামলোচন দোকানির সঙ্গে ঠিক করে এলুম পঁচিশ টাকা মণ, তোমাকে দিল চব্বিশ টাকা। একটা আপত্তি না, কিছু না। ন্যায্য দাম চাইতে গেলাম, বলে, 'দেবো কেন? যার চাল সেই তো দিলে।' আরে বাপু, টাকাটা সদিকে ধার দিয়েছিল কে?" বলে সামনের বেঞ্চের সহযাত্রিণীর মুখের দিকে তাকাল সমর্থনের আশায়, "তা যাও। দুটো পয়সা পাচ্ছ আর এখন বুঝি দেশের মায়া উথলে উঠছে তোমার। ঝুঁটি ধরে ধরে মুসলমানগুলো তাড়াল যখন, তখন তো কই বাঁচাল না তোমার দেশ।"

আবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে সৌদামিনী, "তাড়াবি কেন। ওরা তো থাকতিই কইছিল। সকলে আসতিছে দেখে আমি আর থাকি কোনো ভরসায়।"

কিন্তু ভরসা কী একেবারেই ছিল না? যাবার খবর পেয়ে কানাই এসে বসেছিল, ম্লানমুখে বলেছিল, "সত্যিই যাবা?"

—"যাব না?"

—"না।"

—"ক্যান্?"

—"যাচ্ছ কী মুসলমানগারের ভয়ে, আমাগারে রহিস কাকা আর হাফেজরে বিশ্বেস করো না?"

লজ্জিত হয়ে বলেছিল সৌদামিনী, "না—তা না। এখানে থাকলি খাব কী? বাবুগারে পাড়ায় ভদ্দরলোক এক ঘর নাই যে খোট্যে খাব—পেট চলবি কীসে?"

—"ক্যান্ আমরা নেই? তুমি আমার মিতে কার্তিকের বউ না? একসঙ্গে মাঠে যাই নাই ফসলের দখল নিতি? আমার কোলের ওপর প্রাণডা যায় নাই কার্তিকের?"

তবু ভরসা পায়নি সে। ছেলের হাত ধরে একটা পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। খানিকটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে পেছন থেকে কানাই বলেছিল, "কাজডা কিন্তু ভালো করলে না তুমি। শহরে—পথে কত বিপদ-আপদ, লোভ আর পাপের ছড়াছড়ি। মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সেখানেই বেশি। অপমান আর দুঃখু পালি এখানে জানাবার লোক আছে তোমার—সেখানে নাই।" এর বেশি কিছু বলতে পারেনি। গলাটা ধরে এসেছিল।

এখনও তার সেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, সেই ভাঙা ভাঙা গলার স্বর, আটকানো কথাগুলো কানে বাজে। মাঠে-ক্ষেতে লাঙল চালানো, ঘামে ভেজা চকচকে চওড়া পিঠ চাষীকে দেখলেই মনে পড়ে কার্তিকের কথা—কানাইয়ের কথা। চোখে জল আসে রাতে শুয়ে, "দ্যাশ কই? এ কনে আলাম আমি!" চোখের জল ঠোঁট দিয়ে চেটে নিয়ে অস্ফুটে কাঁদে সৌদামিনী— বাঙালের কান্না!

সেই নোনা জলেই ভরে আসছিল চোখ, হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কথা থামিয়ে কাজে লাগার সময় এখন। সুন্দরী বলে, "আয় রে সদি।" একটা বস্তার মুখ খুলে ভেতর থেকে চটের টুকরো বার করে একখানা, লাঠি দিয়ে চটখানাকে অদ্ভুত কায়দায় ঢুকিয়ে দেয় দরজার মাঝখানের ওই এক ইঞ্চি সরু ফাঁকে, তারপর সুন্দরী ছোটো একটা র‍্যাশন ব্যাগে পুরে দেয় চাল, আর ও ঢালে। হাতে কেঁপে কটা চাল উড়ে পড়ে বাইরে—কটা ছড়িয়ে পড়ে ভেতরে। হা হা করে ওঠে সুন্দরী, "ফেলিস্‌নি, ফেলিস্‌নি। গায়ে বুঝি লাগে না তোর? হ্যাঁরে সদি। টাকাটা আমার কিনা. মায়া হবেই বা কেন।"

ওপাশে আরও দুজন দুটো দিক অধিকার করেছে, একজন দরজার ফাঁকে ঢালছে, একজন ঢালছে জানলার ফাঁকে।

—"সর দেখি," ওকে সরিয়ে সুন্দরী নিজে ঢালে চাল। সৌদামিনীর হাত কাঁপে, বুকের ভেতরটা কেমন করে। ঘরে কি চাল দেখেনি সে!

উঠোনে ধান এনে ফেলত কার্তিক, নিজের হাতে সেই ধান ভেনে ঘর ভরে রেখেছে। একটা চাল মাটিতে পড়লে খুঁটে তুলেছে—চাল না লক্ষ্মী, সোনা-দানার চেয়েও বেশি।

কী যে দুঃখ তার। চালের মূল্য বোঝাতে আসে সুন্দরী, চুরি করা চালের ব্যাবসা করতে গিয়ে! হায় রে কপাল! উপুড় হয়ে কপালটা একবার মেঝেয় ঠুকে দেয়।

সুন্দরী বলে, "কি লো! ঘুমোচ্ছিস নাকি? দে, এটা দিলেই তো শেষ হয়।"

তারপর কাজ শেষ হলে শুকনো মুখ করে চুপচাপ বসে থাকে সবাই। কপালে হাত ঠেকিয়ে যোগমায়া ফিস্‌ফিস্ করে, "দোহাই বাবা তারকনাথ। এই ইস্টিশনটা পার করে দাও বাবা!"

ওরা জানে বিশেষ একটা স্টেশনের কথা। ধরা পড়ে বেশির ভাগই ওখানে। সব জায়গায় পয়সা দিয়ে কেঁদেকেটেও মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু এখানে শক্ত পাহারা, তাই বড়ো ভয় ওদের শেওড়াফুলি জংশনকে। ওটা পার হয়ে গেলেই আবার কাজে মন দেয় ওরা—নীচের থেকে চটখানাকে টানে আর সব চাল ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। সেগুলোকে কুড়িয়ে তুলতে হয়। সুন্দরী বলে, "একটা একটা করে খুঁটে তোল সদি।—পড়ে থাকেনি যেন। এ আর পারিনে বাপু, আধমন চালে আমার দশসের যাবে গুনগার।"

'এ আর পারিনে বাপু!' এই কথাটাই সদির মনে কান্নার ঢেউ তোলে, বুকের মধ্যে উথল-পাথাল করে দুঃখের সাগর। সত্যিই আর পারে না সে। এই চুরি করে পেট চালানো, অপমান আর অভিযোগ!

ছেলেটার কথা মনে পড়ে। আহা কচি ছেলেটা! সেই অন্ধকার শেয়াল-ডাকা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে পিদিম জ্বালিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে, গেলে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, "আমি থাকপো না। কিছুতিই থাকপো না। তুই আমারে কানাই কাকার কাছে যাখ্যে আয়।" ছেলে-মা দু'জনেই কাঁদে।

ছেলে বলে, "ক্যান্ তুই আলি ইস্টিশন্ থে। ওখানে কত লোক ছিল চেনা, এখানে ওরা আমাদের বাঙাল কয়, হাসে।"

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঘুরতে ঘুরতে সৌদামিনীর ওপর চোখ পড়েছিল সুন্দরীর, বলেছিল, "যাবি মা? ব্যাবসা করবি, স্বাধীন ব্যাবসা? দু'টো পয়সা আসবে। এত কষ্টে থাকতে হবে না।"

সাগ্রহে তাখন রাজী হয়েছিল সে। সুন্দরী ঘর দিয়েছে একখানা, টাকা ধার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা বোঝায়। তাই ওর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে। আর অন্যদের মতো সুন্দরী মুখরাও নয়, মনটা নরম আছে এখনও।

অন্যদের হাসি-ঠাট্টা ব্যাঙ্গের উত্তরে কতদিন বিরক্ত হয়ে সুন্দরীকে বলতে শুনেছে সৌদামিনী, "বাঙাল-টাঙাল বুঝিনি বাপু। কষ্টে পড়েছিল, বলতেই এলো, নিয়ে এলাম। তোরাইবা অমন বাঙাল বাঙাল করে মরিস কেন? বাঙালরা কী মানুষ নয়?"

স্টেশনে পৌঁছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সবাই। একসঙ্গে থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কুলিরা জানে কোথায় পৌঁছে দিতে হয় বস্তাগুলোকে। টিকিটবাবু, দাঁড়িয়ে থাকা রেলের লোক, গার্ড—সবাইয়ের জন্যে আলাদা করে পয়সা গুঁজে রাখে ট্যাঁকে। হাত ওরাও বাড়িয়ে থাকে, এরাও বাড়িয়ে রাখে। কথার চেয়ে কাজ হয় তাড়াতাড়ি। রিক্সায় উঠে সুন্দরী বলে, "দাঁড়া বাবা, দাঁড়া একটু। পেছনেরটাকে বেশি ছাড়িয়ে যাস্নি!" পেছনের রিক্সায় আসে সৌদামিনী, তাকে ডেকে বলে দেয়, "বলে দিবি সুবলসখাকে টাকা আর আমি রাখবোনি, পারিস যদি আজই আনবি আদায় করে।"

সুবলসখা বড়ো বাকি ফেলে রাখে টাকা, একটু বেশি দাম পাওয়া যায় বলে ওর কাছে চাল দিতে হয় বটে কিন্তু টাকা আদায় করতে প্রাণ যায়। নিজের অতিকষ্টে সমস্ত জীবন ধরে জমানো গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে কাজে নেমেছিল সে। ভারী তো লাভ, ঘুষ থেকে শুরু করে গুনগার দিয়ে সারাদিনে একটা টাকাও তার লাভ হয় কিনা সন্দেহ। তুব তারই জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম, অপমান, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়, সারাটা দিনের না খাওয়ার ধকল। ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে। এ ব্যবসা ছেড়ে দিলেই বা খাবে কী সে? তিনটে ছোটো ছেলে—নিজের পেটটাও আছে।

স্টেশন থেকে কতদূরে সব দোকান। বাবা! অসমান রাস্তায় রিক্সার ওঠা-নামায় শরীরে যেন ব্যথা ধরে যায় সৌদামিনীর খিদেয় পেটের ভেতরটা মোচড়ায়। আজ সকালে খেয়েও আসেনি সে, মনটা খারাপ ছিল বলে। গলা শুকিয়ে আসে তেষ্টায়।

সুবলসখার দোকানে যাবার সময় দেখল বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; এখানকার কাজ শেষ হলে স্টেশনে পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি, সাড়ে ছ'টার গাড়ি যদি চলে যায় তবে আটটার আগে আর গাড়ি নেই। ছেলেটাকে দু'টো রেঁধে দিতে হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে।

চালের ছোটো বস্তাটা পাশের ঘরে রেখে এসে বেঞ্চিটা গায়ের গামছা দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে একটা হাতপাখা এগিয়ে দিয়ে সুবলসখা বলে, "নাও বসো। যা রোদ, জিরিয়ে নাও একটু।"

বসে পড়ে সৌদামিনী বলে, "বসবার সময় নাই, টাকা কয়ডা যদি দেতেন আজ, সুন্দরী দিদি কয়ে দিল।"

—"সে হবে এখন", অনুরোধের দৃষ্টি নিয়ে সুবল বলে, 'টাকা কী আর ফেলে রাখব নাকি? জল খাবে?"—বলে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেয়। সৌদামিনী মুখে দিয়ে দেখে শুধু জল নয়, মিষ্টি—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। একচুমুকে সেটা শেষ করতে করতে একটা সিরসিরানি ভাব জাগে মনে। স্টেশনে একধরনের লোকের আনাগোনা, তাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ানো দেখলে এমনি একটা গা ঠাণ্ডা করা ভাব জাগত। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে সে রকম করে উঠল। জলের গ্লাসটা শেষ করে সে ভোঁতা আর বোকা চোখে তাকিয়ে রইল।

—"ছেলে-মেয়ে আছে তোমার?" সুবলসখা প্রশ্ন করল।

—"আছে, এক ছাওয়াল মাওর।"

একটু ইতস্তত করে সুবল, কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলে না, খানিক চুপ করে কি যেন ভাবে তারপর মৃদু স্বরে বলে, "রাগ যদি না করো তবে একটা কথা বলি সৌদামিনী।"

ঘরের চারপাশটা একবার অসহায়ের মতো চোখ ঝুলিয়ে নিল সৌদামিনী, তারপর ম্লান-নিস্তেজ গলায় বললো, "কন্ কি কবেন। আমাগর আবার রাগ আর বিরাগ!"

—"বলি কি, সুন্দরীর সঙ্গে ব্যাবসা করা ছেড়ে দাও তুমি। আর তো ত্রি-সংসারের কেউ নেই, ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার এখানে চলে এসো। তুমি ঘর-সংসারের কাজ করবে, আমি উপায় করে আনব।"

অত্যন্ত সহজ সরল প্রস্তাব। এরকম দু-একটা স্টেশনে থাকতেও এসেছিল তার কাছে, সিটিয়ে সিটিয়ে তাই যেন গুটিয়ে গেল সৌদামিনী।

ওকে অসহায়ের মতো চুপ করে থাকতে দেখে সুবল বলে, "কথাটা আমি ভেবেছি তোমাকে দেখার পর থেকেই, বলিনি সাহস করে। বড়ো লক্ষ্মীর মতো চেহারা আর স্বভাব তোমার—ও চুরির ব্যাবসা তোমার যে ভালো লাগে না, তাও বুঝি আমি।"

তবু সৌদামিনীর গুটিয়ে আসা ভাবটা যায় না, মাথা নীচু করেই বসে থাকে। প্রায় গোপন কথা বলার মতো করে সুবল বলে, "এ ব্যাবসা আমারও ভালো লাগে না। করি কেবল টাকার লোভে। আসল ব্যাবসা তো দেখছ আমার—এই দর্জির কাজ—তাই ভালো। এ শালার চালের জন্যে জ্বালা কি আমারও কম, পুলিস-দারোগার ভয়ে তটস্থ। দু'পাঁচ সের চালের ওপরই যত নজর শালাদের।"

তবু উত্তর না পেয়ে। বিরক্ত মুখে সুবল বলে, "কি বলবে বলো না। অন্যায় বলেছি কিছু! কী ভাবছ?"

—"ভাবা কী এতই সহজ? সুন্দরী ছাড়তি যদি ক্যান্? আর আমি বাঙাল, আপনারা তো ঘেন্না করেন আমাগোরে, তার উপরে বিধবা। মানের ভয়ে পালায়ে আস্যে, শ্যেষে কী দুর্নাম কেনব?"

—"ওসবেরর কোনোটাই মানিনে আমি, বাঙালও না বিধবাও না। আর লোকে কী বলল না বলল ভদ্দরবাবুদের মতো আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন?"

হঠাৎ মাথা তুলে বেলার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সৌদামিনা—"সন্ধে হয়ে গেল। যাবানে কেমন করে আমি!"

একটা রিকশা করে যেতে বলে সুবলসখা, ভাড়াটাও দিয়ে দিতে চায়, কিন্তু একা যেতে রাজি হয় না সৌদামিনী। সুবলকে তখন উঠতে হয় পৌঁছে দেবার জন্যে। দোকান বন্ধ করে, চাবিটা ট্যাঁকে গুঁজে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসে মাঝরাস্তা থেকে একটা রিকশা ডেকে বসে। নিজে যথাসম্ভব গুটিয়ে বসে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। গাঁয়ের মেয়ে তার ওপর বিধবা, পরপুরুষের পাশে বসে যেতে সঙ্কোচ তো হবেই। সৌদামিনী সমস্ত শরীরটাকে শামুকের মতো গুটিয়ে আনে ভয়ে, সঙ্কোচে। হয় তো মাথার ওপর হুড তোলা রিকশায় লোকটা জড়িয়ে ধরতে পারে। ওর অবস্থা বুঝে সুবল মুচকি হাসে, "অত ভয় পাচ্ছ কেন গো? হাত-পা খেলিয়েই বসো না, ভয়টা কিসের?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুবল গলাটা পরিষ্কার করে বলে, "বলছিলাম—আসল কথার তো কোনো উত্তরই দিলে না। আমি তো রাজি—তোমার আপত্তি থাকলে চালের ব্যাবসা ছেড়ে দেব তো বললাম।"

সৌদামিনীর কমে আসা ভয়টা আবার বাড়ে, স্টেশনের পথ কতদূর একবার তাকিয়ে দেখে নেয়। লোকটা বুঝি এখনই তার অধিকার কায়েম করতে চায়। খানিক জোর গলায় তাই বলতে হয়, "কথাতো তোমারে এখনই দিতি পারিনে, দেখি ভাব্যে।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবেই দেখো তুমি। সে আমি জোর করে মতো আদায় করব না তোমার তা সামনের দিনেই যাহোক কিছু ভেবে এসো—কেমন?"

সৌদামিনীর নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ পেয়ে বলে, "বিশ্বাস করা না করা তোমার হাত, আমার অন্তরের কথাই বলেছি। লোক আমি খারাপ না।"

লোক যে খারাপ নয় সেটা টের পাওয়া গেছে রিকশায় পাশাপাশি বসেই। কথাটা তা নয়, সৌদামিনীর এখন ধানের দখল নিতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া স্বামীর কথা মনে পড়ে, তার মিতে কানাইয়ের কথা মনে পড়ে। দেশ-ঘর, জমি-ধান, পাপ-পুণ্য মিলিয়ে মনের মধ্যে অন্ধকার নামে।

স্টেশনের আলো দেখতে পেয়ে সুবল বলে, "আমি এবার যাই। তোমার দলকে পেয়ে যাবে ওখানে।"

হঠাৎ সুবলের হাত শক্ত করে চোপে ধরে সৌদামিনী, "না—না, গাড়ি পর্যন্ত উঠোয়ে দিয়ে যাও আমারে।"

সাড়ে ছ'টার গাড়ি একটু আগে ছেড়ে গেছে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পরের ট্রেনটার জন্যে। সুবল ওকে স্টেশনের চায়ের স্টলের বেঞ্চিতে বসিয়ে কাপে করে চা খাওয়ায়, কেক খাওয়ায়।

গাড়ি এলে দু'জনে একটা খালি কামরায় গিয়ে বসে থাকে পাশাপাশি। চুপ করেই থাকে, যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

—"যেতে পারবে তো একা?" গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিলে সুবল জিজ্ঞেস করে, চলন্ত গাড়ির সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে যায়। যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে তার প্রিয়-পরিজন, আর বুঝি দেখা হবে না।

গাড়ি প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়ে গেলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে ভেতরে বসে সৌদামিনীর দু'চোখ ভরে জল আসে। খালি কামরায় গায়ের মধ্যে কেমন ছম্‌ছম্ করে। মনে হয় এ সময়টায় সুবল সঙ্গে থাকলেই যেন ভালো লাগত, এই ভয় ভয় ভাবটা একটুও থাকত না তাহলে।

সেই গা ছম্‌ছম্ করা ভাব নিয়ে ঘরে এলে ছেলেটা আগুনের মতো গরম গা নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে বলে, "তুই মিলিনে মা। শীতে আমারে কাঁপাইছে সারাডা দুপুর।" অনুতাপে বুকের মধ্যেটা পুড়ে যায়, কপালে বুঝি সত্যিই অনেক দুঃখ আছে তার! বিধবা মানুষ, ছেলের মা, দেড়কুড়ি বয়স হতে চললো, দেশ—জমি-জায়গা ছেড়ে এসে নইলে আবার নতুন করে সংসার পাতবার সখ জাগবে কেন মনে। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকে।

থমথমে মুখে সুন্দরী ঢোকে। বলে, "আজ সুবাস আর হারাণীরে ধরে নে গেছে পুলিস, একেবারে হাজতে চালান। ও ভাবে আর নেওয়া যাবেনি চাল।"

পাপ-পুণ্যের জগত থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে আসতে হয়, বোকা আর ভোঁতা চোখে তাকিয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞেস করে, "তবে কী করব?"

—"উপায় আছে রে, উপায় আছে," এতক্ষণ পরে সুন্দরী একটু হাসে মিসিমাখা কালো দাঁতে, বলে, "বজর আঁটনেরই গেরো যায় ফস্‌কে। দে দেখি আট আনা পয়সা—দার্জিকে দিতে হবে। ব্যবসা তো রাখতে হবে, তোরও—আমারও, নইলে পোড়া পেট চলবে কি করি!"

"দার্জি!" বিস্ময়ে সৌদামিনীর কথা আটকে আসে।

—"দেখছিস কি? এবার মেমসাহেবি পোশাক পরতে হবে যে। উঠে আয় দেখি—", গুটিয়ে নিয়ে আসা মস্তবড়ো একখণ্ড চটের টুকরো তার বুক থেকে পিঠ পর্যন্ত ফেলে একবার মেপে নিয়ে বলে, "ঠিক, হবে তোর এতে। আমি মোটা মানুষ, আমার লাগবে বেশি।"

পয়সা নিয়ে যাবার সময় বলে, "ভাবিসনি কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ওর চিন্তিত বিষণ্ণ মুখের দিকে চোখ পড়তে বলে, "মর্ মাগী! ছেলের জ্বর যেন কারুর হয় না, কাঁদছিস কেন? রাতে আমার ওখান থেকে চাড্ডে খেয়ে নিসখনি তুই। কাল বোঁচাকে দিয়ে পাঁচু কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে দিলেই জ্বর সেরে যাবে—ভাবিসনি।"

ছেলে বলে, "তোরে যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায় মা?" বলে কেঁদে ফেলে।

পাপ-পুণ্য এক নিমিষে উধাও হয়ে যায় মন থেকে, সৌদামিনী বলে, "যাবি চলে এখান থে সোনা? একজন আমাগোরে নিয়ে যাতি চাইছে। তোরে আমি লেখা পড়া শেখাব।" ছেলে ভারি খুশি হয়ে বলে, "তাই চল্ মা।" ওদের মনের মধ্যে সুখের ছবিটা একবার জাগে, আবার মিলিয়ে যায়।

সকালবেলা সুন্দরি নিয়ে এলো দর্জির তৈরি করা জিনিসটা। গলার ওপর থেকে পেট পর্যন্ত একটা মস্তবড়ো চটের টুকরো ভাঁজে ভাঁজে সেলাই করা—পেছনে কাঁচুলির মতো কতগুলো দড়ি।

সুন্দরী বলে, "চাল আন তো দেখি ক'সের।" চালের ধামা এগিয়ে দিয়ে বলে, "ধরা দেখি লম্বা করে।" তারপর কৌটোয় করে চাল ঢালতে থাকে সেলাই করা ভাঁজগুলোর মধ্যে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সৌদামিনী, দরজা-জানলার ফাঁকে ছালা গুঁজে চাল ঢালবার সময়ও এত আশ্চর্য হয়নি সে। ধামার প্রায় সব চালগুলো ঢেলে নিয়ে সুন্দরি বলে, "আয় এদিকে।" তার গা থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে বেঁধে দেয় শরীরের সঙ্গে। চটের গরম আর চালের ভ্যাপসা গন্ধে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। ভীষণ মোটা মেয়ে মানুষের মতো হাঁপাতে থাকে সৌদামিনী, "এ আমি পারব না। আমি মরে যাব ওসব পরে—ও দিদি।"

ছেলেটাও মায়ের অদ্ভুত সাজ দেখে হাউমাউ করে কাঁদে। সুন্দরি রেগে ওঠে, "পারবে না তো করবে কী শুনি? আমি এমন মোটা মানুষ—আমি পারছি নে? আরও সবাই যে নেবে, কষ্ট তাদের নেই? না হয় চাল কিছু কম করেই নিও তোমারটায়। পেট চালাতে হবে তো" ফিতেগুলো ঘুলে দিয়ে আবার চালগুলো ধামায় ভরে ফেলে তাড়াতাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে কান্নায় যেন গলা আটকে আসে সৌদামিনীর।

সে কাকুতি জানায়, "তুমি চারডে দিন আমারে মাপ দেও দিদি। ছেলেডারে দেখার কেউ নাই। আমারও শরীরডা খারাপ। তারপর যাতি তো হবিই, তোমাগোরে যে পথ, আমারও সেই পথ—এ তো জানিই।"

—"তা না হয় নাই গেলে তুমি ক'টা দিন", সুন্দরী এবার সহানুভূতিতে নরম হয়ে আসে, "বুঝিস তো দিদি, পেটের দায়েই তো সব। এই বা ক'দিন, আবাগীর ব্যাটারা ঠিক ধরে ফেলবে দেখিস। যত চোখ কী আমাদের উপর গো। দশ সের, বিশ সের চাল নিয়ে কি দালান তুলব আমরা!"

সুন্দরীর কথা সৌদামিনীর কানে যায় না।

ও পথ খোঁজে। এইবার গিয়েই সে সুবলসখার প্রস্তাবে রাজী হয়ে আসবে। তারপর চলে যাবে ছেলেকে নিয়ে। তাতে যদি পাপ হয়—হোক।

সেই একই সময়ে কলরব করে মেয়েরা দৌড়য় গাড়ি ধরতে। বস্তা নিয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায় না বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেয় আর হাঁপায়।

চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে তারা হাসে, "কীগো, তোমরা যে সব পাল্লা দিয়ে মোটা হচ্ছ?"

ওরা গালাগালি করে, "চুপ কর না ড্যাক্‌রা—কে কোথা দিয়ে শুনবে। হয়ে যাবে ব্যবসা করা।"

বিকেলে ফিরে আসে স্বাভাবিক শরীরগুলো নিয়ে ওরাই, স্বাভাবিক মানুষের মতো নিঃশ্বাস নেয়।

সবাই বলে, "ছেড়ে দেব ছাই এই ব্যবসা। দু'পাঁচসের চালের জন্যে প্রাণ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গো!"

কিন্তু ছেড়ে দেব বলেও কেউ ছাড়তে পারে না, কষ্টটা সেখানেই।

কটা দিন পরে ছেলে সুস্থ হয়ে গেলে কোনো অজুহাত দেওয়া যায় না। সুবলসখার সঙ্গেও দেখা করা দরকার। এখনও যদি তার মতো না বদলে থাকে তবে সৌদামিনী মতো দিয়েই আসবে আজ। খানিকটা আশা থাকে বলে সের পনের চাল নিয়েও চটের পোশাকটা খুব ভারী মনে হয় না।

সুন্দরী বলে, "আর একটু জোরে হাঁট।" চালের ভ্যাপসা গরমে কষ্ট হয়—হাঁটতে পারে না তবু চেষ্টা করে। কেবলই মনে হয় আজই তো শেষ দিন তার।

চলতে চলতে ভাবে, সুবল পরিশ্রম করে ফিরবে, ছেলেটা ইস্কুলে যাবে পড়তে। সেও দরকার হলে সুবলকে সাহায্য করবে। আহা, এক নিমেষে যদি পৌঁছে যাওয়া যেত সেখানে!

গাড়িতে উঠে বড়ো কষ্ট হয়, জল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে। দু'টো স্টেশন পার হয়ে গেলে সুন্দরীকে বলে, "একটু খুলি দিদি। আর তো পারতিছিনে।"

ছেলেমানুষ বাতাসীও বলে, "সত্যি, খুলেই বসি একটু।"

—"কোনো ইস্টিশন এটা, দেখি দাঁড়া" বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে সুন্দরী চমকে সরে আসে। তখনও প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়ে যায়নি গাড়ি। খাকি পোশাক পরা লম্বা-চওড়া দু'জন লোক গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়ে ওদেরই কামরায়, সঙ্গে মস্ত এক লাঠিধারী সেপাই। নিমেষে মেয়েদের মুখগুলো শুকিয়ে যায়, বুকের মধ্যে সবারই ধড়ফড় করে।

দু'জনেই দরজায় পিঠ দিয়ে একটু দাঁড়ায়। জামার বুকে অনেকগুলো ব্যাজে রোদ পড়ে ঝক্‌মক্ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছুঁচলো গোঁফ জোড়াটায় পাক দেয় আর একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে মেয়েদের। সেপাইটা যেন কাঠের পুতুল—চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে—এ্যাটেনশনের ভঙ্গি নিয়ে। মাঝবয়েসি, কমবয়েসি মোটাসোটা অনেকগুলো মেয়ে পাশাপাশি বসে, তবু ওদিকের দরজার কাছে বসে থাকা সৌদামিনীর দিকেই যে ওদের চোখ পড়েছে—ফ্যাকাসে মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেও সেটা সে বুঝে ফেলে। মেয়েরা ভোঁতা আর বোবা দৃষ্টি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।—নড়ে না, শব্দ করে না একটাও।

সিগারেটে দু'টো বড়ো বড়ো টান দিয়ে পায়ের নীচে জুতো দিয়ে পিষে একজন অফিসার হঠাৎ অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বাতাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "চাল নিয়ে ভাগছিস শালী! বার কর শীগগির।"

হাউমাউ করে বাতাসী আর্তনাদ করে, "ওবাবু, পায়ে পড়ি বাবু। আজকের মতো ছেড়ে দাও বাবু।"

দাঁত বার করে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকে পেছনের লোকটি, সেই আবার এগিয়ে গিয়ে বাতাসীর কাপড় চেপে ধরে। আর একজন সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে সামান্য দূরে সরে দাঁড়ায়—রিভলবারটা বার করে হাতের ওপর নাচায়। মেয়েগুলোর ভয়ের আড়ষ্টতায় দম আটকানো ভাবটা ওরা যে খুব উপভোগ করছে, সেটা ওদের চোখ দেখেই বোঝা যায়।

সৌদামিনী হঠাৎ উঠে গাড়ি থামাবার শেকলটার দিকে হাত বাড়াতেই একজন এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে হাত নামিয়ে দেয়, "বড়ো যে সখ চাঁদ। শেকল টেনে গাড়ি থামাবে! চুরি চামারির ব্যবসা করে আবার তেজ দেখ!"

সৌদামিনী রাগে হাঁপায়, চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে "তালি নাম্যে যাও। যা পার ইস্টিশনে নাম্যে করো। পাঁচজন লোকের সামনে বিচার হোক—পুলিসে দাও হাজতে পোরো। তা না, চলন্ত গাড়িতে উঠে মেয়েগোরে কাপড় ধরে টানাটানি—একি চাল ধরা, না বজ্জাতি?"

—"চোপরাও", হুংকার দিয়ে এগিয়ে আসে অফিসার একজন, "ভারী যে গর্জন! সরকারি লোক দেখেও ভয় নেই একটু? ভাবছিস আমরা জানিনে চাল নিয়েছিস কোথায়! সব শালীর কাপড় খোলাব আজ।"

পেছনের দরজাটা বাতাসে কখন যেন খুলে গেছে কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবসরও নেই। লোকটা যতই এগিয়ে আসে, বুকের কাপড় শক্ত করে চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সৌদামিনী পিছিয়ে যায়।

এতটুকু কুণ্ঠা নেই, আঁচল চেপে ধরে সরকারি লোক বলে, "খোল্ কাপড়।" সেপাইটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, সেই যে চোখ নামায়, আর তোলে না।

রুদ্ধ কান্নায় শরীরটা ফুলতে থাকে সৌদামিনীর। তীব্র ঘৃণায় ঠোঁট দুখানা কুঞ্চিত হয়। শেষে প্রাণপণ শক্তিতে লোকটার চুলের গোছা মুঠি করে চেপে ধরে দু'হাতে। অফিসার বারে বারে মাথা নাড়ায়, ছাড়াতে পারে না। কষ্ট হয় খুব, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। শেষে উপায় হিসাবে বুটসুদ্ধ পায়ের একটি জোর লাথি কষিয়ে দেয় মেয়েটার পেটে। তাতেই কাজ হয়। কাপড়খানা থেকে যায় তার হাতে, খোলা দরজাটা দিয়ে সৌদামিনীই কেবল ছিটকে বেরিয়ে যায়। কাপড়ের শেষ প্রান্তটায় সামান্য একটু টান পড়ে। ভদ্রলোক নোংরা জিনিসে হাত পড়ার মতো চমকানো ভাব নিয়ে কাপড়খানাকেও জানাল গলিয়ে ফেলে দেয়—বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে যায় সেটা।

এক নিমেষে ভয়ের বাঁধ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে—পাগলের মতো কলরব করে ওঠে মেয়েরা একসঙ্গে, অফিসারের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই।

সুন্দরী ঠক্‌ঠক্ করে গাড়ির মেঝেতে মাথা কুটে কাঁদে, অভিসম্পাত করে, মেয়েরাও কাঁদে আন্তরিক সহানুভূতির কান্না। ইঞ্জিনের তীব্র হুইসিলের শব্দ একটানা বেজে চলে, গতিবেগ কমে আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। কাঁদতে কাঁদতেই সুন্দরী মাথা তোলে, অফিসারদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিচ্ করে থুথু ফেলে খানিক জানলা দিয়ে।

গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নামে অফিসার দুজন, তারও আগে নেমেছে যাত্রীরা। চিৎকার, কান্না আর গোলমালের মধ্যে দু'জন অবাক হয়ে দেখে, সুন্দরীদের কামরাটার সামনেই ওদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকগুলো লোকের একটা দল।

ইঞ্জিনের তীব্র বাঁশির শব্দ ছাপিয়ে ওঠে সবকিছুকে, কাছাকাছি ক্ষেতে-মাঠে কাজে ব্যস্ত কিষাণরাও ছুটে আসে কাস্তে হাতে করে।

নোনা সাগরের কান্নায়

মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত

পুরীর সমুদ্রবেলা। সূর্য ক্রমশ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছে। সাগরে জোয়ার এসেছে। জল এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। তটভূমিতে নানাশ্রেণির পর্যটক, নানা মানুষের ভিড়। নানা বয়স, নানা আকৃতি, নানা বেশভূষা। অক্টোবর মাস। শরতের আকাশ জুড়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। সাদা মেঘের গায়ে পড়ন্ত বেলায় রাঙা আভা নানা ছটায় ব্যাপ্ত।

সঞ্জয় আজ হোটেল থেকে বেরিয়েছিল বেলা দুটোর সময়। হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল চক্রতীর্থে। সেখানে সোনার গৌরাঙ্গ দেখে ঝাউবনের ছায়ামাখা পথ ধরে অনেকক্ষণ হেঁটেছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে জেলেপাড়ায়। নুলিয়াদের আস্তানায়। শত সহস্র দারিদ্রলাঞ্ছিত পরিবেশ দেখে সঞ্জয়ের নিসর্গ প্রকৃতিকে বড়ো স্বার্থপর মনে হয়। এতটুকু সবুজের ছোঁয়া নেই কেন জেলে বস্তিতে?

ভাবনায় আছড়ে পড়ে গর্জন! না, সাগরের নয়, শমিতের চিৎকার। "জানো না? কে স্বার্থপর? কারা স্বার্থপর?"

ঝাউ গাছের শাখায় পাতায় ওঠে প্রতিধ্বনির কোরাস 'কারা? কারা? কারা'? সঞ্জয়ের বুকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে জেলে বস্তি ছাড়িয়ে এবার দক্ষিণ দিক বরাবর চলতে থাকে। এক সময় স্বর্গদ্বারে পৌঁছায়। সামনেই শ্মশান। বালুর ওপর একটা চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। জ্বলন্ত চিতার থেকে মাত্র তের চৌদ্দ গজ দূরে সেই যুবকটি দুই হাঁটু ভাঁজ করে কেমন এক হতাশ ভঙ্গীতে বসে আছে। যুবকটির বয়স আঠাশ হবে। দামি পোশাক, ধবধবে ফর্সা রং, দোহারা লম্বা গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ মাথাভর্তি কালো মিশমিশে চুল! এককথায় অতি সুদর্শন যুবক বলা যায়। গত দু দিন ধরেই যুবকটিকে সঞ্জয় দেখছে। সঞ্জয়ের মতোই যুবকটি একা একা ঘোরে, বহু রাত পর্যন্ত সমুদ্রের পাড়ে থাকে। সঞ্জয় কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। যুবকটি কী কোনো নিদারুণ আঘাতে জর্জরিত হয়ে এ স্থানে এসেছে? সে কী সঞ্জয়ের মতো কোনো প্রিয়জনকে হারিয়েছে?

যুবকটি এক সময় উঠে দাঁড়াল। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পা ফেলতে ফেলতে এগোয়। সঞ্জয়ও চলতে থাকে যুবকটির সমান্তরাল পথ ধরে। তবে কিছুটা ব্যবধান রেখে। এক সময় ওরা হরনাথ আশ্রমের কাছে পৌঁছয়। সেখানে পুরনো আমলের কিছু ঘরবাড়ি। গাছপালা খুবই কম। মানুষের ভিড়ও নেই। শুধু বালু আর বালু। আর সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত উথাল পাথাল সাগর।

সন্ধ্যা নামছে। যুবকটি তটভূমির ঢাল ধরে নামতে থাকে। প্রায় জলের কাছাকাছি চলে যায়। হঠাৎ বিরাট একটা ঢেউ উন্মত্তের মতো ছুটে আসতে যুবকটি দ্রুত পায়ে পিছু হটতে গেলে সঞ্জয়ের সঙ্গে লাগে ধাক্কা।

এই হল পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাত। সেই সূত্র ধরে দুজনে পাশাপাশি চলতে শুরু করে। কথা বলতে বলতে উল্টোদিকে এগোয়। স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে আরও কিছুটা উত্তরে এগিয়ে ওরা সাউথ ইস্টার্ণ হোটেলের সামনে উপস্থিত হয়। জায়গাটা ভারী চমৎকার। ঝাউবনকে পেছনে রেখে ওরা দুজনে বালিয়াড়ির উপর বসে। কাছাকাছিই বসে। চারদিক ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। আকাশে শুক্ল পক্ষের বাঁকা চাঁদ। একটি দুটি করে অনেক তারা ফুটে উঠলো। এতক্ষণে যুবকটি তার পরিচয় দিল, আমার নাম রবীন রায়। চব্বিশ পরগনার কুসুমপুরে আমাদের আদি বাড়ি। বর্তমান নিবাস বারাসাত— কী করেন? চাকরি?

— না না চাকরি বাকরি করি না। বাবার হোটেলেই আছি। দিব্যি খাই দাই, আড্ডা দেই, সিনেমা থিয়েটার দেখি। আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি দেশভ্রমণে। বেকার? অথচ দিব্যি আছেন?

ছোটোখাটো একটা বিজনেস শুরু করেছি অবশ্য! তাতে এখনও বিশেষ আয় নেই।

লেখাপড়া?

এম.কম. পাশ করেছি।

সঞ্জয় বুঝে নিল যুবকটি অতি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং সংসারের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

দু দিনেই সঞ্জয় ও রবীন সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। সঞ্জয় চেয়েছিল নিঃসঙ্গতা। ভেবেছিল নিঃসঙ্গতা তাকে শান্ত করবে, শান্তি দেবে, প্রতি মুহূর্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই তো মানুষ। মানুষ যেখানে সেখানে একাকিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। সঞ্জয় কিন্তু মনে মনে অখুশি নয়। তার একাকিত্ব তাকে বিন্দুমাত্র স্বস্তি দেয়নি। শান্তি দেয়নি। মানুষের সংস্পর্শে আসার তাগাদাও অনুভব করছে! তাই যদি না অনুভব করবে তো রবীনের পিছু পিছু হরনাথ আশ্রম পর্যন্ত যাবেই বা কেন?

ওরা দুজন উঠেছে দুই হোটেলে। একজন বীচ হোটেলে। অন্যজন রেণুকা হোটেলে। কাছাকাছি দুটি হোটেল। সাগরের কাছেই। রবীন এর আগে একবার পুরী এসেছিল। সঞ্জয় আসেনি। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জয়ের চেয়ে রবীনেব বেশি। সে দিল্লি, আগ্রা, রাজস্থান, মুসৌরি, বেনারস, দার্জিলিং, দীঘা— এসব স্থান দেখেছে। সঞ্জয় কলকাতা ছেড়ে এর আগে একবার মাত্র গেছে। তাও বেশি দূর নয়। বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। রবীনের মুখে ওর ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনতে সঞ্জয়ের খুব ভালো লাগছে। রবীন সুন্দর করে বলতেও পারে। ওরা প্ল্যান করল দুজনে একসঙ্গে ভুবনেশ্বর যাবে এবং সেই সঙ্গে খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখে আসবে।

পরদিন। বাসে ওরা উঠলো। তখন সকাল সাতটা। সঙ্গে নিল থার্মোফ্লাস্কে চা, কেরিয়ারে পাউরুটি, জেলি, কলা, ডিম সেদ্ধ বিস্কুট এবং সন্দেশ। বাস চলেছে পুরী শহর অতিক্রম করে। ঘণ্টা দেড়েক পর পৌঁছলো ভুবনেশ্বর! ভুবনেশ্বরকে মন্দির শহর বলা যায়। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখা হল। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের গায়ে অতুলনীয় স্থাপত্য শিল্প কাজ দেখলো, কিছুক্ষণ সেখানে বসল। বাজারটা ঘুরে দেখলো। দু'বার চা টা সহযোগে খেয়ে ওরা যখন বাসে উঠলো তখন বেলা দেড়টা।

আবার বাস। বাস এবার খণ্ডগিরি উদয়গিরির দিকে। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র পাঁচ ছয় মাইল দূরত্বে এই দুটি পাহাড় ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাশাপাশি কাছাকাছি দুই পাহাড়। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পীচ ঢালা সড়ক। দুই পাহাড় যেন দুই যমজ বোন। ইতিহাসের অসংখ্য অক্ষর অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমানকে হাতছানি দিচ্ছে। উড়িষ্যার রাজা খারবেল। তার রানি, অমাত্যদের নিয়ে কতবার এই পাহাড়ি স্থানের সোপানগুলি ধরে উঠে গেছে শিখরের মন্দিরে। মহাবীরের মূর্তির সামনে অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সমৃদ্ধির, নিরাপত্তার ও শান্তির।

রবীন ও সঞ্জয় ইতিহাসের ভাবনা নিয়েই বুঝি মৌন হয়ে যায়। তারা শিলাময় সোপান ধরে এগোয়। খণ্ডগিরির গুহা চৈত্যের ভাঙাচোরা ক্ষুদ্র কুঠুরিগুলির দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে। কোনো সুদূর অতীতে ওই কুঠুরিগুলিতে জৈন শ্রমণেরা ভিক্ষুরা কঠোর সাধনায় রত থাকতো। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। রবীন বলে "কুঠুরীগুলির ছাদ কী নীচু। স্তব্ধ অতীত যদি কথা কয়ে ওঠে তো শোনা যাবে কত যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস।"

সঞ্জয় প্রশ্ন করে, যন্ত্রণা বলছেন কেন? সাধনা কী যন্ত্রণা? অবশ্যই আত্মপীড়নের নামান্তর। আজ থেকে দু হাজারের বছরেরও বেশি আগে এ স্থান ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। হিংস্র জন্তুরা থাকতো, চলে বেড়াতো বিষাক্ত ভয়ংকর সব সাপ। এই পাহাড় ছিল দুর্ভেদ্য, দুর্গম, বসতির থেকে বিচ্ছিন্ন। কত তাজা তরুণ ঘর সংসার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইখানে আত্মপীড়নের যন্ত্রণাকে মেনে নিয়েছে। কত তরুণ হিংস্র জন্তুর হাতে মরেছে। সাপের ছোবলে শেষ হয়েছে কে জানে? ওরা সুন্দর হ'য়ে ফুটতে পারতো। কিন্তু ধ্যানের জাঁতাকলে অকালে বুড়িয়ে যেতে হয়েছে।

— আপনি কী নাস্তিক? ধর্ম হ'ল জীবনের পাথেয়। সাধনার পথ হ'ল শ্রেষ্ঠতম পথ। ধ্যান জাঁতাকল হবে কেন?

একটি কুঁড়িকে যদি বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কোনো পাথরের ফোঁকরে ঢুকিয়ে দাও, কুঁড়িটি কয়েক ঘন্টা ধ্যানস্থ থাকলে সেখানে দেখবে সে আর পাপড়ি মেলবে না শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

কুঁড়ি মানুষ নয়।

— কুঁড়ি নিষ্প্রাণও ছিল না। কুঁড়ি প্রাণসত্তা পাপড়ি মেলে শতশত কুঁড়ির সান্নিধ্যেই, বনবীথির পরিবেশেই, উদ্যানের পরিমণ্ডলেই।

ওরা দুজন উদয়গিরির মাথায় উঠতে থাকে। দুটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে। চমৎকার বসার জায়গা। দু'জনে দুটি পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো। সঞ্জয় বলে, আর আপনি নয়, তুমি। কী বল?

— নিশ্চয়ই। আমরা সমাজের জীব। আমরা বন্ধু চাই, জন চাই, মানুষ চাই, 'ধ্যান'-এর প্রতি আকর্ষণ আমাদের নেই। কী বল?

সঞ্জয় কিছু বলে না। উভয়েই কিছুক্ষণ চারিদিকের শোভা অনুভব করতে মৌন থাকে। দূরের দিগন্তবলয় ইতস্তত পাহাড় সারির ভঙ্গীতে লীন। ঝোপ, ঝাড়, গাছ, গাছালি, মাঠ সড়ক, মন্দির। ঠাণ্ডা বাতাস, আকাশ ভরা সাদা মেঘ। রবীন হঠাৎ বলে ওঠে, এখানে বসে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবতে মন চায় না। জীবনের গান গাইতে ইচ্ছে হয়।

মৃত্যু? এ শব্দ কেন? সঞ্জয়ের হৃৎপিন্ডে যেন শব্দটা বিঁধে গেল তিক্ষ্ণ ফলার মতো। সে তবু সহজ হতে চায়। বলে, আলালের ঘরের দুলাল তুমি, তোমার জন্যই তো জীবন।

হা হা করে গলা ফাটিয়ে হাসে রবীন। সঞ্জয় সেই মুহূর্তে ভাবছে রবীন বড়ো অদ্ভুত। সে একবারও সঞ্জয়ের জীবিকা শিক্ষাগত পরিচয় ঘরবাড়ির কথা জানতে চায়নি। সে কী সঞ্জয়ের শীর্ণ আকৃতি, সাধারণ মানের বেশভূষা দেখে মনে মনে সঞ্জয়কে করুণা করছে? সঞ্জয় একটু ক্ষোভের ফলেই বলে, হেসো না। তুমি তো আর আমার কথা জানো না!

না জানার কী আছে। নিশ্চয়ই শ ছয়েক বেতনের একটি চাকরি করো। সংসারে দায়দায়িত্ব আছে। মাইনেতে কুলোয় না। ধার দেনা মাঝে মাঝে করতে হয়। বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে রোজ কর্মস্থলে যাও সেখান থেকে ঘরে ফেরো। যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবার আশঙ্কায় প্রাণপণে হাতল ধরে থাকো। প্রাণে যে বেঁচে আছ এটাই তোমার কাছে আশ্চর্যের, তাই না?

সঞ্জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রবীনের দিকে। রবীন বলে, কী হল? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আমি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে হতে পারি। তাও কিন্তু অভাব, অনটনের যন্ত্রণা বুঝি!

না রবীন, তুমি আমার যন্ত্রণার কথা জানো না।

তাও আন্দাজ করতে পারি।

মানে? সত্যি বলছ? বল তো কী আমার যন্ত্রণা?

হয় প্রেমে আঘাত পেয়েছে বা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় অস্থির আছ।

হ্যাঁ রবীন। আমি আমার ছোটো ভাই শমিতকে হারিয়েছি। সে আমার চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোটো ছিল। একই কারখানায় আমরা কাজ করি। দুজনই ওয়ার্কার। আমার বাড়িতে আছেন বিধবা মা দু টি অবিবাহিত বোন ও একটি নাবালক ছোটো ভাই।

তোমার ভাই শমিতের কী স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে?

এ প্রশ্ন কেন করছ?

একজন ইয়াং কর্মরত ছেলে সাধারণত চট করে মারা যায় না। হয় অ্যাক্সিডেন্ট নয়ত অস্বাভাবিক কোনো কারণে!

হ্যাঁ রবীন। স্বাভাবিক মৃত্যু তার হয়নি। তাকে খুন করা হয়। রাতের অন্ধকারে একটা গলিতে তার বুকে ছোরা বসিয়ে খুনী গা ঢাকা দেয়।

শুনে রবীনের মুখের প্রসন্নতা মুহূর্তে উবে যায়। সে বোবা দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে থাকে। সঞ্জয় তা লক্ষ্য করে না। সে বলে, চলে শমিক কথাবার্তায় ভারী চৌখস ছিল, বুদ্ধিমান স্মার্ট ছেলে। সদাই মুখে হাসিটি লেগে থাকতো। শত কষ্টেও ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যেতে দেখিনি। কারখানার ওয়ার্কাররা ওকে খুব ভালবাসতো। শমিত ছিল শ্রমিকদের নেতা, ইউনিয়নের সেক্রেটারি। যদিও কারখানার ম্যানেজার আর মালিকের সে ছিল চক্ষুশূল। দুবার তাকে ছাঁটাই করা হয়। দুবারই প্রচন্ড আন্দোলনে প্রতিবাদ জানায় ওয়ার্কাররা। মালিক পক্ষ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শমিত যথারীতি কাজে যোগ দিয়েছিল।

রবীন যেন আচমকাই প্রশ্ন হানে, তুমি কখনও ছাঁটাই হওনি? মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায় সঞ্জয়ের। সে বিমর্ষ দৃষ্টিতে বলে যায়, না রবীন। হইনি। আমি আর শমিত একই মায়ের গর্ভে জন্মেছি। অথচ স্বভাবে ছিলাম দু রকম। আমি চাই নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাতে। মিছিল, শ্লোগান, সভা, ধর্মঘট আমি এড়িয়ে চলি। চলতে চাই। মালিক চটবে এমন কাজ করা থেকে আমি বিরত থাকি। শমিত ছিল অতি দুঃসাহসী, ওয়ার্কারদের দাবি পাওয়া নিয়ে সে মালিকের সঙ্গে বার বার সংঘাতে এসেছে, অনেক ক্ষেত্রেই মালিককে নতি স্বীকার করতে বাধ্যও করেছে যদিও মালিকের দালাল বাবুলাল যে কতটা জঘন্য শমিত তা বুঝতে পারেনি। বুঝলে মরত না।

বাবুলাল কে? সে কী কারখানায় কাজ করে?

হ্যাঁ, সেও একজন ওয়ার্কার। তবে কোনো কাজ করে না। তার কাজ হ'ল কারখানার ম্যানেজারকে খোসামোদ করা তার কাছে সব কিছু লাগানো আর শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা। সোজা কথায় সে একটা সাংঘাতিক লোক। হেন কাজ নেই সে করতে পারে না।

রবীন বলে বুঝেছি, বাবুলালই তোমার ভাইকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়েছে।

কী জানি। শুনেছি শমিত যেদিন খুন হয় তার আগের দিন বাবুলাল নাকি তার দেশ মুঙ্গেরে চলে গিয়েছিল। এ কথা বলেছে বাবুলালের জ্ঞাতি ভাই মগনলাল। মগনলালও আমাদের কারখানায় কাজ করে।

মগনলাল হয়তো মিথ্যে কথা বলেছে।

না, সে মিথ্যে কথা বলার লোক নয়। বাবুলালকে সে দু চোখে দেখতে পারে না। শমিতকে সে খুব ভালোবাসতো। তবে!

তবে কী?

মগনলাল একথাও বলেছে খুন বাবুলাল নিজের হাতে করেনি। তবে খুনের পেছনে বাবুলালের হাত সম্ভবত আছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একেবারে নীরব, নিষ্ক্রিয়।

বলে সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রবীন তা লক্ষ্য করে বলে, এদেশে চাষামজুরের প্রাণের কোনো দাম নেই। এমনি খুন জখম তো রোজই হচ্ছে। কিন্তু এমন হত্যাকান্ডও হয় যা ভাবতে পারবে না।

কী রকম? ব্যাকুল হ'য়ে জানতে চায় সঞ্জয়।

আমারই বয়সী এক ছেলে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। নাম তার সুনন্দ যে তার মাকে খুন করেছে।

মাকে? নিজের মাকে?

হ্যাঁ সঞ্জয়। নিজের গর্ভধারণী মাকে। সে তার মার কফির কাপে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

তারপর?

তারপর?

তারপর আবার কী? সে এখন ফেরার।

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছিল। না হলে কেউ নিজের মাকে খুন করে?

না সঞ্জয়। এ পৃথিবীর বেশির ভাগ খুনিই মাথা ঠান্ডা করে খুন করে। ভাই ভাইকে খুন করে, ছেলে বাবাকে খুন করে, স্বামী স্ত্রীকে খুন করে। এসব যদি ঘটতে পারে তো মাকে ছেলে খুন করবে এতে তেমন অবাক হবার কিছু নেই।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। রবীনের কথাগুলি তার ঠিক যেন পছন্দ হয়নি।

রবীন সিগারেট কেস খুলে সিগারেট বের করে। একটা সিগারেট বারিয়ে দেয় সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় নেয়। আর একটি সিগারেট বের করে রবীন লাইটারের পলতে জ্বালায়। তারপর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রবীন তার কব্জির ঘড়িতে তাকিয়ে বলে, পৌনে তিনটে বাজে। ঢের সময় হাতে আছে। শুনবে সুনন্দের কথা?

নিস্পৃহ ভঙ্গীতে সঞ্জয় বলে, বল। রবীন বলতে শুরু করে।

—দু ভাই বোন ওরা। সুনন্দ, সুস্মিতা। সুনন্দ সুস্মিতার চেয়ে নয় বছরের বড়ো। ওদের বাবার নাম দিনবন্ধু সান্যাল। মার নাম ধীরা সান্যাল বারাসাতের চাঁপাডালি বাজারের কাছে ওদের বাড়ি ছিল। দোতলা সুন্দর পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান লোহার গেট। সুনন্দের বাবা তার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে যখন ওই বাড়িটা কেনেন তখন সুনন্দর বয়স মাত্র পাঁচ বছর আর সুস্মিতা তখন জন্মায়ই নি। কাছেই আমাদের বাড়ি। সুনন্দ ও আমি একই বয়সী। একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়ি। আমার মায়ের সঙ্গে ধীরা মাসির খুব বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় দু'জনে একসঙ্গে সিনেমা যেতেন। মার্কেটিং করতেন। ধীরা মাসিমা দেখতে ছিল যেন দুর্গাপ্রতিমা।

সুস্মিতার জন্ম হল কলকাতার এক নাম করা নার্সিংহোমে। যেদিন সুস্মিতাকে নিয়ে সুনন্দের মা নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরলেন সেদিন ওদের বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসেছিল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবে ঘর ভর্তি। কত খাবার কত মিষ্টি আর কাপে কাপে কেবল চা। নবজাতক শিশুকে ঢুকলাম মায়ের সঙ্গে। শিশুতো নয় যেন আধফোঁটা পদ্মের কুড়ি। মোমের মতো মসৃণ শরীর, আপেলের মতো লালচে গাল, ধবধবে ফর্সা রং।

সুস্মিতার বয়স তিন, আমার বয়স বারো। সুস্মিতা হবার পর থেকেই ধীরা মাসি ক্রমে কেন যেন বদলে যান। আমার মার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে ধরল ফাটল। একদিন সুনন্দ আমায় স্কুলে বলে, হ্যাঁরে কেন মাসিমা কেন আগের মতো আর আমাদের বাড়ি আসেন না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ধীরা মাসিও তো আমাদের বাড়ি যান না। কেন বলতো?

সুনন্দ গম্ভীর হ'য়ে বলে, কী জানি কেন? মা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া করেন।

এই কথাবার্তার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সুনন্দ আমাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে বলে, আমরা এখান দিয়ে চলে যাচ্ছি রবীন।

—কোথায়?

—শিলিগুড়িতে। বাবার প্রমোশন হয়েছে। মাইনে অনেক বেশি পাবেন।

সুনন্দের বাবা দীনবন্ধু সান্যাল ছিলেন আপার ডিভিশন ক্লার্ক। পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ায় তাদের দিন স্বচ্ছলতার মধ্যেই কাটছিল। তিনি প্রমোশন পেয়ে এক্সাইড ডিপার্টমেন্টের অফিসার হলেন। খবরটা শুনে মা, বাবা গেলেন ওদের বাড়ি সঙ্গে আমিও গেলাম। ধীরা মাসি মাকে দেখে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছলতা নিয়ে বললেন, কত দিন পর তুমি এলে আরতি। একদম সময় পাই না, যেতে পারি না ভাই।

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, রবীন ছেড়ে থাকতে সোনার খুব কষ্ট হবে। আমারও তোমাদের ছেড়ে যেতে একদম মন চাইছে না।

আমার মা বলেন এ বাড়ি নিজেদের বাড়ি। চিরদিনের জন্য তো যাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় নিশ্চয়ই আসছেন। দেখা সাক্ষাৎ হবেই। চাকরিতে প্রমোশন হল। একী কম আনন্দের।

ধীরা মাসির চোখ খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, হ্যাঁ তা যা বলেছে। সোনার বাবার মাইনে শুধু বাড়লো না, চাকরিতে মান মর্যাদাও বাড়লো। সংসারে অর্থ, সম্মান দুয়েরই প্রয়োজন। সুস্মিতা বড়ো হবে। তাকে বিয়ে দিতে হবে, সোনাকে ভালো করে মানুষ করতে হবে। কত স্বপ্ন আমার।

রবীন থামে। সঞ্জয় বলে, থামলে যে। দাঁড়াও। কিছু খেয়ে নিই। চা বের করো, জেলি মাখা পাউরুটি থাকলে দাও। খেয়ে শুরু করা যাবে। চা খাবার বের হ'ল। খাওয়া পর্ব সমাধা হ'ল। এবার সঞ্জয় সিগারেট দেয় রবীনকে। রবীন লাইটার জ্বালিয়ে দুজনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলে 'থ্যাঙ্কয়ু'।

—ওরা চলে গেল শিলিগুড়ি। চার বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওদের বাড়ির নীচতলায় একটি ঘরে, এক দুরাত্মীয়কে থাকতে দিয়েছিল বাড়িটা দেখাশোনার জন্য। সে দুরাত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ওঁরা রাখতেন পত্রের মাধ্যমে।

তখন আমার ষোলো বছর বয়েস; সুনন্দরা শিলিগুড়ি থেকে এলো। আমি সেবার হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছি। সুনন্দও শুনলাম পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। আমরা ওদের বাড়ি গেলাম। দেখলাম সুনন্দ আরও সুনন্দর হয়েছে, স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। আর সুস্মিতা যেন এক ছোট্ট পরী। মাতাভর্তি কালো চুলের ঢেউ। ভাসা ভাসা গভীর নীল চোখ, বাঁশির মতো পাতলা নাক, ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু, মুক্তোর মতো দাঁত। হাসলে মনে হয় ভুঁইয়ে পড়া মুঠো মুঠো শিউলী যেন।

আমাদের দেখে ধীরা মাসি আর দীনবন্ধু মেসো খুশির ভাব দেখালেন না। দুজনই কেমন গম্ভীর। আমার বাবা প্রশ্ন করেন, "আবার বদলি হলেন নাকি?" সুনন্দের বাবা কয়েক সেকেন্ড শূন্য দৃষ্টিতে শিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললেন,বদলি কবে হব জানি না। এখন ছুটিতে আছি। তবে বদলির অর্ডার আসবেই।" ধীরা মাসি এক সময় সহজ হলেন আর মাকে অনেক কথা বলেও ফেললেন, বেশ কেটেছে আমাদের শিলিগুড়িতে। অঢেল জিনিস। খাবার দাবার দুধ, ঘি, আনাজপাতি—কোনো কিছুর অভাব বোধ করিনি। ভালোবেসে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেছে সেসব। মানুষদের দেয়ার মন খুব। জিনিসপত্র বাসনকোসনও কম করিনি। সব আনতে পারিনি। শিলিগুড়িতে এক ভদ্রলোকের বাড়ি অনেক কিছুই রেখে এসেছি। গয়নাও গড়িয়েছি। সুস্মিতার কথা ভেবে। এখন ভাবনা; কোথায় আবার পাঠায়।

সেদিন ছিল বারোই নভেম্বর। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। একটা সোরগোলে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মা বাবা পায়ে চটি গলিয়ে বেরুচ্ছেন। কী হল? বাবা মার পেছন পেছন আমিও গেলাম। গিয়ে দেখলাম সুনন্দের বাবার ডেডবডি ওদের বাড়ির একতলার বারান্দায় একটা তক্তাপোষের ওপর শোয়ানো। শুনলাম গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ ভিড় করেছে। সুনন্দের বাবার চোখ দুটি বোজা। যেন ঘুমোচ্ছেন। এতটুকু বিকৃতি নেই মুখে। সুনন্দ কাকে যেন বলছিল। তখন রাত তিনটে বাজে। মা আমার ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে বললো। সোনা তোর বাপীকে দেখছি না। শুনে ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এলাম। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করেও যখন বাপীকে দেখা গেল না তখন একতলার বারান্দায় আমি এসে দেখি বারান্দার সিলিংয়ের হুকে বাপীর দেহ ঝুলছে। গলায় মার একখানা শাড়ি ফাঁসে দেওয়া।"

পোষ্টমর্টেমে পাঠানোর আগে আমার মা ধীরা মাসির ঘরে গেল। ধীরা মাসি তখন খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। আমার মা বললেন, চল ধীরা, নীচে চল! শেষ দেখা দেখবে না একবার! শেষ বারের মতো বিদায় জানাবে না!

ধীরা মাসি চীৎকার করে উঠলেন, না না, কিছুতেই যাবো না। ও অমানুষ, ও শয়তান। ওর কাছে কিছুতেই যাব না।

আমার মা বললেন, ছিঃ স্বামীকে ওভাবে গাল দিতে নেই। নিশ্চয়ই সুস্থ মস্তিষ্কে এ কাজ তিনি করেননি।

ধীরা মাসি ক্ষেপে যায়, না, মাথার ঠিক ছিল না। সব ঠিক ছিল জানেন না ও কত বড়ো পাজি। শিলিগুড়ি থাকতেও করতে গিয়েছিল। বিষ খেয়েছিল। তিনদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি। সে যাত্রায় বাঁচলো ভাবিনি আবার শয়তানি মাথায় চাপবে।

পাড়ার এক বয়স্কা বিধবা বললেন, একথা আগে কেন জানালে না তাহলে পাঁচজন ওকে বোঝাতো! মাথা খারাপ না হলে কী এমন ফুলের মতো ছেলেমেয়ে থাকতে বার বার মরতে যায়। সে তো ভালো চাকরি করত; ভালো উপার্জন করত। তাহলে?

ধীরা মাসি শুকনো গলায় বললে, আমায় জেরা করছেন কেন? ওর মনের কথা আমি কী করে জানবো? কোনোদিন মানুষটা আমায় সুখ দিয়েছে? সবাই ভাবে এমন সাহেবের মতো চেহারা, এমন শিক্ষাদীক্ষা, এমন ভালো চাকরি, তার বউয়ের কপালে বুঝি সুখ ঝরে পড়ছে। কিন্তু সব মিথ্যা! বিয়ের পর থেকেই আমি জ্বলছি। ও আমাকে কম অশান্তি দিয়েছে! শেষ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ করে যাবে কে ভেবেছিল? আমি ওকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না। কোনোদিন না!

রবীন থামে। বেলা পড়ে আসছে। সূর্য এখন পশ্চিমে হেলছে। আকাশে শরতের মেঘ কেমন যেন ঘনীভূত হয়ে আসছে। সঞ্জয় স্তব্ধ। রবীন জানতে চায়, ফ্লাস্কে চা আছে?

—আছে। সামান্য! এক কাপের মতো।

—বের করো। ভাগ করে খাবো। আর চানাচুর।

—বেশ।

কাপে চা ঢালতে সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে। সুনন্দের মার তার স্বামীর প্রতি এত রোষ কেন?

—কারণ নিশ্চয়ই আছে! সবটা না শোনা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকো। ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হবে।

আবার রবীন বলতে শুরু করে।

দিন কাটে, রাত কাটে। সুনন্দ কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমিও হয়েছি। একই কলেজে একই সাবজেক্টে অর্থাৎ কমার্সে। একদিন কলেজ থেকে ফিরছি। সুনন্দ বলে, রবীন চল কোথাও গিয়ে একটু গল্প করি। গেলাম ট্রামে চেপে গড়ের মাঠে। বসলাম আউটরাম ঘাটের পাশে গঙ্গার পাড়ে।

সুনন্দ বলল, জানিস, আমরা বারাসাত ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, সে কী? নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি কেন?

সুনন্দ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, মার বাড়িতে মন টিকছে না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাইছেন, বাপীর বন্ধু ভূদেব গড়াই ভবানীপুরে একটি ফ্ল্যাটের সন্ধানও দিয়েছেন।

আমি না বলে পারি না, এ বাড়িটার কী হবে? ফাঁকা পড়ে থাকবে? সুনন্দ খুব নীচু গলায় বলে। কাউকে যেন বলিস্ না রবীন শুধু তোকেই বলছি। এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে প্রমোশন পাবার পর থেকে বাপীর আয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মাইনের একশো গুণ হ'ত উপরি আয়। এদেশে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার লোকের সংখ্যা তো বড়ো কম নয়। তার ওপর নর্থ বেঙ্গল হ'ল চোরাই চালানের নামকরা ঘাঁটি। বাপী দুহাতে টাকা আয় করতে থাকেন, শুধু কী টাকা? দামি দামি সার্টের প্যান্টর পীস্, ঘি, মাখন, মাছ, কেক, মিষ্টি, ফল এসবও আসতো কত বিনাপয়সাতে। মাতো খুশিতে সদাই উচ্ছল। বাপীকে প্রায়ই বলতেন, "এতদিনে আমার সংসারে লক্ষ্মীব কৃপা পাচ্ছি।' বাপী কিন্তু মার কথায় গম্ভীর হয়ে যেতেন। কখনও কখনও কিন্তু বলতেন, মা লক্ষ্মীর কৃপা কী করে পাচ্ছি তা আমিই জানি। তোমার মুখে আমি হাসি ফোটাতেই এসব মেনে নিয়েছি ধীরা। মাঝে মাঝে, মনে হয় যখন কেরানি ছিলাম তখনই ভালো ছিলাম। শান্তিতে ছিলাম।"

"বাপীর এ ধরনের কথায় মা চটে যেতেন। বলতেন বোকার মতো কথা ব'ল না। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই বেশি টাকা আয় করার চেষ্টা করে তুমিইবা করবে না কেন! তুমি-তো আর টাকার জন্য লোকের বাড়ি সিঁধ কাটছ না চুড়ি ডাকাতি করছ না কাউকে খুনজখম করেও পাকা নিচ্ছ না। যারা তোমার হাত ভরে দিচ্ছে তাদেরও স্বার্থরক্ষা হচ্ছে। এই প্রমোশন হল বলেই না পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্স পলিসি করতে পেরেছো।" মায়ের প্রখর দাপটের কাছে বাপী যেন কেমন চুপসে যান। মার মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা ও লোভ আমাকে যন্ত্রণা দিত। বাপীকে দেখে কষ্ট হত! মনে হ'ত শিলিগুড়িতে এসে বাবা তো বুড়িয়ে যাচ্ছেন। সেই প্রাণখোলা হাসি নেই। গলা ছেড়ে হাঁকডাক নেই, মজার কথা বলা নেই!

সুনন্দ আরও অনেক কথা বলে। ওর কথা থেকে বুঝলাম শিলিগুড়িতে মোটারকম টাকা ঘুষ নেবার অভিযোগে সুনন্দর বাবা অভিযুক্ত হন। আই বি ডিপার্টমেন্টের নজরে পড়ে যাওয়ায় এবং ওই ব্যাপারে থানাপুলিশ হবার আশঙ্কায় সুনন্দের বাবা মনের ভারসাম্য না রাখতে পেরে সেখানে একবার অত্যধিক পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সে অভিযোগ থেকে তিনি একে ওকে ঘুষ দিয়ে রক্ষা পান। কিন্তু শিলিগুড়িতে আর থাকা নিরাপদ না মনে করে তিন মাসের মেডিক্যাল লিভ নিয়ে বারাসাত চলে আসেন। তারপরের কথা তো তোমাকে বলেছিই।

সুনন্দ ওর বাবার আলমারি থেকে একটা ডায়রি পায়। ডায়রিটিতে ওর বাবা অনেক কথা লিখেছেন। ডায়রির কথা ধীরা মাসি জানে না। ডায়রির এক স্থানে নাকি লিখেছেন, ধীরাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। কিন্তু সে বিয়ের পর থেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমার অপরাধ আমি একটু বেশি রকম সুদর্শন। কোনো অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলেই ওরেগে যায়। ছেলেমেয়ে হয়েও ওর সন্দেহ ঘোচেনি।

আর এক জায়গায় লিখেছেন, ধীরা বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিক. স্বার্থপর। কিছুতেই ওর সন্তুষ্টি নেই। ভালো শাড়ি, ভালো আসবাব, ভালো খাদ্য, ভালো বাসন-কোসন, ভালো বাড়ি—ভালোর তৃষ্ণা ওর মিটবে না কোনোদিনই। ধীরাকে খুশি রাখতে গিয়ে আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমি ওর বিরোধিতা করতেও পারছি না। কেমন বশ হয়ে গেছি। অথচ ভেতরে ভেতরে বিবেকের দংশন চলছে দিবারাত্র। মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথাও মনে হয়।

আমি সুনন্দকে বলি, যিনি চলে গেছেন, তাঁকে তো আর ফিরে পাবে না। মার কথা ভাবতেই হবে তোমাকে। তিনি যা করতে চান করুন, ছেলেমেয়ের মঙ্গল নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন।

এর দু দিন পরই সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর পেলাম ধীরা মাসি সুস্মিতা দুজনই বিষের ক্রিয়ায় অচৈতন্য হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটুও কালবিলম্ব না করে দুজনকেই হাসপাতালে পাঠানো হল। ঘটনা সম্পর্কে সুনন্দ বললো "মা টলছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন নেশা করেছেন জিজ্ঞাসা করি, কী হয়েছে তোমার? মা জড়ানো জড়ানো কণ্ঠে বললেন "ইঁদুরের বিষ খেয়েছি। সুস্মির দুধের গ্লাসে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়েছিলেন। সুস্মি যদি মরে যায়। সোনা আমাদের বাঁচা!" বলেই মা পড়ে যান, পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হন"।

সুস্মি খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হল। ধীরা মাসি চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সুস্মিতার ব্যাপারটা অগোচরে রাখা গেলেও ধীরা মাসি যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বিষয়টি পুলিশের খাতায় উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনন্দের এক প্রভাবশালী আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে ঘটনাটি চাপা দেওয়া গেল। হাসপাতাল থেকে ধীরা মাসি সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আমার মা জিজ্ঞাসা করেন, অমন পুলের মতো মেয়েটাকে বিষ খাইয়েছিলে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ধীরা মাসি চিৎকার করে ওঠেন, আমি? আমি বিষ খাইয়েছি সুস্মিকে। এত বড়ো মিথ্যে কথা কে বলেছে শুনি?

আমার মা শান্ত কণ্ঠে বলেন পুলিশকে বলা হয়নি ঠিকই। কিন্তু সুস্মিকে বিষ না দিলে সে অজ্ঞান হবে কেন? হাসপাতালেই বা তাকে ভর্তি করতে হ'ল কেন? তোমার ছেলে সোনা তো মিথ্যে কথা বলেনি।

সুনন্দ সামনেই ছিল। তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরা মাসি বলেন, শয়তান। ওই বাবরই তো ছেলে। শয়তানই তো হবি। মাকে বিপদে ফেলতে খুব শিখেছিস্ না? আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা।

সুনন্দের চোখ দুটি ব্যাথায় ভরে ওঠে। সে তার মার পিঠে হাত রেখে বলে, শান্ত হও মা। চল এ বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতেই চল। বাড়িতে অভিশাপ লেগেছে। আর একদিনও এ বাড়ি নয়।

সুনন্দরা বারাসতের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মাসখানেকের মধ্যে। বারাসতের বাড়িটা ভাড়াও দিয়ে দিল। তারপর বছর খানেক কলেজে এসেছে। কিন্তু সে আসাও ছিল অনিয়মিত। ও আমাকে বলত, না রবীন, আমার আর পড়াশুনা ভালো লাগছে না। চাকরির চেষ্টা করছি বাইরে। কলকাতায় থাকব না।

কলেজে আসা বন্ধ হল ওর। যোগাযোগও শেষ হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। ওদের কোনো খবরই আমরা জানতাম না। হঠাৎ একদিন বউবাজারে সুনন্দের সঙ্গে আমার দেখা। মুখ ভর্তি দাড়ি, কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। আমাকে দেখে ও জড়িয়ে ধরল রবীন তুই! কতদিন পর দেখা। কী খবর তোর।

বললাম, এম্ কম পাশ করে ছোটোখাটো ব্যাবসা শুরু করেছি। তুই? ও বলে, পড়াশুনা তো আর করলাম না। রাণীগঞ্জের কাছে এক কয়লার খনিতে কাজ পেয়েছিলাম। মাটির তলে নামতে হল। যদিও কয়লা কাটার কাজ ছিল না আমার। কত কয়লা উঠছে তার হিসেব রাখতাম। ভালোই দিন কাটছিল। কিন্তু সুস্মির কথা ভেবে চাকরিটা ছেড়ে কলকাতায় এক রংয়ের কারখানায় কাজে নিলাম। তাও কেরানীগিরির কাজ। শ ছয়েক পাই। কিন্তু জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে।

জিজ্ঞাসা করি, তোর মা? সুস্মিতা? তাদের খবর কী? "সুস্মি? সে তো নেই। মাসখানেক আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।" আমি আঁতকে উঠি, কী বলছিস। পরীর মতো সুস্মি আত্মহত্যা করেছে! কত বয়স হয়েছিল? সতেরো? আঠারো?

সুনন্দের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়তে থাকে। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে এক সময় বলে চল রবীন, পার্কে গিয়ে বসি।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসলাম। সুনন্দ বলতে শুরু করে, রবীন, কখনও শুনেছিস মা মেয়েকে হিংসে করে। হ্যাঁ ভাই, আমার মা সুস্মিকে হিংসে করতো। সুস্মি যত বড়ো হ'তে থাকে তত তার রূপ বাড়তে দেখে মা যেন জ্বলতেন। কোথাও সুস্মিকে বেরুতে দিতেন না। সুস্মিকে একটু সাজতে গুজতে দেখলে বকতেন। বলতেন, মেয়েছেলের বেশি সাজ ভালো নয়, মন্দ হয়ে যায়। মার কথায় সুস্মি কষ্ট পেতো কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করত না। বড়ো শান্ত ছিল সুস্মি। এমন শান্ত মেয়ে ভালোবেসে ফেলল ওর বান্ধবী সবিতা মিত্রের দাদা অঞ্জন মিত্রকে। অঞ্জন দেখতে ভালো কথাবার্তায় অতি স্মার্ট বি.এস, সি পাশ ব্যাঙ্কে কাজ করে। দোষের মধ্যে একটু বয়স বেশি, আমাদের চেয়েও বছর দুই তিন বড়ো হবে। চেহারা দেখে কিন্তু বয়স বোঝার উপায় নেই। ব্যাপারটা জানার পর মা সুস্মিকে বললেন,বেশতো ছেলেটিকে এবাড়িতে একদিন আসতে বল্। আলাপ করি।

এর কদিন পরই সুস্মির সঙ্গে এল অঞ্জন। দামি পোষাকে নিজেকে আবৃত করে। কথাবার্তায় তুখোড়। আমার কেন যেন মনে হ'য়েছিল এত কথা বলে যে, তার সঙ্গে সুস্মির মতো শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েকে কী মানাবে?

মা এরপর ঘন ঘন অঞ্জনকে নিমন্ত্রণ জানাতে থাকে। অঞ্জনকে মা-ই চা খাবার সাজিয়ে আপ্যায়ন করেন। ড্রইংরুমে বসে বসে গল্প করেন। সুস্মিকে কখনও অঞ্জনের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে কথা বলার সুযোগ মা দেন না। সুস্মি যদিও বসে থাকে। কিন্তু সে প্রায় নির্বাক! অঞ্জন কিন্তু এই ব্যবস্থাটা মেনে নিল। সে মার ভক্ত হয়ে উঠল। মা প্রায়ই এটা সেটা উপহার অঞ্জনকে দিতে শুরু করেন আর অঞ্জন সেসব পেয়ে মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে!

মার বয়স বোঝা যেত না। দেখতে বরাবরই সুন্দরী। বৈধব্যের সাজপোষাক নিয়ে মার আদৌ কোনো সংস্কার ছিল না। লাল রং বাদে সব রংয়েরই শাড়ি পড়তেন। অঞ্জন আসার পর থেকে মার সাজের ঘটা বেড়ে গেল। অথচ অঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার সময় ভগবান রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সংসারে বৈরাগ্য এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী হয়ে উঠতেন!

একদিন সুস্মি আমাকে বলে, দাদা আমাকে ও বিয়ে করবে না বলেছে।

আমি বলি, মানে? মা জানে?

সুস্মি বলে, আমার বিয়ে নিয়ে মার মাথাব্যাথা নেই। অঞ্জনকে নিয়ে মাইতো কবার হাওড়ায় এক সাধুর আশ্রমে গিয়েছিল। অঞ্জন বলে, ও নাকি দীক্ষা নেবে। সংসার টংসার অসার মনে হয়! মাও নাকি দীক্ষা নেবে!

আমি সুস্মির কথাকে তেমন গুরুত্ব দিই না। যদিও কিছু একটা করা দরকার মনে মনে ভাবছিলাম বৈকি। দুদিন পরই সে আত্মহত্যা করবে কে ভেবেছিল? আমার মিষ্টি বোনটিকে দেখলাম হুকে ঝুলছে। গলায় শাড়ির ফাঁস! সে লিখে রেখেছে, তোমরা ভালো থেকো, আমি চললাম। আমার মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু, কেউ দায়ী নয়!

বলতে বলতে সুনন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। চোখে ভর্তি জল। আমি সুনন্দকে বলি, তোমার মা সুস্মিকে তার শিশু বয়সে বিষ খাইয়েছিল কেন?. তাও কী ঈর্ষায়?

সুনন্দ অসহায় কণ্ঠে বলে, সেদিনের আসল কথাটাও তো বলা হয়নি। শোনো সে কথা। বাবা মারা যাবার পর বেশ কমাস কেটেছে, হঠাৎ একটা খবর এলো পুলিশ আসবে আমাদের বাড়ি সার্চ করতে ভেং মার নামে নাকি পুলিশি ওয়ারেন্ট আছে। খবরটা শুনে মা হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চেচাঁতে থাকেন, "শয়তান সব শয়তান পুলিশকে খবর দিয়েছে? নিশ্চয়ই সোনা, তুই!" মার এই

কথায় আমি বলি, কী বলছ তুমি? আমি কেন খবর দেবো। আমি তো টাকা পয়সার কিছুই জানি না!" মা শান্ত হন না । বলেই চলেন, "লোকটার পাপ আমায় লাগবে কেন শুনি? আমার নামে যদি কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমেও থাকে তো সে টাকার জন্য আমি কেন দায়ী হব? আমি কি চাকরি করেছি? ওই টাকা আমার স্বামী দিয়েছে আমাকে। এখন এ টাকা আমার।" মার কথাগুলি সহ্য করতে না পেরে আমি বলি, "যদি মনে করো বাবার দেওয়া টাকাগুলি সৎ পথে আসেনি, দিয়ে দাও ফিরিয়ে। পুলিশকে সব বল!" মা ফুঁসে ওঠেন কক্ষনো দেব না! কিছুতেই না"। আমি বললাম, "দেখি তুমি কীভাবে আটকাও। কালই আমি থানায় গিয়ে সব বলব।" মা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন, "সোনা আমরা যে ভিখিরি হ'য়ে যাব। সুস্মির কী হবে?"

আমি বলেছিলাম, সুস্মির জন্য খাটব মা। আমি আছি, তুমি আছ ভয় কেন পাচ্ছ মা।

সুনন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই কথাবার্তার পরদিনই মা আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খান আর তার আগে দুধে ঘুমের বড়ি ফেলে সেই দুধ সুস্মিকে খাওয়ান।

সন্ধে নামছে। ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ সামান্য বেড়েছে। বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝাঁক বাধা পাখিরা আকাশের গা বেয়ে নেমে আসছে ধরণীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। লালে লাল পশ্চিম দিগন্ত। রবীন বলে, এবার চল নামি। বাসে উঠতে হবে।

খণ্ডগিরির ঢাল বেয়ে ওরা নামতে থাকে। সঞ্জয় ভাবে, সুনন্দের কাহিনি কী শেষ হ'য়ে গেল। রবীন যেন সঞ্জয়ের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে, না সঞ্জয়, এখানেই শেষ নয়। সুনন্দকে দেখলাম আবারও। কোথায় জানো? পুরীতেই। সমুদ্রের পাড়ে। কবে? হ্যাঁ মনে পড়েছে। গতকাল। ভোরে! সানরাইজ দেখতে হোটেল থেকে বেরিয়েছি। বীচ ধরে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি ওকে! কামানো দাড়ি, সুন্দর পোষাক, বেশ ভালোই লাগছিল! আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। কী খবর? সে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমার মাকে আমি খুন করেছি। তার কফির কাপে বিষ মিশিয়েছি। আমি এখন পলাতক।" কথাটা বলেই রবীন বলে, সুনন্দের কাহিনির এখানেই যবনিকাপাত।

পুরীর সমুদ্রতট। ঘড়িতে সাতটা। রাত নামছে। ঠান্ডা বালুর ওপর সঞ্জয় একা বসে আছে। রবীন এখনও আসেনি। সঞ্জয়ের নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ মনে হয়। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগছে গায়ে। সমুদ্রে বুঝি জোয়ার এসেছে। ঢেউগুলি পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে আসছে। হঠাৎ মনে হল সঞ্জয়ের, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কান্নার রোল উঠেছে। আর সব কান্না মিশে আক্রোশের গর্জন হয়ে সঞ্জয়কে আক্রমণ করতে আসছে। তবে কী সেই মেয়ে উন্মত্ত সাগরের সত্তা হয়ে ছুটে আসছে প্রতিশোধ নিতে। যে মেয়ের নাম কল্পনা। ফেনিল যন্ত্রণায় সে যেন বলছে, তুমি সব জানতে। বাবুলালরা যে শমিতকে হত্যা করবে তা তুমি আগেই কারখানার জমাদার ভৈরবের কাছে শুনেছিলে। অথচ শমিতকে সাবধান করনি। ইউনিয়নকে জানাওনি, কেন? মালিক তো তোমাকে ঘুষ দেয় নি। তাহলে? আমি জানি তুমি বাবুলালের মতো চেয়েছিলে শমিতের মৃত্যু। বাবুলাল চেনে টাকা। আর তুমি চেয়েছিলে আমাকে। ভেবেছিলে শমিতের যদি মৃত্যু এভাবে হয় হোক। আমাকে পাবার পথ তোমার নিষ্কণ্টক হবে। তাই না! কিন্তু আমায় তুমি কখনই পাবে না। ভৈরব না বললেও পেতে না? কারণ আমি তোমাকে কোনোদিনই পছন্দ করতাম না! আর আজ? আদালতের কাঠগড়ায় তোমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে না জানি, কিন্তু আমার কাছে তুমিও বাবুলালের মত খুনী। বাবুলালের চেয়েও তুমি হিংস্র, পিশাচ। নিজের ছোটো ভাইকে খুন হ'তে দিয়েছ তুমি।

একী এসব সে কী ভাবছে। কল্পনাকে ভৈরব তো কিছু বলেনি। কিন্তু শমিতের মৃত্যুর পর কল্পনা তাকে শুধু বলেছিল, জনমে মরণে, আমি শমিতের, আর কারুরই নই। তোমার তো নইই। কারণ তুমি ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর।

... সঞ্জয় জলের দিকে এগোয়। একটা প্রচণ্ড উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে। সঞ্জয় কী করবে? ভেসে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। অতলান্তিক সাগরের জলে?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হ্যাঁচকা টান।

—কী করছ। মরবে নাকি।

রবীনকে দেখে সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে "সহজে কেউ মরে আর যদি মরেই যাই, মন্দ কী।"

বিস্ময় ভরা দৃষ্টি মেলে রবীন বলে ভাইয়ের শোকে মরবে? কী বোকা তুমি। তুমি তো আর তাকে খুন করোনি।

সঞ্জয় আহত কণ্ঠে বলে, কে বলল করিনি। বাবুলালরা যে শমিতকে খুন করার চক্রান্ত করছে আমি জানতাম। কারখানার জমাদার ভৈরব আমাকে বলেছিল 'ভাইকে সাবধানে থাকতে বলবেন।' কথাটার আমি গুরুত্ব দিইনি শমিতকে বলিনি, ইউনিয়নকেও জানাইনি।

—কেন গুরুত্ব দাওনি? কেন বলনি? মালিক তোমায় মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছিল?

—না রবীন, তা নয়। আমি বাবুলালের দলের লোক নই। বিশ্বাস করো।

—তবে জানাওনি কেন?

—আমি হিংসায় বলিনি। কল্পনা নামে একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি কিন্তু সে ভালোবাসে আমাকে নয়, শমিতকে। শমিত কল্পনাকে খুব ভালোবাসতো। ওদের ভালোবাসা দেখে আমি ঈর্ষায় অস্থির হতাম। রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারতাম না। ঈর্ষা থেকেই তো অধঃপতন হ'ল আমার। শমিতকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করলাম না। আমি তো খুনীই রবীন। সাগরের পাড়ে ভেবেছিলাম শান্তি পাব শান্ত হবে। কিন্তু ভেতরটা যে ক্ষয়ে যাচ্ছে বিরাট ধস নেমেছে। সাগরের বুক জুড়ে শুনছি কান্না আর আক্রোশ।

রবীন হাঁটতে থাকে। সঞ্জয়ও পাশাপাশি হাঁটে। রবীন কোনো ভূমিকা না করেই এক সময় বলে একটা কথা বলছি, বলেই বিদায় নেব।

—কী কথা?

—আমি সুনন্দ। রবীন আমার বন্ধুর নাম। আমি চলি।

—কোথায় যাবে?

—সারেণ্ডার করতে। থানায়।

—আমি কোথায় যাব? কী করব? সঞ্জয় জানতে চায়।

—সারেণ্ডার করো! স্বীকারোক্তি ছাড়া বাঁচার পথ জানা নেই আমার বলেই সুনন্দ আর একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়।

চিত

কবিতা সিংহ

পুতুল সদরে দাঁড়িয়ে তানীর ছাগল দোয়ানো দেখছিল। আর তানীদের দড়ির চারপাই-এ বসে পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলের পাল, গুলতানি করা ছেলের পাল, পুতুলকে দেখছিল।

পুলিন ঠিক সেই সময়টাতেই গলির মুখে ঢুকল। গলি আবার কী? হাততিনেক, প্যাচপ্যাচে কাদাওঠা কানা একটা খোঁদল একটা বড়ো বাড়ির মাজা ভেঙে দুফাল করে ঢুকে গেছে। গলিটা যে দেয়ালে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে, তার গা থেকে তানীদের ছোটো চালা। তানী থাকে, তানীর ঘুঁটেওয়ালি মা থাকে আর মুটেবাবা। আর ছাগলটা। দু পাশের টালখাওয়া জানলা, ছাদ থেকে ঝুঁকে আছে দু-চার জন। চা খাচ্ছে, গল্প করছে। আকাশের ঘুড়িওড়া দেখছে। যারা এক-পো আধ-পো দুধ নেবে তারা তানীর দু উরুর মধ্যে চেপে রাখা দুধের ছোটো বালতিটায়, ফেনায় ফেনায় ফেঁপে ওঠা দুধের ফিনকি দেখছে।

আবার—ফিরে ফিরে ঠিক পুতুলকেও দেখছে।

সত্যি, কে বলবে বলো দেখি। এই পুতুল কী সেই রোগা পুতুল? হারানের বিয়ের সময়কার সেই সিড়িঙ্গে মেয়েটা? হারানের বউ-এর সঙ্গে পুতুলও কদিন তার দিদির সঙ্গে থাকতে এসেছিল। তখন পুলিন তাকে সেই খোলাম-কুচির খেলাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। সত্যি এই খোলামকুচি নিয়ে, আপন মনে কী সুন্দর সব খেলা যায়। একটা কিছু ভেবে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া আর লুফে নেওয়া। চিত হলে ফলে যায় আর উপুড় হলে বি-ফল! আর খেলতে খেলতে কেমন ছোটো ছোটো স্বপ্ন তৈরি হতে আরম্ভ করে আর গল্পের টানেল খুঁড়ে খুঁড়ে, তারা চলতে থাকে ভিতর ভিতর।

এই বাড়িটায় পৌঁছোতে হলে বড়ো রাস্তা থেকে গুনে গুনে পাঁচটা বাঁক।

অথচ তাতেই কত তফাত।

বড়ো রাস্তায় কত আলো, কত শব্দ, ট্রাম বাস মিনি জামা কাপড়ের দোকানপাট, গোলদিঘিতে সাঁতার, ট্রানজিস্টারে খেলার রিলে। আর এখানে। এই গলিতে?

বাড়িগুলো সব খণ্ডবিখণ্ড, ছন্নছাড়া নষ্ট দাঁতের সারি হয়ে নড়বড় করে দুলছে সামনের বর্ষার ভার সইবে কিনা সন্দেহ।

তবু পুলিনের মন খারাপ করে দেয় কচিৎ কখনো শ্রীহীন বাড়িগুলোয় লেগে থাকা একটি আধটি সাহেবি আমলের পোর্সিলিনের টালি, খানিকটা খানিকটা পঙ্খের কাজ, কখনো জানলার শার্সিতে আটকে থাকা রঙিন কাচের টুকরো—এসব ছাড়া কষ্টের মতো বেঁধে পুলিনকে। যেমন বেঁধে পুতুল।

বড়ো বেশি শরীর পুতুলের শরীর। বড়ো উগ্র। আগে যখন কাছে আসত পুতুল একটা ফিকে লেবুতলের সুবাস লাগত পুলিনের নাকে। গা থেকে উঠতো গাঁ-দেশের ভিজে মাটির গন্ধ। এখন

মনে হয় পুতুলের চাপ চাপ চুলের ভারে কেবলই বর্ষা স্যাঁতা শরীরে ঘাম আর বাসন মাজার গন্ধ। তবু কখনো, ক্বচিৎ কখনো, পুতুলের চাউনিতে, হাসিতে একটি দুটি সূক্ষ্ম পঙ্খের কাজ, কর্নিকের গড়ন—দেখতে পায় পুলিন। আজও এক ঝলক দেখল।

সদরের এজমালি দরজার সামনে খানিকটা জমা জলের ওপরে পিশু পোকা উড়ছে। তার ওপর পাতা ইঁটের ওপর পা ফেলে ফেলে পুলিন পুতুলের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল। আর পুতুলের শাড়ি থেকে উনুন ধরানোর গন্ধ পেল।

সদরের অন্ধকার গর্তটার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমটা কিছু দেখাই যায় না। ভিজে ভিজে অন্ধকার প্রায় ঝালরের মতো গায়ে লাগে। ক্রমশ চোখ সয়ে এলে, তবেই পাশের প্যাসেজ বেয়ে উঠে, উঠোন ঘুরে নিজের আস্তানায়, অর্থাৎ এই মহলের শেষ প্রান্তে যেতে পারে পুলিন।

কী ছিল আগে এ মহলটা? উঠোনের পাশের জমির সঙ্গে সমান ছোটো ছোটো খুপরিতে বোধ হয় ঘোড়ারাই থাকত। এখন এক-একটি খুপরিতে এক-একটি পরিবার। মাঝখানের উঠোনটার আর কোনো অস্তিত্বও নেই। কেটে কেটে নীচু দেওয়াল তুলে, খুপরি ঘরের সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মানে প্রত্যেকটা ঘরের রান্নার জায়গা, আর বাসন মাজার জায়গা।

এ সময়টা বাড়ি ফিরলেই পুলিন দেখে, নিজের নিজের খোপের সামনে, বাসন মাজতে, কিংবা কাপড় কাচতে বসেছে মেয়েরা। উঠছে এঁটো বাসনের গন্ধ, কুলকুলিয়ে ওঠা যার যার আলাদা উনুনের ধোঁয়া। আড়চোখে খুপরির ভিতরের আবছা উঁচুতক্তাপোশ, বাকস প্যাঁটরা, বিছানার টাল, কখনো হতভম্ভ শিশু দেখা যায়। উঠোনের এপাশের, অর্থাৎ খুপরিগুলোর উল্টোদিকের প্যাসেজ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা এত বাইরের লোক যাতায়াত করে যে মেয়েরা কেউ মুখ তুলে চেয়েও দেখে না। কিংবা হয়তো তাদের আর কিছু দেখবারই ইচ্ছে বাকি নেই।

পুলিনের তো সবাইকেই একরকম মনে হয়। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। বেরঙা শাড়ি পরা ভাঙা চোরা কতকগুলো মেয়েমানুষ। এদের মধ্যে পুতুলের দিদি নির্মলাও আছে।

এদের প্রত্যেকের মধ্যেই পুলিন তার মায়ের কিছু কিছু অংশ দেখতে পায়। এমন কী পুতুলের মধ্যেও পায়।

কোন্ অংশটা? কে জানে, এখনো ঠিক পরিষ্কার করে ধরতে পারেনি পুলিন।

পুলিন প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের দৈর্ঘ্যটা পেরিয়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঘর। বোধহয় একসার ঘরের মাঝের দেওয়াল ভেঙে নেওয়া হয়েছে। এখানে সারাদিন ধরে চলে ঘটাং ঘটাং। একটা ছোটো প্রেস। একদিকে কম্পোজিটারদের খোপ। একদিকে মেসিন। আর পিছনে টালকরা কাগজ আর গ্যালির উঁচু দেওয়াল দেয়া, সরু গলির মতো জায়গাটা, ফুট চারেক মতো হবে হয়তো। সেই লম্বা ফালিটা পুলিনের। লম্বায় অনেকখানি হলেও চওড়ায় পুরু। পুলিনের এই ফালির একপাশে কাগজের দেওয়াল, আর একপাশে নোনা-ধরা এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল। দেওয়ালটা এত নড়বড়ে যে কখন খসে পড়ে, এই ভয়ে কেউ থাকতে চায় না। ভয় করার কারণও আছে। এই তো গত বর্ষাতেই সেই কাণ্ডটা ঘটেছিল। বাড়িটার সিলিঙ্ এত উঁচু যে ওপরে তাকাতে ঘাড় ভেঙে যায়। ওপরটা ঝুলকালো। নোনা-ধরা দেওয়ালের গা দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ ইঁটের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে একটা বন্ধ দেওয়ালের কাছে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত খাঁজকাটা সিঁড়ি একটা দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ হারিয়েই বা গেল কেন? পুলিন মাঝে মাঝে কথাটা ভাবত। হঠাৎ একদিন, ঘোর বর্ষায় সেই বন্ধ দেওয়াল থেকে ঠিক একটা দরজার মাপ খানিকটা অংশ খসে পড়েছিল নীচে। ভাগ্যিস পুলিন তখন পাশের প্রেসে বসে চা খাচ্ছিল। না হলে অক্কা পেয়ে যেত সেদিনই।

তা যাই হোক গে, পুলিনের আস্তানার ওপর দিকের অনেকটাই এখন উদোল। তাতে পুলিনের কিছুই তরবিশেষ হয়নি। বৃষ্টি পড়লে একটা পর্দার মতো গুটোনো তেরপল ফেলে দেয়। বরং খাঁজকাটা সিঁড়ি দিয়ে ভাঙা খোঁদলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দারুণ মজা। প্রেসের লোকেরা বলেছিল, সেকেলে

বাড়ি তো, হয়তো তখন ওই দেওয়ালের ওপারে কোনো গুপ্তঘর বা গুমঘরের চোরাই জায়গা ছিল। কিন্তু এখন?—পুলিন উঠে গিয়ে দেখেছে শুধু খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো চাতাল দেওয়াল কামড়ে পড়ে আছে। সেইখানে —নাঃ থাক! ওটা পুলিনের একার ব্যাপার। ওখানে পুলিনের সঙ্গে কেবল পুলিনই।

পুলিনকে আসতে দেখে হারান ছাপাখানা থেকে গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল—বাজারে যাবে নাকি?

পুলিন তার আস্তানার দিকে এগোতে এগোতে বলল, যাবো, তুমি তৈরি হও, আমি এক্ষুনি আসছি। প্রেসের আলোকিত ঘরটা পেরিয়ে নিজের আস্তানার মুখের কাছে এসে পুলিন নর্দমার ধারে বালতির তোলা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে নিল। তারপর চটের পাট করা থলিতে পা মুছে তার নিজের আড়ালটিতে ঢুকল পুলিন। সারা জায়গাটা জুড়ে মাদুর পাতা। পায়ের তলায় মাদুর কাঠির চিকন চিকন স্পর্শ। আরশোলা ইঁদুর মশাকে মেরে মেরে তাড়িয়েছে। ধুনো দেয়। ফ্লিট দেয়। তাড়াতে পারেনি শুধু নোনা ইঁট আর পুরনো কাগজের গন্ধ।...এখানে এলেই তার মন তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যায়। পুলিন পরিচ্ছন্ন। দড়িতে তার জামা কাপড় গুছানো। তার ছোটো টিনের বাক্স। গোটানো বিছানা। আর দপ্তবির কাজের জিনিস। এ ছাড়া রান্নাবান্নার স্টোভ আর বাসনপত্র। নিজের সরু ফালির সেই অন্ধকার কুয়ো থেকে ওপরের আলোময় খোঁদলটার দিকে তাকাল পুলিন। এখন তার সামনে সেই সুপ্ত দরজায় ভাঙা আয়ত-ক্ষেত্রটায় অপরাহ্নের বেগুনফুল-রঙা আকাশ উঠে দাঁড়িয়েছে। আহা!

পুলিনের চোখ দুটি যেন ভরে গেল।

ছোট্ট একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে আস্তে আস্তে সেই বিপজ্জনক সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে পা ফেলে উঠতে লাগল। যেন সে মন্দির যাচ্ছে!

মানুষের সংসারের গন্ধ, বদ্ধতা, মেশিনের ঘটাং ঘটাং পেরিয়ে তানীর ছাগলের গলার ঘণ্টাধ্বনি তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আর সে যত ওপরে উঠতে লাগল ততই তার চোখে মুখে হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগতে আরম্ভ করল।

ছোটোবেলায় পুলিনদের বস্তির পাশের খোপে থাকত ধোপানিদের দাদিবুড়ি। দাদিবুড়ি ফোলা ফোলা দুপা ছড়িয়ে কেবল দেহাতের গল্প করত। তাদের দেহাতের পার্বতী মন্দির। সাদা, চুনকাম করা। নদীর ধারে যে যায় সে বড়ো ঘণ্টাটা একবার করে বাজিয়ে চলে যায়। চারপাশের গেঁহুর ক্ষেত। সোনালি হলুদ। খয়েরি কাঁচ ডানার ফড়িং উড়তে থাকে।

বেগুন ফুল রঙের পশ্চাদপটে একটা রাঙা টবে দুলছে গাছটা। কী সুন্দর নধর শরীর। পুলিনের গুণে রাখা। সব মুখস্থ। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। গাছটার বড়ো একটা লাগে হয়তো। এবার বাজারে গেলে, গাছওয়ালা বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কোথায় কোন্ বনে? কোন্ বাগানে? গাছটাকে পেয়েছিল সে? পুলিন পরম মমতায় ঘটির জলে এক একটি পাতা আলাদা করে মুছে দিল। তারপর মনে মনে বলল—নাও, তোমার মাথায় আলাদা করে বৃষ্টি ঝরিয়ে দিচ্ছি। স্নান করতে করতে পিছল আর ঝলমলে হয়ে উঠতে লাগল গাছটা। পুলিনকে সে দুলে দুলে নিজের দুডালের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা সুকুমার পত্রমুকুল দেখাতে লাগল। নতুন ডাল হবে, তারই লজ্জা কুঁড়ি। ডালে ডালে থোপায় থোপায় মুঠিয়ে উঠছে ফুল্ল কুসুম গুচ্ছ। কুঁড়ির মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে গন্ধমধু।

আজ রাতে যখন ফুটে উঠবে তখন গন্ধে গন্ধে পুলিন পাগল হয়ে উঠবে।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে পুলিনের সারাগায়ে কাঁটা উঠতে থাকে। আকাশের বেগুন ফুল রং তখন আরও আরক্ত।—কই তুমি কোথায়?

নীচ থেকে পুতুলের কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে উঠে আসতে থাকে। পুলিন চমকে ওঠে। আর তখনই তার হাত লেগে কয়েকটা পাতা খসে পড়ে। পুলিন নীচু হয়ে তুলতে গিয়ে দেখে

পাতাগুলো ঈষৎ বিবর্ণ হলদে। পুলিন থমকে দাঁড়ায় তার মুখও বিবর্ণ হয়ে যায়। এখন তো বর্ষাকাল। এখন তো পাতা খসে না।

কই তুমি বাজারে যাবে না? জামাইবাবু ডাকছে। নীচেটা অন্ধকারে একাকার। ওপর থেকে পুতুলকে ঠাহর করা যায় না। পুলিন সেই অলক্ষ্য শব্দটা লক্ষ্য করে বলল,—বল, যাচ্ছি—

দেয়াল ধরে ধরে অভ্যস্ত পায়ে নেবে এল পুলিন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

পুতুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একবার পুলিনকে আর একবার খাঁজকাটা সিঁড়িটা দেখে সে বলল, —খুব সাহস তো? তুমি ওই অত সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে?

সত্যি অদ্ভুত সরু, আর বিপজ্জনক সিঁড়িটা। দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। সহজে বোঝা যায় না। পুলিনের সারা ঘরে চোখের দৃষ্টিটা ঘোরাতে ঘোরাতে পুতুল এবার তাকাল সেই উঁচুতে, খোলা আয়তক্ষেত্র। তখনই ওপর থেকে একটা শক্তিহীন পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল।

—ওটা হাসনুহানা না?

পাতাটা হাতে তুলে নিল পুতুল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলল—বাঁচবে না!

পুলিন হত্যাকারীর মতো তাকাল পুতুলের দিকে। তারপর বাজারের থলিটা তুলে নিল।

বাজারের মুখে এসে পুলিন বলল—পুতুলের কী ব্যবস্থা হল?

—কাল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি!

পুলিন বলল—যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

—নিজের বউ বলে পরিচয় দিতে হল! তিনটে, ছেলেপুলে আছে বলতে হল।

—চুকে বুকে গেলে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিয়ো!

হারান মাথা নাড়ল। কথাটা পুলিন কেন বলছে হারান জানে। এমনকী পুতুলের রি রি যৌবন নিয়ে হারানের বউ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। পুতুল আসার পর থেকেই যেন এই গলিতে, এই পাড়ায় সারাক্ষণ যেন মাংস রান্না হচ্ছে। অথচ পুতুল যাবেই বা কোথায়? হারান পুলিনকে সব কথা বলে। সব কথা বললে যদি কেউ বন্ধু হয় তাহলে অবশ্যই হারান পুলিনের বন্ধু। কলকাতার কাছে মফঃস্বলে হারানের বউ পুষির বাপের বাড়ি। মাসতিনেক আগে পুতুলকে হাট করে ফেরবার পথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কারা! তারপর রেল-লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে যায়। এখন আর তাকে কলকাতায় না এনে উপায় নেই। হারান পুলিন আর পুষি ভেবেছিল কেউ জানবে না। বুদ্ধি করে কাজ হাসিল করতে পারলে পুতুল দিব্যি কুমারী বনে ফিরে আসবে। কিন্তু পুতুল আসবার পর থেকেই যেন চারপাশের আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ খেলছে। সকলের মন চোখ চিন্তা সব যেন দৌড়োচ্ছে নাভির দিকে। এমন কী পুতুলেরও।

এমন কী হারানেরও!

বাজারের কাছে বরাবর এলেই পুলিনের মনে হয় সে যেন যাত্রার কনসার্ট শুনছে। কত মানুষ। কত জিনিস। জিনিস সাজানোর মধ্যে কত কারিকুরি। বাজারের কাছে এলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। শীতের দিনে শাড়ির দোলাই বেঁধে মায়ের আঙুলটি ধরে, সে বাজার কুড়োতে আসত। ফেলা কপিপাতা, পচা টমেটো, ধসা আলু।

—কী ভাবছ পুলিন?

—ভাবছি এসব কায়দা যদি তখনকারকালে, থাকত, তাহলে আমার মা হয়তো আমাকে আনত না।...

কিন্তু মনে মনে নিজেকে আসল কথাটা বলল পুলিন।

—আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়। আমার মা হয়তো কোনো উঁচু ঘরের মেয়ে ছিল। মায়ের একটি দুটি কথা, টুকরো টুকরো আচরণ এখন বুঝি যেন!

হারান বলল ভালোই হত। আমরা তাহলে জন্মাতাম না। এত কষ্টও পেতাম না।

—না, না, এই জন্ম বড়ো ভালো। এই জন্মে বড়ো পরিতোষ। না, না, মা তাকে চেয়েছিল। মা তাকে জন্মাতে দিয়েছিল। পুলিন এ কথাটা রক্তে রক্তে বোঝে। নাহলে তার জীবন এত আনন্দের হত না। এত আনন্দ।

বাজারের মুখে পুলিন দেখল সেই গাছওয়ালা বুড়োটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তুরীয় হয়ে বসে আছে। পাশে কটা মাটির মুঠোয় ভরা গাছ।

পুলিনের একবার ইচ্ছে হল, সে মাথা নীচু করে বুড়োকে বলে—ও বুড়ো! তোমার হাসনুহানা মেয়ে ভালো আছে!

কিন্তু ততক্ষণে হারান খানিকটা এগিয়ে গেছে আর পুলিনেরও পুতুলের কথা মনে পড়েছে—বাঁচবে না।

পুলিন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল,—ও বুড়ো, তুমি কোথা থেকে গাছ আনো?

—হেই কাকদ্বীপ!

কথাটা কোনো মতে বলেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। পুলিন মনে করতে চেষ্টা করল তার বন্ধু রঘুনাথ কাকদ্বীপ সাইডের কত নম্বর বাসের ক্লীনার?

বাজার পুলিনের বড্ড ভালো লাগে। মাটির বুক ফাটিয়ে বেরোনো এইসব ফলপাকুড়। ফসল দেখলেই পুলিনের ভালো লাগে। কোনো কিছু হয়ে ওঠা দেখলেই। ডালায় সাজানো পুরুষ্টু বেগুনগুলো। আহা গা দিয়ে যেন লাবণ্য ঝরে ঝরে পড়ছে। যেন পাম্প করে কেউ যৌবন ঠেসে দিয়েছে শরীরে। সবুজ লেসের মতো গোছা গোছা সরষে শাক। এবড়ো-খেবড়ো গা—করলা, হালকা বাসন্তী পাতিলেবু। এত সব তরি তরকারি দেখার পর, মা রাঙা আলুর সঙ্গে মাষকলাই সেদ্ধ করে দিত। কখনো কপিপাতা কুচোনোর সঙ্গে ভাত।

বস্তির সেই ছোট্ট খুপরি। উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকত মা। মায়ের টানা ছাঁদের মুখখানি জ্বলজ্বল করত আগুনের আভায়। চোখের কোলে গভীর গর্ত। এখন পুলিন বোঝে কত অল্প বয়স ছিল মার। কত সুন্দর ছিল মা। ওই অতটুকু ঘরে নানা রকমের মানুষের সঙ্গে উঁচু তক্তাপোশে শুয়ে থাকত মা। তলায় লুকিয়ে রাখত পুলিনকে। তাদের মা ও ছেলের অদ্ভুত গোপন খেলা ছিল একটা। অন্য লোককে লুকিয়ে কখনো কখনো মা নিজের হাতটা নামিয়ে দিত পুলিনের কাছে, পুলিন সেই হাতটি নিজের চোখে গালে বোলাত। লোকটা বুঝতেই পারত না যে, পুরো দাম দিয়েও সে একটা হাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আর তখনই পুলিন বুঝতে পারত তার মা তার হাতের মধ্যে দিয়ে নেমে এসে গুটিগুটি হয়েছে পুলিনের কাছে। পুলিন জানত তার মা নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে মড়ার মতো দেহটার থেকে। সেই থেকেই সে ক্রমে ক্রমে শিখে নিয়েছিল কী করে মনকে দেহ থেকে আলাদা করে নিতে হয়। তাই পুলিন কখনো তার মাকে ঘেন্না করতে পারেনি। কারণ সে জানত তার মা এ সব কিছুতেই জড়িত নেই। ওই বস্তি পচা জল-জমা পায়খানা, পুরুষের বাসনা কামনা ঘাম মশামাছি, কাটা, কাপড়, ফুটো চাল—সব তার মা ইচ্ছে করলে সারিয়ে দিতে পারে।

কী করে?

এই যেমন তার মায়েপোয়ে, ঠিক শোবার আগে হাত পা ধুয়ে—গরম কাল হলে রাস্তার কল থেকে জল এনে পরিষ্কার করে গা হাত পা মুছে বিছানায় শুত। তারপর গল্পের জগৎ। অনেককাল আগের সব গল্প। পুরোনো দিনের। সুখের দিনের। পুলিন তাই রাস্তায় গলিতে, আর পাঁচটা ছেলের মতো খেলেধুলে বেড়াতে পারেনি। কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়ত সে। চুল আঁচড়ানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে। সে যে অন্যরকম তা সবাই বুঝত। তাই একবার সকলে তার ঘোর জ্বরবিকার হলে

মাস্টারমশাইরা নিজেরাই তাকে কোলে করে বস্তিতে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা মাকে আপনি আপনি করছিলেন। এটা পুলিন তখনই লক্ষ করেছিল। একজন মাস্টারমশাই বলেছিলেন—সন্ধ্যার সময় ওকে নাইট স্কুলে পাঠান না কেন? ও সময়টা আপনি তো...

মা বলেছিল,—এটা তো আমার পেশা। এতে তো কোনো লজ্জা নেই বাবু! ও সব জানুক। তাতে কী?

মাস্টারমশাইদের একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কী এখানকার? মানে এখানেই জন্মটম্ম?

মা বলেছিল—না, আমি অনেক দূরের মানুষ। রংপুরের।

সেই পুলিন জেনেছিল। তার মা রংপুরের।

হারান বলল—কী হে? তুমি কিছু কিনবে না?

পুলিন বলল,—অ্যাঁ? হ্যাঁ, কিনব। বাইরে থেকে কম দামে কিছু তরিতরকারী কিনব। আচ্ছা, হারান তুমি আলুর ডাল খেয়েছ?

—আলুর আবার ডাল কী?

—মা রাঁধত! আলুসেদ্ধ করে গলিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে—প্রচুর মটরশুঁটি, আমাদের নিজস্ব রংপুরের রান্না।

'আমাদের রংপুর' কথাটা খুব জোর দিয়ে বলল পুলিন।

হারান বলল, বাঃ বেশ ত!

আসলে পুলিন কোনোদিন রংপুরে যায়নি। আসলে পুলিনের মা কোনোদিন আলুর ডাল রাঁধেনি।

এসব তার আর তার মায়ের কিছু নিজস্ব খেলা। মা যখন শেষের দিকে, লোকের বাড়ি বাড়ি—বাসন মাজত, তখন ফিরে এসে স্নান করতে যেত। পুলিন ততক্ষণে ঘর ঝেড়ে মুছে বিছানা পেতে রাখত। মা পাশের ধোবানির উনুনে কিছু কয়লা ফেলে দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি করে নিত। কিংবা মুড়ি কিনে আনত। তাই খেয়ে ওরা ঝাঁপ ফেলে দিত। তারপর মা বলত,—এবার পুলিন?

পুলিন বলত—হ্যাঁ মা!

—কী বাজার করলি বল?

বাজার কুড়োতে যেত রোজ পুলিন। বাজারের সেরা তরিতরকারি মাছ মাংস সে দূর থেকে দেখত। সেই সব তরিতরকারি মাছ মাংসর নাম সে তোতাপাখির মতো আউড়ে যেত।

মা বলত—বেশ,—বেশ বাজার হয়েছে। বাঁধাকপিটা কী সরেস। টমেটোগুলো কী নিটোল! আহা, বাজারের সেরা কড়াইশুঁটি এনেছিস বাবা! কী ভালো—কটা উনুন জ্বালব বলতো? তিনটেই জ্বালি—হ্যাঁ রে সরবতি লেবু এনেছিস? এই দ্যাখো সরবতি লেবুই আনিস নি?—যা যা শিগগির রাজার বাগান থেকে ছিঁড়ে আন। অঢেল আছে।

তারপর শুয়ে শুয়ে দুজনের মিছিমিছি রান্না হত। খেয়ে দেয়ে রেলে চাপা হত। খুপরিটা হত রেলের কামরা, আর ওদের তক্তপোশটা হত বাঙ্ক। স্টেশনে স্টেশনে গরম চা খাওয়া হত। পুলিনের জন্যে বাড়তি গরম দুধ। বেশির ভাগ দিনই ওরা পুরী যেত। একটা না দেখা সমুদ্রের বালিয়াড়িতে অজস্র না-দেখা ঝিনুক কুড়োত।

ঝুপঝুপ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হারান ছাতাটা খুলে বলল মনে পড়ছে—আমার বিয়ের দিনে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল। তুমি আর আমি বিয়ের বাজার করতে বাজারে এসেছিলাম।

—ও হ্যাঁ, তাই তো!

মনে পড়ে গেল পুলিনের। বছর দুই আগেই তো হারানের বিয়ে হয়েছিল। এমনি বৃষ্টি বাদলের দিনে। হঠাৎ সেদিন সেই বুড়ো গাছওয়ালাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাহস করে একটা হাসনুহানার ছোট্ট চারা কিনে ফেলেছিল।

হারান হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,—গাছ! কোথায় রাখবে? গাছের জায়গা কোথায়? মরে যাবে!

পুলিন মনে মনে বলেছিল, তুমি একটা আস্ত বউ পুষতে পারো আর আমি একটা গাছ পুষতে পারব না। এখন তাই হারানের বউ আর গাছটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে পুলিন।

মুখে কিছু বলে না।

বিয়ের সময় ওই পুতুলের মতোই ঝকঝকে চেহারা ছিল পুষির। প্রথমদিকে স্যাঁতস্যাঁতে রোদহীন দালানে থেকে সত্যিই হাসনুহানা গাছটা নেতিয়ে পড়েছিল। যদি না হঠাৎ দেওয়াল ধ্বসে গিয়ে চাতালটা বেরিয়ে পড়ত—তা হলে গাছটা হয়তো সত্যিই মরে যেত।

কিন্তু পুতুল যে আজ তার বুকের মাঝখানে একদম গজাল গেড়ে দিল। বলল, আর বাঁচবে না গাছটা!

হঠাৎ পুলিনের মনে পড়ল। তার বন্ধু ক্লিনার রঘুনাথ কাকদ্বীপগামী কোন্ বাসে কাজ করে।

রাতে শোবার আগে সদরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল হারান আর পুলিন। হারান যেন কেমন অযথা ছটফট করছিল। ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। প্রেস এখনই বন্ধ হল। কেবল পুষি খামোখা কাজ বাড়াচ্ছে। আর উঠোনের পাশের প্যাসেজে বসে পুতুল একমনে খোলামকুচি নিয়ে খেলা করছিল।

পুলিন ভিতরে ঢুকতেই পুতুল বলল—তোমার গাছটা কাছ থেকে দেখে এলাম।

পুলিন বলল—ওই সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে তুমি ওপরে উঠেছিলে?

—হ্যাঁ, এখন জোছ্নায় ভাসছে, কিন্তু বাঁচবে না। সব শেকড়। সব শেকড়। আজ মরলেও মরবে। কাল মরলেও মরবে।

পুষির ছেলেটা কেঁদে উঠতেই উনুন সাজানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। কম পাওয়ারের বাল্বের হলদে আলোয় পুলিন এক ঝলকে যা দেখলো তা কেবল শেকড় শেকড় আর শেকড়। হাতে গলায় বুকে কণ্ঠায় নিম্নমুখী স্তনে কেবলই শেকড়।

পুষিও ছেলেকে দুধ দিতে দিতে বলল,—হ্যাঁ, মাটির চেয়ে সত্যিই শেকড় বেশি হয়ে গেলে গাছ বাঁচে না।

পুলিন পুতুলকে পেরিয়ে গুটি গুটি নিজের আস্তানায় গেল হাত মুখ ধুয়ে। খালি গায়ে, পরিষ্কার একটা ধুতি দু পাট করে পরে, সে ঠিক ওপরের সেই ফাঁকা আয়তক্ষেত্রটার রুজুরাজি তার বিছানাটা পাতল। এখনো মায়ের তৈরি কাঁথাটা সবার ওপরে পাতে। যদিও কাঁথার ওপরের নরম কাপড়টা ছেঁড়াছেঁড়া হয়ে গেছে। একটু বাদেই—চাঁদের চৌকোণা আলোটা সরে সরে এসে পড়ল বিছানায়। পুলিন হাতটা লম্বা করে দিল। তার হাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল হাসনুহানার ছায়াটা। ফুটন্ত হাসনুহানার গন্ধে মাত হয়ে যাচ্ছিল পুলিনের ছোট্ট খোঁদলটা। একটি সুগন্ধ সুন্দরী সবুজ মেয়ের ছায়া বুকে মেখে নিয়ে শোয়ার তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে এলো তার।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পুলিনের; হাস্নুহানার ছায়াটা তখন তার পায়ের কাছে উপুড হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পুলিন ঘুম চোখেই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

চাতালের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো একা।

তখন চাঁদ একেবারে মাথার ওপর। নিঝুম, নিশুতি। ঝলমলে সবুজ রাংতার মতো ঝলমল করছে হাস্নুহানা গাছটা। সারা গায়ে যেন জরির কল্কা দেওয়া সবুজ বেনারসী। কপালে চাঁদের শোলার সিঁথি মৌর। একটা ষোলো বছরের যুবতীর সব সুগন্ধ আর সরলতা নিয়ে নিজের ভবিষ্যত না জেনে খিলখিল করে হাসছে।

চাপা গলায় পুলিন বলে—আমি তোমায় কিছুতেই মরতে দেব না। তুমি থাকবে। বেঁচে থাকবে।

কিন্তু ক'দিন বাদে?

শিউরে উঠলো পুলিন। সে দেখতে পেলো নুয়ে পড়া হলদেটে একটা মনমরা গাছের ছবি। কেবল শিকড়! কেবল শিকড়! পুলিন দ্রুত নীচে নেমে এসে প্যাসেজে বেরিয়ে চোখে মুখে জল

দিতে গিয়ে দেখে পুতুল প্যাসেজের ময়লাটে চাঁদের আলোয় একা একা বসে খোলাম কুচি নিয়ে খেলছে। পুলিন কাছে এসে দাঁড়াতেই একটু সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, —তুমিও কী জামাইবাবুর মতো আমাকে বিরক্ত করবে? কালই তো চলে যাব। আর কেন?

পুলিন বুঝতে পারল হারান নিশ্চয়ই পুতুলকে...থাকগে...পুলিন কথা ঘোরাবার জন্য বলে,—তুমি কী বেশি খোলামকুচি নিয়ে খেল পুতুল?

—হ্যাঁ বেশি! সেই যে তুমি যেমন ভাবতে শিখিয়েছিলে?

—ঠিক তেমন করে! যেমন এই যে

চিৎ হলে রাজপুত্তুর
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে সোনার সংসার
উপুড় হলে খাঁ খাঁ
চিৎ হলে রাঙা খোকা
উপুড় হলে ...

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠল পুতুল—উপুড় হলে সব শেষ!

কিন্তু পুলিন অন্ধকারে হেসে উঠল। তার মায়ের কথা মনে পড়ল। তার মা যে বেঁচে গিয়েছিল শুধু—

মা জগৎ বানাতে পারত।

পুতুলও জগৎ বানাতে শিখেছে।

পুলিন আস্তে আস্তে পুতুলকে তুলে নিল। পুলিনের ধরার ভঙ্গি দেখে পুতুল কোনোরকমে ভয় পেলো না। পুলিনের কাঁধে ভর দিয়ে পুতুল পুলিনের খোপে গেল। চাঁদের ঢল নামা বিছানায় পুতুলকে শুইয়ে দিয়ে পুলিন বলল,—কাল আমরা কোথায় যাবো বলো তো?

—হাসপাতালে।

—না, আমরা যাবো কাকদ্বীপ! বাসে চেপে। তুমি, আমি, আর ও'—

হাস্নুহানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল পুলিন!

—তারপর? সানন্দে বলল পুতুল।

পুলিন বুঝলো পুতুল সব ভুলে গিয়ে একমনে তার গল্প শুনছে।

—তারপর কাকদ্বীপে গিয়ে একটা ভালো জায়গায় ভালো মাটি যেখানে, খুঁজে নিয়ে ওকে রেখে আসব—কেমন?

পুতুল ঝিলমিলে চোখে বলল,—আমি খুঁজে দেবো। আমি ভালো মাটি চিনি। তারপর?

—তারপর আমরা একটা চিহ্ন দিয়ে আসবো!

—হ্যাঁ, সে বেশ হবে। আমরা মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাবো। ও অনেক মাটি পাবে। শেকড় ছড়িয়ে বাড়বে। নতুন নতুন গাছ দেবে!

পুলিন চাঁদের আলোমাখা পুতুলের ছোট্ট কপালটি ছুঁয়ে বলল,—এবার সত্যি করে বলো তো খোলামকুচি চিত্ হয়েছিল?—না উপুড়?

—কখন?

—যখন রাঙা খোকা চেয়েছিলে।

পুতুল পুলিনের বুকে মুখ রেখে বলল,—সত্যি কথা বলবে।

—হ্যাঁ!

—চিত্।

'মা'কে

বীণা মজুমদার

শ্যামলা রং, সুন্দর মুখশ্রী, একমাথা ঘন কালো চুল, পদ্মাকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। ধনীঘরের সন্তান হলে ভালো খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছন্ন সুন্দর সাজসজ্জায় সে সুন্দরীই হয়ে যেত কিন্তু আধময়লা জীর্ণ কাপড়জামায় রূপ তার ফোটে না।

তবুও সুরেশ দত্ত জানে মেয়ে তার সুশ্রী, একমাত্র গৌরবর্ণ না চাইলে মেয়ের তার রূপের অভাব নেই। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে আর অনাদর করতে পারবে না। মেয়েটির উপর সুরেশ দত্ত যে অনেক আশা রাখে।

পদ্মার কথা থাক, আগে সুরেশ দত্তর কথাই বলতে হয়; পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে এখন ভাঙাচোরা জীবনের চেহারাটা তাকে ভাবায়; একটা প্রাইমারী স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি, মনে হতো আর কী চাইবার আছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো রকমে ঠিকই কেটে যায়। কোনো ঢেউ নেই কোনো ওঠাপড়া নেই, শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন তার বদ্ধতার দিকে সুরেশ দত্ত ফিরে তাকায় না। কোনো ছোটোবেলায় পিতৃহীন হয়ে আর থার্ডডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আর কিইবা করা যায়! কোনোকালে তার বাবার একটা বেশ বড়ো পৈতৃক বাড়ির ছবিটা ছায়া ছায়া মনে পড়ে, কোথায় যেন একটা বেশ ভালো চাকরিও করতেন। ছেলেবেলার সেই সুন্দর কোয়ার্টারটির কথাও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। সে স্বপ্নই, তার বেশি কিছু নয়; নিতান্তই অকালে তাকে যেতে হয়েছিল বলে আর কিছু করার ছিল না, একটি অকাল মৃত্যুর পরিণতি আজকের এই সুরেশ দত্তর জীবন। দেশ ভাগ না হলে হয়ত অন্যরকম হতে পারত, অন্তত কিছু জমি, একটা বাড়ি, খুঁটে খাওয়ার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে মার হাত ধরে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। গন্তব্য হয়ত তখনই স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর কয়েকটা বছরের ইতিহাসে অনেক উঁচু নীচু পথ হাঁটা, অবজ্ঞা উপেক্ষায় বিবর্ণ জীবনের করুণ আর্তনাদ। সুরেশ দত্ত এখন আর সেসব কথা মনে করতে চায় না।

অবশেষে গাঁয়ের স্কুলে এই মাস্টারি। কিছু আত্মীয়স্বজন অন্তত এ সাহায্যটুকু করেছিলেন, শিক্ষাবিভাগে বাবারই এক জ্ঞাতি ভাই বড়ো পদে ছিলেন তারই আনুকূল্যে পায়ের তলার এই মাটি, সকলেই চেয়েছিলেন কোনোরকমে সে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। এ ভিড়ের কলকাতায় এই মা আর তার অতি সাধারণ প্রতিভাহীন পুত্রকে কে স্থান দেবে? অনেকে অবশ্য মাকে রাখতে চেয়েছিলেন। মার হাতে অনেক কারিকুরী ছিল, সংসারের কাজে এমন নির্ঝঞ্ঝাট একটি মহিলা অনেকেরই কাম্য, কিন্তু বিনে মাইনের এই ছদ্মবেশ মার পছন্দ হয়নি একথা সুরেশ দত্ত পরে বুঝতে পেরেছে।

মামার দৌলতে পাঁচকাঠা এই জমি। তখন এমন জমি বনবাদাড়ে অনেকের পড়ে থাকত, মামারও ছিল। তার ভূসম্পত্তি নানাজায়গায় ছড়িয়ে আছে তার মধ্য থেকে এই একটি টুকরো মাকে দিয়েছিলেন। সেদিন আর নেই এখন এ জমির অনেক মূল্য। আশেপাশে সমস্ত জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, বড়ো বড়ো বাড়ি উঠেছে, সেদিনের সেই শেয়াল ডাকা গ্রামের চিহ্নও আজ আর নেই। মা তার শেষ সম্বল কখানা গয়না বিক্রি করে এই আশ্রয়টুকু তৈরি করেছিলেন করোগেটের চালা দেওয়া দুখানি ঘর। একসময় আশেপাশের প্রায় সকলের সঙ্গে মার পরিচয় ছিল, আসা যাওয়া সুখ দুঃখের দিনে এক হয়ে থাকা। আজ আশপাশের লোকজনের সে চরিত্র বদল হয়ে গিয়েছে। অনেক নতুনবাড়ি নতুনমুখ, সেসময়ের অনেকেই আজ বিদায় নিয়েছে, মামা জেঠারাও আর কেউ বেঁচে নেই। সুরেশ দত্ত একলা হয়ে গিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে। জাতকর্মে বিবাহে এক আধটা নিমন্ত্রণপত্র আসে ব্যস্ এ পর্যন্ত। স্ত্রী অলকা ততোধিক দরিদ্রের কন্যা নইলে তার কাছে আর মেয়ে দিত কে?

অন্যরকম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, উদ্যোগী পুরুষ নানাভাবে নিজের অবস্থার উন্নতি করে, দরিদ্রের মেধাবি পুত্রকন্যা মেধার দৌলতে উচ্চতর সামাজিক অবস্থায় পৌঁছে যায়, এক্ষেত্রে সেই অসম্ভবের দরজা উন্মুক্ত হয়নি; সুরেশ দত্ত যেখানে ছিল তার থেকে আর একপাও এগোতে পারেনি।

সুরেশ দত্তর অভিমান আছে, তার ভদ্রলোকের অহঙ্কার আছে কিন্তু ওই পুঁজিতে অর্থাগম হয় না, বরং অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়। বড়োলোক অথবা এমনকী মাঝারি অবস্থার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এখন একেবারে মুছে গেছে। মা যতদিন বেঁচেছিলেন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখতেন, শ্যামবাজারে ভাই-এর বাড়ি যেতেন, ভবানীপুরে সুরেশ দত্তর জেঠার বাড়ি, সেখানে নানা দায় সামলাবার জন্য মাঝে মাঝেই মায়ের ডাক পড়তো, গড়িয়াহাটে পিসিমার বাড়ি সেখানেও মা মাঝে মাঝে যেতেন, পিসিমাও দুই একবার এবাড়িতে এসেছেন।

গড়িয়াহাট খুব দূরে নয়, কিন্তু পিসেমশায় চলে গেছেন, বিধবা পিসিমা এখন ছেলেদের উপর নির্ভর করে আছেন, ওরা সবাই বড়ো হয়েছে।

পিসেমশায়কেও দেশভাগের পর অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছে, কেউই সুরেশ দত্তর অবস্থায় নেই।

দেশভাগের পর তের বছরের সুরেশ দত্ত এই কলকাতায় এসে অনেক দেখেছে, কিন্তু তার সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না, ভালো করে লেখাপড়া করে কী করে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হয় এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, আজ বুঝতে পারে ভালো করে লেখাপড়া করলে হয়ত আর একটু ভালো অবস্থায় থাকা যেত, কিন্তু তাও যে কী করে করতে হয় এ চেতনাও তার ছিল না। আর একটু ভালো মাইনের একটা চাকরি, সুরেশ দত্তর কল্পনা এর চাইতে বেশি আর এগোয় না, তখন আশেপাশে সকলের মুখে কেবল একটা কথা শোনা গেছে, 'ছেলেকে একটা কিছুতে লাগিয়ে দাও' আর এই একটা কিছুতে লেগে গিয়ে সুরেশ দত্ত একে ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারলো না। সে একটা সময় গিয়েছে কতদিন কর্মহীন দিন যেন কাটে না, একটা একটা করে গয়না বিক্রি হয়েছে, আর এই বাড়িকেই আঁকড়ে ধরে মা ছেলে বাঁচতে চেয়েছে, সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের দিন আর তাতে যা হয় কোনো স্বপ্ন দেখা আর শেখা হয় নি; এ চাকরিটা পাওয়ার পর এইটুকু স্বল্প আয়েই যেভাবে দিন চলে চলেছে, আজও চলছে।

মাথা গোঁজার এটুকু আশ্রয়, চারপাশে অপরিচিত নিঃসম্পর্কিত লোকের ভিড়, মার হাত ধরে একটি খোলার ঘরে বসতি, বেকার জীবন, তারপরে এই স্কুলে চাকরি হতেই, মা বাকি গয়নাটুকু বিক্রি করে ঘর দুখানা করলেন। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় এটুকু টাকা থেকে মা কী করে

বাঁচাতেন কী করেই বা সংসারের আদায় চালিয়ে যেতেন, অবশ্যই শুধু মা ছেলের সংসার ছিল আর মা যা করতেন সুরেশ দত্ত তাতেই খুশি ছিল।

তারপর এই অলকা, সুরেশ দত্তর মতোই সেও, মার উপর কোনোদিন কোনো দ্বিরুক্তি করেনি, জীবনে তার কোনো চাহিদাও নেই, তারপর সাধারণ নিয়মে এই কন্যা আর দুই পুত্র এসেছে।

সুরেশ দত্ত এখনো বোঝে না, সবকিছু মেনে নেওয়ার এই যে অদ্ভুত মানসিকতা তার থেকেই এরা সবাই এক অবোধ্য জড়তার শিকার। জীবনের উত্থানপতন ভাঙাগড়া এর কোনোটার সঙ্গেই পরিচিত না হতে হতে শুধুই দিন যাপন করে করে এরা এক আঁধির মধ্যে বাস করেছে এর থেকে মুক্তি নেই, এ অন্ধকার গতানুগতিকতার অন্ধকার, হয় বিদ্রোহ বিপথ, আর নয় এই মেনে নেওয়া স্বপ্নহীন বিবর্ণ পথ, তার দুই মেরুর কোনোটাই আয়ত্তে নয়, আয়ত্তে আনার সব প্রয়োজনও এদের জীবনে কোনোদিন অনুভূত হয় নি।

এই বিবর্ণ জীবনে অহরহ বাস করে এর অসহনীয়তার কথাও আর কোনোদিন মনে হয় না আর তাতেই সমাজের অন্যদিক অনায়াসে আপনাকে স্থূল করে এদেরই গ্রাস করে নেয়। সুরেশ দত্ত এসব কথা চিন্তাও করতে পারে না।

তার স্বপ্নও এই তার প্রত্যেকদিনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয় যেন বদ্ধ জলার বুড়বুড়ি তাতে কোনো আলোড়ন নেই, এই পুত্রকন্যাকে ঘিরে সুরেশ দত্ত মাঝে মাঝে আজকাল স্বপ্ন দেখছিল এরা হয়ত একদিন বড়ো হবে এমনভাবে তৈরি হবে যে তার ভাঙাঘরে একদিন চাঁদের হাট ভেঙে পড়বে। মার মুখে ব্রতকথা শোনার একটা লাইনই মনে পড়ে যায়। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে উঠছে, এখন আর স্বপ্ন দেখার কোনোই সুযোগ নেই সুরেশ দত্ত জানে তার অবস্থার আর কোনো পরিবর্তন হবে না।

মেয়ে পদ্মা, কী করে যে সংসারের জোয়ালে দশবছর না পেরোতেই জুটে গেল তার আরম্ভটা আর মনেই পড়ে না, মা চলে যাবার পরই আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুতে ওই মেয়েটাই প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে, বাড়িতে একটা গরু আছে, একটা বাছুর মাঝে মাঝে দুটো বাছুরও হয়ে যায়, ওই গরুটি না থাকলে পাঁচটি প্রাণীর মুখের খাদ্য জোগাবার সমস্যা এই স্কুল থেকে কোনোমতেই মিটতে পারতো না। গরুর পেছনে খাটা খাটনি থেকে শুরু করে সব কাজেই অলকার প্রধান নির্ভর হয়ে উঠেছে পদ্মা, মা বেঁচে থাকতে অলকা যেমন মায়ের হাতের নির্ভর ছিল। প্রথমদিকে গরুটা আড়াই সের তিন সের দুধ দিতে থাকে তখন সকালের দুধটা আশেপাশের লোকেরা নিয়ে যায় আর বিকেলের দুধটা বাড়িতে খরচ হয়। বাড়িতে অল্প স্বল্প তরিতরকারী ফলাতে হয় কারণ বাজার থেকে তরকারি কিনতে গেলে আর চাল কেনার টাকা থাকবে না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কাজে পদ্মা আর অলকা চরকির মতো ঘুরতে থাকে, আর সন্ধে থেকে ঠোঙা বানানো, তাতে অবশ্য ছেলে দুটোও হাত লাগায় কিন্তু তা আর কতটুকু।

পদ্মার প্রথমবার টেস্ট পরীক্ষার আগে নানা অসুখ বিসুখে প্রায় ছয়টা মাস অলকা প্রায় শুয়েই থাকল, আর রাঁধা খাওয়ানো এসব করতে করতে আর পরীক্ষা দিতেই পারলো না মেয়েটা, তারপরের বছরও হল না, তৃতীয়বারে ওই থার্ডডিভিশন, সুরেশ দত্ত বুঝতে পারল আর কিছু হবে না। ছেলে দুটির একজন এবার পরীক্ষা দেবে আর একজন পরের বছর, কিন্তু সেক্ষেত্রেও এমন কিছু আশার আলো নেই পাশ করবে কলেজে পড়বে এ পর্যন্ত, তারপরের কথা এখন আর ভাবার সুযোগ নেই; এত সুরেশ দত্ত যদি ভাবতে পারত, সব কিছুই হয়ত অন্যরকম হত। পদামরও একবার কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা উঠেছিল, পদ্মাও যে একটু স্বপ্ন দেখেনি তা নয়, কিন্তু কী হবে কলেজে পড়ে; পড়াশোনা করে পদ্মা বেশি কিছু করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, তাতে আর টাকা খরচ করার কথা ভাবা যায় না। সুরেশ দত্ত এবার মনে মনে পাত্র খুঁজতে শুরু করেছে, এই একমাত্র সমাধান, অলকাও বলে 'এবার মেয়েকে বিয়ে দাও।'

কথাটা যথার্থ! কিন্তু বিয়ে দাও বললেই তো আর বিয়ে হয়ে যায় না, এই বাড়ি, এই ঘর এই তারা মা আর বাবা এমনি একটা অনুজ্জ্বল পরিবার প্রতিদিনের খাদ্য জোগাতে হাক্লান্ত এর মধ্যে আলোর ইশারা কোথায়? ছেলে দুটি খায় দায় স্কুলে যায় সরস্বতী পুজো দুর্গাপুজোয় মাতে জীবনে হৈ হুল্লোড় আনন্দ ওই পর্যন্ত মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মাঠে বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরা, অন্যকিছু অন্যরকম করা, স্বপ্ন দেখতে শেখা কোনোটাই এদের হয়ে উঠেনি, চারিদিকে চলমান থৈ থৈ জীবনে এদের কোনো ভূমিকা নেই, দূরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক এরা, জীবনের সক্রিয়তায় এদের কোনো যোগ নেই।

জীবনে যে উচ্ছলতা আসে যে প্রাণশক্তিতে মানুষ দুর্বার হয় যৌবন আছড়ে পড়তে চায় বন্ধুর পথের চলমানতায়, সে প্রাণশক্তির জাগরণ কোথায়? প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবন যেন এদের মৌন করে রেখেছে, আর কিছু করার আছে সে বোধেরই বা উৎস কোথায়?

সুরেশ দত্ত যথার্থই নির্বিরোধ মানুষ কিন্তু এই মধ্যবিত্ত নির্বিরোধিতা তাকে যেন জড় করে রেখেছে, তার পরিবারের লোকগুলিরও তার কাছে কোনো দাবি নেই, অলকা প্রাণপণে ছেলেমেয়েদের তাই শিখিয়েছে, আর তারই ফলে দুবেলা পেট পুরে খেতে পেলেই এরা খুশি, আর যাবতীয় উদ্যোগ এই খাবার যোগাড় করার পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়।

সুতরাং পদ্মার একমাত্র লক্ষ্য বিয়ে। এছাড়া আর কী ভাববার আছে? মা বাবাও এই একটাই স্বপ্ন দেখতে থাকে, এখন একমাত্র কর্তব্য পদ্মার বিয়ে দেওয়া। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখার মতোই অলকাও স্বপ্ন দেখতে থাকে। একটা জমজমাট সংসারে মেয়ে গৃহিণী হয়েছে, কত আত্মীয় পরিজন কত দায়-দায়িত্ব। এই রোগা রোগা কচি কচি মেয়েটা কতলোকের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সেবায় যত্নে একটা পরিবারে অপরূপ মহিমায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে এ মেয়ে। সেই ব্রতকথার বরপ্রাপ্ত ভিখারিণীর মতো পদ্মা হঠাৎ রাজরানি হয়, সর্বাঙ্গে ঝলমল করে গয়না বাহারি শাড়ি আর কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। আহা কী ভাগ্যবতী মেয়ে সত্যি ভাগ্যে কী না হয়, মেয়ের ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে!

দীন দুঃখীর ঘরে দুবেলা অন্ন জোগানোই যেখানে বিলাসিতা, তা থেকে মুক্তি পেয়ে এই মেয়েই হয়ে উঠেছে তারিণী। বহুদিন পর হঠাৎই যেন একটা সুখসুখ অনুভূতি তাকে রোমাঞ্চিত করে।

গরিবের ঘরের মেয়ে সে গরিবের ঘরণী, দিনরাত কড়ির ধন সামলাতে সামলাতে মন, হৃদয়, ভাবনা চিন্তা বোধ বুদ্ধি কোনো কিছুই কী তার পরিণতি পেয়েছে, আর এই চিন্তা ভাবনার বালাই ছিল না বলেই কোন্‌টা দুঃখ কোন্‌টা সুখ তার পার্থক্যও যেন তার কাছে পরিষ্কার নয় বুঝিবা সুখ দুঃখের অনুভূতিটাই গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজকাল ওই একটা ভাবনা পেয়ে বসেছে পদ্মার বিয়ে।— কিন্তু কবে, কখন কী উপায়ে?

সুরেশ দত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভদ্রলোকের মোটামুটি একটি শিক্ষিত ছেলে, একটা সাধারণ চাকরি করুক না কিছু আসে যায় না মেয়েকে তারা সেভাবেই তৈরি করেছে। একটি বুদ্ধিমান উদ্যোগী ছেলে যদি পদ্মার বর হয় তাহলে সুরেশ দত্তও একটি সহায় পান। এই নিঃস্ব নিঃসহায় জীবনে একটি অন্তত এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে বর কাছের মানুষ হয়ে থাকতে পারে। এই আত্মীয় বন্ধু বিরহিত জীবনে বুঝি একটু রং লাগে। সুরেশ দত্ত বেশি আশা করে না, সে জানে তার মতো অবস্থায় পদ্মার জন্য একটি সাধারণ ভালো ছেলে জোগাড় করতে কত কষ্ট। কিন্তু তবু! মেয়েটি তো সুশ্রী! প্রথমেই সুরেশ দত্ত একটা হোঁচট খেল, সবছেলেই আগে একটি বি.এ.পাশ মেয়ে চায়। যে সৌন্দর্য মেয়েদের পুঁজি, যে সৌন্দর্যকে এই সমাজ ঘরের সম্পদ বলে মনে করে, যারা ঘরের বউএর সৌন্দর্যও অন্য আর পাঁচটা মূল্যবান সম্পদের মতোই পরিবারের গৌরব বাড়াবার জন্য চায় সে সৌন্দর্য এ সৌন্দর্য নয়, সে সৌন্দর্যে পালিশ লাগাতে হয় অর্থকৌলিন্যে

তার চমকানো পালিশ ঝলমল করে, অনাদর অবহেলায় অমার্জিত এই সৌন্দর্য্য সংসারের কোনো কাজে লাগে না। সুরেশ দত্তর কোনো পুঁজি নেই, মেয়ের সৌন্দর্যও বিয়ের বাজারে মূল্যহীন, সুরেশ দত্ত অনেক দুঃখে এ সত্যকে জানতে পারল। পছন্দসই কোনো সম্বন্ধই এলো না। মেয়ে গ্র্যাজুয়েট নয় তার চাইতেও বড়ো কথা টিনের দুখানা ছোটো ঘর আর একচিলতে জমি নিয়ে তার এ বাড়ি, আত্মীয় রিজনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এ বাড়িতে কে আসবে? সমাজের একপাশে নিতান্ত অবজ্ঞায় অবহেলায় পড়ে আছে তারা, তাদের যে আর্থিক অবস্থা, আর যে সমাজের সঙ্গে তাদের নিত্য ওঠা বসা, তাদের মধ্য থেকে সুরেশ দত্তর পছন্দমতো একটি ছেলে যোগাড় করা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজ সুরেশ দত্ত বুঝতে পারে ভদ্রভাবে চলার যাদের সংস্থান নেই তারা কোনোরকম আশাই করতে পারে না। মেয়েকে যেমন পরিবারে যেরকম ছেলের কাছে তারা দিতে চায় তাও এখন স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

অথচ এ পরিবারে ভদ্ররুচি আছে, পদ্মা আশেপাশের বাড়িতে বিশেষ আসা যাওয়া করে না, ওইসব বাড়ির সমবয়স্কা মেয়েদের জীবনযাপনের সঙ্গে পদ্মার জীবনযাপনের কোনোই মিল নেই, তারা কলেজে যায় বেড়ায় আমোদপ্রমোদ করে সিনেমা দেখে একটি দুটি ছেলে বন্ধুর সঙ্গে গোপনে মেশে।

তাদের সমশ্রেণি পরিবারে যেসব মেয়েরা লেখাপড়া করে না, তারাও নানা সস্তা আমোদ প্রমোদে নিত্য মেতে আছে।

সুরেশ দত্ত এই সস্তা আমোদ প্রমোদের জীবন থেকে দূরে থাকতে মেয়েকে শিখিয়েছে। মেয়ে চিরকালই বাধ্য— কাজেই সে ও ভাবেই মানুষ হয়েছে। আবাল্য যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে পদ্মাকে, পদ্মাও একদিন মোটামুটি একটি মাঝারি বাড়িতে বধূ হয়ে চলে যাবে এ আশাই করেছে। আজ দেখা যাচ্ছে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এমনিতে পদ্মা বিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে তা নয়, বিয়ে না হলে তার নিজের দিক থেকে কোনোই ক্ষতি আছে বলে সে বুঝতে পারে না। এখানে মায়ের পায়ে পায়ে হেঁটে হাজার রকম গরিবের গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থেকে তার সময় ভালোই কাটে, কখনও বাড়িঘর পরিষ্কার, কখনও জামাকাপড় পরিষ্কার, এর ওর তার জন্য নানারকম আরামের ব্যবস্থা, সবই ওরা নিজেরাই করে, তারই মাঝখানে ভায়েদের সঙ্গে এখন তখন খুনসুটি খুঁটে দেওয়া, ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করা, কাজের তো আর অন্ত নেই।

কিন্তু মা আর বাবার বিষণ্ণ মুখ হতাশা অন্তর্বেদনায় সেও কেমন মুষড়ে পড়ে, মনে হয় তার একটা বিয়ে হয়ে গেলেই মা আর বাবার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

স্বপ্ন কী একেবারেই পদ্মার নেই? কৃপণের ধনের মতো সে স্বপ্ন বড়ো গোপনে লালিত হয় বাইরে তার কোনো আভাস নেই, গরিবের মেয়ের সে স্বপ্ন মনের কোনো অতলে অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে, তাকে বাইরে নিয়ে আসা সে যে বড়ো লজ্জার কথা। এ স্বপ্ন গোপনেই ফোটে, গোপনেই ঝরে সুতরাং...

সুরেশ দত্ত সম্ভব অসম্ভব কত কথাই বলে, মাঝে মাঝে এক একটি সন্ধান নিয়ে আসে, অলকাকে বলে, 'জান একটি পাত্রের সন্ধান আজ পেলাম— আমাদেরই সমান ঘরের ছেলে ওরা দস্তিদার; সরকারি অফিসে স্থায়ী কেরাণীর চাকরি আজকাল সরকারি চাকরির মতো আর কোনো চাকরি আছে বলে, চাকরে হলেই হাজার টাকা মাইনে,—

অলকার মুখ উজ্জল হয়— "দেখোনা আবার বি এ পাশ না চেয়ে বসে, যোগাযোগ করো, ' কিন্তু সুরেশ দত্তর মুখে আলো ফোটে না, — ভদ্রঘরে বিয়ে দিতে হলে ভদ্ররকম সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হয়— সকলেরই একটা মান মর্যাদা আছে তো— কত টাকা খরচ হবে বুঝতে পার? আজকালকার যুগ,— ভট্টচায্যি মশায় বলেন এখন আর বরপণ বলে বোধহয় কিছু চাইতে পারবে

না ওখানেই ধর— সাত আট হাজার, আবার এদিগের খরচ আমার তো এতো কিছু মাথায় নেই ভট্টাচায্যি মশাই হিসাব করে দেখালেন, তাতে কিছু না করেও হাতে গলায় কানে গয়নার খরচই কম করে আরও আট হাজার টাকা, বরকে আংটি আর বোতামতো দিতেই হয়। তারপর পূজাপার্বণ খাওয়া দাওয়া—"

অলকার বাক্‌রোধ হয়ে যায়— এত টাকার হিসাব তার মাথাতেই আসে না, এ যে কত হাজার টাকার দরকার! আর কিছু বলার নেই স্বামী স্ত্রী দুজনেই চুপ করে থাকে।

তারপর সুরেশ দত্ত ক্ষোভ জানায়— তোমার যে একটু সোনা বলতে কিছু নেই, একটু আধটু থাকলে সোনার কাজ ওতেই চলে যেত।

অলকা চুপ করে থাকলেও তার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলে, ভেতরটা খান খান হয়ে যায়। তার বাবা সত্যই খুবই গরিব ছিলেন কিন্তু তা হলেও তারও মারই গয়না থেকে হাতে গলায় কানে একটু সোনা দিয়েছিলেন। ক্রমে তার সবই গেছে, কিছু মা হতে গিয়ে; আর পাতলা পাতের মতো গলার হারটা শাশুড়ির শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে। কথা না বললেও একটা শ্বাসরোধকারী কষ্ট তার কণ্ঠরোধ করে দেয়, অলকা মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে, সুরেশ দত্ত চুপ করে, এবার তারও মনে পড়ে— একটু সোনা অলঙ্কার ছিল।

সে নিজে যে বড়ো অক্ষম এই অক্ষমতার বোঝায় সুরেশ দত্ত হঠাৎ যেন বড়ো অস্থির হয়ে পড়ে— চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা দুলতে থাকে, কিছুতেই কী এ পর্দাটাকে সরানো যায় না, কিছুতেই না?

মেয়েকে আর বুঝি বিয়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না। কোনো দিকে আর কোনো উপায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মা সব কথাই কিছু কিছু শোনে, যেটুকু শোনে না সেটুকু বুঝে নেয়, মা বাবার অন্ধকার মুখ নীরস কথাবার্তা তাকে হিম করে, মুখের সবটুকু হাসি শুষে নিয়ে তাকে বিরক্ত করে দেয়।

মনে হয় যে কোনো একটি ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে বুঝি মা বাবাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু যেসব ছেলেদের সঙ্গে তার পরিচয়, হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়, তাদের সঙ্গে পদ্মা কোনোরকমেই ঘনিষ্ঠ হতে পারে না: অসম্ভব; বন্ধুদের মধ্যে পরিচিতদের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটছে, কিন্তু পরে তাদেরও দেখেছে পদ্মা অসহায় সম্বলহীন জীবন তাদের শুধু লাঞ্ছনা আর অপমানই দেয়, তাদের চোখে কী এক দুর্বোধ্য হতাশা খেলা করে, সুখের আলো নেই।

একই হতাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাদের মধ্যে ডানা ঝাপটে পড়ে আছে, তাতে মুক্তি নেই।

কত অসম্ভব কল্পনা মনে আসে, কোথাও কী চিরদিনের মতো হারিয়ে যাওয়া যায় না, অথবা কোনো উপায়ে কিছু টাকা রোজগার? কিন্তু পদ্মার যে কোনো রাস্তাই জানা নেই, কোনো কিছুই তার শেখা হয়নি, আজ হিসেব করে দেখে পদ্মা, যেসব কাজ সে শিখেছে, সারাদিন যেসব কাজে সে ব্যস্ত থাকে তার এক কড়িরও মূল্য নেই একমাত্র অন্যের বাড়ি দাসীবৃত্তি করা ছাড়া, এসব কাজের কোনোই দাম নেই, কিন্তু তাতো হতে পারে না।

এই ভাবনা চিন্তার জগতে পদ্মা একেবারেই একা, হঠাৎ সে মা বাবার জগৎ থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মা বাবার সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রে সেই আছে, একথা ভেবেই সে অস্থির হয়ে পড়ে, একটা অলৌকিক কোনো উপায় থাকত সে হয়ত এই যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারত, কিন্তু সেসব চাবিকাঠিও তার আয়ত্তে নেই। এতদিন একরকম ছিল, আলোও ছিল না আবার অন্ধকারটাও নেপথ্যবাসী হয়েছিল, আজ ঝপ করে পরিবারটায় এই অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই অন্ধকারকে দেখতে পেয়েছে পদ্মা, এ অন্ধকারের চেহারা বড়ো ভয়ঙ্কর, অলকা আর সুরেশ দত্ত যে অন্ধকারের শিকার পদ্মা তার হাত থেকে বাঁচতে পারে না।

সেদিন বাড়িতে রসময় এলো, এককাপ চা খেয়ে ঘুরে ফিরে সারা বাড়িটা সে ভালো করে দেখতে লাগল, সুরেশ দত্তও সঙ্গে আছে। পদ্মা আশ্চর্য হয়ে যায় হঠাৎ এই রসময় বাড়ি দেখতে এসেছে কেন? কী উদ্দেশ্য?

পদ্মা অলকার কাছে জানতে চায়। রসময় বাড়ির দালাল। অলকা আস্তে আস্তে বলে বাড়িটার শুধু ঘর দুখানি রেখে বাকি জায়গাটা তোমার বাবা বিক্রি করে দেবেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পদ্মার বিয়ের জন্যে টাকা জোগাড় করতে এই একটিমাত্র উপায় আছে। পদ্মার মুখে কোনো ভাষা জোগাল না, কথাটা পাথরের মত ভারী হয়ে তার মাথায় চেপে রইল।

অনেক চিন্তা করেছে সে, এবাড়ি বিক্রি করে বাবা রাজপুত্র আনতে চাইছে, তাতে তাদের ভবিষ্যতে এমন কী সুখের উদয় হবে, যে এই শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে ফেলতে হবে? অলকা চিরাচরিত উত্তর দেয়— 'মেয়েকে পাত্রস্থ করা মা বাবা'র কর্তব্য মা, কিন্তু তোমাকে তো আমরা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি না, কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? তুমি সুখে থাকলে আমাদেরও সুখ।' পদ্মা এবার মরিয়া হয় "আমি সুখে থাকলে তোমাদেরও কী সুখ সেজন্য তোমাদের শেষ সম্বলটুকু শেষ করে দেবে! আমি সুখে থাকলে তোমাদের কী সুখ? আমি ভালো খাব থাকব, ভালো জামাকাপড় পরব তাতে তোমাদের কী হবে? আর এত টাকা খরচ করে আমাকে ভালো ছেলের কাছে বিয়ে দেবে, সে কীরকম ভালো হবে তোমরা কী করে জানবে? মুখরক্ষার জন্য মেয়ে যাতে কথা না শুনে সেজন্য অনবরত তোমাদের এভাবে সেভাবে দিয়েই যেতে হবে, সেতো তোমরা আমার থেকে ভালো জানো।

আমি কদিন তোমাদের কাছে এসে থাকব, তোমাদের অভাবে অভিযোগে আমি কী দশটাকাও সাহায্য করতে পারব? তোমরা দিন দিন আরও গরিব হয়ে যাবে, সকাল হলে এই যে তরিতরকারিটা তুলে নিয়ে এসে ভাত খাবার ব্যবস্থা করো তাও যাবে, গরুটা কোথায় বাঁধবে! তোমাদের কাছেই শুনেছি জমির দাম ক্রমশ বাড়ছে, তোমরা এ জমি বিক্রি করে বাড়ি ঘর করে ভাড়া দিতে পারবে; তোমাদের একটা ব্যবস্থা হবে, আমার সুখ হবে জানলে কী করে? 'সত্যি সুখ হবে কিনা কেউ জানে না, অলকার মা বাবাও হয়ত ভেবেছিলেন অলকার সুখ হবে কিন্তু সুখ হয়েছে কী? সুখ কী জিনিস তার কেমন চেহারা অলকা জানে না, তার সঙ্গে কখনও অলকার পরিচয় হয়েছে কী? আবার দুঃখেরই কোন চেহারা অলকা কী করে বলবে? সুখ দুঃখকে আলাদা করে চেনার সুযোগ কোথায়? পদ্মা বড়ো কঠিন প্রশ্ন করেছে, সুখ হবে কী না কে বলতে পারে?

পদ্মা আবার বলে 'সুখের কথা বলো না মা সুখ কী তোমরাও জাননা আমিও বলতে পারবো না। বলো আমার একটা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে চাও— তাও হবে কী? কেউ জানে না মা কেউ জানেনা।' সত্যিইতো পদ্মার বিয়ের সঙ্গে এই খাওয়াপরার প্রশ্নটা বড়ো কঠোর হয়ে যুক্ত হয়ে আছে, অবশ্য আরও হয়ত অনেক কিছু আছে অলকা ভালো করে ভাবতে পারে না।

"আমি খেয়ে পরে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো সেজন্য তোমরা ভিখিরি হয়ে যাবে? আমি তোমাদের ভিখিরি করে দিয়ে যাব? তা হয় না মা"— পদ্মার চোখ দুটো জলে ভরে উঠে।

অলকা অবাক হয় মেয়ের মুখে এত কথা ফুটেছে দেখে, সত্যি পদ্মা এবার বড়ো হয়ে গেছে আর সে ছোটো মেয়েটি নেই। "বিয়েতো আর ঠিক হয়ে যায়নি, তোমার বাবার ভালো বংশ, ওরা কালীকচ্ছের দত্ত তাই একজন একটু আগ্রহ দেখিয়েছে। যারা সম্বন্ধ করবেন তারা বরিশালের গুহ, ছেলে বি.এ.পাশ মেয়েই চায়, স্কুলের হেডমাস্টারমশাই আমাদের জানেন, তোমাকেও ছোটো থেকে দেখেছেন তাই সম্বন্ধটা এসেছে।" "তাতে তোমরা এত টাকা খরচ করে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যাবে? এত টাকা তোমরা খরচ করবে?"

"মেয়ের বিয়ে বলে কথা, সত্যিই অনেক টাকার দরকার একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে,

আদর আপ্যায়ন, আসা যাওয়া আনা নেওয়া অনেক টাকার দরকার হয়। ওরা পণ চাইবে না, কিন্তু সম্মান রেখে প্রণামীটুকুর ব্যবস্থা করা চাই— হিসাব শুনলে মাথা ঘুরে যায়।"

পদ্মা ছোটো করে হাসে, তোমার এত হিসেব দিতে হবে না, বাড়ি বিক্রি যেদিন ঠিক হবে আমি পালিয়ে যাব। কোথায় যাব তোমরা আমায় জিজ্ঞেস করো না— মোট কথা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওরা বংশ জাত গোত্র সব দেখে বিয়ে ঠিক করবে মেয়ে পছন্দ করবে, আর তোমরা শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে আমার সুখ দেখবে আমি ওদের বাড়ি গিয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখব, সেবা-শুশ্রূষা দায় দায়িত্ব। যদি না পারি ক্ষমতা না থাকে তাহলেই আমাকে অপমান করবে তোমাদেরও অপমান করবে তারপর আবার কত মন জোগানো তোমরা সবসময় দেওয়া আনা নেওয়া সব করতে থাকবে তবে তো— এর কী আর শেষ আছে! আমার বিয়ের দরকার নেই যেমন আছি, তেমনি তোমাদের সঙ্গে থেকে যাব।"

এবার অলকা সত্যি সত্যি রেগে যায়, "আমরা কি সারাজীবন বেঁচে থাকবো, আর বিয়ে কী ঠিক হয়ে গেছে নাকি? মেয়ে দেখতে ভালো শুনে রাজি হয়েছে, আগে মেয়ে দেখবে তবে তো তাও মেয়ে দেখতে এসে, এই বাড়ি ঘর এই নাড়া নেংটা চালচলন ওদের পছন্দ হবে কিনা কে জানে!"

পদ্মার মতো 'পছন্দ হবার দরকার নেই এ বিয়ের কথা তোমরা মুখেও আনবে না।' পদ্মাকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না, সুরেশ দত্ত অবাক। খেলতে খেলতে মেয়েটা কখন এমন বড়ো হয়ে গেল, কখন এমন শক্ত হয়ে গেল পোড় খাওয়া মানুষের মতো। কিন্তু একবার ওরা আসুক মেয়ে দেখে যাক। কিন্তু পদ্মা তার 'না' থেকে আর নড়লো না। এত দিয়ে থুয়ে বি.এ. পাশ চাকুরে জামাই কোনো প্রয়োজন নেই, হাজার দিয়ে থুয়েও গরিবের খোঁটা মুছতে পারবে না হাঘরের মেয়ে বলে আমার কেবলই কথা শুনতে হবে, আর তোমরা এ বাড়ি বিক্রি করে আমার খাট পালঙ্কে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে দেবে এ হতে পারে না।

হেডমাস্টারমশায়ের কাছে সুরেশ দত্ত কিছু গোপন করে না তিনি সবই শুনলেন বললেন 'এ মেয়ের বিয়ে তোমরা দিতে পারবে না।' একদিক দিয়ে আবার সুরেশ দত্ত খুশি হয়ে উঠেছে সত্যি এবাড়ি যে তার পাঁজরের চেয়েও বেশি। ভবিষ্যতে এ জায়গাটুকু নেড়েচেড়েই একটা যাহোক ব্যবস্থা করতে হবে এখনই বিক্রি করে দিলে একটা পয়সাও থাকবে না। হয়ত এরই টাকা দিয়ে অন্য অংশে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিতে পারবে একটা ব্যবস্থা হবে জমির দাম হু হু করে বাড়ছে দেখেই এসব পরিকল্পনা মাথায় আসে। ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দিলেও মাসে দু'শ চারশ টাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

পদ্মা তাই বলে। তবে? আমি কী কখনও তোমাদের তিনশ চারশ টাকা করে দিতে পারব, আর টাকা থাকলে তো বাবা আমারও থাকল। এই তোমাদের বুড়ো বয়সের সম্বল বাবা, এ কখনও হাতছাড়া করবে না।

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই সত্যি সুরেশ দত্তর মঙ্গলকামী, আর পদ্মাকেও বড়ো ভালোবাসেন। তিনি আর একটি ছেলের খোঁজ আনলেন, এই লক্ষ্মী মেয়েটি তাকে বশ করেছে।

পাত্র ব্রজেনের তিনকুলে কেউ নেই। একটা সরকারি রেকর্ড অফিসে সে চাকরি করে, তার বন্ধুরা একটি মেয়ে খুঁজছে; হেডমাস্টারমশাই ছেলেটিব সন্ধান পেয়েছেন, কোনোই দাবি দাওয়া নেই, তার নিজেরও বাড়িঘর কিছু নেই, এই চাকরিই সম্বল। সাহায্য করবার জন্য আত্মীয় স্বজন যেমন নেই তারও কাউকে কিছু করতে হয় না। এবার নিশ্চয় পদ্মা অমত করবে না কেননা প্রায় বিনা খরচেই বিয়ে হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েকে একদিন দেখাতে হবে। অবশ্য ব্রজেন এবিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু তার বন্ধুরা

একবার মেয়েটিকে দেখতে চায়, সুরেশ দত্তও ছেলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন, তারা স্বাস্থ্য ভালো সুশ্রী মেয়েই শুধু চায়, রং নিয়ে কোনো বায়নাক্কা নেই।

পদ্মা কিন্তু ছেলের বন্ধুদের কাছে রূপের পরীক্ষা দিতেও রাজি হয় না। এবার অলকা মেয়েকে তিরস্কার করে। একবারও মেয়ে না দেখে কী করে বিয়ে হয়।

কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের কথা যদি ওরা বিশ্বাস করে তাহলে আর মেয়ে দেখার কী আছে? ওরাতো সুন্দরী মেয়ে চায়ও না। তবু হেডমাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা মতো বন্ধুর সঙ্গে একদিন সকালে ব্রজেন বাড়িতে এলো। ছেলেটিকে দেখে অলকার খুবই পছন্দ, সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে, বন্ধুরাই বলল মেয়েকে একটু ডাকুন দুজনে একটু কথা বলুক। ওদের আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু পদ্মা বলে আলাপ করার কী আছে? হেডমাস্টারমশায় বুদ্ধি করে পদ্মার কাছে একটু জল চাইলেন, এবার পদ্মা আর দ্বিধা করলো না। একগ্লাস জল এনে দিয়ে গেলো। ওরা পলকের জন্য মেয়ে দেখলো মাত্র, কোনো কথা বলার সুযোগ হল না।

অলকা ভাবছে বাড়ির চেহারাটা বড়ো দীন, তিনজনকে বসতে দেওয়ার মতো চেয়ারও নেই। একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে মাস্টারমশাই বসেছেন আর সবাই-এর জন্য মোড়া আর জলচৌকি। অলকা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। ওদেরকে এক কাপ করে চা বিস্কিট আর সন্দেশ দেওয়া হল।

দুটি প্রশ্ন আছে, ছেলেটি ভদ্রলোক তো? বড়ো কঠিন প্রশ্ন, কেবল পূর্বপুরুষদের নাম গোত্র খোঁজ করেই ভদ্রলোক কীনা জানতে হবে, আর ছেলেটি অফিসে কি চাকরি করে? অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে হবে। বন্ধুরা পরিষ্কার কিছু বললো না, বললো "অফিসে খোঁজ নেবেন।" হেডমাস্টারমশায় তার আদি নিবাস ইত্যাদি খোঁজ করবেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধানে ছেলেটি ভদ্রলোকই জানা গেল। কিন্তু সুরেশ দত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসলো। অফিসে খোঁজ নিয়ে আসা হয়েছে ব্রজেন অফিসে পিয়নের চাকরি করে, সরকারি অফিসে সে পিয়ন!

আর কোনো চাকরি সে জোটাতে পারেনি। মাষ্টারমশায়ও থমকে গেলেন। পিওন? আর বাড়িঘর? কলকাতাতেই থাকে সে, রাস্তার উপরেই বেশ বড়ো একখানা ঘর। বাথরুমের ব্যবস্থা আলাদা নেই, অন্য সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এমন বড়ো রাস্তার উপরে সে ঘর জোগাড় করলো কী করে? ঘরখানা পাওয়ার ইতিহাস আছে, নইলে এমন জায়গায় দেড়শ টাকায় এমন ঘর মেলে না। মা বাবা মারা গিয়েছে অনেকদিন, ছেলেটি পিসিমার কাছে মানুষ। পিসেমশায় দেশভাগের পর এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাই মারা যাওয়ার পর ব্রজেনের মা আর ব্রজেনকে পিসিমা নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর একে একে সকলেই গেছে।

এ ঘর যখন নেওয়া হয় তখন এজায়গা এমন ছিল না। রাস্তায় এত দোকানপাটের ভিড়ও ছিল না। ক্রমে শহর বেড়ে এ অঞ্চলের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে। এখন চারপাশে বহু বাড়ি ঘর দোকানপাট, রাস্তার পাশে দোকানঘর বেড়েই চলেছে। একটু ভেতরে এগিয়ে গেলেই শ্যামল শান্ত স্নিগ্ধ মাঠ ঘাট এখনও চোখে পড়ে কিন্তু শহর যেভাবে দৌড়াচ্ছে তাও আর বেশিদিন নয়। ব্রজেনের ঘরের সামনে রাস্তা, সরকারি বেসরকারি বাস ধূলা উড়িয়ে চলে মুহুর্মুহু; দুপাশে ঘিঞ্জি দোকান, তার ঘরটির উপর অনেকের লোভ, কিন্তু ব্রজেন এ ঘর ছাড়বে না। সে যাবে কোথায়? ব্রজেন ভাবে সে নিজেই এখানে দোকান করবে। কিন্তু ব্যাবসা কী করে করতে হয় তাইতো আগে শিখতে হবে, অন্য সকলকে সে একথাই বলে। আমি নিজেই এখানে দোকান করব।

ছেলেটি অবশ্য স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে, কিন্তু পিওন! সুরেশ দত্ত ভাবে এই অভাবের সংসারে তার মেয়ে বড়ো হল, সারাজীবনে আর একটু ভালো থাকা কাকে বলে সে জানবে না। আর তার নিজের জীবনে ধিক্কার এলো, এতই অলস পিতা সে, সন্তানদের কোনো রকম সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারেনি, এই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি।

হায়! সুরেশ দত্ত জানে না, এই যে একটা ফ্রেমের মধ্যে সে আটকে আছে, এর থেকে বেরিয়ে আসা, কোনোক্রমেই সহজ নয়। আপ্রাণ চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে চাইলেও নিয়তি কঠিন হাতে নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে ঠেলে দেবে।

একটা অবস্থা আছে তার থেকে বেরিয়ে আসা যায় না, অতি বাল্যকালে যে দুর্ভাগ্য তার হাত ধরে এতদূরে নিয়ে এসেছে এখান থেকে আর তার ফেরার উপায় নেই। জীবনে সকল বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবার মর্মান্তিক শিক্ষা তার হয়নি। তার পুত্রকন্যাও একই অবস্থায় বড়ো হয়ে, তারই মতো ধুঁকে ধুঁকে একদিন এ জীবনলীলা শেষ করবে। আজ বহুদিন পর আর্ত ধিক্কারে সুরেশ দত্ত জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়— "এই সমস্ত অবস্থার জন্য আমিই দায়ী।"

ছেলেটিকে কথাবার্তায়-চালচলনে ওদের বড়ো পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আত্মীয় পরিজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই জানবে পদ্মাকে শেষ পর্যন্ত সুরেশ দত্ত একটা পিওনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

আর পদ্মা? তার কৌতুক হয়, মন্দ কী,— এর চেয়ে ভালো মা বাবা কেন আশা করে— সে বুঝতে পারে না; মা বাবার গায়ে আঁচ লাগবে না তাইতে সে কিন্তু খুশি!

অলকাও তাই বলে, 'কে কী ভাববে আমাদের ভাবলে চলবে না; আত্মীয়স্বজন-কে আমাদের খোঁজ রাখে বলত? বিয়ের একটা নিমন্ত্রণ চিঠি যাবে ওই পর্যন্ত। আমরা কাউকে বাড়িতে আহ্বান করে আনতে পারবো না, আমাদের সে সামর্থ্য নেই, আর আমরা এর চেয়ে ভালো কী করে আশা করবো?'

অলকা সুরেশ দত্ত মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করে না, এ মেয়ে একদিনে তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছে, মা বাবাকে এমন করে কটা মেয়ে জানে? পদ্মার মতটা আগে প্রয়োজন, পদ্মা কী বলে? সে কী বলবে, পদ্মাতো বিয়েই করতে চায় না আর একেবারে সহজে কোনো ঝামেলায় না গিয়ে এর চাইতে ভালো ছেলে আর কোথায় মিলবে? "কাজেই বিয়ে তোমরা যখন দেবেই আর বাছাবাছি করো না এখানেই দাও।" অতএব পদ্মার বিয়ে হয়ে গেল! অলকা দেখল উৎসব বেশ আনন্দজনকই হল, আনন্দ সৃষ্টিতে অর্থটাই যে প্রধান নয়, প্রমাণিত হল। আলো, রোশনাই, চব্য চোষ্য নাইবা রইল, হাসি ঠাট্টা, রসিকতা, চারপাশের সমান অবস্থার লোকের আনাগোনা, লোকাচারের ছোটো ছোটো শুভ কর্মে পাঁচ এয়োর মঙ্গলধ্বনি, শাঁখ আর উলুর সমারোহ পদ্মার বিয়ে জমিয়ে দিল। কেবল পাঁচজন নয় সাত সতেরো এয়োরা নিজেরাই মাতামাতি করলো; ছেলেদের বন্ধুরা মেয়ের বন্ধু তাদের ভাইবোন, বাড়ি মাতিয়ে রাখলো। পানসুপারি চা মুড়ি মুড়কিতে ওরা কোনো কার্পণ্য করলো না, যখনই যে এলো মুঠো ভরে জলখবার পেলো, হাতে হাতে নিজেরাই সব জোগাড় যন্ত্র করে অলকার সমস্ত দায়দায়িত্ব হালকা করে দিল।

আশেপাশে মেয়েরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে, যার যা মনে এলো, নির্দ্বিধায়— তাই করতে লাগলো, অলকার কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই, কাজেই সকলের হাসি আর খুশি ফোয়ারার মতো অনায়াসে ঝরে পড়লো, সবারই যেন নিজের বাড়ি; এই একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে অলকা আর সুরেশ দত্ত অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তবু কিছু নয়— কিছু নয় করে দুই তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। এ টাকাটা অবশ্য স্কুল থেকেই ধার পাওয়া গিয়েছে।

একটা সাধারণ ঝকমকে সিল্কের শাড়ি আর সুন্দর রুপোর গয়নায়— পদ্মা যেন রাজরানি। বন্ধু একটা ইমিটেশন সিঁথিও পরিয়ে দিয়েছে, পদ্মা একচিলতে সোনাও নেয় নি, ব্রজেনকে কেবল একটি আংটি দেওয়া হয়েছে।

আঁচলে চাল বেঁধে দিতে দিতে অলকার মনে হল ঘরের সবটুকু আলো মুছে নিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অলকা কতবার যে পদ্মা, পদ্মা করে ডেকেছে, এই একটা নামই

সারাক্ষণ শোনা যেত, আর মা বাবার দুঃখই বা এমন করে কে বুঝত। 'তুই আমার ঘরের শ্রী ছিলি পদ্মা,— তোকে ছেড়ে আমি এবার কী করে থাকব।' অলকার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্দু দুটি জলভরা চোখই শুধু জেগে রইল কোনো কথাই সে উচ্চারণ করতে পারলো না। এ বেদনা কথায় ফুরায় না, এতো শুধুই নিজের কেবল আজকের নয় চিরদিনের।

গোধূলির আলোয় রওয়ানা হয়ে একটু গভীর সন্ধ্যায় ব্রজেন বউ নিয়ে ঘরে পৌছাল, সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধু আর একজন বন্ধুর স্ত্রী। বাড়িতে তাদেরই আত্মীয়স্বজন, এদেরই একজন একটু বয়স্কা বউ বরণ করে ঘরে তুললেন। তারপর অল্পস্বল্প হৈ চৈ একটু খাওয়া দাওয়া, রাত এগারোটার মধ্যে সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল।

এবার ব্রজেন আর পদ্মা নিভৃতে মুখোমুখি।

সারাদিন বড়ো হৈ চৈ গেছে এবার আর কোনো কথা নয়, স্নানের ঘর এতরাত্রে আর কেউ ব্যবহার করছে না, পদ্মা অনায়াসে হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে পারে। ঘরের মধ্যেই একটা দিকে একটা কাঠের পার্টিশন, নতুন করা হয়েছে, তার মধ্যে রান্নার টুকিটাকি, আর প্রয়োজন হলে যাতে পদ্মা ওখানেই জামাকাপড় ছাড়তে পারে, ব্রজেন ব্যবস্থা করে রেখেছে।

পদ্মা খুশি হল, রাতের অন্ধকারে ভালো করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সত্যিই সে বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই এখন সে কেবল শুয়ে ঘুমুতে চায়। ব্রজেন একটু রসিকতা করছে, তোমার হাঁটার জায়গাটা বড়ো কম হয়ে গেল পদ্মা, আর দৌড়াতে তো পারবেই না আর দৌড়াতে হলে একদৌড়ে বাপের বাড়ি পৌছে যাবে।

পদ্মা চোখ তুলে তাকায়— চোখে আলো আছে কী? ব্রজেন সেই আলোটুকু খোঁজে আবছা আলোয়— বোঝা যায় না কিন্তু বিরক্তি নেই। এ মেয়ে বোধ হয় বিরক্ত হতে জানে না— আ! তাই যেন হয় একটু খুশি, একটু আলো, একটুকরো হাসি বন্ধুর মতো পাশে হাঁটবার একজন ব্রজেন আর কিছু চায় না।

পদ্মা ছোটো একটু উত্তর দেয় "এই বেশ!" এরপর ব্রজেন আর পদ্মা দ্বিরাগমন করে এলো, দুটিতে মানিয়েছে বেশ, অলকা খুশি হল। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে 'পদ্মা তুই ভালো আছিস্ তো' পদ্মাও সপ্রতিভ জবাব দেয় "আমি ভালোই আছি মা, আমার জন্য চিন্তা করো না আমি ভালোই থাকবো।' ভাইয়েদের সঙ্গেও ব্রজেন গল্পে আড্ডায় জমিয়ে দিল।

না চাওয়ার যে শিক্ষা পদ্মা মার কাছে পেয়েছে জীবনে তাই তার অমোঘ অস্ত্র।

ব্রজেন বলে— 'বেশি আমরা চাইব না পদ্মা, তবে আমরা নিজেদের মতো তৈরি হব,— তাই তোমার মতো মেয়ে আমি চেয়েছিলাম এমন একটি মানুষ যার সুখ দুঃখের বোধ আমার সঙ্গে মিশে থাকবে, ভালোবেসে আমরা দুজনে দুজনকে জানবো।'

ব্রজেন ভয় পেয়েছিল তার দীনতা স্ত্রীকে আঘাত না করে, আর তার স্ত্রী এই দীনতাকে দিয়ে ব্রজেনকে না আঘাত করে। যে মেয়েটি তার স্ত্রী হয়ে আসবে, প্রতিদিনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তার দাবি কী হবে কে বলতে পারে? যদি দামী বেশি হয়, যদি তার অক্ষমতা পদে পদে ধিকৃত হতে থাকে, তাহলে সেই ধিকি ধিকি আগুন থেকে রক্ষা পেতে তাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রজেনের শঙ্কা কেটে গেল। ছোটো জায়গায় নড়াচড়া, একই বাথরুম সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা, কোনো কিছু নিয়েই সমস্যা হল না, আশ্চর্য কৌশলে পদ্মা সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।

ব্রজেনের আর্থিক সমস্যাটা উপেক্ষার নয় পদ্মাকে সে কোনো কিছুই গোপন করেনি, 'একটু এদিক ওদিক করার উপায় নেই এরই মধ্যে টেনেটুনে আমাদের চলতে হবে' পদ্মার আপত্তির কিছু নেই ক্ষমতার বাইরে সেও যেতে চায় না, কিন্তু এরই মধ্যে অন্তত কুড়িটি টাকা তুলে রাখতে হবে আপদে বিপদে কাজে লাগবে। ব্রজেন খুশি হয়ে বলল— 'লক্ষ্মী বউ আমার।'

শুধু মাথার উপর একটা খোলা আকাশ নেই এই পদ্মার বড়ো কষ্টের, মার কাছে আর যাই থাক না থাক একখানা আকাশ ছিল, ঘরের সামনে একটু খোলা উঠোন, সেখানে সকাল সন্ধ্যা নানা রং-এর খেলা, প্রতিদিনের রংবদলে যে মাধুরী ছিল তার মূল্য পদ্মা জানতো না, কিন্তু আজ একটি ঘরে বন্ধ হয়ে মনে হয় তার যেন একটা বিপুল সম্পদ চুরি হয়ে গিয়েছে, হাজার চেষ্টায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তারই একটুকরো কষ্ট পদ্মার বুকের মধ্যে বিঁধে থাকে, পদ্মা জানে এ বেদনাটুকু তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল।

ব্রজেন বোঝে সেজন্যই সে ছুটির দিনে সিনেমা নয় বন্ধু বান্ধব নয়, একটি পুকুরের পাড়ে একটা খোলা জায়গা সে আবিষ্কার করে, হাঁটতে হাঁটতে পদ্মাকে নিয়ে সেখানে চলে যায়, একটু সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থেকে বিকেলের মরা আলোর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে পৌঁছে তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফেরে, একটি দুটি তারা ফোটে, পদ্মা বড়ো খুশি হয়, এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্রজেনের।

একদিন পদ্মা বলে 'তুমি কী করে জানলে এই বিকেল এই সন্ধ্যায় এই পুকুর এই গাছপালা মাথার উপর এই আকাশ দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে?"

ব্রজেন রহস্যময় উত্তর দেয় "জানতে হয় জানতে হয়।" ব্রজেন যেদিন মেয়ে দেখতে গিয়েছিল সেদিন সকালের আলোয় সেখানকার মাঠঘাটের শ্যামল স্নিগ্ধতায় তার চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, ব্রজেন জানে কোনো বন্ধন থেকে ছিন্ন করে সে একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছে।

"সেদিনই ভেবেছিলাম পদ্মা তুমি আমার ঘরে এলে ও অভাবটুকু তোমার থেকেই যাবে।"

কথাটা সত্যি সিনেমা দেখার সুযোগ বেশি নেই তবুও এ কয়মাসে পনেরোদিনে একটা সিনেমা ওরা দেখেছে। থিয়েটারও দেখেছে, কিন্তু এই বেড়িয়ে বেড়ানোয় যে অহেতুক আনন্দ তাতো সিনেমা থিয়েটারে পাওয়া যায় না। পদ্মার কথা ভেবে ব্রজেন শুরু করেছিল কিন্তু এখন যেন নেশা লেগে গেছে। ব্রজেন পদ্মার কাছে ঋণী হয়ে রইল।

গোনাগুনতি মাইনে দিয়ে বড়ো কঠিন হিসাব করে সারাটা মাস চালাতে হয়। পদ্মা বাড়ির কথা ভাবে। বাড়িতে ওরা ছিল পাঁচজন কিন্তু নিত্য বাজারের বিলাসিতা তাদের ছিল না। মাছ তারা মাঝে মাঝেই খেত, দৈনন্দিন কোনো ব্যাপার ছিল না, আর প্রতিদিনের প্রয়োজনটা বাড়িতে ফলানো তরিতরকারিতেই মিটতো, তাছাড়া গরু ছিল ও মুরগি ছিল, তাদের পেছনে অলকা আর পদ্মা খুবই খাটাখাটনি করতো, বদলে তারাও অনেক দিত।

এখানে প্রতিটি জিনিস কিনে আনতে হয়, একটামাত্র ঘরে ওরা কয়লা জ্বালায় না, ঘরের সব জিনিস এমনকী কাপড়চোপড়ও নোংরা হয়ে যায়, ব্রজেনও কোনোদিন কয়লা জ্বালায়নি, পদ্মা জ্বালালো না। অবশ্য পরিশ্রম অনেক বাঁচে কিন্তু তাদের টাকাটা যে বড়োই কম।

ন'টার মধ্যে ব্রজেন বেরিয়ে যায় ফিরতে ফিরতে সন্ধে, অনেকদিন রাতও হয়। পদ্মা দরজা বন্ধ করে বেশির ভাগ সময় ঘরে বসে থাকে, সামনে বেরোলেই রাস্তা, অনেক দোকান, ঘরেরই পেছনে পরিবার আছে, পদ্মা তাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে একটু আধটু গল্পসল্প করে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় না। পদ্মা বড়ো অন্যরকম। তবু যখনই তারা কেউ আসে পদ্মা যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করে তারাও খুশি হয়। ঘরে একখানাই তক্তপোষ সেখানেই ওরা বসে একটু গল্প করে চলে যায়। এই বউটি সম্পর্কে তাদের বড়ো কৌতূহল পদ্মা বুঝতে পারে, এই লাজুক লাজুক পুতুল পুতুল বউটি মায়া জাগায়, সবকিছুর মধ্যে থেকেও মনটি যেন তার অন্য কোথাও পড়ে আছে।

একটু একটু করে পদ্মা পরিণত হতে থাকে, একটি ঘরে সে শুধু বধূ নয়, ঘরণী গৃহিণী, সবই। সংকটের সঙ্গে যখন তার প্রথম পরিচয় হতে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সে ভাবতে শিখেছে সে ভাবনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, পদ্মা চিন্তা করতে শিখছে, চিন্তা করতে করতে ব্রজেনের সঙ্গে

নানা রঙিন পরিকল্পনার কথা বলতে বলতে পদ্মার মনটাও ধারালো হয়ে উঠছে, মা বাবার ঘরের সেই আবরণ থেকে পদ্মা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। সারাদিন একটা কর্মহীনতা আছে, এই অখণ্ড অবসর তাকে খুশি করে না পীড়া দেয়, সব সময় কী করি কী করি তার মাথায় ঘোরে। ব্রজেন যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে তার কোনো কাজ করার থাকে না এই সময়টাই তার কাটে না।

ব্রজেনের এক বন্ধু দু'দিন এখানে ন'টায় খেয়ে অফিস গেল, পদ্মা খুশি হয় তার কাজ একটু বেড়েছে, একজন নয় দুজনের জন্য সে রাঁধে একটু যত্ন বেশি প্রয়োজন হয় একটু বেশি ভাবতে হয়, বাইরের একজন লোক খাবে একটু রকমফেরও করতে হয়। অনেক সময় কী করবে সে ভেবে পায় না। সামান্য উপকরণকে হাতের গুণে অসামান্য করে তোলার নিঁপুণতা এখনও তার আয়ত্ত হয়নি, অনেক সময় পদ্মা তার নিজের মায়ের কথা মনে করে।

পদ্মা ঠিক পেরে উঠবে কিনা ব্রজেন ভাবছিল, কিন্তু তার এই খুশি খুশি ভাব ব্রজেনকে আশ্বস্ত করল।

একটা পরিকল্পনা তার আছে সেটাই সে পরীক্ষা করে দেখছিল, শুরুটুকু ভালোই। বন্ধুও খুব খুশি! এই খাওয়াটা তাকে হোটেলে সারতে হচ্ছিল, বাড়ির খাবার পেয়ে সে বেঁচে গেল; তারপর রাত্রেও খেলো, বললো, এখন থেকে এখানেই আমি খাবো,— পদ্মা ভাবলো রসিকতা করছে, কথাটায় অবশ্য রসিকতার রং মেশানোই ছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি সে এখানেই খেতে লাগলো। ব্রজেন বলে রমেন তো খুব খুশী পদ্মা সলাজ হয় বলে রান্না ঠিকমত হচ্ছে?

মাসের শেষে ব্রজেন একশ টাকা পদ্মার হাতে তুলে দিল 'রমেনের জন্য নিশ্চয় এর বেশি খরচ হয়নি হিসেব করে দেখ',— পদ্মা ঠিক হিসেব করে উঠতে পারে না, সারা মাসের খরচের হিসেব তার মাথায় নেই। ব্রজেন হাসি হাসি মুখে বলে 'এর মধ্যে তুমি চল্লিশ টাকা পাবে পদ্মা, আমি দেখেছি হিসেব করে ষাট টাকার বেশি খরচ হয়নি।' পদ্মা লজ্জা পায়— 'আমি কী করে রোজগার করলাম, তুমি বুদ্ধি করে বাজার করেছ, কী করে কী করব বলে দিয়েছ—।'

"তুমি পরিশ্রম করেছ, আমি যেমন যেমন বলেছি ঠিক তা করেছ কাজেই এ চল্লিশ টাকা তোমার। কেরোসন আর রান্নার তেলে একটু প্ল্যান করে চালালে আরও কম পড়বে। তুমি রাজি হলে রমেন এখানেই খাবে, হোটেল থেকে তার কম খরচ পড়ছে, আর তোমারও কিছু বাড়তি টাকা হবে।" পদ্মার সময়ের সমস্যা মিটে যায়, আর একটু হাসি গল্প ঠাট্টা, প্রতিদিন একটু রঙ্গের ছটা।

একজনই শুধু নয় পাচটি বন্ধু এখানে খেতে চাইল, নটায় ভাত, বিকেলে ফিরে চা মুড়ি আর রাত্রে রুটি। একখানা মাত্র ঘর। বন্ধুরা নিজের থেকেই বলে, তারা ঘর আটকে রাখবে না, দশটার মধ্যে তারা খেয়ে অফিস চলে যাবে তারপর ফিরেই চাটুকু খেয়ে আর আসবে রাত নটায়, খেয়ে দেয়ে দশটার মধ্যেই যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। এই সময়টা থাকল ব্রজেন আর পদ্মার, একটু চা করে দিয়েই বিকেলটা বা সন্ধেটা তারা নিজের মতো কাটাবে।

পদ্মা অবাক হয়ে যায় টাকা রোজগারের কত অসম্ভব পরিকল্পনা সে কতবার করেছে কিন্তু এতো অনায়াসে হয়ে গেল, সত্যি সে নিজে উপার্জন করছে। আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে পদ্মা ভাবলো এবার সে কেবল অন্যের মুখ চেয়ে বাঁচবে না, তার নিজেরও হাতে বল এসেছে, সে আর অন্যের প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্র নয়, স্বাধীন চিন্তায় বাঁচার একটা পথ তার খুলে গেছে।

আজ দুপুরের পর বসে মাকে চিঠি লিখছে, তার জীবনে একটা রূপান্তর এসেছে, একটা আবরণ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে, এই চেতনার উল্লাসেই তার মুক্তি। নিজেকে অকৃতার্থ অকর্মণ্য মনে হচ্ছে না, জীবনটার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস তার এসেছে। সে লিখছে—

মা, অনেকদিন তোমাদের চিঠি পাইনি। পনেরোদিন আগে একবার ভাই এসেছিল আমাদের যেতে বলেছিল যাওয়া হয়ে উঠেনি।

মাগো, তুমিতো আমাকে একবারে পরই করে দিতে চেয়েছিলে, আর এখন ভেবে যা দেখছি আমাদের সংসারের নিয়মে মেয়েদের পরই হয়ে যেতে হয়,— কিন্তু কেন? এ নিয়ম আমরা মেনেই বা নেব কেন? এর কী কোনো প্রতিকার করা যায় না মা, আমাকে আমরা সব কিছু মুছে সবরকমে অন্য একটা পরিবারের মানুষ হয়ে যেতে হবে এ নিয়ম কারা বানিয়েছিল? আমার ঘর সংসারে থেকেও আমি তোমার মেয়ে হয়েও থাকতে পারি, তাতে আমার অন্য পরিচয়ে বাঁধা হবে কেন? একই মেয়ে একসঙ্গে বধূ, স্ত্রী, জননী সবই হতে পারে শুধু তার কন্যা পরিচয়টিই মুছে ফেলতে হবে?

আমি স্থানান্তরে থাকতে পারি সেতো ছেলেরাও থাকে. তারা কিছু আর সবসময় মা-বাবার সঙ্গে থাকতে পারে না। তাদেরও নিজেদের সংসার হয় বৃহত্তর ক্ষেত্রে, মা-বাবারও সেখানে একটা ভূমিকা থাকে, শুধু মেয়ের বেলায়ই অন্য রকম?

আমি যেখানেই থাকি, আগে আমি তোমাদের মেয়ে আমার এ পরিচয় মুছে ফেলা যাবে না। আমাদের আলাদা সংসার থাকতে পারে, তাতে সমস্যার কী আছে?

ভবিষ্যত দেখাবে আমি কী করবো, তোমার পদ্মা এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে, তোমার সে ছোটো মেয়েটি আর নেই। শুনে অবাক হবে আমি এখন টাকা রোজগার করছি, কীভাবে করছি পরে জানতে পারবে, এটা খুবই ভালো হয়েছে যে নামহীন খ্যাতিহীন মর্যাদাহীন অবিরাম কর্মে আমাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় এমন বাড়িতে আমার বিয়ে হয়নি অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির একটা হোটেলও আমাকে চালাতে হয় না আর বড়ো চাকুরে স্বামীর হাজার বায়নাক্কাও আমাকে পোয়াতে হয় না। পাশের বাড়ির মিত্রার কথা মনে পড়ে? বড়ো ঘরে বড়ো চাকুরে স্বামী, তবুও প্রত্যেকবার অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি সুস্থ হয়ে যাবার জন্য আসত? তোমরা তো আমাকে এমনভাবে রাখতেই পারতে না।

টাকা রোজগারের মধ্য দিয়ে আমি টাকার চেয়েও একটা বড়ো জিনিস পেয়েছি স্বাধীনতা। এজন্য তোমার জামাইকেও সাধুবাদ দিও, আমি স্বাধীন হলে সে ভয় পায় না খুশি হয়, সে বলে 'তুমি স্বাধীনভাবে ভাবতে পারলেই আমি তোমাকে বন্ধু আর সঙ্গী হিসাবে পেতে পারি নইলে তো কেবল বোঝা। আমি স্ত্রীকে আমার বোঝা করে রাখতে চাই না।' তোমার জামাই আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে মনে হয় এটা কলকাতার গুণ।

মা, আমরা অনেক পরিকল্পনা করি তাতে একদিন হয়ত তোমার জামাই এ চাকরি ছেড়েও দিতে পারে, তখন আর পিওন বলে তার সঙ্গে একটা অবজ্ঞা মিশিয়ে থাকবে না।

আর চাকরি না ছাড়লেই কী, আমাদের পা যদি শক্ত হয়, পায়ের নীচে মাটি যদি কঠিন হয়, আমরা সামনেই হাঁটবো পিছিয়ে থাকবো না।

সামনের মাস থেকে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবো, আমার উপার্জনের টাকা। তোমরা আমার প্রণাম নিও। এই রবিবারে আমরা যাবো।

প্রণাম অন্তে— পদ্মা

প্রথম বধ্যভূমি

রাবেয়া খাতুন

আজকাল প্রায়ই লাল টকটকে চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরত শাহেদ। ক্লান্ত শরীর নিয়েও। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে আবার বেরুত। রাত জেগে পোস্টার লেখা, সেগুলো লাগানোর ব্যবস্থা করা। কাজের নাকি শেষ নেই। কথাগুলো কবে কখন বলেছিল শাহেদ? মনে করতে চেষ্টা করে আকাশের দিকে তাকালেন সাবের সাহেব।

ফ্যাকাশে নীল আকাশে চক্র দিয়ে বেড়াচ্ছে যে পাখিগুলো, পায়রা মনে হয়েছিল প্রথম দৃষ্টিতে। ভুল ভাঙলো কয়েক মিনিটের ভেতর।

উত্তেজিত পায়চারি করতে করতে থেমে দাঁড়ালেন সাবের সাহেব। পায়রা কোথায়? সূর্যের কম আলো আর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসা চোখের চাউনি দায়ী এই ভ্রান্তির জন্য।

হাওয়ায় পাতা উল্টে যাওয়া কোলের বইটার দিকে তাকালেন। দূরমনা হয়ে গেলেন। তিহাস কথা বলে না। কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যুগ থেকে যুগে। এর মধ্যে আবার এক একটা সময় আসে নিদারুণ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তার আধি নিয়ে। সিরাজউদ্দৌলা থেকে বাহাদুর শাহ। কোম্পানির আমল থেকে মহারানির যুগ। প্রায় দুশো বছর পরাধীন একটি জাতির জন্য নানা দুর্দিনের, অপমানের—

ওমা, মাগো দেখো এসে কত লম্বা মিছিল।

তোরাই দেখ বাপু চুলায় আমার রান্না।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল ভুনা পোলার চালের ঝাঁজ মিষ্টি গন্ধ। খিচুড়িতে গরম পানি ঢেলে জলির কথার জবাব সেরে আয়শা বানু স্বামীর উদ্দেশে বলল, তুমি কী ওই ইজি চেয়ারে বসেই দিনটা পার করবে নাকি?

কাজ কিছু থাকে তো বল।

গোসল করতে হবে না। বেলা কত গড়ালো খেয়াল আছে?

উম।

শব্দটা সুখের। কিন্তু ওঠার কোনো গরজ দেখালেন না। আসলে জমে আছে সারা শরীর; জাগতিক সমগ্র চৈতন্য। কি করে, কেমন করে বলবেন কথাটা। অথচ বলতে হবেই।

বাবা, বাবা, রাস্তার লোকজন সব দৌড়াচ্ছে।

দৌড়াচ্ছে নয়, পালাচ্ছে।

জলি, শেলীর কথার মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করলেন আয়শা বানু—ওই এক নতুন রোগে ধরেছে তোদের। রাস্তার মানুষ দৌড়াচ্ছে কী পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে তাতে তোদের কী বাপু? যা না গোসল সেরে আয় চটপট।

মায়ের ধমক খেয়েও কুয়োতলার দিকে নড়লনা ওরা দুজন। বরং বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে বলল, চলো না বাবা বাইরে গিয়ে দেখে আসি কী হচ্ছে। আমাদের ক্লাশের মনিটর বলছিল আজ নাকি গণ্ডগোল হতে পারে। বেশি দূরে তো যাব না, এই গলির মুখে।

স্বামী কিছু বলার আগে চুলার ধার থেকে আয়শা বানু বললেন, খবরদার এক পা বাড়িয়েছিস তো টেংরি ভাঙব। বেশি দূর নয় গলির মুখ! একজন তো এই কথা বলে বেরিয়েছে সেই কোন্‌কালে। ফেরবার নামটি নেই এখনো। হা গো শাহেদ ফিরবে কখন? কিছু বলে গেছে?

এসে যাবে। জবাব দিয়ে আবার দূরমনা হয়ে গেলেন সাবের সাহেব। চোখের ওপর আজ সকালটা। ঘুম ভেঙেছিল আজানের শব্দে নয়, পাখির স্বরেও নয় বহুকণ্ঠের স্লোগানে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—

আজকাল প্রায়ই হচ্ছে এমন। সময়ে অসময়ে। দেশ দুভাগ হয়নি, স্বাধীনও হয়েছে। নতুন ভূখণ্ডের নাম হয়েছে পাকিস্তান। কিছুদিন আগেও ওরা প্রতিষ্ঠা দিবস চৌদ্দই আগস্ট উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছে। জাতির জনক কাঁয়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দেখার জন্য লালন করেছে আগ্রহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানি জনসভায় বক্তৃতারত মানুষটিকে দেখে অবাক হয়েছে। কাঠ কাঠ শরীর। রোগা রোগা মুখ। এই লোকটি নেতৃত্ব দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষের। মুগ্ধ নিবিড় আবেশ কাটলো বিদ্যুৎ ভূমিকম্পে। জিন্নাহ্ প্রথমবারের মতো এদেশে এসেই বললেন, রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হবে। দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা যেখানে বাংলায় কথা বলছে, সেখানে অন্য ভাষা প্রাধান্য পায় কী করে? চারদিকে উঠল রকমারি গুঞ্জন।

ওটা যে ওদের মাতৃভাষা।

পাকিস্তান হবার জন্য নানাভাবে যুদ্ধ করলাম আমরা সবাই। আর যেই পাকিস্তান হল, উনি মনে করে নিলেন এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। নইলে জনমতের তোয়াক্কা না করে এমন কথা বলেন কী করে? প্রকাশ্য ঘোষণার সাহস পান কোথায়?

শাহেদরা বলত, এটা মানা যায় না। আমরা হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় স্কুলে পিকেটিং করেছি, ফুলপ্যান্ট পরা অবস্থায় প্রতিবাদ করব।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জাতির জনক খেতাব পেয়েছিলেন, কিন্তু পিতার দায়িত্ব পালনের উদার নীতি অবলম্বন করেননি। পল্টনের খোলা ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে উড়ে গেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখান থেকে আরও দূরে—মৃত্যুর খেয়ায়। কিন্তু যে ঢেউ ফাঁকা মাঠে তুলে গেছিলেন কটা বছরের ভেতর রাজপথ থেকে পথে, পথ থেকে গলিতে ছুটোছুটি করতে লাগল অস্থির প্রতিবাদী গতিতে। বিপরীত দিক থেকে আসছিল মারাত্মক হুমকি। তবু প্রবহমান রয়েছে আন্দোলন।

সকালে অবশ্য বানু ছেলেকে বেরুতে দেখে বলেছিলেন, কাজ নেই শাহেদ আজ তোর বাইরে গিয়ে।

শাহেদ পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেছিল, কলেজে যাচ্ছি মা, বাইরে নয়। উম যেনো ওই গণ্ডির ভেতর দাঁড়িয়ে থাকবার ছেলে তুই।

জবাব না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেছিলো শাহেদ। আয়শা বানু তাকিয়েছিলেন স্বামীর দিকে ভুরুজোড়া খাড়া করে—তুমি যে বললে না কিছু?

কি বলবো? ছেলে তোমার বড়ো হয়েছে। ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। এমন বাধাই বা কেন দেবে। আর দিলেইবা সে কেন মানবে?

মানবে না মানে? মাথার ওপর তবে বাপ মা থাকে কেন? যদি খেয়াল খুশি মতোই চলবে তো—

স্ত্রীর কথার ভেতর কথা গুঁজলেন সাবের সাহেব। বললেন, আহা খেয়াল খুশি বলছ কেন। আজ কী ও একা বাইরে যাচ্ছে! ওর মতো হাজারো যুবক—

থামলেন হঠাৎ। স্বর, দৃষ্টি, মুখের রেখা বদলে নিয়ে আবার বললেন, থাক ওসব কথা।

আয়শা বানু বললেন, কিন্তু এটা মনে রেখো ছেলে, যদি মাথায় ইট পাটকেল বা হাতে রাইফেলের গুতো নিয়ে বাড়ি ফেরে, তোমার সঙ্গে আমার লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে যাবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে পেছনে রেখে গেলেন আরও কিছু কথা—ছেলেটা কদিন থেকে ভুনা খিচুড়ি খেতে চাইছে। তা এমন একটা কোমর ভাঙা স্কুলে চাকরি করো, যেটার আর গুণ নেই কিন্তু চারগুণ ঠিকই আছে। এদিকে বড়ো বড়ো লেকচার, ওদিকে মাইনে দেবার বেলা রাজ্যির অনিয়ম। কাল টাকা পেলে, তড়িঘড়ি আজ যাও-বা ভালো খাবারের জোগাড় করলাম তো ছেলে চলল মিছিল করতে। এখন অবেলায় এসে খাক ঠাণ্ডা খিচুড়ি। তোমার কি।

শুনে খানিকটা হাসির মতোই কিছু ফুটেছিল ঠোঁটের ভাঁজে। এখন তো শাহেদের পা দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে গিয়ে পৌঁছেছে। সাতচল্লিশের আগে একদিন স্কুলে গিয়ে প্রধান ফটকে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন শাহেদকে। কতোই বা বয়েস তখন? প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। শহরের স্কুলে স্কুলে পিকেটিং-এর ধুম। কিন্তু তার মধ্যে ছেলে থাকবে? বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন, তোমার ছেলের জন্য এবার যাবে চাকরিটা। ষষ্ঠ জর্জের আমলারা আর যাই সহ্য করুক, স্কুল মাস্টারের ছেলের বাড়াবাড়ি সহ্য করবে না।

ছেলেকে প্রথম দিকে তিনি শাসাতেন। যে রাজার রাজ্যে সূর্যাস্ত যায় না, এইসব নিরামিষ অসহযোগ আন্দোলন করে তাড়ানো যাবে তাদের, মাঝখানে নগদ লাভ জুটবে নানা গঞ্জনা।

শাহেদ খুব একটা কানে তুলত না। কখন বলত, এখন আমরা ছাত্ররা মিছিলে যাচ্ছি, তোমরা মাস্টাররা বাধা দিচ্ছ। এমন একটা সময়ও আসতে পারে যখন তোমরাও মিছিল করে রাস্তায় নেমে আসবে নিজেদেরই প্রয়োজনে।

এরপর ছেলেকে খুব একটা ঘাটাতেন না। এ পোড়া দেশে শিক্ষকদের অভিযোগ চিরকালই আছে। কিন্তু তা নিয়ে রাস্তাঘাটে নামার কথা ভাবা যায় না। যেমন ভাবা যায়নি ইংরেজ রাজতন্ত্র খতম হবার ব্যাপারটা।

সাতচল্লিশে তারা যখন সত্যি সত্যি চলে গেলো, আপন সন্তানের ওপর একধরনের বিশ্বাস এলো। তাই স্ত্রী যখন শাহেদের মিছিল, স্লোগান ইত্যাদি নিয়ে চেঁচামেচি করেন, তিনি শুধু বলেন, ভালোভাবে ফিরে আসিস।

আজ সকালেও বলেছেন। কিন্তু—

বাবা, বাবা, কাদের বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে!

জলি-নেলীর জোর চিৎকারে সজাগ হলেন। এই চৈত্রমাসে আগুন। শুকিয়ে সব খটখটে হয়ে আছে না! লাগল কোন্ দিকে? উঠে দাঁড়ালেন। কুণ্ডুল পাকানো কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। দিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। মূল শহর থেকে থাকেন অনেকটা দূরে। নগর প্রাণের স্পন্দন কখন কত ডিগ্রি চড়ল ধরা যায় না ঠিক মতো। তবে এটা সত্যি গত কিছুদিন থেকে মাথার ওপর অভাবিত কোনো ঝড়ের আশংকা নিয়ে থমথম করছে গোটা ঢাকা শহর। এ প্রেক্ষাপট তার চোখে চেনা নয়। সিপাহি বিদ্রোহের আন্টাঘরের ময়দানে প্রকাশ্য ফাঁসির কথা তিনি শুনেছেন। কিন্তু দেখেছেন পরবর্তী সময়ে স্বদেশিরা কোর্টে চালান হলে তাদের এক পলক দেখার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে জনারণ্যের উত্তাল ধারা। কলিজা কাঁপানো দাঙ্গা দেখেছেন কয়েকবার। দেখেছেন দিনের পর দিন দমবন্ধ করা কারফিউ। পাকিস্তান হবার পর স্বাধীনতা লাভের উৎসবমুখর রাজপথ। এই রাজপথে আবার আর কিছু দেখতে হবে, তাও মাত্র পাচ ছ'বছরের ভেতর, একেবারে ভাবতে পারেননি। বর্তমানের ঢাকাকে, বায়ান্নর ঢাকাকে কখন মনে হচ্ছে মশাল নগর, কখন শোকাচ্ছন্ন সমাধি শহর—

সমাধি শহর? চমকে উঠলেন? আজ থেকে মনে হবে শোকাচ্ছন্ন সমাধি শহর। ওরা ছাত্র-জনতার

গায়ে গুলি ছুঁড়েছে। সরকারের ১৪৪ ধারা অমান্য করে যে মিছিলটি এগুচ্ছিল অস্থায়ী সংসদ ভবনের দিকে, সেখানে চলছে তখন বাজেট অধিবেশন। ছাত্র-জনতার স্রোত মেডিকেল কলেজ ছাত্র নিবাসের কাছে পৌঁছামাত্র ছুটে এলো ঝাঁকঝাঁক গুলি। বাঙালি মন্ত্রীর হুকুম পালিত হয়েছে পাঞ্জাবি চিফ সেক্রেটারির তত্ত্বাবধানে। ঘটনাটা যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়েছে মানুষের শরীর, সেই সঙ্গে ছিটেছান হয়েছে স্বাধীনতা নামের দেশের লোকের আস্থা ও বিশ্বাস নামক সমুদয় হৃদয়বৃত্তির।

কিন্তু স্ত্রীর কাছে কী জবাব দেবেন তিনি। বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পরম নিশ্চিন্তে বটিতে সালাদের ব্যঞ্জন কাটছে আয়শা বানু। শাহেদ খিচুড়ির সঙ্গে খেতে পছন্দ করে। ঠিকা-ঝিকে শ্রোতা বানিয়ে যেসব কথা বলছেন তাও কানে আসছে—বুঝলে চিনির মা, মায়ের দুঃখ ছেলেমেয়েরা তলিয়ে দেখতে চায় না। আজও শুনেছিলাম কলেজ হবে না।

হইব না ক্যান আম্মা।

ছেলেরা করবে না। তাই বললাম যা শাহেদ একবার মুন্সীগঞ্জ গিয়ে দুলিকে দেখে আয়। বুঝলে গো আদর করে পয়লা সন্তানের নাম রেখেছিলেন দুলারী। তো কপাল দোষে পড়েছে এমন সব মানুষের ঘরে, ওর প্রতি চিঠিতেই আমার চোখের পানি ঝরে।

ক্যানগো আম্মা, আমাগোর মাইয়াগোর মতোন আপনেগো ভদ্দরলুকের মাইযাগোও জ্বালান পোড়ান অয় নিহি পরের ঘরে?

তা আর হয় না। মেয়েটা আমার যেমন মাটির মতো, শাউড়ি মাগী তেমনি আগুনের মতো। হাড়হাড্ডি চিবিয়ে কিছু রাখল না। তো শাহেদকে সেই কবে থেকে বলছি, নিয়ে আয়। কটা দিন দুলি নাইঅর থেকে পরান ঠাণ্ডা করে যাক। আজ যাই, কাল যাই করে ছেলের আমার যাবারই সময় হচ্ছে না।

কলেজবাবু হইছে যে আম্মা।

তাই বলে আর কিছু বুঝবে না। বুঝবে না ওছাড়া আমার কী আরও একটা ছেলে যে তাকে পাঠাবে? থাকার মধ্যে রোগা পটকা ওই মানুষটা। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে ইস্কুল করবে না নদীর ওপাড় যাবে।

ওরা হয়ত আরও কিছুক্ষণ এমনি কথা বলে যাবে। এক সময হয়ত আয়শা বানু এমন মন্তব্যও রাখবে, মেয়েটাকে তেমন দিতে-থুতে পারেনি বলেই শাশুড়ি জ্বালায় বেশি। ওরা মাস্টারের মেয়ে যেমন চেয়েছে, তেমনি চেয়েছে নিজেদের ছেলের সাধের দু'চারটা সামগ্রি।

এ জীবনে স্বামী যা পারেনি তার মেধাবি পুত্র বড়ো চাকরি করে তা পারবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে বেড়ে যাবে দুলারীর দাম।

কিন্তু যার জন্য সে এখন কোথায়? কেমন করে তিনি বললেন 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হোক'-এর আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে পুলিশের নির্মম গুলিতে নিহত হয়েছে তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান।

আয়শা বানু হয়ত কান্নার আগে প্রশ্ন করে বসবে, মাতৃভাষার জন্য মানুষ জীবন দেয় এ আবার কেমনতর কথা।

ছোট্ট এই প্রশ্নটি তার দিকে জুটে এলে কী জবাব দেবেন জানা নেই। বুদ্ধিতে নেই। সকালে যে বেরিয়ে গেছে যুবকের সঙ্গে, সন্ধ্যায় সেই দল হয়ত ফিরে আসবে। তাদের ভেতর নিজের ছেলেকে না দেখে স্ত্রী আর কারু নয় তার দিকেই তাকাবে। আর্তস্বরে তুলবে চিৎকার—ওগো সবাই ফিরে এলো, এলো না শুধু সে। কেন, কেন?

বলি আজ তোমার হয়েছে কী?

সজাগ হলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আয়শা বানু—খাবে না?

খাবো?

ওমা, যেন নতুন শুনলে শব্দটা।

তা নয়।

তবে কী ভাবছো শাহেদ ফিরলে একসঙ্গে বসবে। আমিও তো তাই ভেবে বেলা কম বাড়ালাম না। কিন্তু দিন ছোটো। তার ওপর তোমার ওই শরীর। অবেলার খাওয়া একেবারে সহ্য হবে না। তাছাড়া জলি-নেলির কথা ভাবো। ওদের খুব খিদে পেয়েছে। তখন থেকে খ্যানখ্যান করছে খাবার জন্য।

ঠিক আছে, চলো বসছি। আজ আর গোসল করব ন। সাবের সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আয়শা বানু খাবার পরিবেশনের এক ফাঁকে সাহেবের ঘরে গিয়ে ঠিক করে রেখে এলেন চটি জোড়া। পাশে চারখানার লুঙ্গিটা। না জানি কত খিদে পেটে ফিরবে। যাবার সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে নাস্তা খেয়ে যেতে পারেনি। অভিযোগ করেছিলেন বলে এক ঝলকের জন্য থেমে গিয়ে শাহেদ বলেছিল, দেরি করব না। খিচুড়ি রাঁধবে বলছ, ওটা হতে না হতে দেখবে এসে গেছি। নাস্তার ক্ষতিপূরণটা তখনি করে নেবো।

লুঙ্গির পাশে গামছা রেখে ফিরে এসে দেখলেন স্বামী হাত ধুচ্ছেন। তাকালেন একটু অবাক চোখে। শাহেদের মতো ওর বাপও যে খিচুড়ি খুবই পছন্দ করে। ভয় পেয়ে বললেন, কিগো শরীর খারাপ লাগছে?

না। তুমি খেয়ে নাও। আমি একটু গলির দিকটা ঘুরে আসি।

স্ত্রীর হাত থেকে পান নিতে ভুলে গেলেন। আয়শা বানু এগিয়ে এসে খিলিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, বাপ ব্যাটা সমান মন ভুলো হয়েছো। দেখা হওয়া মাত্র আজ একটু বকবে কিন্তু। কেমনতর আক্কেল। এতো বেলাতেও ঘরে ফিরছে না। আমি দুশ্চিন্তায় থাকি না! ছাত্ররা আজকাল লাঠিসোটার বাড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে পুলিশ নাকি আরও বেশি করে মারে। ভাবতেও কলজের পানি শুকিয়ে যায়গো।

লম্বা নিঃশ্বাস লুকোলেন সাবের সাহেব। এর বেশি আয়শা বানু ভাবতে পারে না। আজকালকার মা বলে এটুকুও স্পষ্টভাবে বলতে পারছে। স্ত্রীর উদ্দেশ মনে মনে বললেন, হে বিদ্রোহী সন্তানের জননী তোমার আরও স্পষ্ট শক্ত হতে হবে। সামনে বড়ো দুঃসময়। হয়ত আজ সূর্যাস্তের আগেই তোমাকে মুখোমুখি হতে হবে সেই সময়ের। তুমি তৈরি হও।

গলির মুখে ছড়ানো ছড়ানো পাড়ারই কিছু মানুয। ভীত, আতংকিত। ভেতরেই চলাচল করছে ছেড়াছেড়া সংলাপ—পুলিশ কিছু লাশ একদম গুম করে দিয়েছে—কিছু লাশ নিয়ে দু'দলের মধ্যে অসম যুদ্ধ হয়েছে—আগ্নেয়াস্ত্র, আর্তনাদ, ধোঁয়া, গর্জন, সব কিছুর শেষে জায়গাটাকে মনে হচ্ছে বিরান বাধ্যভূমি—

চাচাজান?

কে?

চমকে তাকালেন। শাহেদের বন্ধু আলমগীর। গলার কাছটা দলা পাকানো। ভাষা উঠে আসতে চাইছে না। নিজের ওপর অসম্ভব জোর খাটিয়ে তবু বললেন, লাশ পেলে?

জিনা। ওরা শুধু প্রাণে মারেনি। দেহ কটাকেও কেড়ে নিয়ে গেছে। শাহেদ শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছিল আমার কোলেই। সন্টু আহত হল তখনি। ওকে রেখে সান্টুর কাছে যাব, শুরু হল টিয়া গ্যাসের ঝড়। তার ভেতর—

আলমগীর মুখ নামিয়ে নিল। কয়েক পলক, আবার সরাসরি তাকিয়ে বলল, ওরা ভেবেছে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে জিতে গেছে। এটা কী যুদ্ধ যে হারজিৎ থাকবে। এটা একটি জাতির নিজস্ব আত্মিক দাবি। গতক্ষণ সে দাবি না মিটবে আগুন জ্বলবেই। আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন?

কোথায়?

গায়েবানা জানাজায়।

যাব। কিন্তু তার আগে তোমার চাচীকে—থেমে প্রায় স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, তাকে আর কতক্ষণ অন্ধকারে রাখব? সান্টু এসেছে আমার সঙ্গে। সে বাড়ির ভেতর গেছে চাচীকে সব কথা জানাতে।

আমরাও সব জেনেছি সাবের সাহেব। মৃত্যুকে তো থামানো যায় না, সময়মতো সে আসবেই। তবে আজ বৃহস্পতিবার। বড়ো ভালো দিনে গেছে আপনার ছেলেটা। গোর আজাব একদম মাফ।

প্রতিবেশী শমসের আলীকে যেন তার জবাবে আবার বলছে, থামুন মিয়া ভাই। লাশই গায়েব আর আপনি করছেন গোর আজাবের চিন্তা ভাবনা।

সাবের সাহেবের কানে কিছু ঢুকছিল না। আলমগীরের কথা শেষ হতেই তিনি রওনা দিয়েছিলেন বাড়ির দিকে। এখন তিনি পুত্র শোক ভারাক্রান্ত পিতা নন। সন্তানহারা জননীর স্বামীও। আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন—সানু ছাড়া তোমার চাচীর আর কে আছে?

পাড়ার অনেক মহিলা এসেছেন দেখলাম।

তবে চল। শাহেদ নয় একজন শহীদ, না না অনেক শহীদের জানাজায় শরীক হতে যাব আমি।

পরের লাইনটা ভাঙা জমে যাওয়া গলায় উচ্চারণ করলেন সাবের সাহেব—আর যাব স্বাধীন দেশের সেই বধ্যভূমিটা দেখতে, যে দেশের জন্য দুশো বছর আমরা নানাভাবে সংগ্রাম করেছি।

বড়ো রাস্তায় লাল পাগড়ির ধকল। অন্ধকারেও তারা চোখ জ্বালিয়ে রেখেছে বনবেড়ালের মতো। যেতে হবে গলি, কানাগলি, গেরস্থঘরের আঙ্গিনা দিয়ে।

ঘোরের মধ্যে একসময় এসে পৌঁছুলেন পলাশি ব্যারাকে। একটি বাড়ির দেয়ালের দুদিকে দুটি মই লাগানো। তা টপকালে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের অস্থায়ী আস্তানায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

খোলা উঠোনের মাঝখানে কিছু ছেলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মই পেরুতে কষ্ট হয়েছে সাবের সাহেবের। এখন ধ্বক করে উঠল বুক, আবার নতুন লাশ পড়েছে? না কি পাওয়া গেছে শাহেদকে?

কাছাকাছি এসে দেখলেন সব ছেলে দাঁড়ানো নয়। কিছু বসেও। ভাঙা কাচ, বুলেটের খোল, টুকরো ইঁট, খণ্ড কাঠের বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রভূমিতে বসে, হাতে হাতে তারা তৈরি করছে চৌকোণ একটা কিছু। সেটা কী প্রশ্নের আগেই অনেকগুলো বুটের শব্দে চমকে উঠল চারদিক। অস্ত্রধারী, বিশেষ পোশাকে ঢাকা একদল মানুষ। ক্ষ্যাপা হাতে তারা ভাঙছে কৌণিক সেই স্তম্ভটা। বেয়নেটের খোঁচায়, বুটের ধাক্কায় সেটা মাটির সঙ্গে সমান করে দিয়ে চলে গেল বীর ভঙ্গিতে। কে এক তরুণ বলল, এই নিয়ে তিনবার হল।

সঙ্গে সঙ্গে বাজল অন্য একটি কাষ্ঠ—কতবার ভাঙবে? কতরাত জাগবে ওরা? ওরা হুকুম তামিলের ক্রীতদাস। আর আমাদের পাঁজরে ভাই হারানোর কান্না। ভাঙাগড়ার খেলায় কতক্ষণ টিকে থাকবে ওরা। বন্ধুরা—

আধোআধো আলোর ধোঁয়াটে অলৌকিক জমির কোত্থেকে যেন ছায়ার মতো এগুতে থাকল কারা। কারু হাতে ভেজাবালি, কারু ইস্পাতের কণি, কারুবা ইঁটের চাঁই।

অবারিত আকাশের তলায় আবার বসে গেল একদল স্থপতি। অনাড়ী কিন্তু আন্তরিকতায় উষ্ণ অস্থির হাত। লম্বা টিনশেডের বারান্দায় একটা খুঁটির কাছে বিহ্বল দাঁড়িয়ে সাবের সাহেব। আলমগীর কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, ওরা রাজপথের রক্ত অগ্রাহ্য করে, মৃতদেহ গুম করে আমাদের অস্বীকার করতে চাইছে। আমরা তা দেব না। ভাই-এর মৃত্যুকে আমরা অমর করে রাখব ওই মিনার শহীদ মিনার তৈরি করে।

বধ্যভূমি দেখতে এসে এ তিনি কী দেখছেন? সাবের সাহেব খুঁটিটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন। রাত কত কে জানে? তবু এই যুবকদের সঙ্গে এখানেই তিনি জেগে থাকবেন।

বনবুড়ি

কল্যাণী বসু

সন্ধে ঘনালেই বনবুড়ির ঝিম ধরে। সারা দিনমান ঘরদোরের তত্ত্বতালাশ...গাছপালার পরিচর্যা...হাঁস-মুরগি গোরু বাছুরের তদারকি...কাঁথাকানি সেলাই... আভার বড়ি রোদে শুকোনো... গাঁয়ের অসুস্থ মানুষগুলোকে হোমিওপ্যাথির গুলি দেওয়া... কাজ কী একটা? এ সবেই বনবুড়ির দিনটা বেশ কেটে যায়। সাঁঝবেলার পাতলা অন্ধকারটা মাটির বুকে যেই ঝুপ করে নেমে আসে, শিরীষ- কদম- দেবদারু- আম- জাম- লিচু- কাঁঠালের গাছগুলো আঁধারে আঁধারে কেমন একাকার হয়ে যায়। আলাদা করে আর ওদের চেনা যায় না। মনে হয় কে বুঝি কালো পোঁচড়া টেনে সব গাছগুলোকে একাকার করে দিয়েছে। ঝোপেঝাড়ে ডালপালার ফাঁকফোকরে ঝিকমিক জোনাকি জ্বলে। তুলসীতলায় মিনমিটি করে সন্ধ্যাপ্রদীপ। হঠাৎ হাওয়ার ঝলকানিতে দুলে ওঠে প্রদীপ শিখা। দূরে ধানখেত পেরিয়ে, বাঁশবন মাড়িয়ে মজাপুকুরের কিনার ঘেঁষে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে যায় দূর পাল্লার রেলগাড়ি। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসা বাঁশির প্রতিধ্বনি কতক্ষণ ধরে বনবুড়ির কানের পর্দায় অনুরণন তোলে। নীলাম্বরী আকাশে ক্ষয়াটে চাঁদের পাশে জ্বলজ্বল করে ধ্রুবতারা। উড়ন্ত দলছুট একলা পাখিটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। ঝিমমারা বনবুড়ি এসব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। তখন সে নিজের ভাবনার জগতে তলিয়ে যেতে থাকে।

সদুর মা ডাকে—মা, অমা, এবার খইদুধটুকুন মুখে দাও। রাত তো কম হলনি কো। ওই দ্যাকো, মুখুজ্যেবাড়ির কার্নিশে লক্ষ্মী প্যাঁচাটা এসে বসেছে। চাঁদ যে ঢলে পড়তে লেগেচে গো। আর কত ভাববে? আজ তো অনেক ভাবা হল?

ঝিমভাঙা বনবুড়ি আড়ে আড়ে তাকায় সদুর মায়ের দিকে। উত্তর দেয় না। বলে আজ কত তারিখ রে? সদুর মা ঝংকার দিয়ে ওঠে—তোমার এখন খইদুধ খাওয়ার কথা, খাও না। আঁধারে দুধের মধ্যে পোকামাকড় পড়লে? ওই পোকামাকড়সুদ্ধু দুধ পেটে গেলে অসুখে পড়বে না? তখন দেখবেটা কে? নিজের চিকিচ্ছে নিজে করবে? শেতল কোবরেজি বুড়ো হয়েছে, দুচোখে ছানি। গাছপাদড়া চিনতে ভুল করে, গুলিয়ে ফেলে। আজকাল ওর কাছে কেউ যায় না, সকলে তোমার কাছে আশায় আশায় ছুটে আসে। সেই তুমি যতি অসুকে পড়ো? খালি তারিখ আর তারিখ...

—উফ্ মাগো, বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলে কট্ করে কী কামড়ালো দ্যাখ্ তো সদুর মা, সাপখোপ নয়তো?

– কী আর কামড়াবে? ডেঁয়ো পিঁপড়ে নিয্যস্। চল, ভেতরে চল্। এই ঘুরঘুট্টি আঁধারে তোমায় যেতে হবে না। নাও ওঠো....ওঠ্ঠো....

শেষ ওঠোটায় সদুর মা বেশি জোর দিল। ঝাঁঝালো শোনাল। বনবুড়ি নড়বড় করতে করতে

অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। মাটিতে লুটিয়ে থাকা আঁচলটা তুলে গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নেয়। পশ্চিম দিক থেকে নদীর হাওয়া ছুটে আসছে। ঠাণ্ডা...ঠাণ্ডা....

তখন নদী শুকনো। শীর্ণকায়া। ধু ধু বালুকাময় তীর। বর্ষায় রূপ বদলে ভয়ংকরী হয়ে ওঠে সরু সিঁথির মতো। একরত্তি নদীটা। প্রতি বর্ষায় পাড় ভাঙতে ভাঙতে নদী এগিয়ে আসছে। বনবুড়ির জমি ছুঁতে অবশ্য অনেক দেরি।

বনবুড়ি ভাবে, যখন ও থাকবে না এই জমিজায়গা, গাছপালা, সবজিখেত, হাঁসমুরগি, গোরুবাছুর, সোনালি ধানের শীষ, রোদেরাঙা পূর্বপুরুষের এই ভিটের কী হাল হবে? কে দেখবে? হয়তো এসব কিছুই থাকবে না। থইথই করে নেচে বেড়াবে দামাল নদীর ঘোলাটে জল। গাঁ সরে যাবে অনেক ক্রোশ দূরে। নতুন নতুন মানুষ ঘুরে বেড়াবে গাঁয়ের সোঁদাগন্ধ মাটির বুকে। বনবুড়ি তাদের চিনবে না। নতুন ধানের শীষ লকলক করবে আদিগন্ত সবুজ ঢেউ খেলানো খেতজুড়ে। বনবুড়ি দেখবে না। ওর পূর্বপুরুষের ভিটে আলোকবিহীন অন্ধকারে তলিয়ে থাকবে দস্যিনদীর ক্ষুধার্ত জঠরে। বনবুড়ি জানবে না। নৌকা পারাপার করবে ঢেউ ভেঙে, মাঝিদের ভাটিয়ালি সুর মিশে যাবে নোনা বাতাসে। বনবুড়ি কানে পৌঁছাবে না সে সুর...। আনমনা বনবুড়ি চামচে করে মুখে তোলে খইদুধ। সদুর মা বলে—তুমি খাও গো মা, আমি দোরটোর সব বন্ধ করে আসি। এখন আর ভাবনা করো না। চলে যায় ও।

জমাট অন্ধকারে প্রদীপশিখা নাচে। দেয়ালে দেয়ালে বনবুড়ির খইদুধ খাওয়ার বিশাল ছায়া নড়েচড়ে। ছায়া দেখে একটুও চমকায় না বনবুড়ি। মনে মনে ভাবে, আজ কত তারিখ হল কই সদুর মা তো কিছু বলল না? বড্ড এড়িয়ে যায় আজকাল...

খইদুধটুকু চাটপোট করে খেয়ে, মুখটুখ ধুয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় বনবুড়ি। বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা এখনও কটকট করছে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের কামড়, বড্ড জ্বলুনি...। আকাশে গুমগুম আওয়াজ তুলে উড়ে যায় নিঝুমরাতের উড়োজাহাজ। শুয়ে শুয়ে গরাদের বাইরে সরু দৃষ্টি মেলে আঁতিপাতি করে ওটাকে খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে পায় না। নিমেষে অদৃশ্য। আবার ভাবনায় তলিয়ে যায় বনবুড়ি। কোথায় গেল জাহাজখানা? কারা আছে ওর মস্ত পেটে? তারা জেগে? না ঘুমিয়ে? কত উঁচু দিকে উড়ে গেল? চাঁদে তারায় টক্কর লাগবে না তো? এইসব সাতপাঁচ হাবিজাবি চিন্তায় ডুবসাঁতার দিতে দিতে একসময় ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়। নিশ্চিন্তে নাক ডাকায়। ফুড়ুৎ...ফুড়ুৎ...ফরর...ফরর... নাকের দুপাশের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে। ঘুমের ঘোরে হেসে ওঠে। হুক্কাহুয়া...হুক্কাহুয়া...হঠাৎ বাঁশবন থেকে একপাল শেয়াল ডেকে ওঠে। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে বকতে বনবুড়ি পাশ ফেরে। নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায় একসময়। রাত পুইয়ে যায়। ম্লান চাঁদ ফ্যাকাসে আলো ছড়িয়ে ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে।

দিনের আলো ফুটলেই বনবুড়ি অন্যমানুষ। তখন সে দশভুজা। হাঁকডাক...দাপাদাপি... দৌড়ঝাঁপ....কাজ কী একটা? তখন সারাটা দিন বনবুড়ির দাপটে দালানকোঠা সরগরম। কী না কী রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে যেন। এমনি করে বনবুড়ির দিন আসে, দিন ফুরিয়ে যায়।

সেবার খরার পর নতুন বর্ষা নেমেছে। আকাশভর্তি মেঘ গুমগুম। অঝোরধারে বৃষ্টি। টালমাটাল বাতাসের সাঁইসাঁই রাগী গর্জন। নদীর জল সরোষে ফুলতে লেগেছে। দুধ উথলোনোর মতন সারা নদীর জল এই বুঝি উপচে পড়ে ত্রিভুবন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাতে কী? বনবুড়ির ভ্রূক্ষেপ নেই। সারাদিনের কাজকর্মের পাট চুকিয়ে ভাবনায় বসেছে। কে বলবে দিনভর অমন খাটাখাটুনি করা, বলাকওয়া, হাঁকডাক, দাপাদাপি করা মানুষটা আর এই নিঝুম মানুষটা এক?

আজ বনবুড়ির বেজায় ভাবনা। জল ঠেঙিয়ে শিবু গায়েন জ্বরো ছেলেকে নিয়ে ফিরে গেল। সদুর মা দাবড়ানি দিল, এতক্ষণ কী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলে? মায়ের কখন রোগী দেখা, ওষুধ

দেওয়ার পাট চুকে গেছে। এ সময় মা কোনওদিন রোগী দ্যাকে? এখন মা ভাবনায় বসেছে, আজ আর হবেনি কো। এই তুমুল বৃষ্টিতে জল ঠেঙিয়ে জ্বরো ছেলে কাঁধে এসেছই বা কোনো আক্কেল? আচ্ছা বে-আক্কেলে মনিষ্যি তো?

শিবু গায়েন সদুর মায়ের হাতে পায়ে ধরে মিনতি করে— ও দিদি, মা-ঠাকুরনকে এট্টু বল, অনেক দূর থেকে আসতেছি গো। বেলাবেলিই বেইরেছিলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল। পথেই বৃষ্টিটা নামল কিনা। কী করব বল? ভিজে সোঁপাটে হয়ে গেছি। কে শোনে কার কথা। সদুর মা বলল—ঠিক আছে, একটু জিরোও, বৃষ্টিটা ধরলে ফিরে যেওখন। কাল বরং সকাল সকাল এসো। শিবু গায়েন যেমনি এসেছিল তেমনি ফিরে গেল ছেলে ঘাড়ে,শুকনো মুখে। বনবুড়ি তখন অতল ভাবনায় তলিয়ে। শুধু ঘোলাটে চোখে সদুর মাকে একবার নিয়মমাফিক প্রশ্ন করল—আজ কত তারিখ রে? উলটোপালটা মোটে বলবি না, আমি সব টের পাই, বুঝলি? বলতে বলতে সাতরাজ্যের ভাবনায় তলিয়ে গেল।

এমনি করে বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে আবার বর্ষা চলে আসে। একদিন সদুর মা গোরুদের জাবনা দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিল—শুনছ গো মা ঠাকুরন, নদী এদিক পানে ধেয়ে আসছে। অতখানি বালির চরা সব জলের তলায়। ওদিক পানে পাড় ভাঙছে। ধস নামছে। গরমেন্ট থেকে নদীপাড়ের লোকজনদের সরে যেতে বলেছে। কী হবে গো মা?

বনবুড়ি নিরাসক্তমুখে জবাব দিল—এখুনি কিছু হবে না। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস সদুর মা। আরও পাঁচ-সাতটা গ্রীষ্ম-বর্ষা যাক, তখন দেখা যাবে। ততদিনে নিয্যস্ বড়োখোকা ছোটোখোকা এসে পড়বে। ওরা তো লিখেছিল কবে যেন আসবে, তুই তারিখ বলতে পারিস না, তা আমি কী করব? কী করতে আছিস তুই? আমার মাথা খেতে?

সদুর মা হেসে কুটোপাটি হয়—তাই বল! তোমার খোকারা আসবে?

তাই ঘনঘন তারিখের খোঁজ, রাজ্যের ভাবনা তোমার মাথায়। আমি ভাবি কী না কী। তা সত্যিই একদিন তারিখটা চলে এল। বনবুড়ির মনে ছিল না কিংবা জেনেও ভুলে গেছে। মাথায় ভাবনা কী একটা?

সেদিন সাদা ধবধবে ফুলভর্তি টগরগাছে চাঁপারং রোদ্দুরের হাসি চলকাচ্ছে। কাশফুলের জঙ্গলে হাওয়ার কাঁপন...নদীর বুক চিরে উঠে আসছে জলগন্ধী বাতাস। হাঁস-মুরগির ঘরের দোর খুলে দিচ্ছে বনবুড়ি আর অদুর মা। হাঁসগুলো প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজ তুলে ডানা ঝটকাতে ঝটকাতে দৌড়োতে লেগেছে। পেছনে পেছনে মুরগির পাল। ঠিক সেই সময়ে— টিং-টিং-টিং-টিং সাইকেল রিকশার ঘণ্টি পরপর এসে থামল বনবুড়ির ভাঙা দেউড়িতে। চারটে রিকশা। রিকশা থেকে নেমে আসছে বড়োখোকা ছোটোখোকা। ওদের বউ-বাচ্চারা।

—মা মা, আমরা এসে গেছি। কেমন চমকে দিলাম বলো তো?

বনবুড়ির বিস্ময় কাটে না—আজ কত তারিখ রে সদুর মা?

—আর তারিখ দিয়ে কী হবে গো মা? খোকারা তো এসেই গ্যাচে?

—অ তাই? হ্যাঁ তাই তো। আয়...আয়...এসো বউমারা...আমার দাদু-দিদিভাইরা...

কুইক মার্চের ভঙ্গিতে ওরা সকলে দাওয়ায় উঠে এল। ঘাস খড় বিচালি গোবর হাঁস মুরগির বুনো গন্ধের সঙ্গে চাঁপা-করবীর গন্ধ মিলেমিশে এক বিচিত্র গন্ধ বাতাসে ভাসছে। চারপাশে সন্ধানী নজর বুলিয়ে তীব্র আঘ্রাণে নাক টেনে বড়োখোকা বিরক্ত হয়ে বলল—কী সুখে এখানে পড়ে আছ মা? কোন্ গুপ্তধন লুকোনো আছে এখানকার মাটিতে? বনবুড়ি থতমত খেয়ে যায়। উত্তর দেয় না। মনে মনে ভাবে তাই তো কোনো গুপ্তধন লুকোনো রয়েছে এই পোড়ো ভিটের মাটিতে? কোনোদিন তো ভেবে দেখেনি? আসলে সারা ভিটেটাই যে ওর কাছে গুপ্তধনের মতো। রাশি রাশি

গুপ্তধনের মধ্যেই দিবারাত্তির বাস করে বনবুড়ি। কত বছর...কত যুগ...। যেন জন্মাবধি। সেকথা—খোকারা বুঝবে?

বউমারা শাশুড়িকে প্রণাম করে ঘোমটা টেনে তফাতে দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা অবাক বিস্ময়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। একজন বলল—এখানে থাকা? ইমপসিবল? আমি একটা দিনও এখানে থাকতে পারব না। এক্ষুনি চলে যাব।

ছোটোখোকা বলল—হ্যাঁ মা, আমরা ফয়সালা করেই এসেছি। অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার এখানকার জায়গা জমি বিক্রি করে আমাদের সঙ্গে চলো। এই গণ্ডগ্রামে যে কী সুখে পড়ে আছ? ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ত আসেনি। নদী পাড় ভাঙছে। প্রতিবছর আমাদের ভিটের দিকে এগিয়ে আসছে। যে কোনোওদিন এই বিশাল জমি জিরেত সব নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যা দাম পাওয়া যায় তাতেই বিক্রি করে দিতে হবে। উপায় নেই।

বনবুড়ি হাঁ করে শুনছিল ছেলেদের কথা। বুকের ভেতরটা কেমন সাঁইসাঁই করছে। ঠিকমতন নিশ্বাস নিতে পারছে না। যে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ওরা কথা কইছে, সেই দাওয়ার মাটিতে ওদের ছেলেবেলা কেটেছে। শিরীশ কদমের মাথা ডিঙির পুবের চনমনে রোদ্দুর এসে লুটোপুটি খেত এই দাওয়ায়, বনবুড়ি ছেলেদের গায়ে তেলমালিশ করে দিত। চাটাই বিছিয়ে ঠিক এই জায়গায় ওরা দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করত। বনবুড়ি ওদের পড়াতে বসিয়ে রান্নার তদারকি, সংসারের শতসহস্র কাজের তদ্বির করে বেড়াত। তখন বনবুড়ি ঝিমোত না। সাত রাজ্যের ভাবনায় বুঁদ হয়ে ডুবে থাকত না। সে বনবুড়ি ছিল অন্য একটা মানুষ—এই কাঠামোতেই।

এই দাওয়াতেই শেষ শয্যায় শুয়েছিল ওদের বাপ। যাবার আগে বনবুড়ির হাত ধরে মিনতি করে বলেছিল—পিতৃপুরুষের এই ভিটেটুকু আর দুই নাবালক ছেলেকে রেখে গেলুম তোমার হাতে। সামলে রেখো। ভিটেটুকু রক্ষা করো। তাহলে এই ভিটেই রক্ষা করবে তোমাকে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল মানুষটার। ক্রমাগত হেঁচকি উঠছিল। আরও কিছু বলতে চাইছিল তার আগেই দম ফুরিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল। ওই কালঘুম আর ভাঙল না। বহুদিন ধরে বনবুড়ির চোখের পাতায় আটকে ছিল ছবিটা। তারপর কখন একসময় টুক করে ঝরে পড়ে গেছে। ঝরে গেছে বললেই তো আর ঝরে থাকে না, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লেপটে থাকে চোখের পাতায়। তাই তো বনবুড়ি প্রাণপণে আজও রক্ষা করে চলেছে ভিটেটুকুকে। যত কষ্ট হোক না কেন, কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবে না।

ছেলেদের ভাবনা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বনবুড়ি ওদের সস্নেহে ডাকল আয়, ভেতরে এসে বোস। তবু যা হোক এলি। বাচ্চারা ওদের পূর্বপুরুষের ভিটে তো দেখলই না। তোদেরও কী মনে আছে? কবেকার কথা! বিয়ের পর বড়বউমা বোধহয় একবার এসেছিল, ছোটোবউমা এই প্রথম। সদুর মা, ঈশানকে একবার ডাক। মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-শাক-সবজি-ফলমূলের ব্যবস্থা করুক। শুধু মাংসটাই যা বাইরে থেকে...বড়ো পুকুরে জাল ফেলতে বল। পাঁচসেরি রুই কাতলা চাই। ছোটো মাছও। গাছ থেকে ডাব পাড়তে বল। তেষ্টায়, বেচারাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এতটা পথ...কম ধকল...এই গরমে...কই তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়া আয় ভেতরে আয়... যা গরম... গরম আবার কোথায় গো মা ঠাকুরন? বৃষ্টি হয়ে হু হু হাওয়া...শরীরে কাঁপন লাগে. গায়ে তাতে লাগে না।

ছোটোখোকা সদুর মাকে বলল—আমায় চিনতে পারথ মাসি? সদুর মা একগাল হেসে বলল—ও মা চিনবোনি? কোলে কাঁখে করে মানুষ করলুম না? তোমার হাতের কম কিল হজম করেছি? দুধ খেতে যা ঝামেলা করতি...হেসে লুটিয়ে পড়ল সদুর মা। ছোটোখোকা হাসছে। বউকে ডেকে বলল—শুনলে তো? বউটাও হেসে ফেলল। দুই খোকার চারটে বাচ্চা। দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। বড়ো নাতি টিটু বলল—ঠাম্মা, তোমার অমন অদ্ভুত নাম কেন গো? বনবুড়ি? বনবিবির কথা জানি, সুন্দরবনের দেবী। কিন্তু বনবুড়ি? কখনও শুনিনি।

বনবুড়ি হেসে বলল—ছেলেবেলা থেকে দিনরাত্তির বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতুম কিনা তাই আমার বাবা সোহাগ করে ডাকতেন বনবুড়ি। মা নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণকলি। সে নামটা চললই না। ওই বনবুড়ি নামটাই...

তিনটে দিন ওরা রইল। প্রত্যহ বড়ো পুকুরে জাল ফেলে পাঁচসেরি রুই কাতলা ধরে তার ভাজা, ঝাল, কালিয়া, মুড়িঘণ্ট কত পদ রান্না হয়। বনবুড়ির এতদিনের যমধরা বাড়িটা হঠাৎ জিয়নকাঠির স্পর্শে যেন জীবনের স্পন্দন খুঁজে পায়। রান্নার গন্ধে, বাচ্চাদের দাপাদাপি কলকাকলি খুনসুটিতে ভূতুড়ে বাড়িটা সারাদিন সরগরম। সন্ধে হতে না হতে আর বনবুড়ির ঝিম ধরে না। সদুর মাকে তারিখ জিজ্ঞেস করে না। উদাস চোখে ভাবনা করে না। বাচ্চারাও ফিরে যাবার জন্যে বায়না করে না। মায়াবী চোখে ওরা পোড়ো বাড়ি, ভাঙা দাওয়া, গাছগাছালি, হাঁস-মুরগি, গোরু-বাছুর সবকিছুকে দেখতে থাকে। হাঁসের পেছনে পেছনে দৌড়োয়, মুরগির ডাক নকল করে, বাছুরের গায়ে হাত বোলায়। গভীর একাগ্রতায় দুধ দোওয়া, মাছধরা দেখে। শুধু সুয্যি ডুবলে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে যেমনি ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বলে ওঠে ওরা কেমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ভোর ফুটতে না ফুটতে সকলে মিলে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। গণ্ডগ্রাম দেখার মতো কিছুই নেই। তবুও গ্রামটার ল্যাজা থেকে মুড়ো চষে ফেলে ওরা। আটচালা, চণ্ডীমণ্ডপ, স্কুলবাড়ি, কাসুন্দির মাঠ, জেলেপাড়া, বামুনপাড়া, আমবাগান, শিবের থান, হরগৌরীর মন্দির, নদীর ধার সব দেখা হয়ে যায়। সব দেখা ফুরিয়ে যায়।

বড়োখোকা বলল—কেউ বলবে এটা একবিংশ শতাব্দী? ইলেকট্রিসিটি নেই, এখনও ছুইঢাকা গোরুর গাড়ি। সাইকেল রিকশা চারটে নাকি সদ্য আমদানি। গ্রামের মানুষগুলোও যেন অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে আছে। কবে আমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছি, কই কোনো পরিবর্তন তো চোখে পড়ল না। এদিকে শুনি গাঁ-গঞ্জের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে—ইলেকট্রিসিটি, পাকারাস্তা, সাক্ষরতা, দারিদ্রদূরীকরণ...কোথায় কী? অল হোক্স...ধাপ্পা...

—ওদের দেশ হলে ওটাকে হেরিটেজ ভিলেজ করে রাখত, তাই না দাদা? বড়োখোকা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—বলতে পারো লীনা। সত্যি কথা বলতে কি এখানে এলে পৃথিবীর গতি টের পাওয়া যায় না। ভাবলে বড়ো আশ্চর্য লাগে। এইরকমের গ্রাম এখনও টিকে আছে? এদের সংখ্যা কত তা জানি না কিন্তু আরও আছে আমার স্থির বিশ্বাস। এদের জীবনযাত্রা জীবনবোধ সম্পূর্ণ আলাদা। এরা নিজেদের নিয়ে বেশ আছে। কোনোও আক্ষেপ নেই, আকাঙ্ক্ষার বালাই নেই। যেটুকুন আছে সেটুকুন নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। আজকের সভ্যতার সঙ্গেই একমাত্র এদের তুলনা চলে।

নদীর ধারটা বড়ো সুন্দর। ধু ধু করছে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। বালি ফুঁড়ে হঠাৎ হঠাৎ শেয়ালকাঁটার ঝোপ; ফণীমনসা, আকন্দ। ওরা বালিতে হাঁটছিল। হাওয়ায় ওদের চুল আঁচল উড়ছিল। ছোটোখোকা বলল—তোর মনে পড়ে দাদা, বাবার হাত ধরে এখানে এসে আমরা কত খেলতাম? বালিতে গড়াগড়ি দিতাম? দুর্গ বানাতাম? বড়োখোকা চারপাশে নিরীক্ষণ করছিল। আনমনে উত্তর দিল—মনে আছে, খুব মনে আছে ছোটো।

—দাদা নদী, নদীর ধার কেমন অচেনা লাগছে না? বালিয়াড়ির ডানদিক ঘেঁষে একটা কুঠিবাড়ি ছাড়িয়ে সাত-আট কদম গেলেই মহাকালের মন্দির? আমার স্পষ্ট মনে আছে। তোর মনে নেই দাদা?

বড়োখোকাকে চিন্তান্বিত দেখাল—হ্যাঁ ছিল তো! আমরা ঠিক পথে এসেছি ছোটো? দাঁড়া দাঁড়া একজন লোক আসছে। ওকেই জিজ্ঞেস করি।

—এই যে ভাই শুনছেন? এখানে একটা ভাঙা কুঠিবাড়ি ছিল না? তার পাশে মহাকালের মন্দির? মস্ত ধুমধাম করে পুজো হত! সাতদিন ধরে মেলা বসত?

লোকটি থমকাল। মাথা চুলকে বলল—ঠিক বলতে পারবনি বাবুমশাইরা। তবে ছিল বলে আমিও শুনিচি, চোকে দেখিনি কখনও। নদী টেনে নিয়েছে বোধহয়... হনহন করে চলে গেল।

ছোটোখোকা নিশ্বাস ছেড়ে বলল—আমাদের ছোটোবেলাটা এখন নদীর পেটে। ওই ভাঙা কুঠিবাড়িতে কত লুকোচুরি খেলেছি, মহাকালের মন্দিরের মেলায় মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে পাঁপড় ভাজা কিনে খেয়েছি। নাগরদোলায় চড়েছি...একবার ভিড়ের মধ্যে তুই হারিয়ে গেলি, মায়ের কী কান্না, মনে আছে তোর?

বড়োখোকা ঘাড় কাত করল।

বাচ্চারা বালিতে হাঁটু মুড়ে বসে প্রাসাদ গড়ছে। ওদের মায়েরা নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে নিজেদের মধ্যে গল্পগাছা করছে। সূর্য কখন ডুবে গেছে। পশ্চিমপাড়ে মেঘের খাঁজে খাঁজে তখনও সিঁদুরে মেঘের আভা। ছোটোবড়ো উপলখণ্ডের মতো কালো কালো মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধে।

অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোয় ওরা খাওয়াদাওয়া সারছে। বড়োখোকা বলল—তাহলে কী ঠিক করলে মা?

বনবুড়ি চমকে উঠল—কীসের কী ঠিক করা বাবা?

ছোটোখোকা বলল—যে জন্যে আমাদের এখানে আসা। এখানকার জমিজমা বিক্রি করে সব পাট চুকিয়ে চলে যাওয়া। এরপর সব যে নদীগর্ভে চলে যাবে! তোমার মনে আছে মা—নদীর ধারে ভাঙা কুঠিবাড়িটার কথা? আর তার পাশেই মহাকালের মন্দিরটা?

বনবুড়ি চোখ বুজে অতীতে ডুব দিল। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে চোখ মেলে বলল—হ্যাঁ ছিল বইকি। ছিল তো। কেন?

—তারা এখন নদীর পেটে।

—হ্যাঁ সে তো অনেককালের কথা। এখনকার কেউ ভাঙা-কুঠিবাড়ি বা মহাকালের মন্দিরের নামই শোনেনি। জানেও না।

—ঠিক তাই। দুদিন বাদে তোমার ভিটেরও ওই দশা হবে। বুঝেছ, কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। বড়খোকা বলল।

—তাহলে কী হবে?

—তাই তো বললাম, এখানকার রাজপাট বেচেবুচে আমাদের সঙ্গে চলো। সারাজন্ম এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে রইলে, দুনিয়াটা কেমন দেখলেই না।

—তোদের সঙ্গে যাব! কোথায়?

—কেন, আমাদের কাছে? ইচ্ছে করে না তোমার?

—তোদের কাছে? সে তো অনেক দূর বাবা? মাঝরাত্তিরে উড়োজাহাজে চেপে যেতে হয়। রোজ রাত্তিরে আমার ঘরদোর, আম-কাঁঠালের বাগান ডিঙিয়ে চলে যায়। চোখে দেখি না, আওয়াজ শুনি। মনে ভাবি কারা আছে ওখানে, তোরাই তো আছিস? না রে আমি কোথাও যাব না।

—বেশ আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার যদি আপত্তি থাকে তবে কলকাতায় চলো। সেখানে থাকবে। মস্তবড়ো শহর, কত সুযোগ সুবিধে... এখানে একলাটি...

—কলকাতা? সেখানে আবার আমার কোনো কুটুম আছে?

—কুটুম থাকবে কেন? সেখানে সুন্দর সুন্দর বহু প্রতিষ্ঠান আছে তারা তোমার যত্নে রাখবে। কথা কওয়ার কত সঙ্গী পাবে। সারাদিন মুখ বুজে একলাটি থাকতে হবে না। খাওয়াদাওয়া...অসুখ বিসুখ... সব ব্যাপারে দেখাশোনা করবে তারা। একটুও খারাপ লাগবে না। রাজি হয়ে যাও মা।

এই নির্বান্ধব পুরীতে তোমাকে আর একলা ফেলে রাখতে পারি না। হয় আমাদের সঙ্গে চলো, নাহলে ওই আশ্রমে।

বনবুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। কী যে আবোলতাবোল বকে খোকারা। চলে ওমনি গেলেই হল? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল বলে, এখন ওদের সঙ্গে ভিনদেশে? আর কলকাতার আশ্রমে? সেই বা কেমন জায়গা? এই বয়সে নতুন নতুন অচেনা সঙ্গীসাথী দিয়েই বা কী হবে? সদুর মা কী দোষ করল? সুখেদুঃখে বটগাছের হাজারো ডালপালার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, কই তার কথা তো কিছু বলল না খোকারা?

কলকাতায় বনবুড়ি দুতিনবার গিয়েছিল বটে সেও তো কোনোযুগের কথা! জেলার থেকে জলপানি পেয়ে কলকাতায় তখন পড়তে গেছে খোকারা, ওদের বাপ বনবুড়িকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কী ভিড়! গাড়িঘোড়ার আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়। মানুষ মানুষকে তোয়াক্কা করে না। দু-দুবার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। কালীঘাটের মন্দির, পেল্লায় মাঠের মধ্যিখানে একটা তেধেড়েঙ্গে মিনার, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ চিড়িয়াখানা এসব দেখেছিল। গোটা শহরটাকেই আস্তে একটা চিড়িয়াখানা বলে মনে হয়েছিল ওর। আর একটা মস্তবড়ো সাদা গম্বুজওলা বাড়ি দেখেছিল। গম্বুজের মাথায় পরি, সামনে টলটলে পুকুর, ফুলের কেয়ারি। জায়গাটা বড়ো পছন্দ হয়েছিল। এখন যেসব মুছে যাওয়া ঝাপসা স্মৃতি।

—তাহলে আমরা আসি মা? আরও কিছুদিন কলকাতায় রয়েছি আমরা, মত বদলালে জানিও। এই মোবাইল ফোনটা রাখো। ওটা বাজলে বাঁ-দিকের সবুজ বোতামটা টিপে হ্যালো বলবে। আমাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে লাল বোতামটা টিপে দেবে। এই কাগজে আমাদের নম্বর লেখা রইল। তুমিও ফোন করো। যাবার আগে খোকারা ওদের সব লিখিয়ে দিয়ে গেছে। আবার চারটে রিকশা ভর্তি করে চলে গেল ওরা। বাচ্চাদের চোখ ছলছল করছিল—তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে না কেন ঠাম্মা? আমাদের কত ভালো লাগত! চলো না...

বনবুড়ির বুকের ভেতরটা অনাস্বাদিত এক অজানা শিহরনে কেমন আঁকুপাঁকু করে এই বুঝি ভেঙে পড়ল হৃৎপিণ্ডটা। হৃৎপিণ্ড? সে কেমন দেখতে হয়? হৃদয় আর হৃৎপিণ্ড কী এক? ওরই মণিকোটরে ভরা থাকে ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা, ব্যথাবেদনা, সুখদুঃখের নানান অনুভূতি। চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়!

রিকশাগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্রিং ক্রিং ধ্বনিটা বহুক্ষণ লেগে রইল বনবুড়ির কানের পর্দায়। সদুর মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল। বনবুড়িকে বলল—কী পাষাণী গো তুমি? চোখের জলে কী আগুন লেগেছে যে দু-ফোঁটা জলও পড়ল না? ধন্যি মেয়েমানুষ তুমি মা-ঠাকুরন—

বেলা পড়ে আসছে। বনবুড়ি হাঁক দিল—অ সদুর মা; হাঁসমুরগিদের যে ঘরে তোলা হয়নি। শিগ্গির চল। হাত-পা কোলের মধ্যে গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? হেট হেট করে ওরা দুজনে মিলে হাঁসমুরগিদের ঘরবন্দি করল। বাছুরটা আকাশে মুখ তুলে ডাকছিল হাম্বা...হাম্বা...। বনবুড়ি শুনল ঠাম্মা...ঠাম্মা...। আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত চিরে কারা যেন কাঠগলায় ডেকে উঠল ঠাম্মা...ঠাম্মা...ধ্বনি মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনি লেগে রইল আকাশের গায়ে।

অন্ধকার। বনবুড়ি দাওয়ায় এসে বসেছে। মাথার ওপর মেঘ ডাকছে গুড়গুড় গুড়গুড়। নদীর ধার থেকে দামাল বাতাস ছুটে আসছে। গাছগুলো জড়াজড়ি করে দুলছে। বনবুড়ির আবার ঝিম ধরেছে। নিঝুম হয়ে ভাবনায় ভাবনায় তলিয়ে যাচ্ছে। এই দাওয়া, এক মৃত্যুপথযাত্রীর কাতর অনুরোধ, ঝপঝপ পাড় ভেঙে নদীর এগিয়ে আসা, মা...মা...ঠাম্মা...ঠাম্মা... চরাচর জুড়ে কারা ডেকে উঠল? বনবুড়ি অতল ভাবনায় ডুবে যায়। শুকনো দু-গাল ভেসে যায় নোনা অশ্রুজলে—

মেজোকাকিমার গল্প

নবনীতা দেবসেন

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি। এই কালকেরটাই আগে বলা যাক। ছোটোকাকু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছেন, "মেজবউদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?"

মেজকাকিমা বললেন, "চিঠি? তা তুমি আসছো না, আসছো না, আমি তো রান্নাবান্না সেরে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কী তুমি আসো, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমার মায়ের দেখা পেলুম। সোমার মায়ের খবর তো জানো? তার ভায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। এই সময়েই আবার তার মায়ের হল হার্ট অ্যাটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারি একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়ের খবর নেবে, না পি.জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা তোমাকে ম্যাড্রাসের কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি.জি-তেই যাও। কী সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখো একবাব ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মাত্তর! তারপর সোমার মা তো চলে গেল, আমি ভাবলুম সোমার জন্যে তো পাত্তর দেখা উচিত এবার। মেয়ে বেশ বড়ো হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হলো উমেশবাবুর চার ছেলের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেতে, না আমেরিকায়, খড়্গপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চারটেই দুরে দুরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনোটা পড়ছে, কোনোটা বা চাকরি করছে। কে যে কেমন পাত্তর হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই বরং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন। বিলেতের না আমেরিকার চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ওই সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিরিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়বো না। ওই কত্তেকত্তে ছেলেরা কে কী কচ্চে, কে কী পড়চে সেসব জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেলুম। বয়েসের দোষ আর কী, তা উমেশবাবু—"

ছোটোকাকু ডাল শেষ করে চচ্চরি মাখতে মাখতে বললেন, "মেজবউদি, আমার কী কোনো চিঠি এসেছে?"

"সেই কথাই ত বলচি, তা পিয়নেরও দেখা নেই, তোমারো দেখা নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মেখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে। জবাকুসুম-ক্যান্থারাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নারকেল তেল। তাতেই কী খর্চা, কী খর্চা! মাঝে মাঝেই ভাবি, দূর ছাই চুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেবো! তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্টিখানি, চুল তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, রাগ করে দুদিন তেল না মাখলেই প্রেসার চড়ে যায়।

সে আরেক কেলেঙ্কারী। তা আজকাল সিংঘি মার্কা বদল করে প্যারাসুট মার্কা কিনছিলুম, এখন আবার সেটাও বদল করে—"

এবার মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন, "মেজবউদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?" চিরপ্রশান্ত চিরসুস্থির ছোটোকাকু ধৈর্যভাবেই প্রশ্ন করেন।

"আহা-হা, সেই কথাই হচ্চে। এতটুকুতে এত অধৈর্যি হলে চলবে কেন? ওই চিঠির কথাই তো হচ্চে তা, আমি ভাবলুম পিয়নের তো দেখা নেই, বরং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘষেই নিই, তারপর তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ! ও বাড়ির চাঁদুর ছেলেটা ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওরে বাবা রে—এই ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর মতন এতদূর ডেনজারাস খেলা আর নেই! আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু করেছি! অ চাঁদু! অঁ চাঁদু! তোর ছেলে যে পড়ে মোলো রে। কী কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা! তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলায় এই সময়ে অবশ্যি সে থাকে না কোনোদিনই, তার তো রোজই আপিস—সেই সুযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইস্কুল সব বন্ধ কিনা? গরমের ছুটি দিয়ে দিয়েচে এর মধ্যেই—ইস্কুলগুলো যে কটা দিনই বা খোলা থাকে, আর কটা দিন বন্ধ—"

"মেজবউদি?" ছোটোকাকু কাঁচা আমের ফটিক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আমার কী কোনো চিঠিপত্তর এসেছে?"

"আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কী কথা বলছি আর? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবারে গামছাটা নিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়েই নীচে কলতলায় নাবি, তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সারা হবে—এমন সময়ে সাবির টেলিফোন এলো। সাবির শাশুড়ি যায়-যায় জানোই তো? সাবিদের বাড়ি টেলিফোন নেই, খবর যা কিছু আমার এখানেই দেয়। আমি তখন কী করি? কেমন করে সাবিকে ডেকে পাঠাই? ঘরে তো কেউই নেই, তখন বললুম—তা খবরটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও, দুপুরবেলা যখন ছোটোঠাকুরপো ভাত খেতে আসবে তার হাতে সাবিকে খবর দিয়ে দেবো। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধরা যদি যায়, কলম ধরা বড়োই শক্ত। তখন সাবির দেওরকে বললুম, ধর, তেল হাতটা ধুয়ে আসি।"

দইয়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে ছোটোকাকু বললেন, "মেজবউদি, আমার কী কোনো চিঠি—"

"আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কী সংসারে চলে? আপিসের কাজকর্ম করোই বা কেমন করে তোমরা? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুয়ে সাবির দেওর যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোটোঠাকুরপোকে দেবো—সে ঠিক ভাত খেয়ে আপিস যাবার পথে সাবিকে দিয়ে যাবে তার শাশুড়ির খবরটা। চিঠি চিঠি করে যে পাগল করে দিচ্ছো, তা সেই চিঠির কথাই তো বলছি। শুনলে তো?"

ছোটোকাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমার হাত থেকে মশলা নিয়ে খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "তাহলে, মেজবউদি, সাবির চিঠিটাই দিয়ে দাও। যাবার পথে দিয়ে যাচ্ছি।"

"সে কী আর আছে? রাস্তা দিয়ে তক্ষুণি মনমোহন ছুতোর মিস্তিরি যাচ্ছিল, সে তো সাবিদের পাশের বাড়িতেই কাজ করছে। তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখন তখনই পেয়ে গেছে। ওসব খবর ফেলে রাখতে হয়?"

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোটোকাকু বললেন, "তাহলে আজকে সকালের ডাকে আমার কোনো চিঠি আসেনি?"

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওরকে এগিয়ে দিতে। ফস করে জ্বলে উঠলেন, "কে বললে আসেনি? আমি কী বলেছি একবারও যে তোমার কোনো চিঠি আসেনি? কেন আসবে না চিঠি? আমি পিয়নকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কী কোনো নিয়ম আছে? এই তো

তোমার দুখানা পত্তর এসেছে। এই দরজার কাছেই টেবিলের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়ে তুলে রেখেছি, পাছে উড়ে যায়।"

খবরের কাগজের গোছা তুলে বীরদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোটোকাকুর হাতে।

(২) অতিথিসৎকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে তার আর রক্ষে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, "বউমা, বউমা, মিষ্টি আনো, শরবৎ করো, অতিথিনারায়ণকে অমনি ফেরাতে নেই।" তারপর তো দরজা খোলা হল। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিয়ে পাখা খুলে বলবেন, "কাকে চাই অপনার?" যদি অচেনা হয়, তবু—"বউমা, শরবৎ করো, মিষ্টি আনাও।" তিনি হয়তো কোনো সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁরাই প্রধান। এরোপ্লেনের সুটকেস, ইলেকট্রিকের ঝাঁটাবালতি, গ্যাসের উনুন, বাসনকোসন, তেল, সাবান, খাবার-দাবার, কী না আনেন এঁরা? এমনকী অন্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমার সব কিছুই দেখা চাই। শোনা চাই। তারপর অতিথিকে মিষ্টির থালা দিয়ে শরবৎ খাইয়ে জিনিসপত্র কিনে, বিদায় করা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামি হয়। শ'খানেকের মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হবে না এই বাড়ি থেকে। মেজকাকিমার কল্যাণে বাড়ি খেলো সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অন্তর্বাসে, স্যানিটারি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডারে, ম্যাগিতে, বোর্নভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেরাতে কষ্ট হয় মেজকাকিমার। এত রোদ্দুরে আহারে লোকের দোরে দোরে ঘুরছে, ওদের বুঝি কষ্ট হয় না? কিছু না কিনলে চলবে কেন? আজ দরকার নেই? কাল হবে। যাকে রাখো সেই রাখে। মেজকাকিমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বড়বউদির মতো এমন পুত্রবধূ জগতে হয় না। বড়বউদির সহ্যের সীমা নেই। ভালোবাসার অন্ত নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে যাই, বউদি শুধু হাসেন। দাদার মৃত্যুর পর থেকে বড়বউদি একদম একা। দিনের বেলাটা ইস্কুলে পড়ান, বাকি সময়টা মেজকাকিমাকে নিয়ে। মেজকাকিমা তাঁর অতিথিদের গলা নীচু করে বলেন—"বড়বউমা আবার একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শরবৎ দেয়, আটআনা দামের রসগোল্লা আনায়, তবু দেয় তো। আমার মেয়ে হলে? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যারানী হতো, কিছু দিতোই না! এই দিচ্চি মা দিচ্চি মা করেই সন্ধে উৎরে দিত। তোমরা চলে যেতে। চিরকাল কী কেউ জলখাবারের লোভে লোভে বসে থাকতে পারে?" তখনও জলখাবারের আশায় বসে থাকা, অথবা জলখাবার-খেতে-ব্যস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু অনুপায়। না খাইয়ে ছাড়বেনও না, মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ করার মতো যত্ন তাঁর। "হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, 'মা, তোমার সবটাতে বাড়াবাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমার আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জাতপুত কেউ নয়, তাকে মিষ্টির থালা ধরে দেবার কী দরকার।' আমি বলি, কী দরকার সেটা তুই কী বুঝবি রে সন্ধ্যা? বুঝি আমি আর বোঝে তারা। আমার এতেই পুণ্যি। অতিথি, অতিথি। কী জন্যে এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে, সে আমার জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা করা অবশ্যকর্তব্য।" বক্তৃতার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শরবৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টির থালায় হাত দেন না অতিথিরা। এতো গেল অচেনা অতিথিদের বেলায়। যখন সত্যি চেনা লোক, মেজকাকিমা উচ্ছ্বসিত। "এসো, এসো বউমা, খাবার সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে, বউমা, খাবারটা সাজাতে কত দেরি করছো। বুলু-বাচ্চুকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে। বউমা খাবার থালাগুলো তুলে নাও, বুলু-বাচ্চুকে হাত ধোবার জল দাও, ওরা এবার চলে যাক, ভীষণ ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে তার বসে কাজ নেই।" অথবা, বুলুর বাচ্চা ছোটো, বাড়িতে রেখে এসেছে আর কতক্ষণ বসবে এখানে। অথবা বাচ্চু রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, কেউ না চুরি করে নিয়ে যায়! ওদের ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে এবার, ওদের এক্ষুণি না গেলে নয়! অথবা কার্ত্তিক মাসের কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আরও দেরি করে

গেলে। অথবা বুলুর মায়ের শরীর ভালো নয়, বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয় ওর অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আরও চড়ে যাবে, ওরা বরং বেলাবেলি চলে যাক—মেজকাকিমার ঝুড়িতে ওজরের সংখ্যা অগুন্তি। ঋতুমাফিক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়, বিষ্টি, চোর-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শ্বশুর, ছেলেপুলে, নয় তো চাকরি-বাকরি, নয় তো গাড়িতে ভিড়, শেষ অবধি গাড়ি চুরির ভয় পর্যন্ত দেখান মেজকাকিমা। আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়া হলেই আর এক মিনিটও নয়, তক্ষুনি বিদেয় করা চাই। বসতে দেন যতক্ষণ খুশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদের। ওরা তো 'বেড়াতে' আসেনি, 'কাজে' এসেছে। ওদের কথাই আলাদা। সত্যি কথাই তো।

(৩) পয়া-অপয়া

"এই যে, এই কাপড়টা আর পরবো না বউমা, তুলে রাখো"—মেজকাকিমা হাতে ফর্সা লালপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি একটি। মেজকাকিমা বললেন, "বড়ো বিশ্রী কাপড় এখানা বউমা, এটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা রিকশা উল্টে বিয়েবাড়ির বাসনকোসন সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। কি কাণ্ড বলো দেখি? ওই বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির বিয়ের ভিয়েন বসছে, তার জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কী, একটা গাড়ি একটা কুকুরকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাড়িটা এদিকে হঠাৎ সরে এসেছে, অমনি এই বাসনভর্তি রিকশাটা উলটে পড়ল। কেউ কাউকে ধাক্কা মারে নি। সব আপনি-আপনি,সব এই কাপড়খানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে রাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পরে ভাত খাচ্ছিলুম, আর বিন্দুর মা পা হড়কে পড়ে গেল কলতলাতে?" বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আর ওই আলমারিটাতে জায়গা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হয়ে আছে অপয়া শাড়িতে। তা দিয়ে বাসনও কেনা চলবে না। অপয়া বাসন হয়ে যাবে সেসব। পরাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড় তাঁর মনে থাকে। এত অপয়া শাড়ি কী আর একদিনে জমেছে? তা নয়, পঁচিশ বছর ধরে জমছে। মেজকাকা মারা যাবার দিন থেকেই সেই প্রথম অপয়া শাড়ি বাছা শুরু হল। যেটা পরা অবস্থায় মেজকাকার মৃত্যু ঘটল। তারপর থেকেই অপয়া ঘটনা বড্ড বেড়েছে। "পাশের বাড়ির মেয়েটা যে গলায় দড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়ে, সেই খবরটা এই কাপড় পরে শুনতে পেলুম। এটা বড্ড অপয়া।"—"এই কাপড়টাই আমি পরেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুরে সেই ভীষণ মারামারিটা হল।"—"এই কাপড়টা আমি পরেছিলুম যেদিন মিত্তিরদের কত্তা-গিন্নিতে বেদম ঝগড়া হয়েছিল—গিন্নি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে। শেষে মিত্তিরমশাই নিজে গিয়ে বহু সাধ্য-সাধনা করে দশ দিনে ফেরৎ আনলেন।" —এরকম কত! কত!

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় ছোটোখোকার বউয়ের প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবার খবর পেয়েছিলুম।"

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় বুলুর ছেলের ডিভোর্সের খবর শুনলুম", "এটা পরেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল", "এই কাপড়টা পরা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুরপোর চাকরি যাবার খবর এল।"

"এই কাপড়টা পরেছিলুম যখন রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুসংবাদ দিলে।"

এমনি, নেহরুর মৃত্যুসংবাদের শাড়ি, উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনের শাড়ি, ভোলাদ্বীপউড়ির চরে প্রবল বন্যা হবার দিনের শাড়ি, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শাড়ি, 'কণিষ্ক' প্লেন বিপর্যয়ের শাড়ি, বিশুর ঠাকুমার পা পিছলে পড়ে কোমর ভাঙবার দিনের শাড়ি, পাড়ার ভুতো কুকুর চাপা পড়বার দিনের শাড়ি, দ্বিজুর বাবাকে পুলিশে ধরবার দিনের শাড়ি, শুভেন্দুর বাড়িওয়ালার হুজ্জুতি করার দিনের কাপড়, প্রতিমার ফেল করার দিনের, ফেলুর শ্বশুরের হার্ট অ্যাটাক হবার রাত্তিরের, বেঁটে শিবুর নামে হুলিয়া বেরুনোর দিনের, ফুলবাগানের বাড়িতে চুরি হবার দিনের, দেওঘরের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার দিনের, সরোজের বউয়ের পালিয়ে যাবার দিনের, কুমারের বাপের পক্ষাঘাত হবার দিনের। এরকম

অজস্র মন্দ দিন- রাতের স্মৃতিতে ভর্তি মেজকাকিমার অপয়া শাড়ির আলমারিটা। বড়-বউদি মাঝে মাঝে পুরনো দুটো-একটা চুপিচুপি বের করে বিলিয়ে দেন আমাদের। আমরাও চুপিচুপি ছাপিয়ে নিয়ে পরি। নইলে জায়গায় আঁটবে কেন? অপয়া ঘটনা তো জগৎজুড়ে রোজই ঘটছে। কানপুরে তিনটে কচি কচি মেয়ের গলায় দড়ি দেবার দিনের শাড়িটাও ওতে উঠে গেছে। সক্কালবেলা উঠেই কাগজে ওই ছবি দেখার পরও সে কাপড় কী আর পরা সম্ভব? যে-কোনো মানুষের পক্ষেই?

(৪) ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে

জগতে কিছু কিছু মানুষ রেডিও-অ্যাকটিভ হন। সুবীর যেমন। মেজকাকিকামও খুব রেডিও-অ্যাকটিভ প্রাণী। চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও শুনতে ভালোবাসেন। চিরটাকাল। গ্রামাফোন? হ্যাঁ, তা মন্দ কী? তবে রেডিওর মতন নয়। ওই রেকর্ড লাগাও রে, পিন লাগাও রে, ওসব পঞ্চাশটা ঝনঝাট নেই রেডিওর। চাবি ঘোরাও আর গান শোনো। শুধুই কী গান? সংবাদ, আবহাওয়ার খবর, ধর্ম আলোচনা, নাটক, যাত্রা কী নেই। রেডিও একখানা ঘরে থাকলে আর ঘরে মানুষ লাগে না। মেজকাকিমা ঘুমিয়ে থাকলেও রেডিওর চলা চাই। ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, অক্লান্ত রেডিও চালক মেজকাকিমা। কখনও 'ক', কখনও 'খ', কখনও 'বিবিধ ভারতী', কখনও 'ঢাকা' চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি এদিক-সেদিক শোনেন। প্রায়ই শুনি ইংরেজি ঝিনচাক বাদ্যি বাজছে রেডিওয়, আর মেজকাকিমা তাকিয়া মাথায় ফুরুর ফুরুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, রেডিওটি মাথার কাছে নিয়ে। যখন থেকে ট্রানজিস্টার চালু হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জের রাখাল বালকরা শুনেচি একটি করে ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গরু চরাতে যায়। আর মেজকাকিমাও ট্রানজিস্টারটি সমেত রান্নাঘর, স্নানের ঘর সর্বত্রই বিচরণ করেন। সর্বভূতে আকাশবাণীর সাহচর্য মেজকাকিমার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি রেডিওর অত্যাগসহন সঙ্গী এবং রেডিওর মতিবুদ্ধি মতোই তিনি জীবনযাপন করেন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেই দেখি মেজকাকিমা দরজা জানলা বন্ধ করছেন। ভারি সুন্দর একটা হালকা ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এরকম বাতাসকেই বোধ হয় 'মলয় পবন' বলে, আমি মেজকাকিমাকে বারণ করি দরজা জানলা বন্ধ করতে। এত সুন্দর হাওয়াটা বন্ধ করে দেবার কোনো মানেই হয় না। গম্ভীর মেজকাকিমা বললেন, "এখন মিষ্টি হলে কী হবে, ও যে প্রচণ্ড লোকসান সঙ্গে নিয়ে আসছে বাবা!"

"মানে?"

"মানে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা আসছে। তুমিও বাড়ি চলে যাও। আর এখানে থেকো না।"

"যাব মানে? এই তো এলুম।"

"কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইরে থাকলে তোমার শাশুড়ি ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও।"

"কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তে।"

"আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে।"

"মোটেই আসছে না। বাইরে পরিষ্কার আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইরে থেকে।"

"রেডিওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে, তুমি জানবে কোত্থেকে? তোমরা তো রেডিও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এলো বলে।"

"কোথায় বান? অন্ধ্রে? না বাংলাদেশে?"

এই দুটো দেশকে প্রতিবছর সমুদ্র একবার করে মার দিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পশুপাখি, ঘরবাড়ি সমেত মানুষ মরে।

"অন্ধ্র আর চাটগাঁ ছাড়া কী আর দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চিনে। চিন তো আমাদের গায়ের ওপর। চিনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়লো বলে!"

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ করতে থাকেন, চিনের ঝড় থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

বড়বউদি চুপিচুপি বলেন, "চিন তো ভালো। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল রেডিওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজে কাপড় তুলে ফেললেন। আর ফ্লোরিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তার নাম ওরা দিয়েছিল 'সোনিয়া'। তাই থেকে মার কী ধারণা হয়েছে কে-জানে? রেডিওতে 'সোনিয়া' নাম উচ্চারণ হলেই দৌড়ে গিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করেন।"

টেলিভিশনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পারেননি। টেলিভিশনের ঘরে উনি ঢোকেনই না। কেবল 'রামায়ণ' হলে শুধু এটা দেখতেই ইদানীং যাচ্ছেন। টি.ভি.-কে রেডিওর সতীন বলে মনে করেন মেজকাকিমা। টি.ভি.-র ওপরে মনে মনে তাই তাঁর রাগ। টি.ভি. এসে রেডিওর যেন মান-মর্যাদা নষ্ট করেছে। ছোটোকাকুর মতো বড়োবউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহের প্রশ্রয় দেন। তাঁর সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কারখানাই মেনে নেন। আর হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

(৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমার ইচ্ছে আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পারেননি। এমনকী ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা 'ওয়ান উওম্যান ভলান্টিয়ার ফোর্স' বড়বউদিকেও না।

রাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আর এগারোটায় রেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বড়বউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে রাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর বয়স যদিও সত্তর হয়নি, কিন্তু হার্টটা ভালো নয়। দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। পেসমেকার বসানো আছে। সে আরেক গল্প। ঘুম থেকে উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তারপর ডাকেন, "ও বউমা? বউমা? ঘুমোলে? বলি ঘুমোলে নাকি? ঘুমোলে?"

বড়বউদি বলেন, "কী মা? কিছু বলছেন?"

"না মা, না। কিচ্ছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমার দরকার। সারাদিন খেটেখুটে আসো। বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুড়িটাকে নিয়ে তোমার বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমার শরীর দেবে কেন? এত কাজ মানুষে পারে? ঘরে খাটনি, আবার বাইরে খাটনি। বিশ্রামের সময় বলতে তো এই রাতটুকুনি। তা না ঘুমোলে কী চলে মা? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম মানুষের দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধের মতোই জরুরি। ওটা তোমার দরকার।"

বড়বউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

"অ বউমা। বউমা! বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অ্যাঁ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাবো।"

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশের টেবিল থেকে পাথরের গেলাসটি শাশুড়ির হাতে তুলে দেন। মেজকাকিমার হাতের কাছেই ছিল গেলাস ভর্তি জল। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মেজকাকিমা বলেন, "নাও, শুয়ে পড়ো। ঘুম তোমার দরকার।"

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময়ে ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখে নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না—দাদার ছেলেবেলার গল্প করেন বউদির কাছে। মেজকাকিমার ওই একই ছেলে ছিল। আর একটি মেয়ে আছে। বম্বেতে থাকে। তার ছেলেবেলার গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, "অ বউমা! বউমা! উঠে পড়ো, ওঠো, শীগগির বাথরুম যাও। হিসি করে এসো, নইলে শরীর খারাপ হবে যে। এতক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীরের বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠো? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।"

"আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

"আমি তো যাবোই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যেস।"

মেজকাকিমার অনুরোধমাফিক বড়োবউদির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফের ঘুমোতে যান।

চারটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, "অ বড়বউমা, বড়বউমা। ওঠো মামণি ওঠো, চাট্রে বেজে গেল যে—বড়োবাইরে ফিরে আসবে না? এরপর যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীর শুদ্ধি না করলে কী চলে মা? যাও, বড়োবাইরে যাও। চারটে বেজে গেছে।"

মেজকাকিমার এক্কেবারে কড়া নিয়ম। বড়বউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোনো ভিত্তি হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কমলি'। উনি 'নেহি ছোড়েগী'। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধূপ জ্বেলে ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙানো ক্যালেণ্ডার থেকে বাঁধানো অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে এবারে আরতি করতে শুরু করেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিরে মন্ত্র পড়তে পড়তে।

"অ বউমা, বউমা। ওঠো। ওঠো শাঁখটা ধরো। বাজাতে হবে না, কেবল ধরে ধরে এমনি নাড়লেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এসো। তাবপর শাঁখটা নাড়াও। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বড়ো জাগ্রত মুহূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আরতির সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীরে এসে পূজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের, দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃষ্ট সময়। এই মুহূর্তটা ঘুমিয়ে নষ্ট করতে নেই মা, উঠে পড়ো। দ্যাখো কী সুন্দর সূয্যি উঠবে এবার। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলো 'ওঁ জবুকুসুম সঙ্কাশং'—ওঠো বউমা? ও কী? পাশ ফিরছো কেন? অ বউমা? ওঠো?"

পিঠে জোরসে ঠেলা খেয়ে বড় বউদি ঘুমচোখে এইবারে বলেন, "এই যে উঠছি। উঠছি মা। আপনার ত্রিফলাটা ভেজানো আছে, এই আমি উঠেই দিচ্ছি।"

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নরম সুরে মেজকাকিমা বলেন, "ত্রিফলা? আবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোবরেজ মশাই বুড়ো হয়েছেন, কী বলতে কী বলেছেন— আমি বলেছি, না, আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাবো না আমি।"

"না মা, তা হয় না। কবিরাজ মশাই রাগ করবেন।"

"তুমি শোও তো ততক্ষণ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেয়ের। ভোর হতে না হতে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছো? 'মা, ত্রিফলা খাও'! শুধু শুধু এক্ষুণি ওঠবার কোনো দরকার নেই। তোমার তো মরনিং ইস্কুল নয়, বউমা? তুমি বরং আর একটু রেস্ট নাও। বিশ্রাম করো। আরেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা। ঘুমটা খুবই জরুরী। তোমার শরীরের পক্ষে ঘুমটা খুব দরকার।" বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বউ বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এখন দু'ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। সেই সাতটায় সুরবালা আসে। এসে চা তৈরি করে। চান করে, পুজো করে, চা খেয়ে কাগজ পড়ে এক্কেবারে তাপপরে মেজকাকিমা এসে চায়ের কাপ হাতে আদর করে বউদিকে তুলবেন, "বউমা! অ বউমা? ওঠো, ওঠো, চা খাও। আর কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল যে?" মেজকাকিমার রেডিওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলার টাইম ওভার।

মুক্তি

বাণী বসু

'যা বোঝো না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না তো।'

একটু যেন ঝাঁঝ কমলেশের গলায়।

'কোন্ পরিবারের ছেলে সৌম্যজিৎ তা জানো? আগেকার দিনের স্টিভেডর ওর ঠাকুরদাদা। চেহারাতে আভিজাত্যের ছাপ সীলমোহর করে বসানো। তাছাড়া কতটুকুই বা ছেলে! ওরা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করছে— আমরা মাঝে পড়ে বাধা দেবো কেন? কত কমপ্লিকেশনস এর থেকে হতে পারে জানো? ছেলে মেয়ের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কমপ্লেক্স গ্রো করতে পারে...' তাপসী বরের সমর্থন পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে বলল— অল্পবয়সের এই সব রিক্রেশন থেকেই তো নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কে হয় তো তোতলা হয়ে গেল, কার হাত পা কাঁপছে, কেউ প্রচন্ড রাগী। আমাদের সাইকলজিতে পড়তে হয়েছে মা। তা ছাড়া, বড়োলোকের ছেলে বলে মিড্‌লক্লাসের সঙ্গে মিশবে না এ সব কমপ্লেক্স আজকের দিনে অচল।'

মুক্তি বললেন— 'বড়োলোক ছোটোলোক বুঝি না। ছেলেটা একদম ভালো না। ছোটনকে বিপথে নিয়ে যাবে। মেলামেশাতে সোজাসুজি বাধা দিতে কে বলেছে? একটু বুদ্ধি করেও তো করা যায়! বলিস তো আমি করতে পারি।'

—'না, না' কমলেশ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো, 'আজকালকার বাচ্চা, ইনটারফিয়ার করলে একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।'

মুক্তি হতাশ হয়ে বললেন— 'তবে আর কী! আমি বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি!'

—'তা কেন? তুমি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতে পারো!' কমলেশ বলল।

—'এই তো ঠাকুরঘরে ফুল-জল দিয়ে এলুম, আবার কী! অত ঠাকুর-ঠাকুর বাই আমার নেই *খোকা। বারান্দায় বসতে না দিস তো আমি রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।'*

— 'তাই যান না!' তাপসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে— 'আসলে কী জানেন? বারান্দায় কেউ বসে থাকলেই ছোটন ভাববে ওর জন্য কেউ দুশ্চিন্তা করছে। চটে যাবে।'

— 'সে চটে যাবে বলে আমরা বারান্দায় বসবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম?' বিরক্ত হয়ে মুক্তি পায়ে চটি গলালেন।

রাস্তার ওধারেই ডক্টর রথীন সমাদ্দারের বাড়ি। মিলিটারিতে ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে কয়েক বছর এখানে এসে বসেছেন। পসার বেশ জমেছে। এঁদের পারিবারিক ডাক্তারও তিনিই। বাড়িতে তিন চারটে কুকুর আর ডক্টর সমাদ্দারের পিসিমা থাকেন। পিসিমার সঙ্গে মুক্তির জমে ভালো।

কমলেশ চৌধুরীর মা মুক্তি চৌধুরী মাঝারি সাইজের একটি মহিলা। মোটা তো নয়ই, রোগাও নয়। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। সোনালি চশমার পেছনে বেশ ঝকঝকে দুটো চোখ। রং আধা-ফরসা। আজ পরনে কালো আঁশ পাড় টাঙাইলের শাড়ি। দুহাতে সরু সরু কটা চুড়ি, সোনার চেন গলায়। গন্ডে একটি লাল তিল। আরও তিল গজাচ্ছে। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের বিধবা। নাতি-নাতনি আদর করে বলে— মডার্ন ঠাকুমা। কেন না মুক্তি আই এস সি পাশ করেছিলেন। এখনও গলা ছেড়ে দিব্যি গান, এবং স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত চিরকাল সামলে এসেছেন।

কমলেশের বাবা মোটামুটি পসার-অলা উকিল ছিলেন। তাঁর টাকাকড়ি কোথায় কী লগ্নি হবে, আমানত হবে সে সব ঠিক করা মুক্তিরই কাজ ছিল। এমনকী সল্টলেকের এই বাড়ির সরকারি জমি কেনা, বাড়ি তৈরি— এ সব মুক্তি দাঁড়িয়ে থেকে না করালে হত কিনা সন্দেহ। কর্তা মারা গেছেন আজ পনেরো ষোলো বছর। এখন মুক্তি ছেলে বউকে টপকে বারো বছরের নাতনি আর চোদ্দ বছরের নাতিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যান। থিয়েটার তাঁর বড্ড প্রিয়।

এই মুক্তিকে নিয়েই তাঁর ছেলে-বউ কমলেশ-তাপসী সম্প্রতি পড়েছে মহা মুশকিলে। মুশকিলটা অবশ্য শুরু তাদের ছেলে-মেয়ে জন্মের পর থেকেই। তার আগেটায় মা বেশ বুঝদারই ছিল। কমলেশ তার ক্লাস-বান্ধবী তাপসীকে বিয়ে করতে চাইলে তো তার বাবা— 'সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে কী? পলিটিকস্ করে ওসব মেয়ে নিয়ে কী কেউ সুখী হয়?'—এই সব প্রশ্ন তুলে বেঁকে বসেছিলেন। মুক্তিই তখন তাঁকে বোঝান বিয়ের মোটিভেশন আজকাল কতটা বদলে গেছে। পুত্রার্থে তো নয়ই, সংসারার্থেও নয়, বুদ্ধি-বৃত্তি-রুচি-আদর্শ এসবের মিলযুক্ত মানুষের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটানোটাই এখন জরুরি। আর সুখ? ও হয় তো হবে, নইলে হবে না। উপরন্তু পরস্পরকে বিয়ে করতে চাইছে এরকম দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ের মাঝখানে কোনো অজুহাতই খাড়া করা ঠিক নয়। এই সময়েই কমলেশ-তাপসী মুক্তির অতি-আধুনিক মনের পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু বয়স মানুষকে একটা না একটা সময়ে কাবু করে ফেলবেই। কিছুদূর পর্যন্ত পরের প্রজন্মের সঙ্গে কেউ কেউ হাঁটতে পারেন। তারপরে আর তাল রাখতে পারেন না। পিছিয়ে পড়েন। এটাই স্বাভাবিক। জীবনের নিয়ম। মুক্তিও পারছেন না। কিন্তু তিনি তা কিছুতেই মানতে চাইছেন না। তাঁর ভাবটা তিনি যেন ছেলে বউ তো বটেই, নাতি-নাতনিরও সমবয়সী। কোনো জেনারেশন গ্যাপ নেই।

কিন্তু নাতি-নাতনির নামকরণেই মুক্তির রক্ষণশীলতার ব্যাপারটা প্রথম বোঝা যায়। নাতির নাম *তিয়াস*, নাতনির নাম *পিয়াসা*। শুনে মুক্তি বললেন— 'নামেতে কী আর আসে যায়। সত্যি কথা। গোলাপে যে নামে ডাকো সুগন্ধ বিতরে। কিন্তু এ কী কান্ডজ্ঞান তোদের! দুটোকেই তেষ্টায় ছাতি ফাটিয়ে মারছিস মা-বাপ হয়ে। অন্য নাম দে বাপু।'

কমলেশ বলে— 'কেমন পোয়েটিক নাম বলো তো?'

— 'এসব আজকাল পোয়েট্রিতেও চলছে না তো খোকা, তা যদি বলিস।'

কমলেশ মজা করে বলে— 'পিতৃ পিতামহদের নামগুলো ছিল জগদ্দল টাইপ, আমাদেরগুলো হল কোনোক্রমে জলচল, এবার আসছে কল্পনা, কবিতা, আমরা শোধ নিচ্ছি ধরো।'

মুক্তি বলেন— 'এর চেয়ে যে তোদের বাপ-ঠাকুর্দার পঞ্চানন, মনমোহনও ভালো ছিল রে! তিয়াস-পিয়াসা শুনলে আশুতোষ জীবিত থাকলে কভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া করতেন কে জানে?'

যতই আপত্তি করুন আর যুক্তি দেখান, কমলেশ-তাপসীর বড়ো সাধের নাম পাল্টালো না। মাঝখান থেকে মুক্তি পিছিয়ে পড়তে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নাতি-নাতনি কিন্তু তাঁকে মডার্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছে। আসল কথা ছোটন

আর পুঁটু দুই নাতি-নাতনিই সর্বভুক। বাবা-মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যেত। ঠাম্মার কাছেই অক্ষর পরিচয়। অক্ষর পরিচয় হতে না হতেই গড়গড় করে পড়া। যা পায় তাই পড়ে। পঞ্জিকা থেকে, খবরের ঠোঙা থেকে সব। তারপর একদিন তাদের মা দেখল পুঁটু ছোটন কাড়াকাড়ি করে 'চরিত্রহীন' পড়ছে। বইটা তাপসী ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়।

মুক্তি উল বুনছিলেন, বললেন— 'পড়ুক না তাপসী, ওদের বয়সে যতটুকু নেবার তার বেশি নিতে পারবে না। মাঝখান থেকে ভাষার ভিত শক্ত হয়ে যাবে।' ঠাম্মার প্রশ্রয়ে ছোটন-পুঁটু মহানন্দে শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-রবীন্দ্রনাথ গোগ্রাসে গিলছে। সেই সঙ্গে ঠাম্মাকে একেবারে নিজেদের সমমানসী ভাবছে।

কিন্তু ইদানীং ঠাম্মার এই আধুনিকতায় একটু যেন চিড় ধরেছে। ছোটনের বন্ধুদের মধ্যে আজকাল একটি নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে— সৌম্যজিৎ গাঙ্গুলি। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্মার্ট, উপরন্তু পকেটে সব সময়ে টাকা-পয়সা ঝমঝম করছে। এই ছেলেটিকে মুক্তি কেন কে জানে দেখতে পারেন না। প্রথম দিনেই বলেছিলেন— 'তুমি গলায় ওটা কী পরেছো সৌম্যজিৎ? সোনার হার নাকি?'

—'হ্যাঁ, ঠাকুমা। আমার ইচ্ছে হল চাইলাম, বাবা কিনে দিল।'

—'তোমার হার পরতে ইচ্ছে হয়? তার ওপরে সোনার? বলো কী? যে কোনো সময়ে চোর-ছ্যাঁচড়ে টেনে নিতে পারে যে!'

—'হার পরা আজকাল টপ ফ্যাশন যে! জানেন না ঠাকুমা? নিলেই হল? তাছাড়া কত নেবে? নিলে আরেকটা পরবো ...আরেকটা!'

ছেলেটির কথা-বার্তা মুক্তির ভালো লাগে নি। তবু তিনি কিছু বলেন নি। ছেলেমানুষদের কত বন্ধু আসে, কত বন্ধু যায়, নিজেদের রুচিমতো বন্ধুর বৃত্ত ঠিক হয়ে যায় শেষে। কিন্তু সৌম্যজিৎ যেন ছোটনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁটুকেও বাদ করেছে। অন্য বন্ধু-বান্ধব কমে যাচ্ছে। জিতু আসে না, বিপণ আসে না। সুমিত, বজ্র, রাকা, দীপান্বিতা— ছোটন-পুঁটুর সঙ্গে সঙ্গে এরা মুক্তিরও বন্ধু ছিল। এখন খালি সৌম্যজিৎ। সৌম্যজিতের বাড়ি। ঠাম্মার সঙ্গে সেই সরস আড্ডাগুলো আর হয় না। হয় না মা-বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক। সৌম্যজিৎ একা যেন অন্য সব সম্পর্কগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

মুক্তি একদিন জিজ্ঞেস করলেন— 'হ্যাঁরে ছোটন, সৌম্যজিৎদের বাড়িতে কে কে আছেন রে?'

—'কেন?'

—'এমনি! কৌতূহল হয় না?'

—'ওদের বাড়িতে তোমাদের কৌতূহল মেটাবার মতো কেউ নেই ঠাম্মা। মা কোথায় থাকেন কোনোদিন দেখি নি। বাবার গাড়ি মাঝে মাঝে আসে যায়, ব্যস। আমাদের বিরক্ত করবার কেউ নেই। তিন চারটে ঘর নিয়ে সৌম্য থাকে, চাকর আছে, তারা আমরা যা চাই করে দেয়। সৌম্যদের বাড়িতে আমরা একেবারে ফ্রি'— আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছোটন বলল।

সেই থেকে তাপসী খুঁতখুঁত করছেন— 'তোরা কিছু কর কমলেশ, তাপসী কিছু করো।'

সৌম্যজিৎদের বাড়ির টেনিস লনে খেলে খেলে ছোটন পুঁটু এদিকে রীতিমতো টেনিস- প্লেয়ার হয়ে উঠছে। ওদের সুইমিং পুলও আছে। একদিন বলে ফেলেছিল পুঁটু। কিন্তু ঠাকুমার কড়া নিষেধ। সৌম্যর বাড়ি যেন পুঁটু সাঁতারে না নামে।

—'তুইতো লেকেই যাচ্ছিস সাঁতার কাটতে। আবার বন্ধুর বাড়ি সাঁতার কাটবার কী আছে? কী মনে করবে বল তো!' —ঠাম্মার উক্তি।

—'কেন? কী আবার মনে করবে? মনে করবার জন্যে কে বসে আছে ওদের বাড়ি?'

—'লোকজনও তো আছে? সৌম্য নিজেও তো আছে!'

—'সৌম্য?' বলে মুচকি হেসে পুঁটু চুপ করে যায়।

সেদিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে ঠাম্মা বলেন— 'আত্মসম্মান একটা মস্ত বড়ো জিনিস রে পুঁটু!'

তাপসী মাঝখান থেকে শুনে বলে— 'কী বিষয়ে কথা হচ্ছে রে পিয়া? কার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হল?'

পিয়া ওরফে পুঁটু সবটা বলতে তাপসী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল— 'কী যে একেকটা কথা বলেন না, বারো বছরের মেয়ের আবার আত্মসম্মান। ওদের মধ্যে এতো কমপ্লেক্সও ঢোকাতে পারেন আপনি।'

মুক্তি বললেন— 'বারো বছর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বয়স তাপসী। আত্মসম্মানবোধ আরও ছোটো থেকে জাগে মানুষ-বিশেষে, কিন্তু বারো বছরেও না জাগলে বিপদ! খুব বিপদ! আর কমপ্লেক্স? একেবারে কমপ্লেক্সহীন মানুষ আছে? তোমাদের সাইকলজি কী বলে? কিছু কিছু কমপ্লেক্স থাকা ভালো। আমার কথাগুলো সবই উড়িয়ে দিও না, একটু ভেবে-চিন্তে মতামত দিও। আর পুঁটু, তুই কিন্তু ওই সৌম্যদের বাড়ি খবর্দার সাঁতার কাটতে যাবি না।' রায় দিয়ে মুক্তি আর দাঁড়লেন না।

পুঁটু অবশ্য ঠাম্মার খুব আদরিনী। কথাটা শুনলো। কিন্তু স্কুল ফেরৎ হুটহাট সৌম্যজিতের বাড়ি যাওয়া ওদের আটকানো গেল না। চলে যায়, ফের ওদের গাড়ি করে। যতক্ষণ না আসে বোঝা যায় মুক্তি যেখানেই থাকুন, যে ভাবেই থাকুন, ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

একদিন কমলেশ বাড়ি ফিরে দেখল মা তিনবার তার সামনে দিয়ে চলে গেল, অথচ যেন দেখতেই পেল না। তাপসীকে ইশারায় জিজ্ঞেস করতে তাপসী ফিসফিস কর বলল— 'ছোটন, পিয়া এখনও স্কুল থেকে ফেরে নি, মানে সৌম্যদের বাড়ি গেছে, তাই!'

শেষ কথাগুলো বোধহয় মুক্তি শুনতে পেলেন, হঠাৎ কমলেশের সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে বললেন— 'তোরা কী ভেবেছিস বল তো! ওইটুকু ছেলে-মেয়ে সন্ধে পেরিয়ে গেল বাড়ি ফিরছে না, কিছু বলবিও না, করবিও না!'

কমলেশ বলল— 'আহ্ হা, ওরা সৌম্যর বাড়ি গেছে, গাড়িতে পৌঁছে দেবে...।'

—'গাড়িতে পৌঁছে দিলেই আর ভাবনার কোনো কারণ থাকে না? পড়াশোনা নেই? এইখানে পাশের গলিতে জিতুদের বাড়ি গেলে তো বকে ধমকে একসা করতিস! তবে কী ছেলে-মেয়ে গাড়ি চড়তে পাচ্ছে বলেই চুপ করে রয়েছিস?'

কমলেশ রেগে গিয়ে বলল— 'মা, তুমি এমন একেকটা কথা বলো! গাড়িটা মেনশন করছি সিকিওরিটির জন্য। আর জিতু? জিতুদের বাড়িতে অযথা সময় নষ্ট হত।'

—'সৌম্যদের বাড়িতে কীভাবে সময় লাভ হচ্ছে শুনি?'

তাপসী বলল— 'ওদের স্কুলের মিসেস ডিবেচো, মিঃ ত্রিবেদী, অরুন্তুদ মুখার্জি সব্বাই সৌম্যকে পড়ান। ছোটন আর পিয়া যদি সেখানে কিছু না হোক বসেও থাকে তো ওদের অর্ধেক পড়া হয়ে যাবে।'

—'বুঝলুম'— মুক্তি বললেন— 'গাড়ি, টেনিস কোর্ট, টিউটর, সুইমিং পুল— যা যা নিজেরা দিতে পারছিস না সেই সব জিনিসের লোভে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছাড়া গরু করে দিয়েছিস? বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক উঠে যাচ্ছে মেনে নিচ্ছিস! এরপরে হয় আপস্টার্ট নয় ভিখারির কী চাটুকারের মনোবৃত্তি হবে ওদের? বাপ-মা হয়ে সেই সর্বনাশের দিকে ওদের ঠেলছিস? ছি ছি? শত ধিক তোদের!'

তাপসী রাগ করে দুমদুম করে চলে গেল। কমলেশ মুখ লাল করে বলল— 'তাই বলে একটা সামান্য কারণে আমাদের যা নয় তাই বলে অপমান করবে?'

—'কত বড়ো বড়ো তোদের মাথার ওপর দিয়ে আসছে, টের পাচ্ছি বলেই বলি। ওয়ার্নিং বেল শুনতে কর্কশই লাগে। জানিস, সৌম্যর মা বাবার মিল নেই। সম্পর্ক নেই।'

—'এই কথা!' কমলেশ হো হো করে হেসে উঠল।

—'তাই বলো! মা তুমি এ যুগে একেবারে অচল, বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই না তোমার নাতি-নাতনি তোমায় মডার্ন ঠাকুমা বলে গর্ব করে? আরে বাবা সৌম্যর মা বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তো কী? এ তো এখন আখচার হচ্ছে! ডিভোর্সড বাবা-মার সন্তানের সঙ্গে তা হলে কেউ মিশবে না? এ তোমার কেমন বিচার হল মা? তুমি তো এতো নিষ্ঠুর ছিলে না!'

—'বেশ তো, দয়ার বিধান যদি দিতে চাস তো ওই ছেলেটাকে আন্তরিকভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করো না। ওর বাবা-মার অভাব যতটা পারিস পুষিয়ে দে। ও নির্ঘাৎ বয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে নিজের ছেলে-মেয়েকে ভিড়িয়ে দিয়ে ডবল সর্বনাশ করিস না'— মুক্তি গম্ভীর মুখে বললেন।

দু চার দিন পরে মুক্তি নাতি-নাতনিকে বললেন— 'তোমরা তো প্রায়ই সৌম্যজিতের বাড়ি যাও। কই ও তো তোমাদের বাড়ি আসে না? এবার থেকে বরং ওকেই এখানে নিয়ে এসো।'

ছোটন বলল— 'দূর, এখানে অত মজা কোথায়? ওর জিম রয়েছে নিজের। টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ডস বোর্ড পর্যন্ত রয়েছে ওদের বাড়ি, দুর্দান্ত দুর্দান্ত ভিডিওগেমস, ফাটাফাটি সব ক্যাসেট। আমরা কত দিন কত জায়গায় বেড়াতেও তো যাই। তাজবেঙ্গল, পার্ক হোটেল...'

তাপসী-কমলেশ দুজনেই উপস্থিত ছিল। মুক্তি তাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন— 'যতই যাই থাক, তোমাদের বাড়িতেও কিছু কিছু ভালো নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া বন্ধুর বাড়ি গেলে তাকেও ফিরে ডাকতে হয়। সেটাই ভব্যতা।'

পুটু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল — 'সেটা ঠিক।'

ক'দিন পর স্কুল ফেরৎ ওদের সঙ্গে এলো সৌম্য। ভালো ভালো জলখাবার তৈরি করেছিলেন মুক্তি আর তাপসী। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে তিনজনে খুব হই-চই করল। তারপর ছোটনের ঘরে গিয়ে তিনজনে কিছু গান বাজনা শুনল। একটু পরেই সৌম্য চলে গেল। বোঝা গেল তেমন জমল না।

কদিন বাদ। তারপরেই ছোটন-পুটু আবার নিয়মিত সৌম্যজিতের বাড়ি যেতে থাকলো।

ছোটন বলল— 'ঠাম্মা, বাড়িতে সন্ধেবেলা বড্ড বোর লাগে, প্লীজ।'

তাপসী বলল— 'সকাল সকাল ফিরো। রোজ রোজ অত দেরি কিসের?'

—'বাড়িটাকে কেমন ভুতুম বুড়ো লাগে, সত্যি বলছি মা। নো ফান।'

ছোটন শ্রাগ করল। চলে গেলে মুক্তি বললেন— 'হল তো?'

— 'কী হল?'— তাপসী দমবার পাত্রী নয়।

মুক্তি বললেন— 'বাড়িটাকে যার এই বয়সেই ভুতুম বুড়ো লাগছে, আর একটু বয়স বাড়লে সে যে একেবারে পগার পার হয়ে যাবে তাপসী!'

[illegible] 'ধরে রাখতে চাইলেই কী পারবো মা। ছেলে আজকালকার দিনে কোথায় [illegible] চাকরি পাবে, দেশে অ্যাট অল থাকবে কিনা...'

[illegible] কথা বাড়ালেন না। তারপর বললেন— 'আমি একটু [illegible]।'

[illegible] থেকে মুক্তি পাড়া বেড়াতে যান। প্রতিদিনকার [illegible] এসব আর নেই। ছোটন পুটুও বেশ [illegible] কেদার ঘুরে এলেন।

ডিসেম্বর মাস পড়ো পড়ো। ডিসেম্বরের শেষে ছুটি নিয়ে কমলেশরা বেড়াতে যাবে। কোথায় যাওয়া হবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কমলেশ বলল— 'যাক এতোদিনে মায়ের মতি ফিরেছে, তীর্থ ধম্মো-টম্মো করছে। আবার নাকি বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছে। আমরা ফিরে এলেই যাবে।'

তাপসী বলল— 'ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই এটা কিন্তু মায়ের একটা মস্ত গুণ, স্বীকার করতেই হবে।'

এই সময়ে বাইরে গাড়ির শব্দ হল। ছোটন আর পুটু ঢুকলো। তাপসী ডাকল— 'পিয়া, ছোটন এখানে শুনে যা!' দুজন এসে দাঁড়াতে কমলেশ বলল— 'মাত্র সাতদিন ছুটি, টেনেটুনে ন'দিন করা যেতে পারে, এখন বলো কোথায় যাবে, যাতে মিনিমাম সময়ে ম্যাক্সিমাম মজা হয়। তোমাদের মা বলছে, আসাম, কাজিরাঙা, শিলং। শীতে শিলং দারুণ। প্লেনে যাবো, যাতায়াতের টাইমটা বাঁচবে।'

হঠাৎ ছেলে মেয়ে দুজনেই কেমন মিইয়ে গেল। ছেলে বললো— 'তোমরা যাও না। আমাদের প্রচুর পড়াশোনা আছে। মার্চের প্রথমেই অ্যানুয়াল।'

—'সে কি রে? দুবছর পরে বেরোচ্ছি তোরা যেতে চাইছিস না?'

কমলেশ যেমনি অবাক তেমনি ক্ষুব্ধ। বলল— 'ওসব চালাকি শুনছি না। যেতে তোমাদের হবেই। ইয়ার্কি নাকি?'

এমন সময়ে মুক্তি ঢুকলেন। পুটু নাকি সুরে বলল— 'দ্যাঁখো না ঠাম্মা আমাদের পরীক্ষা এসে গেছে। বাবা মা এই সঁময়ে বেঁড়াতে যাঁবার প্ল্যাঁন কঁরছে। আমরা তো তোঁমার কাঁছেই থাঁকতে পাঁরি। বাবা-মা ঘুঁরে আসুক না!'

মুক্তি সবটা শুনে বললেন— 'ও। কিন্তু ওই সময়ে তো আমি তোদের রাখতে পারবো না। আমার অসুবিধে আছে।'

—'কেন? কী কাজ?'

—'সে একটা আছে দরকার।'

—'বলো না কী দরকার?' ছোটন-পুটু না-ছোড়।

তখন মুক্তি বললেন— '৩১শে ডিসেম্বর আমি বিয়ে করছি কী না!'

—'কী বললে? কে বিয়ে করছে?' - ছোটন লাফিয়ে উঠে বলল।

কমলেশ কোনো একটা প্রশ্ন করেছে কিন্তু শব্দ বেরোয় নি। মুখটা হাঁ। তাপসী অবাকেরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। মুক্তি বললেন— 'খোঁকা হাঁটা বুজিয়ে ফ্যাল। পোকা টোকা ঢুকে যাবে, একত্রিশে ডিসেম্বর আমি আর ও বাড়ির রথীনবাবু বিয়ে করছি।'

—'আপনার কি ভীমরতি হয়েছে?' তাপসীর লাল মুখটা থেকে এতক্ষণে বেরোয়।

'ভীমরতির কী আছে? আজকাল তো এরকম আখচার হচ্ছে। বিদেশে প্রায় কোনো মহিলাই পারলে একা থাকে না। তোরা সব বিষয়ে এত আধুনিক। ডিভোর্স-টিভোর্স জল-ভাত মনে করিস, আর বুড়োদের বিয়েটা মেনে নিতে পারছিস না? আমরা [illegible] নিজেদের ঠিক বুড়ো-বাতিল বলে মনে করি না। বুড়ো আবার কী?'

ছোটন বলল— 'ঠাম্মা, তুমি [illegible] দাদুর বিয়ে? ঠাম্মা [illegible] আবার বিয়ে হয় নাকি? আমরা যে লাফিংস্টক হয়ে [illegible]

কমলেশ বলল— 'রাইট। লোকে যে হাসাহাসি করবে? [illegible]

মুক্তি বললেন— 'লোকে হাসবে বলে আমার যা করা দরকার মনে [illegible] বা? এ তো আচ্ছা জুলুম! দ্যাখ খোকা, আমার আজকাল খুব একা [illegible]

মতেও খুব মেলে আমাদের। উনি অনেকদিন ধরেই বলছেন। আমি নাতি-নাতনির দায়িত্বের কথা ভেবে এতদিন...।'

—'দোহাই তোমার', কাঁদো কাঁদো গলায় কমলেশ বললো— 'তুমি যা বলবে তাই শুনবো। বুঝতে পারছি নাতি-নাতনি কাছ ছাড়া হয়ে তুমি মন মরা হয়ে গেছো। এই ছোটন, পিয়া তোরা আগের মতো ঠাম্মার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবি। সর্বক্ষণ সৌম্য-সৌম্য কী রে?'

মুক্তি বললেন— 'তুই ঠিকই ধরেছিস। নাতি-নাতনিকে মানুষ করার কাজটা নিয়েছিলুম বলেই অন্যদিকে মন যায় নি এতদিন। কাজ, সঙ্গ এগুলো মস্ত জিনিস। তবে এখন ওরা আর ফিরতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে আজকাল ওদের জামাকাপড়ে গাঁজা-টাঁজার গন্ধ পাচ্ছি। সৌম্যজিৎ ভিডিও গেম টেনিস এসবের নেশার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগও ধরিয়ে দিয়েছে।'

তাপসী চোখ বড়ো বড়ো করে বলল— 'ড্রাগ? কে ধরেছে ড্রাগ? কেন?' ছোটন তখন দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন পেছন পুটু।

মুক্তি বললেন— 'কেন ধরেছে? হাতে অনেক পয়সা। মা বাবাও থেকেও নেই। অজস্র স্বাধীনতা, বিশাল বাড়িতে অগাধ সুযোগ... এতগুলো যোগাযোগেও ড্রাগ ধরবে না? বিপথগামী ছেলেপুলেকে দেখলেই বয়সের চোখ চিনতে পারে। যাই হোক, আমার শক্তিতে আর কুলোবে না। এবার তোমরা ছেলে-মেয়ের বাবা-মা যা পারো করো।'

পুটুকে ফ্রকের কোণ ধরে আটকে রেখেছিল তার মা। সে ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দরজার কাছ থেকে ছোটনকে পাকড়াও করে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর রথীন সমাদ্দার। ট্রাউজার্স আর ঢোলা শার্ট পরনে, মুখটা ভারি, কদম ছাঁট চুল, কিন্তু বেশ জব্বর একটা গোঁফ। গলাটিও বেশ ভারি। বললেন— এই যে কমলেশ-তাপসী দুজনেই আছো তাহলে। সর্ব সমক্ষেই তাহলে তোমাদের মা মুক্তি চৌধুরীকে বিবাহের প্রস্তাবটি রাখছি।

কমলেশ রাগে তোতলা হয়ে যায়। '... আমাদের এই দুঃসময়ে আপ্ আপনি ট্ ঠাট্টা করতে এসেছেন?'

ডাক্তারবাবু বলেন— ঠাট্টা? বলো কী হে? আজ দশ বছর ধরে বিল যাচ্ছে পার্লামেন্টে। তর্কাতর্কি, খচাখচি, অ্যাদ্দিনে পাশ হল। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতেই বলো, আর বি-পিতার দায়িত্ব স্বীকার করতেই বলো, আমি নাহয় ছোটন-পুটুকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। অবশ্য তোমাদের অনুমতি চাই। কী তাপসী? হবু-শ্বশুরই হই আর হবু-বাপই হই, অন্ততপক্ষে ফ্যামিলির ডাক্তার তো বটে। এক কাপ চা অন্তত খাওয়াবে না?'

অনন্য পৃথিবী

রিজিয়া রহমান

॥ এক ॥

সূর্য অস্ত গেছে।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল এরসাদ। পশ্চিমে জঙ্গী পাহাড়ের চূড়া বিদায়ী সূর্যের আভায় রক্তিম। দূরের পাহাড়ের দৃশ্য ধূসর হয়ে এসেছে। নীচে আগান উপত্যকার শ্যামল রেখায় ধূপছায়া রঙে কুয়াশা নামছে।

সমুখের পাহাড়ের ঢালুতে মেষ আর ছাগলের পালকে মনে হচ্ছে গৈরিকের ওপর সাদা কালো ছিটের মতো।

ক্লাইম্বিং বুটের ঘায়ে ঠনঠন করে কয়েকটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল নীচে। এরসাদ থামল। বড়ো ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। আগান ভ্যালি এখনো অনেক নীচে। তাড়াতাড়ি নামতে না পারলে ক্যাম্পে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

রাতটুকুই বিশ্রাম। সকালে আবার শুরু হবে কাজ। জিওলজিস্টের এ জীবন মন্দ লাগে না এরসাদের। কী যেন মোহ আছে দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করায়, নেশা আছে ফসিল কুড়ানোর মধ্যে। ভালো লাগে বৈকি কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন পৃথিবীর আদিম ভাষা কান পেতে শুনতে।

উচ্ছৃঙ্খল বাঁধভাঙা মেয়েলি হাসির ঝাপটায় চমক ভাঙল এরসাদের। ফিরে তাকাল ফিল্ড কুলি বরকতের দিকে—

—কে হাসে এমন করে?

কাঁধের ভারি রড দুটো নামিয়ে হাঁফাচ্ছিল বরকত। প্রশ্ন শুনে তিক্তভাবে হাসল। বলল :

—কালকের সেই যাযাবর মেয়েটা স্যার। বরকতের কণ্ঠের বিরসতায় মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল এরসাদ। বরকতম যাযাবর না হলেও এখানকার উপজাতীয় ব্রুহী। অল্পদিন ফিল্ড কুলির কাজ করছে। বেশ উর্দু শিখেছে। আড়ষ্ট উচ্চারণে কয়েকটা ইংরেজি শব্দও বলতে পারে। সভ্যভব্য হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা বরকতের। তাই এখানকার যাযাবর আর উপজাতীয়দের ওপর অসীম বিতৃষ্ণা তার। বরকতের এই প্রবল স্বজাতি অপ্রীতির দরুণই কাল মেয়েটির সঙ্গে এরসাদের সাক্ষাৎ ঘটে।

বিকেলে 'টেন্টে' বসে চিঠি লিখছিল এরসাদ। বাইরে হঠাৎ গোলমাল শুনে উঠে এল। গণ্ডগোলটা জমে উঠেছে পিয়নদের তাঁবুর সামনে। সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের একটা যাযাবর মেয়েকে হাত-মুখ নেড়ে মাতৃভাষায় অনর্গল কী সব বলে চলেছে বরকত। শ্রুতিমধুর

প্রেমালাপ যে চলছে না সেটা বরকতের উগ্রমূর্তি দেখেই অনুমান করা যায়। পিয়ন, বাবুর্চি, ড্রাইভার সবাই সেখানে মজা দেখতে ভিড় জমিয়েছে।

এরসাদকে দেখে ভিড়টা নিমেষে হালকা হয়ে গেল। বরকতের উত্তেজনার কারণ তার দ্রুত বর্ণনা সাহায্যে জানা গেল।

এরসাদের তাঁবুর অনতিদূরে কতকগুলো কুহী যাযাবর এসে তাঁবু ফেলেছে। মেয়েটা তাদেরই। সে তার গাধা দুটোকে নিয়ে চলেছে পাশের পাহাড়ি ঝরনায় পানি খাওয়াতে। ঝরনায় যাবার পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এরসাদের তাঁবুর সম্মুখ দিয়ে চলেছিল। বরকতের মতে এটাই তার অমার্জনীয় অপরাধ। মেয়েটির দিকে একবার অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি হেনে বলল—কী অসভ্য দেখুন স্যার। ওকে বলেছি তাঁবুর সামনে দিয়ে যাবি না। বলে কিনা একশো বার যাব, তোর কী? বললাম, আমাদের সাহেব বাঙালি। যাদু দিয়ে তোকে হাওয়া বানিয়ে দেবে। বলে, দে না হাওয়া বানিয়ে। যা, বল তোর বাঙালিবাবুকে।

বাঙালিদের যাদুকরী শক্তির অলৌকিকতা সম্বন্ধে কয়েকদিন আগেই পাঞ্জাবি ড্রাইভারের কাছে অবিশ্বাস্য সব গল্প শুনেছে বরকত? আর এমন ভয়ংকর মানুষ যাদুর ভয় সত্ত্বেও কিনা মেয়েটা বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না! ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল বরকত। এরসাদ হাসল। বলল—'যেতে দাও।' তারপর ফিরে তাকাল মেয়েটির দিকে। অবাধ্য অশ্বিনীর মতো ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়ে অছে সে, চোখে মুখে সুস্পষ্ট অগ্রাহ্যের ছাপ। দুনিয়ার ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার যেন সবুজ দুটি আঁখি তারায় ঝলসে উঠেছে। এরসাদের নিরুত্তাপ মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝল সে। তার মুখের কঠিনতা কোমল হয়ে এল। বাঁকা তলোয়ারের মতো একটা শাণিত হাসি জেগে উঠল ঠোঁটের কোণে সহসা। তারপর গাথা দুটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল ঝরনার দিকে। যেতে যেতে একটা তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল বরকতের দিকে। তাতে অশেষ অবহেলা আর বিদ্রূপ।

আবার সেই তীক্ষ্ণ উদ্দাম হাসি। সেই সঙ্গে বিচিত্র কয়েকটা কথার শব্দ। এরসাদ হাসির শব্দ অনুসরণ করে তাকাল। কালকের সেই যাযাবর মেয়েটাই বটে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অবলীলাক্রমে ক্ষীপ্র গতিতে নীচে নেমে যাচ্ছে। বরকত আপন মনে জোরে বকে উঠল।

—কী হল বরকত? কী বলল মেয়েটা? এরসাদ জিজ্ঞেস করল। নাকের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ করল বরকত।

—মেয়েটা পয়লা নম্বরের শয়তান। আমাকে বাঙালিবাবু বুঝি যাদু দিয়ে তোকে গোলাম বানিয়েছে? ওদের তাঁবু যদি আমি কাল না ভেঙেছি তো আমার নাম বরকত খান নয়।

এরসাদ হাসল।—ওসব করতে যেও না বরকত। ওরা শুনেছি ভয়ঙ্কর জাত। রেগে গেলে ভীষণ হয়ে যায়।

বরকতের নাসিকাধ্বনি এবার আরও জোরে হল।

—ভীষণ না হাতি। অসভ্য জাত। কাঁচা খরগোশ খায়, শিয়াল খায়। ওরা আবার মানুষ নাকি! বর্ণনার আতিশয্যে বরকত ভুলে গেল মাত্র কয়েকদিন আগে সে নিজেও একটা খরগোশ ধরে পুড়িয়ে খেয়েছে। এরসাদ মনে মনে হাসল।

বরকত খান সভ্য হচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কী?

সারাদিনের রৌদ্রদগ্ধ দেহটা সান্ধ্য হওয়ার স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

পাহাড়ি ঝরনার কলগান ছাপিয়ে উঠেছে বন-ঝাউর মর্মরধ্বনি। ধূমায়িত কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁবুর সামনে ইজিচেয়ারে শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছে এরসাদ প্রত্যেকদিন কর্মশেষের সন্ধ্যাটা এমনিই কাটে। নির্বান্ধব পুরীর নির্জন সন্ধ্যা।

বন-ঝাউর মর্মরধ্বনি আর চকোরের ডাক শুনতে শুনতে রাত বাড়ে। মনে পড়ে একজনের

কথা। অনেক দূর দেশ—সেই শ্যামল সমতল বাংলাদেশ থেকে সে শুভেচ্ছা আর প্রীতির প্রলেপ দিয়ে চিঠি পাঠায়। ব্যাকুল আহ্বান জানায় দুটি নমনীয় বাহুলতার। কফির পেয়ালায় স্তিমিত চুমুক দিল এরসাদ। কী শান্ত নির্লিপ্ত লতিফা। তবু সে মেয়েও পারে গান গেয়ে উঠতে, রঙিন কথার ফুলঝুরি ঝরাতে। তাকে কথা কওয়াতে জানতে হয়। ভালো লাগে তাকে কথা কওয়াতে। ঠিক ওই জুরাসিক কিরথার গাজিস সেলের মতো। নিস্তব্ধ নির্লিপ্ত পাহাড়গুলিও জানে কথা কইতে। যতবার পাহাড়ে গেছে এরসাদ লাইমস্টোন আর স্যান্টস্টোনের ওপর আলগোছে হাত বুলিয়ে যেন লতিফারই স্পর্শ পেয়েছে। নির্বাক পাষাণ যেন হাওয়ার ভাষায় ফিসফাস করে বলে উঠেছে, অনেক কথা, অনেক ইতিহাস আমাদের বুকে আছে। খুঁজে নাও।

বিয়ের পর অনেক রাতে যখন এরসাদের চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে, তখন ঘুমন্ত লতিফার নিস্তব্ধ ঠোঁট দুটিতে যেন ওই কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে অনেক—অনেক ভালোবাসা লুকোন আছে আমার বুকে। খুঁজে নাও।

অনেকদিন পরে কথাটা লতিফাকে বলেছিল এরসাদ। শুনে হেসেছিল লতিফা। বলেছিল জিওলজি করে করে মাথাটা একেবারে গেছে। পাহাড়ে কয়লা আর সোনা খুঁজে খুঁজে এখন আমার ভালোবাসাও খুঁজে বের করতে চাও।

কিন্তু এরসাদ ভুল করেনি। দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরান্তে লতিফার বাইরের নিলিপ্ততার আবরণ থেকে তার হৃদয়ের মাধুর্য খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে লতিফা অত সংযত, শান্ত না হয়ে বিপরীত হলে কেমন হত! যেমন ওই পাহাড়ে তাকিয়ে অনেক সময় এরসাদ কল্পনা করে আর একটি দৃশ্যের—ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, গলিত ধাতুর স্রোতে ধ্বংস আর সৃষ্টির ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হচ্ছে তরুণী পৃথিবী। তার বক্ষ জুড়ে আলোড়ন আর উচ্ছৃঙ্খলতা। ঠিক যেমন ওই উদ্ধত যাযাবর মেয়েটি। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেন একটি। কোথায় বুঝি ওর মিল আছে, অগ্নিকন্যা তরুণী সেই উচ্ছৃঙ্খলা পৃথিবীর সঙ্গে। যে পৃথিবী আজ লতিফার মতো শান্ত সমাহিত। যে পৃথিবী আজ জননী ধাত্রী।

—'সাব চিঠি।' চমক ভাঙল এরসাদের। পিয়ন রশিদ খাম এগিয়ে দিল। প্রতি সপ্তাহের নিয়ম অনুযায়ী সে আজ শহরে গিয়েছিল সাহেবের ডাক আনতে। খাম হাতে নিয়ে অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল এরসাদের। চিঠি নয় টেলিগ্রাম। কিছু হয়নি তো লতিফার? দ্রুত হাতে এনভেলাপের মুখ ছিঁড়ে ফেলল এরসাদ। না, চিন্তার কিছুই নেই। টেলিগ্রাম করেছে লতিফা। আগামী পরশু সে এসে পড়বে। এক ছত্র লেখার নীচে তার নাম লতিফা আহমেদ। বি এ। নাম সম্বন্ধে চিরকাল একটা অদ্ভুত পাগলামি আছে লতিফার। সবসময় সে সম্পূর্ণ নামটি লিখবে, সেইসঙ্গে ডিগ্রিটাও।

টেলিগ্রামখানা আর একবার পড়ল। লতিফা আসছে—কই আগে তো তাকে কিছুই জানায়নি। মেয়েটা বড়ো খেয়ালি।

চকোর ডেকে উঠল ঝাউবনের আড়ালে। কফির পেয়ালায় চুমুক দিল এরসাদ। অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে শুক্লা পঞ্চমীর বেলে জ্যোৎস্নায়। দূরের পাহাড়-চূড়া, বন-ঝাউ আর কাঁটা ঝোপের জঙ্গলকে মনে হচ্ছে রহস্যময়। কেমন একটা উগ্র সৌন্দর্য আছে এক জনহীন পাহাড়ি উপত্যকায়।

লতিফাকে কী মানাবে এখানে? সে যে বড়ো বেশি নম্র নমনীয়। ছুঁয়েও তাকে ছোঁয়া যায় না, পেয়েও তাকে পাওয়া যায় না, লঘু বাতাসের মতো যার শরীর। যার নিবিড় চোখে চোখ রাখলে পৃথিবীর কোলাহল দূরে সরে যায়; যার দীর্ঘ চুলের অরণ্যে মুখ ঢেকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে এই পৃথিবীকে। সেই স্নিগ্ধ শান্তশ্রী মেয়েকে কেমন মানাবে এই পাহাড়ি বন্ধুর পটভূমিতে।

—'সাব খানা দিয়েছি।' বাবুটি এসে দাঁড়াল। উঠল এরসাদ। বেশ রাত হয়েছে। তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে এরসাদ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল একটা ছায়ামূর্তি যেন চকিতে তাঁবুর পাশ

থেকে সরে গেল। ভালো করে তাকাল এরসাদ। কোনো সন্দেহ নেই। জ্যোৎস্নায় বেশ বোঝা যাচ্ছে কে একজন নুড়ির ওপর দ্রুত পায়ের শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার সর্পিল দুটি বিনুনীর হিল্লোল। বাবুর্চিও দাঁড়িয়েছিল। বলল—বোধহয় ক্রুহীদের মেয়েটা। বিকেলেও এসেছিল, বরকতকে বলেছিল বাঙালিবাবুর যাদু দেখব।

॥ দুই ॥

রাতের খাওয়া শেষ করে একটা চুরুট ধরিয়ে তাঁবুর বাইরে এল এরসাদ। আজ সারাদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়েছে। দুরন্ত বাতাসের ঝাপটায় পাথরের চাঙ্গড় গড়িয়ে পড়েছে নীচে। জঙ্গী পাহাড়ের চূড়া মেঘ আর কুয়াশায় ছিল অন্ধকার হয়ে। সারাদিন তাঁবুর বাইরে যায়নি এরসাদ। ঝরনার ঝর ঝর, বৃষ্টির ঝাপটা আর ঝড়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনে দিন কেটেছে। বিকেলের পর থেকে অবশ্য দুর্যোগটা কম।

বাইরে এসে বেশ শীত বোধ হল এরসাদের। জ্যোৎস্না উঠেছে জঙ্গীপাহাড়ের চূড়ায়। যেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে কালো কালো মেঘেরা ডানা মেলে ভেসেছিল, সেখানে এখন শুক্লপক্ষের চাঁদ ঝলমল করছে। ভিজে ঝাউবনের আবছায়ার ভেতর থেকে ঝরনাটাকে মনে হচ্ছে যেন ছিটিয়ে পড়া সহস্র হিরার কুঁচি।

কালকে শহরে যেতে হবে। লতিফা কাল পৌঁছোবে ওখানে এসে। কথাটা মনে হতে পুলকিত হল এরসাদ। এমন সুন্দর ঝরনা দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে লতিফা। খুশি হলে কী আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে লতিফার চোখ দুটি।

ঝর ঝর শব্দে চমক ভাঙল এরসাদের। ভিজে নুড়ির ওপর হাঁটতে হাঁটতে কখন সে একেবারে ঝরনার ধারে এসে গেছে। সম্মুখে তাকিয়ে এরসাদ আশ্চর্য হল। উঁচু পাথরের ধাপ থেকে সেখানে ধরনার জল প্রবল বেগে নীচে পড়ছে, সেখানে নীচু হয়ে বসে চামড়ার মশকে পানি ভরছে একটি মেয়ে। বিস্মিত এরসাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। চুরুটের কড়া গন্ধেই বোধহয় মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বিদ্যুৎ চমকে গেল এরসাদের মনে। কালকের সেই যাযাবর মেয়েটি। মায়াবী চাঁদের আলোয় তাকে আরও উগ্র জ্বলন্ত মনে হচ্ছে। মেয়েটিও দেখতে পেয়েছিল এরসাদকে। বিদ্যুল্লতার মতো তার শরীরে সহসা একটা ঢেউ খেলে গেল। উঠে দাঁড়াল সে। এরসাদের দিকে একটা আশঙ্কিত দৃষ্টি ফেলে পিছু হটতে চেষ্টা করল।

অবাক হল এরসাদ। মেয়েটা অবাক হচ্ছে কেন! বরকতের কথামতো ওকি তা হলে সত্যি ভেবেছে ওকে যাদু দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবে! চুরুটের অবশিষ্টাংশ ছুঁড়ে ফেলে তার দিকে অগ্রসর হল এরসাদ।

শত্রুর আগমনে ভীতা হরিণীর মতো পিছু সরতে গেল মেয়েটা। কিন্তু পিছে সরবার আর এক ইঞ্চি জায়গা নেই। এক পা সরলেই ঝরনার প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এরসাদ দ্রুত একটা হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে আসন্ন পতন থেকে রক্ষা করল। তারপর ভাঙা ভাঙা পশতুতে বলল—ভয় কী? আমি কিছু বলব না তোমাকে। মেয়েটির ভাষা পশতু নয়। এরসাদের কথা সে বুঝল না। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল ধাক্কাটা এরসাদ। বেশ একটু কৌতুক বোধ করল। বাংলাদেশের ছেলে হলেও শক্তি তার কম নয়। কিন্তু মেয়েটা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কী? এবারে ক্ষিপ্রভাবে মেয়েটির দুটি হাত বলিষ্ঠ মুঠিতে বন্দী করে ফেলল এরসাদ। হেসে উর্দুতে বলল—যাদু দেখতে গিয়েছিলে, কাল আমার তাঁবুতে? এবারেও বুঝল না মেয়েটা। হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য নিরুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করতে লাগল। স্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এরসাদ। সবুজ চোখের তারায় কান্না জমেনি—জ্বলে

উঠেছে বিদ্বেষের আগুন। ধনুকের মতো বাকা ঠোঁটে বিদ্রোহ পরিস্ফুট। সুঠাম দেহবল্লরী কাঁপছে, যেন আগুনের শিখা।

এরসাদ মুগ্ধ হল।

অগ্নিকন্যা সেই তরুণী পৃথিবীই কী তার চোখের সামনে জেগে উঠেছে?

উঃ—যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হল এরসাদের। শিখরদশনা তার ধারাল চারটে দাঁত হিংস্রভাবে বসিয়ে দিয়েছে এরসাদের হাতে। লাল হয়ে ফুটে ওঠা চারটে দাগের দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটির দিকে মুখ তুলল এরসাদ। তার চোখের সবুজ ছায়া কেমন বন্য হিংস্রতায় ক্রুর হয়ে উঠেছে। এরসাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আগুন জ্বলে উঠল বুকে। যাযাবর নারীর বন্যতায় তার হৃদয়ের সুপ্ত আদিম পুরুষটিও বুঝি জেগে উঠল। কঠিন আবেষ্টনে বন্য নারীর স্পন্দন নিশ্চুপ হল। বর্বর নিষ্ঠুর চুম্বনে নিষ্পেষিত হল গৌর আনন।

এক মুহূর্ত পরেই বজ্রাহতের মতো একটা পাথরের ধাপের ওপর বসে পড়ল এরসাদ। এ সে কী করল! নিছক একটা কৌতুককে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে একি সর্বনাশ হল!

অসভ্য অশিক্ষিত একটা যাযাবর মেয়ের কাছে এতদিনের আত্মবিশ্বাস বিলিয়ে দিল! কী মুখ নিয়ে দাঁড়াবে সে লতিফার সামনে? যোজন মাইল অতিক্রম করে প্রতিমুহূর্তে যে নিকটতর হচ্ছে, তার রুচি যে ভয়ানক মার্জিত। অসম্ভব তার আত্মসম্মান। সে কি ক্ষমা করবে তাকে?

দুই হাতে মুখ ঢাকল এরসাদ। যাযাবর মেয়েটি এতক্ষণ সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার ভিনদেশী অপ্রত্যাশিত প্রেমিকের দিকে। এরসাদকে মুখ ঢাকতে দেখে সে কী একটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর বিহ্বল দৃষ্টি নত করে বিষণ্ণ পদক্ষেপে হেঁটে চলে গেল ঝাউবনের পাশ দিয়ে। তার দীর্ঘ দুটি বিনুনী আর লাল জামার ঘাঘির জ্যোৎস্নার জালে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল। মাথা তুলে সেদিকে তাকিয়ে কেমন একটা করুণায় এরসাদের মন ছেয়ে গেল।

॥ তিন ॥

লতিফা কিন্তু আগান ভ্যালি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এমন সুন্দর জায়গা সে কল্পনাই করতে পারেনি। সারাদিন ঝরনার জলে রূপালী মাছের খেলা দেখে, পাহাড়ের ছবি এঁকে আর ঝাউবনের ছায়ায় ঘুরে বেড়িয়ে সে দিন কাটাল।

সন্ধ্যার পর জিওলজির একটা ম্যাপ করছিল এরসাদ। লতিফা এসে পাশে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকাল এরসাদ। বিকেলে শাড়ি বদলে চুল বেঁধেছে সে। উড়ন্ত পাখির ডানার মতো উৎক্ষিপ্ত দুই ভ্রূর মাঝখানে পরেছে খয়েরি রঙের টিপ। কেমন একটু লঘু মিষ্টি সুগন্ধও মেখেছে লতিফা।

—'বাঃ!' সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে তাকাল এরসাদ।

—'চল না বেড়িয়ে আসি একটু।'

—'কোথায়?'

—'ওই দূরের পাহাড়।' আঙুল তুলে লতিফা নির্দেশ করল জঙ্গী পাহাড়ের চূড়াটা। এরসাদ হেসে ফেলল।

—'সাধে কী আর সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে বাঙালিদের কোনো ধারণা নেই!'

—'কেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল লতিফা।

—'ওই পাহাড় এখান থেকে কতদূরে জানো? এখন চলতে শুরু করলে রাত দুপুরের আগে ওখানে পৌঁছোতে পারবে না।'

—'তবে চল, যতদূর পারি হেঁটে আসি।'

এরসাদ ম্যাপ বন্ধ করে ঘুরে বসল।

—'এটা কি তোমার বাংলাদেশ পেয়েছ, যে হাতে ইচ্ছে হলেই নদীর ধারে ঘুরে খানিক হাওয়া খেয়ে এলে, অথবা লেকের ধারে বসে হাত দিয়ে মনের কথা কইলে! এ হল অন্য মুলুক। রাত তো রাত। দিনেও এখানে ভিনদেশী জনানারা পাহাড়ে হাওয়া খেতে যাবার কথা কল্পনা করতে পারে না।'

—'ঠাট্টা রাখো।' লতিফা মুখ ভার করল।

—'বেশ, চল তবে। কিন্তু পাহাড়ি দস্যুরা হঠাৎ বেরিয়ে এসে যদি তোমাকে নিয়ে উধাও হয়, তখন আমার কী উপায় হবে?'

লতিফা শঙ্কিতভাবে একটা হাত দিয়ে এরসাদের মুখ চাপা দিল।

—'সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা। চল ওই ঝরনার ধারেই না হয় একটু বসি।'

—'চল। জিওলজিস্টের বউ আর্টিস্ট হলে এমন বিপদই ঘটে।' কপট হতাশার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল এরসাদ।

ঝরনার ধারে হাতির পিঠের মতো কালো বড়ো একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল দুজন।

সন্ধ্যা বয়ে গেছে।

রূপালি শিউলি হয়ে ঝরছে জ্যোৎস্না-ধারা ঝাউবনের মাথায় আর নুড়ির ওপর। কোমল দুটি হাত এরসাদের হাতের ওপর রাখল লতিফা।

—'পাহাড়ে থেকে থেকে তোমার হাত দুটো পাহাড়িদের মতো কর্কশ হয়ে গেছে।'

হ্যামার ধরে পাথর কাটা নিজের হাত দুটির দিকে তাকিয়ে হাসল এরসাদ।

—'শুধু কী হাত! মনটাও যে পাহাড়ি মানুষের মতো বন্য হয়ে গেছে লতা।'

এরসাদের কণ্ঠের বিষাদের সুরটা লক্ষ করল না লতিফা। স্নিগ্ধ হাসি হাসল।

সেদিকে তাকিয়ে কী একটা ব্যথার ঢেউ জেগে উঠল এরসাদের মনে। সরল হাসি হাসছে লতিফা। দুই এক গুচ্ছ চুল উড়ে এসে পড়েছে সুকুমার কপালে। ঝরনার জলের হালকা ছিটে এসে লাগছে মুখে। দুই এক বিন্দু জল চিকচিক করছে চুলের ওপর, চিবুকে।

কী শান্ত লতিফার চোখ দুটি। এমন মেয়েই পারে জীবনের সব গ্লানি মুছে দিতে। এ মেয়েকে বঞ্চনা করার মতো দুঃখ বোধ হয় আর নেই। ভাবল এরসাদ। তবুও তো সে পারেনি সব কথা লতিফাকে খুলে বলতে। এরসাদ জানে এত বড়ো আঘাত লতিফা সহ্য করতে পারবে না।

—'কি ভাবছ?' এরসাদের কাঁধের ওপর মুখ রাখল লতিফা।

—'কিছু না।' লতিফার শুভ্র কপালের ওপর আলতোভাবে ঠোঁট দুটির স্পর্শ দিল এরসাদ।

—'কে ওটা?' চকিতে সোজা হয়ে বসল লতিফা। এরসাদও তাকাল। দেখল কাছেই একটা পাথরে পিঠ দিয়ে পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়ে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ছুটে চলে গেল মেয়েটা। পায়ের কাছ থেকে ঠন্ ঠন্ করে নুড়ি গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা।

—'কে মেয়েটা?' দু-চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করল লতিফা।

—'ব্রুহী যাযাবরদের মেয়ে।'

—'অমন ছুটে চলে গেল কেন?'

—'জানি না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল এরসাদ। লতিফা বিস্মিত হল। প্রশ্ন করল না আর। ঝাউবনে চকোর ডেকে উঠল। আকাশে উল্কার ফুলঝুরি ঝরল। হাওয়ার দোলায় বনঝাউরা গান গাইল।

—'চল উঠি। ভালো লাগছে না আর।' নীরবতা ভেঙে উঠে দাঁড়াল লতিফা। নিজের হঠাৎ অন্যমনস্কতায় লজ্জা পেল এরসাদ।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল,—এখনই যাবে কি। বস না একটু।

—'না চলো। ভালো লাগছে না আর।'

—'আচ্ছা চলো।' উঠে পড়ল এরসাদ।

পেট্রোমাক্সের উজ্জ্বল আলোয় তাঁবুর ভেতর বসে সন্ধ্যার সেই ছন্দপতন ঘটানো দৃশ্যটা অবাস্তব হয়ে গেল এরসাদের কাছে। হালকা হয়ে গেল মনটা।

ফসিলের ব্যাগ ঘেঁটে একটা পাথর তুলে ধরল লতিফার সামনে।

—'বল তো এটা কী?'

—'পাথর।'

—'উহু, পাথর নয়, এটা একটা ফসিল। এর নাম আর্কা। কত শত সহস্র বৎসর আগে এর মাঝে ছিল জীবনের স্পন্দন ভাবতে পার?

আর একটা ছোটো ফসিল হাতে নিল এরসাদ

—'এর নাম নিমোলাইস্‌টস্‌...।'

—আচ্ছা সেই রুক্ষী মেয়েটা তখন অমন দাঁড়িয়েছিল কেন? এরসাদের কথায় বাধা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল লতিফা। এরসাদ তাকাল লতিফার দিকে। কেমন একটা বিষাদের ছায়া নেমেছে লতিফার চোখে।

—আমার কথা না শুনে কোথাকার সেই মেয়েটার কথাই ভাবছ এখনো?

লতিফা অপ্রতিভ হল। নম্র চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

॥ চার ॥

বিকেলে হঠাৎ বালির ঝড় বয়ে গেল। দশ দিক অন্ধকার করে কোথা থেকে উড়ে এল রাশি রাশি বালি। অন্ধকার করে দিল চারদিক। মরুভূমির দেশ।

বন্ধুর পর্বতশ্রেণির মাঝে মাঝে শ্যামলিমার রং ছোঁয়ানো, ঝরনার গান শোনানো ছোটো ছোটো উপত্যকা, তারাও রেহাই পায় না মরুঝড়ের হাত থেকে। তবে জল আর ছায়ার সংস্পর্শে এসে সে ঝড় কিছুটা শীতল হয় বটে। এমন বালির ঝড়ে না চলে বাইরে যাওয়া; না হয় কোনো কাজ। ক্যাম্পে ফিরে আসছিল এরসাদ। দেখা হল যাযাবর মেয়েটির সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে ছাগলের পাল নিয়ে ডেরায় ফিরছে। আজ আর সে থামল না। এরসাদের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ওই এক পলকের মধ্যেই এরসাদ দেখল তার অগ্নিময়ী রূপ। সে রূপে আরও উগ্রতা আরও বিক্ষোভ। এরসাদের মনে আবার আগুন জ্বলে উঠল। ওকে যে অস্বীকার করার উপায় নেই। এরসাদের অবচেতন সত্তা ওকে স্বীকার করে নিয়েছে। লতিফা জানলে হয়ত ব্যথা পাবে। অভিমানী মন নিয়ে গুমরে মরবে। কিন্তু লতিফা কী বুঝবে এরসাদ যার আকর্ষণে বিভ্রান্ত সে কেবল একটি সাধারণ যাযাবর মেয়ে নয়। সে মানবীরূপী আদিম পৃথিবী। এই কঠিন পাষাণ শিলার স্তরে স্তরে যে পৃথিবীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের লেখা খুঁজে ফিরছে এরসাদের মতো ভূতত্ত্ববিদের দল। এই পৃথিবীকেই যে ভালোবেসেছে এরসাদ।

লতিফাকে ভালোবেসে সুখী হয়েছে এরসাদ সে কী শুধু লতিফা বলে? তা নয়। আসলে লতিফার মধ্যে পেয়েছে এরসাদ আর এক মৌন স্তব্ধ শান্তিময়ী পৃথিবীকে। তাঁবুর সামনে এসে চমক ভাঙল এরসাদের। বালির ঝড় থেমে গেছে।

লাল রঙের একটা মেঘ এসে ছায়া ফেলেছে জঙ্গী পাহাড়ের চূড়ায়। রক্তিমাভায় সারা আকাশ লাল। সন্ধ্যার সেই রক্তিমাকাশ আর হিন্দোলিত ঝাউয়ের শাখা বেয়ে কী এক করুণ সুর উত্তাল হয়ে উঠেছে। তাঁবুর দরজায় থেমে পড়ল এরসাদ। লতিফা এস্রাজ বাজাচ্ছে। লতিফার অভিনিবেশিত মুখ আর শুভ্র আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে এরসাদের আগুন ছোঁয়া মন নিমেষে শান্ত হয়ে গেল। বাজনা বন্ধ করে ফিরে তাকাল লতিফা।

—'তুমি এসে গেছ! বাপরে কী বালির ঝড়!' হঠাও মুখ গম্ভীর করে একটু কাছে এসে দাঁড়াল লতিফা।

—'জানো সেই ক্রুহীদের মেয়েটা আজ আবার এসেছিল।'

—'কোথায়?' চিন্তিত হল এরসাদ।

—'তাঁবুতে দুপুরে শুয়েছিলাম; কখন সে এসে ঢুকেছে।'

—'তারপর?' রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল এরসাদ।

—'ভাগ্যি। সে সময় বাবুর্চি এদিকে কি কাজে এসেছিল, সেই জোর করে ওকে বের করে দিল। কী যে ব্যাপার! কিছু বুঝতে পারছি না।'

এরসাদ চিন্তিত হল। কী উদ্দেশে এসেছিল সে? লতিফাকে কী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিনেছে?

লতিফা হেসে উঠল।

—'কী হল?' আমার চেয়ে দেখছি তুমিই বেশি ঘাড়বে গেলে! হাত মুখ ধুয়ে এসে, চা তৈরি করছি।

মুহূর্তে বাস্তব জগতের মানুষ হয়ে গেল এরসাদ। লতিফার দিকে তাকিয়ে বলল।

—কালই দু-নম্বর ক্যাম্পে চিঠি পাঠাব এ ক্যাম্পে পাহারার বন্দোবস্ত করতে। তুমিও একটু সাবধানে থেক লতা। এসব অসভ্য জাতকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।

নিজের কথাগুলো নিজের কানেই বড়ো বেসুরো ঠেকল এরসাদের।

॥ পাঁচ ॥

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। ফিকে হয়ে আসা আকাশে ঝিকমিক করছে শুকতারা। জঙ্গী পাহাড়ের চূড়া কুয়াশার মেঘে অস্পষ্ট। ভোরের হাওয়া আলতো ছোঁয়া দিয়েছে তাঁবুর পরদায়। ঈষৎ সুরে যাওয়া পরদার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল এরসাদ। টুং টাং মিষ্টি ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধহয় দূর যাত্রী কোনো উটের কারাভা চলছে। বাইরে থেকে কে ডেকে উঠল।

—'স্যার!'

—'কে?' উঠে বসল এরসাদ।

—'আমি বরকত স্যার। একবার বাইরে আসুন।' স্লিপিং সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বাইরে এল এরসাদ। —'কি ব্যাপার বরকত?'

—'ওই দেখুন স্যার।'—বরকত আঙুল তুলে নির্দেশ করল সম্মুখে, এরসাদ তাকাল। ভোরের নীলাভ কুয়াশার আবছায়ায় উট আর গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে চলেছে এক ছায়া মিছিল।

সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে নারী, শিশু আর পাগড়ী বাঁধা পুরুষের দল।

—ওরা কারা বরকত?

—ওই যে, এখানে ডেরা পেতেছিল ক্রুহী যাযাবররা।

—চলে যাচ্চে নাকি?

—বা রে। যাবে না তো কি! ওদের ওপর যে জীনের গোস্‌সা পড়েছে।

জীন্-পরীর প্রভাবের ওপর এদের অগাধ বিশ্বাস। কুসংস্কার এই সব অসভ্য জাতির দৈনন্দিন জীবন জুড়ে আছে সেকথা জানে এরসাদ।

—কাল জানে ভুলিয়ে জালীনকে মেরে ফেলেছে। কথার সঙ্গে কাল্পনিক ভয়ে একটু যেন শিউরে উঠল বরকত।

—'জালীন কে?' এরসাদ তাকাল বরকতের দিকে।

—সেই কুহী যাযাবরদের শয়তান মেয়েটা। কাল যে মেমসাহেবের তাঁবুতে ঢুকেছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল এরসাদ।

—কে বলল সে মরেছে?

—আমি নিজে শুনে এলাম, কাল রাতে ওকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদের দলের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাহাড়ের ধারে একটা খাদের ভেতর অজ্ঞান অবস্থায় তাকে পেয়েছে। হাত মুখ সব থেৎলে গেছে। কাল রাতেই মারা গেছে মেয়েটা। খুব সম্ভব জীন ওকে পাহাড়ের ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে আর থাকা চলবে স্যার।

সভ্য হবার জন্য এতদিনকার নিরন্তর প্রয়াস সম্পূর্ণ ভুলে গেল বরকত। জালীনের অপমৃত্যুর ঘটনায় তার প্রাগৈতিহাসিক মন নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছে।

বরকতের সব কথা এরসাদের কানে গেল না। কেমন একটা অপরাধ-বোধ আর শূন্যতার বেদনায় তার চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল। ও কী তবে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল? কিন্তু সে যে তরুণী অতসী পৃথিবী। সবুজ ঘাসে ঢাকা কোমল বক্ষ পৃথিবীর মতো অভিমানী মন তো নয় তার। সে যে ছিল উদ্বেলিতা বিজয়িনী সর্বগ্রাসী।

নিজের অপরাধবোধকে শান্ত করতে চেষ্টা করল এরসাদ; এমনও তো হতে পারে, সে পাহাড় থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে।

সম্মুখে তাকাল এরসাদ। ছায়ামিছিল অস্পষ্ট হয়ে আসছে, কোথায় চলেছে ওরা? পার্বত্য সীমান্ত গিরিপথ পার হয়ে ওরা হয়ত চলেছে আরও উত্তরে, কাবুল কী কান্দাহারের দিকে।

সেখানে পাবে এক টুকরো সবুজ ঘাস, রূপার পাতের মতো একটু জল আর ছায়া, সেখানেই পাতবে অস্থায়ী ডেরা।

কিন্তু সেখানে আর একজনকে দেখতে পাবে কি কেউ? যে নাকি পাহাড়ে ছাগল চড়িয়ে বেড়াত আর জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ি ঝরনায় আসত জল ভরতে।

টুং টাং উটের সারির ঘণ্টা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল। জঙ্গী পাহাড়ের চূড়া রঙিন হয়েছে। আসন্ন প্রভাতের ইঙ্গিত।

অবসন্ন পায়ে তাঁবুতে ফিরে এল এরসাদ। লতিফা তখনো ঘুমুচ্ছে। নীল রঙের পশমের কম্বলে বুক অবধি ঢাকা। ঘুমের মাঝেও কী আশ্চর্য প্রশস্ত মনে হয় লতিফার মুখটা। এরসাদ লতিফার মাথার কাছে বসে পড়ল।

এক অগ্নিময়ী পৃথিবীকে সে হারাল। কিন্তু তার এক পৃথিবী তার বেঁচে রইল। সে মনে আগুন ধরাবে না, ভূমিকম্পের উন্মত্ততায় তোলপাড় করবে না বুককে, যে শুধু দেবে আশ্রয়, শান্তি, ছায়া।

জনারণ্যে একা

কণা বসু মিশ্র

উড়ু উড়ু মন। মনটা ঠিক কী চায়, অথবা চায় না শ্রাবণী এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে না। চারিদিকে পিল পিল করছে শুধু মানুষ আর মানুষের মাথা। তাদের কারো কোনো দায় নেই শ্রাবণীর এই মন-কেমন-করা যন্ত্রণার দাওয়াই দেবার। আকাশের রঙটা এখন পোড়া তামাটে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। হকাররা চেঁচাচ্ছে, মাত্র পনেরো টাকায় নাইটি। পনেরো টাকায়।

ফুটপাথে জন্তুর মতো ছোটাছুটি করা মানুষগুলোর চোখ লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে, এদিকে ওদিকে। লোভী মানুষ বুঝতে পারছে না কি তার চাই আর চাই অথবা চাই না। অন্তর্বাস, শায়া, শাড়ি কিংবা কাটপিসের দোকান সুদ্ধু সবই যে তার চাই। তার চাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হিসেবে কিছুতেই মিলছে না। পয়সাটা সকলেরই কেন যে এত কম হয়ে গেছে আজকাল। অন্যমনস্কভাবে শ্রাবণীও দাঁড়িয়ে পড়ে। ও নেড়েচেড়ে এটা দেখে, ওটা দেখে। জিনিস আর কেনে না। শ্রাবণী ভাবে, ঠিক কত টাকা হলে মানুষ তার সীমানায় পৌঁছুতে পারে? ওর মাথার ওপর দিয়ে চক্কর কেটে একটা পাখি উড়ে যায়। শ্রাবণী কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। পাখিরাও কী মানুষের লোভের জগতে নজর দিচ্ছে নাকি? ও হ্যাঁ করে শূন্যে তাকায়। আকাশের গায়ে পোড়া তামাটে রং এখন কালচে হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে পড়বে। গোধূলির এই শেষ আলোটুকুর ওপর দারুণ লোভ শ্রাবণীর। ও ভিড় বাঁচিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর মনে হয়, এই সময়ের প্রবাহে ভেসে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে ও নিজেকে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কারণটা কী অনেকদিন পর বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বলে? নাকি ওর নিজের মধ্যেই কোনো রং বদল ঘটছে? ও বুঝতে পারছে না।

অনেকদিন ভুরু প্লাক করা হয়নি। শ্রাবণী ট্রামলাইন পেরিয়ে যায়। বিউটি পারলারের দিকে এগোতে গিয়েই পেছনে কার যেন খোঁচা খায়। ও ঘুরে তাকায়।—আরে, বুলবুলদি, তুমি? শ্রাবণীর মনের মেঘ মুহূর্তে সরে যায়। ও উচ্ছ্বসিতভাবে খুঁটিয়ে দেখে বুলবুলকে। সজোরে ওর হাতে ঝাঁকুনি মেরে বলে, তুমি একদম বদলে গেছ।

বুলবুলের পরনে বাদামিরঙের সিফন জর্জেট। গায়ে ম্যাচ করা স্লিভলেস। বয়েস কাট চুল। ঠোঁটে কফিরঙের লিপিস্টিক। দশ বছর আগে সে যখন কলকাতা ছেড়ে বিদেশে যায়, তখন ওর চেহারায় এতখানি ঔজ্জ্বল্য ছিল না। চোখের মধ্যে এমনই আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতাও ধরা পড়ত না। বুলবুল খুশি গলায় বলে, হ্যাঁ বদলে গেছি।

শ্রাবণীর ঠোঁটে একটা ধারাল হাসির ভাঁজ পড়ে। বলে, ভেতরে? না বাইরে? বুলবুল জোরে হেসে ওঠে। বলে, তুইই বল না।

এত তাড়াতাড়ি কী কোনো মন্তব্য করা যায়? দাঁড়াও, আগে তোমায় দেখি।

বুলবুল হাসতে থাকে। বলে, তুইও তো বদলে গেছিস? জানিস, আমি প্রথমে তোকে একদম চিনতে পারিনি।

শ্রাবণী মুচকি হাসে। বলে, হ্যাঁ, পরিবর্তনশীল জগৎ।

বুলবুল ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, জগৎ পরিবর্তনশীল না আমরা, বলত?

শ্রাবণী ঝরঝর করে হাসে। বলে, আমাদের নিয়েই তো জগৎ।

বুলবুল বলে, যাক্‌গে জগৎ নিয় মাথাব্যথা নেই। তোর কথা বল? তোর বাড়ির টেলিফোনটা কী অচল?

কলকাতার কোন্ টেলিফোন সচল বলতে পার?

যা বলেছিস। ডায়াল ঘুরালেই রঙ নাম্বার, এনগেজড্ সাউনড্ অথবা ক্রস কানেকশন। রাস্তায় বেরিয়েও শান্তি নেই। যেদিকেই যাই শুধু মাটি খোঁড়া। গর্ত। কোথাও নোংরা জঞ্জালের পাহাড়। বুলবুলের গলায় খেদোক্তি ফোটে।

শ্রাবণী হাসে। বলে, হ্যাঁ, এই নিয়েই আমরা কলকাতায় বেঁচে আছি। তোমার কী খুব খারাপ লাগছে?

বুলবুল হেসে বলে, খারাপ লাগবে কেন? কলকাতা ইজ কলকাতা।

এ কেমন ইংরিজী হল?

উচ্ছ্বাসের ভাষার রূপ আলাদা হয় বুঝিস না? বুলবুল হাসতে গিয়েও চোট খায়। একটা চাপা নিঃশ্বাস ওর মনের চোরা গলিতে কোথায় যেন পাক খায়। বুলবুল বলে, আমি তো এই গরীব দেশেরই মেয়েরে! কেমন করে কতটাই বা বদলাব বল?

বুলবুলের চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রাবণী ওর কথার গভীরতা খোঁজে। বলে, সত্যি কথাটাই বলে ফেললে।

বুলবুল বলে, তাছাড়া আবার কী! দুদিন বিদেশ গিয়েই রাতারাতি নিজের দেশকে ঘেন্না করে বসব? আমার ছেলে এখনো খাঁটি বাংলায় কথা বলে। এই, তোর ছেলে এখন কত বড়ো হল বলত? তোর বর? বরের খবর কী?

শ্রাবণী হেসে ওঠে। বলে, কোন্ প্রশ্নটার উত্তর আগে দেব? ছেলের এখন আলাদা মনমেজাজ তৈরি হচ্ছে।

কী রকম?

চুটিয়ে কমিক্স পড়ে। গোয়েন্দা গল্প, রোমাঞ্চ, রহস্য কিংবা হাসির গল্প ওর অবসর বিনোদনের সঙ্গী। কিংবা বিকেলে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল। যে সীজনে যা চলে। মর্নিং স্কুল সেরে দুপুরে বাড়ি ফিরে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট চলে।

বুলবুল খুশি খুশি ভাবে তাকায়।—ও কী করে?

শুনবে? ছাদে গিয়ে কালো চশমা পরে সূর্যের গতি পরীক্ষা। কোত্থেকে পুরনো টিভির জোগাড় করে নিয়ে তার মধ্যে নানা রং, ওষুধ, পাউডারের গুঁড়ো মিশিয়ে এক্সপেরিমেন্ট!

বাহ্। ওতো বেশ মজাররে।

মজা? সেদিন কী করেছে জানো? টাকাজাইমের গুঁড়োর সঙ্গে মিল্‌ক ম্যাগ্‌নেশিয়া মিশিয়ে পর পর ছ চামচ খেয়ে নিয়েছে।

তারপর?

তারপর সারারাত বড়ো বাথরুমে ছোটাছুটি। আমরা বুঝতে পারিনি, ওর হঠাৎ কলেরার মতো এমনি অবস্থা হল কেন? তারপর ডাক্তার এলে শ্রীমান নিজেই ফাঁস করলেন, তিনি ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন।

বুলবুল শব্দ করে হেসে ওঠে।

তোমার ছেলের খবর কী বল?

আমার ছেলে? তিনিও ভবিষ্যতের ভাবী বৈজ্ঞানিক। তবে তার গবেষণার বস্তু হবে নাকি মহাকাশ।

খুব ভালো। আচ্ছা, এইসব বৈজ্ঞানিকদের মায়েদের যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, তখন কী হবে বলত?

কথা বলতে বলতে ওরা বিউটি পারলারে পৌঁছে যায়। শ্রাবণী সুইংডোর ঠেলে। বুলবুল বলে, তুই কী চুল ছাঁটবি নাকি?

না না ভুরু।

ভালোই হল। চল, আমিও চুলটা ছেঁটে নিই।

সমস্ত চেয়ারগুলোই দখল হয়ে গেছে। পর পর সাতটি চীনে মেয়ে কাস্টমারের মন জয় করার জন্যে আপাততঃ দারুণ ব্যস্ত। মোটাসোটা থাই মেয়েটি এগিয়ে এসে ভাঙা হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে বলে, প্লিজ ইউ সীট। কেয়া করেগা? আইব্রো, হেয়ার কাটিং, ক্রিম ম্যাসেজ, ফেসিয়াল? ম্যানিকিওর; ব্লিচ?

ওরা দুজনে দুজনের প্রয়োজন জানায়। তারপর খানিকদূরে পাতা সোফা কাম বেড-এর ওপর বসে পড়ে। ওদের ঠিক মুখোমুখি উল্টোদিকের আয়নায় একটা ভীষণ চেনা মুখ। সে এখন ভুরু প্লাক করছে। শ্রাবণী সামান্য অন্যমনস্ক হয়। একে কোথায় দেখেছে মনে পড়ে না। অথচ খুব পরিচিত। তবে কী ওর চেহারাটা খুব কমন? আয়নার গায়ে ওর তাকানর ভঙ্গীটিও খুব চেনা। বুলবুল হঠাৎ ফিসফিস করে বলে, ওই মেয়েটি টিভি-তে বলে না? দুদিন আগেও তো ওকে দেখলাম মনে হচ্ছে?

শ্রাবণীরও মনে পড়ে। ও বলে, হ্যাঁ।

বুলবুল বলে, কলকাতায় একটা বিউটি-পারলার খুললে কেমন হয় বলত?

ভালোই হয়।

এখানে মেয়েরা খুব ব্যাবসা করছে, তাই না?

হ্যাঁ।

কলকাতায় মেয়েরা আজকাল খুব শাড়ির ব্যাবসা করছে?

হ্যাঁ।

তবে কী তাই করব?

চলবে না।

কেন?

মেয়েদের শাড়ির ব্যাবসা এখন কলকাতার মার্কেট প্রায় নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ইনস্টলমেন্টের টাকা আদায় করতে গিয়ে শাড়ির ব্যবসায়ী সফিস্‌টিকেটেড্ মহিলারা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। ওদিকে তাঁতির তাগাদা আছে।

বুলবুল উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, যা বলেছিস। টেলিফোনের ক্রস কানেকশনে আমি তো প্রচুর শাড়ি ব্যবসায়িনীর গলা শুনতে পাই প্রায়ই। কেউ তাঁতির সঙ্গে কথা বলছে, কত সুতোর কাপড় ভাই? একশো বিশ? কেউ আবার দেনাদারকে মিষ্টি গলায় ডোজ দিচ্ছে, টাকাটা দেরি করে দিলে ব্যাবসা চালাই কী করে বলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলাম ইনস্টলমেন্ট শোধ দেবেন। কিন্তু তাঁতির তাগাদা যে।

শ্রাবণী হেসে ওঠে। বলে, আমিও টেলিফোনে অমনি কাঁদো কাঁদো গলায় শাড়ি ব্যবসায়িনীর গলা শুনতে পাই। বুলবুলদি, তুমিও হুঁশিয়ার থেকো। কখন কার গাড্ডায় পড়ে যাবে।

বুলবুল বলে, না, না আমার কোনো বন্ধুবান্ধব শাড়ির ব্যাবসা করছে না।

শ্রাবণী বলে, আজ করছে না বলেই সে কাল করবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

বুলবুল একটু অবাক হয়। বলে, তাই নাকি? ত এত ব্যাবসা থাকতে শাড়ির ব্যাবসা কেন?

শাড়ির মতো প্রিয় বস্তু মেয়েদের আর কী আছে? শ্রাবণী হাসতে হাসতে বলে, বিক্রেতা এবং

ক্রেতা উভয়ের দর্শন যদি এক জায়গায় মিলে যায়, তা হলে এর মতো ভালো ব্যাবসা আর কী হতে পারে? একটা গল্প শুনবে? শ্রাবণী কাঁধের আঁচল গুছিয়ে নিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসে। সদ্য বিদেশ-ফেরত বুলবুলও ভুলে যায় এটা সেলুন। ও শ্রাবণীর মুখোমুখি জমিয়ে বসে। বলে, ইস! কতদিন পর তোর সঙ্গে গল্প! কী যে ভালো লাগছে!

শ্রাবণী বলে, সেদিন এক বন্ধুর বাড়ির নীচে দিয়ে হাঁটছি, ও দোতলার জানালা থেকে দেখতে পেয়েই হাঁকাহাঁকি লাগিয়ে দিল। আয় না রে, কতদিন আসিস নি। শ্রাবণী ভুরু কুঁচকে বলে, তখনো বুঝতে পারিনি কেন এত আদর।

বুলবুল ব্যাগ খুলে চুইয়ংগাম বের করে। একটা নিজের মুখে ফেলে আর একটা শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে দেয়। চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে শ্রাবণী বলে, বন্ধু আদর করে ডিভানে বসিয়ে পিঠের তলায় তাকিয়া গুঁজে দিল। ওর যত না কথা তার চেয়ে প্রচুর হাসি। এ কথা সে কথার পর রসগোল্লার প্লেট এলো। তারপরই এলো শাড়ির বাণ্ডিল। বন্ধু ক বলার আগেই আমি তো কৃষ্ণ বুঝে গিয়েছি। রসগোল্লা দুটো আমার হাতে তখনো অক্ষত। চামচে বসাইনি। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রেখে বললাম. ভাই, রইল তোমার রসগোল্লা, আমি এবারে কাটি।

সেকি! সেকি! বন্ধু তো হাই হাই করে উঠল।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে বলছি, দুটো রসগোল্লার বিনিময়ে আমি জবাই হতে রাজী নই।

বুলবুল খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, তারপর তোর বন্ধুর চেহারাটা কেমন হল? বাংলার পাঁচ?

শ্রাবণী হাসে। বলে, না না তা হবে কেন? ও আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই নিশ্চিন্তে মিষ্টি দুটো খেয়ে নে। কী করব ভাই, ডাক্তারের অ্যাড্‌ভাইস্।

আমি বলি, বললাম ডাক্তার তোমায় শাড়ির ব্যাবসা করতে বলেছেন?

না না, ঠিক তা নয়। বন্ধুর চোখ দুটো এবার উদাসীন হয়ে যায়। বলে, ব্যাপারটা কী জানিস? মেলানকলিয়ায় ভুগছিলাম, তাই মেন্টাল ডাইভারসানের জন্যে।...

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলি, বুঝেছি, কিন্তু ভাই, তুমি মেলানকলিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে আমার যে হার্ট অ্যাটাক করাবে।

বুলবুল জোরে হেসে ওঠে। ওদের সামনে রিভলভিং চেয়ারে বসে থাকা মহিলাটি যিনি ক্রিম ম্যাসেজ করছিলেন, বলেন, কিছু মনে করবেন না ভাই, একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, সেদিন কী আপনি আপনার বন্ধুটির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে বুঝবো উনি কাঁচা ব্যবসায়িনী। শ্রাবণী, বুলবুল দুজনেই হেসে ওঠে। বিল মিটিয়ে দিয়ে সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় ভদ্রমহিলা ওদের দুজনকে নাম ছাপানো কার্ড দিয়ে বলেন, আমিও একজন শাড়ি ব্যবসায়িনী। আমার প্রতিষ্ঠানের নাম কল্যাণী। সামনের রোববারেই এগ্‌জিবিশন। আসবেন। জোর করব না। তবে নিজেরাই ইচ্ছে করে না কিনে পারবেন না। দু হাজার টাকার ক্যাপিটাল নিয়ে নেমেছিলাম ভাই। এখন দু লাখ টাকার ব্যাবসা খাটছে। আমেরিকা, লণ্ডন, হংকং, বোম্বে। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। বুলবুলদি হকচকিয়ে যায়। শ্রাবণী বলে, বুঝেছি, আপনি একজন পাকা ব্যবসায়িনী।

ভদ্রমহিলা হি হি করে হেসে বলেন, তবে আমি কাউকে গিলোটিন করি না। কাস্টমার নিজেই...।

বুলবুল বলে, বুঝেছি, কাস্টমারই গিলোটিন হয়।

ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান। বুলবুল শ্রাবণীর দিকে তাকায়। বলে, কী কাণ্ড বলত?

শ্রাবণী মুচকি হাসে। বলে, বুঝলে বুলবুলদি। এর নাম কলকাতা।

বুলবুল চুল কেটেছে। শ্রাবণী ভুরু। বিউটি পারলার থেকে বেরিয়ে ওরা গড়িয়াহাটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। বুলবুল বলে, চল আমার ফ্ল্যাটটা দেখে আসবি।

আজকেই যেতে হবে?

কেন তোর অসুবিধেটা কীসের? বরের সঙ্গে কী কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

বর? শ্রাবণী ঝরঝর করে হেসে ওঠে। বলে, 'বিবাহের প্রথম রাত্রিতে যে সুর বাজে, সে রাগিণী চিরদিনের নহে'। পড়নি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে? আমার বর এখনো কী আমায় নিয়ে পোঁটলা করে ঘুরবে? না আমিই ওকে নিয়ে ঘুরবো?

বুলবুল ঠোঁট ভেঙে হাসে। বলে, বুঝতে পেরেছি, তোরা খুব মডার্ন হয়েছিস। এতদিন ভেবেছি, আমরাই বোধহয় বেশি মডার্ন। এই যেমন, আমি একলা এসে কলকাতা ঘুরে যাই। আমি ফিরে গেলে আমার বর আসে। কথাগুলো বলেই বুলবুল বোধহয় কোনো চাপা নিঃশ্বাস আটকাতে চেষ্টা করে। তবু ওর লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো হেসে যায়। শ্রাবণীর চোখের কোণে বৃষ্টির বিন্দুর মতো জলকণা চিক্ চিক্ করে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে গড়িয়াহাট। দু পাশে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বহুতল বাড়ি। তার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। শ্রাবণী বুঝতে পারছে না ওই ফ্ল্যাটগুলোতেও কী ওদেরই মতো পুরনো হয়ে যাওয়া অসংখ্য বর কিংবা বউ একক সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে আধুনিক বলে নিজেদের ঘোষণা করছে? ওর মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। শ্রাবণীর মনে হয়, হাজার হাজার মানুষ তাদের আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে ভাঙা পাঁজরের মধ্যে যেন কোনো গোপন নিঃশ্বাস লুকিয়ে রাখে। ওপরে নক্ষত্রের আকাশ। মিট মিট করে তারা জ্বলছে। ওর মুখের মধ্যে এখনো চুইংগাম। শ্রাবণীও হেসে যায়। বলে, জানো বুলবুলদি! আগে আমরাও যৌথ সত্তায় বিশ্বাসী ছিলাম। ও আমায় ছায়ার মতো সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এমন কী চুল কাটতে যাবে সেলুনে পর্যন্ত আমি। শুধু অফিসটুকু ছাড়া। আর এখন আমরা একক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বুলবুল হেসে ফেলে। ওর কপালের ওপরে ঝুঁকে পড়া চুলগুলো কানের পাশে সরিয়ে দিয়ে বলে, এই ভালো। দুজন পাশাপাশি হাঁটলেই তো ঝগড়া।

শ্রাবণীর মুখে এবারে কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ও বলে, তোমার অভিজ্ঞতাটা কী সেই রকম?

বুলবুলও হেসে ফেলে। বলে, তা একরকম তাই বলতে পারিস।

ওরা হাঁটতে থাকে। গড়িয়াহাটের প্রবহমান জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুলবুল যেন কী খুঁজে যায়। ও হঠাৎ বলে, হ্যাঁরে! কলকাতার মেয়েরা বুঝি আর বর নিয়ে হাঁটে না?

শ্রাবণী বলে, কেউ কেউ হ্যাঁরে! যাদের এখনো আত্মোপলব্ধি হয়নি। বুলবুল সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ওর দিকে তাকায়। বলে, ওই যে যারা হাঁটছে, তারা কী বর? না বয়ফ্রেণ্ড রে?

শ্রাবণী বলে, অনুমান করো।

একটা চলমান ট্যাক্সির দিকে হাত বাড়ায় বুলবুল। ট্যাক্সি থামলে বুলবুল বলে, আয় না চলে। কী করবি এখনই বাড়ি গিয়ে? ওরা ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে।

বুলবুল বলে, হ্যাঁরে! কলকাতার ছেলেমেয়েরা কী এখন লিভিং টুগেদার-এ বিশ্বাসী?

শ্রাবণী বলে, যারা যেভাবে জীবনটাকে নেয়।

দশতলার ওপরে বুলবুলের ফ্ল্যাট। বুলবুল লিফটের বোতাম টিপে শ্রাবণীকে বলে, কলকাতার একটা ক্লাস এখন বিদেশের ক্লান্তিকর জীবনটাকে নকল করেছে। সিঁথিতে রেড্ সিগন্যাল থাক বা নাই থাক কিছু এসে যায় না। পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে রাত্রিবাস আকছার হচ্ছে। এক কথায় যৌবন অনন্ত। একথা তারা বুঝে গিয়েছে। পুরুষ কিংবা মহিলা অনেকেই এখন জীবনে আর সিন্‌সিয়ার নেই।

শ্রাবণী বলে, কিন্তু এদের সংখ্যা কত? শতকরা পঁচিশ ভাগ?

বুলবুল বলে, পার্টিকুলার কোনো ঘরকে এরা আর আঁকড়াতে চায় না। কেন বলত? এর কারণ কী ফ্রাসট্রেশন?

শ্রাবণী বলে, খানিকটা তাই। প্রথমে হয়তো শুরু হয় ফ্যাশান থেকে। অর্থাৎ কে কার চেয়ে কত বেশি আধুনিক হতে পারে। তারপর ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায় হয়তো অভ্যাসে।

বুলবুল বলে, কিন্তু এর শেষ কোথায়?

শ্রাবণী হাসে। বলে শেষ হবে। যেদিন বুঝবে আমরা সেই একলা। কেউ কারো নই।

বুলবুল চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকে। বলে, কাজের লোক নেই। বিদেশে তো সবই করতে হয়। এখানে দুদিনের জন্যে এসে ওদের নিয়ে ঝুট ঝামেলা অসহ্য। আমার আর কোনোরকম ভাইব্রেশান সহ্য হয় না বুঝলি? ওখানে তো শুধু টেনসান্, টেনসান্।

শ্রাবণী চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বুলবুলের ফ্ল্যাট দেখতে দেখতে বলে, টেনসান্ থেকেই তো সিভিলাইজেশনের জন্ম বুলবুলদি!

বুলবুল সোফার ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ে। বলে, বোস শ্রাবণী। শ্রাবণীর চোখদুটো তখন ঘুরছে বুলবুলের দশতলার ব্যালকনির ছাদ বাগানে। বিচিত্র ধরনের ক্যাক্নাস, পাতাবাহার, মরসুমী ফুল টবের মাটিতে বসে হাওয়ায় দুলছে।

তোমার ফ্ল্যাটটা দারুন হয়েছে বুলবুলদি!

শ্রাবণী ঝপ্ করে সোফার ওপর বসে পড়ে বলে, কত দক্ষিণা গেল?

বুলবুল বলে, তিন লাখ কুড়ি।

ফাইন! সস্তায় পেয়েছো।

হ্যাঁ। একবারে ক্যাশ ডাউন করেছি তো।

শ্রাবণী বলে, সেইজন্যেই। এখানে উচ্চ চাকুরিজীবী, যাদের আমরা বলি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে তারাই তো বেশি মাথা খারাপ করছে। কিন্তু তাদের হাতে একসঙ্গে অত টাকা কোথায়?

বুলবুল বলে, এই ফ্ল্যাটটা ইন্স্টলমেন্টে কিনতে গেলে আরও বেশি পড়ে যেত।

এগ্জাকটলি।—শ্রাবণী বলে, কিন্তু প্রথমদিকে যারা ফ্ল্যাট কিনেছিল, ইন্স্টলমেন্টেও তারা অনেক সস্তায় পেয়েছিল।

বুলবুল ডানলোপিলোর গদীর মধ্যে বার কয়েক দোল খেয়ে বলে, কী খাবি বল? চা না কফি? অথবা হুইস্কি, জিন, বীয়ার আজ ইউ লাইক।

শ্রাবণী হাসে। বলে, কফি।

ভুরু কুঁচকে তাকায় বুলবুল। বলে, অন্য কিছু নয়?

আমি তো ছেড়ে দিয়েছি বুলবুলদি?

কেন? কী হল?

একসময় মনে হল, অ্যাডিক্টেড হয়ে যেতে পারি।

বুলবুল বলে, তা কেন? আমি মদ খাবো। কিন্তু মদ আমায় খাবে কেন?

শ্রাবণী হাসে। বলে, তাছাড়া মনেও হয়েছিল, সেই শিবরাম চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে হয়, নেশা যদি করতেই হয় তো রাবড়ির নেশা করব। যদিও আমার এখন রাবড়িতেও লোভ নেই।

গুড্। তুই নেশাকে জয় করেছিস, বুলবুল উঠে দাঁড়ায়। সোফায় হেলান দিয়ে বসে শ্রাবণী দেখে শীতের বিষণ্ণ আকাশ। আকাশের নীল জমির মধ্যে গায়ে জরির বুটির মতো অসংখ্য তারা জ্বলছে। শ্রাবণী অন্যমনস্কভাবে বলে, নেশার তো কোনো শেষ নেই বুলবুলদি। কার কিসে নেশা? কেন নেশা? সে কী নিজেই জানে?

ডাইনিং কাম ড্রইংরুমের খানিকটা দূরেই মডার্ন কিচেন। বুলবুল গ্যাস জ্বালিয়ে বলে, আসলে কী

জানিস? আমরা দারুণ মেকানিক্যাল হয়ে পড়ছি। সেই একঘেয়েমির অবসাদ কাটানোর জন্যেই কোনো একটা, কিছু একটা নেশার দিকে ছুটছি। নেশা ছাড়া মানুষের বাঁচাবার রাস্তা নেই।

শ্রাবণী ঘুরে ঘুরে বুলবুলের ফ্ল্যাট দেখছে। মিশর, চীন, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স পৃথিবীর বহু দেশের শিল্প ওর দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে আছে। শ্রাবণী চেঁচিয়ে ডাকে বুলবুলদি : এই বুলবুলদি!

বল না,—বুলবুল কফির কাপে চামচেনাড়তে নাড়তে বলে। শ্রাবণী বলে, ফ্ল্যাটটাকে তো মিউজিয়াম বানিয়ে ছেড়েছো দেখছি। বুলবুল হাসে। বলে, এই নিয়েই তো বেঁচে আছি। একসময় খুব শখ ছিল জানিস? আমার প্রচুর টাকা থাকবে। আর আমি দু হাতে টাকা ছড়িয়ে যাবো। জীবনে কিছু পাইনি বলে যেন ক্ষোভ না থাকে। বুলবুল সেন্টার টেবিলে একটা ম্যাট্ ফেলে কফির কাপ রাখে। বলে, একসময় টাকা টাকা করে আমরা পাগল হয়েছি জানিস? টাকার বাড়ি, টাকার ঘর, টাকার গাড়ির স্বপ্ন দেখেছি। খিল খিল করে হেসে ওঠে বুলবুল। বলে, এখন স্বপ্ন দেখি, টাকা আমায় তাড়া করছে। আমি টাকার ভয়ে শুধু ছুটছি আর ছুটছি। কোনো গাঁয়ের কোনো মেঠো পথ ধরে। তার পাশ দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, একটু বসি। কিন্তু টাকা আমায় বসতে দিচ্ছে না। শ্রাবণী কফির কাপে ঠোঁট ভিজিয়ে অপলকে ওকে দেখে। বলে, জোর করে বসে পড়লেই হয়। মনকে শক্ত করে বলো, টাকা আমার আর দরকার নেই। আমি আর চাই না তোমায়।—শ্রাবণী হাসতে থাকে। বুলবুল বলে, রঞ্জন তো থামবে না। ওর যে ভয়ংকর নেশা। একসময় টাকার অভাবে অনেক কষ্ট পেয়েছে ও। তাই টাকার সমুদ্র থেকে ও আর উঠতে পারছে না। ও বলছে, আমি গরীব দেশের ছেলে। আমার ভোগের এখনই কী হয়েছে?

শ্রাবণী ফের কফির কাপে ঠোঁট রাখে। ওর উল্টোদিকের মুখোমুখি দেওয়ালে মিশরের পিরামিডের টু ডায়মেনসনের একটা ছবি। পিরামিডের মাথার ওপর শতাব্দীর কোনো এক মিশরীয় রানির মুখ। রানির কানে, মাথায়, গলায়, নাকে বিচিত্র ধরনের গয়না। তার চোখদুটো বীভৎস ভাবে হাসছে। যেন হাতছানি দিচ্ছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে শ্রাবণী চোখ ফেরাতে পারছে না। ওকে যেন চুম্বকের মতো টানছে ছবিটা। ও বলে, এই ছবিটা তুমি কোত্থেকে জোগাড় করলে বুলবুলদি?

বুলবুলও অন্যমনস্ক হয়। বলে, স্টেট্স থেকে। ছবিটা কিন্তু খুব অদ্ভুত।—শ্রাবণী বলে। বুলবুল বলে, হ্যাঁ। ওর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ভাবছি, ওটা সরিয়ে ফেলব। অথচ ছবিটা আমার খুব প্রিয়। কী করে ছাড়ি বলত?

শ্রাবণীর বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা জমাট কান্না পাক খেতে থাকে। ও বুঝতে পারে না, কেন?

বুলবুল দুহাত সোফার মাথায় জড়ো করে হেলান দিয়ে বসে। ও শূন্যচোখে তাকিয়ে থাকে, বাইরের ভাসমান মেঘের দিকে। শ্রাবণী ভাঙা গলায় বলে, বুলবুলদি। আমরা হাজার বাঁধনে জড়িয়ে আছি। ছুটে পালাতে গেলেই শেকল ঝনঝনিয়ে বাজে।

বুলবুল বলে, তোর কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে।

তোমার ছেলের কথা, তো একবারও জিজ্ঞেস করিনি। ও কোথায়?

ও তো লণ্ডনে পড়াশুনো করছে।—বুলবুল হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে, বেশ আছি আমরা জানিস? ছেলে একদেশে, রঞ্জন একদেশে, এখন আমি আর একদেশে। আমার টাকার বদলে সুখ খুঁজতে গিয়ে দেখছি সুখটাই হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখানে তিন লাখ কুড়ি হাজার টাকার ফ্ল্যাট, তিরিশ হাজার টাকার ফার্নিচার, পাঁচ হাজার টাকার প্লাসটিক কালার করিয়ে, সেই ফ্ল্যাট পাহারা দিতে এসেছি। হয়তো সারাজীবন ধরে কখনো স্টেটস্-এ, কখনো এখানে দুজন দু জায়গায় ছোটাছুটি করেই সময় কাটিয়ে দেব। আমি আর রঞ্জন দমদমের সেই পুরনো বাড়িটার একতলার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দু'কাপ চা মুখোমুখি রেখে আর কী কখনো গল্প করতে পারবো? ওর আমার কারুরই যে আর সময় নেই।

শ্রাবণী কোনো কথা বলে না। বুলবুল থেমে যায়। শ্রাবণী ভাবে, মানুষ কীভাবে নিজেকে খুঁজে পাবে? সে কী কোনো এক জায়গায় থেমে গিয়ে আত্মস্থ হবে? কিন্তু থেমে না থাকার নামই যে সভ্যতা।

বুলবুল বলে, আমি আর রঞ্জন কোনো কখনো এক ফ্লাইটে যাতায়াত করি না। কারণ,দারুণ টেনসান হয়। সমুদ্রের মধ্যে যদি প্লেন ভেঙে পড়ে? বুলবুলের চোখদুটো আবার কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বলে, একসঙ্গে যদি দুজনেই মরি, তাহলে এই বিপুল সম্পত্তির কী হবে? বুলবুল হা হা করে হাসতে থাকে। বলে, ছেলেটা এখনও সাবালক হয়নি ও সম্পত্তির কী জানে? কী বোঝে? তাই আমাকে আর রঞ্জনকে একসঙ্গে মরলে চলবে না। দুজনের মধ্যে একজনকে বেঁচে থাকতেই হবে।

বুলবুল হারতে হাসতে একসময় স্থির হয়ে যায়। ও দু চোখে জলের ধারা। বুলবুলের বুকের মধ্যে হয়তো যন্ত্রণা হতে থাকে। ও ঠোঁট চেপে চোখ বুজে কান্না আটকায়। শ্রাবণী বুঝতে পারে না, ও এখন কী বলবে? শ্রাবণীর শুধু মনে হয়, আমাদের মন মুক্তপাখি। তাকে কী কোনো বিশেষ জায়গায় বেঁধে রাখা যায়?

বুলবুল একসময় নিজেকে সামলে নেয়। হেসে বলে, জানিস? ভোরের আধফোটা আলোয় দাঁড়িয়ে আমি রোজ পৃথিবীর প্রথম সূর্যকে দেখি। আমাদের এই ব্যালকনিটা যেন দার্জিলিঙের টাইগারহিল। ঠিক টাইগারহিলে দাঁড়িয়ে যেমন আর রঞ্জন সূর্য ওঠা দেখেছিলাম। আকাশে সিঁদুর রং ছড়িয়ে সূর্যটা বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে। রামধনুর সাতরঙের অনেকগুলোই যেন স্পষ্ট হয়। আমার মনের মধ্যে তখন কী রকম যেন একটা পূর্ণতার অনুভূতি। কিন্তু তারপরই রঞ্জনের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে। বিকেলে দাঁড়িয়ে একলাই সূর্যাস্ত দেখি। সারা আকাশে আবির ঢেলে, আমায় পাগল করে দিয়ে রসিক সূর্য টুপ্ করে ডুবে যায়। তখন ফের রঞ্জনের জন্যে মনজোড়া হাহাকার! আমি ফিরে গেলে রঞ্জন এসেও তো এই দৃশ্যই দেখবে। অথচ, পৃথিবীর এই রং বদলের খেলা আমরা দুজনে একসঙ্গে ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাব না।—বুলবুল থেমে যায়। আর কিছু বলে না। ওরা দুজনেই নিস্পলক তাকিয়ে থাকে, ব্যালকনির ওপারের আকাশটার দিকে। শ্রাবণীর বুকের মধ্যে ধূ ধূ করে ফাঁকা মাঠের শূন্যতা। খোলা দরজা দিয়ে শির্ শির্ করে শীতের হাওয়া বয়ে যায়। নির্জন একাকিত্ব নিয়ে একটা বিষণ্ন সন্ধ্যা বার বারই যেন বুঝিয়ে দেয়, কেউ কারো নয়। উদাসীন গলায় শ্রাবণী বলে, বুলবুলদি, আমাদের যন্ত্রণাটা কোথায় জানো? আমরা বোধহয় বড়ো বেশি আঁকড়ে ধরতে যাই। কিন্তু নিজস্ব অনুভূতির গভীরে কেউ তো কারো সঙ্গী নয়।

বুলবুল কোনো কথা বলে না। ব্যালকনির টবের গাছগুলো দেওয়ালের গায়ে ছায়ার ঢেউ তোলে। এই বহুতল বাড়ির নীচের রাস্তা দিয়ে হুশ্ করে মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি চলে যায়। বুলবুল বলে, কিন্তু সংসারের নানা সম্পর্কের মধ্যে সহস্র বাঁধনে জড়িয়ে তো আমরা।

শ্রাবণী একটু হেসে তাকায়। বলে, কিন্তু কোনো সম্পর্কের বাঁধনই আমাদের আর বেঁধে রাখতে পারে না। আমরা কত মুক্ত বলত? ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলি।

বুলবুল বলে, আবার কবে দেখা হবে বল?

লিফ্‌টের বোতাম টিপতে টিপতে শ্রাবণী বলে, মন যেদিন আবার ছুটবে। কোনো গণ্ডীর মধ্যে সে তো সীমাবদ্ধ নয়।

ও কথাগুলো বলেই লিফটের দরজা টেনে নিয়ে বোতাম টেপে। খাঁচাটা আস্তে আস্তে নেমে যায়। ওরা দুপারে দাঁড়িয়ে দুজন হাত নাড়ে।

অরণ্যের থাবা

শ্যামলী গুপ্ত

আজ মাঘী পূর্ণিমা, অন্যবারের মতোই এবারও ব্রত করবে গিরিবালা। আয়োজন তার সারা হয়ে গেছে। ছোটো ছেলে কালিপদও চলে এসেছে সকাল সকাল। বেলা হয়েছে দেখে ওকে খেতে দিল গিরিবালা। দাওয়ার একপাশে বসে খাচ্ছিল কালিপদ। দাওয়ার যে রান্নাঘর সেখান থেকে হাঁড়ির ভাত তুলতে তুলতে তাঁক করে একটা আওয়াজ কানে আসতেই থালা সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে গিরি, দরজার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তে চোখ চলে যায় আসনের দিকে, আর এক ঝলক চোখে পড়ে হলুদ একটা ছায়া যেন সাঁৎ করে সরে গেল। হাত কেঁপে থালা মাটিতে পড়ে যায়, ডুকরে বুক ফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়ে গিরিবালা। ওর কান্নার আওয়াজ শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে বউ, বাচ্চারা সব ছুটে আসে। পলকে বুঝে নেয় সব। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে সবাই ছুটতে থাকে চতুর্দিকে। গিরিবালাকে ঘিরে ধরে দুচারজন বয়স্কা মহিলা। অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওর চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে থাকে তার বাতাস করতে থাকে অবিরত।

এই গাঁয়ে কোনো সমর্থ জোয়ান মদ্দ পুরুষ নেই। একসময় নাম ছিল সোনাখালি। এখন সবাই বলে, লোকমুখে ফেরে 'বেধবা গাঁ'। এখানে থাকে কাঠুরে, মউলে, জেলে মালোদের বিধবা বউ-এরা আর তাদের সঙ্গে থাকে কিছু কচি কাচা, অল্প বয়সী কয়েকটি ছেলে মেয়ে। এরা একটু বড়ো হলেই গাঁ ছেড়ে, বিয়ে থা করে অথবা কাজ-কম্ম নিয়ে চলে যায় অন্যত্র। সুন্দরবনের এই গাঁয়ে এসে সময় যেন থমকে গেছে, এমন বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন জীবন, যেখানে শুধুমাত্র ম্লান কতকগুলো মুখ যাদের কাছে ভবিষ্যৎ অর্থহীন। তবু এরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে, সুখেদুঃখে।

গিরিবালার শাশুড়ি এখন অশক্ত, বেশির ভাগ সময়ই বিছানায় শুয়ে থাকে। ধরে এনে কখন সখন দাওয়ায় বা বাইরের বেড়ার ধারে বসিয়ে দেয় গিরিবালা। নাওয়ানো, খাওয়ানো সবই ওকে করতে হয়। বুড়ি কানে কম শুনলেও কী একটা বিপদের আশঙ্কায় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাই গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে গিরিকে ডাকতে থাকে, 'অ বউ, অ-বউ, তুই কুথায়, কথা কস্‌না কেনে বউরে।" কে এখন উত্তর দেবে বুড়ির হাঁকের। এখনও গিরির জ্ঞান ফেরে নি। গিরিবালার শাশুড়ি নিজেকে কিছুতেই বিধবা বলে মানেনা। আর সবাই জানে যে ও বিধবা, সেটা শুধু মানদাই স্বীকার করেনা। কারণ ওর স্বামী না ফিরলেও তার সঙ্গীদের দু-পাঁচজন পরে পরে গাঁয়ে ফিরেছে। সেও হল গিয়ে অনেক দিনের কথা। জেলে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছিল মানদার বর হরিপদ। অনেকগুলো নৌকায় ওরা যায় ২০/২২ জন ছিল। মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে প্রতি বছরই ওরা মাছ ধরতে বহু দূর দূর যায়। কিন্তু বেশিদিন থাকে না ৭/১০ দিনের মাথাতেই ফিরে আসে। মাছ তুলে দেয় মহাজনের হাতে—আবার পাড়ি দেয় জলে—ডিঙ্গা ভাসিয়ে। সেবারও তেমনি দল

বেঁধে গেছিল হরিপদরা। যারা গাঁয়ে ফিরতে পেরেছে তাদের কাছে শোনা, ওরা যখন মাঝদরিয়ায় তখন প্রচণ্ড বেগে ঝড় বাতাস বইতে থাকে, একেবারে তুফানের মতো। জেলে ডিঙ্গিগুলো দুলতে থাকে দারুনভাবে। সব মাঝি মাল্লা আর জেলের দল দরিয়া পীরের কাছে মানত করতে শুরু করে। ওরা নৌকা ভাসানোর সময়ও বদর পীরের বন্দনা করেই নেমেছিল। ওদের সম্মিলিত প্রার্থনায় বোধহয় পীরবাবার দয়া হয় যেমন ঝড় উঠেছিল তেমনিই আস্তে করে হঠাৎই কমে আসে তুফান। কিন্তু নৌকাগুলো ছিটকে ছাটকে এধার ওধার চলে যাওয়ায়, অনেকেরই ওরা হদিশ করতে পারেনি। যারা ফিরেছিল তাদের নৌকা ঝড় আর স্রোতের টানে পুববাংলার খাঁড়িতে আটকে গেছিল। ওখানকার জল পুলিশ ওদের উদ্ধার করে তাদের দেশে নিয়ে যায়; তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওরা দেশে ফিরতে পেরেছিল তাও প্রায় ৫/৭ বছর পরে। সেও হল গিয়ে দু/তিন যুগ আগের কথা। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন মরে হেজে গেছে।

হরিপদ বেঁচে নেই, একথা মানদা মানেনা বলেই, গিরি বিধবা হবার পর যখন গাঁ ছাড়ল, তখনও মানদাকে সঙ্গে আনতে পারেনি। এয়োস্ত্রী হয়ে কেন যাবে বিধবা গাঁয়ে বারবার বাধা দিয়েছে। অবশ্য শ্বশুর ভিটেতে পড়েছিল বলেই না কচি ছেলে মেয়ে তিনটাকে কোনোগতিকে বড়ো করে তুলতে পারল। গিরিবালার সে যে কী কষ্টের দিন গেছে বলার নয়।

গিরিবালার বর রামপদ ছিল মউলে। বছরের একটা সময় মধু তুলতে গভীর বনে যেত। বাকি সময় জন খাটতে আশেপাশের গাঁ গঞ্জে যেত, এমনকী আকাল পড়লে শহরেও যেত কাজের সন্ধানে। ঘরামির কাজ ভালো জানত রমাপদ। গিরিবালা অনেকদিন বলেছে যেন মধু তুলতে না যায় রামপদ। কিন্তু ও কিছুতেই বারণ শুনত না, বলত আমার বনবিবির কাছে মানত আছে, না গেলে বিবিমার অভিশাপ নেমে আসবে: 'মায়ের আশীর্বাদে কিচ্ছুটি আমার হবেনি, তুই মিছাই এত চিন্তা করিস আর ডরাস।' চিন্তা কী গিরিবালার পিছন ছাড়ে। 'ও বলে বাপ, পিতামোকে দেখেও শিখলে নি। তুমি তো তোমার কতাই বলতেছ; তুমি জাননি তুমাদের বংশে সব্বার মিত্যু অপঘাতে। কেউ গেচে বাঘের পেটে, কেউ বা কুমিরের আর না হলে হদিশ নেই কারুর। ভয় হবেনি সব্বো সময় মোর বুকটা কাঁপে দুর দুর করে।' এসব কথা উঠলেই রামপদ সোহাগে ভরিয়ে দিত গিরিবালাকে। সে যে কী সুখ সেকথা মনে হলে এখনও গাঁয়ে কাঁপন ধরে গিরির, চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

জ্ঞান ফিরে আসে গিরিবালার, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'বাপ ধন রে বাপ ধন, কুনখানে গেলি তুই মুকে ছেড়ে, আমি একটা আবাগী, মোর চোকের সামনে থে নে গেল সোমথ ছাওয়ালটারে, হেই গো বিবিমা, হেই মা বাশুলী, নারায়ণী মা গো এ কেমন ধারা তোমাদের বিচার? এ তোমরা মোর কী করলে গো? কুন পাপে মোর এমনটি হল গো?' সবাই মিলে বলাবলি করতে থাকে রেতবিরেত নয়, একেবারে দুকুর বেলা 'বড়ো শ্যায়াল' ঘর থে ছোঁড়াটাকে উইঠে নে গেল—এর আরও জ্বাইলে মারবে গো। সবার চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা হিমশীতল আতঙ্ক। মোদের একন কী হবে?

এই গাঁয়ে যে বিধবারা থাকে তাদের অনেক ধরনের জাত সম্প্রদায়। সবই অবশ্য নিম্নবর্ণের, নিম্নশ্রেণির। মালো, সদগোপ, বাউরী, বাগদী, নমঃশুদ্র, এমনকী অন্ত্যজ শ্রেণির ডোম, হাঁড়ি, চাড়ালরাও আছে। আর আছে কয়েকঘর মুসলিম বিধবা। এদের মধ্যে কোনো জাতধম্মের বিচার নেই। সবাই গতর খেটে খায়। একে অপরের সমব্যথী। এখন যারা গিরিবালাকে ঘিরে আছে তারাও গিরিবালার মতো অভাগী।

ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে গুনিনকে খবর দিতে হবে। 'বাঘা বাঁধা' মন্তরপড়ে আটকাতে হবে ওই যমদূতটাকে। একবার যখন রক্তের স্বোয়াদ পেইয়েছে, তখন আবার আসতে

ছাড়বেনি।' কেউ কেউ আবার ফিসফিস করে বলে, 'গিরির নেশ্চয় কুন পাপ ছেল। তাই চক্ষের সমুখ দে ছ্যালাটারে উইঠে নে গেল বড়ে মিঞা।' বনবিবির মন্দিরে, দক্ষিণারায়ের থানেও পুজো চড়াতে হবে।' গিরিবালা তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। ওদের কোনো কথাই কানে ঢুকছে না। মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছে কান্নায়। ঘর থেকে শাউরি মা হাঁক পারতেছে থেকে থেকে—ঠিকই এত বেলা হয়ে গেল, পেটে ভাত পড়েনি। এত দুঃখের মধ্যেও এক প্রতিবেশী বউকে গিরিবালা বলে মানদাকে চাট্টি খাইয়ে দিতে।

দূরে ক্যানেস্তারা পিটানোর আওয়াজ কানে আসে, কিছু হইচই চিৎকার হাওয়ায় ভাসতে থাকে। একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এস বলে হুই ওধারে নদী পেইরে বাঘটা চলে গেছে। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বনকর্মীরা কালিপদর আধখাওয়া শরীরটা উদ্ধার যখন করে একটা বড়ো ঝোপের মধ্যে—তখন প্রায় সাঁঝবেলা। বউটারে তো খপর দেওয়া যায়নি—১২/১৪ কোরশ দূরে কালিপদদের গাঁ। বিয়ানে হলে কোনো অসুবিধা ছেলনি, কিন্তু এই সাঁঝসন্ধেতে কে যাবে অতদূরে? বড়েমিঞা, সাপখোপ, না থাক, 'অপঘাতে মিত্যু'—তেনারা আবার চাদ্দিকে ঘোরফেরা করে, এট্টু আঁধার নাইমলেই। আবার বেশ খানিকটা বাদা আর বন পেরিয়ে যাওয়া—কেউই সাহস করছে না, আবার আধখাওয়া শরীরটাও ফেলে রাখার ভয়ে সবাই আতঙ্কিত।

গিরিবালার চোখের সামনে ভাসছে কচি বউটার মুখ, এই বয়সেই ভাতার খাকির সব শেষ। পোয়াতি বউটারে নে ও একন কী করবে, পুত্তশোকের থেও সেটাই গিরির একন বিষম চিন্তা। ওর তো তিনটে ছেলে মেয়ে ছেল যখন গে রামপদ আর জঙ্গল থে ফিরলনি। ওর সঙ্গীরা বললে বড়ে মিঞা টেনে নে গেছে। গিরি তো শেষ দেকাটাও দেখতে পায়নি। কালিপদ মারা গেছে শোক তো আছেই, কিন্তু তার থেও এট্টা ভয় চেপে বইসছে গিরির মনের ভিতরে। যখন যৈবন ছেল, বয়েস ছেল, ও কত খেটেছে। পাঁচটা পেট চাইলেছে এই গতর খেটেই। কিন্তুক একনতো অত খাটতে পারবে নি। কালিপদ এই বছর দু হল পঞ্চায়েত আপিসে এট্টা কাজ পেয়েছেল। সবে এট্টুন সুকের মুক দেকতে শুরু করেছিল গিরি। আর ও এমনি গতর খাকি আবাগী যে ভগমান ওর সব সুক কেড়ে নিল। ভগমান কী কানা? গিরির বড়ো ছেলেটা গঞ্জে থাকে। সোম বচ্ছর একবার আসে কী আসেনা। টাকা পয়সাও তেমন একটা কিছু দেয়নাকো। বুকটা শুইকে শীতল হয়ে আসে গিরির। একে শাউড়ি, তার উপর কচি পোয়াতি বউ। গিরি শুনেছে একন নাকি বাঘে মারলে সরকার থে টাকা দ্যায়। সে যে কী হ্যাপা গিরি জানেনা। আর ভাবতে পারে না ও মাথা ভার হয়ে আসে।

বনকর্মীরা আর আশপাশ গাঁয়ের কয়েকজন তখনও দাঁড়িয়ে আছে, গিরি তাদের বললে, 'নে যাও মোর বাছারে আর দাঁইড়ে থেকোনি।' কালিপদর দেহটা তুলে নিয়ে যাবার পর ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসে। গিরির এক দূর সম্পর্কের ননদও থাকে এই গাঁয়ে। খবর পেয়ে সেও এসেছিল। সেই থাকবে আজ রাতে ওদের এখানে। ঝাড়া, হাতপা, জোয়ান মাগি, এক হাতেই সব সামলে দিতে পারবে। শাশুড়িকে গাঁ থেকে নিজের কাছে আনার সময় মেনকা ওকে খুব সাহায্য করেছিল। কালিপদর তখনও বে থা হয়নি। আর শ্যামাপদ গঞ্জে গিয়ে বিয়ে করে ওখানেই থাকে। মেয়ে কালিতারারও দুটো গাঁ পেরিয়ে বিয়ে হয়েছে। জামাই এর জমিজমা আছে তাই কালিতারা ব্যস্ত থাকে শ্বশুরবাড়িতে। কালিপদর ভরসায় মানদাকে রাখা যাবে না—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে ওনাকে নিয়ে এসেছে গিরিবালা।

যাবার আগে সবাই মেনকাকে বলে গেল, রেতে একটু সাবধানে থাকিস, অপঘাত মিত্যু তো। দেখিস দোরটোর হুটহাট খুলিস নে ্যানো কিচু তো বলা যায় না। তবে ওদের আশঙ্কা দূর করে গুণিন পৌঁছে গেল। গুণিন খবর পেয়েছে লোকের মুখে। গুণিন শুধু একা আসেনি; সঙ্গে দুই চ্যালা নিয়ে এসেছে, ছোটো দুই গুণিন। এই মিত্যুর খপর পবনের আগে ছোটে গিরি তা জানে। কিন্তু

গুণিনরা খাবে কী থাকবে কোতায়? ওর তো একটা বই দশটা ঘর নি। বড়ো গুণিন এসেই কাঁধের বোচকা নামিয়ে ফেলে। সেখান থেকে একটা ধুনুচি বের করে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালায়। হাঁক পাড়ে ওদের হাত মুখ ধোবার জল দেবার জন্য। মেনকা দাওয়ায় রাখা বালতির জল এনে দেয় সম্ভ্রমভরে; জিগ্যেস করে ওনারা কী খাবে? আর কিচ্ছুটি লাগবে না বলে ওকে আশ্বস্ত করে গুণিন।

আর ভয়ভিতরি নেই, এবার গুণিন বাঘ বাঁধা মন্তর আউরে আটকাবে বড়ে মিঞাকে। একথা ভেবেই ওরা ক্ষমা চেয়ে নেয় বাবা দক্ষিণরায়ের কাছে। তিন গুণিন মিলে কাজ শুরু করে দেয়। আজ ভরা পূর্ণিমা—ঘন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে আছে মাঠ জুড়ে, তাকে বশ করেই চাঁদের আলোও উঁকি দিচ্ছে হেথাসেথা। এক দারুন রোমাঞ্চকর পরিমণ্ডল। সুন্দরবনের এইসব অঞ্চলে যারা বসত গড়েছে—তারা বেশির ভাগই অন্য কোথাও গিয়ে থিতু হয়ে বসতে পারেনা। এই বিপদসঙ্কুল জায়গা অনবরত ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। চারিদিকের গভীর নৈঃশব্দ, মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখির ডাক, আর অবিরত ঝিঁঝিঁ পোকার কান্নায় গোটা পরিবেশটাই রাতের বেলা রহস্যময় হয়ে থাকে। এরই মাঝে জঙ্গল থেকে কখন কখন ফেউ এর ডাক ভেসে আসে। নদীর জলে ছপছপ নৌকা চলার আওয়াজ কানে আসে ক্বচিৎ। ভাটিয়ালি গান অথবা ভোর রাতের আজান জানান দেয় জীবন এখানে চলমান। যুগযুগান্তের হানাহানি, রক্তপাত, আর অসহায় মানুষের আর্তনাদের করুণ রাগিণী বাতাসকে ভারী করে রাখে সবসময়। তবু জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে থাকেনা বাদার এই মানুষরা।

ভয়সঙ্কুল এই প্রকৃতির কোলে মানুষের আদিম জীবন ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু যুগযুগান্তের অন্ধ বিশ্বাসের কাছে সে নিঃশব্দে নীরবে এখনও আত্মসমর্পণ করে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কাছে আজও এখানকার মানুষ বড়ো নিঃসঙ্গ আর অসহায়। মৃত্যুও এখানে প্রকৃতির মতোই রহস্যময়ী। তাই গুণিন, ওঝা, এদের অলৌকিক সত্তার উপর বিশ্বাস রেখেই এরা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে চায়, যুঝতে চায়। গুণিন এসেছে শুনে আশেপাশের গাঁ থেকে জোয়ানমদ্দ ব্যাটাছেলেরা এসে পড়েছে। হাতে জ্বলন্ত মশাল, সড়কি লাঠি, ক্যাচা, বল্লম। হৈ হৈ জমজমাট হয়ে ওঠে গিরিবালার হাতাটা।

এর মধ্যে খবর পৌঁছে যায় কালিপদর দাহ সারা হয়ে গেছে। দুপুরের খবরও নাকি পৌঁছে গেছে গিরিবালার বউমার কাছে। গিরি জানে আজ ছেল হাটবার, তাই মুখে মুখেই কতাটা চাউর হয়্যে গেছে। একজন জানিয়ে দিল গিরিকে, তোমার বউ খপরটা গেছে গো। বউ হয়ত গিরিকে দুষবে কেন ওকে না দেইখে পুইড়্যে দেওয়া হল ওর সোয়ামীটারে। বুইঝে বলবে বউটারে গিরি, ওই শরীরটা কি দ্যাখা যায় যায় নাকি পোয়াতি বউটারে দ্যাখতে দিতে আছে। প্যাটের ছাওয়ালাটার ক্ষেতি হলে তকন। নিচ্চয় বুঝবে বউ। তবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গিরিবালা। থাক্ খপর তো নিয্যস পৌঁচেছে। ওকে ছেল্যার মিত্যুর খপরটা বউকে দিতে হবেনি। এটা একটা বাঁচোয়া। আবার বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে বউটার কাছে কে আছে কে জানে, খপরটা শুনে ও কী করতেছে। অবশ্য ওর বাপের ঘর খুব কাচেই, তেনারা আসবে নিশ্চয়।

গিরিবালার আগেতে দুটি পুত্ত সন্তান হয়েছিল। পেঁচোয় ধরে জন্মের পরপরই দুটো মারা গেছে। অনেক মানত করে, গাজীপীরের থানে হত্যে দিয়ে, ষষ্ঠীর থানে পুজো চড়িয়ে তবে পেরথম ব্যাটা শ্যামাপদ হয়, তারপর মেয়ে কালিতারা আর কোল পোঁছা এই কালিপদ। কী সা যোয়ান ছেল্যা। মনটা কিছুতেই বাগ মানছে না। গিরি এখানে ঘর করছে সে প্রায় ২৫/৩০ বছর হল। এই পেরথম এমন কাণ্ড ঘটল। কাছেই নদী—কুমির টেনে ন্যে গেছে, দু পাঁচ জনকে; সবসময় তাই ঘাটে গেলে ওরা সতর্ক থাকে, ভয়ে ভয়েও থাকে। বচ্ছরে একবার গাঁয়ের সবাই

মিলে কুমিরের দ্যাবতা কালীরায়কে পুজা দ্যায়। আর গিরির বাড়িটা নদীর গাঁ ঘেসেই। গিরির কথায়, নদীতে বান আইসলে ঘরটাকে ভাইসে নে যায় যেন। তাতেও শাউড়ি ন্যে ও বেঁচে আছে, একচোখা ভগমান, ওকে নিলে না কেন? এ কেমুন মার ভাগমানের, কী জন্য এমুন করে মাইরল? ফির্যা ফির্যা ওকেই কেন এমুন কষ্টটা দেয়। গিরিবালা জানে এমনধারা চিন্তা করতে করতেই ওর রাতটা কাটবে; আরও কত ঘুমহীন রাত ওকে কাটাতে হবে কে জানে? ওর দুঃখকষ্টের বারমাস্যা বেঁচে থাকতে আর শেষ হবেনা।

গিরিবালা ভাবে রামপদ যখন বনে যেত তখন গুণিন যে রকম আচার বিচার দিয়ে যেত তাই তো সে অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে। যতদিন না জঙ্গল থেকে ফিরেছে, ততদিন ক্ষার দিত না মাথায়, সিঁদুর পরত না এয়ো ইস্ত্রীরিদের মতো, এটা খাবে না, ওটা ছোঁবে না কতনা নিয়মকানুন—কিছুই তো বাদ দেয়নি। প্রতি শনি/মঙ্গলবার পূজা চড়াত বনবিবির মন্দিরে। নারায়ণী তলাতেও একদিন করে হত্যে দিয়েছে। যে যা বলেছে তাই করেছে মান্যতা দিয়ে। সংস্কার বশে এতটুকুও নড়চড় করেনি ব্রত আচ্চাপালনে। তাও কী শুনল বনবিবি, আর মা নারায়ণী সব কথা। গুণিন যে বাটি মন্ত্রপূত করে দিয়েছিল,যাতে কেউ বাণ না মারতে পারে সে মন্ত্রও জপ করেছে অবিরত। রামপদ মারা যাবার পর ছেলেদের মঙ্গল কামনাতেও কত না মানত আর ব্রত করেছে, আজই মাঘী ষষ্ঠীর ব্রত করবে বলে ঠিক করেছিল। কী হল তাতে? কেউ তো বাঁচাল না ওর কোলপোঁছা ধনকে।

গিরিবালার এই আক্ষেপ কী তার একার। এই বাদাবনের ভিতরে, গহীন গাঙের ধারে কতশত গিরিবালার সকরুণ কান্না আলোড়িত হয় প্রতিনিয়ত কে তার হিসাব রাখে? তবুও এখানে ঋতুচক্র ঘোরে। অরণ্যের থাবায় শিহরিত জীবন এগিয়ে চলে তার নিজের ছন্দে, নিজের গতিতে। এখানে তাই জীবন-মৃত্যুর আলো আঁধারিতেও মানুষ খুঁজে ফেরে বেঁচে থাকার রসদ। নোনা জল আর নোনা মাটি সিক্ত হয় নোনা ঘাম আর নোনা রক্তে। আর গিরিবালাদের মতো অসহায় বউ মা এদের চোখের নোনা জলে।

দাদআলীর কলজে

সেলিনা হোসেন

বনের মধ্যে সবসময় একটা ফিসফিসানির শব্দ পায় ঝোরা, মনে হয় গাছ-গাছালি যেন লিলুয়া বাতাসের সঙ্গে কেলিরত। সেই সঙ্গোপন লুকোচুরি-জড়ানো শব্দ ঝোরাকে আনমনা করে রাখে। সেই শব্দে বিভোর হয়ে লম্বা লেজওলা কাটমৌর পাখিটার পেছনে ছুটতে ছুটতে অনেক ভিতরে এসে পড়ে ও। কাটমৌরের দেহের ছোটোবড়ো চক্রাকার ফোঁটাগুলো গোলকধাঁধার মতো কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায় ঝোরাকে। আর তখনই হঠাৎ করে আবিষ্কার করে যে বন এখানে একদম নিথর। গাছের পাতা চুপ। ইয়ল বাতাসের সঙ্গে খেলা নেই বলে হাকিযুকির শব্দও আর থাকে না। সেই ভীষণ সাঁইসিট পরিবেশে ওর মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। থমকে থাকা গাছের মাথার দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়। ডালে ডালে জড়ানো সবুজ মাথাগুলো নিরেট দেওয়ালের মতো। সে দেওয়াল ফুটো করে সূর্যের তীক্ষ্ণরশ্মিও মাটিতে এসে পৌঁছায় না। অমন চমৎকার আলো-আঁধারি ঝোরাকে বিবশ করে ফেলে। বাইরে কোনো শব্দ নেই বলে নিজের অন্তরে সে ধ্বনি পায় ও। কাটমৌরটাকে কোথাও আর খুঁজে পায় না বলে গোটা বনটা ওর আপন হয়ে যায়।

বাবার কথা মনে হয়। বনের এত ভেতরে আসা ওর জন্যে কড়া নিষেধ। বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবে না। আসলে সেটাও ঠিক নয়। বাবার কথা মনে করে ঝোরা নিজেই নিজেকে শাসন করে। ওতো জানে বাবা ওকে জোর করে কিছুই বলতে পারে না। কোনোদিন রাগের মাথায় বলে ফেললেও পরে শুয়ে শুয়ে কাঁদে। ওই দুর্বলতাটুকুও ঝোরার সম্বল। ওটাকে মূলধন করে অবাধে ঘুরে বেড়ায় ও। কয়রা নদীর তীর থেকে গভীর বন। যতদূর ওর ইচ্ছে, মান চাইলে কথা নেই, যেতেই হবে।

উত্তেজনার বশে অনেক দূর ছুটে এলেও ফেরায় পথে গা ছমছম করে ওর। পা জড়িয়ে যায় বোটুনী লতায়। প্রাণপণ চেষ্টায় বাবার কাঠ কাটার শব্দ শুনতে চেষ্টা করে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ। কিন্তু না কোথাও এতটুকু রব নেই। বনের এখন আলিমিলি অবস্থা। চারদিক ঝিমুচ্ছে। কোথাও কোনো ঝিঁঝিকুটও মুখ খোলে না। পায়ের কাছ দিয়ে সুড়ুত করে লাকারু এদিকওদিক ছুটে যায়। থমকে দাঁড়ায় ঝোরা। জলপাই-বাদামি ওদের শরীর সিরিংগা ঘাসের বনে ঢুকে গেলে আবার সচকিত হয়ে চলতে শুরু করে ও। আস্তে আস্তে বন হালকা হয়ে আসে। সুন্দরী শিরীষের ফাঁকে ফাঁকে সোজা উঠে যাওয়া বোনজিলের মাথা পরিষ্কার দেখা যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ঝোরা। তখনই বোঁ করে একটা সোনামুখী পোকা ওর সামনে এসে ডিগবাজি খায়। ঝোরা পোকাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁপ তুলে ডেরায় ঢোকে। বাবা তখনো ফেরেনি।

ঝোরা ছাড়া দাদআলীর জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। বউ মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে।

সেই থেকে ঝোরাই তার সঙ্গী। দাদআলী কোনোদিন উপলব্ধি করেনি যে তার জীবনের কোথাও কোনো শূন্যতা আছে। অফুরন্ত কাজ, কাজের অবসরের সঙ্গী ঝোরা। জীবনের এই নিয়মে দাদআলী অদ্ভুতভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্যে বন থেকে কাঠ কাটতে পাঠিয়েছে ওদেরকে। প্রতি বছর একদল করে লোক আসে। অস্থায়ী ডেরা বাঁধে। দশ মাস থাকে। কাঠ কাটা শেষ করে আবার ফিরে যায়। নদীতে কাঠ ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরাও ঘর ভাঙে।

দাদআলী কেওড়া কাঠ কাটতে এসেছে সুন্দরবনে। সুন্দরী গাছ দিয়ে বেঁধেছে ডেরা। লেপে পুছে সাজিয়ে গুছিয়ে ঝোরা সে ডেরাকে করে তুলেছে বসবাসযোগ্য। দু'সপ্তাহ পর পর খুলনা থেকে লঞ্চ আসে খাবার পানি নিয়ে। নদীর ঘাটে সে পানি আসতে যায় এখানকার সবাই। ঝোরাও যায়। লঞ্চের ভেঁপু শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন কেমন করে ঝোরার। লঞ্চ তো খাবার পানি আনে না, সেই সঙ্গে আসে মোহিত। ঝোরার ভালোবাসার লোক। লঞ্চে কাজ করে। যেদিন লঞ্চ আসে সেদিন আর কাজে মন লাগে না ওর। মধুপায়ী নীলটুনির বাঁকানো লম্বা ঠোঁটের কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় লাজনতি বেগুনি ফুলের কথাও। তখন ওর মনে হয় সারা বনে কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল একটা লঞ্চের শব্দ ছাড়া। কোথাও কোনো পাখি নেই, একটি উড়ালবিহীন পাখি ছাড়া। দাদআলী বলেছে আসছে বোশেখে বিয়েটা দিয়ে দেবে। বোশেখের আর আটমাস বাকি। দাদআলীর ইচ্ছে এই আট মাসে রাতদিন খেটে একটা মোটা অঙ্কের টাকা জোগাড় করবে। লাপিসাপি করে মেয়ের বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার নেই। যে বিয়েতে বাজনা বাজে না, বাতি জ্বলে না, ধুমধাম হয় না সেটা বিয়ের অনুষ্ঠান নয়। সে অনুষ্ঠান করবে লোক বয়ে নিয়ে যাবার মতো। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দাদআলী সাতদিন বাজি ফুটিয়ে, বাজনা বাজিয়ে দেবে, মনের আশ মিটিয়ে দেবে। ঝোরা তার স্বপ্নের কুঁড়ি। প্রতি মুহূর্তে ওকে কেন্দ্র করে ফুল ফুটেছে দাদআলীর মনে। এ যে কী সুখ তা কাউকে বোঝানো যাবে না। সেজন্যে ঝোরার বিয়েকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে কোনো সুমসুমি রাখতে চায় না দাদআলী। সরু সরু বাতাস দাদআলীর বুকের সুন্দরবন মাতিয়ে রাখে। টাকা চাই, অনেক টাকা। ঝোরার জীবনের সবচেয়ে মধুর লগ্নটিকে উৎসবমুখর করে তুলতে হবে।

গাছ হিসেবে টাকা দেওয়া হয় প্রতিটি শ্রমিককে। দাদআলীর যেন ফুসরত নেই। যত বেশি গাছ কাটতে পারবে তত বেশি পয়সা। কেওড়া গাছের গুঁড়িতে যখন কুড়োলের এক একটা কোপ দেয়, তখন দাদআলীর মনে হয় ঝোরার সুখের দিন তরান্বিত করছে ও। কোনো রকম হাইপাইয়ের মধ্যে নেই। শুধু বোঝে কাজ।

মাঝরাতে মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শোনা যায়। মাইলজোসনা আলোকিত করে রাখে জলঙ্গি নদীর কিনারা। ঝোরা বুকের ভেতর ফিসফিসানির শব্দ শুনতে পায়। ভয়ে বাবার কাছে উঠে এসে বসে। বাইরে আগুনের কুণ্ডলি জ্বলে। বাঘের ডাকটা কখনো দূরে, কখনো কাছে শোনা যায়।

—বয় এরতিছে তোর?

দাদআলী মেয়ের মাথায় হাত রাখে।

—হয়, এ্যান্নেই যদি হালুম মাইরে লাফায়ে পড়ে?

—সেই লাইগে তো আমরা সারারাইত আগুল জ্বালায়ে রাহি।

—তুমি যহন এহেকালে জঙ্গলের মধ্যে যাও তোমার বয় এ্যারে না বাফ?

—এক ফোঁটাও না। বয় এ্যারবে ক্যান? সাতে কুড়োল দেহিস না। এক কোপে দেবো সাবাড় বানায়ে।

—যদি ফাছে রথে লাফায় পড়ে। না বাবো তুমি আর মেলা জঙ্গলে যাইরো না।

—তুই এ্যান্নে শো। চোখ বোজ।

ঘুম আসে না ঝোরার। মনটা লটকেরা হয়ে ওঠে। এমন রাতে মোহিত কাছে থাকলে ভালো লাগত। বাঘের গর্জনের সাঙ্গে সাঙ্গে মোহিতের বুকে মুখ লুকিয়ে রোমাঞ্চিত হতে পারত। উলটে ঘুমে মাঝে মাঝে চোখ জড়িয়ে আসে। আবার জেগে যায়। অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ঝোরা। কালকে নদীর ঘাটে করিম সর্দার ওকে গভীর চাউনিতে দেখছিল। মাউপপার মতো থম ধরা ছিল সে দৃষ্টি। করিম সর্দারকে মন থেকে তাড়াতে চাইল ও। বাইরে আগুনের কুণ্ডুলি জ্বালে। একজন সারারাত পাহারা দেয়। নিভে আসা আগুনে আবার শুকনো কাঠ গুঁজে দেয়। দাউ দাউ করে ছড়িয়ে যায় লুক্কা।

বাইরে গাছের ছায়া কাঁপে। হরিণের নরম পায়ের শব্দ ভাসে। হুতুম পাখি অকস্মাৎ ডেকে চুপ করে যায়। বাতাস বয়ে যায় সুন্দরী গাছের গাল ছুঁয়ে। ঝোরা ঘুমুবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দাদআলীর নাক ডাকার শব্দ শোনা-যায়। গভীর বনের জোড়বিহীন পাখির মতো নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে ঝোরার বুকের তল। পানি খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওঠে না। ভয় লাগে। বাঘের ডাক অনেক দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি কোথাও বনমোরগ ডানা ঝাপটায়। মোহিত আগামীকাল আসবে। ঝোরা স্বপ্ন দেখে। আস্তে আস্তে আগুনের শেষ নীল শিখা হয়ে ঝোরার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে।

সকালে উঠে দাদআলী কাজে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় দুপুরের খাবার। সারাদিন আর ফিরে আসে না। সন্ধের পর ঘরে ফেরে। সমস্তবেলা ঝোরা একলা। প্রায় এক'শ জনের মতো ওরা ক্যাম্প করে আছে। এদের কাজের তদারক করে করিম সর্দার। পুরুষরা চলে গেলে ছাউনিগুলো ঝুম মেরে থাকে। ভোরে উঠে বনমোরগ জবাই করে দিয়ে গেছে দাদআলী। ঝোরা বসে বসে পালক ছাড়ায়। তাড়াতাড়ি রান্না সারতে হবে। আজ মোহিত আসবে।

সর্দার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কী এরিস ঝোরা?

—দেখতি ছো না!

—পাতিছি তো। তেমু তোর থাইয়ে শুনতে বালো লাগে।

ঝোরা উত্তর দেয় না। ও জানে করিম সর্দার কী চায়। ইশারায় ইঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে সে কথা প্রকাশ করে। কী করে একটুখানি রেইশকামি করবে সে চেষ্টায় থাকে। মাঝে মাঝে 'করিম সর্দারের চক্‌চকে চোখে চোখ পড়লে শীতল হয়ে আসে গায়ের রক্ত। তখন কিছুই ভালো লাগে না ওব। কয়রা নদী সাঁতরে চলে যেতে সাধ হয় মোহিতের কাছে।

করিম সর্দার ওর সামনে উবু হয়ে বসে।

—এই ঝোরা?

—কী?

—চল তোরে নয়ে পাহি মাইরে আসি। মেলা জঙ্গলে যাবনে?

—ইহ্ আউস কতো!

—কেন আউস থাকবে না ক্যান?

—যাও ঢং দ্যাহায়ো না।

—তুই আমারে বড্ড চটায়ে দিস? একদিন মজা দ্যাহাবো।

—দ্যাহায়ো।

—বড়ো ত্যাজ তোর।

—থাকবেই তো। সব ত্যাজ কী তোমার একার?

—আচ্ছা আমিও দ্যাখবো।

করিম সর্দার উঠে চলে যায়। তার ক্রুদ্ধ পদক্ষেপ বনান্তরে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভেঙে পড়ে ও। আশ্চর্য মেয়ে ঝোরা। কালো ছিপছিপে বাঁকানো দেহটা পদাবলি গানের মতো। সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি যমুনার কালো জলে বেসামাল ঢেউ। সে কারণেই ওর প্রতি আকর্ষণ দুর্বার। শলপির মতো সৌন্দর্যে বনের ছায়ার স্নিগ্ধতা জড়িত। হাসতে হাসতেই ও শুনতে পায় কয়রা নদীর বুক চিরে ছুটে আসা লঞ্চের ভেঁপু।

পানি নিয়ে যখন মোহিতের সঙ্গে ফিরে আসে তখন বেলা অনেক হয়েছে। পাখির ডাক কমে গেছে। গাছের ছায়ায় নরম রোদ। পায়ের নীচে থোপ থোপ ঘাস। মোহিতের কাঁধের ওপর ঝোরার কলসি। কখনো হলুদ পাতা টুপ করে মাথার ওপর ঝরে পড়ে। মোহিত এলেই সেদিন ঝোরার প্রাণটা নদীর মতো কল্‌কল করে ওঠে। দু'জনে হাসতে হাসতে হাঁটে। কাঠ কাটার মৃদু শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। বাবার কথা মনে হয় ঝোরার।

কলসিটা ঘরে রেখে দুজনে আবার বেরিয়ে পড়ে। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরী গাছের ছায়া। বুচিলতা পা জড়িয়ে ধরে কখনো। মোহিতের হাতে ঝোরার হাত। ঝোরার পায়ে হরিণীর লঘু গতি।

—জানো, তোমার সাতে যহন বনের মদ্যি দিয়ে আটি তহন বনডারে একালে বাসা বাড়ির মতো মনে অয়। এল্লা এল্লা হাঁটতি গেলে মনের মদ্যি সুমসুমি থাহে।

তুমি এল্লা হাঁটিও না কহন ও। মনে কতো বয়।

—যা বয় কী? আমারে দেইহে পহিকুলি পলায় যায়। ভুঁড়ো শিয়েল ফারাকতে চাইয়ে দ্যাহে। আর লকারু? ওডার কতা কী আর কমু?

খিলখিলিয়ে হাসে ঝোরা।

—আর বাঘ?

—বাঘ? থমকে যায় ও।

মোহিতের হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। খসখসে গলায় বলে, বাঘ এ তাবৎ এট্‌টাও চোহি পড়েনি। রাইত কালে গোঙ্গাতি শুনেছি।

—বাঘ যদি হালুম মাইরে লাফায়ে পড়ে?

—ও বাবো!

ঝোরা দু'হাতে মোহিতকে জড়িয়ে ধরে। মোহিত হো হো করে হাসে। নরম গালে চুমো দেয়।

—বাঘের নাম শুনেই ফ্যালায়ে ফেড়। দেখলি না জানি.....

—তুমি খালি খালি বয় দেহাও।

ঝোরা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। মোহিত ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। দূরে বসে থাকে ঝোরা। পাতার আড়ালে কিচকিচিয়ে ওঠে একঝাঁক মনচুঙ্গি। দুজনেই অবাক হয়ে দেখে। বাঁকা ছোটো ঠোঁটের পাখিগুলোর মাথার রং হালকা নীল ও লালচে। লেজের গোড়া গাঢ় বেগুনি, দেহের ওপরের বাকি অংশ টুকটুকে লাল। গলা, মাথা ও বুকে লাল, বেগুনি ও খয়েরি রঙের অপূর্ব মিশ্রণ। বুকের কিছু অংশ ও পেট চকচকে হলুদ। মোহিতের মনে হয় ওই একঝাঁক পাখি ওর সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে।

মোহিত ঝোরার দিকে তাকিয়ে হাসে।

—জানো ঝোরা পুরুষ মনচুঙ্গিগুলো কিন্তু মাইয়ে মনচুঙ্গিগুলোর চাইতে বেশি সুন্দর। ঝোরা কিছু বলে না। জিভ দেখিয়ে ঠোঁট ওলটায়। মোহিত উঠে গিয়ে ওর পাশে বসে।

—দ্যাখো ঝোরা বাবো কলি খমায় খমায় বিয়ের দিন পাছইয়ে দিল। এমলায় মাসে দুইবার

আসার জন্যে দিন গুনতে বালো ঠেহে না। মাঝে মাঝে মনে কয় তোমারে একদিন লঞ্চে উটোয়ে লয়ে রওয়া দিই। থাক বাবো, থাক বিয়া।

—এদিকে বাফের তো খাটতি পরান যায়। জানো এক একদিন বাফ কেওড়া গাছ কাটতি মেলা দূরের জঙ্গলে যায়।

—মানা এরতি পারো না।

—শুনলি তো?

—বিয়াতে না অয় আলো আর বাজি না ফোড়ালাম। বাফের কতা মতো এ্যান্নাস্ত ছয় মাস বাকি। মনে অয় ছয় আজার বছর।

—আমারই বুজি ভালো ঠ্যাহে ছাই।

—ঝোরা?

—কী?

—যাবা আমার সাতে?

—উঁহু।

—এই না কলে......

ঝোরা হাত দিয়ে মোহিতের মুখ চেপে ধরে। চোখ ছলছলিয়ে আসে। বাফ বড্ড কষ্ট পাবে।

ঝোরার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিতের নেশা ধরে যায়।

কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ঝোরার দৃষ্টি। মেঘের ছায়ার মতো জোলো।

ঝোরার গায়ের চিত্রগন্ধ মোহিতকে পাগল করে তোলে।

—আমি তোমারে মন লাগাতি চাইনি। এমনি কলাম।

ঝোরার গালে ঠোঁটে মাথায় লুটিয়ে যায় মোহিতের সকল আকাঙ্ক্ষার বুনো রোদ। ঝোরা যেন এক বিশাল সুন্দরবন। কয়রা নদী যাচ্ছে সবুজ বনের শরীর ছুঁয়ে। কলকলিয়ে-কলকলিয়ে। ঝোরা এ বনে মাঘ নেই। এ বনে বাঘ থাকে না।

বিকেলে মোহিত চলে গেলে ঝোরার মনটা খারাপ হয়ে যায়। লঞ্চঘাট থেকে একলা ফিরতে গিয়ে করিম সর্দারের মুখোমুখি হয়। বনের সরু পথটা আগলে দাঁড়ায় করিম সর্দার। ঝোরা বিব্রত হয়।

কীরে ভালোবাসার নোক চলে গেল বুঝি।

—তাতে তোমার কী?

—আমার আবার কী? এমনি বাত্তানলাম!

পথ দাও। যাই?

—জেতি না ছাড়ি?

ঝোরা থমকে যায়। লোকটার এ ধরনের হারুমদারুম সহ্য হয় না। কিন্তু এই বনে একলা দাঁড়িয়ে বেশি কথা বলতে সাহস পায় না ও। এক ঝলক হাঁকড়া বাতাস বয়ে যায়।

ঝোরার চোখমুখ জ্বালা করে। মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে।

—চল ঝোরা জঙ্গলের এ বাড়েবতে গুরে আসি।

—আমি গরে যাব।

ঝোরার কণ্ঠ শিথিল। কান্না ছুঁইছুঁই প্রায়। কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

—তোর বয় এতিছে? আচ্ছা যা।

ছাড়া পেয়ে ও একরকম দৌড়ে ছাউনিতে ফিরে আসে। মনে মনে ভয় হয় যে করিম সর্দার ওকে সহজে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই ধরবে। লোকটার দু'চোখ সব সময় সে কথা বলে। কিন্তু

কী করবে ঝোরা? সারা সন্ধ্যা ও শুয়ে শুয়ে কাটায়। আলো জ্বালতে ইচ্ছে করে না। মোহিত আসবে আবার পনেরো দিন পর। কিছুই ভালো লাগে না। সন্ধ্যার অনেক পরে ফিরে আসে দাদআলী। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কুড়ালটা ঘরের কোণে ঠেসে দিয়ে রাখে।

—এত রাত্তির করিছ ক্যান বাফ?

ঝোরার কণ্ঠে অনুযোগ।

—আইজারা মেলা গাচ কাটিছি মা।

দাদআলীর কণ্ঠস্বর ক্লান্ত।

—এমনি এরে নিজেরে শ্যাষ করলি আমি মাতায় বাড়ি দিয়ে মরব। এল্লা পরে তাকতি আমার ভয় ঠ্যাহে না?

—এই তো আর কয়ডা মাস। তায়শিন কাঠ কাটা তো বোন্দ দেলাম বুলে।

বাবার ওপর ক্ষোভটা আজ বেশি। প্রায় চেঁচিয়ে বলে, কবে এসে দ্যাখফা আমি নেই।

দাদআলী হেসে বলে, ক্যান কোবায় যাবি আমারে ফালায়ে।

—যাবো আর কোনআনে। আইলে দেখবা তোমার মাইয়ে বাঘের ফ্যাটে।

আঃ ঝোরা!

—দাদআলী ধমকে ওঠে। কেউ আর কোনো কথা বলে না। দাদআলী হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খায়।

শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। আজকে পরিশ্রমটা বেশি হয়েছে। ভাত খেয়েই শুয়ে পড়ে দাদআলী। চোখ জুড়ে ঘুম নামে একঝাঁক মৌমাছির মতো।

ঝোরার ঘুম আসে না। একলা বিছানায় নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে থাকে। কাঁটাচুয়ার দৌড়ে যাওয়ার শব্দ পায়। পাখির পাখা ঝাপটানিতে বুকের ভেতর কেমন চেপে আসে। মোহিতের কথা মনে হয়। ঝোরার ইচ্ছে নদীর বুক থেকে এক ঝলক হিমানি বাতাস ছুটে আসুক। সমস্ত শরীর কীসের স্পর্শে যেন শান্ত হতে চায়। আনসাটে মনটা সেদিকে এগোয়। বাইরে বাঘ ডাকে। আজ যেন বেশ কাছে। শব্দটা মোটামুটি জোরেই শোনা যায়। ঝোরা বালিশ আঁকড়ে ধরে। বাইরে আগুন জ্বলে। আগুনের গায়ে নীল শিখা দাপায়।

চোখ বন্ধ করলে করিম সর্দারের মুখটা বিরাট আকারে ভেসে ওঠে। লোকটা যখন তখন কাছে এসে দাঁড়ায়। ঝিলিমিলি চোখের তারা এক মুহূর্ত স্থির থাকে না। মাঝে মাঝে ভয় হয় ঝোরার। এখন আর বেসামাল বনের দিকে ছুটে যায় না। বড়োজোর নদীর দিকে গিয়ে বেতি শাক কুড়িয়ে আনে। তাও কী শান্তি আছে? লোকটা ঠিক টের পায় ঝোরার গায়ের গন্ধ।

পিঁপড়ের মতো গিয়ে উপস্থিত হয়। ইদানীং বেশ বেপরোয়াও হয়ে উঠেছে। করিম সর্দার এখন আর কোনো বাঁধে বিশ্বাস করে না। ভেঙেচুরে এগোবার মতলবে আছে। ঝোরা নিজের অজান্তেই বুকের ওপর হাতটা রেখে আঁতকে ওঠে।

এমনি করেই মাস কেটে যায়। যাবার আনন্দ সবার মনে ঘনিয়ে আসে। গত পরশু মোহিত এসেছিল। ও আর আসবে না। দাদআলী অনেক দূরের জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। নদীর তীরে কাঠ এনে জড়ো করা হচ্ছে। সকালে দাদআলী বেরিয়ে যাবার মুখে বলল, আজ কিন্তু মেলা জঙ্গলে যাবো মা। তুই চিন্তে এরিসনে।

—সোয়ালে সোয়ালে ফিরো বাফ।

দাদআলী কুড়াল কাঁধে বেরিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে আশেপাশের সবাই। সবার মধ্যেই হাকবাক ভাব। ফেরার আনন্দ মনে। সূর্যের মৈলকা তাপ তখন বনের মাথায় মাথায় ছড়াচ্ছে। ঝোরার হঠাৎ মনে হয় বনের সেই ফিসফিসানি শব্দটা ও শুনতে পাচ্ছে। বাইরে বেরুবার তাগিদ অনুভব করে।

আর কদিন পরেই এখান থেকে যাবে। এখানকার এই আকর্ষণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঝোরার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেই হাকিযুকির শব্দটা নিজের বুকের মধ্যে পুরে নিয়ে ঝোরা বনের ভেতর হাঁটতে থাকে। পারিপার্শ্বিক ভুলে যায় ও। সুন্দরবনের বিশাল আকাশে সূর্যের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ।

আপন ছন্দে ছুটে চলা যমুনার গতি ঝোরার পায়ে। প্রতি পদক্ষেপে শুকনো পাতা মচমচিয়ে ওঠে। ও কখনো বুনোফুল ছোঁয়। গাছের পাতা ছেঁড়ে। ঘাস তুলে চিবোয়। একঝাঁক লাল-পিঠ ফুলঝরি গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ছোটো ছোটো ফল ঠোঁটে তুলে নিচ্ছে। অসম্ভব অস্থির প্রকৃতির পাখি। নিজের মনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পায় ও। ঝোরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাখিগুলো দেখতে থাকে। পিঠের ওপর মাথা থেকে দেহের শেষপর্যন্ত একটা মোটা টুকটুকে লাল ডোরা। পিঠের বাকি অংশ নীলচে সবুজ ও কালো। দেহের নীচের দিক ঘোলাটে। ঝোরা মনে হয় এর চাইতে ছোটো পাখি ও আর একটাও দেখেনি। পুরো পাখির ঝাঁকটা একটা চমৎকার আনন্দ। পায়ের নীচে কালো পিঁপড়ের কামড়ে চমক ভাঙে। আবার হাঁটতে থাকে ও। লম্বা-লেজ কাটমৌর দেখতে পায় ও এবং সেটার পিছে ধাওয়া করে। কানের কাছ দিয়ে সোনাপোকা উড়ে যায়। মনটা অকারণেই সোনমন করে। কী করবে, কোথায় যাবে কিছুই বুঝতে পারে না। টের পায়নি যে করিম-সর্দার পিছু নিয়েছে। ও ভুলে গেছে করিম সর্দার নামক ভয়ের কথা। ঝোরার লমশমি যৌবনে করিম সর্দারের দৃষ্টি তখন হাবুডুব খায়। মনের বুজবুড়ি রোধ করবে সে তার সাধ্যি!

মনে হয় সেই ফিসফিসানি শব্দটা বুঝি হঠাৎ থেমে গেছে। চারদিকে থমথম করছে। গাছের ছায়ায় দাঁড়ায় ও। মালপুকা বারবার উড়ে এসে গায়ে বসে। ঝোরা এতক্ষণে বুঝে ওঠে যে বনের অনেক ভেতরে চলে এসেছে ও। বাবার কাঠ কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভয়ে ওর থিতুবিতু অবস্থা। নিজের লরখৈগা স্বভাবের জন্যে নিজের ওপর রাগ হয়। ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই একদম করিম সর্দারের মুখোমুখি। করিম সর্দার ওর হাত ধরে।

—অনেকদিনের আউস তোর সাতে একটু জঙ্গলে ঘুরি।

—পথ দাও।

—এজ জাল ক্যান? আয়

—ছাড়ো, ছাড়ো কলাম।

করিম সর্দারের উচ্চ হাসিতে ঝোরার মিহি কণ্ঠ মিলিয়ে যায়।

দাদআলী প্রথমে শুনতে পায়নি শব্দটা। একমনে গাছের গুঁড়িতে কুড়াল চালাচ্ছিল। আর চার-পাঁচ দিন পর চলে যাবে। যত বেশি গাছ কাটা যায় তত লাভ। সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও চলে এসেছে এতদূরে। বাঘটা আবার গরগর শব্দ করে ওঠে। মাটিতে লেজ আছড়ায়। দাদআলীর চমক ভাঙে। সামনের দিকে তাকাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। হাতের কুড়াল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ও।

করিম সর্দারের দু'বাহুর মাঝখানে ঝোরা নীলটুনি পাখির মতো তড়পায় আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তোলে।

—ঠান্ডা অ ঝোরা। চিল্লায়ে কোনো লাভ নেই। আজ তোরে কোনতায় ছাড়ব না। আমার কত দিনকার ইচ্ছা?

ঝোরার চোখে পানি নেই। সে চোখে আগুন। কিছুতেই নতিস্বীকার করবে না ও। কিন্তু গায়ের জোরে কুলিয়ে উঠতে পারে না। করিম সর্দারের গায়ে আজ অসুরের শক্তি।

বাঘটা দু'বার লেজ আছড়ে গাছের কাটা অংশের ওপর সামনের পা দুটো উঠিয়ে দেয়।

দাদআলী মরিয়া হয়ে কুড়ালের এক কোপ বসায় থাবার ওপর। বাঘটা প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আইরা ফুলের ঝোপের আড়ালে করিম সর্দার ঝোরার লমশমি যৌবন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পরিশ্রান্ত ঝোরার মুখের ওপর করিম সর্দারের উমলি নিঃশ্বাস। ঝোড়ো বাতাসের মতো বয়ে যায়। ঝোরা প্রাণপণে কাঠ কাটার মৃদু শব্দ শোনার চেষ্টা করে। কোনো শব্দ নেই। ও একমনে লঞ্চের ভেঁপু আপন অন্তরে শোনার চেষ্টা করে। কোনো ভেঁপু নেই। ঝোরা পাগলের মতো বাইরে-ভেতরে শব্দ হাতড়ায়। কিন্তু কোথাও কোনো ধ্বনি নেই। সব চুপ। পরিশেষে ওব মুখ থেকে ক্ষীণ শব্দ গড়িয়ে পড়ে বা-বা।

বাঘটা তখন দাদআলীর কলজে টেনে বের করেছে।

শব্দভেদ

নন্দিতা বাগচী

পাকানো খবরের কাগজটা ঠক্কাস করে এসে পড়ল দোতলার ব্যালকনিতে। শব্দটা অন্বেষার চেনা। তবে এ শব্দতরঙ্গ ওকে বড়ো একটা বিচলিত করে না। সে ছিল অদ্রিজের। শব্দভেদী ক্ষমতা। ঘুম ঘুম চোখে ঠিক জায়গায় হাতড়ে তুলে নিয়ে যেত কাগজটা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অন্বেষাকে পড়ে শোনাত যত রাজ্যের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, আত্মহত্যা, পথ-দুর্ঘটনা আর ডাক্তার পেটানোর খবর।

গ্রিলের গেটটা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। পাশ ফিরে শোয় অন্বেষা। পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরতে ভালো লাগে। যেন একটা অবলম্বন। নিজেকে সঁপে দেওয়ার মতো একটা নির্ভরযোগ্য জায়গা। ঠিক যেমন আরাম হত অদ্রিজকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে। ঘরের বাইরে সকাল হচ্ছে বুঝতে পারে অন্বেষা। সাইকেলের টিং-টিং। দুধওয়ালা-কাগজওয়ালাদের পরস্পর বাক্যালাপ। কাজের লোকেদের তড়িৎ গতিতে হেঁটে যাওয়া। এসব কিছুরই আলাদা ভাষা আছে। আলাদা ছন্দ আছে। আর আছে শালিক-চড়াইগুলির কিচির-মিচির। অন্বেষার শোওয়ার ঘরে এখনও ঘোর অন্ধকার। মস্-গ্রিন ভেলভেটের পর্দার পিছনে কোরা মার্কিন কাপড়ের লাইনিং।

বছরখানেক হল বড়ো নাইট মেয়ার হচ্ছে অন্বেষার। কখনও মনে হয় যেন জলে ডুবে যাচ্ছে। নয়তো অনেক উপর থেকে পড়ে যাচ্ছে কিংবা কেউ তাড়া করছে। অদ্রিজ বলত, পেট গরম হচ্ছে। রাতে হালকা খাবার খেও। ঘুম ভেঙে গিয়েও কেমন আতঙ্কিত হয়ে থাকত অন্বেষা। শুধু বলত, "অদ্রি আমাকে জাপটে ধরো, আমার বড়ো ভয় করছে।" অদ্রিজের বেষ্টনের উত্তাপটা বেশ একটা অভয় দিত ওকে। যে কোনো বিপদ থেকে মুক্ত করার একটা প্রতিশ্রুতি।

দরজার বেলটা বাজছে অস্থির সুরে। এবার উঠে পড়তেই হয়। নইলে 'নট ফাউন্ড' স্ট্যাম্প পড়ে যাবে। তর্কেও ওদের সঙ্গে পেরে ওঠে না অন্বেষা।

—দিদি কী রাতে দেরি করে শুয়েছিলেন? অনেকক্ষণ হল বেল বাজাচ্ছি।

অন্বেষা জানে বেলটা কতক্ষণ বেজেছে। কিন্তু বচসায় যায় না। কথায় কথা বাড়বে। ওদের কথা-গাছের গোড়া কেটে দিয়েছিল অন্বেষা প্রথম দিনেই। অন্বেষার ভাসুরঝি বুড়িয়ার ঠিক করে দেওয়া ঠিকে কাজের লোক ওরা। বুড়িয়ার মতোই প্রথম দিন ডেকেছিল "ছোটো মা"।

—না-না, ওসব মা, কাকিমা, মাসিমা, বউদি বলবে না আমাকে। দিদি বলে ডাকবে।

ওদের দু'জনার দু'-জোড়া চোখের আলাপ নজর এড়ায়নি অন্বেষার। জানে অন্বেষা, তার ছোটো করে কাটা চুল, তার পরিধেয় প্যান্ট-শার্ট, শর্ট-কুর্তার নেকলাইনের বোতামহীন স্লিট ওদের কাছে বিষম আলোচ্য ব্যাপার। তার উপরে পঞ্চাশোর্ধ্বাকে দিদি বলে ডাকা! এ অঞ্চলে তার বয়েসীরা মাসিমা-কাকিমা। তাঁতের শাড়ি পরেন তাঁরা। হাতে শাঁখা-পলা। সিঁথি জুড়ে পরতে পরতে জমা সিঁদুর।

ক্রিসমাসের সময়টায় মাসখানেকের জন্য দেশে আসে অন্বেষা। বরাবর। অদ্রিজও অসম্ভব দেশপাগল ছিল। ওদের বন্ধুরা ছুটিতে কত জায়গায় বেড়াতে যায়। ইউরোপ, সাউথ আমেরিকা, ইস্ট আফ্রিকা, পলিনেশিয়া। কিন্তু অদ্রিজের প্রাণভোমরা পঞ্চসায়রে। বাইপাসের ধারে গড়ে ওঠা টাউনশিপ। বুড়িয়ারা যখন ফ্ল্যাট কিনল তখনই ছোটকাকে খবরটা দিয়েছিল। এন-আর-আইদের জন্য একটা ল্যান্ড ডেভেলপ করা হচ্ছে। পাঁচ-ছয় কাঠার একেকটা প্লট। বাড়ির সামনে-পিছনে বাগানের বন্দোবস্ত। পিচ বাঁধানো রাস্তা। রাস্তাগুলির ফাঁকে ফাঁকে তেকোণা-চৌকোণা ঘাসের লন। কেয়ারি করা ফুলের বাগান। জাপানি রক গার্ডেন। তার ভিতরে টেরাকোটার ভাস্কর্য। গ্রাম্য কুকুরগুলিকে সৎকার করে তৈরি হয়েছে লেক। লেকগুলির ধার বরাবর পামগাছের সারি। অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপিং। কাছেই বড়ো বড়ো হাসপাতাল। আধুনিক যন্ত্রপাতি। বিলেত থেকে পাস করা ডাক্তার। সোনায় সোহাগা একেবারে।

একমাসের ছুটিতে দেশে এসে অদ্রিজ পাক্কা বাঙালিবাবু হয়ে যেত। বাংলা কাগজ পড়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লুঙ্গি পরে থলে হাতে নিয়ে বাজারে যেত। বাজার থেকে ফিরেই হইচই লাগিয়ে দিত। পুঁটিমাছগুলি সর্ষে-বাটা দিয়ে রান্না হবে। কুমড়ো ফুলের বড়ায় যেন একটু চালবাটা পড়ে। লাউডগাগুলি সুতো দিয়ে বেঁধে ভাতে দিতে হবে ইত্যাদি। রিকশা চড়ে খুঁজে বেড়াত পাটুলি-গাঙ্গুলিবাগান-বাঘাযতীন। পাড়া-বেপাড়ার লোকেদের ডেকে গল্প করত। নীল সায়রের ঘোলা জলে ঝাঁপাঝাঁপি করত বস্তির বাচ্চাগুলির সঙ্গে। সম্ভব হলে এবাড়ি-ওবাড়ির ছাদ থেকে কুলের আচারও চুরি করত হয়তো। অথচ হিথরো এয়ারপোর্টে নেমেই সে অন্য মানুষ। চলনে-বলনে একেবারে সাহেব তখন।

অদ্রিজের অনুপস্থিতিটা সহ্য করা কষ্টকর। তবে একা হলেও অবলা নয় অন্বেষা। লন্ডনের ন্যাটওয়েস্ট ব্যাঙ্কে কাজ করে। মোটা মাইনে পায়। বন্ধু-বান্ধবও অনেক সেখানে। দেশেও কী কম আপনজন? আত্মীয়-স্বজন, ছোটোবেলাকার বন্ধুরা। কোথা দিয়ে যে কেটে যায় একটা মাস। কিন্তু এবার ছুটিতে আসা ইস্তক বড়ো নিঃসঙ্গ লাগছে অন্বেষার। একা ওদেশেও লাগে। তবে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। বাড়িতে ফিরেও ঘরের কাজ। টুকটাক রান্নাবান্না, জীবনধারণের জন্য। এখানে অখণ্ড অবসর। তার উপরে বুড়িয়ার খবরদারি,

—ছোটোমা, কটা দিন বিশ্রাম নাও। ওদেশে তো নিজের করো সব।

তাই ওর বহাল করা কাজের লোকেদের উপরেই সংসারের হাল এখন। তাদের গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর। বাসনপত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দে আছড়ে পড়া। ধপাস্-ধপাস্ কাপড় কাচা। শব্দগুলি বাড়িটাকে ভরিয়ে রাখে বেশ। ওরা বেরিয়ে গেলেই শুরু হয় সূর্যগ্রহণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কালো রং এসে গ্রাস করতে থাকে অন্বেষাকে। সেই কৃষ্ণ-গহ্বরে হাবুডুবু খেতে খেতে দিনটা পেরোতে সময় নেয় বড়ো। এই মুহূর্তগুলিতে, বিশেষ করে পঞ্চসায়রের এই খাঁ-খাঁ করা, কাক ডাকা দুপুরগুলিতে অদ্রিজের কথা মনে হয় খুব।

আজ বুড়িয়া আসবে। গড়িয়াহাটে নিয়ে যাবে অন্বেষাকে। দর্জির কাছে ব্লাউজ তৈরি করতে দেবে। পেটিকোট কিনবে। শাড়িগুলি গত সপ্তাহেই কেনা হয়ে গিয়েছে। মার্কেটের ভিতরেও ঢুকবে একটু। তালদির গুড়ওয়ালাকে পাটালি গুড়ের অর্ডার দেবে। ছোটো এক হাঁড়ি নলেনগুড়ও কিনবে এখানকার জন্য। এ ছাড়াও অনেক অর্ডার আছে। অর্চনাদির জন্য একটা ছোটো হামানদিস্তা নিতে হবে। পম্পার বাচ্চাটার জন্য দুলালের তালমিছরি। মশলাপাতি আর নিয়ে যেতে হয় না এখন। লন্ডনের আশেপাশে প্রচুর ইন্ডিয়ান গ্রসারি স্টোর। বুড়িয়ার বর তো গতবছরে বাংলাদেশি দোকানের ইলিশ খেয়ে বলেই ছিল এত ভালো ইলিশ মাছ কলকাতায়ও নাকি খায়নি কখনও।

ঋতি এসেছিল কাল। ওর মস্ত গাড়ি নিয়ে। মেটালিক গ্রে গাড়িতে সাদা আপ হোলস্ট্রি। ইউনিফর্ম পরা সোফার। অন্বেষাকে নিয়ে স্যাটার ডে ক্লাবে গিয়েছিল। কিটি পার্টি ছিল ওদের।

রামি খেলল ওরা পয়সা দিয়ে। অন্বেষাকেও জোরাজুরি করেছিল ঋতির বন্ধুরা। অন্বেষা তাস খেলতে জানে না। সময়ই পায়নি জীবনে। পড়া শেষ হতেই বিয়ে। বিয়ে। বিয়ের পরেই চাকরি। ওদেশে আর কে ঘরে বসে থাকে। সক্কাল বেলা গাড়ি নিয়ে টিউব স্টেশন। তারপর টিউব ট্রেনে অফিস। গাড়িটা থাকে পার্কিং-এ। সন্ধেবেলায় ফেরেও ওই একই রুটে। বাড়ি থেকে অফিস বাইশ মাইল। রোজ-রোজ অত পেট্রোল পোড়ানোর পয়সা নেই ওর।

অন্বেষার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কাল। আগাগোড়া দেশে থেকেও ঋতিরা বড্ড স্মার্ট। কী দারুণ একটা শাড়ি পরেছিল ঋতি। হালকা গ্রে ক্রেপসিল্কময় কালো কাপড়ের পাড় বসানো। পাড়ে হালকা-গাঢ় গ্রে সুতোর কাজ। ছোট্ট একটা কালো ব্যাগ বগলে। সরু হিলের কালো জুতো। কালচে র‍্যাসবেরি পিঙ্ক লিপস্টিক। অন্বেষার ইংল্যান্ডবাসের গরিমা যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছিল ওদের পাশে। কবেকার একটা সবুজরঙা পাটোলা সিল্ক পরেছিল অন্বেষা। চওড়া হলুদ পাড়। ইস্তিরিও ছিল না ঠিকমতো। জরিগুলি কোঁচকানো। পায়ে ড. স্কল জুতো। কাঁধে একখানা ঢাউস মাইক্রোফাইবারের ব্যাগ। তার ভিতরে রাজ্যের জিনিসপত্র। কাগজ-কলম, পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, হেল্‌থ ইনসিওরেন্স কার্ড, ছোটো একটা জলের বোতল, টিস্যু পেপার, কিছু ওষুধপত্র, সর্বোপরি হাজারটা কুচো কাগজে লেখা নানারকম লিস্ট। যেন মোবাইল ক্যাবিনেট একখানা। ভোদকাটা রিফিউজ করার সময় একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কাজ করছিল ওর মনে। ইংল্যান্ডে একটু আধটু ওয়াইন খেতে শিখেছে অন্বেষা। কিংবা জিন অ্যান্ড লাইম। কখনও-সখনও সানডে লাঞ্চে শ্যান্ডি। ঋতিরা কত স্মার্ট।

লাঞ্চের পর অন্বেষাকে নিয়ে নতুন শপিং আর্কেডগুলি ঘুরিয়ে দেখাল ঋতি। পশ্চিমী ধাঁচের নতুন মিউজিক স্টোর, বুক স্টোর। কিছু সিডি আর বই কিনল ঋতি। রবিশঙ্কর ও আমজাদ আলির দুটো সিডি প্রেজেন্ট করল অন্বেষাকে। বিকেলে বাড়ি ফেরার আগে ফেস লিফটিং করা ফ্লুরিজ-এ নিয়ে গিয়ে অন্বেষার প্রিয় দার্জিলিং টি আর পেস্ট্রি খাওয়াল। ও আর ওর বর নাকি প্রায়ই আসে এখানে। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল অন্বেষা। ঋতির গাড়িটা অদৃশ্য হওয়ার পর ফিস্‌ফিস করে বলল,—ইয়েস ঋতি, ইউ আর দ্য উইনার। তুই তো তা-ই জানতে চেয়েছিলি আজ। আমি তোকে আজ একশোতে একশো দিলাম ইন এভরি রেসপেক্ট। শুধু তোর বরের কথাটা অত না বললেও পারতিস।

দরজাটা খুলে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়েছে অন্বেষা। রাতে ভালো ঘুম হয় না আজকাল। এত ফাঁক এদিকটা, কেমন যেন ভয় ভয় করে। জমিটা কেনার সময়ে এসব কথা মাথায়ই আসেনি। তখন যে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল পাশে। ভবিষ্যৎটা আর কতটুকু দেখতে পায় মানুষ। ইনসিওরেন্স কোম্পানি আর ইনভেস্টমেন্ট সংস্থাগুলি যতটুকু দেখান, ততটুকুই। জ্যোতিষাচার্যরাও কিছুটা দেখান বটে। তবে সেখানে আবার বিশ্বাস- অবিশ্বাসের তুল্যমূল্য। তরাজুর দোল।

বেডসাইড টেবিলে পড়ে থাকা চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কাপটা নিয়ে যায় ঝুমা। আবার নতুন করে চা বানিয়ে রেখে যায়,

—দিদি উঠুন, চা-টা খেয়ে নিন। আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

'লপচু'-এর লিকার চুম্বকের মতো টেনে নিল অন্বেষার ডান হাতখানা। যেন অসংখ্য লৌহচূর্ণ দিয়ে গড়া তার হাত। মস্ গ্রিন ভেলভেটের পর্দা, পেস্তা গ্রিন ঘরের দেওয়াল। মাথার দিকের দেওয়ালে শাল-সেগুনের ওয়াল পেপার। চোখ বুজে চায়ে চুমুক দেয় অন্বেষা। চা খেতে খেতেই কখন যে শুকনার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে অন্বেষা। সাদা টয়োটা কোয়ালিস। নেপালি ড্রাইভারের আদব-কায়দা। আর বেআদপ অদ্রিজের বেপরোয়া প্রেম। কালি ঝোরার উচ্ছল তিস্তার সঙ্গে নির্লজ্জ হুটোপুটি। গতবছরের সাতান্নতেও সে ছিল সতেরোয়।

—দিদি, বিছানা ঝাড়ব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হাউসকোটটা পরে নেয় অন্বেষা। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসর থেকে নেগ্লিজে নাইটগুলি কিনে দিত অদ্রিজ। ওগুলি পরে আর কারও সামনে যাওয়া যায় না। পায়ে চপ্পলটা গলিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। বারান্দাটার দৈর্ঘ্য বরাবর একটা ঝুলন্ত ফ্লাওয়ার বেড বানিয়েছিল অদ্রিজ। নিজে হাতেই খোঁড়াখুঁড়ি করত। এবারে কাস্টমসকে লুকিয়ে কিছু টিউলিপ আর ড্যাফোডিলের বালব নিয়ে এসেছে অন্বেষা। যেমন নিয়ে যায় এখানকার রজনীগন্ধা। পটলগুলিকেও খবরের কাগজে মুড়ে, প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরে চালান করে দেয় শাড়ি-জামা-কাপড়ের গভীরে। দমদমে, হিথরোতে, গ্রিন চ্যানেল পেরনোর সময়ে মুখে নিপাট ভালোমানুষের মুখোশ।

এখানে এসেই টিউলিপের বালবগুলিকে পুঁতে দিয়েছিল অন্বেষা। প্রয়োজনীয় সার-টারও দিয়েছিল। রোজই উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে সকাল-বিকেল। পাতা ছাড়ল কী না। হয়তো অঙ্কুর গজাবে না। গাছ-পালা, জীব-জন্তু আবহাওয়া নির্ভর। সব দেশের জলহাওয়া সয় না ওদের। সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায় কী কাণ্ডটাই না করছে পোলার বেয়ারগুলিকে এনে। এয়ার কণ্ডিশন করে ফ্রিজিং পয়েন্টে নামিয়েছে টেম্পারেচার। বরফের চাঙড় দিয়ে সাজিয়েছে হ্যাবিট্যাট। শুধু মানুষই বোধহয় হ্যাবিট্যাটের পরোয়া করে না। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তই গমনার্হ তাদের জন্য। নাকি নিজেদের মতো করে হ্যাবিট্যাট তৈরি করে নিতে জানে তারা? ইলিশমাছ-রসগোল্লা-সর্ষো কা শাগবাটাটা বড়া-ইডলি উত্তপম পূর্ণ হ্যাবিট্যাট।

—দিদি, জলখাবার দেব? আমাদের সব কাজ হয়ে গিয়েছে।

বাস্তবে ফেরে অন্বেষা। ঝুমার পায়ের শব্দে কী দাঁত কিড়মিড়ানির আওয়াজ ছিল?

—দাঁড়াও, ব্রাশ করে আসছি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাওয়ার টেবিলে এসে বসে অন্বেষা। সুগন্ধি কামিনী চিড়ে দিয়ে পোলাও তৈরি করেছে নয়ন। নিশ্চয়ই বুড়িয়ার প্রেস্‌ক্রিপশন। মেয়েটা প্রায়ই বলে,

—অত পাউরুটি খাও কী করে তোমরা? পেটে চড়া পড়ে যায় না?

চিড়ের পোলাও এর সঙ্গে 'লপচু'-এর লিকার। বড়ো মগে। বেশ জমাট ব্যাপার। পাশে বাংলা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখা। কাগজটা খুলে চায়ের কাপে চুমুক দেয় অন্বেষা। খুঁটে খুঁটে কিসমিস, বাদাম, কড়াইশুঁটি খায়। তেজপাতা দুটো চেটে প্লেটের পাশে সরিয়ে রাখে। নয়ন টেবিলের পাশে ঘুরঘুর করছে। অন্বেষা জানে প্রশস্তির জন্য প্রতীক্ষমান উপস্থিতি ওটা। যেমন অদ্রিজ বুঝে ফেলত কোনো নতুন ক্যুইজিন টেবিলে থাকবে। মুখভর্তি চিড়ের পোলাও নিয়ে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে দেখায় ও। ভুরু দুটো তুলে, চোখ দুটো বড়ো করে মাথা নাড়ে। কেব্‌ল টিভি দেখে দেখে এমন জেশ্চারে এখন অভ্যস্ত নয়ন-ঝুমারা।

ব্রেকফাস্টটা খেয়ে ফেলার পর দারুণ অপরাধবোধ হয় অন্বেষার। ও খুব স্বাস্থ্য সচেতন। ক্যালোরি মেপে খায়। জিমে যায়। হাঁটে। অদ্রিজ হাঁটত একেবারে উল্টোপথে। ওসব ডায়েট-ফায়েট নিয়ে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ছিল না। যা প্রাণ চায় খেত, যা মন চায় করত।

কাগজটার এপাতা-ওপাতায় চোখদুটো ছুটিয়ে নিয়ে যায় অন্বেষা। নিত্যকর্মের মতো। যেন একটা রিচ্যুয়াল। মিনিট পাঁচেকের সময় যাপন। পাত্র-পাত্রী কলামে হটাৎ আটকে গেল ও। পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কেউ। বাষট্টি বছর বয়স। রিটায়ার্ড সরকারি অফিসার। উচ্চতা পাঁচফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। দোহারা চেহারা। মাথার চুল পাতলা। শারীরিকভাবে সক্ষম। অটুট কৌমার্য। এনআরআই চাকুরে পাত্রী চাই।

ভীষণ হাসি পায় অন্বেষার। কী শখ! সারা জীবন অটুট কৌমার্য নিয়ে বসে থেকে বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরল? আবার আব্দার দেখ! এনআরআই পাত্রী চাই। তাও আবার চাকুরে! বেচারা। হয়তো বিদেশ দেখার শখ হয়েছে। রিটায়ার করে যা পেয়েছেন সে টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জে কনভার্ট করলে কটা ডলারই বা পাবেন! নাকি পরিবারের বড়ো ভাইয়ের কর্তব্য করে করে ক্লান্ত? খুঁটি

উপড়ে ফেলে পালাতে চান নাগালের বাইরে? তবে যা ভেবেই অ্যাডটা দিয়ে থাকুন, এলেম আছে ভদ্রলোকের। বেশ দূরদর্শীও মনে হয়। কিন্তু এমন অর্ডারি মালটা উনি পাবেন কোথায়! রিটায়ার করা বুড়ো বেকার বরকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে চাপিয়ে ব্রিটেন কিংবা আমেরিকায় নিয়ে ঝোল-ভাত রেঁধে খাওয়াবে তার চাকুরে বউ? ইমপসিবল! ওদিকে সবই তো নেগেটিভ। পজিটিভের পাল্লায় একমাত্র অটুট কৌমার্য। অবশ্য হিন্দু পুরাণ-টুরাণে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে এমন দু'একজন মহীয়সীর। কিংবা হলিউডের ওদিকটায়।

ঘণ্টাখানেক ধরে বসে থেকে ওই অচেনা-অদেখা ভদ্রলোকটিকে ভিস্যুয়ালাইজ করার চেষ্টা করে অন্বেষা। কিছুদিন হল এই মজার খেলাটা আবিষ্কার করেছে ও। আহা রে! হয়তো ভাইপোরা দেখে না। হয়তো রিটায়ার্ড খিটখিটে জ্যাঠশ্বশুরকে সহ্য করতে পারে না তাদের বউরা। কিংবা ভাই-বোনেদের দাবি-দাওয়ায় অতিষ্ঠ। নাকি খুব একা ভদ্রলোক? অন্বেষারই মতো। হয়তো সঙ্গি চান একজন। তবে ওই অদ্ভুত কথাটা লিখেছেন কেন? অটুট কৌমার্য! প্রলোভন দেখাতে চান সম্ভাব্য স্পাউসকে? যেমন করে কনজ্যুমার গুডসকে মার্কেটে চালু করার জন্য হাইপড আপ করে কোম্পানিগুলি। মিডিয়ার সাহায্য নেয়। তবে ভদ্রলোক বুদ্ধিমান এবং একা। শেষ লাইনে লেখা আছে বিয়ে করাটা বাধ্যতামূলক নয়।

অনেকটা সময় কেটে যায় অন্বেষার। নিজেকেও আর একা লাগছে না। কাগজে, টিভিতে কোনো একটা ঘটনার কথা, পরিবেশের কথা জেনে কিংবা অচেনা-অদেখা মানুষের কথা শুনে ভাবতে ভারি ভালো লাগে ওর। মনে হয় যেন সেই জায়গাটায় পৌঁছে গিয়েছে ও। মানুষগুলিও রয়েছে ওর পাশেই।

আচ্ছা এই ভদ্রলোকটি দেখতে কেমন হবেন? সৌগতদার মতো? নাকি মিস্টার ব্রাউনের মতো? চোখে চশমা আছে নিশ্চয়ই। বাষট্টি বছর বয়স যখন, বাই-ফোকালই হবে। নাকি মায়োপিক? ছোটো থেকেই হয়তো হাই পাওয়ারের চশমা। ফ্রেমটা কী সোনালি? নাকি আঁতেল মার্কা মোটা কালো ফ্রেম? বাড়িতে হয়তো লুঙ্গিই পরেন। তবে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমার সঙ্গে লুঙ্গিটা ঠিক যাচ্ছে না। ধোপদুরস্থ সাদা পাজামা-কুর্তাও পরতে পারেন। বাঙালি যখন, স্মোকও করেন নিশ্চয়ই। কে জানে পান-জর্দা চিবিয়ে যেখানে সেখানে পুচুত করে পিক ফেলেন কি না।

আচ্ছা এতসব নেগেটিভ কথাই বা ভাবছে কেন অন্বেষা? এমনও তো হতে পারে যে ভদ্রলোক একজন দারুণ স্মার্ট রিটায়ার্ড আইএএস অফিসার। বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। অমিতাভ বচ্চনের মতো চেহারা। হঠাৎ শব্দ ব্রহ্মের আদেশ যেন বাজতে থাকে কোথাও। অদ্রিজের শব্দভেদী ক্ষমতারও ছোঁয়াচ লাগে অন্বেষার স্নায়ুতে। হেমন্তের ওক-মেপলের মতো রং বদলাতে থাকে অন্বেষা। হলদে-কমলা-লাল। ওর খিন্ন মনও কলকল করে উঠে মন্দিরা বাজায়। ঝটপট বুড়িয়াকে ফোন করে একটা।

—আজ শরীরটা ভালো লাগছে নারে। কাল যাব গড়িয়াহাটে।

—কী হয়েছে ছোটো মা? শরীর কী বেশি খারাপ লাগছে? আমি আসব?

—না রে পাগলি। অত অস্থির হোস না। কাল সারাদিন পার্কস্ট্রিটে ঘোরাঘুরি করেছি তো। একটু টায়ার্ড লাগছে। একটা দিন রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ নিজেকে খুব স্মার্ট মনে হল অন্বেষার! ঋতির চাইতেও বেশি। অদ্রিজও বলত, ভালো কাজের ডিসিশন নিতে দেরি করবে না। টেলিফোনের হ্যান্ড সেটটা হাতে নিয়ে বসে থাকে ও। অ্যান্টেনাটা আলতো করে চিবোয়। কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ করেই টেলিফোনের নম্বরগুলি টিপতে থাকে।

—আমি অন্বেষা বলছি। আপনার অ্যাডটা পড়লাম। আমি ইংল্যান্ডে থাকি। ব্যাঙ্কে কাজ করি। চুয়ান্ন বছর বয়স। স্বামী মারা গিয়েছেন আটমাস হল। আমরা কী আজই কোথাও দেখা করতে পারি?

যুধিষ্ঠিরের বোন

পূরবী বসু

ভিড় ঠেলে নামনে যাবার সাহস নেই জরিনার, দূর থেকেই সে দেখতে পাচ্ছে সব।

মোতালেবের শব ঘিরে তখনও আত্মীয়স্বজনের আহাজারি শুরু হয়নি। সকালের ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনার খবর বাড়ির লোক্‌দের আগে কর্মস্থলেই পৌঁছেছিল। মোতালেব আর এখলাসের মৃতদেহ পাশাপাশি রাখা ছিল হাসপাতালের বারান্দায়। জরিনার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কাছে গিয়ে দেখে সত্যি সত্যিই মোতালেব মরেছে কিনা। সাহস হয়নি। তাকে নিয়ে গতকাল থেকে কারখানায় যে কানাকানি, ফিসফিস, তারপরও যে হাসপাতালে এসেছে সে, এটাই যথেষ্ট। জরিনা ভেবে পায় না কেমন করে সম্ভব হয় এটা। মাত্র চল্লিশ ঘন্টা আগে যে লোকটা তাকে এমন করে বাঁচার কথা বলেছিল, যার হাতের উত্তাপ এখনও তার বুকে লেগে আছে, মুখে লেপ্টে আছে যার কাঁচা সিগারেটের গন্ধ, সে কেমন করে নিথর শুয়ে থাকতে পারে হাসপাতালের করিডোরে। জরিনার বিশ্বাস হয় না মোতালেব মারা গেছে। নিশ্চয়ই বিচার এড়াতে মশকরা করছে মোতালেব। এখুনি হয়ত গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে হা হা করে হাসতে শুরু করবে। কিন্তু ওর মাথার রক্তে ভেজা পট্টিতে তো একটা মাছি ঘুরছে এখন। মোতালেব নাকি তখনও বেঁচেছিল— *ঠেলাগাড়িতে* করে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল তাকে। এখলাস অবশ্য মুখোমুখি সংঘর্ষে সকাল আটটার আগে ঘটনাস্থলেই মারা গেছিল।

ওরা দুজনেই জরিনার সহকর্মী। শুধু কী সহকর্মী? মোতালেব কে ছিল জরিনার? এক বছর আগেও কেউ নয়। অথচ আজ! এই তো গত পরশু ভরা সন্ধ্যাতে মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কী অসম্ভবরকম জীবন্ত ছিল তখন। তারপর জরিনা বাড়ি যাবার পর, দু ঘন্টার মাথায় আবার দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। মাত্র দুটি ঘন্টায় কী ভয়ঙ্করভাবে বদলে গিয়েছিল লোকটি! ভয়ার্ত, পরাজিত মোতালেব কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জরিনার দিকে। বলেছিল, 'তর উপরে সব। তুই যা কবি, তার উপরই আমার মরা বাঁচা।'

অথচ কী আশ্চর্য, জরিনা কিছু বলার আগেই— মুখ খোলার আগেই মরে গেল মোতালেব, জরিনা কী বলত শুনে যেতেও পারল না। কাল অন্যদের সাক্ষ্য নিতে নিতেই সময় কেটে গেল। আজ জরিনাকে ডাকার কথা ছিল। হয়ত মোতালেবকেও আবার। যদিও সবাই বলাবলি করছিল, ওকে আর ডাকা হবে না। অন্যদের দিয়ে তার দোষ প্রমাণিত হয়ে গেলে মোতালেবকে আর দরকার নাও হতে পারে।

হাসপাতালের চারদিকে আজ লোকে লোকারণ্য। পাঁচজন মানুষ মারা গেছে সকালবেলার বাস-ট্রাক সংঘর্ষে। এক মহিলার লাশ ঢেকে রাখা হয়েছে উল্টোদিকের বারান্দায়। তার ছাপা

শাড়ির পাড়ের নীচ দিয়ে লাল টুকটুকে সায়া, তারও নীচে দুটো শ্যামলা পা বেরিয়ে আছে। কে জানে কার বউ— কার মেয়ে। এভাবে হাসপাতালের বারান্দায় মড়া হয়ে শুয়ে আছে এখন। পাঁচ ছ'বছরের ছেলেটির লাশ এখনও বাইরে বের করা হয়নি— ওয়ার্ডের ভেতরেই আছে। ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হচ্ছে। কে জানে বাচ্চাটা এ মহিলারই সন্তান কী না, আরেক বৃদ্ধও নাকি মারা গেছে। আছে এ হাসপাতালেরই কোথাও। জরিনা তাকে দেখেনি। হাসপাতালের বাইরে, বাগানে, খোলা মাঠে, ইতস্তত লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মিলিত কথাবার্তার গুঞ্জনে একটা অদ্ভুত ভারী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। সামনের আম গাছটার ডালে বসে দুটো কাক অনবরত ডেকে চলেছে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপরে। চিরচিরে চৈত্রের রোদ্দুরে গরমটাও পড়েছে বটে। ওপাশের বটগাছের নীচে হাঁটু গেড়ে বসে তিনজন লোক অনবরত সিগারেট খাচ্ছে আর মৃদুস্বরে কথা বলছে। পাতলা কাপড়ে মুখ ঢাকা পিতলের কলসি কাঁখে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরা মেয়েটি ডান হাতে একটা কাচের গ্লাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে খাবার পানি বিক্রি করছে। সিঁড়ির ঠিক নীচেই সাগর আর চাপা কলা বোঝাই একটা ঝাকা নিয়ে বসে আছে এক দাড়িওয়ালা লোক। হাসপাতালের সামনে বারান্দায় এক কোণে বসে চাপা কণ্ঠে বিলাপ করে কাঁদছে এক মহিলা। পাশে কালো বোরখার ভেতর থেকে আরেক মহিলা ও তার পাশে বসা এক লোক ক্রন্দনরত মহিলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

হালিম খুব পানি খেতে চাইছিল। জরিনা যখন ওকে দেখতে গেছে, ওর হুঁশ ছিল না। তার চোখের সামনেই জ্ঞান ফিরে এল হালিমের। চোখ খুলেই পিপাসার কথা বলছিল। হালিমের মাথার সব চুল কেটে দেওয়া হয়েছে। মাথার তিন জায়গায় সেলাই। একটি জায়গা থেকে নাকি সব কাঁচের টুকরো ঠিকমতো বের করতে পারেনি এখনও। ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হালিম জরিনার সঙ্গে প্যাকেজিং বিভাগেই কাজ করে। ছোটোখাটো হালিমকে চুল কাটা অবস্থায় একটি মেয়ের মতো দেখাচ্ছে এখন। মোতালেব আর হালিম নাকি পাশাপাশি বসেছিল বাসের সামনের সিটে। হালিম জানালা ভেঙে বাইরে ছিটকে পড়েও বেঁচে গেছে। মোতালেব গাড়ির ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। মাথায় সামান্য কাটা ছাড়া সারা শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না মোতালেবের। অথচ হালিম ছিল রক্তাক্ত— ক্ষতবিক্ষত। এ সবই অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে শোনা জরিনার। সকালের এ বাসে তাদের ফ্যাক্টরির আট-দশজন আসছিল। তাদের মধ্যে দুজন এখন মৃত। একজন মারাত্মকভাবে আহত। অন্য তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন যে মোতালেবকেই মরতে হল! বিচারের রায়টা পর্যন্ত জেনে যেতে পারল না লোকটা। বড়ো ভয় পেয়েছিল মোতালেব। সে সঙ্গে ভয়ানক রাগও হয়েছিল তার। সবার ওপরেই। চাকরি খোয়া যেতে পারে সে আতঙ্ক তো ছিলই। লোকের চোখে কতখানি হেয় হয়ে গেল এটাও ভুলতে পারছিল না। রাতারাতি জীবনটা পাল্টে গেল বলে আফসোস করছিল। অথচ যদি জানত মৃত্যু এত কাছে ছিল তার! এমন নাটকীয় ঘটনাও ঘটে জীবনে!

ইব্রাহিমই প্রথম নালিশ করেছিল তার বিরুদ্ধে। সে নিজের চোখে দেখেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে ফ্যাক্টরির পেছনের সিঁড়িতে বসে মোতালেব জরিনার বুকে হাত দিয়েছে। জরিনার মুখে চুমু খেয়েছে। জরিনা 'না না' বলে আপত্তি জানালেও মোতালেব জোর করে নিজেকে চাপিয়ে দিয়েছে। ইব্রাহিম ছাড়াও আরও একজন নাকি সাক্ষী দিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। সে ব্যক্তিটি কে জরিনা জানে না। তবে সে নাকি স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনাটা না দেখলেও জরিনার প্রতিবাদের শব্দ শুনতে পেয়েছিল।

কাল বন্ধ অফিস ঘরে সালিশি বসেছিল। এ কারখানায় মেয়েদের নিয়োগের বয়স মাত্র দেড় বছর। তরুণ কিছু কর্মকর্তার উদ্যোগ ও আগ্রহে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদের

পর কর্তৃপক্ষ রাজি হয়েছিল মেয়ে-শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যাপারে। কিন্তু কেবল সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ করে তারা। রাতের ডিউটি দেশের শ্রমনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেয়েদের এখনও দেওয়া হয় না। জরিনার ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পরও সে কেন তখনও ফ্যাক্টরিতে ছিল, এটাও বিবেচনার বিষয়। গতকাল সারা ফ্যাক্টরিতে বিশেষ করে শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে এ ঘটনা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছিল। পুরো ব্যাপারটা বিশেষ স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে কেননা ইব্রাহিম একজন ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার। দীর্ঘ দশ বছর ধরে সে কাজ করছে এ কারখানায়। এখনও স্থায়ী পদ পায়নি পারমানেন্ট হবার সিরিয়ালে তার নাম ওপরের দিকে। মোতালেবের মতো একজনকে সরাতে পারলে তার সমূহ নিয়োগের সম্ভাবনা। ফলে শ্রমিক ইউনিয়নের অনেকের ধারণা এটা একটা ষড়যন্ত্র। ইব্রাহিম মরিয়া হয়ে উঠেছে নিয়োগপত্র পাবার জন্যে। অন্য অনেকে অবশ্য বলাবলি করছে দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী জরিনার প্রতি মোতালেবের আকর্ষণ ও আগ্রহ বহুদিনের। জরিনা প্রথম দিকে একেবারে পাত্তা দিত না মোতালেবকে। ইদানিং অবশ্য কখনও কখনও তাদের একসঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। কিন্তু তাই বলে কারখানায় দাঁড়িয়ে এরকম মেলামেশা। এ ধরনের অনাচার মানা যায় না কোনোমতেই।

কেবল ইব্রাহিম সাক্ষী দিলে এতটা গুরুত্ব পেত না ব্যাপারটা। কারণ সে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার। কিন্তু আরেকজন বয়স্ক এবং স্থায়ী কর্মচারিও জরিনার প্রতিবাদের ভাষা শুনেছে ও ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছে বলে জানিয়েছে। গতকাল বন্ধ ঘরের ভেতর এদের দুজনেরই জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। মোতালেবকেও ডাকা হয়েছিল। বেশিক্ষণ জেরা করেনি। পরে প্রয়োজন হলে আবার ডাকবে বলেছিল।

আর জরিনার কথা বলার কথা। কাল সারারাত ধরে সে মনে মনে গুছিয়েছে কী বলবে। সে জানে তার কথার ওপরেই সব নির্ভর করবে, অন্য যে যাই বলুক না কেন। পরশু রাতে জরিনাদের বাড়ি গিয়ে মোতালেব অনুনয় করে এসেছে তাকে বাঁচাবার জন্যে। 'সব তর উপর নির্ভর করতাছে জরিনা' মোতালেব বলেছি, 'তুই আমারে ফাসাইস না জরিনা।' 'আমি ফাসানের কে? তোমারে কতবার কইছি এইটা কাজের জাগা। রঙ্গলীলার জাগা নয়। এখন ঠ্যালা সামলাও। তোমার আমার দুইজনেরই কাম যাইব।' জরিনা রাগ করেছিল। 'না যাইব না। সব ঠিক অইয়া যাইব। তুই যদি আমার লিগ্যা মিছা কইতে না পারছ, সব অস্বীকার করতে না পারছ, তাইলে সত্য কথাই কইস্। ডরাইস না। আমি তরে বিয়া করুম। কিচ্ছু অইব না আমাগো।' জরিনার কানে মোতালেবের কথাগুলো এখনও বাজছে। জরিনা সত্য কথাই বলবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। তারপর যা হবার হবে।

সেই সন্ধ্যায় অঘটনের কোনো কিছুই হয়ত ঘটত না, যদি না সেদিন জরিনাকে আবার লকারে ফিরে যেতে হত। সকালে যখন কাজে এসেছিল বৃষ্টি হচ্ছিল। লকারে ছাতাটা রাখা ছিল। কাজ শেষে বেরুবার মুখে গেটের কাছে গিয়ে হঠাৎ মনে হল ছাতাটি নিয়ে আসেনি। কাল যদি আবার বৃষ্টি নামে! ছাতাটা লকার থেকে নিয়ে বারান্দায় বেরুতেই মোতালেবের সঙ্গে মুখোমুখি। শিফটিং ডিউটি ছিল তার। সন্ধ্যায় কাজের বিরতিতে চা-নাস্তা খেতে যাচ্ছিল মোতালেব কাফেটেরিয়ায়। কী কুক্ষণেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরশু! মোতালেব ডেকেছিল তাকে। পাশে এনে বসিয়েছিল সিঁড়িতে। তারপর...। তারপর। মোতালেবের আঙ্গুলগুলো যেন আগুন ছেঁকা। মুখগহ্বর তো নয়— যেন জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। সিগারেটের তীব্র গন্ধ ছিল সেখানে।

'কী করো, কী করো।' বলতে বলতে জরিনা চুপ করে গিয়েছিল। চুপ করে গিয়েছিল শুধু আরেকটি মানুষের স্পর্শ দেখে নয়, একটা অভুতপূর্ব শিহরণে সমস্ত শরীর তার নেচে উঠেছিল বলে। আপনা থেকেই মুহূর্তের জন্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। নিজের অজান্তে সে মোতালেবকে

বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে কাছে টেনেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার 'ছাড়ো, আমারে ছাড়ো। কী করো।' বলতে বলতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। ইব্রাহিম ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে। অন্য ছায়াটিও সরে গেছে।

বেলা দুটো বাজার আগেই হাসপাতাল থেকে সকলের সঙ্গে জরিনা আবার ফিরে এল ফ্যাক্টরিতে। ততক্ষণে মোতালেব ও এখলাসের আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করেছে হাসপাতালে। মোতালেবের বৃদ্ধা মা ও ছোটো ভাইটিকে দূর থেকে দেখেছে জরিনা। মা'টা চিৎকার করে কাঁদলেও, ভাইটির চোখ দুটো ছিল শুকনো ও ফাঁকা। জরিনাদের কারখানার বড়ো কর্তারা তখনও হাসপাতালে। পুলিশ রিপোর্ট, ময়নাতদন্ত, আহতদের ঢাকার হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সকলেই খুব ব্যতিব্যস্ত। মোতালেব ও এখলাসের মৃতদেহ যাতে শীঘ্রই তাদের আত্মীয়দের কাছে দাফনের জন্যে দিয়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে তাদের।

এতক্ষণ হাসপাতালে সহকর্মীরা দুই মৃত শ্রমিকের লাশ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। জরিনার দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়নি কেউ। বাসে ওঠার পর আবার শুরু হল চোখ চাওয়াচাওয়ি, ফিস্‌ফিস্, কানাকানি। কাল সারাদিন এমনি চলেছে ফ্যাক্টরিতে। এত কিছুর পরও জরিনা কাজে আসবে গতকাল, কেউ ভাবেনি। আজও যথারীতি এসেছে সে।

কিন্তু হঠাৎ তার পা দুটো ভয়ানক ভারি লাগছে। জরিনার মনে হচ্ছে হাঁটতে, পা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে তার। পারলে ফ্যাক্টরিতে না এসে হাসপাতাল থেকেই সরাসরি বাড়ি চলে যেত জরিনা। কিন্তু না। মোতালেব তার কেউ নয়। অন্য সকলের মতোই মোতালেব তার একজন সহকর্মী। এখলাস যেমন সহকর্মী। সহকর্মী মারা গেলে খুব কষ্ট হয়নি কিন্তু কাজ থেমে থাকে না। কাজ ঠিকই চালিয়ে যেতে হয়। জরিনা তাই ফিরে এসেছে কাজে। সালিশ কমিটির বাশার সাহেব হাসপাতাল থেকে কোম্পানির একই বাসে ফিরছিল ফ্যাক্টরিতে। জরিনার ঠিক সামনের সিটেই বসেছিলেন। ভয়ে ভয়ে জরিনা একসময় জানতে চায় তাদের বিচারের আর দরকার হবে কী না, যেহেতু মোতালেব বেঁচে নেই। এত স্পষ্ট করে প্রশ্নটা সরাসরি উচ্চারণ করতে পারবে সে নিজেও ভাবেনি। বাশার সাহেব যিনি গতকাল সকালেই জরিনা, মোতালেব ও ইব্রাহিমকে ডেকে ভালো করে শাসিয়ে- ছিলেন এ ঘটনা সম্পর্কে সালিশ কমিটি ছাড়া আর কারো কাছে যেন মুখ না খোলে তারা, নির্লিপ্তের সঙ্গে বললেন, 'মোতালেব চলে গেছে। কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছ। তোমার বক্তব্য শুনতে হবে। মোতালেবের কথা তো শুনেছি আমরা।' বাস থেকে আস্তে আস্তে নামে জরিনা। বাশা সাহেব বলেন, 'কাল ঠিক দশটার সময় আমার অফিসে এসো। অন্য সকলেও থাকবে তখন। যা ঘটেছে সত্য করে বলবে।'

হ্যাঁ, সত্যিই বলবে জরিনা। মিথ্যা কেন বলতে যাবে? মোতালেব আর বেঁচে নেই। পুরো ঘটনাটা অস্বীকার করতে না পারলেও সত্যি কথাই বলতে বলেছিল সেও। বন্ধ দরজার ভেতর কাল সে নিজে কী বলেছে জরিনা জানে না। গতকাল সন্ধ্যায়ও মোতালেব এসেছিল জরিনার বাসায় জরিনার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পরশু রাতে সব ঘটনা শোনার পর জরিনার মা-বাবা আর দেখা করতে দেয়নি তার সঙ্গে। জরিনা তাই জানে না মোতালেব কী বলেছে, সালিশ কমিটিতে। তা, যাই বলুক, জরিনা তার নিজের কথাই বলবে। নির্ভয়ে বলবে। বলবে, মোতালেব তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করত। গত পরশুও করেছিল। অবশ্য পরশু সন্ধ্যার মতো স্পর্ধা এর আগে আর কখনও দেখায়নি। জরিনা বলবে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। মোতালেবের ব্যাপারে কখনও কোনো আগ্রহ ছিল না তার। তার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোতালেব তার গায়ে হাত দিয়েছিল। তাকে চুমো খেয়েছিল। সে বলবে তার ঘৃণা প্রকাশ করার জন্যে সে এক দলা থু থু ছুড়ে মেরেছিল মোতালেবের দিকে। ভাবতে ভাবতেই জরিনা হঠাৎ নিজের জিবের ডগাখানি তালুতে লাগিয়ে

কিছু একটা গিলে ফেলল—তার ঠোঁটদুটো তখন দুধে চুমুক দেবার ভঙ্গিতে ঈষৎ সুঁচালো ও বিস্ফারিত হয়ে এল। জরিনা বলবে, খুব অপছন্দ করেছে সে পুরো ব্যাপারটা। প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ, সেটাই সত্য। কেননা জরিনা মোতালেবের মতো বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। মা-বাবা ছাড়াও তিনটি ছোটো ছোটো বোন ও একটি ভাই রয়েছে তার। মৃত সহকর্মীকে শেষ দেখা দেখে এসেছে জরিনা। তার কুলখানিতে যাবে। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করবে। আর কী? কাপুরুষের মতো পালিয়েছে যে মোতালেব, তার জন্যে যথেষ্ট করেছে জরিনা। আর নয়।

আর তাছাড়া কাজ শেষে কারখানা থেকে তাকে নিজের ঘরেই ফিরতে হবে সে জানে। আরও অনেকদিন। হয়তো সারাজীবন।

ঘৃণার সমস্যা

জয়া মিত্র

গত দুদিন যাবৎ আমি একটু সমস্যায় আছি, যে কোনো রকমেই হোক সেটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। কিছু না কিছু সমস্যায় তো লোক সারাটা জীবনই থাকে, শান্তি আর কোথায়! কিন্তু সেগুলো যেন খানিকটা চেনা ব্যাপার—নিজের কী বউ ছেলের নিদেন মা বাবার অসুখ, সাংঘাতিক অসুখ এমনকী ক্যান্সারও, না হলে ছেলের চাকরি, ছেলেপুলে স্কুলে ভর্তি কী পড়াশুনোর সমস্যা, মেয়ের বিয়ে কিংবা তাদের প্রেম এমনকী স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যকে সন্দেহ, খিটিমিটি, অশান্তি—এ সব সমস্যার কোনো না কোনোটা, একসঙ্গে কয়েকটা মানুষের জীবনে আসে। কোনো মতে তার কিছু সমাধান একরকম করে হয়। কখনো বা হয়ও না। চলতে থাকে। আমরা অফিসে দপ্তরে কলম পিষতে থাকা লোক, এর চেয়ে খুব একটা বেশি আর কীই বা আশা করতে পারি।

এক এক সময়ে এক এক রকম ঝঞ্ঝাট। এই তো আমারই মনে আছে, খুলনা ছেড়ে বাবা কাকাদের চলে আসাটা। স্পষ্ট কিছু মনে পড়ে না অবশ্য কিন্তু মায়ের কোলে চাদরে ঢাকা হয়ে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যেন যাওয়া, নৌকোয় ওঠা, অন্ধকার নদীর জলে এক দুটো আলো, জলের মধ্যে সেগুলোকে দেখাচ্ছে কাঁপাকাঁপা লম্বা জরির ফিতের মতন, যেমন ফিতে দিয়ে পুজোর সময়ে দুর্গাঠাকুরের সাজ হত। ট্রেনে বেশ ভিড়, আবছা মনে আছে, বাবা বোধহয় খেতে দিলেন পেঁপে, হলুদ রঙের নৌকোর মতো কাটা। ওইটুকুই। বারাসাতে স্কুলে যেতাম, বেড়ার ঘর ছিল। দু-এক বছর পরই বোধহয় পুজোর সময় দুয়োরে অনেক লাল গোলাপি দোপাটি। তারপর তো পার্কসার্কাস। অনেক ভালো, এমনকী দৌলতপুরের বাড়ির চেয়েও, তবু দোপাটি ফুলগুলির জন্যে আমার আর বুলির মন খারাপ হয়েছিল। তখন বাবার নতুন চাকরির সামান্য মাইনেতে টানাটানি করে দিন চালাতে মায়ের কষ্ট হত এখন বুঝি কিন্তু তা নিয়ে বাড়িতে কোনোদিন বাবা-মাতে ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখি নি। বরং ঠাকুমা কখনো কখনো আমাদের খাবার পাতে দুধ কী মাছ না থাকার দুঃখ করত, 'নিজে গো দ্যাশে—' বলে মা কিম্বা বাবার কানে গেলেই বুড়িকে থামিয়ে দিত 'যা গিছে গিছে— ছোটোগুলির মাথায় আর সেইগুলি ঢুক্যায়া কী লাভ!' বলে ঠাকুমাও 'না—বলতিছিলাম, মনে তো হয়—' পর্যন্ত বলে চুপ করে যেত। দাদা স্কুলে রেজাল্ট ভালো করত। বুলিটাও পড়াশুনোয় ভালো ছিল একেবারে শুরু থেকেই। না হয়ে উপায় ছিল না। বুঝতে পারতাম আমরা রেজাল্ট খারাপ করলে বাবা মা মনে ভীষণ কষ্ট পাবে। আর সেটা আমরা একেবারে ভাবতে পারতাম না। বাবা এক একদিন সন্ধ্যেয় কী সকালে চৌকির ওপর পিঠ সোজা করে বসে কবিতা বলত 'লক্ষ বক্ষ চিরে, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে' কিংবা 'ইংরাজ সেনা ছুটে পশ্চাতে শেষে বহুদূরে বনে নিরালাতে সাক্ষাৎ হল ঝাঁসিরানি সঙ্গে বিশাল নদীর তীরে'। আমরা তিন ভাইবোন পড়াশোনা ছেড়ে সে সব দিনে একেবারে মুগ্ধ শ্রোতা।

মাও তাই। আমি আর দাদা তখন একটু বড়ো হচ্ছি, ভারি ভালো লাগত, সেই সকাল-সন্ধ্যেগুলো, মা রান্নাঘরের দরজার পিছনে আধখানা, কিন্তু মুখ দেখলেই বোঝা যেত মা সবকিছু ভুলে গেছে আশপাশের। তারপর হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়লে যেন একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে যেত। কখনও এক-আধদিন অনেকরাত্রে বিছানায় শুয়ে শুনতাম বাবা বাঁশি বাজাচ্ছে, আমরা জানতাম—মাকে শোনাচ্ছে। অথচ রোজকার জীবনে যেমন আর পাঁচজনের মতোই। তবু এই বাবা-মায়ের মনে কষ্ট হবে এমন কোনো কাজ করবার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না।

অথচ না ভেবেও কত কিছু যে হয়ে যায় জীবনে! সেই যে বাবার মুখের আবৃত্তি, তার শব্দের ঝংকার আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত, আর সাহস আত্মত্যাগ বীরত্বের সেই সব কবিতা! সিটি কলেজে পড়তে পড়তে কী করে যে যোগাযোগ হয়ে গেল কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আর তার চেয়েও আশ্চর্য আমার যে কোনো আবৃত্তি বা ডিবেটের সভায় পাড়ার যে দুবেনী বাঁধা ফর্সা মেয়েটাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখতাম সে মেয়েটা হঠাৎ কখন আমার কাছে আস্ত একটা তনুকা হয়ে উঠল, দেখলে বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্‌ না দেখতে পেলেও তাই— দুটোর কোনোটারই শুরু তেমন স্পষ্টভাবে খেয়াল করিনি। প্রথমটার কারণ অবশ্য আজ বুঝি, সেই পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির যেন বাতাসই ছিল অন্য রকম। আগুন ধরানো বাতাস। আঁচ বাড়ছিল তো সেই বাষট্টি-চৌষট্টি থেকেই। বাবা যেন খানিকটা ভেঙে এসেছিলেন চৌষট্টি থেকেই, নাকি আমরা বুঝিনি ঠাকুমার মৃত্যুই আরও বছর তিনেক আগে থেকে বাবাকে ভাঙছিল। ঠাকুমা যে বছর মারা গেল আমি স্কুল ফাইনাল দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে চারদিকে উৎসবের বান ডাকছে। নির্দিষ্ট কিছু অসুখ বোঝা যায়নি। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, কথাও বলছিল না প্রায়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসত, হাত পা ও মুখ ফোলা ফোলা। যতটুকু কথা বলত সবই প্রায় কেবল দৌলতপুরের বাড়ির কথা। অফিস থেকে ফিরে ঠাকুমা ঘুমোন পর্যন্ত ওই বিছানার পাশেই বসে থাকত। ঠাকুমা যেন নিজের আশপাশ পরিবেশ সব ভুলে গিয়েছিল। একটু যতটুকু কথা বলত বিড়বিড় করে সবই দৌলতপুরের বাগান কাঁঠালগাছ গরুর রাখাল, হঠাৎ কেনো দিন মাকে ডেকে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করত নয়নবউ, খিড়কি বন্ধ করিছ? কাইল ছোটো ঘরের কাঠের বাক্স থিকে কাপড়চোপড় বাইর কইরে একটু রোদ্দুরে দিও।

মা উঠে গিয়ে চোখ মুছত। যাঁদের সঙ্গে বাড়ি বদলাবদলি করে এই পার্কসার্কাসের বাড়ি আমরা পেয়েছিলাম সেই ফইজুদ্দিন সাহেবের জামাই বর্ডার সিকিওরিটিতে চাকরি করতেন। সেই সুবিধের কারণেই হয়তো তিনি বছরে, দু বছরে একবার আসতেন। ঠাকুমারে আম্মা বলতেন, তিনি এলে ঠাকুমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত যে কথা জিজ্ঞেস করত বাড়ির, বাগানের ঘরের কুলুঙ্গিগুলির পর্যন্ত। বাবা হয়তো কখনও একটু অপ্রস্তুত হতেন, ফইজুদ্দিন সাহেব, তাঁকে অনেক বছর ধরে বাবার কথামতো, চাচাজান বলতাম আমরা, বাবাকে নিরস্ত করতেন। বলতেন, ভাই, আমরা মুখ বুজে থাকি, আমরা তো কায়দা-কানুন মেনে চলি। মনে কি হয় বাইরে আনতে পারি না। যাঁরা তা বলতে পারেন তাঁদের বাধা দেবেন না। এই আম্মাজান যেমন, ওইখানে আপনাদের ভাবিরও সেই এক অবস্থা। আপনাদের অতোখানি ছড়ানো জায়গা, ফলফলারির গাছ, পুকুর—তবু সে এইখানকার জন্য চোখের জল ফেলে। বারণ করি না। কি জানেন, এদের কান্নার মধ্যে আমরাও কাঁদি।

বাবা ওঁর ছেলেদের খবর নিতেন। চাচাজানের বড়ো ছেলে দৌলতপুর কলেজে পড়ে ততদিনে। বাবা নিজে এককালে ওখানকার ছাত্র ছিলেন। চাচাজান দুপুর রোদেও একবার পার্কসার্কাস ময়দানটা ঘুরে আসতেন।

সেবার ঠাকুমাকে ওরকম দেখে শান্ত চাপা স্বভাবের মানুষটিও বিছানার পাশে বসে কেঁদে ফেললেন। এত বছরের মধ্যে সেই একদিন রাত্রে রয়ে গেলেন। ঠাকুমার ঘুমোবার পর খেতে বসে

বললেন, যদি কোনো উপায় থাকত আম্মাজানকে আমি একদিনের জন্যও তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতাম। যে মানুষগুলি চারদেওয়ালের ভিতরে থাকে ভাইজান, তারাই ওই দেওয়ালগুলোকে বাড়ি বানায়! সেই বাড়ি ছেড়ে আসতে তাদের যে কোথায় লাগে—।

এই একবারই বোধহয় বাবাকে ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম। বাবা বলে উঠলেন, কতগুলি লোক নিজেদের লাভ-লোকসানের প্যাঁচ কষে দেশটাকে টুকরো করল, আর একদিনের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের জীবন তছনছ হয়ে গেল। রাগারাগি হোক, ভাব ভালোবাসা হোক আমরা নিজের নিজের জায়গায় মিলেমিশে বেশ ছিলাম, একটা লোকও চায়নি নিজের ঘরদোর ছেড়ে এই রকম করে অন্যদেশে অন্য লোকজনে গিয়ে পড়তে। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য হাওয়া দিয়ে দিয়ে আগুন বাড়ায় আর মরলাম আমরা, আপনারাও। দেশ কাটবার আগে কর্তারা সবাই সবার সঙ্গে কত বৈঠক করেন, কিন্তু আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করেছিল একবারও।

এসব কথা বাবার মুখে কখনো শুনি নি। মা আস্তে আস্তে বলে, ও সব থাক। খাওয়ার সময়ে আর এসব কথা না তোলাই ভালো।

সেবার ফইজুদ্দীন সাহেব চলে যাবার মাসখানেকের মধ্যে ঠাকুমা মারা যায়। তারপরে একবারই এসেছিলেন চাচাজান। ছাদের সিঁড়িতে বসে রইলেন চুপ করে হাতে মাথা রেখে। দৌলতপুরের অনেকগুলো ছবি এনেছিলেন—বাড়ির, রাস্তার, কলেজের, রাস্তার মোড়ে ডিস্পেনসারির। রেখে গেলেন মায়ের কাছে। বলে গিয়েছিলেন আসবেন আবার। কিন্তু আর আসেন নি। চৌষট্টি সালের যুদ্ধের পর বর্ডারের কড়াকড়ি অনেক বেড়ে গেছে বলে শুনতাম। হরদম 'পাক ছত্রীসৈন্য'র কথা শোনা যেত পথেঘাটে। সে সময়ে লোকের দেশপ্রেম হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে উঠেছিল। তার আগে চীন-ভারত যুদ্ধেও এরকম দেশপ্রেম বেড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। চাইনিজ ইঙ্ক কিংবা চিনাবাদামের নাম উচ্চারণ করাও দেশদ্রোহ বলে মনে হচ্ছিল অনেকের কাছে। বরাবরই দেখেছি দেশপ্রেম বাড়লেই কিরকম যেন রাগী হয়ে ওঠে লোকে। চৌষট্টিতেও রাস্তার গোটাকতক কাগজ-কুড়োনেওলাকে দু-চারবার ধরে আনল পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা, বম্বেতে জনি ওয়াকারের প্রায় ভাত উঠে গেল।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন। কলেজ পাস করে গিয়েছি কিন্তু মনে মনে ছাত্রফ্রন্ট থেকে সবে আসতে পারিনি তখনও। দাদা সেনর্যালেতে চাকরি পেয়েছে। কোয়ার্টারও। চলে গেছে বউদিকে নিয়ে। তনিমা মাঝেমধ্যেই চাপ দিচ্ছে বাড়িতে বলার জন্য। ও নিজের বাড়িতে বলে দিতে চায় কেননা ওর বাবা-মা চারদিকে সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ দেখতে এলে ও যাবে না সেকথা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল। তাই ও চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে।

এর মধ্যেই ছেষট্টিতে এসে পড়েছে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। সে যে কী উত্তেজনার ব্যাপার! মনে হচ্ছে সব সমস্যা মিটতে চলেছে এইবার। এই কলকাতা শহরটাকেই মনে হচ্ছিল যেন রেড স্কোয়ার! তারপর তো কদিন যেতে না যেতেই মারামারি খেয়োখেয়ি। স্বপ্নে চিড় ধরে গেল। সেও এক অন্যরকম সমস্যার সময় গিয়েছে। কোন্‌টা যে ঠিক আর কোনটা ভুল, এতদিন বিক্ষোভ মিছিলে মিটিংয়ে যেসব জিনিসকে ধিক্কার দিতে শুনেছি কী করে সেই সব লোক, সেইসব কাজকর্মসুদ্ধই নিরুপদ্রবে রয়ে যাচ্ছে, কেবল তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে—এসবে বেশ গোলমাল লাগত। অবশ্য তখন রাজনীতি ছেড়ে একটু একটু করে নিজের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়ছি সে কথাও ঠিক। চাকরি পাওয়ার তাড়াটা অস্থির করছে।

মায়ের বুদ্ধি আর পরিশ্রম, একতলার দোকানঘর দুটোর ভাড়া—বাড়ির অবস্থা ঠিক আমার চাকরি না হলে ভাতে টান পড়বে এমন ছিল না। কিন্তু ওই যে, চাকরিটা পাওয়ার দরকার ছিল আমার সমস্যার অর্ধেক, বাকি অর্ধেক সমস্যাটা ছিল চাকরি না পেলে তনিমাকে বিয়ে করার কথাটা

আমার বা ওর বাড়িতে তোলাই সম্ভব ছিল না। এল আই সি-এর এই চাকরি পাওয়ার পর সে সমস্যা মেটাতে অবশ্য খুব বেশি কাঠখড় পোড়ানোর দরকার হয়নি। তনিমারা আমাদের স্বজাতি। ওদের বাড়ির অবস্থা আমাদের থেকে ভালো, কিন্তু চার-চারটি বোন। পাত্র হিসেবেও আমি খারাপ নই। তার ওপর কোনো পণ না নিয়ে বিয়ে করেছিলাম। আমার মায়ের তাতে মত ছিল, বাবা একটু গাঁইগুই করেছিলেন। বউভাতের খরচা কী ছেলের ঘর থেকে হবে নাকি? তাতে মা একেবারে স্পষ্ট বলে দেন—ছেলের আজ পর্যন্ত যা কিছু দরকার হয়েছে সবকিছু যদি তার বাপ-মা জোটাতে পেরে থাকে, নিজের ছেলের বউভাতে কী মেয়ের বাপের কাছে হাত পাততে যাব? অবশ্য তখন আমাদের বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই এরকম ধরনের ভাবত। বিয়ের পণ নেওয়াটা একটু সেকেলেপনাই মনে হত। দু-চারজন যদি গোপনে নিতও তো বাইরে সেটা চেপে যাবারই চেষ্টা করত। পণ নিয়ে বিয়ে করেছে, এটা ঢাক পিটিয়ে বলার মতো ব্যাপার ছিল না। অথচ মাত্র এই কুড়ি-পঁচিশ বছরেই অবস্থাটা কী করে এত পালটাল তাই ভাবি। এখন আমাদের অফিসের এই নতুন ছেলেগুলো বিয়ে ঠিক হলেই বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে কোন্ কোম্পানির স্কুটারের ইঞ্জিন ভালো কিন্তু তেল কম খায়, কোন্ কোম্পানির স্টিল আলমারিতে একটা লকার এক্সট্রা থাকে—এইসব। পণের টাকাটা নাকি মা বাবার ব্যাপার'। বেশির ভাগ সময়েই বিরক্ত—কারও না কারও নিন্দে করছে। হয় নিজের বউয়ের নয় ছেলের বউয়ের, আর না হলে কমবয়সী ছেলেপুলেদের। সব সময়েই বলছে—আমাদের আমলে—আমাদের কালে—অথচ নিজেরা যে কত পাল্টে গেছে তা খেয়াল করে না! ধরিয়ে দিলে খুশিও হয় না সব সময়। এই তো রথীন, কতকালের বন্ধু। কলেজে পড়েছি একসঙ্গে, প্রেম করেছি একসঙ্গে, চাকরিতে ঢুকেছি। বিয়েটা অবশ্য ওর দেরিতে হয়। রথীনরা একেবারে মুখুটি কুলীন আর সীমারা জাতে ছিল সোনার বেনে। সে কি করা যায়? অত হিসেব করে প্রেম হয় নাকি? ঠিকুজি কুষ্ঠী মিলিয়ে? রথীনের বাপ-মা আমার বাপ-মায়ের মতো ছিলেন না। সে অনেক কেলেঙ্কারি। জাতপাত, পিতৃপ্রাধান্যের পারিবারিক আভিজাত্য সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়ে রথীন আমাদের হিরো হয়ে গেছিল। আর বিশ্বাস হয়, সেই রথীন মেয়ের পাত্র পছন্দ করেও বাদ দিল জন্মকুণ্ডলী মিলছে না বলে? গুরুর অদেশে? সেই কথা সেদিন বলেছিলাম—সে কিরে! নিজের বেলায় কোন্ কুণ্ডলী মিলিয়েছিলি? তাতে দস্তুরমতো রেগে গেল রথীন। এতদিন পর ওসব কথা তুলে আমি নাকি ওর ফ্যামিলি স্ক্যান্ডাল বাইরে টেনে আনছি। স্ক্যান্ডাল! হবেও বা। ঘরে এসেছিলাম তনুকে বলতে। তনু অবশ্য আমাকেই দোষ দিয়েছিল।

ঠিকই তো। সবাই কী তোমার মতো? এতখানি বয়স হয়েছে কোনো আচারবিচার মানা নেই কোনো ধর্মকাজে এতটুকু ভক্তি নেই—তনুও পাল্টেছে। আমি নিজে কী পাল্টাই নি? তনুর পাল্টানো আমি বুঝি। শুধু দুটো মানুষেরই সংসার রয়ে গেল আমাদের, নতুন কেউ আসেনি—এই কষ্টটা ওকে এখনও ভিতরে ভিতরে খেয়ে ফেলতে থাকে। প্রথম প্রথম হতাশায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তখনই প্রথম মানত তাবিজ। এই সব শুরু করেছিল। আমি দু-একবার বলেছি, মানত করা কেন তনু? তোমাদের ভগবান কি ঘুষ খান? রেগে গিয়েছে। সেই অস্থিরতাটা কেটে গিয়েছে সময়ে, কিন্তু ফাঁক ভরাট হয়নি। ক্ষতটা ঢাকা পড়েছে, সারেনি। এমনকী মা কিছু না বললেও বউদি প্রথমদিকে একটু-আধটু বাঁকা কথা শুনিয়েছিল। তনুকে, দাদার সংসারের সঙ্গে আজও তনুর, ফলে আমারও একটু ফাঁক হয়েই গিয়েছে যেন। যত দিন যাচ্ছে, সমবয়সীদের থেকে সরে, স্বজনদের থেকে সরে, উত্তরপুরষ বিহীনভাবে আমি যেন আরও বেশি করে কেবল তনুর কাছেই সরে থাকতে চাই। অন্তত এইখানে যেন একটা সঙ্গী থাকে যার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে, সম্পর্ক আছে, ভালোবাসাও আছে।

তনুর কথাটাকে হালকা দিকে নিয়ে যেতে চাই, আমি, কেন, তোমার সংসারের কোন্ ডিসিপ্লিন আমি মানি না তনু? সেগুলো কী সাংসারিক আচার নয়?

সে কথা নয়, যা সবাই করে, তোমারই বা কেন সর্বদা তার বাইতে মতি?

সবাই যা করে মানে? সন্ধ্যাবেলা ফিরলে তোমার সঙ্গে বসে দু-কাপ চা না খেয়ে টি-ভি দেখা? তনু রাগতে গিয়েও হেসে ফেলেছিল। কিন্তু নিজের জমি থেকে নড়েনি।

ঢঙ করো না, সবাই আমায় জিগ্যেস করে তোমার মন্ত্র নাওনি? নেবে না? আমার ভালো লাগে না অত কথা। কেন, কী হত দীক্ষা নিলে?

তনু, একথাটা অনেকদিন হয়ে গেছে। তোমাকে তো আমি বলেছি তোমার যদি মনের ভেতর থেকে বিশ্বাস আসে যে যিনি তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি মানুষ হিসেবে অন্য সকলের চেয়ে অনেক বড়ো কিংবা তিনি তোমাকে কোনো ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছে দেবেন, কিংবা তোমার মনের মধ্যে কোথাও এমন কোনো বোঝা জমে রয়েছে যা বাইরের কারও কাছে বলতে পারলে তোমার মন হালকা হবে—তুমি দীক্ষা নাও। আমার এর একটাও নেই, কাজেই আমার কারও কাছ থেকে দীক্ষা নেবার দরকারও নেই। তবে হ্যাঁ, আমি তোমায় কেবল এইটুকু বলি, সবাই নিচ্ছে বলে নেব এটা মনে করো না। এটা ওই লেটেস্ট ফ্যাশানের শাড়ি, লেটেস্ট ফিল্মস্টার পর্যন্তই ভালো।

আগের আরও অনেকবারের মতোই মুখ গম্ভীর করে উঠে গেছিল তনু।

কিন্তু এখন সমস্যাটা আর ঠিক এরকম জায়গায় নেই। মুশকিলটা গভীরতর লাগছে এজন্য যে এটা এসেছে ওই যাদের বুঝতে পারি বা না পারি ভালোবাসি সেই কমবয়সীদেরই ক-জনের কাছ থেকে। শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে। লাঞ্চ আওয়ার্সের একটু পরে নীচের ক্যান্টিনে বসে পাঁচ রকম কথা হচ্ছিল। অখিলের মেয়ের বিয়ে হয়েছে আসানসোলে, গতমাসে টিভিতে আসানসোলে কার্ফু, মিলিটারি নেমেছে এসব খবর শুনে সকলেই কমবেশি উদ্বেগে ছিলাম। ওর জামাই বিল্ডিং-কন্ট্রাক্টর। সময়ে অসময়ে বেরোয়! পাঁচরকম লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করে। শহরে দাঙ্গা হলে চিন্তার কথা তো বটেই। তো এই তিনচারদিন হল মেয়ে এসেছে অখিলের। বলছে—না, কিছুই প্রায় হয়নি আসানসোলে। পুলিশ খুব চমৎকার সামলে নিয়েছে। কার্ফু, মিলিটারি-এর বেশিটাই ছিল সাবধানতার জন্য। তা থেকে পুলিসের ভূমিকা, তা থেকে বম্বে। অনেক কাগজেই তো লিখেছি যে বস্তিগুলোয় আগুন লাগানোর সময়ে পুলিশ নাকি দাঁড়িয়ে দেখছিল। পুলিশ নাকি রাজনৈতিক দলের কথায় চলেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের নয়। এইসব নিয়ে চলছিল। এ দেশের আর কিছু হবে না হে, সব কিছু পলিটিক্‌স ঢুকে গেছে, বলে উঠে পড়ার সময়ও হয়ে গিয়েছিল। পাশের টেবিলের কটি কমবয়সী ছেলে বিলিং সেকশানে কমপিউটার রুমে বসে। মুখ চিনি, ওরা যে নিজেদের আলোচনা থামিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল, খেয়ালও করিনি। হঠাৎ আমার কথার মাঝখানে উঠে এসে খুব রুক্ষভাবে বলল, সব সময়ে নিজেদের জাতের নিন্দে করাটা আপনাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য ধর্মের লোকদের ইউনিটি দেখেছেন? মুরুব্বি যা বলে দেবে জাতসুদ্ধ লোক এককাট্টা হয়ে শুনবে। আর শালা আমাদের দ্যাখো, নিজেদের দেশটার ওপর প্রেম নেই, নিজের ধর্মে ভক্তি নেই। কেন, যে লোকগুলোর নামে যে বলছিলেন আপনি—কী ক্ষতিটা করেছে তারা? তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলে কেবল আমি আর অখিল, বাকিরা সরে গেছে। এই ছেলেগুলো আমার অফিসে কাজ করে, ঢুকতে বেরোতে কতবার দেখা হয়েছে অথচ কি রকম অচেনা মনে হচ্ছে। ওরা যে ভাষায় যেভাবে কথা বলছে এটা অফিস প্রেমিসেরের মধ্যে, অন্তত ত্রিশ কী পঁচিশ বছরের সিনিয়র কোনো সহকর্মীর সঙ্গে বলবার কথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমি দেখলাম কোথাও একটা কোনো চোখের দৃষ্টিও এপাশে ফিরল না। বেশির ভাগ টেবিল খালি হয়ে গেছে, কেবল কাউন্টারের কাছাকাছি দুটো টেবিলে নিউ বিজনেস সেকশানের ক-জন

চা খাচ্ছে। তারা এমন নির্বিকারভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে যেন এখানে, এই দুটো টেবিল থেকে দূরে কোনো শব্দ হচ্ছে না, কোনো লোক নেই। অখিল পিঠের পাশ থেকে 'আমি তাহলে সেকশানে—' গোছের কী একটা বিড়বিড় করে বলল। বুঝলাম অখিল চলে যাচ্ছে। আমি ছেলেগুলোর দিকে ভালো করে তাকালাম। দামি পোশাক-আশাক। জনা-দুয়েকের শার্টের খোলা বোতাম দিয়ে রূপোর চেনে গাঁথা ছোটো নীল লকেট দেখা যাচ্ছে, একজনের রুদ্রাক্ষ। পাঁচজন আমাকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছে যেন ওরা আমাকে আক্রমণ করবে। হঠাৎ এ রকম অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে আমার কেমন ভয় হচ্ছিল সত্যি, আবার ভিতরে ভিতরে রাগও হচ্ছিল।

কী হল, উত্তর দিচ্ছেন না যে?

ওদের মধ্যে একজন নতুন করে বলল, না, বলার কী আছে—দেশের এত বড়ো একটা ট্রেডসেন্টার—যেখানে সব জাতধর্মের লোক বাস করে, চিরকাল করছে—সেখানে একটা দাঙ্গা ইচ্ছে করে লাগিয়ে গরিব মানুষের সর্বনাশ করা কী ভালো?

গরিব মানুষ—ওঃ! ওই ওরা আপনার গরিব মানুষ হল আর অন্য দেশে আপনার এই গরিব মানুষেরা যে শয়ে শয়ে ধর্মস্থান ভেঙ্গে ধুলো করে দিচ্ছে, কই সে ব্যাপারে কোনোদিন আপনাদের মুখ খুলতে তো এসব কথা শুনি না।

যদি এ রকম হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সেটা খুব অন্যায় হয়েছে, কিন্তু দাঙ্গার সময় নানান গুজব ওড়ে—সে কথাও সত্যি। আর তাছাড়া একদল লোকের দোষে অন্যদেরকে খুন- জখম করা কী ঠিক?

আলবত ঠিক। যারা করছে তারা মরদের বাচ্চা।...

আমি চলে যেতে চাইছিলাম। চিত্রেশেদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। ক্যান্টিনে আমি একা আর এই ছেলেগুলো। সত্য দেখি কাউন্টার থেকে এদিকে তাকাচ্ছে। একবার ওর চোখে চোখ পড়ে গেল। এবারে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

দেখুন, এভাবে এত তাড়াতাড়ি এসব কথার আলোচনা শেষ হয় না। আমার মতে ধর্ম যার যার নিজের ব্যাপার, সেটাকে উপলক্ষ করে দাঙ্গা বাঁধানো যাই হোক, এ নিয়ে পরে আবার কথা বলা যায়। আপাতত সেকশানে যেতে হবে আমাকে। লাঞ্চ আওয়ার ওভার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—

আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে আসছিলাম। দরজার ওপর পা রাখতেই পেছন থেকে শুনলাম, শালা দালাল কুইস্‌লিং—

মাথাটা চড়াৎ করে উঠল। ফিরে যাব? আবার কী রকম ভয়ও হল, ওরা কী মারপিট বাধাতেই চাইছে?

সেকশানেও স্বস্তিতে বসতে পারলাম না। অনেকেই যেন কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এরা কী সব জেনে গেছে? অথচ কেউ কিছু জিগ্যেস করছে না। আমার চোখে চোখ পড়লেই তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে ফাইল দেখছে। ঘণ্টাখানেক কিছু কাজ করে না করে উঠে ইউনিয়ন রুমে গেলাম। বিপুল আর চিত্রেশ বসেছিল। চিত্রেশ আমাদের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি, ডিভিশনাল কমিটির মেম্বার। পার্টির ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার। সরাসরি চিত্রেশকেই ধরলাম।

এসব কী হচ্ছে অফিসে? এটা কী ধর্মীয় আড্ডার জায়গা হয়ে উঠছে নাকি? এই সমস্ত কালকের ছেলেরা, এঁরা ক্যান্টিনের মধ্যে একজন সিনিয়র স্টাফের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কী করে করতে পারে? এতক্ষণে আমার গলা কেঁপে যাচ্ছিল। ভয়ে নয়, অপমানে।

চিত্রেশ বলল—

বসুন বসুন, চট করে এত উত্তেজিত হন কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? তুমি নিজের চোখে দেখনি ওই ছেলেরা ক্যান্টিনের মধ্যে কী রকম মারমুখো হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছিল? কী ভাষায় কথাবার্তা বলছিল?

না না, এটা আপনি একটু বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছেন। আমি তো ছিলাম ক্যান্টিনে, আমি দেখলাম আপনি দাঁড়িয়ে সৌরাংশুদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মারমুখোটুখো কেউ ছিল না তো!

ওরা বম্বে রায়টে গুণ্ডাদের সমর্থন করে কথা বলছিল, নোংরা ভাষায় অন্যদের গালাগালি করছিল।

না না বিজয়দা—চিত্রেশ মাথা নাড়ল, আপনি এতদিনের পুরোনো লোক, দেশের এই বিপদের সময়ে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আলোচনা তুলতে গেলেন কেন? এটা কিন্তু আপনার কাছে আশা করিনি। আপনি জানেন, এসব আলোচনা নিজেদের মধ্যেকার বিভেদকে বাড়িয়ে তোলে, প্রতিপক্ষের হাত শক্ত হয়?

বিপুল এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে ওঠে—কে একদলকে সমর্থন করে কে অন্যজনকে সমর্থন করে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে কাউকে খোঁচা দেওয়াটা ঠিক নয়। বিপুল হাত নেড়ে কথা বলল বলে আমার চোখে পড়ল ওর ডান হাতে নানা রঙের তিনটে আংটি।

তাছাড়া বিজয়দা, আপনার তো অনেকদিন হয়ে গেল, রিটায়ারমেন্টের আর বোধহয় বছর দুই বাকি, তাই না? আপনি আর কেন এইসব ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে যান? যা করছে করতে দিন। এদের ল্যাঙ্গোয়েজ-ট্যাঙ্গোয়েজ আপনাদের কাছে খানিকটা শংকিতই মনে হবে—এরা সব নিউ এডুকেটেড নিউ জেনারেশান তো, কমপিউটার টাইপ!

চিত্রেশ আর বিপুল দুজনেই নিজেদের রসিকতায় হেসে উঠল। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

এই ইউনিয়ন রুম বহু কষ্টে স্যাংশন হয়েছিল অফিসের মধ্যে। তারও আগে অফিসে ইউনিয়ন করার অধিকারের দাবিতে ধর্মঘট হয়েছিল। পেন ডাউন হয়েছিল। পনেরো-কুড়ি জনের নামে শো-কজ নোটিশ এসেছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

লিফটে উঠতে ইচ্ছে হল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। ল্যান্ডিংয়ের জানালাগুলো দিয়ে অনেক গাছপালা দেখা যেত আগে। কখন কাটা হয়ে গেল সবগুলো! সুপার মার্কেটের বিল্ডিং উঠছে। সামনেই মারুতি গাড়ির শোরুম। আমি কী অনেকদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠিনি? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বুকে চাপ ধরে তাই লিফটে উঠে যাই, সে আজ কতদিন হয়ে গেছে! তিনতলার ল্যান্ডিং-এ একটু দাঁড়ালাম রেলিংটা চেপে ধরে। চোখে পড়ল প্যাসেজের ভিতরটা ওয়াটার কুলার মেশিনটার সামনে জটলা। সেই ছেলেগুলোই কী ক্যান্টিনের? ঠাহর করতে পারলাম না। ওরাই, আরও কেউ কেউ থাকতে পারে। দু-তিনজন এগিয়ে এল। না আমার দিকে আসে নি। ল্যান্ডিংয়ের জানলা দিয়ে নীচে কী দেখল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। জোরে জোরে বলা কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

যত্তোসব দালাল, বুড়ো ভাম—আশ্চর্য, ওদের সম্পর্ক একটু ঘেন্না হয় না মাইরি!

মাথাটা কুচ করে একটু ফাঁক করে দিলেই ঘিলুতে হাওয়া লাগবে—

ওরা হো হো করে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল। আমার ভেতরটা ফাঁকা লাগছিল। এতখানি সিঁড়ি ওঠা ঠিক হয়নি, নিঃশ্বাসে বাতাস পাচ্ছিলাম না।

এসব পরশুদিনের ঘটনা। তনুকে কিছুই বলিনি। সন্ধ্যেবেলা সেদিন তনু লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অস্বস্তি পাচ্ছে। আমি খবরের কাগজটা হাতে করে ঘরের অন্যপাশে ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। তনুর গলার গুনগুন থেকে ওর পাঁচালির কথাগুলো বুঝতে পারছি। তাছাড়া কিছু কিছু লাইন মনেও পড়ে যাচ্ছে, এই পাঁচালি মাও পড়তেন, কতবার শুনেছি। আচ্ছা তনু কী হিন্দু? কিন্তু তনুর পাঁচালিতে তো কেবল নিজের সংসারের ভালোর প্রার্থনাই আছে, ধর্মের কথা—শত্রুদের কথা তো কিছু নেই। কালকে সারাদিন অফিসে সেকশান থেকে বেরোইনি। এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে চলে এসেছি। লিফটেই

উঠেছি। তবু যেন অস্বস্তি লেগেছিল। কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে? এরকম মনে হচ্ছিল সমস্তক্ষণ। আজও তাই।

সেকশানের সকলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। সবাই সহজভাবেই কথাবার্তা বলছে। সেদিন যে ওরা বলছিল মাথাটা কুচ্ করে কেটে দিলেই—তখন কী ওরা আমার কথা বলছিল? দূর, অত সোজা নাকি! রাস্তাঘাটে আর পাঁচটা লোক নেই? কিন্তু ক্যান্টিনেও তো সেদিন অনেকে ছিল প্রথমে। সেদিন যদি ওরা আমাকে মারত? রাস্তায়, কোনো পাড়ার মোড়ে হয়তো ওদের মতো লোক আরও অনেক আছে। এই যে মাঝে মাঝে কোনো পাড়ার ঠিক মাঝখানে হঠাৎ ত্রিপল টাঙিয়ে টানা তিনদিন ধরে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম-সংকীর্তন হয়—কেউ কিছু বলে না তো? কারা যায় ওসব জায়গায়? কারা ব্যবস্থা করে? কী করে খরচটা ওঠে? সারারাত্রি মাইকের চিৎকার চলে, কচিবাচ্চা, ছাত্রছাত্রী, রুগি—কারো বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি ওঠে না? সবাই কী ভয় পায়? পুলিসও কিছু বলে না, অথচ রাত নটার পর মাইক বাজান বারণ এ তো সবাই জানে। কিন্তু আমার সম্পর্কে ওরকম বলবে কেন? আমি যে কারো সমর্থক নই এ তো সবাই জানে। আমার কথায় কী কিছু চলে? ধর্ম নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই তো ছাপ্পান্ন বছর দিব্যি কেটে গেছে, কেউ তো তাই নিয়ে কোনো কথাও তোলেনি। সম্পর্কে কিছুই জানি না। মা-বাবা আলাদা আলাদা পুজো করতেন। তনু তনুর মতো করে। পৃথিবীতে সব রকমের লোক থাকে— কত হিন্দু আছে জাত মানে না, কত মুসলমান আছে চারটে বিয়ে করে না। তাতে কাউকে ঘেন্না করব কী করে?

এটাই আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দেশের, কোনো দলের লোককে ঘেন্না করতে হবে নিজে নিরাপদ থাকতে হলে। কিন্তু কাকে ঘেন্না করব? ঘেন্না করতে হলে যে জানতে হবে কেন ঘেন্না! আমি তো চিনিই না সেই অন্য দেশ কী অন্য দল কী অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের! যে দু-চারজনের নামধাম জানি তাদের নাম তো সবাই জানে— তারা কেউ গান গায় কেউ ক্রিকেট খেলে কেউ ছবি আঁকে। অচেনা লোককে কী ঘেন্না করতে পারে কেউ? বড়ো একা লাগছে। এ কথা কী তনুকেও বোঝাতে পারব যে ঘেন্না করবার মতো একটা চেনা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। কাউকে ঘেন্না করতে হবে নিজে নিরাপদ থাকতে হলে? কিন্তু কাকে ঘেন্না করব? আমি বুঝে উঠতে পারছি না। খুব চেষ্টা করছি কোনো একজনকে খুঁজে বার করতে ঘেন্না করার জন্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো চেনা মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না।

পরখ, পরিক্রমায়

জ্যোৎস্না কর্মকার

শানাই স্রোত ছাপিয়ে একটাই ডাক। অন্ন অন্ন আর অন্ন। অন্নদি, অনু, অন্নরে। কোথায় অন্ন? মেসোমশাই, মাসিমা গায়ে হলুদের তত্ত্ব-বরণডালা, বেনারসী জোড়, ঠাকুর রসময়, চাল, চিনি, গরমমশলা প্রীতি উপহার। ডাকছেই অন্নদিকে। যত দায় অন্নদির। বরের মাসি, কনের পিসি। ওর মামাতো দেবরের সঙ্গেই তো বিয়ে পুতুলের। অন্নদির মেজোমাসির মেয়ে পুতুল। পুতুলের থেকে দশ পনেরো বছর বয়স্ক হাত পা, লালচে ঠোঁট ফর্সা রোগা শরীর। মুখে টেপা হাসি। আর অফুরন্ত উদ্যম নিয়ে সবার চোখে চোখে অন্নদি। আর বরেনদা তো যেন চোখে হারাচ্ছে অন্নদিকে।

পাড়ার, স্কুলেরও। হামজোলি পুতুলের আজ বিয়ে। গলি, দুটো মোড়ের পর প্রথম বাড়িটাই আমাদের, যে বাড়িটার সামনে শুধু ফুল আর ফুল। যেখানে আমার অপরূপা মায়ের যত্ন হাতের ছোঁয়া। মা জানে, আমার যে সব ঠাঁই সুন্দর। শুধু সুন্দর। অসুন্দর সইতে পারি না। অন্ধকারও না। মার ঠিক মনের মতো বাবাও। আমার সুন্দর মায়ের কত চুল। চুলে রোজ বিকেলে আমার হাতের ফুল খেলা। বাবা হাসেন।

আজকাল ফুল খেলতে খেলতেও কেমন আনমনা হয়ে যাই। আকৈশোর কেমন একটা মন খারাপ করা ঘেরাটোপ মাঝে মাঝেই আমাকে পেয়ে বসে, আনমনা হয়ে যাই। সেসব কাটিয়ে উঠতে সুন্দর ফুল-স্মৃতি মুখ ভাববার চেষ্টা। মিষ্টি মিষ্টি ছবি, ডাকি। ডাকতে থাকি। পাখি ডাকা। মনে মনে। ওদের সাতরঙা ডানায় মন বুলিয়ে দি। মমতা।

মা বলে, বসতে শেখার বয়সেই আমি নাকি দশ বারোটা ডিম নিয়ে খেলেছি কতবার। তন্ময়। একটাও ভাঙিনি। ভাঙা-ভাঙিটা কোনোদিনই নেই আমার মধ্যে। একটা কাঁচের পাত্র অসাবধানে ভাঙলে বুকে দাপায় কষ্ট। যেদিন মেজোমাসির থার্মাস ভাঙল হাত ফস্কে—ঘরময় পারদ। পৃথিবীর অনুকণা। সব যেন ছড়িয়ে ফেলেছি। কোনোদিন আর যেন গুছিয়ে কুড়োন হবে না নিজেকে।

নেমতন্ন সকাল থেকেই। পুতুলের সঙ্গে ছায়া যেন। ওর নতুন শাড়ি, গয়না, হলুদ, চন্দন, কুমকুম-এর মিলিত গন্ধ আকুল করছে। বারবার মানসপটে শুদ্ধর মুখটা। হুজ্জতি। না ভাবতে চাই না ওর কথা। একটুও না। পুতুলের অন্নদি ভালোবেসে আমারও অন্নদি হয়েছে। কী যেন একটা রহস্য আছে অন্নদির। চুম্বক, কেবলই হাতছানি।

দুপুর গড়িয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। গলায় মালা দিতে তো তর সইছে না। কাজ ফুরোয় না অন্নদির। সকলে শুধু যেন ডাক আর অন্নদি সাড়া। হাসিমুখ। কিন্তু অন্নদির তো এতক্ষণে জমে ফুলকী হয়ে যাওয়ার কথা। অন্নদিকে ঘিরে যে বরেনদার হিম দৃষ্টিবলয়।

—অন্নদি। বরেনদা বোধহয় কিছু চাইছে!

—ও হ্যাঁ। যা না ভাই উষা সরবতটা ওকে দিয়ে আয়।

অন্নদিকে সাহায্য করতে পেলে বর্তে যাই। কিন্তু এই লোকটাকে। অনিচ্ছুক হাতে সরবত হাজির। অহেতুক উচ্চকণ্ঠ বরেনদা—এই উষা তোমার অন্নদিকে বলো আমার আন্ডারওয়ারটা খুঁজে দিয়ে যাবে।

অন্নদি অপ্রস্তুত। ওদিকে যেতেই পুতুলের কনেদি মিনতি রাঙাবউদিকে বলল—বাঁদরামি দেখ। দিন দিন বাড়ছে। অন্নদিটা এত লাই দেয়।

—চুপ, শুনলে এখন অনর্থ হবে। উঃ, পিটুলি গোলা হাতেই কনেদির মুখচাপা দিল রাঙাবউদি।

—হ্যাঁ পাগলামিটাই একমাত্র কাজ এখন। রুখে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, সে সাহসও নেই অন্নদির।

—নারে মায়া! কুকুর বেড়ালও ফেলতে পারে না মানুষ। ওই মায়া, কষ্ট হয় অন্নদির জন্য। রাঙাবউদি আর কনেদির কথা সবটা কানে আসছিল না আমার। গেলেও নাবুঝ।

রাঙাবউদির পাশে গিয়ে বসতেই শ্রবণ ছাড়াও সম্যক অবলোকনের আওতায় চলে এলে রাঙাবউদির সুন্দর হাত ও হাতের আলপনা। নিবিষ্ট। এখন দেখে মনে হচ্ছে আলপনা দেওয়া ছাড়া আর নেই জগৎ।

রাঙাবউদি সুন্দর করে বলে। অপ্রিয় কথাও। সুডৌল হাত, হাতে সোনার কাঁকন, ধপধপে শঙ্খ বলয়, চোখের ঝিলিক ধরে রাখতে চাই। প্রয়োজনে চাই সুঘ্রাণ। এখানে সদাবসত নয় রাঙাবউদির। পুজো পার্বণে রাঙাদা যুগলে এলেই প্রতিবেশী চোখ স্বস্তি। নয়নসুখ আমারও।

রাঙাবউদি যেন কনকচাঁপা-বিভা। চিনেমাটির ত্বক পিছলে গোপন মনে উল্লাস। ঝোটন কখন কাছে এসে বসেছে! সুপুরি কুচোচ্ছে আর চোরা চোখে তাকাচ্ছে কেবল রাঙাবউদির দিকে। চোখ আটকে গেল আমারও। একটা লো-কাটের লাল ব্লাউজ। সামান্য লাল পাথরের অসামান্য লকেট, দুর্লভ দুটো স্থলপদ্মের ম্ ম্ সৌন্দর্যের মাঝে। নাক ডুবিয়ে সম্পূর্ণ হতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ মুখ তোলে। চোখে চোখে হাসে। চোখ নামিয়ে ঝোটনের দিকে তাকাই। ঝোটনের গোঁফের রেখা, অনেকটা স্পষ্ট, হয়তো সেজন্য মুখটা জেদি মনে হচ্ছে। আগে তো এভাবে দেখিনি। এবার রাঙাবউদি ঝোটনের চোখে উঁকি দিয়ে হাসল। ঝোটন চোখ নামিয়ে নিলেও একটা আঙুল রক্তাক্ত করে ফেলল। উঃ করে উঠতেই রাঙাবউদি চট করে আঙুলটা চেপে ধরল। দেখলাম ঝোটনের হাত কাঁপছে। কেন আমার আঙুল কাটল না! রাঙাবউদি আমার হাত ধরত তাহলে।

ঝোটন বাইরে চলে যেতে সবাই চুপ। নিঃশব্দ ভেঙে রাঙাবউদি বলল—অন্নদি একটা দত্তক নিতা অথবা এমনিও তো একটা হতে পারত।

—কীভাবে? মহাভারতের নিয়োগ প্রথা?

—কেন বরেনটার কিছু না থাক লিভিং স্পার্মও নেই?

—যা না টেস্ট করার কথা বল গা, কেমন ছুঁচোর কেত্তন হবে দেখিস!

অন্নদি তখন ছাদ থেকে শুকনো কাপড় নিয়ে নামছে। এসেই তাড়া।—কইরে তোদের হল। ও মিনু রাঙাবউ ওঠ। গা ধুয়ে চল ঠিক করো, মেকাপ নে। লোকজন আসতে শুরু করল বলে। উষা তুইও যা বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে যায়।

—থামো তো, এখনও অনেক সময়। এসো না ঠাকুরঝি তোমায় একটু সাজাই।

—ধ্যাৎ কনে সাজাচ্ছো সাজাও, বুড়ো বয়সে আমাকে কেন? উত্তরে রাঙাবউদি অন্নদিকে জড়িয়ে ধরে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বর।

—ভারি তো শেষ বয়স! এখনও জ্বলে ওঠা যায়। বন্য হওয়া যায়। পারো না কেন? তোমার না একটাই জীবন!

রাঙাবউদির মৃণাল আলিঙ্গনের মধ্যে ছোটো একটা পাখির মতো মতো ছটপট করতে করতে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে যায় অন্নদি। বিষণ্ণগলায় বলে—আঃ ছাড় তো রাঙাবউ। তোদের কথা শুনলে আমার বুক কাঁপে। সবকিছু ভাঙচুর করে বাঁচার সাধ আমার নেই। হলে তো ফুলশয্যার রাতেই ছেড়ে আসতাম।

বরেনদা কখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা টের পায়নি। ওদের সতর্ক করতে বলি—তোমার গলাটা এত ধরা লাগছে কেন গো?

—বড্ড মাথা ধরেছে রে, অন্নদির একথায় বরেনদা টিকটিক করে ওঠে।

—এতক্ষণ তো দিব্বি ছিলে। আমাকে দেখেই তোমার মাথা ধরে গেল!

কাল রাতে নাকি আলাদা শোওয়ার ঘর নিয়ে চরম অশান্তি হয়েছে। বরেনদার বায়নার আর শেষ নেই। অন্নদি সাজবে না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না, কোথাও বেড়াতে গেলে লেজুড় হবে, হয়ে বেড়ানোর পিণ্ডি চটকে ছাড়বে। ট্যাক্সিতে চাই বুড়ো ড্রাইভার। বাড়িতে রেখে যেতে হলেও কিচাইন, ফিরে এসে অন্নদিকে টেনে হিঁচড়ে দরজা বন্ধ করে পরখ। মুখ বুজে সয়ে গেছে অন্নদি। কদিন আগেই নাকি কোথা থেকে নিজের মাথা ফাটিয়ে এসেছিল। কোনো এক তেল মালিশওয়ালাকে মারধোর করে তার সাইকেল ভেঙে দিয়ে এসেছিল।

মায়ের কাছে গিয়ে আগুন রঙের বেনারসীতে সেজে গুজে ফিরছিলাম। তপনদাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি ওদের রকে তপনদাদের ব্যাচটার সঙ্গে বসে শুধু আড্ডা মারছে। রকটার অনেক চোখ। সবচোখে পলক নেই। দেখছে আমাকে। আলোচনা স্তব্ধ। পা চলছে না। শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে। না চাইতেও শুদ্ধর চোখে পড়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

পুতুলতো রাঙাবউদির হাতের শিল্প হয়ে গেছে। কিন্তু রাঙাবউদি কোথায়? রাঙাবউদি তখন ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছে। পেছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝোটন।

—এই ঝোটন কী করছিস?

—এই দেখ না ব্ল্যাকটেপ খুঁজতে এসেছি। ঝোটন যেন চমকে উঠেছিল।

—ভাই ঝোটন দাও তো ঘড়ির স্ট্র্যাপটা লাগিয়ে। চোখের কোণে হেসে বলল—রাঙাবউদি।

দেখলাম ঝোটন ওর কাটা আঙুলের বাহানায় রাঙাবউদির হাত ছুঁয়ে সময় নিচ্ছে। দাঁড়ালাম না। অন্নদিকে খুঁজে বের করি। রাঙাবউদির হাতের ছোঁয়ায় অন্নদিও ঝলমল করছে। হলুদ বেনারসী। খোঁপায় একগুচ্ছ হলুদ গোলাপ।

—দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু। কোথায় পেলে এই গোলাপ?

কনেদির বর সুজয় এনে দিয়েছে বলেই কী সঙ্কোচে গুটিয়ে যাচ্ছে! নাকি সেজেছে বলে! অন্নদি কোত্থেকে একটা সাদা গোলাপ এনে আমার পরিয়ে দিতে দিতে বলল— তোদের বাড়িতে এত ফুল আর খোঁপায় ফুল নেই! ওঃ তুমি কী ভালো অন্নদি? এত ভালো তুমি তবু তোমারই পায়ে-পায়ে, তোমার আনাচে-কানাচে সর্বনেশে দুঃখ-বিড়ালটা কেন যে ঘোরে! লুকিয়ে চোখের জল ফেলতে হয় তোমাকে! সুস্থ স্বাভাবিক তুমি। ভালোবাসো হাসি গান, হাসি ঠাট্টা, চাঁদের ঝিকি-মিকি, ফুল পাখি শিশু উচ্ছ্বাস। ভালোবাসা ভালোবাসা পেতে। ভালোবাসতে। ভালোই বেসেছো, পেয়েছো কি ফিরে? নাকি শুধুই ধমক—কাকে দেখাতে সাজলে? কে ফুল দিল? মিনুর বর সুজয়?

অন্নদি এমনই প্রশ্নের ঠেলায় তুমি বারবার হোঁচট খাচ্ছ তবু এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বার বার উচ্ছল হয়ে ওঠার চেষ্টা করছ আর আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখছি সুপুরুষ বর আড়চোখে পুতুলকে দেখছে। চাপা মেয়ে পুতুল। তবু খুশি খুশি। তপনদার কথা মনে পড়ছে না নিশ্চয়ই। ও প্রান্ত থেকে এক সুশ্রী যুবকের প্রজাপতি দৃষ্টি। উড়ে এসে বার বার ছুঁয়ে দিচ্ছে আমার

চোখ। বরযাত্রী। দেখব না দেখব না করে আবার তাকাই। লজ্জা! হাত আড়াল করে লজ্জা মুছে স্বাভাবিক হতে চাই। আবার বেয়াড়া চোখ। ছেলেটা হাসল। গোলাপ জল স্প্রে করল কেউ। কী সুন্দর দুটো চোখ। ছেলেদের চোখ! নেশা আছে নাকি! এক চুমুক। আর মাত্র এক চুমুক। মনে মনে, জানি না কার কাছে যেন ক্ষমা চাইলাম। ছেলেটা তার এক বন্ধুকে ডেকে আমাকে দেখাল। দুজনেই হাসতে লাগল এবার। আমায় সস্তা করে দিল! এভাবে জানায় কেউ! সম্বিত ফেরালাম নিজের। সজাগ। ওমা হোঁদলদা দাঁড়িয়ে আছে আমার কাঁধে ওর ধ্যাবড়া হাত কেন? ভেবেছিলাম কুন্তলা বিয়ে দেখছে। হোঁদলদা—ঘিন ঘিনে পিচ্ছিলতা বোধ। ব্যাং। আমার অস্তিত্ব ছুঁয়ে দিতে চাইছে। ছিঃ, পায়ে পা মাড়িয়ে দিচ্ছে। মাগো। ছিঃ, ছিটকে সরে যাই।

এবার পড়লাম মাসিমার স্ত্রী আচারের পাল্লায়। উনি জামাই-এর মুখে তালাচাবি লাগাবেন। তালাচাবি চাই মানে অন্নদিকে চাই। কিন্তু কোথায় অন্নদি। কই চোখে পড়ছে না তো। কনেদি বলে অন্নদির মাথা ধরেছে। টাবলুদের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে আছে। তোমার এত মাথার যন্ত্রণা হয় কেন? চোখের অসুখ। ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন অন্নদি। পান সিগারেটের ট্রে হাতে বরেনদা সুজয়কে খুঁজছে। আরও কিছু প্যাকেট লাগবে। টাবলুর মা বলল—সুজয় অন্নদিকে মাথাধরার ওষুধ দিতে ওদের বাড়ি গেছে কিছুক্ষণ আগে। শুনে বরেণদার মুখটা তামাটে হয়ে গেল। ট্রেটা কার যেন হাতে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বরেনদা বেরিয়ে গেল।

রাঙাবউদির মুখটা কেমন সাদাটে। করুণ। বরেনদাকে রাঙাবউদি আর আমি রাঙাবউদিকে অনুসরণ করে ছুটলাম টাবলুদের বাড়ি। টাবলুদের ঘর অন্ধকার। সুজয়দাকে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দরজা বোধহয় খোলাই ছিল। সুজয়দার পাশ কাটিয়ে বরেনদা ভেতরে চলে গেল। সুজয়দাও একটু থমকে থেকে চলে গেল।

একফালি বাগান পেরিয়ে রাঙাবউদি সাইডের জানালায়। পিছন থেকে আমিও চোখ রাখি আধভেজানো দৃষ্টি পথে। এখন ঘরে আলো জ্বলছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বরেনদার। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্নদি। বরেনদার কর্কশ স্বর।

—কে? কে এসেছিল ঘরে? অন্নদি নিরুত্তর। বাকহারা। ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে। খোঁপা থেকে টান মেরে ছিঁড়ছে গোলাপ। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছেতাই। পাগলাটে দৃষ্টি। দু'কাঁধ ধরে তোমাকে ঝাঁকাচ্ছে কেন বরেনদা! নিষ্প্রাণ প্রতিমা তুমি অন্নদি ধীরে প্রাণ পাচ্ছ বুঝি!

—বল কে? কে এসেছিল ঘরে? ন্যাকামি হচ্ছে অন্ধকার ঘরে। খোল খোল। সব খোল আমি দেখব।

দেখবই।

—না...আ...আ...আর পাগলামি সইব না আমি।

—দেখবই। খুন করে ফেলব সব শালাদের। চালাকি হচ্ছে না?

অন্নদির চোখ জ্বলে উঠল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। প্রবল প্রতিরোধ—ঠুঁটো জগন্নাথ। পার্ভার্টেড। আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন। রোজ রোজ মজা পেয়েছ না!

প্রবল পরাক্রম যেন। দ্বিগুণ জ্বলে উঠে অন্নদিকে ধাক্কা মেরে মেঝেয় ফেলে দিল বরেনদা। অন্নদি মাটিতে পড়ে ছটপট করে বাধা দিচ্ছিল কিন্তু পেরে উঠল না। শাড়ি সায়া এলোমেলো। চোখের হেডলাইট জ্বালিয়ে দুই উরুর মাঝখানে ঝুঁকে পড়ল কালাপাহাড়।

অন্নদি তুমি কী মরে গেছ। চোখে মরা মাছের দৃষ্টি কেন? ছাদটা ভেঙে পড়ছে। টুকরো টুকরো। ফালা ফালা আকাশ। বিদ্যুৎ তরঙ্গ হল। কঠিন হল—শলাকা। গেঁথে গেল আড়াআড়ি রগ বরাবর। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলে তুমি। আর আমিও। একই যন্ত্রণায় আপ্লুত। ছুটছি।

ছুটে যাচ্ছি তেরো বছরের কিশোরী যেমন ছুটেছিলাম দেওঘরে। চিত্রকূট পাহাড়ে। মাসতুতো

ভাই আর বোন সীমাও গিয়েছিল। ওদের জেঠু নিয়ে গিয়েছিল। গরমের ছুটিতে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ওদের চিত্রকর জেঠুর কাছে কদিন আঁকা শিখব। মাসির সঙ্গে চলে এসেছি দেওঘরে একরকম জেদ করেই।

আগের রাতের একটা দুঃস্বপ্ন আমাকে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছিল না। সকাল থেকেই কেন যেন কান্না পাচ্ছিল। সমানে কাঁদছিলাম মার কাছে ফিরে যাব বলে। আমার মন ভালো করতে জেঠু চিত্রকূট পাহাড়ে ঘোরাতে নিয়ে যাবে বলে খুব সাধাসাধি করছিল। সীমা আর রতনও। শরীর মন না চাইতেও যাব না যাব না করে যখন গিয়ে পৌঁছলাম বেশ বেলা। লোকজন নামতে শুরু করেছিল। গুহার কাছে এসে আমি বেঁকে বসেছিলাম। রতন আর সীমা অনেকবার বলে বলে নাকাল। ওরা ওদের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তখন নীচে নামতে চাইছিল। জেঠু ওদের সাধ দিয়ে আমাকে অভয় দিতে একসময় নিমরাজি অথবা বলা যায় হালছাড়া।

অন্ধকার আমার ভয় করে। জেঠুর গা ঘেঁষে গুহায় ঢুকছি। জেঠু আমার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। স্বল্প পরিসর, অন্ধকারও। কাঁপাগলায় বলেছিলাম—জেঠু চামচিকে আর বাদুড় আছে নাকি? গন্ধ পাচ্ছি যেন।

—দেখই না কী আছে।

বাইরে তখনও একফালি রোদ। চোখে রোদ নিয়ে ভেতরে গিয়ে প্রথমে কিছু ঠাহর হচ্ছিল না। গুহার ভেতর আমি আর জেঠুর বয়স্ক হাত। একটা আমার কোমরে কেটে বসেছিল, অন্যটা নখ সমেত চামচিকে। দুটি কনকচাঁপা ক্ষতবিক্ষত করছিল। কাঁপছিলাম। দুলছিল আমার পৃথিবী। গা গুলোচ্ছে। তামাম মৃত্তিকা জুড়ে শতখানেক লাটিম ঘুরছে। বুকের কোটরে ঢাক পেটাচ্ছিল কেউ আর এলোপাথাড়ি লাফাচ্ছিল ঘোড়াগুলি, মালিরাও ফুল ছেঁড়ে।

দুপাশেই শক্ত দেওয়াল। প্রসারিত হচ্ছে, সঙ্কোচিত হচ্ছে। ছিটকে সরে যেতেই দেওয়ালে ধাক্কা। মাথাটাতো ঠুকলোই। জগৎ চুরমার। পায়ে কিছু ফুটল বুঝি! দলা পাকানো কান্না। বমন সামলাতে সামলাতে বলি—ছিঃ। নোংরা। রতনকে বলে দেব। এক্ষুণি। ছিঃ র...ত...ন।

—না, না বলবে না। লক্ষ্মী মেয়ে। সোনা মেয়ে। আমি তো তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম।

—পরীক্ষা! আমাকে! কেন পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা? আমার মুখ হাঁ হয়ে গেছে দেখে জেঠু আমার মুখ চেপে ধরে শক্ত করে। তারপর জান্তব ঘড়ঘড়ে গলায় বলতে থাকে—ভিতুর ডিম একটা। তুমি অত ভয় পেলে কেন কাল রাতে, আমি তো শুধু তোমার ওপর আঙুল দিয়ে ছবি আঁকছিলাম, সুখ ছবি। তুমি আঁকতে শিখবে। পনেরো দিনে ভ্যান গগ-পিকাসো। তুখোড় করে ছাড়ব তোমায়। আমার আদুরি আদর খাবে উঃ...

আদর! রতনের জেঠু মানে এই লোকটাই তো রাতে কম্‌প্লান গুলে খেতে দিয়েছিল। রতনদের মাস্টার এসেছিল বলে ওরা নেমে গিয়েছিল জেঠুর ঘর থেকে নীচে পড়তে। বিশাল বাড়ির ওপর মহলে জেঠুর স্টুডিও। ইজেল রং তুলি কত ছবি, সুন্দর সুন্দর ছবি। দেখতে দেখতে ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম, একটা পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে আমি ঘুমেও হাঁসফাস করছিলাম। দমবন্ধ হয়ে আসছিল আমার। আর অনেক অনেক কালো পিঁপড়ে আমার মুখ থেকে ঠোঁট থেকে কম্‌প্লান খুঁটে খাচ্ছিল। কামড়ে কামড়ে অস্থির করছিল। আরও কতসব কী যেন হচ্ছিল। একসময় যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। তবে কী স্বপ্নে নয়। তার মানে? তার মানে কী? হে ভগবান। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যে।

আস্থার তাবৎ ছবি চুর চুর। হাতের তালুতে থার্মাস ভাঙা পারদ গোলক। অজস্র। রতনের দূরাগত ডাকে জেঠুর থাবা আলগা হতেই দৌড়।

দৌড়ে ভাঙছিলাম নামার সিঁড়িও। লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। পিছনে ডাক। অনেক ডাক

রতন সীমা ওদের জন্ত্ত জেঠু। একপাটি চটি খুলে পড়েছে। নগ্নপদে রক্তাক্ত আমি ছুটছি। ছুটতে ছুটতে...এ কোথায় এলাম!

সময় এগিয়ে মাস দেড়েক আগের একটা হৈ চৈ পিকনিকের দিন। পাড়ার বন্ধুরা মিলে খয়ের বনে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। আমি আর শুদ্ধ দলছুট হয়ে ড্যামের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বনের ভেতর চলে গিয়েছিলাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের মিষ্টি রোদ্দুর চুঁইয়ে পড়ছিল আমার আর শুদ্ধর গায়ে। খেলছিল ঝিলমিল ঝিলমিল। বনের স্তব্ধ নির্জনতায় সবকিছুকে অবাস্তব করে ডেকে উঠছিল বন পাখিরা। বন জুড়ে ঝম ঝম করে বাজছিল ভালোবাসা থেকে ভালোবাসা জন্ম নেওয়ার কনসার্ট। পাখিদের ডাক চেনাতে চেনাতে শুদ্ধ কেমন বদলে গিয়েছিল, বনলতা বলে শুদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। আর চুমু হয়ে গলে গলে পড়ছিল সুপ্ত ঝর্ণাধারা। চুমু। মুগ্ধ চোখে মুখে ঘাড়ে গালে। কী যে মানিয়ে গিয়েছিল শুদ্ধকে। আমি হলুদ জামা শুদ্ধকে একটা হলুদপাখি হয়ে আমার বুকের কোটরে ঢুকে যেতে দেখলাম। সমৃদ্ধ আমার যেন আর কোনোদিন মাটিতে পা পড়বে না। বনও এই বুঝি নন্দন বন। নতুন করে জন্ম হচ্ছিল আমার।

নিজস্ব আগল থেকে উপছে পড়ে উড়ে যাচ্ছিলাম বাষ্প হয়ে চুঁইয়ে পড়া রোদ্দুর বেয়ে আকাশের মূল কিরণ-উৎসের দিকে। রঙিন প্রজাপতিটার ডানায় প্রতিফলিত হয়ে বুঝি বাহারি কল্পনায় ফুটে উঠছিল আমাদের আলিঙ্গন মুহূর্তটি। আর তক্ষুণি মাথার ওপর একটা মগডাল থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছিল তুঁতে রঙের পাখিটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় এলেমেলো হয়ে গিয়ে বলে উঠেছিলাম—কেন, কেন এমন করলে শুদ্ধদা? কথার কথা যেন না বললেই নয় বলে কিছু বলা। নিজের গলার স্বর নিজেরই অচেনা ঠেকছিল আমার। আমার লালচে মুখের দিকে তাকিয়ে শুদ্ধও কেমন যেন ঘাবড়ে যায়।

—এই, ও কিছু না—মানে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম, তোমাকে টেস্ট করলাম পরখ। তুমি কেমন মেয়ে...।

আমার কান ধাতব উত্তাপে আনচান। সক্রোধে একপাক ঘুরে গিয়ে শুদ্ধর গালে সজোরে একটা চড় মেরে ছুটতে শুরু করি। বনকে বনের কাছে, শুদ্ধকে শুদ্ধ'র কাছে ছেড়ে শাল-মহুয়ার শেকড় মাড়িয়ে, পাথর মাড়িয়ে, কাঁটাঝোর মাড়িয়ে ছুট ছুট ছুট। গাছ গাছালি আকাশ উল্টে পড়ছিল, সিঁয়াকুলের ঝোপে আঁটকে ছিঁড়ছিল শাড়ি।

ছুটছিলাম। লম্বা গলি। কিছুটা গিয়েই অন্ধকার। লক্ষ্য আমাদের বাড়ি। তপনদাদের রকটার কাছে একটা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়েই থেমে গেল হেডলাইটটা শরীরের ওপর জ্বেলে রেখেই। চোখ ধাঁধিয়ে যেতে থমকে দাঁড়াই। তীব্র আলোয় পরীক্ষা করা হচ্ছে চোখ মুখ বুক...।

নিরুপায় আমি লণ্ড-ভণ্ড হতে থাকি। চোখ বন্ধ করেও দেখতে পাই শরীর থেকে আলগা হয়ে খসে খসে পড়ছে আমারই অঙ্গ হাড়মাস। তপনদাদের রকটা কোনোরকমে পার হলাম। দু'পাশে সরে সরে যাচ্ছে ঘুমন্ত গাছ আর হা হা বাড়িগুলি। বেরিয়ে পড়েছে পরিত্যক্ত স্কেলিটন। বাড়ি একান্ত আমার বাড়িটার নাগাল পেতে তাবৎ অঙ্গারের মধ্য দিয়ে দগ্ধ হতে হতে ছুটে চলেছি এক হাড়ের মানুষ।

উজানবেলা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ফোনটা এল মাঝরাতে। প্রায় দেড়টা নাগাদ। গভীর নিশীথে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলে কার না বুক কাঁপে! নিঝুম অন্ধকারে ওই ধাতব ঝংকার বিশ্রী এক আকঙ্ক ছড়িয়ে দেয় না কী? মনে তো হয়ই, এই বুঝি কোনো দুঃসংবাদ এল!

মৈনাকের আগে আমিই ধড়মড়িয়ে উঠেছি বিছানা ছেড়ে। গিয়ে রিসিভার তুলতেই ওপারে পুলুর গলা,—অ্যাই দিদি, মা কী সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে রে!

পুলুর স্বরে বিপন্নতা, তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তবু ধুকপুকুনিটা যেন কমল না। ইদানীং মাকে নিয়ে ভারি দুশ্চিন্তায় থাকি। বয়স আশি পেরিয়েছে, চোখে ভালো ঠাহর পায় না, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায় বিকল. নানা আধিব্যাধিও ভর করেছে শরীরে, তবু নিজেকে কণামাত্র অথর্ব ভাবতে মা রাজি নয়। পেরে উঠুক না উঠুক, সংসারের সব কাজে হাত লাগাতে যাবে, পইপই করে বলা সত্ত্বেও রাতবিরেতে বাথরুম যাওয়ার সময়ে কাউকে ডাকবে না, একাই হুটহাট প্রবিবেশিদের বাড়ি চলে যাচ্ছে...। বিপত্তিও ঘটে মাঝেসাঝে। এই তো মাস খানেক আগে একটা বড়োসড় কেলেঙ্কারি বাধাল। কোনো প্রয়োজন ছিল না, সরস্বতীর মা আসেনি বলে নিজেই ওপরপড়া হয়ে জলের বালতি টানতে গিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে, নাকমুখ ফুলিয়ে ঢোল। কপাল ভালো, মাথায় চোট লাগেনি। অ্যান্টিবায়োটিক আর পেনকিলারের কল্যাণে ব্যাপারটা সামলেছে বটে, কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠার পারা তো চড়েছে খানিকটা।

উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে মার? কী করেছে?

—দ্যাখ না, রাতদুপুরে হঠাৎ আলমারি থেকে জামাকাপড় নামিয়ে এখন সুটকেস গোছাতে বসেছে?

--সে কী রে? কেন?

—কাল নাকি ভোর ভোর বেরতে হবে! বাবার সঙ্গে সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাচ্ছে!

—কী সর্বনাশ! হঠাৎ বাবা...?

—জানি না। বুঝতে পারছি না।

—আজ ঘুমের ওষুধ পড়েনি?

—হ্যাঁ। দেওয়া হয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, আমি যখন সাড়ে দশটায় ফিরলাম, তখন তো শুয়ে পড়েছে।...তারপর এই খানিকক্ষণ আগে হঠাৎ জেগে উঠে, আলোটালো জ্বালিয়ে...। পুলু একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, কী করি বল দেখি? মাকে তো আর শোওয়ানোও যাচ্ছে না। কেমন যেন একটা ট্রান্সে চলে গেছে রে!

চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী চলছে মার মধ্যে কে জানে, তবে মা যা জিদ্দি টাইপ, তাকে বাগে আনা সোজা কাজ নয়। পুলু তো পারবেই না, একটুতেই যা ঘাবড়ে যায়। এর পর মা যদি স্যুটকেস হাতে হাঁটা লাগায়, পুলু হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবে। আর নীলুর বউ? তার তো মাকে কবজা করার ক্ষমতাই নেই। দশ বছর আগে বাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে নীলু, তারপর থেকে শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কটা কেমন ঘাঁটা ঘাঁটা। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, দুটো পাল্লাই সমান সমান। শিপ্রার কথা মা থোড়াই শুনবে। একমাত্র তুলতুলি যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাকুমাকে ঠান্ডা করতে পারে আমিই চলে যাব? কিন্তু এত রাতে সালকিয়া থেকে টালিগঞ্জ ছোটা কী মুখের কথা? ট্যাক্সি মিলবে কী?

নাঃ, সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই। গলা ঝেড়ে বললাম,—ডক্টর সেনগুপ্তকে একবার ফোন কর না।

—এখন? রাত দুটোয়?

—আহা, এমারজেন্সি কেস তো। জিজ্ঞেস কর কোনো ওষুধ-টষুধ আছে কিনা, যাতে চট করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়।

—হুম্, সেটুকু হলেও তো আপাতত...

টেলিফোন রেখে ভার বুকে বসে আছি। মৈনাকও জেগে গেছে, সব শুনে সেও বেশ ভাবিত। টিউবলাইটটা জ্বেলে ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ ধোঁয়া দিল বুদ্ধির গোড়ায়। তারপর ভুরু কুঁচকে রায়, সেনিলিটি।

পুরোপুরি মানতে পারলাম না। মার যে খানিক ভীমরতি ধরেছে, এ তো আমরা সবাই জানি। বেশি বকবক করে, এক কথা বার বার বলে, বহু সময়েই খেয়ে ভুলে যায়...। চোখে না দেখুক, কানে না শুনুক, দিনে অন্তত বার চারেক টিভির খবরের সামনে বসা চাইই চাই। তুলতুলির সঙ্গে তা রোজ এই নিয়ে লাগছে। সে বেচারা হয়তো নাচাগানা দেখছে, মা খটাস চ্যানেল ঘুরিয়ে টিভির ডগার চোখ লাগিয়ে বসে গেল। বাচ্চাদের মতো আইসক্রিম, চিপস, আর কোল্ডড্রিংকসের দিকে ঝোঁক হয়েছে খুব। লজেন্স, চকোলেট পেলে তা মহা আহ্লাদিত, বাঁধানো দাঁতে কচর চিবোচ্ছে।

কিন্তু আজকের কীর্তিটাকে কী একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায়? বাবা চলে গেছে আজ আঠারো বছর। বাবার প্রসঙ্গ মা আজকাল তোলেও না বড়ো একটা, অথচ হঠাৎ মধ্যরাতে সেই বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সাধ জাগল কেন? রিটায়ার করার পর মাকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ঘুরতে গিয়েছিল বাবা, সেই স্মৃতিই কী স্বপ্নে এসে নাড়িয়ে দিল মাকে? ঘুমের ঘোরেই হয়তো করছে ওসব কাণ্ড! কিন্তু সেই ঘোরই বা কাটে না কেন? হলটা কী?

তা যাই হোক, রাতে অবশ্য অশান্তি আর বাড়ল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফের পুলুর ফোন, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন, বেরিয়ে কিনেও এনেছে পুলু, কয়েক ফোঁটা খাইয়ে দিতে শুয়েও পড়েছে মা। সকালে খবর নিলাম, মা তখনও আচ্ছন্নের মতো ঘুমোচ্ছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা দিলাম টালিগঞ্জ। গিয়ে দেখি মা তখন বাইরের ঘরের সোফায়। চোখ ঈষৎ ঢুলুঢুলু।

পাশে গিয়ে বসেছি। মাকে আর এক প্রস্থ নিরীক্ষণ করে বললাম, বাহ, ম্যাডাম তো ফিট।

মা যেন কথাটা ঠিক বুঝল না। হাসি হাসি মুখে তাকাল শুধু।

চোখ টিপে বললাম, জব্বর একটা খেল দেখালে বটে।

এবারও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। উল্টে বলল, ফোন করে এলি না তো আজ?

স্বর বেশ নিস্তেজ। শিপ্রাকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন ঘুম থেকে উঠেছে?

—এই তো, বারোটা, সাড়ে বারোটায়।

—স্নান করেছে?

—করতে চাইলেন না। খাওয়ার আগে মাথাটা ধুইয়ে দিয়েছি। শিপ্রা গলা নামাল, জানো তো, কালকের কথা মা বেমালুম ভুলে গেছে।

—তাই নাকি? ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছিস?

—উনি তো এসে দেখে গেলেন। বললেন, রক্তটা টেস্ট করাতে। সোডিয়াম পটাশিয়ামের ব্যালেন্সের গন্ডগোল থেকেও নাকি এমনটা হয়ে থাকে।

চিন্তা যেন বেড়েই গেল খানিকটা। নিজেকে প্রফুল্ল রাখার জন্য মাকে নিয়ে পড়েছি। গলা উঠিয়ে বললাম, তোমার কেসটা কী বল তো? হঠাৎ আবার সাউথ ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য খেপে উঠলে কেন?

—আমি? মা চোখ পিটপিট করছে, কই, না তো!

—বললে মানব? কাল ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে রেডি...?

মার তাও কিছুই স্মরণে আসে না। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে।

হাতে হাত রেখে বললাম, সঙ্গী হিসেবে আমাদের কাউকে মনে ধরল না? বাবাকে ওপর থেকে টানাটানি শুরু করেছ? আমরা কী তোমায় দক্ষিণ ভারত নিয়ে যেতে পারি না?

মা এবার কী শুনল কে জানে, গাল দুটো হাসিতে ভরে গেল সহসা। জ্বলজ্বলে চোখে বলল, একটা ভারি মজা হয়েছে, জানিস। ওই যে একটা জায়গা আছে...যেখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে পাখিদের খাওয়াতে হয়...হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা মনে পড়েছে...পক্ষীতীর্থম। কী গোবদা গোবদা সিঁড়ি ওখানে, বাব্বাহ্। অর্ধেক চড়েই আমার দম শেষ, সিঁড়িতে বসে পড়েছি।...এদিকে তোর বাবা তো উঠে গেছে টকাটক। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে বাবুর খেয়াল হল, বউ তো সঙ্গে নেই! অমনি তিনি ধরে নিলেন, আমি হারিয়ে গেছি! তারপর তো খুঁজছে পাগলের মতো। পাশ দিয়ে গটগট নেমে গেল...আমি ডাকছি...সে শুনতেই পেল না। পরে কী বলে জানিস? আমার ডাকাডাকি শুনে ভেবেছিল, ভিখিরি পয়সা চাইছে।

এ গল্প বহু বার শোনা। তবে আজ যেন মার বলার ভঙ্গি একটু অন্যরকম। যেন ঘটনাটা আজ-কালের মধ্যেই ঘটেছে। যেন এই মুহূর্তে মা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

মা ফের বলল, এর পর তো পুরীতে আর এক কেচ্ছা। আমি তো কিছুতেই সমুদ্রে নামব না...ওই জল, ওই ঢেউ...শাড়ি-টাড়ি সব মাথায় উঠে যায়...এদিকে তোর বাবাও ছাড়বে না, বলে কিনা আমার আন্ডারওয়্যার পরে নামো! শেষে তার কথা মতো...

হাজারো বার শোনানো গল্পে নতুন করে ডুবে যাচ্ছে মা। জড়ানো স্বর চড়ছে, নামছে। কখনও মুখে ফিকফিক হাসি, কখনও চোখ খুশিতে চিকচিক। সারাটা বিকেল এভাবেই স্মৃতিরোমন্থনে মশগুল রইল মা। কিন্তু বাবা যে নেই, তা নিয়ে একবারের জন্যও কোনো আক্ষেপোক্তি শোনা গেল না।

পরদিন রক্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর অনুমানই ঠিক, রক্তে সোডিয়ামেব পরিমাণ একটু কমের দিকে। তবে ভয়ের কিছু নেই, নুন খাওয়ার মাত্রাটা সামান্য বাড়ালেই চলবে।

কী আশ্চর্য, মাত্র সাত দিনে মা পুরো স্বাভাবিক। অর্থাৎ ফিরে গেছে পুরোনো ফর্মে। ছেলেমানুষি আর বকর বকর তো চলছেই, হুটহাট হাজির হচ্ছে রান্নাঘরে, আবছা চোখে কড়ার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে, মুখরোচক খানা বানাচ্ছে পুলু আর তুলতুলির জন্য। আবার আমার আঁটি চাকলা ভাগাভাগি নিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়াও চলছে সকাল বিকেল। রাতে ঘুমোচ্ছে দিব্যি। পুরনো ঘুমের ওষুধেই।

আমরাও মোটামুটি স্বস্তিতে। আগের মতোই হাসাহাসি করি মার কাণ্ডকারখানা দেখে। মায়াও জাগে অবশ্য। জানি তো, ভীমরতি মাকে এমনি ধরেনি। আহা রে, কম শোকতাপ পেয়েছে মা! বাবারই কী মৃত্যুর বয়স হয়েছিল? প্রাণবন্ত মানুষটা প্রায় বিনা নোটিসে, মাত্র ছেষট্টিতে...। নীলুর বেঘোরে প্রাণ হারানো তো মেনেই নেওয়া যায় না। মায়ের কাছে ওই পুত্রশোক যে কী মর্মান্তিক! তারপর মার থেকে দশ বছরের ছোটো মাসিমণি তো প্রায় মার হাতের ওপরেই মারা গেল। সে আঘাতও কম বাজায়নি মাকে। এছাড়া একের পর কে ভাসুর, দেওর, ননদ, জ্বলজ্যান্ত দুই ভাসুরপো, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে নিজের তিন ভাই, দুই ভাজ, ভগ্নিপতি...। মৃত্যুর এই মহামিছিল তো মস্তিষ্কের কোষগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে যাবেই। এত কিছুর পরও মা যে হাসছে. গল্প করছে, রান্না করতে চাইছে, এগুলো তো আমাদের উপরি পাওয়া।

এই নিশ্চিন্ততা অবশ্য বেশিদিন টিকল না। মাস দেড়েকও যায়নি, হঠাৎ এক রোববার দুপুরে তুলতুলির ফোন, ও পিসি, এক্ষুনি চলে এসো।

—কেন রে?

—ঠাম্মা আবার সেই আগের বারের মতো করছে!

—বলিস কী রে? আবার স্যুটকেস গোছাচ্ছে?

—না গো। ভাত খেয়ে উঠেই সাজতে বসে গেছে। ড্রেসিংটেবিলের সামনে। চুল বাঁধছে, পাউডার মাখছে, চুল বাঁধা পছন্দ হল না, আবার খুলে খোঁপা করেছে...

—কেনওও?

—এক্ষুনি নাকি ইভনিং শো শুরু হয়ে যাবে।

—কীসের শো?

—'পথে হল দেরি'। উত্তম-সুচিত্রার। দাদু নাকি বিজলীর সামনে অপেক্ষা করবে।

—সর্বনাশ! পুলু কোথায়?

—কাকামণি তো ভোরবেলা শান্তিনিকেতন গেল। কাল ফিরবে।

—খেয়েছে রে।...চোখে চোখে রাখ, যেন বেরিয়ে না যায়।

—ওই ওষুধটা দিয়ে দেব? এখনও রাখা আছে।

দু-এক সেকেন্ড থমকে থেকে বললাম, থাক। আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে ছুট। সঙ্গে মৈনাক। হাঁচোড় পাঁচোড় করে টালিগঞ্জ পৌঁছে দুরু দুরু বুকে নামলাম ট্যাক্সি থেকে। ভেতরে ঢুকে দেখি, সে এক দৃশ্য! মা খাটে পা ছড়িয়ে বসে। দু'দিকে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে তুলতুলি আর শিপ্রা। মার পরনে বহুকাল আগের এক রঙিন ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, কপালে ঘাড়ে গলায় ছোপ ছোপ পাউডার। মুখ বেজায় গোমড়া, ছোপ ছোপ পাউডার। মুখ বেজায় গোমড়া, কব্জি চোখের কাছে এনে ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন।

হতবাক মুখে বলল, এ কী অবস্থা!

শিপ্রা বলল, তাও তো এখন অনেকটা দমানো গেছে। ভাগ্যিস তুলতুলি নুনচিনির জলটা খাওয়াতে পেরেছিল, নইলে এতক্ষণ রোখা যেত না।

মা যেন প্রথমটা আমাদের খেয়াল করেনি। হঠাৎ আমার দিকে নজর যেতে গাল ফুলিয়ে বলে উঠল, ও ঝুনু দ্যাখ না, মা-মেয়ে আমায় জোর করে আটকে রেখেছে। তোর বাবা ওই দিকে রেগে যাবে না?

কথাটা ঝাং করে বুকে ধাক্কা মারল। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম, মা এখন স্বাভাবিক নয়। মনে হল, পাল্টা ধাক্কা দিয়ে মা-র অলীক জগৎটাকে ভেঙে দেওয়া দরকার। কড়া গলায় বললাম, কী আবোল তাবোল বকছ? জানো না, বাবা নেই?

—বললেই হল? আমার সঙ্গে কথা হয়েছে সে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকবে...

—না। বাবা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে না। বাবা মারা গেছে।

অবাক কাণ্ড, রূঢ় সত্যিটা শুনেও মার মুখে কোনো ভাঙচুর হল না। একটুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর ঠোঁটে এক অনাবিল হাসি। অবিকল অনেক অনেক বছর আগের মতো মা গ্রীবা হেলিয়ে বলল, জানতাম ঝোলাবে। 'হারানো সুর'-এর দিনও এমনটাই করেছিল। পরে ওজর গাইল, বন্ধুরা নাকি আটকে রেখেছিল আড্ডায়। আমি যেন কিছু বুঝি না? আচমকাই গলা খাদে নামিয়েছে মা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, আসলে তোর বাবা উত্তমকুমারকে ভীষণ হিংসে করে।

আমরা স্তম্ভিত। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

মা হাসিটাকে আর একটু বিছিয়ে দিয়ে বলল, কিছু হিংসুটে মানুষ বটে তোর বাবা। পাছে আমি উত্তমে মজে যাই, কিছুতেই তার বই দেখাবে না। নেহাত আমার সঙ্গে পেরে ওঠে না...। আমার বাপু সাফ কথা, তুমি সুচিত্রাকে প্যাটপ্যাট করে গিলতে পার, আমার উত্তমকে পছন্দ হলেই দোষ?

মৈনাক ভুরু কুঁচকে শুনছিল। কানের কাছে মুখ এনে বলল, ডাক্তারবাবুকে ফোন করব?

অস্থির অস্থির লাগছিল আমার। ঝেঁঝে উঠে বললাম, জিজ্ঞাসার কী আছে? শিপ্রার কাছ থেকে নম্বরটা নাও, মোবাইলে ট্রাই করো।

মৈনাক ও শিপ্রা চলে গেল পাশের ঘরে। মা কিন্তু থেমে নেই, আপন মনে চলেছে, শুধু উত্তমকুমারই বা বলি কেন, কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে আমি হেসে দুটো কথা বললেই তো তার জ্বলুনি। রমেশবাবুর সঙ্গে কী ব্যবহারটা করে বলে? বেচারার বউ মেরে গেছে, মাঝে মাঝে আমার হাতের মোচাটা লাউটা খেতে আসে, তাতেও বাবুর কী রাগ! বলতে বলতে মিটিমিটি হাসছে, সেদিন কী কাণ্ডটাই না করল...লজ্জায় মরে যাই! রমেশবাবু ভেতর বারান্দায় বসে আয়েস করে কচুর শাক খাচ্ছে, অমনি কোত্থেকে তোর বাবা হাজির। কোমরে হাত রেখে দেখছে খাওয়া। যেই না রমেশবাবু বলেছে, আপনার গিন্নির হাতে জাদু আছে মশাই, অমনি ভেংচে উঠল, কর্তার হাতে লাঠিও আছে স্যার! বোঝ বোঝ, কেমন একাযেঁড়ে ভালবাসা!

কথার প্লাবনের মাঝেই মৈনাক ফিরেছে। বলল, ডাক্তারবাবু ওই মেডিসিনটাই আবার অ্যাপ্লাই করতে বললেন। সেম ডোজ। না ঘুমোলে পেশেন্ট কুল ডাউন করবে না।

—কিন্তু কেন আবার রোগটা ফিরল?

—সিম্পল। সোডিয়াম লেভেল নিশ্চয়ই আবার ফল করছে। উনি তো আগের বারের ট্রিটমেন্টটাই টো টো চালিয়ে যেতে বললেন। রেগুলার সল্ট থেরাপি, আর এমারজেন্সিতে ওই নার্ভের ওষুধ। এতে ইমপ্রুভ না করলে নার্সিংহোমে ভর্তি করে স্যালাইন দিতে হবে।

অত দূর অবশ্য গড়াল না সমস্যাটা। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ ভীমরতিতে ফিলে এল মা। এবং যথারীতি সেদিনকার কীর্তিকলাপ মাথা থেকে উধাও। তবে পুলু এবার যথেষ্ট সতর্ক। বাড়িতে নির্দেশ জারি করেছে, মার নুন খাওয়া যেন কমানো না হয়। আশি বছরেও মা যখন রক্তচাপ নিয়ে তেমন ভুগছে না, নুন একটু বেশি খেলে ক্ষতি কী!

সেই মতোই চলছিল। গরম ফুরিয়ে বর্ষা এসে গেল হুড়মুড়িয়ে। প্রথম কয়েক দিন তো নাজেহাল দশা। সালকিয়া ভাসছে, গোলাবাড়িতে থই থই জল, জি টি রোড তো নদী। মার কাছে যাওয়া হয় না নিয়মিত। গেলে বেশিক্ষণ বসতে পারি না, আকাশ বেগতিক দেখলেই পালিয়ে আসি। সম্প্রতি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে মার। ফুচকার নেশা। রোজ বিকেলে গুনে গুনে চারটে ফুচকা চাই। কম হলে মুখ হাঁড়ি, বেশি হলে খাবে না।

ওই ফুচকাই নতুন করে বিপদ ডেকে আনল। কী সব মশলা টশলা দিয়েছিল কে জানে, কিংবা

হয়তো তেঁতুলজলে গড়বড় ছিল, খেয়ে হঠাৎই মার পেট ছেড়েছে। ওষুধ-টষুধ দিয়ে বাথরুম যাতায়াতটা বন্ধ করল পুলু, কিন্তু মা যেন ঝিমিয়ে পড়ল কেমন। কথাবার্তা বেশি বলে না, দিনভর শুয়েই থাকে। ফোনে চাঙা করার চেষ্টা চালাই, কাজ হয় না বড়ো একটা। পাপু বার বার বলছে, দিম্মাকে নিয়ে এবার পুজোর দিল্লি চলে এসো মা, গাড়িতে আগ্রা-বৃন্দাবন-মথুরা ঘুরিয়ে দেব। প্রিয় নাতির এমন সাদর আমন্ত্রণেও দিদিমা যেন উৎসাহী নয়, হুঁ হ্যাঁ কিছুই বলে না। আমাদেরও সংশয় জাগছে, মা যেমন জবুথবু হয়ে পড়ছে আর কী কোথাও নড়ানো যাবে?

এমনই এক সময়ে, একদিন সন্ধেয়, পুলুর আর্ত স্বর উড়ে এল,—মা তো আবার খেল দেখানো স্টার্ট করেছে রে দিদি!

একা বসে টিভি দেখছিলাম। সিরিয়াল মাথায় উঠল। ত্রস্ত সুরে বললাম, কী হল এবার?

—বর এসে গেছে, এদিকে কনের সাজ এখনও হল না...

—কার বর? কে কনে?

—সম্ভবত মা স্বয়ং। বাবা বিয়ে করতে এসেছে।

—যাহ্।

—হ্যাঁ রে। বাইরে নাকি খুব বৃষ্টি, বরযাত্রীরা ভিজে গেছে, তাদের শুকনো জামাকাপড় দেওয়া হল কিনা জানতে চাইছে। আরও শুনবি? বলছে, মেজদাকে যেন খবরদার পিঁড়ি ধরতে দিস না, রোগা মানুষ...

শুনতে শুনতে আচমকাই মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক শক। আজ বাবা-মার বিয়ের দিন না? একুশে জুলাই! কিছু মনে রাখতে পারে না মা, অথচ এই দিনটা স্মরণে রয়েছে? এবং পিছোতে পিছোতে চলে গেছে সেই গোড়ায়?

পুলু করুণ গলায় বলল, আমায় তো প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দিচ্ছে রে। পেঁয়াজরঙা বেনারসিটা কোথায় জানতে চাইছে, কোথায় রতনচুড় রেখেছি, বিছেহার, টিকলি...আরও কী কী সব যেন...

—দেরি করছিস কেন? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনট্যাক্ট করো

—ফোনে কথা হয়েছে। উনি বলছেন, ফ্লুয়িড লসের এফেক্ট। তবে এবার আর বাড়িতে হবে না, নার্সিংহোমে, স্যালাইন চলবে, অবজারভেশানে রাখবে কয়েক দিন...

—ও। আমার তালু শুকিয়ে এল। ঢোক গিয়ে বললাম, তাই করো তাহলে। যদি এতে মা সুস্থ হয়...

—আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মাকে নিয়ে যাচ্ছি। হেল্‌থ কেয়ারে। তোরা যদি একবার আসিস...

অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। যেতে তো হবেই। মৈনাক এখনও অফিসে, তাকে খবরটা দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। নার্সিংহোমটা টালিগঞ্জে, ভিড় জ্যাম ঠেলে পৌঁছলাম প্রায় আটটায়।

লাউঞ্জে পুলু আর তুলতুলি। হন্তদন্ত পায়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, এখন কেমন?

পুলু ঘাড় ঝুলিয়ে বসেছিল। শুকনো হেসে কাঁধ ঝাঁকাল, এমনি তো ঠিকই আছে। নো ফিজিকাল অসুবিধে।

—তোরা এখান কেন? মার কাছে থাকতে দিচ্ছে না?

তুলতুলি বলল, এতক্ষণ তো আমি ছিলাম। আমরা সামনে গেলেই যা উল্টোপাল্টা বকছে...! বর দেখতে কেমন হল, কোনো বরযাত্রী একশো আটটা রসগোল্লা খেয়েছে, কে জোরে জোরে বিয়ের কবিতা পড়ল...। বলতে বলতে হেসে ফেলেছে তুলতুলি, যাও না। দেখে এসো।

—অ্যালাউ করবে এখন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন তো থাকতেই পারে।

—ছোট্ট পরিচ্ছন্ন কেবিন। মা শুয়ে আছে শুভ্র শয্যায়। চোখ দুটো বোজা। ডান হাতের সবুজ শিরা বেয়ে লবণজল ঢুকছে শরীরে। ফোঁটা ফোঁটা করে।

টুল টেনে বিছানার পাশে বসলাম। নিঃশব্দে। মার কপালে হাত রেখেছি।

চোখ খুলল মা। কুয়াশা মাখা দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, কে? গীতা? এতক্ষণে তোর আসার সময় হল?

গীতামাসির খোঁজ করছে কী? মার জামালপুরের সেই বান্ধবী? তিনি তো বছর চারেক আগে মারা গেছেন!

তাড়াতাড়ি বললাম,—আমি ঝুনু। তোমার মেয়ে।

পরিচয়টা যেন মাকে ছুঁতে পারল না। অস্ফুটে বলল, গীতা এল না? বাসরে গান গাইবে বলেছিল?

—মা প্লিজ। ঘুমোনোর চেষ্টা করো তো।

—দুর বোকা, আজ কেউ ঘুমোয় নাকি? মার অশীতিপর মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব হাসি, দাদা আমাকে বলছিল, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে গাইতে। কী বুদ্ধি, বাসরে ওই গান চলে নাকি? আমি গাইব, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...। কী ভাল হবে না?

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। না, এ কান্না নয়, অন্য এক অনুভূতি। এ এমনই এক বোধ, যা সুখদুঃখের অতীত। আমার যুক্তিবুদ্ধি বলছে লবণজল এখনও মার শরীরে ক্রিয়া শুরু করেনি। করলেই এ ঘোর ক্রমে কেটে যাবে। তখন আজকের সন্ধেটা মার মনেও থাকবে না।

কিন্তু হৃদয় যে অন্য কথা বলে। থাকবে। থাকবে। মার অবচেতনে। জীবন যত ফুরিয়ে আসছে, মৃত্যুর দিক থেকে ততই মুখ ফেরাতে চাইছে মা। সময়ের উজান স্রোতে ভাসছে। শোকতাপ, বেদনা, মৃত্যু, সবই এখন মার কাছে চাপ চাপ অন্ধকার। তার মাঝে শুধু ফুটে ওঠে কয়েকটা আলোর বিন্দু। সুখের মুহূর্ত। বিয়ে তো হল, এবার হয়তো এক্কা-দোক্কার দিনে ফিরবে মা।

পড়ন্তবেলায় এই সব মুহূর্তগুলোই কী খোঁজে মানুষ? একা একা!

স্নেহলতা

মীনাক্ষী সেন

॥ এক ॥

লোকটা এল ঠিক দুপুর বেলা। স্নেহলতা তখন ঘুমোচ্ছেন। লোকটার চেহারা চোয়াড়ে, মুখভাবে নিষ্ঠুরতা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান। লোকটা উঠোনের মস্তবড়ো জলের ট্যাঙ্কের ওপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে এসে দাঁড়াল।

ডাকল, কেউ বাড়ি আছেন?'

যেহেতু স্নেহলতা তখন ঘুমোচ্ছেন, কোনো জবাব এল না। 'এত বড়ো জলের ট্যাঙ্ক আবার কেউ বানায় নাকি?' লোকটা তার কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এই বিষয়টা নিয়ে ভাবল এবং আবারও ডাকল—'বাড়িতে কেউ আছেন?'

স্নেহলতা এই ডাকে সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠলেন। তার ঘুমন্ত মুখের রেখায় যে গাঢ় অতৃপ্তি ও দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল—তা আরও গাঢ় হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি জাগলেন না এ ডাকেও।

লোকটা দ্বিতীয় ডাকেরও কোনো জবাব না পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে খোলা টানা বারান্দায় উঠে এল। সে ঠিক ঘরটির সামনেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এই একটি ঘরই খোলা। বাকিগুলো যে তালাবন্ধ, টানা বারান্দার এধার ওধার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে লোকটি তা প্রথমেই দেখে নেয়।। তারপর খোলা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই স্নেহলতাকে দেখতে পায়।

স্নেহলতা শুয়ে ছিলেন, লোকটি তাই স্নেহলতার বয়স ঠিকমত ঠাহর করতে না পারলেও শায়িতা মহিলাটি যে যথেষ্ট বৃদ্ধা, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না তার।

যেহেতু সে একটা দুসংবাদ এনেছিল—তাই এমন এক বৃদ্ধাকে এই দুসংবাদটি দেওয়া উচিত হবে কী না ভেবে তার মনে ইতস্তত ভাব জেগে ওঠে।

পরক্ষণে সে এইভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়—কারণ তার ডিউটি শেষ, কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে বড়োবাবু এই অপ্রিয় কাজটি তাকে ধরিয়ে দেন। সে চাকরিতে একেবারে নতুন ঢুকেছে বললেই হয়—এ অবস্থায় বড়োবাবুর কোনো কথায়, তা অনুরোধ হিসেবে এলেও, না করা সম্ভব নয়, সে না করতে পারেনি, তবে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল তো মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল তো ঠিকই। এখন এই কাজটা শেষ করে বাড়ি যাওয়ার তাড়া ফিরে এল মনে।

—ওঃ, কি বিশ্রী, সারাদিন এই থানার গরমে বসে বসে ঘামা — এর চেয়ে আউটডোর ডিউটি পড়লে সময়টা তবু কেটে যায়... মনে মনে বলতে বলতে সে বেশ চড়া গলায় ডাকল এই যে আপনি শুনছেন?

এবার পাশের ছোটো একটি ঘরের দরজা দমাস শব্দে খুলে গেল। এই ঘরটা আগে লক্ষ্য করেনি লোকটা। ঘরটা থেকে মধ্য বয়স্ক একজন মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখে লোকটা সবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছে — কারণ একজন পুরুষ এবং মধ্যবয়স্ক মানুষকে দুঃসংবাদটা দেওয়াই যায় এবং সেই মানুষটা নিজেই লোকটার কাছে এগিয়ে এল 'কী চাই? কাকে?'

—এই যে, এই টে...' বলে লোকটা পকেট হাতড়ে কিছু বের করতে যাচ্ছিল— তার আগে নেহাৎ নিয়মরক্ষার মতো করে সে মধ্যবয়সী লোকটাকে জিজ্ঞেস করল —'আপনি কনকেন্দু রায়ের কেউ হন?'

— কনক? হ্যাঁ, এ্যা শালা, গুয়ো ভুতো... বলে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘুরে সেই মধ্যবয়সী লোকটা, অর্থাৎ প্রণবেন্দু হাসতে থাকে নিঃশব্দে। হাসির দমকে এক অব্যক্ত শ্বাস টানার মতো আওয়াজ আর কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার লম্বা, রোগা শরীরটা।

—'সর্বনাশ, এ যে পাগল দেখছি, এর কাছে তো দেওয়া যাবে না!' লোকটা কাগজটা বের করেও পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। কোনোমতে কারও হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিতে পারলেই সে শান্তি পেত। কিন্তু বড়োবাবু বলে দিয়েছেন — বাড়ির লোক যেন খবর পেয়ে ইমিডিয়েটলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, বলে আসবেন। তা এই বলে যাওয়ার মতো একটা লোক তো চাই সে যতক্ষণ এই কথাটা ভাবছে, ততক্ষণে প্রণবেন্দু কোনোদিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা বারান্দা দিয়ে উঠোনে নেমে গলিপথে রাস্তার দিকে চলে গেল। 'যা বাঃ বা, এতো ভালো ঠ্যালায় পড়লাম।' সে ভাবল এবং চূড়ান্ত বিরক্তি নিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তার ডিউটিকালীন কর্কশ গলা বের করে চিৎকার করল — 'এই যে, শুনছেন, আপনাকে বলছি...'

এবার স্নেহলতার ঘুম ভাঙল। তিনি খুব একটা চমকে উঠলেন না। যেন এক ডাকাডাকিতেই তিনি অভ্যস্ত এইভাবে ধীরে সাড়া দিলেন, 'কে-এ-এ?' তারপর উঠে বসলেন আস্তে সুস্থে, উঠে বসতেই লোকটা দেখতে পেল স্নেহলতার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, বয়সের ভারে চামড়া শিথিল হয়ে গেছে তবু তার কী চিকন ঔজ্জ্বল্য, আধা-পাকা আধা কাঁচা মসৃণ চুল মুখখানাকে আরও অভিজাত করে তুলছে—যদিও এই আভিজাত্যের সঙ্গে খাপ খায়নি তার শীর্ণ মুখের আর পীড়ার কুঞ্চনগুলো।

সত্যি কথা বলতে গেলে স্নেহলতার চেহারা লোকটার মনে তেমন কোনো দাগ কাটে না। কোনো মায়াদয়াও অনুভব করে না সে, বরং চেহারার এই আভিজাত্য তার মনে একটু বিরুদ্ধভাবই জাগিয়ে তোলে। কিন্তু স্নেহলতা যখন 'কে—এ, কী দরকার' বলে বিছানা থেকে নেমে শাড়ি গুছিয়ে সেকেলে আটপৌরে ঢঙে ফিরতি আঁচল চাবির গোছা সমেত কাঁধের ওপর ফেলে এগিয়ে আসেন—তখন লোকটা খেয়াল করে, মহিলা চোখে প্রায় দেখেন না। সেই প্রায় অন্ধ হেঁটে আসা তার মনে অভূতপূর্ব করুণার উদ্রেক করে।

স্নেহলতা সম্ভবত কোনো একটি অবয়ব দেখতে পান, কিন্তু অবয়বটি কার তা বুঝতে পারেন না। তাছাড়া সদ্য ঘুম থেকে ওঠার আবেশে পা ফেলতে বা চোখ মেলে তাকানোতে, দুটোতেই অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে প্রায় টলমল করে ডান হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে বাতাস কাটার ভঙ্গিতে যতক্ষণে তিনি ঠিক ঠিক লোকটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন —ততক্ষণে লোকটা পকেট থেকে বের করা কাগজটা আবার পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে। — এটা কী কনকেন্দু রায়ের বাড়ি?

—কনকেন্দু? হ্যাঁ, সে আমার ছেলে, তবে সে তো এখানে থাকে না...

— তা হোক, কেউ তো থাকে... লোকটা আবার বাস্তববাদী গলায় জিজ্ঞেস করল— এ বাড়িতে আপনার সঙ্গে কেউ থাকে তো? না কী?

—হ্যাঁ থাকে, আমার আরেক ছেলে...

— সে এখন কোথায়?

লোকটির জিজ্ঞেসার উত্তরে স্নেহলতা ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক দেন—

—প্রণব, ও প্রণব,—দ্যাখেন তো পাশের ঘরে। কেন আপনি কী চান? স্নেহলতা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশের ঘরটা দেখান এবং একই সঙ্গে অন্য প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেন।

স্নেহলতাকে পাশের ছোটো ঘরটির ইঙ্গিত করতে দেখে লোকটা হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। —ও, সেই পাগল নাঃ, আপনার অন্য এক ছেলে নাকি কোথায় এক বড়ো অফিসার?

—অফিসার? ও, রূপেন্দু, না সেও এখানে থাকে না সেতো অনেক দিন। আসে, মাঝে মাঝে আসে... স্নেহলতা লোকটির জিজ্ঞেসাবাদে একটু বিরক্ত, সামান্য ভীতও যেন হয়েছিলেন। এখন লোকটি তার অফিসার ছেলেকে খুঁজছে ধরে নিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে যেন বেশি কথাই বলতে থাকেন।

লোকটির মুখের করুণার রেখাগুলি কিন্তু 'সেও এখানে থাকে না' কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় অদ্ভুত বিস্ময় আর আগের মতো নিষ্ঠুরতার রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে।

—কী আশ্চর্য। এই পাগলকে নিয়ে এত বড়ো বাড়িটায় আপনি একা থাকেন না কী? এ হ্যাঁ। বলতে বলতে হঠাৎই যেন আত্মসংযম হারিয়ে কর্কশ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে— কৃষ্ণেন্দু রায় আপনার কে হয়?

এই প্রশ্নে স্নেহলতা স্পষ্টতই কেঁপে ওঠেন, তার মুখের উৎকণ্ঠার রেখাগুলো গাঢ় হয়ে ওঠে। কিন্তু লোকটি মনে মনে এই ঊর্ধ-সত্তর মহিলাটিকে তারিফ না করে পারে না, কী অসম্ভব মনের জোরে তিনি নিজের কাঁপুনি ও উৎকণ্ঠাকে দমন করে প্রায় স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেন—কৃষ্ণ, হ্যাঁ সেও আমারই—ছেলে, তবে সেও তো এখানে থাকে না।

—সেটা আমি জানি।

লোকটার গলার রূঢ়তা তখন রয়েছে এবং এই ঝনঝাটের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বোধহয় আরও রূঢ় এবং মরিয়া গলায় সে বলে—একটা খবর ছিল...

—খবর?

স্নেহলতা সতর্ক এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—খবর? কিন্তু কৃষ্ণ তো এখানে খুব একটা আসে না, তাকে কী করে খবর দেব?

স্নেহলতা শেষ কথাগুলো মিথ্যাই বলেন, কৃষ্ণ বাড়িতে আসে না আজ এক বছরের ওপরে হল। খুব একটা আসে না নয়—মোটেই আসে না। কথাগুলো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেও আস্তে আস্তে স্নেহলতা যে সংযমে নিজেকে ধরে রেখেছিলেন তা হারিয়ে ফেলেন, খুব উৎকণ্ঠিত দেখায় তাকে। তার সন্দিগ্ধ কাতর প্রায়ান্ধ দৃষ্টি লোকটির ওপর স্থাপন করে স্নেহলতা প্রশ্ন করেন—কেন? কী খবর দিতে চান তাকে? আপনি কে? কী খবর? কী?

স্নেহলতার এই উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে লোকটির মুখের রেখাগুলো আবার নরম হয়ে আসে। আসলে তার মুখের রেখাগুলোই হয়ত প্রতারক। সম্ভবত লোকটি অন্তরে নিষ্ঠুর নয় —নাহলে এত সহজে নরম হয়ে পড়ত না।

—না, অসম্ভব, এই বৃদ্ধাকে, একে এমন খবর আমি দিতে পারব না।

ভাবতে-ভাবতে লোকটি তার ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলে। সে ঠিক করে, থানায় ফিরে গিয়ে সে বড়োবাবুকে জানাবে 'ম্যাসেজটি ডেলিভারি' দেওয়ার মতো কাউকে সে পায়নি। তারপর বাড়ি ফিরে যাবে। ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পরও তো অনেকটা সময় সে দিয়েছে। বড়োবাবু নিশ্চয়ই এবার তাকে রেহাই দেবে। অন্য কাউকে পাঠাবে আবার।

দুঃসংবাদটি তাকে 'ডেলিভারি' দিতে হবে না ভেবে লোকটি খুব নিশ্চিন্ত ও খুশি হয়ে ওঠে।

আজ বাড়ি ফিরে রেশন তোলার কথা, বাজারও করতে হবে এবং বউ বলেছিল... ইত্যাদি সমস্ত জরুরি অথচ নিত্যনৈমিত্তিক সাংসারিক কাজগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তার। সে দ্রুত বারান্দা থেকে উঠোনে নামে —'আচ্ছা আমি যাই তবে' গোছের কিছু একটা বৃদ্ধাকে বলতে বলতে।

ঠিক তখনই 'টিন-টিন-টিন, টিন-টিন-টিনটা টিনা' করে 'এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়'... জনপ্রিয় হিন্দি গানটির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, বেঁটে ফরসা, গোলাপি গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট পরনে, খুব কায়দা করে শ্যাম্পু—ওড়া চুল আঁচড়ানো একটি ছেলে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় এসে ওঠে। 'দিদিমা, ও দিদিমা, হাউ আর ইউ? কই হ্যায় ঘরমে? তুমি ছাড়া?'

দিদিমা।

লোকটা উঠোনে নেমেও থমকে দাঁড়ায়। দিদিমা, মানে ছেলেটি মহিলার নাতি। সে যথেষ্ট তরুণ এবং স্বাস্থ্যবান। কাজেই তাকে তো খবরটা বলতে কোনো বাধা নেই এবং এখন তাকে কাগজটা দিয়ে ফেলতে পারলেই ডিউটি শেষ। তাছাডা সমস্ত সাংসারিক ও জরুরি কাজগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় লোকটি খুব তাড়ার মধ্যে পড়েছিল। কাজেই সে এতক্ষণ ধৈর্য ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে কাগজটি পকেটে রেখে, বৃদ্ধাকে দুঃসংবাদটির আভাসমাত্র না দিয়ে, সে সব ভুলে দ্রুত কাগজটা ছেলেটির হাতে তুলে দেয়।

—'দেখুন, আমি থানা থেকে আসছি, এই ম্যাসেজটা আপনার মামাদের কাউকে ... বা কৃষ্ণেন্দু রায়ের যদি ওয়াইফ থাকেন—বলবেন এক্ষুণি যেন থানায় গিয়ে বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করেন—উনিই সব বলে দেবেন...'

স্নেহলতা যে ঘরটিতে ছিলেন, তার আগের ঘরটির জানলার সামনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল—লোকটার বাধা পেয়ে। লোকটা তাড়াহুড়ো করলেও যথেষ্ট নীচু গলায় কথাগুলো বলে। ছেলেটি কিন্তু এতই ঘাবড়ে গেছিল যে কোনো কিছু খেয়াল না করেই চিৎকার করে ওঠে—'থানা? কোন্ থানা? থানা কেন?'

তারপর লোকটির দেওয়া কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে বেশ উচ্চকণ্ঠে খবরটা পড়তে শুরু করে। ওয়ারলেসে এক থানা থেকে অন্য থানায় এসে পৌঁছানো খবরটি একটি মলিন কাগজে, কালো বিবর্ণ কালিতে লেখা ছিল বলে, তার খবরটি পড়তে একটু অসুবিধা হয়। যথেষ্ট থেমে—থেমে কিন্তু জোরে-জোরে সে খবরটি পড়ে।

—কৃষ্ণেন্দু রায়, নোন বাই লোকাল রেসিডেন্ট অ্যাজ ব্রাদার অফ ফেমাস সিংগার কনকেন্দু রায় ওয়াজ ফাউন্ড ডেড...। ডেড?

এই পর্যন্ত পড়ে এবং দ্বিতীয়বার ভীত আর শুকনো গলায় 'ডেড' কথাটি উচ্চারণ করে ছেলেটি চমকে উঠে পাণ্ডুর হয়ে একেবারে থেমে যায়।

—আঃ, ও, আপনি কী করলেন আপনি, এমন ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে পড়লেন কেন? খাসা চিজ তো আপনি। আমি বলে এতক্ষণ এই মহিলার জন্য ... বুড়ো মানুষটা, আপনারই তো দিদিমা, কী করলেন? লোকটা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

—দিদিমা!

ছেলেটি এতক্ষণে নিজেকে সামান্য একটু সামলে নিয়েছে, হয়ত। কিন্তু তার বিবর্ণ ও হতবুদ্ধিভাব কাটেনি। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে —দিদিমা ইংরেজি বোঝে না।

—বোঝে না।

লোকটা সামান্য স্বস্তি বোধ করে। হতে পারে, সত্তরের ওপরে বয়েস এমন এক মহিলা ইংরেজি জানে না, হতেই পারে ভেবে সে একটু শান্ত হয়। নইলে সে এতক্ষণ যে কারণে সময় নষ্ট করেছে, ছেলেটি এক কথায় তা পণ্ড করে মহিলাকে দুঃসংবাদটা জানিয়ে দিল বলে উদগ্র-ক্রোধ অনুভব করছিল সে।

একটু শান্ত হয়ে লোকটা এই সত্যিটাও বুঝতে পারে, মহিলাকে তো এক সময় দুঃসংবাদটা শুনতেই হবে হয়ত। এখন তার সুজন এসেছে, তার সামনে দুঃসংবাদটার আঁচ যদি মহিলা পান, তবেই বা সে এত রেগে যাচ্ছে কেন?

নিজেকে শান্ত করতে করতে লোকটা তার বাকি ডিউটিটুকু শেষ করার জন্য জিজ্ঞেস করে—'দিদিমা, উনি—আপনার? মানে আপনি ওনার মেয়ের...'

'না, না, নিজের মেয়ের নয়, বেশ দু-উ-র সম্পর্কের নাতি আর কী...'

লোকটির প্রশ্নের উত্তরে 'দ উ র' শব্দটা উচ্চারণ করে ছেলেটি যেন নিজেকে এই দুঃসংবাদটার থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। বেশ একটা কঠিন পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। এখন দায়িত্ব এড়িয়ে পালাতে চাইলেও অপ্রীতিকর কোনো না কোনো দায়িত্ব তার পালন করতেই হবে, অথচ কিছু করতে তার খুব অনিচ্ছা ও ভীতি, এই রকম একটা বিমর্ষ ও দ্বিধাগ্রস্তভাব নিয়ে পলায়নপর ভঙ্গিতে ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

দিদিমা ইংরেজি জানে না বলে নন্দন নিজেকে ও লোকটিকে স্তোকবাক্য শোনালেও স্নেহলতা ইংরেজি একেবারে বোঝেন না তা নয়।

নন্দন সত্যিই তার দূর সম্পর্কের নাতি, ভালো ছবি আঁকে, মূর্তি বানায়, মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসেছে ভাগ্য খুঁজতে। কদিনই বা সে দেখেছে স্নেহলতাকে ভালো করে। তাই জানে না যে, আসলে শিক্ষা তো আর শুধু বইপুঁথি পড়া, ইস্কুলে যাওয়া নয়, জীবনযাপনের ধরনও তো মানুষকে শিক্ষিত করে। আর তিনি এক ডাক্তারের বউ হয়ে 'ডেড' শব্দটির অর্থ জানবেন না?

তাছাড়া উচ্চশিক্ষিত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনিদের কথাবার্তা শুনতে-শুনতেও তিনি অনেক ইংরেজি শব্দ জানেন। স্বাভাবিক সময়ে কথা যখন বলেন, তা এতই মার্জিত এবং ধারালো যে কেউ বলতে পারবে না তিনি লেখাপড়া শেখেননি কখনও।

শুধু 'ডেড' নয়—কৃষ্ণেন্দু এবং তাঁর প্রসঙ্গে কনকেন্দু ও ব্রাদার শব্দটি শুনে ও বাক্য গঠনটি লক্ষ্য করে তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন 'ডেড' শব্দটি কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শব্দটি যেন এক ভারী পাথরের মতো তীব্র ভরবেগ নিয়ে আঘাত করল তার বুকে। তিনি কোথাও কোনো ব্যথা অনুভব করলেন না, কিন্তু সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল তার। প্রথমে মনে হল তিনি পড়ে যাবেন মাটিতে। তারপর অসাধারণ সংযমে নিজেকে সামলে নিলেন। পরমুহূর্তেই মনে হল, বাতাস ফুরিয়ে গেছে পৃথিবীতে। তিনি মস্ত বড়ো হাঁ করে ডাঙায় তোলা মাছের মতো দুবার খাবি খেলেন—তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে আগের চেয়েও করুণভাবে বাঁ-হাতে বাতাস হাতড়াতে হাতড়াতে খাটের ধারে গেলেন এবং পুরনো দিনের উঁচু কারুকার্যময় সেগুন কাঠের পাটায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন বিছানায়।

সাত সন্তানের মা তিনি, বয়স পঁচাত্তর হয়ে গেল। স্বামীকে অকালে হারানোর শোক পেয়েছেন। উপযুক্ত ভালো চাকরি করা সমর্থ ছেলে পাগল হয়ে গেছে, সে শোক পেয়েছেন। কিন্তু লোকে বলে সন্তানের মৃত্যুশোকের তুল্য কোনো শোক নেই — সেই শোক এই পঁচাত্তর বছর বয়সে প্রথম আঘাত করল তাকে।

কেমন লাগছে তার? তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। শুধু, প্রথমেই তার মনে এল সবচেয়ে দূরে আছে যে সন্তান, তার কথা। সবচেয়ে সংসারের ভালোমন্দ বুঝতে, সবদিকে যার নজর ছিল, সেই ছেলে এই রাজ্যে কোনো চাকরি না পেয়ে কতদূরে চলে যেতে বাধ্য হল। আসতে যেতে গুচ্ছের টাকা পয়সা খরচা, সময়ও লাগে দু-তিনদিন, ছেলেপুলে বউ নিয়ে হরদম আর

আসতে পারে কই? ভেবে রেখেছিলেন, এবার সে এলে একবার বলবেন তাকে কৃষ্ণর খোঁজ করতে।

স্নেহলতার যেন মনে হল তার নব—সেই সবচেয়ে দূরপ্রবাসের ছেলে, তার একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে—ও মা, একদম কেঁদো না, আমি তো আছি।' ...নবেন্দুর পেছনেই যেন দেখলেন কনককে, তার আর এক কলজের টুকরো—কেমন উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

একটু পরেই ঘোর কেটে গেল তাঁর। নব নয়, নন্দন জড়িয়ে ধরেছে তাকে—'ও দিদিমা, দিদিমা...'

নন্দন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খুব ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে নড়ে উঠল স্নেহলতার ঠোঁট দুটি — যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে তার স্বর, এমন মৃদু ও অস্পষ্টভাবে তিনি বললেন —আমি এখন কী করুম?

এই প্রথম নিজস্ব পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে কথা বললেন তিনি, কারণ নন্দন বা লোকটিকে নয়, বোধহয় নিজেকেই তিনি কথাগুলো বলছিলেন এবং নিজেই যেন খুঁজে নিলেন প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে উনি হাতটি তুললেন ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে আঙুল নাড়লেন — সে আঙুলে ফুটে উঠল এক বিরাট সংসারের একদা কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা। তিনি নন্দনকে জিজ্ঞেস করলেন – ন-মামীর বাড়ি চেনো তুমি? বাপের বাড়ি?

—'হ্যাঁ, এ্যা, একবার গেছি তো, পারব বোধ হয় চিনতে'। নন্দন দ্বিধাগ্রস্থ ও অনিশ্চিতভাবে বলে। এই ঘটনা, দৃশ্য এবং এই খবরকে কেন্দ্র করে আগামীতে যেসব ঘটনা ঘটতে চলেছে, সেইসব কিছুর থেকেই পালাতে চাইছিল সে। যদি খবরটা ন-মামী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দুর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে সে পরিত্রাণ পায়, এই আশায় বলল—'যাব সেখানে? দিদিমা?'

—হ, মা, মামীরে বা তার মায়েরে পাইলে ভাইঙ্গা কিছুটা কইস না. ক গিয়া মামীরে এক্ষুনি দেখা করতে আমার এখানে, আর ভাইপো কাউরে পাইলে সব কিছু খুইল্যা ক. তারপর আমারে খবর দিয়া যা কি হইল।'

বোঝাই যাচ্ছিল স্নেহলতা অনেকখানি সামলে নিয়েছেন নিজেকে। অকম্পিত গলায় কথা বলতে বলতে বাক্যের শেষের দিকে পৌঁছে তার গলা বসে গেল। শেষ অক্ষরগুলো হারিয়ে গেল হাওয়ায়।

তবু উপস্থিত দুজনেই বুঝলেন স্নেহলতা কী বলতে চাইছেন।

—আচ্-ছা... তবে যাই মামীর বাড়ি...

কাগজটা হাতে নিয়ে, যেন কাগজ নয় এক দশমনি পাথরের বোঝা বইছে, এমন ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে উঠোনে নেমে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। একটু আগেই টিন-টিন-টিন করতে খোস-মেজাজে দিদিমাকে দেখতে এসেছিল যে নন্দন, তার বিধ্বস্ত চেহারা।

—শুনুন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন—কেউ না এলে, এই বৃদ্ধাকে একা ফেলে তো আর...

॥ তিন ॥

কী আশ্চর্য, লোকটা প্রশ্ন করছিল নিজেকেই নিজে।

—আমি চলে যাচ্ছি না কেন? বসে আছি কেন এখনও? 'ম্যাসেজ ডেলিভারি' করা হয়ে গেছে, বড়োবাবু দেখা করতে বলেছেন, সে কথাও বলা হয়ে গেছে এক আত্মীয়কে। মৃতের বউ-এর কাছে খবর গেছে, তবুও এখানে বসে আছি কেন আমি।

নিজের কাজের পেছনে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কিন্তু যেতেও পারছিল না একাকী এই বৃদ্ধাকে ছেড়ে।

এর মধ্যে বার তিনেক এসেছে প্রণব। মায়ের কাছে একবার পয়সা চাইল, একবার খাবার। 'দুলুর দোকান থিকা কিন্যা নে কেক বা কিচ্ছু...' বলে স্নেহলতা তাকে আবারও বাইরে পাঠালেন, লোকটি দেখল।

সে যেন কেমন এক মায়া অনুভব করছিল বৃদ্ধার জন্য। নতুন করে বুঝতে পারছিল, পুলিশে চাকরি করার পক্ষে সে খুব অনুপযুক্ত। তার শরীরে মায়া দয়া বেশি। এমন হলে পুলিশের চাকরি করা কঠিন। সহকর্মীরা পেছনে লাগে, ওপরওয়ালা ধমকায়, আর কাজও বেড়ে যায়। তবু স্বভাব পালটানো কী অত সহজ? আজ ওই বৃদ্ধার কাছে ছেলের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসার সময় সে যে খুব বিচলিত বোধ করেছে তারও এক পূর্ব ইতিহাস আছে।

যখন তার ন বছর বয়স, তখন মা মারা যায় তার। মাকে তাই মনে আছে, আবারও নেইও। মনে আছে তার শ্রীময়ী মায়ের শান্ত কোমল স্বভাব, অপরিমিত আদর, নিপুণ যত্নে খাইয়ে দেওয়া, ঘুম পাড়ানো—কী নরম আর ঠাণ্ডা ছিল মায়ের হাত, কী মিষ্টি ছিল মায়ের গলা।

বাকি যেটুকু তার মনে নেই—সে ফাঁকটুকু সে ভরে নিয়েছে কল্পনায়। সে কল্পনা ও বাস্তব স্মৃতিতে মিলে যা তার কাছে কোমলতা, স্নেহ আর ভালোবাসার এক অতল আঁধার...

তার কাছে সব মা-ই তাই। এমন এক মা কী করে সন্তানের শোক সহ্য করে? সে ভেবে উঠতে পারে না।

সে বড়ো হয়েছে তার মাসীর কাছে। মাসী নিরন্তর তাকে বুঝিয়েছে তার শান্ত আর নরম প্রকৃতির মা, বাপের মদ্যপ আর জহ্লাদ স্বভাব সইতে না পেরে অসুখে-অসুখে মারা যায়।

বাবাকেও সে বিশেষ পায়নি। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এক হোমগার্ড মহিলাকে, ছেলের খবর রাখতেন না। কিন্তু সে পক্ষের কোনো ছেলেপুলে না হওয়ায় 'লিভার' ফেটে যখন মারা গেলেন বাবা, তখন তার টাকা পয়সা সৎ মা পেলেও চাকরিটা পাওয়ার অধিকার হল তার। তবু বহুদিন সে পুলিশের চাকরি নেয়নি, অন্য কাজ খুঁজেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়ে একটা বিয়ে করে ফেলায়, চাকরিটা নিজেই তদ্বির তদারক করে জোগাড় করে।

তার পালন কর্ত্রী মাসিও ছিলেন যথেষ্ট উগ্রস্বভাবের। তবু সে যে এত নরম ধাতের হয়ে উঠল, তার কারণ হয়ত তাকে আসলে লালন করেছে মায়ের এক শান্ত নম্র ছায়া। মাসি বলত 'জহ্লাদ বাপটার চেহারা পেয়েছে কিন্তু স্বভাবটা যেন মা বসানো।'

মৃতা মায়ের প্রতি তার এখনও এতই দরদ যে এক মায়ের কাছে সন্তানের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে আসার পর তার নিজেকে মনে হচ্ছিল জহ্লাদ। তার বাপের মতোই অন্য এক মায়ের যেন সে মৃত্যুর কারণ হতে চলেছে এমন আশঙ্কা কষ্ট দিচ্ছিল তাকে।

—কী লেখা আছে কাগজে?

যেন স্নেহলতার গলার আওয়াজ নয়। জলের কোনো গভীর তলদেশ থেকে উঠে এসেছে গম্ভীর কোনো শব্দ। এভাবে চমকে ওঠে সে স্নেহলতার গলা শুনে—'মইরাই গেছে? একেবারে মরছে?'

প্রশ্ন শুনে লোকটার গলা শুকিয়ে যায়। মায়ের মুখ থেকে নির্গত এই প্রশ্নের সে কী জবাব দেবে বোঝে না। এই সময় লোকটাকে রক্ষা করে এক গাড়ির আওয়াজ। ঠিক যেন স্নেহলতাদের গলির দরজার সামনেই থেমেছে গাড়িটা, এমন মনে হয়।

—গাড়ির শব্দ, আপনার ছেলে এল না কী?

লোকটা স্নেহলতাকে বলে। সে ভাবে কনকেন্দু রায় এসেছে। এতবড়ো একটা নামকরা গায়ককে সামনাসামনি দেখবে ভেবে সে রোমাঞ্চ বোধ করে। বড়োবাবু বলেছিলেন ফোন নম্বরটা জোগাড় করতে পারলে কনকেন্দু রায়কে ফোন করে জানবেন তার ভাই কি না। এ বাড়িতে যে কনকেন্দু এখন থাকে না, সে কথা জানেন বড়োবাবু।

কনকেন্দু এসেছে ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় লোকটা—কিন্তু পরমুহূর্তে গলিপথকে সচকিত করে গম্ভীর, আত্মপ্রত্যয়ী দামি জুতোর শব্দ তুলে যে মানুষটি বারান্দায় উঠে আসে—সে কনকেন্দু নয় — লোকটি খবরের কাগজে কনকেন্দুর ছবি দেখেছে অনেক, তাই বোঝে। এই মানুষটির বয়স কনকেন্দুর চেয়ে অনেক বেশি। মাথায় অমলাসুলভ টাক, গালের রং গোলাপি, চোখে সরু সোনা-রং চশমা। দামি কোট প্যান্ট টাই-এ লোকটি সুসজ্জিত। হাতে ছোট্ট দামি ব্রিফকেস।

মানুষটি যে আশেপাশের কাউকেই দেখছে না, দেখার কোনো প্রয়োজনও নেই তার এমন গর্বিত ও অনায়াস ভঙ্গিতে সে স্নেহলতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়—ব্রিফকেস খুলে একটা লম্বাটে পাতলা খাম বের করে, লোকটিকে দেখেও দেখে না — ব্যস্ত কিন্তু ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় বলে —'মা, টাকাটা রাখো, দিতে দেরি হল। ভালো আছ?'

বলতে বলতে খামটা খাটের পাশের টেবিলে রেখে জলের গ্লাস-চাপা দিয়ে তিনি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন—মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই। 'ও রূপু, এই দিকে তো সব্বোনাশের খবর...' যেটা বলতে বড়ো সঙ্কোচ, অনেক দ্বিধা পেরিয়ে তবে বলতে হল, এমনভাবে আস্তে আস্তে কথাগুলোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন স্নেহলতা।

রূপু অর্থাৎ স্নেহলতার বড়ো ছেলের রূপেন্দু, যে কী না এখন এক বড়ো কোম্পানির বড়ো অফিসার, উল্টোদিকে ঘুরে তাকান, চলে যাওয়া থামিয়ে, চকিতে তার চোখে ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার ছাপ—'কে, নবরা ভালো আছে তো?'

যেন নব সম্পর্কেই তার যা কিছু চিন্তা, নবর খবরের তার যা কিছু আসে যায়।

—না, নব না, কৃষ্ণ...

স্নেহলতা এরপর আর কী বলবেন, যেন কথা খুঁজে পান না। প্রায় দৃষ্টিহীন চোখের ক্ষীণ ছবিটা প্রসারিত করে ছেলেকে দেখতে চেষ্টা করেন। কারণ দরজার সামনে থেকে ততক্ষণে রূপেন্দুর অবয়ব অপসারিত হয়েছে—কৃষ্ণর নাম শোনামাত্র তিনি উঠোনের দিকে রওনা দিয়েছেন, স্নেহলতার কথা শেষ হবার অপেক্ষা না করে।

এবার লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে থামায়। যদিও সে নিজেই বেশ একটু ঘাবড়ে গেছিল রূপেন্দু রায়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে।

লোকটির বাধা পেয়ে রূপেন্দু রায় অবশ্য থেমে যান, বেশ একটু অস্বস্তি নিয়ে, কড়া গলায় বলেন—আপনি?

লোকটি এতক্ষণে খেয়াল করে তার শার্টটা বেশ ঘামে ভেজা আর নোংরা। চেহারাও নিশ্চয়ই আট ঘণ্টা ডিউটির পর আরও একঘণ্টা এখানে বসে থাকাতে একেবারে দড়কচা মেরে গেছে। একথা খেয়াল করে সে আরও সংকুচিত বোধ করে। তবু বলতে তো হবে, স্বয়ং ছেলে যখন এসে পৌঁছেছে, তখন সব শুনে যা ব্যবস্থা করার তো ঠিকই করবে। থানায়ও যাবে নিশ্চয়ই।

—একটু সাইডে আসবেন?

লোকটি গলায় সঙ্কোচ নিয়ে বলে।

—'না, কি বলবেন, এখানেই বলুন।' রূপেন্দু রায়ের গলা আরও কড়া হয়। তিনি ঘড়ি দেখেন। লোকটি তখন সেইখানে দাঁড়িয়েই বিবৃত করে ঘটনাটা। যথাসম্ভব নীচু গলায়।

আজ দুপুরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক থানা থেকে ভবানীপুর থানায় এক ম্যাসেজ এসেছে—ওখানে এক গৃহস্থ বাড়ির ভাড়াটে জনৈক কৃষ্ণেন্দু রায়কে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছে, লোকটি নিজেকে প্রখ্যাত গায়ক কনকেন্দু রায়ের ভাই বলে পরিচয় দিত। কেউ অবশ্য তার কথা তেমন বিশ্বাস করেনি। কৃষ্ণেন্দু রায় আরও বলত, তারা নাকি সবাই মিলে

ভবানীপুরের বাড়িতে থাকত — ওখানেই তাদের পৈত্রিক বাড়ি। এখন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এই সূত্র ধরেই ওখানকার থানা থেকে খবর এসেছে—কৃষ্ণেন্দুর আত্মীয় কাউকে পাওয়া গেলে তাকে এক্ষুনি যেতে হবে কৃষ্ণেন্দুকে সনাক্ত করতে।

রূপেন্দু রায়ের সমস্ত ব্যক্তিত্ব কেতাদুরস্ত কঠোরভাব, এক মুহূর্তে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। একটা কাঠের মূর্তির মতো মনে হয় তাকে কিছুক্ষণ। তারপর তার হাত-পা কাঁধ এমনভাবে ঝুলে পড়ে যে টাইট ফিটিং প্যান্ট শার্ট যেন ঝুলঝুল করে ঝুলতে থাকে গায়ে। পরমুহূর্তেই কঠিন চেষ্টায় তিনি অনেকখানি সামলে নেন নিজেকে, লোকটিকে প্রবল উপেক্ষা দেখিয়ে বলেন — 'তা আমি কী করব? আই অ্যাম নট হিজ লিগাল গার্ডিয়ান।' তারপর মায়ের দিকে ফেরেন 'মা...।'

'ও রূপু, কী হইবে এখন? কী করুম?'

লোকটা আশ্বস্ত হয় শুনে যে এতক্ষণে যেন স্নেহলতার গলা থেকে উঠে আসছে বিলাপের সুর। এতক্ষণ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া এক মা হিসেবে বড়ো শুকনো লাগছিল তার গলা, লোকটার কানে।

—দীপাকে খবর দাও, সে যা ভালো বোঝে করুক।

রূপেন্দু রায় মৃত কৃষ্ণেন্দুর বউই-এর নাম বলেন। তারপর গলায় যথাসম্ভব নিস্পৃহতা এনে বলেন, 'আমি এখানে এসেছিলাম জরুরি একটা ইন্সেপেকশনের কাজে, গাড়ি দাঁড়িয়ে, অফিসে ফিরতে হবে, চলি।'

—যাবি? থাকবি না আর? আমি কী করুম? আর আইবি না?

—আজকে আর আসা হবে না। তোমার নাতির জ্বর, দেখি কাল সকালে একবার চেষ্টা করে...' বলতে বলতে রূপেন্দু রায় উঠোনে নেমে গলিপথে অদৃশ্য হয়ে যান। যদিও তার 'শু'তে এখন আর ঢোকার সময়ের আত্মপ্রত্যয়ী শব্দ ছিল না।

— ও রূপু, দীপা যদি না আসে? আমি কী করুম?

স্নেহলতা আবারও প্রশ্ন করেই বুঝতে পারেন রূপু চলে গেছে। তিনি চুপ করে যান একেবারে। লোকটা প্রথমে একেবারে হকচকিয়ে যায় রূপেন্দু রায়ের এই চলে যাওয়া দেখে, পরের মুহূর্তে প্রবল ক্রোধ এসে গ্রাস করে তাকে।

—আরে আরে, লোকটা দেখি যায়। নিজের ছেলে চলে যাচ্ছে আর আমি বসে আছি.. এ কি কেস রে বাবা...

চোর-পকেটমারদের মারধোর করা এখনও শুরু করতে পারেনি সে, কিন্তু তার মনে হয় এ মুহূর্তে লোকটাকে একটা ঘুষি মেরে সে তার কলার ধরে টেনে পুলিশি কায়দায় এনে ফেলবে বারান্দায়। সে ছুটে চলে যায় গলি পেরিয়ে রাস্তায়, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রূপেন্দু রায়ের সাদা অ্যাম্বাসাডার ততক্ষণে গলি-রাস্তার মোড়ে পৌঁছে বড়ো রাস্তার দিকে বাঁক নিচ্ছে।

— ও, কি মস্ত বড়ো গর্দভ আমি, কেন এখনও বসে আছি? নিজের ছেলে যখন চলে গেল মাকে একা রেখে? .

নিজেকেই নিজে সে গাল দেয়। রাগ ও বিস্ময় তাকে এতখানি অভিভূত করেছিল যে সে বারান্দার মতো বড়ো থামের পাশে একটু বসে, জিরিয়ে নিতে। দরদর করে ঘাম হচ্ছিল তার।

স্নেহলতা তখন আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি জবুথবু হয়ে বসে কৃষ্ণর বিয়ের কথা ভাবছিলেন। রূপেন্দু, তার বড়ো ছেলে, বারবার নিষেধ করেছিল কৃষ্ণেন্দুর বিয়ে দিতে। শুধু রূপেন্দু কেন — কনক, নব, সকলেই বারণ করেছিল। তিনি কারও বারণ শোনেননি।

রূপেন্দুই তখন এক চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে কৃষ্ণকে।

তা সেই নতুন চাকরিতেও কৃষ্ণ ঠিকমতো যেত না। নেশাভাঙ করে পড়ে থাকত যেখানে সেখানে, যখন তখন।

অথচ মাস ছয়েক চাকরি করার পর একদিন স্নেহলতার পা ধরে কাঁদল কৃষ্ণ। 'মা, আমাকে এবার বিয়ে দাও, একেবারে ভালো হয়ে যাব আমি।'

—ওসব নাটকে ভুলে একটা জীবন নষ্ট কর না। রূপেন্দু সাবধান করেছিল। তিনি শোনেননি। ভেবেছিলেন, বিয়ে দিলে, ঘরে বউ এলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। অল্প বয়সে কত ছেলেদের কত দোষ থাকে। বিয়ে হলে, সংসার, ছেলেপুলে, তখন কি আর এমন নেশাভাঙ করবে?

কিন্তু ভালো আর হল কই? দিন দিন খারাপের থেকে আরও খারাপ। বউ, দুটো ফুটফুটে ছেলে মেয়ে হল, কেউ তার স্বভাব বদলাতে পারল না। চাকরিতে কখনও যেত, কখনও যেত না, মাসান্তে একটা পয়সাও আনত না ঘরে। ভাইরা টেনেছে তার সংসার, বউ চাকরি করেছে. কিন্তু তাকে একটা পয়সাও দিতে হয়নি এ সংসারে। ভাইরা সংসারে টাকা দেওয়া পর্যন্ত ঠিক ছিল। শেষে তার নামী ভাইদের সম্মানে টান পড়ল। কোথায় কোথায় পড়ে থাকে, লোকে বাড়ি দিয়ে যেতে চাইলে কনক, রূপুর নাম বলে। পুলিশও ধরেছে দু-চার বার। কনক, রূপুর নাম বলে ছাড়া পেয়ে যায়। সেই থেকে দুই ভাই-এর রাগ, তারা কৃষ্ণর নামও শুনতে পারে না এখন।

রূপু তো সেই যে বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেছিল, সেই থেকেই রাগ, কৃষ্ণর বউ-এর দিকেও চেয়ে দেখল না। তার ওপরও যেন রেগে রইল। কিন্তু স্নেহলতার কী অন্য কিছু করার উপায় ছিল? তিনি যেন অনুভব করলেন কৃষ্ণর চোখের জলের ফোঁটা, তার পায়ের উপর।

অভিমানী ছেলে। তিন ভাই অনেক লেখাপড়া শিখেছে, কনক লেখাপড়ায় ততটা না হলেও গান গেয়ে তো দেশ জয় করেছে—প্রণবের মাথা খারাপ না হয়ে গেলে আজ রূপুর চেয়েও বড়ো অফিসার হত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরিতে। নব তো সবচেয়ে ভালো ছিল লেখাপড়ায়, তাছাড়া ভালো লিখতে পারে বলেও তার নাম।

—আমি হলাম তোমার লটের মধ্যে ওঁচা, যাকে বলে। এই ছিল তার মুখের লব্জ।

—'ওই জন্যই তুমি ভালোবাসো না আমায়।' এই ছিল কৃষ্ণের মনের বদ্ধমূল ধারণা। সে ধারণা তিনি বদলে দিতে পারলেন না। মা কী সন্তানকে ভালো না বেসে পারে? একথা বললে সে বুঝত না। সেই অভিমানেই কী না কে জানে নেশাভাঙ ধরল কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই। গ্র্যাজুয়েটও হল না শেষ পর্যন্ত।

—ওসব না মা, বাজে পাল্লায় পড়েছিল, কেউ তোমরা বোঝনি, সময়ে শাসন করলে.. আর তুমিই বা কী করবে? বাবা নেই যে সংসারে তাতে দু-চারটে ফুটো ফাটা হয়ে যায় মা।'

নব বলত। নব ছোটো ভাই হয়ে কম চেষ্টা করেনি কৃষ্ণকে ফেরাতে। সে এখানে থাকলে হয়ত একেবারে এতখানি হাতের বাইরে চলে যেত না কৃষ্ণ...

—কৃষ্ণেন্দুবাবুর বউ? আছে তো?

লোকটা বহুক্ষণ আগে বারান্দা থেকে উঠে এসে স্নেহলতাকে দেখছিল। এবার সে বলে। নন্দন তার বউকে ডাকতে গেছে, জেনেই বলে। আসলে স্নেহলতার শুকনো চোখ, চুপ করে বসে থাকা, তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সে কথাবার্তা চালিয়ে স্নেহলতার মন বুঝতে চাইল। তাছাড়া কৃষ্ণেন্দু রায়ের বউও আদপেই কী আসবে, না কী রূপেন্দু রায়ের মতোই সরিয়ে রাখবে নিজেকে, সেটাও তো জানার দরকার।

—হ' বউ আছে, ছেলে মেয়ে আছে, নাইলে কাঁদতে কে থাকব পিছনে?

—তারা থাকত না ওনার সঙ্গে?

—না। এখন আর থাকত না।

স্নেহলতার বুকের ভেতর থেকে এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস এল। অনেক বুঝিয়ে ছিলেন বউকে।

—একসঙ্গে থাকো, বুঝাইয়া, শুনাইয়া ফেরাও। তা বউ শুনল কই?

—ও ফেরার নয় মা, অনেক সহ্য করেছি, আর না। ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করতে হবে আমার।

বলে সে বাপের বাড়ি চলে গেল। এখন হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর যে গেল, আর কী পাবি?

—হতভাগী! স্নেহলতা রাগ করতে গিয়ে দেখলেন রাগ নয়, কেমন দুঃখ আর মমতায় দ্রবীভূত হয়ে এল মন। লোকটা স্নেহলতার কাটাছাটা উত্তরের পিঠে কীভাবে কথা চালাবে বুঝতে পারছিল না। বৃদ্ধা সবই বুঝেছেন, তবু, চিৎকার করে কাঁদছেন না কেন? কেন এমন থম ধরে বসে আছেন, বুঝছিল না সে। স্নেহলতা এক মা, তখন সন্তানের গুণগুলিকে স্মৃতির ঝুলি থেকে বের করে উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। কৃষ্ণর মতো অমন হাসিখুশি, দিলদরিয়া তো তার কোনো ছেলে ছিল না। ভালো থাকলে বাড়িটা ভরে থাকত হাসিঠাট্টায়। নবর বউ, কনকের বউ, সবার সঙ্গে তার ভাব।

আর পরোপকার কী কম করেছে কৃষ্ণ? পাড়ার কাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, রাত বিরেতে শ্মশানে যেতে হবে। যার যে বিপদ আপদ বুক দিয়ে পড়েছে কৃষ্ণ—কত মানুষ তার সামনেই আশীর্বাদ করে গেছে কৃষ্ণকে, তাদের কারও আশীর্বাদ-ই কি কোনো কাজে এল না?

মদের নেশা তো ছিলই, তারপর কোনো শয়তান তাকে ড্রাগ ধরাল? সবচেয়ে সর্বনাশা জিনিস ওই শেষেরটাই। ওটা যদি না ধরত তো এত রকমের অশান্তি ঢুকত না ঘরে। আর এমন উধাও হয়ে যায় না বাড়ি থেকে। ডাক্তার, হাসপাতাল, কোনো কিছু করেই তো কোনো লাভ হল না! কোন্ সর্বনাশা তার এমন সর্বনাশ করল?

—ও কৃষ্ণ, আর কী তোকে দেখব না? ধীরে ধীরে শোক ও সন্তাপ তাকে আচ্ছন্ন করছিল। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

সে কান্না এত আকস্মিক, চমকে ঘরে ঢুকে এল লোকটা। লোকটাকে সামনে দেখা মাত্র ঠোঁট কামড়ে কান্নাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন স্নেহলতা। লোকটা কেন তখন থেকে বসে আছে, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। অলক্ষুণে লোকটা সর্বনাশের খবর নিয়ে এসেছে, দিয়েছে—এখনও চলে যাচ্ছে না কেন!

আসলে স্নেহলতার অকস্মাৎ ডুকরে ওঠা শুনে হঠাৎই ঘরে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। ঢোকামাত্র ঘরের ভেতরটা যেন মস্ত বড়ো ধাক্কা দিল তার বুকে।

এত বড়ো গায়ক কনকেন্দু রায়, ল্যান্সডাউনে তার মস্ত বড়ো ফ্ল্যাট, কত টাকা পয়সা। তার মায়ের ঘর এমন? বোধহয় এ ঘরেই রান্না হয়। ঘরের কোণে কয়লার উনুন, স্টোভ। মস্ত বড়ো বড়ো ঝুল ঝুলছে ছাদের ওপর থেকে। কালো নোংরা একটা মশারি আটকানো ধুলোয় বিবর্ণ খাটের রেলিং-এ। লাল রঙের মেঝেটা কালো হয়ে আছে নোংরা, ময়লায়। তেলচিটে, পুরোনো ট্রাঙ্ক—ঘরটা যেন গুদাম ঘরের চেয়েও খারাপ।

কনকেন্দুর মতো যদি তার টাকা পয়সা থাকত? আর মা যদি বেঁচে থাকত? তবে সে যে কত সুখে রাখত, কত আরামে ঐশ্বর্যে ভরে দিত মাকে সে তো ভেবেই পায় না। অথচ এমন নামী ছেলের মায়ের এই দশা? অফিসার ছেলের ব্যবহার তো সে দেখলই চোখের সামনে।

তার ভেতরের রাগটা আবার ফিরে আসে। সে রাগত গলায় জিজ্ঞেস করে—কনকেন্দু রায় এ বাড়িতে আসে না?

—হ্যাঁ আসে, মায়ের কাছে আসবে না কেন? সময় থাকলেই আসে। স্নেহলতা যেন বিরক্ত হয়েই জবাব দেন।

—আর আপনার অফিসার ছেলে? দু'মিনিটও বসল না এমন একটা খবরের পর?

—ও অমন ধারাই, বুঝ কম। স্নেহলতা এবার যেন একটু লজ্জিত হয়েই আড়াল করলেন ছেলেকে। কিন্তু লোকটার ব্যবহারে তিনি ক্রমশ ভীত আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন। এত প্রশ্ন করার কে সে? রাগ করে লোকটাকে চলে যেতে বলবেতো? কিন্তু দেখলেন রাগ নয়, ভয় করছে তার। আজকাল বাড়িটা এমন ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর সবসময় তার ভয় করে।

স্বামী হঠাৎ মারা যাওয়ার পর এই বাড়ি তাকে এমনই ভয় দেখাত অনেকদিন। ছোটবড়ো নানা বয়সের সাত সন্তান নিয়ে অকুল পাথারে পড়েছিলেন তিনি। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল। এই বাড়ি ভর্তি হয়ে উঠল লোকে। রূপু বড়ো চাকরি পেল, বউ এল, নাতি, নাতনীরা এল। নব তো একটু রাজনীতি করত, লেখালেখিও, তার তো বাড়িভরা বন্ধুবান্ধব সব সময়। ততদিনে কতক নাম করতে শুরু করেছে। কত লোক, কত ক্লাব, কত পার্টি, সবাই কনককে তাদের অনুষ্ঠানে নেওয়ার জন্য স্নেহলতার খোশামোদ করত।

—'মা, আপনি আমাদের হয়ে বলুন, সে আপনার কথা ঠেলবে না, মাতৃভক্ত ছেলে।' তা কনক তো মাতৃভক্তই। দু'হাতে টাকা রোজগার করেছে—তিনি চাইলে তাকেও দিয়েছে হাত ভর্তি করে। তারপর তার বিয়ে হল, মেয়ে হল, এত নাম ডাক যে আমেরিকাতেই গান করতে যায়। এত বিরাট এক মানুষকে এই ভাঙাবাড়িতে কী আর ধরে? ফ্ল্যাট করে অন্য অঞ্চলে চলে গেল, রুপু তো গেছে আগেই। কোনো চাকরি এই রাজ্যে না পেয়ে বাধ্য হয়ে চাকরির জন্যই নব বাইরে চলে যাবার পর থেকেই বাড়িটা আবার ভয় দেখাতে শুরু করেছে তাকে।... তারপর কৃষ্ণর বাড়াবাড়ি, ড্রাগের নেশা, তার বউও চলে গেল —সবশেষে গেল কৃষ্ণ। এখন এই এত বড়ো বাড়িটাতে তিনি আর প্রণব একা। বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসে তাকে—সব সময় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখায়। বড়ো ভয় লাগে আজকাল এতবড়ো ফাঁকা বাড়িতে একা একা থাকতে। বাড়ি যত ফাঁকা হচ্ছে প্রণব তত ক্ষ্যাপাক্ষিপ্ত হচ্ছে বেশি বেশি করে। তিনি তো মা, তবু আজকাল ভয় করে তার। পনো না গলা টিপে মেরে ফেলে তাকে।

না। তার ছেলেরা কেউ অমানুষ নয়। তাকে সকলেই নিয়ে যেতে চায়। সকলেই তাকে আদরে রাখবে। রূপুও না বলবে না। কনক আর নব তো মাথায় করে রাখবে। কিন্তু প্রণবকে তো কেউ রাখবে না। নব এখানে থাকলে সে প্রণবকে দেখত কিন্তু আর কেউ তাদের ঘরেও ঢুকতে দেবে না প্রণবকে। তিনি বেঁচে থাকতে পাগল ছেলেকে কী রাস্তায় ছেড়ে দেবেন? কিন্তু তিনি মরে গেলেই বা কী গতি হবে প্রণবের? কোথাও রাখা যায় কি না, দেখতে বলেছিলেন নবকে।

—কোথাও রাখবে না মা। সরকার সক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেয়। অক্ষম, বৃদ্ধ অসহায় আর পাগলদের কোনো দায়িত্ব নেয় না, সে দায়িত্ব পরিবারের...

—ওর পরিবার কই?

—নাই, বাপ নাই, মা তুমি মরলে, আমরা ভাইরা দেখলে দেখলাম, না দেখলে কেউ আইনত বাধ্য করতে পারে না, সুতরাং তুমি না পারলে রাস্তায় যাবে, কুড়িয়ে খাবে... খুব ভাগ্য ভালো হলে স্বনামে বা বেনামে কোনো বন্দিশালায় ঠাঁই পাবে।' বলে রাগে গজগজ করেছিল নব।

— ও সব ভলান্টারি, ইন-ভলান্টারি, সব দেখলাম, মা, পয়সা দিলে দু-চারদিন দেখবে, পয়সা না দিলে এক দিন, শেষ পর্যন্ত সব দায়িত্ব পরিবারের। আর পরিবারের দেখার কেউ না থাকলে রাস্তায়।... কিন্তু এদের দেখিয়েই বিদেশে যাওয়া যায়। পয়সা আনা যায়। তবু যার কেহ নাই, কেহ নাই তার বুঝলে মা? এইরকম কত কথা যে নব বলে। নব'র সব কথা স্নেহলতা বোঝেন না। শুধু বোঝেন প্রণবকে নিয়ে একা পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ নেই তার। অথচ এই ছেলে যত দিন যাচ্ছে ততই ওষুধ-বিষুধ চিকিৎসার বাইরে যাচ্ছে। আগে বউদের মারতে যেত, তারপর ভাইদের, এখন মাকেও মারতে আসে, টাকা পয়সা কেড়ে নেয়—কে জানে ওরও মায়ের মতোই

ভয় করে কি না আজকাল, ভয়ে ভয়েই আরও উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে কি না... কি যে ভয়ে ধরেছে স্নেহলতাকে এখন। সব কিছুতেই ভয়, সবাইকে ভয়। যেন সংসারের কাছ থেকে আর কিছু চাওয়ার নেই — পাওয়ারও নেই, কেবল ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা। সেই ভয় যেন আজ একটা কাগজের টুকরো হয়ে ওই লোকটার হাত ধরে এসে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্টে—ভয়ের সেই পাঁজর গুঁড়িয়ে দেওয়া যন্ত্রণায়, ঠাণ্ডা, হড়হড়ে ছোঁয়া আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছেন তিনি, এমন সময় পেট থেকে গলা পর্যন্ত এক আগুনের ভাপ উঠে এসে যেন তার গলা বন্ধ করে দিল। তিনি অনুভব করলেন শুধু তার বুকে নয়, পেটেও যেন আগুন জ্বলছে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে তার, ভীষণ ক্ষিদে।

॥ চার ॥

— কী ব্যাপার? কৃষ্ণদার ব্যাপারে আমাদের ডাকাডাকি কেন?

লোকটা কি যেন ভাবছিল। চমকে তাকিয়ে দেখল হৃষ্টপুষ্ট বছর পঁচিশের একটি ছেলে একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে কথা বলছে স্নেহলতার সঙ্গে।

—তার সঙ্গে তো সব চুকেবুকে গেছে দিদির।

—চুকছে আর কই? তার নামেই তো এখনও হাতে শাঁখা, নোয়া, কপালে সিন্দুর দেয় — স্নেহলতা দুর্বল, ভীরু গলায় অস্পষ্টভাবে বললেন।

— সেটা দিদির পার্সোনাল ব্যাপার। তাই বলে দিদিকে আপনারা থানায় যেতে ফোর্স করতে পারেন না।

ছেলেটা তেড়িয়া হয়ে বলে। তার বুকের পেশি গেঞ্জির আড়ালে ফুলে ওঠে। যেন তার দিদিকে সব ধরনের ঝামেলা থেকে বাঁচাতে সে বুক পেতে দেবে।

— তাইলে কি হইবো অখন? কৃষ্ণর? স্নেহলতার কাতর ও বিভ্রান্ত গলা করুণ কান্নার মতো শব্দ প্রশ্ন করে। তিনি কৃষ্ণের সৎকারের কী হবে, হয়ত সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা মুখে আনতে পারেন না। ছেলেটা কাঠগোঁয়ারের মতো যেন কিছুই বুঝছে না এভাবে বলে—কী আবার হবে? যা হবার তো হয়েছে, এভরি থিং ইজ ফিনিশ এখন।

লোকটার ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা চড় মারে ছেলেটাকে। তারপর লক্ষ্য করে ছেলেটাকে রূপেন্দু রায়ের মতো অস্বস্তিকর লাগছে না।

—ও বাবা কিল্টুস, রাগ কইরো না বাবা, আমি তো নিরুপায়, চোক্ষে মুখে দেখি না, তুমি বাবা তাইলে নবরে একটা ট্রাঙ্কল কইরা দাও, টাকা দিতেছি আমি।

স্নেহলতা কাঁপতে থাকা হাতে কাপড়ের খুঁট খোলার চেষ্টা করেন। ওই খুঁটে নব'র ঠিকানা আর ফোন নম্বর বাঁধা। কেন যে তিনি সদাসর্বদা আঁচলে নব'র ঠিকানা আর ফোন নম্বর বেঁধে রাখেন তা তিনিই জানেন। ওই ঠিকানা আর ফোন নম্বরই যেন মায়ের জন্য নব'র ভালোবাসা আর উদ্বেগ, নব'র উপস্থিতি হয়ে স্নেহলতার শরীরে লেগে থাকে, তার সঙ্গে ওঠে, বসে। কেবল স্নানের আগে গিট খুলে কাগজের টুকরোটা নিরাপদ জায়গায় রেখে স্নানে যান। তারপর স্নান সেরে এসে আবাব আঁচলে ওই কাগজের টুকরোটা বেঁধে নিতে কখনও ভুল হয় না স্নেহলতার। সেই কাগজটাই এখন বের করতে চেষ্টা করলেন গিট খুলে। কিন্তু হাত এত কাঁপছিল যে গিট খুলল না।

—কোথায় থাকে আপনার ছেলে?

—সে তো অনেক দুর, আসতে তিন দিনের ধাক্কা...। স্নেহলতা কিছু বলার আগেই কিল্টুস লোকটার কথার উত্তর দেয়।

— প্লেনে আইবো বাবা, কৃষ্ণের খবর শুনলে তক্ষুনি প্লেনে উঠব। সে কৃষ্ণরে ভালোবাসে—এতক্ষণে কান্না এল স্নেহলতার উচ্চারণে।

— কিন্তু তাও তো কালকে দুপুর বিকেলের আগে...

কিল্টুস আগেকার উগ্র মেজাজের কথা ভুলে ঢুকে পড়েছিল স্নেহলতার সমস্যায়। লোকটা কিন্তু আবার মরিয়া হয়ে ওঠে।

—কী আশ্চর্য, কনকেন্দু রায়কে খবর দিন না, সে তো কাছেই থাকে...

— হ, কনকেরে একটা খবর দিয়া দাও বাবা। স্নেহলতার যেন হঠাৎ করেই কনককে মনে পড়ে।

— ওই ট্রাঙ্কে তার ঠিকানা, ফোন নাম্বার আছে একটু দেখতো কিল্টুস।

স্নেহলতা ট্রাঙ্কটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মেঝেতে পা দেন—কিন্তু দুটো পা আর সঙ্গে ঘাড় শুদ্ধু মাথা নড়বড় করে নড়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে কিল্টুসের দৃষ্টি নরম হয়ে আসে।

— আরে কনকদার অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর আমারও জানা আছে... আমি ফোন করে দিচ্ছি।

কিল্টুসের গলা শুনে বোঝা যায়, সে তার জামাইবাবু কৃষ্ণর সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করলেও কনকের সঙ্গে আত্মীয়তার এক সূত্র আছে বলে বিশেষভাবে গর্বিত।

লোকটা এবার হাতছানি দিয়ে কিল্টুসকে তার কাছে ডেকে নেয়। এ ছেলেটিকে ভয় করা বা রাগ করা নিরর্থক—এটা সে বুঝেছিল। এবার সে পুলিশি গলা বের করে।

—একটা আনন্যাচারাল ডেথ—আপনার দিদির সঙ্গে কী কৃষ্ণবাবুর ডিভোর্স হয়েছিল?

— না, তা হয়নি এখনও।... ছেলেটি থমমত খায়।

— তাহলে যতই ভাই — ব্রাদাররা যাক, লিগাল ওয়াইফ না গেলে বডি আর কাউকে দেবে না পুলিশ... তাকেই 'আইডেনটিফাই' করতে হবে হাজবেন্ডকে।

—অ্যা, এ্যাঁ? তাই না কী?

কিল্টুস দৃশ্যতই ঘাবড়ে যায়।

—বাঃ, আমি তো থানা থেকে ওনার, মানে আপনার দিদির জন্য তখন থেকে বসে আছি...' লোকটা একটু মিথ্যাই বলে।

—ওঃ, তাই নাকি, আমি ভেবেছিলাম নিউজটা দিয়ে আপনি চলে গেছেন। মানে, জানতাম না, নন্দন তো বলেনি... আপনিই যে নিউজটা...

কিল্টুস কথাবার্তা গুলিয়ে ফেলে। তার মুখের ঔদ্ধত্য আগেই চলে গেছিল, এখন ঘাবড়ানো ভাবটাও কেটে যায়। কেমন এক অদ্ভুত দুঃখ আর কোমলতা ছায়া ফেলে তার মুখে। ভারী নরম গলায় সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে—ওটা কি সত্যি সত্যি কৃষ্ণেন্দু রায়, মানে আমাদের কৃষ্ণদারই বডি? আপনারা সিওর?

—সিওর কী করে হব, যতক্ষণ না আইডেনটিফাই হচ্ছে? সেজন্যেই তো...

কিল্টুস যেন লোকটির কথা শুনছে না এভাবে আবারও বলে ফাইন ম্যান ছিল জানেন, কৃষ্ণদা। হি ইজ এ নাইস ম্যান, সাধে কী আর বলে 'নেশা, সর্বনাশা। ওই এক দোষে নিজের লাইফটা স্পয়েল করল, দিদিরও বারোটা বাজল, ভাগ্নেভাগ্নি দুটো... কী বলেন, হতেও তো পারে ওটা কৃষ্ণদার বডি নয়...

— না হলে তো ভালোই। লোকটা স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে এমন কিছু হওয়া সম্ভব ভেবে সত্যিই খুশি অনুভব করে। কিন্তু হঠাৎ করেই কিল্টুসের মুখভাব বদলে যায়, আগের মতোই ঔদ্ধত্য ফিরে আসে সেখানে। তাকে চোয়াড়ে আর নিষ্ঠুর দেখায়।

—না, না, যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে, একটা এসপার ওসপার হওয়া দরকার ছিল, এভাবে আর কতদিন...

তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে ঠিক আছে, আপনি বসুন আর একটু, এতক্ষণ যখন

বসেছেন। আমি দিদিকে অফিস থেকে নিয়ে থানায় যাচ্ছি। আর কনকদাকেও ফোন করে দেব আপনি ভাববেন না মাসিমা... শেষ কথাটি স্নেহলতার দিকে ছুঁড়ে দেয় সে।

—আছে যখন ডিউটি দিদির, করুক, শেষ ডিউটিটা করে দিক। তারপর নিশ্চিন্ত।... কিল্টুসের তরুণ ও গতিময় শরীর নিমেষেই উঠোন থেকে গলিপথ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিল্টুস চলে যাওয়ার পর স্নেহলতার আবার ভয় করতে থাকে। এখানেই আসবে না কী কৃষ্ণের বউ? এসে, কী বলবে না বলবে তা কে জানে। কী করে তাকাবেন তিনি ওর দিকে, ভেবে পান না। কেবল টের পান সেই নাড়ি জ্বলানো খিদে উঠে আসছে পেট জুড়ে, এমনকী মাথার ভেতরেও যেন ঝিম ধরিয়ে দিচ্ছে। ধনী মানুষের বউ ছিলেন, বউ-এর খাওয়া দাওয়ার দিকে ডাক্তার স্বামীর তীক্ষ্ণ নজর আর যত্ন ছিল। বলতেন ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে, আমাকেও। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেবে না, অভাব তো নেই।

সে যত্ন তো পনেরো বছরের। তারপর কয়েক বছর কষ্ট গেছে, কিন্তু ছেলেরা চাকরিবাকরি শুরু করার পর আর কষ্ট পাননি। ছেলেরা সব টাকা পয়সা তো তার হাতেই দিত। তার হাতে ঘর সংসার, ভাঁড়ার। বউরা এসেছে, গেছে। তিনিই সংসারে সব। খাবার কষ্ট পাবেন কেন?

পঁয়ত্রিশ বছরে বিধবা হয়ে মাছ মাংস ছেড়েছিলেন। কিন্তু রাঁধতে তো হত সব কিছুই, ছেলেমেয়েদের জন্য। মাঝে মাঝে তীব্র আকাঙ্খাও জেগেছে একটু খেয়ে দেখার জন্য— একথা নিজের কাছে স্বীকার করেন তিনি। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে এখন মাছ ডিম সবই খান, খানিকটা নিরুপায় হয়ে।

বাজারে প্রণবকেই পাঠাতে হয়। সে পাগল, বেশিরভাগ দিন শুধু মাছ নিয়ে আসে। অন্য কোনো সবজি আনে না। কোনো, কোনো দিন বাজারেই যায় না। বাড়ির সামনের মুদির দোকানের ডিম-আলু তখন ভরসা। আলু সেদ্ধ ডাল খেয়ে আর কদিন কাটানো যায়? তাছাড়া শুধু ঝোল-ভাত একপদ রান্না করে নিলে সুবিধা হয়। চোখে দেখেন না, তাই আগুন জ্বালতে ভয় — হাঁটুতে ব্যথা, পা মুড়তে পারেন না, রান্নার লোকের হাতে খেতে ঘেন্না পান ওই একপদ কোনোমতে রান্না করে নেন আজকাল। বাড়িতে লোক এলে অবশ্য নিরামিষই খান। কিন্তু নব'র বউর নজর তীক্ষ্ণ। একদিন হেসে বলল 'মা, আপনার ছেলেরা সব প্রগ্রেসিভ, সভায় নারী মুক্তি নিয়ে লেকচার দেয়, আপনি সকলের সামনে বসে মাছ মাংস খান, কেউ কিছু মনে করবে না।'

—এখন? মাছ মাংস? পাপ হইবো না?

নিজের প্রশ্নেরই যেন উত্তর খুঁজছিলেন তিনি। — 'পাপ হবে কেন? সারাজীবন রান্না করলেন, তাতে পাপ হল না। খেলে পাপ হবে? তবে আপনার সে পাপ আমি নিলাম।'

বলে সে মস্ত বড়ো মাছের টুকরো তুলে দিয়েছিলেন শাশুড়ির পাতে। সেই থেকে সবার সামনেই মাছটা, ডিমটা খান। মাংস আর ধরেননি নতুন করে।

কিন্তু সেই ঝোলভাত জোটানোও আজকাল দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দেয়, সব ছেলেরাই টাকা দেয়। কিন্তু কোনো মাসে রূপুর দেরি হয়ে যায় টাকা দিতে, ট্যুরে হয়ত বাইরে যায়—কোনো মাসে কনকের সেক্রেটারি টাকা পাঠাতে ভুলে যায়, কোনো মাসে নব'র মনিঅর্ডার দেরিতে এসে পৌঁছায়। এক থোক টাকা রেখে দেবেন, তারও জো নেই, তালা দিতে পারেন না ট্রাংকে—তালা খুলতে পারেন না বলে আর খোলা ট্যাঙ্কে টাকা রাখলে সব নিয়ে নেয় প্রণব। বিড়ি খেয়ে, বিলিয়ে দেয় যা — ইচ্ছা করে।

মাস খরচের টাকা থেকেও সে টাকা কেড়ে নেয়। দিনে পাঁচ টাকা হাত খরচ দেওয়ার পরও। ছেলেদের যে টাকা বাড়াতে বলবেন, সাহস পান না, যদি তারা রাগ হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়? এমন করবে না তারা, তিনি জানেন — তবু ভয়, টাকা বন্ধ হলে খাবেন কী? অথচ বয়স

যত বাড়ছে খিদেও তত বাড়ছে। তীব্র সেই খিদে আজ এই দুঃসময়ের বিকেলেও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তিনি টের পান।

আজ তিরিশ টাকা দিয়েছিলেন বাজারে। হতভাগা পনো দুটো ফলি মাছ এনে বাকি টাকা মেরে দিলে। কাঁটা ভরা মাছ খেতে পারেন না তিনি, ফলি মাছের কাঁটা ভরা ঝোল দিয়ে তাই দু এক গ্রাসের বেশি ভাত খেতে পারেননি। এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেছে, তীব্র খিদে।

একটু পরে, স্নেহলতা বুঝতে পারছিলেন, ঘর লোকে ভরে উঠবে। কনকের খুব রাগ কৃষ্ণের ওপর। সে আসবে কী না কে জানে, তবে কনকের বউ ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, সে দৌড়ে আসবে নাতনীর হাত ধরে। সেই হয়ত মেয়েদের খবর দিয়ে দেবে। খবর পেলে তারাও আসবে রূপুর বউ মন হলে আসবে, আরও কত আত্মীয় স্বজন। খবর পেলে সবাই আসবে—কেবল নব আর নব'র বউ এসে পৌঁছোবে সবার শেষে। ততক্ষণ রান্না করবে কে খাওয়াদাওয়া হবে কী করে? কৃষ্ণের দাহ-সৎগতি হওয়ার আগে রান্না খাওয়া কী ভালো দেখাবে? তিনি মা হয়ে সেকথা কাকে বলবেন?

অথচ কী প্রচণ্ড খিদে, যেন শেষ করে ফেলবে তাকে এই অলক্ষুণে খিদে, তিনি ভাবেন। তারপর মনে পড়ে, দুপুরে খাওয়ার পরই উনুনের নিবু আঁচে ডিম বসিয়ে রেখেছিলেন গোটা চারেক। ওগুলো সিদ্ধ হয়ে রয়েছে এতক্ষণে নিশ্চয়। তিনি ঠিক করে নেন, এক্ষুনি তিনি ডিমের ঝোল রান্না করে নেবেন। দুপুরের ভাত আছে অনেক। তাই দিয়ে ঝোলভাত তিনি এখনই খেয়ে নেবেন পেট ভরে। তারপর পেট শান্ত করে বাকি ঝোলভাত তিনি ঢেকে রেখে দেবেন প্রণবের জন্য। সে মর্জিমতো এসে খেয়ে যাবে।

নিজের ভাবনাকে যুক্তিসঙ্গত করে তুলতে গিয়ে তিনি প্রণবের কথা ভাবেন। ও তো সন্ধ্যা হলেই ভাত খাওয়ার জন্য পাগল করে দেবে। না পেয়ে হুজ্জোত হাঙ্গামা শুরু করলেই তো কনকের বউ শুদ্ধ সকল চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। কী যে জ্বালা, তার যে কি জ্বালা, পেটে ধরেও শান্তি পেলেন না। এক একজন এক এক রকম জ্বালা যন্ত্রণা দিল — এখন পেটের জ্বালা আর বুকের জ্বালা যেন এক হয়ে গেল। সাত সন্তানকে গর্ভে ধরা যে পেটের চামড়া এখন কুঞ্চিত, ঝুরে রয়েছে কুৎসিত হয়ে তাকে খামচে ধরে সেই জ্বালা সহ্য করতে করতে তিনি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। আদেশ ও অবজ্ঞার সুরে লোকটিকে বললেন—ঘরের বাইরে মোড়া আছে, ওইখানে বসেন।

লোকটা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। তারপর স্টোভটা টেনে নিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ফেলে দিলেন স্টোভের ফিতের ওপর।

এখনও সবাই বলে রন্ধনে তিনি দ্রৌপদী। ডিমের ঝোলে তিনি পেঁয়াজ রসুন দেন না। যেন আদা, জিরা, লঙ্কাবাটা আর একটু গরম মশলা। ঠিকা কাজের মেয়েটা মশলা বেটে রেখে গেছে সকালে। স্টোভের আঁচ উঠছে যতক্ষণে ততক্ষণে তিনি ডিম ছাড়িয়ে সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়িয়ে তৈরি। স্টোভে আঁচ উঠতে না উঠতেই তেল গরম বসান। গরম তেলে ডিম আর আলু লাল করে ভেজে থালায় তুলে রাখেন। কড়াই-এ আরও একটু তেল দিয়ে মশলা ঢালেন বাঁ হাতে একটু একটু করে জলের ছিঁটে দিতে দিতে মশলা কষান — মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এসে কষানোর সুগন্ধ উঠলে জল ঢেলে দেন কড়াইয়ে। তেল মশলা নিয়ে জল ফুটে উঠলে জলের মধ্যে ঢেলে দেন আলু, ডিম, নুন, চিনি। হাতা দিয়ে ডিমগুলোকে একটু একটু ভেঙে দেন -- যাতে ঝোল থেকে ডিমের স্বাদ ও সুগন্ধ আসে।

লাল ঘন ঝোল টগবগ শব্দ তুলে ফুটতে থাকে। ছিটকে ছিটকে ওপরে ওঠে ঝোলের কণা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ডিমের ঝোলের সুগন্ধ।

স্নেহলতা অসম্ভব তৃপ্তি বোধ করেন সেই সুগন্ধে। তার মুখের অসন্তুষ্টি ও উদ্বেগের রেখা মিলিয়ে যায়। কেবল মসৃণ অভিজাত বয়স্ক ত্বকে তবু জেগে থাকে কয়েকটি দুঃখের ভাঁজ, প্রায় অন্ধ চোখ দুটির শুকনো জমিতে এতক্ষণে জল জমতে থাকে।

লোকটা বাইরে বসে থাকতে থাকতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর কোনো মা একাকী, দরজা বন্ধ করে দিলে আশঙ্কা তো হবেই। তাছাড়া মহিলার আচরণও তো কেমন অস্বাভাবিক। একবার ডুকরে ওঠা ছাড়া তিনি কান্নাকাটি করেননি। কোনো হাহুতাশ বা বিলাপও করেননি বললে চলে। যেন বড়ো বেশি শক্ত তিনি মনে মনে, এমনই ধারণা হয়েছে আর বৃদ্ধাকে দেখে।

আসলে শোকে পাথর হয়ে চরম কোনো পন্থা বেছে নেবেন ঠিক করে নিয়েছিলেন দেখেই হয়ত এত শান্ত আর শক্ত ছিলেন তিনি, লোকটা মনে মনে ভাবতে থাকে।

একথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম ছুটে যায় তার। এত সময় নষ্ট করে, সামনে বসে বসে সে কী মহিলার মৃতদেহ দেখবে শেষে? সে কেন দেখতে পায় ঘরের ওপর থেকে মহিলার ঘাড় ভাঙা মৃতদেহ ঝুলছে। আতঙ্কিত হয়ে সে দরজার কাছে ছুটে যায়। হঠাৎ কেরোসিন তেল আর আগুনের গন্ধ নাকে আসে তার। সে ধরে নেয়, মহিলা গায়ে আগুন দিতে চলেছেন। বা দিয়ে ফেলেছেনও হয় তো। সত্যি, এমন এক বৃদ্ধা কী করে ওপরে উঠে গলায় দড়ি দেবে? মরিয়া হয়ে দরজায় সজোরে এক ধাক্কা দেওয়ার পর সে দেখতে পায়, পাশের একটা জানালা খোলা।

—কী আহাম্মক আমি, জানলা দিয়ে দেখি না কেন কী হচ্ছে ভেতরে।

সে দৌড়ে জানলার কাছে যায়। ততক্ষণে শব্দ ও সুগন্ধ তুলে ডিমের ঝোল ফুটতে ফুটতে রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লোকটা দেখে রান্না হচ্ছে কড়াইয়ে। নীল শিখা তুলে স্টোভের আগুন জড়িয়ে ধরেছে কড়াই। স্নেহলতা খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছেন ডিমগুলো—নিখুঁত নৈপুণ্যে। তার মুখের রেখায় তৃপ্তি। কিন্তু চোখ দিয়ে অবিরল গড়িয়ে পড়ছে জল।

— ও কৃষ্ণ, তুই কোথায় কীভাবে মইর‍্যা রইলি বাপ, আর কী তোরে দেখুম না রে ধন আমার।

লোকটার প্রথমে মনে হল যেন বাজ পড়ার শব্দ হল ভেতরে — অথচ আগে কোনো বিদ্যুতের ঝলক দেখা যায়নি। হুড়মুড় করে প্রচণ্ড শব্দে যেন ভেঙে পড়েছে। কী যেন ভেঙে পড়ছে, অথচ সেই ভেঙে পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা, ভিজে হাওয়ার স্পর্শ এল— তারপর ধীরে ধীরে ঝির ঝির, ঝির ঝির করে কোনো জলের ধারা যেন ঝরে পড়তে লাগল — অনবরত, অবিরাম।

লোকটা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করল ওই দৃশ্য, এই শব্দের অর্থ। তার চোয়াড়ে নিষ্ঠুর-দর্শন মুখে ফুটে উঠল দুঃখী, বোকাটে একটা হাসি। সে পেছন ফিরে বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা হল। তার এখানে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে।

জায়গা বদল

সীমা রায়

অংশু আপাদমস্তক অভিলাষকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'করেছিস কী তুই? একেবারে জামাই বনে গেছিস? এ কী সাজ হয়েছে?' অভিলাষ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'বাজে দেখাচ্ছে বলছিস? অনুপমের বিয়ের সময় কিনেছিলাম। কাঁথা স্টিচের পাঞ্জাবি, পাজামা। আটশো টাকা দাম নিয়েছিল মাইরি।' 'তুই না একটু বেশি বকিস। তোর পাঞ্জাবি আটশো টাকা না আঠারোশো টাকার তা কে জানতে চাইছে! আমি বলছিলাম আজকে এরকম বরমার্কা সাজগোজ না করাই ভালো। একটা ক্যাজুয়াল ড্রেস পর না বাবা!' 'কেন বল তো, আমেরিকায় চাকরি করা মেয়েরা পাজামা-পাঞ্জাবি পছন্দ করে না?'

'ধ্যাত্‌তেরি! কে কী পছন্দ করল না-করল তা দিয়ে তোর দরকারটা কী? তুই তোর মতো সাজগোজ কর কিন্তু ওই কনে দেখা-কনে দেখা, থুড়ি, বর দেখার ভাবটা বাদ দিলেই ভালো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে মেয়েরা যেমন সেজেগুজে দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে, তোকে যেন তেমনি না দেখায়।'

অভিলাষকে আজ পাত্রীপক্ষ দেখতে আসছে। পাত্রী স্বয়ং তার বান্ধবীকে নিয়ে আসবে। পাত্রী মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বয়স ২৮। নিউ আলিপুরের দিকে বাড়ি। তবে সে বর্তমানে আমেরিকায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আইআইটি থেকে পাস করে ক্যাম্পাসেই তার চাকরি হয়ে যায়। কর্পোরেট সংস্থায়। বছরখানেক পরে সেই চাকরি ছেড়ে আরও অনেক বড়ো চাকরির অফার নিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। বছরতিনেক সেখানে আছে। বছর, দেড় বছরে একবার বাবা-মার কাছে আসে। কখনও বাবা-মা তার কাছে যান! পাত্রীর অশীতিপর ঠাকুমাও বর্তমান।

এবার পাত্রের পরিচয়। পাত্রে নাম অভিলাষ। বয়স তিরিশ ছুঁই-ছুঁই। পড়াশোনায় ভালো ছিল। সাহিত্য প্রিয় বিষয়। ইচ্ছে ছিল ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ার কিন্তু আশানুরূপ নম্বর হল না বলে ইতিহাসে অনার্স পড়ে এমএ পাস করল। জার্নালিজম পড়ার বাসনা আগেই ত্যাগ করেছিল। পত্র-পত্রিকায় টুকটাক লেখালেখি ছাড়া সে এখনও 'বেকারি'র মালিক। অংশু ওকে এই পরিচয়েই ডাকে।

হ্যাঁ, এবার অংশুর পরিচয় দেওয়াটাও জরুরি। কারণ, এই সম্বন্ধটা অংশুই এনেছে। অংশু আর অভিলাষের বন্ধুত্বটা সেই স্কুলবেলা থেকেই। কিন্তু স্বভাব দু'জনের একেবারেই বিপরীত। অংশু গ্রাজুয়েট হওয়ার পর এ-কোর্স করে একটা এমএনসি-র সেল্‌স-এ আছে। এ চাকরিটা সে জুটিয়েছে পঞ্চাশ ভাগ নিজের কৃতিত্বে আর পঞ্চাশ ভাগ তার এক বিশাল চাকুরেমামার উদ্যোগে। সুদর্শন, স্মার্ট, বলিয়ে-কইয়ে অংশুর বাবা-মাকে তাঁদের ছেলের কেরিয়ার নিয়ে ভাবতেই হয়নি।

কিন্তু অভিলাষের বাবা-মা ছেলের জন্য খুবই চিন্তিত। বাবা দু'বছর হল ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। মা এখনও একটি সরকারি স্কুলের বাংলার টিচার। গড়িয়ায় নিজস্ব সুন্দর বাড়ি। অভিলাষকে বলা যায় সচ্ছল পরিবারের অসফল ছেলে। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মায়ের ইচ্ছার কাছে হার মেনে, বলা যায় চাপে পড়ে, এসএসসি-তে বসছে মাঝেমধ্যে। কিন্তু সিলেকটেড হলে বাসন্তী বা বনগাঁয় তাকে যেতে হতে পারে ভেবে সে উৎসাহ পায় না। তাই সফলও হয় না। এসব কারণে অভিলাষ ইদানীং একটু কমপ্লেক্সে ভোগে। অংশু সেটা বোঝে। তাই সে খবরের কাগজে চাকরির পাতায় অভিলাষের জন্য চাকরির খোঁজ করে। সেই সঙ্গে পাত্র/পাত্রী চাই-এর পাতা খুলে নিজের জন্য পাত্রীর সন্ধানও করে অবশ্য। সে রকম কিছু চোখে পড়লে অভিলাষকে দিয়ে ওর মা-বাবাকে বলাবে। যদিও ওর বাবা-মা দু'জনেই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী।

এইভাবেই হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল এই বিজ্ঞাপনটা। 'পাত্রী, ২৮, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি, গাড়ি। স্ব-অভিভাবিকা এই পাত্রীর জন্য আমেরিকা গমনেচ্ছু পাত্র চাই। পাত্রের বেকার হওয়া আবশ্যক। অন্য দাবি নাই।' ঠিকানা, ফোন নং। বিজ্ঞাপনটি বড়ো হরফে লেখা। অংশুর চোখ টানল। কাটিং নিয়ে সোজা অভিলাষের বাড়ি। অভিলাষকে কাটিং দেখিয়ে বলল, 'এই পাত্রী একেবারে তোর জন্য বুঝলি। চেষ্টা করো। তোর আমেরিকায় চাকরি ঠেকায় কে?'

অভিলাষ বিজ্ঞাপন পড়ে বলল, 'কে চাকরি দেবে, পাত্রী স্বয়ং? তাহালে তো আজীবন তার দাসত্ব করে যেতে হবে!'

'শালা কোনো বিবাহিত পুরুষ দাসত্ব করে না বল তো? এ তো তবু তোকে একটা চাকরি দেবে। নিজে বড়ো চাকরি করেও কত মহাপুরুষকে দেখেছি বউয়ের গোলামি করতে।'

প্রথমে খানিকটা অমত থাকলেও শেষমেশ অভিলাষের মা-বাবাও মত দিলেন। ফোনে ফোনে যোগাযোগ হল। পাত্রী স্বয়ং তার বন্ধুকে নিয়ে পাত্র দেখতে আসবে। অভিলাষের বাবা পাত্রীর বাবাকে ফোনে বলেছিলেন, 'এটা একটু কেমন কেমন লাগছে। মামণিকে বরং আমরাই আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসি।'

পাত্রীর বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিয়ে করবে ওরা। আমরা, বিশেষ করে আমি তো একেবারেই এসবের মধ্যে নেই। আপনি যদি কিছু বলতে চান আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন সোজাসুজি। কোনো অসুবিধা নেই।'

অপ্রস্তুত অভিলাষের বাবা মেয়েকে বললেন, 'মামণি, আমার ছেলে যদি আপনাকে মানে তোমাকে তোমার বাড়ি গিয়ে দেখে আসে?'

ওপার থেকে ইঞ্জিনিয়ার মেয়ের দৃঢ় কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে, 'মি. ব্যানার্জি,এটা কী রকম বলছেন! দেখতে আসা কথাটা আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না। বলতে পারেন আলাপ করতে আসা।'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে মি. ব্যানার্জি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগামী রবিবার যদি তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে আসে আমার ছেলে...'

ওপারের আওয়াজ বলল, 'মি. ব্যানার্জি, আমার সময় খুব কম। আমি এক মাসের জন্য ইন্ডিয়ায় এসেছি, দশ দিন পার হয়ে গেছে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি আর পাত্র দেখার কাজে। আগামী রবিবার আমার এক বন্ধুর বাড়ি যাব। সে-ও গড়িয়ায় থাকে। দুপুরের খাওয়া সেরে সেই সময় আপনার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা আছে, কারণ, আপনারাও গড়িয়ায়। বেশি সময় নষ্ট হবে না। আমার বাড়িতে আসতে চাইলে বোথ সাইডেরই সময় নষ্ট হবে।'

সেই মেয়েই আজ অভিলাষকে দেখতে আসছে অথবা আলাপ করতে আসছে। বাবার গাড়ি চালিয়ে বন্ধুসহ। অংশুও যথাসময়ে অভিলাষের বাড়িতে চলে এসেছে। তারপর অভিলাষের সাজ দেখে তার মন্তব্য শেষ হতে না-হতেই নীচে গাড়ির হর্ন। অংশু জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই বলল, 'এসে গেছে। থাক অভি, তোর আর ড্রেস চেঞ্জ করে দরকার নেই।'

অভিলাষ প্রচণ্ড নার্ভাস।

'আমি কী বাইরের ঘরেই বসে থাকব, না ভিতরে যাব?'

'ভিতরে গিয়ে কী করবি? চা তৈরি করে ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে ঢুকবি মেয়েদের মতো? একদম ফ্রি ভাবে বসে থাকে। নো টেনশন।'

অভিলাষের বাবা দরজা খুলে পাত্রী আর তার বান্ধবীকে আপ্যায়ন করে ঘরে বসালেন। অংশু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি অভিলাষও। অভিলাষের বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন, 'এই যে আমি অভিরূপ ব্যানার্জি আর ও আমার ছেলে অভিলাষ। আর ও হল ছেলের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, অংশুমান।'

পাত্রী স্বয়ং সপ্রতিভাভাবে জবাব দিল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ অল। আমি অলি। অলি রায়। আমেরিকায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। এ আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, সোনালি, সোনালি চক্রবর্তী। আপনারা উঠে দাঁড়ালেন কেন, বসুন।' বলে একটি সোফায় বসে পড়ল। বান্ধবীকে বলল, 'বোস সোনালি।' তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'বড্ড গরম এখানে। দম বেরিয়ে যাচ্ছে।'

অলির পরনে ধূসর-রঙা জিন্স, টপ। ঢিলেঢালা ক্রিম রঙের গেঞ্জির টপ। গেঞ্জির বুকে 'ফ্রিজম' কথাটা বেশ চিকমিক করছে। আর কোনো ডিজাইন নেই। সোনালি একটি সুন্দব সালোয়ার-কামিজ পরেছে। পিচ কালারের। দু'জনেই সুশ্রী তবে অলির গায়ের রং একটু চাপা।

'বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?' মি. ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথার খোলা চুল ঝাঁকিয়ে অলি বলল, 'না না, সোনালি নোজ এভরি নুক অ্যান্ড কর্নার অফ গড়িয়া। গড়িয়াতেই ওর বিয়ে হয়েছে কিনা।'

'ও আপনি ম্যারেড!' অংশুর মুখ দিয়ে কথাটা হঠাৎই বেরিয়ে গেল। অভিলাষ মৃদুস্বরে বলল, 'হতাশ হলি নাকি?' সোনালি আর অলি শুনতে পেয়ে হেসে উঠল।

অংশু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'হ্যাজব্যান্ডকে আনলেন না কেন? এই সুযোগে আলাপ হয়ে যেত।'

'প্রয়োজন নেই তো। তা ছাড়া ওর সময়ই বা কোথায়।' সোনালি বলল।

এবার ঘরে ঢুকলেন অভিলাষের মা। চায়ের কাপ স্ন্যাকস আর মিষ্টির প্লেট ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে। অংশু বলল, 'কাকিমা, এ হচ্ছে অলি। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আর ও হচ্ছে সোনালি। হাউস ওয়াইফ।'

'না না, ওটাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়। গড়িয়াহাটে আমার একটা বুটিকও আছে। সিল্ক শাড়ির। আমার দ্বিতীয় পরিচয় আমি দোকানদার।' আবার একচোট সমবেত হাসির রোল।

অলি বলল, 'বসুন মিসেস ব্যানার্জি। আপনার চা কই?'

'আমি এ-সময় চা খাই না। তোমরা খাও।' বলে প্রত্যেকের হাতে হাতে কাপ তুলে দিতে লাগলেন অভিলাষের মা। আর আড়চোখে দেখতে লাগলেন জিন্স-টপ পরিহিতা তাঁর হবু পুত্রবধূকে।

টুকটাক কথাবার্তা চলতে লাগল। ইন্ডিয়ার অর্থনীতি, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন, আমেরিকার দুর্গাপুজো, অভিলাষের মায়ের স্কুল, সব আলোচনাতেই সকলে স্বচ্ছন্দ। কিন্তু হঠাৎ যেন একটু অস্বচ্ছন্দ দেখায় অলিকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড হেভেন, পাঁচটা বাজে। এবার...'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।' সোনালি একটু সলজ্জভাবে বলল, 'মি. ব্যানার্জি, এবার একটু অলি আর অভিলাষকে নিজস্বভাবে কথাবার্তা বলতে দেওয়া যাক। আমার বরং...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।' ব্যানার্জি দম্পতি উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়াচ্ছিল অংশুও।

অভিলাষ অংশুর হাত ধরে টেনে বলল, 'তুই কেন কেটে পড়ছিস রে? বোস এখানে।' সোনালিকে বলল, 'আপনিও বসুন।' অভিলাষকে এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। তার নার্ভাসনেস কেটে গেছে।

শেষ পর্যন্ত এরা চারজনেই বসল। এক মিনিটের নিস্তব্ধতা। তারপর অভিলাষের দিকে তাকিয়ে অলি বলল, 'আপনি সম্পূর্ণ বেকার তো? মানে টুকটাক পার্ট টাইমও কিছু করেন না তো?'

অভিলাষ একটু থতমত খেয়ে বলল, 'না, নিয়মিত সেরকম কিছু করি না। কিন্তু চাকরির চেষ্টাটা করি।'

'সে কী? আপনারা তো বিজ্ঞাপন দেখেই যোগাযোগ করেছিলেন,' অলি তাকাল অংশুর দিকে, 'সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ বেকার ছেলের কথা বলা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! বেকার। সম্পূর্ণই বেকার।' অংশু শশব্যস্তে বলে, 'চাকরির চেষ্টা করা আর চাকরি করা তো এক নয়।'

'দ্যাটস গুড!' অলি খুশি হল, 'যদি আমাকে বিয়ে করতে চান তাহলে কিন্তু ওই চাকরির চেষ্টাটাও ছাড়তে হবে। কারণটা এই যে, আমি আমেরিকায় জাস্ট লাইক আ মেশিন। আমি যে বাড়িটা ওখানে কিনেছি সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে আসতে গাড়িতে আধঘণ্টা লেগে যায়। নিউ ইয়র্কেই আমার অফিস। সকাল ছ'টার আগে কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে পারি না। ডট আটটায় অফিস। তার মধ্যে আধঘণ্টা সময় আমাকে রাখতে হয় রাস্তার জন্যে। বাকি দেড় ঘণ্টায় ফ্রেশ হওয়া, খাওয়া, ড্রেস করা। বুঝতেই পারছেন। সেই সময় আমি চাই আমার উড বি হাজব্যান্ড, হু এভার হি মে বি, আমায় একটু হেল্প করবেন। সুতরাং সে সময় তিনিও যদি অফিস যাওয়ার ব্যস্ততায় থাকেন তাহলে তো—।'

অভিলাষ আর অংশু, হাঁ করে কথা গিলছিল। অংশু বলল, 'আপনি বাড়ি ফিরে তো আপনার হাউসহোল্ড সামলাতে পারেন, সকালটা যেমন-তেমন করে চালিয়ে। তাই তো করেন, নাকি?'

'সাড়ে আটটায় আমি বাড়ি ফিরি। ট্র্যাফিক জ্যাম থাকলে কখনও কখনও ন'টাও হয় তখন আমি টোটালি এগজস্টেড। টিনড ফুড আর ফ্রুটজুস খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি ধরে গেছে। ভীষণ কুকড ভেজিটেবল খেতে ইচ্ছে করে। আর টাটকা মাছের ঝোল। মা-বাবারা যখন যান তখন খুব ভালো কাটে আমার দিনগুলো। কিন্তু ওঁরাও বেশিদিন থাকতে পারেন না। আমার ঠাকুমা রয়েছেন এখানে। এইট্টি ইয়ার্স ওল্ড।' তারপর অলি অভিলাষের দিকে চেয়ে বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, আপনি রান্না জানেন তো? কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো!'

অংশু হতভম্ব। অভিলাষ অপমানিত। অতিথির মর্যাদা রেখেই অভিলাষ বলল, 'তার মানে হাজব্যান্ড নয়, আপনি অ্যাকচুয়ালি কুক চান বলুন।'

'অফকোর্স নট।' অলি আবার চুল ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, 'আমার ফিজিক্যাল, মেন্টাল ডিমান্ডগুলোও মেটাতে হবে তো! শুধু কুকে তো আর তা হবে না। ব্যাপারটা ঠিক ওরকমভাবে নেবেন না। আমি খবর রাখি কলকাতার অনেক কোয়ালিফায়েড ছেলে বেকার বসে আছে। আমি তাদের একজনকেই চাই যে আমার সব প্রয়োজনই মেটাতে পারে। আমিও তার সব প্রয়োজন মেটাব। আমি তাকে মান্থলি যে-রেমুনারেশন দেব এখানে একটা গ্রেডেড চাকরিতেও তা পাবে না। আমি তো সমাজের ভালই করতে চাইছি।'

এবার অভিলাষ গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, 'কিন্তু আজীবন একটা ছেলে বেকার থেকে তার বউয়ের প্রয়োজন মেটাবে এটা কী সম্ভব? তার নিজস্ব জীবন বলে কী কিছু থাকবে না?'

'কেন থাকবে না? তারই তো নিজস্ব জীবন থাকল। সে ইচ্ছেমতো বই পড়বে, টিভি দেখবে, বেড়াবে, ঘরকন্নার পাশাপাশি। আচ্ছা বলুন তো ইন্ডিয়ায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মেয়েই তো তাই করে। নয় কী? খুঁজলে আমেরিকাতেও পাওয়া যাবে বেশ কিছু। আমি না হয় একটু অন্য দিকে চাকা ঘোরালাম, ক্ষতি কী?'

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সোনালিই প্রথম কথা বলল, 'আপনারা ভেবেই দেখুন না দু'-একদিন। লি তো এখনও বেশ কিছুদিন আছে।'

'লি! লি কে? ও আচ্ছা, অলিকে আপনারা লি বলেন?'

'হ্যাঁ, যত ছোটো করে ডাকা যায় আর কি। স্টেট্‌স-এও আমাকে লি বলেই ডাকে। যত শর্টকাট হয় ততই সময় কম লাগে। সময়ের যা অভাব!'

অলি অকটু থামল। তারপর অভিলাষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার নামটাও একটু শর্ট করা যায় না! বড্ড বড়ো নাম। আমেরিকান স্টাইলে প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে লাশ বলে ডাকলেই তো ভাল হয়!'

অভিলাষের চোখ কপালে ওঠে। বলে, 'আমি জলজ্যান্ত মানুষটা লাশ হয়ে যাব? মরার আগেই!'

সকলেই হেসে ওঠে। সোনালি বলে, 'বলিউডের বিখ্যাত নায়িকা যদি ঐশ্বর্যা থেকে অ্যাশ হতে পারে তো আপনার লাশ হতে আপত্তি কী?'

অলি ওঠার জন্য উশখুশ করে। সোনালি বলে, 'হ্যাঁ, এবার তাহলে মি. অ্যান্ড মিসেস ব্যানার্জিকে ডাকুন। আমরা উঠব। আর আপনাদের মতামতটাও কাল-পরশু ফোনে জানিয়ে দেবেন।'

অংশু বলে, 'তার মানে পাত্র আপনাদের পছন্দ হয়েছে।' বলেই তার মনে হয় কথাটা বড্ড বোকা-বোকা হয়ে গেল। অভিলাষ তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

অলি সহাস্যে বলে, 'পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। আমার কন্ডিশনগুলো যে মেনে নেবে তাকেই আমি সিলেক্ট করব।'

অভিলাষ অংশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওকে জিজ্ঞেস করো তো বাচ্চার জন্মটাও কি আমাকেই দিতে হবে? এটাও কী কন্ডিশনের মধ্যে?'

'কিছু বলছেন?' সোনালি ঘাড় ঘোরাল।

অংশু চটপট ম্যানেজ করে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, একটা কথা। অভিলাষ কিন্তু রান্নাবান্না কিছু জানে না। আপনি মাছের ঝোল ভালোবাসেন? ও কিন্তু ঝোলের ঝ-ও জানে না।'

'তুই জানিস?' অভিলাষ চোখ পাকায়।

'জানি বইকি। অনেক মেয়ের থেকে অনেক রান্না আমি ভাল জানি। ভুলে গেছিস হায়ার সেকেন্ডারির পর আমি কিছুদিন কেটারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তা ছাড়া আমার মা যখন নার্সিংহোমে ছিলেন তখন মাসখানেক আমাকেই রান্নাঘর সামলাতে হয়েছিল।'

অভিলাষ হেসে বলে, 'বাঃ, তোর তো অনেক গুণ রে! বাচ্চাও মানুষ করতে পারিস নাকি?'

অলি উঠতে গিয়েও বসে পড়ে।

'ঠিক পয়েন্টটা আপনি রেজ করেছেন লাশ—আই মিন অভিলাষ। আমার কিন্তু আরও একটা কন্ডিশন—বাচ্চা মানুষ কার। আমি বাচ্চা খুব ভালবাসি। আমার নিজের কোনো ভাইবোন ছিল না। এটা আমি খুব মিস করেছি। তাই আমি চাই আমার দু'টি সন্তান হোক। আমার মেডিক্যাল টেস্ট করানো আছে। আই হ্যাভ নো প্রবলেম টু ক্যারি আ চাইল্ড। আপনি যদি আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি থাকেন আপনিও সব টেস্ট করিয়ে নেবেন।'

অংশু আর অভিলাষের খুব অস্বস্তি লাগছে। স্বাবলম্বী এনআরআই তনয়ারা এই পর্যায়ে চলে গেছে নাকি! পাত্র দেখতে এসে হবু সন্তানের প্রসঙ্গ তোলে! নির্লজ্জ! বিরল প্রজাতির আধুনিকা।

ইতিমধ্যে পর্দা সরিয়ে অভিলাষের বাবা-মা ঘরে ঢুকলেন।

'কী, হল তোমাদের আলাপ-পরিচয়?' মি. ব্যানার্জি বললেন।

অলিই উত্তর দিল।

'হ্যাঁ, অনেক কথাবার্তা হয়েছে। এবার আমরা উঠছি মিসেস ব্যানার্জি। আপনাদের মতামত ফোনে জানিয়ে দেবেন। চল নালি, খুব দেরি হয়ে গেল। বাই এভরিবডি।' গটগট করে দু' বন্ধু নীচে নেমে গেল। এরা দু' বন্ধুও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেই ঘরে সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল।

'যওসব।' অভিলাষ বলল, 'কোথা থেকে কাগজ পড়ে কী সম্বন্ধ আনলি!'

অংশু বলল, 'যাই বল, দেখতে কিন্তু বেশ মিষ্টি, চেহারায় কাঠখোট্টা ভাব নেই।'

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'কী বল শেষ পর্যন্ত? মেয়েটি তো খুব ভাল বাংলা বলে। ভুলে যায়নি এখনও। কী বলছে, বিয়ে করলে অভিলাষকে ওখানে কী চাকরি দেবে?'

'বউয়ের সেবাদাসী—সরি—সেবাদাসের। জিজ্ঞেস করা হল না মাইনেটা কেমন দেবে।' অভিলাষের গলায় উষ্মা।

'কী ব্যাপার রে অংশু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অংশু নয়, শুধু শু বলো মা। অংশু নামটা বড্ড বড়ো।'

মিসেস ব্যানার্জি হতবাক।

'বলবি তো আমায় সব ব্যাপারটা খুলে, নাকি!'

সমস্তটা শুনে মি. ব্যানার্জি বললেন, 'যাঃ মুখে ওরকম বলছে। একবার স্টেট্‌সে পৌঁছলে অভিলাষের একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।'

'আরে না বাবা। ব্যাপারটা তা নয়। শর্তটাই এই যে, সারা জীবন বেকার থাকতে হবে।'

এবার অংশু বলে, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ অভিলাষ তুই কিন্তু সারাদিন ফ্রিলি তোর লেখালেখির কাজটা করতে পারবি। বিদেশে থাকা একটা ইঞ্জিনিয়ার বউ, হ্যান্ডসাম রেমুনারেশন, উইক এন্ডে বউয়ের গাড়ি চেপে লং ড্রাইভ—সবই এখন তোর হাতের মুঠোয়। ঝুলে পড়, অভিলাষ, ঝুলে পড়। কী হবে এই পচা দেশে চাকরির পিছনে দৌড়তে দৌড়তে অর্ধেক জীবন শেষ করে দিয়ে?'

'তা তোর যদি ইঞ্জিনিয়ার বউ পাওয়ার এত শখ তো তুই নিজের জনাই তো যোগাযোগ করতে পারতিস। আমাকে ফাঁসাবার কী ছিল?'

'এই দেখ, ভালো করতে গেলে মন্দ হয়। আমি রবিবারে খবরের কাগজের পাতায় তোর জন্য চাকরির খোঁজ করি। চাকরির বিজ্ঞাপন তো তেমন সুবিধাজনক কিছু পাই না। হঠাৎ পাত্রপাত্রীর পাতায় এটা চোখে পড়ল...'

'ও পাত্রপাত্রীর পাতাতেও তুই আমার চাকরির খোঁজ করিস? দারুণ তো! লুকোচ্ছিস কেন বাপ! চাকরি করে সেটেল্‌ড হয়েছিস। এখন নিজের জন্য পাত্রী খুঁজছিস বলতে লজ্জা হচ্ছে?'

'দুর গাধা। তা নয়।' অংশু সত্যি কথাটা অস্বীকার করে, 'ওটা এমনিই চোখে পড়েছিল। বক্সের মধ্যে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিল। যে কারওরই চোখে পড়ার কথা। তা তোর ইচ্ছে না হয়, রাজি হোস না। মিটে গেল।'

অভিলাষের মা বলে ওঠেন, 'দাঁড়া অংশু, একটু সময় দে। মেয়েটিকে আমার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। সরল, সোজাসাপটা। তা ছাড়া অভি আমেরিকায় গেলে আমাদেরও বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হবে।'

'তোমার বিদেশ যাওয়াই বড়ো হল মা? তোমার বউমা গাড়ি হাঁকিয়ে অফিস যাবে আর তোমার ছেলে গলদঘর্ম হয়ে রেঁধেবেড়ে তার মুখের সামনে তুলে ধরবে। কেমন লাগবে সেটা?'

'কেমন কেমন যে একটু লাগবে না তা আর অস্বীকার করি কীভাবে, এতকাল মেয়েরাই এসব করে এসেছে তো। তবে এখন তো সব কাজ সকলের জন্যই। এ তো শুধু জায়গা বদল।'

এইভাবে খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। দিনতিনেক পর অভিলাষ একদিন অংশুদের বাড়ি গেল।

'মেয়েটিকে "না" বলে দে রে অংশু। বউয়ের রান্না আব বাচ্ছার কাঁথা কাচার শর্তে আমি আমেরিকায় যেতে পারব না। অবশ্য এতদিনে সে যোগ্যতর হাজব্যান্ড কাম সারভেন্ট পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

'না, পায়নি।' অংশু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আজই ফোনে সেটা আমি জানলাম।'

'তোদের আবার ফোনাফুনিও চলছে নাকি?' অভিলাষ বলল।

'আরে ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার ফোন করতে হয়। তাতেই জানতে পারলাম কোথাও কিছু সেটেল্‌ড হয়নি। আসলে সবাই তো তোর দৃষ্টিতে ভাবছে—হাজব্যান্ড কাম সারভেন্ট। কিন্তু আমি একটা জিনিস ভেবে পাই না, কোনো যোগ্যতা ছাড়া স্টেট্‌সে থাকার এমন একটা সুযোগ কেউ নিচ্ছে নাই বা কেন? বিশেষত যারা বেকার। বেকারদের জন্য, কিছু মনে করিস না অভি, এরকম অফার আর কখনও এসেছে বলে শুনিনি।'

অভিলাষের মাথাটা গরম হয়ে উঠল। বলল, 'এক কাজ করো, তোর বিশ হাজার টাকার চাকরিটা ছেড়ে চট করে বেকার বনে যা। স্টেট্‌সে থাকার অফারটা তুইই নিয়ে নে না!'

'নাঃ, তোর সঙ্গে আর এ-নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। চ, মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

তারপর বেশ অনেকদিন কেটে গেছে। অভিলাষের স্কুল সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কোয়ালিফাই করেছে। ইন্টারভিউও শেষ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কচুবেড়িয়া হাই স্কুলের হিস্ট্রি টিচার হয়ে তাকে জয়েন করতে হবে আগামী মাসে। সে এবার এ-চাকরিটা নিয়েই নেবে। আর বেকার বসে থাকতে ভাল লাগছে না। ওখানেই ঘর ভাড়া করে থাকবে। সপ্তাহান্তে মা-বাবার কাছে আসবে।

সেদিন বিকেলে অংশুর আবির্ভাব। অভিলাষ ফোনে তাকে চাকরির খবর জানিয়েছিল। অংশু বলল, 'চললি তাহলে কচুবেড়িয়া শেষ পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ রে নিউ ইয়র্ক আমার কপালে নেই। আমার জন্য কচুবেড়িয়াই ভালো।'

'আমি কিন্তু নিউ ইয়র্কেই যাচ্ছি। সামনের সপ্তাহে।' অংশু বলল।

'আই বাপ! কোম্পানি পাঠাচ্ছে?'

'কোম্পানি কী পাঁঠা নাকি যে আমাকে নিউ ইয়র্ক পাঠাবে? আমি প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ারও নই, ম্যানেজমেন্টের টপ র‍্যাঙ্কেও নেই। আমাকে কোনো কম্মে বিদেশে পাঠাবে? তা ছাড়া গত সপ্তাহেই তো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

'কী বলছিস তুই! পার্মানেন্ট একটা মোটা টাকার চাকরি তুই ছেড়ে দিলি হঠাৎ!'

'পার্মানেন্ট বেকার হওয়ার জন্য। পার্মানেন্ট বেকার না হলে তো আর আমেরিকায় যাওয়া যেত না। এখনও বুঝতে পারছিস না?'

'জলের মতো বুঝেছি। তার মানে ওই লি-তেই তুই মজলি শেষ পর্যন্ত!'

'হ্যাঁ রে। অলির সঙ্গে কাল আমার রেজিস্ট্রি। সামান্য কজন বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করেছি আমরা দু'জনেই। পাঁচতারা হোটেলে পার্টি দেব। যাবি কিন্তু। তার দু'দিন পরেই আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছি। প্লিজ অভি, কোনো কমপ্লেক্সে ভুগিস না। আসিস কিন্তু কাল।'

অভিলাষ ফ্যালফ্যাল করে অংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যাব। নিশ্চয়ই।'

কিন্তু অভিলাষ যায়নি। কেন যায়নি সে নিজেও জানে না। হপ্তাখানেক বাদে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে সে চলে এসেছে কচুবেড়িয়া। খবর পেয়েছে অলি তার নতুন বরকে নিয়ে স্টেট্‌সে উড়ে গেছে যথাসময়ে। আশা করা যায় অংশু সেখান সুখেই ঘরকন্না করছে।

কচুবেড়িয়া গ্রামে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নেমে আসে। যখন-তখন পাওয়ার কাট। অভিলাষ তার এক কামরার ভাড়াবাড়িতে লেখালেখি করতে বসে সন্ধ্যার পর। ঠিক মন লাগে না। মনে পড়ে চারিদিকে আলো ঝলমল তার গড়িয়ার বাড়ি। বন্ধুবান্ধব, আড্ডা। কত রকম স্বপ্ন। সে কী কিছু ভুল করল? না বাবা, অলি-র পায়ের 'শু' না হয়ে কচুবেড়িয়ায় 'লাশ' হয়ে পড়ে থাকাও শ্রেয়। অভিলাষের এটাই সান্ত্বনা।

ফুলপিসি, তোমাকে

চন্দ্রা ঘোষ মিত্র

ফুলপিসি যখন আমাদের বাড়িতে এল, সেই প্রথম আমি আমার বাবার তরফে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলাম। হাতিশালার বাড়িতে দেখেছি অনেক লোক, নিকট সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের ডাকতেও হত। কিন্তু এত কাছ থেকে কখনও দেখিনি। আশ্চর্য লাগলেও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমার দশ বছরের জীবনে সেখানে গেছিও মাত্র বারকয়েক। একবার ছোটোকাকার বিয়ের সময়, একবার ঠাকুমার অসুস্থতার সময়, আর শেষবার ঠাকুমা মারা যাবার পর।

কেন এরকম হল তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথাও ছিল না আমার। ওই যে বললাম না, অভ্যেস। তবু কী করে যেন বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরে গিয়েছিলাম আসল কারণটা কী। ঠাকুমা আমার মাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। মা-র অপরাধের মধ্যে প্রথমটা বাবা মাকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন, দ্বিতীয়টা জাতের অমিল, তৃতীয়—মা লেখাপড়া শিখেছে, চতুর্থ—শিখেছে শিখেছে, বিয়ের পর ঘরে বসে স্বামীসেবা করতে পারত, তা না করে দুপুরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে চাকরি করতে, পঞ্চমত, ষষ্ঠত এরকম আরও কত করতে করতে একবারে চক্ষুশূল। তবে আমি বোধহয় অতটা চোখের বিষ ছিলাম না। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েও ঠাকুমা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন—এ আমার বেশ মনে আছে। ততদিনে মার গ্রহণ-ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

এমন অবস্থায় ফুলপিসির আমাদের বাড়িতে থাকতে আসাটা এক দৈব নির্বন্ধন। ঠাকুমা মারা যেতেই হাতিশালার সংসারে ফুলপিসি বোঝা হয়ে গেল। বিয়ে দেওয়ার দায়টাই সবচেয়ে বড়ো দায়। সেই সময়ই আমাদের বাড়িতে যে কাজের মাসি আমাদের সংসারটাকে এবং আমাকে আগলে রেখেছিল সে কাজ ছেড়ে তার দেশের বাড়িতে চলে গেল। এরকম যোগাযোগকে দৈব বলব না তো কি! বাবার জ্যেষ্ঠপুত্র জনোচিত কর্তব্যবোধ চাগিয়ে উঠল, কলকাতায় নিয়ে এসে সর্বকনিষ্ঠ ননদটির বিয়ের ব্যবস্থা করা খুবই উচিত—মারও মনে হল। আর ফুলপিসি? স্রেফ প্রজাপতির মতো পাখনা কাঁপাতে কাঁপাতে তার স্বপ্নের ফুলবাগানে এসে হাজির হল।

বাবাকে অসম্ভব সমীহ করে চলত। আমার বাবার মতো শান্ত, ভালোমানুষ লোকটাকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে, কিছুতেই মাথায় আসত না আমার। এক কাপ চা-ও কোনোদিন নিজে হাতে বাবাকে দিতে পারত না। কেবল আমাকে সাধত, যা না ঝিমলি, তোর বাবাকে চা-টা দিয়ে আয় না।

আমিও সুযোগ বুঝে দর বাড়াতাম, কী দেবে তাহলে আমায়?

কী চাস বল? আজ দুপুরে তেঁতুল মাখব বেশ তারে কিংবা আমের আচার। দেবখন তোকে।

বাবাকে বলি পাকা তেঁতুল আনতে? তেল, নুন, লঙ্কা আর এখো গুড় দিয়ে এত চমৎকার মাখো তুমি, ভাবতেই আমার জিভে জল আসছে। বলো, বাবাকে বলব কি না?

ও আমার পোড়া কপাল, এতে আবার বাবাকে বলার কী আছে? বাসন মাজার জন্য বউদি বলে কত পাকা তেঁতুল জমা করে রেখেছে। তার থেকে এক খাবল নিলে কেউ বুঝতে পারবে না।

এমনই ভয় করত বাবাকে। বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকত ও এটা-সেটা কাজের ছুতো করে রান্নাঘর ছেড়ে নড়তই না। অথচ ওরই তো দাদা, আপন মায়ের পেটের ভাই। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ না থাকলে এত দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়?

মায়ের জন্যই কি কম করত? সব সময় তোয়াজে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও তো ভয়েরই আর একরকম ভাব। হাতের থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সেরে রাখত। সাফা ঘরকে আবার সাফাই করত, মাজা বাসন আবার মেজে তার চেকনাই ফেরাত—এমন মানুষকে কী বলা যায়?

তারপর মা, বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে, সেই সন্ধে পর্যন্ত আমার আর ফুলপিসির রাজত্ব। আর যত রাজ্যের শাসন আমার ওপর। মাথায় তেল দে, পায়ের পাতায় ঝামা ঘষ, ভালো করে গায়ে জল ঢাল, গলা পর্যন্ত ভর্তি করে ভাত খা—আর চার দানা বেশি হলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে এমন করে, খেয়ে উঠে লাফালাফি করবি না, হয় ঘুমো নয়তো ওই দেখ তোর বিজনমামা এসেছে, যা অঙ্ক কর গে যা, এ কি, পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে আবার একটা ভুল, মাথা খাটাস না কেন, বকুনি খেতে তোর ভালো লাগে?

॥ দুই ॥

বিজনমামা মায়ের মামাত ভাই। আমার মামাবাড়ির সমাজে ভালো ছাত্র নামে বিখ্যাত। সে নাকি দুনিয়ায় লেখাপড়া ছাড়া কিচ্ছু জানে না। আমাদের সব তুতো ভাইবোনদের চোখে একটা করে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে সব দিক ঢেকে দেওয়া হত, শুধু বিজনমামার দিকটা খোলা। আমরা যারা ভালো হতে চাই, বিজনমামাতে উঠতাম, বিজনমামাতে বসতাম। এ হেন মামা ছিল মা-র বিশেষ স্নেহের পাত্র। সে বাড়িতে এলে মা কী করবে আর কী না করবে ভেবে পেত না।

একদিন সন্ধেবেলা মা অফিস থেকে সবে ফিরেছে, দরজায় ঘণ্টা। এ সময়টা মা-র একান্ত বিশ্রামের সময়। তবু আগন্তুককে দেখে মা লাফিয়ে উঠল, ও মা, বিজু এসেছিল? কী খাবি বল?

বিজনমামা একপলক রান্নাঘরের দিকে চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল, তোমার কাজের মাসি তো চলে গেছে শুনলাম। এটা আবার কোথথেকে আমদানি?

যাঃ, এরকম করে বলিস না। তোর জামাইবাবুর বোন।

গেঁয়ো ভূত একেবারে।

ভালো কথা বললি তুই! গ্রাম থেকে এলে গেঁয়ো হবে না তো কী সুচিত্রা সেন হবে?

আমার মনে হল মা সবটা ঠিক বলছে না। একটা ছুটির দিন, কানাঘুঁষোয় কানে এল, আজ ফুলপিসিকে কোনো এক পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। দেখতে এলে ঘটা করে সাজতে হয় আমি জানি। সামনের চুলে আলবার্ট কাটা, কপালের মাঝখানে কালো টিপ,ম্যাগি হাতা বেগুনি রঙের ব্লাউজ, জল-গোলাপি রঙের শিফন শাড়ির এলানো আঁচলের প্রান্ত বাঁ কাঁধে আটকানো, আমার ফুলপিসিকে দেখে মনে হল অনেকটা, অনেকটাই সুচিত্রা সেন।

মা কিন্তু দেখে একেবারে জ্বলে উঠল, এ কি করেছ, মাথার সামনে চুড়ো করে চুল বেঁধেছ কেন? এরকম পাতলা জ্যালজেলে শাড়ি কেউ পরে? ল্যান্সডাউনের লোকদের তোমাকে দেখে পছন্দ হবে?

মা-র আশঙ্কাই ঠিক। তাদের পছন্দ হয়নি। না হোক গে, আমি ঠিক করে রেখেছি, বড়ো হলে ফুলপিসির মতো সাজব। ওরকম আঁচলের কোনোটা কাঁধের কাছে ধরে রেখে মোড়ার ওপর

একপাশে পা বেঁকিয়ে এমনভাবে বসব যেন শাড়ির কুঁচিগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একটার পিঠে পড়ে থাকে আর একটা।

কত শেখানোর চেষ্টা হয় ফুলপিসিকে। শুধু সাজগোজের ধরনই নয়, কথা বলার টানও। 'খাগা যা'কে খেতে যা, 'গ্যিইছিলাম'কে গেছিলাম—এরকম কত কী শুধরে দেওয়া হয়। বাধ্য ছাত্রীর মতো সব মেনে নেয় সে। আবার কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে বলবে, আমি কি অত জানি? তোদের মতো শহরে থাকি, না টি ভি দেখি?

তা সত্যি, তখন অত গ্রামেগঞ্জে ঘরে ঘরে টিভি পৌঁছয়নি। আমাদেরই একটা সাদা-কালো টিভি ছিল, রাত্তির বেলা কয়েক ঘণ্টা চলত সেটা। ঠিকই ধরেছে ফুলপিসি। টিভি-র প্রকোপেই না সারা বাংলা, কী বলি সারা পৃথিবীই এক চালে চলছে?

তরমুজের সরবত নিয়ে দরজার কাছ থেকে ফুলপিসি আমাকে ডাকাডাকি করে। লজ্জা পাচ্ছে বুঝতে পেরে মা বলে, এসা না ফুলটি, ঘরে এসো। ও আমার ভাই, বিজু। ওকে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

সরবতের গ্লাস এগিয়ে দিতে গিয়ে বিজনমামার হাতে ফুলপিসির হাত ঠেকে যায়।

নিমেষে গলার স্বর কঠোর করে মা বলে, ফুলপিসি তোমাকে কতদিন না বলেছি, কারওকে কিছু দেবার সময় গ্লাসটা ডিসের ওপর রেখে তারপর দেবে।

কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলপিসি।

ওসব কায়দা-কানুন অন্য লোকের বেলায়। আমি এ বাড়ির ঘরের লোক, আমার জন্য ওসব না মানলেও চলবে।

যা হোক, বিজন মামার কথায় ঘরের হাওয়া খানিক সহজ হল না। ফুলপিসি হাঁফ ছেড়ে রান্নাঘরে দৌড়ল। আমি মনে মনে বিজুমামাকে ধন্যবাদ জানাতে যাব, শুনলাম সে বলছে, রাতারাতি কেতাদুরস্ত করতে যেও না রাঙাদি, একবার চোখ খুলে গেলেই মুশকিল।

॥ তিন ॥

মা, বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলেই কিন্তু ফুলপিসি খুব সহজ, স্বাভাবিক। বিজুমামা প্রায়ই আসে আমাকে অঙ্ক করাতে। কিন্তু অঙ্ক যে কী হয় সে আমিই জানি।

বিজু-দা, কী খাবে? চা, না সরবত?

আমি ঘুমোচ্ছিলাম। চোখ খুলে অবাক হয়ে যাই। কী রে বাবা, কখন এসেছে বিজনমামা? আমাকে ডাকেনি কেন ফুলপিসি? আগে তো আমাকেই দরজা খুলে দিতে হত, এত লজ্জা ছিল ফুলপিসির বিজনমামার সামনে বারই হত না। তুমি বসো তো ফুলটি। ঝিমলি আজ আমাদের চা করে খাওয়াবে।

ঝিমলি? আহা, ও যে বড্ড ছেলেমানুষ। বউদি রাগ করবে। ব্যস্ত ফুলপিসির হাত টেনে রাখে বিজনমামা, এত জোর করে টেনে ধরে যে ফুলপিসি বিজনমামার বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে।

ছাড়, ছাড় বিজুদা। ঝিমলি গ্যাসের উনুনে ঠিকমতো পারবে না। ও কোনোদিন করেনি। বউদি বকবে আমাকে।

ছেড়ে দেওয়ার বদলে আরও সাপটে জড়িয়ে ধরে বিজনমামা। ধরা পড়া পাখির মতো ঘাড় উঁচু করে ঠোঁট ফাঁক করে রাখে ফুলপিসি।

আমি রান্নাঘর থেকে চেঁচাই, উঃ মাগো, আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল।

ছটফট করতে করতে নরম গলায় ফুলপিসি বলে, বিজুদা, আমি যাই।

না, ও শিখুক। সব সময় তো তুমি থাকবে না ফুলটি, তখন ও কী করবে? বলতে বলতে বিজনমামার চোখের দৃষ্টি ঘোর হয়ে ওঠে।

আমি কাল্পনিক ফোস্কার ওপর ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বিজনমামাকে দেখি। একটুও ভালো লোক বলে তাকে আর মনে হয় না আমার। কিন্তু সে কথা ফুলপিসি মানলে তো।

মাঝখান থেকে আমাদের টইটম্বুর দুপুরবেলাগুলো একদম মাটি। ফুলপিসি আসাতে আমার পুতুলের সংসারে কত সুরাহা হয়েছিল! সব মেয়ে পুতুলগুলোর বিয়ে দিতে পেরেছিলাম। রং-চটা ছেলে পুতুলগুলোও নাক-চোখ আঁকার পর একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা যেগুলো ঝড়তি-পড়তি মাল হয়ে জুতোর বাক্সে পড়েছিল, এখন রীতিমতো পোশাক-আশাক পরিয়ে দিয়ে চিলেকোঠায় তাদের ঘর-বসত করাতে পারলাম। সেখানেও বিজনমামা।

অঙ্ক কষানো বন্ধ রেখে বিজনমামা মাঝে মাঝে ঘোষণা করত, সবসময় লেখাপড়া করা উচিত না। ওতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

আমার তো ভালোই। শুরু হত লুকোচুরি খেলা। চোখ কষে রুমাল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। বলা থাকত মনে মনে একশো অবধি গুনে নিয়ে আমি বাকি দুই খেলুড়েকে খুঁজতে বেরোব। একশো সংখ্যাটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচশো, হাজার পর্যন্ত করে ফেলা হত। গুনতে গুনতে অস্থির হাতে রুমাল ছুঁড়ে ফেলে আমি দৌড়ে বেড়াতাম এ-ঘর, ও-ঘর। খাটের নীচ, দরজার পাশ, আলমারির খাঁজ। যেখানে মানুষ থাকতে পারে আবার পারেও না। খুঁজতে খুঁজতে চিলেকোঠার ঘর।

ও ফুলপিসি, বিজুমামা, দরজা বন্ধ করে কি করছ তোমরা এ ঘরে?

কারও সাড়া নেই, ভেতর থেকে দু-চারটে খুটখাট আওয়াজ ছাড়া। মাঝে মাঝে ইঁদুরের কিচমিচ, পাখির ঝটপটির মতো শব্দ। আমি তবু দরজা ছেড়ে নড়তাম না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দরজার গায়ে একটা ফুটো আবিষ্কার করলাম। তারপর সেটার গায়ে চোখ পেতে দিয়ে, আবছা আবছা মানুষ, বিজুমামা ফুলপিসিকে কি করছে?

দুম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফুলপিসি। বিশ্রস্ত শাড়ি কোনোমতে গায়ে জড়ানো।

ওমা, তুই ঠিক খুঁজে বার করেছিস। চল, এবার আমি চোর দেব।

পিছন পিছন বিজুমামা—রাঙাদি এই মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে একদম মানুষ করতে পারেনি।

ভীষণ রাগ হত আমার। আদর দেওয়ার কি হল? খেলার শর্তই তো এই। খুঁজে বার করাটা যেন আমার অপরাধ।

॥ চার ॥

অচিরেই অঙ্ক শেখা আমার ডকে উঠে গেল। আমি তো বাঁচলামই, মা-ও খুশিতে ডগমগ। কী, না, তাঁর বিদ্বান ভাইটি আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। দেশের মাটি ছেড়ে দিগ্বিজয়ে বেরুচ্ছেন তিনি। কেবল একজন ছাড়া।

ফুলটি, এরকম মড়ার দড়ি চেহারা হয়েছে কেন তোমার? চোখের নীচে কালি?

না, না ও কিছু না, বউদি। বড্ড গরম পড়েছে কি না, কদিন রাতে ঘুম হয়নি তাই।

দুপুরবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ফুলপিসিকে চেপে ধরলাম আমি।

তুমি মাকে মিথ্যে কথা বললে কেন? তোমার শরীর খারাপ না তো কী? খেতে পারছ না, বমি করছ—তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ছ, তোমার তো ডাক্তার দেখানো দরকার!

চুপ করো তো। হুট বলতেই কেউ অমন ডাক্তার দেখায় না। হাতিশালা হলে আমি ভাবতামই না।

তবে সেখানেই চলে যাও। না হলে মরে যাবে তুমি!

মৃত্যু মানে যে এক জীবনের দূরত্ব, এটা কল্পনা করেই আমি ফুলপিসির আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালাম। দুহাতের বেষ্টনীতে আমার মাথাটা নিজের বুকের ওপর রেখে ফুলপিসি বলল, হ্যাঁ রে, তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস, তাই না ঝিমলি? আমি মরে গেলে তোর কষ্ট হবে, খু-উ-ব?

আমি তার হৃৎপিণ্ডের লাব্ ডুব শুনতে শুনতে ফিসফিস করে বললাম, মরার কথা বলতে নেই, ফুলপিসি। তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে।

আর তোর বিজনমামা? সে আর আসবে না?

হায় রে আমার পোড়া কপাল, তুমি বুঝি তার জন্যে বসে আছ?

এরকম করে কথা বলার ঢঙটা আমি ফুলপিসির কাছ থেকেই শিখেছি।

চিঠিপত্র দেয় তোদের? কোনো ফোন-টোন? আমার কথা বলেনি একদিনও?

যতই গোপন করতে চাক ফুলপিসি, গোপন কিছুই রইল না। প্রথমটায় বিজনমামার দোষ মা কিছুতেই মানতে চাইছিল না। মা-র বক্তব্য এটা ফুলপিসির তরফে বিজুকে ফাঁসানোর চেষ্টা। বামন হয়ে চাঁদে হাত? কলকাতায় আসতে পেরে হয় না, আবার আমেরিকা যাবার শখ!

বাবা ফুলপিসির সঙ্গে সোজাসুজি কথা কমই বলত। সেই বাবাও, ফুলটি তুই এরকম? তোর বিয়ে দেব বলে আমি হাতাশালা থেকে নিয়ে এলাম, হন্যে হয়ে পাত্র খুঁজে যাচ্ছি, আর তার প্রতিদান তুই এই দিলি? মায়ের কাছে আমাকে চিরকালের পাতক করে রাখলি?

বিজনমামাকে কিছুতেই ধরা গেল না। দায়মুক্ত হবার জন্য খরচপত্রের দায়টা সে নিতে চেয়েছিল, এই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ফুলপিসি কিছুতেই রাজি হয় না। তার যেন বিশ্বাসই হয় না, এটা বিজুদার কথা। সে বসে থাকে—একটা চিঠি, নিদেন একটা ফোন!

অপেক্ষা করতে করতে মা-বাবা ক্রমশ অধৈর্য, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। একদিন তো চুলের মুঠি ধরে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিল মা।

তুমি আর কত মুখ হাসাতে চাও আমাদের? ঝিমলির কথাটাও তো ভাববে? ও কিছু না বুঝতে পারলেও কেমন মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেখো না?

মা-র অজ্ঞতায় আমার হাসি পায়। আমি কিছু জানি না তা নয়। কিছু জানি কিন্তু সবটা নয়। কী যে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটা, তা আমার কাছে তখন রহস্য। বিজনমামা তো একদিন আমারও বুকে হাত—। তবে কী আমিও ফুলপিসির মতো অসুস্থ হয়ে পড়ব?

এটা শুনেই পাথরপ্রতিমা ফুলপিসি এক কথায় রাজি।

সেই ফুলপিসির চলে যাওয়া। আমাদের বাড়িতে, এমনকী। অন্য আত্মীয়রাও তাকে কেউ মনে করে না, বিয়ের জন্য তোলা ফটো আছে একটা, মাথার পিছনে স্টুডিওর পাহাড়ের ছবি, পাইন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, সামনে বসে আছে ফুলপিসি একটা কাঠের হাতল-ওয়ালা চেয়ারে—সেটাও চলে গেল গুমঘরে। যেন আমার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়, যেন আবার সব কিছু ধোয়া তুলসীপাতা বনে যায়!

শেষবারের মতো ফুলপিসিব সঙ্গে আমার দেখা, ডিলেরিয়াম শুরু হয়ে গেছে, সেপ্টিসেমিয়া এক মোক্ষম থাবার আঘাতে ছিঁড়ে ফেলেছে বৃন্তডোরে। একটা ভগ্নপ্রায় হাসপাতাল বাড়ি, বারান্দার একধারে উনুনের ওপর বসানো ডেকচিতে ফুটছে ছুরি, ইন্‌জেকশনের সূঁচ, ঘরের ভেতরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গন্ধ জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব, বিছানার চাদরের সাদাটাও ঠিক তত সাদা নয়, ধারের জানালা বন্ধ, তার ওপর আড়াআড়ি করে মারা আছে বাঁশের কঞ্চি। নিমীলিত অবস্থা থেকে মাঝে মাঝে ঘোর লাগা চোখ তুলে কিছু বলছে ফুলপিসি, শোনা যাচ্ছে

না কিছু। শুধু বিড়বিড় করে ঠোঁটের নড়াটুকু দেখা যাচ্ছে। বড়ো-পিসিমা পাশে একটা টুলে বসে, নীচে ফুটপাথে ন-কাকু, মেজ পিসেমশাই, ছোটোকাকু।

মা তাড়াতাড়ি আমাকে সরিয়ে আনতে চায়।

কী মেঘ করেছে, দেখেছিস ঝিমলি? আকাশ লাল হয়ে গেছে, এখুনি ঝড় উঠবে।

যেন এখানে যা ঘটতে চলেছে তার চেয়েও দুর্বিপাকের আকাশের ওই ঘনঘটা। শক্ত মুঠোয় হাত চেপে ধরে মা দৌড়তে থাকে সিঁড়ির দিকে। যেন এই ঘটনাস্থল থেকে পালাতে পারলেই আমি রয়ে যাব অপাপবিদ্ধ। কিন্তু মা-র সঙ্গে তাল রাখতে আমার কষ্ট হয়। কেননা তখনই প্রথম আমার ঊরুসন্ধি ভিজে ওঠে রক্তে।

॥ পাঁচ ॥

বিজিত আমার কোচিং ক্লাসের বন্ধু। আমাদের বাড়ির ওপর দিয়েই ওকে বাস রাস্তায় যেতে হয়। সে বারান্দা থেকেই গ্রিলের ফাঁকে হাত গলিয়ে কেমিস্ট্রি খাতা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, এসো না, ভেতরে, দু-একটা চ্যাপ্টার তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেব।

আমি? আর লোক পেলে না' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে এল বিজিত। ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা আছো?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে মা-বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে আমি একাই থাকি।

দুর্ঘটনা? কী হয়েছিল, চুরি-টুরি?

নিজেই কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে সোফায় বসে বিজিত।

জানতে পারবে সবই। তার আগে বল কী খাবে, চা, না, বাইরের আগুনে দুপুরের দিকে তাকিয়ে বললাম, সরবত।

কিছু না। খাতাটা দাও। আমি এখুনি বাড়ি চলে যাব।

ভয় পেয়েছ? ওর অবস্থা দেখে ভয়ানক মজা লাগল আমার।

ভয়? না, ভয়ের কী আছে? এই আমি বসলাম। যাও, চট করে চা নিয়ে এস। বলার ভঙ্গিতে, বেশ একটা পুরুষালি মেজাজ নিয়ে এল বিজিত।

চায়ের ট্রে নিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন আমি সালোয়ার কামিজ পাল্টে শাড়ি পরে নিয়েছি। ম্যাগি হাতা ব্লাউজ, গরমের দিনে ভালোই লাগছে বেশ, খসে পড়বে কী পড়বে না আঁচলের প্রান্ত ধরে রেখেছি এক হাতের ভাঁজে, কপালের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি কালো বিন্দি, সামনের দিকের চুল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্লিপ আটকে দিয়েছি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল বিজিত। তার দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলাম সে ফুলপিসিকে দেখছে। আমার কেমন যেন আত্মবিশ্বাস এল।

চায়ের কাপ ওর হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, ঘটনাটা তোমাকে বলতে গেলে, প্রথমেই তোমার অনুমতি নিয়ে নিই। তোমাকে আমি 'বিজু' বলে ডাকব।

'বিজু'? আচ্ছা বেশ। কিন্তু কেন?

বিজিতের কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম, সামান্য একটা খাতা চাইতে এসে আচ্ছা বিপাকে পড়েছে সে। কিন্তু ততক্ষণে নেশা পেয়ে বসেছে আমায়। খেলতে নেমে মাঝখান থেকে উঠে যায় যারা আমি তাদের দলে নই। ওর কেন-র উত্তরে আমি বললাম, ঘটনাটা বুঝতে তোমার সুবিধে হবে তাই।

শুরুটা ছিল এইরকম। ধরো, আমি চা নিয়ে এলাম, তুমি বললে, না, আমি চা খাবো না।

সবেমাত্র চায়ের কাপটা মুখে তুলেছে বিজিত, অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল।

না, না, আমি তা বলিনি। তুমি একেবারে খাবেই না সেরকম নয়। এক হাতে কাপ ধরে আর এক হাতে ধরতে পারো আমার হাত। কিংবা খুব বেশি অসুবিধা না হয় যদি, তাহলে জড়িয়েও ধরতে পারো আমার কোমর।

যন্ত্রের হাত বাড়িয়ে বিজিত আমার হাতটা ধরতে পারল শুধু, তার বেশি এগোতে পারল না। প্রথম দিনের পক্ষে মাত্রাটা ভারী হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমি ছেড়ে দিলাম।

পরদিন 'অনেক অফিস করেছি, আজ আর যাব না' বলে বেমক্কা ছুটি নিয়ে নিল মা। বিজিত যথাসময়ে এসে হাজির। আমি আর ওকে ঘরে ডাকলাম না, গ্রিলের ফাঁক গলিয়ে একটা এলেবেলে খাতা পাচার করে দিলাম ওর হাতে। একটিমাত্র সার কথা লেখা আছে ওখানে, কাল অবশ্যই এসো। ঘটনাটার এখনও অনেক বাকি।

মার ঘরপোড়া মন, ঠিক দেখতে পেয়েছে। অমনই জেরা।

কে রে ছেলেটা?

আমাদের কোচিং-এ পড়ে।

নাম কী ওর? ক্যাবলাকান্ত বললেই ঠিক মানায়, তার বেশি কিছু জিজ্ঞেস করো না।

অনার্স নিয়েছে কোন্ সাবজেক্টে?

অনার্স? স্বপ্ন দেখছ মা! পাস কোর্সে পাস করলেই বলে ওর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য।

মুখের ভাব দেখে মনে হল প্রত্যুত্তরে মাকে খুশি করতে পেরেছি।

তারপর দিন বিজিত এল। সঙ্গে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের কতগুলো প্রব্লেম। আমি তাড়াতাড়ি সেগুলো ড্রয়ার বন্দি করে রেখে বললাম, যাবার সময় মনে করে চেয়ে নিয়ে যেও। আজকে তোমায় লুকোচুরি খেলার নিয়মটা বলে দেব। আমি যেখানে ইচ্ছে লুকিয়ে পড়ব আর তুমি মনে মনে একশো গুনে নিয়ে আমায় খুঁজতে বেরোবে। শুধু খুঁজে বার করলেই হবে না আমাকে। তুমি আমার পিছু ধাওয়া করবে। যদি ধরতে পারো, তবেই কিন্তু জিতে নিলে তুমি আমাকে। যে কোনো জায়গাই ছুঁতে পারবে তখন আমায়। ও হরি, আসল কথাটাই তো বলা হয়নি তোমাকে, পিছমোড়া করে বাঁধা থাকবে তোমার হাত। শুধুমাত্র ঠোঁট দিয়েই স্পর্শ করতে পার তুমি আমাকে।

খেলার বিবরণ শুনেই পাংশুবর্ণ ধারণ করে বিজিত।

গা থেকে আমার ওড়নাটা খুলে নিয়ে আমি ওর দুটো কাঠের হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধতে থাকি। ও মুখে মৃদু 'মিচ্‌মিচ্' আওয়াজ তুলে ভাঙা ভাঙা বাক্যে আপত্তি জানায়।

এরকম করে? কী করে? আচ্ছা ছোঁওয়া যায়?

আমি পাত্তাই দিই না। পিছমোড়া করে বেঁধে রাখার ভঙ্গিতে হাত পিছনে রেখে শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিই। আমার মাথা পৌঁছয় বিজিতের মাথার নীচে। আমি ঠোঁট সরু করে ছুঁয়ে দিই ওর কণ্ঠা। ঢোঁক গিলে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিয়ে ও বলে, এরকম একটা অর্থহীন খেলা খেলবার কী দরকার ঝিমলি? তার চেয়ে তোমাকে একটা অন্য খেলার কথা বলি শোনো।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখনও তো চিলেকোঠার পর্বটা পুরো বাকি।

সেটা হচ্ছে, খেলার একদম অন্তিম পর্ব। আশ্চর্যজনকভাবে তারপরই ঘটনাটা অন্য দিকে বাঁক নেয়।

আচমকা একদিন ছুটির সময় মা আমার কলেজের গেটে। মাঝে মাঝে এরকম হানা দেওয়া মা-র অভ্যেস আছে। আমার গতিবিধির ওপর নজরদারি করার এ-ও একটা পন্থা। তবে সেটা নেহাতই পুলিশি কঠোরতার সঙ্গে না। তার মধ্যে পাপড়ি-কোমল ফুরফুরে ভাবও মিশে থাকে। অনেক সময় আমরা কেনাকাটা করি, খাই কোথাও। আমি ভেবেছি সেরকমই কিছু।

লেকের গাছপালার ফাঁকে তখন বিকেল লুকিয়ে পড়েছে। নৈশ অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সন্ধ্যে। রাতবাতি জ্বলে উঠেছে কিন্তু তার চমক নেই। গাছের ছায়াও হয়নি তত ঘন। নীচে মগ্ন যুগল মূর্তি, মাথার ওপর অজস্র পাখির কলতান। পাখিদের কলোনিতে জায়গা দখলের লড়াই, ঝটাপটি, দু-একজনের ছিটকে বেরিয়ে আসা। পরিচিত রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াতে যাব, হতে পরে পূর্ব-পরিকল্পিত, তার সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য, মা একবারও বলেনি কেন? ভেবেছিল কী, আগে জানলে সঙ্কোচ, লজ্জায় জবুথবু হয়ে পড়ব আমি? কী যে ভাবে মা আমাকে! আমার মুখে প্রশ্ন পড়ে পরিচয় করিয়ে দিল মা, এ হচ্ছে অভিষেক, অভি। ডলি মাসির ভাগনে। আর অভি, বুঝতেই পারছ, আমার মেয়ে: নমস্কার আর প্রতিনমস্কারের মধ্যে আমি মনে মনে খুঁজে চললাম, ডলিমাসি কোন্ জন আর ইতিপূর্বে তাকে আমি দেখেছি কিনা।

এরপর আমাদের চেনা জায়গায় আমার পছন্দের ডাক্ রোস্ট আর হাক্কা চাউ খেতে খেতে মা বলল, অভি যাদবপুর থেকে ইন্‌জিনিয়ারিং পাস করে এখন আমেরিকায়, নিউ জার্সিতে একটা সফ্টওয়ার কোম্পানিতে আছে।

আমি তো জানি মা-র আমেরিকা-প্রীতি কীরকম, জানতাম না আমার মধ্যেও কখন তা সঞ্চারিত করেছে। আমি পূর্ণ প্রাণে অভিবাদন জানালাম।

সেই অভিষেকের সঙ্গে আজ আমি শ্বশুরবাড়ি চলেছি।

ন-মামা একতলায় সদর দরজার মুখে হাতের মুঠোয় ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে মহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হলেই আমাদের রওনা করিয়ে দেবেন। ফুল-সজ্জিত বাহনও প্রস্তুত। বাড়ির কুচো-কাঁচারা ভিড় করে ঘিরে আছে তাকে। কে একজন একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলেছে বলে ধমকও খেল ন-মামার কাছে। আসলে শুধু ন-মামা কেন, বাড়ির সবাই অতি সতর্ক, যাতে পান থেকে চুন খসার মতো কোনো ত্রুটি, যত অনিচ্ছাকৃত, যত অযৌক্তিকই হোক না কেন, আমার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনে কোনোরকম ছায়াপাত না ঘটায়। হয়তো এর মূলে কালকের ফোনটা।

তখন সবেমাত্র গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে। সবার সঙ্গে আমিও দেখছি, কী কী শাড়ি পাঠিয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। হলুদ পাড় লাল কাঞ্জিভরম, সুন্দর খুবই। কিন্তু ঠিক এইরকম পোড়া লাল রঙের একটা আমার আগেই কেনা হয়ে গেছে। তবে ব্রোঞ্জ রঙের বোমকাইটা একেবারে নিখুঁত। এই শাড়িটা আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল। আর এই পাটোলাটা--ঘিয়ে রঙের জমির ওপর মেরুন সবুজের নকশাকাটা—এত অপূর্ব, আমার কল্পনাতেও ছিল না। একটার পর একটা ট্রে সরাচ্ছি, উত্তেজনায় আনন্দে ধকধক করছে আমার বুক। ওয়ালকলাম, ঘরছোড়া, জামেয়ার, বালুচরী—এত, এত রকমের শাড়ি, আমার, আমার, শুধু আমার! অন্যাদের জন্যও আছে। দিদি, বউদি, মাসি মামিদের নাম লেখা লেখা আর সঙ্গে নানাবিধ সরল মন্তব্য।

"ওমা, এই দেখ এখানে আবার কী লেখা।"

বলতে বলতে একটা ট্রে লিলিদি আমার মুখের সামনে তুলে ধরল। দেখলাম, মুঠা মুঠা এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ছড়ানো, তার মধ্যে কাগজের চিরাকুট—"সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি, বাছ তো দেখি।"

লিলিদি আমার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, চাঁদ বদনী ধনি, বাছো এবার, দেখি কত সোহাগ!

আমি বললাম, বয়ে গেছে আমার বাছতে। ফুলশয্যার তত্ত্বে এই ট্রে এরকমভাবেই ফেরত দিয়ে দিও। শুধু চিরকুটটায় বদলে লিখে দিও, বাছাবাছি জানি না, পরের ছেলে মানি না।

কেমন না মেনে পারিস, দেখব। অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে তো পদসেবা করতে বসে যাবি।

সমরদাকে তুমি তাই করো বুঝি?

কী আর করব ভাই, তোর সমরদা যা কিপটের হদ্দ। এইসব পদসেবা-টেবা করে যদি এরকম একটা কাঞ্জিভরম আদায় করা যায়। রসিকা লিলিদির মুখে ছদ্ম দুঃখ ফুটে ওঠে।

ওদিকে আবার কলতলায় দিদি, বউদিরা গায়ে হলুদ মাখবে বলে ডাকাডাকি করছে। এইরকম ব্যস্ততার মধ্যে ফোনটা এল।

মা ধরেছিল। আমি কোনো আগ্রহও বোধ করিনি। কত ফোনই তো আসে। মাউথ পিস্‌টা বাঁ হাতে চেপে ধরে মা ডাকল, ঝিমলি, এদিকে একটু শোন তো। মা-র গলা শান্ত, গম্ভীর। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অজানিত কী যেন ছমঝম করে উঠল। আমি পায়ে পায়ে মা-র পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মা সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে বলল, বিজিতের দাদা ফোন করেছে।

হ্যাঁ, ওর দাদা-বউদির কাছে থেকেই লেখাপড়া করত ও। না হলে ওদের বাড়ি তো সীতারামপুর কোলিয়ারি। সেখানে স্কুল-কলেজের এত সুবিধে কোথায়? কেন, কি হয়েছে তার? এই শেষের কথাটা বলতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে জিভ্ জড়িয়ে যায় আমার।

বরফ জমানো হিম কনকনে দুটি বাক্য মার শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, সে এখন হাসপাতালে। কাল রাতে ঘুমের ওযুধ খেয়েছে একগাদা।

আমাকে ওই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে মা আবার ফোনে ফিরে গেল—তা, আমার মেয়ে এখন কি করবে সেখানে গিয়ে? আপনি জানেন, আজ তার বিয়ে। এখন এসব কথা তুলে আপনি কি ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছেন? জানেন, আমি পুলিশে খবর দিতে পারি?

ওপাশে গলার আওয়াজ ক্রমশ মিইয়ে যায়। মা ফোনটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ফেরে। আমি তখন অসহায়, চোখের চলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছি। কি করছে এখন বিজিত? মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে? এত বোকা ও। খেলাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেছে? মা-র কাছে কি উত্তর দেব এখন আমি।

সেই প্রথম মা আমার কাছের মানুষ হয়ে যায়। আমার পিঠে হাত রেখে কাছে টেনে নেয়। মা-র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলি। মা-কে আমি কখনও দেখিনি কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে। সব সময় মনে হত মা বাস্তবের মতো কঠোর। সে-ই মা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে আমাকে, কি চাস তুই, ঝিমলি? তোর মন যদি বলে, এখনও বল, এই বিয়ে ভেঙে দেব আমি।

ততক্ষণে চোখের জল মুছে ফেলেছি। অভিষেকের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দেব? আমি? আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে, ভিসাও তৈরি হতে চলেছে। মাস খানেকের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে আমি আমেরিকার পথে পা বাড়াব। সে-ই বিজনমামার আমেরিকা। দ্বিরাগমনের আগেই ব্রিটিশ হাইকমিশনের অফিসে একটু দেখা করতে যেতে হবে। যাওয়ার পথে লন্ডনটাও যদি ঘুরে নেওয়া যায়—কত স্বাদ! এখন আবার ঘুমের ওযুধ খাওয়া- টাওয়া এসব কী গণ্ডগোল। এতে আমার দায়ই বা কি? আমি বিজিতকে একটা দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে দেখিয়েছিলাম মাত্র, এরকম অদ্ভুত সমাপতন তো আমি চাইনি।

ওই ন-মামা ডাকছে। সময় হয়ে গেছে। আমিও প্রস্তুত। লিলিদিকে দিয়ে দিয়েছি আমার নিজের কেনা লাল কাঞ্জিভরমটা। আর সেন্ট, পাউডার, লিপস্টিক, স্যাম্পু তো অকাতরে বিলিয়েছি। কি হবে আমার এসব দিয়ে? এত সব কিছু আমি ব্যবহারও করি না। এখন আর নিজেকে সুচিত্রা সেন সাজাতে ইচ্ছে করে না। বরং মাধুরী দীক্ষিত বললেই খুশি হই বেশি এবং এতেও যে আমি সফল তার প্রমাণও আমি দিয়েছি। অমন যে পৃথিবী-চরা ছেলে অভিষেক তাকেও কব্জা করতে আমার সময় লাগেনি। প্রাপ্তি উশুল করে দিয়েছে আমার পাওনা। তাহলে আর এসব ছিঁচকে জিনিসে আমার কি দরকার? বাবার কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। মা-র আঁচলে কড়ি ও তণ্ডুল ঢেলে দিয়ে যথাবিধি ঋণ শোধ করে দিয়েছি।

শুধু এইটুকু থাক, বিজনমামা থেকে বিজিত—এর মধ্যে পড়ে রইল যে কৌটো ভরা প্রিয় ভালোবাসা আমার, ফুলপিসি তোমার জন্য।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

বাঁকা আল্পো এসে পড়েছে জলে। আলো নয়, সে কী মেঘের উড়ন্ত ছায়া, পিঙ্গল নদীর ওপর দিয়ে ভবিতব্যের মতন এগিয়ে যাচ্ছে আগে আগে ছুটতে থাকা হলদে রোদের ফালিটিকে ধরতে। কার্তিকের শুরু। নদীতীর থেকে আরম্ভ করে যতদূর বাঁয়ে চোখ যায়, ধানের চারাগুলি শস্যভারে নুয়ে পড়েছে। তারই মাঝ দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে, শিরশিরানো শব্দ ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেল রোদে। নৌকোয় নোঙর ফেলা। তবু এক্ষুনি ঢাউস ক্যান হাতে সারেংকে ডাঙায় নেমে যেতে দেখে মণীশের সৌম্য ভুরু কুঁচকে ওঠে।

অ্যাই সত্যেন, এখন চললে কোথায়, দেরি হয়ে যাবে না? এগারোটা বাজে!

তেল নিয়ে আসি। আগে তো বলেননি, একাকুলা যাবেন। তেলে কুলোবে না। আর ওই আপনার হাতঘড়ি আর দ্যাখেন না, এখন ঘড়িতে টাইম দেবে না। আমরা এখন জোয়ার-ভাটার হাতের পুতুল, বুঝলেন?

তবু মণীশের ভুরু সোজা হয় না দেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের মাঝখানটা খুঁচিয়ে নিয়ে একটু বিরক্তভাবে হেসেছে সত্যেন, এই তো যাব আর আসব। জল বাড়ছে। সাড়ে এগারোটায় ছাড়লে চারটে নাগাদ খুলা পৌঁছোব। আগে ছাড়লেও লাভ নাই না! মাঝপথে যদি জল নামতে শুরু করে, মুশকিলে পড়তে হবে। এই খগাই, বাবুদেরকে চা দে।

মণীশ-এর রে-ব্যান-এ আকাশের মেঘ-মায়ার নেগেটিভ। রিয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এও তো বেশ লাগছে, নৌকো ডাঙায় বাঁধা, জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ, যাব যাব ভাব, অথচ যাচ্ছি না।

মণীশ ও রিয়ার চারিদিকে পিঙ্গল, জলে রোদ চমকাচ্ছে. যেন বিশাল এক খয়েরি বালুচরি শাড়ি বিশ্বভুবন জুড়ে মেলে ধরেছে কেউ।

কেবিনের বাইরে এসে রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রিয়ার খোলা কোমরে একটি হাত রাখে মণীশ। আমার জন্যে নাকি, ওকে সাত তাড়াতাড়ি তুলে আনলাম। হয়তো সকালে জলখাবারও খায়নি।

এই ওকে কিছু খেতে দাও না, আর খগাইকে বলো আমাদের চা দিতে। ওর গলা যতই মৃদু করুক, বাইরে, লোয়ার-কেবিনের ছাতে পা লম্বা করে বসে থাকা অনিন্দ্যর কান এড়ায় না। অনিন্দ্য ওখানে বসেই বলে ওঠে, ভ্যাট্, আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি, তোরই বোধহয় খিদে পেয়েছে, পেটুক কোথাকার!

কিছুক্ষণ পর নিচ থেকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে স্টিলের থালায় চায়ের কাপ সাজিয়ে ধুপধাপ্ শব্দ করে অসুন্দর অসুখী খগাই এসে হাজির হ'লে, রিয়া তার জলরঙা চুড়ি পরা হাতের তরল শব্দ তুলে

মণীশকে হাসি মিশিয়ে চা দেয়, তারপর পেছন থেকে অনিন্দ্যর কাছে গিয়ে চায়ের কাপটি বাড়িয়ে ধরে বলে, ভালো লাগছে?

অনিন্দ্যর কপালের ওপর এসে পড়া কোঁকড়া এক গাছি চুল একটুখানি কেঁপে ওঠে শুধু। তার ঠোঁট ঈষৎ আলোকিত হয় হাসিতে।

হ্যাঁ, ভালোই লাগছে, সুন্দর হাওয়া। আপনার?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই, রিয়ার চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যায় নদীতীর, নদীজল, রৌদ্র, ধানক্ষেত ও ভ্যান গঘের ছবির মতো আকাশের নীল। চরাচর অতি সূক্ষ্ম দোলায় দুলতে আরম্ভ করে। রিয়ার মুখের উবে যাওয়া স্বর্ণাভা অনিন্দ্য দেখতে পায় না। দেখে না মণীশও, সে নীচু হয়ে এই মুহূর্তে সামান্য ধুলো মাখা পুরু কাঁচের প্লেট থেকে বুনো চেহারার নোনতা বিস্কুট তুলে নিচ্ছে। খিদে পেয়েছে মণীশের।

সারেং ফিরে এসে মণীশের দিকে পেছন ফিরে একটি বিড়ি ধরায়, ও কেবিনের ভেতর ঢুকে লঞ্চ স্টার্ট করে। নোঙর তোলা হয়ে গেছে; হাঁটু পর্যন্ত কাদা, কাদা দু হাতের আঙুলে, একজন ক্ষেতমজুর ছপছপ করতে করতে জল ছেড়ে উঠে আসতে লেগেছে। খগাইও আসছে, তার ধুতি হাঁটুর ওপরে. শালীনতার এক ইঞ্চি নীচে গোটানো। চুলে কাদা লেগেছে।

হংসালি নদী ধরে নৌকো এগোয়, সূর্য মাঝ আকাশে। তাকে দেখা যায় না। বরং এক ধবনের মেঘচাপা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, ছপাং ছপাং জল সরে যাচ্ছে। বুড়ো হাতির গায়ের চামড়ার মতন অনর্থক আঁকিবুঁকি নদীর জলে। দামাল হাওয়ায় ঢেউ ফুঁসে উঠে আছড়ে পড়ছে নৌকোর ওপর। নৌকোর চলার মধ্যে এক অদ্ভুত টলমল ভঙ্গি আছে, যেন সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু বেড়াতে বেড়িয়েছে। রেলিং ধরে দাঁড়াতে গেলে হাওয়া এসে চোখে মুখে নোনা ঝাপট মারে। মণীশ নীচে তাকিয়ে সরে আসে। রিয়া কেবিনের ভেতর থেকেই একদৃষ্টে তাকে দেখছে, জানে মণীশ। এও জানে, এই মুহূর্তে রিয়ার চোখের পলকগুলি ভিজে, চোখের কোল আস্তে আস্তে শুকোচ্ছে। এই বোধ মণীশকে এক ধরনের কষ্ট মেশানো আনন্দ দেয়।

দু-এক মিনিট বাইরে তাকিয়ে থাকার পর রিয়া বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের রেলিং-এ তার সুন্দর শরীরখানির ভর সইয়ে দাঁড়ালো। মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছে রিয়া, দেখছে টার্নের ঝাঁক কেমন নরম ল্যান্ডিং করে ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ঢেউয়ের চুড়োয় ভেসে ওঠা রুপোলি মাছ, চীলেরা মালার মতন আকাশ থেকে নেমে জলে সাঁতার কেটে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, রিয়াকে যদি কেউ আকাশে তুলে নিয়ে যেত!

ভেতরের কেবিনে এক দিকে সারেং-এর স্টিয়ারিং। স্টিয়ারিং এর দুই পাশে জানলার ধার ঘেঁষে তার ঠাকুর দেবতারা—লক্ষ্মী, গণেশ, বনদেবী, মা কালী, সিঁদুর, শুকনো ফুল বেলপাতার গন্ধ। উল্টোদিকে গদি-মোড়া বিছানা, তিনদিক খোলা কাচের জানালাপথে থই থই নদী দেখা যায়। মেঘের মাঝখানে কাঠের রেলিঙে ঘেরা নীচে যাবার প্যাঁচালো সিঁড়ি। সেই বিছানার ওপর ফোমের বালিশ ঠেসান দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়েছে মণীশ,তার পায়ের কাছে সামান্য জায়গা খালি পেয়ে ময়লাটে ম্যাপটি মেলে ধরে নিশীথ দে। নতুন কী পুরনো ম্যাপ বোঝা যায় না, খয়েরি কাগজে লুপ্ত হরপ্পার নকশার মতন আঁকাবাঁকা রেখা সব, নদীর গতিপথ, দ্বীপ, জঙ্গল, নদীতীর আলাদা আলাদা সংকেতে বোঝানো।

আমরা এখানে, রিয়া শুনছে জেনেই গলা পরিষ্কার করে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে নিশীথ, আমরা এখন কাটানিয়ার দিকে এগোচ্ছি। আমাদের ডান ধারে কুশাভদ্রপুর, বাঁদিকে রিয়ামাল।

কই, কাটানিয়া কোথায়?

মণীশ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু হেলান দিয়েই বসে থাকে। কাজেই ম্যাপ সমেত তার দিকে ঝুঁকতে হয় নিশীথ দে-কে। সম্ভ্রম-জনিত দূরত্ব বজায় রেখে বলতে হয়, এই যে এইখানটায়!

দূরে তাকিয়েছিল রিয়া, অনেক দূরে। মেঘ-ফুরিয়ে-যাওয়া রোদ-ঝলমল আকাশ মেখলার নীচে সে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে ধানবোনা মাঠের ঝাপসা সবুজ নেই, পাখিদের ওড়াউড়ি নেই, নেই লোকালয়ের জলরঙা ছবি, আকাশ বাতাস জুড়ে কেবল পিঙ্গল, ছটফটানো, গজরানো, অস্থির জল—এই সেই সংগম যেখানে শঙ্খ এসে মিশেছে চন্দনীতে। দুই ডাকসাইটে নাগরী নদী উত্তরের টাড়, পাহাড়, শালবনের হলুদ সবুজ মাড়িয়ে টলমল করতে করতে সমুদ্রের নেশায় চুর হয়ে সমতলে নেমে শান্ত হয়ে গেছে,বিশাল হয়ে গেছে এক দিন, তারপর সমুদ্রের কাছে এসে তাদের দেখা হয়ে গেছে আচমকা —এই দুইয়ের মিলনে তৈরি কাটানিয়া নদী সমুদ্রেরই মতন অন্তহীন, উদ্ভাসিত। সেই তুমুল আবিষ্কারের আনন্দে বালিকার মতো দৌড়ে এসেছে রিয়া। ভিতরে ঢুকে নিশীথ দে-র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ম্যাপের আঁকিবুঁকির ওপর সোনার ময়ূর আংটি পরা, চাঁপা-গৌর তার আঙুল রেখে বলেছে, এই যে কাটানিয়া এখানে, আমি দেখেছি।

মণীশ অলসভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে উঠেছে, আরেববাস, কী জল! অ্যাই অনিন্দ্য, ভেতরে এসে বোস না। আমরা কি ফিশিং হারবারের দিকেই যাচ্ছি? নিশীথবাবু, খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে দুপুরে?

অনিন্দ্য হেসে মুখ ফেরায়, তোর আবার খিদে পেয়ে গেল? এই তো খেলি!

নিশীথ নীচে পঞ্চা ও খগাইকে বকছে, লেবু-লংকা আনেনি বলে। ইত্যবসরে মণীশ ধোঁওয়া ছাড়ে। আমার তো সব সময়েই খিদে, দিনে, রাতে।

রিয়া অপমানে রাঙা মুখ নিয়ে বাইরে চলে যায়। ওটুকু তো তুচ্ছ করতেই পারে মণীশ। অনিন্দ্যর মুখের হাসি মেলায় না। যদিও সে কেবিনের ছাত ছেড়ে ওঠে না। মাথার পেছনে এক হাত রেখে রাজার মতন এই আকাশ-রোদের ঘ্রাণ নেয় অনিন্দ্য। তামাটে, ঘন ওর মাথার চুল সেই রকমই আছে, যেমন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে। রোদে-জলে গায়ের রং হয়তো খানিকটা পুড়েছে। এইটুকুই নইলে সেই রমণীমনোহর ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক, সেই কপাল যা ছুঁলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওষ্ঠাধর; লম্বায় অবশ্য মণীশের ধারে কাছেও নেই অনিন্দ্য, মাত্র পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি। তবু ছিপছিপে বলেই এখনও পালকের মতন নির্ভার দেখায় ওকে। তুলনায় মণীশের মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হতে লেগেছে, চিবুক ও গাল ভারি, চুলের পিছু-হঠাকে জুলপিও সামাল দিতে পারছে না আজকাল। ছ ফুটের ওপর হাইট বলেই ওর শরীরের বিশালতা আরও প্রকট হয়ে পড়ে।

এখনও বাঁশি বাজাস, অনিন্দ্য, এনেছিস?

হ্যাঁ, আছে সঙ্গে। এখন না। দেখি, সন্ধেবেলা বাজাবো।

নীচে ইঞ্জিনঘরের কাছ ঘেঁষে, কাজ চলছেই। এই দুলুনির মধ্যেও অসন্তুষ্ট খগাই ও তার সঙ্গে বারো-তেরো বছরের একটা ছোটো ছেলে তার নাম পঞ্চা, ডাব কাটছে, কেটে ওপরে আনলো, চা বানিয়েছে দুবার, বিড়ি খাচ্ছে নিজেরা, বাটা মশলাও বানানো হল। পাঁচফোড়নের গন্ধ সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে হারিয়ে যায় ঢেউয়ের ওপর। এই জলযাত্রায় সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে সঙ্গে আনতে হয়েছে নিশীথ-দে কে, পান-চুন-খয়ের অবধি, খাবার জল।

কাটানিয়া ফিশিং হারবারের কাছে এসে পড়েছে নৌকো। এখানেই খাওয়াদাওয়া সারা হবে দুপুরের। নৌকোয় নৌকোয়, মাছ ধরার ট্রলারে ছয়লাপ নদীর কূল। নানারকম ফ্ল্যাগ উড়ছে, লাল, সবুজ, নীল। জলের রং এখন ময়লাটে কালো। আকাশে মেঘ, রোদ নেই, কিন্তু সেই চাপা আলোর ক্ষণিক বদলেই নদী তার রং বদলায়। বাতাসে আনমনা ঝুলে আছে শুখুয়ার গঞ্জ। এখানে সব ট্রলারের ছাতেই মাছ শুকোচ্ছে, যেন সবাই ভেবে নিয়েছে, বৃষ্টি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই আর। এত ভিড়, নৌকো ভিড়োবার ঠাঁই নেই। মস্ত বড়ো একটা মোটর লঞ্চের কাছ ঘেঁষে এসেছে ওরা। নতুন রং বার্ণিসে চমকাচ্ছে, কালো বাজারের টাকায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা নতুন বড়োলোকের মতন।

খগাই, এই খগাই, নৌকো বাঁধবে!

নৌকো সোজা এগোতে এগোতে এক সময় ঘা খাওয়া জন্তুর মতন কাতর আওয়াজ করে, বোধহয় তীরের এঁটেল মাটি পা টেনে ধরায়। সবুজ মাস্তুল সামান্য টাল খেয়ে আবার সোজা হয়। ইঞ্জিনের শব্দ এখন থেমে গেছে। নোঙরের দড়িদড়া পড়ে আছে কেবিনের মাথায়। নোঙরটা কাদামাখা অবস্থায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। একটা বাজতে চলল।

খগাই রেলিং টপকে অতিকায় দড়িটা হাতে ধরে পাশের লঞ্চে চলে গেল। ওর গায়েই আপাতত নৌকো বাঁধা হবে। পঞ্চাও লিকপিকে পায়ে চলে গেল, হাতে একটা আধুলি। লেবু ও লংকা নিয়ে আসবে পাড়ের দোকান থেকে।

পাশের নৌকোয় চিংড়ি ধরা হচ্ছে। নাইলনের জালের মধ্যে ছটফট করতে থাকা মাছগুলো বাঁধডিহার প্রসেসিং ইউনিটে চলে যাবে সন্ধের আগেই। অল্প কিছু ভাজা হয়ে রাম্ এর সঙ্গে সেজে চলে আসবে ডিনার টেবিলে—যদি সন্ধেবেলা নৌকোয় মালিক আসেন, অথবা তাঁর বন্ধুরা। এই লঞ্চে অনেকগুলি লোক, মাঝিমাল্লা, হেল্পার, জোয়ান সব। রেলিং ধরে গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গল্পগাছা করছে, সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছে, দেহের বর্ণ শ্যামলা। হাঁটুর কাছে রঙিন লুঙ্গি গোটানো। জর্দা পানের গন্ধ ভুরভুর করছে কারও মুখে, কানের কাছে তারস্বরে ট্রানজিস্টর ধরে শুনছে কেউ। রিয়া আঁচিয়ে উঠে তোয়ালেতে হাত মুছে রেলিঙের ধারে দাঁড়াতেই ও লঞ্চের পুরুষদের ভিড়ে শিহরণ বয়ে যায়। মোমের মতন মাজা এই মেয়ের তনুদেহ। কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া রেশম-সদৃশ ট্রিমড় চুল, নিবিড়-কালো পাখির মতন বিস্মিত-অবোধ দুই চোখ ও ভুরু—এই নোনা-পানির দরিয়ায়?

রিয়ার কস্তুরীগন্ধে তাদের মুগ্ধতা, আওয়াজ, টাকরায় জিভ ঠেকানো এ নৌকোর পুরুষদের চোখ এড়ায় না। মণীশ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, খাওয়াদাওয়া তড়িঘড়ি সেরে, সতর্ক এঁটো-হাত নিশীথও। কেবল মন্ত্রমুগ্ধ অনিন্দ্য বসেই আছে। খাওয়ার পর ওর প্লেট নিয়ে গেছে খগাই। ছিমছাম নিরামিষ লাঞ্চ। রাজনগরের মিষ্টি সেদ্ধ চালের লাল লাল ভাত, বিউলির ডাল, করলা ভাজা আর কুমড়োর তরকারি। সামান্য ওপাশে বেঁকে হাত ধুয়ে নিয়েছে অনিন্দ্য, খগাই জল ঢেলে দিয়েছে তার হাতে। এখন অনিন্দ্যর সুন্দর কপালে কিছু চিন্তা খেলা করছে।

হুট্ করে তুলে তো নিয়ে এলি, প্রিন্সিপালকেও বলা হল না। ছেলেগুলো দুদিন যে কী করবে!

ছাড়্ তো। প্লেজার ট্রিপে এসে তখন থেকে কেবল স্কুল স্কুল করছিস। ওরা ঠিক ম্যানেজ করবে। আর প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখে এসেছিস তো! কাল রোববার। সোমবার দুপুরেই তোকে নামিয়ে দিচ্ছি।

তবু অনিন্দ্যর কপালের সূক্ষ্ম রেখাগুলি মেলায় না দেখে মণীশ বলেছে, বোর হচ্ছিস না তো? কবিতা-টবিতা লিখতিস এককালে! মনে হল তোর ভালো লাগবে। একা একা আর কত জায়গায়ই বা বেড়াস।

না, না। ম্লান মুখে জোর করে আলো ফোটায় অনিন্দ্য।

তুই না নিয়ে এলে আমার কোনোদিন আসাই হত না। আচ্ছা, বাঁ দিকে কী বল তো আমাদের?

নৌকো সরে এসেছে পাড়ের কাছ থেকে। নদীর মাঝ বরাবর। দূরে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ফিশিং হারবারের বেচাকেনার গুঞ্জন, মাছের জালের আঁশটে গন্ধ। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে ডেকে কী যেন অচেনা এক পাখি উড়ে গেছে এইমাত্র ওদের মাথার ওপর দিয়ে। সেই কি এনেছে প্রথম আসন্ন-সবুজ সমুদ্রের সংকেত?

নিশীথ দে তার ম্যাপ সাবধানে কেবিনের ছাতে বিছিয়ে বলল, উম্ম্, বাঁয়ে, কালিয়াপুরাণ, রিসার্ভ ফরেস্ট।

কেওড়া, সুন্দরী ও হেঁতাল জঙ্গলের ঘন-সবুজ দেওয়াল দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। এই অরণ্য—আদিম, দুর্ভেদ্য ও রহস্যময়। শোনা যায়, রূপকণিকার জঙ্গলও এর তুলনায় এখনও কিশোর। পাড়ের মাটি খেয়ে যায় জল। জল সরে গেলে ভাটায় সুঁদরির শেকড় জেগে থাকে কাদার ভেতর।

নিশীথ, কালো, লম্বা, দাঁত উঁচু নিশীথ একটু গর্বের সঙ্গে বলে : আপনি তো রূপকণিকা থেকেই ফিরতে চেয়েছিলেন। একাকুলার আইডিয়াটা আমার। আজ পূর্ণিমা। একাকুলার সী-বীচে যাবার এমন ভালো সময় আর পাওয়া যাবে না, জানেন?

সত্যেন তো বলছিল, তেলে কুলোবে না।

নিশীথ দে গলা নামিয়ে বলে, ওদের সব সময় ছুতোনাতা। লম্বা ডিউটি করতে হবে যে, কাল আবার রোববার। এই তো রূপকণিকায় তেল নেবো। কাটানিয়াতে খগাই দশ লিটার নিয়ে এসেছে পাশের ট্রলার থেকে। তেল একটা ব্যাপার নাকি।

খুলা নদীটি ক্ষীণকায়া, নিতান্ত লাজুক। কাটানিয়ার মতন অতিকায় নদীদেহ থেকে বেরিয়ে নানাভাবে এঁকে বেঁকে সে যে কীভাবে রূপকণিকায় গিয়ে পড়েছে, এ পথে না এলে তার চলন বৃত্তান্ত অজানাই রয়ে যেত ওদের। অবশ্য নিশীথ দে তাকে ছেড়ে কথা কইত না। তার হরপ্পা-ম্যাপে খুলার মতন একাকিনী রজস্বলাও নীল পেন্সিলে দাগানো।

খুলার মুখেই নৌকো বদলাতে হল। অগভীর, কৃশা নদী, বড়ো মোটর বোট যাবে না এতে। ছোট্ট একটি রঙচঙে নীল-লাল হালকা বোট, খুলা ও কাটানিয়ার সংগমের মুখে পাড়ের কাছে বাঁধা। তার রঙিন ছায়া ভেঙেচুরে থিরথির করে কাঁপে জলের ভেতর। ঠিক ওপরেই তীরের কাদায় এক জংধরা বোর্ড, লেখা, সাবধান মির আছে। কুমিরের 'কু' মুছে গেছে কবে। জরাগ্রস্ত এই বোর্ডকে কেউ আর তোয়াক্কা করে না। প্রথমে নিশীথ লাফিয়ে নামে ছোটো নৌকোয়, তারপর এক লাফে দৃপ্ত মণীশ, অনিন্দ্যর দিকে নিশীথই হাত বাড়িয়ে দেয়, 'এই যে স্যার' বলে। লীলায়িত রিয়া পায়ের চটি হাতে নিয়ে, শাড়ি সামলে নেমে আসে, নিশীথেরও হাত নেয় না, মণীশেরও না।

অপ্রশস্ত জলধারা চলেছে, আঁকাবাঁকা। দুধারে হেঁতাল বন। নল, হেঁতাল, কেঁরুয়া, সুন্দরী গাছে মেশামিশি ঝাপসা দেওয়াল। দিনের পড়ন্ত আলোয় গাছগুলি রহস্যভাবে জলে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায় স্থির নদীজল। তার কাঁপন এমনই সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে দেখাই যায় না। হয়তো কেবল অনিন্দ্য শুনতে পায়—তার স্নায়ুতন্ত্রীতে কোথাও পৌঁছে সে শব্দজাল শিঞ্জন তোলে। ঘন সবুজ ছায়া। মোহময় তাদের দুলুনি, জলের ভেতর। সালিম আলির পাখির বইটি নিশীথের প্রাণ। এখন সে বইটি বার করে মলাটে একবার ফুঁ দিয়ে মণীশের করকমলে সমর্পণ করেছে। একশো চল্লিশ রকমের পাখি আছে এখানকার পাখিরালয়ে। মাছরাঙাই কেবল ছরকমের। যত প্রজাতির পাখি দেখতে পাবে মণীশ, ততই উজ্জ্বল হবে নিশীথদের কালি পড়া ভবিষ্যৎ।

এখন ডানহাতে বনের ফাঁকে ঘন ধানক্ষেত। বাঁয়ে সুন্দরীর বন। জলের তোড়ে গাছেদের দম বন্ধ হয়ে আসে বুঝি। তাই শেকড়গুলি উঁচিয়ে আছে নিশ্বাস নেবার জন্য। মাঝনদীতে জেগে আছে পুরোনো আঁকাবাঁকা ডালপালা ও গুঁড়ি সহ কেঁরুয়া গাছ। তার মাথায় বসে ওটা কি গো? সাদা-কালো ছিটছিট পায়েড কিং ফিশার, কী সুন্দর, কী গম্ভীর! রিয়া প্রায় নেচে ওঠে। কত দেখবে ওর দু চোখ। জলে হাঁটু ডুবিয়ে গুগলি খোঁজে দেশি বক। মাথার ওপর দিয়ে হু-উ-স করে উড়ে চলে যায় আইবিস! জংলি আম ও গরানের ঝোপের ফাঁকে ছটফট করে উড়ে বেড়াচ্ছে সবুজ তোতারা। বনে অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি চলেছে সারাদিন। সুন্দর, অপরূপ বিকেল। রোদ মরে গেছে অনেক আগেই। ছায়া ঘনায়। বনের সবুজ গন্ধ হাওয়ায় জড়িয়ে ভেসে থাকে। অচেনা কত হলুদ বনফুল উঁকি মারে সবুজ পর্দার ওপার থেকে। কত লতা দোলে মগডাল থেকে হাতির শুঁড়ের মতন। খালি নৌকোর ভটভট শব্দ। এইটুকুই যা। বাকি সমস্ত চরাচরকে গর্ভজলের মতন ঘিরে আছে স্তব্ধতা।

ব্যাটারি অপারেটেড নৌকো রাখেন না কেন, নিশীথবাবু? মণীশ ভুরু কুঁচকোয়। এত শব্দ করে যাওয়ার কোনো মানে হয়?

ছোট্ট নৌকো। কেবিনও খুদে একটি। খাওয়ার জল, রিয়া-মণীশদের মালপত্র, সুটকেস-এ বোঝাই। বাইরে ওরা চারজন। আড়াআড়ি পেতে দেওয়া পাটাতনের ওপর অনিন্দ্য, ওর গা ঘেঁষে রিয়া।

বাইনক্স হাতে মণীশ সামনে দাঁড়িয়ে, ঠিক পেছনেই, সম্ভ্রমে একটু কুঁজো হয়ে নিশীথ দে! রিয়ার নরম চুলে ভরা মাথা অনিন্দ্যর কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। বাঁক ঘোরার পরেই আচমকা বিকেলের হলুদ আলোয় ঝলমল করে ওঠে দৃশ্যপট। এ আলোকে কি অরণ্য শুষে নিয়েছিল এতক্ষণ? অরণ্যের ছায়াঘেরা খুলা নদী যেন অনিবার্যতার তোড়ে এসে পড়েছে রূপকণিকায়। রূপকণিকা বড়ো নদী, এখানে তার চলন ইন্দ্রধনুর মতন বাঁকা। এই কাঁকন-বাঁকে ঢোকার মুখে কাদায় শুয়ে থাকা প্রাগৈতিহাসিক এক অতিকায় কুমিরকে কষ্টে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে রিয়া। বুঝি অনেকক্ষণ শুয়েছিল এই কুমির। ভাঁটার সময় কাদায় শুয়ে সে রোজই শিকারের অপেক্ষায় থাকে। জোয়ারের জল এলে আনমনে ভেসে যাবে। ফার্ন ও হেঁতাল পাতা খুঁজে তার ওপর ডিম পেড়ে রাখতে হয় তাকে, এখানে ওখানে। হয়তো আচমকা নৌকোর শব্দ ভেসে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিয়েছে। রিয়া কথা বলে না, ওর সারা শরীর শিউরে ওঠে একবার এবং এই শিহরনের উত্তপ্ত রোমাঞ্চ অনিন্দ্যর দেহে জ্বরের মতন সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনিন্দ্য নিঃশব্দে মুখ ফেরায় রিয়ার দিকে। রিয়া ডুবন্ত মানুষের আতুরতায় অনিন্দ্যর কপাল, নাক, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করে তার চোখের ভাষা দিয়ে। সেই মুহূর্তে অনিন্দ্যর কালো চশমায় এক মায়াময় ছবির প্রতিবিম্ব ভেসে যায় : নটীসুন্দরীর ডাল ছেড়ে উড়ে যাওয়া তুঁতে নীল রঙা স্বপ্নিল এক মাছরাঙার। মাত্র একটি কি দুটি মুহূর্ত, কারণ চোখ থেকে বাইনক্স নামিয়ে মণীশ পেছন ফিরেছে; তার পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদলে যায়। খিদে পেয়েছে মণীশের।

এই, খগাইকে বলো না। কাছে এসে রিয়ার শুভ্র কাঁধের ও পিঠের দৃশ্যমানতাকে ওর আঙুলগুলি খিদের কথা জানাতেই, খগাই অন্তর্যামীর মতন পিছন থেকে বিস্কুট ও চানাচুরের থালা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে!

হ্যাঁ, খগাইও এসেছে, এ নৌকোয়। পঞ্চা রয়ে গেছে বড়ো নৌকোয়। ঘুমোচ্ছে: ঘুমোক ছেলেটা। খগাই না এলে বাবুদের ফাইফরমাশ খাটে কে! খগাই ভালোমতো ফাইফরমাশ না খাটলে, নিশীথেরও বদলি হবে না এই অজ-গোবিন্দপুর থেকে। আর বদলি না হলে সিন্ধবাদের গল্পের বুড়োর মতন অনাদি অনন্তকাল নিশীথ দে তার বসদের, তাদের বউ ও বউয়ের বন্ধুদের ঘাড়ে করে এইসব আইবিস, পেইন্টেড স্টর্ক, স্নেকবার্ড, কুমির, জোয়ার-ভাটা দেখিয়ে বেড়াবে। কুশভদ্রপুরের ভারনাকুলার স্কুলে এক হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়ে আষাঢ় থেকে আশ্বিন হেজে যাবে তার চোদ্দ বছরের ছেলে।

কাজেই, খগাই!

আজ দুপুরে কেবল দুটিখানি ভাত ছেল। ডাল নাই। কিছু নাই। পেট ভরে নাই মোর।

ক্ষুণ্ণভাবে খগাই এই কথা বলতেই দশ টাকার একখানি নোট নিশীথ তার হাতে গুঁজে দিয়েছে স্নেহভরে।

রাখ রাখ। রাতে বেশি করে ভালো খাস এখন। আর রাঙতাপুরের চিংড়ি তো নিচ্ছিই আমরা। লংকা, কালোজিরে দিয়ে ঝোল, কেমন?

বাঁক ঘোরার পর থেকে আসন্ন সন্ধ্যার ঘ্রাণ জড়িয়ে ধরছে চরাচরকে। নিবে যাওয়ার আগে যেন কীভাবে একবার জ্বলে উঠেছিল শেষ বিকেলের হলুদ আলোটি—খুলার মুখে। রূপকণিকার দুই পাড়ে অগাধ হেঁতাল বন, ঝাপসা সবুজের পর্দা নিথর দাঁড়িয়ে, এখান থেকে দেখা যায়। চিতল হরিণেরা জল খেতে এসে ইতস্তত খুরের দাগ রেখে গেছে কাদায়। গেরুয়া রঙের বাজের শরীরে সাঁঝ নামছে। গরান কাঠে বানানো রূপকণিকার আদিম জেটি পেরিয়ে পাড়ে পৌঁছতে পৌঁছতে শেকড় ছড়ায় সন্ধে। কাদায় অনবরত লাফ মেরে চলেছে রাশি রাশি মাড স্পাইক।

অনিন্দ্যটা কিস্যু দেখতে পেল না। ধুস্। কী লাভ হল! খগাই ওকে জেটি পার করে দেবার পর অনিন্দ্য ততক্ষণে একাই, আস্তে আস্তে সরু সিঁথির মতন সুরকির রাস্তা ধরে ডাকবাংলোর দিকে চলেছে।

রিয়া তার খর বিদ্যুৎ দৃষ্টি হানে মণীশের মুখে। তুমি তো জানতেই, তবে ওকে আনলে কেন?

মণীশ এ কথার কোনো উত্তর দেয় না। তার ভুরু কুঁচকেই থাকে। আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা নিজেরই জানা নেই। প্রথমে সে ঠিক করেছিল, রূপকণিকার এই বাংলোয় একটি রাত কাটিয়ে, যে পথে এসেছিল, সেই পথেই কুশভদ্রপুর ফিরে যাবে। অথচ নৌকোয় পা রাখার পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই তাকে টানছে একাকুলার বিজন সমুদ্রতট, তার জ্যোৎস্না, ক্যাসুরিনা-বন। পাগল হাওয়া। যাবেই মণীশ। নিশীথ দে আরও প্রলুব্ধ করেছে তাকে। রোহিতখুল্লার ও তার সঙ্গীরা আসছে, সেই খবরটি তারই পরিবেশন করা। একাকুলায় ওরা অপেক্ষা করবে, মণীশ ও রিয়া আসছে জানলে।

এইভাবেই বিনা পরিকল্পনায়ই কী মণীশ চলে যায়নি অনিন্দ্যর কাছে? কুশভদ্রপুরের দুমড়োনো ছাতা পড়া শহরতলিতে জিপ বিগড়োনোয় বিরক্ত হয়ে সে অনিন্দ্যদের স্কুলের কম্পাউন্ডে আচমকা ঢুকে পড়েছিল, দিন পনেরো আগে। তখন অবশ্য মণীশ জানত না, এখানেই থাকে অনিন্দ্য। কয়েক মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর দুজনে প্রিন্সিপালের ঘরে বসে গল্প করেছিল দু' তিন ঘণ্টা। সতেরো বছরের নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার পর। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে, আগামী মাসে এই নদীযাত্রার সময় সে অনিন্দ্যকে তুলে নিয়ে যাবে। একেবারে সকালে পৌঁছে চমকে দেবে অনিন্দ্যকে। এই শহরে অনিন্দ্য নির্বান্ধব। ছাত্র হস্টেলের নীচের তলার একটি সিঙ্গল রুমে কীভাবে কাটে তার দিন। তক্তপোশ, সুটকেসের ওপর কাগজ পেতে বইপত্র সাজানো, এক কোণায় এক কেরোসিন স্টোভ, ময়লা কোঁচকানো চাদর, ছিঃ!

কিন্তু জল, আকাশ ও অরণ্যের আলিঙ্গনে বিহ্বল এই বন পৃথিবীর সোনার গুটির ভেতরে প্রবেশ করার পর থেকেই মণীশ অনুভব করেছে যে, নিজের অজ্ঞাতসারে প্রতি মুহূর্তে এই অমানবিক নিষ্ঠুরতার পরিকল্পনা করছে সে, অনিন্দ্যর প্রতি। রিয়াকে সারপ্রাইজ দেবার ভূত তার মাথায় ভর করেছিল। অনিন্দ্যকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু সেই প্ল্যান আর এই আদিম বর্বরতা যে একই আত্মবিশ্বাসের দুই সূচিমুখ, মণীশ ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি তখনও।

তাদের দশ বছরের বিবাহোত্তর সহবাসে অনিন্দ্য একবারও রিয়ার দৃশ্যমান সান্নিধ্যে আসেনি, রিয়া মুখেও নেয় না তার নাম, কত রাত না ঘুমিয়ে উৎকর্ণ কাটিয়েছে মণীশ, ছটফট করেছে এই আশঙ্কায়, যদি স্বপ্নে বা জ্বরে অনিন্দ্যকে ডাকে রিয়া, হতাশ করেছে তাকে বার বার, অথচ অনিন্দ্য তো আছে, তাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিন্দ্যর বাস, রক্তধমনি পথে তার যাওয়া আসা। কেন রিয়া এভাবে কষ্ট দেয় মণীশকে, কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনার নকাব ছিঁড়ে ফেলতে দেয় না কিছুতেই।

রুক্ষ হয়ে উঠছে মণীশ। যদিও বলেছে একাকুলা যাবেই, নিশীথ দে মনে করেছিল, ও শেষমুহূর্তে মত বদলাবে। এতটা একটানা জলে জলে আসা। রূপকণিকার আই বি-তে রয়ে যাবে হয়তো রাতে। নিশীথের এই আভাস অনুযায়ী সামান্য ক্লান্ত অনিন্দ্যও সুটকেস খুলে জিনিসপত্র খাটের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছিল। কিন্তু চা খাওয়া ভালো করে শেষ না হতেই পকেটে দু হাত ভরে আকাশ আড়াল করে উঠে দাঁড়িয়েছে মণীশ।

কাম অন, লেট্‌স্ গো।

এক্ষুনি বেরোবেন?

নিশীথের অমায়িক প্রশ্নের উত্তরে খিঁচিয়ে উঠে বলেছে না তো কি, এখানে বসে মশার কামড় খাব! একাকুলায় খুল্লার ওয়েট করবে না? সবাইকে বলে দিন রেডি হয়ে নিতে।

বাঁধডিহার কাগজ কলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রোহিত খুল্লার। সে বা তারা আজ রাতে একাকুলায় অপেক্ষা করবে মণীশের জন্য। রিয়ার জন্য। মদ্যপান হবে চাঁদের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত লনে বসে। সঙ্গে রাঙতাপুরের ভাজা চিংড়ি। কাছেই সমুদ্র তার শিঙার আওয়াজে ভরে দেবে নভস্তল। ঝাউবনে ঢুকে হেঁটে চুপিসাড়ে এগোবে রাতের হাওয়া। যতবারই গ্লাস থেকে ওষ্ঠাধর বিযুক্ত করবে রোহিত, রিয়াকে জরিপ করতে করতে তরল হয়ে উঠবে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ। এমন তো কতবার হয়েছে।

তুমি তো আগে বলোনি, ওরা আসবে। আঃ কী করছ! রিয়ার গলা অভিমানে বুজে আসে জেটির দিকে এগোতে এগোতে। সন্ধের অন্ধকারে অভয়ারণ্যের এক ঝাঁক হরিণ নিঃশব্দে চলে গেল ওদের পাশে রেখে। সুরকির রাঙা পথটি পেছনে হারিয়ে গেছে অভয়ারণ্যে ক্রমশ কৃশ হতে হতে। সামনে সেই আবার জেটি বেয়ে নেমে গেছে রূপকণিকা নদীতে। নদীর দিকে তাকিয়ে আকস্মিক ভয়ে হঠাৎ জমে যায় রিয়া। এইমাত্র মণীশের আঙুলগুলি সাঁড়াশির মতন তার বাহুতে গেঁথে গেছিল। এ কি চাপা রাগ মণীশের, অবোধ নিষ্ঠুরতা।

সরি, আই ডিড নট মিন ইট। আচ্ছা, আসুক না খুল্লার। তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করব।

নৌকোর পাটাতনে বসে অনিন্দ্য মৃদু গলায় মণীশকে বলে, তোর কী হয়েছে বল তো? ছটফট করছিস তখন থেকে? এত রাতে সী-বিচে যাবি, জল তো ক্রমশই বাড়ছে মনে হচ্ছে। তার চেয়ে না হয় আমরা রূপকণিকাতেই...

মণীশ একটি গাঢ় নিশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর জন্য আমার বড়ো কষ্ট হয় অনিন্দ্য। এত ট্যালেন্ট, এমন রেজাল্ট, কি হল তোর বল তো!

অনিন্দ্যর মুখ অন্ধকারে কাছিমের পিঠের মতন কঠিন হয়ে ওঠে। আমি তো তোর দয়া চাইনি মণীশ।

নিঃশব্দে হাসে মণীশ।

আমিও তো তোর দয়া চাইনি। কিন্তু কী করবো বল, এক ঢোঁক দু ঢোঁক করে তোর দয়া পান করেই তো বাঁচতে হচ্ছে আমাকে!

সতর্ক নিশীথ দে নিঃশব্দে পেছনে চলে গেছে, ইঞ্জিনের কাছে ছোটো নৌকো, আড়াল - আবডালের জায়গা কই আর! তবুও এ সময় কাছেপিঠে না থাকাই ভালো।

কেবিনের ভেতর ডান ধারের কাঠের বেঞ্চিতে খগাই-এর পাতা গতি ও চাদরে ঘুমিয়ে পড়েছে রিয়া। সী-সিকনেস না হলেও সকাল থেকে ক্রমাগত নৌকোর দুলুনিতে তার শরীরে এক ধরনের ব্যথা, মাথাটা ভারী লাগছিল। শোওয়ার আগে বেশি দুধ-চিনি দিয়ে এক কাপ চাও দিয়েছিল খগাই। চা-এর পর ঘুম আসার কথা নয়, চোখ তবু লেগে আসছিল রিয়ার। ঘুমের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত সে টের পাচ্ছিল ঠান্ডা হাওয়ার ডানা ঝাপটানো, দুলুনি বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে উত্তাল হয়ে যাচ্ছে। ঢেউ-এর মাথায় একখানি প্রদীপের মতন ভাসছে রিয়ার শরীর। শাল-সেগুনে মেশানো ছোটো নৌকো পলকা একেবারে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, খেয়াল নেই। কষ্টে চোখ খুলে এক সময় শুয়ে শুয়ে ছোট্ট জানলা দিয়ে রিয়া দেখতে পেল, জোৎস্নায় গজরাচ্ছে সবুজ জল, আকাশে ঝলমল করছে পূর্ণিমার চাঁদ, এ তো নদী নয়, দু ধারে কূলের রেখা কই, এ কী সমুদ্র! রূপকণিকার মোহনা পেরিয়ে তবে কী নৌকো সাগরে এসে পড়ল!

ভীষণ দোলার মধ্যেই কোনো মতে বাইরে বেরিয়ে এসে রিয়া দেখল চাঁদের আলোয় দিগন্ত পর্যন্ত টলমল করছে সর্পিল জল। এখন সবাই স্তব্ধ, নিঃসঙ্গ। মণীশ, অনিন্দ্য, নিশীথ। আস্তে আস্তে রিয়ার মন্ত্রমুগ্ধ দু চোখের সামনে ফুটে উঠল হেঁতাল জঙ্গল দুধারে, মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু নিস্তরঙ্গ এক জলরেখা। তার ভেতর দিয়ে নৌকো এগিয়ে চলল তীরের ঝাউ জঙ্গলের দিকে। তারপর এক সময় থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

আর এগোবে না বোট, কূলে ভিড়োবার উপায় নেই। জল একেবার কম। এই হাঁটুজলেই লাফিয়ে নামতে হবে সবাইকে।

একাকুলা। যেন বিসর্জিতা হয়ে বসে আছে একাকিনী এক নারী। অথবা চারদিকের ক্যাসুরিনা গাছেদের সম্মিলিত দীর্ঘনিশ্বাস। নাম শুনেই যেন বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। ডাকবাংলোর চারপাশে ঘন মিশ্র জঙ্গল—ঝাউ, গরান, নারকোল, বট, বড়ো ছোটো নানা গাছপালা এলোমেলোভাবে বেড়ে উঠেছে। বাইরে থেকে বাংলোটা দেখাই যায় না প্রথমে। নিঃশব্দ এক মিছিল হেঁটে যাচ্ছে

অন্ধকারে—মণীশ, নিশীথ দে, অনিন্দ্য, রিয়া ও সবশেষে লটবহর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খগাই। হ্যাঁ, ওরা এসে গেছে আগেই। রোহিতরা। হ্যাজাক, সিগারেটের ধোঁওয়া, ব্রিজের টেবিল, পানীয়, উরু চাপড়ে হাসি।

খগাই-এর মুখ দুঃখে কুঁচকে যায়, অবশ্যই সে কিছু বলে না। এর অর্থ, একটি বিড়ি ভালো করে ধরানোর আগেই খগাইকে ধুতি গুটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, গেঁথে যেতে হবে এবং দরকারে রান্নাঘর ও বাংলোর মাঝখানকার পথটুকু ট্রে হাতে পেরোতে হবে বারবার। মণীশের কপালে জ্যোৎস্না ও হ্যাজাক-মোমবাতির মেশামিশি আলো। ও এক পা বারান্দায় রেখেছে, এক পা নীচে। নীচে থই থই বালি। বাংলোর চৌহদ্দি খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে কাঁকড়ার মরদেহ, ঝিনুক, পাখিতে এনে ফেলা উচ্ছিষ্ট। মণীশ এই মুহূর্তে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ না বিরক্ত বোঝার কোনো উপায় নেই, যদিও অন্ধকার বাথরুম থেকে বেরিয়ে মোমবাতির আলোয় সারাদিনের ক্লান্তিমাখা পোশাক ছেড়ে হালকা সালোয়ার কামিজ পরতে পরতে ওর গলায় মৃদু ডাকে বুক কেঁপে ওঠে রিয়ার।

হ্যাঁ, আসছি, অন্ধকারের ভেতর থেকেই সে সাড়া দেয়।

ততক্ষণে রোহিত এগিয়ে এসে করমর্দন করেছে। ওদিকে মুখ করে বসেছিল বলে প্রথমটা দেখতে পায়নি মণীশকে। রোহিতের সঙ্গে দুজন বন্ধু। তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

কতক্ষণ এসেছেন?

এই তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন। আপনার বাস্থ দেখছিলাম।

রিয়া দ্রুত বেরিয়ে এসেছে, কপালে টিপ নেই, চোখে সেই ভোরের কাজল, ঠোঁট রাঙায়নি, নীল সালোয়ার কামিজ ও জলের চূর্ণ মাখা চুলে তাকে দেখে নটীসুন্দরীর ডাল ছেড়ে উড়ে চলে যাওয়া সেই নীল মাছরাঙাটির কথা মনে পড়ে মণীশের। মণীশ স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, বাঃ।

রোহিত খুল্লার ও তার সহযোগীদের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে রিয়া। অথচ যেন কাছাকাছি কেউ নেই, এই আলো-আঁধারে তারা নিঃসঙ্গ এইভাবে মণীশ কাছে টেনে আনে রিয়াকে, ওর দুই কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বলে, ওরা এসেছে। আমি বসছি। রাত হবে আমাদের। তুমি একটু অনিন্দ্যটাকে বেড়িয়ে নিয়ে এসো সী-বিচ থেকে। না হলে বেচারার কোথাও বেড়ানো হবে না।

নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়ে অপ্রতিভ রিয়া প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। তার গমনপথে খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে বেঁকে দাঁড়াতে চেষ্টা করে রোহিত খুল্লার, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে। এ কী! বসবেন না, বসুন, আপনি না থাকলে তো সন্ধের মেহফিলই জুড়িয়ে যাবে...

মণীশ হাসতে হাসতেই বলে... য়ু শাট আপ।

এ কী ভর্ৎসনা? রোহিত সোজা হয়, চেয়ারে ফিরে আসে। এবং তার বাঁশ জঙ্গল নির্মূলীকরণের পারমিট মণীশের কড়ে আঙুলে ঝুলছে, মণীশ আঙুল নাড়ালেই তা টুপ করে পড়ে ছুঁচের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে ফাইলের খড়ের গাদায়—এই কথা জানে বলেই মুখের হাসি মেলাতে দেয় না রোহিত, বসে পড়ে তাস সাজায়।

বাংলোর খিড়কি পথে একেবারে সরু, ঝাঁকড়া গাছপালার ভিড়ে গা ছমছমানো পথটি ধরে অনিন্দ্য আর রিয়া জ্যোৎস্নাকীর্ণ বেলাভূমিতে এসে পড়ার সময় আরও একজন তার পথ আটকাতে চেয়েছিল। মালগাড়ির লুট শান্টেড বগির মতন এখন পথেই দাঁড়িয়ে আছে নিশীথ দে।

জীর্ণ ম্যাপটি সর্বদা কাছেই রাখে সে। সেই ম্যাপ বার করতে করতেই অনিন্দ্যকে শোনাবার ছলে নিশীথ রিয়াকে বলেছিল, পূর্ণিমার রাতে এই একাকুলা... অপূর্ব। জানেন না হয়তো, অলিভ রিডলে কচ্ছপদের এই হচ্ছে বিরল এক নেস্টিং গ্রাউন্ড। তিন-চার লাখ কাছিম এখানে ডিম পাড়তে আসে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। প্রথম ডিটেক্‌শন—হুম— বোধহয় উনিশশো চুয়াত্তর। সবচেয়ে বেশি রেকর্ড অ্যারাইভাল—ছ লাখ?

নিশীথবাবু, আপনি বাংলোর দিকে যান প্লিজ। ওঁদের কি লাগবে টাগবে...

রিয়ার গলায় যে কাতরতা ফুটে ওঠে, তার অর্থ জানে নিশীথ। সোনার পাখিটিকে পায়ে শেকল পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মণীশ। রিয়ার কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ দামি। নিশীথ জানে, খেলা চলছে পৃথিবীর সর্বত্র। এই খেলায় যে যার দাম আদায় করে নেবে। যে নিতে পারবে না, সে নির্বোধ।

অনিন্দ্য সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে; রিয়ার একটু কাছে এসে, অন্তরঙ্গ গলায় নিশীথ বলে, আমার বদলির কথাটা একটু মণীশবাবুকে বলবেন? বড়ো কষ্টে আছি। ছেলেপুলে-বউ এক জায়গায়, আমি এক জায়গায়, দু'বছরের ওপর এইভাবে... বলবেন?

ক্রমশ দূরে চলে যায় রিয়ার শরীরের সুগন্ধের বলয়।

রিয়া ও অনিন্দ্যকে জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যেতে দেখে নিশীথ। হাতঘড়ি দেখে সে। ফিরে যাবার পথে কিছু চিন্তা তার কপালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুকনো চন্দনের মতন।

মাথার ওপরে, ঠিক ওপরে নয়, একটু বাঁয়ে হেলে চাঁদ। ডান হাতে ক্যাসুরিনা অরণ্যে হাওয়ার ডাহুক-ডাক। বাঁ দিকে সমুদ্র বালিতে ভেঙ্গে পড়ছে উদ্বেল সাদা ঢেউয়ে। রিয়া ও অনিন্দ্যর অবয়ব এই মুহূর্তে আলাদা করে চেনা যায় না। রিয়ার মুখ ঝুঁকে আছে অনিন্দ্যর মুখের ওপর। ওর কপালে, গালে এসে লাগছে রিয়ার নিশ্বাস।

চশমাটা খোলো।

থাক না। কী হবে দেখে?

কেন তোমার এমন হল অনিন্দ্য?

তুমিও যে মণীশের মতো কথা বলছ।

প্রত্যুত্তরে রিয়া জোরে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ওর, নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে।

খুব কাছেই বালুবেলায় পড়ে আছে বিশাল এক কাছিমের কঙ্কাল। মাছধরার জালে শীতের মরসুমে প্রায়ই কাছিম ধরা পড়ে। ট্রলারগুলি বর্বরের মতন কাছিম তোলে। জালের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতেই তাদের কতগুলো মারা যায়। কখনও জেলেরাই পিটিয়ে মেরে ফেলে। জাল থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। সেই প্রাণহীন শরীর সমুদ্র ফিরে নেয় না আর। কাঁকড়া কি উড়ন্ত পাখিরা ধীরে ধীরে খেয়ে গেছে এই মৃত কাছিমের শরীর। পিঠের খোলাটা কেউ তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থহীন কঙ্কালটা কেবল পড়ে আছে; মানুষ, পাখি, পোকা-মাকড়, কেউ এখনও তাকে নির্মূল করেনি বলে।

অনিন্দ্যর গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। কেন আবার নিজেকে জড়াচ্ছে রিয়া! তুমি তো মণীশকে জানো! নিজে কষ্ট পাবে, ও দ্বিগুণ কষ্ট দেবে, ঘৃণা করবে তোমায়। কেন তোমাকে আজ আমার হাত ধরে নিয়ে বেড়াবার জন্য পাঠাল, আমি তো চাইনি! আমাকে বলেছিল, রিয়াকে ছুঁলেই আমি বুঝতে পারি, ওর শরীর মন সেই মুহূর্তে অন্য কাউকে চাইছে! অথচ গত দশ বছরে, আমি তোমাকে একটিও চিঠি লিখিনি, ফোন করিনি, আর দেখার পাট তো উঠেই গেছে কবে। মণীশও তো জানে! কুশভদ্রপুরের আমাদের স্কুলে খাওয়ার সময় যখন অন্ধ ছেলেমেয়েগুলিকে মূক-বধির ছেলেগুলির গুণ্ডামির হাত থেকে বাঁচাতে হয় নিয়ম করে, আমি এই ভেবে মনে মনে হাসি—কী জীবন আমার! পনেরো বছর আগে সেই যে তোমরা বালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাসা ছেড়ে চলে গেলে, দিল্লির ট্রাকে তোমাদের জিনিসপত্র লোড হচ্ছিল, আমি দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তারপরেই তো জানলা বন্ধ হয়ে গেল রিয়া! ট্যাক্সি এল, সবার শেষে তুমি পেছনে জানলার ধারে বসলে। ওঠার আগে আমার দিকে তাকালে, হাত নাড়লে। তোমার শাড়ির হলুদ আঁচল, তোমার সেদিনের সেই দুই চোখ, সমস্ত অস্তিত্বের সেই এক মুহূর্তের ভাষা—সেইটুকু আজ কতদিন হল অন্ধকারে বার বার উল্টে পাল্টে দেখছি। আর কোনো দিন দেখতে পাবে না তোমাকে।

চোখের জলে রিয়ার সামনে মোছা শ্লেটের মতন হিজিবিজি সাদা হয়ে যায় রাতের সমুদ্র।

একটি আঙুলে ওর ভেজা গাল ছুঁয়ে নিয়ে অনিন্দ্য বলে, আজ সারাদিন তোমরা কত কথাই যে বলছিলে। রোদ্দুর, জলের রং, গাছের সবুজ, পাখিদের ওড়াউড়ি, আমি সব শুনছিলাম। নিশীথ

দে-র রানিং কমেন্টারিও। যেন রঙিন এক স্বপ্নের পৃথিবীতে তুমি ও মণীশ চোখ বেঁধে ঘোরাচ্ছিলে আমায় সারাদিন। আমাদের ভাঙাচোরা স্কুলে, বিবর্ণ ঘরে এত কষ্ট পাইনি রিয়া! আজ বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার।

রূপকণিকার সেই চিত্রল হরিণগুলিকে তো দেখিনি আমি, তাদের চলে যাওয়ার যেটুকু শব্দ উঠেছিল ঘাসে, পাতায় সেইটুকু শুনেছি কেবল। তুমি বললে, আমার কালো চশমায় পাখির ওড়া দেখেছ তুমি, আমি কেবল ডানার শব্দটুকু তুলে নিতে পেরেছি নদীর বুক থেকে! হাওয়া, জলের নোনা স্বাদ, রোদের ওম্ এই সব আমি পেয়েছি, বাকি সব কিছু তোমরা ছিঁড়েছুঁড়ে নিয়ে গেছ কেড়ে, তোমরা কেন আমাকে এখানে আনলে রিয়া?

জাফনার সমুদ্র থেকে শরতের শুরুতে রওনা হয়ে গেছে জলপাই কাছিমের দল। এ মরসুমে তারা সংখ্যায় কত, কেউ জানে না। তিন লাখও হতে পারে, পাঁচ লাখও। মাঝ-সমুদ্রে যায় না, উপকূলের কাছের স্রোতরেখা ধরেই সাঁতরায়, দিন-রাত। মাঘের শেষে একাকুলায় এসে পৌঁছবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই। তারপর একদিন নরম রোদে খাতাপত্র, বাইনোকুলার নিয়ে ধেয়ে আসে নিশীথ দে-রা, এ অঞ্চলের ও দেশের যত প্রাণী-বিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা। বালির ওপর যেখানে অনিন্দ্য ও রিয়া এখন শুয়ে আছে, একদিন সেখানে তিলধারণের জায়গা থাকবে না। জলপাই সবুজ লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের এক সমুদ্র তৈরি হবে বেলাভূমিতে। ক্রমশ ডিম দেওয়া শুরু করবে নারী কাছিমের দল। ছোট্ট ছোট্ট সাদা বিশ ত্রিশটি কাছিম শিশুর জন্ম সম্ভাবনাকে বড়ো মমতায় পা-পাখনা দিয়ে ওড়ানো বালিতে ঢেকে দেবে তারা—যাতে আকাশের গাঙচিল, এই পৃথিবীর ক্ষুধার্ত বালকবালিকারা অথবা লোভী ট্রলার ব্যবসায়ীদের হাত তাদের ছুঁতে না পারে। তারপর ফিরে চলে যাবে কাছিমেরা। যেমন আতুরতা নিয়ে দীর্ঘ সমুদ্রপথ পার হয়ে এসেছিল একদিন, তেমনই অপার ঔদাস্যে ফিরে চলে যাবে। কিছুদিন পর, হয়তো বা এমনই এক পূর্ণিমার রাতে, বেলাভূমিতে আরম্ভ হয়ে যাবে অগ্ন্যুৎপাতের মতন এক নিঃশব্দ ওলট-পালট। লক্ষ লক্ষ কাছিমশাবক ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসবে, শরীরে বালু মেখে, মুখ তুলে একবার দেখবে এই অচিন তটরেখা, ওই কান্নায় ভেঙে পড়া সমুদ্র, তারপর ধীরে ধীরে চলে যাবে জলের দিকে। অবিকল সেই স্রোতরেখা ধরে ভেসে যাবে তারা, যে পথ দিয়ে তাদের অচেনা জননীরা চলে গেছে। কে তাদের অজাত চেতনায় ভরে দেয় এই দীর্ঘ জলপথের নকশা, কে তাদের বলে দেয় সমুদ্রে দিশা, অন্তহীন রহস্য!

জ্যোৎস্না আপ্লুত জলের দিকে তাকিয়ে রিয়া ভাবে—কোনো অদ্ভুত মন্ত্রবলে যদি সে ঢেউ-এর মাথায় ভাসতে ভাসতে ওই হেঁতাল জঙ্গল ঘেরা কুশ জলরেখা পেরিয়ে চলে যেতে পারত, একদিন এই বালুবেলায় জেগে উঠত যদি তার ও অনিন্দ্যর সন্তান, তারপর জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে সেই স্বপ্নের শিশু যেত জননীকে খুঁজতে। বালি দিয়ে, খড়কুটো দিয়ে, আলো-অন্ধকার দিয়ে রিয়াও কি ঢেকে রেখে যেতে পারত না তার জন্ম-সম্ভাবনা! তা পারেনি রিয়া। শেষ বারের মতন ওষ্ঠাধরে অনিন্দ্যর চেতনা থেকে আজকের বর্ণহীনতার স্মৃতি মুছে দিতে দিতে সে দেখে দূর ক্যাসুরিনা দেওয়াল ঘেঁষে দুটি লণ্ঠন এগিয়ে আসছে আততায়ীর মতন। নিশীথ আসছে এবং মণীশ।

মণীশ যতই পান করে থাকুক, রিয়া জানে, আজ তাকে নেবে না। আগামীকালও নয়। ঘরে ফেরার অনেক অনেক পর, প্রয়োজনে গর্ভসম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করাবে, তারপর। রিয়া নড়ে না, অনিন্দ্যর একটি হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ভয়শূন্য, চিন্তাশূন্য বসে থাকে। সে জানে, বেঁচে থাকার সমস্ত অর্থহীন কোলাহলও ঢেউ-এর মতন শেষ হবে একদিন।

মালবিকা সাগরিকা

ঋতা বসু

"তাড়াহুড়ো করে দুলটা পরতে গিয়ে প্যাঁচটা যে কোথায় পড়ে গেল মালবিকা খুঁজেই পেল না। ঝাঁটা এনে নীচু হয়ে খাটের তলা, আলমারির কোণ তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেল না। অন্তত এক গ্রাম সোনা আছে ওই প্যাঁচটার মধ্যে। ঠাকুরমার ছিল দুলটা, মালবিকাকে মা প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে দিয়েছিল। সারির একটুও ইচ্ছে ছিল না মা ওটা দিদিকে দেয়। তখনও পর্যন্ত মা কত শক্তপোক্ত ছিল। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করবার মনের জোর ছিল। মালবিকার কী ভীষণ পছন্দ ছিল দুলটা। সোনার জাফরিকাটা রিঙের মাঝে আর একটা ছোট্ট বৃষ্টির ফোঁটার মতো ছোট্ট নোলক। মালবিকা বিয়ের সময়ই কতবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। মা তখন দেয়নি। কেন জানি না পরে কী মনে হয়েছে, প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে দারুণ দামি একেবারে সাচ্চা জরির কাজ করা টিসু কাজিভরমের সঙ্গে এই দুলটা দিয়ে দিল।

এখন মালবিকা বোকার মতো প্যাঁচটা হারিয়ে বসে রইল। আগে হলে মা'র কাছে ঘ্যানঘ্যান করে ওটা বানানোর খরচটা বাগিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু মা নিজেই এখন শয্যাশায়ী। পুরোপুরি সারির ওপর নির্ভর। কথা ভালো বোঝা যায় না। ব্রেনটাও সবসময়ে কাজ করে না। সারির হাত থেকে বাড়তি একটা ছুঁচও গলবার উপায় নেই।

দুঃখে মালবিকার কান্না পেয়ে গেল। আর সেই দুঃখটাই কেমন একটা চাপা রাগ আর ক্ষোভের চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ল ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর। মেয়েটা এখনও উলিঝিলি মতো পোশাক পরে বিছানায় গড়াচ্ছে। হাতে গল্পের বই। সামনে ডালমুটের প্লেট। মালবিকা এক ঝটকায় ডালমুটের প্লেটটা তুলে নিয়ে বলল—এক্ষুনি দিদুর বাড়ি থেকে গাড়ি চলে আসবে। এখন তুমি বসেছ ডালমুটের গুষ্টি নিয়ে? তারপর ওখানে গিয়ে ভালো ভালো খাবার—মাছ, মাংস, মিষ্টি মুখে তুলতে দিয়ে তোমার গা গুলোবে। সহ্য হবে কেন ভালো জিনিস? কুকুরের পেটে কী ঘি সয়?

ঝুম ধীরেসুস্থে আড়মোড়া ভাঙে। ওঠার কোনো লক্ষণই নেই। মায়ের এই ধরনের আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে তার বেশ ভালোই পরিচয় আছে। বাড়তি মনোযোগ দেবার কোনো চিহ্নই তার ভাবভঙ্গিতে ফুটে ওঠে না।

মালবিকা ছেলের দিকে তাকায়। টিটো একমনে গিটারে ঝমঝম করেই চলেছে। সামনে রাখা মিউজিক সিস্টেমে প্রবল কোলাহলমুখর একটা ইংরেজি গান বাজছে। কানের কাছে যে এত বড়ো একটা নাটক হয়ে গেল সেদিকে কোনো দৃক্‌পাতই নেই।

মালবিকা যতটা সম্ভব আওয়াজ করে মিউজিক সিস্টেমটার চাবি টিপে বন্ধ করে দেয় যাতে টিটো বুঝতে পারে তার যথেষ্ট রাগ হয়েছে, গানটা বন্ধ হওয়ামাত্র টিটো মার দিকে তাকায়। হাওয়া

গরম বুঝতে পেরে দিদির দিকে আড়চোখে তাকাতেই ঝুম পেছন থেকে নিজের মাথায় তর্জনী ঠেকিয়ে চক্রাকারে ঘুরিয়ে যে-ভঙ্গিটা করল সেটা মালবিকা দেখতে না পেলেও অনুভব করল।

এ ঘরে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মালবিকা এবার সত্যি পাগল হয়ে যাবে। প্রতি সপ্তাহে কী কষ্ট করে যে ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মার কাছে যেতে হয়—একথা সে কাকে বলবে? রথীনকেও কী সে বোঝাতে পারে? সন্ধেবেলা বুড়ি-ছোঁয়া করে মার ঘরে একবার নামমাত্র ঢুঁ মেরে সারিকে বাঁধাধরা কয়েকটা কুশল প্রশ্ন করে সপরিবারে তাদের ফেরত নিয়ে আসে—যেন এক মহান কর্তব্যসাধন করা হল।

মালবিকা ভাবে—মা আর কদিন? নাতি-নাতনি বলতে তো টিটো আর ঝুমই। সারি তো আর বিয়ে করবে না। করবেই বা কেন? অত বৈভব ছেড়ে আহাম্মকরাই অন্য লোকের ঘর করতে যায়—যেমন মালবিকা।

কলেজে রথীনকে দেখে কেন যে অত মজেছিল মালবিকা তা এখন আর বুঝতে পারে না। মা কতবার বলেছিল—তুমি কোন্ বাড়ির মেয়ে ভুলে গেলে কী করে? ওরকম উদ্বাস্তু পরিবারে মানাতে পারবে কেন?

মা এমন ভাব করেছিল যেন রথীনদের দুবেলা খাওয়া জোটে না, মালবিকাদের তখন নামেই বিষয়সম্পত্তি, তা থেকে রোজগার নেই একফোঁটা। জমানো টাকাই ভরসা অথচ ঠাটবাট অহঙ্কার ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। ওদিকে রথীনদের বিষয়সম্পত্তি না থাকলেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞা ছিল চোখের সামনে। অন্তত মালবিকার তখন মনেই হয়নি বনেদি ধনী পরিবারে বিয়ে করে পুজোতে হিরের গয়না আর গরমে পাহাড়ে যেতে না পারলে জীবন বৃথা। বরং ক্লাসের অন্যতম উজ্জ্বল ছাত্র রথীনের প্রেমে ধন্য হয়ে এই পার্থিব বস্তুসমূহকে অসার বলে মনে হয়েছিল।

সারির ব্যবহার ছিল সব থেকে অসহনীয়। মালবিকা যে পরে আপসোস করবে এ-কথা এত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করত যে, মা পর্যন্ত থমমত খেয়ে যেত। রথীনের বিরুদ্ধে মার বলাটা মালবিকার খারাপ লাগলেও মেনে নিত কিন্তু সারির বিদ্রূপাত্মক উক্তিগুলো সহ্য হত না। হেসে হেসে বলত আশাভঙ্গ হলে সিংদরজা দিয়ে ঢোকা রাজকীয় প্রেম জানলা দিয়ে উড়ে পালাবে। যেন মালবিকা তেমন পছন্দসই বিয়ে করছে না বলে তাকে একেবারে ছেঁটে ফেলাই ভালো। রথীনও প্রথম থেকে শ্বশুরবাড়ির মনোভাব বুঝতে পেরে সেই যে আড়ষ্ট হল সেই আড়ষ্টতা আজও কাটেনি। অথচ সব থেকে কাছের একমাত্র পুরুষ অভিভাবক হিসেবে মা ও সারি অনায়াসেই রথীনের ওপর নির্ভর করতে পারত। রথীনের থেকে কত লোকেই তো কম পরামর্শ নেয়। একজন মানুষের সাফল্য কৃতিত্বের পরিমাপ কী সবসময়ে সে কত টাকা রোজগার করছে তার ওপরে নির্ভর করে?

তাই বোধহয় করে। নিজের ঘরে এসে আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে মার দেওয়া দামি ঢাকাইটা পরতে গিয়েও তিনটে জন্মদিন আগে মারই দেওয়া টাঙাইলটা পরল। ভালোই আছে শাড়িটা. শুধু প্রথমবার ধোওয়ার পরই পাড়ের রঙটা ফিকে হয়ে গিয়েছে।

তৈরি হয়ে মালাবিকা রথীনকে জিজ্ঞেস করল, কখন যাবে? তাড়াতাড়ি চলে যেও।

রথীন তিন-চারটি খবরের কাগজ মেলেজুলে এক কাপ চা তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে রবিবারের সকালটা উপভোগ করেছিল। বলল, যাব যাব, পাহাড় পর্বত না ডিঙিয়ে দু'পা গিয়ে একসঙ্গে বৈষ্ণদেবী, শ্মশানকালী দর্শনের পুণ্যলোভে বঞ্চিত হই কেন?

মালবিকা একটা জুতসই উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলেছিল, তার আগেই গাড়ির হর্ন শুনে, বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখতে পেল, গাড়ি থেকে নেমে বংশীদা বনেটটা খুলে কী খুটখাট করছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মালবিকা কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করে। বিষণ্ণ না ক্লান্ত

নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। প্রতি রবিবারই এমন হয়। নিজের বাড়ি থেকে অনিচ্ছুক ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে স্বামীর ব্যাঙ্গোক্তি শুনে মার বাড়িতে পৌঁছে মনে হয় সম্পূর্ণ অন্য একটা জগতে এসে পড়েছে। প্রতিবারই মনে হয় পরের সপ্তাহে আর আসবে না। মা যখন ভালো ছিল। কখনও বকুনি দিত বা মালবিকার বোকামি নিয়ে ঠাট্টা করত তখন তবু একরকম ছিল। মালবিকা রাগ করলেও কখনও ভাবেনি আর আসব না। এখন ও বাড়ি পুরোপুরিই সারির দখলে। ঝুম টিটোও বড়ো হয়েছে। তাদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। আর কতদিন মালবিকা এমন জোর খাটাতে পারবে জানে না।

সকালবেলা সোনার আভরণাংশ হারানোর বেদনার সঙ্গে স্বামী-সন্তানদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় চাহিদা থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্পলোকে বিচরণ করার প্রবণতা দেখে হতাশায় মালবিকার কাছে ঝকঝকে দিনটা অকারণেই মেঘলা হয়ে ওঠে।

মালবিকা জানে রথীন প্রথম থেকেই শ্বশুরবাড়িতে তার অনাদর অনুভব করে গুটিয়ে গিয়েছিল। পরে শাশুড়ির সঙ্গে কর্তব্যবোধেই হোক বা বয়সোচিত সম্মান প্রদর্শনের কারণেই হোক খানিকটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সারির অহঙ্কার, বংশকৌলীন্যের গর্ব, বিষয় সম্পত্তিতে তীব্র অধিকারবোধ এবং আকাঙ্ক্ষা কখনওই মেনে নিতে পারেনি রথীন। সেইজন্য মালবিকা চারপাশে যেমন 'দেখে শ্যালিকা ও জামাইবাবুর সরস সম্পর্ক, ওদের দুজনের মধ্যে তেমনটা কখনও গড়ে ওঠেনি।

সব জেনে বুঝেও মালবিকা চোখ বুজে থাকে কারণ মালবিকাকে হাল ছাড়লে চলবে না। সারির বক্রোক্তিতে ভেঙে পড়লে চলবে না। তার মেয়ের বিয়ে, ছেলের উচ্চশিক্ষা সবই বাকি আছে। এবং যদি একটু বুঝদার হত ছেলেমেয়েগুলো যদি আর একটু দিদু দিদু করে...রথীন যদি আরও একটু ধৈর্য্যশীল হয়ে গায়ে না মাখে... মালবিকা আর কত শেখাবে? কীভাবে বোঝাবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালবিকা ঘরে আসে। শেষবারের মতো চোখ তীক্ষ্ণ করে ঘরের মেঝেটা আর একবার দেখে মালবিকা, যদি কোথাও একটু চিকচিক করছে চোখে পড়ে।

ঝুম ডাকল, মা বংশীদা তাড়া দিচ্ছে—যাবে না?

মালবিকা তাকিয়ে দেখল ঝুম জিনস আর খাটো হাতকাটা গেঞ্জি পরে তৈরি। মা কী অপছন্দ করে এই পোশাকটা। অনায়াসেই ঝুম সালোয়ার কুর্তা পরতে পারত। কিছুতেই পরবে না। তাহলে যে মালবিকার সুবিধে হয়। টিটো সর্বক্ষণের সঙ্গী গিটারটা হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার মানে যত কম মাসি ও দিদুর মুখোমুখি হওয়া যায়।

তেতো মন। ক্ষিপ্ত মেজাজ নিয়ে মালবিকা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

টিটো আর ঝুম বংশীর সঙ্গে নানারকম মশকরা শুরু করে দেয়। বংশী ওদের জন্ম থেকে দেখছে। সে সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। ঝুম বলে, বংশীদা সীতাহরণ পালা কখন শুরু হবে?

গাড়িটা পুরনো হয়েছে। বেশ কয়েকবার চলার পথে কখনও ওয়াইপার, কখনও চাকা থেকে হাফক্যাপ, কখনও আর কিছু খুলে খুলে পড়ে যায়। সেইজন্য ঝুম আর টিটো এর নাম দিয়েছে সীতা। কোনো টিভি সিরিয়ালে সীতা ভূষণ ত্যাগ করতে করতে চলেছিল, তার সঙ্গে নাকি এর বিস্তর মিল।

মালবিকা ওদের কথায় প্রভাবিত হয়ে মাকে একবার বলেছিল নতুন গাড়ি কেনার কথা। তখনও মার শরীরটা এত খারাপ হয়নি। মার হয়তো আপত্তি ছিল না কিন্তু সারি একেবারে নাকচ করে দিল—কার বুদ্ধি এটা?

--কেন, আমার নিজের হতে পারে না?

—তোর নিজের যদি থাকত তাহলে কী আর তোর এই দশা হয়?

মালবিকা যতই নিজের মনে নিজের বাড়িতে তার অবস্থা নিয়ে হাহুতাশ করুক না কেন, সারির

মুখে তার উল্লেখ শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সারি মালবিকার রাগকে পাত্তা না দিয়ে বলল, এটা মনে হয় রথীনদার নয়,—ঝুম আর টিটোর বুদ্ধি। বাজারে নতুন গাড়ির মেলা দেখে খোকাখুকুর শব্দ হয়েছে। মা—তুমি আর নেচো না ওদের কথায়। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আর বংশীর যতটুকু ক্যাপাসিটি তার জন্য ওই পুরনো অ্যাম্বাসাডারই ঠিক আছে।

এই হল সারি। তার নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে একচুলও বদলাবে না। পুরনো বাড়ি, পুরনো কাজের লোকজন, পুরনো গাড়ি এসব নিয়ে সারি শুধু সন্তুষ্ট বললে কমই বলা হয়। সে তার পরিমণ্ডল নিয়ে গর্বিত এবং যারা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলছে, প্রাত্যহিক জীবনে আধুনিকতা অনতে চাইছে, তাদের প্রতি সারির নিদারুণ অবজ্ঞা। এই মনোভাব মার'ও ছিল। কিন্তু মার বয়সে মাকে এটা মানিয়ে যেত। মনে হত, মা একটু বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল, অতিরিক্ত সাবধানী। তারপরই মনে হত যাক গে—সব মায়েরাই এমনই হয়। কম আর বেশি। সেই মনোভাবই সারির মধ্যে কেমন ভয়ঙ্কর দেখায়। সেইজন্যই বোধহয় সাবির কোনো পাত্রই আর পছন্দ হল না। তার কখনও মনে হল রূপ নেই, কখনও মনে হল বংশগরিমা নেই, কখনও বা মনে হল টাকার লোভেই বুঝি এই পার্টি রাজি হয়েছে। মনের পরতে পরতে এত সন্দেহ জমে থাকলে কী আর বিয়ের মতো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়?

মালবিকার এখন কুট একটা সন্দেহ হয়—এই বাড়ি ছেড়ে যাবে না বলেই সারি এতরকম বাহানা করেছিল। এত অসীম সম্ভাবনা তাদের এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ছিল এ সারি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি।

মালবিকার এখন মাঝে মাঝে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে। তার কেন মাথায় আসেনি আগে? সাততাড়াতাড়ি ড্যাং ড্যাং করে নেচে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসল। এখন চেকবই বার করে সারির চেক কাটা দেখে, গোছাগোছা নোট অবহেলায় নাড়াচাড়া করা দেখে, চাকরবাকর ড্রাইভার দারোয়ান নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মতো ঠাটবাট দেখে মালবিকার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে মনে মনে জানে যদি সারির বিয়ের পর এমন হত, যদি তার বরের এমন প্রতিপত্তি হত তার কিছুই মনে হত না। বোনে বোনে অবস্থার ফারাক সে প্রচুর দেখেছে।

বিয়েটা এমনই এক জুয়াখেলা। কার ভাগ্যে কখন যে কী ঘটবে আগে থেকে বলাই যায় না।

কিন্তু মালবিকার আপসোস হয় যখন সে ভাবে, বিয়ে না করে ওই বাড়িতে থেকে গেলে এই সুখ-সৌভাগ্যের সে-ও একজন অংশীদার হতে পারত।

॥ দুই ॥

সেগুন কাঠের ভারী আলমারিটা খুলে সাগরিকা ভাবছিল এই রূপোর বাসনের আলমারিটা কতদিন ধরে অগোছালো হয়ে আছে। মা ঠাকুরঘরে যেতে পারেন না আজ দু বছর। মা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না বুঝতে পেরে ঘরেই ছোটো করে গোপালের আসন পেতে দিয়েছে সাগরিকা। মায়ের ইচ্ছে গোপালের হাতে রূপোর বাঁশি থাকুক। সেই বাঁশি খুঁজতেই আজ আলমারি ওলটপালট হয়ে গেল। বাঁশি কেনাই ছিল, কিন্তু কোথায় কীসের মধ্যে যে ঢুকে আছে—খুঁজেই পাচ্ছে না সে। সাদা ঝকঝকে নানা আকারের বাসনপত্রের মাঝে কোথায় যে হারানিধি ঢুকে আছে। বাসন ছাড়াও আর কতরকম জিনিস যে জমেছে।

সাগরিকা জানে দামি শাড়ি, গয়না, রুপোর বাসন ইত্যাদি কেনা তার প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তবু কেনে। কেন কেনে, কার জন্য কেনে এসব প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না। নিজেই নিজেকে বলে, ইচ্ছে করে, ভালো লাগে ক্ষমতা আছে তাই কিনি। সেইজন্য নতুন গড়ে ওঠা আধুনিক বাজারগুলোতে অবসর পেলেই ঘুরে বেড়ায় সাগরিকা। ঠুনকো বস্তুতে তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই।

আজ সকালেই কাশী থেকে ভালো সাচ্চা জরিকাজের কাপড় নিয়ে লোক এসেছিল। অত দূর থেকে এসেছে লোকটা, সাগরিকা কিনবে না ভেবেও কিনে ফেলে রাধামাধবের সিংহাসনে পাতবার রেশম কাপড় আর সূক্ষ্ম জরি সুতোয় কাজ করা একটা শাড়ি। কলকাতায় সাগরিকাদের মতোই দেব মিত্র মল্লিক ইত্যাদি কয়েকঘর পুরনো পরিবারে এরা আসে বংশানুক্রমে। সাগরিকার মা-ঠাকুমাও কিনতেন।

শাড়ি থেকে ব্লাউসের জন্য আলাদা কাপড়টা কেটে নিয়ে শাড়িটা আলমারিতেই তুলে রাখল সাগরিকা। আর কিছুক্ষণ বাদেই দিদি চলে আসবে দলবল নিয়ে। ওদের বেশি না দেখানোই ভালো।

ভারী রূপোর চাবির রিংটা কোমরে গুঁজে কারুকার্য করা কাঠের আলমারির পাল্লাটা বন্ধ করার আগে সাগরিকা সমস্ত আলমারিটায় চোখ বোলাল। মূল্যবান ধাতব বস্তুপুঞ্জ তাদের বংশানুক্রমিক অক্ষয় অনড় অপরিবর্তিত আনুগত্য নিয়ে সাগরিকার দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

একটা নিশ্চিন্ত আরামের বোধ ছড়িয়ে যায় তার শরীরে ও মনে।

আলমারিটা বন্ধ করে সে একটু হাসল আপনমনে। এই বাড়িময় ছড়ানো কত দামি জিনিস, মেহগনি, সেগুন কাঠের আসবাব থেকে শুরু করে সিঁড়ির বাহারি রেলিং, মার্বেল টেবিল, ঘড়ি, আলোর ঝাড়, সমস্তই হতশ্রী বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল বহু বছর। এগুলো যে মূল্যবান এ তথ্যটা সাগরিকা সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

দেউড়িতে এখনও আদি অকৃত্রিম লোহার গেটটাই আছে। সেটা পেরিয়ে ছোট্ট বাগান। বাগানে মার্বেলের ফোয়ারা। তার চারদিকে ছোটো-বড়ো নুড়িপাথর দিয়ে সাজানো। এই ফোয়ারা দিয়ে জলপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সাগরিকাদের জন্মের বহু আগেই। বাগান আগাছায় ঢেকে গিয়েছিল। বাড়ির সামনের অত ভালো ঘরগুলোয় কোথাও কালোকুষ্টি কয়লার দোকান, কোথাও গনগনে উনুন ধরিয়ে তাগাড় করে ইস্তিরি হত—তার সঙ্গে চা-ওলাও পুরি ভাজিওলা, যত রাজ্যের মুটে মজুরের ভিড়—সেই সময়কার বাড়িটার চেহারা মনে করলে সাগরিকা এখন শিউরে উঠে।

এত বড়ো বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের টাকার অভাবে প্রোমোটারের হাতেই যেত যদি না সাগরিকা সাহস করে তার বিয়ের জন্য রাখা জমা টাকা ভেঙে একতলার খানিকটা অংশ মেরামত করে সাজিয়ে বাগানসুদ্ধ বিয়েবাড়ি, জন্মদিন ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে ভাড়া দেওয়া শুরু করত। যে-বাড়ি একসময় ছিল বিষম দায় সেই বাড়িকেই সাগরিকা আজ সম্পদে পরিণত করেছে।

এখন দিদির গাত্রদাহটা সাগরিকা বেশ বুঝতে পারে। বাড়ির এই বোলবোলাও সবই হয়েছে তার বিয়ের অনেক পরে। হয়তো আপসোস করে তার কেন মাথায় আসেনি বলে। মাথায় এলেই বা কী হত? তখন তো রথীনদাকে বিয়ে করবার জন্য মরে যাচ্ছিল একেবারে।

বিয়ের কথা ভাবলে সাগরিকা এখনও আবছাভাবে এক বলিষ্ঠ পুরুষের কথা ভাবে,—যাকে সে দেখতে পায় না—অনুভব করতে পারে। একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানুষ যাকে সাগরিকা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারে।

এমন মানুষ কী সত্যি আছে যে সাগরিকার সমস্ত দায় নেবে, পাশে এসে দাঁড়াবে? সাগরিকার সাম্রাজ্যেরই একটা অংশ হয়ে যাবে অথচ যাকে সে সম্মান করতে পারবে। লোভী মনে হবে না।

বংশীর গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে।

টিটো নামল সবার আগে গিটার হাতে দিদি। বোধহয় কিছু বলল। বাগানের দিকে যেতে গিয়েও টিটো মায়ের কথা শুনে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিশ্চয়ই মার ঘরের দিকেই গিয়েছে। ঝুম মাটিতে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে গাড়িতে বসে থাকার আলস্য কাটানোর আড়মোড়া ভাঙে। দিদির ছেলেমেয়ে দুটোই সুন্দর হয়েছে। মা-বাবার ভালোটাই পেয়েছে। পড়াশুনোতে কিন্তু তেমন মন নেই। অবশ্য সবই দিদির মুখে শোনা। সাগরিকা কখনও যায় না কারও বাড়ি।

এইবার দিদি নামল ঠিক—সাগরিকা যা ভেবেছে—একটা রং ওঠা পাড়ের শাড়ি পরে এসেছে। দিদি কখনও এ বাড়িতে ভালো কাপড় পরে আসে না জানে এই রং ওঠা পাড়টা দেখলে মা রাগ করবে। অসন্তোষ প্রকাশ করবে—তারপর তাঁতিনী এলে গোটা দুই ভালো কাপড়ও কিনে রাখবে বড়ো কন্যার জন্য।

দিদির দীনতা দেখে সাগরিকার হাসিও পায় আবার রাগও করে। রথীনদা বাংলাদেশ গিয়েছিল কাজে, দিদির জন্য ঢাকাই শাড়ি এনে দিয়েছে, দিদি সেটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল। ঝুম সরলমনে বলে ফেলেছে তাই জানা গেল।

কই সেবেলা তো মনে হয়নি ছোটোবোনকে একটা দিই, মার জন্য একটা আনাই। মাতো তখন চলাফেরাও করত। এ সব বললেই বলবে—তোকে আর কী দেব। তোর নিজেরই কত দামি দামি জিনিস।

আরে দিয়ে তো দ্যাখ। এই বাড়ি মানেই পাওনাগণ্ডা আদায় করা। এখানেও যে কিছু দিতে হয় এটা ওর মনেই হয় না।

বারান্দা থেকে সরে আসে সাগরিকা, দূর থেকে মার ঘরের দিকে তাকায়। সাদা কালো বড়ো বড়ো চৌখুপি কাটা মেঝে। মা কাঠের কারুকার্য করা ছত্রি লাগানো খাটের ওপর পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। মার আয়া কমলাদি একটু দিদির কাছ ঘেঁষে হাসিমুখে কী বলছে। বোধহয় মার কথাই বুঝিয়ে বলছে। মাঝে মাঝে মার কথাগুলো জড়িয়ে যায়। একমাত্র মলাদি ও সারিই সব কথা বুঝতে পারে।

দূর থেকে মার ঘরটা মনে হচ্ছে ফ্রেমে আঁটা একটা সুখী পারিবারিক ছবি। টিটো গিটারটা পিড়িং পিড়িং করতে করতে মার খাটের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝুম মার পাশে বসে হাতের ম্যাগাজিনটা থেকে কী একটা ছবি দেখাচ্ছে! দিদি পায়ের কাছে বসে আছে। মার মুখে হাসি। এই হাসিটা তোলা থাকে দিদিদের জন্য। সারির ওপর মা যতই নির্ভর করুক না কেন এই হাসিটা মা কিছুতেই হাসবে না তার সঙ্গে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতাস শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেয় সাগরিকা। সেও যদি আসত এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে সপ্তাহে এমনই একটা দিন, তা হলে কি মা এমন করে স্নেহ প্রশ্রয় ধমক মেশানো এই হাসি হাসিটা হাসত তার সঙ্গে?

দিনের বেলা জ্বালানো বিজলিবাতির মতো সাগরিকার ফ্যাকাশে ফরসা মুখটা হঠাৎ তীব্র রক্তোচ্ছ্বাসে লালচে দেখায়। মুহূর্তের মধ্যে একটা তরল তাপপ্রবাহ যেন শিরা-উপশিরায় বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাগরিকার সমস্ত শরীরে। কান ঘাড় গলা গরম হয়ে ওঠে। অদেখা অজানা অবয়বহীন শক্ত অথচ আভিজাত্যে মোলায়েম বিশ্বাসযোগ্য একটি নির্ভরের জন্য তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

সর্বনাশ করেছে, বারান্দা থেকে সাগরিকা দেখল বিহারী ঠেলাওয়ালাগুলো ঠেলা থেকে বাঁশ নামিয়ে রাখছে নতুন লাগানো গাঁদার চারাগুলোর ওপর। দারোয়ান কোথায়? শ্যামলই বা এই সময়ে অফিসঘরে ঢুকে বসে আছে কেন?

দোতলা থেকেই চেঁচিয়ে বারণ করতে পারত সাগরিকা কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত গলা সে কখনওই তোলে না। মাপা স্বরগ্রাম, ওজন করে কথা, তাইতেই কাজ হয়।

বারান্দার থামের কোণটা ছেড়ে নীচের দিকে রওনা দিল সাগরিকা। কত কাজ পড়ে আছে। এত ভাবালুতার সময় কোথায় তার? আজ বাগান সহ একতলার ভেতরটা ভাড়া নিয়েছে এক মারোয়াড়ি পার্টি—বাচ্চার জন্মদিনের জন্য।

রাস্তার ওপরের ঘরটায় গতকাল যে এগজিবিশনটা ছিল তারা দু ঘণ্টা বেশি সময় নিয়েছে। শ্যামল নিশ্চয়ই বাড়তি সময়টুকু ধরেই হিসেবনিকেশ করবে। সে বেশ চৌখস ছেলে। কাজকর্ম

ভালোই বোঝে। ইনকাম ট্যাক্স ব্যাঙ্ক সবই সে সামলায়, তবু সাগরিকা চোখ রাখে সব দিকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব—খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু নিজে যাচাই করে না নিলে তার শান্তি হয় না।

একতলায় আসতে আসতেই সাগরিকা নিজস্ব ধারাল ঝাঁঝাল অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য জগতের মধ্যে ফিরে আসে। রাজা রামকান্ত রায়ের তস্য তস্য উত্তরসূরী হিসেবে এই পুরনো বাড়ি আর বংশানুক্রমে থেকে যাওয়া বিবর্ণ আসবাব, বাক্সবন্দি বাসন, কিছু সাবেকি অলঙ্কার যা 'আছে' এই ভাবনাতেই যত আরাম বাস্তবে তারা কাজে তো লাগেই না বরং অসুবিধেরই সৃষ্টি করে—এইটুকুই সে পেয়েছিল।

এই সামান্য পুঁজিটুকু কাজে লাগিয়ে সাগরিকা আজ বেশ সুবিধাজনক একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। যা হতে পারত প্রাণান্তকর বোঝা তা-ই আজকে ঈর্ষা উদ্রেক করা সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও মালবিকা ও সাগরিকা দু বোনেরই বিয়ে বাবদ পর্যাপ্ত টাকা বাবা রেখে দিয়েছিলেন। সে টাকা কোনো সম্পত্তি বেচে এসেছিল তা সাগরিকা জানে না।

তারা দু বোন স্কুলে থাকতেই বাবা মারা গেলেন আচমকা। দিদি কলেজটা শেষ করেই রথীনদাকে বিয়ে করবার জন্য খেপে গেল। সাগরিকার মনে আছে মা তখন দিদিকে অনেক বুঝিয়েছিল, অসবর্ণ বিয়ে সুখের হয় না। তা ছাড়া ওরা পূর্ববঙ্গের। অবস্থাও সাধারণ। তুই মানাতে পারবি না। বাঙালদের সঙ্গে থাকা কী চাট্টিখানি কথা?

কত ভুরি ভুরি উদাহরণ দিয়েছিল বাঙালদের গেঁয়োপনা নিয়ে।

মালবিকা আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, কবে ওরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছে। রথীনের বাবার ছোটোবেলায়। রথীন তো আমারই মতো কলকাতায় জন্মেছে।

সাগরিকা ওদের কথার মাঝখানেই বলেছিল, যেখানেই জন্মাক বাঙালরা বাঙালই থাকে। ওদের বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায়।

দিদি রাগ চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, বাঙালদের বুঝি আলাদা গন্ধ থাকে?

সারিও পিছু না হটেই বলেছিল, থাকেই তো।

—সে তো মানুষখেকোরই গায় থাকে বলে জানতাম।

সাগরিকার সঙ্গে চিরকালই দিদির একটা ধাতুগত পার্থক্য ছিল। এখন রথীন এবং এই বিয়েকে কেন্দ্র করে সেটা রীতিমতো বিদ্বেষে পরিণত হল। সাগরিকার পরে অবশ্য মৃদুভাবে মনে হয়েছিল বিয়ের আগে অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও হত। দিদিটা যা কাছাখোলা নিশ্চয়ই রথীনদাকে সব কথা লাগিয়েছে, নয়তো রথীনদাও সাগরিকার কাছে হাত গুটিয়ে থাকত না।

যাক গে, তাই বলে সাগরিকা এখন আর মাথা নীচু করে ভুল স্বীকার করতে পারবে না। ওটা তার ধাতেই নেই। রথীন ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন পরে—সে রাজা রামকান্ত রায়ের বংশে জামাই হবার উপযুক্ত নয়, একথা সাগরিকা এখনও জোর গলায় বলবে।

সাগরিকার জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে ঘটক কলকাতার পুরনো পরিবারগুলো থেকে দু-চারটে সম্বন্ধ এনেছিল। যারা আগ্রহ দেখিয়েছিল সাগরিকা এক কথায় তাদের নাকচ করেছে। অলস অকর্মণ্য পারিবারিক পুঁজি ভেঙে খাওয়া নোনা ধরা পুরুষকেও সাগরিকা জীবনসঙ্গী হিসেবে কল্পনা করেনি, আবার আভিজাত্যহীন উটকো পরিবারে সে দিন কাটাচ্ছে এই কল্পনাতেও তার বিবমিষা হত।

সেইজন্য তার এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়াই হল না। তাই নিয়ে সাগরিকার অবশ্য কোনো আপসোসও নেই। শুধু মাঝে মাঝে এইরকম দিনগুলোতে—যখন ওরা আসে... যখন মার রোগপাণ্ডুর মুখে ওইরকম আশ্চর্য একটা হাসি দেখা যায়...

শ্যামল—সাগরিকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে ডাক দেয়। ঠেলাওলাদের মূর্খতার দায় গিয়ে পড়ে শ্যামলের ওপর।

শ্যামল তড়িৎগতিতে যথাকর্তব্য সমাধা করে ফিরে আসে অফিসঘরে। সাগরিকার অন্তরের প্রদাহ তখনও শান্ত হয়নি। শ্যামলকে খানিক কর্কশভাবেই বলে, এ কী এই হিসেবগুলো এখনও খাতায় তোলনি? ডেকোরেটার, ফুলওলা এদের ভাউচারগুলো কোথায়?

শ্যামল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে সাগরিকার সমস্ত নির্দেশ। ধীরে ধীরে সাগরিকার গণ্ডদেশ থেকে বাড়তি রক্তাভা মুছে গিয়ে মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক রং ফিরে আসে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হিসেবের কাগজে মন দেওয়ায় চোয়ালে কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

অবাঞ্ছিত অতিথিদের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়ে সাগরিকা ধীরে ধীরে ডুবে যায় নিজের কাজের জগতে।

॥ তিন ॥

মধ্যাহ্নভোজনের পর ঝুম বই নিয়ে চলে গিয়েছে অন্য ঘরে। টিটো গুরুভোজনের ফলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। সাগরিকা মালবিকা মার খাটের দুধারে বসে সাধারণ কথাবার্তা বলছে। কমলা খাওয়া সেরে এলেই সাগরিকা নিজের ঘরে চলে যাবে।

শ্যামল ঘরে ঢুকে সাগরিকার হাতে এক তাড়া নোট দিয়ে বলল—এখানে বিশ আছে। দশ রেখেছি। পেমেন্ট করে বাকিটা দিয়ে যাব।

সাগরিকা অবহেলায় টাকার গোছাটা পাশের তেপায়া টেবিলের ওপর রেখে বলল, ঠিক আছে। কাল ফার্স্ট আওয়ারেই ব্যাঙ্কে যাবে। আমি সব রেডি করে রাখব।

মালবিকা একদৃষ্টিতে টাকার বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বাড়িটা থেকে এত টাকা সারি রোজগার করে? সারিও তাকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে সে বলল, রোজই কিছু না কিছু লেগে থাকে—নারে? আগে তো এত তাড়া হত না?

—না। এদিকে পুরনো বাড়ি ভেঙে অনবরত মাল্টিস্টোরিড হচ্ছে। বেশিরভাগ ননবেঙ্গলি। টাকাও যেমন শখও তেমন। অবশ্য ওদের মনের মতন ব্যবস্থা করে দেবার জন্য খরচও করতে হবে ভালোরকম।

—খরচ খুব বেশি বলে মনে তো হয় না। প্রায় পুরোটাই লাভ, তাই না?

মালবিকা না চাইলেও গলাটা কেমন যেন হয়ে গেল। সাগরিকা একথার উত্তর দিল না। অনাবশ্যক বোধ করলে সহজেই যে-কোনো প্রশ্ন অবহেলা করার মতো ক্ষমতা তার আছে। সাগরিকার অগ্রাহ্য করার ধরনের সঙ্গে মালবিকার পরিচয় থাকলেও আজ হঠাৎ সে যেন নতুন করে অপমানিত বোধ করল। মনে হল হাতে এক গোছা নোট ধরে আছে বলেই সারি যেন ওপর থেকে তার দিকে তাকাচ্ছে, যেন ইচ্ছে করে তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিচ্ছে না। এই টাকাতে তারও ভাগ আছে। সে দাবি করছে না বলে সারিরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সম্ভবত সারির কৃতজ্ঞতা উদ্রেকের জন্যই মালবিকা আচমকা বলে বসে, আমি ভাবছি আমিও এখানে কিছু একটা শুরু করব—

সাগরিকার মুখে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। যেন এই কথাটা সে আগে অনেকবার শুনেছে। খুব ঠাণ্ডাভাবেই জিজ্ঞেস করল, কী করবি ভেবেছিস কিছু?

—এখনও ঠিক করিনি।

সাগরিকা টাকার গোছা হাতে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল এবং সম্ভবত টাকার গরমেই বেশ ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলল, খুব ভালো করে ভাব। ব্যাপারটা যথেষ্ট লাভজনক হওয়া চাই।

বিয়ে না করে বিয়ের জন্য রাখা টাকা ইনভেস্ট করে বাড়ি থেকে আজ যা রোজগার হচ্ছে তার অন্তত দ্বিগুণ হওয়া চাই। যাতে আমি আমার টাকাটা সুদসুদ্ধ ফেরত পেতে পারি।

মালবিকাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে গা থেকে টোকা দিয়ে পোকা ঝেড়ে ফেলার মতো তুচ্ছ করে সাগরিকা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ক্ষোভে হতাশায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিল মালবিকা। চোখ ফেটে জল আসছিল তার। এত অপমান, এত অসহ্য অবহেলা সে কাকে বোঝাবে? রথীন যদি একটু মাথা ঘামাত তাহলে কী বার করতে পারত না কোনো লাভজনক পন্থা, যাতে সারির অহঙ্কার পূর্ণ হয়?

কিন্তু বৃথা। তার নিজের লোকেরাই তার শত্রু। তোর জ্বালা ক্ষোভ কোনোদিন সে তার কাছের লোকেদের বোঝাতে পারেনি, পারবেও না। বরং মার দেওয়া দামি উপহার দেখে মালবিকার আদায় করবার ক্ষমতা নিয়ে বাবা এবং ছেলেমেয়ে হাসিঠাট্টাই করেছে। ওরা বুঝতেই চায় না দু-একটা দামি উপহার মালবিকার প্রাপ্যের কণামাত্রও নয়। তার বঞ্চনার পরিমাণটা বুঝবার মতো ক্ষমতাই ওদের নেই।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন মালবিকার দমবন্ধ হয়ে আসে। কমলাদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কী যেন বলছে। মালবিকার কোনো কথা কানে যাচ্ছে না। সে ছটফট করে উঠে দাঁড়াল। কী করলে যে তার ভালো লাগবে বুঝতে পারছে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকাল সমস্ত বাড়িটার দিকে। একটা লোক সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ রাখা বড়ো ঘড়িটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। লোকটার ঘষাঘষিতে কাঠের বিস্তৃত ফ্রেমের ওপর সোনালি ঝলক ফুটে উঠছে। জ্ঞান হওয়া থেকে এই ঘড়িটা দেখছে সে, অবাক হয়ে ভাবল ওটার মধ্যে যে পেতলের কারুকার্য ছিল তা তো জানাই ছিল না।

গাড়ি বারান্দার নীচে বসে জটলা করছে দারোয়ান চাকর এবং আরও কারা। বোধহয় ডেকরেটরের লোক—মালবিকা সবাইকে ভালোমতো চেনেও না। তার বিয়ের আগে শুধু বংশীদা ছিল। কালেভদ্রে গাড়ি নিয়ে বেরনো হত। বংশীদাই একধারে বাজার করা থেকে শুরু করে সব সামাল দিত। যামিনীদা রান্না করে দিয়ে অফিস চলে যেত। একটা ঠিকে ঝি একবেলা কোনো রকমে দোতলাটা ঝাড় দিয়ে মুয়ে যেত। একতলাটা অমনিই পড়ে থাকত—অরক্ষিত, নোংরা। পাড়ার ছোটো ছেলেরা আগাছা ভর্তি বাগানে খেলা করত। কেউ কোনোদিন বারণ করেনি। মালবিকার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন বাড়িটা এইরকমই ছিল।

তারপরে কবে কী মন্ত্রবলে সারি ধীরে ধীরে এইরকম শক্তপোক্ত একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলল কে জানে। চারিদিকে তার বশংবদ লোকজন। সে অন্নদাতা। এর মধ্যে কোথায় মালবিকা দাঁত ফোটাবে?

সমস্ত গলা বুক জ্বালা করে মালবিকার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠে। এই বাড়িতে সারির মতো সে-ও সম্রাজ্ঞীর ঠাটঠমক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত। ইচ্ছে মেটাবার পর্যাপ্ত ক্ষমতা, অনুগত লোকজন—তার বদলে কী সে পেয়েছে? উচ্চাশারহিত উদাসীন স্বামী—অবাধ্য সন্তান।

মালবিকার মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে থাকে। দুপুরের গুরুভোজন হঠাৎ প্রবল উদগারের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। দৌড়ে মার ঘরের লাগোয়া বাথরুমের বেসিনে উপুড় হতে হতেই বুঝতে পারল হাত-পা অবশ হয়ে চৈতন্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কমলাদি গলা মস্তিষ্কে ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি তোলে।

চোখ খুলে প্রথমেই রথীনের উদ্বিগ্ন মুখটা চোখে পড়ল। পায়ের কাছে টিটোও বসে আছে। হাতে সর্বক্ষণের সঙ্গী গিটারটা নেই। ঝুম মাথার কাছে। ঘরে আলো জ্বলছে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছে নাকি মালবিকা? সামান্য দুর্বল বোধ করলেও শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। লজ্জিত হয়ে সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই ঝুম বলে, মা আর একটু শুয়ে থাকো, উঠো না।

অপ্রস্তুত হাসি হাসে মালবিকা, নারে। এখন ভালোই লাগছে। হঠাৎ কী যে হল?

বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার একটা বড়ো গর্তে গাড়িটা জোরে ঝাঁকুনি খেতেই রথীন মালবিকার ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যতটা সম্ভব আরাম দেবার চেষ্টা করে। ঝুম এবং টিটোও অন্য দিনের মতো হল্লা না করে চুপচাপ বসে আছে। ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে রথীনের শরীরের ওমের মধ্যে মালবিকা আস্তে আস্তে নিজের নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দুটা খুঁজে পায়। একটা চোরা অপরাধবোধের স্রোত তার মনের আনচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সেটা চাপা দিতেই মনের মধ্যে তীব্র করে তোলে বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম। স্বামীর হাতটা নিজের করতল দিয়ে চেপে ধরে। রথীন মুখে কিছু না বললেও তার স্পর্শের মধ্যে উদ্বেগ ও মমতা মাখামাখি হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে ওদের দলটাকে নেমে যেতে দেখেছিল সাগরিকা। ঝুম টিটো রথীনদা যেভাবে দিদিকে ঘিরে ধরে নামছিল যেন মহামূল্যবান সামগ্রী। ভাগ্যিস দুপুরবেলা শ্যামল এসে টাকার বান্ডিলটা দেবার সময় ওরা দিদির দৃষ্টিটা দেখেনি। লোভী ভিখিরিরও অধম।

সেইজন্যই সাগরিকার বেশির ভাগ লোককেই এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এত সাধারণ এত তুচ্ছ এরা। এত অল্পে তুষ্ট— জানেই না কাকে কতটা মূল্য দিতে হয়।

সাগরিকার মাথা থেকে একটা তরল আগুনের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে শরীরে কোষে কোষে। ঘাড়ের পিছনটা দপদপ করে ওঠে। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ভারী কাঠের আলমারিটা খোলে. থরেথরে সাজানো দামি শাড়ি, তাদের অপূর্ব নকশা এবং অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে সু[illegible] মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সারা ভারতবর্ষের বাছাই করা ঐতিহ্যমণ্ডিত সঞ্চয়। সাগরিকা কোনোটা বার করল, কোনোটা বুকের ওপর মেলে ধরল, কোনোটা শুধুই নাড়াচাড়া করে রেখে দিল—যেন মনস্থির করতে পারছে না এই মুহূর্তে কোন্‌টা আপন।

শাড়িগুলো রেখে দিয়ে আলমারির গহন কোণে কাঠের লুকনো পাটার তলা থেকে টেনে বার করল গয়নার বাক্স। উজ্জ্বল পাথরের বিভায় চোখের জ্বালা জ্বালা ভাবটা খানিকটা কমে গেল। বিজলি বাতির হলদে দ্যুতির সঙ্গে স্বর্ণের ছটা মিলে এক অপরূপ অলৌকিক বিভ্রমের সৃষ্টি হল।

ধীরে ধীরে সাগরিকার দৃষ্টি নরম হয়ে আসে। ঘাড় গলার উত্তাপ স্বাভাবিক হয়। একটি একটি করে মহামূল্যবান অলঙ্কারগুলি বিছানার ওপরে নামিয়ে সযত্নে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখে সারি। পরম মমতায় কোনোটার জট ছাড়ায়। কোনোটা শাড়ির আঁচল দিয়ে আলতো করে ঘষে দেয়। যেন আদর করছে পরম প্রেমাস্পদকে। শতাধিক বছরের প্রাচীন অট্টালিকার নির্জন প্রকোষ্ঠে এক নিঃসঙ্গ মানবী তার নিজের রচনা করা অলৌকিক মায়াময় জগৎ থেকে বিন্দু বিন্দু সুখ খুঁজে নিতে থাকে।

ঠিক সেই সময়ে রথীনের কাঁধের ওপর মাথা রেখে পরম নির্ভরতায় চোখ বোজে মালবিকা।

মাফলারে ঢাকা

চিত্রালী ভট্টাচার্য

পাঁচ তীরন্দাজ কিন্তু একটিই মাত্র মৎস্য, থুড়ি মৎস্য নয়, মৎস্যকন্যা। সদ্য সরোবর থেকে উঠে এসে বসেছে যাদরপুর কফিহাউসে। ওকে ঘিরে সকলে। সকলে মানে ওরা পাঁচ আর আমি এক। এক বলতে যা বোঝায় সে স্বাতন্ত্র্য অবশ্য আমার নেই। আমি একম্ অদ্বিতীয়ম্ নই বরং ফাউ বললে আমার অবস্থানটা ঠিক বোঝা যায়। সাতাশ পেরোনো উদ্‌ভ্রান্ত এক যুবক। থাকার মধ্যে আছে সস্তা পাঞ্জাবীর তলায় এক দুস্প্রাপ্য রোমান্টিক হৃদয়। ওদিকে জিন্সের চার চারটে পকেট যেন খরাক্রান্ত কোনো মাঠ। কোনোদিনও পর্যাপ্ত বৃষ্টি পড়েনি সে পকেটে। শুধুই কুয়াশা। এই কুয়াশার কথা টের পাওয়া যায় খুব সহজেই, কারণ কোনো কন্যার আবদার রাখতে ফুচকাওয়ালার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ালেই পকেট থেকে নির্গত বাষ্প ক্লোরিনের গন্ধ পাওয়া যায়। অতএব খুচরো মেলামেশার পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপারে আর যাওয়া হয় না, শুধু গন্ধ শুঁকেই কাটিয়ে দিতে হয়। বাড়ানো হাতে শালপাতার ওপর তীব্র তেঁতুলের জল টলটল করে। বাহারি ফুচকা সব অন্যদের জন্য। আমি ওদের টাইম পাস। প্রেমাহত, বিরহী, সাময়িক অভিমানীদের একমাত্র সম্বল। আগে আহত হলাম, আজকাল অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বরং বেশ লাগে। কত কন্যে, কতরকম তাদের হাবভাব। কেউ যৌনগন্ধী তো কেউ স্পর্শময়ী, কেউ প্রেমাক্রান্ত আবার কেউ বা সম্পূর্ণ গদ্যছন্দী। কেটে যায় রক্তপাতহীন, আমার দিন।

মাঝে মাঝে অবশ্য বন্ধুদের ঠাট্টা চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে কালি মাখায়। বাড়ি ফিরে ধুয়ে ফেলি স্বপ্নে। কোনোদিন স্বপ্নে মৌসুমি এসে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে, তো কোনোদিন পত্রালী। শরীরে শরীর, দাবানল জ্বলে ওঠে সাতাশের শৈত্যে। ঠিকঠাক পাশবালিশও পাই না সে দাবানল চাপা দেওয়ার। চিলেকোঠা থেকে ছুটে আসি ছাদে। বাতাসের গতি দেখে মুখ রাখি আল্‌সেতে। রাতকে বলি একজোড়া কোমল হাত পাঠাও আমার জন্য! একটা স্থায়ী আশ্রয়! রাত শুধু অন্ধকার ছুঁড়ে দেয় মুখের ওপর। শরীর শান্ত হলে ফিরে আসি ঘরে। আবার সকাল হতেই চলে যাই ব্যর্থতা কুড়তে। এর মধ্যে পাওনা-গণ্ডা বলতে ডি. টি. পি. করে কিছু টাকা। এই আমার শীর্ণ এবং লড়াকু বায়োডাটা। তাই ইদানিং আমি ফাউ হিসাবেই ভাবতে চেষ্টা করি নিজেকে। যাক্ গে আমার কথা। আজ বরং মৎস্যকন্যার কথাই হোক্। তো সেই মৎস্যকন্যার শরীর জুড়ে অচেনা সুবাস। মৃদু মৃদু মিষ্টি স্বপ্নের মতো। মন পাগল করা। সরোবরের পদ্মের মতো। মৎস্যকন্যা কীভাবে ধরে রাখে এই সুবাস! দুর্লভ এক কস্তুরীর মতো ও যেন নিজের গন্ধে নিজেই মাতোয়ারা। ও কি জানে ওর কস্তুরীর কথা? মনে হয় জানে না কারণ জানলে ওর আচরণই বদলে যেত। মাটিতে পা পড়ত না তখন। হংসীর মতো উড়ে যেত। তবে ও না জানলেও তীরন্দাজরা জানে। তাই ওরা জ্যা টেনে

আমূল বিদ্ধ করতে উঠে পড়ে লাগে। একটা তীর, শুধুমাত্র একটা তীর যদি মৎস্যকন্যার বাঁ দিকের পাঁজর ভেদ করে ঢুকে যায় গভীরে তাহলেই রাজ্য আর রাজকন্যা দুইই নাগালে। বাম্পার ড্র। এ সুযোগ কেউ ছাড়ে?

—কার রাতে এস. এম. এস করে যা জানতে চেয়েছিলাম তার উত্তর দিলি নাতো? প্রথম তীরন্দাজের চোখে প্রশ্ন। আসলে ও পরখ করতে চাইছে তীরটা ঠিক জায়গায় লেগেছে কিনা।

—দেবো। অতো ব্যস্ত হচ্চিস কেন বলত? মৎস্যকন্যার সংক্ষিপ্ত উত্তর। অতএব প্রথমজনের প্রশ্ন ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে থাকল অনির্দিষ্টকালের জন্য।

দ্বিতীয়জন আবার অন্য ভূমিকায়। একটু যেন নেগেটিভ ঘেঁষা। বলল—তোদের (মেয়েদের) জানা আছে, যার পকেট ভারী তার দিকেই তো ঝুঁকবি তোরা। আমি তাই তোদের তেমন পাত্তা দিই না। মিশতে হয় মিশি।

আড়াল। ভয়ঙ্কর একটা আড়াল। আমি বুঝতে পারি ওর আর্তনাদ ও ঢাকতে চাইছে পাথরের আড়ালে। বুঝছে না ওর নিজের কণ্ঠস্বর ওই পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো প্রার্থনা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

মৎস্যকন্যা আলতো হাত রাখে ওর পিঠে। আর অমনি নেগেটিভ নায়কের চোখের মণিতে চমকেওছে এক কাঙাল। মৎস্যকন্যা যেন জানে ওর আসল কথাটা এমনভাবে তাকিয়ে মৃদু হাসে। এদিকে ওদের কথোপকথনের থেকে বহুদূর আমি একমনে সিগারেটে টান দিই, ব্ল্যাক-কফিতে চিনির শেষ বিন্দুটুকু গুলে চুমুক দিতে দিতে ভাবি ভাগ্যিস আমার কোনো সংস্থান নেই। এর চেয়ে আমার চিলেকাঠার স্বপ্ন ঢের ভালো। আমরা নিরাপদ এবং নিভৃত যাপন। আমার দমবন্ধ জীবনের একমাত্র এবং চিরস্থায়ী ভরসা। কোনো প্রতারণা নেই, প্রত্যাখ্যান নেই। মাঝে মাঝে সে আসে, স্নিগ্ধ হাত রাখে কপালে, বুকে। আমিও বালিশে মুখ গুঁজে, খুঁজে পাই স্পর্শবিন্দু।

॥ খ ॥

একটা আরশোলা কুচকাওয়াজ করতে করতে হেঁটে গেল বুকের ওপর দিয়ে। আমি বিপর্যস্ত, পড়ে আছি বিছানায়। নাঃ, কোনো নেশা-ফেশা নয়, এমনি। নেশা করার জন্যও হেভস্ হতে হয়। মার্কস, লেনিন যাই বলুন, সর্বহারারা এখনও মালিকদের দয়ার ওপরই নির্ভরশীল, আর আমি বড়োলোক বন্ধুদের। ওরা মাঝে মাঝে দু-চার পেগ খাওয়ায়, খাই। প্রায়ই লুকিয়ে চুরিয়ে আরও দু-এক পেগ। নিজের রেস্ত খরচা হচ্ছে না ভেবে স্বস্তিতে নেশা আরও জমে ওঠে। কানদুটো গরম হয়, মাথার স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঝিন্‌ঝিন্। চাকরি -ফাকরি সব তুচ্ছ মনে হয়—এই একটা সময়। অন্যান্য সময় তো ব্যর্থতার মেগা সিরিয়াল। তবে কদিন আগে একটা টিউশনি জুটেছে কম্প্যুটার শেখানোর। পয়সাওয়ালা ভদ্রলোকের ডেঁপো ছেলে। ক্লাস সেভেন। মওকা বুঝে হাজার টাকা দাঁও মেরেছি। দেখি রাজি। পরে বন্ধুমহলে সে কী হাসাহাসি। ঘাড়ে রদ্দা মেরে রকি বলেছিল—ঠিকঠাক রোজগার করতেও শিখিসনি। একটা সফট্ওয়ার কোম্পানির প্রোজেক্ট ম্যানেজার মাসে কত পায় জানিস? তোর বাবা রিটায়ার করার সময় সরকার সাকুল্যে যা টাকা দিয়েছিল ওদের এক মাসের মাইনে তারচে বেশি। প্রথমটায় ঠকে গেলাম ভেবে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল কিন্তু মাস ফুরোতেই টাকাটা হাতে পেয়ে বুঝলাম ওই একহাজার আমার কাছে দশহাজারের সমান। বন্ধুরা বোঝে না। যে যার চাহিদা মতন টাকা পেলেই তো হল। ওদের চাহিদা বেশি তাই জোগানও বেশি, আমার চাহিদা কম জোগানও কম। টাকাটা হাতে পেয়েই দাদাকে আমার খাইখরচা বাবদ পাঁচশো টাকা দিতেই একটা শরতের হাসি উপহার পেলাম। বউদিও না চাইতেই চা নিয়ে হাজির।

—চাকরি জুটল বুঝি? দাদার চোখে আলো।

—নাহ্, হাজার টাকার একটা টিউশনি। আলো অমনি লো-ভোল্টেজ। দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দাদা বলল—লেগে থাক, দেখবি একটা ভালো কিছু জুটে যাবে একদিন।

একদিন, সেই সাংঘাতিক একটা দিন থেকে কত কিছু যে অন্যরকম হয়ে যাবে আমার জীবনে কে জানে।

সেই রাতে মৎস্যকন্যা এসেছিল স্বপ্নে, চিলেকোঠা একেবারে ম-ম।

—কি মেখেছ? স্বদেশি না বিদেশি?

—কোথায়? আমি কিছু মাখি নাতো?

—তবে ওই গন্ধটা? ওঃ পাগল করা একটা সুবাস। নেশা ধরে যায়। স্থির থাকতে দেয় না আমাকে।

মুখের ওপর ঝুঁকে পরে ওর মুখ। ঠোঁটের এক সেন্টিমিটার দূরে ওর নরম ঠোঁট। একটা ব্যথা মাথা থেকে উঠে সোজা হৃদপিণ্ডে গিয়ে গেঁথে যাচ্ছিল, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে বলি—তুমি আর এসো না।

—কেন? মৎস্যকন্যার চোখে অভিমান।

—আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার লোভ সামলাতে পারি না।

—বামন কেন হবে? তুমি পাঁচ এগারো। রীতিমতো হ্যান্ডসাম।

আমি ওকে আমার কথা বুঝিয়ে উঠতে পারি না। আমি বলতে পারি না কতগুলো আয়তকার কাগজের নোটের অভাব গত কয়েকবছর ধরে আমায় হাত-পা বেঁধে একটা হাঁড়ির মধ্যে পুরে রেখেছে। সেখানে আমার পাঁচ-এগারো শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে, তালপাকিয়ে কোনোমতে শুধু হীনমন্যতা খেয়ে বেঁচে আছে। এভাবে বেঁচে থাকা যায়! আমাদের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জন্য কোথাও কোনো উপায় সংরক্ষিত নেই। আমরা জন্মাই শুধু ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য। এই সাতাশ বছরেই আমার মধ্যে মৃত্যু চেতনা কাজ শুরু করেছে। ক্রমাগত একটা ভয় আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। গত একবছর নিজের দাঁড়িটুকু পর্যন্ত নিজে কামাই না, পাছে ব্লেডে হাত দিলে আত্মহত্যায় প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বলিনি। এসব কোনো কথা বলতে পারিনি ওকে। স্বপ্নেও না। শুধু মনে মনে কাঙালের মতো কামনা করেছি—এসো, কাছে এসো। চিলেকোঠা আলো করে আমায় আশ্রয় দাও। আবার পাছে এই কাঙালপনা কথায় প্রকাশ পায় তাই মুখ গুঁজে রাখি বালিশে। ভালোবাসার জন্য হাত বাড়াতে গেলেই যে প্রথম টিউশনির কথা মনে পড়ে যায়।

মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, সামনে ঋতু। ক্লাস টুয়েলভ্। টেবিলের ওপর খোলা ম্যাগরাহিলস্, জয়েন্টের অঙ্ক। তবু বারবার আমার তেইশ বছর, বই টপকে, ঋতুর কাছে বসন্তের খবর জানার জন্য ছট্‌ফট্ করছিল। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টায় অঙ্ক সলভ্ করে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই। প্রায় বছর তিনেক হল ওকে পড়াচ্ছি। মাধ্যমিকে অঙ্কের নম্বর দেখে ওর বাবা তো অবাক। সব কৃতিত্ব নাকি আমার। যদিও জানি ঋতুর মেধা কিছু কম ছিল না, যা কম ছিল তা গাইডেন্স। তবু সেই থেকে ওদের বাড়িতে আমার জামাই আদর। সেই আস্কারাতেই কিনা জানি না এই নিধিরামের হঠাৎ সর্দার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়েছিল। ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই 'ইয়ালগার হো' বলে ঝাঁপ দিতে চাইছিল মন। ঠিক সেইসময় ঋতু আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ নাকি? তাহলে আজ না হয়—

ব্যস, ওর মুখে অমন প্রশ্রয়ের 'তুমি' শুনে আমার লাগাম-টাগাম ছিটকে ছত্তিরিশ। ন্যাকা প্রেমিকের মতো হঠাৎ ওর হাতের ওপর হাতটা রেখে বলেছিলাম—মনটা আজ আমার ঠিক বশে নেই ঋতু, আজ না হয়...

আমাকে পুরো বাক্যটা শেষ করতে দেয়নি ঋতু। তীরের মতো আমার হাতের তলা থেকে

ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল ওর হাত। চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে ঋতু তীক্ষ্ণভাবে বলেছিল—ছিঃ সৌরভদা! তোমাকে আমি অন্যরকম...

—কী অন্যরকম? কেন আমি সবসময় অন্যরকম হয়ে থাকব? আমিও একটা মানুষ! টাকাপয়সা কম থাকলে একটা মানুষের ইমোশনও তো কমে যায় না। কিন্তু সেইদিনও আমি ঋতুকে এসব কথা বলতে পারিনি। কোনোমতে চেয়ার থেকে শরীরটাকে তুলে পালিয়ে এসেছিলাম ওদের বাড়ি থেকে। আর আমার পেছন পেছন তাড়া করে এসেছিল একটা তীব্র দৃষ্টি আর হাজারটা ছিঃ। চিলেকোঠায় সে রাতে ঘুম এসে কোনো সান্ত্বনা দেয়নি আমাকে বরং সারারাত শাসন করতে করতে সময় বলেছিল—যোগ্য হও। ভালোবাসার যোগ্য হয়ে ওঠো। তারপর থেকে শুধু যোগ্য হয়ে ওঠার লড়াই চলছে। যদিও ভালোবাসতে গেলে কেন যে হৃদয় আর সরীর ছেড়ে টাকার যোগ্যতা বারবার প্রমাণ করতে হয় এ ফ্যালাসি এখনও আমার মাথায় ঢোকেনি। পাঁচ-এগারো, হৃদয়ে প্রেম, শরীরে দুরন্ত যৌবন অথচ রোজগার সামান্য এ বায়োডাটা একদম অচল। বরং প্রেমে আস্থা না রাখা যুবক, পরিমাণ যত নেশাড়ু, অফুরন্ত অবিশ্বাসী, টাকা রোজগারের মেশিন অনেক বেশি আকর্ষক। প্রেমের বাজারে ওদের কাজ একদম বাঁধা। আমরা শুধু আইটেম নাম্বার। এসো, নাচো, চলে যাও। তোমরা শুধু উত্তেজনা ছড়াও।

॥ গ ॥

রবীন্দ্র সরোবরে মেট্রোরেল থেকে নেমে পা রাখলাম এস্‌কালেটারে। আমি আর আমার মৎসকন্যা। না, স্বপ্নে নয়, জলজ্যান্ত বাস্তবে। পাশাপাশি ও আর আমি। উষ্ণ স্পর্শময় বাতাবরণ। রকির বাড়ি থেকে মুনলাইট গশিপ সেরে ফিরছি শেষ ট্রেনে। ওর বাড়ি লেক গার্ডেন্স, আমি যাদবপুর। মিতভাষিণী চুপচাপ। আমিই কথা বলছি দু-একটা। ও শুধু উত্তর দিচ্ছে! মনে মনে যদিও অমি অনর্গল বলে যাচ্ছি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে—বলো, অনেক কথা বলো আমার সঙ্গে। আমার অস্থির মন কিছু কথা চাইছে তোমার কাছ থেকে। সেই যে কলেজ জীবনে আমি আমার দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়েছি নিজের হাতে, তারপর থেকে কেউ এসে খুলে দেয়নি। সেই থেকে বন্ধ হয়ে আছি নিজেরই ভেতরে।

—কটা বাজে এখন? মৎস্যকন্যার ছোট্ট জিজ্ঞাসা।

—দশটা।

—চলো, আজ লেক গার্ডেন্স পর্যন্ত হাঁটি। রাজি?

—বেশ, চলো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন ভেবে ভগবানের উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে তাকালাম। অল্প অল্প হিম বাতাসে ভাসতে ভাসতে নীচে নেমে আসছে। আমি মাফলারটা গলায় জড়িয়ে নিলাম ভালো করে। আনোয়ার শাহ্ রোডের মসজিদ পেরিয়ে গেলাম দুজনে। নবীনা আসছে। আর তো মাত্র কিছুটা সময়। কিছুই বলা হল না তো! মৎস্যকন্যার বোধহয় কিছুই বলার নেই আমাকে। আমিই শুধু শুধু...হঠাৎ কিসের একটা স্পর্শে চমকে তাকিয়ে দেখি মৎস্যকন্যার ডানহাতের আঙুলগুলো আমার বাঁ হাতের গুলোকে পেঁচিয়ে ধরেছে। নরম কোনো বিদ্যুৎবাহী তারে যেন জড়িয়ে গেছে আমার হাত। ঝন্‌ঝন্ করছে। একটা অদ্ভুত তরঙ্গ সারা শরীরে ছোটাছুটি করতে করতে ফেটে পড়ছে হৃদপিণ্ডে। মাফলারেও প্রবল টান, মাথা ঝুঁকে আসছে নীচে। বড়ো রাস্তা পেরিয়ে গলির মুখটার অন্ধকারে গাল স্পর্শ করেছে একটা স্বপ্নে চেনা ঠোঁট। উঃ, চলার শক্তি আর নেই। গলির অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি পাথরের মতো। কলেজের দিনগুলোতে বাড়িয়ে দেওয়া সেই হাত আজ ভরে উঠছে উপহারে। কিন্তু আমি তো ওকে বলিনি যে আজ দুপুরের ডাকে আমার মতো অপদার্থের নামে একটা ছাড়পত্র এসেছে। বলিনি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির শরীরে আট হাজারের

একটা ছোটো নেমপ্লেট সেঁটে গেছে। কাউকে জানাইনি। তবে কী আমার মন এই ঘটনাটার জন্য অপেক্ষা করছিল! কিন্তু তাই বা বলি কী করে? মৎস্যকন্যা আমার মতো একজনকে? কিছুতেই ক্যালকুলেশন মেলাতে পারছিলাম না। নিজেকে বারবার প্রবোধ দিচ্ছিলাম—নিশ্চয়ই এটা ওর মুহূর্তের আবেগ। এ ঘোর থাকবে না বেশিক্ষণ। কেটে যাবে। নিশ্চয়ই কেটে যাবে। তা বলে ঋতুর মতো আমি ওকে তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিনি। ওর হাতের থেকে আমার হাতটা মুক্ত করে বলতে পারিনি ছিঃ, তোমাকে আমি অন্যরকম...

আসলে কেউই অন্যরকম হয় না ঋতু। তুমি আমাকে অন্যরকম বলে দূরে সরিয়ে দিলেও অনিরুদ্ধকে পারোনি। ও তোমাকে খাট, বিছানা, ড্রেসিংটেবিল, নগদ সমেত তুলে নিয়ে গিয়ে ওর দশ বাই এগারো ঘরে সেট করে ফেলেছে। খাওয়াচ্ছে-দাওয়াচ্ছে, নানাভাবে ভালো রাখতে চাইছে তোমাকে আর বিনিময়ে তাইই চাইছে যা একদিন আমি চেয়েছিলাম—স্পর্শ, অসহায় বেদনার্ত মুহূর্তগুলোকে পাশাপাশি থাকা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে জেনে নেওয়া ক্ষতস্থানগুলো। অথবা প্রবল আবেগে যখন ভেতরের লকগেটগুলো ভেঙে যেতে চায়, সে চাপ দুজনে মিলে ভাগ করে নেওয়া। এরই ভালো নাম সম্পর্ক অথচ যা ক্রমাগত আমাদেরই ত্রুটিতে ক্লিশে হতে হতে সমঝোতা নামে বেঁচে আছে অনেকের মধ্যে। হয়তো তোমার অনিরুদ্ধর মধ্যেও। তাই আজ এই মুহূর্তে, গলির অন্ধকারে আমার আর মৎস্যকন্যার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠল, তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক, তাকে তুমি ছোটো করে দেখো না ঋতু। ভেবে দেখতে গেলে হয়তো এগুলোই এখন সত্যি। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বলে হয়তো আর কিছু নেই পৃথিবীতে। ক্রমাগত গতির মধ্যে, চাপের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে এত বেশি থাকতে হচ্ছে আমাদের যে সম্পর্কগুলোও টুকরো টুকরো হতে বাধ্য হচ্ছে। চরিত্রে বা আকারে অন্যরকম হলেও এগুলোও সেই অখণ্ড রূপকথারই অংশ।

ঠং করে শব্দ হতেই সংবিত ফিরে আসে। ঋতুর ভাবনা থেকে মুখ তুলে দেখি মৎস্যকন্যা গেট খুলে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ফিরে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে মৃদু হেসে বলি—আজ আসি। মনে মনে বলি—কেউ জানবে না, মাফলারে ঢাকা থাকবে।

যামিনীর জপতপ

তৃপ্তি সান্ত্রা

বাক্স বাড়িতে তিনমাসেই দম বন্ধ হয়ে গেছে। যামিনী চাইলেন বাড়ির সমস্ত ছাদ টিনের চাল হয়ে যাক। তবে কত কত শব্দ হবে। বেড়ালের ঝগড়া। সুপুরি গাছ থেকে টুপ্ টুপ্ ফল পড়া। বৃষ্টি হলে ঝমঝমে নাচ। রোদের শব্দ নেই কোনো। যামিনী তবু ভাবেন, রোদ যদি খড়মে শব্দ তুলে সারা ছাদ হাঁটে তবে বেশ হয়।

কাজের মেয়ে বাসন্তী টিভি খুলে বসেছে। পর্দায় অবিরাম শব্দ ও ছবি ভাসে। সদ্য কাটানো চোখে বেশি টিভি দেখা বারণ বলে নয়, টিভি দেখতে ভালোইবাসেন না তিনি। অত অত হাত পা নাড়া মানুষ দেখলে কী হবে, কারো কোনো বাস নেই। ঘ্রাণ নেই। রোগা, চিকন, কাঁঠালপোতা, ছাতিমফুল, পেঁজরসুন, ঘি, আতপ, ঝালনুন টকে যাওয়া কোনো গন্ধই বেরোয় না কারো গা থেকে। দরজায় শব্দ হয়। ভাবেন ঝন্টুর মা পুষ্প এল। অঞ্জু এল, রেবেকা কী তরিকুল এল। গড়গড়ে রেলগাড়ির মতো কথা বলে অঞ্জু, সবাই খেপায়। তার বেশ লাগে—ঝমঝম করে নেচে ওঠে বাতাস। হলুদ পর্দা দোলে। যামিনী ভাবেন অঞ্জু। হাঁক পাড়েন, অঞ্জু এলি?

বাসন্তী টিভি দেখতে দেখতে জবাব দেয়। কে কোথায় আসবে গো দিদা, দরজা তো বন্ধ। যামিনীর ভুল ভাঙে। এটা তো চেথরুটোলা নয়। শহর। শহর কী, একটা খটমটে পাড়ার নাম। নতুন করে কোনো কিছু আর মনে থাকে না। বাসন্তীর কথাই ঠিক, এখানে হুটহাট কে আসবে, দরজা বন্ধ সব সময়। মন্টু, মন্টুর বউ, মুন্না, পপি সব অফিস কাছারি ইস্কুল। বাসন্তীর ভরসায় তিনি। বাড়িতে যামিনীর বাবার ঘরের কাঠের পেল্লাই এক সিন্দুক ছিল। কী যে ছিল তার মধ্যে, সে এক বিরাট রহস্য। সব সময় বন্ধ থাকত তার মুখ আর সেটা ব্যবহার করা হত চৌকির মতো, টেবিলের মতো। নিয়ম ছিল, ওটা খোলার সময় ছোটোদের কেউ ঘরে থাকবে না। গিরি, ভাদি, টুকু, তিনু, কালো সব্বাই বাইরে যাও। যামিনীকেও থাকতে দিতেন না মা। কোথায় কবে কার বাড়িতে নাকি ছোট্ট মেয়েটি হাপিস—খোঁজ, খোঁজ, কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। অনেক দিন পর সিন্দুক খুলে পাওয়া গিয়েছিল তার কঙ্কাল। মা ভয় পেতেন। যামিনীরও ভয়। দমবন্ধ আটকানো ঘরের ভয়। শহরের এই সব বাড়ি তো বাড়ি নয়, পেল্লাই সিন্দুক। গ্রিল আটকানো বাক্স। এখন ভরদুপুর। এসময় কেউ কারো বাড়ি যায় না। এসময় কেন কোনো সময়ই, এ বাড়ি ও বাড়ির যাতায়াত নাই। খোলামেলা হাওয়া বাতাস নাই, চারিদিক কেমন যেন ঘোলা ঠেকে। ছেলেরা অনেক পয়সা খরচ করে ডাক্তারের কাছে মেশিন দিয়ে চোখ কাটালো বটে কিন্তু সব কিছু বেবাক ফর্সা দেখায় না আগের মতো। কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগে। চোখ কাটানোর তিন মাস বাদে ফের দেখানো—চেকাপ্ না কী যেন বলে, সেই করতে দুই ছেলে মন্টু আর ভৃগুর বাড়ি প্রায় মাসখানেক আটকে আছেন যামিনী। দিন আর যায়

না। এক মাসেই জি ঘেঁটে, দম বেঁধে ঘৃণা লেগে শরীর জেরবার। গ্রামের অবস্থা ভালো নয়। ওলটপালট ভাঙনে ডুবে যায় গ্রামের পর গ্রাম। ছেলেরা চাইছিল, মা শহরে তাদের কাছে থাকুক। তাদের ভিটেটাও যাবে সম্ভবত, তবে এবার নয়। নদী হঠাৎ করেই বাগ্দীটোলার দিকে কাটতে থাকায়, এ বছর ছাড় পেয়ে গেছে। যা শরীরের হাল, দেখে সাহস পেল না তারা। একেবারে মাটিজলের মানুষ, বয়সও হয়েছে। মন্টু গ্রামেই পাঠিয়ে দেয় মাকে।

সে কী গো দিদা—সব বাড়ি খাঁচা দেওয়া জেলখানা, এবাড়ি ওবাড়ি লোক যায় না— আসা যাওয়া নেই। সবাই এমনি শহরে, আমার ভালো লাগে না গো—বহুশিরা বের করা শাখাপ্রশাখা মেলা শীর্ণ হাতখানা তুলে, তালু দিয়ে চোখ ঢেকে যামিনী শহরের লোকেরা কেমন করে থাকে দেখালেন। ঝন্টুর বোন পায়েল, মা পুষ্প এমনকী ফড়িং শরীরের ডিগ্গা খেলা অঞ্জু পাগলিও হেসে উঠল যামিনীর কায়দা দেখে। ঝন্টুর চোখে শহরের স্বপ্ন। গান লেখার স্বপ্ন। শহরের বাড়িঘরও দেখা তার। সে সবজান্তা...বলে—শহরে এরকম খোলামেলা কোথায় পাবা—সক্কলের পাকা বাড়ি, দোতলা। তিনতলা জিনিসপত্রে টিভি ফ্রিজ সোফা আলমারিতে বাড়ি ঠাসা। হুটহাট কে কার বাড়ি যাবে? দরজায় গ্রিল, চাবি।

হাঁ ঠিক বলছিস—উঠান টুঠান নাই, ঝন্টুকে সঙ্গে পেয়ে আরও খানিকটা জোর পান যামিনী। বলেন—কিছু নাই, উঠান, বাগান, খিড়কি। শুধু ঘরের প্যাটে ঘর। বাড়ি থেকে এক পা বেরোও তো রাস্তার তালা খোলো—কারো বাড়িতে ফস্ করে ঢোকার উপায় নাই—সব বাড়িই একরকম—সব সময় বারান্দায় তালা দিয়ে রাখে।

—তালা খোলে কে গো, লোক এলেই তো দরজা খোলা লাগবে, পুষ্প শুধায়।

—লোক কোথায়রে বাবু। বলছি কী—কেউ কারো বাড়ি যায় না। প্রবল অপছন্দে যামিনীর শীর্ণ হাত কাঁপতে থাকে, মাথাও নড়ে ডিগ্‌ডিগ্ করে।

তুমি কী করতা?

—কী আবার। মন্টু, মন্টুর বউ অফিস যায়, মুন্না পপি ইশকুলে। আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকতাম, সারাদিন। বাসন্তী থাকত। ভালোলাগে না ওখানে।

তাই কী লাগে, ইখানে অ্যাত ঘুরাফিরা, ঝন্টুর মা সায় দেয়, এরপর পায়েল কিছু বলে। অঞ্জু বলে। ঝন্টু বলে, কথার পিঠে কথা বসে। এদিক গড়ায় ওদিক গড়ায়। যামিনী জোর পান। অসংখ্য বক্‌বকম্ পায়রা নামা উঠোন দেখেন। বাটিতে গম নিয়ে ছড়িয়ে দেন। টুক টুক করে আঙিনা খোঁটে পায়রা। এখন শুধু এইরকমই ভালো লাগে। পায়ে পায়ে মানুষ। কথা। আর কোথাও না, থাকতে চান এইখানে। এই গাঁয়ে। ভিটেয়। আশেপাশে ছেলেপুলে বউ ঝিয়ের আড্ডায়।

খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই বাঁ দিকে পাকাঘর। দরজার পাশে। সামনে উঠোন। উঠোনের দু-পাশে ডাইনে বাঁয়ে দালান। শরীরটা নরম। তিন ছেলেই চাকরি-বাকরি নিয়ে শহরে। মন্টুটা তো কলকাতায়। আর কোলপোঁছা ছেলে হচ্ছে ট্যাপা। কম বুদ্ধি। মগজ শর্ট। হাত পা-ও আছে। ঘোরে ফেরে। বাঁ দালানে ট্যাপা শোয় হাতুড়ে ডাক্তার নব পরামানিকের সঙ্গে। নব বারো ক্লাস ফেল। ফেল নয়, ইংরিজি ব্যাক। ডাক্তার হলেও সায়ান পড়া বিদ্যে নয়। আর্টস পড়েছে নব। পরামানিক বাপের ফোঁড়া ফাটানো, মালিশ তেল এসবে হাতযশ ছিল। এইচ এসে ব্যাক পেয়ে আবার গলদঘর্ম হয়ে ইংরেজির পেছনে ছোটার চেয়ে, পেটভাতা আর একশোটাকা বেতনে ডিসেন্ট মেডিক্যাল স্টোর্সের কাজ অনেক ভালো। বাপেরও পড়ানোর ক্ষমতা নাই। বড়ো ভাঙন, ছোটো ভাঙন, এ অঞ্চলে কেউ কেউ ষোলোবারও বাড়ি পাল্টেছে। নবর বাপ খেতুর ঘর ভেঙেছে দুবার। জমি, ভিটে সব মা গঙ্গার কোলে। পুব কাটছে, পশ্চিমে জেগে উঠছে চর। পঞ্চানন্দপুরে যার জমি ডুবল, সে জমি পাবে নদীর

ওপারের চরে। সে চর তখন অন্য পুরুষের, অন্য রাজ্যের কব্জায়—তার ঝাড়খণ্ড স্বামী। সে বড়ো বিচিত্র সংসার। চরের বদিরুদ্দিন ১০ টাকা ভাড়া দিয়ে প্রায় ২০ মিনিট উজিয়ে এ পারে আসছে কেরোসিন কিনতে। খেতুরও চরেই ঘর। সেখানে ডাক্তার নাই ইশকুলও নাই। চরের মানুষের জ্বর, প্যাট বেদনা, ঘুষণা ধরা বাপ সামলায়। আর এদিকে বাজার সামলায় নব। যামিনীর বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, সুতরাং রাত্রে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা। প্রেসার মাপার যন্ত্র, ডিব্বাভরা নানা কিসিমের বড়ি, ক্যাপসুল আর সুঁই দেবার বাহাদুরিতে নব রীতিমতো ডাক্তার।

জল মাটিকে ঘিরে ঘিরে কাটছে। নয়াবাজার স্ট্যান্ড থেকে নেমে পাগলা নদীর ওপর বেলী ব্রিজ পেরিয়ে বাজারের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা গেছে ঘাটের দিকে। ঘাটের থেকে সেই বাঁধ ডানদিকে ঘুরে গঙ্গাভবন পেরিয়ে সোজা চলে গেছিল ২০ নং স্পারের দিকে। বাঁধ বরাবর ডানদিকের সব গ্রাম, গঙ্গাভবন সব জলের তলায়। বাঁধের বাঁদিকে যে বাজার, ইশকুল, গ্রাম সে সব কিছুই থাকবে না। ঘাটের খুব কাছেই চেথরুটোলা, যামিনীর বাড়ি। সেটাও থাকবে না। জল ঘুরে কাটছে বলে, এক্ষুনি এটা যাচ্ছে না। তবে যাবে। চারিদিকে বাড়ি ঘর ভেঙে ইঁট, দরজা জানালা খুলে পালিয়ে যাবার তাড়াহুড়ো। ট্রাক, ম্যাটাডোর আর ভ্যান গাড়ি ভর্তি ভাঙা বাড়ি, ইট, শিক, দরজা, জানালার স্তূপ। যামিনী গাড়ি ভর্তি ইঁট, সিমেন্ট, বালু, পাথর আনতে দেখেছেন। সে সব দিয়ে পাকা ঘর হয়। বাঁধ হয়। জঞ্জাল ফেলে, মাটি ফেলে জায়গা ভরাট হয়। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেননি যামিনী। ছক্কুটোলা আর জাহানটোলার মানুষদের অ্যাতো মালপত্র কবে থেকে হল। সারাদিন সার বেঁধে গাড়ির মেলা। এখন তো নতুন করে ঘরও বানাবে না কেউ, তবে? পরে জেনেছেন বাড়িঘর খুলে পালিয়ে যাবার নানা গপ্পো, পাড়া প্রতিবেশী বাজার হাট সমস্ত গ্রাম জুড়ে এইসব ভাঙার আওয়াজ। তার ভালো লাগে না। দুলু, ভৃগু বারবার করে বাড়ি বিক্রির কথা বলছে। মাটি বিক্রি হবে না। হবে শুধু ইঁট, কাঠ।

—মা শহর চল্। একা একা থাকিস। কুন দিন কী হয়।

বাড়ি বেচা বা ভাঙার কথা সোজাসুজি আলোচনা হয় না। তবে সে কথাটি ধিকিধিকি থাকে। একা, একা কী যে বলে সবাই—এখানে এটা টের পান না যামিনী। শহরেই একা। ছেলে, বউ, নাতি এসব নিয়েও একা। এই গাঁ, নদী, নদীর পারের মানুষ এসব ছাড়া বড্ড একা। বোকা। বয়সকালে জমজমাট সংসার করেছেন এখানে। স্বামী শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ি ননদ চার ব্যাটা বাগানখেতি আর হ্যাঁ, নদীও তো প্রতিদিনের সঙ্গি। নদী বেয়ে খেতিজমির মানুষের আনাগোনা, মাছের বাজার, কেউ নিত্য স্নান করেন। কেউ বা পরবে, সংক্রান্তিতে আর গ্রহণে স্নানপর্ব সারেন। মানুষজন একে একে ঝরে পড়েছে। কোল ঘেঁষা ছেলেরা গ্রাম ছেড়ে পেটের ধান্দায় শহরমুখী। বছর তেরোতে বিয়ে হয়েছিল যামিনীর। আগে শ্বশুরঘর ছিল সাবেক পঞ্চানন্দপুরের পলাশগাছিতে। গঙ্গা কাটতে থাকলে এখানে এসে ওঠা তাদের। তাও বছর তিরিশ হয়ে গেল। আর এখন বাড়ির সামনে উঁচু রাস্তার ওপারে তাদের একমাত্র জেগে থাকা বাগান, পরেই সর্বনাশী নদী। সমস্ত গাঁ জুড়ে ভাঙনের গান। চোখে ছানি কাটার পরও ভালো দেখেন না—কেমন যেন ভাঙা ভাঙা আবছা দৃশ্যপট। চোখ কেটেছে শহরের নামি ডাক্তার। ভালো হাত। অপারেশনও নাকি ভালো হয়েছে। গেলেই একই কথা ডাক্তারের। চোখ ভালো আছে, বেশি ভাববেন না, চোখে চাপ যেন না পড়ে। দুলু, ভৃগুরও এক কথা—ভাবনা না ভাবনা না। ভাবব না। তো জিগ্যেস ক্যানো। অত কথা বলার কী। শহরে চলো, কেন একা থাকব। যামিনী যেন কিছু বোঝেন না। সব রাক্ষুসির পেটেযাবার জন্য তৈরি। বাড়িটা ভাঙা লাগে। ভাঙা লাগে তো ভাঙ। আমি চোখ বুজি, ভাঙ। তা-না-তা-না করতে করতে যদি আরও দু-এক বছর গড়ায়। যেমন জি ঘাটা, মুখে ভাত নামে না, বাহ্যি নাই। রাত জুড়ে চেতন থাকি, ঘুষণা লাগল আমার। বড়ো বড়ো হাঁড়ি ঠেলেছি—ওই দ্যাখ্ পাকঘরের দাওয়ায় কত বড়ো জাঁতি। কাঠের মজবুত হাতল করে দিয়েছিল তোদের বাপ—কেমন ঘড় ঘড় শব্দ হত, পিছলা শব্দ নয়। চোঁচা ওঠা আধভাঙা কলাইদানার মতো শরীর শব্দের—এখন

একগ্লাস জল ওঠাতে হাত কাঁপে। যামিনী নিজের মনেও কত কথা বলেন। ছেলেরা ভয় পাচ্ছে। ট্যাঁপা তো হাবাগোবা—ওকে নিয়ে একা একা গ্রামে থাকা। সবার আপত্তি, তবু মন্টুর জোরেই থেকে যাওয়া। একা আবার কোথায় বরং আমাদের কাছেই হাঁপ ধরে মায়ের— থাক এখন, যখন উপায় থাকবে না দেখা যাবে। ওরা তো আছে।

ওরা মানে এই ঝন্টুর মা পুষ্প, পায়েল, নব, ছক্কুটোলার রেবেকা, জুলেখা। ইশকুলের মাঠে ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন কমিটির মিটিং। সব্বাই দলবেঁধে গেল। এইসব মিটিং, মনসাগান, মহরমের লাঠি খেলা কী পুজোর জলসা—যামিনী যেতে ভালোবাসেন। নবই বারণ করেছে—কাদা রাস্তা, নরম শরীর তুমার। যেয়ে কাম নাই।

যামিনী বারান্দায় বসেছিলেন খানেক। পরে সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে উঁচু রাস্তায় উঠলেন। রাস্তা ঘেঁষে ঝন্টুদের তেরপল খাটানো চৌকি। মাটির মোড়াখানা বের করে দিয়েছে ঝন্টুর মা। মিটিং চলবে দুপুর থেকে সন্ধে অবধি। ঝন্টু, অঞ্জু, পাগলি কারো অত ধৈর্য্য নাই। তারা একবার বাজারে পাক দেয়। একবার বেলী ব্রিজের পাশে তৈরি হওয়া নতুন বাঁধে ওঠে। মাটি আর পাথর ফেলার কাজ চলছেই। রোগা পাতলা পাগলা নদী, গঙ্গার সঙ্গে মিশে ফুলে উঠেছে। ওপরে জল। ঘোলা জলের তলে গ্রামের পর গ্রাম ডুবে আছে। আর আছে রাশি রাশি স্পারের পাথর। অ্যাতো পাথর আছে নদীতে, লোকে বলে— চার পাঁচখানা রাজমহল পাহাড় বানানো যায় তাই দিয়ে। পাগলা গঙ্গা মিশে এখন জল ঘুরছে বাঙ্গীটোলার দিকে। খানিকটা কেটে কেটে গোল হয়ে ঢুকে যাবে নদী, তারপর সোজা রাস্তা করে নেবে, তখন সোজা রাস্তার পথে সব যাবে নদীর গর্ভে। নদীপাড়ের মানুষ এ হিসেবটা বোঝে। ভাঙনে বাড়ি, জমি, সব গেলেও প্রাণহানি হয় না। আগে -ভাগে সরে পড়ে মানুষ। প্রাণে মরে না। মরে প্রতিদিন তিলে তিলে। যে যার নিজের নিজের ধরনে যায়। জমি ঘর হারিয়ে ভিখু ইসলাম একরকম ভাবে মরছিল কাগমারিতে ফুসের ঘরে। ঘরে তিন তিনটা জোয়ান মেয়ে। তিন মেয়ের পর হামকুড়ি দেওয়া ছেলে। পাগলা গঙ্গা মিশেই আছে। জল বাড়ছে। এবার রোখা যাবে না। বাঁধ ভেঙে পাগলা নদী বেয়ে গঙ্গা ছুটে যাবে ভাগীরথীর দিকে। বেলী ব্রিজ ভেসে গেলে নয়াবাজারের সঙ্গে পঞ্চানন্দপুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মাটি ফেলে তৈরি হয়েছে নতুন বাঁধ, নতুন রাস্তা। মাটি ফেলার কাজ করতে করতে দুপুরবেলা অন্য সবার সঙ্গে ছাতু গিলছিল ভিখু। আকাশ পরিষ্কার। মেঘ নেই। বৃষ্টি নেই। কোত্থেকে মেঘ ফুঁড়ে বাজ পড়ল—সামনে আফজল, ওপাশে গোপাল, এদিক ওদিক অনেক লেবার—সবাই ঠিকঠাক, কিন্তু বাজ পড়ল ভিখুর গায়ে। 'আম্মা' ডাকার সময় পেল না। মরে বাঁচল। এবার সারা জীবন ধরে একটু একটু মরুক ওর বউ, তিন মেয়ে আর সাধের ছেলে সমু। এটা আজকেরই ঘটনা। ঝন্টু মহাউৎসাহে শোনাচ্ছে সে গল্প।

যামিনী উঁচু রাস্তায় যেখানে বসে, সেই রাস্তার ওপরেই শাকিলা, আমিনা কোলে কুলো নিয়ে বিড়ি বাঁধে। যামিনীকে অনেকদিন পর বাইরে বসা দেখে খোঁজ নিতে আসে। এদের কারো দালান ছিল না। খাপরা ছিল। এখন বাঁশ পুঁতে ওপরে তেরপল। হাজারে তিরিশ টাকা হিসেবে, হাত চালাচ্ছেন রমনা বিড়ি ফ্যাক্টরির জন্য। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই কথা। সদ্য শহর ঘরে চোখ কেটে আসা। সেই গল্প। শহরের লোকে কীভাবে কেউ কারো সঙ্গে কথা না বলে থাকে তার গল্প—হাত ঘুরিয়ে, চোখে হাত রাখেন যামিনী।—কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে থাকে তার গল্প—হাত ঘুরিয়ে, চোখে হাত রাখেন যামিনী।—কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে নাকো—রগ বের করা হাত চোখের সামনে ধরেন, সজনে পাতার মতো শিরশিরে কাঁপতে থাকে হাত—চেখে দেখতো পান তো—কেউ জিজ্ঞাসা করে, না পস্ট নয় কিছু। সব আবছা। চোখে ধুলো পড়ে। তার নাগাল।

—ঘুষণা লাগলে অমুন হয়—ঝন্টুর মা বলে। আমিনাও বলে। অল্পবয়সী চ্যাংড়া টোটো করে গাঁ ঘুরছে। এই বয়সটা লাটিম পাকের মতো। দুঃখকেও কেমন হাসি মস্করার লেত্তিতে পাকিয়ে বন্‌বন্ ঘোরানো যায়। গাঁয়ে আনন্দ উৎসবের আর কোনো ব্যস্ততা নাই। এখন হুড়মুড় করে জল এলে, ঘরে

ব্যাটাছেলে না থাকলে, হুটপাট করে মাল টানার সময় তাদের কাজ বাড়ে। রাতে বিরেতে শরীর বিগড়ালে চার মাইল দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবার সময় কাজ বাড়ে, ভ্যান ডাকা, রুগি ওঠানো। তো, যত রাতই হোক, ভ্যান পাওয়া যাবেই, সেদিকে গাঁয়ের নাম আছে। এইসব চ্যাংড়া প্যাংড়া ঝন্টু, পাপু, নানটুর দল বাজ পড়ে মানুষ মরার খবর আনে। মাটি বিক্রির খবর আনে। জমি বিক্রি হবে না কিন্তু মাটি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা, চারশো টাকা কাঠায়। সেই মাটি কেটে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে অথবা কাগমারির জমিতে বাড়ি করার সময় উঁচু করা হচ্ছে ভিটে। ঝন্টুর মা পুষ্প বোঝে, যামিনী মাসিমা এসব কথা শুনতে ভালোবাসছেন না। তাঁর বিশ্বাস আরও এক বছর টিকে যাবে এই দিকটা, তাকে শহরে যেতে হবে না, থেকে যাবেন এখানে। মাসিমার নরম শরীর এখন। পুষ্প রাঁধে। রাত্রে শোয়। জানলাহীন খাপরার দেওয়াল ছেড়ে, দালান কোঠায় শুয়ে বড়ো আরাম। রাত্রে কারেন্ট না গেলে পাখাও ঘোরে। ঝন্টুটার মাথায় কিচ্ছু নাই। ফেনিয়ে ফেনিয়ে মাটি বিক্রি আর বাড়ি বিক্রির গল্প পাড়ছে তখন থেকে। পুষ্প কথা ঘোরায়। চোখ আপনার ঠিকই আছে মাসিমা। এখন সবারই চোখ ঘোলা ঘোল্লা লাগে। শরীরটা নরম আপনার, তাই একটু বেশি ঘোলা।

—তুমারও লাগে?

—লাগে না আবার, খুব লাগে। চারিদিকে তাকাও তো, বেবাক ধূলা আর ধূলা।

মন জুগিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল পুষ্প। কিন্তু কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। এই জনপদ বাকল খসাচ্ছে। খুলে ফেলেছে সভ্যতার সব চিহ্ন। বরফগলা স্বচ্ছ প্রবাহিনী এখানে ঘোলা, পলি মাটি পাথরনুড়ি ভর্তি আর পাপ কুড়িয়ে তরলস্রোত ঘোর মাটি বর্ণা। কান্না আর রক্ত মেশানো অস্বচ্ছতা। আদি অনন্ত জল—কোথাও বাতাস নেই, ঢেউ-এর জীবনের অনর্গল উচ্ছ্বাস নেই। শুধু নেই নয়, যেন কখনো ছিল না। জল এখানে ঘুরে ঘুরে কথা বলে। কার সঙ্গে। জলেরই সঙ্গে। যেন শলা চলে—কীভাবে কোন্‌দিকে ঘুরে যাবে। পোহাল কাটবে। প্রবল ঘূর্ণি দিয়ে, বিলি কেটে কেটে অবশ করে দেবে, মাটির মাথা আর তারপর ধাক্কা দিয়ে টেনে নেবে বুকে। এসময় সমস্ত আকাশ, পথঘাট, ঘরবাড়ি, ঘোলাটে ধুলো হয়ে ওড়ে। জানলা দরজা ইঁট আসবাব তৈজস সব নিয়ে পালাচ্ছে মানুষ। মানুষ, গবাদি, দিয়ারার উর্বর চর, খেয়ালি আকাশ এমনকী মালবহনকারী শক্তিমান, টাটা ট্রেকার, ট্রাক, ভ্যানরিকশা সব কিছু এক মিহি বিষাদে ঢাকা।

সাত বছরের মেয়েদের বুক লেপ্টে বিড়ির কুলো, ঝাঁঝালো তামাক পাতা। তামাক পাতা তামাম বউ-ঝির হাতে। মেয়েদের গা থেকে সবুজ না, শস্য ভাঙানো মাতাল গন্ধ না, নদীর ছলছল জল শব্দ না কেমন ধূসর বিড়ি পাতা রঙের ধোঁয়াটে মেঘ ওড়ে।

এর মাঝে, যামিনী, ঝন্টু, মা পুষ্প। ন্যাড়ামাথায় ডগডগে সিঁদুর পরে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে বেড়ান অঞ্জু, পাগলি। পাপু, আফজল, তারিকুল ভাঙন কমিটির ছেলের দল। যামিনীর ধুকপুক বুকে শহরে আটকে যাবার ভয়। চোখের সামনে কালো কালো কী যেন ঘোরে। মাথায় ঝাপসা স্মৃতি। ঝাপসা চোখে ভেঙে পড়া এখানকার ঘর-গেরস্থালি। ঝাপসা কানে হাজার বক্‌বকম্‌।

ডুবে যাবে বলে তিরতির করে কাঁপছে গ্রাম। এর মাঝে ভিজে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালানোর গপ্পো। ক্ষিধের হাওয়া ইনিয়ে বিনিয়ে ঘোরে। বাড়ি ডুবে যারা বাঁধের ওপর, সরকার তাদের ত্রাণ পাঠায়। একমাসে পরিবার পিছু বারো কেজি চাল। যেন এ গাঁয়ের সবার সুগার। শহরের পুষ্টিবিদ ডাক্তারের মেনু চার্ট ধরে এক কাপ ভাত খাবে মানুষ। প্লাস্টিক, তেরপল, দেশলাই, মোমবাতি সব কিছু নিয়েই কাজিয়া লাগে। ঝন্টুর বাপ কাগমারিতে একখণ্ড জমি কিনতে পারেনি। এ জায়গা ডুবে গেলে শহরে প্লাস্টিকের মতো ঘুরতে হবে। আর এর মাঝে বসেই ঝন্টু নির্বিকার ভাবে বিড়বিড় করে কবিতা বলছে। বাড়ির কেউ বোঝে না। ভাঙন দেখতে শহুরে ব্যাটাছেলে মেয়েদের দল প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসে। তাদেরই কাউকে কাউকে লেখা দেখায় ঝন্টু। বাঃ! এর মধ্যে বসেও কবিতা লিখছ।

ছেলে গদ্‌গদ্‌। বাপ শুনলে দাঁত কিড়মিড় করবে। পুষ্পর বেশ আহ্লাদ হয়। শহরের লোকেরা কেমন বলে, আপনি ঝন্টুর মা, ছেলে তো খুব গুণী। বেশ লাগে।

কোঁকড়া চুলের ফর্সা দিদিটি অবাক হয়ে বলেছিল, সব তো প্রেমের পদ্য ঝন্টু। এই যে চারিদিকে অ্যাতো ভাঙন, নদীর তাণ্ডব, মানুষের দুঃখ দেখছ—এসব লিখতে ইচ্ছে হয় না।

ঝন্টু বলে—হ্যাঁ, তাও লিখেছি তো।

লেখার হাত নেই ঝন্টুর। শুধু অসম্ভব আবেগ। কাউকে পেলে সেই আবেগ ঝরঝর করে বলে। জোরে জোরেই বলে। যামিনী ঝাপসা শোনেন। বেশ কুর-র-আর বকম্‌ শব্দ।

এই এখন বিড়ি বাঁধার মেয়ের দল হাত চালাতে চালাতে কথা বলছে। মনিরুলের বউয়ের বেশ খর গলা। নয়াবাজার ইশকুলে সিক্স ক্লাসে পড়ত বিটি, বিহা দিয়েছে ভাসুর ব্যাটার সঙ্গে। অবস্থা ক্যামুন ওদের?

গেরস্থালি। তবে জল, ভাঙন নাই ও দেশে।

মেয়ের বিয়ে দেবার সময় এ গাঁয়ের লোক এখন উঁচু জায়গার দেশ খোঁজে সবচেয়ে আগে।

মনিরুলের ব্যাটা মেয়ের চেয়ে দশমাসের ছোটো। ডাংগুলি খেলে না শুধু, ফোর ক্লাসে পড়লে কী হবে— ফাইভ ক্লাসের বই ঝরঝরিয়ে পড়তে পারে। ছেলে কীভাবে ভালো, মনিরুলের বউ তারই বেত্তান্ত শোনাচ্ছে।

—হামিই উঠানু না। পেরাইমারিতে তো ফল নাই। অক্ষর চেনে না, যোগ বিয়োগ জানে না—মাস্টাররা পাশ দিতেই ব্যস্ত। হামি বুঝলাম, না। হামার ব্যাটা পাশ দিবে না। অক্ষর চেনে না, লিখতে পারে না তো পাশ কী? দু-বছর আটকে রাখনু। এখন দেখো-ফাইব কেলাসের বই রেলগাড়ির মতো পড়ছে। সবাই বলে, বড্ড খর মনিরুলের বউয়ের গলা, যামিনীর কিন্তু বেশ লাগে—কানে অজস্র শালিখের কিচিরমিচির শব্দ ঘোরে। কখনো বাড়ির উঠোনে, কখনো এই ছোটো বাঁধের ওপর পাড়ার বউ-ঝি বিড়ি বাঁধা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যামিনী নদী দেখেন। তীরে সার বেঁধে নৌকো দাঁড়িয়ে। চরে যাবার বড়ো নৌকো। নদী ভাঙছে। পালাচ্ছে লোকজন। বড়ো ধুলো ধুলো লাগে চোখে সব কিছু। এর মাঝে চাংড় ভর্তি পটল, ঝিঙা, ঝুড়িভর্তি লালমুখো বাটা, ট্যাংরা আর বড়ো বড়ো চিংড়ি—পাইকাররা বরফ দিয়ে বাক্স করে পাঠাতে মহাব্যস্ত। জলে জলে ভুট্টা বেবাক নষ্ট। রউফের মা হাত দিয়ে ভুট্টা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দানা করে রাখে। কচকচ করে পেয়ারা খায় অঞ্জু, ঝন্টু, পায়েল, রেবেকা। শর্মাদের বাড়িটা এবারই হয়তো চলে যাবে। গাছ মুড়িয়ে ডাব পেড়ে নিয়েছে, পেয়ারা নিয়েছে। মুড়িয়ে নিয়েছে বললে ভুল হবে। দু'চারটা নারকেল আর পেয়ারা রাখাই আছে গাছে। গাছ মুড়িয়ে ফল নিতে নেই। শর্মা দিদা বারবার বারণ করেছেন। মিলটা এখনো খোলা হয়নি। এখনো ছাতু, কলাই, গম ভাঙানো চলছে।

নাক জুড়ে এই সমস্থ গন্ধও পান যামিনী। পেয়ারা পাতার গন্ধ, ঘোলা জলের ভ্যাপসা গন্ধ। বিড়ির মশলা মাখা রোগা রোগা ল্যাপ্টাবুকের যুবতি মেয়ের মন খারাপের গন্ধ, সমস্ত গ্রামের শরীর জুড়ে একটা শ্যাতলা শ্যাতলা ভাব। যেন জি ঘাটছে। ঘুষণা লেগেছে, তার মতো। ছেলেরাই হয়তো ঠিক—বাড়িঘর খুলে নিয়ে ভিটে ফেলে পালিয়ে যাওয়া। তার কাছে কথা চায় তারা। যামিনী অত কথা বোঝেন না—কোন্‌টা ভালো, কোথায় ভালো। এবছর যদি ঘরটা না কেটে সামনের বছরের মতো থেকে যায় তবে তার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে ভালো। এখন শব্দ কেমন ঘোর ঘোর লাগে, গন্ধও ফিকা রঙের মতো, সারা চোখে ধুলোর মতো ছবি ঘোরে। তবু বন্ধ সিন্দুকের দম আটকানো মৃত্যুর চেয়ে এ ঢের ভালো। এইসব ভেবে ভেবে ঘুম আসে না। মিহি মিহি ধুলোর পৃথিবীতে সারারাত চেতন থাকতে থাকতে হাত গুনে গুনে জপ করেন যামিনী। ইষ্টমন্ত্র মনে আসে না। শব্দ আসে। পথঘাট, নদী, মানুষের অসংখ্য বক্‌বকম আর রোদজল বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। আর কিছু না, এই জপ মন্ত্রের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তে চান যামিনী। এখানেই।

শিকার

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন শঙ্গারু দেখার সময় মনে হয়েছিল ভুল হচ্ছে। বিরাট একটা ভুল। পরে বোঝা গেল না। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। অনেকদিন এসব বন্ধ ছিল তো। মানে এসব ঝাপসা ছবির ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা এবং ওর আক্রান্ত হওয়া। বেশ কিছুদিন পরে আবার শুরু হল। অফিসে অনিমেষ সামন্তর ঘটনাটাই দুর্ঘটনার মতো উসকে দিল আগেকার স্মৃতি। মাঝে বেশ কিছু বছর শান্তিতে ছিল শিপ্রা। আসলে ছোটোবেলা থেকেই এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখা অভ্যেস আছে শিপুর। কতদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনে হয়েছে চারপাশে বৃষ্টি পড়ছে। সারারাত ঘরের জানলা দিয়ে ছাট এসেছে। ভিজিয়ে দিয়েছে বিছানা-বালিশ সবকিছু। ঘুম চোখেই ছুটে গিয়েছে জানলা দিতে। কোথায় কী? বাইরের শুকনো হাওয়ায় পুরো বৃষ্টির আমেজটাই নষ্ট একেবারে। তবে এরকম হবার দু-একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামত ঝেঁপে। ঘরদোর ধুয়ে যেত আচমকা বৃষ্টির জলে। স্কুলে রেনিডেও হয়েছে কখনও-সখনও।

সে সময় ছবি আঁকার অভ্যেস ছিল। পাহাড়ের রাস্তাঘাট, বাড়ি, বাগান আঁকতে আঁকতে দেখতে পেত ঝরনা নামছে কুলকুল করে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা সেই জলস্রোতের ছবি আঁকতে পারেনি কোনোদিন। তবে ভেতরে ভেতরে তীব্র অস্বস্তি হত। পাহাড় আঁকতে গিয়ে জলের আওয়াজ ভাসত কানে। ছবি শেষ না করেই ভয় পেয়ে উঠে পড়েছে তক্ষুনি।

অনেকদিন তেমন করে চারপাশ আঁকা হয় না। আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর লাইনটাই পালটে গেল। কমার্শিয়াল কাজকর্ম করতে করতে সেই মগ্নতাই হারিয়ে ফেলল বুঝি। এখন ওর স্টাডিতে ঢুকলে অনেকেই অবাক হয়ে যায়, ছবির অন্য ধরন, ইশারার মাত্রা আলাদা। মা বলে আগেই বেশ ছিল। এখন তো কিছুই বুঝি না। ধরাছোঁয়ার বাইরে।

হাসে শিপ্রা। আমাকে তো সারাক্ষণ ছুঁয়ে আছ। তাতে হচ্ছে না?

তুই তো আমার সন্তান। তোকে তো জন্ম থেকেই ধরে আছি শিপু। এখন আর নতুন কী?

ওগুলো তেমনি শুধু আমার বুঝলে!

বাড়িতে কাজ করতে বসলে বারবার ঘুরে ফিরে আসে মা। ছুঁড়ে দেয় মন্তব্য। তবু শান্তিতে কাজ করা যায়।

সেবার কদিন ধরেই কাজে মন বসছে না। অথচ হাতে বেশি সময় নেই। প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। অ্যাকাডেমির হল ভাড়া করা, কার্ড ছাপানো, ইনভাইটিদের লিস্ট তৈরি, সব রেডি, অথচ কাজ এগোচ্ছে না একদম।

হিয়া ফোন করল, কীরে কতদূর?

অনেক বাকি, মন বসছে না।

বাজে বকিস না তো। আর মোটে টু-উইকস্।

শেষ দিন অবধি তাগাদা দিয়ে গেল ও। শিপ্রাদের ব্যাচের মোট পাঁচজন আর আগের ইয়ারের ধ্রুবদা, বিজিতদা, সবসুদ্ধ সাতজন নামাচ্ছে ব্যাপারটা। ওদের দলের নাম ঠিক হয়েছে 'সপ্তর্ষি'। আসলে অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল শুধু চাকরিতে কোনো স্যাটিসফ্যাকশান নেই। সারাক্ষণ বাঁধা পয়সার পেছনে দৌড় দৌড়। নিজেদের হিম্মত বুঝতে গেলে প্রদর্শনী মাস্ট। থিম্ যুগোপযোগী। 'সন্ত্রাস ও আমরা'। সবার মাঝে ওর কাজের প্যার্টানটাই একদম আলাদা। মাঝে মাঝেই ঘাবড়ে যাচ্ছিল ও। নিজেই নিজেকে চার্জ করা যে কী মুশকিল। ওদিকে মা ঘ্যান ঘ্যান করছিল সমানে। সারাদিন অফিসের পর হয় এসব? বললাম ছুটি নে, শুনলে তবে তো!

ফার্মটা বিদেশি। খুব স্পিডে কাজ হয়। জবাবদিহির ব্যাপার আছে। ছুটি নিলে কাজ তোলা যাবে না। সেদিন পাঁচটা বেজে গেছে, তেড়ে কাজ সারছিল ও। অনিমেষদা এসে চেয়ার টেনে বসলেন সামনে। জেনেশুনেই প্রথমে পাত্তা দেয়নি। চোখ তোলেনি। লোকটা তেমন পছন্দের নয়। কী ধান্দায় এসেছে কে জানে? তাছাড়া সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে।

তবু সৌজন্য বলে একটা কথা থাকেই। মিনিট দুয়েক পরে ওদিকে তাকাতে গিয়ে হতবাক। এসব কী হচ্ছে? সবকিছু ঠিকঠাক অথচ...। তবে কী কাজের চাপে মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেল? না। অন্য সব চিন্তা-ভাবনায় কোনো গোলমাল নেই। মানে যেমন হওয়া উচিত তেমনই তো ঘটছে। সন্ধে সামছে। অফিসের জানলার বাইরেও ঘন মেঘ। তবু কাচের জানলা দিয়ে রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছে পরিস্কার। টেবিলের ওপরের গোল পেপারওয়েট। পেনের স্ট্যান্ড। এলোমেলো ছড়ানো ফাইল, রুমাল, এমনকী ওর নিজের হ্যান্ডব্যাগও যেমন তেমন। একটুও জায়গা পালটায়নি। গোলমাল শুধু এক জায়গায়।

সামনের চেয়ারে বসে আছেন অনিমেষ সামন্ত। অন্তত ওঁর কণ্ঠস্বর তাই বলছে।

সাদার ওপর নীল ডোরাকাটা শার্ট। তার নীচে কালো প্যান্টে ঢাকা দু-জোড়া পা। হাতের তর্জনীতে গোমেদের আংটি। কোথাও কিছু অসুবিধে নেই। শুধু ঘাড়ের ওপর থেকে ঈষৎ লম্বাটে ওই মুখ এর বেরিয়ে থাকা চোয়াল, দাঁতে সারি, একদম কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওকে। শরীরে মৃদু কাঁপুনি শুরু হয়েছে। টের পাচ্ছে ও। স্রেফ মনের জোরেই পেনসিল টানছে কাগজে। যাতে সবকিছু একদম স্বাভাবিক দেখায়। কিন্তু এভাবে বসে থাকতে থাকতে পড়ে যাবে না তো। অনিমেষ সামন্তর পরিচিত মুখ-এর বদলে বীভৎস শেয়ালের মুখ না দেখার যুদ্ধ করছে। হচ্ছে না নিজের অজান্তেই চোখ চলে যাচ্ছে ওদিকে। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা জলের স্রোত নামছে। ঘাড় গলা ভিজে একশা। মুখ না তুলেও শুনতে পাচ্ছে, অনিমেষদা বলছেন, শিপ্রা কী হল? তুমি এত ঘামছ কেন?

কিছু না বলেই মুখে রুমাল চেপে সোজা টয়লেটের দিকে ছুটছে ও। পেছনে অনিমেষদার চিরচেনা কেজো গলা ধাওয়া করে আসছে, এবারের বাড়তি ডি এ-র হিসেব করেছ? বলো তো করে দিতে পারি।

বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল। জলের ঝাপটায় চুল এলোমেলো। চোখ, ভ্রু সব জলে ধুয়ে পরিষ্কার। তাহলে এটা কী সাময়িক কোনো বিভ্রম? টয়লেট থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অনিমেষদা উঠে গিয়েছেন।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চেয়ার ঠেলে দিয়েছিল টেবিলের নীচে। ড্রয়ারের চাবি নিজের ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতেই নজরে এসেছিল প্রায় সব কিউবিকলই ফাঁকা। অফিসে কেউ-ই নেই। কীরকম একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে টলতে টলতে কোনওরকমে বাসস্টপে পৌঁছেছিল।

শেষপর্যন্ত প্রদর্শনী ভালোই ওতরাল। তাছাড়া কাগজের রিপোর্টেও ওর নামটার বিশেষ উল্লেখ ছিল। খরচ বাদ দিয়েও সত্তর হাজার মার হাতে তুলে দেওয়া গেল।

মার সেই এক কথা। অ্যাকাউন্টে ফেলে দেব, বিয়ের সময় কাজে লেগে যাবে। শুধু ছবি এঁকে তো জীবন চলবে না।

সে সময় হাসি পেয়েছিল ওর। মা ভারী ছেলেমানুষ। সোমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই বিয়ের কথা ভাবছে। সেবার সোমের মাও দেখতে চেয়েছিলেন ওকে।

সোম বলেছিল মা তোমাকে দেখতে দেয়েছে।

হঠাৎ?

হঠাতের কী হল। আমার বন্ধু যখন দেখা করতে চাইতেই পারে। তার ওপর আবার এক একটা ছবির দাম সত্তর হাজার, পঞ্চাশ হাজার। এরকম দামি বন্ধুকে কে না দেখতে চায়?

তাই বুঝি? ছবির দাম কমলে আমার দামও কমে যাবে তো?

ঠিক তা নয়। মানে আমিই তোমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিষয়টার উল্লেখ করেছি।

সোমের কথাটা ভালো লাগেনি ওর। পরে মনে হয়েছে হতেও পারে। কেমিস্ট্রির এম. এসসি। অথচ প্রফেশনাল লাইফে এখনও তেমন সেটলড্ নয়। কমপ্লেক্স থাকতেই পারে। কয়েকটা ট্রেনিং কলেজের পার্ট টাইম লেকচারারশিপ, স্থিরতা কোথায়!

মনের কথাটা মুখে বলেই ফেলেছিল শিপ্রা। এম. এসসি-তে এত ভালো রেজাল্ট। কলেজে পার্ট টাইম করছ? নেটে বসবে না?

না। আমি অন্য চাকরির চেষ্টায় আছি। পড়াতে ভালো লাগে না।

বি. সি. এস-এর রিটন্ কোয়ালিফাই করেছে বুঝি। এখনও ইন্টারভিউ বাকি। তবু অবাক হয়েছিল ও। সোমের মতো ছেলে কলেজে পড়াবে না। অ্যাকাডেমিক লাইনে থাকবে না। একেবারেই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত!

এমনিতে সোমকে খারাপ লাগে না। ভালো স্টুডেন্ট। কষ্ট করে বড়ো হয়েছে। বাবার চাকরি চলে যাওয়ায় ছোটো থেকেই সংসার টানছে। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষিও করে। এই সেদিনই বলছিল আমার মা খুব সুন্দরী, জানো। সাজতে-গুজতেও ভালোবাসে।

তাই বুঝি, তবে তো আমাকে ওঁর ভালো লাগবে না। কী বলো? এই একে তো পেতনির মতো দেখতে। তায় শাঁকচুন্নির মতো সাজগোজ।

যাঃ। তোমাকে তো বেশ লাগে।

তাই?

সোম এখনও সেভাবে অ্যাপ্রোচ করেনি। কথাবার্তা ও হাবেভাবে মনে হয় যে কোনো দিন তুলবে কথাটা। তবে সিদ্ধান্ত নেবার আগে ওর বাবা-মা দুজনকেই দেখে নেবে শিপ্রা। কেননা কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া অনিমেষ সামন্তর ব্যাপারটা আর কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর একটা ঘটনাও ঘটেছে। যাতে মনে হয়েছে ও ভুল করে কিছু দেখে না। ঘটনা সত্যিই ঘটে।

চোখ বুজলে এখনও দৃশ্যটা দেখতে পায় শিপ্রা। প্রায় অন্ধকার গলিতে, ঝিমোনো আলোর মধ্যে, কতকগুলো মানুষের শরীর নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। অথচ তারা মানুষ নয়। সাদা একসারি ভয়ালো দাঁত। টুনি বাল্বের মতো আলোকিত চোখ। শিকারের শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যত ভঙ্গি। একদল হিংস্র শ্বাপদ তাড়া করেছে, আর ও প্রাণপণে সাইকেল চালাচ্ছে। শিপ্রা কিছুই বলেনি মাকে। জামাকাপড় ছেড়ে, মুখেচোখে জল দিয়ে, স্বাভাবিক হয়েছিল নিজে নিজেই।

অফিস থেকে ফেরার পরই মা বলেছিল শিপু একটু যা না মা, নীলিমার খবরটা নিয়ে আয়। চারদিন হয়ে গেল কাজে আসছে না।

তখন সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। কলোনির দিকের রাস্তাটা এবড়ো-খেবড়ো। তাই আর স্কুটিতে যায়নি ও। সাইকেলটাকে টেনে হিঁচড়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার ধুম জ্বর দেখে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করে ফিরতে ফিরতে একটু বেশি রাতই হয়েছিল। তাই শর্টকাটের রাস্তাটাই বেছে নিয়েছিল। মোড়ের ছেলেদের জটলা থেকে শিস্‌টা দিয়েছিল কেউ। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই রাগের মাথায় ওদের দিকেই সাইকেল ঘুরিয়ে ছিল ও। ছেলেগুলো একটুও না ঘাবড়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ওর দিকে।

গলিটায় আলো কম। ওদের আসতে দেখে একটু থমকেছিল শিপ্রা। ঠিক তখুনি ঘটল ঘটনাটা। ঝকঝকে দাঁতের সারি সমেত ওইসব মুখগুলো আচমকা ভোল পালটাল। শিপ্রা দেখল একঝাঁক কুকুর তাড়া করেছে ওকে। অন্ধকারে তাদের চোখগুলো জ্বলছে।

ঘটনাটা নিয়ে পরেও ভেবেছে অনেকবার। ব্যাপারটা এতই অবাস্তব, এমনই অদ্ভুত, যে কাউকে বলা যায় না। পরে মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে ওর মাথার ঠিক ছিল না হয়ত। নয়ত এরকম হবে কেন? সারাদিন ঘুরছে ফিরছে। এখানে ওখানে যাচ্ছে, আসছে। প্রতিদিন অফিস করছে নিয়ম করে। সব ঠিকঠাক। কোথাও কোনো এলোমেলো হাওয়া নেই। শুধুমাত্র একদঙ্গল ছেলের নিমেষের মধ্যে একদঙ্গল কুকুর হয়ে যাওয়ার মতো আপাত অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা কাকেই বা বিশ্বাস করানো যায়? অনেক ভেবে দেখেছে। তারপর বেমালুম সব কথা চেপে গিয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই এই অভ্যেস ওর। বাবা-মার একটু বেশি বয়সের সন্তান। ভাই-বোন নেই। শেয়ার না করা অনেক কথাই একা একা হজম করেছে কতদিন।

সোমের বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করার তেমন প্রয়োজন তক্ষুনি হওয়ার আশাও ছিল না খুব। কিন্তু সবকিছু উলটে-পালটে দিল সোম নিজেই। ঘটনাটা এত আচমকা ঘটল। সোম ওকে প্রস্তাব দিয়েই যে সোজা ওর বাবা-মার কাছে বলতে চলে যাবে এই ব্যাপারটাও ধারণায় ছিল না। অনুযোগ করতে সোম মুচকি হাসল শুধু, তোমার কী আমাকে নিয়েই সমস্যা?

তা নয়। তবে এত তাড়াতাড়ি...।

আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। চাকরিতে জয়েন করলেই ট্রেনিং-এ যেতে হবে। বিয়ের ডেট পাওয়া যাবে না।

হলই বা।

উত্তরে সোমরে গোমড়া মুখ দেখে নিজেকে সামলে নিয়েছিল শিপ্রা। তবু বিয়ের আগে ওদের বাড়ি একবার অন্তত যাবে ভেবেছিল। তাতে বাগড়া দিল মা। দিব্যি ঘরদোর! আমরা তো দেখে এলুম। এসব বেশি বেশি আধুনিকতা আমার পছন্দ হয় না।

অগত্যা কী আর করা। তাছাড়া সেই সময়টায় খুবই ব্যস্ততা গিয়েছে শিপ্রার। অফিস ট্যুরেও কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হল। নেমন্তন্ন, মার্কেটিং, সবই করতে হল। অথচ সোমের বাবা-মার সঙ্গে একবার চোখের দেখাটা ঘটল না। তবে এখন মনে হয় দেখা হলেই বা কী হত? সবকিছু কী পালটে যেত? আর ভাগ্যের ব্যাপারটাই বা অস্বীকার করে কী করে।

বিয়ের দিন পাকা। হল ভাড়া হয়ে গিয়েছে। সকালে মা খবর দিল আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। সোমের মা আসবেন।

একা?

না। সঙ্গে কোনো এক বোনঝিও থাকবে।

ওর বাবা?

কই? বললেন না তো। যাই হোক তুমি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি ফিরো, নাহলে খুব বোকাবোকা দেখাবে ব্যাপারটা।

আমার সঙ্গে কী?

তবে কী আমার ব্লাউজ আর হাতের মাপ দিয়ে দেব?

মা আদর করে তুমি বলছিল সেদিন। সোহাগ বা রাগ দেখাতে মাঝে-সাঝে তুমি বলে মা। মায়ের মুডটা নষ্ট করে দেয়নি ও।

ঠিক আছে বাবা। চলে আসব। মুখে বললেও মনে মনে টেনশন হচ্ছিল খুব। বিয়ের আয়োজন প্রায় শেষ। সোমের মাকে দেখে যদি কোনো খটকা লাগে ওর, বিয়েটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু এইসব ঘটনার ওপর তো কারওর কোনো হাত থাকে না।

শুয়ে শুয়ে মুখের সামনে হাত নেড়ে অদৃশ্য মাছি তাড়াচ্ছিল শিপ্রা। পুরানো কথাগুলো মাঝে

মাঝেই এমন ঝামেলা পাকায়। সোমের বাড়ি, বাবা-মা, বা ও নিজে সবটাই তো বারুদে ঠাসা বাজির মতো। হঠাৎ হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে আর ওর ভুলে থাকা, ভালো থাকার ইচ্ছেয় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেদিন অফিস থেকে ঠিকঠাক ফিরে এলে ওই অতীব গোলমেলে অধ্যায়টির সূচনা হত কী? যদিও এসব ভেবে লাভ নেই। তবু ভাবনা ছাড়ে না।

শেষপর্যন্ত সব কিছুর মাপই মা দিয়েছিল। ওর পক্ষে সেবার বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়নি। ঠিক সেদিনই ধ্রুবদার বাড়িতে তিন-জন ফরাসি শিল্পীর হঠাৎ আবির্ভাব। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ধ্রুবদা ফোন করলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার বাড়ি চলে আয়। ফ্রান্স থেকে তিনজন আর্ট ক্রিটিক এসেছেন। ওঁরা তোর প্রেজেন্টেশান দেখে মুগ্ধ বলা যায়। ওঁদের দেশে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে। কথাবার্তা আছে কিছু। কালই ফ্লাইটে চলে যাচ্ছেন ওঁরা। এরপর আর কিছু বলা যায়? তবু বলেছিল ও, কাল সকালে যদি হয়? বাড়িতে কিছু গেস্ট এসেছেন।

ঠিক আছে, আসিস না। বাড়িতে কাপ-ডিশ সাজা। পরে কিন্তু আমায় দোষ দিবি না। এরপরে আর ফেরা যায়?

সেদিন দরজা খুলে দেওয়ার পর থেকে অনেকক্ষণ কথা বলেনি মা। শেষে সোমের মার কাছে ক্ষমা চেয়ে ফোন করতে ঠান্ডা হল। উনি অবশ্য পাত্তা দিলেন না। সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বললেন ও, আগে কাজ তারপর সবকিছু। আমি কিছুই মনে করিনি।

খুব স্বস্তি পেয়েছিল শিপ্রা। পরে সেটাই অস্বস্তির কারণ হল। এখন মনে হয় বিয়েটা হতই। আসলে যা যা হবার সবকিছুই হয়। যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি কোনো কাজে আসে না।

এক পা এক পা করে অনিবার্য ঘটনারা এগিয়ে আসেন, কাজ মিটিয়ে আবার চলে যান অন্য লক্ষ্যে।

কেননা পরে বারবার মনে হয়েছে, সোমের মার সঙ্গে কেন একবারও আগে দেখা হল না?

যোগাযোগটায় শুরু থেকেই গোলমাল ছিল। শুধু সূত্রটা হাতে ছিল না একদম।

সোমেদের ফ্ল্যাটে বউ বরণ করলেন পাশের বাড়ির কাকিমা।

ওর মার নাকি হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। শোবার ঘরের খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। দাঁড়াতে পারছেন না।

ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে এগোতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। আর তখনই আচমকা নজরে এল অচেনা কিছু যেন আড়মোড়া ভেঙে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। গোলাকৃতি বস্তুটির সারা শরীরে তীক্ষ্ণ কাঁটার সারি। এক সেকেন্ডও দেখেনি ও। মাথা নীচু করে নিয়েছিল। ভেবেছিল মনের ভুল।

উনি তক্ষুনি কাছে টেনেছিলেন ওকে। দ্যাখো তো, এমন দিনে আমায় শুয়ে পড়তে হল। কত শখ ছিল, কিছুই মিটল না। কী করি বলো, মাথা টলমল করছে। সোমের বাবাও ছিলেন ছিলেন একপাশে। যদিও পা ছাড়া ওঁর কিছুই দেখতে চায়নি ও। আগের অভিজ্ঞতার কোনো অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি ওর কাম্য ছিল না। মনের মধ্যে খচখচানি, তবু ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল শিপ্রা। নানান ঝামেলায় বিয়ের পর হানিমুন হল না। ঘরের সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেটা কি পুষিয়ে নেওয়া যায়? প্রথম প্রথম খুব উদার সাজতেন উনি। ওঁদের ড্রয়িংরুমের দেয়ালে ওর আঁকা একটা অয়েল পেন্টিং দেখে চমকে গিয়েছিল ও। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম? শাশুড়ি বলেছিলেন। শ্বশুরের উপস্থিতি ছিল একেবারে শব্দহীন। সারাক্ষণই আছেন। অথচ নেই যে সেটাও সত্যি। শাশুড়ি কথা বলতেন অজস্র। প্রথম প্রথম সখীর মতো মিশতেন, পরে বোঝা গেল সবটাই ভান। ভেতরের কথা বার করার চেষ্টা।

তখন ওর পুরোদমে কাজ চলছে। অফিস থেকে ফিরতেও রাত হচ্ছে। বাবা-মাকে দেখতে গিয়ে সেদিন একটু বেশি রাতই হয়েছিল। আসলে মা শখের রান্না করে ডেকেছিল ওকে।

বাড়ি ঢুকতেই সোম জিজ্ঞেস করল এত দেরি করলে কেন?

কৈফিয়ত দেবার অভ্যেস নেই, মাথাটা দপ করে উঠলেও শান্ত গলায় বলেছিল, তোমাকে তো ফোন করেছিলাম।

তাবলে এত রাত?

কাজ ছিল!

শাশুড়ি ফুট কাটলেন কাজ নয়, বাপের বাড়ি গিয়েছিলে তো। তোমার মা ফোন করে বললেন তোমার ফিরতে দেরি হবে। মুচকি হেসেই বলেছিল ও, তবে আর জিজ্ঞেস করা কেন?

সোম বিরক্ত হল। ফালতু বকছ। বাপের বাড়ি যাওয়াকে কাজ বলে না।

শিপ্রা সত্যিই রেগে গিয়েছিল। এইজন্যই বিয়ে করতে চায়নি ও। ওর মতো স্বাবলম্বী মেয়েকে কৈফিয়ত দিতে হবে কেন? তবু তখনও বোঝেনি ও বাড়ির অসুখ আরও গভীরে। বুঝল যখন তখন তো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

ছোটোবেলাটা কেন যে ফিরে আসে না। সেই আঁকার স্কুলে একসঙ্গে বসে ছবি আঁকা, বাবা-মার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, র‍্যালির কুলপি আর কলেজের সামনে দলবেঁধে ফুচকা খাওয়া। বয়স বাড়লে প্রতিমুহূর্তে শুধু লড়াই আর লড়াই। কখনও বা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, সাহায্য করবার কেউ থাকে না।

এক সময় সোমের সঙ্গে দেখা করতেই জ্বর গায়ে বেরিয়ে পড়ত ও। অফিস কামাই করে ঘুরত রাস্তায় রাস্তায়। এখন সেই সোমের সঙ্গে দেখা হবে কোর্টে। ডিভোর্সের মামলা চলছে।

মা একদিন বলেছিল আর একবার চেষ্টা করা যায় না শিপু? বাবা অবাক, তুমি একথা বলছ কী করে? ওর গলার ব্যথার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

মা পালিয়েছিল রান্নাঘরে।

আসলে ওরা ছিল ঠগ্। প্রতারক। রিটন্-এর পর ইন্টারভিউয়ে আউট হয়ে গিয়েছিল সোম। যা জানতেন শুধু ওর মা। তবু এভাবে বিয়েটা কেন দিতে চাইলেন ওরা, সেটা শ্বশুরবাড়িতে একমাস কাটিয়েই বুঝেছিল ও।

বিয়ের পর প্রথম মাইনে হাতে পেয়ে সোমকে খাওয়াতে পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় ডেকেছিল শিপ্রা।

সোম হতভম্ব। এখানে শুধু শুধু এত টাকা খরচ করবে?

শুধু শুধু? আমার একমাত্র বরকে খাওয়াব সেটা 'শুধু শুধু' হবে কেন?

তাহলে সবাইকে ডাকলেই পারতে।

মানে?

মানে আমার বাবা-মা কী দোষ করল?

পাগলের মতো কথা বলছ। ওঁরা এলে আমার বাবা-মা-ই বা আসবেন না কেন? আসলে এ-ব্যাপারটা শুধু আমাদের।

সেদিন খেতে খেতেই বলেছিল সোম আমাদের বাড়ির নিয়ম মায়ের হাতে মাইনে দেওয়া। তারপর মা...। তুমিও মায়ের হাতেই টাকাটা...।

কথাটা আগে বলা উচিত ছিল। কেননা এটা আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব না।

কেন?

খুব সিম্পল। আমি কোনোদিন আমার মায়ের হাতেও...। যাক্ এ নিয়ে ফারদার কিছু বলতে এসো না।

সোম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল তারপর। খাওয়া এবং খাওয়ানোর আয়োজনটাই বিস্বাদ লেগেছিল হঠাৎ।

টুকরো টুকরো কথা, ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি বারবার ফিরে আসে। আর সেইসবের মধ্যে মিশে থাকে অনেক এলোমেলো রং, অনেক না চেনা হিজিবিজি। এমন একটা রাত নেই যে রাতে উদ্ভট স্বপ্নে ঘুম ভাঙে না ওর।

মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, মা তোমার কেমন ঘুম হয়?

মার মুখ নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে, ঘুম? কেন রে?

এমনি বলছি।

সকালবেলাই যত আবোলতাবোল প্রশ্ন শুরু হল। মা দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মায়ের পালানো দেখতে দেখতে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল ও। মিথ্যে বলবে না তাই এড়িয়ে গেল কথাটা। ওই ঘটনার পর মাও তো ঘুমোয় না ভালো করে।

অথচ ওই বাড়িতে মিথ্যের ঝুড়ি ছিল একটা। সমস্তটাই মিথ্যের মোড়কে মোড়া। মিথ্যে রূপকথা ভেঙে যাবার পর সেসব একটি একটি করে চিনেছে ও। কতরকমের নীচতা। তাদের চেহারা আগে কখনও দেখেনি। আগের দিন রাতে হয়ত তুলকালাম হয়েছে। সকালে উঠে সবাই স্বাভাবিক। যেন কিছুই ঘটেনি। অথচ ওর কষ্টটা ছিল অন্য জায়গায়। সোম আর ওর মধ্যে পাঁচিল উঠছিল ক্রমশ। পাঁচিলটা অবিশ্বাসের, সন্দেহের। অবশেষে তিক্ততার।

কতদিন ঝগড়ার সময় সোমের দিকে তাকিয়েছে ও। না কোনো পরিবর্তন নেই। নিখুঁত মুখ, চিবুকের সহজ কাঠিন্য, এমনকী কপালের কাটা দাগটা পর্যন্ত একইরকম নিভাঁজ, মসৃণ। নিশ্চিন্ত হয়েছিল শিপ্রা।

ঠিক সেই সময় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। চা দিতে এসে রান্নার বউটি দাঁড়াল ওর একদম কাছে। খুব অবাক হয়েছিল ও। হঠাৎ হল কী? বউটির সঙ্গে তেমন কথাও হয়নি কোনোদিন। বাড়িতে সেদিন কেউ নেই। বউটি বলল, আপনি বাপের বাড়ি চলে যান। এখানে থাকবেন না।

মানে? শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল শিপ্রা। কদিন ধরেই ক্লান্তি আর মনখারাপটা বড্ড পেয়ে বসেছে। অফিস থেকে ফিরে নিজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

কিছু মনে করবেন না। এরা লোক ভালো না। আপনার চায়ের কাপে আপনার শাশুড়ি...। আমায় ঢুকতে দেখে চমকে গেল।

কী বলছ কী?

আমি খুব শীঘ্রি এদের কাজ ছেড়ে দেব। টাকা-পয়সা নিয়েও গোলমাল করছে। তারপর যা দেখলাম, কী থেকে কী হবে, আমায় নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে। তবে একটা ধর্ম বলে কথা আছে তো! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। তাই বলে গেলাম। বিশ্বাস না করলে করবেন না। বউটি চলে যেতে শিপ্রা হাঁ হয়ে বসেছিল বিছানায়।

সোম বাড়ি ফিরে খুব রাগারাগি করল। হয়েছেটা কী?

এরকম ভূতের মতো বসে আছ।

না। কথাটা ফাঁস করেনি শিপ্রা। ও ততদিন বুঝেছিল সোমের মায়েব ব্যাপারে বিচারহীন দুর্বলতা আছে একটা।

সেবারও সপ্তর্ষির প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। অথচ ওর কাজ এগোচ্ছে না একদম। সোমকে কথায় কথায় বলেছিল কদিন বাড়িতে গিয়ে থাকলে হয়ত কাজটা ঠিকঠাক সামলে নিতাম।

এখানে হবে না?

নারে বাবা। সব জিনিস তো আনিনি। ও বাড়িতে আমার স্টাডিতে কাজের সুবিধা হয় কত।

বলো না, এ বাড়িতে ভালো লাগছে না। যত বাজে অজুহাত।

ভালো লাগছে না-ই তো। কী আছে এখানে?

ফের তর্ক শুরু হল। সেদিন হঠাৎ নিজে থেকে এসে সোমের মা মিষ্টি কথায় মধ্যস্থতা করলেন। এত রাগারাগি করছিস কেন? যাবে বলছে যখন একটু ঘুরেই আসুক না। অবাক হয়েছিল শিপ্রা।

সোম আর কথা বাড়ায়নি।

মুশকিল অন্য জায়গায়। মা ব্যস্ত হয়। কীরে ঝগড়া করে এসেছিল?

সোম এল না তো? ফোনও করে না। হলটা কী?

যত বাজে চিন্তা। আমায় ফোন করেছে তো। যদিও মার দুশ্চিন্তা একেবারে অমূলক নয়। ফর্মাল ফোন ছাড়া সোম তেমন করে কথা বলেনি। অফিসে দেখা করতেও আসেনি। সবটা তো মাকে বলা যায় না।

সোমের সঙ্গে দেখা হল একেবারে প্রদর্শনীর দিন। শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে। উনি আবার বেশ শৌখিন সাজগোজ করতে পারেন। শিপ্রার কাজ দেখে রীতিমতো হইহই করে উঠলেন। হাসি পাচ্ছিল শিপ্রার। সত্যি বোঝা আর নকল বোঝায় অনেক তফাত যে। দলের সবাই অবশ্য বলছিল তোর লাক ভালো। বর সুন্দর অনেকেরই হয়। সুন্দরী শাশুড়ি সবার জোটে না।

এক ফাঁকে সোম জিজ্ঞেস করল, বাড়ি যাচ্ছ কবে? বৃহস্পতিবার এটা শেষ হবে। শুক্রবার যাব তাহলে। না না বৃহস্পতিবারই চল। আমি নিতে আসব তোমায়।

সোমের আগ্রহে তখনকার মতো রাগ দুঃখ মুছে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে দেখে রান্নার লোক অনুপস্থিত। ও নাকি কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মুখ ভার করে বসে আছেন সোমের মা। গজগজ করছেন নিজের মনে। সোম নিজেই বলল, ফোন করলে পারতে। কিছু কিনে আনতাম।

পয়সা! অত সস্তা না? আমি আছি যখন দুটো ভাতে ভাত ঠিক ফুটিয়ে নেব।

রাতে গুম হয়ে ছিল ও। অনাসক্তি দেখেও জোর করে কাছে টানছিল সোম। শেষে ভ্রু কোঁচকাল, কী হল?

ঢঙ করছ কেন?

মানে? আজ ইচ্ছে করছে না একদম।

ইচ্ছে করছে না কেন? অন্য কেউ জুটল নাকি?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ও। কী বলছ কী? আমার সঙ্গে এভাবে কথা বোলো না। দিনের পর দিন এসব নোংরামি আমার অভ্যেস নেই।

নোংরামি? কাকে নোংরা বলছ তুমি?

আবার কাকে? তোমাকে, তোমার মাকে...।

ঠাস করে ওর গালে একটা চড় দিয়েছিল সোম। আর কোনোদিন যদি মার নামে কিছু বল...।

ঘটনার আকস্মিকতায় থতোমতো খেলেও শিপ্রা বলেছিল সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না আমি। আবার বলব। আর এখানে আমি থাকব না।

তোর ঘাড় থাকবে...। জোর করে ওর ম্যাক্সি ধরে নিজের কাছে টানছিল সোম। ছিঁড়ে যাচ্ছিল হুক। আর নখে দাঁতে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল ও।

ঠিক তখুনি অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠল সোমের চোখ। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে একদম অবশ হয়ে গেল শিপ্রা। এ কার চোখ? এ তো সোম নয়? গলায় সোমের হাত তখন চেপে বসেছে। নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে বুঝতে পারছিল ও জোর করে ওর মধ্যে ঢুকছে সোম। বুক, পেট, গাল, গলা জ্বলে যাচ্ছে। তীব্র বিতৃষ্ণার মধ্যেও সারা ঘর জুড়ে এক অদ্ভুত বোটকা গন্ধ পেয়েছিল। ঝিম মারা অবস্থাতেও গন্ধটা চিনতে ভুল হয়নি। তুব বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করা কী যায়?

সকালে ঘুম ভাঙল সোমের নবম আদরে। আদর করতে করতেই ও আগের রাতের বিশ্রী ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছিল বারবার। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। পাঁচ আঙুলের চাপা দাগ। কাপড় জড়িয়ে ঢাকা দিয়েছিল শিপ্রা।

শাশুড়ি তাকিয়েছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তোমার গলায় আবার কী হল?

কিছু না। ঠান্ডা গরমের ব্যথা। গার্গেল করলেই চলে যাবে।

দু-তিনদিন বাদেই ফোন করল হিয়া। তোর বর এসেছিল। আড্ডা মেরে গেল।

কোথায়?

কেন ধ্রুবদার বাড়ি। তোকে বলেনি। আরে তার আগে তোর মোবাইলে ফোন করেছিলাম তো। সোমই ধরলেন, তুই তখন বাথরুমে। ধ্রুবদার ওখানে মিটিংটার কথা বলে দিতে বলেছিলাম তোকে। তুই তো এলি না। বদলে উনিই এলেন। বেশ জমাটি লোক। তুই লাকি।

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল শিপ্রা। সোম ওকে বলেনি কেন?

সোমের আড্ডা মারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যও ফাঁস হয়ে গেল দু-একদিনের মধ্যেই। কাজে মন বসাতে না পেরে সোফায় বসে সাম্প্রতিক ভালো ভালো কাজের ওপর ড্রইং-এর একটা লিটারেচার ওলটাচ্ছিল ও। সোম হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারবে?

সতর্ক হয়ে গেল শিপ্রা। হিয়ার কাছে সেদিনের এপিসোড শুনে সোমের সঙ্গে খুব কুল ব্যবহার করছে। তাই ঠান্ডা ভাবেই বলল অত টাকা কোথায় পাব?

কেন? চেক কেটে দেবে।

অ্যাকাউন্টে অত টাকা নেই।

এগজিবিশনের পেমেন্টটা বাপের বাড়ি রেখে এলে নাকি?

উত্তর দেয়নি ও। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শুধু।

আরও কাছে এসে হিস-হিসিয়ে ছিল সোম। ওই টাকাটা এনে দেবে। এখানে বসে বসে বিনি পয়সায় ফুর্তি মারা চলবে না।

আর কথা বাড়ায়নি শিপ্রা, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। রাতে শাশুড়ি বারবার খেতে ডাকলেও যায়নি। পরদিন সকালেও একই নাইকের পুনরাবৃত্তি। ক্ষমা চাওয়া, বারবার আদর করা। শিপ্রা আর ভুলে যায়! খালি মনে হয়েছিল কে পরামর্শ দেবে? কোথায় যাবে? এ কি কাউকে বলার। তাছাড়া এ ব্যাপারে কার সঙ্গে শেয়ার করবে ও। ঠিকঠাক চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো শক্তি কারই বা আছে?

এখনও মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। ঝড়ো হাওয়ায় জানলা বন্ধ করতে গিয়ে মনে পড়ে অন্য এক বাড়ির কথা। চলে আসার দিনের কথা।

লোডশেডিং হয়েছিল হঠাৎ। অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে নিজের ঘাড়ে পিঠে পাউডার ঢালছিল ও। সোম হঠাৎ এসে মুখ ঘসতে শুরু করল গলায়, গালে, গা গুলিয়ে উঠছিল। একটা বোটকা গন্ধ আসছে সোমের শরীর থেকে। নরম গলায় বলেছিল এখন নয়। খুব ঘুম পাচ্ছে। সোম মুচকি হেসে চলে গেল ঘর থেকে। বিছানায় শুয়ে বই হাতে পড়ার চেষ্টা করল একটু। পারল না। শরীরের মধ্যে ঝিমঝিম অনুভূতি একটা। যেন কোনো গভীর বনের ডালপালা ঘিরে ধরেছে ওকে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সব রাস্তা বন্ধ। ও ঘুরছে। বেরোতে চাইছে। পারছে না। চারপাশ চেপে এগিয়ে আসছে বন। হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। কোথা থেকে একটা গন্ধ আসছে। গন্ধের তীব্রতায় গা গুলোচ্ছে। আবার চোখ বুজল। ভাবতে চেষ্টা করল এসব ওর মনগড়া। ভুল হচ্ছে। সবটাই ভুলের কারসাজি। আসলে বিষিয়ে গিয়েছে মন। তাই এসব।

ঠিক তখনই গন্ধটা চিনতে পারল ও। পোড়ার গন্ধ। দুধ পুড়ে গেলে যেমন হয়। অথবা হাঁড়ির নীচটা ধরে গেলে...। আচমকা ওই গন্ধে ভারী হয়ে উঠছিল বাতাস, শুয়ে থাকা যায়নি। জল আনার ভান করে রান্নাঘরে উঁকি মেরেছিল একবার। কিছু নেই কোথাও। শুধু ওই বিকট গন্ধ বাড়ছে ক্রমশ। বারান্দার কোণে কোণে মোমবাতি জ্বলছে। বাবা, মা আর ছেলে নীচু গলায় কথা বলছে শাশুড়ির ঘরে। লোডশেডিং চলছে তখন।

ওর সাড়া পেয়ে সোম বলল একবার কী হল? উঠে পড়লে যে? ঘুম হল না?

আশ্চর্য, ওদের কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল না। তখনই মনে হল সারা বাড়িতে পোড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে অথচ ওরা কেউ কেন পাচ্ছে না! সন্ধেবেলা শিঙাড়া বানিয়েছেন শাশুড়ি। প্লেটে করে ওর ঘরে রেখে গেছেন। শ্বশুর বাইরে হেঁটে ফেরার পরে কথা বলেছেন অনেকদিন বাদে। কি শরীর ভালো তো? সবশেষে সোমের আদর। সবকিছু এত ভালো। তবু কিছুই ভালো লাগছে না। যেন কোনো

অশরীরী ভয় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, ঘিরে ধরছে। তবে কী? ঘরের দরজা ভেজিয়ে বাপের বাড়িতে ফোন করল মোবাইলে। মা এক্ষুনি বাবাকে পাঠিয়ে দাও। বলো তোমার শরীর খারাপ। আমি না গেলে চলবে না।

ওদিকে রিসিভার কানে মাও ভয় পেয়েছিল হয়ত। তবু কথা বাড়ায়নি।

না, ওর অনুভূতিতে কোনো ভুল হয়নি কখনও। ওর নিজস্ব ওই অ্যান্টেনাকে অবিশ্বাস করে কী করে? কিন্তু কে? এসব খবর পাঠায়। কেন হয় এরকম? শুধু ওর সঙ্গে। বাবা বাড়িতে ঢুকতেই গন্ধটা কমে গেল হঠাৎ। তারপর আস্তে আস্তে নিভেই গেল একেবারে।

শাশুড়ি, সোম, শ্বশুর সবাই বাবার আবির্ভাবে হকচকিয়ে গিয়েছে। শাশুড়ি বললেন, এত রাতে নিয়ে যাবেন? সানে নটা বাজে। কাল সকালে যেত না হয়।

শিপ্রা দেখল ওঁর সারা শরীরে কাঁটাগুলো খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চোখের মণির রং পালটাচ্ছে।

সোম তীব্র চোখে দেখছিল ওকে। হঠাৎ এরকম যাওয়ার মানে কী? ও গেলেই মা ভালো হয়ে যাবেন? সোমের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল ও। তবু বোটকা গন্ধটা ওর পেছন ছাড়েনি।

শ্বশুরমশাই নিঃশব্দে ঢুকে গিয়েছিলেন পাশের ঘরে। কথা বলেননি কোনো। আর পোড়া গন্ধটা একেবারে ভ্যানিশ্।

ওখান থেকে ফিরে আসার পর যখন আর কোনোদিন ফিরেই যাবে না বলল শিপ্রা, তখনও মনে একটু সংশয় ছিল। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে সম্পর্ক না রাখাই ভালো। তবু বাবা চুপচাপ। মা কান্নাকাটি করছে। ওর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা কাউকেই বলেনি ও। কেউ বিশ্বাস করলে ভালো, না করলে বলবেটা কী? তাছাড়া বাইরের মানুষ ভাববে সবটাই একটা বাজে অজুহাত। সারাদিন একটা খারাপ লাগা ঘিরে থাকত ওকে। সারাক্ষণ ভাবত, তবে কী ভুল করল কিছু? আর একটু ধৈর্য দেখালে হত? ঠিক সেই সময়ে আবার কেউ নিশ্চিন্ত করে দিল ওকে।

সপ্তর্ষির মিটিং ছিল। যাব না যাব না করেও চলে গিয়েছিল ও। ভয় একটা ছিলই, কোনোভাবে কেউ কিছু জেনে গেছে নাকি? ঘরে ঢুকতেই সবাই হইহই করে উঠল।

এত দেরি করলি?

শিপ্রা জবাব দেয়নি কোনো। সেই চেনা বোটকা গন্ধটা বাতাসে ভাসছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসেছে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছিল ও। কে? এখানেও কেউ আছে তাহলে।

হিয়াই ধমকাল ওকে। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিস কী? তোর জন্য অপেক্ষা করে করে এই মাত্র চলে গেল একজন। বল দেখি কে?

তখনও হাঁ করে দেখছে হিয়াকে। হিয়াকে কেমন অন্যরকম দেখতে লাগছে, না? তাই ওর কথার জবাব দেয়নি।

কী ভাবছিল তুই? তোর বর সোম এসেছিল। এতক্ষণ ছিল। কতবার বললাম মোবাইলে রিং মারি। রাজি হল না। তুই নাকি রাগ করে বাপের বাড়িতে এসেছিস। হঠাৎ সারপ্রাইজ দেবে বলে ও এখানে এসেছে।

কথা না বলে সামনের চেয়ারটা টেনে বসল শিপ্রা। এরা তাহলে কিছুই জানেনি এখনও। ডিভোর্সের প্রস্তুতি তো শুরু হয়ে গিয়েছে।

হিয়া গড় গড় করে বলে যাচ্ছে অনেক কথা। কিছু কিছু ঢুকছে কানে। আমার কিন্তু সোমকে বেশ লাগে। কী সুন্দর কথা বলে। হাসিটাও বেশ ম্যান্‌লি। দেখিস বাপু চটে যাস না। যা বর-পাগলা তুই। কীরে ঝিমোচ্ছিস কেন? চা দিতে বলব?

শিপ্রা ঘামছিল ভেতরে ভেতরে। তবু দেখছিল হিয়াকে। ওকে হরিণের মতো দেখাচ্ছে।

কেন? তাহলে কী?

এক প্রজাপতি ও বৃক্ষলতা

অঞ্জলি দাশ

সামনে আবার একটা অনিশ্চিত জীবন, এসব তারই পূর্বাভাস। বুকের ভেতরটায় অদ্ভুত একটা কনকনে ঠান্ডা স্রোত মাঝেমধ্যেই আমাকে জানান দিচ্ছে সেকথা। এই লক্ষণগুলোতে আমি অভ্যস্ত। ছবিটা খুব চেনা, শুধু রংটা আলাদা।

এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি শেওলা রঙের কলাক্ষেত্র শাড়ি, তার সঙ্গে কালো ব্লাউজ। ঘাড়ের কাছে প্রায় ভেঙে পড়া খোঁপা। তানপুরাটাকে আঁকড়ে ধরে আছে অবলম্বনের মতো। এই স্পর্শটাতে সে শরীরী আনন্দ পায়। এই আমার মা। সবার কাছে শুনি ভালো কবিতা লেখে।

আমি কবিতা বুঝি না, কিন্তু মা যে খুব ভালো গান গায় সেটা জানি। ছুটিব দিন বলে দুপুরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। কখন চোখ জড়িয়ে এসেছে বুঝতে পারিনি। গানের সুরে ঘুম ভেঙেছে। মা গান গাইছে। অনেকদিন পর। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা ভাঙনের পূর্বাভাস। একটা নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রস্তুতি চলছে।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি আগামী ক'দিনের ভবিতব্য কী। আমার মুখস্থ। প্রত্যেকবার এভাবেই সূচনা হয়। গত তিন-চারদিন ধরে যা ঘটে চলেছে, একটু এদিক-ওদিক করে নিলে ছবিটা প্রায় একই। তবে এবারে টানাপোড়েনটায় একটু অন্য মাত্রা লক্ষ করছি। ভিতরে ভিতরে তীব্র ভাঙচুর চলছে। সিদ্ধান্ত নিতে মায়ের একটু অসুবিধা হচ্ছে।

এই নিয়ে চতুর্থবার। প্রথম বারেরটা আমার জানার কথা নয়। কারণ, তখন আমার বয়স তিন মাস। তবু দিম্মার কাছে অনেকবার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

—বেড়াল যেমন বিপদের আঁচ পেলে তার বাচ্চাকে ঘাড় কামড়ে নিয়ে এখান থেকে ওখানে পালিয়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনি করে তোকে বুকের মধ্যে লেপটে নিয়ে, এক হাতে একটা কিটব্যাগে তোর কিছু কাঁথা, কাপড়চোপড় আর অন্য হাতে ওর নিজের একটা ছোটো সুটকেস নিয়ে যেদিন বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল...এই উপমাটাই আমার মনে এসেছিল।

শুনতে শুনতে বহু দিন আগের সেই দৃশ্যটা কল্পনা করে বারবার চোখ জলে ভরে উঠেছে আমার। এক কিশোরী মায়ের অসহায়তা অনুভব করে কষ্টে বুক ভেঙে গেছে। কত আর বয়স তখন মায়ের বড়োজোর আঠারো-উনিশ। আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, সবে ক্লাস টুয়েলভ পাশ করা একটা মেয়েকে তড়িঘড়ি বিয়ে দিতে গেলেন দাদু-দিম্মা। এই বয়সে তো পরীক্ষার আগে আমার মা আমাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েছে। দিম্মার কাছে আমি অনেকদিন জানতে চেয়েছি, একটা দায়সারা গোছের জবাব দিয়েছেন।

—তোর দিদুন আমার ছোটোবেলার বন্ধু। তোর মা একটু বড়ো হয়ে ওঠা থেকেই ও আমার

পিছনে আঠার মতো লেগে ছিল, এত সুন্দর মেয়েটাকে সে কিছুতেই অন্যের ঘরে যেতে দেবে না। ওর এত আগ্রহ দেখে আমিও আহ্লাদে ডগমগ।

—তাই বলে নিজের মেয়ের পড়াশুনো, ভবিষ্যতের কথা ভাববে না! তুমিই তো বলেছ মা পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল।

—ছিলই তো। তোর দিদুন বলেছিল, পড়াশুনোটা ও না হয় আমার কাছে থেকেই করবে। তখন তো ভাবতে পারিনি এমন হবে। আমারই ভুলে ওর জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। তোর দাদুও তো কোনোদিন মেয়েটাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায়নি। আমার একার সিদ্ধান্তে সব কিছু হয়েছে। আমার মেয়েটাও যে বড্ড বোকা, ছেলেমানুষ।

দিম্মা তাঁর মতো করে বলেন। নিজের সন্তান, ওঁর দেখাটা একটু একপেশে লাগে আমার মাঝেমাঝে। ওঁর মেয়ে যে এতটা ধোয়া তুলসীপাতা নয়, সে তো আমি জানি। যার রক্তরসে ন'মাস ডুবেছিলাম, তার ধমনির প্রতিটি স্পন্দন আমি চিনি। চিনি বলেই আজ এই ভয়, এত যন্ত্রণা, এমন চারপাশ অন্ধকার করে দেওয়া হাহাকার টের পাচ্ছি বুকের ভেতর। কেননা এটাই ছিল আমার স্বপ্ন নিয়ে জীবনটাকে দাঁড় করানোর শেষ চেষ্টা। বলা ভালো, জীবনকে পূর্ণরূপে অনুভব করার স্বাদ আমার এই প্রথম। এর আগে মা প্রতিবার নতুন করে জীবন শুরু করেছে, আর আমি একটু একটু করে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। সবার অজান্তে আমার হাত ফসকে ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ে গেছে আমার শৈশব, কৈশোরের চাওয়া-পাওয়াগুলো। আমার ভেতরের তৃষ্ণাটাকে মা কোনোদিন ছুঁতেই পারেনি।

এবার আমি আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছি। আজ একদিকে আমার ভুলে ভরা মা, অন্য দিকে পায়ের তলার এই শক্ত মাটি, শেকড়ের অনুভব, দু'দিকেই সমান টান অনুভব করছি। মা নিজেও হয়তো সেটা বুঝতে পারছে। ছোটোবেলা থেকে বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরা আকাঙ্ক্ষাগুলো এই প্রথম আমাকে ঘিরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। জীবনের এই মাধুর্যটুকু আমি হারাতে দেব না।

অন্যবার এই দিনগুলোতে আমি খুব আপসেট থাকতাম। ক'দিন খুব ইনসিকিওরড লাগত। তারপর ধীরে ধীরে একটা গোজাঁমিল দেওয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতাম। অভ্যস্ত হতাম, তবে রংটা পাল্টে যেত। জীবনের রং। বারবার এই পট পরিবর্তনের জন্যই কোনোদিন আমার কোনো স্থায়ী ঠিকানা হয়নি। একটা নিজস্ব ঠিকানার জন্যে আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বরাবর। অবশেষে সেটা আমি পেয়েছি। এর আগে নিজেকে ভেসে বেড়ানো শেওলার মতো মনে হত। এই প্রথম আমি বুকের ভেতর শেকড়ের টান অনুভব করছি। নিশ্বাসের প্রতিটি ওঠাপড়ায় একটা বন্ধনের মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। কে যেন শক্তি জোগাচ্ছে আমাকে, প্রতিরোধের শক্তি।

॥ ২ ॥

প্রায় সাড়ে সাত বছর আগে কার্শিয়াং থেকে প্রথম যেদিন আমি এখানে আসি, সেই দিনটা আমার কাছে ছিল দীর্ঘ কুয়াশার পর সূর্যোদয়ের মতো। বুকের মধ্যে পুরোনো অভ্যেসের নির্লিপ্তি নিয়ে গাড়ি থেকে নামার পর বাড়িটার দিকে তাকিয়েই নিজের ভেতর প্রচণ্ড একটা লোভ টের পেয়েছিলাম। আজন্ম খর রোদ্দুরে হেঁটে এসে সামনে টলটলে কাঁচজলের দিঘি দেখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই।

পুরোনো আমলের তিনতলা বাড়ি। মরচে ধরা লোহার গেট পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। লন বলতে যা বোঝায়, তা নয়। কিন্তু সযত্নে লালন করা একটা ঘাসের বিছানা। তার ওপর মনের আনন্দে বেড়ে ওঠা নানারকম দেশি ফুলের গাছ। কী নেই—কামিনী, গন্ধরাজ, টগর, মল্লিকা, জুঁই,

চাঁপা, জবা, কলাবতী। সবাই যে যার মতো বেড়ে উঠেছে, পরিচর্যা ছাড়াই ফুল ফোটাচ্ছে। এখানে কোনো মরসুমি ফুল নেই। যা আছে, সে সবই এই বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা।

সেটা মার্চ মাস। তবু সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন বাপু। আমি এখানে আসার আগেই এই শব্দটা জেনে গিয়েছিলাম। এ-বাড়িতে ওঁকে এই নামেই ডাকা হয়। মা বলেছিল, ক'দিন হল ওঁর একটু সর্দিজ্বর মতো হয়েছে, তাই স্টেশনে আসেননি আমাকে রিসিভ করতে। 'ওয়েলকাম' বলে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। মায়ের চেয়ে অন্তত উনিশ-কুড়ি বছরের বড়ো, প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লেগেছিল। আমি সচরাচর অচেনা কাউকে প্রণাম করি না। সেদিন নীচু হয়ে ওঁকে প্রণাম করলাম। মা বলে দেয়নি, তবু নিজে থেকেই করতে ইচ্ছে হল। দু'হাতে আমার কাঁধ ধরে তুলে বললেন, এই বাড়িটা তোমার জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছে, তুমি সেটা বুঝতে পারছ?

ওঁর কথায় এই সুর, এই স্পর্শটা আমার কাছে নতুন। আমার কান্না পেয়ে গেল। এভাবে কে আর কবে আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। মুখের দিকে না তাকিয়ে একপাশে সরে গেলাম। ওঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল, যা শোনার জন্য আজন্ম আমার বুকের ভেতর একটা তৃষ্ণা ছিল। আমার লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল, জাপটে ধরতে ইচ্ছে করছিল এই নতুন উপলব্ধিকে।

একতলায় বড়ো ড্রয়িংরুম পেরিয়ে মায়ের সঙ্গে দোতলায় এলাম। 'এটা তোর ঘর', বলে মা এই ঘরে আমাকে রেখে পাশের ঘরে গেল চেঞ্জ করতে। ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুকের ভিতর থেকে কিছু একটা উপচে বেরতে চাইছিল। আমার রুচি, ছোটো ছোটো পছন্দ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ঘরটা। জানি এসব মায়ের হাতেই হয়েছে। কিন্তু সেই হয়ে ওঠার পিছনে কারও প্রশ্রয় তো থাকা চাই! সেই প্রশ্রয়টুকু আমাকে আপ্লুত করেছিল। মনে হচ্ছিল এটা শুধু আমার ঘর নয়, গৃহ। এ আমার প্রথম গৃহাভিষেক। এর আগেও মায়ের সংসারে আমার মাথা গোঁজার জন্য ঘর বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু সে-ঘর বেশিদিন আমার থাকেনি। যদিও সেজন্য কখনও কোনো আক্ষেপ হয়নি আমার। কেননা সেই গৃহচ্যুতি আমার কাছে মুক্তি নিয়ে আসত, অপমান থেকে মুক্তি। কিন্তু এবার মনে হল, এই ঘরটুকু যদি আবার আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে বাস্তু হারানোর কষ্ট অনুভব করব।

চান-টান করে দুপুরে খাওয়ার টেবিলে আমি আর মা। বহু দিন পর আমার উড়নচণ্ডী মাকে এত অপরূপ লাগল। তৃপ্ত, শান্ত, মায়াময়। টেবিলে সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে আমার চেয়েও মায়ের চোখে বেশি বিস্ময় লক্ষ করলাম। সবই আমার পছন্দের। মা জিজ্ঞাসু চোখে মলিনামাসির দিকে তাকাল। মলিনামাসি বলল, এ সবই বাপু রান্না করতে বললেন।

—পমফ্রেট কোথায় পেলে? ফ্রিজে তো ছিল না।

—তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর বাপু দামোদরকে দিয়ে আনিয়ে দিলেন।

বাপুকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর কাছে যেতে। আসার পর তো কথাই হয়নি তেমন। অন্তত আমি তো কিছু বলিনি। নিঃশব্দে আত্মস্থ করেছি ওঁর আবাহন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাকে সেকথা বললাম।

—একবার দেখা করে আসি?

—এখন থাক। শরীরটা ভালো নেই তো, হয়তো ঘুমোচ্ছেন। তুইও একটু রেস্ট নিয়ে নে।

আমি দুপুরে ঘুমোই না। মা চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে পুরোনো 'সন্দেশ' আর 'আনন্দমেলা' দেখতে দেখতে দুপুরটা কেটে গেল। তারপর উঠে ঘুরে ঘুরে বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে মনে হল আমার পা দুটো ভারী খুশি হয়ে উঠেছে।

বাড়িটা খানিকটা অর্ধবৃত্তের মতো। ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেলাম। খানিকটা খোলা ছাদ, কার্নিশ জুড়ে জুঁই আর মাধবীলতা, ওরা নীচ থেকে লতিয়ে উপরে উঠে এসেছে। অন্য দিকে পাশাপাশি বড়ো দুটো ঘর। দুটো ঘরের সঙ্গেই একটা করে ব্যালকনি। একটা ঘর তালা বন্ধ, অন্যটাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম লাইব্রেরি। দেওয়াল জুড়ে সারি সারি কাঠের আলমারি বইয়ে ঠাসা। একপাশে একটা টেবিলটেনিস বোর্ড। একদিকের দেওয়ালে গোটা তিনেক অয়েলপেন্টিং।

নীচে নেমে দাঁড়াতেই বাবু ডাকলেন, এদিকে এসো। ওঁর ঘর থেকে সিঁড়ির মুখটা দেখা যায়। বিছানায় আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নামিয়ে রাখলেন। আমি কাছে গিয়ে দ্বিধাহীন হাত রাখলাম ওঁর কপালে।

—এখন জ্বর নেই তো?

চোখ বুজলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। একটু পরে চোখ খুলে মৃদু হাসলেন। বললেন, জ্বর এবার পালাবে।

একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন। আমি চেয়ারটা বিছানার পাশে টেনে এন বসলাম। খাটের পাশে একটা চেস্ট অফ ড্রয়ার। তার ওপরে রাখা ফোটোস্ট্যান্ডে একটা ছবি। আগ্রহ নিয়ে দেখছি দেখে বাপু বললেন, আমার ছেলে, নিউ ইয়র্কে থাকে।

—জানি।

—জানো? কিন্তু পরিচয় তো হয়নি। আজ হয়তো হবে। ফোন করবে নিশ্চয়। ও জানে তোমার আজ আসার কথা। হি ইজ টু এক্সাইটেড। ভেবে নাও কী বলে ডাকবে ওকে।

আমার খুব অদ্ভুত লাগছিল, এতদিনকার অভিজ্ঞতাগুলো হোঁচট খাচ্ছিল। আমার ভয় করছিল, এসব আমার কল্পনা নয় তো? মিলিয়ে যাবে না তো?

—পরীক্ষা কেমন হল?

—ভালো।

—ক'দিনের ছুটি?

—ছুটি আর কোথায়, নেক্সট উইকেই ফিরে যেতে হবে। অ্যাডমিশনের ব্যাপার আছে।

—অ্যাডমিশন তো এবার কলকাতায়।

—কে বলল, মা?

—না, মা কিছু বলেননি, বাপু বলছেন।

ওঁর এই স্নেহের কর্তৃত্বটুকু আমার অনুভূতিতে একটা নতুন স্বাদ এনে দিল। শৈশব থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত এই স্বাদটুকু তো কখনও অনুভব করিনি! আমার চারপাশে একটা বৃত্তের সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আভাস আমাকে রোমাঞ্চিত করছিল। মনে হল বাপু যা চাইবেন, তাই হবে। আমি নিজেকে সমর্পণ করতে চাই এই স্নেহের কাছে। এর নামই অপত্য স্নেহ। এর প্রতি আমার একটা তীব্র আকর্ষণ। আকর্ষণ না বলে লোভ বলাই ভালো।

এত দিন ধরে চেপে রাখা আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে মাথা খুঁড়ছিল। একান্ত বাধ্য মেয়ের মতো বাপুর সব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ইচ্ছে করছিল। এটা ঠিক যে মা আমাকে আগলে রাখে সমস্ত প্রাণ দিয়ে, চেষ্টা করে আমার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না লাগে। তবু নিজেকে অসহায় লাগত। মনে হত আমার মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই। সেদিন বাপুর সামনে বসে বড়ো নিশ্চিন্ত লাগছিল। প্রবল ধূলিঝড়ে মুখ গুঁজে রাখার মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পাচ্ছিলাম। বাপুর কথার উত্তরে আমি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে করছিল তাই হোক। আর ফিরে যাব না কার্শিয়াংয়ে।

—কী হল, তোমার মতটা তো জানতে হবে।

বাপু উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে।

—আমি ভাবিনি।

—ভাবো। কারণ তোমার মতো একজন অভিভাবক দরকার আমাদের।

হঠাৎ কী হল, কে জানে, খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। ভেতরটা হালকা ফুরফুরে লাগল। মজা করে বললাম, অভিভাবকের মতামতটাই সবসময় শেষ কথা হবে। রাজি?

—আমি রাজি। তোমার মায়ের কথা জানি না। ওই তো মা আসছেন, জেনে নাও।

তখনই মা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকল।

—তুই এখানে! আমি ভাবলাম ঘুমোচ্ছিস। মলিনাকে বলে এলাম তোকে ডাকতে। সেদিন রাত পৌনে বারোটায় নিউ ইয়র্ক থেকে ফোন এল। এ ঘরে একটা প্যারালাল লাইন আছে। মা আমাকে ডেকে বলল ফোনটা ধরতে। ফোন তুলতেই একরাশ উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ল আমার কানে, হাই, টিয়া, ওয়েলকাম হোম।

কান্নায় আমার গলা বুজে আসছিল, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারছিলাম না। আমার মধ্যে একটা অন্য টিয়াকে দেখতে পাচ্ছিলাম। জীবনের সমস্ত মাধুর্য যেন উপচে পড়ছিল আমাকে ঘিরে, সেই প্রথম নিজেকে মহার্ঘ মনে হল। সেদিন রাতে মাকেও উৎসবের মেজাজে দেখলাম। দীর্ঘ পথশ্রমের পর ঘরে ফেরার আনন্দে দু'জনেই খুব নিশ্চিন্ত আর উৎফুল্ল ছিলাম। তবু ভেতরে জমে থাকা দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস আর আশঙ্কা আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল, মা এখানে আমরা কতদিন থাকব?

মা আমার খোঁচাটা বুঝল কিনা জানি না। মা বলল, তুই চাইলে সারাজীবন।

॥ ৩ ॥

ছ'বছর বয়সে সবার পীড়াপীড়িতে আমাকে কার্শিয়াংয়ের বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন মায়ের দ্বিতীয়বার সংসার পাতার তোড়জোড় চলছে। শুনেছি মা নাকি কিছুতেই আমাকে কাছছাড়া করতে চায়নি। মায়ের সবসময় ভয় ছিল, আমার জন্মের অন্যতম দাবিদার যদি আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। ভয়টা অহেতুক ছিল, কারণ সে আর ফিরে তাকায়নি আমার দিকে। তার তো অন্য জীবন কেন সে পিছুটান রাখতে চাইবে? আমাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, মানে আমি সমস্যা তৈরি করছিলাম বলে মায়ের দ্বিতীয় সংসারও বছর দেড়েকের বেশি টেকেনি। আবার সেই মামাদের আশ্রয়ে ফিরে আসা।

একটা সময় ছিল, যখন কার্শিয়াং যাওয়ার সময় প্রত্যেকবার কান্নাকাটি চলত, যেতে চাইতাম না। মাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না। ধীরে ধীরে অভ্যেসটা পাল্টে গেল। হস্টেল জীবনটাই আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল। মায়ের জীবনে তখন নতুন প্রেম আসতে শুরু করেছে। নিজেকে খুব অবহেলিত মনে হতে লাগল। যে-জায়গাটা শুধু আমার ছিল, সেখানে অন্য একজন ভাগিদার এসে গেছে, এটা আমি প্রথম প্রথম একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম। মা যথাসাধ্য চেষ্টা করত তার নতুন জীবনের সঙ্গে আমাকে জুড়ে নিতে। কিন্তু জোড়া লাগত না, ফাঁক থেকেই যেত। উপরন্তু সেই ফাঁকফোকরে জমে উঠত অপমান আর গ্লানি। একটা দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি হত। আমার তো তবু বোর্ডিং স্কুল ছিল, সেখানে গিয়ে অপমানের ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতাম। মা একা যুদ্ধ করত তার প্রেম আর প্রয়োজনের সীমারেখার ওপর দাঁড়িয়ে। আমি মানসিকভাবে একটু একটু করে একা হয়ে পড়তাম। ছোটোবেলা থেকে এই জটিল খেলায় আমি অভ্যস্ত এবং বেশ পারদর্শী হয়ে উঠছিলাম। ছুটিতে

যখন কলকাতায় ফিরতাম, মায়ের নতুন সংসারে আমি একটা উপদ্রব বলে গণ্য হতাম। প্রতি মুহূর্তে সেটা অনুভব করে বিষ জমত ভেতরে ভেতরে।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে, কার্শিয়াংয়ের বোর্ডিং স্কুলের জীবনের সঙ্গে সুন্দরভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছি, তখন একবার শীতের ছুটিতে আমাকে নিতে মা কার্শিয়াং এল একজনকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে অতিরিক্ত আন্তরিক ব্যবহার করছিলেন, যেটা আমি একেবারেই নিতে পারছিলাম না। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ভদ্রলোক আমার জন্য প্রচুর উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভেতরে বিষ জমেছিল বলে ওই উপহারগুলোকে আমার মনে হচ্ছিল ঘুষ। আমার কাছ থেকে মাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চতুর উপঢৌকন। ছুটিতে কলকাতায় ফিরে মায়ের নতুন সংসারে উঠলাম। ভদ্রলোক ডিভোর্সি। একটা মেয়ে আছে, সে মায়ের কাছে থাকে। সম্বোধনহীন কথাবার্তা বলছি দেখে ও-বাড়িতে যাওয়ার কদিন পরে মা আমাকে বলল, সোমেশ কিন্তু তোকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসে। ওর নিজের মেয়ে তো কাছে থাকে না, ওর ইচ্ছে তুই ওকে বাবা বলে ডাকিস।

মায়ের অনুরোধে শত চেষ্টা করেও তার সে ইচ্ছে আমি পূরণ করতে পারিনি, দু'অক্ষরের ওই শব্দটাকে ঘিরে আমার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা কিছুতেই ঠোঁটের বন্ধ অর্গল খুলতে দেয়নি। কিন্তু এবারে আমি কোনো সমস্যা তৈরি করিনি, উল্টে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা ও সমস্যা ফেস করতে হচ্ছিল আমাকে। সোমেশ মায়ের চেয়ে আমার দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল। মনোযোগটা ক্রমেই শরীরী হয়ে উঠছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে গেলেই হিংস্র হয়ে উঠছিল সে। আক্রোশটা গিয়ে পড়ছিল মায়ের ওপরে। বুঝতে পারছিলাম ওদের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। সুতরাং ক্লাস নাইনের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর উইন্টার ভেকেশন কাটাতে মায়ের সঙ্গে আমি আবার দিম্মার বাড়িতেই ফিরলাম। তারপর আরও একবছর কেটেছে, মায়ের জীবনযাপনের ব্যাপারে আরও খানিকটা নিস্পৃহ হয়েছি। মা আমাকে সুস্থ মজবুত কোনো দাঁড়ানোর জায়গা দিতে পারবে এটা আশা করা তখন আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম।

এ-বাড়িতে আসার পর সপ্তাহখানেক কেটে গেল ঘোরের মধ্যে। বাড়িটা ক্রমেই আমার বুকের ভেতর সেঁটে বসছিল, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এর প্রত্যেকটা পরতকে লোভীর মতো আত্মস্থ করছিলাম আমি। পনেরো বছর ধরে যাপন করে আসা অবহেলা আর অপমানের জীবনটাকে মুছে এ যেন নতুন জন্ম আমার। জন্মের পর একটি শিশুর যে- যে ইচ্ছের উন্মেষ ঘটে, তার সবগুলো যেন আমি জেগে উঠতে দেখেছিলাম নিজের মধ্যে। প্রত্যেক মুহূর্তে আমার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল অপরিসীম প্রশ্রয়, যার পিছনে একটা স্নেহের হাত আমি অনুভব করছিলাম। আমার ভেতর একটা অচেনা আহ্লাদ স্ফুরিত হয়ে উঠছিল। জিভের ডগায় বুড়বুড়ি কাটছিল দু'অক্ষরের একটা সহজ শব্দ, যা শিশুর প্রথম বাকস্ফুরণের সময় স্বতঃস্ফূতভাবে বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। সেই শব্দটাই অবরুদ্ধ হয়ে আছে আমার ঠোঁটের নীচে। শব্দটাকে অর্গলমুক্ত করার জন্য এতদিন পরে এই প্রথম একটা আকুলতা অনুভব করলাম। শুধু একটা সাপোর্ট দরকার।

সে সুযোগও এল পনেরো-ষোলো দিন পর। সেদিন বিকেলে ফোন বাজছিল। আমি ফোনের পাশে ছিলাম, কেউ তুলছে না দেখে আমিই রিসিভ করলাম।

বলছি।

—কে, টিয়া?

—হ্যাঁ।

—আমি ড. সুবীর দত্ত বলছি। তোমার বাবা আছেন? একটু ডেকে দাও।

শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে একটা আশ্চর্য শিহরন হয়ে সারা অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ল।

—ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমি টিয়া?

—জয়ন্ত বলছিল, কেউ যদি ফোন তুলে বলে 'বলছি', বুঝবে সে আমার মেয়ে টিয়া।

ইচ্ছে হচ্ছিল, ওখান থেকেই বাবা বলে চিৎকার করে ডাকি, ঠোঁটের আড়ষ্টতায় আটকে গেল। কারণ এর দু'-তিনদিন আগে, তখনও সম্বোধনটা ঠিক করে উঠতে পারিনি, মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি ওঁকে কী বলে ডাকব? মা বলেছিল, এ-বাড়িতে সবাই ওঁকে বাপু বলে ডাকে, তুইও তাই ডাকবি।

আশাভঙ্গের অভিমানে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দু'ঠোঁটের কাছে এসে সংকোচে থমকে গিয়েছিল শব্দটা। এরপর আর কোনোদিন পারিনি। কিন্তু মনে মনে আকুল হয়ে হাজারবার ডেকেছি।

আবছা মনে আছে, তখন আমরা দিম্মার কাছে থাকি। পাড়ার একটা নার্সারি স্কুলে আমাকে ভর্তি করা হয়েছে, রোজ আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মা ইউনিভার্সিটিতে যায়, ছুটি হলে দিম্মা নিয়ে আসে। স্কুলের অন্য বাচ্চারা বাবার হাত ধরে আসে, মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফেরে। আমার মামাতো, ভাইবোন বুম্বা-টিনার ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম! একদিন মাকে বললাম, মা, মামুকে বলো না আমাকে স্কুলে দিয়ে আসতে। মা মামুকে বলতে, মামু একদিন বাজারে যাওয়ার পথে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিল। আমি বন্ধুদের বললাম, আজ না আমাকেও আমার বাবা স্কুলে দিয়ে গিয়েছে। সেই কথা কী করে যেন বাড়িতে সবার কাছে পৌঁছে গেল। তাই নিয়ে মামণি দিম্মাকে কীসব বলল। মা মামণিকে কেঁদে-কেটে কীসব বলল। বাড়িতে খুব অশান্তি হল তা নিয়ে। আর একবার মামা বাইরে কোথাও গিয়েছিল। চার-পাঁচদিন পর যেদিন ফিরে এল সেদিন টিনা, বুম্বা আর আমি বারান্দায় খেলছিলাম। দূর থেকে মামুকে দেখতে পেয়ে ওরা দুজন 'বাবা' 'বাবা' বলে গেটের দিকে ছুটল। তাই দেখে আমিও ওদের মতো করে 'বাবা' বলতে বলতে ছুটলাম। সেটা নিয়েও মামণি বেশ বকাঝকা করেছিল মাকে। মা কেঁদেছিল। সেদিন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছিল। রাতে শুয়ে মাকে আদর করে বলেছিলাম, আর কখনও 'বাবা' বলব না মা, তুমি কেঁদো না। সেই থেকে দু'অক্ষরের ওই সম্বোধনটা আমার কাছে একটা যন্ত্রণার স্মৃতি হয়ে রইল। আমার ঠোঁট 'বাবা' শব্দটাকে আমার কাছে নিষিদ্ধ করে দিল। এমনিতে মামাকে আমি মামু বলেই ডাকতাম, সেদিন কোনো এক অবদমিত ইচ্ছে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল। বলতে ভালো লেগেছিল। এসব ঘটনা কিছুটা আবছা হয়ে লেগে আছে আমার স্মৃতিতে, আর কিছুটা পরে দিম্মার কাছে শোনা।

আমি এখানে আসার পাঁচ মাস পরে ভাইয়া এল। এই সম্বোধনেই আমি ডাকি ওকে। এ-বাড়ির একমাত্র ছেলে। খোলা হাওয়ার মতো। আমার বুকের ভেতর যত অবহেলা আর গ্লানির ধুলোবালি জমেছিল, সব উড়িয়ে দিয়ে আমাকে নতুনভাবে চিনিয়ে দিল। শৈশবে মাকে হারিয়ে ও কোনোদিন পূর্ণ পারিবারিক আবহ অনুভব করতে পারেনি। উচ্ছ্বাস দেখে মনে হল ওর অবচেতনেও কোথায় হয়তো লুকিয়ে ছিল এমন একটা গৃহচিত্র। একদিন খবরের কাগজ দিতে বাপুর ঘরে ঢুকেছি, কানে এল বাপু ভাইয়াকে বলছেন, টিয়াকে কেমন লাগল?

—ভেরি অ্যাফেকশনেট। বাপু, হোয়াই ডোন্ট ইউ অ্যাডন্ট হার?

—তার দরকার আছে কি? চন্দ্রাণী আমার লিগাল ওয়াইফ।

—বাট শি ইজ নট ইয়োর লিগাল ডটার। ওর ওপর কিন্তু তুমি কখনও কোনো দাবি রাখতে পারবে না।

—কাগজের অধিকারে কখনও দাবি তৈরি হয় না, সেটা হয় ভালোবাসায়।

ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে নিজেকে কেমন যেন একটা বেওয়ারিশ সম্পত্তির মতো মনে হচ্ছিল। আমার জীবনে যেন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারের জায়গা নেই। আলোচনাটা আমার ভালো লাগছিল না, দরজায় নক করলাম। তারপর যত দিন যাচ্ছিল একটু একটু করে টের পাচ্ছিলাম আমার কাঙ্ক্ষিত অধিকার এসে যাচ্ছে আমার হাতে, তুলে দেওয়া হচ্ছে।

॥ ৪ ॥

মায়ের দ্বিতীয় বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার পর, মা চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত যে-সময়টা আমরা কাটিয়েছি, সেটা খুব যন্ত্রণার ছিল। দিম্মার কাছে ছিলাম বটে, এক সময় যেটা আমার মায়েরও বাড়ি ছিল—অদ্ভুত নিয়মে সেটা আর আমার মায়ের বাড়ি রইল না। শুধুই মামাবাড়ি হয়ে গেল। অথচ মামাবাড়ির যে আদর-আহ্লাদ, সেটাও আমার কপালে জুটল না। কেননা আমরা তো ছিলাম মামাদের আশ্রিত। মামুর আচরণে সেটা বোঝা না গেলেও, মামণি, বুম্বা, টিনা বুঝিয়ে দিত। এত হীনমন্যতায় ভুগতাম যে তার আঁচটা গিয়ে লাগত মায়ের ওপর। দিনে দিনে আমি জেদি গোঁয়ার আর অবাধ্য হয়ে উঠছিলাম। মা আমাকে শান্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। রাতে শুয়ে শুয়ে আমাকে স্বপ্ন দেখাত আমাদের নিজেদের বাড়ির। সেটা কত সুন্দর হবে, সেখানে আমার কেমন ঘর থাকবে, কেমন করে আমি ঘর সাজাব—সেই স্বপ্ন নিয়ে কেটে গেল কতদিন। আগে কখনও কখনও মনে হত, মা আমাকে যে-সুন্দর ঘরের স্বপ্ন দেখাত, সারাজীবন তারই খোঁজ চালিয়ে গেল। মাকে বারবার ঠাঁই বদল করতে হয়েছে হয়তো আমাকে কেউ গ্রহণ করতে পারেনি বলেই। এখন মনে হয়, শুধু আমার কথা ভেবেই যদি হত, তাহলে তো আমরা সত্যিই নিজেদের মতো করে থাকতেই পারতাম। মায়ের এত ভালো চাকরি ছিল। আসলে প্রথম স্বপ্নভঙ্গের যে-ক্ষত, মা হয়তো জীবনের কাছ থেকে তার দাম আদায় করে নিতে চেয়েছে বারবার। কিংবা নিজের চাওয়াটাকে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি কোনোদিন।

আমি এখন তেইশ। এরই মধ্যে চারবার আমার বড়ো হয়ে ওঠার পটভূমি পাল্টেছে। এই বয়সে জীবনকে এত বিচিত্রভাবে দেখেছি যে, জীবনের জটিলতা, তার হিসেব-নিকেশ আমি অনেক বেশি বুঝি। আগে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগ হত মায়ের ওপর। এখন আর রিঅ্যাক্ট করি না, উপেক্ষা করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুদিন হল নতুন যে উপদ্রবটি শুরু হয়েছে, সেটি ছায়া ফেলতে শুরু করেছে আমাদের জীবনে। তাই বিচলিত লাগছে।

অফিসের কিছু কাজ আমি বাড়িতে নিয়ে আসছিলাম কিছুদিন। রাত জেগে কাজ করতে হলে আমার এক কাপ কফি চাই। এ অভ্যেস আমার কলেজে পড়ার সময় থেকে, মা এটা জানে। মাস দুয়েক আগে একদিন অনেক রাতে কম্পিউটারে কাজ করছি, মা কফি নিয়ে আমার ঘরে এল। কাপটা বেডসাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে গুছিয়ে বসল।

—কাল অফিসের পর তোর সময় হবে?

—কেন?

—একজনের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

--হঠাৎ?

—ক'দিন থেকেই ভাবছি।

—কে সে?

--আমার খুব চেনা একজন মানুষ।

আমার বুকের ভিতর অতিপরিচিত একটা ভয় কাঁটার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুখ না তুলেই বললাম, তোমার সব চেনা মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করার দরকার কী?

—ও তোকে মিট করতে চায়? পরিচয় হলে বুঝতে পারবি মানুষটা সবার চেয়ে আলাদা।

—প্রত্যেকটা মানুষই অন্য একজন মানুষের চেয়ে আলাদা হয় মা।

—ভাবতে পারবি না কী পাগলের মতো ভালোবাসে আমার কবিতা।

—অনেকেই তোমার কবিতা ভালোবাসে, এটা কি নতুন কোনো কথা?

—কথাটা নতুন নয়, সেটা অনুভব করাটা নতুন। ও বলে না দিলে আমি বুঝতেই পারতাম না আসলে কবিতাই আমার জীবন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, শুধু রান্নাবাড়া, ঘর সাজানো আর অন্যের ইচ্ছে হয়ে থাকার জন্যই কী আমার জন্ম? মনে হয় নিজেকে অপচয় করছি। খুব রাগ হয়, কষ্ট হয়।

আমি জানি বাপু কবিতা নিয়ে মাথা ঘামান না। মায়ের গান শুনতে খুব ভালোবাসেন, কিন্তু কবিতার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। প্রশ্রয় দেব না ভেবেও বুকের মধ্যে চিনচিন করে। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মায়ের মুখের দিকে তাকাই। ঠিক হোক ভুল হোক, যুদ্ধ চলছে ভেতরে ভেতরে, অভিমানও। বুঝতে পারি, এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হচ্ছে না। অভিনব স্তুতিতে বা নতুন কোনো প্রলোভনে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও শক্ত মাটি থেকে পা উঠতে চাইছে না। দোলাচলে কিছু ভাঙচুর চলেছে, মুখে তার অস্পষ্ট ছাপ। নরম করে বলি, ওসব কাজ তো তুমি ভালোবেসে করো।

—করি, তবে না করার স্বাধীনতাটুকুও তো পেতে চাই।

—কে তোমাকে বাধ্য করে?

—আমার দায়বদ্ধতা।

—সেও তো তুমি যেচে নিয়েছ।

—নিয়েছি, কিন্তু এখন স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে দায়টাই বড়ো হয়ে উঠেছে। আমাকে ঢেকে ফেলেছে আমার দায়দায়িত্ব। অথচ সাড়ে সাত বছর আগে যখন শুরু করেছিলাম, তখন অন্য প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হয়েছিল।

শুরুটা আমি জানি। বাপু গল্পচ্ছলে বলেছেন আমাকে। ওঁদের একজন কমন ফ্রেন্ডের দৌলতে পরিচয়। প্রথম দিনের আলাপেই বাপুর ভালো লেগেছিল। বাপুর ভাষায়, কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমার জীবনের শূন্যতা ঠিক এই মেয়েটির জন্যই অপেক্ষা করেছিল এতদিন। মনে হয়েছিল, মেয়েটা মেঘের মতো, বৃষ্টির মতো। ভালোবাসার জন্য ও কাঁটার জঙ্গলেও ঝাঁপ দিতে পারে। সেটা ছিল জুলাইয়ের মাঝামাঝি। বন্ধুর বাড়িতে গান গল্প আড্ডার পর বৃষ্টি নেমেছিল। বাপু বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন মাকে। তার দুদিন পর পয়লা শ্রাবণ, অনেক রাতে একটা এসএমএস পেয়েছিলেন। একটা গানের লাইন—'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে...'। সেই কম্পন স্পর্শ করেছিল বাপুকে। আর দ্বিধা করেননি। দুয়ার খুলে আমার মাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনে।

ওঁরা কে কতখানি পেয়েছেন, সে হিসেব ওঁদের। আমার যা-যা পাওয়ার কথা ছিল, সেই সব উপকরণ এখানে সাজিয়ে রাখা ছিল। খুঁজে নিতে একটু দেরি হল, এই যা। আজ আমার বুকের ভেতরে জমে থাকা এতদিনকার সব হাহাকার, হীনমন্যতা মুছে গেছে। এখন নিজেকে দেখে আমি চিনতে পারি না। কোথায় সেই ক্ষোভ, গোঁয়ার্তুমি, বেয়াড়াপনা। এ যেন আমার পুনর্জন্ম। শান্ত, বিবেচক, সহনশীল, দায়িত্ববান একজন পূর্ণ মানুষ। দু'জন অসমবয়সি নারী-পুরুষের প্রেমের

মাঝখানে আমার ভূমিকা আজ সেতুবন্ধনের। আসলে বলা ভালো, ভুল স্রোতে ভেসে যাওয়া একটা নৌকাকে তীরে ভেড়ানোর দায় আমার আজ।

গত তিন-চারদিন থেকে বাপুর অস্বাভাবিক গম্ভীর ব্যস্ততা আমাকে খানিকটা বিব্রত করছে। বাপুর ব্যস্ততা দেখেছি, এর চেয়েও বেশি। গাম্ভীর্য, তাও দেখেছি কখনও কখনও। কিন্তু এভাবে একসঙ্গে দুটো—একটা মুখোশের মতো সেঁটে আছে মুখে। আমিও কাছে পৌঁছতে পারছি না, এমন ঘটনা এই প্রথম। কিছুদিন থেকে অনেক রাত অবধি পাশের ঘর থেকে কিছু ঠান্ডা পাথরের মতো শব্দ বিনিময় ভেসে আসে কানে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি কোন্ দিকে যাবে তা থেকেই কিছুটা অনুমান করি। ভয় পেতে পেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে একসময় ঘুরে দাঁড়াতেই হয়, ঘুরে দাঁড়াই। মা হয়তো আবার গিঁট খুলবে। এ পর্যন্ত মায়ের জীবনে যা-ই ঘটুক না, আমাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তার যাবতীয় পট পরিবর্তন। আমিই তার জীবনের একমাত্র স্থায়ী প্রাপ্তি, তার নিজস্ব সৃষ্টি। এবার তো তাকে দুটো গিট খুলতে হবে। পারবে তো? সেটাই এবার একটা চ্যালেঞ্জ আমার। মায়েরও নয় কি?

॥ ৫ ॥

গান থেমেছে। চুপ করে জানালার গ্রিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মা। পৌনে ছটা বাজে। শহরতলির সূর্য একটু তাড়াতাড়ি রাজপাট গুটিয়ে ফেলে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি গাছপালার রং ঘন হচ্ছে। ফুল আর পাতার রঙের বিভেদ মুছে যাচ্ছে। একটু পরে মলিনামাসির ঘরে ঘরে ধুপ-ধুনো দেবে, শঙ্খ বাজাবে। ওর ধারণা, শঙ্খধ্বনি বাড়ির সব অমঙ্গল দূর করে দেয়। এরপর গোটা বাড়ির আলো জ্বেলে দেবে। এমনকি বাগানেরও। মুখে ভারী মিষ্টি একটা হাসি ফুটিয়ে বলে, যাই অন্ধকার তাড়িয়ে আসি।

ফোন বাজছে। বাপু ওঁর এক বন্ধুকে সি-অফ করতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন। মিনিট দশেক হল ফিরেছেন। এখনও বাইরের জামাকাপড় ছাড়া হয়নি। চোখের সামনে খবরের কাগজ খুলে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন, ফোন ধরছেন না। মা পাশের ঘরে জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ফোন ধরছে না। ফোনটা থেমে গিয়ে আবার বাজছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিই এবার উঠে গিয়ে রিসিভার তুলি।

—বলছি।

—টিয়া।

মুহূর্তে আমি খড়কুটো পাই, ডক্টরকাকু। এতদিন ফোন করোনি কেন? কোথায় ছিলে?

—বাইরে গিয়েছিলাম। কী ব্যাপার বল তো, তোকে খুব এক্সাইটেড লাগছে। বাবা কোথায়?

—ডাকব?

—ডাকতে পারিস, কিন্তু এখন তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে রে মা।

—সে পরে বলবে, এখন তুমি ডাকতে বলো।

—কেন, আমি না বললে ডাকবি না?

—তুমি বলোই না। সেই প্রথম দিনের মতো। একটিবার বলো প্লিজ।

—একেবারে সেই প্রথম দিনের মতো করেই বলতে হবে! বেশ, তোমার বাবা আছেন? একটু ডেকে দাও।

মুহূর্তে আমি সমস্ত দ্বিধা আর অস্বস্তির বাধা ছিঁড়ে, সবটুকু খিদে আর আকুলতা জড়ো করে আমার এতদিনকার অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিলাম। সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে, চিৎকার করে ডাকলাম, বাবা, তোমাকে ডক্টরকাকু ডাকছেন, ফোনটা ধরো।

মা জানালার গ্রিল ছেড়ে আমার দরজার সামনে এসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাপু হাতে ধরা খবরের কাগজটা দুমড়ে সরিয়ে তাকালেন। আমি আবার বললাম, বাবা ডক্টরকাকু তোমাকে ডাকছেন।

বাবু প্রতিক্রিয়াহীন সহজভঙ্গিতে উঠে এসে আমার হাত থেকে রিসিভারটা নিলেন। মনে হল যেন এ-ডাকে তিনি অভ্যস্ত। হয়তো তাই। আমি মনে মনে যতবার তাঁকে ডেকেছি, সে-ডাক তাঁর শ্রুতি স্পর্শ করেছে। মনে হল, বাপু আমার মন পড়তে শিখে নিয়েছেন।

মলিনামাসি ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ির অন্ধকার তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাপু ডক্টরকাকুর সঙ্গে কথা বলছেন। মা আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বারান্দার থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলাম। মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছি। অভিব্যক্তি বুঝতে পারছি না। অন্ধকারের দিকে মুখ করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, তুমি তাহলে যাচ্ছ?

নিরুত্তর।

—যাওয়ার আগে এখানকার সবকিছু আমাকে ঠিকঠাক বুঝিয়ে দিয়ে যেও। চাবিটাবি, বাবার ওষুধপত্র সব।

মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি যাচ্ছি মানে? আমি গেলে তুই কোথায় থাকবি? আর কেনই বা থাকবি? কী সম্পর্ক তোর ওঁর সঙ্গে?

—পাখিরা যে-গাছের ডালে বাসা বাঁধে, সেই গাছের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক মা? আমি তো পক্ষীশাবকের মতো। এই সম্পর্কটা তুমি আমাকে দাওনি। আমরা দু'জনে বানিয়ে নিয়েছি।

কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে ছাদে চলে এলাম। মায়ের দোলাচলের সামনে আমি শুধু আমার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়ে এলাম, মতামত জানতে চাইনি।

আগে ছুটির দিনগুলোতে আমরা তিনজনে প্রায়ই বাইরে যেতাম। সেটা কোনো সিনেমা, নাটক, গানের অনুষ্ঠানে বা শুধুই বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে বাইরে কোথাও ডিনার করে বাড়ি ফিরতাম। কিছুদিন থেকেই সেই নিয়মটা পাল্টে গেছে। মা আমাদের ছাড়াই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে যায়। হয়তো কোনো কবিতার আসরে, হয়তো ডেটিং-এ। একটা অদ্ভুত একাত্মতা বোধে আমি আর বাপু পরস্পরের আরও কাছাকাছি চলে এসেছি। পরশু আমরা দু'জনে বাইরে ডিনার করতে বেরিয়েছিলাম, মায়ের অন্য কোথাও নেমতন্ন ছিল বলে। রাতে বাড়ি ফিরে বাপু হঠাৎ বললেন, ক'দিন ছুটি নিতে পারবি?

—ছুটি। অসম্ভব। দেবেই না এখন!

—তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দে।

—বাহ্, বেশ মজার কথা। কিন্তু ছুটির দরকার কেন তা বলবে তো!

—কয়েকটা দিন বাইরে, দূরে কোথাও ঘুরে আসা যাবে।

—কে কে?

—সেটা তুই ঠিক করবি।

আমিও যেন বাপুর মন পড়তে পারছি।

—কবে যেতে চাও?

—সতেরোই জুলাইয়ের আগে।

চমকে উঠলাম। সতেরোই জুলাই মায়ের সঙ্গে বাপুর প্রথম দেখা হয়েছিল।

আজ এগারোই জুলাই। আজও রাতের খাওয়া নিঃশব্দে শেষ করে উঠে এলাম তিনজনে। বাপু শুধু বেড়াতে যাওয়ার তারিখটা বলে বাকি দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক

কায়দা করে ষোলোই জুলাই থেকে এক সপ্তাহের ছুটি ম্যানেজ করেছি। এয়ার টিকিট বুক করব বলে ইন্টারনেট খুলেছি। মা ঘরে ঢুকল।

—অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।

—একটু কাজ করব?

—কফি করে দেব?

—না।

ষোলো তারিখ ভাইজাগের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। না তাকিয়েই বুঝতে পারলাম মায়ের উৎসুক চোখ কমপিউটারের স্ক্রিনে।

—আমি সাতদিনের ছুটি নিয়েছি মা। বেড়াতে যাব। ক'টা টিকিট কাটব?

—তিনটে।

মায়ের কম্পিত গলা। বুকের ভেতর জমে থাকা এক টুকরো কালো মেঘ জল হয়ে বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখি হাজার ডালপালা, পত্রবিন্যাসে সবুজ, আমার ডানাওয়ালা মায়ের পা দুটো শিকড়ের মতো গেঁথে আছে মেঝেয়।

লজ্জা

জাহান আরা সিদ্দিকী

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিক থেকে বিভিন্ন শহরে গোলমালের খবর আসছে। দিল্লিতে তুমুল উত্তেজনা। প্রচণ্ড সতর্কতা। যে-কোনো মুহূর্তে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

ঠিক এমনি সময় ফারুক বোম্বেতে ট্যুরে চলে গেল। বাড়িতে ফারজানা একলা। সঙ্গে চার বছরের কন্যা ফারিন। আর বাড়িতে মাঝবয়সী কাজের মাসি, রহিমের মা। ফারুক অফিসে যাবার পথে ফারিনকে স্কুলে নামিয়ে দেয়। স্কুলটা কাছেই, সে না থাকায় রহিমের মা সে দায়িত্ব নিল। তবুও ফারুক বাড়িতে না থাকাতে ফারজানা একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকল।

দুদিন পরের সকালবেলা। ফারজানা নাস্তার টেবিলে দৈনিক পত্রিকা উল্টোচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে ফারিন সুন্দর হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। ধবধবে ফর্সা রং, মাথা ভর্তি কালো চুল, মিষ্টি চেহারা। বলল, আজকে বিকেলে প্রীতির জন্মদিনে যাবে তো?

কথাটা ফারজানা ভুলেই গিয়েছিল। ফারিনের ক্লাশমেট প্রীতির বাবা মিস্টার দাশগুপ্ত কদিন আগে তাদের ফোন করে প্রীতির জন্মদিনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ফারিনের হাত দিয়ে কার্ডটাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিবারটির সঙ্গে তাঁদের কন্যাদের মাধ্যমে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ফারিন প্রায়ই স্কুল থেকে ফিরে প্রীতির কথা বলত। তাদের স্কুলে প্রীতিই তার সবচাইতে প্রিয় বান্ধবী। শুনতে শুনতে একদিন ফারজানা ফারিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রীতির পুরো নামটা কী?

—দাঁড়াও বই খুলে দেখি।

প্রীতির একটা বই তার কাছে ছিল। ওটা সে ফারজানাকে এনে দেখিয়েছিল।

ফারজানা আর ফারুক দৃষ্টি বিনিময় করেছিল। ফারুক বলেছিল, পদবী দাশগুপ্ত, তবে তো বাঙালি।

মিস্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে কদিন পরই ফারুকের পরিচয় হয়ে গেল। স্কুল ছুটির পর যে যার কন্যাকে নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। ছুটির ঘণ্টা বাজতে, ভেতর থেকে প্রীতি আর ফারিন দুজনে হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে বের হল। যে যার বাবাকে দেখে খুশিতে ছুটে এসে হাত ধরল। কন্যাদের হাত ধরে ভদ্রলোক দুজন দুজনের দিকে তাকালেন।

ফারিন হাত বাড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল,—বাবা ও প্রীতি।

ফারুক জিজ্ঞেস করল, আপনি কী তবে দাশগুপ্তবাবু?

ভদ্রলোক হেসে দুপা এগিয়ে এসে বললেন,—আর আপনিই নিশ্চয় ফারুক সাহেব?

সেই শুরু। দুপক্ষ দুপক্ষের বাড়িতে, বেড়াতে গেল। মিসেস দাশগুপ্ত ফর্সা, কোঁকড়া চুলের সুন্দরী মহিলা। এককালে নাচ করতেন। এখন দিল্লিতে এসে আর নাচের চর্চাটা হচ্ছে না বলে দুঃখ করলেন। তবে ওদের চারজনের আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুই হল ফারিন আর প্রীতি। দুপক্ষ মিলে গবেষণা করে উদ্ধার করতে চাইল ওদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে যেখানে প্রায় সবাই হিন্দি ভাষার ছাত্রছাত্রী, সেখানে কীভাবে এই দুই বাঙালি নিজেদের খুঁজে বের করে। এটা নিয়ে ওরা বেশ হাসাহাসিও করল। সেই থেকে ওদের মধ্যে যাতায়াতও শুরু হয়। ঈদের সময় প্রীতির মা ফারজানাকে বললেন, আমি কিন্তু সেমাই খেতে পছন্দ করি ওটা থাকবে তো? ফারজানা তাঁর জন্য স্বহস্তে দুরকমের সেমাই রান্না করে।

আর পুজোর সময় ওদের বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট হাতে এলেন দাশগুপ্ত পরিবার। ফারজানাদের নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখালেন। ছোটোরা, ফারিন আর প্রীতি, গলাগলি করে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিমা দেখে বেড়াতে থাকে।

সেই প্রীতির জন্মদিনে না গেলে ভালো দেখায় না।

কিন্তু ট্যাক্সি করে একলা ফারিনকে নিয়ে যেতে সাহস পেল না ফারজানা। শহরের অবস্থা যেরকম থমথমে তাতে একলা সন্ধ্যাবেলা বেরানোর রিস্ক না নেওয়াই ভালো। কখন কী ঘটে যায় কে জানে। ফারুক থাকলে সমস্যা ছিল না। সেই-ই ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আর সবচেয়ে বড়ো কথা দাশগুপ্তবাবুদের বাড়িটা বেশ দূরে। যেতে কম করে হলেও আধঘণ্টা মতো সময় লাগবে। ফারজানা একলা না যাবার সিদ্ধান্ত নিল। তবুও মনের ভেতরটা খচখচ করতে থাকল। ফারিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে নিশ্চয় খুব আনন্দ করত। মেয়েকে আদর করে কোলে তুলে ফারজানা বলল, মা তোমার বাবা তো এখানে নেই। আমরা একলা কীভাবে যাব?

ফারিন নির্লিপ্তভাবে বলল, চল ট্যাক্সি করে যাই।

—এখন চারিদিকে গণ্ডগোল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে—

এটুকু বলেই সে সহসা থেমে গেল।

ফারিন অবাক দৃষ্টিতে ফারজানার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হিন্দু কী মা? মুসলমান কী?

ফারজানা এটুকু বলেই বিব্রত হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। এতটুকু মেয়ের সামনে এসব কথাবার্তা বলা ঠিক না। ওর নিষ্কলুষ মনে বিষাক্ত প্রভাব পড়তে পারে। এমনিতেই চারদিকে যে বাজে পরিবেশ। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আর ফারিন সেসব শুনছে, ফারজানা এসব প্রসঙ্গ ওর কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। অত সতর্কভাবে কথা বলা যাচ্ছে না।

নিজেকে সামলে নিয়ে ফারজানা বলল, সে তুমি এখন বুঝবে না। বড়ো হও তখন বুঝতে পারবে। ফারিনেরও এ নিয়ে জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। সে কথা না বাড়িয়ে মুখটা ভার করে হতাশকণ্ঠে বলল, তাহলে যাওয়া হবে না।

—না মা, পরে তোমাকে একদিন নিয়ে যাব।

—কিন্তু আজকে আমি না গেলে ওর জন্মদিন যে হবে না। ফারজানা ওর গালদুটো টিপে আদর করতে করতে বলল,

—কে বলেছে হবে না? ও জন্মদিন ঠিকই করবে।

ফারিন মাথা নাড়িয়ে গম্ভীর মুখে জানাল।

—না মা প্রীতি বলেছে আমি না গেলে ও জন্মদিন করবে না।

মনে মনে হাসি পেল ফারজানার। কী অবুঝ শিশু। পৃথিবীটা কত জটিল এখনও জানে না। নির্বোধের মতো আশা করে আছে তাকে ছাড়া প্রীতির জন্মোৎসব হবে না।

ফারজানা নিজেই ফোন করে জানিয়ে দেবে ভাবছে এমন সময় ফোন করলেন দাশগুপ্তবাবুই, আপনারা আসছেন তো?

বিব্রতা কণ্ঠে ফারজানা বলল, ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু ও বোম্বেতে। বুঝতেই পারছেন, শহরে টেনশন, এ অবস্থায় আমি একলা—

দাশগুপ্তবাবু ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলেন। বললেন,

—বুঝতে পেরেছি, আপনার একলা আসাটা ঠিক না, আমি এসে নিয়ে যেতে পারতাম—

ফারজানা লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বলল,

—না না, অতদূর থেকে আপনি এসে নিয়ে যাবেন কেন? আপনার ড্রাইভার নেই।

—সেটা কোনো সমস্যা নয়। আসলে সমস্যা হচ্ছে আজই আমাদের কোম্পানির জরুরি মিটিং, প্রায় ছটা পর্যন্ত চলবে। নইলে—

—শুনুন, ও বোম্বে থেকে ফিরলেই আমরা আপনার বাসায় যাব। এখন বরং একগাদা লোকজনের ভিড়ে কথাবার্তা হবে না।

—হ্যাঁ, সেটাও মন্দ হবে না। সন্ধেবেলা আপনারা চলে এলেন, ওরা খেলাধুলা করল। রাতে একবারে ডিনার সেরে আপনারা চলে গেলেন।

—ঠিক আছে সেটাই ভালো হবে।

ফারজানা ফারিনকে ডেকে বুঝিয়ে বলল। ফারিন চুপ করে শুনল, ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল না প্রস্তাবটা তার মনে ধরেছে কি না।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আসছে ফারজানা। হঠাৎ দুজনের কথাবার্তা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। রান্না ঘরের মেঝেতে পিঁড়িতে বসে রহিমের মা গল্প করছে ঠিকে ঝি মনীযার সঙ্গে। একজনের পরনে শাড়ি, অন্যজনের নীল শালোয়ার কামিজ। মনীষা বাংলা বলতে পারে না। তবে রহিমের মায়ের সঙ্গে বিগত দুবছর ধরে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ওর কথাবার্তা বুঝতে শিখেছে। মনীষা রহিমের মাকে সতক করে দিয়ে হিন্দিতে বলেছে, দিদি, তুমি মুসলমান, সাবধানে থেকো। সহজে বাইরে বেরিও না। দাঙ্গা হচ্ছে,

রহিমের মা বলছে,

—তুমিও একটু দেখে শুনে পথ চলো, দাঙ্গার মধ্যে গেলে মুসলমানরা তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে।

ফারজানা আর দাঁড়াল না। সরে এল। আশ্চর্য! এরা দুজন প্রায়ই কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি করে। অথচ আজ দুজনে দুজনের বিপদেব আশঙ্কায় কত ব্যাকুল।

বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফারজানা বাইরের প্রকৃতির শোভা দেখছিল। এমন সময় দাশগুপ্তবাবুর ফোন এল, আপনি কী একটু কষ্ট করে আমার বাড়ি আসতে পারবেন? আমি গাড়ি নিয়ে আসছি যদি তৈরি হয়ে নিতেন।

ফারজানা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, এখন! আপনার জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, এ সময় আপনি কি করে বের হবেন? তাছাড়া সবেমাত্র অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।

—প্লিজ আপনি আসুন। আপনারা না এলে অনুষ্ঠানটা হবে না।

—সে কী বলছেন?

—শুনুন, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি সে এক মহাকাণ্ড, একগাদা অতিথি এসে গেছে, অথচ প্রীতি জেদ ধরে বসে আছে ফারিন না এলে সে কেক কাটবে না। সে ফারিনকে কথা দিয়েছে—

ফারজানা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—

—সে কী! ওকে ফোন দিন, ফারিন বুঝিয়ে বলবে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে দাশগুপ্তবাবু অসহায় ভাবে বললেন, ওতো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। ফারিন যতক্ষণ না আসবে ও ততক্ষণ দরজা খুলবে না।

—ঠিক আছে আপনি আসুন আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ফোন ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ফারজানাকে দেখে ফারিন। ও নিশ্চয় পেছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথোপকথন শুনছিল। ফারজানা বলল,

—চল, প্রীতিদের ওখানে যেতে হবে, ও তোমাকে ছাড়া কেক কাটবে না। ফারিন তেমনি নিষ্পাপ হাসি দিয়ে বলল,

—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমি না গেলে ওর জন্মদিন হবে না।

মেয়েকে জামা পরাতে পরাতে ফারজানা চিন্তা করতে শুরু করল। ঘরে এমন কিছু নেই যা প্রীতিকে জন্মদিনে উপহার দেওয়া যেতে পারে। আগে জানলে সে একটা কিছু কিনে রাখত। খালি হাতে মেয়েটার জন্মদিনে যাওয়া এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হবে। শাড়ি পরতে পরতে ফারজানা এসব ভাবছে, এমন সময় ওকে অবাক করে দিয়ে ফারিন একটা বারবি ডল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—ও কী? ওটা তুমি কোথায় পেলে?

—বাবা সেদিন যে ডলটা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন, ওটা এখন প্রীতিকে দিয়ে দেব, পরে তো বাবা আমাকে কিনে দিতে পারবে।

আধঘণ্টার মধ্যে ঝড়ের বেগে দাশগুপ্তবাবু এলেন। লম্বা কালো চেহারাটার ওপর ক্লান্তির ছাপ। চুলগুলো অবিন্যস্ত। তবু মুখে মৃদু হাসিটা লেগে আছে। ফারজানা তৈরি ছিল। ফারিনের হাত ধরে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকল। দাশগুপ্তবাবু ফারিনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তারপর গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। ফারজানা বাইরের দিকে তাকাল। সূর্যটা এখনও অস্ত যায়নি। চারদিকে সোনালি আভা।

প্রীতিদের বাড়ির সামনে অজস্র গাড়ি। বোঝা যাচ্ছে প্রচুর লোকজন এসেছে। সামনের লনটাতে ফুলভর্তি টব এনে সাজানো হয়েছে। ঘন সবুজ পাতাভর্তি রবার গাছের নীচে গার্ডেন চেয়ারে লোকজন বসে আছে। কতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে দাশগুপ্তবাবুর সঙ্গে ড্রয়িং রুমে ঢুকল। বিরাট ড্রয়িং রুমটা আজ বিশেষভাবে সাজানো। নতুন রঙিন পর্দা ঝুলছে। সোফার সামনে কারুকার্যময় টেবিলের ওপর অজস্র ফুলের ডালি। কেউ কেউ সোফায় বসেছিল। কেউ কেউ ঘোরাঘুরি করছিল। ফারজানাকে দেখেই মিসেস দাশগুপ্ত এক গাল হাসি দিয়ে এগিয়ে এলেন, 'যাক বাবা, এসে পড়েছেন। কি দুশ্চিন্তায় যে ছিলাম, একমাত্র মেয়ে, জন্মদিনের দিন বকাঝকা করে ঘর থেকে বের করব সে উপায় নেই। অযথা আপনাকে কষ্ট দিতে হল।'

ফারজানাও বলল, আজকাল একটা দুটো বাচ্চা হয়ে ওদের খুব কদর বেড়ে গেছে। আমাদের যুগে কিন্তু বাবা মা'রা কড়া শাসনে রাখতেন।

—হ্যাঁ, যুগ পাল্টে গেছে, কই ফারিন, এস, তুমিতো আজ আমাদের চিফ গেস্ট।

ফারিনের হাতটা ধরে মিসেস দাশগুপ্ত ড্রয়িং রুমের অপর প্রান্তে সংলগ্ন ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, ওকে ডাক, বল তুমি এসেছ।

ড্রয়িংরুমে এতক্ষণ যারা বসেছিল বা যারা ওদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, সবাই সকৌতূহল দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকাল। ফারজানার পাশে সোফায় উপবিষ্টা এক মোটাসোটা মহিলা জিজ্ঞেস

করলেন, ওই বুঝি প্রীতির বান্ধবী? ওর জন্যই বুঝি এত সব হচ্ছে? মেয়েটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে না।

ফারজানা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। মহিলা নিজে থেকে তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি প্রীতির পিসি। আপনি বুঝি ওর মা?

ফারজানা হেসে বলল, হ্যাঁ।

ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে। ছোট্ট একটা মিষ্টি শিশু হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছে। প্রীতি অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে একগাল হেসে ফারিনের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একটা চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হল, দুজনে গলাগলি করে হাঁটতে হাঁটতে ড্রয়িং রুমের মাঝখানে এগিয়ে এল। মিসেস দাশগুপ্ত প্রীতিকে তাড়া দিলেন। তাড়াতাড়ি এসে কেক কাটো। দেখোতো সবাই কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

সে কথায় শিশুদের কোনো তাড়া আছে বলে মনে হল না। ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের মধ্যে আপনমনে কথা বলে যাচ্ছে।

প্রীতির পিসি আবার ফারজানাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি রায়টের ভয়ে আসতে চাইছিলেন না?

ফারজানা কি উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময় করতালির শব্দে ঘর মুখরিত হয়ে উঠল, ওরা দুজনে ঘুরে তাকাল। প্রীতি কেক কাটছে। পাশে দাঁড়িয়ে ফারিন। দু তিনটে ক্যামেরার বাল্ব একসঙ্গে ঝলসে উঠছে। সবাই গাইছে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। মিসেস দাশগুপ্তা প্রীতিকে কেক কাটতে সাহায্য করছেন। কেকের একটা টুকরো হাতে করে ফারিনের মুখে তুলে দিল প্রীতি। দুজনার মুখে অনাবিল আনন্দ।

প্রীতির পিসি ফারজানার দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে করে বললেন, বাচ্চা মেয়েদুটো আমাদের বড়ো লজ্জা দিয়ে দিল।

আবাদ

কৃষ্ণা রায়

—নাম কি?

—ঠাণ্ডা।

—কী নাম বললে? সরকারি কর্মী বকুল পালের গলায় অধৈর্য উষ্মা। ঘণ্টা খানেক ধরে এই চলছে। মানুষের ঢল যেন শেষ হয় না।

—কানে কম শোনো নাকি বাপু? বল্‌লাম তো ঠাণ্ডা।

—ঠাণ্ডা? সে আবার কেমন নাম?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠাণ্ডা। লিখে নাও, তোমার কাগজে। ঠাণ্ডা বাগ্‌দি, গেরাম সাতআমড়া, বাপের নাম বলাই বাগ্‌দি, স্বামীর নাম ছেল তারক বাগ্‌দি, গেরাম রাজিপুর। আর কিছু জানতে চাও?

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক সঙ্গে অত কথা লেখা যাবে না। এক এক করে বলো।

সদ্য মাস খানেক কাজে ঢুকেছে বকুল পাল। এসব কাজ যতটা দায়সারা ভাবে করা যায়—তার ছিঁটেফোটা অভ্যেসও এখনও রপ্ত হয়নি।

—হ্যাঁ, এবার বলো স্বামীর নাম ছিল তারক বাগ্‌দি, তা তিনি গত হয়েছেন কবে? তার জমি-জমা-সম্পত্তির হিসেব এনেছ কিছু? সরকার এখন এক্কেবারে গরীব মানুষদের কোয়েল-পাখি চাষের জন্য বিলি-বন্দোবস্ত করেছেন তো। আছে প্রমাণের কাগজ?

—ই! উ কাগজ কুথা পাব? পরধানকে জিজ্ঞেস করো না কেনে? উ সব জানে। আমি ঠাণ্ডা বাগ্‌দি। উই—উই বড়ো ফ্যাক্টোরির কোয়ার্টারবাড়িতে ঝিগিরি করি। রেতে বাপের ঘরে দু মুঠো ভাত পাই। আমি গরীব লয় তো গরীব কে শুনি? আঙ্গুল দিয়ে দূরের লাল-সাদা চিমনিটা দেখায় ঠাণ্ডা বাগ্‌দি।

—বেশ তো, তোমার স্বামী কবে গত হয়েছেন, ছেলে-মেয়ে কটা, এসব তো বলতে হবে।

হাল ছাড়ে না বকুল পাল। অনেক কষ্টে স্বাবলম্বনের পথ খুঁজে পেয়েছে। যোগ্যতা প্রমাণ করতেই হবে।

—হি হি... গত কি গো? উ তো আবার বিয়ে করেছে। ঘোলা গাঁয়ের সাবিত্তিরিকে। ছেলেপিলে উয়ারও হয় লাই অ্যাখনও। আমাও না। সি লেগেই তো বর আর শাউরি কঁ্যাতায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে গেল। দ্যাখো না, আমার হাত-পা, বুক খানিক পুড়েছে। প্যাটে লাগে নাই। কঁ্যাতাটো বেশ করে জড়ানোর আগেই জেগে গিয়েছিলাম কিনা।

কালোজামের মতো চক্‌চকে কালো মুখে নিভাঁজ সরল হাসি। চোখ-দুটোতে হাল্‌কা বিষাদ লেগে আছে কী? এ মেয়ের জীবনযন্ত্রণা বকুল পাল বোধহয় একটু আধটু চেনে। বন্ধ্যা নারীর

উপর নির্যাতনের ভার কী সব সমাজের মানুষ একইভাবে নেয়? একটু অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করে—থানায় খবর দাওনি?

—ই! থানা? তারা তো আরও লচ্ছার। বলবে, দে মাগী, আগে ট্যাকা দে। এম্‌নি এম্‌নি খবর লেখা যায়? পঞ্চাৎ-পর্‌ধান্ তো সব জানে। হ্যাঁ দিদি, অ্যাতো কথা কিস্যের? দিবে তো দাও, লয় তো বলো, চলি যাই।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। নিজের জীবনযন্ত্রণা এসবের কাছে তুচ্ছ লাগে।

ঝুড়ি-ভর্তি কোয়েলের ছানা ঠাণ্ডা বাগদি-র হাতে ধরিয়ে দেয় 'প্রাণীবন্ধু'—চন্দ্রধর মুর্মু। সরকারের নতুন স্কীম চলছে। গ্রামের গরীব মানুষদের স্বাধীনভাবে পাখি-চাষের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নরম-সরম পাখি। দেড়-মাস বয়সের পর থেকে ডিম পাড়বে। কদিন ধরে পঞ্চায়েত প্রধান মাধব দলুই এলাকার মানুষদের বুঝিয়েছে, 'সামনে ভোট আসছে, তুমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমিও তুমাদের বিনি-পয়সায় পাখি দিব। চাষ করো, নিজেরা খাও, ডিম বিক্‌কিরি করো। এ ডিমের বহুৎ গুণ। শরীর তাজা হবে... ডবল টাইম খাটতে পারবে...।'

—একেবারেই এতগুলো বাচ্ছার মা হলে, পারবে তো সামলাতে? ঠাণ্ডার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বকুল পাল কৌতুক করে।

—হ...! পারব না কেনে? রোজ কম কাজ করি?

লাইনে আরও অনেক বউ-ঝি অধৈর্য হয়ে ঠেলাঠেলি করে। চন্দ্রধর হাঁক দেয়— অ্যাই সব লাইন ঠিক রাখো, নইলে কেউ পাখি পাবে না। চন্দ্রধর মুর্মু। এ তল্লাটের আদিবাসী ছেলে। বকুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট। সরকারি ভাষায় 'প্রাণীবন্ধু'। বকুলের কৌতূহলের বহর দেখে হাসে, 'পারবে না গো দিদিমণি, শুনে শেষ করতে পারবে না। এক একটা মেয়েছেলের এক একটা গল্প। কেউ পাঁচবার মেয়ে বিইয়ে নিত্যি বরের ঠ্যাঙানি খায়, কারুর বর আবার বিয়ে করেছে, কেউ পুড়ে মরতে গিয়ে পালায়...এমন কত শুনবে? একটা ব্লকে কদিন থাকবে? ওদিকে বড়ো অফিসারের চোখরাঙানি মনে আছে তো?

ঝুড়িভর্তি কোয়েল ছানা নিয়ে জোরে জোরে পা চালাচ্ছে ঠাণ্ডা। যেতে হবে অনেকটা। সোনাঝুরির জঙ্গল, কোঁড়াদের গাঁ পেরিয়ে নতুন বিলের পাশের মেঠো রাস্তা ধরে পাক্কা দশ মিনিট হাঁটলে তবে পৌঁছবে তাদের কলোনিতে। আচ্ছা, চশমা-পরা দিদিমণিকে গাঁয়ের নাম সাত-আমড়া বলল কেন? তাদের সাত-আমড়া গাঁ তো এখন নতুন বিলের জলের তলায়। বড়ো ফ্যাক্টোরিটো হবার পাঁচ বছরের মধ্যে অমন ভর্-ভরতি গাঁ-খান্ ধুয়ে মুছে শ্যাষ। ফ্যাক্টোরির কাজে নাকি মেলাই জল লাগে। বড়ো বড়ো চিমনিগোলান্ অত অত জল গিলেও সাদা কালো ধোঁয়া ছাড়ে ফোঁস-ফোঁস করে—সারাটা দিন। ঠাণ্ডারও ইচ্ছে করে সারাদিন অমন রাগ দেখাতে। মাকে, দাদাকে...ওই বাঁদরমুখো পরধানকে...সক্কলকে। ইস্! রোদের তাপ কত! পাখিগোলান্ খুব শান্ত। চেল্লামেল্লি নেই। ঘরে গিয়েই উয়াদের জল খাওয়াতে হবে। কেমন নরম পালক। খাঁচা কেনার আগে বড়ো কাগজের বাক্সটায় ওদের থাকতে দিতে হবে। মন্দিরা দিদিমণির কাছ থেকে আগাম চেয়ে এনেছে ঠাণ্ডা।

মন্দিরা দিদিমণিতো যেন কেমন। অমন সাজানো ঘর-দালান, তবু বেটা-বেটি আনার গরজ করে না। দিনরাত আয়নার সামনে সাজগোজ। কত রকমের শিশি-বোতল থেকে এটো-ওটো মাখে। ঠাণ্ডার অবাক লাগে। সেদিন আয়নার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডার একদিকে চাউনি দেখে দিদিমণি হেসেছিল—'কি রে! কী অত দেখছিস'?

—তুমাকে গো, কত সোন্দর সাজো তুমি?

—তাই বুঝি?

সাহস পেয়ে ঠাণ্ডা আবার বলেছিল, দাদাবাবু তোমাকে খুব ভালোবাসে, লয় গো?

—তুমিই জিজ্ঞ্যেস কোরো।

—উরিব্বাপ। ভয় লাগে না?

—ভয় কিসের?

—পুরুষ না? পুরুষমানুষকে ভয় পাব না? হ্যাঁ দিদি, দাদা তোমায় কখ্খনো বকে না?

—দূর! বকবে কেন?

—কেনে বকবে না? তুমার কি বেটা-বেটি হয়েছে? ঠাণ্ডা বাগ্দির চোখ জ্বলে উঠেছিল।

তো শুনে দিদিমণি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী, বলো কী গো? এর জন্য দাদা বকবে কেন? আমার কত কাজ বলোতো। অফিসে চাকরি, লেখা-জোখা, নাটক করার কাজ, বাচ্চা-কাচ্চার পেছনে কখন সময় দেব?

—তা বটে। হোতো যদি আমাদের ঘরে। কম পিটুনি খেয়েছি! দেখো কেনে, দেখো ...অ্যাখনও দাগ যায় নাই। বুকের কাপড় সরাতেই দিদিমণি চেঁচিয়ে উঠেছিল, কী সব যেন বলেছিল—'বুরুট'। বুরুট মানে কী কে জানে! ওরা বর-বউতে নিজেদের মধ্যে ইনজিরিতে কথা বলে? একদিন মনে করে কথাটোর মানে জানতে হবে।

ক'দিন একটানা বৃষ্টির পর চারিদিক থৈ থৈ। কাঁদরে জল, পথে জল, আর নতুন বিল এখন ভর-ভরন্ত নদী। সাত-আমড়া গাঁয়ের স্মৃতি বলতে জলের মধ্যে জেগে থাকা খাড়া খাড়া কটা তাল আর খেজুর গাছ। বড়ো গাছপালা আগেই কাটা পড়েছে। দাদা বলে—ফ্যাক্টোরির কাজ কী এট্টু-আধটু? বড়ো বড়ো পাইপে জল গরম হবে, ধোঁয়া বেরোবো, তারপর ম্যাশিন ঘুরে কারেন্ট তৈরি হবে। আবার ধোঁয়া ঠাণ্ডা হবে। জল কি কম লাগে? সাত-আমড়া গাঁয়ের মানুষ এখন উঁচু ডাঙালের কলোনিতে থাকে। সরকারি কলোনি। এট্টু এট্টু ঘর, ছামুতে একচিলতে বারান্দা। গু-মুতের জন্য খোলা মাঠ, পুকুর, ডোবা তো আছেই। এমন মেঘ-বাদলের দিনে মন খারাপ লাগে ঠাণ্ডার। সেই ডাকাত, কসাই স্বামীটার জন্যও বুকের ভেতর কেমন তাপ ঝট্কা মারে। ফ্যাক্টোরির হ্যাট-কোট পরা অফিসাররা তাদের গাঁয়ের নতুন নাম দিছে—'ড্যাম'। ঠাণ্ডাদের কলোনির কেউ অবশ্য ওই নামে ডাকে না। ওরা বলে 'লতুন বিল', 'নানা 'নতুন বিল'। চক্চকে কাচের পারা জল। সান-বাঁধাই করা পাড়ের ধারে ধারে সিমেন্টের চেয়ার, বাঁদর-লাঠি আর সোনাঝুরি গাছগোলান্ চুপ করে দেঁইড়ে আছে। ছাতার মতো ঘন সাত-সাতখান আমড়া গাছ দিয়ে ঘেরা অমন সোন্দর গাঁটো বিলকুল জলের তলায়। ইস্। অমন মিঠে আমড়া গাছগোলান্। গাই বাছুরের দড়ি খুলতে গিয়ে ঠাণ্ডাকে বেঁকা চোখে একবার দেখল মা। ঠাণ্ডা তখন আপন মনে ঠোঁট চাটছে আর বিড়বিড় করছে।

—হুঁ। সাতসকালে উদাস পারা চোখে কী অত গিলছিস?

—মা-রে! পুরোনো ঘরটোর লেগে বড্ড মন কেমন করে রে। উই, উই তালগাছটা আমাদের লয়? হ্যাঁ মা?

—ইস্। কাজ নাই ভাবুনির। শউববাড়ির ভাত খেতে হয় না তো, তাই অত ভাবনের সময় তোর। যা, যা গরুগোলান্ মাঠে খানিক চরিয়ে আনদিকি। কচি ঘাসও জড়ো করতে দোঁখনা অ্যাখুন। সারাটা দিন শুধু ওই পলকা পাখিগোলান্ নিয়ে হৈ হৈ। আদিখ্যেতা।

—ভাতের খোঁটা দিবিনে বলছি। তিন বাড়ি ঝি-গিরির পুরো ট্যাকা দি না তুকে?

—দিবি না তো খাবি কুথায়? বাপ-দাদার ঘাড়ে বসে গিলবি শুধু?

মা-টো আজকাল খুউব মুখ ঝামরা দেয়। মাটির অমন বড়ো বড়ো ঘর-দালান ছেড়ে এই ছোট্ট ইঁটের বাড়িতে থেকে থেকে মনটাও ইঁটের পারা শক্ত হয়ে গিয়েছে। বাপটা পেরাই রেতে ঘরে

ফেরেনা। মাঝি পাড়ার ওই ডব্‌কা বউটোর সঙ্গে জোর আস্‌নাই চলছে। ঘরে ফিরলেই মা মুখ খিস্তি করে, বাপ তখনো আরও রেগে গিয়ে মারধোর করে মাকে। মা আর কী করবে? সারাদিন গজগজ করে ঠাণ্ডার ওপর। আবার লুকিয়ে চুরিয়ে ওই পোষা পাখির ডিম চুরি করে খায়। ভাবে, ঠাণ্ডা কিছু টের পায় না। হুঁ, পাখিগোলান্ যবে ঠেঙে ডিম দিচ্ছে, ঠাণ্ডা গুনে গুনে রাখে না? পেরাণ ধরে একখানও খেয়েছে অ্যাখনও? চশমা-পরা দিদিমণি বলেছিল, 'এতগুলো বাচ্চার মা হলে কিন্তু'? দাদাটা ডিম বিচেছে অনেকগোলান্। ঠাণ্ডার সে জন্য রাগ কম? কলোনির মেয়েরা শুনলেই হাসে, তবু ঠাণ্ডার ডিম বিচতে এট্টুও মন চায়না।

ফ্যাক্টোরি পাড়ার দু বাড়ির কাজে আজ ছুটি। তেনারা বেড়াইতে গেছেন। মন্দিরা দিদিমণির কাজে ছুটি নেই, হ্যাপা বেশি। কাজ সেবে বেরোনোর মুখে কেমন মিঠে করে বলল, ঠাণ্ডা, বিকেলে কটা পদ্মফুল আর পাতা আনিস্ তো, তোর দাদার সখ হয়েছে পদ্ম পাতায় ভাত খাবে। তবে আর কি? ছোট্ ঠাণ্ডা। জলে নাম। পুকুর ঠেঙে ফুল পাতা তোল্। আপন মনেই গজ গজ করে ঠাণ্ডা—ঘাস না কাটলে মায়ের মুখ তোম্বা হবে। ফুল পাতা না তুললে মন্দিরা দিদিমণি মুখ আঁধার করবে। সবই ঠাণ্ডা করবে। আর ওর যি এট্টু ইচ্ছে করে কাজ সেরে নতুন বিলের পাড়ে চুপ করে বসে থাকতে, কোয়েল ছানাগুলোর ছিট্‌ছিট্ আঁকিবুকিকাটা ডিমগোলান্ আদর করতে—সি কে বোঝে? দোপর বেলায় নতুন ঝিলের জলে কত্ত রকম পাখি আসে। গরুগোলান্ মা আর দূরে চরাতে দেয় না, পেরাই চুরি হয় কি না। বেশ, আজ ঘরে যাবার আগেই বস্তাবোঝাই ঘাস কাটবে ঠাণ্ডা। নতুন বিলের একধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া জায়গাটার বেশ নরম সবুজ ঘাস বেরিয়েছে। বেড়ার একটো ধার ভেঙে গিয়েছে। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে খুব পারবে ঠাণ্ডা।

—অ্যাই, অ্যা—ই! কী করছিস্ এখানে? ছুটে এল উর্দিপরা নজরদার।

—কী করছি দেখ্‌তে পেছনা? ঘাস কাট্‌ছি গো।

—কার হুকুমে কাটছিস্?

—ই। মা - রে —মাটি থেকে ঘাস কাটব, তার আবার হুকুম কিসের? ই মাটির ঢেলায় চলে ফিরে এতটা বড়ো হলাম—ইখানে ঘাস কাটব না তো যাব কোথায়? ইখেনেই তো আমাদের গাঁ ছিল।

—থাম, থাম। সরকারি জমিতে না বলে ঘাস কাটার সাজা জানিস? কাল ড্যাম অফিসের তালা ভেঙে দরকারী কাগজপত্র চুরি হয়েছে বড়োসাহেব বলে দিয়েছে—এখানে না বলে কেউ ঢুকলেই তার সাজা হবে।

—অ্যাই জমাদার, চুরি হয়েছে তো তার আমি কী জানি? আমি তাখন এখানে এসে ঘাস কেটেছি নাকি? ঝলসে ওঠে ঠাণ্ডা বাগ্‌দি।

—সে সব জানি না, যে নিয়ম ভাঙবে, তাকেই সদর থানায় চালান করা হবে। আসুক বড়োসাহেব।

সকাল এগারোটা থেকে ঝাড়া সাত ঘণ্টা দাঁত বার করা গুঁফো নজরদারগুলোর কাছে আটক রইল ঠাণ্ডা। বড়োসাহেবের দেখা নাই। কিন্তু নজরদাররা ছাড়বে না। ওদের মুখে এক কথা—এ হলো দামী চায়না গ্রাস। এ ঘাস কেটেছিস। বড়ো অফিসার এলেই তোর সাজা হবে। আঁধার হল। লতুন বিলের চারধারে থামের মাথায় সাদা সাদা আলোর কলসিগোলান্ জ্বলে উঠল। খিদেয় পেট টন্‌টন্। ঠাণ্ডার কথা শোনে কে? একটু পরে পর্‌ধান মাধব দলুই-এর ভাই যোদো ঢুকল অফিস্ ঘরে। নজরদারগুলোর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কী সব শলা করতে করতেই ওর চোখ পড়ল ঠাণ্ডার

দিকে, অ্যাই। তু সপা বাগ্‌দির বোন না? এখেনে কী করছিস? চেনা লোকের দেখা পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে ঠাণ্ডা।

রাতে বাড়ি ফিরে দাদা কেমন খুশি খুশি গলায় বলল—এবারেটোর মতো পরধানের লোক তোকে বাঁচায়ে দিল রে ঠাণ্ডি। অ্যাখন তুর পাখিপোলান উদের দিয়ে দেরে। উরা রেতে ফিস্ট করবে। গাঁ-ঘরে বাস, চটাতে তো পারিনা উয়াদের। দাদাটো পরধানের সাকরেদি করতে চায়। ভাবে ওকে খুশি রাখতে পারলেই কাজ কাম মিলবে। সারাটা দিন কত কথা যে শুনেছে ঠাণ্ডা! এত কথায় গা মাথা পাক দেয়। চান নাই, খাওয়া নাই... পাখিগোলান্‌ ঝটপট করছে। উয়াদের খাঁচার ঠেঙে বার করে নিচ্ছে। অবসন্ন ঠাণ্ডা, শুধু একবার রাঙা চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে মিনতি করল—উয়াদের বল্‌, খাঁচাটো এক্কেবারে যেন খালি না করে দেয়।

বুক হু হু করলেও ক্লান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছিল ঠাণ্ডার। অনেক রাতে খিদেয় ঘুম ভেঙে গেল। মা তো একবারও খাওয়ার জন্য ডাকে নাই। পেটে-ঘাড়ে-হাতে কেমন চাপ চাপ ব্যথা। শক্ত হাতে কে যেন পেঁচিয়ে ধরেছে ঠাণ্ডার পলকা শরীরটা। অন্ধকারে জোনাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চলাফেরা করছে, কিন্তু ধারে কাছে এক এত জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে?...রেলগাড়ির ইঞ্জিনের পারা শব্দ না? কেরোসিন কুপির কালো শিখা দেয়ালে ধানছড়ার মত ছায়া ফেলছে। উইতো! দেয়ালে বেতের কুলোটা ঝুলছে। সবই চেনা তবু...খিস্‌খিস্‌ করে কে কথা কইছে, অ্যামন জব্বর গতর তোর—অ্যাতোদিন চোখ পড়ে নাই কেনে বলতো? তুর দাদাকে ট্যাকা দিছি, আরও দেব...

কোঁড়াদের গাঁয়ের কালো কুকুরটার মতো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে মুখের উপর গরম শ্বাস ফেলে যোদো দলুই। উঃ মা-গো, আতঙ্কে দু হাতে মুখ ঢাকে ঠাণ্ডা। ঢেউয়ের মতো যন্ত্রনাটা হাড়-মাংস-চামড়ার ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করে কিছুক্ষণ, তারপর বুকফাটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে শরীরটা কুঁকড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

নতুন বিলের জলে একটা পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছে আর উঠছে, ডানা ঝাপটে জল ঝরিয়ে আবার ডুব। বেশ মজার খেলা তো। জেবনটা যদি এমন হোত। ঠাণ্ডার ঠোঁটের কিনারে চিলতে হাসি ঝিলিক মারে। দু-দুটো দিন-রাতের পর এই প্রথম তার হাসি পাচ্ছে। আশ্চর্য। মা-টা কোত্থেকে এসে ঝংকার দিয়ে গেল—ও। দিন ভোর শুয়ে থেকেও হয় না। যা যা কাপড় ছাড়, চা-রুটি গেল্‌, কাজে যা। বাঁজা মেয়েছেলের আবার সতীপানা। বিযই নাই, তার কুলোপান্না চক্কর। কদিন আগে মাঝিদের ডবকা বউটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ডিম খাওয়াচ্ছিল মা। রেতে বাপ ঘরে ফেরে না, ওর হাত দিয়ে কিছুমিছু টাকা পাঠায়। তো আড়াল থেকে মা-র কাজ কম্ম দেখে মায়া হয়েছিল ঠাণ্ডার। বেচারা মা। আর অ্যাখুন? কেমন চোখ গরম করে বলছে—বাঁজা মেয়েছেলের আবার সতীপানা। কে বলেছিল ওস্তাদি করে নতুন বিলের ঘাস কাটতে? সারাদিন শুধু উদিক পানে ঘুরঘুর, লয়তো এই দাওয়ায় বসে ভাবুনি হয়ে জলের দিকে চেয়ে থাকা। হ্যাঁ-রে, ঘরদুয়োর আমার গেল, তুর অত কীসের আঠা? শউরবাড়ি যাবিনি, শান্তিতে থাকতে দিবিনি, মরণ হয় না কেনে তোর? সকালের আলোয় নতুন বিলের জলে সোনার গুড়ো ভাসছে। হলুদ আলোয় উই তো ঠাণ্ডাদের তালগাছটার পাতা চিক চিক করছে। বিয়ের আগে আগে ওর তলায় বসে কত খেলা করেছে! চোত-বোশেখের ঝড়ে গাছের ডাল খসে পড়লেই ছুট্‌ ছুট্‌... কে আগে নেবে। বাউড়িপাড়ার মেয়েগুলো ছুটে ছুটে আসত। তালগাছটা অ্যাখনও ওখেনে একা দাঁড়িয়ে আছে। এক্কেবারে একা। ঠাণ্ডার মতোই। ওর মরণ হয় নাই। ঠাণ্ডারও মরণ নাই।

কলোনির সামনে দিয়ে মেঠো পথ ধরে ফ্যাক্টোরির কোয়ার্টারবাড়ির দিকে মন্থর পায়ে হাঁটছিল ঠাণ্ডা। কোঁড়াদের গাঁয়ের পেছনের বাঁশবনটা পেরোতেই মাধব দলুই-এর দলের লোক পথ

আটকালো—পরশু রেতের কথা ফাঁস করেছিস তো ঘরের সামনে লাশ ঝুলবে। তোর দাদাকে টাকা দিয়েছি। ওরা কেউ মুখ খুলবে না। বুঝলি?

রাগে, অপমানে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে ঠাণ্ডা। মাধব দলুই-এর ছোট্ট ভাই সুবোধ ঠাণ্ডার কনুই ধরে টান দিল—অ্যাই, আজ রাতে তোকে দরকার হবে রে। ড্যাম অফিসের কন্ট্রাকটাররা টাকা নিয়ে খোসমুদি করছে। রেডি থাকিস কিন্তু। এমন গতর থাকতে ঝি-গিরি করবি কেন?

হ্যা হ্যা করে হাসে সুবোধ দলুই। পিচ করে থুতু ফেলে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলে ঠাণ্ডা। মাথার ওপরে গোল আকাশটা ঝক্‌ঝক্ করছে। আষাঢ় মাসের নির্মেঘ দিন। মাঠে মাঠে ধান পোঁতার কাজ চলছে। আদিবাসী, বাগ্‌দি-বাউড়িদের বউ-ঝিরা দমে কাজ করছে। ওকে দেখে তারা হাসল, ও ঠাণ্ডি, কুথা যাস রে? উত্তর দেয় না ঠাণ্ডা। ওরা আবার ডাকল, কী রে, বিচ্‌ন ফেলার সময় অত খাট্‌লি, অ্যাখন কাজে লাগছি না?

—অ্যাখুন লয়।

ঠাণ্ডার উত্তর সংক্ষিপ্ত। নয়তো আর কী বলত? ওরা জানে ঠাণ্ডার বর, শ্বশুরবাড়ির লোক খারাপ। পরশু রাতের পর ঠাণ্ডাও যে খারাপ মেয়েছেলে হয়ে গেছে তা কী ওরা জানে? দুদিন আগেও ওর পরিচয় ছিল আলাদা। স্বামী স্বীকৃতি না দিলেও সে কারোর তোয়াক্কা করত না। কিন্তু এখন এই ভরা সকালে, জলভরা মাঠের আধডুবন্ত ধানের চারার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফিনফিনে পাতলা হাওয়া গায়ে মেখে, গাঁয়ের বউ-ঝিদের কর্মমুখর উল্লাসে তার আর কোনো ভূমিকা নেই। সে এখন একটা 'লষ্ট মেয়েমানুষ'। কালোজামের মতো মসৃণ নরম মুখশ্রীটি ক্রমশ কালো পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠে।

দুদিন ধরে পেটে খাবার পড়েনি তেমন। খিদেয় পেটের ভেতর তীক্ষ্ণ মোচড় দিচ্ছে। বাপ দাদার ভাত ঠাণ্ডার গলা দিয়ে আর ঢুকবে না। এদিকে রোদের হল্কাও বাড়ছে। কোঁড়াদের গাঁয়ের কাছে আসতেই মানুষের জটলা দেখতে পেল। চন্দ্রধরের গলা পাওয়া যাচ্ছে—'অ্যাই, লাইন সোজা করে বসি পড়ো সব। পাখি বিলোনোর দেরি আছে।' পাখি বিলি হচ্ছে মানে সেই চশমা-পরা দিদিমণিটো আবার এসেছে। এর মধ্যে তিনমাস হয়ে গেল। ঠাণ্ডা অবাক হয়। দিদিমণি বলেছিল তিন মাস পর এসে খবর নেব—কে কেমন বাচ্ছা পালতে পারলে। দূর থেকে নজর তীক্ষ্ণ করে ঠাণ্ডা। তারপর গটগট করে সামনে বসা বউ-ঝিদের সামনে এসে দাঁড়ায়, অ্যাই চন্দর্, পাখি-ওলি দিদিমণি লাই এখেনে?

অপেক্ষারত মেয়ে-বউরা প্রবল আপত্তি তোলে—উ্য কেনে নিজের গাঁ ঠেঙে এখেনে এসেছে?

বাধা পেয়ে ঠাণ্ডা একবার কঠিন চোখে ওদের দেখল, তারপর হাতের নাগালের ঝাঁকড়ামাথা বেঁটে তেতুল গাছটার নীচে পা ছড়িয়ে বসল।

চন্দ্রধর বলল, পথ ছেড়ে বসো গো। দিদিমণির আসতে ঢের দেরি। অ্যাখন পরধানের মিটিন্ হবে, তারপর তো পাখি বিলি। তুমার যা বলার আছে কাল বোলো। কাল দিদিমণি উদিকের গাঁয়ে যাবে। লাল ধুলো উড়িয়ে দুটো মটোর সাইকেল আর একটা জিপ থামল। পঞ্চায়েত প্রধান মাধব দলুই, যোদো, সুবোধ, আরও কত সব লোক জড়ো হচ্ছে। তেঁতুলের লম্বা একটা ডাল আপন মনে চুষতে চুষতে উদাস মুখে ওদের সকলকে একবার দেখল ঠাণ্ডা। তারপর ফ্যাক্টোরির কোয়ার্টারবাড়ির পথে হাঁটা দিল।

সভাপতি মদন পালের জিপ থেকে শাড়ি দুলিয়ে দিদিমণি নামল। ঠাণ্ডা গিয়ে পথ আটকায়, কথা আছে তুমার সাঙ্গে দিদি।

—কে তুমি ভাই? চিনলাম না তো।

—না চিনলে না চিনবে। আমি ঠাণ্ডা বাগদি। গেল বার তুমি আমায় এক কুড়ি পাখি দিয়েছিলে।

—বেশ তো। কোন্ গাঁয়ে থাক তুমি বলো। কাল সকালে থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে পাখির হিসেব নেব, তখন না হয় কথা বলব।

—মোর কুনো হিসাব নাই, ঘর লাই, পাখিও লাই। কেউ লাই মোর। লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে প্যাট চলে। আমারে তুমার সাঙ্গে কাজে লিবে? পাখির কাজ?

—আমি তো নিজেই একটা পাখি গো, আজ এ গাঁয়ে আছি তো কাল ফুরুৎ করে ও গাঁয়ে। আমার কী কোনো ক্ষমতা আছে? অবশ্য তোমাদের পঞ্চায়েত প্রধান যদি রাজি হয়... তাহলে।

—হুঁ! খ্যামতা লাই তো ত্যাখন অত মিঠে মিঠে কথা কইছিলে কেনে—একেবারে এত্তগুলো বাচ্চার মা হলে কিন্তু, পারবে তো সামলাতে?

—বাব্বা কী রাগ মেয়ের! তোমার নাম ঠাণ্ডা কেন গো? তুমি তো খুউব গরম গরম কথা বলতে পারো।

—ই। তুমি লিজে সব সময় ঠাণ্ডা কথা কও? বাপেতে, সোয়ামীতে খেদাবে, মন্দ মানুষ আমার পাখিগুলোর ঘাড় মটকাবে, আমারে আঁচড়ে কামড়ে মন্দ করি দিবে, আর আমি দেঁইড়ে দেঁইড়ে ঠাণ্ডা কথা কইব, কেমন?

ঘাম চক্‌চকে কালো মুখে আগুনের তুবড়ি ছোটে।

কী শুনছেন দিদিমণি, এরা সব সময় ছেনালীপনা করতে আসে। মন কিছুতেই ওঠেনা। অ্যাই মেয়ে। ভাগ্ এখেন থেকে। দুর দুর করে ঠাণ্ডাকে তাড়িয়ে দেয় সভাপতি মদন পাল।

মেয়েটার চাউনিটা বড্ড তীব্র। মহিলা কমিশনের অর্চনাদির ক্রুদ্ধ চোখদুটো হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল বকুল পালের—'তোমরা কেমন লেখাপড়া জানা মেয়ে? চুপ করে মারধোর না খেয়ে ফুঁসে উঠতে পারো না? ঘরের জন্য এত টান?' বকুল পালের ওভারিতে সিস্ট, ইউটেরাসে টিউমার। বন্ধ্যাত্বের কারণ ধরা পড়তে স্বামী সরাসরি কোনো অভিযোগ করেনি, শুধু রোজ রাতে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার গল্প শোনাতে আসত। না শুনলেই বেদম মার, গালে থুতু। পাশের ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি উচ্চগ্রামে রামকৃষ্ণের ভজন শুনতেন। এ মেয়েটার সমস্যাটা মনে পড়েছে এতক্ষণে ... সেদিন বলার সময় কেমন হাসি হাসি মুখ করেছিল। অসহায় মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারলে হয়তো... অবশ্য বকুল পালের অত সাহস নেই।

মাইক বেজে উঠল। বাবরি চুলের একটা লোক মুখের সামনে একটা মাইক নিয়ে গলা ফাটাতে লাগল। লোকটাকে চেনে না ঠাণ্ডা।—মায়েরা—দিদিরা—বোনেরা, আমাদের এই পঞ্চায়েত প্রধান মাধব দলুই এ তল্লাটের গর্ব। তোমরা এতদিন এর কাছে অনেক সাহায্য পাচ্ছ, অ্যাখনও পাবে। বিনি পয়সায় পাখি চাষ করার সুযোগ তোমাদিগকে কে দিল? নাম বল।

—মাধব দলুই। সমবেত উত্তরে কোঁড়াদের শান্ত গাঁ-টা গম্‌গম্ করে।

সারা বছর তোমাদিগের জন্য এত খাটছে যে, তাকে তোমরা ভোট দেবে তো?

—দিব। দিব।

—বেশ। ও কথাই থাকল। আমাদের চিহ্নটা শুনে রাখো... সব শালো শকুনের বেটা শকুন। বিনিপয়সায় পাখি চাষ করতে কেমুন দিচ্ছ বটে। বিড়বিড় করতে করতে ঠাণ্ডা মাটিতে পা ঘষে। পাখি বিলি শুরু হচ্ছে এবার। মাটিতে বসে থাকা বউ-ঝিরা দাঁড়িয়ে উঠে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। লাইনে পেরথ্ম-দাঁড়ানো মদন কোঁড়ার বউটো একঝুড়ি পাখি নিয়ে হাসতে হাসতে আসছে। ঠাণ্ডাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলল, এবারে এক কুড়ি পাখি পেছি। ফিরিতে চারটো ডিমও দিছে।

ছোট্ট ডিমগুলোর গায়ে কালো-খয়েরি আঁকিবুঁকি। কয়েক পলক তাকায় ঠাণ্ডা। তারপরই ওর চোখ পড়ে দূরে দাঁড়ানো যোদো দলুই এর দিকে। মাত্তর দুদিন আগে সাঁঝবেলাতে লোকটাকে

কত্ত ভালো লেগেছিল। আবার সেই রেতেই লোকটা তাকে নষ্ট করে দিল। দলুইবাড়ির সকলেরই অনেকগোলান্ করে ছেলেপিলে আছে। এটারও আছে ঠিক কটা? গোটা দু তিন তো হবেই। তাই যদি হয় তাহলে...ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবে ঠাণ্ডা। ধ্যুস্। আচ্ছা ধ্যুস্ কেন? হতেও পারে। ছিট ছিট কোয়েলের ডিম দেখে কী মাথা খারাপ হল ঠাণ্ডার? কই। লোকটার ওপর তেমন রাগ হচ্ছে না তো অ্যাখন। দূর। দূর। বাঁজা বেবুশ্যেরা ওই পাখ্-পাখালিরই মা হতে পারে। তাই বলে মানুষের বাচ্চার?

হতেও তো পারে?

অনিশ্চয় আনন্দে পলকা শরীরটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলে ঠাণ্ডা—ক্ষেতের আলপথ ধরে গেলে ঘুর কম হয়। ফ্যাক্টোরির কোয়ার্টারবাড়িতে রাত-দিনের কাজের যোগাড় করতে হবে অ্যাকটা। অ্যাকটাই জেবন্। মা হতে গেলে কষ্ট করতে হবে না?

নির্জন দুপুরে ক্ষেতের আলপথ দরে ফসলের স্বপ্ন ভাসে, একটি নারীর 'রায় অসম্ভব একটি স্বপ্ন।

বৃক্ষছায়া

বিজয়া দেব

এ জায়গাটাতে গ্রীষ্ম বর্ষা কিংবা শরতেও বান আসে। লোকে তাই কথায় কথায় বলে বানভাসিপুর। বছর বছরই পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী বাঁকী মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে কানায় কানায় ভরে ওঠে। লোকে বলে, নদী নাকি হেমন্তের হাওয়া বইতে শুরু করলেই কাঁদে। কাঁদে তার বুক ছাপানো জলের জন্যে। নিজের শীর্ণদেহটি দেখে তার দুঃখ হয়, সইতে পারে না। এই জায়গাটা একটা ছোট্ট শহর। নাম ইচ্ছেমতিপুর। এখানকার লোকজনেরা ইচ্ছেখুশি বাঁচতে ভালোবাসে। তাই নাগরিক জীবনের বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাকে কিছুটা উপেক্ষা করে মানুষ খেয়ালখুশিতে বাঁচে। একটু ইতিউতি বাঁচতেই স্বস্তি পায় ইচ্ছেমতিপুরের মানুষেরা। তো, বর্ষায় নদীর দেহ যখন ভরভরন্ত, কূল ছাপিয়ে দেবার আকুল ইচ্ছেয় নদী যখন উথাল পাথাল, মানুষ তখন তৈরি। বাঁকী নদী দু-কূল ছাপিয়ে শহরে ঢুকবে যখন, তখনও মানুষের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভেবে নিয়ে মানুষ তার নিজের মতো করেই বাঁকীকে আবাহন করে। নিজেদের তখন বলে বানভাসি মানুষ, ইচ্ছেমতিপুরকে বলে বানভাসিপুর। যখন বাঁকী নদী দুকূল ছাপিয়ে ইচ্ছেমতিপুরে ঢোকে, তখন অন্তরার ছোট্ট ছিমছাম বাড়িটি জলে ডুবে যায়। অন্তরা তখন দোতলার ঘরে আশ্রয় নেয়। বাইরে বেরোতে হলে নৌকো করে বেরোয়, ঘোলা পাক খাওয়া জলের ঘূর্ণিপাকে ছোট্ট ছোট্ট নৌকো দোল খায়। 'নদীমাতৃক' শব্দটিকে বানভাসি মানুষ তখন নানাভাবে ব্যাখ্যান করে।

গত দুবছর থেকে বাঁকী নদী কিছুটা শান্ত হয়ে আছে। লোকে বলে, বাঁকীর নাকি বুকের জোর গেছে কমে। শীর্ণতোয়া হয়ে যাবে বুঝি নদী! ফুরিয়ে যাবে ধীরে ধীরে? এ রকম প্রশ্ন আজকাল জাগছে মানুষের মনে। এমনি সময়ে অন্তরা তার পুরনো পুঁজিকে এলোমেলো করে দেখে ফেলে একদিন। আগের রাতে দেখা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন তাকে এই কাজটা করাতে তাড়িত করে। স্বপ্নে এসেছিল একটা লোক, মাথায় উড়ুক্কু চুল, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, হাতে ছাতা, পুরু লেন্সের গোলাকৃতি চশমা, কেমন এক চোখে তাকিয়ে—পা দুটি ধূলি ধূসরিত—যেন কতকাল থেকে পথ চলছে লোকটা। ব্যস্ এইটুকুই। সেই থেকে লোকটার মূর্তি তাকে তাড়িয়ে মারছে। ঘরের এক কোণে রাখা একটা তোরঙ্গ—অন্তরা জানে বাবা এর ভেতর কাগজপত্তর আরও কী কী জমিয়ে রেখেছিল। বাবা নেই, তোরঙ্গটা আছে। স্বপ্নের লোকটা যেন ক্রমাগতই নির্দেশ করছে, 'তোরঙ্গটা খোলো'। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত খুলল তোরঙ্গ অন্তরা। জমির দলিল, ছেঁড়া ডাইরির পাতা, কতগুলো হলদেটে বই। বইগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটা শব্দের ওপর হঠাৎ করেই চোখ আটকে গেল। একটা শব্দ, তেমন কিছুই নয়, 'বৃক্ষছায়া' মোহাবিষ্ট ফেলল অন্তরাকে। এ শহরে গাছ তেমন নেই। শহর যখন বানভাসি হয় গাছেরা তখন ঘোলা জলের ক্লেদকে সহ্য করে যায়—তখন তাদের শাখাপত্র, কাণ্ড ক্রমশ ধূসর হতে থাকে। জল সরে যাওয়ার

পর তাদের দেহ ক্ষীণ, ভঙ্গুর ও অবশ হয়ে আসে। তোরঙ্গটা বন্ধ করার পর অন্তরা দেখল সূর্য অস্তে চলেছে। সূর্যের লালিমা হা হা শহরের বুকে ঢেউ খেলে খেলে যেন কোথাও প্রাকৃতিক বাধা পাওয়ার মতো অবলম্বন না পেয়ে যেখানে সেখানে আছড়ে পড়ছে। মুখের ভেতর একটা বিস্বাদ ঢেউ গলা পর্যন্ত গিয়ে আটকে গেল অন্তরার। ভাল করে হাত ধুয়ে মুখ ধুল অন্তরা, তবু বিচ্ছিরি স্বাদটা গেল না।

রাতে স্থির করল সে যে গাছ লাগাবে একটা, সামনের উঠোনে। গাছে সার, জল, চারপাশের মাটি খুঁড়ে দেওয়া ইত্যাদিতে গাছটা বাঁচবে, বড়ো হয়ে উঠবে। বাঁকী নদী সত্যিই যদি বুকের জোর হারিয়ে ফেলে, শীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে শহর ভাসবে না। গাছটা বাঁচলে অনেক কিছুই হবে। গাছের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফল, ফুল, পাতা—তারপর পাখপাখালি, পোকামাকড়, টিকটিকি, গিরগিটি যেন গোটা একটা প্রাকৃতিক বিশ্ব ধরা পড়বে গাছটাতে। সূর্যের রশ্মি শাখাপত্রে বাধা পেয়ে হাসবে, খেলবে, গাছের সবুজ শাখাপত্রে পিছলে পড়বে।

পরদিনই গাছের চারা কিনে আনল অন্তরা, উঠোনের একপাশে মাটি খুঁড়ল। চারাটা পুঁতল, খানিকটা জল দিল. তারপর সারা হাতে মাটির সোঁদা গন্ধ মেখে ঘরে ঢুকল।

গাছটা এখন শাখাপত্রে বাড়ছে, বেশ দ্রুতই বাড়ছে। বোধহয় উঠোনে বাঁকী নদীর পলির স্তর থাকার জন্যে গাছটা শাঁসেজলে বাড়ল ভালই। আজকাল দিব্যি পাখপাখালিকে উড়তে দেখা যায়।

পরপর কবছর কূল ছাপানো ঘোলা ঢেউয়ের উথাল পাথাল ছবি না দেখে মানুষও যেন বাঁকীকে ভুলতে বসল। অন্তরার বাড়ির পাশ দিয়ে আসা যাওয়ার পথে মানুষ গাছ দেখে। এমন সবুজ, সজীব, পত্রবহুল গাছ যেন অনেক অনেকদিন কারো চোখে পড়েনি। কোনো কোনো সময় কিছু পথচারীকে অন্তরা বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। গাছটা ছায়াদায়ী হয়েছে দিব্যি। সদর রাস্তা অব্দি তার ছায়ার বিস্তার ঘটেছে।

আজকাল অন্তরা ভাবে অনেক কিছুই। যেমন, ভালো থাকা কাকে বলে! মানুষেরা বেঁচে থাকে—কতখানি তার বাঁচার জন্য বাঁচা মানে অভ্যাসে বাঁচা আর কতখানি তার বাঁচার আনন্দে বাঁচা? একদিন অন্তরা ভাবল এইসব। অনেকক্ষণ জুড়েই ভাবল। তারপর মনে হল তার নিজের জীবনটা কতগুলো ক্লান্ত মুহূর্তের সাথে ক্লান্ত মুহূর্তের জুড়ে দেওয়া বিসদৃশ কণ্ঠহারের মতন, উত্তাপ নেই, আগ্রহ নেই, প্রীতি নেই, কতগুলো জড় অভ্যাসের সমষ্টি শুধু। এ সব ভেবে অন্তরা কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠল। কেন না, এমনতরো কষ্টকর ভাবনা তাকে আহত করেনি কোনওদিন। ইচ্ছেমতিপুরের মানুষেরা যেভাবে বাঁচে, সে-ও তো এমনি করেই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন। হঠাৎ করে ও ধরনের ভাবনা--জীবনকে অসার ভাবার মতো ভাবনা তার হয়নি তো কখনও। এ ব্যাপারটা নতুন। তাই কষ্টকর হলেও এই কষ্টের গায়ে হাত বুলানো যায় দিব্যি। হাত বুলাতে বেশ লাগে, অন্যরকম একটা অনুভব হয়, যা বেশ উদ্দীপ্ত করে তাকে ভেতর থেকে! অন্তরার মনে হল, এ শহরে মানুষেরা ঠিক বেঁচে নেই। জীবন বা প্রকৃতি তাদেরকে যেমনটি যেভাবে দিচ্ছে মানুষ সেভাবেই তাকে মেনে নিচ্ছে। স্রোতে ভাসতে থাকা খড়কুটোর মতো নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে যেমন তেমন বেঁচে থাকাটাকে বেঁচে থাকা মেনে নিয়ে জীবনকে হারিয়ে ফেলছে। এমন নিরুত্তাপ ভাবে বেঁচে থাকা, শোকতাপ, দুঃখকষ্টকে বুঝতে না পারাটা ঠিক মনুষ্যোচিত নয়।

সেই থেকে শুরু হল অন্তরার দাহ। যে জীবনটাকে সে ছুঁতে পারত, যে প্রাণময় উত্তাপ তাকে ভরিয়ে দিতে পারত তাকে পেতে পারল না বলে সে আজকাল আপশোশ করে সারা হয়ে যায়। একদিন চমকে উঠে সে শুনতে পেল গাছের ছায়ায় বসে তিনচারজন পথচারী বলাবলি করছে বাঁকী নদীতে নাকি জল বাড়ছে। দুচারদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল বেশ। তবে আশ্চর্য হয়ে সে শুনতে

পেল মানুষগুলির কণ্ঠে অসন্তোষের ছোঁয়া। বাঁকীর তাণ্ডবের অদূরবর্তী ইতিহাসের কথামালাকে খণ্ডন করছে মানুষগুলো। দুর্গতির কথা বলছে, ঘোলাজলের প্রকোপে ঘরছাড়া হওয়ার কথা, নিরাশ্রয়ের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছে।

বাঁকীতে সত্যিই জল বাড়ছে। অন্তরার অস্বস্তি বাড়তে থাকে। খুব যে বৃষ্টি হচ্ছে তা নয়, তবে আকাশ আজকাল ঘন মেঘে জমাট হয়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ বর্ষণ হয়, তারপরই আবার ক্ষান্ত হয়ে পড়ে। কেমন শ্বাসরোধকারী হয়ে আছে আকাশ।

অন্তরা মাঝেমাঝেই গাছটার নীচে দাঁড়ায়। সরু লম্বাটে, পাতা, গোড়ার দিকটায় হলদে সবুজ আভা, ভেতরের দিকটায় ঘন সবুজ, সরু সরু শিরা উপশিরা, অজস্র ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দিবালোক ফিনকি দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। পাতার উপর ও নীচ সবুজ আভায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। হাওয়া যখন দেয় পাতাগুলি দোল খায়। গাছে বাসা বেঁধে থাকা প্রাণীগুলো এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। কাণ্ডটি দিব্যি পুষ্ট, মজবুত থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কোনো মুহূর্তে অন্তরার গাছটিকে অলৌকিক বলে মনে হয়। এই জন্যেই মানুষ গাছকে পুজো করত? বলত, বৃক্ষদেবতা! একটা গাছ, মানে বৃক্ষ অনেকদিন বাঁচে। মানুষের চাইতেও তো তার আয়ুষ্কাল বেশি।

দুচারদিনের মধ্যেই ভারী বৃষ্টি নামল। গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে ঝেঁপে আসা বৃষ্টি বড়ো বড়ো ফোঁটায় গলে পড়তে লাগল। প্রায় সারাক্ষণই অন্তরা জানলায় দাঁড়িয়ে গাছটার বৃষ্টিভেজা অপরূপ রূপটি দেখো, দুচারদিন বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

কদিনের অবিরাম বর্ষণের পর যখন বৃষ্টিপাতের বিরাম হল, তখন পথে মানুষের কলকোলাহল শুনে বাইরে এল অন্তরা। বৃষ্টি ধোওয়া ইচ্ছেমতিপুরের মানুষের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। রাস্তার কিছু লোক গাছটার নীচে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকী নদীর দিক থেকে সোঁ সো আওয়াজ আসছে। বাঁকী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কূল ছাপানোর সময় বুঝি হয়ে এল। এরই মাঝে কেউ একজন বলে উঠল, 'এই গাছটা, গাছটা দেখেছ, যেন ভগবান, পাতাগুলো দেখো হে, কেমন আলো করে রেখেছে গাছটাকে। কত প্রাণীকে যে আশ্রয় দিয়েছে গাছটা। অহংকারী নদী খেয়ে ফেলবে গাছটাকে। শেষ করে ফেলবে। সাথে সাথে অতগুলো প্রাণী—ওই কাঠবিড়ালিগুলো, সোনালি পোকাগুলো, পাখি পিঁপড়ে সব নিরাশ্রয় হবে। এত বড়ো নরম গোল ছায়া, মাটির কলসীর জলের মতো নরম ঠাণ্ডা ছায়া মিলিয়ে যাবে পুরোপুরি, ভাবা যায়! ওহ!'

কেউ বলল, 'নদী তো নয় রে বাবা, হত্যাকারী!'

কেউ বলল, 'কাল থেকে আমিও গাছটার কথা ভাবছি জানো, বড়ো রাগ হচ্ছে, আক্রোশ হচ্ছে, অসহায় লাগছে করবার কিছু নেই বলে। বারবার গাছটার কথা ভাবছি। চলতে ফিরতে এর ছায়ায় এসে বিশ্রাম নিতাম—হায়রে, ঘোলা জলের হিংস্রতা—প্রাণভুক বানের জল... ...'

কেউ বলল, 'নদীকে আটকাতে হবে।'

—'নদী আটকাবে? আটকানো যায়? বাঁধভাঙা জল আটকানোর সাধ্য হবে আমাদের, এই ইচ্ছেমতিপুরের লোকেদের?'

বিকেলে আরও মানুষের সাথে বাঁকীর তীরে গেল অন্তরা। নদী ফুঁসছে। ফুলে ফেঁপে একরাশ দাপুটে জলের প্রপাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছেমতিপুরের মতো একটা ছোট্ট শহরকে হাঁ করে গিলবে তার জল। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। কেউ কেউ যেন নদীকে রুখে দিতে চাইছে। কিন্তু কীভাবে রুখবে তা তো জানা নেই। বিপুল জলধারার গর্জনের ভেতর ধীরে ধীরে মানুষের কথা চাপা পড়ে যায়। অন্তরা চঞ্চল হল, প্রবল চিত্তবিক্ষোভ হয় তার। অন্ধকার হয়ে আসছে। যেন চরাচরব্যাপী এক শীতল নীরবতা বিরাজ করছে। বাঁকী নদীর উচ্ছ্বসিত অহংকার সইতে না পারার জন্য এ প্রগাঢ় নীরবতা? জল প্রাণ দেয়, আবার হননকারীও

হয়ে থাকে? তার আঙ্গিনায় বেড়ে ওঠা গাছটিও এবারে বিবশ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? বাঁকী হবে সেই ক্রুর হত্যাকারী?

নীরবতা ভেঙ্গে আবার মানুষেরা কথা বলে।

—'আচ্ছা, নদীতে উঁচু করে বাঁধ দেওয়া যায় না?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি বাঁধ দিলে নদীকে আটকানো যায়।'

—'যেমন তেমন বাঁধ নয় হে! শক্তপোক্ত করে আঁট ঘাট বেঁধে বাঁধ দিতে হয়, আমাদের সাধ্য নয়।'

—'ধ্যুত! এবারে বড্ড আদেখলাপনা দেখছি। বান আসে, বান যায়। বাঁকী ফুঁসে, শান্ত হয়। বরাবরই এরকম চলে আসছে। এবার যে ভিন্ন ছবি দেখছি।'

অন্তরা ভাবে চলে যাবে নাকি ইচ্ছেমতিপুর ছেড়ে! গাছটার দুর্দশা দেখা তার সাধ্য নয়। তবে এটা ঠিক, এই প্রথম ইচ্ছেমতিপুরের মানুষের চোখেমুখে অস্বস্তি ও অসন্তোষ চোখে পড়ছে। বাড়ি ফিরে ঘরে ঢোকার মুখে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গাছের গায়ে হাত বুলোয় অন্তরা। সরসর করে কিছু একটা সরে যায়।

অসন্তোষ মানুষের মনে দানা বাঁধলেও বাঁকীকে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবারেও নদী শহর ভাসাল। কিছু অসহায় মানুষ প্রতিবারের মতো এবারেও নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ঘোলা পাক খাওয়া জলে ছোটো ছোটো নৌকো ভাসল। অন্তরা নৌকো করে তার দৈনন্দিন কাজ সারল। শুধু গাছটার দিকে চোখ পড়ল তার বারবার। যদি গাছটা বাঁচে। এত পুরুষ্টু যার কাণ্ড, এত বৈভব নিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মৃত্যু হবে! যেন ভাবাই যায় না। পুরো তিনটি দিন ঘোলা পঙ্কিল জলে শিকড় কাণ্ড ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাছটা ক্লেদমুক্ত হল।

শহর থেকে জল নেমেছে। তীব্র সঙ্গমসুখ ভোগ করার পর বাঁকী যেন হা-ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছেমতিপুরের মানুষেরা ম্রিয়মান। গাছের কথা সবাই যেন ভুলেই গেছে। নিজেদের ছত্রখান ঘরকন্নাকে নতুন করে গুছিয়ে তুলতে লেগেছে সবাই। অন্তরা শুধু ভীষণভাবে লিপ্ত হয়ে আছে গাছটার সাথে। গাছের শিকড় থেকে শাখা প্রশাখার ভেতর অব্দি অন্তরা যেন দেখতে পায়। মনে হয় তার অস্তিত্ব, তার বেঁচে থাকা, তার প্রতিটি অন্যমনস্ক মুহূর্ত, তার স্বপ্ন সত্য বিষাদ স্মৃতি অতীত বর্তমান সব কিছুই যেন এই বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে। বাঁকীর জল তাকে বৃক্ষ থেকে বিযুক্ত করে দিতে চাইছে। ক্লেদাক্ত পঙ্কিলতাকে নিজের হীন চক্রান্তের দূত করে পাঠিয়েছে তাকে চূড়ান্ত অপ্রেমের জগতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে। এমনি অমোঘ এবং অনিবার্য বাঁকীর আক্রমণাত্মক প্রবাহ যে তার প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে কিচ্ছুটি করার সাধ্য অন্তরার নেই। এই বৃক্ষকে সে বাঁচাতে পারবে এমনি ভরসা ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে অন্তরার ভেতর থেকে। আজ গাছটির কাণ্ডের উপরকার বাকল ছড়ছড় করে উঠে এসেছে অন্তরার হাতে। বোঝাই যাচ্ছে, গাছটি তার প্রাণময় রসকে আর জীইয়ে রাখতে পারছে না। ধীরে ধীরে তার ভেতরকার রস শুকিয়ে যাবে। কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকবে তার দেহের কঙ্কাল, তারপর কোনো একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে সে।

গাছটাকে বাঁচানো গেল না। ইচ্ছে যতই প্রবল হোক, বাঁকীর প্রবল প্রবাহের কাছে সে ইচ্ছে ক্ষীণ, মূল্যহীন অন্তত বানভাসি জলের প্রতিরোধী শক্তি তো নয়! এ শহরে থাকবে না অন্তরা। এখানে সজীবতা বাঁচতে পারে না। বাঁকীর পঙ্কিল প্রবাহে আর নিজেকে সে ভাসিয়ে দিতে চাইবে না। বৃক্ষছায়া অন্তত তাকে এই চেতনাটুকু দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে গৃহস্থালির যাবতীয় টুকিটাকি বাঁধে অন্তরা। আর হাতে তুলে নেয় বাবার ফেলে যাওয়া রং চটা ধূসর তোরঙ্গটি। যাবার আগে বাঁকীর তীরে দাঁড়ায়। একে একে ইচ্ছেমতিপুরের গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিস বাঁকীর জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। সব ফুরিয়ে গেলে পুরনো তোরঙ্গটি হাতে নিয়ে ইচ্ছেমতিপুরের রাস্তা পেরিয়ে এসে ধূসর অস্পষ্ট পথে পা রাখে অন্তরা

লাল পাখির নীল চোখ আঁখি

দীপ্তি দেব

ওগো! ওগো! টুসুমণি!
পয়সা দে মা দু'আনা
বাজার ঘরে জিলিপি উঠেছে
কিনিয়া খাব চারখানা।'

ডাক্তারবাবুর আঙিনায় দাঁড়িয়ে টুসু পরবের গান গাইছে লাল পাখি ওরফে লালিয়া। তরুণী লালিয়ার পরণে সবুজ ফুলছাপ হলুদ শাড়ি। লালিয়ার গায়ের রং দুধে-আলতা। চোখের রং নীল। চা বাগানের কালো রুগ্ন কুলিকামিনদের মাঝে লালিয়ার এই রং বড্ড বেমানান।

মেয়ের এই বেমানান রূপ ও রং নিয়ে ফুলমণিকে অনেক বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। লাজুক নির্বিরোধী স্বভাবের ফুলমণি নীরবে সব যাতনা সয়েছে। সে রেগে যায়নি। প্রতিবাদে মুখর হয়নি। ফুলমণির মরদ শম্ভুসর্দার কালো দীর্ঘদেহী। পুরুষালী চেহারার। ফুলমণিও কালো, তবে কিনা মুখখানা তার ভারি মিষ্টি। লালিয়া যত বড়ো হয়েছে তার নীলচোখও গায়ের লালচে সাদা রঙের জন্যে চা বাগানে কানাকানি ও হাসাহাসি বেড়েছে।

ফুলমণির সখী ললিতা তো একদিন ফুলমণিকে শুনিয়ে ওর মরদ সুখলালকে বলে বসেছে, —ওই যে এন্ডারসন সাহেব ওরই সঙ্গে কিনা ফুলমণি ফ্যাক্টরিতে জোগালির কাম করত। ওই রাঙা সাহেবটা হামাদের সখি ফুলমণিকে বহুত পসন্দ্ করত। আর ওই সাহেবটাই কিনা ফুলমণিকে ওর বাংলোয় ডেকে নিয়ে কী সব ভজঘট বাঁধালো। ফুলমণি এ ধরনের কথা শুনলেও না শোনার ভান করে এড়িয়ে চলত। কারণ ফুলমণি জানতো—কলঙ্ককে যতই ঘাঁটিয়ে তোলা যায়, তার কালিমা ততই বেড়ে ওঠে। অতীত স্মৃতির ভারে তাড়িত ফুলমণি আজ কেন জানি ক্ষণে ক্ষণে কেবলই হারিয়ে যেতে থাকে।

টুসু পরবের দল এখন ঢুকে পড়েছে হেডক্লার্ক অমিয়বাবুর কোয়ার্টারে। লালপাখি এখন আর গান গাইছে না। আঁচলে মুছে চলেছে তার মুখের ঘামটুকু। সমবেত কণ্ঠে তখনও গান গেয়ে চলেছে কুলিকামিনরা।

"বড়োবাবুর কুয়াশালে করমলতা ধরেছে,
বড়োবাবু বড়ো কিপটে টোপা লয়ে দৌড়েছে।"

গান শুনে হাসছে ছোটো ছেলেমেয়েরা। হাসছে লালিয়াও। পৌষের সোনাঝরা রোদ লালিয়ার গায়ে পড়ে তার যৌবনোচিত লালিত্যকে যেন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। যতবারই লালিয়ার দিকে তাকাচ্ছে ফুলমণি ততবারই যেন অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

ছোটো সাহেব এন্ডারসন একা থাকত বাংলোয়। বাংলো ঘিরে ইউক্যালিপটাস ধবধবে সাদা ঋজু বৃক্ষের সারি। বিলাতে গিয়ে তখন নূতন বিয়ে করে এসেছেন ছোটোসাহেব কিন্তু অল্পবয়সী মেম নাকি সাহেবের সঙ্গে ইন্ডিয়ায় আসতে চায় না। সাহেব বাংলোয় একা থাকে। ধবধবে সাদা গাছটাকে ওরা বলে মেমগাছ। সাহেব যখন ওই লনে ভূতের মতো একা ঘুরে বেড়ায় তখন ওই মেমগাছের সঙ্গে সাহেব একা একা কথা বলে। তার মনের দোসর কেউ নেই। তাই চাপরাশি, খানসামা, চৌকিদার দেখত—সাহেব সন্ধের পর বিলাতি মদ খায়, স্ফূর্তি করে ক্লাবে গিয়ে। তবু মনে তার শান্তি নেই। খানসামা রতনলাল এসব গল্প বলত ফুলমণিদের কাছে। বুদ্ধিমতী পূর্ণকিশোরী ফুলমণি তখন কাজকর্মে দারুণ পটু ছিল তাই ফুলমণির বাপ মংলু সর্দার ফুলমণিকে ফ্যাক্টরির কাজে বহাল করেছিল। আর সত্যিই ফুলমণি মেশিনে চা তৈরির কাজে দারুণ দক্ষতা দেখাতে পেরেছিল। ফুলমণির গুণমুগ্ধ শম্ভু যে কিনা পঞ্চায়েতের তখন নতুন সেক্রেটারি, সে তরুণী ফুলমণির প্রেমে পড়ে তাকে শাদি করেছিল। আর ফুলমণিও শম্ভুকে শাদি করে সুখী হয়েছিল। কিন্তু সে সুখ ফুলমণির ভাগ্যে বেশিদিন সইল না। একদিন কাজে নিবিষ্ট ফুলমণিকে ছোটোসাহেব বললে—আজ বিকেলে হামার বাংলোয় আসতে হবে ফুলমণি!

—কিঁউ সাহেব?

—কুছ কাম আছে। আরজেন্ট কাম। গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর করে বলেছিল, এন্ডারসন সাহেব। ফ্যাক্টরির কুছ কাম সাহেব? নতুন মেশিন আসবেক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেছিল। তব্ ওই মেশিনের কুছ ট্রেনিং নিতে হবেক হামার?

—হু! তব ওই কামে হামাকে খুশি করতে পারলে বহুত বখশিস্ মিলবেক টোমার!

লালমুখো সাহেব অভিনব হাসি হেসে বলেছিল ফুলমণিকে। সদ্য যুবতী ফুলমণি তখন কত সহজ সরল ছিল! মানুষকে বড্ড বিশ্বাস করত সে। কাউকেই ফুলমণি কিংবা শম্ভু সন্দেহ করতে জানতো না। ফুলমণির মতো শম্ভুও ভেবেছিল ফ্যাক্টরিতে নতুন সব মেশিন এসেছে—আর তারই কোনো ডিরেকশন দিবে হয়তো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। ছোটো সাহেব এন্ডারসনের বাংলোতে। আর তাই সাহেবের বাংলোয় যাওয়ার সময় যখন লাল ঢোলা ব্লাউজের সঙ্গে মোটা বুনুনের সবুজ ছাপ, ছাপার শাড়িটা পরেছিল ফুলমণি, তা দেখে যুবক শম্ভুর সে কী হাসি!

—ই কিমন শাড়ি পিন্দেছিস্ তু? সাহেবের বাংলোতে যাবি, কত বড়ো বাংলো! কিতনা বড়া বড়া আদমী হরদম আসা যাওয়া করছে, আউর তু কিনা দুখিয়া কামিন সেজে...

—তব হামি কোন্ শাড়ি পিন্দব?

—কেনে তুর সেই হলুদ ফুলছাপ লাল সিল্কের শাড়িটা পিন্দে লিবি।

—ওটা তো হামি দুর্গা পরবে পিন্দব। ফুলমণি সিল্কের শাড়িটা প্রথমে পরতে চায়নি। কারণ শাড়িটা বিয়ের পর শম্ভু শিলচরের গান্ধিমেলা থেকে কিনে এনে ফুলমণিকে উপহার দিয়েছিল।

তবু শম্ভুর অনুরোধে সাহেবের বাংলোতে যাওয়ার সময় ফুলমণি সেই শাড়িটা পরেছিল।

ছোটো সাহেবের বাংলোর বিশাল গেটে যখন এসে দাঁড়িয়েছিল ফুলমণি তখন সূর্য প্রায় অস্তগত। পাখিরা কুলায় ফিরতে ব্যস্ত। গেটম্যান ছোটোসাহেবের নির্দেশে ফুলমণিকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সাহেবের কামরায় তখন নীল আলো জ্বলছে। নীলাভ আলোর ভেতর নীলনেশায় ঢুলছিল তখন লালসাহেব; আরক্তিম চোখ মেলে যেন আদেশ জারি করেছিল এন্ডারসন সাহেব ফুলমণিকে দেখে,—সিট ডাউন। ইধার বৈঠো।

সাহেবের আদেশে সোফার এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়েছিল ফুলমণি। খানিকক্ষণ পরে বেহারা এসে ফুলমণির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল পানীয় ভর্তি সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাস। ফুলমণির দ্বিধা দেখে সাহেব পুনর্বার আদেশ জারি করেছিল।

—টেক ইট। পিলো।

সুসজ্জিত কক্ষে অভিনব পরিবেশে ফুলমণি কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিল। মন্ত্রপূতের মতো সাহেবের আদেশ পালন করতে গিয়ে গ্লাস ভর্তি ঝাঁঝালো পানীয়কে দামি সরবত ভেবে দ্রুত গলাধঃকরণ করেছিল সে। বিলাতি কড়া সুরায় কী মেশানো ছিল জানে না ফুলমণি কিন্তু তা পান করার খানিক পরেই সে কেমন যেন অর্ধচেতন হয়ে পড়েছিল। ফের যখন চেতনা ফিরে পেয়েছিল ফুলমণি তখন দেখেছিল সাহেব ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে পাইপ টেনে চলেছে। ফুলমণি নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা আর বেশবাসের শৈথিল্য দেখে বুঝতে পেরেছিল সাহেব তার চরম সর্বনাশ করে ফেলেছে। সতীত্ব হরণ করে নিয়েছে ভিন্‌দেশী লালমুখো নির্দয় লোকটি। ড্রাইভার সাহাবউদ্দিন অতঃপর ফুলমণিকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

সে রাতেই শম্ভু ফুলমণির বিধ্বস্ত চেহারা দেখে বুঝে নিয়েছিল গোটা ব্যাপারটা। ফুলমণির শাড়ির আঁচলে বাঁধা কড়কড়ে নোটগুলো দেখে সে বুঝে নিয়েছিল—সাহেব তার সহধর্মিনী সতী-সাধ্বী ফুলমণির চরম সর্বনাশ করে ফেলেছে। তাহলে কী সাহেব শুধুমাত্র নিজের অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করার জন্যই ফুলমণিকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে বাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল! কি আশ্চর্য! শম্ভু এতদিন তো নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে এসেছে। তাহলে কী সে সত্যিই নির্বোধ! ফুলমণিকে তো সেই সেজেগুজে সাহেবের বাংলোতে যেতে উৎসাহিত করেছিল। নাকি মানুষকে বিশ্বাস করাও পাপ। রাগে দুঃখে হতাশায় কাঁপছিল শম্ভু। সেই দুঃসহ ঘটনার পর থেকে শম্ভুর কী যে হয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ শুধু আকাশ পাতাল ভাবত, একেবারেই কথা বলত না। ফুলমণিকে আগের মতো ভালোবাসা দূরে থাক সবসময়ই এড়িয়ে চলত। এরপর—দশমাস পর ফুলমণি যখন সন্তানের জন্ম দিল, মেয়ে সন্তানটিকে কোলে নিয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শম্ভু; প্রশ্ন জেগেছিল তার মনে, দুধে আলতা রং, নীল চোখ, বাদামি চুলের মেয়েটি কী তাহলে তার আত্মজা নয়? দিশেহারা যুবক শম্ভু সেদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চা বাগানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল। আর সন্ধের পর বেহেড মাতাল হয়ে ফিরেছিল ঘরে। মেয়েটি যতই বড়ো হয়েছে শম্ভু বুঝতে পেরেছে—মেয়েটি হয়ে উঠেছে যেন এন্ডারসন সাহেবের প্রতিমূর্তি। মেয়েটির বয়স যখন বছর দুই তখন মেয়ে ও মাকে ছেড়ে এ চা বাগানেরই অন্যত্র ঘর বেঁধে নিয়েছে শম্ভু সর্দার। তবে সে আর বিয়ে-শাদি করেনি। ঘরনীহীন ঘরে বাকি জীবন কাটাবে বলে মন স্থির করে নিয়েছে শম্ভু। তাই শম্ভুকে এভাবে ঘর বেঁধে থাকার কারণ কেউ জিজ্ঞেস করলে সে রেগে উত্তর দিত,

—হামার ইচ্ছে হামি একলা আছি। তব তুদের কী?

—তা তু ইতনা বড়া সর্দার! কিতনা নাম তুরই চা বাগানটায়!

—তব কী! দিনভর সর্দারি করব, আর সাঁঝে সরাব গিলব। এই ব্যস।

এরপর সত্যিই শম্ভু সর্দারকে বেহেড মাতাল অবস্থায় টলমল পায়ে চা-বাগানের আলো আঁধারিতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনো বা নেশায় চুর হয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ে থাকত শম্ভু। একদিন তো ছোটো সাহেবের গাড়ির নীচে পড়ে গিয়ে মরতে বসেছিল। সেদিন ঠিক সে সময়ে ফুলমণি নিতাই মহাজনের দোকান থেকে সরিষার তেল ও নুন কিনে ঘরে ফিরছিল। বিপরীত দিক থেকে ট্যাক্সি ছুটে আসছে দেখে পথে শায়িত শম্ভুর কাছে ছুটে গিয়ে দুহাত মেলে পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল ফুলমণি। হেড লাইটের আলোয় পথের মাঝখানে শুয়ে থাকা শম্ভুকে আগলিয়ে ফুলমণিকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে কোনোক্রমে ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছিল এন্ডারসন। সে যাত্রা ফুলমণির জন্যই জীবনরক্ষা হয়েছিল শম্ভু সর্দারের। এই ঘটনার মাসখানেক পরই এন্ডারসন নয়নছড়া চাবাগান ছেড়ে চলে যায়।

পৌষের সোনাঝরা রোদ্দুরে টুসুর কাঠামো মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে লালপাখি। ফুলমণি এক ঝকঝকে সুন্দর দিনকে দেখছে। বেলা বারোটার রোদের আলো বরাকের পাখা চিরনদীর জলে

পড়ে কেমন যেন চিক্‌চিক্ করছে। নদীর পাড়ের গাছগাছালি থেকে পাখির কূজন ভেসে আসছে। নদীর ওপারের শ্মশান এখান থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান। ওই শ্মশানেই কিনা ফুলমণির বাপ মংলু সর্দারকে বছর কয়েক আগে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। এই মংলু সর্দারই আদরের নাতনীর চা বাগানের ঘন সবুজ পরিবেশকে আলো করা রূপ দেখে আহ্লাদে নাম রেখেছিল—লালপাখি, লালিয়া। যাহোক বৃদ্ধ বাপ মংলুকে ফুলমণি ও বিচক্ষণ শম্ভু কেউই জানতে দেয়নি এন্ডারসন সাহেবের দুষ্কর্মের সেসব কাহিনি। বুদ্ধিমতী ফুলমণিও বুঝেছিল, বৃদ্ধ বাপ মংলুর এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। শুধু এক ট্রাজিক ঘটনার প্রতিবাদহীন বিবরণ শুনে যাওয়া ছাড়া। সুতরাং এই জ্বলন্ত অসহ সত্যকে চেপে যাওয়াই মঙ্গল। বুদ্ধিমানের কাজ।

ওদিকে মংলু ভেবে কুলকিনারা পেতো না।

—শম্ভু এতো ভালোবেসে ফুলমণিকে বিয়ে করেও হঠাৎ কেন এমন করে বিগড়ে গেল সে!

ফুলমণির অতীত স্মৃতিচারণে বাধা পড়ে। ফুলপাতা দিয়ে সাজানো টুসুর কাঠামো এবার জলে ভাসিয়ে দিয়ে ওরা উলুধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত করে এগিয়ে চলে। সমস্বরে গান ধরে ওরা—

"মাকে ভাসিয়ে দিয়ে কী ধন নিয়ে যাব ঘরে,

ঘরে গিয়ে মা বলিব কারে?"

গান গেয়ে চা বাগানের মসৃণ পিচ বাঁধানো পথে এগিয়ে চলে ওরা। একসময় ফুলমণি বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে শম্ভু সুরাপানে মত্ত অবস্থায় ওদের নিকানো বারান্দায় বসে আছে। ফুলমণিকে দেখে মাতাল শম্ভু রাগে ফেটে পড়ে।

—জোয়ান বেটিকে সঙ্গে লিয়ে বাবুদের কোয়ার্টারে ঘুরে বেড়িয়ে এলি? লাজ নাই লাগে তুর? উহাকে শাদি নাই দিচ্ছিস কেনে?

—ভালো লেড়কা নাই মিলছে তব্ কেমনে শাদি দিব? ফুলমণি নিরুপায় কণ্ঠে বলে।

—কেনে রামদীনের বেটা নবীনকে নাই দেকছিস? কেমন তাগড়া জোয়ান হয়েছে। বহুত সোন্দর। কাল রামদীন হামকে বলেছিল,—তুর বেটি লালিয়ার সাথমে হামার বেটা নবীনের শাদির বাতটা উঁয়ার মাকে গিয়ে বল শম্ভু।

—রামদীনের বেটা? ওই পাট্টার নবীন? ফুলমণি বিস্মিত হয়।

—হুঁ নবীন। কিঁউ উহাকে নাই চিনিস?

—কিঁউ নাই চিনব? হামার সঙ্গেই তো ফ্যাক্টরিতে মেশিনে চা তৈরির কাম করছে।

—তব তু উঁয়াকে তো হরদম দেকছিস্।

—দেকছি বটে। দিনভর ফ্যাক্টরিতে কাম কোরে আউর রাতে চা বাগানের আদমিকে সরাব গিলাচ্ছে। উঁহার সঙ্গে হামার লালিয়ার শাদি দেবো?

—হুঁ দিবি। আলবৎ দিবি।

—নাই দিব শাদি।

—কিঁউ নাই দিবি? লালপাখিকে উড়তে দিবি, সঙ্গে নিজেও উড়বি। রাগে দুঃখে শম্ভু গজরাতে থাকে।

—হে মা! তু নবীনের গায়ের বরণটা দেকেচিস্ কেমন কুচকুচ কালো। আঁখি লাল! লালিয়া হেসে বলে ফুলমণিকে।

—দিনরাত লেড়কাটা সরাব গিলছে, আঁখি লালবরণ হবেক নাই?

—লাল আঁখি, কালোবরণ! হি হি হি, কেমন ওরলগে উঁহাকে দেখে। হামার বহুত ডর লাগে। কথাগুলো বলে হাসে লালিয়া।

—তব্ উঁহার কালোবরণটা দেখে হাসছিস তু? হাসব নাই কে? লালিয়া প্রশ্ন করে শম্ভুকে।

—হাসবি বটেক। তব্ তুর দেহের বরণটা কেমন সোন্দর। বক সাদা। তুর হবেক নাই? তুর বাপের বরণ সাদা ছিল রে লালিয়া বেটি।

—তু কী বলছিস রে বাপ? তুর দেহের বরণটা সাদা নাইকে কালো। বহুত কালো। হে বাপ!

—হামি তুর বাপ নাইখে। হামকে বাপ নাই ডাকবি। তুর বাপ তো সাহেব ছিল, লালমুখো সাদাসাহেব।

—বেহিসেবী সরাব গিলে তু বেসামাল হয়ে গেছিস রে বাপ! বিলকুল বেহুঁশ। আভি তু চুপচাপ নিদঁ যা। বাতচিৎ নাই করবি রে বাপ্।

—কিঁউ নাই করব। তুর জনম বৃত্তান্ত বলব হামি, শোন্।

তুর মা তো তুকে ছোটোসাহেবের বাংলোয় জনম দিয়েছিল। রাঙা সাহেবটাই তো তুর বাপ।

—কি বলছিস তুই ঝুটবাত।

শম্ভুর কথা শুনে লালপাখির নীলচোখ বিস্ফারিত হয়।

—ঝুট নাইকে সচ বাৎই বোলছি। শম্ভু বলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে। সচ বাত?

—বিস্ময়াহত লালিয়া নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার নীলচোখের তারায় অফুরান ঘৃণা ফুটে ওঠে। সে ঘৃণা কালোদেহী ফুলমণির প্রতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ফুলমণি আত্মজার ঘৃণার বহ্নিতে দগ্ধ হতে হতে নিকানো উঠোনের এককোণে বসে পড়ে বজ্রাহত মানুষের মতো।

লালিয়ার নীলচোখ থেকে তখনও এক বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণার বহ্নি উপছে পড়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন শুধু শম্ভু ও ফুলমণির সীমিত সংসারেই শুধু নয়। গোটা চা বাগানের নিস্তরঙ্গ, নিরুপায় এলাকা জুড়ে।

জল খাবেন বনদুর্গা

ঝুমুর পাণ্ডে

সামনের সবুজ পাহাড়টার মাথা ছুঁয়ে চামকাঁঠাল গাছটার ডালপালা গলিয়ে, শণবাঁশের ঝুপড়ি ঘরটার ফাঁকফোকর পেরিয়ে শীতের রোদটা বনদুর্গার শীর্ণ মুখে আড়াআড়িভাবে পড়েছে। কতদিন তেল না পড়া চুলেও বিলি কাটছে শীতের এই মায়ামায়া রোদ। বেলা কত হল কে জানে, কিছুক্ষণ আগেও তো শিশির পড়ছিল টুপটাপ টুপটাপ। কাল সারারাত ঝরেছে এমনি টুপটাপ-টুপটাপ বনদুর্গার মন গড়িয়ে, স্মৃতি গড়িয়ে, বাঁশের বেড়া গলিয়ে, ময়লা চট কাঁথায়ও পড়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো শিশির। দুহাতে শিশির মেখে ছুটছে মেয়েটা সর্ষে খেত, আলু খেত, মটরশুঁটির খেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ছুটতে ছুটতে পদ্মবিলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। একটা পদ্মও নেই এখন। শীতে কী আর পদ্ম থাকে? মা বিষহরির পদ্ম তুলতে গিয়েই না সাপের কামড়ে মরে গেল ভাইটা। রাশরাশ পদ্মের মধ্যে শুয়ে ছিল ছোট্ট ভাইটা। আহা রে! হাতে তখনও ধরা ছিল একটা পুরুষ্টু পদ্মের ডাঁটা। বনদুর্গার গাল বেয়ে জল গড়াল। এক ফোঁটা। দু ফোঁটা। তিন ফোঁটা। গড়াতেই থাকল। পাখিটা ডাকল কিচ-মিচ-কিচ-মিচ...।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল খেলে ভালো হত। কিন্তু শরীরের কোনো অঙ্গই তো এখন আর চলে না। চোখটাও খোলে না। কথা তো বন্ধ কতদিন। ফুচুর বাপ, নিমাইয়ের মা, সনাতনের দাদা মাঝে মাঝে দেখে যায় প্রাণটা আছে কি না, না না, গেছে কী না। তবু ভালো, খবর তো নেয়। নইলে এদের সঙ্গে কী বা সম্পর্ক। যাদের সঙ্গে ছিল সামাজিক সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক ওরা তো...। পাখিটা আবার ডাকছে। আবার সেই পদ্মফুল...হাতভরা পদ্মফুল, পদ্মের টনা নিয়ে ছুটে আসছে জগই। কালো কুচকুচে মুখ। মাথায় খাড়া খাড়া চুল। লে লে।

ছোট্ট হাত দুটো ভরে ওঠে মেয়েটার ফুলে ফুলে।

টনা খাবি?

দে একটা।

না না চল ওই চাতালটায় বসে খাব।

চ তবে!

খাড়া খাড়া চুল আরও খাড়া হয়। বুকের ভেতর কেমন একটা খচখচ কষ্ট! গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু কে গড়িয়ে দেবে জল? কয়েকটা কাক এসে যেন বসল। ওদের ডানার শব্দ, গন্ধ সব অনুভব করতে পারছেন বনদুর্গা। ওদের মধ্যে কী নিয়ে যেন কথাবার্তাও চলছে। সেবার একটা কাক বিজলির তারে লেগে মরেছিল। কয়েকশো কাক মিলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মরা কাকটাকে নিয়ে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড। আর শহরের মিষ্টির দোকানে কাজ করা ভাইটাকে যখন পিষে দিয়ে গিয়েছিল একটা লরি, কেউ ভাইটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়নি। আহা রে! কত ঘণ্টা অমনি

পড়েছিল ভাইটা। কাক আর মানুষ। মানুষ আর কাক। লম্বা শ্বাসটা বেরোতে-বেরোতে কোথায় যেন আটকে গেল বনদুর্গার। কে যেন আসছে। নিশ্চয় ফুচুর বাপ। আজকাল শব্দ শুনলেই সবকিছু বুঝতে পারেন বনদুর্গা। দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। বাঁশের দরজা। এমনি ভেজিয়ে রাখা। মুখ বাড়াল কে? সত্যিই ফুচুর বাপই তো।

একটুকুন জল দেও গো।

আর একটু সরে এল ফুচুর বাপ।

জল গো। একটুকুন জল দেওগো ফুচুর বাপ।

এবার ঘুরে গেল ফুচুর বাপ। দরজা ভেজানোর শব্দ হল। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি শুনতে পায়নি ফুচুর বাপ?

ফুচুর বাপ্‌ ও ফুচুর বাপ!

আবার ডাকছেন বনদুর্গা।

কাকগুলো উড়ে গেল। টিলার গাঁ ঘেঁষে কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে। গরু নিয়ে যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গরুরও পায়ের শব্দ পাচ্ছেন বনদুর্গা। এখানে এই জঙ্গলে ঘর বাঁধার পর একটা বাছুরও রেখেছিলেন, শেষে ডাগর হয়ে গাভীনও তো হয়েছিল। নামও দিয়েছিলেন —মঙ্গলা। কার কাছে আছে এখন মঙ্গলা? বাচ্চা কী দিয়েছে? আহা রে। কেমন হয়েছে বাছুরটা দেখতে? দুধও দিচ্ছে নিশ্চয়। আবার লম্বা শ্বাসটা বেরোতে বেরোতে গলার কাছে আটকে গেল। পাখিটা ডাকছে। আবার যেন কারা আসছে। এবার দুজনের পায়ের শব্দ— একজন নিমাইয়ের মা, আরেকজন, হ্যাঁ, ওর নাতি সুধন্য।

ঝুঁকে পড়ে দেখল নিমাইয়ের মা বনদুর্গার শ্বাস-প্রশ্বাস।

একটুকুন জল দিবে গো?

না জান এখনও আছে। বলছে নিমাইয়ের মা।

তবে চ যাই। পা বাড়ায় সুধন্য।

একটুকুন জল দিবে গো নিমাইয়ের মা।

এ মা দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাচ্ছে দেখি নিমাইয়ের মা।

ও নিমাইয়ের মা? নিমাইয়ের মা...

ধেৎ। দুচোখ দিয়ে বনদুর্গার শীর্ণ গাল বেয়ে নেমে এল অনেকটা জল। গড়াল গাল বেয়ে, গলা বেয়ে। বুকের খাঁজ বেয়ে নাভি কুণ্ডে এসে সব জল থমকে গেল। মাগো। মা... ওমা একটুকু জল দেও গো মা...

ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসছে মা। কোমরে মাটির কলসি। মাথায় তিনটা অ্যালুমিনিয়ামের বটুয়া। একহাতে ভিজে কাপড়। মা চলছে, আহা রে! যেন জগৎ জননী। কোমর ছাপিয়ে লাল-লাল চুল। রংটাও ছিল একেবারে সাদা। সাহেবের বেটি ছিল কিনা মা। পাতি তুলতে-তুলতে জগৎবাউড়ির ঘর-সংসার সামলাতে সামলাতে পাঁচ-ছটা বেটা-বেটির জনম দিয়ে একদিন টুপ করে...

আবাক কাকগুলো ডাকছে। রোদটা মুখ থেকে সরে গেল কখন। গেন্দা পাতা, গেন্দা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন বনদুর্গা। ফুটেছে কী উঠোনে? লাগিয়েছিলেন তো সেই পুজোর আগে ডাল কেটে কেটে। আহা রে। দেখাই হল না ফুলগুলো কেমন হল। কাউয়া না হাজারি? না কৃষ্ণ গেন্দা। কৃষ্ণবাবুর খরে দেখেছিলেন সাদা রঙের গেন্দা। আনবো আনবো করে আনাই হল না একটা ডাল। নইলে...

ইষ্টি কুটুম পাখিটা ডাকল। এখন তো এই পাখিটা ডাকে না। কোত্থেকে এল এখন এই

পাখিটা। এই হলুদ রঙের পাখিটার পেছনে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কতদিন ছুটেছেন বনদুর্গা। কালীথানের ঝোপে ঘর বাঁধছিল পাখি দুটো, তখন থেকেই উঁকিঝুঁকি। তারপর ডিম। তা। মেয়ে পাখিটা তা দেয়। পুরুষটা খাবার খোঁজে। একদিন ডিম ফেটে বেরিয়ে এল ফুটফুটে দুটো বাচ্চা। খাওয়ার জন্য বড়ো বড়ো হাঁ করে থাকত সারাক্ষণ। আবার যেন কে আসছে। আরে, বাবুর মেজো ছেলেটা মনে হচ্ছে। পাঁচটা ছেলের মধ্যে এই ছেলেটাই মাঝে মাঝে আসে। বাবুর বউ মরতে সবগুলোকেই তো কোলেপিঠে মানুষ করলেন বনদুর্গা। নিজের সব কিছু ছেড়ে ওদের ঘরের মানুষই হয়ে গেলেন। লোকে বাবুর কাজের মেয়ে থেকে 'রাখেল' শেষে তা-ও না 'বউ'ই বলত। বাজার-হাট থেকে রান্নাবান্না ঘরে বাইরে ছুটতে ছুটতে শরীরের আর অবশিষ্ট কিছু ছিল না। বনদুর্গা বাপের জমিন বেচার টাকায় বাবুর বাঁধা রাখা বাড়িটা ছাড়ালেন। শেষে বাবু মরতে ছেলেগুলো পথে বের করে দিল। যাদের জন্য সারাজীবন...বনদুর্গার চোখ গড়িয়ে জল নামছে! আহা রে! কোথায় ছিল এত জল? ছেলেটা ঘরে ঢুকছে। পেছনে দেখি নিমাইয়ের মা-ও। বাইরেই ছিল নাকি এতক্ষণ? কম্বলটা দিয়ে দাও উপরে। ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়। মনে মনে হাসলেন বনদুর্গা। কিসের ঠাণ্ডা আর কিসের গরম? সবকিছু এখন এক হয়ে গেছে বনদুর্গার। আজ কী পৌষপরব? না, চলে গেছে? কে জানে?

পরবের দিন মা আর পাড়াপড়শিদের সঙ্গে রাত থাকতেই ধলেশ্বরীর জলে নেয়ে আসতেন বনদুর্গা। লক্ষ্মীমণিদের টুসু তখন মালা বদল করতে বেরোত। তারপর পিঠে খেতে খেতে টুসুর সঙ্গে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে দুটো ছোট্ট পায়ে ব্যথা হয়ে যেত। লক্ষ্মীমণির দাদিই তো গাইত—

ছোটো বাবুর ওই কোঠাটায়
ওই ছোঁড়িটা কে বটে
হাতেতে ডায়মন্ড কাঁটার বালা
কী মজাতে আইসেছে...

বাবুর বাড়িতে এসে কত রকমের পিঠা বানানো শিখলেন বনদুর্গা। আহা রে! বাবুর বড়ো ছেলেটা খেতে বড়ো ভালোবাসত চিঁড়ের পিঠা। ছুটিতে এলে বায়না। আর একবার তো পিঠা পরবে...গত ভোটে পাওয়া কম্বলটা গায়ে চ.ড়িয়ে দিল নিমাইয়ের মা। কিন্তু জল? একটু যদি জল দিত মুখে। ও নিমাইয়ের মা, নিমাইয়ের মা। আবার চোখ দিয়ে জল গড়াল। চলে যাচ্ছে ওরা কী যেন বলতে বলতে। পাখিটা আবার ডাকছে। এবার যেন শীতটা বেশিই পড়েছে। কেমন যেন একটা শন-শন হাওয়াও আছে। বিছানায় কম্বলে কেমন একটা কটু গন্ধ। গুলিয়ে উঠছে শরীর। একসময় বনদুর্গার ঝকঝকে পরিষ্কার বিছানায় কেউ বসতে ভয় পেত। বাবুর বাড়িতে থেকে থেকে কতকিছুই না শিখেছিলেন। কত রকম রাঁধাবাড়া আদব কায়দা। মা-ও তো কম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। ঘরদোর, উঠোন-আঙন, লেপেপুছে ঝকঝক, তকতক করে রাখত। বোনাসের জন্য গুলি খেয়ে সদ্যলেপা উঠোনেই না বাপটা ছুটতে ছুটতে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। মা তখন চান করে রুটি বানিয়ে চা করছিল। নুন দিয়ে চা। আহা রে! গরম রুটির গন্ধে তখনও ভরে ছিল ঘর। আর বনদুর্গা তখন দুর্গা থানে মেড় দেখছিল। খড় বাঁধা মেড়। তখনও একতালও মাটি পড়েনি গায়ে। মিছিল, জমায়েত করতে করতে দুদিন থেকেই নাকি ভুখা ছিল বাপ। ওই ভুখা পেটেই...পাখিটা আবার ডাকছে। কোথায় যেন ঢাপলা বাজছে। মেয়েদের গলায় গানও শোনা যাচ্ছে। তাহলে কী কারও বিয়ে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুচুর বিয়ের কথা ছিল। রূপাছড়ায় বিয়ে। এখন সব মনে পড়ছে। আজ কী তবে ফুচুর গায়ে হলুদ? হলুদবাটা সর্ষেবাটা কতদিন মেখেছিল বনদুর্গা। প্রায় সাত দিন। কত গান, বাজনা, নাচ। কিশোরী মন উছলে উঠেছিল। ভেতরে কত টলমল করা সুখ শুধু উথালপাথাল খেয়েছে। তবু ঘর করা আর হল কোথায় বনদুর্গার? ভিনজাতের একটা মেয়ের সঙ্গে

থাকত কিনা মরদটা। শেষে বনদুর্গার পেটে বাচ্চা আসতে একদিন মদ খেয়ে এমন লাথি মারল পেটে, রক্তে নদী হয়ে গেল ঘর। বাজনাটা দেখি এদিকেই আসছে। পাখিটাও দেখি ডাকছে। পাখির ডাক, বাজনার শব্দ সব যেন এক হয়ে যাচ্ছে। কম্বলটা যদি কেউ সরিয়ে দিত। কেমন ভারী লাগছে। গত ভোটে কারা যেন এনে দিয়েছিল কম্বলটা। অনেক কম্বল নাকি বিলি হয়েছিল। কিন্তু ভোট দিতে আর যেতে হয়নি। ভোট তো আগেই হয়ে গেছে। কয়েকবার থেকেই ভোট দিতে পারেননি বনদুর্গা। কারা যেন আগেই...বাজনাটা দূরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয় কালীথানে যাচ্ছ। আহা রে! কেউ যদি সরিয়ে দিত কম্বলটা। কেউ কী এখন আর আসবে? বড্ড ভারী লাগছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন। গায়ে অসুরের শক্তি ছিল বনদুর্গার। সাহসও। গত ভোটের সময় যখন মারামারি হচ্ছিল সুহাসবাবুর ছেলেটাকে প্রায় মেরে ফেলছিল কয়েকটা গুণ্ডা মতন ছেলে মিলে বনদুর্গা তখন একাই দশভুজা হয়ে... আর শবরীর মেয়েটাকে যখন...পাখিটা আবার ডাকছে। সুহাসবাবুর ছেলেটা নাকি এখন আমেরিকা থাকে। আর শবরীর মেয়েটাও ইশকুলে চাকরি পেল গেলবার। কত শক্তি ছিল শরীরে গুণ্ডারাও ভয় পেত আর এখন কম্বলটা পর্যন্ত...লম্বা শ্বাসটা বেরোতে আবার গলার কাছে আটকে গেল। গাল বেয়ে নেমে এল আরও কতটা জল। লিচুগাছে উঠে পা দোলাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটা। এডাল থেকে ওডালে লাফাচ্ছে।

হেই দুটা নীচে ফালা

সুলোচনা, শকুন্তলা, ফুলবাসিয়া সবাই তখন হাঁ করে উপরে তাকিয়ে আছে।

দিচ্ছি। দিচ্ছি।

ছোট্ট মুখে তখনও টক-মিষ্টি স্বাদ লুটোপুটি খায়। আবার পাখিটা ডাকছে। ধেৎতেরি, কম্বলটা যদি কেউ সরিয়ে দিত। কী যে জ্বালা!

ওঝার গান শোনা যাচ্ছে। কোথাও কী তবে নৌকো পুজো হচ্ছে? গেলবার তো হয়েছিল শ্মশানটার সামনে। রামী বুড়ি স্বপন দেখে সারা বছর ভিক্ষে করে..কত দেবদেবীর মধ্যে দেবী মনসা আহা রে। ...পাখিটা মনে হচ্ছে ঘরের চালে এসে বসল। আধুনিকার আঁকাবাঁকা সিঁথির মতো রাস্তা দিয়ে ছুটছিল মেয়েটা। শিস দিচ্ছিল, পাহাড়ি ময়না ছাতিম ফুলের গন্ধও ছিল কী বাতাসে? কে জানে? না, না, শিমূল আর পলাশে ভরেছিল গাছ।

আরে আরে এত দৌড়চ্ছিস কেনে?

থমকে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা।

তুই এত বড়ো হয়ে গেছিস?

আরে এ তো জগই। পুলিসে ভর্তি হয়েছে জগই। ওই শেষ দেখা। আর দেখা হয়নি জগইয়ের সঙ্গে। বুকের ভেতর কষ্টটা আরও খচখচ করে। বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন এদিক-সেদিক হচ্ছিলেন তখন এই জঙ্গলে খাসজমির উপর ফুচুর বাপরাই বানিয়ে দিয়েছিল এই শনবাঁশের ঘরটা। জঙ্গলে এসে ভালোই লাগত। তখন থেকেই তো নাম হল বনদুর্গা। নইলে আসল নাম তো উমাশশী। এই নামটা যেন কার দেওয়া মা বলত। ধেৎতেরি, মনেও আসছে না। ফুচুর বাপরাও ভিটেমাটি হারিয়ে এখানেই ঘর তুলেছে কিনা। ওদের বাপঠাকুরদার ভিটের পেট চিরে এখন সিটি বাজায় রেল। আম, জাম, কাঁঠাল, সুপুরি, আহা রে। জলপাই, লুকলুকির গাছও ছিল। বাতাবিনেবুর গাছে লাফালাফি করত কাঠবেড়ালি। ভেবেছিল অনেক পয়সা পাবে, কত আশ্বাস দিয়েছিলেন, এম. এল. এ. সাহেবও এসে। কিন্তু কোথায় টাকা, কোথায় পয়সা? মালিক পাবে নাকি আশি শতাংশ ওরা বিশ—তা-ও এখনও কোর্টে কেস ঝুলছে। পাহাড়ি ময়নাটা আবার ডাকছে। সঙ্গে হলুদ পাখিটাও আছে। বাবুর ঘরে ছিল একটা ময়না পাখি। হলুদ জলে চান করত। তইতই করে হাঁসদের ডেকে উল্টেদিত ভাত। শিম পাতা, শিম ফুলের গন্ধ আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ,

লাগিয়েছিলেন তো সেই জৈষ্ঠিমাসে কটকটে গরমের সময়। গাছগুলো কয়েক হাত হতেই মাচা বানিয়ে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। পুজোর পরেই সাদা-বেগুনি ফুল এসেছিল। এখন বোধহয় শিমে শিমে ভরে গেছে সারা মাচান! কিন্তু দেখা হল আর কোথায়? আচ্ছা, মাঝলি এখন কেমন আছে? আছে, কী নেই? সেই যে গো কৃষ্ণবাবুর বোন নিয়ে গেল কলকাতা, আর ফিরে এল কই? দুবছর পর মা দেখতে চাইলে ওরা বলল, একটা বদছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সত্যিই কী পালিয়ে গেছিল? লোকে বলে নারী পাচারকারীরা নাকি খারাপ বস্তিতে বেচে দিয়েছে। আহা রে! সবে তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছিল বোনটা। সোনা রঙের চুলে ঢাকা মুখে বড়ো বড়ো পিঙলা চোখ। বোনটা একদম মায়ের মতো হয়েছিল। বাগানে তখন লকআউট চলছিল। না খেতে পেয়ে ধুপধাপ মরছিল মানুষ। নইলে কী আর মা অতদূরে দিত? মাঝলিকে দেখতে এখন মনটা বড়ো আঁকুপাঁকু করছে। চোখ বেয়ে গাল গড়িয়ে আবার নেমে এল জল। আবার কে যেন আসছে। কে হতে পারে? চেনা-চেনা তো লাগছে না। অপরিচিত পদশব্দ। সনাতনের দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। হামার বউ লাগে সচ বলছি ভাই।

তোম্যর বউ।

হুঁ, শাদি করা বউ।

কান পাতেন বনদুর্গা। হ্যাঁ, এখন গলাটা চেনা-চেনা লাগছে। সেই পাষণ্ড মরদটা। তবু বুকের ভেতর উথলে উঠল সুখ। তাহলে পাষণ্ডটারও মন আছে। এতদিন পর শেষ সময়ে দেখতে এল। ধেৎতেরি, এত দিন বনদুর্গা কত উল্টো-পাল্টা ভেবেছেন। গাল গড়িয়ে নেমে আসছে জল। চোখটা যদি একটু খুলতে পারতেন, মুখটা যদি একটু দেখতেন?

জমিন কত আছে এইখিনে?

যতটাই থাকুক জমিন তো খাস।

হোক খাস বাকি দখল তো আছে। হুঁ ভাই শুনেছি, সিলিঙেরও কয়েক কিয়ার জমিন নাকি উয়ার নামে আছে।

জমিন-জায়গা কী বলছে গো মানুষটা, কী লজ্জা কী লজ্জা! বনদুর্গার চোখের জল গাল অবধি গড়িয়ে আটকে গেল। এখন মনে পড়ছে সিলিঙের জমি পেয়েছিলেন সেবার। কৃষ্ণবাবুরাই পাইয়ে দিয়েছিলেন। একবার ভাগে চাষও করেছিলেন। ধানও পেয়েছিলেন। এখন কে করছে কে জানে? তা হলে কী পাষণ্ডটা জমির লোভেই এসেছে? কী ঘেন্না কী ঘেন্না! সিলিঙের জমিন তো আছে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

ওইটা বাবুর মেজো ছেলে লিবেক মনে হয়।

মাগো মা। এইজন্যই ছেলেটা আসে। কী স্বার্থ গো মা, কী স্বার্থ! মাগো তুমি কোথায়? আমি কোথায় রাখি গো মা মুখ?

আর এইখিনেরও তো সব দেখাশুনা করছে, ওদেরও তো দাবি আছে। বলছে সনাতনের দাদা।

বনদুর্গার সব চোখের জল শুকিয়ে গেল। যদি একটু বমি করতে পারতেন। শরীরটা কেমন মাতলাচ্ছে। গত আকালে যখন ওরা জঙ্গলের আলু খাচ্ছিল, খিদেয় সারারাত কাঁদত ছোটো ভাইটা, তখনও বাপ এক ব্যাগ টাকা পেয়ে থানায় জমা দিয়েছিল। লোকে তখন বলেছিল, জঙ্গলের ধারে পেয়েছিস, এটা ডাকাতের টাকা। রেখে দে, আমাকেও দু-একটাকা দে রাজা হয়ে যাবি। বাপ শুনে কানে আঙুল দিয়েছিল। রাম রাম! মা-ও একবার মেমসাহেবের হার পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। পাখিটা আবার ডাকছে। ভোটে পাওয়া কম্বলটা ভার হয়ে চেপে আছে সারা শরীরে। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধও আসছে। বাদশাথানে কী অজ পুজো হচ্ছে? বাদশাথানের

বচ্ছরকার পুজোয় বাপের সঙ্গে আসতেন। তখন তো ঘোর জঙ্গল। কলাপাতায় খিচুড়ি খেতেন। কত বাঘ, কত হরিণ, আহা রে! খরগোশ, কত রংবেরঙের পাখি ছিল! জংলি হাঁস, তিতির, মধুরা ডাহুকে ভরে থাকত বিল। একবার বনদুর্গার পাঁচ হাত আগে লাফ দিয়ে পড়েছিল একটা চিতা। না, কিছু করেনি। রাস্তা পেরিয়ে নেমে গেছিল সামনের ঝিলটায়। বনদুর্গা ভয়ে উত্তেজনায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কতক্ষণ। পাখিটা আবার ডাকছে। বেলা কত হল কে জানে? ধূপের গন্ধে মনটা বড়ো ভালো লাগছে। একটা কোকিল ডাকল। এবার এই ডাকটা প্রথম শুনলেন বনদুর্গা। আর ভোটের কম্বলটা দেখি আপনি সরে গেল গা থেকে। এরা কী সবাই চলে গেছে? যাক্। না, ওই তো বাইরে সবাই কথা কাটাকাটি করছে। বনদুর্গা এখন স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছেন। কে যেন কমলা ছাড়িয়ে রেখেছিল, রসও দিয়েছিল কী মুখের ভেতরে? এমা, মুখ পর্যন্ত পিঁপড়ে সারি বেঁধে হাঁটছে। কতদিন পড়েছিলেন? পিঠে ঘা, পায়ে ঘা। ওরা এখনও ঝগড়া করছে। না, কেউ কাঁদছে না। বাঁশ, কাঠ কাটার শব্দ হয়তো শুরু হবে এক্ষুণি। বনদুর্গা হাসলেন হো হো করে অনেক অনেকক্ষণ...। বাইরে কত সুন্দর গাছগাছালি, বন-জঙ্গল, ফুল, পাতা, আহা রে। আকাশে কত থোকা থোকা মেঘ। কলকল করে উড়ে যাচ্ছে জংলি হাঁসের ঝাঁক বসে আছে একটা তিতির। ডাহুকটা কী যেন খুঁটেখুঁটে খাচ্ছে। বাদশাথানের ধূপের গন্ধ ম ম করছে বাতাস। সর্ষে ফুলেরও গন্ধ পাচ্ছেন—ওই তো হলুদ হয়ে আছে পাহাড়ের নীচে খেতটা। বড়ো হালকা লাগছে মনটা। প্রাণভরে বুকভরে শ্বাস নিলেন বনদুর্গা। কিন্তু সারা শরীর বুক জুড়ে বড়ো তেষ্টা গো। বড়ো তেষ্টা। পাহাড় পেরোলেই তো বড়ো ঝরনা। রাতদিন ঝরঝর করে অঝোর ধারায় ঝরছে ওখানে জল। ঝরনায় নেমে অঞ্জলিপুরের মনের সুখে এখন জল খাবেন বনদুর্গা...

পরমশত্রু

হেনা ইসলাম

ইচ্ছেটা দু'জনার হৃদয়েই ছিল, অপ্রকাশিতভাবে। দীর্ঘদিন একই নিয়মের নাগরদোলায় জীবনকে বেঁধে নিয়ে নিশ্চিত কাটানো একেবারে অসম্ভব নয়। তবুও কিছুটা ব্যতিক্রম লোকালয় প্রয়োজন, যেখানে একঘেয়েমির ভূষণগুলো খুলে রেখে উদোম শরীরে আলোবাতাস, সবুজ পত্রালী, পাখির কলগুঞ্জন ইত্যাদিগুলো আহরণ করে দেহের সজীবতা পাওয়া যায়। অথচ সময়ের জল্লাদ, প্রত্যেকের হৃদয় খুঁড়ে সেখানে নামহীন বৃক্ষের বীজ বপন করেছে। যা এক একটি মহীরুহে পরিণত হয়ে, শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মানুষকে সময়ের ক্রীড়নক করেছে।

জিনাত এবং কামাল, পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে, শহরের অভিজাত এলাকায় রঙচঙা প্রচ্ছদের মতো দিন যাপন করলেও তাদের দ্বিতীয় একটি সত্তা, যা শুধু অনুভবের দেয়ালে আবদ্ধ, অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক। বদ্ধ জলাশয়ের ঘোলাজলের মতো সীমিত সময়ের আবরণে সংসার, অফিস, ঘরকন্না, মাঝেমধ্যে দু'একটা সিনেমা, এখানে ওখানে বেড়ানো এবং রাত্রির সংলাপহীন মুহূর্ত, তাদের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সুখী জীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে অন্যকিছু ভাববার মতো দীর্ঘ অবকাশ সেখানে নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কার্য্যক্রমগুলো তাদের মুখস্ত।

মাঝেমধ্যে আগের উজ্জ্বল দিনগুলোর বর্ণচ্ছটা যে স্মৃতিতে আবির্ভূত হয়না তা নয়। তবে তা ক্ষণিক। দুপুরে সবকাজগুলো গুছিয়ে যখন জিনাত একাকী নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে এ পাশ ওপাশ করে, ঠিক তখুনি এক্কা দোক্কা খেলার মতো একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো আবির্ভূত হয়। অথবা ফুলস্পীডে ছেড়ে দেয়া ফ্যানের নীচে বসে মুহূর্তের জন্য যখন কামাল হাতের কলমটা টেবিলে শুইয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চিন্তা করে জীবনটা কত সুন্দর, ঠিক তখুনি রঙবেরঙের কতকগুলো বেলুন উড়তে উড়তে এসে মনে করিয়ে দেয়, আসলে আগের সেই দায়িত্বহীন জীবন অনেক অনেক সুন্দর ছিল : আকাশের মত বিশালতায় অবাধ বিচরণ। হাসি-গান-ফুল-পাখি-প্রেম-ভালোবাসা-আনন্দ, জীবন। পরমুহূর্তেই পর্দায় সিনেমা স্লাইডের পরবর্তী বিজ্ঞাপন উপস্থিত হয় এবং নিজেকে অনেক অসহায়ভাবে সময়ের ঘরে সমর্পিত করতে হয়।

এই যে সুখী ও আনন্দিত জীবনের মধ্যেও অসহায়তা ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠেছিল, সেটা জিনাত এবং কামাল দু'জনেই যখন অনুভব করতে পারল, তখন আনন্দে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে, দরোজাজানালা খোলা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে তা প্রকাশ করল। এজন্যে মাসুদের কাছে তারা কৃতজ্ঞ।

মাসুদের পত্র একটি অলৌকিক চাবির মতো ওদের অনুভবের দরোজা খুলে দিল। আসলে গাড়ি, বাড়ি, আভিজাত্য ইত্যাদির মধ্যে সুখী জীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কৈশোর যৌবনের মতো

দু'হাত প্রসারিত করে উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে কাশবনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ কোথায়?

'দীর্ঘদিন খবর নেইনি বলে ভুলে গেছি ভাবিসনা। এইপত্র তার প্রমাণ। সম্ভবত জীবনের পরিপূর্ণতায় আমাকে ভুলে গেছিস তোরা। নতুবা একবার খোঁজ নিতি। আমি পাহাড়ি এলাকায় বেশ কিছু জায়গা নিয়ে ফলের বাগান করেছি এবং ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাবো এতোদিন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তোদের আহ্বান জানাবার। এখোন যে কোনো সময় আসতে পারিস। আনন্দিত হব।'

জিনাত ও কামাল এমন কিছু একটা প্রত্যাশা করছিল, মনে মনে। মানুষের হৃদয়ের অসুখ যে তাকে কতটা অসহায় করে সেটা বোঝা যায় হঠাৎ বন্ধ ঘরে সামান্য আলো প্রবেশের মতো, এক চিলতে আনন্দের হাসি দেখে। বিনা বিলম্বে দু'জনেই প্রস্তুতি নিল।

...আমরা তিনজন ছিলাম অভিন্ন হৃদয়। সংকোচের দেয়াল ভেঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতাম আমরা। কলেজ ছুটির দিনগুলোতে সকালে খাবার বেঁধে নিয়ে, শহর থেকে দূরে, বন-বনান্তরে, নির্জনে চলে যেতাম। সারাদিন কাটিয়ে ফিরতাম সন্ধ্যায়। পাহাড়ের নির্জনে নিস্তবদ্ধতা ভেঙে যখন উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করতাম, অদ্ভুত লাগত। অতঃপর সবুজ ঘাসের চাদরে পাশাপাশি শুয়ে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তাম...

...পাহাড়ের নির্জনে শুয়ে নীল আকাশ দেখতে দেখতে একদিন অনুভব করলাম, আমাদের তিনজনের জীবন, টুকরো টুকরো মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরকে ভালোবাসি আমরা এবং ঘর বাঁধতে চাই। জটিল আবর্তে না গিয়ে, সহজভাবেই বললাম জিনাতকে, আমাদের অভিলাষ এবং এটাও বলে দেয়া হল, জিনাত ইচ্ছেমতো একজনকে বিয়ে করতে পারে। এতে অপরজন মনঃক্ষুন্ন হবে না...

আজ কোনোদিকে যাবো আমরা? নীরবতা ভেঙে জিগ্যেস করল কামাল।

সামনের উচুঁ উচুঁ পাহাড়গুলোর ওপাশে, মুরংপাড়ায়। বলল মাসুদ।

বাংলোর বারান্দায় দুটো চেয়ারে বসে কথা বলছিল মাসুদ আর কামাল। গল্পে গল্পে দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল অনেক অনেক দূরে। নীল আকাশ, সবুজ বৃক্ষ, পাহাড় আর পাহাড়। জিনাত তখন ভেতরে তৈরি হচ্ছিল। ওর দেরি দেখে কণ্ঠস্বর চড়া করে জিগ্যেস করল কামাল :

জিনাত, এখনো হয়নি? দেরি হলে ফিরতে অসুবিধা হবে।

আর সামান্য। আসছি। ভেতর থেকে জবাব দিল জিনাত।

এইজন্য শালা মেয়েদের নিয়ে কোথাও যেতে নেই। সব কাজে দেরি। বলল কামাল

আস্তে বল। ও যা সেন্টিমেন্টাল। শুনলে রেগে যাবে। শেষে কোথাও যাওয়া হবে না।

হাসল দু'জন টেবিলে রাখা সিরগেট নিয়ে মুখে দিল মাসুদ। বাড়িয়ে দিল কামালকে। আগুন লাগিয়ে টানতে লাগলো।

....কেন যেনো ইচ্ছে হচ্ছে সারাক্ষণ ধরে, মাসুদের মাসুদের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজগোজ করি। কতোদিনপর এমন ইচ্ছে দ্বারা আক্রান্ত হলাম। বারান্দায় বোসে ওরা বিরক্ত হচ্ছে ঠিক, তবুও সময় নিয়ে সাজতে লাগলাম।...আমি পছন্দমতো কামালকে বিয়ে করেছি, মাসুদ সম্ভবত সহজভাবে নিতে পারেনি। নতুবা বিয়ের আগের দিন হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল কেউ বলতে পারেনা। পাঁচ বছর পর পুনরায় এই সাক্ষাৎ। তবে কী নিজেকে সামলে নিতে পাঁচবছর সময় লেগেছে মাসুদের। আজ অবশ্যই জিগ্যেস করব...

পড়তে পড়তে সামান্যের জন্য বেঁচে গেল জিনাত। ভাগ্যিস মাসুদ ধরে ফেলেছিল। পাহাড়ি সরুপথ, কী একটা লতায় পা আটকে গিয়েছিল। ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল আবার।

রিয়েলি মাসুদ, অদ্ভুত পছন্দ তোমার। বলল জিনাত।
তাই নাকি?
হ্যাঁ। ঘর করার যে জায়গা বেছে নিয়েছ। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সবুজ সমুদ্রের মতো উচুঁ উচুঁবৃক্ষ। একপাশে পাহাড়ি খরস্রোতানদী। সুনীল আকাশের শামিয়ানা। যখন ইচ্ছে সব কিছু ভুলে দৌড়ে অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া যায়। চিৎকার করে মনের অকথিত ইচ্ছেগুলো পাখির মতো আকাশে উড়িয়ে দেয়া যায়।
আমি তো আকাশ, পাহাড় আর বক্ষ দেখে দিন কাটাতে আসিনি। তাছাড়া নানান ঝামেলায় ওগুলো দেখবার মতো অবকাশ কোথায়?
এটা কী তোমার মনের কথা?
কীরে, তোরা যে গতিতে হাঁটছিস তাতে পথের শেষ হবে না কোনোদিন। কিছুটা উচ্চস্বরে বলল কামাল।
কামাল কিছুটা আগে আগে হাঁটছিল। জিনাতকে সঙ্গ দিয়ে মাসুদও কিছুটা পিছে পড়ে গিয়েছিল।
আমি জোরে হাঁটতে পারবনা। বলল জিনাত।
বেশ তবে পেছনেই থাক। আমি চললাম। ফেরাব পথে দেখা হবে।
কামাল আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল। হাসল মাসুদ। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে লাগালো একটা। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হাঁটল ওরা। কোনোকথা খুঁজে পেলনা। আসলে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে অন্তরগত সহজতা হারিয়ে ফেলেছে।
আমার কী ইচ্ছে করে জানো?
কী? জিগ্যেস করল মাসুদ।
এখানে, এই পাহাড় আর অরণ্যের মাঝে আজীবন থেকে যাই!
বন্য জানোয়ারের ভয় আছে।
কী হবে, তাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে নেব।
কোন্ বিশ্বেসে?
মাসুদ তাকিয়ে দেখল, কামাল সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। তার ওপাশে ঢালুতে, নদীর তীর ঘেঁসে মুরংপাড়া। মাসুদ ও জিনাত তখন মাঝামাঝি পথে। জিনাত পাশের ঝোপ থেকে একটা বুনোফুল তুলে খোঁপায় গুঁজলো। মাসুদ সিগ্রেটের শেষাংশ ছুড়ে দিল দূরে। কামাল অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে।
আজকাল লেখটেখ না?
মাঝেমধ্যে চেষ্টা কোরি কিন্তু পারিনা।
কেন?
ঠিক বুঝতে পারিনা।
না কী আমাকে সহজভাবে বলতে পারছনা?
যেটা মনে করো।
জিনাত যেন একটু বিষণ্ন হল। মাসুদের কাছ থেকে সামান্য দুরে সরে একা একা হাঁটতে লাগল। মাসুদ কোনো কথা না বোলে অনুসরণ করল ওকে!
ইস্ কী সুন্দর! বাচ্চা মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল জিনাত।
কী? ততক্ষণে মাসুদ পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।
নদী।
পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে, নীচে বহমান নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা। মাসুদ একটা পাথরের

নুড়ি তুলে ছুড়ে দিলো নদীর দিকে। সেটা কখন, কেমন করে নীচে গিয়ে হারিয়ে গেল, অনুভব করতে পারলনা ওরা।

চলো, এখানে দেরি কোরলে কিছুই দেখা হবেনা। বলল মাসুদ। না, আমি আর কোথাও যাবোনা। এখানে বসে বসে নদী দেখবো। ফেরার পথে নাহয় বসব কিছুক্ষণ।

তোমার ইচ্ছে না থাকলে চলে যাও। ফেরার পথে এখান থেকে নিয়ে যেও আমাকে।

অগত্যা জিনাতের পাশে বসল মাসুদ। নীচে অনেক নীচে, কাঁচের শার্সিতে বৃষ্টির জালের আঁকা বাঁকা সর্পিল পথের মতো নদীটা বয়ে চলেছে। মাসুদ একটা আবৃত্তি কর না। আগের মতো।

কেন বারবার আগের দিনগুলোতে যেতে চাইছ জিনাত। ভুলে যাও ওগুলো।

সে জন্যই বুঝি এতক্ষণ এ্যাভয়েড করছ?

এ্যাভয়েড।

নতুবা কী? যখনি আমি পুরোনো প্রসঙ্গ তুলেছি, অন্য কথার ঘণ্টা বাজিয়ে ঢেকে দিয়েছ তা।...আসলে তোমরা কেউ আমার দুঃখ বুঝতে চাইছনা। না কামাল না তুমি।

দুঃখ। তোমার।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমার। বিয়ে করে জীবনে সবচেয়ে বড়ো ভুল করেছি। একটা বুনো জানোয়ারের সঙ্গেও ঘর করা যায় কিন্তু অমানুষের সঙ্গে,... অর্থের নেশা যাকে পাগল করে তুলেছে।

কীসব আজেবাজে কথা বলছ?

ঠিক কথাই বলছি। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে, শহরের অভিজাত এলাকায় সমস্ত দিনগুলো একা একা নিঃসঙ্গ কাটাতে পারি না আর। আমি মুক্তি চাই। লোকালয়ের নিঃসঙ্গতা থেকে অরণ্যের হিংস্রতার মধ্যে বাঁচতে চাই। আমাকে আজীবন তোমার সঙ্গে রেখে দাও মাসুদ।

জিনাতের মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মাসুদ। ধীরে ধীরে পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল। প্লানচেটের আত্মার মতো অনুচ্চারিত স্বরে বলতে লাগল,... এই যে জিনাত, কামালের বিবাহিত স্ত্রী, সর্বশেষ অস্ত্র দিয়ে আজ আমাকে আঘাত করেছ, আমিও পাল্টা আঘাত হানব। তোমার ইচ্ছের সাগরে একদিন আমরা দু'জন ভাসমান রাজহংস ছিলাম। কামালকে বিয়ে করলে তুমি। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হলাম, তোমরা সুখী হবে এই ভেবে। কিন্তু আজ কামালের দোহাই দিয়ে বধ করতে চাইছ আমাকে। তা হতে দেবনা।

মাসুদের পাথর হাত দুটো মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল। ধাক্কা দিল জিনাতকে। একটা তীব্র চিৎকার শুধু, খানিক আগে ছুড়ে দেয়া পাথরের নুড়ির মতো অদৃশ্য হল জিনাত।

মৃদু স্পর্শে চমকে উঠল মাসুদ। তাকিয়ে দেখে পেছনে দাঁড়িয়ে কামাল। শোভনহীন উচ্চস্বরে হেসে বলল :

ডোণ্ট বি এ্যাফ্রেড মাসুদ, আমিও চাইছিলাম কিছু এমন একটা ঘটুক। কেউ ওকে মুক্তি দিক। জিনাত, যেহেতু আমার বিবাহিত স্ত্রী ছিল, আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা কিছু করা। তুই আমাকে মুক্তি দিয়েছিস। আমি আজ মুক্ত। আই অ্যাম ফ্রি নাউ। চল, মুরংপাড়ায় উৎসবে আজ প্রাণভরে দিশি টেনে মাতাল হব। আনন্দে নাচব আমরা। লেট্স্ গো।

তারপর হঠাৎ অসম্ভব স্তব্ধতা।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে দুটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দে দুজন পরস্পরের দিকে চমকে তাকালো। মুরং পাড়ায় তখন উৎসবের হল্লা উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ইস্কুলবেলা

অপরাজিতা ঘোষ

আমি তখন ফাইভ। ফোরের পচা স্কুল ফেলে। মেয়ের দঙ্গল ছেড়ে। নতুন স্কুল। ডানকুনি পাঠভবন। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে। তাকেই যে কো-এড বলে, তা জেনেছিলাম অনেক পরে।

বাসে করে স্কুলে সেই প্রথম। সেই প্রথম এত দূরের স্কুল। সেই প্রথম হৈ হৈ করে একসঙ্গে যাওয়া-আসা। কত গল্প যে হত সারাক্ষণ বাসে। সব থেকে মজা ছিল সেই বাস-জার্নিটা। গল্পের আর শেষ হয় না। এমন একটা দিনও মনে পড়ে না, স্কুল স্টপ এসে গেছে এবং আমাদের গল্পেরও শেষ হয়েছে। বাস থেকে নামতে নামতেও চলত গল্প। শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে?

গল্পের বিষয়েরও কোনো অভাব হ'ত না তখন। রাগ হত খালি, বাসটা হুস করে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালে। ভারি আনন্দ হত, বাসটা রাস্তায় অনেকক্ষণ জ্যামে আটকে থাকলে। তখন নব উদ্যমে আমাদের গলা সপ্তমে গিয়ে চড়তো। সবাইকে বলতে চাই, শোনাতে চাই; শুনতে চাইতাম কম। কত কথা যে বলার থাকত তখন আমাদের!

সিক্সের ইন্দ্রনীলদা সম্পর্কে আমার যে কী মোহ আর দুর্বলতা ছিল তখন! মাঝে কত ছেলে এলো—গেল। অচিরে তারা খসেও পড়ল তারার মতো। কিন্তু ইন্দ্রনীলদা আমার মনের আকাশ জুড়ে বসেছিল বহুকাল! সে আমার রাতের চাঁদ, দিনের রবি। কোন্ ছেলের সাধ্য আছে, দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার মন থেকে সরানোর!

সে সময় ইন্দ্রনীলদা আমার হার্টথ্রব। কত স্বপ্ন যে দেখতাম তাকে নিয়ে! নিদ্রায়, জাগরণেও। কাছে বসে। দূরে গিয়েও। সেই ক্লাস সিক্স থেকে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত। দীর্ঘ সময় জুড়ে আমার অন্তরের একমাত্র স্থায়ী হিরো ছিল ইন্দ্রনীলদা।

ইন্দ্রদা ছিল আমার ইষ্টনাম। জপের মন্ত্র, কী সুন্দর নাম! উচ্চারণ করতেই সমস্ত শরীর মন কেমন যেন রিনরিন করে সুরে বেজে উঠত। জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, কেমনে পাইবো সই তারে?

ইন্দ্র মানেই একটা ব্যাপক ব্যাপার। নইলে কী আর ভোটে হেভিওয়েট প্রার্থীর হার হলে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট করে লেখে, ইন্দ্রপতন! ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র। দেবতা, তাদেরও রাজা! ইন্দ্রধনু। যেন নীলাকাশ। আমার নীলকণ্ঠ।

আমার সেই নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে আমি প্রায় রোজই যেতাম দোকানে। মায়ের সংসারের টুকিটাকি আনতে। ভাই তো হয়নি তখন। আমিই আমার মা-বাবার বড়ো মেয়ে, বড়ো ছেলে, সব। সবেধন নীলমণি। সকলের নয়নের মণি।

আবদারের অন্ত ছিল না আমার। কথা কিছু মুখ থেকে বার হতে যা দেরি। সঙ্গে সঙ্গে গুপী-বাঘার হাততালির মতো এসে যেত সবকিছু।

—মা, ডিম খাবো।

—যা, নিয়ে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে মা পয়সা বার করে দিত আমার হাতে।

আমি তক্ষুণি মহানন্দে ছুটতাম ডিম কিনতে। পাড়ার কাছের দোকান ছেড়ে অনেকটা দূরে, শ্যামদার দোকানে। সেই দোকানের পুব দিকের পুকুর পাড়েই যে ইন্দ্রনীলদার বাড়ি। যদি দেখা হয়! দেখা হ'ত না প্রায় কোনোদিনই। তবু রোজ সকাল হতেই মাকে বলতাম, —কী গো? আজ আর কিছু লাগবে না তোমার? মা 'না' বললে খুঁজে খুঁজে কিছু একটা আনার কথা আমাকেই বের করতে হত।

—মা! ডিম আনি না গো, প্লিজ। জানোই তো ডিম ছাড়া আমার ভাত খেতে একটুও ভালো লাগে না। মায়ের হয়ত ইচ্ছে ছিল না, সেদিন ডিম রান্নার। তবু আদুরে কন্যার আগ্রহেই—।

প্রতিদিন ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরোতাম আমি। স্কুলের পরীক্ষা দিতে নয়; ও পাড়ার দোকানে।—ঠাকুর, যেন একবারটি ইন্দ্রনীলদার সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর একদিন আমার কথা শুনলেন। দেখা হল তার সঙ্গে। কিন্তু কথা হল না। আমি হাসলাম বলেই সে-ও হাসলো একটু। তাতেই আমি ফিদা।

খুশিতে আনন্দে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরি। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামার শব্দও কী অতো জোরে হয়! তখন তো রামদেব স্বামীর আবির্ভাবই হয়নি। তাহলে আমায় দেখে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো কেন?

—কী হল রে তোর? পথে ষাঁড়-টাড় তাড়া করেনি তো? এমন করে হাঁফাচ্ছিস কেন?

আমি সিক্স। ইন্দ্রনীলদা সেভেন। আগের থেকে অরেকটু পাত্তা পেতাম তখন। দেখা হলে আর শুধুই হাসি নয়। একটা কথা অন্তত বলত।

—কী রে? অথবা, —কেমন আছিস?

তার বেশি কিছু আমার দরকার হত না। ওতেই গোটা দিনটা আমি পেখম তোলা ময়ূরী।

একদিন স্কুলে কী একটা ভুল করায়, কাছে এসে আমায় গাট্টা মেরেছিল ইন্দ্রনীলদা। একটু ব্যথা লেগেছিল। কিন্তু আনন্দ হয়েছিল তার থেকে ঢের বেশি। তারপর ইচ্ছে করে কতদিন কত ভুল করেছি আমি। ইন্দ্রদাকে দেখিয়েই। যাতে ইন্দ্রদা আবার আমার কাছে এসে গাট্টা মারে। কিন্তু মারেনি আর।

ততদিনে আমি সেভেন। ইন্দ্রনীলদা এইট। সারাটা দিন ইন্দ্রদার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে এমনিতেই মনটা ভীষণ খারাপ ছিল। তার উপর সেটাই আবার ছিল আমার লাল-ঝরণার প্রথম মাস।

আমরা সব কেবল ইন্টারনেটের যুগের মেয়ে। প্রথম রক্তে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো ন্যাকা বোকা ছিলাম না। পেকে একেবারে সব আঁটি। এসব ব্যাপারের টপ টু বটম্ জানা আমাদের। কিন্তু মাকে কে বোঝায় তা? মা তো ভাবে মেয়ে আমার দুধের শিশু। কিচ্ছুটি জানে না। তাই বোঝাতে বসে এসব দিনে কী কী হয়। আর শোনায় হাজার রকম নিষেধ-বারণের কথা। এই করো না, ওই করবে না। তুমি এখন বড়ো হয়ে গেছ। একটুও ভালো লাগছিল না আমার। সারাটা বিকেল-সন্ধে কানের কাছে সেই এককথার ঘ্যানর ঘ্যানর। ফাটা রেকর্ড যেন চলছে তো চলছেই।

বিকেল-সন্ধ্যের সন্ধিক্ষণটাতে পড়ায় কিছুতেই মন বসত না আমার। আলোর পর আঁধার এসে মনটাকে কেমন উদাস বিষণ্ণ করে দিত রোজ। অকারণ।

সেই সময়টাতে মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাবার ঘরে বসে পড়ার নামে প্রতিদিন আমি ফোনে ফল্‌স্ কল দিতাম ইন্দ্রদাকে। ও সময়ে সে ছেলে বাড়ি থাকত থোড়ি। তা আমি জানতাম। তবু একবার সে গম্ভীর স্বরে বলেছিল : 'হ্যালো'? সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আনন্দে আমি ফোনটা রেখে

দিয়েছিলাম। আর যদি কখনো 'হ্যালো!' বলে সে, আমি সাহস করে এবারে ঠিক কথা বলতে পারব।

কিন্তু ইন্দ্রদার ফোনে প্রতিদিনের মতো ফলস্ কল দেওয়ার আনন্দঘন শিহরিত নিস্ফল কাজটুকু করারও অবকাশ সে সন্ধ্যেতে মা আমাকে দেয়নি। সারাক্ষণ আঠার মতো লেগেই রইল আমার পিছনে। কতক্ষণ আর তা ভাল্লাগে কারো?

জানতাম সবই। তবুও সেদিন বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ অমন কাণ্ড দেখে আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাই। আসলে প্র্যাক্টিকালি তো ফার্স্ট টাইম না? কোয়েলকে শুধু একা ডেকে কথাটা বলি। ও সেদিন আমাকে বয়স্ক দিদির মতো সস্নেহে বলেছিল,

—চল, অফিসে গিয়ে সবিতাদিকে বললেই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। এতে টেনশনের কী আছে? আমাদের স্কুলে সবাই প্রায় দূর থেকে আসে বলে স্কুলেই সব ব্যবস্থা আছে।

আমাদের মধ্যে কোয়েলটা বরাবরই ছিল রাম পাকা। সব বোঝে। সব জানে। কিন্তু সর্বক্ষণ চুপচাপ থাকে। ওকে দেখতেও ছিল বোকা বোকা। সরল টাইপের। খুব নিরীহ। ভাবটি যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না খুকু।

তবে আমাদের মতো বাচাল ছিলনা ও। খুব ম্যাচিওর চিন্তাভাবনা ছিল ওর। ওই একমাত্র বুঝত, আমার ইন্দ্রনীলদার কেসটা। তাই মাঝে-মাঝে আমাকে রাগাতে মিথ্যে করে বলত,

—তোর ইন্দ্রনীলদাকে দেখলাম।

—কোথায়! কোথায় রে?

—ওই তো কাল আমাদের পাড়া দিয়ে একটা টুকটুকে লাল রেসিং সাইকেল নিয়ে হিরোর মতো দুরন্ত গতিতে হাওয়া হয়ে গেল।

—তাই! কোন্ দিকে গেল রে?

—তা বলতে পারব না। তবে ইন্দ্রদার সাইকেলের সামনে একটা মেয়েকে দেখলাম।

আমি তো তা শুনে চিৎকার চেঁচামেচি অবিশ্বাস কান্নাকাটি ... সে একটা সিন করে ফেলতাম। কিছুদিন যেতেই ধরতে পেরেছিলাম, কোয়েলটা আমাকে ক্ষ্যাপাতেই ওসব বানিয়ে বলে। ভারি বিচ্ছু মেয়ে। ইন্দ্রনীলদা তেমন ছেলেই নয়।

এসবে কোয়েলের কোনো আগ্রহই ছিল না। ছোটো থেকেই বড়ো বেশি পড়ুয়া মেয়ে ও। পড়া আর ফিচ্‌লেমি করে কথায় কথায় খালি একে-ওকে নিয়ে ছড়া বানাত। এই ছিল তার কাজ।

আমাকে নিয়েও বানিয়েছিল একটা ছড়া। সেই নিয়েই তো ওর সঙ্গে পুরো এক সপ্তাহ আমি কথা বলিনি। তারপর থেকে রোজ দেখতাম, ও বাসে প্রায়ই আমার পাশে জায়গা করে রাখত ইন্দ্রনীলদাকে বসানোর জন্য। সেই দেখে আসতে আসতে আবার ভাব হয়ে গিয়েছিল কোয়েলের সঙ্গে।

রাগ হয়েছিল আমাকে নিয়ে ছড়া বানিয়েছে বলে নয়। বন্ধুদের সকলের সামনে ছড়াটা পড়ে শুনিয়েছিল বলেই। ঠিক রাগ, না লজ্জা? ভাগ্যিস সেদিন আমাদের কাছাকাছি কোথাও ইন্দ্রনীলদা ছিল না।

পরে একদিন টিফিন পিরিয়ডে কোয়েল বাইরে খেলতে গেলে, আমি ওর খাতা থেকে সেই ছড়াটা বার করে লিখে নিয়েছিলাম।

সেটা সযত্নে রাখা থাকত আমার পার্টসে। তাতে কেউ হাত দিত না। আমি প্রতি সন্ধ্যায় ইন্দ্রনীলদাকে ফোনে ফলস্ রিং করে ওকে না পাওয়ার পরই, কোয়েলের লেখা ছড়াটা বার করে পড়তাম। অমনি আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। ম্যাজিকের মতো। অবধারিত। তারপর সন্ধ্যে কেটে গেলে চোখ-টোখ মুছে পড়তে বসতাম আমি।

সেভেনের শেষের দিকে, কত আর হবে বড়ো?
রক্তে ভেজা নবীন ঘাসে, শিহরন জাগল তারও।
ইন্দ্রদা তাহার থেকে, কত আর হবে বড়ো?
মনে মনে দিয়েছে সব; ইন্দ্রদা, কিছু তো করো।
সে খুকীর বয়স যখন, বেশি নয় সদ্য বারো,
পৃথিবীটা খুকুর কাছে, হল অনবদ্য আরও।

*   *   *   *

ইন্দ্রনীলদার প্রাণের বন্ধু ছিল শুভ। শুভ-দা ভারি ভালো ছেলে। ওর কোনো বোন-দিদি ছিল না। ও একা। মা, বাবা দু'জনেই কঠিন অসুখে মারা গিয়েছিল। অনেক ছোট্টোবেলাতেই। মাসির কাছে মানুষ শুভদা। খুব দুঃখী ছেলে।

আমাদের কাছে একবার রাখি পরতে চেয়েছিল শুভদা। আমরা সবাই সেবার ঠিকও করি, শুভদাকে রাখি পড়াবো। কিন্তু তাতে আমার ভীষণ টেনসন হচ্ছিল। শুভদা তো ইন্দ্রনীলদা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকে না। শুভদাকে রাখি পরাতে গেলে যদি ইন্দ্রনীলদা হাত বাড়ায়? দুম্ করে আমাকেই বলে বসে,

—কি রে, শুভকে পড়ালি, আমাকে পড়াবি না?

তাহলেই তো কেস জন্ডিস। আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে যে! ইন্দ্রদা আমার প্রেমিক। আমার স্বপ্নের রাজা। শেষ পর্যন্ত আমি তাই ঠিকই করে ফেলি, ওই রিস্কে যাওয়া নেই। ওরা যা পারে করুক গিয়ে। আমি শুভদাকে রাখি পড়াতে যাব না।

যখন আমরা ক'জন প্রতিদিনের মতো সবার সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ না করে, খেলার মাঠের এক প্রান্তে বসে থাকতাম; তখন আমাদের ক্লাসের বিচ্ছু বাবিন এসে বলত,

—তোরা অমন চুপচাপ বসে আছিস কেন রে? আমাদের সঙ্গে খেলবি না আজ?

বাবিনের মতো আমাদের পিঙ্কিটাও ছিল মহা বিচ্ছু। ঠোঁটকাটা। তখন আমরা বোধহয় সেভেন পেরিয়ে এইট। ইন্দ্রনীলদা নাইন। পিঙ্কি বলত,

—না রে, আজ খেলব না।

—কেন রে, খেলবি না কেন?

—কেন খেলব না, তুমি পাকা তা তো ভালো করেই জানো গুরু। জানিস্ না, বল?

বাবিন মুচকি হেসে বলত,

—জানিইতো।

—তাহলে এবার কেটে পড়ো খুড়ো।

ফিচলেমি হাসি দিয়ে, আমাদের সর্বাঙ্গ মেপে চলে যেত তখন শয়তান বাবিনটা। মহা খচ্চর ছেলে ছিল বাবিন। ইন্দ্রনীলদাকে বলে একদিন আচ্ছা করে—।

ইন্দ্রনীলদা মাঝে-মাঝেই স্কুলে আসত না। ওর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে বলত,

—পড়া ছিল।

—তার মানে? স্কুলে কী পড়ার পরিবর্তে খেলা হয় নাকি?

—বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে সকালে প্রাইভেট পড়তে যাই। বাড়ি ফিরতে যেদিন খুব দেরি হয়ে যায়, সেদিনটা আর স্কুলে আসতে ইচ্ছে করে না।

সেই কথাটা শুনে এত রাগ হত যে কী বলি! ইন্দ্রনীলদা ছাড়া স্কুলে আসার আর মজা কী? তখনই ঠিক করি কিছু একটা করতেই হবে। এরকম করে মোটেই চলবে না।

আমি এর-ওর কাছ থেকে জেনে নিই, ইন্দ্রনীলদা কোথায় পড়ে, অজিত স্যারের কোচিং-এ। মাকে বলি,

—দিদিমণির পড়া আজকাল আমি আর ভালো বুঝতে পারছিনা মা।

—সে কী! এ্যাতোদিন বলতিস্, খুব ভালো পড়ান দিদিমণি। আজ হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল?

—আমি অজিত স্যারের কোচিং-এ ভর্তি হব মা।

—কিন্তু পিয়ালী দিদিমণির বাড়ি কত কাছে ছিল। অজিত স্যারের বাড়ি তো অনেকটাই দূরে।

—তা হোক্ মা; আমার ওখানেই ভালো পড়া হবে। সব বন্ধুরা ওখানেই—

আমাদের এক ক্লাস উঁচুতে পড়া দাদা-দিদিদের লেখা খাতা অজিত স্যার আমাদের হাতেই তুলে দিতেন। তা থেকেই টুকে নিতে বলতেন এটা-ওটা। আমি প্রায় সবসময় অজিত স্যারকে বলতাম,

—আমাকে ইন্দ্রনীলদার খাতাটাই দেবেন প্লিজ। তাহলে আমি স্কুলে ফেরত দিতে পারব।

অমনি উনি চেঁচিয়ে বলতেন,

—ইন্দ্রের খাতাটা নিস্‌নে খবরদার। ও ভীষণ বানান ভুল লেখে।

শুনে আমার রাগে গা পিত্তি জ্বলে যেত। হাটের মাঝে চিৎকার করে কথাটা বলার কী দরকার ছিল তাঁর? সব তাতেই স্যারের বেশি বেশি। তবু আমি ইন্দ্রদার খাতাটাই বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

স্কুলে ক্রিকেট খেলা। আমি প্রাণপণে ঠাকুরকে ডাকছি। আমার ইন্দ্রনীলদা যেন সেঞ্চুরি করে। ফাটিয়ে দেয়। সবাই হাততালি দেবে কাঁপিয়ে। মুহূর্তে হিরো হয়ে যাবে ইন্দ্রদা। গর্বে আমার বুক ভরে উঠবে। তখন তো ভরে ওঠার মতোই সম্পূর্ণা আমি।

বাথরুমে যে কতসময় নিতাম রোজ। আসলে বাথরুমের নির্জনতায় খালি মনে হত ইন্দ্রনীলদার কথাই। ভারি অভিমান হত তার ওপর। এতদিন ধরে এত এত ভালোবাসি তোমায়। তুমি কী কিছুই বোঝ না, নাকি বুঝতেই চাও না। কেন ইন্দ্রনীলদা? স্পষ্ট করে কিছু না বলো, ইশারাও তো করতে পারো। কতদিন যে অপেক্ষায় আছি তোমার!

তবে বাসে রোজ রোজ ইন্দ্রনীলদার পাশেই বসার সুযোগ পেতাম আমি। পেতাম না বলে জবরদস্তি করে নিতাম বলাই ভালো। আমি ছাড়া সেখানে অন্য কারো বসার জো ছিল না। আমার তখন ভারি ইচ্ছে হ'ত, বাসটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে পড়ে থাক্; আর জ্যাম্ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মধ্যে যেন একটু জোরসে ব্রেক কষে ড্রাইভার। পড়া বোঝার বাহানায় প্রায়ই কোনো একটা খাতা বা বই নিয়ে বসতাম বাসে ইন্দ্রনীলদার পাশে। ওকে তখন চলন্ত বাসে খাতা বা বইয়ের লেখা পড়তে সরে আসতেই হত আমার দিকে। কখনো আমি, কখনো দুজনেই হেলে পড়তাম দুজনের গায়ে। ঠোকাঠুকি লাগত। কি যে শিহরন তার মধ্যে, ভাষায় বোঝানো যায় না।

স্কুলে নাটক হবে। তাসের দেশ। আগের বছর ছেলেদের গ্রুপড্যান্সে ইন্দ্রনীলদা দারুণ একটা পৌরুষের পোজ দিয়েছিল। আমার পাশে বসেছিল কোয়েল। আমার চোখের সামনে বারকয়েক হাত নাড়িয়েছিল ও। তবু আমার আর চোখের পাতা পড়ে না।

শয়তান বাবিন বলেছিল—গেল।

কোয়েল আমায় ধাক্কা দিয়ে বলেছিল—ওরে অমন ফিকসড্ হয়ে গেলে রাতে ঘুমোবি কী করে?

আমি তো নিশ্চিত, ইন্দ্রদা এবারে 'তাসের দেশ'-এর হিরোই হবে। লম্বা, হ্যান্ডু। কী সুন্দর টানাটানা চোখ। নায়ক হওয়ার যোগ্যই বটে। কোমল গোঁফের রেখা আর হাল্কা ফাঁকা ফাঁকা দাড়িতে

যুবরাজ হিসেবে ইন্দ্রদাকে সত্যিই ব্যাপক মানাবে। আমি মনে মনে বলি; ঠাকুর 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্র করে দাও আমার ইন্দ্রদাকে।

ছুটতে ছুটতে রিহার্সালে এসে দেখলাম ঠাকুর শোনেনি আমার কথা। তা নিয়ে সেবারে আমি একটুও অভিমান করিনি ঠাকুরের ওপর। বয়স তো বাড়ছিল। তাই একটু একটু বুঝদার হয়ে উঠেছিলাম। ইন্দ্রদাকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে দিনরাত এ্যাতো চাই-চাই করলে তিনিও আর কাঁহাতক পারেন? তাঁর কাছে তো চাওয়ার ক্যানডিডেট কম নয়। রোজ রোজ কত মানুষের কত ডিম্যান্ড স্লিপ যে ওঁকে পড়তে হয়। একা আমাকে নিয়েই যদি সারাক্ষণ—।

তবু ঠাকুরেরও তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত। রাজপুত্র যদি না-ই করা হয়, অত সুন্দর ইন্দ্রদাকে অ্যাটলিস্ট কোটালপুত্র তো করা যেত। তা নয়, পোস্টার মারা চিড়িতন হরতন তাস? মঞ্চে সারাক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা! সবশুদ্ধ সংলাপ একটাই।— রাজার জয় হোক!

সেই একটামাত্র ডায়ালগের জন্য পরপর চারদিন রিহার্সালে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে, শেষমেষ রাগ করে নাটকের কাছ থেকেই পালিয়ে যায় ইন্দ্রনীলদা। পরে বন্ধুদের বলেছিল, অভিনয়-টভিনয় নাকি ন্যাকামি। ফালতু। বেকার দাঁড়িয়ে থেকে ঠ্যাঙে ব্যথা করা। ওসবে সে নেই। গেল আমার সব স্বপ্ন ভেঙে।—তুই তাহলে আছিস কী জন্য? ক্রিকেট নয়, নাটক নয়। খালি এ্যাকাডেমিক মেধা?

ইন্দ্রনীলদাকে নিয়ে আমার স্বপ্ন-কল্পনার আর শেষ নেই। ক্লাস টেনের টেস্টের রেজাল্ট। আমার তো আগের সারারাত ঘুম নেই। রেজাল্ট আমার নয়। আমার ইন্দ্রনীলদার। ও নিশ্চয় ফার্স্ট হবে।

ওমা, একি! দুটো সাবজেক্টে লাল দাগ! কী লজ্জা! সারারাত কাঁদি। ভাগ্যিস আমার নিজের একটা আলাদা ঘর ছিল। অনেকক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে একসময় দুঃখ কমে গিয়ে আনন্দে ভরে ওঠে আমার মন। এখনও তো তিনমাস বাকি। খুব যদি খাটে তো মাধ্যমিকে নিশ্চয়ই ব্যাপক রেজাল্ট করতে পারবে। আমি ওকে রিকোয়েস্ট করব, মন দিয়ে পড়তে। আমার কথা কি আর ফেলতে পারবে?

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সেদিন হঠাৎ জানলাম উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাট বিক্রি করে বাবা চলে আসতে চান। দিদার কাছাকাছি। শ্রীরামপুরে। অন্য কোনো ভাবনা দিয়ে আমি এবার আর আমার কান্নাকে কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না।

মনে হচ্ছিল একটা ফোন করে সব কথা বলে দিই ইন্দ্রনীলদাকে। বলেই দিই—যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না গো। সেই কোন্ ছোটোবেলা থেকে তোমায় ভালোবাসি। তুমিই আমার সব। ....কিন্তু রিসিভারটা হাতে তুলেও নাম্বারটা ডায়াল করি না। মনে হয় এখনই না। এভাবে না। স্কুলে তো দেখা হবেই। যাক আরও কটা দিন।

ইন্দ্রনীলদা মাধ্যমিকে টেনেটুনে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে ক্লাস ইলেভেনে তখন। আর আমি মাধ্যমিকে পেলাম স্টার। তিনটে তে লেটার। ইন্দ্রনীলদা হাতটা বাড়িয়ে দেয় শুভেচ্ছা জানাতে। তারপর দু'হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলে—'খুব আনন্দ হচ্ছে রে! তুই তো ফাটিয়ে দিয়েছিস।'

ভেতরে ভেতরে টের পাই, ইন্দ্রদার প্রতি মোহ যেন কাটছে আমার। সেই টান—আকুলতা—শিহরন—অস্থিরতা কই, আর অনুভব করছি না তো আমি! একদিন যে আমি একটু বাসের দুলুনিতে ইন্দ্রনীলদার সঙ্গে সামান্য ছোঁয়া লাগলেই অজানা উত্তেজনায় কেঁপে উঠতাম। আজ, সেই আমার পুরো হাতটাকেই ইন্দ্রনীলদা ওর দু'হাতে চেপে ধরেছে। কিন্তু তবুও তো ....।

উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট হয় আমার। ক্রমশই যেন কেরিয়ারিস্ট হয়ে উঠি অবচেতনে। স্কুল শেষ করে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হতে আসি। প্রথম লিস্টের প্রথম দিকেই আমার নাম।

উচ্চমাধ্যমিকে ব্যাক পেয়েছিল ইন্দ্রদা। তাই এখন ও আমারই ইয়ারে। একে তো একবার ফেল। তারপর আবার এবছর পাশ করলেও রেজাল্টটা ওর খুবই খারাপ। তাই হাজার চেষ্টা করেও শ্রীরামপুর কলেজ তো দূরের কথা, হীরালাল পালেও চান্স হবে কিনা কে জানে? শ্রীরামপুর কলেজের বিরাট ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে ফার্স্টলিস্টে থাকা নিজের নামটা দেখতে দেখতে ইন্দ্রনীলদা সম্পর্কে এই কথাগুলো মনে পড়তেই কেমন যেন করে উঠল শরীরটা। না, না। কোনো শিহরন নয়। যেন একটা দম বন্ধ করা বিরক্তি কাঁপিয়ে দিল আমায়। এমন একটা ফালতু ছেলেকে নিয়ে আমি যে এতদিন কি করে—! ছিঃ!

বুঝতে পারি, মোহ তখন তলানি থেকেও সরে গেছে। অথচ এই কিছুদিন আগেও সে ছিল আমার চব্বিশ ঘণ্টার আরাধ্য দেবতা। একমাত্র কাঙ্ক্ষিত পুরুষ। কী আশ্চর্য! এখন মনে হয়, ও আদৌ আমার যোগ্যই নয়। বরং খুব বোকা-বোকা লাগে এখন আগের এতগুলো দিনের সব কথা মনে পড়লে।

তবে আজ একটা ব্যাপারে অন্তত কিছুটা শান্তি লাগছে। ভাগ্যিস সেদিন উত্তরপাড়া থেকে চলে আসার আগে ফোনে সব বোকার মতো জানিয়ে দিইনি ইন্দ্রনীলদাকে। নইলে কী আজকের এই পিছুটানহীন স্বাধীনতার আনন্দটা অনুভব করতে পারতাম? কেরিয়ারের অপ্রতিরোধ্য হাতছানিতে আমার এতদিনের স্বপ্নের পুরুষ কেমন চোখের সামনে লং শর্ট-এ চলে যেতেই থাকে। ক্লোজ আপ-এ এসে যায় অন্য স্বপ্ন। কেরিয়ারের স্বপ্ন। শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের স্বপ্ন।

দেশবাড়ি

শর্মিলা দত্ত

রাতটুকু বড়ো নির্ঘুমে কেটেছে নিবারণের। কিছুতেই সোয়াস্তি পায়নি। বেটে বউটার শরীর নিয়েও আরাম মিলেনি। খালি এপাশ ওপাশ করেছে। ভাবছে নিবারুণ, সকাল কী হয়ে যাচ্ছে?

—ও বউ উঠলি নিকি?

—কী তখন থাইকা খালি উসখুস করতাছো?

—চক্ষে ঘুম লয় না রে বউ।

—চিৎ মাইরা পইরা থাকো।

—তুই বড়ো নির্দয় রে বউ।

কথা বলে সময় কাটাতে চায় নিবারণ। কিন্তু সময় ত আর চলে না।

এই শহরে নিবারণ হালুইর লালমোহন মিষ্টি বিখ্যাত। যে-কোনো অনুষ্ঠানে এই লালমোহনের কদরই আলাদা। এর কোনো হেরফের হয়নি এই পঁয়ত্রিশ বছর থেকে। হাল ফ্যাশনের মিষ্টিও এর জায়গা টলাতে পারেনি।

দুপুর বারোটা নাগাদ তৃপ্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ভিড় জমতে থাকে গরম গরম সদ্য লালমোহনের জন্য।

নিবারণ হালুই ওর জন্য খুবই গর্বিত।

তৃপ্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক রসময় ঘোষ মনে প্রাণে আগলে রাখে নিবারণকে। দেশের লোক বলে কথা। ছিন্নমূল মানুষের এই এক তৃপ্তি। দেশের লোক, দেশের গান, দেশের পান মায় দেশের লোকের হাগা মুতেও দেশিয় টান।

নিবারণ টের পায় আসলে যারা ভাগাভাগিতে রক্তাক্ত হয়েছে—তাদের যন্ত্রণা কোথায়। প্রথম পা রাখার জমি সবার কাছে তার অস্তিত্বের আজান। সেই পায়ের চিহ্নে লেগে থাকে তার স্বভূমির সুঘ্রাণ। চেতনায় বা অবচেতনায় সেই ঘ্রাণে, সে মানুষ লালিত হয়। সেই ঘ্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে, বড়ো হয়, বুড়ো হয় এবং মৃত্যুর সঙ্গে সেই ঘ্রাণ নাভিতে জমা হয়। জন্ম জন্মান্তরেও নাভিকুণ্ডের সেই টান যাবে কোথায়?

—ও বউ ঘুম যাইতাছস?

কোনো রা নেই চম্পার।

ভোর হতে খুব একটা দেরি নেই। নিবারণ কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ মেশ সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

নিবারণ তার একঘরের সামনের অনু উঠানটা পেরোয়। কলোনি ছাড়িয়ে হাঁটতে থাকে অন্নপূর্ণা মন্দিরের পাশ দিয়ে। রেলের গোদাম ঘরটা ঘুমিয়ে আছে। সার্বজনীন ভুলু কুকুরটা

নিবারণকে আড় চোখে একবার দেখে নেয়। পি, ডাব্লু, ডি, ডাক বাংলার পাশে ঘাটের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় নিবারণ। সামনেই ঝাঁপ ফেলা কবিরের চায়ের দোকান। চায়ের দোকানের এক ফালি বারান্দায় বাঁশের খুঁটির সঙ্গে অঙ্গ লাগিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে চাম কাঠের তক্তাটা।

নিবারণ জানে যজ্ঞেশ্বরবাবুদের স মিলের অবহেলার টুকরো এটি।

কবিখুড়াকে বড়ো রাস্তায় হাঁটতে দেখে নিবারণ। বড়ো সুন্দর কবিতা পড়েন এই চক্রবর্তী খুড়া। প্রায়ই দোকানে মিষ্টি নিতে আসেন। নিবারণকে খুব স্নেহ করেন। সেই দীর্ঘবাঁকের কবিকর্তার শ্রাদ্ধ বাসরে মিষ্টির চালান দিতে নিবারণ নিজেই গেছিল খালের পারের বাড়িতে। সেই কবিকর্তা ছিলেন হবিগঞ্জের মানুষ। সেখানেই এই চক্রবর্তী খুড়োর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ। কবিকর্তার শ্রাদ্ধবাসর পুরোটাই কবিতায় কবিতায় সাজানো হয়েছিল। খুব বেশি লেখাপড়া করেনি নিবারণ, কিন্তু হবিগঞ্জের কবির লড়াই, কথকঠাকুরের আসরের প্রতি ওর সহজাত আকর্ষণ ছিল। জ্যাঠার নেওটা ছিল। অনেকবার মদনঠাকুরের আখড়ায় গেছে সেইসব আসরে। তাই সে শব্দ বুঝে, আখর বুঝে। সেই আখর বাউলে যে রস রয়েছে তাকে প্রাণে প্রাণে ধারণ করে।

কবিখুঁড়া বল খেলার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পায় নিবারণ। বড়ো মানুষেরা ভোরবেলায় রাস্তায় হাঁটে। তাতে নাকি শরীরের কল চালু থাকে।

কে জানে? হবে হয়ত।

কবীরের চায়ের দোকান পেরিয়ে বাঁধের উপর বসে পড়ে নিবারণ। বরাকের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনি শেষ রাত ও অন্য আরেক দিনের সন্ধিক্ষণ কখনো দেখেনি নিবারণ। মনটা কেন জানি ওর আকুপাকু করে ওঠে। শেষ রাতের হাওয়া ভাসে চারিদিকে। বাবা বলত—পথিক হাওয়া। বেবাক ঘুইর‍্যা বেড়ায়। গরমের সুময় মলয় লাগায়। কেমনে আয়, কেমনে যায়, ঠাহর করন যায় না।

নিবারণ ধীরে ধীরে বাঁধ থেকে নামতে থাকে বরাকের জলের দিকে। নৌকা পারাপার শুরু হয়নি তখনোও। নদীর ওপারের দুধপাতিল গ্রামটাও ঘুমে। এখনো সেই জ্যান্ত কালীঠাকুরাণী আছেন কি না দুধপাতিলে কে জানে। ঈশ্বররা কী জ্যান্ত থাকেন? নিবারণ কবিদের মুখে শুনেছে। এর আলো আধারি নিবারণের জানা নেই।

ফজরের আজানে আলোর আহ্বান ধরা দেয়। হঠাৎ বমি আসে নিবারণের। একি রাতের অঘুমা, মানসিক অসোয়াস্তি না নদীর পারের হাগা মূতের গন্ধ বিকৃতি।

প্রকৃতি অঢেল দিয়েছে কিন্তু তার তত্ত্বাবধানে মানুষ-ই শেষ কথা।

নিবারণ খেয়াঘাটে নেমে বরাকের জল স্পর্শ করে। বুকটা হু হু করে ওঠে তার।

এই বরাক ও সুরমানদী জল ছোঁয়াছুয়ি খেলে।

নিবারণের সুরমানদী। তার মনে হল—চারপাশ এখন কেবল শেকড়ের গন্ধ ভেসে আসছে।

বরাক, সুরমাকে ছাপিয়ে কোরাঙ্গী নদীর স্পর্শ পাচ্ছে নিবারণ।

চোখে ভাসছে—বাহুবল বাজার, সাতকাপন গ্রাম—বহু নাম, বহু ভালোবাসা মন।

নিবারণরা ছিন্নমূল প্রাণ সব। শেকড়টা গেঁথে আছে সুরমার ধারে।

নিবারণ অনুভব করে সুরমানদীর চোখে জল।

কোরাঙ্গী নদীর বুকে থৈ থৈ হাহাকার।

মনে পড়ে যায় নিবারণের ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতিকথা। মনে পড়ে হবিগঞ্জের বাহুবল বাজারে তাদের মিষ্টির দোকান।

সন্ধেবেলার আড্ডা ও সঙ্গে জগদীশ খুড়ার বৈঠকী গল্প। গ্রামের সন্ধেবেলায় বৈঠকী মজলিসের এক আলাদা চিত্র থাকে।

মধুমিঞাকে নিবারণ মিঞাখুড়া বলে ডাকত। এই মিঞা খুড়া বাহুবল, সাতকাপনের সবচেয়ে বয়স্ক, বিজ্ঞ ও রসিক মানুষ ছিলেন।

সাতকাপনের জমিদার আদিনাথ দত্তের বাড়িতে পুজোর সময় অতিথি আপ্যায়নের সম্পূর্ণ ভার ছিল এই মিঞা খুড়ার উপর।

স্মৃতির আকাশে কেবল মেঘ জমে নিবারণের। ঘুম না হওয়া চোখের পাতায় সেই মেঘ ভেঙে জল আসতে চায়।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় নিবারণ। পায়ে পায়ে চলে আসে কবিরের দোকানের কাছে। ঝাঁপ খোলা হয়ে গেছে।

চায়ের জন্য তেষ্টা পায় নিবারণের। পিচুটি লাগা চোখে আকন্দও এসে গেছে। কবিরের দক্ষিণ হস্ত। নামটা বেশ সুন্দর ওর। কিন্তু ওকে সবাই আকাই বলে ডাকে।

জীবনের স্তরে স্তরে মানুষের নাম কেমন যেন বদলে যায়। নতুন নতুন নাম হয় চিত্রবিচিত্র সব ঘটনায়। এইসব নামের আড়ালে সুখ, দুখ, প্রেম, লজ্জা জড়িয়ে রয়।

নিবারণের আবার বাহুবল বাজার চোখে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে যায় তার এক নামাবলি ঘটনা।

'চুঙ্গাঠাকুর'—সবাই তাকে এই নামেই চিনত। মেঘালয়ের খাড়কুঙ্গার জ্যাঠার দৌলতে সে নিবারণ থেকে চুঙ্গাঠাকুর হয়ে যায়। জ্যাঠার সঙ্গে অনেকদিন অনেক জায়গায়ই গেছে নিবারণ। তারমধ্যে মেঘালয়ে বেশ কয়েকবার গেছে। সিলেট, জাফলং ডাউকি হয়ে পাহাড়ি শহরে খাড়কঙ্গার জ্যাঠার ওখানে অনেকবার থেকেছে। পাহাড়ের গাছে ছোটো ছোটো কাঠের ঘর। রাতে সেই ঘরগুলোতে আলো জ্বললে মনে হত অন্ধকার জোনাক জ্বলছে। শীতশীত, ঠাণ্ডাঠাণ্ডা ভাব সারা অঞ্চলটার শরীরে। নিবারণের জ্যাঠার সঙ্গে কী ব্যাবসা ছিল এই খাড়কুঙ্গার জ্যাঠার সেটা আর মনে নেই। কিন্তু ওদের ভালোবাসা আর ভুলতে পারে না নিবারণ। ভিন্ন ভাষা ভিন্ন জাতি হলেও মনের কথা বা ভালোবাসার কোনো গিঁটের প্রয়োজন হয়নি। বেটে খাটো খাটিয়া ড্রিমস্যাম খাড়কুঙ্গার নিবারণকে খুব ভালোবাসত। পাহাড়িদেশ মেঘালয়ের এই খাড়কুঙ্গার জ্যাঠা বাঁশের চোঙ্গায় দুধ খেতে দিত। ওরা বাঁশের চোঙ্গায় তখন চা এসব খেতো। এটা তখন নিবারণের জন্যে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা ছিল।

সাতকাপনে ফিরে এসেই তার গল্প ছিল—সেই চোঙ্গায় দুধ খাওয়ার গল্প। এত ভালো, ঘন দুধ ছিল যে চোঙ্গা উলটালেও দুধ পড়ত না। নিবারণের এই এক গল্পের পুনরাবৃত্তিতেও গল্পের গোরু গাছে চড়ে ব্যাপার হয়ে যাওয়ায় জগদীশ খুড়া ও মিঞা খুড়া তাকে চুঙ্গাঠাকুর নাম দেয়। তারপর থেকে সারা বাহুবল বাজারে, সাতকাপনে তার নাম হয়ে গেল চুঙ্গাঠাকুর। সবার কাছেই এ এক হাস্যরসের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। কিছুতেই নিবারণ আর সেই চুঙ্গাঠাকুর থেকে মুক্তি পায়নি। হারিয়ে গেছিল বাপমায়ের দেওয়া নাম নিবারণ।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর। দেশভাগের ঢেউয়ের তোড়ে এপারে এসে নিবারণ হারিয়ে ফেলেছিল সেই স্মৃতিবিজড়িত চুঙ্গাঠাকুর নামটা। খ্যাপানো নামও যে চোখে জল আনে— সেটা নিবারণের জানা ছিল না। লালমোহন বানানোর কৃতিত্বে—খাড়কুঙ্গার জ্যাঠা, পাহাড়িদেশ, এসব স্মৃতিগন্ধের তলানিতে এসে পৌঁছেছিল। দেশভাগকে তুলেছিল নিবারণ। নিজের বাড়ির লাউমাচা, পুঁইডগা, বাড়ির উঠানে কেঁচোর বহুতল ঘর—সব ভুলে গেছিল নিবারণ। চম্পা, রসময় ঘোষ, লালমোহন, অন্নপূর্ণাঘাটের ঝুপড়িতে মাথা গোঁজার ঠাঁই—এই ছিল তার বরাকপারের জীবনের চলমান চালচিত্র।

গতকাল মিষ্টির দোকানে ঝিমধরা দুপুরে হঠাৎ দেশের কোরাঙ্গীপারের বৃদ্ধ জগদীশখুড়াকে

দেখে তার সারাটা রাত তছনছ হয়ে গেল। আবার স্মৃতিক্ষরণ শুরু হয়ে গেল। দুজনে মিলে অনেকটা সময় চোখের জলে সুরমার কথকতাতে ডুবেছিল। ছাড়তে চায়নি খুড়াকে। কিন্তু জগদীশখুড়া থাকতে পারেনি।

—এতদিন থাইকা—হেই যাইবার কালে তোমার দেখা পাইলাম।

আবার আসবে অনেক স্মৃতিগন্ধ নিয়ে এই বলে গেছে খুড়া।

যাবার সময় নিবারণখুড়াকে দোকানের বাইরে নিয়ে কানে কানে বলেছে—খুড়া, হেইপারের নামটা আমার এইহানে আর আয় নাই। হিটা এট্টু খেয়াল রাইখ্যান।

জগদীশখুড়া সেই বাহুবলের পুরোনো মিটিমিটি হাসিটা হেসে গেছে। কিন্তু চোখ ভর্তি ছিল সুরমার জলে।

চায়ের তৃষ্ণায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর তক্তার ডাকে সেই চক্রবর্তী খুড়াকে আসতে দেখল নিবারণ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী নিবারণকে দেখে একটু অবাকই হন।

—কি, হে নিবারণ, তোমায় ত এদিকে কখনোও দেখি না। আজ এদিকে, কী মনে করে? এ সময়ে?

—না খুড়া রাইতে ঘুম লয় নাই। বাড়ি ত হেই কাছেই, কলোনিতে। অনেককাল পর আমার সাতকাপনের জগদীশ খুড়ার লগে দেখা। মাথার খালি অনেক জন্মের কথা কিলবিল করত্যাছে। দুই চক্ষু এক করতে পারি নাই। তাই নীচে ঘাটে গিয়া বরাকজলে সুরমার কথা জিজ্ঞেস কইরা আইছি।

—নিবারণ, দেশ শব্দটাই এমন। এই শব্দের শরীরে কেবলই স্মৃতিগন্ধ।

কবিখুড়ার গলায় পূর্বজন্ম যেন কথা বলে ওঠে। মনটা অস্থির অস্থির নিবারণের।

কবিরের ঝুপড়িবেড়ার চায়ের দোকান, মাটির উনানে আগুনের ধোঁয়া, কেটলিতে জল চাপানো, ঝুপড়ির বারান্দায় দু'তিনটে ঘুমভাঙ্গা লোক, নিবারণের পথিক হাওয়া—সব নিয়ে যেন আরেক সাতকাপন সামনে এসে দাঁড়ায়।

কালরাত থেকেই এমন হয়েছে নিবারণের।

নিবারণ যেদিকে যায়—তার দেশবাড়িও সেদিক পানে ধায়।

হঠাৎ সুবল দাসকে মনে পড়ে। সেই রক্তাক্ত দিনগুলোতে পারাপারের ক্যাম্পে সুবলকে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করেছিল ঘাতকরা—তার দেশ কোথায়।

সুবল নির্লিপ্ত সুরে বলেছিল—

—আমাগো আবার দ্যাশ কি কর্তা? আমরা হইলাম মাছের পোলাপান। মাছ যেদিকে সাঁতরায়ে যায়, সেদিক পানে আমরাও যাই। দ্যাশের সমস্যা, থাকনের সমস্যা এগুলা আপনাগোর, আমাগোর না।

তারপরের কথা নিবারণ মনে আনে না।....

কবিখুড়োর কথায় আড় ভাঙে নিবারণের স্বপ্নঘুমের।

চায়ের জন্য গলা শুকায়ে আসে।

কবির আকাই এর জন্য গজগজ করছে। দোকানে লোক এসে গেছে—কিন্তু আকাই যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চায়ের গ্লাস ধোয়।

—নিবারণ, চা হতে হতে আজ এই ভোরে তোমাকে একটা কবিতা শোনাই। আসলে আমাদের দুঃখটা একই।

নিবারণের কবিখুড়ো, সঞ্জয় চক্রবর্তী স্মৃতি থেকে বলতে থাকেন—

'সকলেরই একটা ভূখণ্ড দরকার
দাঁড়াবার।
কথা বলার।
ঈশ্বর অভিমুখী হওয়ার।
যেমন, ঠাকুর্দার ছিল
সিলেটে লক্ষীপাশা গ্রামে।
যেখানে তিনি প্রতিটি ভোরে
সূর্যের সঙ্গে বার্তালাপ সেরে
রাত্রির অনন্ত কোলে গভীর নিদ্রায় যেতেন,
একদিন সেই ভূখণ্ডে দাঁড়ালো অন্যলোক।
নিবিড় উঠোন শুনতে পেল অচেনা পদধ্বনি।
ভালোবাসার শিউলি জেনে গেল
এখান থেকে গন্ধ বিতরণ হবে অন্যপ্রাণে।'

নিবারণ শুনে যায় আর বুকটা তার উথালি পাথালি করে। কবিখুড়া বলে যান..
গলা বুঁজে আসে নিবারণের। গলার কাছে কী যেন দলা আটকে আছে।

—অনেকটাই টের পাইলাম কবিখুড়া আবার অনেকটা বুঝলাম না। কিন্তু বুকের ঢেলা ত আর সরে না।

বড়ো কষ্ট কবিখুড়া। আপনার গলায় ও কষ্ট ঠাহর করি।

আবার চায়ের জন্য ছলকে উঠে নিবারণের গলা।

ছায়া সংসর্গে

তিলোত্তমা মজুমদার

কাল ও কলকাতার বাইরে গিয়েছে। ও না থাকলে এই জনবহুল শহরকে শূন্য লাগে আমার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমি নির্লিপ্ত হয়ে উঠি তখন। যে-কদিন ও থাকে না, সেই কদিন কোনোক্রমে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য থাকে না।

একটা কিছু গড়ে উঠছে। কিন্তু তাকে ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। একটা ধোঁয়ার মতো কেবলই পাকিয়ে উঠছে আর ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। দেখা যাচ্ছে তাকে, ছোঁওয়া যাচ্ছে না, এমনই অবয়বহীন।

আজ সন্ধ্যায় যখন এসএমএসএল, খুলে দেখতে ইচ্ছেও করেনি। কারণ আমি ভাবিইনি এটা ওর হতে পারে। এমনও হয়েছে, আমি ওকে চারটে এসএমএস করেছি, ও একটিরও জবাব দেয়নি। আমি লিখেছি—তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। ও লিখেছে—আমি বড়োই নির্জলা, শুকনো।

কষ্ট পেয়েছি। তবু আমার মধ্যেকার আবেগ অস্বীকার করতে পারিনি। ওর জন্য যতদিন আমার এ আবেগ উৎসারিত হতে থাকবে, আমি তাকে সম্মান করব। এ হল জীবনের চিরন্তন মাধুকরী।

আমি যখন ওকে ব্যাকুলভাবে ডাকি, ও আসে। ঈশ্বরের মতো। তীব্রভাবে আমার দিকে তাকায়। এরকম দিন আসবে, যখন আমি ডাকব, ও আসবে না তবু। ঈশ্বরেরই মতো। এই গতিপ্রকৃতি জীবনের, আমি তাকে স্বীকার করেছি। স্বীকার সকলি করেছি। ন্যায়-অন্যায় কিংবা স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের বিভেদরেখা ছাড়িয়ে যাবার এই প্রবণতা আমার, প্রচলিত নৈতিক বোধের প্রতি অনানুগত্য—এ আমার একার, নিজস্ব বহন। ওকে নিয়ে যে গভীর অনুভবের জগৎ সে-ও আমারই, কারণ নিশ্চয়তার ধ্বনি শুনি না তো একবারও। যাকে চিরন্তনে পেতে চাই, সে অধরা রয়ে গেলে কী আর করতে পারি আমি!

এসএমএসে ও লিখেছিল—আজ আকাশে একটা তীব্র চাঁদ। কী যে দেখো তুমি চাঁদে, তাই ভাবি।

আমি লিখলাম—চাঁদে চাঁদই দেখি। আর কী? তুমি শহরে নেই, ভালো লাগছে না।

এবার ও ফোন করল। বলল আমি শহরে থাকি আর নাই থাকি, কী এসে যায়?

আমি বললাম—ট্রাম-বাস কিছুই বন্ধ হয় না। হকাররা খবরের কাগজও দিয়ে যায় ঠিকঠাক। চিল দুটোও নিয়মিত এসে বসে নারকেল গাছের পাতায়। বিশ্রাম নেয়। আমারই কেবল মনে হয়, ধু-ধু সীমাহীন বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

—তোমার সংস্কার।

—হয়তো।

॥ দুই ॥

দুটি বই আজ উপহার এনেছে ও আমার জন্য। দেরিও করেছে খুব। তার জন্য রাগ হয়নি আমার। ওর ওপর রাগ করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। দুজনে এক সঙ্গে খেলাম আজ। আমার এই সামান্য সংসারে খাবার টেবিলও নেই। তাই মেঝেয় বসে খেলাম। আমার একটু খারাপ লাগছিল। আমি তো যত্র-তত্র বসে খাই। কিন্তু ওকে আমার সযত্নে গুছিয়ে আহার করানো উচিত।

খেয়ে দেয়ে ও বেশ পা ছড়িয়ে বসল আমার বিছানায়। খাবার টেবিল যেমন নেই, সেরকম আমার খাটও নেই। মেঝের ওপরেই তোশক পেতে আমি শয্যা রচনা করেছি। আমার এ-জীবনে মহৎ আয়োজন কিছু নেই। তাকে সামান্য ধারণ করাই ভালো। কিন্তু ওর কথা ভাবলে মনে হয়, ওর জন্যই আরাম রচনা করা উচিত ছিল আমার। এই একটা মাত্র ঘর, তাতে আলো-হাওয়া প্রতুল। কিন্তু জায়গা কম। একটি প্রাচীন আলমারি কবেকার। জিন্‌স, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর এবং কম্বলে ঠাসা। এটুকু বাদে দেওয়াল জুড়ে বই কেবল। একদিনই গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে। মূল চিত্রে তফাত একটাই। ওর ঘরের সংখ্যা দুই এবং ওর একটি দীঘল খাট ও আয়না আছে। ওর ঘরে, ছড়ানো, অগোছাল ঘরে, ও আমাকে যত্ন দিতে চেয়েছিলে। বলেছিল—খাটে পা তুলে বসো।

আমার পায়ে অনেক ধুলো জমে ছিল।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ও বসেছে। ওর সাদা মসৃণ গালে আলো ঠিকরাচ্ছে। এই প্রথম ওকে স্পর্শ করতে খুব ইচ্ছে করল। আমি জানি, এভাবেই ইচ্ছেরা একের পর এক আসতে থাকে গাঁথা মালায় ফুলের মতো। তবে আপাতত আমার কেবল স্পর্শের ইচ্ছা। আর কিছু নয়। ওকে বললাম, 'চশমা খোলো।' ও খুলল। বলল—কী করতে চাইছ?

আমি ওর দুচোখ আঙুলে স্পর্শ করলাম। ওর গাল স্পর্শ করলাম। নাক রাখলাম ওর কপালে। ও বলল—মাথাটা তোমার গেছে একেবারে।

সরে এলাম আমি। চোখ বন্ধ করে বজ্রাসনে বসলাম কিছুক্ষণ। তাকাতে পারছিলাম না ওর দিকে। কী এক প্রত্যাশা জাগছিল। ও আসবে। ঠোঁটে স্পর্শ করবে আমায়। আমার জিভ শুকিয়ে আসছিল। কিন্তু প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। ও শান্ত। বলল—কী হয়েছে তোমার?

—আমি জানি না।

ওর হাত ধরলাম। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে অবিশ্রাম গাড়ির হর্ন। নারকেল গাছে রোদ্দুর পড়েছে। শেষ বর্ষার আর্দ্রতা হাওয়ায়। আমার বুকের তলায় আবেগ তিরতির কাঁপছে। ওর নরম গোলাপি একটি হাত মেলে দিলাম আমার সামনে। করতলের পর কব্জি থেকে সম্পূর্ণ বাহু ঢেকে আছে গেরুয়া পাঞ্জাবির বিস্তার। সেই হাতে আদর করতে করতে আদর করতে করতে বললাম—সম্পর্ক হয়। মুছে যায়। স্থায়ী নয় কোনোটাই। তুমি কি তা মানো?

—মানি।

—তোমার সঙ্গে আমার এ সম্পর্ক, কত দিনের জন্য?

—আদৌ যদি হয়ে থাকে সম্পর্ক কোনো, হয়তো আজই এর শেষ।

—আমি যে ভাবতেও পারি না।

—কী?

—এই, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এমন সব পরিস্থিতি। ভাবলে দারুণ কষ্ট হয়।

—তা হোক না। আমরা যে কোনো কষ্ট পাব না, এরকম প্রতিজ্ঞা তো করিনি। এই কষ্ট আগে পাওনি কখনও?

—পেয়েছি।

—তখন কী করেছ? কতদিন কষ্ট পেয়েছ?

—বছরের পর বছর।

—তারপর?

—একদিন কষ্ট মুছে গেল। কষ্টের দাগ রইল শুধু।

—ওমনিই হয়। আসলে এইসব তোমার চাঁদ দেখার মতোই অর্থহীন।

হাত, ধরাধরি করে শুয়ে পড়লাম আমরা। পাশাপাশি। ও কথা বলছে। ওর অতীত দিনের কথা। জানালার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সবুজ সুসজ্জিত নারকেল পাতা। চিল দুটি তার ওপরে বসল এসে। পরস্পরকে আদর করছে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখছে। আমি বললাম— দেখো ওদের। ও দেখল। বলল—পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই যৌনধর্মের অন্তর্গত।

আমি বললাম—প্রেমধর্ম। এই আদর, ঠোঁটে ঠোঁট রাখা, একে প্রেম বলো। যৌনতা বলো না। একে যৌনতা বললে প্রেমের বিস্তারকে খর্ব করা হয়।

—আসলে সবই এক। তুমি আলাদা করে দেখছ।

—দেখার মধ্যে দিয়েই তো জগৎ, বলো! দেখার মধ্যে দিয়েই কী আমরা নিরন্তর এ-জগৎ গড়ে তুলছি না?

নারকেল পাতা দুলছে। চিল দুটি দোল খেতে খেতে ডানা মেলে ভারসাম্য রাখছে। আর ঠোঁটের গভীরে ঠোঁট চিরকালের মধ্যে বিঁধে গেছে যেন। ওকে বললাম—কাছে এসো।

ও এল। আমি ওর মুখে টেনে নিলাম আমার গলায়। চেপে রাখলাম। তারপর দুহাতে ওর মুখ ধরে চুমু খেলাম। আমার মুখগহ্বর লালায় ভরে উঠেছিল। তারই কিছু লেগে গেল ওর গালে। আমিই মুছে দিলাম। আবেগের ঢেউ আসছে আমার মধ্যে তখন। আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমার পাঁজরে। আমি ওর বুকে মুখ রাখলাম। ও জড়িয়ে নিল না আমাকে। চেপে ধরল না ওর বুকে আমার মাথা। এবং হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, উপলব্ধি করলাম, এতক্ষণ আমি যা করেছি, ও বাধা দেয়নি মাত্র। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে স্পর্শও করেনি। অসম্ভব কষ্ট হল। ঠিক বুঝেছি কী আমি? আমি কী একা একাই গড়ে তুলছি যৌথ আবেশ আর হয়ে উঠছি বিফল। বোঝার জন্য ওর মুখ টেনে নিলাম আমার দিকে। টের পেলাম, ওর ঘাড় নমনীয় নেই। ছেড়ে দিলাম। বললাম—জোর করছি তোমার ওপর, না?

ও ক্ষীণ হাসল। শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। বলল—আমার এগুলো প্রথাসিদ্ধ মনে হয়। কিংবা রীতি বলতে পার।

—কী?

—এই যে কারওকে ভালোবাসলেই ঠোঁট ছুঁইয়ে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে।

আমি চমকে তাকালাম। প্রতিবাদ করে বললাম—না না! এ তুমি কী বলছ! রীতি কেন হবে! তুমি জৈবিক প্রবণতা বলো, মানতে রাজি আছি। চুম্বন একটা অপার্থিব ব্যাপার আমার কাছে। খুব সুন্দর। খুব পবিত্র।

—চাঁদর দেখার মতো?

—না না। সে অন্য রকম। সে অন্য সৌন্দর্য।

—কী অন্য সৌন্দর্য? একটা গোল আলোর টুকরো। নেড়ামাথার মতো কিংবা স্টিলের থালার মতো সাদামাটা। তাকে নিয়ে মাতামাতি, কবিত্ব, সেও আসলে প্রথা। রীতি। আমরা ছোটো থেকে

এভাবেই শিখি যে চাঁদকে সুন্দর বলতে হয়। ভালোবাসলে চুমু খেতে হয়। এই হল প্রকাশের উপায়। আমার খুব ইচ্ছে একটা ফিল্‌ম করার। তাতে দেখাব থাপ্পড় মেরে সবাই ভালোবাসা প্রকাশ করছে। যত জোর থাপ্পড়, তত গভীর ভালোবাসা।

আমি তখনও এক হাতে জড়িয়ে ছিলাম ওকে। সেই অবস্থায় ওর কথা শুনে কেঁপে উঠলাম। বললাম—ফিল্‌ম করতে হবে না। থাপ্পড়টা নানাভাবে মারা যায়। যেমন তুমি আমায় মারলে।

মুহূর্তে ওর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল—রাগ করো না। আমার কথায় রাগ করো না। আমি তোমাকে বলতে চাইনি। দেখ যারা আমাকে চেনে তারা আমার কথায় রাগ করে না।

আমি কি ওকে চিনি? এ পর্যন্ত এ জীবনে কতজনকেই বা চিনি বলে দাবি করতে পারলাম? আমি কিন্তু রাগ করিনি। সে ওকে চেনার দাবিতে নয়। আমার রাগ হয় না ওর ওপর। আমি কষ্ট পাই। আর, কারও দ্বারা আমি কষ্ট পাই, আমার এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কষ্ট যতদিন আমায় জড়িয়ে থাকবে, জানব, আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমি মানুষ আছি, হৃদয়ে আমার নিরন্তর ফোটে রক্তের উষ্ণ ফুল!

স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। কিন্তু ওর কাছে অহঙ্কার রাখিনি কোনো। বয়ঃধর্মে আমরা অসমান। এ কথাও মনে রাখিনি। ছোটো ছোটো করে ছাঁটা ওর চুল হাওয়ায় ওড়ে না পর্যন্ত। আমি ভাবি নিরহঙ্কার এই আমি। অসহায় এই আমি। অসহায় কারণ ও আমাকে দূরে রেখেছে। মাত্র এক চুলের দূরত্বে। কিন্তু আমি জানি, আমিই একমাত্র জানি এই দূরত্ব, দুর্লঙ্ঘ্য, দূরতিক্রম্য। ওর ওপর কোনো অধিকারই নেই। ব্যক্তিগত সম্পর্কের এইসব অধিকার—এ বড়ো সূক্ষ্ম, বড়ো ক্ষীণজীবী! কেউ একে হাতে তুলে দিলে পাওয়া যায়, কেউ চাইলেই ওকে, মাত্র দু আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে পারে। ও আমাকে কোনো অধিকার দেয়নি।

হঠাৎ আমার পাগল-পাগল লাগে। উন্মত্ত লাগে। কেন ও এরকম ঠেলে রাখবে আমাকে? কেন স্বাগত জানাবে না? মিশিয়ে ফেলবে না কেন নিজের সঙ্গে?

সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে একেবারে আমার কাছাকাছি টেনে আনলাম। ওর লাগল বোধহয়। অস্ফুট শব্দ করল। দুচোখে বিস্ময়। আমি ওকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম— কেন তুমি এরকম ভাবো? কেন এরকম বলো? তুমি তো এরকম নও! নিজেকে এরকম লুকিয়ে রাখছ কেন?

ও হাসল আবার। আমি ওর বুকে মুখ গুঁজে দিলাম। পোশাকের ওপর দিয়ে ওর শক্ত বৃন্তদ্বয় আমি অনুভব করতে পারছিলাম। ওকে বললাম—আমি অন্যভাবে ভাবি। আমার তোমার প্রতি যৌনটান নেই। এই চুম, এই জড়িয়ে থাকা—এসব শুধু ভালোবাসার প্রকাশ। ভালোবাসা। তুমি বিশ্বাস করো না? তোমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকলেও আমি এভাবেই থাকব।

ও বলল—হ্যাঁ। আমি জানি। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি।

আমার ভেতরে জ্বালা করছিল। শীতবোধ হচ্ছিল। জ্বর আসছে। প্রায়ই আসে এরকম। তুমুল উদ্দাম জ্বরে আমি বেহুঁশ পড়ে থাকি। ও তখন আসে না আমার কাছে। অসুখ-বিসুখ ও পছন্দ করে না। কে-ই বা করে! আমিও ওকে ডাকি না তখন। অসুখ করলে আমার গা দিয়ে অসুখের গন্ধ বেরিয়ে আসে। জামায়, বিছানায়, ঘরে, ভাতে, স্নানের জলে—সর্বত্র সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আমি তখন সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই।

ও টের পেল আমার জ্বর। বলল—চাদর নাও।

আমি বললাম—নেব।

—এখনই নাও।

—নেব।

—কোথায় আছে চাদর?

—আলমারিতে। তৃতীয় তাকের বাঁ দিকে।

ও আলমারি থেকে চাদর নিয়ে এল। খুলে গায়ে দিতে গিয়েও থমকে গেল কীরকম। আধখোলা চাদর আমার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল—নাও।

একটু পর দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম আমি। ও চলে গেল। যুদ্ধ বিধ্বস্তের মতো পড়ে রইলাম। অসহ্য যন্ত্রণা ফিরে আসছে। মাথার যন্ত্রণা। এ সবই আমার পরিচিত উপসর্গ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘরে ছেয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। আমার খুব কান্না পাচ্ছে। খুব কান্না পাচ্ছে। ইচ্ছে করছে ফোন করি ওকে। ও শুনুক আমার কান্না। শোনাব না। আমার কান্না ওকে ভিজিয়ে দেবে না। হয়তো অস্থির করবে।

॥ তিন ॥

ওকে বলতে পারছি না চাঁদ কিংবা রামধনুর কথা, কারন ও ব্যস্ত। ওকে বলতে পারছি না চিল কিংবা রোদ্দুরের কথা, কারণ এখন কিছুদিন ওকে ফোন করা চলবে না। সমস্ত দিন ওকে মনে পড়ে। ওকে বলেছিলাম—'যতক্ষণ তোমার অসুবিধে না হয়, ততক্ষণ থেকো আমার সঙ্গে।' ও বলেছিল—'থাকব'।

সেদিন অন্ধকারে অসহ্য যন্ত্রণা পেতে পেতে মনে হল, আর একা পারব না। কারওকে চাই। কেন মনে হল? একা যাপনের সঙ্কল্প আমি তো নিয়েছি সেই কবে!

ভালোবাসা কী, আমি জানি না। এই যে ওর জন্য বিবিধ বিচিত্র অনুভূতি, এই কী ভালোবাসা? আমি জানতে চাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে এক অরূপের সন্ধান।

॥ চার ॥

প্রতিদিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকার আমাকে ছেয়ে ফেলছে। ভুলতে পারছি না ওর নীরবতা। ও কী স্তব্ধ থেকে হারিয়ে যেতে চায়? ও কী পরীক্ষা করতে চায়, আমার ওকে কাছে পাবার ইচ্ছা কতখানি গভীর?

মহালয়া আজ। ভোরে রেডিও চালিয়ে দিয়েছিলাম। শুনতে মন লাগল না। সারা আকাশ ঢেকে ছিল মেঘে। তার ওপর কমলা রঙের আলো। আকাশ জুড়ে আমি তো ওকেই দেখি দৃষ্টি মেলে। ও কেন তা বুঝতে পারে না? বিশ্বাস করে না কেন?

॥ পাঁচ ॥

মেলবক্স খুললাম। ই-মেল করেছে ও। শনি বা রবিবার আসবে। আজকের শরৎ বড়ো সুন্দর। মনোরম। আমাদের ফ্ল্যাটের পেছনের মাঠে কাশের গুচ্ছে দোলা লাগিয়ে দিল বাতাস। এরপর নদীর ওপরে পড়বে নীল আকাশের ছায়া। জলকে দেখাবে নীল। আমি সাদা পালতোলা নৌকায় চেপে ভেসে পড়ব জলে; ভাসতে ভাসতে ঠেকব কোথায়? কে জানে?

॥ ছয় ॥

সকালে ওর ফোনে ঘুম ভাঙল। সামান্য কথা। কেমন আছ? জ্বর কমেছে? ওষুধ খাচ্ছ নিয়মিত? রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে?

ওর স্বর শুনলে ভেতরটায় শান্তি নেমে আসে। এই যে দেখতে পাচ্ছি না ওকে, তবু, যতক্ষণ ওর স্বর শুনি, আঃ, এক মোলায়েম শান্তি নেমে আসে। কিন্তু সে ক্ষণকালের। শান্তির পর এক বিপুল শূন্যতা। এ সম্পূর্ণ আমারই দোষ। আমিই পারি না আনন্দ ধরে রাখতে। শান্তিতে ডুবিয়ে রাখতে নিজেকে। আজও তাই হল।

ইস্ত্রির জামাগুলো দিয়ে এসে, বাজার করে ফিরলাম, চা খেলাম। গভীর অবসাদ আমাকে পেয়ে বসল। কিছুই করতে ইচ্ছে করল না। ঘর অগোছালো, গোছাতে ইচ্ছে করল না। শুয়ে রইলাম। অলস শুয়ে রইলাম। ওর কথা ভাবলাম। আচ্ছা, আমরা যদি কখনও একসঙ্গে থাকি, যৌথ জীবনযাপন করি, সারাক্ষণ ওকে ভাবব? বোধহয় না। নিরন্তর সান্নিধ্য কী তবে মুছে দিতে থাকে চাইবার তীব্রতা!

॥ সাত ॥

ওর পায়ে হাত রাখলাম। ও চমকে উঠল না। পা সরিয়ে নিতে চাইল না। ভালো লাগল। ক্রমশ নেমে আসা অন্ধকারে, আমি আর ও, কথা বলতে বলতে পার করেছি অনেক সময়। আমি ওর বুকের কাছে বসলাম যখন, ও বলল—তোমার জন্য ওঝা ডাকতে হবে। তোমার ভূত তাড়াতে হবে।

বললাম—তুমি চাও আমার ভূত চলে যাক?

—কতটুকু চেনো তুমি আমাকে? বলো তো?

—আমি চিনতে চাই। তোমাকে চিনতে চিনতে চিনতে সারা জীবন পার করে দিতে চাই।

ও আলতো করে জড়িয়ে নিল আমাকে। আলতো চাপড় মারছে আমার মাথায়, পিঠে। আমি জুড়িয়ে যাচ্ছি। ঘুম পাচ্ছে আমার। জড়ানো গলায় বললাম—ইচ্ছে করছে।

—কী?

—চুমু খেতে। কিন্তু ঠোঁটে ছোঁয়াব না তোমায়। তুমি সেদিন তিরস্কার করেছ।

—না। তিরস্কার করিনি।

আমি ওর কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। চোখে, নাকে, গালে, কানের পাশে, মুখের প্রতি স্থানে চুম্বন আঁকলাম। ও ঘন হল। কিন্তু শিথিল। যেন কোনোভাবে নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখার যতেক আয়োজন ওর সঙ্গে সঙ্গে আছে। বললাম—আমাকে একটুও আদর করছ না কেন?

ও আমার চুলে মুখ রাখল। চাপ দিল হাতে। জড়িয়ে রাখল। শরীরে লেগে যাচ্ছে শরীর। ভাপ উঠছে। টের পাচ্ছি অন্তঃস্থ উত্তেজনা। ওর এবং আমার। ওর বুকে মুখ রাখব বলে খুলে দিতে চাইছি বোতাম। পারছি না। ও তখন খুলে দিল নিজেই। ডুব দিলাম। কী নরম! কী গভীর! স্বেদগন্ধে মেশা।

ও যখন চলে গেল, দেখলাম, হাতের কাছে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও সমস্ত ক্যাসেট ও বই ওকে দিতে ভুলে গিয়েছি।

॥ আট ॥

ও এখন ট্রেনে। আজ সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশে যে ভাঙা-ভাঙা চাঁদ উঠেছিল, ও কী তা দেখতে পাচ্ছে? ঘুমিয়ে পড়েছে কী ও? কতদিন ওকে দেখতে পাব না! শুনতে পাব না স্বর!

কাল থেকে চলেছে এক বেখাপ্পা দিন। কড়া ব্যস্ততা ও জনসমাগমে মুখর। ভালো লাগে না। বহু লোকের সঙ্গে বহু কথা ভালো লাগে না। ভদ্রতার ছাপ দেওয়া বানানো হাসি ভালো লাগে না। ক্লান্তি আসে। চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আমি চাই নিভৃতি। ওর সঙ্গে কিছু কষ্টের কথা বলে, আনন্দের কথা বলে, আবোল-তাবোল বলে সময় বইয়ে দেওয়া প্রিয় ইচ্ছা আমার।

॥ নয় ॥

সকাল থেকে ঘোর বৃষ্টি। আবার এক পুজো এল। মহাসপ্তমীর এমন দিনে এই বৃষ্টি শরতে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষণ্ণতা। ওর এসএমএসগুলো পড়লাম। কতবার করে পড়া। তবু আবার পড়লাম। একা

একা থাকতে চেয়েও এমন মায়ায় জড়িয়ে গেলাম কেন? আমাদের কোনো বন্ধন নেই। ও যদি চায়, হরিয়ে যাবে, যেতে পারে।

গভীর কষ্ট আছে ওর মধ্যে। টের পাই। আঘাত আছে। ও আমার সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে চায় না। ওকে বললাম—কে তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল? কী করে দিতে পারল?

ওর চোখে রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট ফুটে উঠল। ওর নীরবতাকে ঠেলে দিয়ে বললাম— আমার কাছে আসতে না পারলে কষ্ট হবে না তোমার?

ও বলল—জানি না। আমার এইসব অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে।

কী যে মায়া লাগছিল আমার! আর অক্ষম কষ্ট! আমি তো পারি না ওর কষ্ট মুছে দিতে। পারি না। অন্য একজনের দেওয়া কষ্ট আমি কী করে মুছে দেব?

সেদিন ও প্রায় ছ ঘণ্টা আমার সঙ্গে। ও নিজে থেকে আমাকে স্পর্শ করবে এই আশায় চার ঘণ্টা ওকে ছুঁইনি। না। ও নিজে থেকে টানেনি আমাকে। শেষ পর্যন্ত আমিই আর পারলাম না। শুলাম ওর কোলে। ও আমার চুল ঘেঁটে দিল। আমার চুল ওর মতো ছোটো নয়। আঙুল ডুবিয়ে দেওয়া যায়। মাথায়, পিঠে, গালে ও আদর করল গভীর স্নেহের ভাষায়। আমি বিবশ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা করছিল। সেই ইচ্ছা, যাকে আমি স্বীকার করতে চাইনি। এখন, যা আমার সমস্ত রক্তস্রোতের মধ্যে। ওকে বললাম— আমি চাই।

—কখন বুঝতে পারলে?

—এখন।

॥ দশ ॥

যা ও দেয়, তার বেশি চাইব না। চাইবার অধিকার নেই। ও যে আমাকে একেবারেই অস্বীকার করে ঠেলে দেয়নি, এই তো অনেক। আমি কোনোভাবেই ওর জীবনে না থাকলে, কণামাত্র ক্ষতি নেই ওর।

ক্ষতি ওর নেই। কিন্তু আমার? আজ ও এল না বলে আমার সব তছনছ হয়ে গেল। মনে হল, ওকে দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যাব। জিজ্ঞেস করলাম কবে আসবে, বলল না। কিছুক্ষণ কাঁদলাম একা-একা। কেন কাঁদলাম? জানি না। একটা রাত্রি, মাত্র একটা রাত্রি ওকে থাকতে বলেছিলাম আমার সঙ্গে। ও কী থাকবে?

॥ এগারো ॥

ও এল রাত্রি আটটায়। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। হাসতে ইচ্ছে করছিল না। ওর কাছ ঘেঁষে বসিনি আমি এবং এই প্রথম ও নিজে থেকে আমাকে ওর কাছে বসাল। আমি ওকে ছুঁয়েছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে কোনো প্রাণ ছিল না। ও ওর বুকে টেনে নিয়েছিল আমার মাথা। আমার খুব ভয় করছে কদিন হল। তীব্র ভয়। সেই ভয়ের সিরসিরানি গ্রাস করেছিল আমাকে। ওকে বললাম—আমার ভয় করছে।

—কীসের ভয়?

ও আমাকে জড়িয়ে রেখেছিল। বললাম—মনে হচ্ছে, তোমাকে হারিয়ে ফেলব আমি।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে বলো তো?

—জানি না। আমি জানি না।

আমি সরে বসছি ওর থেকে। দূর থেকে দেখছি ওকে। ওর হাত, হাতের রেখা, ওর শয়ন দেখছি, ওর পা। যেন মুখস্থ করে নিচ্ছি। আমার মনের মধ্যে কী একটা ঘটে যাচ্ছে। কী এক আলোড়ন। মনের মধ্যেকার সংবেদনশীলতা আগে থেকে অনেক কিছু টের পায়। সতর্ক বোধের

অগোচরে। তার নাম প্রিমোনিশন, পূর্বশঙ্কা! আমার তাই হচ্ছে। ওকে হারাতে চলেছি আমি। আমার কষ্ট হচ্ছে।

ও বলল—রাগ করেছ আমার ওপর?

না। রাগ করিনি তো। আমি ভাবছি ওর প্রথম দিনের আসা। দ্বিতীয় দিন আসা। তৃতীয় দিন। ওকে দেখতে দেখতে আদরের ইচ্ছে জাগছে আমার। আমি হাত বাড়াচ্ছি, ফিরিয়ে নিচ্ছি। ও আমাকে কাছে টানল। আমার মুখ নামিয়ে আনল ওর গালে। ওর চোখ আবিষ্ট। ওর শরীরের ভাষা মিশে যাচ্ছে আমার ভাষার সঙ্গে। তবু আমরা শেষ পর্যন্ত পৃথক হয়ে রইলাম। কী যেন নেই, কী যেন ছিল না আমাদের। ওকে আঁকড়ে বললাম—আমাকে তোমার কথা বলো।

—এই, মেঝে সারাচ্ছি, বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। খাজনা দিতে হবে, তার জন্য কাগজ গোছাচ্ছি। তুমি মেঝে বানাবে? আমি মিস্ত্রি সরবরাহ করব। খাজনা দেবে? পরামর্শ দেব।

—আমাকে বলো। কে তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল?

—কষ্ট কী কেউ দেয়? কষ্ট পায়।

—কীভাবে কষ্ট পেলে বলো। আমি জানতে চাই।

ওর ঠোঁট কাঁপছে। আমি দেখেছি, এই প্রসঙ্গ এলে ওর ঠোঁট কাঁপে। মুখে কালচে ছায়া পড়ে যায়। ও বলল—আমি বলব না। কিছুতেই বলব না।

—এত সুন্দর তুমি। তুমি কেন কষ্ট পেলে?

—সুন্দর তো একটা বস্তুগত ব্যাপার। তোমার কাছে যা সুন্দর, অন্যের কাছে তা না-ও হতে পারে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। বুঝতে পারছি ও এবার চলে যাবে। ও যখন যাবার জন্য মনস্থির করে, তখন নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে নেয়। আমার ইচ্ছে হল, ও আর একটু থাকুক। বললাম—আদর করো। আমাকে আদর করো।

ও অনেক দূর থেকে আমার চুলগুলো ঘেঁটে দিল। বলল—চুল কাটতে গেলে নাপিত যেমন আদর করে, এ তেমন।

আমি বললাম—তোমার পা দাও।

—না।

—কেন? তোমার পায়ে সংস্কার আছে?

—এসব টিভিতে রামায়ণ সিরিয়ালে হয়। আমার কান-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছে এখনও। এটাও কী বলে ফেলল? এত সস্তা!

॥ বারো ॥

সবুজ পোশাকে আজ ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ছুঁতে ইচ্ছে করছিল খুব। ওর কোলে শুয়ে পড়লাম। ওর দু হাত সরিয়ে রাখল। ছুঁল না আমায়। জিগ্যেস করলাম—একদিন থাকবে না আমার সঙ্গে? একটা পুরো দিন? চব্বিশ ঘণ্টা?

—না।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না।

আমি মুখ তুললাম। স্পষ্ট তাকালাম পরস্পরের দিকে। বললাম—আর কী কী ইচ্ছে করে না?

—এই, ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

আমি তখনও ধরে আছি ওর হাত। ওর কথায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। নিঃশব্দ সে ভাঙনের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। বললাম—আগে কেন বলোনি? আমাকে আটকাওনি কেন?

ও একটা হাত রাখল আমার কাঁধে। বলল—আমি কী তোমাকে ছুঁই?

—না। ছোঁও না। কিন্তু আমি তো স্পর্শ করি তোমাকে।

—তাতে কী? তুমি যদি একটা গাছকে ছোঁও, গাছের কী কিছু যায় আসে?

আমার চোখে জল এসে গেল। ও বুকে টেনে নিল আমাকে। বলল—'কেঁদো না।' আমি বিকৃত কণ্ঠে বলতে পারলাম—তোমাকে তোমার শরীরের থেকে আলাদা করে দেখব কী করে? আমার যে ছুঁতে খুব ইচ্ছে করবে।

ইচ্ছে। ইচ্ছা। ইচ্ছাগুলি সব। পায়ে পায়ে চলে যাচ্ছে দূরে। আমি টের পাচ্ছি তাদের মিলিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ। ও বলছে—সেই চরিত্রটা মনে আছে তোমার? সেই উপন্যাসের চরিত্রটা? অনেক ঘটনায়, অনেক কারণে লোকটা অক্ষম হয়ে গিয়েছিল তো! মনে আছে?

—মনে আছে। তাতে কী?

—শোনো, এই যে সম্পর্ক, যদি এটা তোমার ভালোবাসা হয়, তবে এর আনন্দ আছে। কষ্টও আছে। তোমাকে দুটোই বইতে হবে। দুটোই একা বইতে হবে। কারণ ওই চরিত্রটার মতো আমিও ভালোবাসতে অক্ষম হয়ে গেছি। আমি আর কোনোদিন ভালোবাসতে পারব না।

আমি তাকিয়ে আছি। ওর ঠোঁট কাঁপছে। ওর চোখ—অনেক দূরে ওর চোখ—অনেক দূরের। ভালোবাসার সুখ-দুঃখ, ভালোবাসার আনন্দ-বেদনার ভার, এ কী একা-একা বহন করা যায়? আমি জানি না। সমস্ত জীবনের বোঝার ওপর এ কী এক সংযোজন মাত্র? হে ভালোবাসা—!

কস্তুরীমৃগ

কাবেরী রায় চৌধুরী

চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের বুকে। এক একটি ঢেউ সমুদ্রের এক একরকম আবেগ যেন! নির্নিমেষ দেখছে হংসিতা। পৃথিবী প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের আবেগ সবই যেন এক সুতোয় গাঁথা। সামগ্রিকভাবে এই বিশ্বচরাচর মহাবিশ্ব একই প্রকার মৌল ও যৌগ কণায় সৃষ্টি তার ধারণা। না হলে প্রকৃতিও প্রাণীকূলের আবেগ দেহধর্ম, মননধর্ম সব এক কেন? এই যে চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে লজ্জাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর সমুদ্রের বুকে আলোড়ন তুলছে, তা কি তার আর অসীমের আবেগঘন মুহূর্তকেই মনে পড়ায় না? পড়ায়। পাঁচবছর আগে বিয়ের পর মধুযামিনী রচনা করতে এখানে আসা প্রথম। রেজিস্ট্রি বিয়ে। সইসাবুদের পরই ট্রেনে ওঠা। এক বুক রোমাঞ্চ। চোখে চোখ মিলে গেলেই শরীর জলমগ্ন ঢেউয়ে ঢেউয়ে। কলেজের শেষ বছর সব মিলিয়ে চারবার দেখা দু'জনের। বন্ধুদের সাহায্যে তারপরই ঘরছাড়া হল সে। তাই আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে গেলেই বিদ্যুৎপ্রবাহ।

মনে পড়ছে হংসিতার আবার সেইসব কথা। শরীর আর মনে যে সবকিছু একদিন খুব বেশি করে স্পর্শ করে যায়, তারা অনন্ত চিহ্ন এঁকে রেখে যায় বুঝি গোপনে। তাদের চাক্ষুস করা যায় না। কিন্তু অনিবার্য তাদের যন্ত্রণাবোধ ও আনন্দবোধ। বারান্দা। থেকে ঘরের ভেতর দিকে তাকাল হংসিতা। জোড়া বিছানা জুড়ে তাস ছড়ানো। উত্তেজিত আটটি মুখ। এক একটি পাত্তি পড়ছে আর 'শালা', 'শুয়োর কোথাকার' হর্ষরব উঠছে। সৌম্যেন্দুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল তার এইমাত্র। নিমেষের মধ্যে সাধারণ থেকে আবেগঘন হয়ে উঠল তার দৃষ্টি ভাষা। এক পলক মাত্র। চোখ নামিয়ে নিল সৌম্যেন্দু। কিন্তু ঠোঁটে আর গোঁফের সরু পথে অনন্ত রোমান্টিকতার হাতছানিটি রয়েই গেল। গর্বোদ্ধত হংসিতা। রাজহংসীর মতো মাথাটাকে উঁচু করল। সে অহঙ্কারী। চাঁদের দিকে একবার তাকাল মাত্র। আবার ঘরের দিকে তাকাল। দীপঙ্কর তার চালটি খেলতে যেতেই চোখে চোখ পড়ল। ভ্রূ নাচাল সে। হাসল। বলল, সব দৃশ্য আজই দেখে ফেললে কালকের জন্য কী থাকবে? ঘরে এসো।

দীপঙ্করের কথায় বাকিরা তাকিয়েছে বারান্দায় তার দিকে। সৌম্যেন্দু তাস ফেলে উঠে এসেছে বারান্দায়। বলল, ঘরে চলো।

—ভাল্‌লাগছে না। আপনারা খেলুন না? কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ করল হংসিতা।

সকলের অলক্ষ্যে আলতো করে সে আঙুল ছুঁলো হংসিতার বলল, রাগ করোনা প্লিজ!

সকলের অলক্ষ্যে আলতো করে সে আঙুল ছুঁলো হংসিতার বলল, রাগ করোনা প্লিজ!

ভ্রূ ভঙ্গিতে সামান্য উষ্মা হংসিতার। গলার স্বর নামিয়ে নিল, বলল, রাগ করতে বয়ে গেছে। যান।

—প্লিজ—। এলো ঘরে।

ঘর থেকেই প্রীতম চিৎকার ছুঁড়ে দিয়েছে, অ্যাই হংসিতা কী করছ বলো তো ওখানে? খেলবে এসো না?

সৌম্যেন্দু গলা মিলিয়েছে একই সুরে, ঘরে এসো ঘরে এসো। ডিনারের পর সবাই মিলে বিচে শুয়ে চাঁদ দেখব। এখন এসো। শরীর জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জলে আবেগের ঢেউ উচ্ছ্বাসে চরম এখন। শরীরে ঔদ্ধত্য এখন তার। পায়ের ছন্দে ময়ূরী নৃত্য। সে বিলক্ষণ প্রতীত আছে এখানে উপস্থিত আটজন যুবক পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ। উপলক্ষ্য একজন, হংসিতা বসু।

পাতলা একটি চাদর কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়ল হংসিতা। তাসের আসরের ছন্দ কেটে গেছে। হালকা মেজাজে আটজন প্রতিপক্ষ গল্প করছে। হাসিঠাট্টার অধিকাংশ জুড়েই একে অন্যকে ছোটো করার প্রবণতা।

সৌম্যেন্দু দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে বলল, অমন খোদার খাসিটি হয়ে আর কতদিন কাটাবে?

দীপঙ্কর সিগারেটের ছাইটিকে এক টুসকিতে ফেলে দিয়ে অবহেলা ভরে তাকাল অসীমের দিকে, বলল, এই শালা বল্‌না, ব্যাটাচ্ছেলেকে কিছু?

'বাংলা দেহতত্ত্বের গান' বইটিতে মগ্ন অসীম। অসম্ভব উদাসীনতায় বলল, অ্যাঁ, কিছু বলছিস?

দাঁত খিচিয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। বলল, তোর শালা উচিত হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীশিপ নেওয়া।

হাঃ হাঃ করে হাসছে অসীম। বইয়ের দিক থেকে এতটুকু মনোযোগ বিচ্যুত না হয়ে বলল, ভাবছি তাই—।

প্রীতম বলে উঠল, মাইরি হংস, কী করে এই ব্যাটাকে সহ্য করো তুমি বলো তো!

বিমল এক আনন্দের চোরা স্রোত চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবাহিত হংসিতার হৃদয়ে। এই আটজন পুরুষ তার প্রেমে নিমজ্জিত এই মুহূর্তে। এই আটজন পুরুষ, সৌম্যেন্দু, দীপঙ্কর, প্রীতম, প্রবাল, দেবাশিস, সুকান্ত, রণদেব আর অসীম তাকে চুমু খেয়ে নিজেদের ধন্য করেছে। তার শরীরের প্রসাদ পেতে কাঙাল এই আট পুরুষ। শুধু কী এই আটজন? সে বিলক্ষণ জানে আছে তার শরীরী সৌন্দর্যের বিষয়ে। বাসে, ট্রেনে, পথে এমন কোনো পথচারী নেই যে তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করে চলে যায়! বরং এই তিন বছরে অসীমের মধ্যে এই ধরনের ঔদার্য্য লক্ষ্য করেছে সে। সে বন্ধুদের প্রতিপক্ষ মনে তো করেই না, বরং বরাবরের বন্ধুপ্রীতি এখন দ্বিগুণ হয়েছে।

প্রীতমের কথা শুনে হেসে গড়িয়েছে হংসিতা। অসীমের অসম্ভব উদাসীন এবং আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে একপলক দৃষ্টিপাত করে বলল, হিংসা হচ্ছে?

রণদেব হো হো করে হেসে উঠেছে, বলল, ঠিক বলেছ হিংসা, ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে মেয়েছেলের মতো হিংসুটে! পুরুষ মানুষ হিংসা করবি কী রে? সাচ্চা মরদরা জেলাস হয় না। সৌম্যেন্দু খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে প্রকাশিত আকাশটার দিকে চমৎকৃত ঔদাসীন্যে বসে। অবজ্ঞা ভরে হাসল যেন, বলল, সব ব্যাটা ভেক্‌ধারী।

চাদরের তলা দিয়ে দেবাশিসের হাত হংসিতার উরু স্পর্শ করল এবার সকলের অলক্ষ্যে। কেন্নোর মতো তার অনুভব। পায়ের পাতা থেকে শাড়ি সরিয়ে সরীসৃপ মসৃণ গতিতে তার চলন অব্যাহত। কাঁপুনি উঠেছে হংসিতার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল সে দেবাশিসের হাত। সজোর প্রতিবাদ সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে। কারণ চাদরের জ্যামিতিক পরিবর্তন হবে তাহলে। সাতজোড়া ছবি আকর্ষিত হবে। সেই সুযোগটিরই পূর্ণ ব্যবহার করতে চাইছে দেবাশিস এখন। তার মুখভঙ্গি স্থির অতি স্বাভাবিক। গল্প করছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। সৌম্যেন্দুর কথায় মজাদার মুখভঙ্গি করল, বলল, ভেক্ খুললেই ধরা পড়বে বাছাধন তোমার জারিজুরি। হাত তার মসৃণ গতিতে ঊর্ধ্বমুখী।

প্রবাল এমন সময়ে অতর্কিতে লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার। সিগারেট বার করে দেবাশিসের পাশে এগিয়ে এল, বলল, আগুন দে।

প্রবালের এগিয়ে আসার প্রকৃতি দেখেই হাত সরিয়ে নিয়েছে দেবাশিস। দুটি হাত যেন প্যান্টের পকেটে তার এমন ভাব। প্রবাল আগুন বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাইটার বার করে দিয়েছে সে। চতুর হাসি তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির পরোতে পরোতে। গুন্‌গুন্ করে বলে উঠল প্রবালের একটি দারুণ স্বভাব, যেখানে দেখিবে ছাই, সরিয়ে দেখিবে...।'

অসীম বইমগ্ন হয়েই বলল, যা পুরোপুরি জানিসনা তা কোট্ করিস কেন মূর্খ?

অসীমের কথায় সম্মিলিত হাসির ঝড় বয়ে গেল। নিশ্চিন্ত হয়েছে হংসিতাও। দেবাশিস যেভাবে বিপজ্জনকভাবে উর্ধ্বমুখী গতি হয়েছিল তার পক্ষে সংযমী থাকা অসম্ভব শুধু নয় অকল্পনীয় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। জলক্ষরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল তার। দেবাশিস এইবার ধুস্‌স্‌শালা বলে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। সৌম্যেন্দু এই সুযোগে হংসিতার পাশে বসার সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইল না। জল খাবার অজুহাতে নিজের স্থানটি ত্যাগ করে জল খেয়ে হংসিতার পাশে সামান্য অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বসল। কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কাল কোনারক না চিল্কা? দীপঙ্কর প্রবলভাবে আপত্তি তুলেছে, বলল, নো ফিস্‌ফিস্। হাসছে হংসিতা, বলল, ঠিক, মাছের গন্ধ নয়। যা হবে সব মাংসল।

—কী ফিস্‌ফাস হচ্ছিল?

—চিল্কা না কোনারক?

সুকান্ত এতক্ষণ তার গায়নোকোলজির মোটা দুর্ভেদ্য বইয়ে স্থির ছিল। চোখ তুলে বলল কোনারক।

—না, চিল্কা, কাল চিল্কা, তারপর সময় থাকলে কোনারক। আদুরে ভঙ্গি হংসিতার। বলল, আমি বহুবার চিল্কাকে স্বপ্ন দেখেছি।

—কেন হানিমুনে চিল্কায় আসো নি? মোটা কাঁচের ওধারে ঝক্‌ঝকে দুটো চোখে কৌতূহল আর বিদ্ধ করার আর্তি। আজকাল এদের সামনে হানিমুন অথবা দাম্পত্য নিয়ে আলোচনা করতে অস্বস্তি হয় তার। প্রসঙ্গ অতিক্রম করল সে নিপুণ দক্ষতায়, বলল, চিল্কা আমার স্বপ্ন, জল ভালোবাসি আমি। মীনরাশির কন্যা।

—জলকেলি করবে? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই গায়নোকোলজির শরীরতত্ত্বে ডুব দিল সুকান্ত।

রাজহংসী যথা! খিলখিল করে হাসছে হংসিতা।

অপূর্ব আজ চাঁদের বিস্তার। চাঁদ আর সমুদ্রের এমন বেহায়া মিলন দৃশ্য ইতিপূর্বে সে দেখেনি। রাতের আহারের পর সোনালি সৈকতে শরীর মেলে দিয়েছে সকলে। নিঃশব্দ সৈকত, ক্ষণে ক্ষণে সামুদ্রিক গর্জন, আর জলের ধুধু শব্দই বলে দেয় মহাবিশ্বে একটি অলৌকিক রহস্যময় চরাচরের অস্তিত্ব।

হংসিতাকে মাঝখানে রেখে উভয় পার্শ্বে শায়িত অন্যরা। অসীম শুয়ে নেই। জলের কাছাকাছি বসে আছে। বাতাসে তার শীর্ণ দেহটি পত্‌পত্ করে উড়ছে যেন, একরাশ চুল দিকভ্রষ্ট। কী ভাবছে সে পড়া যায় না।

সুকান্ত ভরাট কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করছে তখন, '...অসামান্য আগুন, সেই/আগুন অসাধারণ। একটিবার রেখেছ হাত/দুবার রাখা বারণ!' জয় গোস্বামী, প্রবাল তার বলা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, কোথায় কোন্ আগুন? কার পদ্য?

হংসিতা দু'পাশে ডানা মেলে আরও একটু রাজেন্দ্রাণী হল। যৌবন তার সার্থক। পৃথিবীতে তার মতো ভাগ্যবতী ক'জন আছে বলা মুশকিল। এ কবিতার উদ্দেশ্য বিধেয় জ্ঞাত সে। তাই

হাসল সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাসের শব্দকে অতিক্রম করে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি এ গ্রহের কেউ নও।/মেঘের ভিতরে আলো। দু'হাতে সবুজ রেখা নিয়ে। বসে আছো সানুমূলে। আমি চাই আমাকে ঘিরেই। উঠুক তোমার ছায়াপথ।' (শঙ্খ ঘোষ)

সুকান্ত বালির শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল চকিতে। দীর্ঘকায় সে। লম্বা পদক্ষেপে অসীমের পাশে গিয়ে বসল। তারপর সামান্য কিছু পরে দু'জনেই ফিরে এল। হংসিতার ঠোঁটে স্ফুরণ, বলল, এ কিন্তু ভালো হল না। সুকান্ত তুমি আমাদের ফেলে ওর কাছে উঠে গেলে কেন?

ঈষৎ বিরক্ত সুকান্ত বলল, এবারে আমরা হোটেলে ফিরব।

—আরেকটু থাকি না সুকান্ত? নাকিসুর হংসিতার। সবে তো বারোটা! কলকাতায় এর থেকে বেশি সময় ধরে আড্ডা মারো কিন্তু আমাদের বাড়িতে।

দেবাশিস বালি ঝেড়ে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে। একমুঠো বালুরাশি ছুঁড়ে দিল হংসিতার দিকে। সমুদ্র বাতাস হংসিতার অনুকূলে বইছিল, ফলে সমস্ত বালুকণাই তার চোখে মুখে চুলে ছড়িয়ে পড়েছে নিমেষের মধ্যে। ত্বরিৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, মুখে চোখে লোনা বাতাসের আঠালো আর্দ্রতায় বালুকণা চেপে বসেছে। উফ্ আহ্হ্! 'কী করলেন বলুন তো! বলতে বলতে মুক্ত হতে চাইছে সে বালুরাশি থেকে। উঠে এসেছে দেবাশিস। রুমাল দিয়ে যত্ন করে মুছিয়ে দিল সে। সুকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জ্যাঠামো করছিস কেন? আরেকটু থাকলে ক্ষতি কী? তোর ইচ্ছা না হলে ঘরে গিয়ে মেয়েদের শরীরতত্ত্ব পড়।'

দ্বিরুক্তি না করে কাউকে কিছু না বলে এগিয়ে গেল সুকান্ত হোটেল অভিমুখে।

অসীম এগিয়ে এসেছে, বলল, সিবিচ এরপর আর নিরাপদ নয়। এগোই চল।

রাত্রিগুলো ইদানীং অদ্ভুত লাগে। অদ্ভুত হয়ে নামে হংসিতা—অসীমের ঘরে। কলকাতা অথবা পুরী অথবা শৈলশহরে এই রাত্রির নাম 'নিরুত্তাপ উদাসী রজনী।' মুখ ভার হংসিতার। সমুদ্র সৈকতের গর্জন আর জ্যোৎস্নার আবিল মাদকতায় আকণ্ঠ আশ্লেষিত সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা প্রস্তরীভূত নগরকন্যার অনুভূতিতে আছন্ন। রাত পোশাকেই বেলাভূমিতে গিয়েছিল সে। সেভাবেই বিছানায় উপুড় হল। ঘর অন্ধকার এখন। জ্যোৎস্না নিবিড়ভাবে নেমে এসেছে ঘরে। মর্মর শব্দে সমুদ্র বাতাস সদর্পে উচ্ছ্বাসে এ ঘরের যাবতীয় পর্দা উড়িয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাচারী এখন। নোনা জলের আঁশটে গন্ধ উঠছে হংসিতার শরীর থেকে, সে নিজেও টের পেল। অসীম তার দিনান্তের শেষ সিগারেটটি খেয়ে বিছানায় শরীর মেলে দিয়েছে। চাঁদের দিকে চেয়ে হংসিতা। আবেগ দ্বিগুণ হচ্ছে। একসময় পাশ ফিরে অসীমকে একপলক দেখল সে, উন্মুক্ত জানালাপথে দৃষ্টি অসীমের অসীমের বুকের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে এবার। রমণীয় ভঙ্গি তার। কণ্ঠে রাত্রির স্বর বলল, তুমি খুব পাল্টে গেছ।

দু'টি চোখের পাতা বন্ধ এখন অসীমের। শান্ত স্বরে বলল, ঘুমিয়ে পড়ো, কাল তো চিল্কায় যাওয়া আছে। উঠতে পারবে না।

সামান্য শরীর ভঙ্গী পরিবর্তন করল হংসিতা। সাপিনীর ফণার মতো উদ্যত তার মাথা। ঝুঁকে পড়ে দেখছে অসীমকে। চোখের পলক বন্ধ অসীমের। ঘুমোনোর প্রচেষ্টাই আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড়ো উপায় এই সময়গুলোতে। এ তার নিজস্ব আবিষ্কার। ছেলেমানুষের মতো অসীমের বন্ধ চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করল সে এইবার। আদুরে কণ্ঠস্বর, বলল, ঘুমুবে না তুমি। খোলো। চোখ খোলো।

বিরক্তি প্রকাশ করে হংসিতাকে এ সময়ে কোনোদিনই নিবৃত্ত করা যায়নি, জানে অসীম। আলিঙ্গন করল হালকা বাঁধনে, বলল, কাল কিন্তু আমি ঘুম থেকে ডাকবোনা তোমাকে। রাজি?

—না। অসীমের বুকের ওপর উঠে বসেছে এবার হংসিতা, বলল, আমি তোমাকে জ্বালাব আর তুমি আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে চিল্কায় নিয়ে যাবে।

—আমার নিজেরই ঘুম ভাঙবে না এরকম করলে।

অভিমান কেন্দ্রীভূত হচ্ছে হংসিতার মনে। ঠোঁটে স্ফুরণ ঘটল, বলল, কাল না হয় চিল্কায় যাওয়া, কিন্তু অন্যদিন? প্রতিদিন রাত বারোটা একটা পর্যন্ত আড্ডা, তারপরই ঘুমিয়ে পড়ো তুমি! আমারও তো তোমাকে একটু পেতে ইচ্ছা করে।

—আড্ডা তো তুমিও এনজয় করো।

—তুমিই অভ্যাস করিয়েছ।

—ঝগড়া করবে এখন? শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর অসীমের, বলল, ঘুমিয়ে পড়ো প্লিজ।

—কতদিন আদর করোনি জানো? অসীমের থেকে দূরত্ব রচনা করেছে সে এখন। হাঁটু মুড়ে বসে, চাঁদের দিকে দৃষ্টি।

—শরীরই সব? উঁ? তিনবার অ্যাবরশন্ করানোর জন্য দোষ দাওনি আমাকে?

নিঃঝুম শুয়ে গেল হংসিতার মুখমণ্ডল, ধীরে ধীরে বলল, ওরকম কষ্ট পেলে তুমিও দিতে।

—সেইজন্য তো কষ্ট দিতে চাইনা। আলতো স্পর্শ রাখল অসীম হংসিতার পিঠে বলল, ঘুমোও।

—প্রতিটি পুরুষ আমার প্রেমে পড়ে। আমাকে চায়। একমাত্র তুমি ছাড়া। গলায় অভিমান ও আক্রমণ একই সুরে এখন হংসিতার। একজন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

—দেবাশিস। তাই তো?

ঘূর্ণি বাতাসের মতো ঘুরে পড়ল হংসিতার মুখ। অবিশ্বাস দৃষ্টিতে। অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে তার। অসীমের শার্ট দুহাতে খামছে ধরেছে, বলল, তুমি জানলে কী করে?

—ওটি ঠিক ঘোড়া নয়। বাবা-মার অমতে ও বিবাহিত কাউকেই বিয়ে করবে না। কলজের জোর নেই। নিরুদ্বেগ সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর অসীমের, ঘুমোও, রাত হয়েছে অনেক। বালিশে মাথা রেখেছে হংসিতা। দৃষ্টির আড়াল হয়েছে এখন চাঁদ। অথচ জ্যোৎস্নালোক বিস্তীর্ণ চরাচর জুড়ে। সৃষ্টি করেছে অসম্ভব মায়াজাল, সমুদ্রগর্জন অলৌকিক চেতনায় বুঝি নিয়ে যায় এই প্রহরে প্রতিটি জড় ও জীবকে।

ডুবে যাচ্ছে মায়ার সেই সম্ভাব্য চেতনাস্তরে হংসিতা। দেবাশিস তাকে গ্রহণ করেছে সমস্ত শরীরে। প্রবাল তাকে চুমু খেয়েছে। সৌম্যেন্দু তাকে আলিঙ্গন করেছে যতটা সম্ভব আশ্লেষে। রণদেব, দীপঙ্কর, প্রীতম কেউই নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারেনি তার শারীরিক আকর্ষণ থেকে। প্রত্যেকের বক্ষলগ্না হয়েছে সে বিভিন্ন সময়ে। তার শরীরী আবেগ সকলের জানা। শুধু দেবাশিস গতবছর তোপচাচিতে তাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছিল প্রথমবার। সেই অজানা সান্নিধ্য তাকে উন্মাদ করেছিল। কারণ বহু রাত অসীম তাকে ছুঁয়েও দেখেনি। এরপর বাড়িতে বহুবার এবং ডায়মন্ডহারবারে কয়েকবার তারা শারীরিকভাবে সংলগ্ন হয়েছিল। একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত দেবাশিস। বিদেশ ভ্রমণ তার কাছে কলকাতা-সোনারপুর ভ্রমণের মতো। বিদেশ থেকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী এনে তার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়েছে সে প্রতিবার। শারীরিক সম্পর্ক চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাবার আগে উন্মাদের মতো বলেছে, তোমাকে ছাড়া পাগল হয়ে যাব হংস। অসীম তোমার যোগ্য নয়। কী আছে ওর তোমাকে দেবার মতো? কী আছে? রূপে, গুণে ও তোমার যোগ্য নয় মোটেই। সে বলেছে, আমার রূপ ছাড়া আর কী আছে? ও লেখাপড়ায় কত ভালো দেবাশিসদা!

—মেয়েদের রূপই আসল। তাছাড়া কী এমন চাকরি করে ও? ওর তিনমাসের স্যালারি আমার এক মাসের সমান। আমার চেহারাও ওর চেয়ে সুন্দর। যেসব শাড়ি তুমি পরো ও আমাদের কাজের মেয়েও পরে না।

অহঙ্কার জেগে উঠেছিল তার ভীষণভাবে হৃদয়ের অতল থেকে। অভিমানও। দ্রবীভূত হয়ে

পড়েছিল সে। তার চুল, তার পায়ের পাতা, তার হাতের আঙুলের গড়ন, তার ত্বক, তার উদ্ধত ভরাট বুক, তার কোমরের শীর্ণতা সমস্ত কিছু দেবাশিসের কাছে অতি মহার্ঘ্য বস্তু। দেবাশিসের মুগ্ধ দৃষ্টি তাকে বানভাসি করেছিল। তবু রণদেব, দীপঙ্কর, সৌম্যেন্দুরা যখন পৃথক পৃথক ভাবে বন্দনা করেছে, কামনা করেছে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি। নেশার মতো আকণ্ঠ অনুমোদন করেছে সে তাদের সকলকে। মনে পড়ছে আজ সকালেই তারা যখন সমুদ্র বেলাভূমিতে স্নানরত, তখন প্রতিটি পুরুষের ছবি তার প্রতি একধরনের গাঢ় বন্যতায় আছড়ে পড়ছে। এসব দৃষ্টি রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তার। অথচ অসীম এ সমস্ত দেখেও উদাসীন! ব্যতিক্রম দেবাশিস, সৌম্যেন্দুরা। তারা ঈর্ষাকাতর হয়। তাদের ঈর্ষাকাতরতা তাকে আনন্দ দেয়।

রুপোলি নীল আকাশের দিকে চেয়ে সমুদ্রের শক্তিশালী গর্জন শুনতে শুনতে আবেশে চোখ বুজে এল হংসিতার। স্বপ্নে তার নিজেকে এক সোনালি মাছ মনে হল। তাকে একবার জাল পেতে ধরার জন্য জেলেদের যে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা আর তীব্র লড়াই। আর সেই মাছ দেখা দিয়ে পিছলে চলে যায়! বিশাল সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায় সে। তবু তার মনে এক সমুদ্র হাহাকার! ঘুমের মধ্যেই সেই হাহাকার অনুভব করতে পারে হংসিতা। চাপ যখন তীব্র হল, ঘুম ভেঙে গেছে তখন তার।

মধ্যরাত পার করেছে পৃথিবী এখন। আলুথালু বেশে শয্যা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল হংসিতা। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অসীম। হোটেলের সম্মুখের বালুকাভূমি ছাড়ালেই সমুদ্র। অপূর্ব জল-নীল রং এখন আকাশে। জ্যোৎস্না ক্লান্ত, নির্বাপিত। ঢলে গেছে চাঁদ পশ্চিমে; বার্ধক্যে। সমুদ্র উচ্ছ্বাস রাতের মতো দুর্বার প্রবল নয়। ছোটো ছোটো ঢেউ ফেনায় ফেনায় ভাঙছে সমুদ্র পাড়ে। চরম উত্তাল বন্য উচ্ছ্বাসের পর এখন প্রকৃতিতে ক্লান্তি নেমে এসেছে যেন। শূন্য শূন্য লাগছে হংসিতার। অসীম তাহলে সব জেনেও নিশ্চুপ ছিল! অসীমের মনের তল খুঁজে পাচ্ছেনা সে। দেবাশিসের কথা জেনেও কীভাবে অসীম শান্ত থাকে এই রহস্য তাকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। বিশ্বচরাচরে সে যেন একাকী এক নারী, সমুদ্র প্রেক্ষাপটে তেমনই মনে হচ্ছে তার। হুহু বাতাস, মৃত চাঁদ ছাড়া আর কারোর অস্তিত্ব নেই এখন। 'দেবাশীষ ঠিক ঘোড়া নয়'—অসীমের এই বাক্য আশ্চর্য করেছে তাকে। অর্থাৎ অসীম পূর্ব থেকেই জানে তার আর দেবাশিসের সম্পর্ক! এই মুহূর্তে দেবাশিসকে জাগিয়ে তুলে কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারে সে, তার মনে হল। পর মুহূর্তে মনে হল সম্ভব নয়। কারণ বাকি সকলে ডর্মেটারিতে এখন। মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা জমাট আবেগ দমন করল সে। আবেগ দমন করার যে কষ্ট তা তখন উথালপাথাল করছে মনকে। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি স্থির। অথবা সমুদ্রেও নয়। আরও অন্য কোথাও। যে কোথাও-এর দিক নেই। তেমন কোনো শূন্যদিকে। পর মুহূর্তেই দৃষ্টি আর্কষিত হল তার পাশের বারান্দায়। নিঃশব্দ চরাচরে সামান্য শব্দই শতগুণ হয়ে বাজে। কোনাকোনি বারান্দায় অন্ধকারে ছায়ামূর্তি এক তার মতই নিশ্চল। জ্যোৎস্নার মরা আলোতে তবু বুঝতে অসুবিধা হল না মূর্তিটি সুকান্তর। রেলিঙে ধরা দুটো হাত। বাদামের খোসার মতো তার চুলের রং, সেই চুল নিয়ে বাতাস স্বেচ্ছাচারী। সুকান্তর দৃষ্টি পড়া যায় না।

ক্ষীণ স্বরে ডাকল সে, সুকান্ত!

—বলো। সুকান্তর উচ্চারণই বলে দেয় তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে পূর্বেই জ্ঞাত ছিল।

—ঘুমোওনি?

—ভেঙে গেল।

—আমাকে জিজ্ঞেস করলে না?

—দেখতেই তো পাচ্ছি।

নির্বাপিত হয়ে গেল হংসিতার আবেগ। অসীমের মতোই আবেগহীন একজন মানুষ সুকান্ত,

এই ধারণাটি আরও দৃঢ় বদ্ধমূল হল। এই দলে সুকান্ত একমাত্র পুরুষ, যার তার সম্পর্কে কোনোরূপ দুর্বলতা নেই। এই রাতে তা আবার প্রমাণিত হল।

উগ্র হয়ে উঠছে হংসিতার আবেগ। রাত স্বেচ্ছাচারের সময়। ইচ্ছা করলেই সুকান্ত তাকে কাছে আসার জন্য ডাকতে পারত। সেই নির্দেশ অমান্য করার বাসনা তার নেই। ইচ্ছা করলেই এই রহস্যময় রাতের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারত তারা! আশ্চর্য! তার মতো অফুরন্ত যৌবনবতীকে কী অবলীলায় অতিক্রম করতে পারে সুকান্ত! নপুংসক একটা! মনে মনে উচ্চারণ করল হংসিতা। মুখে বলল, কাল কটায় চিল্কা?

—আমি যাচ্ছিনা।

—কেন?

একথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না সে। 'যাচ্ছি' বলে ঘরে ঢুকে গেল।

জ্বর নয় তবে জ্বরের মতন আচ্ছন্ন লাগছে হংসিতার। শেষ রাত থেকেই তার মনে হতে শুরু করল সমস্ত শরীর জুড়ে প্রদাহ প্রবাহিত হচ্ছে। সুকান্ত ঘরে চলে আসার পর থেকেই এই অনুভব প্রতিটি স্নায়ুশাখায়। সকালে ঘুম ভাঙার পরও আচ্ছন্ন শরীর।

চিল্কা ভ্রমণে মেতে উঠেছে পুরো দলটাই। সবচেয়ে বেশি মেতেছে সুকান্ত, সবাইকে অবাক করে দিয়ে। বিছানায় লেপ্টে থাকা তাকে দেখে মজাদার মুখভঙ্গি করল, বলল, হইল কী রাইজকইন্যের? হাড় মুড়মুড়ি ব্যামো? ওঠো। সবাইকে নাচিয়ে এখন নিজে শয্যা নিয়েছেন! দেখি কত বোটিং করতে পারো. 'দেবাশিস উৎকণ্ঠিত, বলল, কাল রাত পর্যন্ত তো ঠিক ছিল! জ্বর তো নেই! দেখি—।' বলে কপাল, গলায় হাত দিয়ে উত্তাপ বোঝার চেষ্টা করল। বলল, উঁহু জ্বর নেই। তবে কী যাবে? রণদেব জ্বরের ওষুধ এনে দিয়েছে, বলল. খেয়ে নাও। মাইন্ড। প্রীতম হংসিতার পায়ের আঙুলগুলো টেনে দিচ্ছে, বলল, আরাম লাগছে? ব্যাথা, না?

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে অসীমের। তাড়া দিল, নাও, নাও, ওঠো। গাড়ি এসে গেছে। ন্যাকামো কোরোনা।

হাসছে সুকান্ত, বলল, ওটি মেয়েদের নিজস্ব অলংকার। ও নিয়ে আমাদের কারুর কিছু বলার নেই। নাও ওঠো হংসরানি। যথেষ্ট হয়েছে।

বিরক্ত দেবাশিস বলল, তুই ডাক্তার বলে তুইই সব জানিস নাকি?

দেখছিস ওর শরীরটা দুর্বল লাগছে! না হয় এবার আমরা যাব না চিল্কায়?

—যাবে না? সুকান্তর চোখে হাসির ঝিলিক।

—যাব, প্রস্তুত করে নিয়েছে হংসিতা নিজেকে। তবু যেন কেমন অগোছালো বিবশ লাগছে। পুরীতে আসার সময় যেমন মৌতাতে ভরে ছিল মন, তেমনটি আর নেই। সালোয়ার ছেড়ে আজ শাড়িই পরল সে।

দেবাশিস বলল, আজ তোমার নীল অথবা সবুজ সালোয়ার পরা উচিৎ ছিল। বোটিং করবে। সুবিধা হত।

সেদিকে কর্ণপাত করল না হংসিতা। নিজের ইচ্ছামতো প্রসাধন শেষে অসীমের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ঢলোঢলো মুখ তার, বলল, চলো, আমার হয়ে গেছে।

দেবাশিস প্রীতমরা তার ব্যাগ বইতে চাইলে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না।

কেন? অবাক দেবাশীষ।

—আমি মেয়ে বলে নিজের ভার বইতে পারি না এমন মেয়ে তো নই। আমিই বইব। না হলে অসীম বইবে। বিয়ে করেছে বৌয়ের ভার বইতে পারবে না? আমার বরকে আন্ডার এস্টিমেট করছেন আমারই সামনে! আশ্চর্য! শাড়ির আঁচলে ঝড় তুলে সবার আগে বেরিয়ে পড়ল হংসিতা অসীমের উদ্দেশ্যে, বলল, আমার ব্যাগটা ক্যারি করো না প্লিজ।

কী মুশকিল বল্ তো! হংসিতার ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিতে নিতে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে হাসল অসীম। 'আজ কী হল!' হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিয়েছে সুকান্ত অসীমের হাত থেকে অসীমের ব্যাগটি বলল, দে। আমার তো পলি প্যাক। হাল্‌কা।

হাসছে অসীম, বলল হংসরটা নিলে পারতিস।

—মাথা খারাপ! পাগলের ব্যাগ কাঁধে করা মানে পাগলকে মাথায় তোলা! দিব্যি স্বস্তিতে আছি।

অদ্ভুত লাগছে আজ হংসিতার। অদ্ভুত রকমের রিক্ততার অনুভব মনকে নিকষ করে নিয়েছে যেন। গাড়ি চলল। সারাটা পথ নিঃঝুম হয়ে জানালার পাশে বসে থাকল সে। অসম্ভব রকমের চুপ দেবাশিস। আরোহী প্রতিটি মানুষ আজ অন্যদিনের তুলনায় শান্ত, স্থির। সমস্ত নীরবতা ভেঙে উচ্চকিত শুধু অসীমের কণ্ঠস্বর আজ। গলা ছেড়ে গান গাইছে। তার গলার সুর বড়ো বেসুরো। তবু মাঝে মাঝে প্রাণের আনন্দে গান গায় সে। উপস্থিত মানুষজন তখন পালিয়ে বাঁচে। আজও সে তেমন গাইছে, 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আ-আ-আ....আনন্দধারা...'। গানটি দুতিন লাইন গাওয়া হলে হংসিতা আহলাদিত হয়ে বলল, আর একটা করো।

অসীম মনে মনে চমকে উঠেও খুশি মুখে জিজ্ঞেস করল, কোন্‌টা? 'মন্‌সা তলার বাগানে পেথম দেকা দুজনে' গাই?

—ধ্যাত্! মুখভঙ্গি করল হংসিতা, দূরে পাহাড়ের আভাস দেখামাত্র বলে উঠল, কী অপূর্ব! দেখো—!

—কোন্‌টা? গান?

অসীমের হাত জড়িয়ে ধরেছে সে, অনুরাগের আভাস বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে পড়েছে চোখে মুখে। কৃত্রিম মুখভঙ্গি করল, বলল, বাজে বোকোনা। পাহাড়! কী অপূর্ব লাগছে দূরের পাহাড়গুলো আকাশের বুকে কেউ যেন তুলির টানে এঁকেছে, না?

গান ধরেছে অসীম, 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে...'। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সে সুর অসুর হয়ে দশ দিকে ছুটে গেল মার মার রবে। তবু আজ আশ্চর্যভাবে শান্ত সকলে।

চিল্কার নীল জলরাশি দেখে জলকন্যার মতো মেতে উঠল নিমেষেই হংসিতা। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর নীল জলরাশিতে ভেসে পড়ল সকলে। সর্বমোট তিনটি বোট চলেছে, অসীম দেবাশিস আর দীপঙ্করের সঙ্গে হংসিতাকে একই বোটে যেতে বললে মুখ ভার করল সে। বলল, হাসিমুখে চিল্কায় নিয়ে আসোনি ভুলে যেওনা।

—ঠিক্ ঠিক্, অসীম এ তোমার ভারী অন্যায়! আজ অন্যদিনের তুলনায় প্রকৃতই সরস সুকান্ত। বলল, কোথায় নিজের বৌয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ঘুরবি না, আমাদের মতো কতগুলো ধম্মের ষাঁড় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অ্যাবনর্মাল!

—আপনি বিয়ে করলে কী করবেন? চোখে বঙ্কিম রেখা হংসিতার।

—আমি? হো হো করে হাসছে সুকান্ত, আমাকে বিয়ে করবে কে? এখনও লন্ডন যাওয়া বাকি ম্যাডাম! লন্ডন থেকে বাকি ল্যাজগুলো লাগাই। তবে বিয়ে!

—তাও তো করবেন। তখন?

—করবো কিনা ডাউটফুল। মেয়ে মানেই তো তুমি! অসহ্য ন্যাকা! সহ্য করা যায় না! গম্ভীর সিরিয়াস মুখ সুকান্তর। তুমিই বলো, তোমাকে রেশিক্ষণ সহ্য করা যায়?

আচম্বিতে আক্রমণ! ভাষা হারিয়ে ফেলেছে হংসিতা। চোখে বিস্ময়। কথা যোগাচ্ছে না মুখে। রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল দুবার। বলল, দেখব, দেখব, তখন দেখবেন আমার চেয়েও বেশি ন্যাকাকে নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছেন।

—হারগিস্ নয়। প্রতিবাদ করে উঠেছে সুকান্ত, তারপর দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কবে করছিসরে হারামজাদা? বেলা তো হল অনেক।

—যখন করব হৈ হৈ করে করব। লাল অথচ পাংশুটে মুখ দেবাশিসের। জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে তিনটি বোট চলেছে। বাক্য ভেসে যাচ্ছে বাতাসে বাতাসে। সুকান্ত তার নিজের বোটে টান করে মেলে দিয়েছে শরীর। আকাশের দিকে চোখ, বলল, এইবেলা করে ফেল। জম্পেশ করে খাই। ছ' মাস পরে করলে আমার আর খাওয়া জুটবে না। তখন বগলে মেমসাহেব নিয়ে লন্ডনের পাবে গিয়ে নাচছি আমি...।

রণদেব পাশের বোট থেকে বলে উঠল, তুই শালা নাচবি! তা'হলেই হয়েছে! গায়নোকোলজির পুথি চোখে আটকে বসে থাকবি—তাই? আকাশের বুকে চোখ মেলল সুকান্ত। আকাশ আর জলরাশি কে যে কাকে নীল রঙে রঙিন করেছে বোঝা ভার, অন্তত তার মনে হল। মনে মনে তর্ক উপস্থিত হল, চিল্কা না কোনারক? কোনারক না চিল্কা? সুকান্তর এই এক স্বভাব বরাবরের। মনে মনে তর্ক করা। তর্ক করতে করতে তার মীমাংসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে কতদিন হয়েছে, বেলা চলে গেছে। হস্টেলের ঘর খালি হয়ে গেছে, ছাত্ররা অথবা হাউসস্টাফরা বেরিয়ে গেছে। কখন খেয়ালই থাকেনি। যখন খেয়াল পড়েছে পোশাকটি কোনোমতে গায়ে চাপিয়ে গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে পড়েছে।

জল কেটে কেটে চলেছে বোট। প্রবাল তার সঙ্গি। শুয়ে পড়েছে সেও, বলল, কী ভাবছিস?

—উঁহু। এ তর্ক অথবা মনের মধ্যে জেগে ওঠা ভাবনা শুধু তার নিজস্ব। এ ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে সে চায় না।

—না এলে মিস্ করতাম।

প্রবালের এ কথাটি উত্তর পেল না। ভাবছে সুকান্ত। প্রকৃতির হাতের রচনা সুন্দর না মানুষের হাতের সৃষ্টি? তার মনে হল প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ। খামখেয়ালি মেয়ের হাতের একেবারে মৌলিক ছোঁয়ায় যা সৃষ্টি হয় তার তুলনা মানুষের ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অঙ্ক কষে তৈরি সৃষ্টির সঙ্গে সম্ভব নয়। এই যে পাহাড়শ্রেণি, এই যে অঢেল নীল জলাধার, এই যে নীলাকাশ, এই যে পুঞ্জীভূত তুলোর মতো মেঘের বিক্ষিপ্ত বাহার, এ কোনো শিল্পী রচনা করতে পারবে না। মানুষের সৃষ্টির মধ্যে রহস্য বিলীন হয়ে থাকে। সেই রহস্য প্রত্ন রহস্য। পূর্বপুরুষদের বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আমাদের ভাবায়। নস্টালজিক করে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? তার সৃষ্টিকর্তা কে, সে অনন্ত জিজ্ঞাসা সে রহস্য কোনো বিজ্ঞান দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়। শোয়া থেকে উঠে বসে পড়েছে সুকান্ত। আকাশের দিক থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে দৃষ্টি পড়ল হংসিতার দিকে। মুখের দুপাশ থেকে জলপ্রপাতের মতো নেমে এসেছে অঢেল কেশরাশি। হাঁটু ভাঁজ করে বসে সে। দুটি হাত হাঁটুর ওপর ন্যস্ত। মুখের সামান্য অংশ চুলের ফাঁক থেকে দৃশ্যমান। জলের দিকে দৃষ্টি তার, এটুকু বোঝা গেল শুধু। অনির্বচনীয় এক পুলক মাছের মতো সাঁতার কাটছে সুকান্তর বুকের ভেতর। মাছের ডানায় তোলা ছোটো ছোটো ঢেউ বুকে এসে ধাক্কা মারছে। অথচ এই পুলকের কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁড়ে পেল না সে এখন।

নৈঃশব্দে পূর্ণ এখন হ্রদ অঞ্চল। ছোটো ছোটো আরও কয়েকটি বোট জলে ভাসমান। তবু কোনো কথা নেই। সূর্য অস্ত যাবার প্রাক্‌কাল মুহূর্ত। কান্না আসছিল হংসিতার রিক্ততা আর পূর্ণতার অনুভব যদি একই সঙ্গে স্নায়ুপথ দিয়ে বয়ে যায়, তবে বৈপরীত্যে চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য। হংসিতার মনে সেই অন্তঃস্রোতের ধাক্কা অনুভূত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ায় কান্না আসছে দুর্দমনীয় বেগে। অসীমের কাঁধে মাথা রাখল সে। আস্তে ধীরে তার মাথাটি সরিয়ে দিল অসীম, বলল, ওরা বাজে ভাববে। একসঙ্গে এসেছি...।

একটু কী আহত হল হংসিতা? অভিমান যেন কারণ অকারণে যখন তখন তীব্র হচ্ছে তার। বলল, আমরা স্বামী স্ত্রী সবাই জানে!

—তা হলেও—। লুকস্ ব্যাড।

—আমাকে কেমন লাগছে বললেনা তো?

—অপূর্ব! হাসছে অসীম, বলল, দেবাশিসের রাগ হচ্ছে কিন্তু।

—হোক, বন্ধুর বউয়ের দিকে হাত বাড়ালে ওরকমই হয়।

—সবারই হচ্ছে—।

—হোক্। বলো না কেমন দেখাচ্ছে?

—সুন্দরী ক্লিওপেট্রা! মজাদার মুখভঙ্গি করল অসীম।

—সুকান্তর একটি সাইকো অ্যানালিসিব করাব ভাবছি কলকাতায় ফিরে।

অবাক হংসিতা। পলকে সুকান্তর দিকে ফিরে তাকাল একবার, তারপর আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন?

—ব্যাটা অ্যাবনর্মাল। না হলে তোমার প্রেমে পড়ে না?

—চুপ করো। মৃদু ধমক দিয়েছে হংসিতা, বলল, তোমার মুখে যেন কিছু আটকায় না।

—আটকাবে কেন? আমার বউ সুন্দরী। তার প্রেমে পড়বে লোকে, দিস ইজ অ্যাবসোলিউট নর্মাল। ও ব্যাটার কী করি দেখো, ফিরে?

—কী করবে? হাসছে হংসিতা। অসীমের গায়ের ওপর ঢলে পড়েছে আবার। বলল, কী করবে বললে না তো?

—দেখতে পাবে।

সূর্য পশ্চিম পাহাড়শ্রেণির আড়ালে হারিয়ে গেল অকস্মাৎ, সেই সময়েই আকাশের রং পাল্টে গেল। রাঙা উচ্ছ্বাসে দিগন্ত থেকে দিগন্ত। সারস একঝাঁক দিগ্‌বলয়ের দিকে 'বিদায়' বলে উড়ে গেল। নাম-না-জানা অচেনা পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের মাথার ওপর দিয়ে অতিক্রম করল পথ। হ্রদের জল তাম্রলাল বর্ণ। বাতাস দিয়েছে সন্ধ্যা। বাতাসের চুম্বনে তরঙ্গায়িত এখন হ্রদের জল। এই সন্ধ্যায় সকলে যে যার মতো অন্তস্থ। বোঝা যায় না হৃদয়ের অন্তঃস্রোত।

সময়, মুহূর্ত, পল, ক্ষণ-গুলোকে কি আঁচলবন্দী করা যায় না? মুহুর্মুহু উদাস হচ্ছে হংসিতা। আজ দুদিন; কলকাতায় ফেরার পর থেকে চিল্কার বুকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার বুকে সূর্যদেবের ফেলে যাওয়া রক্তিম বসন, নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া মানুষগুলো—বারবার শূন্যতার এক ভয়াবহ দিকশূন্যস্তরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে হংসিতাকে।

দেবাশিস গতকাল দুপুরে 'লাঞ্চ আওয়ারে' এ বাড়িতে এসেছিল। থমথমে অপমানিত মুখ। দরজা খুলে দিতেই জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়েছিল। আবেগে রিরংসায় জড়িয়ে তার স্তন স্পর্শ করতে যেতেই সরিয়ে দিয়েছিল হংসিতা তাকে। বলেছিল, আপনি আর এ বাড়িতে অসীমের অনুপস্থিতিতে আসবেন না।

মুহূর্তে কেন্নোর মতো গুটিয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল দেবাশিস। পায়ে পড়েছিল তার। বলেছিল কেন এরকম করছ হংস? কেন? তুমি কি আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসো না?

—না।

নির্বাক দেবাশিস, আহত চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল সর্বাধিক। বলেছিল, জানতাম।

—আমি যদি আজ বলি, কালই বিয়ে করতে পারবেন আমাকে? বাবা-মা, বোনের অবাধ্য হতে পারবেন? সাহস আছে? শুনুন লুকিয়ে পরস্ত্রী গমন করার জন্য সাহস লাগে না। দায়িত্ব নিয়ে সামাজিক মর্যাদা দিতে সাহস লাগে। কেঁচোরও বাচ্চা হয়। কিন্তু তা বলে সে মেরুদণ্ডী প্রাণী নয়। যান, অসীমের থেকে শিখুন।

মাথা নীচু। কেঁচোর মতোই বুকে চৌকাঠ পেরিয়েছিল দেবাশিস।

মেঘ জমেছে আকাশের কোণে কোণে। আষাঢ় এল বলে। জলভরা মেঘের মধ্যে মধ্যে আলো চলে যাচ্ছে রমণীয় বিভঙ্গে। শূন্য শূন্য এ ঘর আজ। অসীম অফিসের কাজে রায়পুর বেরিয়ে গেছে আজ একটু আগে। ফিরতে ফিরতে সাতদিন। এত শূন্যতা যেন জীবনে আসেনি হংসিতার! বিছানায় শুলো একবার। তারপর উঠে সারা বাড়ি ঘর একা একা পায়চারী করল। জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল। ভারী হয়ে আসছে আকাশের বুক। কাছে দূরের গাছপালাগুলো এই জলরঙা পটভূমিতে আরও শ্যামল সবুজ। চিল্কা হ্রদের অফুরান সৌন্দর্য এখন তার চোখের পাতায়।

সুকান্ত আসবে সন্ধ্যার দিকে, এইটুকু তবু সান্ত্বনা। অসীমই বলে গেছে সুকান্তকে। তাকেও বলেছিল, একলা এতগুলো দিন তুমি একা কাটাতে পারবে না। আমি সুকান্ত হারামজাদাকে বলে যাচ্ছি। ও এসে রাতের দিকটা থাকলে তোমার সুবিধা হবে।

—কিন্তু ও যদি রাজি না হয়?

—ধম্মের ষাঁড় শালা! রাজি না হলে কেলিয়ে...। হবে, হবে, রাজি হবে।

—কিন্তু পাড়ার লোকজন দেখলে কী বলবে?

—ওগুলো গাছ পাথর।

—তুমি ফিরবে কবে।

—দিন দশ লাগবে—।

বৃষ্টি নামলোই অবশেষে। বড়ো বড়ো ফোঁটায়। গাছপালার ঝুঁটি ধরে নেড়ে চেড়ে তাণ্ডব করে যাবতীয় খরতা, আবর্জনা ধুইয়ে মুছিয়ে প্রবল বেগে বয়ে গেল ঝড় আর বৃষ্টি। দেবাশীষের কথা মনে হলনা একবারও হংসিতার। অসীমের অভাব বোধ হচ্ছে শুধু। কীভাবে যেন দাম্পত্যের সবুজ শুকিয়ে যাচ্ছে অনুভব করতে পারছে সে এই মুহূর্তে। কবে থেকে শুরু হল এই দাবদাহ মনে করতে পারেনা তবু। কবে থেকে দুজনে পাশাপাশি শুয়েও পরস্পরকে ছুঁয়ে দেখেনি মনে করতে পারছে না। শুধু তিন তিনবার অ্যাবরশন্ মনে পড়ে। তীব্র অভিযোগ ছোড়াছুড়ি মনে পড়ে। দুজনের আড্ডা ছেড়ে সম্মিলিত আড্ডার বাসর ঘর হয়ে উঠল এই বাড়ি কবে থেকে যে তারও দিনক্ষণ মনে নেই। দেবাশিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানার পরেও সহমর্মী অসীম! তবে কী অসীম তাকে ভালোবাসেনা? হয়তো সহমর্মিতা নয়। করুণা। তাও অসম্ভব নয়। বুঝে উঠতে পারছেনা হংসিতা।

বৃষ্টি তুফান আকার নিয়েছে এখন। জানালা থেকে চোখ সরালোনা তবু সে। সুকান্তর কথা মনে পড়ল সব ছেড়ে। অদ্ভুত ছেলে! তার সঙ্গে একান্তে গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি পর্যন্ত কখনো! সেই ছেলের কী যে শাস্তি আজ থেকে! তাকেই পাহারা দিতে হবে হংসিতাকে! ভাবতে গিয়ে এত শূন্যতার মধ্যেও হেসে ফেলল সে। কথা সরে না যে ছেলের মুখে সেই ছেলেকে প্রহরায় রেখে গেল অসীম!

সন্ধে আজ সময়ের পূর্বেই হয়েছে। আষাঢ়ের চতুর্থ দিন সারাটা দিন মেঘে মুখ উজ্জ্বল আকাশের। দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর সজল ভাব পৃথিবীর শরীরে।

সুকান্ত আসবে ভাবতেই মন ভালো হংসিতার। বিকেলের শুরু থেকেই রিনরিন করে অচেনা সুর খেলে যাচ্ছে শরীরে। সজল ভাব থাকলেও হাল্‌কা একটা গুমোট ভাবও রয়েছে। তাই সন্ধের আগেই গা ধুয়ে পরিপাটি বিন্যাসের শাড়ি পরেছে একটা। প্রসাধন করল স্বাভাবিক ভাবটি বজায় রেখে। সুগন্ধী ছড়িয়ে দিয়েছে অঙ্গত্যঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে। সুকান্তর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করেছে। তারপর রাস্তামুখী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য এই চেতনার উন্মেষ বারবার ঘটছে আজ, অনুভব করতে পারছে। উপলব্ধি করতে পারছে সে। এই প্রথম অসীম এতদিনের জন্য বাইরে

গেল। এর আগে একদিন, বড়জোর দেড় দিনের জন্য শহর ছাড়া হয়েছে। এই প্রথম অন্য কোনো পুরুষ এ বাড়িতে অসীমের অনুমোদনে রাত যাপন করবে।

সুকান্ত; সুকান্তর ছবিটি দৃষ্টিপাতায় ভেসে উঠল হংসিতার। চিল্কা হ্রদের ওপর বোটে শয়ান এক পুরুষ! উদাস, চঞ্চল দৃষ্টি যার আকাশের অসীমতায় নিবদ্ধ ছিল! অবাক লাগছে নিজেরই, সেদিন সুকান্তকে এত মনোযোগী হয়ে দেখেনি তো সে! অথচ আজ কী পরিষ্কার মনে পড়ছে সেই দৃশ্য, নিজের মনটিই তার ভারী অচেনা বোধ হল। প্রতিবেশী দাসদা তখনই অফিস ফেরতা তার দিকে চেয়ে হাসল। মরমে মরে আছে যেন সে, এমনই বিগলিত হাসি। এ অঞ্চলের সকলেই তার রূপে মুগ্ধ, আজ কবছরে ঠারে ঠারে টের পেয়েছে সে। শাড়ির আঁচলটি খসিয়ে অবোধ হাসি হাসে এ সময়গুলোতে সেও। আজ তেমন কিছু ইচ্ছা হল না তার। পথে পথে আলো জ্বলে উঠলে নিজের ঘরটিকে বড়ো অন্ধকার আর নিঃস্ব মনে হল। অফিস ফেরত মানুষজন ঘর অভিমুখে। সুকান্তকে ভ্রম করল সে দু-একবার। অচেনা লাগছে বড়ো নিজেকে। কত পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছে যে সে ভাবতেও অবাক লাগছে। এখন এই মুহূর্তে। কেউ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ না করলে হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠত সে। অথচ এমন তো ছিল না সে! ভাবতে ভাবতে আছন্ন হয়ে পড়েছিল কখন মনেও নেই! চোখের সামনে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোর উজ্জ্বলতা শুধু সত্য।

চমকে উঠেছে হংসিতা দরজায় বেলের শব্দে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে—সুকান্ত!

ভারী চশমাটি খুলে হাতে নিয়ে হাসল; সপ্রতিভ ভঙ্গি। বলল, কেমন আছ?

—ভালো, এসো।

একটু যেন অপ্রস্তুত ভাব এখন সুকান্তর। বই খাতা, ব্যাগ নামিয়ে রেখে বসেছে ডিভানের ওপর। জল এনে দিল হংসিতা, বলল, আমি কিন্তু না করেছিলাম ওকে। তোমার কী শাস্তি বলো তো?

—তা বটে। কদিনের ধাক্কা?

—কেন? বলেনি?

—হন্তদন্ত হয়ে এল, বলল, আজ রাত থেকে আমার বাড়িতে থাকবি। হংসিতাকে পাহারা দিবি আমি না আসা পর্যন্ত। ঝড়ের মতো চলে গেল, গেল কোথায়?

—ট্যুরে। দশ দিন। ঝম্‌ঝম্‌ করে হাসছে হংসিতা। বলল, জীবনে এমন বুদ্ধু বোধহয় কোনোদিনও হওনি না?

সত্যিই না। হেসে ফেলল সুকান্ত।

—মেয়েদের সঙ্গে এত কথাও বোধহয় আমি ছাড়া...মধ্যপথে কথা থামিয়ে দিল সুকান্ত, বলল, বলিনি। বলিনা, বলতে ইচ্ছেও নেই। মেয়েদের মধ্যে ইনটেলিজেন্সের এত অভাব যে কথা বলব কী ভেবে পাইনা! মেয়ে মানেই হিহি হাসি, হো হো হাসি, ন্যাকা ন্যাকা কথা! হরবল্‌!

—তাহলে দশদিন তোমার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা?

—দেখি সব সত্যি কথা সব সময়ে বলতে নেই।

মেঘের গর্জন শুরু হল আরও একটু রাত হলে। উদ্দাম বাতাস সঙ্গে। মেঘ কেটে কেটে চলা বিদ্যুৎ শিখা চোখ ঝলসে দেয়। বৃষ্টি এল তার সঙ্গে সঙ্গে।

রাতের আহারের পর নৈঃশব্দ জমাট বাঁধতে শুরু করল যেন প্রবলভাবে। ঝড় কমলেও ভারী বর্ষণ হচ্ছে। বারান্দায় এসে দাঁড়াল দুজনে। জলমগ্ন পাড়া। ল্যাম্পপোস্টের বাতি অন্ধকার ঝুপ্‌সি কিছু গাছ আর নিস্তব্ধতা সমস্ত শহরের চিত্র যেন। চাঁপা আর কামিনী ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। শরীরের প্রতিটি কোষে অস্বস্তি ভাবটা একটু একটু করে জেগে উঠছে তার অনুরণন টের পাচ্ছে হংসিতা। এ বোধ, এ উপলব্ধি কি বাতাসে ভেসে সংক্রামিত হয় অন্যের অনুভবে? সুকান্ত জ্বলন্ত

সিগারেটটি অর্ধভুক্ত অবস্থায় ফেলে দিল রাস্তায়। বলল, আমি শুতে যাচ্ছি। কাল আটটায় ডিউটি আমার। বলল, যাও। কিন্তু দরকার হবে ডেকো।

—হবে না। দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হল সুকান্ত।

কত রাত হবে তার দিশা পাওয়া যায়না। হাল্‌কা নিদ্রা এসেছিল। মস্তিষ্কের রহস্যময় সেই কোটর থেকে বার্তা আসছে শরীরে হংসিতার। ছোটো ছোটো ঢেউয়ে শরীর জল চলকে উঠছে অল্প অল্প। ঘুম ভেঙে গেল। পশ্চিমের জানালা সব বন্ধ। বৃষ্টি ধারা আসছিল বলে বন্ধ করে দিয়েছিল সে শুতে যাবার আগে। বারান্দার দিকে পূবমুখো জানালাটা খোলা। সেদিকে তাকাল সে। ঘন ধূসর বাদামি আকাশ। তার বুকের ওপর দিয়ে ছাইরঙা মেঘ স্তূপের সতর্ক পদচারণা। যেন আক্রান্ত আকাশকে সম্পূর্ণ দখল করে তবেই শান্তি তাদের। ভৈরবী সুর বাজছে হংসিতার উপোসি শরীরে। স্বাভাবিক সভ্য চেতনা থেকে এই রাতেই বুঝি মুক্তি পেতে বেরিয়ে আসে শরীর পিশাচ। জ্ঞান-গম্যি তার কিছুই থাকেনা। তেমনই হুলুস্থুল ডাক আসছে শরীর থেকে। উন্মত্ত পিশাচিনীর মতো দরজা খুলে ছুটে গেল সে। সুকান্তর ঘরের দরজা খোলা। বাইরের প্রেক্ষাপট থেকে একঝলক এই রাতে ঘরের মধ্যেটা দেখলে রহস্যময় গুহাকন্দর মনে হয়। দরজার সামনে বিস্রস্ত দাঁড়াল সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে সুকান্ত। বিনিদ্র। রক্তবর্ণ চক্ষু। উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। এক লহমা বোধহয়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হংসিতা দুটি পদক্ষেপে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুকান্তর বুকের ওপর। লুটোচ্ছে তার আঁচল, উন্মাদ আচরণ। জড়িয়ে ধরেছে সুকান্ত তাকে। বুকে চেপে তুলে দাঁড় করিয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবের মতো চুম্বন করছে সে হংসিতাকে। চোখ, নাক, ঠোঁট, ঘাড়, গলা এই ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা পেলনা কোনোভাবেই। তারপর আরও একবার বিধ্বংসী তাণ্ডবের জন্য প্রস্তুত হবার আগের মুহূর্তে সামান্য শান্ত হল সে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। হংসিতাকে সবলে আকর্ষণ করল এবার। ক্ষণিক মুহূর্তকাল, সে তীব্রভাবে ধারালো দৃষ্টি দিয়ে ছিন্ন করল হংসিতার মুখের পাতাটি। সে দৃষ্টির ধারে জ্বলে গেল হংসিতার চোখ। শরীর তবু তার পাগল নদীটির মতো। সপাটে আঘাত করল সেই মুখে সুকান্ত। বারবার। একাধিকবার। সে আঘাত নীরবে সহ্য করছে সে। দুহাতে তার শরীর ধরে ঝাকাচ্ছে সুকান্ত, হিস্ হিস্ গলার স্বর। বলে চলেছে, বেশ্যামাগি কোথাকার! দেবাশিস? হ্যাঁ? সৌম্যেন্দু কে কে ছুঁয়েছে তোকে বল্? বল্? বল্ আর ছোঁবে আজকের পর?

চাক ভেঙে জমাট কান্না কী এক মন্ত্রে হু হু স্রোতে বেরিয়ে আসছে হংসিতার দু চোখ বেয়ে। সেই জলধারা জিভের গ্রন্থি দিয়ে শুষে নিল সুকান্ত। হংসিতা মাথা নাড়ছে, বলে চলেছে, 'মারো। মারো। আমাকে মেরে ফেলো। শাস্তি দাও। মেরে ফেলো আমাকে...। ও মাগো! মারো...মারো...।' আলিঙ্গনে নিষ্পেষণ করছে সুকান্ত তাকে, দংশন করছে সমস্ত শরীরে। বলে চলেছে, 'এই শরীর আমার। এই মন আমার। আজ থেকে আমার অবাধ্য হলে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোয়ালঘরে বন্দী করে রাখব। ছিপটি পেটা করব। সারা শরীরে দাগ করে দেব দেখিস। সুন্দরের বড়ো দেমাক না? ছেনালি? আজ থেকে তুমি শুধু আমার...।' কাঁদছে সুকান্ত। উন্মুক্ত করল হংসিতাকে সম্পূর্ণভাবে। পায়ের পাতা থেকে চুমু খাচ্ছে। নরম স্পর্শ দিচ্ছে হংসিতার সমস্ত শরীরকে। অবাধ অঝোর বর্ষণ তখনও হংসিতার দুচোখের একূল ওকূল ছাপিয়ে নামছে। সুকান্তর মাথার চুল আকর্ষণ করে সে বুকের মাঝে চেপে ধরেছে। বলছে, আমাকে শাস্তি দাও। মুক্তি দাও।

বারান্দার দিকের অর্ধ উন্মুক্ত জানালা পথে তখনই সরে গেল ছায়ামূর্তি এক। ধক্‌ধক্ করছে অসীমের হৃৎপিণ্ডটি। আর একটু হলে বুকের খাঁচাটি ভেঙে যেন টুক্ করে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে সেটি। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা করল সে কয়েকটি পল। তারপর করাঘাত করল দরজায়। ভেতর থেকে এক নিমেষ নীরবতার পরই ভেসে এল কণ্ঠস্বর, কে? কে?

—হংস আমি। খোলো।

বজ্রপাত ঘটে গেছে চরাচরে। একটি পিঁপড়ের পদধ্বনিও শোনা যাবে এমন নীরবতা নেমে এল মুহূর্তের মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড। সংযুক্তি ছিন্ন করে পোশাক পরে দরজা খুলে দিল সুকান্ত। বিছানায় বসে আছে হংসিতা। স্বাভাবিক ভঙ্গি অসীমের। যেন কোনো বিপর্যয়ই ঘটেনি। বলল, 'স্যারি, ফিরে আসতে হল। ট্রেন ক্যানসেল। তোরা শুয়ে পড়। টায়ার্ড লাগছে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি কাল সকালে কথা হবে।'

থরথর কাঁপছে হংসিতা। মেঝেতে ফুঁড়ে গেছে দৃষ্টি তার। যেন সে দৃষ্টি পাতালে তলিয়ে গেছে চিরজীবনের মতো। মেরুদণ্ডটি দৃঢ় ঋজু সুকান্তর। অসীমের কাঁধে হাত রাখল, বলল, যা বৃষ্টি গেল! এত গরমের পর বৃষ্টি, বিপর্যয় তো হবেই। ট্রেন কটায় ছিল?

—নটায়।

স্মিত হাসি সুকান্তর ঠোঁটের রেখার ওপর দিয়ে হাল্কা বাতাসের মতো বয়ে গেল। টেলিভিশনে সংবাদ শুনেছে সে। ট্রেন ও প্লেন চলাচলের নির্দিষ্ট সময়সূচি অপরিবর্তিত ছিল বলেই সংবাদে প্রকাশ। বলল, হ্যাঁ, খবর শুনলাম। সব ট্রেন বাতিল। ভাবছিলাম...

টানা দুদিন একটানা অঝোর কান্নার পর শ্রান্ত বিধ্বস্ত হংসিতা অসীমের দিকে ক্ষমার অযোগ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি, না?

আর একটু পরে সুকান্ত আসবে। ঘরের চারদিকে হংসিতার সামগ্রী বাক্সবন্দী হয়ে অপেক্ষা করছে। অসীম বিধ্বস্ত হংসিতার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মমতা ভরে, বলল, কে বলল?

—তাহলে এরকম করলে কেন?

—তোমার ভালোর জন্য।

—আমি তো এসব চাইনি। আমি এরকম হলাম কেন?

—হবার ছিল, তাই—। সুকান্ত আমার বাজির ঘোড়া ছিল। জানতাম ওই পারবে।

—মহান হচ্ছ? তোমার উদাসীনতার জন্যই তো আমি এমন......!

—মহান হব কী? লোকে তো আমায় গালাগাল করবে আজ থেকে! হাসছে অসীম, 'বলবে, বউ সামলাতে পারেনা।'

—সত্যি কথা বলেছ। তোমার চেয়ে সুকান্ত শতগুণে ভালো। আমি জানি, বউ কী করে রাখতে হয় ও জানে। ও দাবি করতে পারে। ও ওর অধিকার বজায় রাখতে জানে। তোমার মতো উদাসীন নয় ও। ভেক্‌ধারী মহান নয়। তোমার মতো নিজের জিনিস অন্যের হাতে তুলে দেবেনা ও কখনও।

—সেইজন্যই তো আমার বাজি ছিল ওর ওপর। বাদবাকিগুলো অপগণ্ড শালা। 'চুরি করো যদি না পড়ো ধরা! শুয়োরের বাচ্চা!'

আবেদ শুষে নিয়েছে দীর্ঘ অশ্রুবর্ষণ। নির্লিপ্ত দুই নারী পুরুষের বাক্যালাপ, শবব্যবচ্ছেদ চলছে এমনই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। হংসিতা বলল, তার মানে তুমি চেয়েইছিলে আমার হাত থেকে মুক্তি পেতে? অথচ আমি কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত তুমি ছাড়া কিছুই বুঝতাম না! তোমার উদাসীনতা, একই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের ঘরে এভাবে ডেকে আনা! বাড়িটা তো আর ঘর ছিলনা। মেসবাড়ি হয়ে গিয়েছিল! অথবা সুকান্তর ভাষায় বেশ্যা বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ওরকম কেমন একটা হয়ে যাবার পরেও তোমার আমার প্রথম পর্বের সম্পর্ক ভালোলাগার দিনগুলো নিয়ে ভাবতাম! কিন্তু তুমি আমাকে এ পথে ঠেলে দিলে কেন? পারতেনা ফিরিয়ে আসতে? সুকান্ত পেরেছে। একটু ঘৃণা যেন দৃষ্টিতে মিশে গেল, এবার বলল, মুখে যতই উদারতার কথা বলো আসলে মেলশভিনিজম্ তোমার কিন্তু কম নয়। এঁটো হওয়া বউকে ঘাড় থেকে নামাতে চাইছিলে।

নীরব অসীম, সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখ ভার। বিছানা থেকে নেমে ঘরের এদিকে ওদিক চাইলো। তারপর চিন্তিত গলায় বলল, সব ঠিকঠাক দেখে নিয়েছ তো? কিছু ভুলে ফেলে গেলে না তো? প্রত্যেকবার বেরিয়ে ফেরার সময় হোটেলে কিছু-না-কিছু ফেলে আসো কিন্তু।

কানে গেল কি গেল না একথা বোঝার উপায় নেই, সবুজ একটি ভেঙে পড়া গাছের মতন বসে হংসিতা। চোখের জল শুকিয়ে দুগালে তার চিহ্ন। বলে চলেছে, কত উদারতা তোমার! বন্ধুর মতো ভেবেছিলাম! আসলে তোমার সামন্ততান্ত্রিক চেহারাটা ধরতে পারিনি আমি! ওইটাই সত্যি, —আবার বিয়ে করবে তুমি?

কাঁধ ঝাঁকালো অসীম, না।

—কেন?

—এখনও ভাবিনি। করলে বলব। কিছু ফেলে যাচ্ছ কিনা দেখে নিলে না?

তুমি খুব নিষ্ঠুর অসীম! আমাদের প্রেমের দিনগুলো মনে পড়ল না?

ডান হাতে কব্জির কাছে মস্ত অপারেশনের চিহ্নটার দিকে নির্দেশ করল অসীম, বলল, এই চিহ্নটা হাজার চেষ্টা করলেও মুছতে পারব?

—আমরা যদি দুজনেই কম জেদ করতাম! তুমিও প্রোটেকশন্ নেবেনা বলে জেদ করলে, আমিও পিল খেয়ে খেয়ে মোটা হবো না বলে জেদ ধরলাম! তিনবার অ্যাবরশন্! স্বগতোক্তির মতো বলে যাচ্ছে হংসিতা। উপেক্ষা করা শুরু করলে। আমিও। তবে আমি এখনও তোমাকেই ভালোবাসি—!

বিপদের গন্ধ পাচ্ছে অসীম, এই মুহূর্তে পুরো ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে হবে তাকে, উপলব্ধি করল, বলল, সত্যিকারের ভালোবাসার লোক সুকান্ত। মেরুদণ্ড দেখেছ? ওর জায়গায় আমি হলে কেটে পড়তাম। ভালোবেসে অন্যায় করেনি ও, ওর এই বোধটা যখন সেদিন রাতে দেখলাম, শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করছিল। এইজন্যই বরাবর ও আমার বাজির ঘোড়া।

—একটা সত্যি কথা বলবে?

—বলো—

—সেদিন সত্যি ট্রেন ক্যানসেল ছিল?

চরম সত্যিটা বলার মতো মেরুদণ্ডে শক্তি পেলনা অসীম। বলল, ইয়েস।

—তুমি জানতে সুকান্ত.......?

—জানতাম। ওর সিরিয়াসনেস দেখেই প্রথম থেকে জানতাম।

ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল হংসিতা এরপর কিছু সময়। কী যে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে কী যে ফেলে যাচ্ছে বুঝতে পারেনা! রান্নাঘর থেকে স্নানঘর—সর্বত্র তার আঙুলের ছোঁয়া। এই ছোঁয়াটুকু কীভাবে নিয়ে যাবে বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেলল।

চোরাটান

অহনা বিশ্বাস

সুনন্দাদিরা যে এসেছে টের পাওয়া গিয়েছিল। ফল্গু তখন ছাদে রিক্সার শব্দেই মুখ বাড়িয়েছিল। সুনন্দাদি রিক্সা থেকে নামল। পিছনটা দেখতে পেয়েছিল ফল্গু। সঙ্গে কাঁকন কি? কাঁকনই হবে। সকালে বাজার যাবার আগে যখন মাসিমার কাছ থেকে বাজারের থলি আনতে গিয়েছিল, তখন তো শোনেনি কিছু—ওদের আসার কথা। ওরা মানে সুনন্দাদিকেই একবার তার বাড়ির দিকে তাকাতে দেখল। মাথাটা সরিয়ে নিল ফল্গু। ওরা তাকে দেখুক এটা সে সেই মুহূর্তে কিছুতেই চাইছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল। ঘড়িটার দিকে আনমনে চোখ গিয়েছিল। চারটে সবে মাত্র বেজেছে। সুনন্দাদি কী স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছে, নাকি স্কুল যায়ইনি। কেন এল ও হঠাৎ! মাসিমার সঙ্গে মনকষাকষি হবার পর থেকে নিজের শ্বশুরবাড়িতে কদাচিৎ আসে সুনন্দাদি। যদি আসে তো অশোকদার সঙ্গেই। একা অশোকদাই খোঁজ-খবর নিয়ে যায় একসপ্তাহ, দুসপ্তাহ পর পর। আর কিছু হলে তো ফল্গু আছেই। অশোকদা সেকথা সরবে বলে, নীরবে বলে। কিন্তু যাইহোক শতকাজের মধ্যে এক-আধবারও তো আসে। কিন্তু সুনন্দাদি আজ এল কেন? তার ওপর কাঁকনকে নিয়ে।

ফল্গু রান্নাঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণ আগেই সে চা খেয়েছে। তবু চা চিনির কৌটোগুলোর ঢাকনা খুলে পরিমাণ দেখে। না, আছে। ওরা যদি আসে, সুনন্দাদিতো চা খেতে চাইবেই। তার হাতের চা সুনন্দাদির খুব পছন্দ। শুধু সুনন্দাদির কেন, অশোকদারও। শুধু ওদের দুজনকেই নয়, ফল্গু তখন অনেককেই চা খাওয়াতো। হয়তো সেই থেকেই এই একটা ব্যাপারেই ফল্গুর বিলাসিতা রয়ে গেছে। ঘরে ভালো চা খাওয়ার। যত্ন করে চা করার।

কাঁকনও কী সুনন্দাদির সঙ্গে আসবে? আসাই স্বাভাবিক। কিংবা হয়তো কাঁকনের জন্যই ও এল না। এক একবার যেমন করে সুনন্দাদি, রাস্তা থেকে একটা হাঁক দেয়। ফল্গু দরজায় দাঁড়ায়। ছুড়ে ছুড়ে কয়েকটা কথা হয়। আদরের ভানে কতগুলো কড়া কথায় ফল্গুকে বিঁধে হাসি হাসি মুখে রিক্সায় উঠে যায়। তেমনি হয়তো এবারও করবে। তবু ভালো। বেশি কথা বলা ফল্গুর পোযাবে না। আজকাল তার কিছুই ভালো লাগে না, কাউকে ভালো লাগে না।

কাঁকনকে নিশ্চয় মাসিমা অশোকদাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তৈমুর চলে যাবার পর থেকে মাসিমা কয়েকবারই ফল্গুর কাছে ওর নাম করেছেন। বারবার বলেছেন—বেচারা মেয়েটা। সারাজীবন কষ্ট করে গেল। ফল্গু কিছুই বলেনি। অনেকদিন আগে মাসিমা কাঁকনকে ডেঁপো মেয়ে বলতেন, একবার বলেছিলেন, দেখিস ও তোদের অনেক ছেলের মাথা চিবিয়ে খাবে। মাসিমার কথা শুনে তখন হাসত ফল্গু। মনে হত সুনন্দাদির ওপর রাগ ওর মাসতুতো বোনের ওপর শুধু

শুধু ঝাড়ছেন মাসিমা। মাতৃস্থানীয়াদের বোধহয় এরকমই মনে হয়। মাসিমার যেমন মনে হয়েছে অশোকদার মাথা আসলে সুনন্দাদিই খেয়েছে, আর ফল্গুর মাথা তো অশোকদা অবশ্যই খেয়েছে। শেষের কথাটা ফল্গুর মা বলতেন। আজকে তিনি বাড়িতে নেই, বালুরঘাট গেছেন বড়ো ছেলে, বড়ো বউ-এর বাড়িতে। মা থাকলে কিছু সুবিধা হত ফল্গুর। মাকে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে খানিক আত্মগোপন করা যায়। অবশ্য এখন ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে পড়লেই হয়। সুনন্দাদিরা তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও আসেনি, আর তারও কোনো মাথার দিব্যি নেই যে ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ফল্গু খবরের কাগজটা একবার নাড়াচাড়া করে। টিভিটা একবার চালিয়ে দেয়। পরক্ষণেই বন্ধ করে। দ্যুৎ, কিছুতেই মন বসছে না। বড়ো অশান্ত হয়ে উঠছে যে সে, নিজেই টের পায়। আজকাল এই এক রোগ হয়েছে। ফল্গু সিগারেট ধরায়। মাঝখানে সে সিগারেট ছেড়েই দিয়েছিল, আবার ধরেছে। একবার ট্রেনে যেতে যেতে এক ধূমপায়ীর মুখে শুনেছিল—বুঝলি, কিছু একটা জীবনে থাকতেই হয়। সব ছেড়ে দিলে চলে না। শোকে দুঃখে আনন্দে কাউকে একটা তো তোর সঙ্গে থাকতে হবে। সিগারেটা চলে গেলে কী আর থাকবে! ফল্গু বড়ো করে ধোঁয়া গেলে। নাক দিয়ে ছেড়েও দেয়। ধোঁয়ার দিকেই সে খানিক তাকিয়ে থাকে। কাঁকনকে তার খুব ছেলেমানুষ লাগত চিরটাকাল। তৈমুরের সঙ্গে ও যখন পালিয়ে গেল তখনও পর্যন্ত ফল্গুর মনে হয়েছে—ছেলেমানুষি করল মেয়েটা। সুনন্দাদি কাঁকনকে আর একটু সময় দিলে, ওর সঙ্গে একটু বেশি কথাবার্তা আদানপ্রদান করলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না। তখন অবশ্য সব রাগ অশোকদা সুনন্দাদির সঙ্গেই সে কাঁকন তৈমুরের ওপর করেছে। সুনন্দাদিকে তখন কাঁদতে দেখেছিল ফল্গু। সুনন্দাদি বলত, মাসিকে আমি কী জবাব দেব! শেষে ও আমারই দলের সঙ্গে, সবচেয়ে ওঁচাটার সঙ্গে চলে গেল। আমি মুখ দেখাব কেমন করে। সেই দুর্বল মুহূর্তে সুনন্দাদি বলেছিল, আচ্ছা ফল্গু, এতলোক থাকতে ওর তৈমুরকে কেন পছন্দ হল? শেখর, অনিমেষেরাও তো আমাদের বাড়িতে আসত। ওর এমন রুচি হল আমার বোন হয়ে। সুনন্দাদি ভাবত ফল্গু কাঁকনকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু কী করে বাঁচাত ফল্গু। অবশ্য সুনন্দাদির অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার সে কাঁকন আর তৈমুরের কাছে গিয়েছিল। কিছুই বলতে পারেনি ফল্গু। সুনন্দাদি যে তাকে পাঠিয়েছে সেটা কী করে যেন বুঝে গিয়েছিল কাঁকন। তাকে বাসে তুলে দিতে এসে হঠাৎই বলেছিল—আর কতদিন ওদের পা চাটবে ফল্গুদা?

—কাদের কথা বলছিস কাঁকন?

—তুমি বোঝো না ফল্গুদা কিছু? তোমার মাথায় কী আছে?

—কী আছে?

কাঁকনকে তখন আর ছেলেমানুষ লাগছিল না। এমনিতেই সিঁদুর টিদুর পরলে মেয়েদের বয়স বেশি লাগে। কাঁকনকে একেবারে অন্য গ্রহের জীব লাগছিল। কাঁকন বলেছিল—নিজের ভবিষ্যতের দিকে মন দাও। ওরা ছিবড়ে করে দেবে তোমায়।

ভবিষ্যৎ তখন তরতর করে ছুটছে অশোকদার সঙ্গে। অশোকদা বক্তৃতা দিতে যাবে, ফল্গুকে সঙ্গে থাকতেই হবে। অশোকদার সিডুল তৈরি করা, প্ল্যান করা, এমনকি ওর কাপড়-জামা ঠিকঠাক করা সবই তখন ফল্গু করত। আরে চা করতে তো তখনই শেখা। ওরা সবাই মিলে যখন তুখোড় আলোচনায় মত্ত, কে যাবে ওদের চা আনতে। ফল্গুই বলেছিল—একটা স্টোভ থাকলে আমিই করে দেব। যতবার খেতে চাও। এটা আর এমন কী কাজ। অশোকদা এসব কথা শুনে প্রশ্রয়ভরে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসত। অশোকদার চোখগুলো খুব মায়াময়। সেই চোখে ফল্গুর জন্য মায়া মমতা উথলে পড়ত। অশোকদার সে নিজের ভাই নয়, কোনো সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে,

তবু ওর জন্য সে মরতেও পারত। অশোকদা অবশ্য সর্বত্র নিজের ভাই বলেই ফল্গুর পরিচয় দিত। তার প্রতি অশোকদার ভালোবাসার তো পরিমাপ হয় না। সেই অশোকদার দেখভাল করা মানে পা চাটা! মানুষটাকে যে ফল্গুর বড়ো আত্মহারা লাগত। দেশের কাজে সমাজের কাজে যে নিজেকে নিবেদন করেছে তার সেবা করতে পেরে তো ফল্গু নিজেই ধন্য। অশোকদার ছোটোখাটো কথাও সে মন দিয়ে শুনত। কত পড়াশোনা ওর। ফল্গুর তো জীবনে অত বই পড়ে ওঠা সম্ভবই নয়। অশোকদার স্বপ্ন, জীবন সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে সব কথাগুলো সে মাথায় ধরে রাখতে পেরেই খুশি। ফল্গুর কাজ ছিল সেগুলো অন্যদের ব্যাখ্যা করে শোনানো। অশোকদার অর্ডার সাপ্লাই। 'অর্ডার সাপ্লাই' টার্মটা অশোকদারই দেওয়া। যেবার বি. এস. সি.-তে একটা পেপার ব্যাক এল, বাড়িতে এ নিয়ে তীব্র অশান্তি, অশোকদা সেই প্রথম ওকে বকেছিল খুব। বলেছিল—আমার সবকথা তো মুখস্ত রাখতে পারিস, বই-এর পড়াই শুধু পারিস না। ফল্গুর দুঃখ হয়নি। গর্ব হয়েছিল। গর্বের চোটে দাঁত বের করে হাসত। ব্যাক পাবার দুঃখ তার গায়ে লাগেনি।

কাঁকনেব কাছ থেকে ফেরার সময় তাচ্ছিল্য ভরেই ফল্গু বলছিল—যা যা সংসার করগে। সব জিনিস সব্বার মাথায় ঢোকে না, ঢোকাতেও যাস না।

বলার পর অবশ্য খারাপ লেগেছিল। ভুরু কুঁচকে কাঁকন তাকে দেখেছিল। কাঁকনের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। খারাপ কী কাঁকনও কিছু কম বলেছে। ফল্গুকে বোঝার ক্ষমতা ওর নেই।

মাঝেমাঝেই সুনন্দাদি কাঁকনের কথা বলত। যতবার কাঁকনের কথা উঠত, ততবারই ফল্গুকেই দোষ দিত। তুই ওর বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতিস। অন্তত আরও কয়েক বছর, ও যদি গ্র্যাজুয়েশনটাও করত। কলেজে পড়াটাও যদি শেষ করত। ফল্গু বুঝতে পারে না কী করে কাঁকনকে আটকাতে পারত, তবু সে ভাবে—পড়াটা যদি শেষ করত কাঁকন। পুরুষের প্রতি লোভ, অপোজিট সেক্সের প্রতি লোভ কী এরকমই যেআগুন জেনেও তার মধ্যে ঝাঁপাতে হবে? ফল্গু কোনোদিন প্রেমে পড়েনি, সেভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গ পায়নি, ও বুঝবে না। কিন্তু তৈমুরটার যদি পেটে একপয়সা বিদ্যা থাকত। অশোকদা অনেক সময় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাজে তৈমুরকে ব্যবহার করত। সেই তৈমুরকে সুনন্দাদির একরত্তি বোনের ভালো লাগল কী করে? তৈমুর তো দেখতেও ভালো নয়। মানুষের মনের ব্যাপার-স্যাপার বোঝে না ফল্গু। শুধু কাঁকন কেন, সে যে দেখেছে নিকট লোক, বহুদিনের চেনা লোক চোখের সামনে অচেনা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম রাগ হয়, তারপর তীব্র হতাশায় আক্রান্ত হতে হয়। নিজেকে ঠুকরে দেখতে ইচ্ছে করে নিজেও একরকম আছে কিনা। এ পৃথিবীতে ফল্গুর মতো লোকের বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে যায় তখন। কিন্তু এরকম হতে কে চেয়েছিল।

সুনন্দাদি কাঁকনকে নিয়ে রাগাত। কাঁকনের নাকি ফল্গুকে ভারি পছন্দ। কাঁকন তখন বেশ ছোটো, হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে। সুনন্দাদি একঘর লোকের সামনে কাঁকনকে নিয়ে রাগালে লজ্জা পেত ফল্গু। যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক হবার কথাও নয়, তার কথা বললে প্রথম প্রথম লজ্জা পেয়েই হেসে উড়িয়ে দিত, তারপর অবজ্ঞা করত। কিন্তু অনেক লোকের সামনে বললে তারাও মজা পায়। সবাই মিলেই পিছনে লাগত ফল্গুর। তখন তো অস্বস্তি হবার কথাই। কতবার ফল্গু সুনন্দাদিকে বলেছে সে অশোকদার মতো বিয়ে করবে না, তবু বলা ছাড়ত না সুনন্দাদি।

ফল্গুর আলাদা কোনো দাম ছিল না। দাম পেতে, গুরুত্ব পেতে ফল্গুতো কখনও চায়নি। তার যোগ্যও ছিল না। অশোকদা, তার চেয়ে দশ বছরের বড়ো, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায়, সমাজবোধে, নেতৃত্বে ও ফল্গুর থেকে যে একশো বছরের বড়ো। অশোকদা যদি তার পাশের বাড়ির দাদা না হত তাকে কেই বা সংগঠনে জায়গা দিত। কেই বা কাজ করার সুযোগ দিত। আজও ফল্গু অস্বীকার

করতে পারে না, অশোকদার জন্যই তার যেটুকু পরিচয়। অশোকদা সুনন্দাদি শুধু যে কমরেড ছিল তাতো নয়, ওদের অন্য সংযোগের কথা কে না অনুভব করত? তবু ওদেরকে নিয়ে কেউ কখনও সেভাবে সামনা-সামনি হাসি-ঠাট্টাও করত না। ফল্গুর ওদের সম্পর্কে বড়ো শ্রদ্ধা ছিল। যেমন সুনন্দাদি, তেমনি অশোকদা। কাজের ক্ষেত্রে এমন যুগলবন্দী বড়ো একটা দেখা যায় না, শোনাও যায় না। অন্যদের প্রেমের সঙ্গে ওদের কখনো মেলাতে পারেনি ফল্গু। এ মিল তো আদর্শের, আজীবন কাজের প্রতিশ্রুতিতে।

হয়তো একটা দিনের কথা ফল্গুর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল বলেই সে এই ধারণাটার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছিল। একবার একটা মিটিং-এর শেষে অশোকদার সঙ্গে শুতে হয়েছিল। জায়গাটা ছিল দামোদরের ধারের একটা গ্রাম। মাটির ঘরের দাওয়ায় তাদের শোবার ব্যবস্থা। মাঝরাতে অশোকদা বলল--চলো ফল্গু, একবার নদীর পাড় দিয়ে ঘুরে আসি। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি তখন পৃথিবী। চারদিকে কালোকালো অন্ধকার গাছ-গাছালি ঘরবাড়ির ওপর। চ্যাপ্টা রূপোর পাত হয়ে শুধু পাতলা নদী শুয়ে আছে। অশোকদা বলল, ফল্গু এই যে আলো আর অন্ধকার দেখছিস, এর মধ্যে কত মায়া। ভাবত, ওই সব কালোকালো গাছ-গাছালি না থাকলে এই আলোটার অবস্থা কী হত। আলাদা করে চেনা যেত কী। এটাই হল বিউটি। বুঝলি। এই বিউটির মধ্যে, এই মায়ার মধ্যে চিরকাল থেকে যেতে ইচ্ছে করে। কী ভয়ঙ্কর আকর্ষণ। কিন্তু জানিস তো ফল্গু এরকম চাই না। আমি চাই আলো, সর্বত্র আলো। সত্য চাই। চাই সবার মুখে সমান আলো পড়ুক। বিভেদের সৌন্দর্য এই জগৎ থেকে ঘুচে যাক।

অশোকদা যখন বলত, তাকে থামতে দিত না ফল্গু। শেষের দিকটা বক্তৃতার ঢঙে বলছিল। মনের মধ্যে শব্দগুলো টুকে নিচ্ছিল ফল্গু। কবিতার মতো কথা বলে অশোকদা। কথার টানে পরম শত্রুও পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তবু অশোকদা লেখে না। লিখলেও অনেক বড়ো সাহিত্যিক হত—ফল্গু চিরকাল ভেবে এসেছে।

সেজন্যই আমি সকলের মতো সংসার করব না-রে। বিয়ে সন্তান সংসার এসব আমার জন্য নয়। সুনন্দাকে সেকথা বলেছি। আছিই তো দুজন পাশাপাশি। তারপর ফল্গুর পিঠে চাপড় মেরে অশোকদা ভারি গলায় বলেছিল—আর তুই ফল্গু, তুই আমার সৈনিক। কিরে, আমার সঙ্গে আজীবন লড়বি তো?

ফল্গু এসব কথায় গলত বৈকি। অল্পবয়স বলে কিনা ফল্গু বোঝে না, তবে অশোকদার কথাগুলো তো এমনিতে কিছু মিথ্যা ছিল না। পরেও ভালো করে, ভেবে দেখেছে ফল্গু। মানুষ বদলে যায়। সেই অশোকদা আজকে আর কোথাও নেই ফল্গুর কাছে। কিন্তু কথাগুলো আছে। আকাশে বাতাসে, বই এ, পত্রিকায় বসে নেই, ফল্গুর মনের মধ্যে সেগুলো খসখস গজগজ করে। বিয়ে যে সকলের জন্য নয়। বিয়ে বা সংসার যে আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ তৈরি করে, তার থেকে সমাজসেবীর বেরিয়ে আসা বড়ো কঠিন হয়। ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে ওর আস্থা ছিল। সংযমকে গুরুত্ব দিতে হবে— এ কথা মিটিং-এ, আড্ডায় জোর গলায় চূড়ান্ত যুক্তির সঙ্গে কতবার যে বলেছে অশোকদা। সেই কথাগুলো কী ভেতরে লোড হয়ে গিয়েছিল ফল্গুর। নইলে কাঁকনকে মনের কোণায় এতটুকু জায়গা দেয়নি কেন? সুনন্দাদির বাড়ি গেলে, কিংবা কোনো কারণে তাদের পার্টি অফিসে কাঁকন এলে তার সঙ্গে একটু বেশি কথাই বলত। ওকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য ঝোঁক ধরত। তখন ওসব কাঁকনের ছেলেমানুষি ভেবে বড়ো বিরক্ত হত ফল্গু। আর এসব নিয়ে তো সুনন্দাদির পিছনে লাগার অন্ত ছিল না। ফল্গু চিরকাল জেনেছে তার প্রতি অশোকদার যে স্নেহ, তার দেখাদেখি সুনন্দাদিও সামান্য প্রশ্রয় দেয় তাকে। আর তারই ফলশ্রুতি তাকে নিয়ে ক্রমাগত হাসিঠাট্টা করে যাওয়া। আর এত কিছু কাণ্ডের পর, সেইসব

দিনগুলো-রাতগুলো ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবার পর যখন অশোকদা তার মেয়ের জন্মদিনের নেমতন্ন করতে আসার ছলে জানিয়ে যায় কাঁকনের নাকি ফার্স্ট লাভ ফল্গুই, তখন সে হাসবে না কাঁদবে কিছুই বুঝতে পারে না। বরং সে অশোক মজুমদার নামক বদলে যাওয়া মানুষটাকেই দেখে। সেদিন অশোকদার সামনে, অশোকদার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ফল্গু দ্বিধা করে না। সে শুধু ধীরে ধীরে কয়েকটা শব্দই উচ্চারণ করে। ও, আচ্ছা, জানলাম।

অশোকদা তো ফল্গুকে জন্ম থেকেই চেনে। কথাটা বলেই কথাটা ঘুরিয়ে নিতেও অসম্ভব পটু। সুনন্দাদি তো তাও আজকাল ছুড়ে ছুড়ে হলেও কথা বলে। অশোকদা এড়িয়ে যায়। তাও ওর মার সব দায়িত্ব নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে বলে মাঝেমাঝে অশোকদাকে তার মুখোমুখি হতেই হয়। বোঝা তো যায় অস্বস্তিটা দুজনেরই হচ্ছে। গাড়িটাও ওই পাড়ার বন্ধুর বাড়ির সামনে রেখে আসে অশোকদা। এই পথটুকু হেঁটে আসে। মাঝে-মাঝে অশোকদা বাড়িতে খেলে মাসিমা ভালোমন্দ রান্না করেন। ফল্গুরও তখন ডাক পড়ে। একসঙ্গে খেতে বসে তৃতীয় কোনো বিষয়ে কথা বলে তারা। অশোকদা বুদ্ধিমান লোক. ফল্গুও তো চালাক হয়ে উঠেছে। হাজার হোক. সে তো আর আগের মতো নেই।

দুর্মুখরা বলে সুনন্দাদির জন্যই অশোকদার এই অবনতি। ফল্গু এসব কানে নেয় না। সে জানে যারা একথা বলছে, তারাও সুযোগ পেলে ওরকম অবনতি করত। তবে জনপ্রিয়তা তো হারিয়েছে এই জনপ্রতিনিধি। এম. এল. এ. হবার পরীক্ষায় ফেল করে গেছে অশোকদা। তারপর থেকে যেন কল্পতরু হয়ে গেছে। সকাল দশটা থেকে কৃপাপ্রার্থীদের ভিড় লাগে। ভারতীয় সন্ন্যাসীই বটে। তাকেও কৃপা করতে চেয়েছিল অশোকদা। নিজে বলতে পারেনি, মাসিমাকে দিয়ে বলিয়েছিল, মিউনিসিপ্যালিটির চাকরিটা যদি ফল্গু নেয়। একটা হিল্লে ফল্গুর সবসময়ই করতে চেয়েছে অশোকদা। এখন যেমন কাঁকনের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাইছে।

সবই দেখে যায় ফল্গু। সবই বুঝতে পারে। সাত বছরের মিষ্টির জন্মদিনই এই প্রথম মাসিমার বাড়িতে হল। অশোকদার সুনন্দাদির সে কী ডাকাডাকি। বেশ খানিকক্ষণ থাকতে হয়েছিল ফল্গুকে। ওদের বাড়ি হলে তো যেতই না। সেদিন অবশ্য কাঁকন আসেনি। সুনন্দাদির সেকারণে আপশোশের সীমা ছিল না। অশোকদাও বারবার বলছিল ওর কথা। ফল্গুর কাছে ওর সম্পর্কে এমন প্রশংসাই করছিল যেন কাঁকনকে সে চেনেই না।

কাঁকন কী করে তখন আসত, বা ওরা যে কীভাবে ওকে প্রত্যাশা করেছিল তা ওরাই জানে। ফল্গু ভাবছিল আটদিন আগে যে মেয়েটার স্বামী রেললাইনে কাটা পড়েছে, তার পক্ষে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করা কী করে সম্ভব? ওরা বেশ ধুম করে মিষ্টির জন্মদিনে, বেশ পয়সা ওড়ায়। অনেক ভি. আই. পি.-র মাঝখানে সুনন্দাদি ওকে আলাদা করে সময় দিয়েছিল, সে নিশ্চয় কেবল মাসিমাকে দেখাশোনা করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নয়। সেদিন ধন্দে ছিল, পরে অশোকদার কথাবার্তায় পুরো বুঝে গেছে এর কারণ। অবাক হয় ফল্গু। কাঁকনও কী তাই চায়? তৈমুরের মৃত্যুর মাস-দুয়েক যেতে না যেতেই নতুন সংসার চায়। আর কাঁকনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সেজন্য ফল্গুকে পাত্র ঠাউরেছে। আশ্চর্য, কিন্তু ফল্গু কী এতই সস্তা?

কাঁকন সম্পর্কে আলাদা করে কোনো কিছু মনে আসেনি ফল্গুর। একবার একটা বিয়েবাড়িতে দেখেছিল। খুব সেজেগুজে ছিল। ফল্গুকে দেখে একবার দূর থেকে হেসেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল চেহারা ভালো হয়েছে। সেজেছিল বলেই হয়তো আড়ষ্ট ছিল। কাছে আসেনি। ওই কথাটা বলার পর ফল্গুর সঙ্গে কাঁকনের একটা দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাদের কথায় ব্যাপারটা মীমাংসা করতে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে দিন দিন ওর সম্পর্ক ঘনই হয়েছে। মাসিমার কাছে সম্ভবত শুনেছিল ফল্গু, তৈমুরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব খারাপ। বিবাহিত বন্ধুদের কাছে এর দোষ ওর দোষ কত

কথা শুনেছে ফল্গু। ওসব কত কথাই তো ওরা বলে। ওদের বেঁচে থাকার রসদ। ফল্গু এক কান দিয়ে শোনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। তবু খারাপ লাগে যখন শোনে কাঁকন তৈমুর দুজনই বাইরের লোকের কাছে এসব বলে বেড়ায়।

এসব শুনে ফল্গুর একবার মনে হয়েছিল কাঁকনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অন্তত ছোটোবেলা থেকে যাকে দেখেছে তার নামে এতসব কথা রটনা হওয়া ঠিক নয়। তারপর আর যেতে ইচ্ছে হয়নি। ভেবেছে গিয়ে আর কী হবে? সত্যিই কী আর কাঁকন বা তৈমুর তার কাছে মন খুলবে? কিংবা সেও সহজ করে বলতে পারবে তার আসার কারণ। এমনকী যে কিশোরী কাঁকনের সঙ্গে সে গল্পগুজব করত সেও কী আর সেইরকম আছে? বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে এইরকম নিদারুণ অভিজ্ঞতাই তো হয়েছে ফল্গুর। গণ্ডির ভেতর গণ্ডি কাটতে কাটতে সে একেবারে একা হয়ে গেছে। কাঁকনের বাড়িতে গিয়ে হয়তো সেরকমই অভিজ্ঞতা হত, বিবাহিত যে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ফল্গুর যেমন হয়। বন্ধুরা নিজেদের প্রেমের কথা নানাভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে। কখনও ঝগড়ার ভঙ্গিতে, কখনও সমালোচনা করে, কখনও সামনাসামনি গায়ে ঢলে পড়ে। আর বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে তো কথাই নেই। গোটা পৃথিবী সম্পর্কে তারা তখন অচেতন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রথম প্রথম নিকটজনের কাছে উষ্মা প্রকাশ করত। তারা বিয়ে করার সুপারিশ দিয়াছিল। অর্থাৎ বিয়ে করা মানে অসামাজিক হওয়ার সামাজিক তকমা আঁটা। ফল্গু গেলে হয়তো কাঁকনও তাকে শোনাত—তুমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে মাথা ঘামাতে এসেছ কেন? তুমি এসবের কী বোঝ? ভেতরে ভেতরে এই বোধ আছে বলেই ফল্গু এসব নিয়ে চুপচাপ থাকে। সংসার সে করবে না, সংসারের ভেতর ঢুকবেও না। ফলত অধিকাংশ সময় মুখ বন্ধ করেই থাকতে হয়। কাজের মধ্যে তো তার বাপের কালের ব্যাবসা, যা খাইয়ে পড়িয়ে তাকে রেখেছে। আর নেশার মধ্যে হোমিওপ্যাথি বই পড়ে চিকিৎসা। সন্ধেবেলাটা কাটানোর এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি ফল্গু আর একটাও পায়নি। চার ব্যাটারির টর্চ হাতে ফল্গু তখন বস্তিতে বস্তিতে ঘোরে। পাড়ার লোকজন যে তার এই ব্যাপারটা জানে না তা নয়। পাশ না করা ডাক্তার হিসেবে আগে পাড়ার চেনা ছেলেরা ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। এখন নিজেরাই ওষুধ নিতে আসে। বিনা পয়সার ওষুধ। কেউ কেউ বলে তুই শালা অশোক মজুমদারের শিষ্যই রয়ে গেলি। আজকাল এই কথায় সে তেলে-বেগুনে জ্বলে। অশোক মজুমদার সম্বন্ধে সরাসরি কোনো কিছু সে বলে না ঠিক, লোকে বুঝতে পারে আজকে আর সে তুলনা হয় না। অশোক মজুমদারের নিন্দা করে ফল্গুর মন পেতে চায় তখন। ফল্গু হাঁসের মতো গা ঝাড়া দেয়, নীরব অঙ্গভঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দেয়, সে কেবল কাজের কথা ছাড়া অন্যকিছু শুনবে না। তার প্রতি লোকের চোখের নীরব শ্রদ্ধা তো ফল্গু দেখেনি এমন নয়। এত পেয়েও মন ভরে না কেন কে জানে!

দরজার কড়া নড়ে উঠেছে। সুনন্দাদিরা কী মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা করেই, দু- চারটে কথা বলেই ফিরে এল নাকি। দরজা খুলতে গিয়ে দেখল কেউ নেই। হাওয়ায় কোথায় খুট করে শব্দ হয়েছে আর ফল্গুও ভেবে নিয়েছে...। যাবার আগে ফল্গু খালিগায়ে পাঞ্জাবিটা চাপিয়েছিল। কাঁকন যদি আসে ওর সামনে খালিগায়ে বের হওয়া যাবে না। তাড়াহুড়োতে উল্টো পরে ফেলেছিল। ছাড়তে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আজ বৃহস্পতিবার। ওর ব্যাবসা বন্ধ। বৃহস্পতিবারটায় ও দাসপাড়ার দিকে যায়। ওরা যদি না আসে তাহলে তো বেরিয়ে যেতেই পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই ফল্গুর মনে হল কাল থেকে নানা ঝামেলায় দাড়ি কামানো হয়নি। নিজের গালে ফল্গু হাত দিল। থুতনির নীচে দাড়ি তার এতটা পেকেছে। এতটা! ফল্গু রেগুলার নিজেই দাড়ি কামায়। এতটা কখনও লক্ষ করেনি। বয়স তো বাড়ছেই। বন্ধুদের ছেলেমেয়েরা কত বড়ো হয়ে গেল। আর এই বয়সে ওরা ওসব বলছে। এমনিতে সে বিয়ে করুক আর নাই করুক ওরা তো বয়সটা অন্তত মানবে।

দরজাটা খুলেই এসেছিল। সুনন্দাদি ঢুকে পড়েছে। মোটা হয়ে গেছে বড়ো। ওর চলার ধরনে

একটা থপ-থপ ভাব এসেছে। ফল্গু বলতে গেল. হঠাৎ কী ব্যাপার, তুমি এলে! একটু অভিনয় করার প্রয়োজন ছিল, পারল না। বরং আন্তরিকতা দেখিয়েই বলল— বোসো সুনন্দাদি। বাইরের ঘরটা বড়ো অপরিষ্কার হয়ে আছে। শোবার ঘরে এসো।

—মাসিমা না থাকলে তুই এরকম ভূত হয়ে থাকিস বুঝি।

—না, না। বাইরের ঘরটায় খুব লোকজন আসে। আজকে ছুটির দিন বলে ভিড় হয়। জুতো পরেই সব ঢোকে। ভেতরটা পরিষ্কার আছে দ্যাখো।

সুনন্দাদি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিল। যেন কখনও এ বাড়িতে আসেনি। যেন নতুন কিছু জিনিসপত্র ঢুকেছে এই ঘরে। আজ কত বছর যে অপরিবর্তিত তাদের ঘর-দুয়ার। সুনন্দাদি বলল—চিরকাল তুই একইরকম থাকবি ফল্গু?

ফল্গু আলতো হাসে। একইরকম কোথায়? কোনো মানুষ তা থাকে বুঝি! সুনন্দাদি শাড়ির আঁচল আঙুলে গোটায়। ফল্গুর দিকে খানিক চেয়ে থাকে। যেন মুখ দেখে সব বুঝবে। না, তুই একইরকম আছিস। সবাই বদলে গেলেও তুই বদলাসনি।

—না! বদলে গেছি। গম্ভীর লাগে ফল্গুর গলা। ফল্গু রান্নাঘরে গিয়ে সুনন্দাদির জন্যে চায়ের জল চাপায়। তখনই মনে হয় কাঁকনও কি আসবে? তখন যদি কম পড়ে! কিন্তু কাঁকনের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। সুনন্দাদি রান্নাঘরে ফল্গুর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ায়।

—ইস্, তোর মতো যদি একটা চা করা বর পেতাম-রে, স্কুল থেকে ফিরে যদি বরের হাতের এককাপ চা খাবার সৌভাগ্য হত!

—তোমার কি চা করার লোকের অভাব? বরের হাতেই খেতে হবে কেন—হাসতে হাসতে ফল্গু বলে।

—ও তুই বুঝবি না, বিয়ে হলে বুঝবি। ফল্গুর হাসি মিলিয়ে যায়। সুনন্দাদি চায়ে চুমুক দিয়ে চায়ের গুণগান করতে করতে বলেই ফেলে, বউ-এর হাতের রান্না যখন খাবি, তখন বুঝবি এর মধু।

ফল্গু বলে, তেমন তেমন রোগ থাকলে মধুও বিষ হয়ে ওঠে। সুনন্দাদির কথায় টেক্কা দিতেই ফল্গু কথাটা বলেছিল। কিন্তু সুনন্দাদি যেন কথাটা শুনলই না। মন দিয়ে চা খেতে লাগল। খানিকক্ষণ সবই চুপ। ফল্গু চুপ করে চায়ে চুমুক দেয়। আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করার মতো কথা খুঁজে পায় না। সুনন্দাদি আজ ওর স্বভাবের বড়ো বিপরীত আচরণ করছে। এমনিতে সুনন্দাদির বাচাল বলে বদনাম ছিল। বয়সের সঙ্গে যা খানিকটা কেটে গেছে। অবশ্য অশোকদার সঙ্গে বিয়ে হবার গুণে, অশোকদার গুণাবলিও কিছুটা ওর ওপর চেপেছে বৈকি। অশোকদার বান্ধবী না হলে তো এই মহিলাটিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেবার মতো কিছু ছিল না। যতই সুন্দরী হোক, যতই ইউনিভার্সিটির ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্রী হোক, ফল্গুর কাছে সুনন্দাদির এসব গুণ কখনও গুরুত্ব পায়নি। আর অশোকদার উপযুক্ত তো কখনই মনে হয়নি। চিরকালই একটু চালাক ধরনের। ওর চেয়ে কাঁকন ভালো। অনেক সহজ। কিন্তু কাঁকনের নামেও যেসব কথা শোনা যাচ্ছে...।

কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে ফল্গুই জিজ্ঞেস করে—মিষ্টি কেমন আছে সুনন্দাদি?

—কাঁকন আমার সঙ্গে এসেছে, ও বাড়িতে আছে জানিস। কী কথার কী উত্তর! সম্ভবত এই নিয়েই ভেবে যাচ্ছিল সুনন্দাদি। ফল্গুকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল—ওর সম্পর্কে কী খারাপ কথাই না রটছে। জীবনে একটা ভুল করে এত দুঃখকষ্ট পেল মেয়েটা, তার ওপর এসব রটনা। ওদের ফ্যামিলিটা বড়ো খারাপ বুঝলি। আসল রাগ তো তোর অশোকদার ওপর। তৈমুরকে চাকরি না দিয়ে কেন কাঁকনকে দিল।

সুনন্দাদি অন্যদিকে তাকাল। কাঁকনের দুঃখে তাঁর চোখে জল আসছে। সুনন্দাদির তো নিজের

ভাইবোন নেই, কাঁকনই সব। সুনন্দাদির এই কান্নায় ফল্গু প্রভাবিত হতে পারত। কিন্তু সে সতর্ক হল। অন্য সময় হলে, অন্য কেউ হলে কাঁকনের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী হয়ে উঠত ফল্গু। এক্ষেত্রে গম্ভীর, চিন্তাকুল মুখ নিয়ে বসে থাকা ছাড়া তার কী-ই বা করার আছে। যখন লোকজন তৈমুরের মৃত্যুটাকে হত্যা বলছে, আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অশোকদাকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। সে নাকি ওদের বহু গোপন বিষয় জানত, আর বহু রোষও পুষে রেখেছিল ওদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেসব রটনাই হোক, আর সত্যিই হোক, আপাতত ওরা বিপদমুক্ত। কেন না পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও কিছু পাওয়া যায়নি, আর সাহস করে পুলিশ কেসও কেউ করেনি। তৈমুরদের পরিবার বেশ গরিব। চীৎকার করে ঝগড়াঝাটি হয়তো করতে পারে, কিন্তু আইনত লড়তে পারে না। এসবের মাঝে সত্যি সত্যিই কাঁকনের জন্য তার দুঃখ হয়। তৈমুরের এমন ব্যক্তিত্ব ছিল না যে কাঁকনকে এদের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনে। সবসময় সবাইকে মারব-ধরব করত ছেলেটা, শেষে নিজেই অপঘাতে মরল।—কাঁকনের জীবনটাকে ফের গড়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য বুঝলি। এই তো বয়স। আমরা ওকে বিয়ে করার জন্য সবসময় বলছি, ভাবছি। তোর কী মত ফল্গু? কী বলিস তুই!

—তোমরা যা ভালো বোঝ। সুনন্দাদি তাকিয়ে আছে যেন ফল্গুর মতামতের অপেক্ষায়। ফল্গু ছাড়া যেন সব কাজ আটকে আছে।

বড়ো অস্বস্তি হচ্ছে ফল্গুর। সে তো ব্যাপারটা জেনেই গেছে। অশোকদা তো তার মারফৎ খোলাখুলি প্রস্তাব পাঠিয়েছে এবং ফল্গু রাজি হয়নি। সুনন্দাদি জানে না, নাকি অভিনয় এসব।

—কিন্তু কে ওকে বিয়ে করবে বল! সুনন্দাদির গলা ভাঙছে। কাঁকনের ব্যাপারটা যে ওদের কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বোঝা গেছে।

ফল্গু আপ্লুত হয়। খারাপ লাগতে থাকে মেয়েটার জন্যে। সুনন্দাদি কী এখানে ইচ্ছে করেই আনেনি ওকে, নাকি নিজেই আসতে চায়নি। সুনন্দাদি-অশোকদার কাছেই যখন ও আছে তখন নিশ্চয় জানে ফল্গুর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

সুনন্দাদি ঘনঘন চোখ মুছছিল। ফল্গু বলল, তোমাদের তো কত জানাশোনা, দ্যাখো না, ভালো ছেলে, প্রগতিশীল ছেলে পেয়ে যাবে। আজকাল এরকম কত বিয়ে হয়।

—প্রগতিশীল ছেলে? সুনন্দাদি যেন তাকে ভেংচে উঠল। প্রগতিশীল ছেলে আর আছে নাকি এই তল্লাটে। সব মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা নিয়ে পড়ে আছে।

ফল্গু মৃদু হাসে। তোমাদের এত বড়ো সংগঠন আর তুমি এইরকম কথা বলছ। জেনারালাইজ করছ। সুনন্দাদি রেগে ওঠে, এতবড়ো সংগঠনের কথা তুই বলছিস। সংগঠন-টংগঠন ছাড়, তুই নিজে, তুই নিজে কী করছিস?

ফল্গু দাঁড়িয়ে পড়ে। জানালার কাছে একবার যায়। অনর্থক লাইটারটা খুঁজতে থাকে সিগারেট ধরাবার জন্যে।

—তুই কি সত্যই বিয়ে করবি না কোনোদিন ফল্গু?

লাইটারটা খুঁজে পায় ফল্গু। সিগারেটটা ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বলে—আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন বলো তো?

—তুই কি মানুষ নোস ফল্গু? তোর থেকে ভালো ছেলে এখানে কে আছে? তুই কি জানিস তোর কত নাম। তুই জানিস না, আমি জানি।

ফল্গু কথাটা গায়ে মাখে না। বলে, একা মানুষ দিদি, তুমি তো জানো কেমন কিপটে আমি। কখনও একটা ভালো শার্ট গায়ে চাপাইনি। ওই টাকায় বরং কিছু ওষুধ কিনি, বিলোই। আর না বিলোলে আর ওষুধই বা নেবে কে? পাশ করা ডাক্তার তো নই।

—তুই আর বাজে বকিস না। তোর ওষুধে কাজ হয় বলেই না লোকে তোর কাছে আসে। কম লোক হয় তোর ঘরে। আমি দেখিনি না, কানে কিছুই আসে না।

—তুমি আর লজ্জা দিও না সুনন্দাদি। বেশি কিছু শুনলে পুলিশ ধরবে। রেজিস্ট্রেশন নেই, একটা আর এম. পি. ডিগ্রি পর্যন্ত নেই।

—তুই অনেক ডাক্তারের বাবা। সুনন্দাদির কথাটা শুনে শব্দ করে হাসে ফল্গু। সুনন্দাদি ওর হাসিতে যোগ দেয় না। অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে ফল্গুর দিকে।

—তুই কী সত্যিই বিয়েটিয়ে নিয়ে কিছু ভাববি না।

ফল্গুর হাসি শেষ হয়নি, সে তার লয় কমিয়ে এনেই বলে, পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি। সুনন্দাদি ওর হাঁটুর ওপর হাত রাখে। নিজের কথা এতটুকু ভাববি না। তোর তো ভবিষ্যৎ আছে। মাসিমা আর কদিন। তারপর একা থাকতে পারবি তো?

ফল্গুর ভাবতে খুব ইচ্ছে করে সুনন্দাদি এসব সত্যি সত্যিই তার জন্য বলছে। তার সুখ-অসুখ নিয়ে বড়ো ভাবিত যেন ও। কিন্তু তাতো নয়। সবই কাঁকনের জন্য। তৈমুর যদি মাঝখানটায় না এসে যেত তাহলে কী ওরা একবারের জন্যও ফল্গুকে যোগ্য পাত্র ভাবত! ফল্গু যদি কোনোদিন কাঁকনকে নিয়ে ভেগে যেত তাহলে কী তার ভাগ্য তৈমুরের মতোই হত?

—এ বয়সে আর হয় না। ফল্গুর এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে সুনন্দাদি আরও নানা দিক থেকে ওকে চেপে ধরে। এতদিনকার সম্পর্ক, এতদিনকার যোগাযোগ সব যেন একদিনে উশুল করে নিতে চায়। আমাকে বল না তুই কী কারণে বিয়ে করবি না। আমাকে একবারের জন্য বল, দ্যাখ তোর সমস্যা আমি সমাধান করে দিতে পারি কিনা। আচ্ছা ফল্গু, তোর বন্ধু-বান্ধব সব সংসার করছে, আর তুই করছিস না—তোর খারাপ লাগে না?

এসবের কীইবা জবাব হয়। জবাব তো একটাই, না, লাগে না। এরকমই আমি। এভাবে তো ভালো আছি। সকলের চেয়ে ভালো। অন্যরা দেখছ না, সংসার নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে জীবনের সব আনন্দ বিসর্জন দিয়েছে। বাঁধা কথাগুলো বলতে গিয়েও এই প্রথম কয়েকবার আটকায় ফল্গুর। তবু বলতে হয়। সুনন্দাদি বা অশোকদা কী তাকে কিছুই চেনে না। ওরা যদি বিয়ে না করত, অশোকদার সঙ্গেই কাজকর্মে থেকে যেত ফল্গু। নিজেকে আলাদা কিছু মনে হত না। বিয়ে না করলে কী পাশের বাড়ি, গায়ে লাগান বাড়িটা থেকে চলে যেত অশোকদা, ফল্গুর অস্তিত্ব মাটি করে দিয়ে! অশোকদা যেসব কথা বলত তার বিপরীত আচরণ যখন একে একে করতে লাগল, ফল্গুর তখন জেদ চেপে গেল নিজেকে প্রমাণ করার। পার্টির মধ্যে সে পারবে না, জেনে পার্টির বাইরে অশোকদার স্থান নেবার জন্য লড়তে লাগল। পার্টির ডাকও একবার এসেছিল মিউনিসিপ্যালিটির ভোটের সময়। বোধহয় উপযুক্ত কমিশনার খুঁজে পাচ্ছিল না ওবা। যায়নি ফল্গু। হয়তো অশোকদার চেয়ে আজ তার মান-মর্যাদা বেশি। লোকের আস্থা আছে তার ওপর। কিন্তু এরকম হবার জন্য কী সে কোনো কষ্ট পায়নি? দিনের পর দিন কি একা হয়ে যায়নি? বন্ধুরা যখন তাকে জিতেন্দ্রিয় জেনে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রেম করেছে, তখন কী ঈর্ষা তার কিছু কম হয়েছে? বন্ধুরা যখন তাদের বউ বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, তখন কী কম নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে ফল্গুর? কাজেকর্মের নেশায়, ডাক্তারির মধ্যে সে আরও নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এসব কথা কী কাউকে বলা যায়! এসব কথা বলার লোক কী সুনন্দাদি? একবারই সে অশোকদা আর সুনন্দাদিকে জ্বালিয়েছিল। জীবনে একবারই সচেতনে কাউকে জব্দ করা। প্রতিশোধ নেওয়া। বিয়ের পর ওরা দুজনে হনিমুনে গিয়েছিল মুসৌরি পাহাড়ে। বিয়েটা সহ্য হয়নি ফল্গুর। তবু সারা বিয়েতে হাসিমুখে হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে হয়েছিল। ওরা হনিমুনে যেতেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল ফল্গু। সে নিয়ে কী তোলপাড় কাণ্ড। থানা পুলিশ মর্গে খোঁজা সবই হয়েছিল। অশোকদাদের তার জন্যই সাত-তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল। ওদের ফেরার পরে ফল্গু ফিরেছিল।

একটা গল্প বানাতে হয়েছিল তাকে। সে গল্প সবাই বিশ্বাস করলেও ফল্গুর সন্দেহ অশোকদা করেনি। সম্পর্কটা আর জোড়া লাগেনি। ভাঙার দাগটুকু বারেবারেই স্পষ্ট হয়। এবার আর একটা সুযোগ এসেছে মিলে যাবার, তাদের বাড়ির লোক হয়ে যাবার। হয়তো অশোকদা-সুনন্দাদির সম্পর্কিত বলে সে এ ব্যাপারে ভাবতেও রাজি নয়।

ভারি মুখ নিয়ে সুনন্দাদি ফিরে গিয়েছিল। উচিত ছিল সুনন্দাদির সঙ্গে মাসিমার বাড়ি গিয়ে কাঁকনকে সমবেদনা জানিয়ে আসা। অন্তত যখন শুনেছে কাঁকন এসেছে। বারবার নিজেকে বুঝিয়েছিল ফল্গু, অশোকদা-সুনন্দাদির প্রতি তার যতই বিরূপতা থাক, তার সঙ্গে কাঁকনের কী সম্পর্ক? ও তো বরঞ্চ ওদের হাত থেকে ফল্গুকে বাঁচাতেই চাইত। কিন্তু পা ওঠেনি। কাঁকনের সামনে দাঁড়ানো বড়ো কঠিন। চমকে উঠল ফল্গু। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে সোজাসুজি দেখা যাচ্ছে ওদের দুজনকে। সুনন্দাদি অবশ্য চিরকালের মতো ফল্গুকে দরজায় দেখতে পাবার আশায় এদিকে তাকাল। দরজা তো খোলাই রেখেছে ফল্গু। পা অবশ হয়ে গিয়েছিল ফল্গুর। পা নয়, সারা শরীর। ও তো একবারও এদিকে তাকাল না। ওর কী ইচ্ছে নেই? হাতের চুড়িটুড়ি খুলে ফেলেছে কাঁকন। সাদার ওপর ফুল ফুল শাড়ি। তৈমুরকে কী এখনও ভালোবাসে ও। তারজন্যই কী এই বিধবা বেশ। সুনন্দাদিরা কী ওকে জোর করেও রঙীন কিছু পরাতে পারেনি। কিংবা ফল্গু মনে করতে পারে না ওরকম হালকা শাড়ি ও চিরকাল পরত কিনা। আগে তো এভাবে কোনোদিন দ্যাখেনি। ওর ফর্সা ঘাড়, পিঠ, ওর নিটোল শরীর, বেণীটা হাঁটার তালে তালে দুলছে। সবই তীব্রভাবে দেখতে লাগল ফল্গু। ওরা কী ফল্গুর সম্পর্কে কথা বলছে। সুনন্দাদি কী কাঁকনের প্রতি ফল্গুর অবজ্ঞা জানাচ্ছে।

বুকের ভেতর, গলার কাছে কী একটা মোচড় দিতে লাগল। এরকম অনুভূতি কখনও হয়নি। কী একটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। এখনও ওদের কাছে দৌড়ে যাওয়া যায়। বলা যায়, তোমরা দাঁড়াও। আমি রিক্সা ডেকে দিই। তখন কী কাঁকন তার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাবে?

কী আশ্চর্য। কাঁকন সম্পর্কে তার এসব মনে হচ্ছে কেন? কাঁকন—ও তো সুনন্দাদির মাসতুতো বোন। চিরকাল তো ওকে কত ছোটো মনে হয়েছে। তৈমুরের সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর কত রাগ করেছে ওর ওপর।

হঠাৎ ফল্গুর মনে হল—কাঁকন, একবার কাঁকন যদি নিজে এসে তার কাছে বলে, তার অমত করার শক্তি হবে না।

বিষ জমি

অনিন্দিতা গোস্বামী

দুটো পঁয়ত্রিশের আপ গেদে লোকাল ঘটাং ঘটাং করে পার হয়ে গেল চূর্ণীর ব্রিজ। দিব দিব দিব দিব করে কেঁপে উঠল মাটি। খুব খানিক মাথা ঝাঁকাল গাছগাছালি। খাবার পাত থেকে উঠে আড় ভাঙল বৃন্দা। আধ খাওয়া ভাতের থালা উঠোনে উপুড় করে গলা তুলে ডাকল - আয় আয় ভুলু আয়। ডাক শুনে লেজ নাড়তে নাড়তে এল ভুলু, ঘেউ ঘেউ করে দুবার আহ্লাদি সম্বোধন সেরে ডাল দিয়ে সপসপে করে মাখা ভাত লক্‌লক্ করে পরম তৃপ্তি ভরে চেটেপুটে খেল। হাত ধুয়ে দরজায় শিকল তুলে মন্থর পায়ে নদীর দিকে এগোল বৃন্দা।

ঘর থেকে সুখেন, থুড়ি ঘড়িটা পিছু ডেকে বলল—'ভর দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা', এ সময় কেউ নদীর পাড়ে যায়? কী হয়ে গেলে? ভূতে ধরে, লোকে মন্দ কথা বলে। বৃন্দা বিড়বিড় করে, ধরে তো ধরে, একা মেয়ে মানুষের ঘরও যা বারও তা, অত টিক টিক করো না তো বাপু সবসময়।

খুব রাগ হল বৃন্দার। না, অত জবাবদিহি সে করতে পারবে না কারোর কাছে। সে কারও খায়ও না পরেও না। চার পাঁচ মাস অন্তর দু ছটাক তেল আর দু-দশ কেজি চালে সারা বছরের খোরাকি চলে না। ইচ্ছে করে টান মেরে ঘড়িটাকে ফেলে দেয় জলে। তার ঘড়ির কী দরকার, সকাল সন্ধে ট্রেনের বাঁশিতেই তো কাজ বাঁধা, ইস্‌টাইল, কায়দা ওসবে আর মন ভরে না বৃন্দার। চেহারা ছবির যা হাল হয়েছে তার আবার ঘড়ি আর খোঁপা।

সুখেন যখন আসে তখন একেকবার একেকটা দামী জিনিস নিয়ে আসে বৃন্দার জন্যে। এবার এনেছে এই ঘড়িটা, আগের বার এনেছিল একটা দামী শাড়ি। বৃন্দা খুশি হয় না, কেন সে কী বাজারি মেয়েছেলে যে সুখেন ক'রাত কাটাতে আসে তার সঙ্গে। বিয়ে করা বৌ, তার ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা নাই, ঝড় বাদলে আগলে রাখা নাই। ছিল এক শাউড়ি, বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গেল মরে। একলা ঘরে কী করে রাত কাটায় বৃন্দা খোঁজ রাখে সুখেন? ঘরের কাছে লোকে কাজ পাচ্ছে না? সমর্থ জোয়ান সুখেনকে কী না কাজ জোটাতে যেতে হল মুম্বাই।

নদীর পাড়ে সার সার কতরকম গাছ, কত বেল, আতা, সবেদা, নিম, তেঁতুল। নিম গাছের ছায়ায় আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে বৃন্দা। নিমের বাতাস ভালো।

এ সময় বাউরি পাড়ায় মজলিসটা মন্দ হয় না। আজ এর ঘরে তো কাল ওর উঠোনে। পাড়ার বউ ঝি-রা পা ছড়িয়ে বসে। কোলে পাতা ছোটো ছোটো কুলো। মোটা মাথা গায়ে গতরে খাটো। ওদের ওই বউ ঝি-গুলোর মুখ হাত চলে সমান তালে। কেন্দু পাতা আর তামাকুর গন্ধে মৌতাত জমে খুব। বিড়ি বাঁধে সব। চল সেই আসরে আমরা একটু কান পাতি।

বৃন্দার পাশের ঘরে থাকে কমলা, আজ আসর বসেছে সেই উঠোনে। কমলা বলল— বিন্‌দাটা কেমন ধারা লো দেখ গিয়ে ঘাট পাড়ে শুয়ে আছে।

—তা আর কী হবে বল। লক্ষ্মী মাসির ঠোঁটে বিদ্রূপের বক্র রেখা ফোটে, গতর পোষার কপাল করে তো আসিনি। সকালে দু'বাড়ি ঠেঙিয়ে আইছি আবার বিকেলে দু'বাড়ি ঠেঙাব। দুকুরে খ্যায়া দ্যায়া দু দণ্ড জিরোবো তারও উপায় নাই, বইসা বইসা বিড়ি বান্দি, এই বয়সেও খ্যাইটা মরি।

কমলা বলল—তুমি খাট মাসি স্বভাবে। তুমার দুইখান পোলা কাম করতাসে, তুমার এত কষ্টের দরকারটা কী—

—হ, তা ত কইবাই, পোলায় কাম কইরা হগ্গল পয়সা বউয়ের পোঙায় ঢালতাসে, আমার হেঁপো বুড়াডার ওযুধের পয়সা জুগইব কেডা?

আর এক বৌ এতক্ষণ চুপচাপ বিড়ি বাঁধছিল। সে দুহাতে মাজা ধরে পিঠ টানটান করতে করতে বলল—পেটের বাড়া সত্তুর আর আছে? দু'জনা মিলা উপায় তো এক্কেবারে কম করি না গো মাসি কিন্তু পাঁচখান প্যাট, মাগ্গিগণ্ডার বাজারে, গরীব মানুষ আর থাকব না দেশে। টিবি হয়াই মরব দেখোনে। হেল্‌থ সেন্টারের দিদিমণিটা বলছিল না বিড়ি বাধলে টিবি হওনের ইস্‌চান্স বেশি।

কমলা বলল—হ, এদেশেই পয়সা নাই। বিন্‌দার বর সুখেন কত পয়সা কামাচ্ছে। বিন্‌দার কাজটাতো ফল্‌স, সারা দিন বইসা বইসা কী করবে তাই দু'বাড়ি কাজ নিছে।

লক্ষ্মী মাসি বলল—অত কইস না, শুনছি সুখেন নাকি বেশি ট্যাকা পয়সা দেয় না, বুম্বাইয়ে উয়ার নাকি আর একডা সোমসার আছে।

কমলা বলে—হুঁ, কী কও মাসি তার ঠিক নাই। কী প্রেরেম ট্টুয়াদের, আমি দেখছি না!

—কী দেখছস?

—কী দেখছি কমু মাসি শুনবা?

এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। বলে—কয়া দে কমলা, লক্ষ্মী মাসির শুনবার শখ খুব।

লক্ষ্মী মাসি কপট রাগে বলে—হ আন্ধার রাতে দরমার ফাঁক দিয়া তুমি দেখবার পাও কেমনে? তুমার চক্ষু দিয়া কী জ্যোতি বাড়ায়?

কমলা আঁচলে মুখ চেপে বলে—সুখেন হ্যারিক্যাল জ্বালায়ে রাখে। অন্ধকার ওর পছন্দ হয় না।

এবার লক্ষ্মীমাসি আরক্ত কষ থেকে দোক্তার রস মুছে নিয়ে বলে—আর মাঝরাতে তুই উঠানে কী করিস ছেমরি? তুর বর কী জ্যোছনা জ্বালায়ে রাখে?

এর মধ্যেই ডাউন কৃষ্ণনগর শেয়ালদার খবর হয়। সবাই কাজ গুটিয়ে উঠে পড়ে। হাওয়াই চপ্পল পায়ে গলিয়ে ছোটে প্লাটফর্মের দিকে। নদী পেরিয়েই শহর, মাত্র একটা স্টেশন। বিকেলের কাজ সেরে সব বাড়ি ফিরবে সাতটায় আপ শান্তিপুরে। বৃন্দাও ওঠে। গজেন্দ্র গমনে ওঠে প্লাটফর্মে। সেও ধরবে ট্রেন।

দুপাশে ঘন সবুজ ধানক্ষেতের ঠিক মাঝখানে খোলা সিঁথির মতো পড়ে রয়েছে নদীটা। ওই দূরে কপালের মতো আকাশ আর কপালের মাঝে বড়ো সিঁদুরের টিপের মতো লাল সূর্য। এ সময় ব্রিজের ওপর থেকে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে ধক করে ওঠে বুক। বৃন্দার মনে হয় চিৎ হয়ে পড়ে আছে যেন কোনো মেয়েমানুষের লাশ। ব্রিজ পেরোনোর সময় ট্রেন হুইশেল দিয়ে জানিয়ে দেবেই সে পেরিয়ে গেল ব্রিজ। এই নাকি রেলের নিয়ম।

ঘুসঘুসে জ্বর ছাড়ে না বৃন্দার। বগলের নীচে, কানের পিছনে ব্যথা, খাওয়ায় রুচি নেই। সুখেন যখন আসে সাতদিনেই সাত মাসের সুখ দিয়ে যেতে চায়। কাজের বাড়ি যেতে দেবে না, ঘর থেকে

বেরোতে দেবে না। খালি সোহাগ আর সোহাগ। কাজের বাড়ির বউদিরা রাগ করে বলে কী করে যে পার বাবা তোমরা, যে স্বামী মাসের পর মাস বাড়ি আসে না, খরচও পাঠায় না, সে এলেই একেবারে গলে যাও। বৃন্দা মনে মনে বলে, কী করব বৌদি, থাকার মধ্যে আছে তো ওই টুকুনই। তোমাদের মতো বাড়ি নাই, ঘর নাই, টিভি নাই, ফ্রিজ নাই। তাই মোটা করে সিদুঁর দিই, বড়ো করে টিপ পরি।

ঝটরপটর ঝটরপটর কী একটা আছড়ানর শব্দ শুনে চোখ খুলল বৃন্দা, দেখল কালুচরণ ঘাটের সিঁড়ির ওপরে কী একটা পিটোচ্ছে খুব আক্রোশে। কালুচরণের ওরকম চোখমুখ আগে কখনও দেখেনি বৃন্দা। বলল—কী হল গো কালুদাদা, কী করছ?

কালুচরণ বলল—এই দেখেই যাও এসে। খুব তো নিশ্চিন্তিতে ঘুমাও এখানে, এদিক পানেই যাচ্ছিল।

আঁচল ঝেড়ে উঠে এল বৃন্দা, দেখল প্রায় দু'হাত লম্বা একটা সাপ মরে পড়ে আছে, মাথার খড়মটা এত স্পষ্ট যে জাত চিনতে ভুল হয় না। দেখল কালুচরণ শুকনো ডালপালা এনে আগুন ধরিয়ে সাপটাকে ছুঁড়ে দিল আগুনে। গা গুলিয়ে উঠল বৃন্দার। ঘাটের সিঁড়িতে বসেই ওয়াক ওয়াক করতে শুরু করল। দু'চারটে ভাত উঠল কী উঠল না দমকে দমকে শুধু জল উঠল। কালুচরণ মনে মনে ভাবল এ বেটির নির্ঘাত পেট হয়েছে। নতুন পোয়াতি, মুখ দিয়ে জল কাটছে শুধু। কালুচরণ নারকোলের মালাই করে খানিক জল তুলে এনে বলল—লে চোখে মুখে খানিক ছিটায়ে লে। দুকুরের বাতাসটা ভালো না। ঘরে ঘুমাবার পারস না?

—গরম লাগে।

—হুক করে পাখা চাললেই পারস। সব্বাই তো চালায়।

—পাখা কুথায় পাব?

—সুখেনকে কইবার পার না। বলে গজগজ করে কালুচরণ। —হ, ভারী সোহাগ করছে, বউডা একা ঘরে মরছে আর উনি মুম্বাই শহরের বাবু হইছেন।

বৃন্দা উঠে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যদি সাপেও কাটত তবে বেঁচে যেত বৃন্দা। মরা খুব শক্ত। কত দিন ভেবেছে জলে ডুব দেয়। রাতের অন্ধকারে রেল লাইনে শুয়ে পড়ে—কিন্তু ওই ভাবাই সার। পা ভারি হয়ে আসে আর এগোয় না। উঃ কী যন্তনা শরীলে। কাজের বাড়ির বউদি সেদিন বলেছে—বৃন্দা তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ— বল জ্বর সারে না। একবার ডাক্তার দেখিয়ে এসো। বৃন্দা। বুঝেছে কাজটা আর থাকবে না। অসুস্থ লোক রেখে কেউই শান্তি পায় না। অজানা ভয় সবাইকে কুরে কুরে খায়। এই বুঝি ছড়াল অসুখ।

ডাক্তার দেখানো যে দরকার সেটা টের পাচ্ছে বৃন্দা। কিন্তু যাচ্ছে না। কদিন হল কাজের বাড়িও যায় নি। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। রাতের দিকে জ্বরটা বেশ বেড়েছে। একা একা হাসপাতাল যেতে ইচ্ছে করে না। অভিমান হয়। আউটডোরের লাইনে স্বামী স্ত্রী বসে থাকে, পোটলা খুলে খাবার খায়, পাখার বাতাস করে এ ওকে। চোখ উপচে জল আসে বৃন্দার।

কমলা বলছিল, বৃন্দা নতুন পেট বাধলেও সময় সময় এরম জ্বর জ্বর হয়। সেরম কিছু না তো রে? মাসে মাসিক হসিল তো? বৃন্দা ঘাড় নাড়ে এমনভাবে যাতে হ্যাঁও বোঝায় নাও বোঝায়। কী বলবে সে কমলাকে। কতদিন হল খড় ধোয়ার মতো ফ্যাকাশে জল নামে তার। সুখেন এলে বলেছিল। সুখেন বলল—রক্ত কম পড়েছে তোর। বেদানা খাবি রোজ একটা করে। নিয়েও এসছিল পাঁচটা বেদানা। বলেছিল এবার তোর ফল খাওয়ার জন্য বেশি করে টাকা পাঠাব। ওই বলাই সার। যাবার সময় হাতে যা টাকা দিয়েছিল তাতে এক মাসের বেশি চলে না। তারপর আজও পাঠায় কালও পাঠায়, সে টাকা আর আসে না। ফোন করলে বলে এই পাঠাচ্ছি, ঠিকমতো মাইনে পত্তর দিচ্ছে না মালিক বুঝলি।

—তা চলে এসো না। কী দরকার ওখানে পড়ে থাকার।

—না রে, এবার আমাকে হোটেলের কুক করে নেবে, তখন মাস মাইনার আর চিন্তা নাই। আরে তখন তো তোকে নিয়ে আসব এখানে, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বৃন্দা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে আর এ জীবনে হয়েছে।

সুখেন সুখী মানুষ। ওই হাড়ভাঙা খাটুনি, রাজমিস্ত্রীর জোগাড় দেওয়া কী রিক্সা গাড়ি টানা সুখেনের কম্ম নয় তা বোঝে বৃন্দা। মুম্বাইয়ের নামকরা হোটেলের বয় সুখেন। যখন কাজ করে সাদা কোট লাল টাই পরে। কী গর্ব হয় বৃন্দার সেই সব ড্রেস কাচতে। এবার হবে কুক, তখন সাদা জামা, মাথায় এইয়া বড়ো সাদা কৌটোর মতো মুটুক।

—কোয়াটার দেবে ওখানে? বৃন্দা জিজ্ঞাসা করে।

—দেবে তো। আর তুই শুধু দেখ আমি কোথা থেকে কোথায় যাই।

ময়ূরপঙ্খীর নাও চূর্ণির ঘাটে এসে বাঁধে ভর দুপুর বেলা। সার সার ডেকচিতে কত খাবার, মাংস, কোপ্তা, কাবাব, সব রেঁধেছে সুখেন। ওই সুদূর মুম্বাই থেকে দরিয়া বেয়ে বেয়ে নাও এসেছে বৃন্দার ঘাটে। নাওয়ের হাল ধরেছে ক্ষেপা কালুচরণ। পাল তার আশমানের পারা। মেঘ জমেছে মাথায়। কতকাল বৃষ্টি নামেনি। উত্তাপ। এত উত্তাপ যেন মাটি জ্বলছে। বেদনার তারসে গোঙায় বৃন্দা—জল জল।

কালুচরণের এই হয়েছে জ্বালা। বউডা মরছিল কোনো বিহান বেলায়। চার চার খান মাইয়া। বিয়া-বাদি দিয়া এখন এট্টু জিরান দিবার লগে মন চায়। পোলা তো নাই যে বইসা খাবে।

চূর্ণির ঘাটে বুড়া মাঝিডা মরছিল মাস চারেক আগে। সেই থ্যাইকা নৌকা পোঙা উল্টাইয়া মুখ থুবাইয়া ছিল মালিকের উঠোনে। তা কালু বলল—মালিক আমি মাঝির বেটা, জাত ব্যাবসা ছাইড়া হাল চষে জেবন কাটাইলাম। এখন শ্যেষ বেলায় নদী আমারে ডাকে, রাতের বেলা নৌকাখান উইঠা যেন আমারে গুঁতায়, কয়, আমারে নিয়া চলো, বাইবা। মাঠের অদ্দুর আর সয় না, যদি অনুমতি দেন গাঙের জলের ঠাণ্ডা বাতাসে বাকি জেবনডা জুড়াই।

তা অনুমতি পেয়েছিল কালুচরণ। রেল ব্রিজের ধার ঘেঁষে এই এতটুকু পায়ে চলার পাটাতন ধরে একদিন যারা এপার ওপার করেছে, সাইকেল, ছেনি, বাটালি, কড়া নিয়ে, তারা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। সকালে ওপারে যায় বিকেলে এপারে। এক টাকায় পারাপার। সবাই খুশ। কালু খুশ, মালিক খুশ, আম জনতা খুশ।

সারা দুপুর প্রায় বসেই কাটে কালুচরণের। নৌকার পাটাতনে বসে কালু বিড়ি ফোঁকে আর নদীর জলের গতি মাপে। আকাশের ছায়া খোঁজে, ঝোপ ঝাড়ে খড়খড় সরসর শব্দ পেলে পাতার ফাঁকে পাখি খোঁজে, ঘাসের আড়ালে সাপ। ইস্টিশন থেকে নতুন কোনো লোক নামলে তার মুখে খোঁজে অভিসন্ধি। তরাসে ঝিমুনি আসে না কালুর, যেন গ্রাম রক্ষার তার বর্তেছে তার ওপরে।

আর এই এক হয়েছে বিন্দা। দিনে দুপুরে নদীর পাড়ে এসে শুয়ে থাকবে। মা মনসার কোপ পড়লে আর রক্ষে আছে। ভারী মায়া লাগে বিটিকে দেখে। আহা কচি বয়স। সোয়ামীটা এমন ফনফনে বৌ ফেলে কী করে যে বিদেশে পড়ে থাকে। টান থাকলে কখনও এমনধারা হয় না। ও তরীর এ ঘাটে টান নাই। কালুচরণ জানে বয়সকালে একা থাকার জ্বালা। কলিজা ছটফটায়, তেষ্টায় ছাতি ফাটে। তবু তো তখন কালুচরণ চার মাইয়ার বাপ। কালুর মায়েই পালছে কালুর চার মাইয়া, বিয়া বাদিও দিছে মায়েই। কালুচরণ আর বিয়ায় বসে নাই। মাইয়াগো মায়ের মতোই আছিল। বেতলতার মতো চিকন শরীর, পাছাপেড়ে শাড়ি, পিঠের ওপর একঢাল চুল। অন্য কোনো ঘাটে আর নাও বাইবার শখ যায় নাই কালুর।

বিন্দার চেহারা ছবিও যেন ছায়াছায়া, ওই আদলটা যেন ... মিল খোঁজে কালু। বিন্দার বয়সেই

না পালাইয়া গেল সে। কে কইল চিলে কান নিয়া গেছে, কানের খোঁজে সেই ঝাঁপ দিল জলে, আর উঠল না। হায়রে, যাত্রায় ফিমেলের গলা জড়াইলে কী পেরেম হয়, তাও বুঝে না হতভাগী।

দুদিন হল বিন্দা নদীর পাড়ে আসে না। কালুচরণ বসে বসে বিড়ি টানে আর ভাবে, দেখতে দেখতে বিটি কেমন শুকাই গেল। জ্বর বাড়ে নাই তো? মাইয়া মানুষ একা থাকে, তার ঘরে কালু যায় কেমনে? বিমলারে জিগাইলে হয়। কোথায় যেন বাধে কালুর। সঙ্কোচে জিভ জড়িয়ে আসে। জলে বিলি কেটে চলে যায় জলঢোরা। ভয়ে শিরশির করে ওঠে কালুর শরীর। অশুভ আশঙ্কায় শুকিয়ে আসে আলজিভ। নৌকা ঘাটে বেঁধে রেখে বৃন্দার ঘরের দিকে পা বাড়াল কালু।

চারটের লোকাল ধরে প্রতিবেশী মেয়ে বৌরা সবাই গেছে কাজে। বৃন্দার ঘরে চাল বাড়ন্ত। এ মাসে ওষুধ কিনতেই চলে গেছে অর্ধেক টাকা। গাদা গাদা ব্যথা কমার আর জ্বর কমার ওষুধ খেয়েছে কদিনে, তাও জ্বর কমেনি। কালু উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে —এ কেমন প্রতিবেশী, ঘরে মানুষ মরলেও খোঁজ নেয় না। পাথরের কলিজা না কী রে।

না অত খারাপ তার প্রতিবেশীরা না। কমলা, লক্ষ্মীমাসি খোঁজখবর সবাই নিয়েছে। কিন্তু কারুরই সময় নেই দাঁড়াবার। সবাই ছুটছে ভাতের সন্ধানে। কালুচরণের ঘর বেশ দূর। দু তিনটে পাড়া পেরিয়ে। কী করে সে এখন। কমলা না ফেরা পর্যন্ত মাথায় জল ঢালল বসে বসে। কমলা ফিরলে বলল—রাতে টুকুন থ্যোকো উয়ার ঘরে। ফোন নম্বর নিয়ে বুথ থেকে ফোন করল সুখেনকে। সুখেন বলল—ছুটি তো নেই এখন, তবে বড়ো ডাক্তারও দেখাও। টাকা পাঠাচ্ছি শিগগিরি।

॥ ২ ॥

গায়ে হালকা র‍্যাপার জড়ান বৃন্দার। ট্রেনের এককোণে পা গুটিয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে। থেকে থেকে অল্প অল্প কাঁপন উঠছে গায়ে। উল্টোদিকে বসে আছে কালুচরণ। কেউ বৃন্দাকে সিটের থেকে পা নামিয়ে বসতে বললে বলছে উয়ার ভারী অসুখ, আমি দাঁইড়ে আছি আমার জায়গায় বসেন। কালুচরণ বৃন্দাকে নিয়ে চলেছে জেলার সবচেয়ে নামী হাসপাতালে। ঘরের কাছে হেলথ সেন্টারে দু একবার গিয়েছে বৃন্দা। জ্বর ছাড়ে না শুনে ডাক্তারবাবু বলেছিল রক্ত পরীক্ষা করতে। আজ তাই সকাল সকাল বেরিয়েছে ওরা। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ফিরবে।

কালুচরণ আর বৃন্দা যাচ্ছে হাসপাতালে। এত কষ্ট এত যন্ত্রণার মধ্যেও ভালো লাগছে বৃন্দার। কেউ তো যাচ্ছে তার সঙ্গে। কেউ তো নিয়ে যাচ্ছে তাকে সঙ্গে করে। সুখেন দু' একবার বই দেখাতে কিম্বা জামাকাপড় কিনতে দুকান বাজারে নিয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অসুখের কথায় বড়ো বিরক্ত হত। বলত দুদিন আসি, এর মধ্যে আবার অসুখ বিসুখ জ্বর ব্যাধির কথা বলে মুডটা খারাপ করিস না তো, জ্বর জ্বর লাগে তো ওষুধ এনে খা, আমি চলে গেলে হাসপাতালে যাস। বাপের বাড়িতে মা আছে, ভাইরা আছে, তারা ভাবে সুখেন অনেক পয়সা কামায়। বৃন্দা মক্ষীচুস। দু পয়সা দেবার লগে ডড়ায় তাই অভাবের ভান করে। অতই যদি অভাব দামি শাড়ি দামি ঘড়ি কই বাইচাতো খায় না কখুনো। বৃন্দাও ভাবে ভাইরা তো একবারও ডাক খোঁজ করে না একা ঘরে দিদি কেমন একলা শুকায়। অভিমানের ফাটল ধরে যেন চূর্ণি নদী বয়। দু ঘাট আর এক হয় না।

অভিমানিনীর চোখে আজ তাই জল। কালুদাদার সঙ্গে তার না আছে রক্তের সম্পর্ক না মনের। শুধু এক ঘাটে নোঙর করে ওরা। শুধু নদীর জলে দুপুর বেলা যে জলা বাতাস তা একসঙ্গে শান্তি দেয় দুজনের চোখেই, দুজনেই নদীর কথা শুনতে পায়, নদীর ডাক শুনতে পায়। ওরা দুজনা চূর্ণির দু-দুটো পাঁজর। সেই কালুদাদা আজ বৃন্দাকে নিয়ে চলেছে আরোগ্য নিকেতনে।

কালু বলল—বিন্দা শশা খাবি? বৃন্দা ঘাড় নাড়ে—না। ঝোলা থেকে জলের বোতল বার করে

ঢকঢক করে জল খেয়ে এগিয়ে দেয় কালুর দিকে। বলে—রক্ত পরীক্ষার আগে না খাওয়াই ভালো। অনেক পরীক্ষায় খাইতে নাই।

রক্ত পরীক্ষার লম্বা লাইন। কালুচরণ মস্ত বড়ো কালো ছাতা ধরে থাকে বৃন্দার মাথায়। বৃন্দা বলে—তোমার মাথায় রোদ লাগে না কালু দাদা? কালু হেসে ফেলে— বিন্দা তুই যেন আমারে নতুন দেখতাছিস? জল ঘাটা শরীল, হালটানা শরীল, এ রোদ গায়ে লাগে? তোর নেহাত শরীলটা নরম পরছে, না হলে কেমন মিঠা বাতাস, রোদ কই? দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে ওঠে কালুচরণ, অফিসের লোকদের বলে— অসুস্থ মানুষ আর দাঁড়ায়ে থাকবার পারে? দেহেন তো বিন্দা দাস আর কত দেরি?

বৃন্দা দাম্পত্যের সুখ মাখে সারা শরীরে। পায়ের আঁচলটুকু এমনভাবে টানে যেন কালুচরণের স্নেহের আড়ালে গুটিগুটি মেরে আশ্রয় নিচ্ছে বৃন্দা। বলে—ব্যস্ত হও কেন কালুদাদা, সময় হলে তো ডাকবেই।

বৃন্দার রক্ত পরীক্ষার নাম 'ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট'। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তারবাবু। থমথমে মুখে কালুচরণের দিকে ফিরে বললেন—পেসেন্ট কে হয় আপনার?

—আজ্ঞে কেউ না।

ডাক্তারের মুখ আরও কুঞ্চিত আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল—মানে এঁর স্বামী কই?

—বিদেশে থাকে।

—এই তুমি চুপ করো তো পেসেন্টকে বলতে দাও। খেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু— কোথায় থাকে এর স্বামী?

এবার বৃন্দা উত্তর দিল—মুম্বাই। ডাক্তারবাবু আমার কী কুনো খারাপ অসুখ করেছে?

—মরণ রোগ দিয়ে গেছে তোমার স্বামী তোমাকে জান।

—আমি জানতাম।

—জানতে?

—জানতাম ওর সোহাগ আমারে সন্তান দিতে পারে না মরণই দিতে পারে। ভয়ংকর সে সোহাগ ডাক্তারবাবু।

—তোমার কী আর কোনো পুরুষ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে? এর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

—জলের।

—মানে?

—ডাক্তারবাবু সুখেনের সোহাগে আমার সারা শরীর জ্বলে। ব্যথা বেদনায় শ্যেষ হয়া যাই। শরীল যেন দড়ি। কালুদাদা আমার এই জ্বালাপোড়া শরীলে জলের ছিটা দেয়, মাথা ধুয়ায়, বুকে করে নিয়া আসে হাসপাতালে।

—ব্যস ওইটুকুনই যেন থাকে। তোমার যে রোগ হয়েছে, তাতে তুমি কোনো পুরুষ সঙ্গ করবে না, রোগ ছড়াবে। তবে কালুচরণ তুমি ওর সেবা করতে পার তাতে কোনো বাধা নাই। আমি ওষুধ দিচ্ছি জ্বর ব্যথা কমবে। বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিও। তবে এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আর ওই স্কাউন্ড্রেলটাকে, ওই যে ওর স্বামীটাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করো, ও আরও অনেকের ক্ষতি করবে। কালুচরণ তুমি এডস্ রোগের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, ডাক্তারি ভাষায় বলে এইচ. আই. ভি. পজিটিভ? সুতরাং সাবধান।

শিউরে ওঠে বৃন্দা, এড্‌স। মুহূর্তে লক্ষ্মীমাসির বাড়িতে টি. ভি.-তে দেখা গোলগাল বুলাদির মুখটা মনে পড়ে যায়। সুরক্ষাভরা যৌনজীবনের জন্য কন্ডোম ব্যবহার করুন। সন্তান চেয়ে

স্বামীকে ভালোবেসেছিল বৃন্দা। তখনও কী সে কন্ডোম ব্যবহার করবে? দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে বৃন্দা। কাঁদতে কাঁদতে বিহ্বল মুখ তুলে বলে— ডাক্তারবাবু আমার স্বামীও কী তবে বাঁচবে না?

ডাক্তারবাবু বলেন—সে এখনই কিছু বলা যায় না, অনেকে কেরিয়ার হয়েও অনেকদিন বাঁচে।

—ডাক্তারবাবু ওর শরীরে এ রোগের জীবাণু এল কী করে?

ডাক্তারবাবু রাগত স্বরে বলল—বম্বে থাকে, বোঝ না অনেক নারীসঙ্গ করেছে সে। বম্বের বেশ্যাপল্লিগুলোতে এ রোগের জীবাণু থিকথিক করছে।

—উঃ মাগো, চুপ করুন ডাক্তারবাবু। এরম কাজ ও করতেই পারে না, আমি বিশ্বাস যাই না।

—এর মধ্যে কী কোথাও রক্ত টক্ত নিয়েছিলে বা ইঞ্জেকশান?

—না।

—তবে কোনো সন্দেহ নেই যে তোমার স্বামী একটি দুশ্চরিত্র লম্পট।

হঠাৎ ফোঁস করে ওঠে বৃন্দা—আমাকে যে ছাইড়া দিতাছেন, আমি যদি দাবানলের মতন এই মারণ রোগ ছড়ায়ে দিই। পুরুষকে বশ করা তো মাইয়া মানুষের তিন তুড়ির কাজ। তার থাইক্যা বিষ দিয়া মাইরা দেন এই নরকের কীটরে।

কালুচরণ নীচু হয়ে মাটি থেকে তুলে চেয়ারে বসায় বৃন্দাকে। ডাক্তারবাবু বলেন— ডাক্তার কখনও রোগীকে প্রাণে মারতে পারে? পাগল। শান্ত হও। বাড়ি যাও। কাউকে তো বলার দরকার নেই তোমার কী রোগ হয়েছে? হেলথ সেন্টার থেকে দিদিমণি গিয়ে তোমার দেখভাল করে আসবে, ওষুধ বিষুধও দিয়ে আসবে।

কালুচরণ বৃন্দাকে পৌঁছে দিল ঘরে। খবর আগুনের চেয়েও দ্রুত ছড়ায়। কীভাবে যেন সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল খবর। বৃন্দার খুব নোংরা অসুখ হয়েছে। ছুলেই সর্বনাশ। হেল্‌থ সেন্টারের দিদি বুঝিয়ে দিয়ে গেল, ছুঁলে কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি খাওয়া দাওয়া করলেও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মৃত্যু ভয় শিক্ষিত সমাজেরও যুক্তি বুদ্ধি গুলিয়ে দেয়, আর এতো অশিক্ষার অন্ধকারে আটকে থাকা বদ্ধ সমাজ।

ক্রমেই বৃন্দার ঘরটা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে উঠল। চারদিকের সেই পরিখা পেরিয়ে নাও বেয়ে একমাত্র কালুচরণ পৌঁছাত সেই দ্বীপে। বাজার করে দিত। দুটো ভাত ফুটিয়ে দিত। ওষুধ দিত। সবাই ধীরে ধীরে কালুচরণকেও ভয় পেতে শুরু করল। কালুচরণের নিঃশ্বাসেও বুঝি বিষ ঢুকে গেছে। গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়, খ্যাপা কালুচরণকে বশ করেছে বৃন্দা।

কালুচরণের মালিক বলল—কালু নৌকো যেমন পোঙা উল্টাইয়া উঠানে থুয়া ছিল অম্বা থাকপে। তুই এরে ছুবার পারবি না। তোর ভয়ে তো কেউ আব নাও পার হয় না, বিরিজ ভাঙে পায়ে। ছিঃ ছিঃ, ওই নুংরা মাইয়াটার সঙ্গে বুড়া কালে তুই একী নুংরামী শুরু করলি ক দেহি। কালুচরণ মাথা নীচু করে রইল। মালিক বলল—হয় তুই ওই মাইয়াডারে সেবা করবি, নয় নাও ধরবি, দুটার একডা।

কালুচরণের চাকরি গেল। কালুচরণ আর নাও ভিড়াল না ঘাটে। কিন্তু খাবে কী দুই জনে। এতকাল কালুচরণের টাকায় বৃন্দার আখায় দুটো ভাত ফুটেছিল, এখন কালুচরণেরও ট্যাক ফাঁকা। কালু বলল—চল বিন্দা তোরে হাসপাতালে ভর্তি কইরা দি। দুটো খাইতে তো পারবি। বিন্দা বলে—অর তুমি কালুদাদা? তুমি বুঝি হাওয়া খাইবা।

আঁধার নামে। বৃন্দার উঠোন বেয়ে হিলহিল করে ঢুকে যায় অন্দরে। বেহুলার কাল ঘুমে চোখ জুড়ায় কালুচরণের। অনাহারে নির্জীব কালুচরণের দুহাতের ভেতর থেকে বৃন্দা কখন যেন ডিঙি মারে জল ছেড়ে। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে কালুচরণ দেখে মাইয়াডা বড়ো আরামে ঘুমুচ্ছে ওর দুহাতের ভেতরে। আদলটা যেন ঠিক—ছায়া মিলায় কালু।

মড়া ছুঁতেও ভয় মানুষের। এ নাকি বিষাক্ত মড়া। স্বামী আসেনি, মা আসেনি, ভাইরা আসেনি। কলঙ্কের ভয়, ব্যাধির ভয়, মৃত্যুর ভয়। মুখাগ্নি করেছে কালুচরণ। সৎকার করেছে কালুচরণ। বুভুক্ষু কালুচরণ বাজারে মুদি দোকানের সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ায়। বড়ো খিদা, এক ঠোঙা মুড়ি। যেন ভূত ঢুকেছে বাজারে। এক ঠোঙা মুড়ি ঝুপ করে হাতের ওপরে ফেলে দেয় দোকানি, বলে—যা কালু ভাগ এখান থেকে, ওই পিশাচীটা তরে শ্যোষ করে দিলে, তুই আর বাঁচবিনি। কালুচরণ ঠোঙা ভরা মুড়ি পথের ওপর উপুড় করে দিয়ে বলে—বল হরি, হরিবোল।

কালুচরণ ঘাটে এসে বসলে পাখি বসে না গাছে, খরখর করে এগিয়ে আসে না খরিস। ভয় পায়, সব্বাই ভয় পায়। আঁজলা ভরে চূর্ণির জল তুলে খায় কালুচরণ। দিনের পর দিন স্রেফ না খেতে পেয়ে মরতে আরম্ভ করে কালু। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসতে থাকে তার প্রাণবায়ু।

সন্ধে আঁধার হলে আপ শান্তিপুর লোকালে শহর থেকে কাজ সেরে ফেরে এলাকার বউ ঝি-রা। অন্ধকারে একা কেউ বিন্দার ঘর পেরোয় না। যদি কাউকে অগত্যা পেরোতেই হয় সে শুনতে পায় অনেক কথা। অলীক সেই অভিজ্ঞতায় ফের জমে ওঠে বাউরি পাড়ার দুপুরের মজলিশ। কেউ বলে—কাল বিন্দা ঘরের মধ্যে কাঁদছিল, আমি পস্ট শুনেছি কেঁদে কেঁদে ডাকছিল—কালুচরণ, কালুচরণ। কেউ বলল—আমিও সেদিন শুনেছি কী যেন উড়ছিল ফরফর ফরফর।

লক্ষ্মীমাসি বলল, আহা পোড়া আত্মাটাগো, আমিও শুনেছি জল জল কইরা এখনো ফরফরায়।

হিস হিস করে ছুটে আসে ট্রেন। সব কথা চাপা পড়ে যায় ট্রেনের শব্দে। পায়ে চপ্পল গলিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটতে ছুটতে কমলা বলে—হুঁ, মরে গিয়া বিন্দা খুব এক্কেবারে মহান হইছে, যখন দামি শাড়ি ঘড়ি পইরা কোমর বাঁকায়া চলত তখন তো কানাকড়িও পুছত না তোমাগো। সেকথা কেউ শুনতে পায় না এই যা। বাতাসে মিলায়; বাতাসে মিলায়—কত কিছু যে বাতাসে মিলায়।

মুদ্রার ভিন্ন পিঠ

দোলনচাঁপা দাস পাল

মরা...মরা...মরা...মরা...

জপ চলছে। অক্লান্ত জপ। বিরাম-বিরতিহীন এ জপের আদি এখন ভুলে যাবার শেষ সোপানে। আদি একটা আছে বৈকি। সব শুরুর যেমন একটা ভূমিকা থাকে, এও তেমনি। সব ঠিকঠাক চলতে হয়তো এ কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হত না। কিন্তু সর্বশক্তিমান, সর্বচালিকাশক্তির অভিপ্রায় বোধহয় ভিন্নই ছিল। তাই এতদিনের পেশা বদল করে এই জপ-তপ। এই সাধনা, এই অনন্ত তপস্যা, বড়ো কঠিন এই পথ। চলতে চলতে প্রতিটি পদক্ষেপে শুধুই হোঁচট। কিছুতেই মনস্থির হয় না। প্রিয়জন, প্রিয়জনেরা মিছিল হয়ে ঘুরে ঘুরে আসে যায়। ফিরে তাকায়, বোধহয় কিছু বলতেও চায়। কী বলতে চায় ওরা? কী? ওরা কী বলতে চায়—"রত্নাকর ফিরে এসো। ফিরে এসো রত্নাকর। তুমি ছাড়া আমরা নিতান্তই দুর্বল ও অসহায়। তুমিই ছিলে আমাদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের একমাত্র উপায়। সবল ও দুর্জয় উপায়। ফিরে এসো রত্নাকর! ফিরে এসো!"

উফ্! বড়ো অসহ্য এ যন্ত্রণা। এ আত্মদহন। যাদের জন্য এ জীবনের প্রতিটি অণু পল, অণু মুহূর্ত, এ দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকা, প্রতিটি লোমকূপ নিবেদিত ছিল, উৎসর্গীকৃত ছিল—তারাই পারল জীবনের কঠিনতম এবং দুর্বলতম মুহূর্তে তার থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে? কী করে পারল? কী করে এটা সম্ভব হল? তবে কী সে কোনোকালেই কোনোদিনই ওদের কেউ ছিল না? কোনো আত্মিক সম্পর্কই কী প্রকৃতপক্ষে গড়ে ওঠে নি। স্ত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। সে অন্য ঘরের, অন্য রক্তের অন্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেয়ে। তাই বলে নিজের মাতা-পিতা...!!!

এঁদেরই তো রক্ত-বীর্যে রত্নাকরের ভ্রূণ-প্রাণের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি যখন এতদিন পর নিজের কুকর্মের যৎসামান্য দায়বদ্ধতা এঁদের ওপর ন্যাস্ত করতে চাইল—সৃষ্টিকর্তারা সরে এলেন। কক্ষচ্যুত হলেন ওরা। আপন আত্মজকে কেন্দ্র করে ওঁদের অভিবর্তন থেমে গেল। ওরা গুটিয়ে নিলেন নিজেদেরকে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—"না, রত্নাকর, এ হয় না। তোমার কুকর্মের ভার তোমাকেই নিতে হবে। তোমার কু অথবা সু কোনো কর্মের অংশীদার আমরা নই।" ধাক্কা খেল রত্নাকর। প্রচণ্ড ধাক্কা। পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। প্রবোধ দিল নিজেকে। মাতা-পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়সের ভারে কিছুটা মতিভ্রম হলেও হতে পারে। যদিও আজ অবধি মতিভ্রমের সামান্যতম আভাস ও মাতা-পিতার কোনো কাজে কর্মে প্রতিভাত হয় নি, তথাপি নিজেকে সান্ত্বনা দেয় রত্নাকর—"মা বাবা বুড়ো হয়েছেন, কী বলতে কী বলেছেন। আমি নিজেও বা ওনাদের বয়সে গিয়ে কী করব ঠিকানা নেই...।" একটু হাসে রত্নাকর। ফাঁকা হাসি কী? এই হাসির আড়ালে কিছু লুকোবার অভিপ্রায় আছে কী? আর কিছু না হোক—অন্তত পক্ষে নিজেকে নিজের থেকে লুকোনো? রত্নাকর এবার ধীর পদে নিজ কক্ষে অভিমুখে অগ্রসর হয়। নিশ্চিন্তরূপে সে জানে

তার প্রিয়া এখন কক্ষেই থাকবে। সত্যিই তাই। রত্নাকরের এ ধারণা নির্ভুল, অভ্রান্ত। রত্নাকর-ভার্যা সেইক্ষণে আপন কক্ষে নিজ পরিচর্যা ও প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল। অসময়ে রত্নাকরের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে প্রিয়ার গভীর ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল। 'হায়রে অকুতোভয় নির্ভীক পুরুষ! কেন তোমার বারবার এই ফিরে ফিরে আসা সেটা বুঝতে কী আমার আর বাকি আছে? তথাপি আমাকে অজানার ভাণ করতে হবে। এই ভাণটুকু জরুরি। কোনো সময় হয়তো বা ভীষণভাবেই জরুরি। নইলে এই আকর্ষণ বিকর্ষণে পরিণত হতে বেশি সময় নেবে না।' কামিনী-ভার্যা ঘনিষ্ঠ হয় রত্নাকরের। রত্নাকরের সবল পেশীবহুল বহুডোরে নিজেকে হারাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিদ্ধা করতে থাকে রত্নাকরের উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশ নিজ আরক্ত নখরে। কিছুটা সুস্থির বোধ করে রত্নাকর। আ!! এই সেই নারী যার সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য উন্মুক্ত কৃপাণের সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না সে। এই রমণী যেমন তার একান্ত নিজস্ব তেমনি সেও তো একান্ত নিজস্ব পুরুষ এই রমণীর। পারস্পরিক মানসিক ও শারীরিক মিলনে যে রসায়ন দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার অমোঘ আকর্ষণ কী নারীর পক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব? তীব্র আশ্লেষে স্ত্রীকে বক্ষে জড়ায় রত্নাকর। যেন এ তার শেষ আশ্রয়স্থল। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে প্রশ্ন— 'প্রিয়তমা, তুমি কী আমার দস্যুবৃত্তির দায়ভার আমার সঙ্গে, আমার জন্য গ্রহণ করবে? খানিকটা হলেও হবে, তুমি দায়ভার নেবে তো?''

প্রশ্ন শেষ করে শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করে রত্নাকর। একটা 'হ্যাঁ' শোনার অপেক্ষায় পাথর ঠেলে পাহাড়ে তোলবার জন্যও প্রস্তুত। কিন্তু একি!! প্রিয়তমার বাহুডোর কেন শিথিল হচ্ছে?

চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। জোর করে বন্ধ করে রাখে চোখজোড়া। প্রিয়ার এই নিষ্ঠুর উত্তর সে শুনতে পারবে না। হা, ঈশ্বর! যদি এই মুহূর্তে সে অন্ধ এবং বধির হয়ে যেতে পারত!

কিন্তু ঈশ্বর নির্বিকার। এমন জাগতিক মায়া রচনা এবং মায়া মোচন দুইই তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে পালিত হচ্ছে। সুতরাং তিনি অবিচল। কিন্তু রত্নাকর তো মানুষ। জাগতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় সে সততই গভীর ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ঈশ্বর রত্নাকরের প্রতি আপাত দৃষ্টিতে বিশেষভাবে স্নেহময় এবং যত্নবান হলেন না। ফলস্বরূপ স্ত্রীর নেতিবাচক উত্তরে রত্নাকর খানিক সময় বেসামাল এবং টলোমলো হলেও নিজস্ব ভবিষ্যপন্থা সে দ্রুত স্থির করে এবং অসুর রত্নাকরের জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে রাম নাম জপের অভিপ্রায়ে সুদুর হিমালয়ের চূড়ায় বসে তপস্যা শুরু করে। তপস্যা শুরু হয়। কিন্তু পাপের ভার এতটাই ভারি যে দস্যু রত্নাকরের মুখ থেকে রাম নাম বেরোয় না। কিন্তু নির্মোহ রত্নাকর এবার ব্রহ্মসত্য জানায় অবিচল। তাই জপ চলতে থাকে। রাম নয়, মরা। তাই-ই সই। কুছ পরোয়া নেহি...

ধ্যাত্তেরি! আজ সকাল থেকেই নেটওয়ার্ক বিজি! যতবারই ট্রাই করছে জনা ততবারই নেটওয়ার্ক বিজি। এর চাইতে বাবা সেই আদিকালের বি. এস. এন. এল-ভালো। মোটামুটি নেই মামার চাইতে কানা মামা তো ভালো! মুখ গোমড়া করে খানিকটা চুপচাপ বসে রইল জনা। আর বিজনও কি রকম ছেলে বটে! যখন দেখছে এতটা বেলা অব্দি এদিক থেকে কোনো সাড়া নেই তখন একবার খোঁজ নিলে এমন কী আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! থাক্, আজকে আর জনা ফোন করবে না। কিছুতেই না। মনে মনে সিদ্ধান্তে এল জনা এবং এ সিদ্ধান্ত নিতে পারায় মনে মনে খুশিই হল সে। ধীরে ধীরে নিজের বেডরুমে এসে ওয়ার্ডরোব খুলে আকাশের জামা কাপড়গুলো সুটকেসে ভরতে থাকল। বড্ড ভালোবাসে আকাশ ওকে। আর জনা? জনাও কী তাই? নিশ্চয়ই জনাও আকাশকে একশ শতাংশ ভালোবাসে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের কাছে আকাশের মঙ্গল প্রার্থনাই করে জনা। আকাশ ছাড়া জনা অসম্পূর্ণ এ সত্য জনা হাড়ে হাড়ে টের পায় যখন আকাশ অফিসের কাজে বাইরে যায়। একদম ভালো লাগে না তখন জনার। সারাটাক্ষণই কি নেই, কী যেন

নেই ভাব। রবিবার দুপুরে খেয়ে উঠেই আকাশের দোকানে যাওয়া এবং পরমুহূর্তেই শুধু জনা ভালোবাসে বলেই মিষ্টি নিয়ে আসা—এরকম অসংখ্য ছোটোখাটো অথচ সূক্ষ্ম ভালোলাগার রং-ছবিকে হারাবার আশঙ্কাতেই যেন আকাশের জামা কাপড়গুলো শক্ত হাতে ধরে রইল সে। একটু মন খারাপ লাগল জনার। কেন আকাশ ওকে বুঝতে পারল না? বিজনের সঙ্গে দু'মাসের আখ্যাহীন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই কী এত সহজে আকাশ ওকে অবিশ্বাস করতে পারল?

আখ্যাহীন সম্পর্কই তো বটে এটা। শুধু কথার চাতুরী দিয়ে এবং কথার খেলা দিয়ে কী সত্যিকারের গভীর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে? আকাশ যুক্তি দেখিয়েছিল—'কেন পেন ফ্রেন্ডশিপ তো এভাবেই গড়ে ওঠে?'

'ঠিক কথা, কিন্তু তুমিই বলো কটা পেনফ্রেন্ডশিপ জীবনের শেষ বেলা অব্দি গড়ায়? যুক্তি দেখিয়েছিল জনাও। অনেক বুঝিয়েছে জনা আকাশকে। কিন্তু আকাশ নিজেব জায়গা থেকে সরে আসেনি। হ্যাঁ, জনা স্বীকার করে—যে সম্পর্ক জনা আর বিজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, তা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, আকাশের কাছ থেকে লুকিয়ে সে ভালো করেনি। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন যখন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক খোলামেলা আচরণ এবং বিশ্বাসের ওপরই ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তথাপি কেন জানি জনার মনে হয় প্রতিটি সম্পর্কিত অবস্থানের পরও মানুষ কোথায় যেন ভীষণভাবেই একা এবং একক শূন্যস্থানটি তখনই পূর্ণ হয় যখন অবস্থান রহিত আরও কোনো একা মানুষের সেখানে প্রবেশ ঘটে। নিজের কাছেই ঠিক স্পষ্ট নয় তথাপি জনার কেন জানি মনে হয় এ সমস্ত নাম-গোত্রহীন সম্পর্কগুলো জীবনের মধ্যে কোনোভাবেই স্থান পায় না। জীবনের পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে এসব শিকড়হীন সম্পর্কগুলো কোথাও হারিয়ে যায়। মন খারাপ হয় বটে। তবে সেই মনখারাপের সঙ্গে আকাশের অভিমান হলে পরে যে মন খারাপ হয়—তার কী কোনো তুলনা হয়! না সেই তুলনা যুক্তিসঙ্গত? নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠিক থাকলেও আকাশকে কনভিন্স্ করাতে পারে নি জনা। আর এজনাই বিজনের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলাটা ভীষণ জরুরি জনার। না আকাশকে কষ্ট দিয়ে বিজনের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না জনা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনা আবার বাটন প্রেস করে এবং ভগবানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতো এবার বিজনকে পেয়েও যায়। বিজনকে নিজের অভিমত জানিয়ে দিয়ে বেশ হালকা বোধ করে জনা। বিজনও বেশ সহজভাবে নিয়েছে পুরো ব্যাপারটা। আর নেবে নাই বা কেন? ভাবে জনা। দুতরফ থেকেই এ শ্যাওলা সম্পর্কের একদিন ইতি হত, আজ নয় তো কাল। আকাশকে ভীষণ ভালোবাসে জনা। ভীষণ। জনার ভালোবাসার মধ্যে কোনোকালেই কোনোদিনই কোনো খাদ ছিল না, আজও নেই। জনা ঠিক বিশ্বাস করে নিজের ভালোবাসার জোরেই সে আবার আকাশকে আগের মতো ফিরে পাবে। তপস্যা চালায় জনাও। আকাশকে আবার নিজের মতো করে ফিরে পাবার আশায় নিজের সাধ-আহ্লাদকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে বারবার আকাশের কাছে ফিরে ফিরে আসে জনা। নিজের শরীর মন দিয়ে উষ্ণ ভালোবাসার প্রমাণ দেয়। নিজের পৃথিবীকে আকাশের কক্ষপথে ঘুরিয়েই এখন জনার সত্যিকারের আনন্দ। সত্যিকারের খুশি। নিজেকে পৃথিবীর বাকি সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে জনা নিজেকে সূর্যমুখী করে তোলে এবং এতে সে পরিতৃপ্ত বোধ করে। কিন্তু তারপরেও কোথাও যেন সুর কেটে যায়। সবসময় তালে তাল মেলে না। না বলতে চেয়েও সঙ্গমের চূড়ান্ত মুহূর্তে আকাশ প্রশ্ন করে—'আমাকেই আদর করছ তো জনা?' শীৎকারের পরিবর্তে মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ বের হয় জনার। আর কত? আর কত পরীক্ষা দিতে হবে? দুদিনের সেই সম্পর্ককে আজ—আজ কুড়ি বছর পরও মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে নি আকাশ। তাহলে কী জনার ভালোবাসায় কোনো খামতি রয়ে গেল? তপস্যা আরও কঠিন করে জনা। আরও অনেক পথ যেতে হবে জানে জনা। নিজের ভুলের দায়ভার স্বীকার করে জনার সাধনা চলতে থাকে। চলতে থাকে তপস্যায় হৃদ ভালোবাসা পুনরুদ্ধারের আশায়।

তখন সবে মাত্র উষা। ঘুম ভেঙে পাখিদের কিচির মিচির পৃথিবীকে নূতন দিনের বার্তা শোনাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে সূর্যের প্রথম কিরণ প্রতিভাত হয়ে বিশ্ব চরাচরকে করে তুলেছে রক্তিম। কত বছর কেটে গেছে তার হিসেব কেউ রাখে নি। শুধু সাধু-সন্ত যাঁরা রত্নাকরকে পাশে রেখে এগিয়ে গেছেন অথবা ফিরে এসেছেন ওঁদের মুখে মুখে ফিরত রত্নাকরের হাড়ে নাকি দুর্বা গজিয়ে গেছে। সেই যাই হোক্, মোদ্দা কথা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা রত্নাকরের এহেন তপস্যায় খুশি হয়ে প্রাণীহত্যার মতো সর্বাধিক নৃশংস, কঠোর এবং ঘৃণ্য কৃতকর্মের দায়ভার মুকুব করেছেন এবং এক্ষণে সেই মুহূর্ত আগত, ব্রহ্মাণ্ডের অণুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেই মুহূর্তকে স্বাগত জানাবার জন্য বরমাল্য নিয়ে প্রস্তুত, যখন রত্নাকর বাল্মিকীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, যখন মরা নাম রাম নামে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ইনডিড্ এ গ্রেট মেটামরফোসিস!

পুরুষ প্রাণ দিয়ে মহান কর্ম সম্পাদিত করবার জন্য সর্বশক্তিমান, সর্বমহান বিধাতারও তাহলে এই ছলনাটুকুর প্রয়োজন ছিল? সত্যি বড়ো বিচিত্র এই বিশ্ব চরাচর!

না, আমাদের এই গল্পের অতি নগণ্য নারী চরিত্র জনার কিন্তু কোনো রূপান্তর হয়নি। জনার অবস্থারও কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। জনা আজও আকাশের কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছে এবং আজও আকাশ-অবসরমতো ভালোবাসিবার কর্তব্যটুকুই করে যাচ্ছে। না কম, না বেশি। বড়ো মাপা মাপা। জনা নিজের এই অবস্থাই এখন মেনে নিয়েছে কেননা জনা রত্নাকর নয়। স্ত্রী-পুত্র, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সহায় সম্বলহীন করে রত্নাকর যেভাবে শুধু নিজের কথা চিন্তা করে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের কোলে বসে নিশ্চিন্তে ধ্যান করতে পেরেছেন, আমাদের জনার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সংসারে থেকেই অতি সামান্য, ক্ষণিকের ভুলের জন্য জনাদের প্রায়শ্চিত্য করে যেতে হয়। তবু জানারা জনাই থেকে যায়। অহল্যা হয় না। রামায়ণ রচিত হয়, সীতায়ণ রচিত হয় না, দেবী হয়, সতী হয়, ডাইনী হয়, মানবী কিন্তু হয় না।

পাশ ফিরে এবার চোখ বন্ধ করল জনা।

'ঘুমিয়ে পড়েছে?'

—'উঁহু'

—এদিকে এসো'—যন্ত্রমানবীর মতো জনা আকাশের দিকে এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে জনাকে অনাবৃত করে আকাশ। খেলা শুরু হয়। এ খেলায় জনা নিতান্তই এক শরিক। কখনো কখনো জনার মনে হয় এরকম সময় আকাশের শুধু একজন মেয়েমানুষ হলেই চলে। সে রামী, শ্যামী অথবা যে কেউ। আকাশ আগেও এরকম ছিল। কিন্তু সেটা ছিল তার প্রবৃত্তি-জাত। কিন্তু জনা এখন বুঝতে পারে আকাশ আজকাল তাকে যেভাবে ব্যবহার করে (হ্যাঁ, সেটা শুদ্ধ ব্যবহারই বটে) সেটা তার ইচ্ছাকৃত। সব জেনে শুনেও জনা চুপ থাকে। কখনও প্রতিবাদ করে না, যন্ত্রণায় কাতর হয়েও নিষ্পেশিত হতে থাকে। দুহাতে আকাশের পিঠকে বেড় দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়ে আকাশের আঘাতকে ধারণ করে। আশা করে হয়তো এসব আঘাতের কোনোক্ষণে আকাশের বন্ধ দৃষ্টি খুলবে। হৃদয় দিয়ে জনাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। হায় রে! ব্যর্থ আশা! সেসব কোনোদিনই কিছু হয় না। ক্লান্ত আকাশ কিছুক্ষণ পরেই জনাকে ছেড়ে দেয়। জনা হয়তো তখনও আকাশকে চাইছে। তবুও সে আকাশের কাছে মুখ ফুটে নিজের কথা বলে না। আকাশের তৃপ্তিতেই নিজেকে তৃপ্ত করে এবং ছিন্ন হৃদয় মন দিয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহকে টেনে হেঁচড়ে ফেরে। জনা ক্রমশই পশ্চিমমুখো হয়।

আজ বহুদিন, বহু বছর অতিক্রান্ত। রত্নাকর আজও সযত্নে আমাদের চিন্তনে, মননে সমাদৃত। আর জনা? বলবেন না আর সে কথা। সে কলঙ্কিনী আজও গায়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে। পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে যেতেও নিজেকে প্রমাণ করে যাচ্ছে...

তৃতীয় অধ্যায়

জয়িতা চাকলাদার

কোর্টে যাবার জন্য ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে বেরোতেই অনিন্দ্য দেখতে পেল, দরজার ঠিক বাইরেই মেঝের উপর একটা খাম পড়ে রয়েছে। খামটা তুলে নিয়ে দেখল, তাতে মনীষার নাম লেখা। সে গলা তুলে ডাকতে লাগল।

—মণি, মণি এই দেখো তোমার নামে কী একটা চিঠি এসেছে।

রান্নাঘর থেকে মনীষা সাড়া দিল, 'আমার নামে আবার কী এল? কে পাঠিয়েছে?'

—তার আমি কী জানি? নাম লেখা নেই। তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যাও। আমার কোর্টের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—আমি এখন যেতে পারছি না। আমার হাত জোড়া। মাছ ধুচ্ছি।

—তাহলে আমি এটাকে সোফার উপর রেখে দিলাম।

—হ্যাঁ, তাই দাও। আমি পরে দেখে নেব।

চিঠিটা ছুড়ে সোফার উপর রেখে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে ঘাড় ঘোরাতেই তার চেখে পড়ল দেওয়ালে লাগানো তার নেমপ্লেটটা—অনিন্দ্য ব্যানার্জি, অ্যাডভোকেট। অনিন্দ্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

তিনতলার ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মনীষা দেখল, অনিন্দ্য গাড়ির জানালা দিয়ে উপরের দিকেই তাকিয়ে আছে। ড্রাইভার রতন গাড়ি স্টার্ট দিতেই মনীষা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে হাত নাড়ল। গাড়িটা চলে যাবার পর মনীষা বাকি রান্নাটুকু খুব চটপট শেষ করে নিল। তারপর আরও কিছু টুকটাক কাজ সেরে সে স্নানে গেল। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরোতেই শুনতে পেল কলিংবেলের আওয়াজ। বুঝল যে কাজের মেয়ে শেফালি এসেছে। তাড়াতাড়ি হাউসকোটটা গায়ে জড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল।

তার চোখে পড়ল সোফার এক কোণে পড়ে থাকা সাদা খামটা। আরেঃ, কাজ করতে করতে সে ভুলেই গিয়েছিল এটার কথা। সে খামটা তুলে উল্টেপাল্টে দেখল, কিন্তু কে পাঠিয়েছে তা বুঝতে পারল না। খামটা খুলে অবাক হয়ে গেল মনীষা। দেখল, খামের ভিতর কিছু পুরনো খবরের কাগজের কাটিংয়ের ফোটোকপি। এসব আবার কী? ফোটোকপিগুলো ভালো করে দেখতেই আতঙ্কে গা হিম হয়ে গেল মনীষার। দেখল প্রায় কুড়ি বছর আগে তার জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই সম্পর্কিত একটি ঘটনারই নিউজ পেপার রিপোর্টের ফটোকপি ওগুলো। তা-ও আবার একটা নিউজ পেপার নয়, তিন- তিনটে নিউজ পেপারের। কিচ্ছু ভাবতে পারছিল না মনীষা। চিন্তাভাবনা কররার সব শক্তি যেন তার পোল পেয়ে গিয়েছিল। মাথার ভিতরটা মনে হচ্ছিল একদম ফাঁকা।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সে সংবিৎ ফিরে পেল। ফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই সে

শুনতে পেল বাবুয়ার গলার আওয়াজ। মনীষা কোনোমতে দু চারটে কথা বলে তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিল।

বাবুয়া বোধহয় একটু অবাকই হল কারণ সাধারণত যখন বাবুয়ার সঙ্গে ফোনে কথা হয় তখন বাবুয়াই ফোন রাখতে চায় মনীষা কথা বলেই চলে। ছেলের সঙ্গে অল্প কথায় তার যেন আশ মেটে না। আর আজ সে নিজে থেকে ফোনটা রেখে দিল। আসলে নিউজ পেপারের ওই কাটিংগুলো দেখার পর থেকেই তার মনটা খুব অস্থির অস্থির করছে, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল নাযে, কে তাকে এগুলো পাঠাতে পারে। কারণ ওই ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন যে কজন মানুষ ব্যাপারটা জেনেছিল তাদের কারওর সঙ্গেই মনীষার বহুকাল কোনো যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ ছিল একমাত্র তার নিঃসন্তান মামা আর মামির সঙ্গে যাঁরা বাল্যকালে মা-বাবার মৃত্যুর পর তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। লেখাপড়া থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত সব দায়িত্বই তাঁরা দুজন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। কখনও এক মুহূর্তের জন্যও মনীষার মনে হয়নি যে, সে তাদের নিজেদের সন্তান নয়। যদিও তার মামা বা মামি কেউই আজ আর বেঁচে নেই। ফলে মনীষার জীবনে বাপেরবাড়ির চ্যাপ্টার পুরোপুরি ক্লোজড। পুরনো পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব কারও সঙ্গেই তার কোনো যোগাযোগ নেই। তার থেকেও বড়ো কথা হল এই যে, সে নিজে ছাড়া খুব একটা কেউ জানতই না যে ওই ঘটনাটার সঙ্গে সে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তাহলে কে এই কাজ করতে পারে? তবে এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যে-ব্যক্তি তার কাছে ওই কাটিংগুলো পাঠিয়েছে সে নিশ্চয়ই জানে যে ওই ঘটনার সঙ্গে মনীষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। কিন্তু কী করে জানল? আর এত বছর বাদে ওই পেপার কাটিংগুলোর ফেটোকপি তার কাছে পাঠালই বা কেন? কী উদ্দেশ্য আছে তার?

ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন মনীষার উনিশ বছর বয়স। সবে বাংলা অনার্স নিয়ে বি.এ. ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছে। সে মফস্‌সলের মেয়ে, ফলে সেখানে ভালো কলেজ না থাকায় প্রতিদিন ট্রেনে করে তাকে দুই-দুই চার ঘণ্টা যাতায়াত করতে হত শুধু ভালো কলেজে পড়ার জন্য। তার কলেজের বন্ধু বান্ধবীরা বেশির ভাগই থাকত শহরে, কলেজের থেকে কাছাকাছি দূরত্বে। একমাত্র আশিস আর বাদল থাকত তার মামারবাড়ির কাছাকাছি। কাছাকাছি বলতে দুচারটে স্টেশন এদিক-ওদিক। ফলে প্রতিদিনই তারা তিনজন কলেজ থেকে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরত। ধীরে ধীরে তাদের তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হচ্ছিল। তবে যত দিন যাচ্ছিল, মনীষা ক্রমশ অনুভব করতে পারছিল যে, বাদলের প্রতি তার একটা দুর্বলতা জন্ম নিচ্ছে। সে বুঝতে পারত যে, বাদলের দিক থেকেও অনুভূতিটা একই রকম। একদিন যখন অসুস্থতার কারণে আশিস কলেজে আসেনি, বাড়ি ফেরার সময় বাদল তাকে প্রোপোজ করে। সেও সম্মতি জানাতে সময় নেয়নি। তারা দুজনে মিলে ঠিক করে যে, তারা আশিসকে এক্ষুনি কিছু জানাবে না। পরে একসময় ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বসে আশিসকে সব বলবে। সেদিনের পর থেকে আশিস প্রায় মাসখানেক কলেজে আসেনি। ওরা বন্ধুরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, আশিসের জন্ডিস হয়েছে। প্রায় এক মাস পর যখন আশিস কলেজে এল, ততদিনে তার আর বাদলের সম্পর্কটা আরও গভীর হয়েছে। অন্যান্য বন্ধুরাও ওদের দুজনের ব্যাপারটা আঁচ করতে শুরু করেছিল। আশিস বোধহয় অন্য কোনো বন্ধুর থেকে ব্যাপারটার একটা আভাস পেয়েছিল, একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাদলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আশিস তাকে বলল, 'আজ তো বাদল আসেনি, আমারও এখন অন্য কোনো কাজ নেই। চল, তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।'

মনীষা সরল মনেই বলেছিল, 'ঠিক আছে, চল।'

স্টেশন থেকে নেমে মনীষার বাড়ি পৌঁছতে প্রায় মিনিট পনেরো হেঁটে যেতে হত। তাদের

বাড়িতে পৌঁছনোর খানিক আগে আশিস বলল, 'আচ্ছা মনীষা, যদি কিছু মনে না করিস, তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'

—ওমা, মনে করার কী আছে? বল না কী বলবি?

—না মানে, তোরা, তুই আর বাদল কী পরস্পরকে ভালোবাসিস?

—দেখ আশিস, যদিও এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমি তোকে বলতে বাধ্য নই, কিন্তু তাও যেহেতু তোকে আমার খুব ভালো বন্ধু বলে মনে করি তাই বলছি। হ্যাঁ, আমি আর বাদল, আমরা দুজনই দুজনকে ভীষণ ভালোবাসি।

--তুই কি নিশ্চিত যে বাদল তোকে সত্যিই ভালোবাসে?

—হ্যাঁ, আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত।

—আমার কিন্তু মনে হয় বাদল তোকে ঠকাচ্ছে। এখনও সময় আছে। বি কেয়ারফুল।

—দেখ আশিস—তোকে আমি আমার খুব ভালো বন্ধু মনে করি ঠিকই কিন্তু নিজের অধিকার ভুলে যাস না। বাদল সম্পর্কে তোর কাছ থেকে কোনো বাজে কথা আমি শুনতে চাই না।

—আমাকে ভালো বন্ধু বলে মনে করিস বলেই কিন্তু আমি তোকে কথাগুলো বলছি। না হলে বলতাম না। তুই জানিস না, বাদলের চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। পড়াশুনোয় ভালো বলে ওর বেশ একটা গুডবয়-গুডবয় ইমেজ আছে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে ও বিভিন্ন মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে। তোকেও তাই করেছে।

ঠাস করে আশিসের গালে মনীষা একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে তোর স্পর্ধা সহ্য করছি। আমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলার চেষ্টা করবি না।'

কোনো প্রতিবাদ করেনি আশিস। শুধু বলেছিল, 'আজ তুই ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে আছিস তাই আমার কথায় তোর বিশ্বাস হচ্ছে না। বাদল যেদিন তোকে ব্যবহার করে তারপর ছুড়ে ফেলে দেবে তখন হয়তো আমার কথাগুলো তোর বিশ্বাস হবে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তবে এটা জেনে রাখ যে, তোর চরম বিপদের দিনেও কিন্তু তুই আমাকে তোর পাশে পাবি, সে তুই আমাকে অপমান কর আর যাই কর।'

—তোর কথা আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আর তোর কী দরকার আমাকে সাবধান করার? তুই কি সব মেয়েদের বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিস?

—সব মেয়ে আর তুই আমার কাছে সমান নয়।

—ওহ্। তা আলাদাটা কীসে শুনি!

—কারণ, আমি... আমি তোকে ভালোবাসি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সেটা আমি সঠিক সময়ে প্রকাশ করে উঠতে পারিনি।

—ওঃ, তাই বল! এটাই তাহলে আসল কারণ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তুই বাদলের বদনাম রটাচ্ছিস। তুই কী ভেবেছিস, ওর নামে আমার কাছে বদনাম করলেই আমি ওকে ছেড়ে তোর কাছে চলে আসব?

—তুই আমাকে ভুল বুঝছিস মনীষা। আমি তোর ভালোর জন্যই কিন্তু কথাগুলো তোকে বললাম, তুই বাদলকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবি বলে নয়। তুই আমাকে না-ই ভালোবাসতে পারিস কিন্তু আমি তো তোকে পাগলের মতো ভালোবাসি। সেটাই আমার কাছে যথেষ্ট।

—আমি অনেকক্ষণ ধরে তোর পাগলের প্রলাপ শুনেছি, আর নয়। আমি আসছি।

এই বলে মনীষা তার বাড়ির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। একটু পরে পিছন ফিরে দেখল, আশিস তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মনীষার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। সে ভাবল, আশিসকে সে অত্যন্ত নিরীহ, ভালো ছেলে বলেই জানত কিন্তু আশিস যে ওকে পাবার

জন্য বাদলের নামে এরকম বদনাম রটাতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ভাবল, কাল যদি বাদল কলেজে আসে, কালই ঠিক সুযোগ করে আশিসের চোখ এড়িয়ে বাদলের সঙ্গে একা বাড়ি ফিরবে আর তখনই ঘটনাটা বাদলকে জানাবে। বাদলের কাছে আশিসের ভালো মানুষীর মুখোশটা খুলে দেওয়া দরকার।

পরদিন আশিস কলেজে এল না ফলে মনীষার পক্ষে সুবিধা হল। ও চাইছিল বাদলের সঙ্গে একা কিছুক্ষণ থাকতে, যাতে এই কথাগুলো তাকে জানাতে পারে। কলেজ শেষের পর বাদলকে সে বলল, 'এখন কী তোর কোনো কাজ আছে?'

—টিউশন আছে। কেন বল তো?

—না, তোর সঙ্গে কিছু কথা ছিল। কিন্তু তোর তো আবার টিউশন আছে বলছিস।

—ট্রেনে করে যখন বাড়ি ফিরব তখন বলিস। আমার টিউশনটা তো তার পরে।

—না, ট্রেনে বলা যাবে না। আমি চাই না ট্রেনে পাশের লোকগুলো আমাদের ব্যক্তিগত কথা শুনুক।

—ও বাব্বা, কী এমন কথা?

—আছে, আছে।

—তা তুই কথাটা কোথায় গিয়ে বলতে চাস তুই-ই বল।

—স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি যাবার পথে যে বড়ো আমবাগানটা পড়ে ওটা এইসময় একদম ফাঁকা থাকে। ওখানে যে-কোনো একটা গাছতলায় বসে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু তুই আগে ভেবে দেখ, তুই কী টিউশনটা কামাই করতে পারবি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একদিন কামাই করলে কিছু হবে না।

কলেজ শেষের পর আর দেরি না করে তারা দুজনে ট্রেনে চেপে বসেছিল। ট্রেন থেকে নেমে মনীষা আর বাদল হাঁটতে শুরু করল। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ওরা আমবাগানটার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখন ছটা বেজে গেছে। যদিও গ্রীষ্মকাল তবুও বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেশ পরিষ্কার একটা গাছতলা দেখে দুজনে বসল। মনীষা তখনও ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তার জীবনের সব স্বপ্ন, সব আশা, সব বিশ্বাস ধুলোয় মিশে যাবে। বাদল সেদিন তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়নি। পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার উপর। জীবনের যে-মুহূর্তটা বহু প্রতীক্ষিত ছিল মনীষার কাছে, তা যে এমন বিকৃতভাবে তার কাছে ধরা দেবে না মনীষা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনোদিন। তার কল্পনায় বাদলকে নিয়ে গড়া কাচের স্বর্গ যেন মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

বহুক্ষণ পর বিধ্বস্ত দেহটাকে মাটি থেকে টেনে তুলে শাড়ির আঁচলটা দিয়ে ছেঁড়া ব্লাউজটা ঢেকে কোনোমতে মনীষা বাড়ি পৌঁছল। মামা-মামির প্রশ্নের উত্তরে সে বলল যে, ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে সে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেছে তাই তার হাত-পা ছড়ে গেছে, কপালে-গালে কালশিটে পড়েছে। সারা রাত শুধু গুমরে-গুমরে কেঁদেছে কিন্তু কাউকে বলতে পারেনি, সত্যিটা কী। সেদিন রাত থেকেই মনীষার ধুম জ্বর এল, টানা দু সপ্তাহ কলেজ যেতে পারেনি। পাঁচ-ছয়দিন পর আশিস এল তার বাড়িতে খোঁজ নিতে—কেন সে কলেজে যাচ্ছে না। সেদিন মনীষা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। কান্নায় ভেঙে পড়ে সব খুলে বলেছিল আশিসকে। কারণ তার সঙ্গে যখন সেদিন আমবাগানে ওই ঘটনা ঘটছিল সে-সময় তার শুধু আশিসের সাবধানবাণীর কথাই বারবার মনে পড়েছে।

তার কাছ থেকে সব ঘটনা শোনার পর আশিস কোনো কথা বলেনি, শুধু চোয়াল শক্ত করে

বসেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর সে 'আসছি, পরে দেখা হবে'— বলে উঠে চলে যায়। তার পরদিনই সন্ধেবেলায় তাদের কলেজের মাঠের একপাশে বাদলের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুনের অপরাধে পুলিশ আশিসকে গ্রেপ্তার করে কারণ সব সাক্ষ্যপ্রমাণই ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, আশিস কিন্তু একবারেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, খুনটা সে-ই করেছে। তবে কেন সে বাদলকে খুন করল সেটা হাজার প্রশ্নের জবাবেও বলেনি। অনেকগুলো খবরের কাগজে খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল—'কলেজের মধ্যে নৃশংসভাবে বন্ধুকে খুন'—শিরোনাম দিয়ে। সেই সময় বেশ কিছুদিন ধরে সব জায়গায় এই বিষয়টা নিয়ে জোরদার আলোচনা চলেছিল। বিশেষ করে তাদের কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। তবে কেউই আন্দাজ করতে পারেনি ঘটনাটার সঙ্গে মনীষার প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার ব্যাপারটা। কারণ যেদিন বাদল খুন হয় তার এক সপ্তাহ আগে থেকে অসুস্থতার কারণে মনীষা কলেজে অনুপস্থিত ছিল।

বিচারে আশিসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মনীষা মাত্র একদিনই জেলে গিয়েছিল আশিসের সঙ্গে দেখা করতে আর ক্ষমা চাইতে। আশিস তাকে বলেছিল, 'আমার জন্য দুশ্চিন্তা করিস না। তুই ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকব। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, তোর জীবনের এই দুর্ঘটনার কথা কোনোদিন আমি কাউকে বলব না। আমায় কথা দে, তুই আর কোনোদিন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবি না। আমি চাই, তুই তোর জীবনের এই অধ্যায়টাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু কর।' ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল মনীষা।

সেদিন থেকে মনীষার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এই ঘটনার দু বছরের মধ্যে অনিন্দ্যর সঙ্গে মনীষার বিয়ে হয়ে যায়। তার দু বছর পর বাবুযার জন্ম। সুপটু গৃহিণীর মতো সংসার করতে শুরু করে মনীষা। এতদিন পর্যন্ত মনীষা আর আশিস ছাড়া আর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জানতে পারেনি মনীষার জীবনের এই গোপন রহস্যের কথা। অন্তত মনীষা আজ এই চিঠিটা পাবার আগে পর্যন্ত তাই-ই ভাবত। আবার যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল মনীষার মাথায়। কিছুতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না সে। বারবার তার মনে হতে লাগল, যে ব্যক্তি তাকে ওই পেপার কাটিংগুলো পাঠিয়েছে সে যদি অনিন্দ্য বা বাবুয়াকে তার জীবনের সব ঘটনার কথা জানিয়ে দেয় তাহলে কী হবে? চিন্তায়, ভাবনায় প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হল মনীষার। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য সে একে-তাকে ফোন করে অপ্রয়োজনীয় গল্প করতে লাগল। কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, ততই ঘটনাটা যেন পাথরের মতো তার বুকের মধ্যে চেপে বসতে থাকল। নিজের অপরাধবোধের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সারা দুপুর ধরে সে অনিন্দ্যর পছন্দের সব খাবার বানাল।

বিকেলে অনিন্দ্য কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর মনীষা তাকে নিয়ে নাইট শোতে সিনেমা দেখতে গেল। অনিন্দ্য একটু অবাকই হল কারণ মনীষা সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখতে খুব একটা পছন্দ করে না ফলে অনিন্দ্যকেই সাধারণত অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে রাজি করতে হয় সিনেমা দেখার জন্য। রাতে বাড়ি ফিরে খেতে বসে অনিন্দ্য দেখল, সবকটা আইটেমই তার ভীষণ পছন্দের। সে মনীষাকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? ম্যাডামের আজ মেজাজ খুব শরিফ মনে হচ্ছে।'

—ক্-কেন, কেন?

—না, তুমি নিজে থেকে সিনো দেখতে যেতে চাইলে, আবার এখন দেখছি এত ভালো ভালো সব রান্না করেছ তাই বলছি।

—ওঃ, ত্-তাই বলো।

—কী ব্যাপার? তুমি কি কোনো ব্যাপারে নার্ভাস নাকি?

—না ন্না। নার্ভাস হব কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

খেয়ে উঠে খানিকক্ষণ টিভির বিভিন্ন চ্যানেল সার্ফ করে তারপর শুতে গিয়ে অনিন্দ্য দেখল বেডরুমের পাশে লাগোয়া বারান্দায় মনীষা দাঁড়িয়ে আছে। সে মনীষাকে জিগ্যেস করল, 'কী হল? শোবে না?'

—হ্যাঁ, আসছি। তুমি শুয়ে পড়ো।

—তুমি এত রাতে শুধু শুধু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—ও কিছু না, এমনিই। তুমি শুয়ে পড়ো না, আমি আসছি।

অনিন্দ্য শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পর মনীষাও এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়লেও অনেক রাত অবধি তার চোখে ঘুম এল না। ভোরবেলা যখন আকাশে একটু-একটু আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন চোখটা লেগে এল মনীষার।

—মণি, মণি।

অনিন্দ্যর ডাকে ঘুম ভাঙল মনীষার। দেখল জানলা দিয়ে বিছানার উপর রোদ এসে পড়েছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। দেওয়াল ঘড়িতে দেখল সাতটা কুড়ি বাজে। 'ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে। আগে ডাকোনি কেন?' মনীষা অনিন্দ্যকে জিগ্যেস করল।

অনিন্দ্য বলল, 'আমি কী করে জানব যে তুমি এত বেলা অবধি ঘুমোবে। এই তো সবে মর্নিংওয়াক সেরে দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ।'

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে সংসারের কাজে লেগে পড়ল মনীষা। খেয়েদেয়ে অনিন্দ্য কোর্টে বেরিয়ে যাবার পর আবার ওই চিন্তাগুলো মাথায় চেপে বসল মনীষার। সকাল থেকে কাজের তোড়ে তার আর কিছু মনে পড়েনি। কিন্তু যেই কাজকর্ম শেষ হয়ে এল অমনি সেই পুরনো ঘটনাগুলো তার মনে পড়তে লাগল। হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজে ঘোর কেটে গেল মনীষার। ভাবল, বাঁচা গেল—নিশ্চয়ই কাজের মেয়ে শেফালি এসেছে। ওর সঙ্গে কথা বললেও খানিকক্ষণ মনটা ব্যস্ত থাকবে। দরজা খুলে দেখল, শেফালি নয়—কেরিয়ারে ওর নামে একটা চিঠি এসেছে। চিঠি দেখেই আতঙ্কে গা-হাত পা অবশ হয়ে গেল মনীষার। তার নামে আবার কে কী পাঠাল কে জানে! প্রেরকের নাম-ঠিকানা তার পরিচিত নয়, সই করে খামটা নিয়ে দরজা বন্ধ করল মনীষা। খামটা খুলে দেখল তার ভিতর কয়েকটি ডায়েরির পাতার ফোটোকপি। হাতের লেখাটা চেনা চেনা মনে হল। ভালো করে লেখাগুলো পড়ার পর ও বুঝতে পারল যে, এগুলো আশিসের লেখা। তার জীবনে ঘটা ওই ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন আছে তেমনই মনীষার সম্পর্কে আশিসের ব্যক্তিগত সব অনুভূতির কথাও ওতে লেখা আছে, এমনকী সে যে বাদলকে খুন করেছে মনীষার উপর হওয়া অত্যাচারের বদলা নিতে, তাও। যেদিন আশিস পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সেদিনের তারিখটা আজও মনীষার স্পষ্ট মনে আছে। সে খেয়াল করল, ডায়েরির শেষ পাতার তারিখটা তার আগের দিনের। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক কারণ, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তার নিশ্চয়ই আর ডায়েরি লেখা হয়ে ওঠেনি। মনীষা তাড়াতাড়ি আগের দিনের নিউজ পেপার রিপোর্টের ফোটোকপিগুলো আর আজকের ফোটোকপি করা ডায়েরির পাতাগুলো আলমারিতে শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল। সে ভাবল, যদিও খামের উপর প্রেরকের অন্য নাম ঠিকানা লেখা কিন্তু এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আশিসই এইগুলো তাকে পাঠিয়েছে। নিশ্চয়ই এতদিনে তার ঠিকানা জোগাড় করেছে। কিন্তু আশিস্ই তো একদিন তাকে বলেছিল নতুনভাবে জীবন শুরু করতে, তাহলে সে কেন তার সংসারে আগুন লাগাতে চাইবে। অবশ্য এটা হতে পারে যে, এতগুলো বছর জেলে কাটিয়ে তার মন বদলে গেছে। অবশ্য সেটা যদি হয়েও থাকে তাহলেও

তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যৌবনের উন্মাদনায় যে ব্যাপারটা সে ঘটিয়েছিল, যে ঘটনার জন্য তার জীবনের সেরা সময়টা তাকে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে কাটাতে হয়েছে, সেটার জন্য আজ যদি সে অনুশোচনায় ভোগে তাহলে সেটা তার অপরাধ নয়। বরং মনীষার মনেই দীর্ঘদিন একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে। যে বন্ধু তার উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের জীবনের অমূল্য এতগুলো বছর নষ্ট করল, তার জন্য মনীষা কী করতে পেরেছে—কিচ্ছু না। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের সুখের কথাই ভেবেছে। আসলে জেলে আশিসের সঙ্গে দেখা করে চলে আসার সময় সে আশিসকে কথা দিয়েছিল যে, সে নতুন জীবন শুরু করবে, সুখী হবে। সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে এতদিন। কিন্তু আজ সে উপলব্ধি করতে পারছে যে প্রকৃত সুখী সে কোনোদিনই হতে পারেনি। তার কারণ, তার মনে আরও একটা অপরাধবোধ প্রতিনিয়ত কাজ করত। তা হল অনিন্দ্যকে ঠকানোর অপরাধবোধ। সে আজ পর্যন্ত অনিন্দ্যকে জানায়নি তার জীবনের এই দুর্ঘটনার কথা— এ তো তাকে এক প্রকার ঠকানোই হল।

মনীষা ভাবল, আগামীকাল একবার আশিসের বাড়ি যাবে ওর সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানতে যে, কেন এতদিন পর ও মনীষার সুখের সংসার নষ্ট করতে চাইছে। পরদিন সকালে অনিন্দ্য কোর্টে চলে যাবার পর রেডি হয়ে মনীষা বেরোতে যাবে, দেখল— দরজার বাইরে তার নাম লেখা একটা খাম পড়ে আছে। খামটা তুলে নিয়ে সে দেখল, তাতে পোস্ট অফিসের কোনো ছাপ নেই। খামটা খুলে দেখল, তাতে কয়েকটা ফোটোগ্রাফ। কলেজ থেকে তারা একবার পিকনিকে গিয়েছিল। সেখানে আশিস তাদের সকলের অনেকগুলো গ্রুপ ফটো তুলেছিল, তার মধ্যে কয়েকটা ছবিতে আশিস নিজেও ছিল। মনীষা দেখল বেছে বেছে সেই ছবিগুলোই তাকে পাঠানো হয়েছে যেই ছবিগুলোতে সে, বাদল আর আশিস তিনজনেই আছে। মনীষার মনে হল তার পা দুটো পাথরের মতো ভারী, সে বোধহয় এক পাও হাঁটতে পারবে না। সে ভাবল, আশিস কি নিজে এসে দরজার সামনে খামটা ফেলে গেছে? অনিন্দ্য কোর্টে যাবার জন্য যখন বেরোচ্ছিল তখন যদি খামটা ওখানে পড়ে থাকত আর অনিন্দ্যর হাতে পড়ত তাহলে কী হত? টেনশনে মাথা ঘুরতে শুরু করল তার। শাড়ি বদলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। দুপুরে কিচ্ছু খেল না। বিকেলে অনিন্দ্য বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠল না।

কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক বদল করে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সোফায় বসল অনিন্দ্য। সে মনীষাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি চা খাবে না?'

নাঃ, ভালো লাগছে না।

—তোমার কি শরীর খারাপ? চোখমুখ কীরকম শুকনো শুকনো লাগছে!

—না, না। সেরকম কিছু না।

—মণি, তোমার চোখমুখ কিন্তু সেকথা বলছে না।

—আঃ, বলছি তো কিচ্ছু হয়নি। কেন বারবার একই কথা বলে চলেছ।

চুপ করে গেল অনিন্দ্য। খানিকক্ষণ পর মনীষার মনে হল, সে বোধহয় অনিন্দ্যর সঙ্গে একটু বেশিই রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছে। সে অনিন্দ্যর মন ভালো করার জন্য তার সঙ্গে সেধে সেধে গল্প করতে লাগল। অনিন্দ্য অবশ্য তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারই করছিল। অনিন্দ্যর ব্যবহারে মনে হচ্ছিল না যে সে খুব একটা আঘাত পেয়েছে। যাই হোক, রাত্রে খেয়েদেয়ে তারা দুজনে শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে নিল মনীষা। অনিন্দ্য কোর্টে বেরোনোর দশ মিনিটের মধ্যেই সে রেডি হয়ে নিল আশিসের বাড়িতে যাবার জন্য। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল

মনীষা। আশিসের বাড়িটা যে রাস্তার পাশে ছিল তার নামটা ভুলে গেলেও এলাকাটা তার মোটামুটি মনে ছিল। ফলে বাড়িটা খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হল না তাকে। যদিও এলাকাটা আর আগের মতন নেই, বড়ো বড়ো সব ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে তবে আশিসদের বাড়িটা এখনও একইরকম আছে। বাড়ির সামনে এসে সবে কলিংবেলটা বাজানোর জন্য সে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় দরজাটা খুলে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে বোঝা গেল যে, কাজের বা অফিস যাবার জন্য তৈরি হয়েই সে বেরিয়েছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনেই অপরিচিত এক মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? কাকে চাই?'

—আচ্ছা, এটা কি আশিস সেনের বাড়ি?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমি ওঁনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—কে আপনি? আশিস সেনের সঙ্গে আপনার কী দরকার?

—আমি তার বন্ধু।

—বন্ধু! তা কীরকম বন্ধু যে জানেন না আশিস সেন গত কুড়ি বছর ধরে জেলে রয়েছেন!

—না না, সেটা আমি জানি। ভাবলাম যদি এর মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে থাকে।

—ও, আপনি কি ওঁর কেসটা রি-ওপেন হয়েছে—সেই খবর পেয়েছেন?

—রি-ওপেন হয়েছে!

—হ্যাঁ, গত মাসেই কাকুই কেসটা রি-ওপেন হয়েছে। তবে এখনও কোনো ডিসিশন হয়নি। কাকু এখনও জেলেই আছেন।

—উনি তোমার কাকা হন? তুমি কি প্রভাসদার ছেলে?

—হ্যাঁ, আপনি আমার বাবাকে চেনেন?

—হ্যাঁ, কলেজে পড়াকালীন তিন-চারদিন এসেছিলাম তোমাদের বাড়িতে। তখনই আলাপ হয়েছিল। তুমি তখন খুব ছোটো।

—আপনি কি কাকুর কলেজের বন্ধু?

—হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার কাকু কি এখনও প্রেসিডেন্সি জেলেই আছেন?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—না, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

জেলে গেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে দেবে?

—হ্যাঁ দেবে। তবে সোমবার বা বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিন দেখা করা যায় না। আর আগের দিন গিয়ে ভিজিটরস লিস্টে নাম লিখিয়ে আসতে হয়।

—কাল তো বৃহস্পতিবার। তাহলে আমি বরং কালই গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে আসব। আজ গিয়ে ভিজিটরস্ লিস্টে নামটা লিখিয়ে আসি।

—সে ভালো। তাই করুন।

মনীষা তখন আর একটা ট্যাক্সি করে সোজা চলে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে ভিজিটরস্ লিস্টে নাম লিখিয়ে প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ বাড়ি ফিরল। আজকের বাকি সময়টা যেন আর কাটতে চাইছে না। সে শুধু ভাবতে লাগল। কখন সকাল হবে আর সে আশিসের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পরদিন জেলে দুপুর আড়াইটের সময় তার আশিসের সঙ্গে দেখা করার কথা। দুটো বাজতে না বাজতেই সে পৌঁছে গেল জেলের গেটে। সঠিক সময়ে তার ডাক পড়ল ভিতরে। জালের ওপারে এসে দাঁড়ানো আশিসকে দেখে সে যেন চিনতেই পারছিল না। এই কুড়ি বছরে যেন আশিসের

বয়স চল্লিশ বছর বেড়ে গেছে। কাঁচাপাকা চুল, চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। আশিস কিন্তু তাকে একবারেই চিনল, 'মনীষা, না?'

—হ্যাঁ, এতদিন বাদেও চিনতে পারলি?

—কেন পারব না? তোর চেহারা তো খুব একটা বদলায়নি। শুধু একটু মোটা হয়েছিস।

—তুই কেমন আছিস, আশিস?

—আছি একরকম। এখানে যতটা ভালো থাকা যায় আর কী। তুই কেমন আছিস বল। ঘরসংসার করছিস?

—হ্যাঁ, তা করছি। স্বামী ল-ইয়ার, একটাই ছেলে, সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। হস্টেলে থাকে।

—সুখেই আছিস তাহলে। ভালো, ভালো।

—সুখে হয়তো আছি, কিন্তু শান্তিতে নেই।

—কেন?

—তুই জানিস না, কেন?

—বাঃ, আমি জানব কী করে?

—আশিস, তুই হয়তো ভুলে গেছিস, কিন্তু তুই-ই একদিন আমাকে বলেছিলি সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে।

—না, ভুলিনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা। সেকথা কী আমি ভুলতে পারি? সেদিনই তো তোকে শেষবার দেখেছিলাম।

—তোর কি মনে আছে, তুই আমাকে বলেছিলি—আমার জীবনের ওই দুর্ঘটনার কথা আমি আর তুই ছাড়া আর কেউ জানবে না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। কাউকে আমি জানাইওনি। হঠাৎ একথা জিগ্যেস করছিস কেন?

—সেকথা পরে বলছি। আগে বল, তোর কেসটা আবার রি-ওপেন হয়েছে শুনলাম?

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিস। কার কাছ থেকে খবর পেলি?

—কাল আমি তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওখানে তোর দাদার ছেলের কাছ থেকে সব শুনলাম।

—ও-ই তো সব ব্যবস্থা করেছে। আমার যখন জেল হয় তখন ও খুব ছোটো ছিল। চার-পাঁচ বছর বয়স। তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর যখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওর ধারণা স্পষ্ট হল তখন থেকে ও শুধু এই চেষ্টাই করে যাচ্ছে যে কীভাবে আমাকে জেল থেকে বের করবে। শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই ও আইন নিয়ে পড়াশুনো করেছে। এল. এল. বি. পাস করে প্র্যাকটিশ শুরু করেছে। কিন্তু তুই এবার আমাকে বল যে, কেন তোর মনে হল যে, আমি তোর জীবনের ওই ঘটনাটার কথা অন্য কাউকে বলেছি?

—কারণ আছে বলেই মনে হয়েছে। ভালো করে মনে করে দেখ, কাউকে বলেছিস কি না।

—আমার ভাইপো যখন আমাকে খুব জোর করছিল এই কেসটা রি-ওপেন করার ব্যাপারে, তখনও পর্যন্ত ওর বহু প্রশ্নের জবাবেও ওকে আমি বলিনি, প্রকৃত সত্যটা কী। ও তখন আমার উপর রাগও করেছিল ওর সঙ্গে সহযোগিতা না করার জন্য। আমি ওকে বলেছিলাম যে, আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই এই বিষয়ে কোনো কথা আমি ওকে বলতে পারব না। কিন্তু ও এমনই নাছোড়বান্দা যে, যার আন্ডারে ও প্র্যাকটিশ করে, সেই সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে পর্যন্ত একদিন এখানে নিয়ে এসেছিল। সেই ভদ্রলোক ততদিনে ওর কথায় আগ্রহী হয়ে কেসটা রি-ওপেন করানোর জন্য কুড়ি বছরের পুরনো খবরের কাগজ, যেখানে ওই খুনের ঘটনাটার রিপোর্ট বেরিয়েছিল,

জোগাড় করে ফেলেছেন। আমাকে নানাভাবে ওই ভদ্রলোক বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন কিন্তু আমি কিছুতেই মুখ তুলতে রাজি হইনি। শেষে তিনি কথা দিলেন যে, তিনি কখনও কাউকে আমার কথাগুলো বলবেন না, এমনকী আমার ভাইপোকেও না। সেদিন আমি তার কথায় ভরসা পেয়ে আমার সব কথা তাকে বলি। তিনি প্রমাণস্বরূপ কিন্তু চাইছিলেন। আমি তখন ওঁকে বলি যে, আমি ডায়েরি লিখতাম কিন্তু সেইসব ডায়েরিগুলো, আমার বন্ধুবান্ধবদের কিছু চিঠি, ছবি—সব একটা ছোট্ট সুটকেসে ভরে সবসময় তালা দিয়ে রাখতাম আর তার চাবিটা আমার কাছে থাকত। যেদিন বাদল আমার হাতে খুন হল সেদিনই বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়বই। তাই ওই চাবিটাকে আমাদের ঠাকুরের আসনের তলায় পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম যাতে কেউ চাবিটা খুঁজে না পায় আর ওই সুটকেসটাও খুলতে না পারে। ওই ভদ্রলোককে আমি চাবিটার হদিশ দিই কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বলে দিই যে, সুটকেস খুলে ভিতরে যা পাবেন তা যেন উনি ছাড়া আমার বাড়ির অন্য কেউ না দেখে। উনি অবশ্য আমার কথা রেখেছেন। আমার বাড়ির কাউকে জানাননি ওই জিনিসগুলোর কথা, এমনকী আমার ভাইপো মানে ওঁর অ্যাসিস্টেন্টকেও না। এ কী, এ কী কী হল? মনীষা, তোর কী শরীর খারাপ লাগছে?

মনীষা পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে দেওয়ালটা ধরে সামলে নিল। কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ওই ভদ্রলোকের নাম কী?'

আশিস বলল, 'কার? ওই সিনিয়র অ্যাডভোকেটের? ওঁর নাম হল অনিন্দ্য ব্যানার্জি।'

পরিণত

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কিংশুকের ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল তৃষা! 'অ্যাঁ, অ্যাঁ! কী হয়েছে, কী হয়েছে?' দেখল বড়ো বড়ো চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিংশুক, অন্ধকারে একটা ভয়ার্ত মুখ! বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলছে কিংশুক। সে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল তাড়াতাড়ি। কিংশুক এখন মাটির দিকে তাকিয়ে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে নিজেই,কী হয়েছে। তৃষা আবার বলল, 'কী?' সে জানে এখন সে কতটা বিরক্ত। পঞ্চাশের কাছে বয়েস হল তার, এরকমভাবে ঘুম ভাঙলে বুকটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জোরে বিট করে তা ছাড়া তার হাইপ্রেশার!

—স্বপ্ন? জানতে চাইল তৃষা।

—দেখলাম আমাকে একটা ষাঁড় তাড়া করেছে, বিরাট, কালো, ভয়ঙ্কর একটা ষাড়!

—বাবা গো! আর তোমার এই স্বপ্ন বাতিক। পারি না! সে বসে রইল চুপচাপ। ওঠো, জল খাও। টয়লেটে যাও! কী বোকা বোকা স্বপ্ন দেখে কিংশুক! সব সময়! যাঁড়ে তাড়া করেছে নাকি ওকে? যাঁড়ের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এবার হাসি পেল তার, কিংশুকের স্বপ্নটাকে কল্পনা করে। মোটা শরীরটা নিয়ে ছুটছে কিংশুক মরিয়া হয়ে! কিংশুক বিছানা থেকে নেমে চটি গলাচ্ছে। সে বলল, 'কোন্ রাস্তা ধরে তাড়া করেছিল ষাঁড়টা তোমায়?' এমনভাবে প্রশ্নটা করল তৃষা যেন স্বপ্নটা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে কিছু ও।

কিংশুক টয়লেটের দরজার নব ঘোরাচ্ছিল। ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'কোন্ রাস্তা? বুঝলাম না ঠিক। মনে হল আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাই হবে। বসন্ত রায় রোড, লেক রোড, নাও হতে পারে!'

কী আহম্মক! তৃষা যে ঠাট্টা করল বুঝলই না! যদি সে হেসে ফেলত তা হলে কিংশুক রেগে যেত খুব তার ওপর। এ দিক নেই সে দিক আছে! রাত তিনটের সময় পঞ্চান্ন ছুঁই ছুঁই একটা লোক স্বপ্ন দেখে ভয়ে নাভিশ্বাস ফেলছে, তাও কী স্বপ্ন একখানা! কিন্তু তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা চলবে না, অমনি পৌরুষে লাগবে। তাও যদি সেটা আদৌ থাকত! তৃষা শুয়ে পড়ল ধপ করে আবার। ফেব্রুয়ারির শেষ। দুপুরে এসি চালাতে হয়েছিল আজ, অথচ শেষ রাতের দিকে শীত শীত করে রোজ। একটা হালকা চাদর মুড়ি দিলে আরাম হয় খুব। ইদানীং ঘুম আসতে অনেক রাত হয় তৃষার। শুয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করে, এ পাশ ও পাশ করে। কিংশুক হয়তো বলল, 'কী তোমার ঘুম আসছে না? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

—তুমি তোমার চরকায় তেল দাও তো! বলে কিংশুককে থামিয়ে দেয় তৃষা। এর মধ্যে আবার কিংশুক কেন? আটাশ বছরের বিবাহিত জীবন, সংসার-ধর্ম, লোকলৌকিকতা, সন্তান, ঝগড়াঝাঁটি, মান-অভিমান—হয়েছে তো সব, বস্তা বস্তা বছর গায়ে নিঃশ্বাস ফেলে কাটিয়েছে। এখন এই ঘুম

আসার আগের নিরিবিলি একটু ভাবনাচিন্তার মুহূর্তগুলোয় আবার কিংশুকের অনুপ্রবেশ? রিমা যেমন ঠিক করেছে, বেডরুম আলাদা করে নিয়েছে প্রভাতের সঙ্গে, 'পঁচিশ বছর একটা লোকের সঙ্গে এক ঘরে শুয়েছি, তার নাক ডাকা, কোঁৎ পাড়া, হাত পা ছোড়া, হাঁচি, সর্দি, বাতকর্ম সব সহ্য করেছি, আর না! এবার একার ঘর চাই।'

মালবিকা জিজ্ঞেস করেছিল সঙ্গে সঙ্গে, 'তা হলে রিমা, প্রভাতদার সঙ্গে আর ওসবও হবে না তোর বলছিস? নাকি সেই সময় আমেদুধে মিলে যাবে?'

—ছিঃ! নাক মুখ কুঁচকে উঠে বলেছিল রিমা, 'ওই অত জানা একটা লোকের সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করে কারও মালবিকা? শুতে হলে একটা ফ্যান্টাসি চাই না? হ্যাঁ, একটা সময় ভালো লাগুক না লাগুক অ্যালাউ করেছি। তখন ছেলেমেয়ে ছোটো ছিল। অন্য মেয়েদেরও প্রভাতকে ঝটপট বেশ মনে ধরত দেখতাম। এখন ছেলের বউ এসে গেছে। এখনও বরের জন্যে ইনসিকিওরড ফিল করব এত রোম্যান্টিক আমি নই। গেলেও কোথায় আর যাবে?' বৈশালির বাড়িতে কিটি পার্টি ছিল সে দিন। জিনে চুমুক দিয়েছিল রিমা বড়ো করে, 'আর শোন, এখন এদিক ও দিক গেলেও কী এসে যায় বলত? আমি তো বলে দিয়েছি সাফ সাফ, আমার কাছে আর ও সব আশা করো না।''

কড়মড় করে পকোড়া চিবিয়ে সুতনুকা রিমার সুরে সুর মিলিয়ে ছিল সে দিন, 'আমি তো কবেই সেটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি, যেখানে যেতে হয় যাও ভাই, আমার কাছে এসো না! এখন আমরা ভাইবোন।'

তেরোজন প্রায় সমবয়েসি মহিলার মুখগুলো একে একে দেখার চেষ্টা করেছিল তৃষা সে দিন। বিউটি পার্লারের নিয়মিত পরিচর্যা, মেক-আপ, দামি শাড়ি গয়না, আরাম আয়েস সব কিছু বয়েসকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে মরিয়া যুদ্ধ করে চলেছে, তবু চুল পেকে গেছে বেশিরভাগের, গলায় হাঁসুলির মতো মোটা মোটা দাগ, চিবুক ঝুলে গেছে, কুনুইয়ের কাছে ঝুলছে চামড়া, দুধ, ঘি, ওয়াইনের কারণে চেহারায় জেল্লা আছে সবারই অবশ্য! তাছাড়া সোসাইটির মহিলারা সব বরের দ্বারা প্যামপারড, অন্তত মানুষের চোখের সামনে, নজরের সামনে। ভিতরে অনেক গল্প থাকতে পারে—যেমন পাঁচ হাজারি তাঞ্জোর সিল্ক পরে গপগপ করে চিজ বলে সাঁটাচ্ছে যে মালবিকা, কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে, মাত্র দশটা বছর আগেও বরের লাথি খেয়ে নার্সিং হোমে ভরতি হয়েছিল। সে দিক থেকে কিংশুক অবশ্য তার চিরকালের গোলাম। বিয়ের সাতদিনের মাথায় পা টিপে দিয়েছিল, তারপর সেটা আবার বড়ো মুখ করে বলেছিল বড়ো বউদিকে। তাই নিয়ে কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড শ্বশুরবাড়িতে। শাশুড়ি কত দিন কথা বলেননি তৃষার সঙ্গে। তাও তার অত মডার্ন শাশুড়ি। ফটফট ইংরেজি বলতেন, গাড়ি চালিয়ে সমাজসেবা করে বেড়াতেন। কিংশুককে অবশ্য টলানো যায়নি, ও বরাবর স্বঘোষিত স্ত্রৈণ। কিন্তু সেটা কোনোদিন পছন্দ হল না কেন তৃষার কে জানে। বরং যদি মেজাজী হত, তাকে রুল করত, শরীর দিতে না চাইলে সঙ্গে সঙ্গে 'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে না পড়ে যদি জোর করে কেড়ে নিত সব, সে কেঁদে কেঁদে চোখ বুলিয়ে ফেলত তখন আর তাই দেখে তার সঙ্গে খুনসুটি করত খুব। বলত, 'ও, ব্যথা লেগেছে? আর একবার আদর করলেই সমস্ত ব্যথা সেরে যাবে।'

তৃষার জীবনে এমনটা ঘটেনি কখনও। এ সব কী তা হলে শুধু তৃষা কল্পনা করেছে? নাকি এ সব পড়েছে কোথাও, গল্প উপন্যাসে? এই যে শুয়ে ছটফট করে সে, রোজ এ সবই ভাবে নাকি? না, না, এ সব ভাবে না মোটেও। পরের দিন কী কী করার আছে তাই ভেবে বেশিরভাগ সময়। ক্লাবে কী আছে উৎসব, অনুষ্ঠান, কোন্ পার্টিতে যাওয়ার আছে, কোন্ শাড়িটা পরা যেতে পারে, হিরের একটা গয়নার বিজ্ঞাপন খুব মন কেড়েছে তার, কিন্তু কুচি কুচি হিরে দিয়ে বানানো

গয়না পরার বয়েস তার আর নেই। তা ছাড়া তার যা হিরের সম্ভার অত খেলো জিনিস নিজের জন্যে কিনতে রুচিতে বাধবে. অথচ জিনিসটা কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, মিঠুর বোন দুতুনের জন্যে নেওয়া যায় না? দুতুনকে তো সব কিছুই দেওয়া হচ্ছে, শাড়ি, পোশাক, কসমেটিকস, জুতো, ব্যাগ, ঘড়ি, ক্যামেরা — সঙ্গে ওরকম কিউট এক সেট গয়নাই বা নয় কেন? তার যদি আর একটা ছেলে থাকত তা হলে দুতুনকে তার বউ করে আনত তৃষা। দিব্যি দুই বোনে মিলেমিশে থাকত, ঝগড়াঝাঁটি, রেষারেষি করত না। বাব্বা, জায়ে জায়ে কী সাপে-নেউলে তা হাড়ে হাড়ে জানা আছে তৃষার। বউ হয়ে এসেছিল যখন এ বাড়িতে তখন অলরেডি নিজের তিন ভাসুরের বিয়ে হয়ে গেছে। তা ছাড়া জ্যাঠতুতো জায়েরা তো ছিলই।

পড়ে ঘুম না আসা অবধি এ সবই তো ভাবে তৃষা রোজ—দেওঘরের বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার আগে একবার ক্লাবে তাদের গ্রুপটা মিলে আউটিং করে এলে হয় না? সুপর্ণারা এবার গরমে হল্যান্ড যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী—শুধু কিংশুকের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, অসম্ভব! কী কথা বলবে? কী শেয়ার করবে? দলবল ছাড়া বেড়াতে গিয়ে লাভ নেই। অবশ্য এ বছর গরমে পাপাইয়ের বিয়ের রেশই কাটবে না তখনও। আত্মীয় পরিজন কী কম? এ বাড়ি ও বাড়ি নতুন বউ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই পুজো এসে যাবে বোধহয়। বিয়ের প্রথম বছরের পুজো, সে-ও কম ব্যস্ততার ব্যাপার নয়!

এইসব ভেবেটেবে ঘুমোলে ভোরের দিকটা যখন শীত শীত করে, গায়ে একটা চাদর টেনে নেয় তৃষা আর যা একখানা জমাট ঘুম দেয় সাতটা অবধি। সকালে উঠে আয়নায় দেখে রূপ, যৌবন এক দিনে যতটা ক্ষয় হয় তার কিছুটা অন্তত বাঁচাতে পেরেছে। না, না, যৌবন কথাটা হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশের এক নারীর পক্ষে। তবে সে মোটা হয়ে যায়নি আর ঢলঢলে একটা আকর্ষণ তার চিরদিনই ছিল, সেটা এখনও আছে—তাবৎ পুরুষকুলের চোখ দেখে টের পাওয়া যায়! এ দিকে কিংশুক তার সেই ঘুমটা কেমন ভাঙিয়ে দিল দ্যাখো? বারোটা বাজিয়ে দিল!

টয়লেট থেকে বেরিয়ে কিংশুক বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও, আমি একটু ব্যালকনিতে বসছি গিয়ে।''

তৃষা বলল, 'শোবে না?' এবং চোখের ওপর হাত চাপা দিল সে।

—বসি একটু। একটা সিগারেট ধরাই।

কিংশুকের সিগারেট খাওয়া একদম বারণ, মদ, মাংসও বারণ। খুব একটা অনিয়ম এখন আর করেও না। ভোরে উঠেই ক্লাবের জিমে যায়, ওষুধটষুধ যা খাওয়ার নিজেই মনে করে খায়। এখন একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর, তাতে হাঁ-হাঁ করে উঠতে হবে তৃষাকে এমন কোনো কথা নেই। তবু তৃষা বলল, 'এখন আবার সিগারেট খাওয়ার কী দরকার? শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তো! আর শোনো, স্বপ্নটপ্ন দেখে এরকম দশ বছরের শিশুর মতো ব্যবহার করবে না বলে রাখছি! ওরকম করে ঘুম থেকে ডাকলে আমার প্যালপিটিশন হয়। এখনও একটা অস্বস্তি হচ্ছে বুকে কেমন—ভালো লাগে না বাবা।'

কিংশুক উত্তরে কিছু বলল না, ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসল চুপচাপ। সিগারেটও ধরাল না। যদি ধরাত তা হলেও দুটো কথা বলার কারণ খুঁজে পেত তৃষা। ওফ, কী বোরিং!

সে চাদরটাদর সরিয়ে বিছানা ছাড়ল এবার, টয়লেটে যাবে। কিংশুক বলল, 'পাপাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে তৃষা।'

—এখনও ঘুমোয়নি? তৃষা অবাক বল খুব, 'সে কী, কাল দশটার ফ্লাইট ধরে তো দিল্লি যাবে পাপাই? কালই তো?' অবশ্য কিংশুক কী জানে ছেলে কবে হিল্লি কবে দিল্লি ট্যুরে যাচ্ছে? আজ

যায় কাল ফেরে, আবার কালই বেরিয়ে যায় বিকেল গড়াতে না গড়াতে। পৃথিবী বিখ্যাত সফটওয়্যার সংস্থায় এই এক রত্তি ছেলে বিরাট দায়িত্বের পদে আসীন। এক বছরও হয়নি ঢুকেছে, এরই মধ্যে কোম্পানির নাকি কৃশানু দত্তকে ছাড়া চলে না! গর্বে বুকটা মাখামাখি হয়ে থাকে তৃষার যেন। এবং যেখানে সে জানে ছেলেকে সে কীভাবে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। আজ না হয় ক্লাব, পার্টি, মদ্যপান করে বেড়ায় সে—কিন্তু পাপাইয়ের উচ্চ মাধ্যমিক অবধি? অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে সন্তানকে বড়ো করেছে সে। তখন তার কোনো বাইরের জীবন ছিল না। আয়ার কাছে ছেলে রেখে শাড়ি, গয়না কিনে, পার্টিতে গিয়ে অন্যের বরের সঙ্গে ঢলাঢলি করে সময় ব্যয় করেনি তখন। এই জন্যেই তো কিংশুক এত কৃতজ্ঞ তার কাছে। পাপাইয়ের বড়ো হওয়ার সময়টায় যথেষ্ট ক্রাইসিস ছিল ফ্যামিলিতে, শ্বশুররা পরপর মারা গেলেন, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল, নিজের ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল। কিংশুকের ভাগে পড়ল এমন ব্যাবসা যা তখন প্রায় লালবাতি জ্বেলে বসে আছে। পাগলের মতো খেটেখুটে কিংশুক আবার ব্যাবসাটা দাঁড় করাল অবশ্য।

তৃষা নাক কুঁচকাল, 'সেই দিক থেকে কিংশুক তো সফল, অ্যাচিভার। তা হলে আবার ষাঁড়ে, তাড়া করার স্বপ্ন দেখে কেন কে জানে? সবই আছে কিংশুকের, ব্যক্তিত্বটাই যা নেই। অথচ তার পছন্দ ছিল টল, ক্লিন শেভড, খটখটে কোনো পুরুষ, ঠিক যেমন মল্লিকার বরকে দেখেছিল। মল্লিকা তার কলেজের বান্ধবী, এখন কোথায় কে জানে। পরমেশ্বর নাম ছিল মল্লিকার বরের। বিয়ে করতে এসে বিয়ে করবে কী, সবার ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। কী স্মার্ট, চৌখশ! ক্লাবের পুরুষগুলোর মধ্যে এরকম কেউ নেই। সন্ধে গড়াতে না গড়াতে চার পেগ খেয়ে আবোলতাবোল বকছে, টলছে, রোম্যান্স করবে কী? কথাই জড়িয়ে যায়। বড়ো জোর শুয়ে পড়লে অন্যের বউয়ের সঙ্গে। তৃষার শোওয়ায় রুচি নেই, সে চেয়েছিল একটা প্রেম! প্রেম আর হল না তার এ জীবনে!

টয়লেট করে তৃষা আর বিছানায় ফিরে গেল না। বেরল বেডরুমের দরজা খুলে। অনেক পুরোনো বিরাট বাড়ি। টানা লম্বা শ্বেতপাথরের করিডরের ও প্রান্তে পাপাইয়ের ঘর। তাদের ঘরের লাগোয়া ঝুল বারান্দা থেকে পাপাইয়ের ঘরটা দেখা যায়। কিংশুক বারান্দায় গিয়ে বসতে তাই দেখতে পেয়েছে যে পাপাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। তৃষা পাপাইয়ের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। হ্যাঁ, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এত রাতে কার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে পাপাই? ক্লাবে বলাবলি করে বটে সবাই আজকাল ছেলেমেয়েরা নাকি সারারাত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু পাপাইয়ের তো এরকম স্বভাব ছিল না। তা ছাড়া সময়ই বা পাবে কোথায়? ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিতে ঢুকে গেল। আটটায় অফিসে বেরিয়ে যায়, অফিস থেকে বেরতে বেরতে নটা। তার ওপর রোজ দিল্লি, হায়দরাবাদ, মুম্বই, বেঙ্গালুরু ছুটে বেড়াচ্ছে। মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় পায় না।

তৃষা বিরক্তির সঙ্গে দরজা নক করল, 'পাপাই! পাপাই! দরজা খোল?'

ভিতর থেকে গলা ভেসে এল পাপাইয়ের, 'মা? কী হয়েছে?' ভীষণ অবাক হয়েছে ছেলে মায়ের ডাকাডাকিতে। মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে দিল পাপাই, মুখেচোখে দুশ্চিন্তা, 'কী হয়েছে মা?'

তৃষা দেখল ছেলের হাতে ধরা অফিস থেকে দেওয়া ব্ল্যাকবেরি, 'কিছু হয়নি। তুই এখনও ঘুমোসনি? কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

এবার অপ্রস্তুত হল পাপাই, 'ও ঘুমোইনি বলে এনকোয়ারি করতে এসেছ তুমি মা? পারোও বটে!' হাসল একমুখ।

—কার সঙ্গে কথা বলছ পাপাই এত রাতে? কাল না সকালে তোমাকে প্লেন ধরতে হবে?

পাপাই তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে তুলে বলল, 'উইল কল ইউ ব্যাক ইন ফিউ সেকেন্ডস!' বলে লাইন কেটে দিল। ...ফিউ সেকেন্ডস? তাজ্জব হয়ে গেল তৃষা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফুটিয়ে দিবি মাকে তোর পাপাই? কী উন্নতি হয়েছে ছেলের, ভাবা যায় না।

সে রেগেমেগে, 'কে! কে! হ্যাঁ? কী? ব্যাপার কী?' বলে উঠল।

পাপাই তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল অমনি, 'কুল ডাউন মা, আমি কী জানি না কাল আটটার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্ট ছুটতে হবে?'

—আসল কথাটা বলো পাপাই, বলে উঠল তৃষা।

বিছানার ওপর ল্যাপটপ খোলা, স্যুট, টাই, প্রেস করা জামাকাপড় রাখা একপাশে, লাগেজ গোছানো হয়নি এখনও। এবার তো চারদিন থাকছে না ছেলেটা। পাপাই তাকে বসিয়ে দিল পুরোনো দিনের হাতাওয়ালা সোফায়। পাপাইয়ের ঘরটা বিরাট বড়ো। দিন সাতেকের মধ্যে মিস্ত্রি লাগছে বাড়িতে। নতুন ফ্লোরিং হবে, রং হবে পাপাইয়ের ঘরে। টয়লেট ভেঙে বানানো হবে। পাশের ঘরটাকে জুড়ে দেওয়া হবে পাপাইয়ের ঘরের সঙ্গে। দেওয়ালে দরজার ফোটানো হবে একটা। মিঠু ভীষণ গানবাজনা ভালোবাসে। ক্লাসিকালের তালিম নিয়েছে ছোটো থেকে নাম করা গাইয়ের কাছে। ওই ঘরটা হবে ওদের মিউজিক রুম কাম বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জায়গা। কাঠের মিস্ত্রিও লাগবে ক দিন পর থেকে কাজে। বৈশাখ পড়তে না পড়তে পাপাইয়ের বিয়ে। মিস্ত্রিটিস্ত্রি লাগলে সব দায়িত্বই এসে পড়বে তৃষার ঘাড়ে। দুপুরের দিকে ক্লাবে যাওয়া বা এর ওর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানোর স্কোপ থাকবে না তখন। এখন এমন অভ্যেস হয়ে গেছে বাড়িতে বসে থাকতে হবে ভাবলেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়।

—কার সঙ্গে কথা বলব আর মা? গেস করো দেখি? ছেলের চোখ হাসিতে চিকচিক করছে।

—কার সঙ্গে? দু দিন পরে কিন্তু তোমার বিয়ে এটা মনে রেখো পাপাই। কিছু ব্যাপার থাকলে এখনই খোলসা করে বলে দাও। পরের মেয়ের জীবন নিয়ে ইয়ারকি নয়।

—কী মুশকিল! হো হো করে হেসে উঠল পাপাই, 'তোমার পছন্দের মেয়ের সঙ্গেই তো কথা বলছিলাম?'

—মিঠু? গালে হাত দিল তৃষা। 'তাই নাকি?' সামান্য লজ্জিত হল, 'তোমাদের রোজ বুঝি এত রাত অবধি গল্প হয়?'

—ধুর। ঘুমকাতুরে মেয়ে একখানা, কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কী বলো তো মা, একদম চিনি না জানি না একটা মেয়েকে ফট করে বিয়ে করে ফেলতে কেমন লাগে একটা। তাই একটা কোর্টশিপ করে ফেলার চেষ্টা করছি। এমনিই বন্ধুবান্ধব আওয়াজ দিচ্ছে!

—কেন আওয়াজ দিচ্ছে?

—বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করছি বলে। এখন ও সব চলে না, না! কিন্তু আমি তো প্রেম করার সময়ই পেলাম না।

তৃষা খুশি হল, 'হাতে মাস দেড়েক আছে, করে নে প্রেম। আমি মিসেস বোসের সঙ্গে কথা বলব। এখন তো মিঠুকে তোর সঙ্গে ছাড়তে ওদের আপত্তি হওয়ার কথা নয়। রোজ দেখাটেখা কর, ঘুরতে টুরতে যা।'

পাপাই তাকে চোখ মারল, 'আজও দেখা করেছি আমরা মা।'

—ওমা, তাই বুঝি? তৃষা উত্তরোত্তর অবাক, 'কোথায় গেলি?'

—বাড়ি থেকে তুললাম। হায়াটে গেলাম, ডিনার খাওয়ালাম, তারপর আবার ড্রপ করে দিলাম।

—হ্যাঁ, তোর অফিস আর ওদের বাড়ি তো কাছাকাছি। তা আজকাল আমাকে সব খুব চেপে যাচ্ছ তুমি পাপাই।

মাথাটাথা চুলকে পাপাই বলল, 'না, মা। নট লাইক দ্যাট। কী মনে হল, ওকে ফোন করলাম, না, না করছিল, তারপর বলল বেশিক্ষণ না, কাল পরীক্ষা আছে। হার্ডলি ফর্টি মিনিটস ছিলাম একসঙ্গে।'

তৃষা থমকাল, 'না, না করছিল? কেন? তোব সঙ্গে দেখা করায় মিঠুর উৎসাহ নেই বুঝি?'

—মা। প্লিজ! উৎসাহ থাকবে না কেন? একটু লাজুক ধরনের।

—লাজুক? মনে তো হয়নি। তোর লাজুক মনে হল?

—মা, তোমার পছন্দ করা মেয়ে, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। লাজুক মানে ওই আর কী, একটু রিজার্ভড।

—হ্যাঁ, সেটা আছে। কী পরে এসেছিল রে? ভালো দেখাচ্ছিল?

—ও সব আমি অত লক্ষ করিনি। হাত পা ঝেড়ে অধৈর্য হওয়ার ভঙ্গি করল পাপাই। ভালো দেখাচ্ছিল—ব্যস!

—বুঝেছি, তুমি এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে। বেশ আমি উঠি।

পাপাই গলা জড়িয়ে ধরল তার, 'না মা, আর কথা বলব না, এবার ঘুমোতেই হবে।'

পাপাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তৃষা বলল, 'কাল তো মিসেস বোস আর মিঠুকে নিয়ে আমি শপিংয়ে বেরুচ্ছি। সঙ্গে মিঠুর মাসিরাও থাকছে।'

—জানি! বলল পাপাই, 'পিংক কিছু কিনো তো ওর জন্যে, লং ড্রেসট্রেস কিছু একটা। মিঠুকে পিংক খুব মানাবে।'

তৃষা হেসে ফেলল কথাটা শুনে। নিজের ঘরে ফিরে দেখল কিংশুক এখনও ঝুল বারান্দায় বসে। রাস্তার দু ধারে স্থির দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো গাছেরা। শরৎ বসু রোডের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বড়ো বড়ো লোডেড ট্রাক—কিন্তু কিংশুক সে সব কিছুই দেখছে না বোধহয়। এক মুহূর্তের জন্যে তৃষার মনে হল কিংশুককে পাপাই-মিঠুর কথাটা জানায়, তাই নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করে কিন্তু তারপরই বেলুন থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার মতো চুপসে গেল সে। একটা কথা অপর পক্ষকে বুক খালি করে বলার মধ্যে দিয়ে বক্তা যে আনন্দ লাভ করে, সেই আনন্দ কী সে কোনো কথা কিংশুককে বলতে পেয়েছে কখনও? তার আনন্দে, দুঃখে তার স্বামী কী কোনোদিন তেমন করে সাড়া দিতে পেরেছে? যাতে সেও বারংবার ফিরে ফিরে আঁকড়ে ধরতে পারে লোকটাকে? কিংশুক আর তার সম্পর্কটার গড়ার ক্ষেত্রে অদৃশ্য এক কারিগর যেন। সম্পর্কের শরীরে চোখ ফোটাতেই ভুলে গিয়েছিলেন এবং সেই ভুল কোনোদিন শোধরানোরও চেষ্টা করেননি। সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত গলায় কিংশুককে একবার শুতে বলে তৃষা কুঁচকানো চাদরের মতো হয়ে থাকা ঘুমটাকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোজা করে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে এসে গেল পাপাই-মিঠুর বিয়ের দিন। বাড়ি ভরে গেল আত্মীয়-সমাগমে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার পর কিংশুকদের তিন ভাইয়ের তিনটে আলাদা আলাদা ফ্লোরে আলাদা আলাদা সংসার। একতলার বৈঠকখানাটা খালি কমন, চাকরবাকররা একতলার পিছন দিকটায় থাকে। কিন্তু বিয়ে উপলক্ষে ক দিন ধরে আবার সকলে এক অন্ন হয়েই গেছে। পিছনের ঘাসজমিতে ম্যারাপ বেঁধে রান্নাবান্না চলছে, যেমন হয় যজ্ঞিবাড়িতে। উঠতে, নামতে, নড়তে, চড়তে যাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে তৃষার, তারা কেউ তার বড়ো জায়ের মা, মেজ জায়ের দিদি, অথবা দাদার বউ, হইহট্টকোলে কাজ আর অকাজ একাকার হয়ে গেছে। আর পাঁচটা লোকের পাঁচ

রকম মতামত! তৃষার তো মাথা গুলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। একটা মাত্র ছেলে তার। সব সাধ, স্বপ্ন দিয়ে বড়ো করা। আচার-অনুষ্ঠানে কোনো খুঁত রাখতে চায় না তৃষা। যে যা বলছে তাতেই সে ঘাড় নাড়িয়ে দিচ্ছে।

কাল বিয়ে, আজ বিকেলে সে একটা চায়ের আসর বসিয়েছে বাড়িতে। বাড়ির মেয়েরা তো থাকছেই, আত্মীয় মহিলারা আর ক্লাবের বান্ধবীদেরও আমন্ত্রণ তাতে। সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতে তত্ত্ব সাজানোর দলটা এসে হাজির। শাড়ি দিয়ে ময়ূর বানানোটানানো তৃষার কোনোদিন পছন্দ হয় না। অভিনব প্ল্যানটা দিয়েছে তার ছোটো বোন পৃথা। আজকে চায়ের আসরে উপস্থিত সবাইকে কিছু না কিছু লিখতে হবে তার ছেলের বিয়ে উপলক্ষে। কবিতা হোক, দু-এক লাইন কথাই হোক, আশীর্বাণীই হোক—লিখতে হবে প্রত্যেককে। সেগুলোই আটকে দেওয়া হবে ট্রেগুলোয়। আইডিয়াটা যাকে বলে হিট। বৈঠকখানার ঝাড়গুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাড়ি, গয়নায় সজ্জিত নারীর দল কে কী লিখছে তাই নিয়ে হাসিঠাট্টায় ফেটে পড়ছে মুহুর্মুহু। সবারই দেখা যাচ্ছে বাংলা বানান নিয়ে সংশয়। তৃষার ছোটো জা সঞ্চিতা ছুটে গিয়ে একটা ডিকশনারি এনে রাখল মাঝখানে।

মিঠুর জন্যে খুঁজে খুঁজে তৃষা একটি পিংক ড্রেস কিনেছে। একদম বেবি পিংক। শিফনের। হল্টারনেক, কোমর থেকে পা অবধি ছড়িয়ে গেছে এ লাইন স্কার্টের মতো। এলগিন রোডের একটা ডিজাইনারের কাছ থেকে নিয়েছে তৃষা সাত হাজারি পোশাকটা। ছেলে মুখ ফুটে বলেছে যখন সমস্ত কলকাতা টুঁড়ে ফেলেও জিনিসটা খুঁজে নিয়ে আসত সে।

মিঠুর জন্যে পাপাইয়ের তরফ থেকে ভেরি স্পেশাল কিছু গিফট পাঠানো হচ্ছে গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে। ছটা-সাতটা ট্রে। জোগাড়তন্ত্র সব তৃষাই করেছে আর কী! পিংক ড্রেসটা তৃষা তার সঙ্গেই জুড়ে দেবে ঠিক করল। বড়ো জায়ের মা এই সব গিফটটিফট দেখে মন্তব্য করলেন একটা, 'তৃষা, এটা হল শাশুড়ি হিসেবে কে কত মডার্ন, কত উদার—তাই দেখাবার যুগ। নইলে শ্বশুরবাড়ি থেকে এইসব পোশাক পাঠানো হচ্ছে কস্মিনকালেও কেউ এমনটা ভাবতে পারত?'

পৃথার শাশুড়ি বলে উঠলেন, 'তাই বলে ভাববেন না বেয়ান, শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কটা বদলে গেছে এ যুগে। ভিতরে ভিতরে সবাই ভয়ে কাঁটা। আজকাল দেখছি তো সব, মেয়ের মা তো বিয়ে দিয়ে দিল, ঢুকে গেল। ছেলের মায়েরই যত দায় নিজেকে প্রমাণ করার। উদার শাশুড়ি হতে হবে। ছেলের বউকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতে হবে। আবার সংসারে নিজের দখলটাও বজায় রাখতে হবে। এই যে রাজ্যের যত টিভি সিরিয়ালে শাশুড়ি-বউকে যুযুধান দুই পক্ষ করে দাঁড় করায়, কেন করায় বলুন তো? মানুষ দেখে বলেই না? আরে বাবা, সবারই ওটা ব্যথার জায়গা দিদি।'

রিমা আজ একটা দারুণ পাটোলা পরে এসেছে, মুক্তোর গয়না দিয়ে। বলল, 'সত্যি কিন্তু, আমার দিদির ছেলের বউ কী করল দেখুন। দিদি তো দিন রাত ছেলের বউকে তোষামোদ করে অস্থির, কীনা এত বছর বাদে জীবনে মনের মতো একটা বন্ধু পেয়েছি। সেই মেয়ে কীরকম স্ট্যাব করল দেখুন পিছন থেকে। ওয়ান ফাইন মর্নিং ঘুম থেকে উঠে জানিয়ে দিল ওরা এখানকার পাঠ চুকিয়ে আমেরিকা চলে যাচ্ছে। পড়ে রইল অত বড়ো বাড়ি, বাবা, মা—কেউ কিছু নয়। উনি শুধু ওঁর বাপের বাড়ির থেকে আনা কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। কী বেইমান?'

মহিলামহলে এমনতর কথাবার্তা, আলোচনা ঘটবেই ঘটবে, এগুলোর স্থায়ী আবেদন আছে আড্ডায়। ভীষণ মুখরোচক, এবং তৃষারও মনে মনে খুব একটা আগ্রহ মিঠুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন হবে কে জানে! মিঠু তো তারই পছন্দ করা মেয়ে—ছেলের জন্যে। কিংশুক সেখানে একটা কথাও বলেনি। পাপাইও মায়ের পছন্দকেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছে—তবু তৃষার একটা ভয়

আছে কোথায় যেন। হয়তো মেয়েটা তার এবং একমাত্র তার ইচ্ছেতেই এ বাড়িতে আসছে বলে তৃষার ওপর এক ধরনের চাপও আছে সব মিলিয়ে। ছেলে তার সুখী হবে তো?

অবশ্য সে নিজেকে এটাই বুঝিয়েছে যে, তার বিয়েটাও তো বাবা-মা দিয়েছিল। ঘর, বর দেখেই দিয়েছিল কিন্তু সব থেকেও সে যে কখনও সুখী হতে পারল না তা কী তার বাবা-মায়ের দোষ? সে কী বাবা, মাকে দায়ী করেছে কখনও এই জন্যে? এমনকী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিংশুককেও দায়ী করতে পারে কী? বলতে পারে যে এই বিয়েটা একটা ভুল বিয়ে ছিল? নাহ্!—খুব গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তৃষা একটা তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল অতিথি সৎকারে। পৃথাকে বলল, 'পৃথা, এবার এক রাউন্ড কফি হয়ে যাক। ঠাকুরদের বল তো গিয়ে।'

শাড়ির বাক্স খুলতে খুলতে যেই সোনালি বেনারসিটা বেরল, সব্বাই সুখ্যাতি করতে লাগল শাড়িটার। রিসেপশনে এটাই পরানো হবে নতুন বউকে। জানিয়ে দিল তৃষা!' বড়ো জা অমনি শাড়িটা তৃষার কোলে জমা করে দিয়ে বলল, 'এই শাড়িটার সঙ্গে তুই লেখ তৃষা!' সুদৃশ্য রাইটিং প্যাড আর গোল্ডেনে গ্লিটারি কলম এগিয়ে ধরল পাশ থেকে কেউ। 'কী লিখবি দিদি?' বড়ো বড়ো চোখ করে জানতে চাইল পৃথা।

কী লিখবে তৃষা?—নিমেষে, প্রায় অকারণেই চোখে জল চলে এল তার। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল তাতে। সে তো মেয়ের মা নয়, মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে সব সাধ্য মতো সাজিয়ে গুছিয়ে—তা তো নয়। সে হল ছেলের মা। কিছুই হারাচ্ছে না সে, বরং নতুন একটা অস্তিত্বের আগমনে কানায় কানায় ভরে উঠতে চলেছে তার সংসার। তা হলে চোখে জল আসছে কেন? ভিতরে মৃদু একটা কষ্ট হচ্ছে কেন এখন? কত ঝড়ঝাপটা সামলে, কত ঝক্কি পোহাতে পোহাতে, বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়েই তো সে-ও এতটা বড়ো করেছে সন্তানকে। ছেলের বউ আনছে মানে আজ কী তৃষাও ছেলেকে সমর্পণ করছে না পরের মেয়ের হাতে? এবার তো বহু বছরের কিছু দায়দায়িত্ব থেকে তার ছুটি। খুঁটিনাটি হাজার প্রয়োজনে ছেলে তো আর মা, মা করবে না! অনেক রকম ব্যাবহারিক অভ্যেস বদলে যাবে এবার। ছেলে, ছেলের বউ মিলে এবার আলাদা একটা ইউনিট—এটা তো একটা সত্যি, তাকে সেটা মেনে নিতে হবে। বুঝতে হবে বাবা-মা সেখানে এক সংসারে থেকেও বাইরের লোক সময়ে সময়ে।

সামনে বসে আছেন বড়ো জায়ের মা, সারাজীবন বেথুন স্কুলে ছাত্রী পড়িয়ে চুল পাকিয়েছেন। মানুষটা এখনও শক্তপোক্ত, পাট পাট করে টাঙাইল পরা, ডান মণিবন্ধে ঘড়ি, গলা থেকে ঝুলছে মোবাইল ফোন, পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন। গৌরব বড়ো ভাসুরের ছেলে, এখন বম্বেতে থাকে, বউ মেয়ে নিয়ে আজ সন্ধেবেলা কলকাতায় পৌঁছচ্ছে—ওরই বিবাহের প্রাক্কালে মাসিমা এ রকম কিছু কথা বলেছিলেন সবার সামনে বড়ো জা সুতপাকে। মাসিমার সে দিনের কথাগুলো তার মনে গেঁথে আছে কিন্তু এই যে এখন চোখে জল এল ওই কথাগুলোর মতো কিছু ভেবে এল যে তা তৃষার মনে হয় না! আসলে সোনালি বেনারসি কোলে এসে পড়া মাত্র একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে ভেসে উঠল তার। কত পুরোনো ঘটনা, স্মৃতি যে সেই ঘটনাকে এমন করে আগলাছে এতকাল যাবত তাই ভেবেই আশ্চর্য লাগছে তৃষার! পাপাই তখন কত বড়ো হবে? এগারো বারো? লা-মার্টিস-এ পড়ত পাপাই। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় সিরাজ থেকে বিরিয়ানি তুলে নিয়েছিল তৃষা ছেলের জন্যে! সে দিন বাড়ির সবাই একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নে গেছে। বিকেলের দিকে তারও যাওয়ার কথা ছেলে নিয়ে। কিন্তু তার মেজাজটা ভালো ছিল না একটুও। সেই সময় তার মুড সুইং হত খুব, এক দিকে শরীর শরীর চাইত, অন্য দিকে কিংশুকের সঙ্গে কিছুতেই শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে ইচ্ছে করত না তার। দায় পড়ে যতবার ঘটত ব্যাপারটা বিরক্তিতে ভরে থাকত মন।

বাড়ি ফিরে একটা প্লেটে বিরিয়ানিটা বেড়ে পাপাইকে খেতে দিয়েছিল তৃষা। তারপর ঠাকুরকে বলেছিল তার জন্যে ওপরে দুপুরের খাবার না আনতে, সে খাবে না, ইচ্ছে নেই। ঘরে এসে চুপচাপ চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল তারপর।

ঘুম নয়, একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে চোখ মেলে সে দখল পাপাই তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে ধরা বিরিয়ানির প্লেট। পাপাই ডাকল তাকে, 'মা, একটু খাও!' ছোট্ট মুঠোর মধ্যে একটু বিরিয়ানি, তৃষা হাঁ করল, পাপাই খাইয়ে দিল তাকে, খেতে গিয়ে সে দেখল সব কিছু একটু একটু দিয়েছে তাকে পাপাই। একটু আলু, একটু মাংস, একটু ডিম ভেঙে ভেঙে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে একটাই প্রতিক্রিয়া সমস্ত হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে এসেছিল তার—সে পাপাইয়ের মাথা বুকে টেনে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'ভালো থাকো পাপাই, অনেক আশীর্বাদ করি তোমাকে সোনা, বড়ো হও, সুখে থাকো, ভালো থাকো!' সে বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিল পাপাইকে আঁকড়ে ধরে। আশীর্বাদটাকে কী কখনও বিশ্বাস করেছে তার প্রজন্মের মানুষরা? কিন্তু সে টের পেয়েছিল সে দিন কানায় কানায় ভরে ওঠা মাতৃস্নেহ জিভে ভর করেছিল তার যেন, অন্তর নিংড়ে বেরিয়ে এসেছিল ঢেউয়ের পর ঢেউ, শুভাকাঙ্ক্ষা! শব্দগুলোর মানে, কোথায় কীভাবে তার উৎপত্তি বুঝেছিল প্রথমবার। সে যদি লিখতে পারত তা হলে এটাই প্রকাশ করত ভাষা দিয়ে, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠছে পাপাইকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তৃষার। মিঠু, পাপাই আর তুমি সুখে থাকো, ভালো থাকো, পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে থাক তোমাদের জীবন। আমি আশীর্বাদ করি, আশীর্বাদ করি, আশীর্বাদ করি!' এ ছাড়া আর কিছু লেখার নেই তৃষার, চূড়ান্ত আবেগকে বাকি সবার কাছ থেকে আড়াল করতে করতে সেটাই কোনোমতে লিখে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল সে।

নির্বিঘ্নে মিটে গেল বিয়েটা। বউভাতের পরের ভোরেই মিঠুকে নিয়ে হানিমুনে চলে গেল পাপাই। মরিশাস! গৌরব এ ব্যাপাবে ট্রেন্ড-সেটার। বিয়ে করে গৌরব হানিমুন করতে গেল মরিশাস। তারপর থেকে এ বাড়ির যত ছেলেমেয়ের বিয়ে হল সব হানিমুনে মরিশাসেই গেছে। পাপাই আর মিঠুর পনেবো দিনের ট্যুর। ওদের কেন্দ্র করেই এত মানুষ জড়ো হয়েছিল, এত হইহুল্লোড়, এত ক্রিয়াকর্ম, হাঁকডাক। বউভাতের পরের দিনই ওরা চলে যেতে তৃষার মনে হল সব কলকাকলি, মুখরতা যেন ভুস করে ফুরিয়ে গেল। ফাঁকা হয়ে গেল! আর কিছু করার নেই। বাড়িটা যেন ভাঙা হাট। সে ভাবল, পাপাইকে তারই বারণ করা উচিত ছিল। তিন-চারটে দিন পার করে গেলেই ভালো করত ওরা!

দেড় দিনের মধ্যে যে যার স্বস্থানে ফিরে গেল আত্মীয়স্বজন। বিকেলের দিকে সেজেগুজে সে-ও অরুণিমার মেয়ের বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে গেল। পাপাইরা নিরাপদে পৌঁছে গেছে—সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত লাগছিল তার। অরুণিমার মেয়ের সঙ্গে একবার পাপাইয়ের বিয়ের কথা উঠেছিল। মধ্যস্থতা করেছিল রিমা, বিয়ের সাজে অরুণিমাকে দেখতে দেখতে তৃষা বলেই ফেলল কথাটা রিমাকে ফিসফিস করে, 'মিঠুকে অনেক মিষ্টি দেখতে রূপার থেকে। ওর চেহারায় একটা অন্য দীপ্তি আছে, যাই বলিস!'

রিমা দুম করে বলল, 'সব দেখে, বিচার করেই তো এনেছিস ছেলের বউ তৃষা। এবার তোর ছেলের মনে ধরলেই হল।'

আর পনেরো দিন নয়, মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় মিঠুকে নিয়ে মরিশাস থেকে ফিরে এল পাপাই! বাড়িসুদ্ধ লোক ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওদের দেখে। মিঠুর মুখে যেন শোকের ছায়া! পাপাই উদভ্রান্ত! এক পরিবার স্তম্ভিত মানুষের সামনে দিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল ওরা,

একটা শব্দ উচ্চারণ করল না! কারো সাহসও হল না কিছু জিজ্ঞেস করার! তৃষা দেখল কিংশুক ইজিচেয়ারে বসে দরদর করে ঘামছে। সে গিয়ে দাঁড়াতে বলল, 'কী হতে পারে?' প্রশ্নটা শুনে ভয়ঙ্কর আক্রোশে তৃষা তাকিয়ে রইল কিংশুকের দিকে।

এর কিছুক্ষণ পরেই সে দেখল মিঠু পোশাক পালটে একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে, হাতে ধরা ছোটো একটা ব্যাগ—সিঁড়ি বেয়ে নামছে! তৃষা পড়িমরি দৌড়ল, 'মিঠু কোথায় যাচ্ছ?' প্রেশার চড়ছে বুঝতে পারল তৃষা, মাথা দপদপ করছে, যাই ঘটুক না কেন তা যে আত্মীয়বন্ধু, এই পরিবার সব কিছুর সামনে তাদের ছোটো করে দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে কী তারা জীবনে কখনও পড়েছে?

উত্তর দিল না মিঠু, মাঝ সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা নীচু, থুতনিটা বুকে ঠেকে গেছে, ভঙ্গি দেখে মনে হবে মেয়েটা জানে ও যেটা করছে তা মারাত্মক ভুল, কিন্তু মেয়েটা তা করবেই, এমন জেদ!

সে আর কিছু বলার আগেই পাপাই বেরিয়ে এল। পোশাকটোশাক পরে তৈরি. যেন অফিসে বেরচ্ছে, তাকে দেখে পাপাই বলল, 'মা, আমি ওকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব, ওদের বাড়িতে ফোন করে দিয়েছি যে ও যাচ্ছে।'

বড়ো জা, মেজ জা উঠে এসেছে তিনতলায়, বড়ো জা বলল, 'পাপাই, আমাদের একটু বল কী ব্যাপার? হানিমুন শেষ না করে ফিরে এলি কেন? কী হয়েছে, কোথায় সমস্যা? তা ছাড়া মিঠু কার অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে? তুই কী একে যেতে বলেছিস? দু-মিনিট বসে কথা বললে কী ক্ষতি হবে তা তো বুঝতে পারছি না। মায়ের সঙ্গে কথা বল—তারপর যদি মিঠুকে যেতেই হয় তা হলে না হয় বিকেলের দিকে...।'

পাপাই চোয়াল শক্ত করে শুনছিল কথাগুলো। এই অবধি এসে বাধা দিল, 'আমি যেটা করছি সেটা করতে দাও, রাতে কথা বলব।' মিঠুকে 'চলো' বলল পাপাই, মিঠু টলতে টলতে নামতে লাগল। তৃষা হঠাৎ বলে উঠল, 'মিঠু, তুমি আবার আসবে তো। মানে তুমি কী...।' মিঠু তাকাল না, দুদ্দাড় করে নেমে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে!

সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বড়ো আর মেজ জা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কিছু। তৃষা পাপাই আর মিঠুর ঘরে প্রবেশ করল গিয়ে এবং নিজেরই খটকা লাগল তার পাপাই আর মিঠুর ঘর ভাবতে! কতখানি মন থেকে গ্রহণ করেছিল সে মিঠুকে, নইলে সাত দিনও হয়নি পাপাইয়ের নামের পাশে পাশে মিঠুর নাম উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাতসারে। ঢেলে সাজিয়েছিল দুটো ঘর, টয়লেট! কোনো কার্পণ্য করেনি। কিংশুক 'এত খরচ, এত খরচ!' করলে দাবড়ে দিয়েছে তৃষা! রাস্ট রঙা পরদাগুলো, তাতে কালো ব্লক প্রিন্ট করিয়েছিল সে, উজ্জ্বল পরদাগুলো তার চোখে এখন ফ্যাকাশে, প্রাণহীন লাগছে। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে পাপাইদের লাগেজ, একটা লণ্ডভণ্ড দশা ঘরটার। হাউসকোটের পকেট থেকে মোবাইল বের করে পাপাইকে ফোন করতে চাইল তৃষা কিন্তু তার আগেই বেজে উঠল ফোনটা, গৌরব! 'ছোটাকাকি, আমি পাপাইকে ফোন করলাম, প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই বলতে চাইছিল না, তারপর চেপে ধরতে একদম ভেঙে পড়ল ও!'

শুনতে শুনতে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল তার! পাপাই ভেঙে পড়েছে, কেঁদে ফেলেছে? তার পাপাই? যার চোখের জল চোখ থেকে উপচে পড়তে দেয়নি সে কখনও! সাত মাসে জন্মে গিয়েছিল, কী কষ্ট করে বাঁচাতে হয়েছে ওকে। তৃষার মা দিনের পর দিন বাচ্চা কোলে ঠায় বসে। তারপর পাপাইয়ের সর্দির ধাত, বেচারি নিঃশ্বাস নিতে পারত না যখন বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকত একমাত্র তার মুখের দিকে। যেন বলত, 'মা বাঁচাও!' তৃষা পাগল হয়ে যেত

ছেলের কষ্ট উপশম করতে না পারলে। আজ তার সেই পাপাই কাঁদছে? আর কাঁদাচ্ছে মিঠু?

গৌরব বলল, 'ছোটোকাকি, আমি আজ বিকেলের মধ্যে কলকাতায় নামছি। তোমরা আর পাপাইকে বেশি খোঁচাখুঁচি কোরো না। আমি গিয়ে কথা বলব ওর সঙ্গে। দরকার হলে সমস্যা না মেটা অবধি আমি কলকাতাতেই থাকব!' গৌরবের বউ একবার ফোন চেয়ে নিয়ে কথা বলল তার সঙ্গে, 'তুমি চিন্তা কোরো না ছোটোকাকি! আজকালকার ছেলেমেয়ে, হয়ত কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে দুজনের মধ্যে। ওরা ভাবে ওরা আগের জেনারেশনগুলোর থেকে অনেক বেশি প্র্যাক্টিকাল কিন্তু আসলে ওরাই সব চেয়ে বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ে অ্যাট টাইমস।'

চিন্তা করা না করাটা তৃষার হাতে নেই। সে পাপাইয়ের বিছানার ওপর অসহায়ভাবে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল এবং বড়ো জা এসে ডাকল তাকে, 'তৃষা, তুই মিঠুর বাড়িতে ফোন করো, এটা তো করতেই হবে। এতক্ষণে ওরাও নিশ্চয়ই মাথা খারাপ করছে। তা ছাড়া মিঠু বাড়িতে কী বলল না বলল সেটাও তো শোনা দরকার।' মেজ জা বলল, 'নতুন বউ, কীভাবে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে? মিঠু তো এ বাড়ির বউ তৃষা! এই বাড়ির একটা মানসম্মান নেই? যাকে অত আদর করে, সাজিয়ে গুছিয়ে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে আনা হল সে রাজ্যের লোকের সামনে মুখ চুন করে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল। কী খারাপ যে লাগছে এখন!'

নানা শঙ্কায় দুলতে দুলতে তৃষা ফোন করল মিঠুর মায়ের মোবাইলে। অনেকক্ষণ বাজার পর ফোন ধরলেন মিসের বোস। গলাটা ভেঙে বসে গেছে একেবারে, 'আমিই আপনাকে ফোন করতাম তৃষাদি।' থেমে থেমে ভদ্রমহিলা, 'মিঠুর বাবা তো তৈরি হয়ে বেরচ্ছিল, আপনাদের ওখানে যাওয়ার জন্যে।'

—মিঠু কী পৌঁছেছে? জানতে চাইল সে।

—হ্যাঁ, কৃশানু নামিয়ে দিয়ে গেল...। সুপ্রিয়া কথাটা শেষ করতে পারলেন না, কেঁদে ফেলল, 'আমাদের মুখ একদম পুড়িয়ে দিল মিঠু! মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিল। ওর ওপর ভরসা করেই তো আমরা এতদূর এগিয়েছিলাম তৃষাদি, নইলে এখনকার ছেলেমেয়ে, তাদের তো হাত-পা বেঁধে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায় না?'

সে খুব ধীরে ধীরে প্রশ্নটা বের করল, 'আপনারা কী জানেন সমস্যাটা কী? দেখুন সুপ্রিয়াদি, আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। এখানে আমাকে অসংখ্য মানুষকে জবাবদিহি করার একটা ব্যাপার আছে। নতুন বউ, এভাবে চলে গেল? আমরা কী কেউ নই? যদি পাপাইয়ের কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে....।'

—কোনো ত্রুটি নয়, কোনো ত্রুটি নয়...। সুপ্রিয়া হু হু করে কাঁদতে লাগল, 'এত কিছুর পরও আপনারা এত ধৈর্য দেখাচ্ছেন, সো কাইন্ড অফ ইউ তৃষাদি...।'

সুপ্রিয়া কাঁদছে, তৃষা ফোন কেটে দিল।

এরপর ক্রমশ ঘোরাল হয়ে উঠল পরিস্থিতি। গৌরব এয়ারপোর্ট থেকে সোজা পাপাইকে মিট করল সে দিন। সম্ভবত কোনো বারেটারে গিয়ে বসেছিল ও ভাইকে নিয়ে। দুজনে যখন ফিরল তখন রাত এগারোটা। ফিরে পাপাইকে ও বলল, 'তুই যা, একটা শাওয়ার নিয়ে শুয়ে পড় পাপাই।' একবার তৃষার মুখের দিকে তাকাল পাপাই, কাঁধে হাত রাখল, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল তারপর। সবাইকে শুনিয়ে গৌরব বলল, 'আমি ফ্রেশ হয়ে এসে কথা বলছি ছোটোকাকি।'

এই সময় রক্তের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস টের পেল তৃষা। পাপাইয়ের মুখ সে আগেও একবার দেখেছে। বহু বছর আগে, যখন খড়্গপুরে পড়ত পাপাই। যশবিন্দর নামের একটা পাঞ্জাবি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও। কিন্তু মেয়েটা পাপাইকে কোনোদিন সিরিয়াসলি নেয়নি। অনেকের সঙ্গে ঘুরত, ফ্লার্ট করত—পাপাই ছিল তেমনই একজন। পাপাই বরাবর পড়াশুনোয় খুব ভালো,

এমনিতে ধারাল ছেলে কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে একদম সরল শিশুর মতো। নইলে কেন বুঝতে পারল না যে যশবিন্দর ওকে নিয়ে স্রেফ খেলছে?

সময়টা এখনও মনে আছে তৃষার, পুজোর ছুটির পর ক্যাম্পাসে ফিরেই আবার বাড়ি চলে এল পাপাই। গায়ে জ্বর, চোখ লাল, ভিতরে গুমরচ্ছে একটা কান্না। অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে জেনেছিল ব্যাপারখানা—যশবিন্দরকে অন্য কারো সঙ্গে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখে ফেলেছিল পাপাই। মনের সেই চোট অনেক বছর লেগেছিল ওর সারতে। তারপর যতবার তৃষা জানতে চেয়েছে, 'কী রে, প্রেম ট্রেম কিছু করছিস?' পাপাই বলেছে, 'এখন ও সব নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার সময় নেই মা।'

নিজের ঘরে গৌরব শুধু মা-কাকিমাদেরই ডেকে নিল। মাত্র বছর খানেক আগে মিঠুরা একটা ব্যান্ড ফর্ম করেছে নিজেদের। ধ্রুপদী সংগীত এবং জ্যাজ মিলিয়ে মিশিয়ে গায় ওরা, নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করে। জ্যাজ গায় যে ছেলেটি তার নাম রবার্ট। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, খ্রিস্টান ছেলে। ছেলেটার সঙ্গে মিশতে মিশতে কবে যে মিঠু ছেলেটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ও নিজেও বুঝতে পারেনি। ও নিজেও জানত এই এই প্রেমের কোনো মানে নেই। বাবা-মাকে সেভাবে রবার্টের কথা বলেওনি মিঠু কারণও জানত বাড়ির তরফ থেকে কোনো সাড়াই পাবে না। তা ছাড়া রবার্টের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। উড়নচণ্ডী টাইপের, রোজগারের অবস্থাও তথৈবচ। এ সব জেনেও মিঠু রবার্টের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেনি। দিনে দিনে সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে! কী আশ্চর্য মেয়ে, এরই মধ্যে বিয়েতে মত দিয়েছে মিঠু এবং এ বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পর রবার্টকে ছাড়েনি ও। বিয়ের মাত্র হাতে গোনা কটা দিন আগে রবার্টকে বিয়ের কথা জানায় মেয়েটা, সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে, বিয়ের পর ও আগের মতোই ব্যান্ডে থাকছে ও, ফলে রবার্টের সঙ্গে আগের মতোই থেকে যাবে ওর যোগাযোগ।

সত্যিই হয়ত এভাবেই চালিয়ে যেত মিঠু, কী সৃষ্টিছাড়া মেয়ে বাবা! কিন্তু এত ধূর্ত মেয়ে, এত ঠান্ডা মাথার মেয়েও সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় যখন মরিশাসে পৌঁছে বাড়িতে ফোন করে বোন দুতুনের কাছে আর জানতে পারে বেশি মাত্রায় ড্রাগ নিয়ে ফেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে রবার্ট। মিঠু ভেঙে পড়ে, ভয়েই হোক, আবেগবশতই হোক পুরোটাই ও নিজের মুখে স্বীকার করে পাপাইয়ের কাছে।

পাপাই নাকি জানতে চেয়েছিল, 'তুমি কী করতে চাও? তুমি কী ওর কাছেই ফিরে যেতে চাও? তা হলে কিন্তু এখনও দেরি হয়নি।' উত্তরে মিঠু বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল।

গৌরবের কথা শেষ হওয়ার পর ঘরে পিন ড্রপ সাইলেন্স। প্রথমে মেজ জা কথা বলল, 'কী গেছে ভাবো পাইপটার ওপর দিয়ে! ও বলে তাই, অন্য কোনো ছেলে হলে এই মেয়েকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে ফেলত।'

গৌরব বলল, 'এ সব কমেন্ট কোরো না মেজকাকি। পাপাই যেভাবে হ্যান্ডেল করেছে ব্যাপারটা—তা আমাদের বাড়ির ছেলে বলেই পেরেছে। ফেরার সময় প্লেনে সমানে বমি করতে করতে এসেছে মিঠু।' পাপাই আমাকে বলল, 'আমার মর্মান্তিক লেগেছে সবটাই, বড়দা, কিন্তু রাগ হয়নি মিঠুর ওপর। অত বমিটমি করছিল, আমি সাধ্য মতো হেল্প করেছি ওকে।'

তৃষা খুব কেটে কেটে জানতে চাইল, 'ওদের কী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গৌরব।'

গৌরব দু হাত তুলল, 'না, হয়নি। থ্যাংক গড!'

তৃষা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। বড়ো জা বলল, 'এবার কর্তব্য কী? এইখানে গৌরব হাসল অদ্ভুতভাবে, 'কর্তব্য তো খুব সহজ ছিল মা। মিঠুর জিনিসপত্র সব ঠিক মতো প্যাক করে পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর একজন বড়োসড়ো লইয়ারকে কনসাল্ট করা, একটা ডিভোর্স-স্যুট করা, তারপর লড়ে হোক, মিউচুয়ালি হোক মিটিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা! কিন্তু...!'

—কিন্তু? বলে উঠল মেজ জা, 'এর মধ্যে কিন্তু কীসের?'

—কিন্তু পাপাই ডিভোর্স চাইছে না। পাপাই বলছে...হি ইজ ইন লাভ উইথ দিস গার্ল

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকছে তৃষা—তার ছেলে এমন একটা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে যে ঘটনাক্রমে ওর স্ত্রী অথচ আজ ওর ধরাছোঁয়ারও বাইরে!' রাগে দুঃখে পাথর হয়ে যাচ্ছে সে।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন পাপাইকে টলানো গেল না তখন ক্ষান্ত দিয়ে মুম্বই ফিরে গেল গৌরব। গেল বেশ রেগেমেগেই। এর মধ্যে মিঠুর বাবা-মা একদিন ঘুরে গেলেন এ বাড়িতে। কিংশুক ওদের সঙ্গে কথাই বলতে রাজি হল না, ঠেলে দিল তৃষাকে। তৃষা বলল, 'তুমি কেন কথা বলবে না? তুমি তো ছেলের বাবা! কথা তো বলা উচিত তোমারই।' কিংশুক বলল, 'অসম্ভব! তুমি তো জানো রেখে গেলে আমি ভুতলে যাই।'

প্রচণ্ড হতাশায় তৃষা বলে উঠল, 'তাই তুমি কখনও রাগলে না, না?' তার বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস পড়তে লাগল কিংশুকের সঙ্গে কথা চালাতে গিয়ে।

কিংশুক বলল, 'কর্মচারীদের ওপর চোটপাট করতে বলো, আমি পারব। কিন্তু সমানে সমানে যে তর্ক করবে, তার সঙ্গে আমি পারব না! তুমি জানো না তৃষা, যুক্তিফুক্তি কেমন গুলিয়ে যায় আমার? নতুন দেখছ আমাকে?'

কিংশুককে খোঁচা দেওয়ার জন্যে তৃষা বলল, 'তা হলে মনে রেখো, ছেলের ব্যাপারে আমি যা বলব তাই হবে। পরে তুমি কোনো ছেঁদো কথা বলতে পারবে না, কোনো গাঁইগুঁই চলবে না। তুমি যখন এতই অপদার্থ একটা লোক, তখন এ সবে তোমার থাকা না থাকা সমান।'

পুরুষত্বহীন একখানা লোক যা হোক, বলল, 'না, না, আমার এ সবে না থাকলেও চলবে। তুমি যা ভালো বুঝবে করো তৃষা।'

কিন্তু যা ভালো বুঝবে তা করার কোনো উপায় রইল না তৃষার। ছেলেই তো বিগড়ে গেছে তার। সে যতবার বলেছে, 'কেন তুই ডিভোর্সের জন্যে আপিল করবি না? কেনই বা তুই মিঠুকে ডিভোর্স দিতে বলবি না?' ততবার পাপাইয়ের সেই এক কথা, 'মিঠু তো বলছে না মা যে ও বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়, ও তো শুধু বাবা-মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল! ও যে দিন নিজে বলবে যে ও আর ফিরছে না একমাত্র সে দিনই...আই মিন এ সব ভাবা যেতে পারে!' কী শান্ত, কী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলে তার।

তৃষা খেপে ওঠে, 'তুমি কী বলতে চাও পাপাই। মিঠু যদি চায় তা হলে ও আবার এ বাড়িতে ফিরে আসতে পারে?

—নিশ্চয় পারে মা!

—তুমি ওকে ফিরিয়ে নেবে?

—নেবো!

—পাপাই, তোর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে! তোর সঙ্গে ওর কথা হয়?

—হয়।

—হয়।

—হুঁ!

—কী বলে ও? কী চায় ও?

—কী যে চায় সেটা মিঠু নিজেই জানে না এখন। বাড়িতে এখন ও খুব কর্নারড, বাবা-মায়ের সঙ্গে নিত্য ঝামেলা, রবার্টের সঙ্গেও যোগাযোগ হচ্ছে না, ছেলেটাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। ও বেচারি খুব একা পড়ে গেছে। এ সবই বলে আমাকে! ইনফ্যাক্ট ওর বাড়িতে ওর এখন এত অসুবিধে হচ্ছে সব ব্যাপারে যে, আমি ওকে বললাম এখানে চলে আসতে!

—অ্যাঁ?

—কিন্তু ও তোমাদের ভয় পাচ্ছে! আমি বলছি কেউ কিছু বলবে না, আমার মা তো ওরকম মানুষই নয়, তাও ওর ভয়, সবাই তোমরা নাকি ওকে দেখেই জল দিয়ে গিলে খেয়ে নেবে!

—মা গো, কী মেয়ে দেখো, আমাদের বিরুদ্ধে তোকে উসকাচ্ছে!

পাপাই না, না করে উঠল, 'ও ভয় পাচ্ছে মা, বাড়িতে কত প্রেশার, তুমি জানো ওর বাবা-মা ওকে রোজ বলছে হয় ও ডিভোর্স পেপারে সাইন করুক, নয় ও ফিরে আসুক এখানে। আমাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিক—এ দিকে মিঠু নিজেই জানে না, কোনটা করলে ও নিজে স্বস্তি বোধ করবে।'

তৃষা পুরো যাকে বলে বোকা বনে গেছে, 'তোর অপমানিত লাগে না নিজেকে পাপাই? তোর মেরুদণ্ড নেই?'

পাপাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, 'কী করব মা, আমি তো ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি ওকে বলেছি আমি আছি ওর সঙ্গে। দরকার হলে রবার্টকে খুঁজে দিতে পারি। মা, অ্যাম হ্যাপি, দ্যাট অ্যাম ইন টাচ উইথ হার। মা, ও আমার বউ, সমস্ত রিচুয়ালস মেনে ওকে গ্রহণ করেছি আমি।'

তৃষা দেখে পাপাইয়ের চোখ ছলছল করছে। তার মনে হয় ফোন করে যা তা বলে মিঠুকে, 'এত বড়ো সর্বনাশ করেও শান্তি হল না? আমার ছেলেটার মনটা নরম দেখে ওকে এইভাবে ইউজ করছ মিঠু তুমি? খেলছ ওকে নিয়ে? ছলনা করছ ওর সঙ্গে?'

পাপাইয়ের চোখে জল, তৃষা জানে যে পাপাই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে সমানে কিন্তু এই তো এইটুকু ছেলে, ওর মনের মধ্যে অহোরাত্রি কী বিষম যন্ত্রণা, কী দ্বন্দ্ব! তৃষা বুঝতে পারে পাপাই ছটফট করছে ভিতরে। আজকাল প্রায় দিন সে রাতে উঠে পাপাইয়ের ঘরে কান পাতে, ঘরে আলো জ্বালা, পাপাই গান শুনছে, ও কী ঘুমোতে পারছে না? সারা দিন এত পরিশ্রমের পরও ও ঘুমোতে পারছে না? অকারণ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢুকে গেছে পাপাইয়ের জীবন—কীভাবে ছেলেটা বেরবে এর মধ্যে থেকে?

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় দু'মাস। অফিস থেকে ফোন করে পাপাই বলল, 'মা, আমি আজ রাতে বম্বে যাচ্ছি। মিঠুও আমার সঙ্গে যাচ্ছে।'

আকাশ থেকে পড়ল তৃষা, 'মানে?'

—হ্যাঁ, জানোই তো ও ভালো নেই। বলল তোমার সঙ্গে যাব, তিন দিনের ট্যুর, ওর ওখানে কে পুরোনো বন্ধু আছে। আমার তো প্রচুর কাজ থাকবে, 'মিঠু ওর বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করুক, ঘুরুক ফিরুক!

তৃষা চিৎকার করল, এটা জেনেই যে কিছুই কোনো হাতে নেই তার, 'কী হিসেবে যাচ্ছে ও তোমার সঙ্গে? তোমার বউ হিসেবে? গার্লফ্রেন্ড হিসেবে? ওর বাবা-মা যে বলে যাচ্ছে সমানে ওকে ডিভোর্সের জন্যে রাজি করিয়ে ফেলেছে। এই তার প্রমাণ? না, পাপাই, তুমি ওকে নিয়ে যাবে না?'

—প্লিজ মা...কেন রাগ করছ?

—ও তোমাকে ইউজ করছে পাপাই। তুই আমার একটা মাত্র ছেলে, কত কষ্ট করে তোকে বড়ো করেছি। কেউ তোকে নিয়ে মজা করবে, তোর জীবন নিয়ে খেলবে এ আমি কী করে দেখে চোখ বুজে থাকব? এক দিন নয় পাপাই, দীর্ঘ এতগুলো বছর ধরে তোর জীবনটা যাতে সুন্দর হয় সেই চেষ্টা করেছি আমি। তুই তো ছিলিস আমার সব! তুই না থাকলে হয়ত এই সংসার থেকে আমি কবেই বেরিয়ে যেতাম পাপাই। আমার বাবা-মা আমি ফিরে গেলে মাথায় তুলে

রাখত। একটা দিনের জন্যেও তোর বাবাকে আমি ভালোবাসতে পারিনি। মানুষটাকে আমার কোনো দিনও মনেই ধরেনি। কিন্তু কীভাবে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম শুধু তোর মুখ চেয়ে! আমার আপশোশের শেষ নেই পাপাই, তুই জানিস না, আমার আপশোশের শেষ নেই...।' আচমকা থেমে গেল তৃষা, বলতে বলতে কাঠ হয়ে গেল সে।

পাপাই বলল, 'মিঠুও তো তাই বলে, বলে যে ও আমাকে কখনওই সেরকম ভালোবাসতে পারবে না। যদি ফিরে আসে হয়ত থাকতে থাকতে একটা অভ্যেসের সম্পর্ক গড়ে উঠবে ওর আমার সঙ্গে। যেমন ওর বাবা-মায়ের মধ্যে হয়েছে। আমি বলি, হ্যাঁ, আমাদের বাচ্চাটাচ্চা হবে, তাদের দায়দায়িত্ব পালন করতে করতে কেটে যাবে একরকম। যেমন আমার বাব-মায়ের হয়েছে।'

তৃষার গলা শুকিয়ে গেছে, 'তোরা এইসব বলিস, এইসব ভাবিস?'

—হয়ত এতটা নির্মোহভাবে বলি না—তুমি তো জানোই মা, আমি আমার বাবারই ছেলে। তুমি বাবাকে ভালো না বাসলে কী হবে, বাবা তো তোমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না! আর একটা কথা কী বলো তো, তোমার আর বাবার মধ্যে বিন্দুমাত্র কমিউনিকেশন নেই। তাতেই সাতাশ বছর কাটিয়ে দিলে। আমার আর মিঠুর মধ্যে তো একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আজকাল তো বক বক করেই যায় মিঠু। আমি শুনতে শুনতে পাষাণ হয়ে যাই! মা, মেয়েটার কিন্তু মাথায় একটু ছিটও আছে। কয়েকটা স্ক্রু ঢিলে।'

—পাপাই আর বলিস না পাপাই, আমার এবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

পাপাই হো হো করে হাসে তার কথা শুনে।

মিঠুকে নিয়ে পাপাই বম্বে ঘুরে আসে। আবার বেশ কিছু দিন কেটে যায়। একদিন পাপাই সন্ধেবেলা মোবাইলে ফোন করে তাকে। তৃষা তখন ক্লাবে। পাপাই বলে, 'মা, মিঠুকে নিয়ে বাড়ি আসছি আমি, মিঠু ক দিন থাকবে!'

—ছেলেটা আমার এক নম্বরের ভেড়া একটা? রিমাকে এই কথা বলে তৃষা পড়িমরি বাড়ি ফিরে আসে। দেখে পাপাইয়ের ঘর আলো করে চুপচাপ বসে আছে মিঠু। শাড়ি পরে এসেছে। পাপাইয়ের মুখটা কী খুশি খুশি। আর বাড়িসুদ্ধ সবাই হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। সে নিজের ঘরে ঢুকে যেই গজ গজ করতে শুরু করেছে, কিংশুক বলে ওঠে, 'তৃষা, তুমি ওদের ঘরের মধ্যে কোনো কথা বলবে না, ওরা যা পারছে করুক, তুমি আমার সঙ্গে ক্লাবে চলো।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম আটকাচ্ছে কিংশুক। তৃষা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে স্বামীকে, 'তুমি আমাকে বলছ?'

কিংশুকের গলা আরও জোরালো শোনায়, 'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি! সব ব্যাপারে নিজের মতামত দেওয়ার তো প্রয়োজন নেই। এটা ওদের জীবন।'

তৃষা স্বামীর সঙ্গে সত্যিই আবার ফিরে যায় ক্লাবে। মিঠু থাকে তিনটে দিন। তারপর চলে যায়, আবার আসে, আবার থাকে কটা দিন, আবার চলে যায়, আবার আসে, নিজেদের ঘর গোছায়। তৃষাকে কিচেনে হেলপ করে টুকটাক। পাপাই অফিসে বেরিয়ে গেলে ওদের ঘর থেকে মিঠুর রেওয়াজের শব্দ ভেসে আসে। তারই মধ্যে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফোনে কার সঙ্গে কথাও বলে দীর্ঘ সময় ধরে। তৃষার ভয়ে হিম হয়ে যায় বুকটা, রবার্ট কী? তার মনে হয় এই মেয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই, যে কোনো দিন চলে যাবে রবার্টের সঙ্গে। আর পাপাইটা শেষ হয়ে যাবে। এই চিন্তায় ঘুমের মধ্যেও সে এ পাশ ও পাশ করে। কিংশুক বলে, 'কী হল তৃষা? শরীর ঠিক আছে তো?' তৃষা উঠে বসে বিছানায়। বলে, 'একটু জল খাব। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে শরীরে, প্রেশারটা বেড়েছে মনে হচ্ছে।'

কিংশুক ব্যস্ত হয়, 'ডাক্তারকে কল দেব?'

—কাল সকালে দিও। আমি একটা ঘুমের ওষুধ খাই বরং, তুমি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও!

কিংশুক বলে, 'দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও!'

তৃষা কিংশুকের হাত চেপে ধরে, 'আমার কিছু হলে তুমি আমার পাশে থাকবে সব সময়।' তার ঠোঁট ফুলে ওঠে, 'পাপাইকেও বলবে যেন এক পা-ও না যায় আমাকে ছেড়ে, না নড়ে।'

কিংশুক বলে, 'যাহঃ, তোমার আবার কী হবে? আমি আছি না?'

ন্যাড়া

অমলা দেবী

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিন কয়েক আগে গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হইয়াছে। রাত্রি বারোটা। বসিয়া বসিয়া প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলাম, এবং মনে মনে ছাত্রদের মুণ্ডপাত করিতেছিলাম। অদূরে খাটের উপর পত্নী গরমে ছটফট করিতেছিলেন, এবং এই পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রকাশ্যে আমাকে ও পুত্রকন্যা-সমেত পত্নীকে দার্জিলিং পাঠাইতে সমর্থ কোনো বড়ো সরকারি চাকুরের সঙ্গে বিবাহ না হওয়ার জন্য স্বগত নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, কে মিহিসুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। কান খাড়া করিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, মেয়েমানুষের কান্না—কোথায় গেলি রে বাপ আমার, একবার দেখা দে বাবা! এই দুপুর-রাত্রে অসহ্য গরমে কাহার আবার কান্নার সখ হইয়াছে। হঠাৎ মনে হইল, পেত্নী নয় তো? পাড়াগাঁয়ে ইঁহাদের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। গা-টা ছমছম করিতে লাগিল। হাঁকিয়া কহিলাম, ওগো! শুনছ? কোনো জবাব মিলিল না। ঘুমাইয়া পড়িল নাকি। আরও একটু জোরে ডাকিলাম, ওগো!

ঝঙ্কার হইল, কেন? কী করতে হবে, কী? সভয়ে কহিলাম, কিছু না। শুনতে পাচ্ছ?

কী?

কে কাঁদছে?

পত্নী ধমকাইয়া কহিলেন, কে আবার? জান না নাকি? ন্যাড়ার মা। পত্নী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রোজই তো কাঁদে, শোনোনি কোনোদিন? জবাব দিলাম না, কিন্তু ন্যাড়াকে মনে পড়িল।

ন্যাড়া আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মহেশ আচার্যের ছেলে। মহেশ কয়লা-খাদে চাকুরি করতেন। এবং চাকুরি করিতে করিতেই পাথর চাপা পড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধবা পত্নীর জন্য পর্যাপ্ত স্মৃতি ও প্রচুর পৈতৃক ঋণ, একটি তেরো বছরের বিবাহযোগ্যা কালো মেয়ে এবং দশ বৎসরের একটি নাবালক ছেলে ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই স্বামীর জন্য কান্নাকাটি শেষ করিতে না করিতেই বিধবা দয়াময়ীকে পাওনাদারদের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইল। জমিজমা, পুকুর, বাগান—যাহা কিছু ছিল দেনার দায়ে সব গেল, রহিল শুধু ভিটাটুকু অর্থাৎ মাটির একটি কোঠা ও খান দুই চালাঘর। দয়াময়ীর বাবা কোনো এক জেলা-শহরের স্কুলে পণ্ডিতী করিতেন। সংবাদ পাইয়া মেয়েকে দেখিতে আসিলেন, শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিয়া শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন, বাছা বাছা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া দয়াময়ীর দুর্ভাগ্যকে তাহার পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়া প্রমাণ করিলেন; কিন্তু কেমন করিয়া ইহার পর দয়াময়ীর দিন চলিবে, মেয়ের বিবাহ হইবে ও ছেলে মানুষ হইবে, তাহার কিছুই হদিস দিতে পারিলেন না। অবশ্য পণ্ডিতকে

দোষ দেওয়াও যায় না—কারণ সর্বস্ব ঘুচাইয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া তারপর পুত্রকন্যা সমেত সেই মেয়ের ভার ঘাড়ে লওয়া কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালি পিতার সাধ্য নয়। দয়াময়ী তাহা বুঝিলেন; কহিলেন, ভিক্ষে করেই হোক, দাসীবৃত্তি করেই হোক দুটো পেট আমি চালিয়ে নিতে পারব বাবা, তুমি শুধু ন্যাড়ার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। ও যদি একটু ইংরেজি লিখতে পড়তে শেখে তো সাহেব চাকরি করে দেবে বলেছে। পণ্ডিত রাজি হইলেন। দিন কয়েক পরে ন্যাড়াকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ইংরেজি শিখিবার জন্য মাতামহের গৃহে পাঠানো হল। দয়াময়ী পাড়ার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে একাধারে ঝি ও রাঁধুনির কাজে ভর্তি হইলেন।

দিন একরকম করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু মেয়ে বড়ো হইতে লাগিল। গ্রামের পুরুষ ও মেয়ে—দুই মজলিসেই আলোচনা শুরু হইল। কিন্তু ভগবান সুরাহা করিলেন। পাড়ায় গগন গাঙ্গুলির পত্নী বহুদিন যাবৎ কাসরোগে ভুগিতেছিলেন। একদিন কাসিতে কাসিতেই হঠাৎ হার্টফেল করিলেন। গগন পত্নীশোকে কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিল বটে, কিন্তু দুই দিন পরেই বিবাহ করিতে রাজি হইল। কাজেই পাড়ার লোকে ধরাধরি করিয়া দয়াময়ীর মেয়ে লক্ষ্মীকে গোটা কয়েক মন্ত্র পড়াইয়া গগনের পাশে দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু যিনি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত স্থান দখল করিতেছিলেন, তিনি উহা সহ্য করিলেন না। বৎসর খানেকের মধ্যেই গগনকে ইহলোক হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মী সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙিযা, সমাজের দেনা মিটাইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

সাত বৎসর পরে। বোধ করি ১৯৩০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। আমি তখন এম. এ. পাস করিয়া আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে সদ্য উন্নীত হাই স্কুলটির কর্ণধারণ করিয়া কোনোমতে টানিয়া লইয়া যাইতেছি, এমন সময়ে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া উঠিল। নেতাদেব মুখ হইতে গরম বুলি ছুটিতে লাগিল, দলে দলে ছেলেরা স্কুল ও কলেজ হইতে বাহির হইয়া গাঁজা ও আফিঙের দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিল এবং দেশের যত তালগাছ কাটিয়া ভূমিশাযী করিতে লাগিল। আমাদের জেলা শহরেও ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, খবর পাইলাম। অতএব মাহিনা আদায়ের আশা সিকায় তুলিয়া দিয়া আমাদের স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া হেডপণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছি, এমন সমযে কানে আসিল—বন্দে মাতরম। মহাত্মা গান্ধি কী জয়!

হেডপণ্ডিত মহাশয় মুক্তকচ্ছ হইয়া দরজার দিকে ছুটিলেন এবং উঁকি মারিয়া দেখিয়া, ঘাড় নাড়িয়া ও দুই হাতের করতল চিৎ করিয়া কহিলেন, এসে গেছে মশায়। আমি একবার ভোঁদাটাকে দেখিগে।—বলিয়া কাছা ও কোঁচা সামলাইতে সামলাইতে উল্টা দিকে ছুটিলেন।

আমি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম—আমাদের ন্যাড়া এবং তাহার পিছনে জন কয়েক স্কুল হইতে বিতাড়িত বেকার ছেলে। ন্যাড়ার মাথায় গান্ধিটুপি, পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। অন্য সেবকগুলি এখনও পোশাক সংগ্রাম করিতে পারে নাই।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ন্যাড়া সদলবলে আমার কাছে আসিল এবং নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার কাছেই এলাম দাদা।

কহিলাম, কখন এসেছিস?

ন্যাড়া উত্তর দিল, কাল রাত্রে।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে?

স্কুল তো ছেড়ে দিয়েছি।

বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস। কেন?

মৃদু হাস্য করিয়া ন্যাড়া কহিল, পড়াশুনা করে কী হবে? পরাধীন দেশে—

বাধা দিয়া কহিলাম, পড়াশুনা না করে কী করতে হবে?

ন্যাড়া দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া ও দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও প্রসারিত করিয়া কহিল, যুদ্ধ।

ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, যুদ্ধ। কার সঙ্গে?

ধীর উদাত্ত কণ্ঠে ন্যাড়া কহিল, যুদ্ধ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের সঙ্গে—

বলিস কী? গোলাগুলি কই?

গোলাগুলির প্রয়োজন নেই। আমাদের যুদ্ধ অহিংস যুদ্ধ। ব্রিটিশের শাসন আমরা মানব না। গোলাগুলি আমরা বুক পেতে নোব। আমাদের বুকের রক্ত দেশের বুকে ঢেউ খেলে যাবে, তাতে ভেসে যাবে আমাদের হীনতা, দীনতা, কাপুরুষতা ও পরাধীনতার মোহ। বুঝিলাম ন্যাড়া কাহারও বক্তৃতা বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইতেছে। বাধা দিয়া কহিলাম, তোর দাদামশায় কিছু বললে না? ন্যাড়া রুখিয়া উঠিয়া কহিল, দাদামশায় আমার কে যে তার কথা শুনতে হবে? মা, মামা, দিদি, দাদা, কেউ আমাদের নেই। দেশ আমাদের জননী, মহাত্মা গান্ধি আমাদের মন্ত্রগুরু, নকুড়বাবু আমাদের সেনাপতি—

প্রশ্ন করিলাম, নকুড়বাবু কে?

ন্যাড়া আকাশ হইতে পড়িল, পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, জেলা কংগ্রেস সভাপতি, নকুড়বাবুকে চেনেন না? অথচ এ জেলাতে বাস করেন?

কহিলাম, নকুড়বাবুকে চেনবার আমার কী দরকার?

ঈষৎ হাসিয়া ন্যাড়া কহিল, সত্যি তো। জেলখানায় আমরণ পচতে হ'লে পাহারাওয়ালার সঙ্গে পরিচয় থাকলেই চলে। তবে নকুড়বাবু নিজেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করবেন বলেছেন।

তার মানে?

মানে, তিনি দিনকয়েক পরেই এখানে আসবেন। তারই আয়োজন করতে আমরা বেরিয়েছি। আপনার স্কুলের উঠোনটা আমাদের দরকার। সেইখানেই সভা হবে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, স্কুলের জায়গায় স্বদেশি সভা-টভা চলবে না, সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ন্যাড়া নির্বিকারভাবে কহিল, গেলইবা, স্কুল তো এমনিই উঠে যাবে। পিকেটিং করে সব ছেলেকে আমরা বের করে নোব। ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন বসে বসে শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্ত করবার সময় নয়, ছেলে বুড়ো সকলকে কোমর বেঁধে আগুন নেভাতে ছুটতে হবে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, ওসব দেঁতো রক্তিমে আমাকে শোনাতে হবে না, আমার ঢের শোনা আছে। তোকে ভালো কথাই বলছি, শোন। এসব ছেড়ে দে; লেখাপড়া শিখে মানুষ হোগে যা, মায়ের দুঃখ ঘোচা।

হাসিয়া ন্যাড়া কহিল, মায়ের দুঃখ ঘোচাবার জন্যেই তো বেরিয়েছি দাদা।

ন্যাড়ার পিছনে তেনা (এই ছেলেটা এ বৎসর দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রমোশন না পাইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছিল) শুদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভস্মীভূত করা যায় কী না, তাহাই এতক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিল; অবজ্ঞার সহিত কহিল, বাজে বকবার সময় নেই দাদা। আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। ন্যাড়া কহিল, সত্যি। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, আমরা আজ আসি। স্কুলের উঠোনেই সভা হবে। এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। তবে আর একটা কথা—কিছু করে চাঁদা আমাদের দিতে হবে। নকুড়বাবুর মতো লোক আসছেন, যেমন তেমন একটা পার্স না দিলে ভালো দেখায় না। আচ্ছা নমস্কার।—বলিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিল।

ন্যাড়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। লম্বা, দোহারা চেহারা, ফর্সা রং, নীল রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবিতে

চমৎকার মানাইয়াছে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। মহেশ আচার্যের ছেলে! যে মহেশ আমরণ নিষ্ঠার সহিত সাহেব-সেবা করিয়াছে, সাহেব দেখিলে যে বিশ গজ দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে ভুলুণ্ঠিত হইত, এমন কী স্বপ্নে সাহেব দেখিয়া হামাগুড়ি দিত, তাহারই ছেলে কিনা সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। বাহির হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের গ্রামে এ ফ্যাসাদ আনিল কেন? একে তো স্কুলটি এমনিই টলমল করিতেছে, তাহার উপর বাহির হইতে ধাক্কা পাইলে কী টিকিবে? একেবারে ভূমিশায়ী হইবে। তারপর? পত্নীর রণরঙ্গিনী মূর্তি। মুহূর্তের জন্য চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, দ্বিধা নয়, সময়ক্ষেপ নয়, আশু প্রতিকারের প্রয়োজন। অতএব দ্রুতপদে সেক্রেটারি মহাশয়ের বাড়ি ছুটিলাম।

সেক্রেটারি মহাশয় স্কুল বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অতএব স্কুলে গিয়া ছাত্রদিগকে প্রাঙ্গণে সমবেত হইবার জন্য আদেশ দিয়া সদলবলে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হেডপণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, দেশের কতকগুলি বেকার ও কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করিতেছে, তাহা তোমরা প্রাণপণে পরিহার করিবে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব সর্বশক্তিমান ভগবানের আদেশে আমাদের মঙ্গলের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। মনু যাজ্ঞ বল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সহস্র বৎসর পূর্বে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যাহারা ইহার বিরুদ্ধতা করিতেছে, তাহাদের পাপের সীমা নাই। তাহাদিগকে ইহলোকে আমরণ কারা-যন্ত্রণা ও পরলোকে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাছাড়া ইংরেজরা আমাদের যে কত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহা তোমবা প্রতিদিন পুস্তকে পাঠ করিতেছ। রেল-রাস্তা ও ইউনিয়ন-বোর্ডের কথা তোমরা জান। এই যে আমাদের কত শত লোক ইংরেজি শিখিয়া ভালো ভালো চাকুরি করিতেছে, মাসে মাসে মোটা মাহিনা ঘরে আনিতেছে, তাহা কী ইংরেজ রাজত্ব না হইলে হইত? তোমরা আমাদেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার পত্নীকে দেখ নাই, (এই সময়ে জনাকয়েক ছেলে দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দেখেছি স্যার।) তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিলে ও কথাবার্তা শুনিলে কেহ তাঁহাদিগকে সাহেব ও মেম ছাড়া কিছুতেই আমাদের বাঙালি ভাবিতেই পারিবে না। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে?—তাহারা ইংরেজি শিখিয়াছেন, বিলাত গিয়াছেন ও ইংরেজদের কৃপা তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া। তোমরাও যদি নিষ্ঠা সহকারে ইংরেজি পাঠ করো, বড়ো হইলে তোমরাও যে জজ ম্যাজিস্ট্রেট, নেহাৎপক্ষে সার্কের অফিসার হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব বৎসগণ, তোমরা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না। ছুটি হইলেই নিজ নিজ গৃহে গমন করত পাঠে মনোনিবেশ করো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

পরিশেষে আমি ছাত্রদিগকে কোনো আন্দোলনে যোগদান না করিতে, ছুটিতে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করিতে এবং বাড়ি গিয়াই অবিলম্বে দুই মাসের বেতন পাঠাইয়া দিতে বলিয়া সভাভঙ্গ করিলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসিয়া সহকারী শিক্ষকগণের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিতেছি, এমন সময় অন্দর হইতে অবিলম্বে হুজুরে হাজির হইবার জন্য পরওয়ানা আসিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, বারান্দায় ন্যাড়ার মা দয়াময়ী ও আমার পত্নী মুখোমুখি বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া পত্নী মাথার ঘোমটা একটুখানি টানিয়া দিয়া, ফিসফিস করিয়া কহিলেন, কাকীমা কী বলছেন, শোন। দয়াময়ী কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, কী করব, বল দেখি? ন্যাড়া পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কহিলাম, দেখেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ন্যাড়ার।

আগ্রহের সহিত দয়াময়ী কহিলেন, দেখা হয়েছে? একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছ বাবা?

কহিলাম, আমি তাকে বোঝাব কী, সে-ই আমাকে বোঝাতে চায়।

পত্নী বিস্মিতস্বরে কহিলেন, বল কী?

কহিলাম, হ্যাঁ, বলে স্কুল ভেঙে দিয়ে সবাই মিলে ওর সঙ্গে হৈ হৈ করি।

ক্রুদ্ধস্বরে পত্নী কহিলেন, উচ্ছন্ন গেছে ছোঁ—। বলিয়াই উদ্যত রসনা সংযত করিলেন। দয়াময়ী ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিলেন, আরও কত কী যে বলে বাবা, কিছু বুঝি না। বলে, আমি, লক্ষ্মী ওর কেউ না। ভারত না কে তার মা। বলে, যুদ্ধ করব, কোথায় আগুন লেগেছে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কী করি বাবা? ওর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি, ও যদি এমন করে তো, আমার মরাই ভালো।—বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। কহিলাম, আপনার বাবার দোষেই এতটা বেড়েছে কিনা! তিনি যদি ন্যাড়াকে এখানে পৌঁছে দিতেন কিংবা ওখান থেকে পালিয়ে আসামাত্র এখানে খবর দিতেন, তা হলে এতটা বাড়তে পেত না। তা না করে তিনি চুপ করে বসে আছেন, আর এদিকে ন্যাড়া নানান জায়গা গেছে, পাণ্ডাদের সঙ্গে মিশেছে, বক্তৃতা শুনে মাথা গরম করেছে, তারপর এখানে ফিরে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। চিন্তা কী শুধু আপনারই, ভেবেছেন? আমাদের চিন্তা আরও বেশি। গাঙ্গুলি মশায় তো পরামর্শ করবার জন্যে দারোগাবাবুর কাছে ছুটেছেন।

আঁতকাইয়া উঠিয়া দয়াময়ী কহিলেন, দারোগা কেন বাবা? ন্যাড়াকে কী ধরে নিয়ে যাবে? কহিলাম, না, তা নয়। ন্যাড়া শহর থেকে লোক এনে এখানে বক্তৃতা দেওয়াবে বলছে কিনা, তাই।

পত্নী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, তাই পুলিসে খবর দিতে গেছে! এক ফোঁটা ছেলে, ওকে ধমকে দিলেই থেমে যাবে। তা না করে দারোগা পুলিস! বুড়োর ভীমরথী ধরেছে দেখছি।

দয়াময়ী খপ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, তাই বল তো মা!

কহিলাম, ধমকালেও কিছু হবে না, পিঠে হাত বুলিয়েও কিছু হবে বলে ভরসা হয় না। কিছু যদি হয় তো, পুলিসের ভয়েই হবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমরা চেষ্টা করছি, আপনিও কান্নাকাটি ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখুন। তাতেও যদি না শোধরায় তো আপনার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতাপত্র সারিতেছিলাম, এমন সময়ে মিলিতকণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কানে আসিল। তার পরেই কোলাহল, তাহার পরে আরও প্রবলভাবে 'বন্দে মাতরম্', এবং কিছুক্ষণ পরেই হেডপণ্ডিত মহাশয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—আমি পুলিস ডাকব, আদালত করব, চিট বানাব ছোঁড়াদের। বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই পণ্ডিত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাথায় হাত চাপড়াইয়া কহিলেন, সর্বনাশ হয়েছে মশায়। রৌদ্ররস সহসা রোদনরসে পরিণত হইল দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, কী হল মশায়? বাড়িতে অসুখ নাকি?

কান্না থামাইয়া পণ্ডিত কহিলেন, অসুখ হলে তো ভালো ছিল মশায়, বাড়িতে মরত, এ যে পুলিসের গুঁতো খেয়ে বেঘোরে মরবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কার কথা বলছেন?

কেন? আমাদের ভোঁদা। হতভাগা ন্যাড়ার সঙ্গে মিশেছে গিয়ে। ছেলেটা আসল শয়তান মশায়! আমাকে কিনা চোখ রাঙায়! থাকত গায়ে ক্ষমতা তো, একটি একটি করে ওর দাঁত আমি উপড়ে ফেলতাম।—বলিয়া হস্তভঙ্গি দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন।

পণ্ডিত মশায়কে বসাইয়া সমস্ত খবরটা শুনিয়া লইলাম। ব্যাপারটা এই—পণ্ডিত-গৃহিণী শয়নকক্ষের কুলুঙ্গিতে বাজার-খরচের জন্য একটা সিকি রাখিয়াছিলেন। সকালে খোঁজ করিতে গিয়া দেখা গেল, সিকিটি অন্তর্ধান করিয়াছে এবং তাহার বদলে রহিয়াছে একটি চিরকুট। গৃহিণী হতভম্ব হইয়া চিরকুটটি পণ্ডিতকে দিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিতের ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত হইয়া

উঠিল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি গৃহিণীকে মারিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভুল বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে গৃহত্যাগকরত স্বরাজ আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, স্বরাজ আশ্রম কোথায়?

পণ্ডিত জবাব দিলেন, কেন? ওই যে মহেশ আচায্যির বাইরের চালাঘরটা। পতাকা উড়িয়েছে, স্বরাজ পতাকা—

তারপর?

তারপর পণ্ডিতকে বেশিদূর যাইতে হইল না। রাস্তাতেই স্বরাজ সংঘের দেখা মিলিল। পণ্ডিত সটান তাহাদের মধ্যে গিয়া পুত্র ভোঁদড়চন্দ্রের কর্ণধারণ করিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল।

ন্যাড়া তাড়িয়া আসিয়া ধমকাইয়া কহিল, ছেড়ে দিন। পণ্ডিত তাহার কর্ণপাত না করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। সেবক-সংঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ন্যাড়া মারমুখী হইয়া কহিল, আমাদের কোনো মেম্বারের গায়ে হাত দেবার কোনো অধিকার আপনার নেই। পণ্ডিত দাঁত মুখ খিঁচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আগে স্বরাজ-সেবক, না আগে তাঁর ছেলে?

ন্যাড়া কহিল, আপনাব ছেলে তার প্রমাণ কী?

রাগে পণ্ডিতের সর্বদেহে আগুন ধরিয়া গেল। কহিল, প্রমাণ? প্রমাণ এই।—বলিয়া তিনি ভোঁদার কর্ণত্যাগ কবিয়া কর্ণমূলে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন।

ভোঁদা টলিতে টলিতে সামলাইয়া লইয়া সেবকব্যূহের মধ্যে গিযা ঢুকিয়া পড়িল। সকলে 'বন্দে মাতরম্' হাঁকিতে লাগিল এবং কেহ টিকির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বাক্য প্রয়োগ কবিতে লাগিল। পণ্ডিত অগত্যা তাহাদের জীবিত ও মৃত পিতামাতাদের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা কবিতে করিতে স্থানত্যাগ করিলেন।

কহিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত হাঙ্গামা করা ভালো হয় নি।

পণ্ডিত হাঁকিয়া কহিলেন, ভালো হয়নি? বলেন কী মশায়? নিজের ছেলে কুসঙ্গে পড়ে বকে যাবে, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে চোখে দেখব। তা ছাড়া সিকিটা—। উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, ওব যে গলাচ্ছেদন করি নি, এই ওর ভাগ্যি।

কহিলাম, ভাগ্যি ওর নয়, আপনার। মহাভারতের যুগ নয়, ইংরেজ রাজত্ব, পুত্রের জীবন ভরণের দায়িত্ব আছে, হরণের অধিকার নেই।

কিন্তু মশায়, একটা ছেলের জন্যে গাঁয়ের সব ছেলেগুলো বয়ে যাবে, আর আমরা সবাই থাকতে কোনো উপায় হবে না?

উপায় আর কী হবে?

ভোঁদাকে ওর মামার বাড়ি পাঠিয়ে দোব। অজ পাড়াগাঁ—এখনও প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ চলছে সেখানে।

ছেলে যদি যেতে না চায়?

ত্যাগ করব।

যদি তার আগেই সে আপনাকে ত্যাগ করে?

পণ্ডিত মশায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, কি যা-তা বলেন, মশায়। নিজের ছেলেরা বড়ো হয়নি কিনা, তাই দিল ঠান্ডা করে বসে আছেন। আপনার কাজ নয়, যাই গাঙ্গুলি মশায়ের কাছে। উপায় বাতলে যদি কেউ দিতে পারেন তো, তিনিই।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন বিকালবেলায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, পত্নী অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু ও নাসিকা মুছিতেছেন।

কহিলাম, সর্দি করেছে নাকি? ভারী গলায় উত্তর দিলেন, না, ন্যাড়া এসেছিল। ন্যাড়ার

আগমনের সহিত নাসিকা ও নয়ন হইতে নীর নির্গমনের সম্পর্ক স্থির করিতে না পারিয়া কহিলাম, তাতে কী?

পত্নী আমার কথার জবাব না দিয়া কহিলেন, ভগবান যে এখনও কী করে সহ্য করছেন, তাই ভাবছি।

ভগবানের আবার কী হইল! কহিলাম, কী হয়েছে? স্যাঁতসেঁতে ঘোলাটে আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কিছু জান না কী? শোনগে ন্যাড়ার কাছে। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, তুমিই বল না, শুনি। পত্নী কহিলেন, দেখ, চালাকি কর না। আমি না হয় মুখ্যু মানুষ। তুমি তো লেখাপড়া জান, খবরের কাগজ পড়; কিছু জান না তুমি? বোকার মতো চাহিয়া রহিলাম। পত্নী কহিলেন, পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারছে, ছেলে বুড়ো মেয়েমানুষ পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না, মায়ের বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে আছড়ে মারছে, ঘরের বউকে উলঙ্গ করে চাবকাচ্ছে—কিচ্ছু জান না তুমি? গম্ভীরভাবে কহিলাম, ওসব মিথ্যে কথা, ন্যাড়া বানিয়ে বলেছে। দুই চোখ দীপ্ত করিয়া পত্নী কহিলেন, মিথ্যে নয়, মিথ্যে হলে দেশের ছেলেরা সব ক্ষেপে উঠত না, তা ছাড়া আজকাল ছেলেরা মিথ্যে বলে না। বল বরং—

কথার জের টানিয়া কহিলাম, আমরা।

সত্যিই তো। তোমরা মিথ্যের পর্দা বানিয়ে তার আড়ালে আত্মরক্ষা করছ, পাছে ঘর থেকে বেরুতে হবে। তোমরা শুধু কাপুরুষ নয়, অমানুষও।

পত্নীর দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলাম, ন্যাড়ার দলে যোগ দিই, তাই কী তুমি চাও?

পত্নী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। কহিলাম, চাকরি যাবে কিন্তু।

গেলই বা, ভারী তো চাকরি। এক বচ্ছর পরে আমাদের রাজত্ব হলে কত ভালো চাকরি হবে।

ন্যাড়া বলেছে বুঝি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

জেলে যেতে হবে কিন্তু।

পত্নী একটু থমকিয়া থাকিয়া কহিলেন, জেলে যেতে হবে কেন?

বা রে! সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করব, আর সরকার বুঝি পিঠে হাত বুলিয়ে খেতাব দেবে!

ন্যাড়া যে বলছিল, সকলের জেলে যাবার দরকার নেই!

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তা বলবে বইকি। স্বরাজ যদি হয়, তা হলে যারা জেলে খাটবে, তারাই বড়ো বড়ো চাকরি পাবে। কাজে যদি নামতেই হয়, জেলে আমি যাবই।

পত্নী কিছুক্ষণ চিন্তাকুলভাবে থাকিয়া কহিলেন, বেশ, যেও। কত ছেলেমানুষ জেলে যাচ্ছে। তাতে আর ভয় কী?

স্ফূর্তি সহকারে কহিলাম, বেশ, তাই হবে। আজ থেকেই লাপসি প্র্যাকটিস করব। সরকার সেলাম তো রপ্ত হয়েই আছে। তোমাকে আর নাক ঘষে পাকা বিলিতি বেগুন করে তুলতে হবে না।—বলিয়া দ্রুতবেগে স্থানত্যাগ করিলাম।

মনে দুঃখ ও অভিমান হইল। নিজের স্ত্রী যাহাকে জেলে পাঠাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, তাহার আর সংসারবাসের প্রয়োজন কী? কপালে যাই থাক, কালই নকুড়বাবুর দলে নাম লিখাইব। কিন্তু ন্যাড়ার একি অন্যায়! সদরে যাহাই করো, অন্দরে আন্দোলন ঢুকাইবার দরকার কী? অথবা ইহাই বোধহয় প্রোপাগান্ডার প্রথম নীতি। পুরুষদের দলে আনিতে চাও? মেয়েদের হাত করো। সৈন্য চাই? বাড়ির মেয়েদের ক্ষ্যাপাইয়া দাও, দলে দলে লোকে সৈন্যদলে নাম লিখাইবে। ভোট আদায় করিতে চাও? মেয়েদের ক্যানভাস করিতে পাঠাও, দেশসুদ্ধ লোক তোমাকেই ভোট দিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। গুরুগিরির ব্যাবসা করিতে চাও? মেয়েদের ধরিয়া শিষ্যা করো, পুরুষগুলি আপনা হইতে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিবে।

গাঙ্গুলি মহাশয়ের বৈঠকখানায় হাজির হইলাম। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। ঘরে ঢুকিতেই গাঙ্গুলি মহাশয়ের গলা কানে আসিল, জেলে দেবে মাগি। থাকবি কাকে নিয়ে? গাঙ্গুলি গিন্নি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, জেলে দেবে না আরও কিছু। মিছে ভয়েই গেল! গাঁয়ের মধ্যে গণ্যিমান্যি বলেই না ছেলেরা আবদার করছে! কই, আর কারও কাছে তো যাচ্ছে না!

গাঙ্গুলি মহাশয় কহিলেন, যাবে কেন? ওসব রেধো হারামজাদার পরামর্শ। আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা।

হ্যাঁ, সবাই ওকে বিপদে ফেলবারই চেষ্টা করছে! ন্যাড়া তো বলছিল, তুমি না হলে রাধু হবে বলেছে।

গাঙ্গুলি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কী বলেছে ন্যাড়া?

গাঙ্গুলি-গিন্নী জবাব দিলেন, বলেছে, রাধু হবে। তা হলে মুখ একেবারে ঝলমল করবে তোমার।

গাঙ্গুলি একটু চুপ করিয়া কহিলেন, হোকগে, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

গাঙ্গুলি গিন্নী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, বেশ। আমিও তোমার সংসারে নেই। থাকগে তুমি তোমার দারোগা, চৌকিদার আর সার্কেল-বাবু নিয়ে। ছেলে নেই, আছে তো একপাল মেয়ে। কে তোমার রাজ্যি-পাট নেবে? পিসিডেন্টগিরির মুখে ঝাঁটা!

গাঙ্গুলি মহাশয় সদম্ভে কহিলেন, কী! মুখে ঝাঁটা! চললাম দেশ ছেড়ে। এমন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার চেয়ে বৈরেগী হয়ে বোষ্টমি নিয়ে থাকা ভালো।

গাঙ্গুলি-গিন্নী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, খবরদার। ওসব কথা বল না বলছি।

একশো বার বলব, এখুনি চললাম আমি শ্যামপুরের আখড়ায়।—বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে আমার ঘাড়ের উপর পড়িলেন। আমি পড়িতে পড়িতে দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইলাম, এবং গাঙ্গুলি মহাশয় সামলাইলেন আমাকে দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, কে, কে? রেধো বুঝি? আড়ি পাতা হচ্ছে, না?

কহিলাম, না দাদামশায়, আমি।

গাঙ্গুলি মহাশয় নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, ওঃ, তুমি। ভারী ফ্যাসাদে পড়েছি ভায়া। বাইরে চল, বলছি।

চলিতে চলিতে কহিলাম, বলতে হবে না, বুঝেছি। কাল সভাপতি হতে হবে, এই তো?

হ্যাঁ হে। ন্যাড়া হতভাগা গিন্নীকে ক্ষেপিয়েছে। কী করা যায় বল দেখি?

আমাকে আর কী জিজ্ঞাসা করছেন, আমার বাড়িতেও—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলি কহিলেন, নাতবউকেও ক্ষেপিয়েছে বুঝি? কী বলছে নাতবউ?

বলছে, জেলে যেতে হবে।

আর আমার স্কুল? জাহান্নমে যাবে, না? ন্যাড়াকে গাঁ থেকে তাড়াব আমি, তুমি দেখে নিও।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

দারোগাবাবুর কাছে। একটা উপায় তো করতে হবে। তুমিও চল ভায়া।

রাত্রে আহারের সময় তরকারি মাছ ইত্যাদি দূরে সরাইয়া দিয়া শুধু ডাল ও ভাত চটকাইয়া পায়সের মতো করিয়া মাখিয়া সপাসপ গিলিতে লাগিলাম। পত্নী যথারীতি কাছে বসিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, গম্ভীরভাবে কহিলেন, ও কী হচ্ছে?

কহিলাম, লাপসি খাওয়া অভ্যাস করছি। জেলে গিয়ে তো এই-ই খেতে হবে। পরম পরিতোষ সহকারে কহিলাম, মন্দ নয়, বেশ লাগছে খেতে। খাবার কিছু কষ্ট হবে না দেখছি। একটু একলা একলা ঠেকবে হয়তো, তা ভালো একজন সঙ্গী পেলে—

পত্নী কহিলেন, জেলে আবার সঙ্গী কোথায় পাব? কহিলাম, আগে পাওয়া যেত না বটে। আজকাল দলে দলে মেয়ে পুরুষ জেলে যাচ্ছে। এত লোক থাকবার জায়গা কোথায়? এক এক ঘরে মেয়ে পুরুষ সব ঠাসাই করে রেখে দেয়।

পত্নী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে রাখে?

খাইতে খাইতে ভরাট মুখে কহিলাম, রাখেই তো। ওই তো মজা, না হলে এত লোক জেলে যাচ্ছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, বেশ সুন্দরী, অমায়িক মিষ্টি একটি সঙ্গী পাই তো আর জেল থেকে ফিরব না। যাবজ্জীবন থেকে যাব সেই জেলে।

পত্নী জবাব না দিয়া গম্ভীরমুখে উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে গাঙ্গুলি মহাশয়ের ছোটো মেয়ে টুনু আসিয়া কহিল, মা আপনাকে ডাকছে!—বলিয়া কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পূর্বেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গাঙ্গুলি মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম দিদিমা বারান্দায় গুম হইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এসো ভাই, বস।

উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসুমুখে গাঙ্গুলি-গিন্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন, উনি কাল রাতে রাগ করে বেরিয়ে গেছেন. এখনও ফেরেন নি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

গাঙ্গুলি গিন্নী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিলেন, কাল ন্যাড়া এসে বললে, আজ নাকি ওদের সভা হবে, ওঁকে সভাপতি হতে হবে। গাঁয়ে গণ্যিমান্যি মানুষের মতো লোক বলতে উনি ছাড়া কে আছে, বল? আমি মত দিলাম। অন্যায় কিছু করেছি ভাই? কিন্তু ওঁকে বলতেই উনি রেগে উঠলেন, মুখে যা এল তাই বললেন, শেষে রেগে বেরিয়ে গেলেন।

কোথাও খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন?

গাঙ্গুলি-গিন্নী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন, খোঁজ করতে কার দায় পড়েছে। কচি খোকা তো নয় যে, হারিয়ে যাবে, কী ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে। কিছু করব না, আরও কিছুক্ষণ দেখব, না আসে তো মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব! দেখব, বুড়ো কী করে!

গম্ভীরভাবে কহিলাম, দেখুন দিদিমা, ওসব করবেন না। দাদামশায়ের সত্যি কদিন থেকে মন-খারাপ। বৈরেগী হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

দিদিমা গাম্ভীর্য পরিহার করিয়া, সরিয়া বসিয়া ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন, তোমাকে বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ, যেদিন শ্যামপুরের আখড়ার বৈষ্ণবীরা কেত্তনে গাইলে, তার পরদিনই—

গাঙ্গুলি-গিন্নী শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, কী, বলছিল কী?

বলছিলেন, ভালো লাগে না সংসার। প্রেসিডেন্টগিরি হাতে না থাকলে চলে যেতাম। গাঙ্গুলি-গিন্নী গুম হইয়া রহিলেন।

কহিলাম, আমি বলি কী, ওঁর যা ভালো লাগে তাই করুন। জোর-জবরদস্তি না করাই ভালো।

গাঙ্গুলি-গিন্নী নীরসকণ্ঠে কহিলেন, কে আর জোর-জবরদস্তি করছে ভাই! যা ইচ্ছে করুন না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি ডেকে নিয়ে আসতে পার? আমি মেয়েমানুষ, আমার যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় গেছেন তিনি?

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গাঙ্গুলি-গিন্নী কহিলেন, বোধহয় শ্যামপুর।

শ্যামপুরে বহুদিন হইতে একটি বৈষ্ণবদের আখড়া আছে। সেখানে কতকগুলি মধ্যবয়সী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী স্থায়ীভাবে বাস করে। বৈষ্ণবীরা প্রায়ই আমাদের গ্রামে ভিক্ষা করিতে আসে।

সম্প্রতি সোনাপুরে বৈষ্ণবপুরে একটি মেলা হইয়াছিল। সেখান হইতে ফেরত কতকগুলি নবীনা ও সুশ্রী বৈষ্ণবী আখড়াতে আশ্রয় লইয়া ছিল। তাহাদেরই এক জোড়া দিন কয়েক আগে আমাদের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কীর্তন গাহিয়া গিয়া গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কহিলাম, শ্যামপুর গেছেন, কে বললে?

গাঙ্গুলি-গিন্নী ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, তা ছাড়া যাবার আর কোনো চুলো আছে, শুনি? দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, আগে হলে ঝাঁটা মেরে—

কহিলাম, এই দেখুন আপনি রাগ করছেন। তা হলে ডেকে এনে কাজ নেই। এলেই আবার ঝগড়া করবেন।

গাঙ্গুলি-গিন্নী রাগ সামলাইয়া লইয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, না, ঝগড়া করব না, তুমি ডেকে আনগে।

শ্যামপুর নহে, থানার দিকে অগ্রসর হইলাম। কারণ দারোগাবাবুর পরামর্শমতো গাঙ্গুলি মহাশয় থানাতেই রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

গাঙ্গুলি মহাশয়কে আনিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় থাকিয়া কর্তা ও গিন্নীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। গিন্নি কহিলেন, হ্যাঁগা, কাল সারারাত্তির কোথায় কাটালে? আমি ভেবে বাঁচি না। মাস্টার নাতিকে ডেকে খুঁজতে পাঠালাম।

কর্তা গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, কোথায় আবার? বুড়ো শিবের আটচালায়—

বিস্ময়ের সহিত গিন্নী কহিলেন, অ্যাঁ! ওই ভূতের আড্ডায়! কাছেই শ্মশান! ওমা! আমার কী হবে!

গাঙ্গুলি উদাসকণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছে শ্মশান সংসার দুই-ই সমান; আর কটা দিনই বা আছে।

গৃহিণী কহিলেন, দেখ, ওসব অলক্ষুণে কথা বল না বলছি।

গাঙ্গুলি কহিলেন, মিথ্যে বলি নি গিন্নী। মেঘে মেঘে বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে।— বলিয়া ঈষৎ দার্শনিক হাস্য হাসলেন। তারপর কহিলেন, আমার চাদর আর কামিজটা একটু পরিষ্কার করে দিও।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন গা?

বিকেল বেলায় আবার সভা আছে।

গৃহিণী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, না না, সভা-টভায় গিয়ে কাজ নেই।

গাঙ্গুলি কহিলেন, পাগল! ছেলেরা ধরেছে, সভাপতি না হলে লোকে বলবে কী! প্রেসিডেন্টগিরির কথা ভাবছ? ও আমি ছেড়ে দোব, দারোগাবাবুকে বলে এসেছি।

গৃহিণী কহিলেন, পাগল হয়েছ নাকি? ওসব কিছু ছাড়তে পাবে না তুমি।

ওসবে কী হবে গিন্নী? আমার না ছেলে, না পিলে। আছে তো গণ্ডা কয়েক মেয়ে।

গৃহিণী সতেজে কহিলেন, দেখ, এক পা তোমাকে আমি ঘর থেকে বেরুতে দেব না। সভার নাম করেছ তো, আমি বলে দিচ্ছি, পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হব আমি।

মধ্যাহ্নের আহারের পর শয়নকক্ষে না গিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?

কহিলাম, আসছি একটুখানি ঘুরে।

রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে। এখন আর ঘুরতে যেতে হবে না, ঘরে শোওগে যাও।

মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, আসছি চট করে। হাতে তো আর বেশি দিন নেই, অথচ জেলে সারাদিন রোদেই কাজ করতে হবে।

পত্নী কহিলেন, তাই রোদ অভ্যেস করছ? কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শ্লেষের সহিত কহিলেন, কাল রাত্রে তো লাপসি অভ্যেস হল; কিন্তু আজ তো তরকারি মাছ, দুধ, কিছু ফেলে রাখতে দেখলাম না। কড়া গলায় কহিলেন, ন্যাকামি না করে, শোওগে যাও বলছি।

কহিলাম, একটুখানি—

মুখ লাল করিয়া পত্নী কহিলেন, আচ্ছা, যাও।—বলিয়া দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন। আমিও আজ আর বেশি বাড়াবাড়ি করা বিপজ্জনক ভাবিয়া শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া দেখি, পত্নী সামনে বসিয়া আছেন। কহিলেন, দেশের জন্যে দুশ্চিন্তায় তোমার যে মোটেই ঘুম হচ্ছে না গো। কবরেজকে ডাকতে পাঠাব? উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কহিলাম, পাঠাও। হঠাৎ সভার কথা মনে পড়িল, কহিলাম, ন্যাড়া আসে নি? পত্নী কহিলেন, এসেছিল। বেচারী ভারী বিপদে পড়েছে। গাঙ্গুলি বুড়ো সভাপতি হবে বলেছিল, গিন্নী নাকি জবাব দিয়ে পাঠিয়েছে। তোমাকে বলতে এসেছিল। কহিলাম, তুমি কী বললে?

পত্নী কহিলেন, বললাম, উনি তো জেলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, ওঁকে আর কেন? নতুন কাউকে ধরগে।

সহসা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে পল্লির আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। কহিলাম, এসে গেছে নকুড়বাবু, যাওয়া যাক। পত্নী হাসিয়া কহিলেন, না গো, ওসব ছেলে-ধরাদের কাছে গিয়ে কাজ নেই। ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে পালাবে।

গম্ভীরভাবে কহিলাম, ঝুলিতে পুরতে হবে কেন? আমি তো এখনই যেতে প্রস্তুত।

স্কুল-প্রাঙ্গণে নহে, চণ্ডীমণ্ডপে, সভার আয়োজন করা হইয়াছে। স্কুলের চেয়ার বেঞ্চি কিছুই দেওয়া হয় নাই। নবনির্বাচিত সভাপতি রাধাশ্যাম নায়ক তাহার বাড়ি খালি করিয়া একটি টেবিল, দুইখানি চেয়ার ও একখানি বেঞ্চ ধার দিয়াছে। তাহাই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে পাতিয়া সভাপতি ও মাননীয় অতিথিগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং শ্রোতাদের জন্য খালি ঢালাও মেঝে—ইহার জন্য অবশ্য কিছুই ব্যবস্থা করিতে হয় নাই। মহিলা শ্রোতাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে (ইহা অবশ্য নকুড়বাবুর আদেশে ও অভিপ্রায়ে)। মন্দিরের চাতালে খান দুই চট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আব্রু রক্ষার জন্য খান তিন বিছানার চাদর সামনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া ন্যাড়া আগাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল ও সভার মধ্যে লইয়া গিয়া নকুড়বাবুর পাশে বসাইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। নকুড়বাবু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, আপনি এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার? ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সভাপতি রাধাশ্যামের পাশে একখানি চেয়ারে একটি সুন্দরী তরুণী গম্ভীরবদনে উপবিষ্টা। ন্যাড়াকে চক্ষের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিল, নকুড়বাবুর মেয়ে শ্রীমতী রেবা। ন্যাড়া রেবা দেবীর কাছে গিয়া আমার কথা বলিতেই তিনি মৃদু হাস্য ও কটাক্ষ সহযোগে মস্তক আন্দোলন করিয়া আপ্যায়ন জ্ঞাপন করিলেন। রাধাশ্যাম গলাবন্ধ কোটের নীচে ভুঁড়ি ও মাথার সামনে টাক লইয়া গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করিয়া বসিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপে, মন্দিরের চাতালে ও চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। শিশু ও স্ত্রী কণ্ঠের কলরোলে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। নকুড়বাবু কহিলেন, নারায়ণবাবু (ন্যাড়ার পোশাকি নাম) খুব প্রচারকার্য করেছেন। ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইলাম। মনে মনে কহিলাম, প্রচারকার্য করিতে হয় নাই। আপনা হইতেই সকলে আসিয়াছে এবং তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্যে আসে নাই। ভাবিয়াছে, যাত্রাগান হইবে অথবা বাজি হইবে। তা ছাড়া জামা জুতা পরা, বিনুনি-ঝোলানো সুন্দরী তরুণী দেখার সৌভাগ্য তাহাদের সহজে ঘটে না।

ন্যাড়া চিৎকার করিয়া কোলাহল থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং তাহার সহকর্মীগণ গায়ে নীল রঙের খদ্দরের জামা ও মাথায় গান্ধি-টুপি আঁটিয়া সকলের বসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জনতা শান্তভাব ধারণ করিল। তখন ন্যাড়া টেবিলের কাছে আসিয়া রাধাশ্যামকে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করিল, এবং সকলে তাহাকে সমর্থন করিল।

কিন্তু রাধাশ্যাম তো সভাপতির আসন আগেই দখল করিয়াছে। রাধাশ্যাম কাপড়ের দোকান ও সুদী কারবার করে। বার কয়েক ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বার হইবার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হওয়ার জন্যই বোধ করি ন্যাড়ার দলে যোগ দিয়াছে। সর্বসমক্ষে চেয়ারে বসিবার সুযোগ জীবনে তাহার কখনও আসে নাই। কাজেই বসিবার জন্য চেয়ার দিয়াছে এবং পাছে কেহ দখল করে সেইজন্য আগে হইতে বসিয়া আছে। আজ তাহাকে সভাপতি না করিলে সে চেয়ার মাথায় করিয়া সভা ত্যাগ করিত।

ন্যাড়া রাধাশ্যামের কানে কানে কহিল, ধন্যবাদ দিন।

রাধাশ্যাম কহিল, ধন্যবাদ কিসের? চাঁদা দিয়েছি, চেয়ার টেবিল দিয়েছি—। ন্যাড়া কহিল, ওটা নিয়ম।

রাধাশ্যাম চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়াই কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। রেবা দেবী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তারপর ন্যাড়া নকুড়বাবু ও তাঁহার কন্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রোতাদের উদ্দেশে জ্ঞাপন করিল এবং নকুড়বাবুকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

নকুড়বাবুর দেহ দীর্ঘ ও শীর্ণ, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের যোগ্যতম প্রতিনিধি। মাথার চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। চিলের ঠোঁটের মতো নাক; ছোটো চোখ, কিন্তু দৃষ্টি ধারালো। চোখের কোল ও বসা গালের মধ্যে উঁচু চোয়াল; গলদেশ ব্যাপিয়া পিরামিডের মতো সমুন্নত কণ্ঠাস্থি। গায়ে হাতকাটা খদ্দরের ফতুয়া, পরিধানে খদ্দরের কটিবস্ত্র ও পায়ে স্বদেশি চটি।

কিন্তু রেবা? সুন্দরী-তন্বী—তরুণী। মুখের চেহারা নকুড়বাবুর মতো চৌকোণা নহে, একটু লম্বা ধরনের। সূক্ষ্মাগ্র চিবুক, পাতলা ঠোঁট, উজ্জ্বল ও কালো চোখ। ওই চোখ হইতে অপাঙ্গ দৃষ্টি একবার যাহার উপর পড়ে, তাহার স্বদেশ-সেবক হওয়া ছাড়া বোধহয় আর কোনো উপায় থাকে না। পরিধানে খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি এবং খদ্দরেরই শাড়িসঙ্গত ব্লাউজ। ধবধবে ফর্সা পা দুইটিতে গাঢ় নীল ভেলভেটের ফিতাওয়ালা স্যান্ডেল। গায়ে গহনার বাহুল্য নাই। হাতে মাত্র দুইগাছি করিয়া প্লেন সোনার চুড়ি, ও কানে দুল।

নকুড়বাবু দাঁড়াইতেই রেবা দেবী চেয়ার টানিয়া আমার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, আপনি হেডমাস্টার? কহিলাম, হ্যাঁ।

মধুর হাস্য করিয়া রেবা দেবী কহিলেন, আর কতদিন গোলামখানার সর্দারি করবেন? চলে আসুন না আমাদের সঙ্গে?

ছাত্রদের গ্রামার ও কম্পোজিশন পড়াইতে পড়াইতে মনের উপর ছাতা পড়িয়া গেলেও বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিতে লাগিল ও কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। এমনই করিয়া মিষ্ট হাসিয়া কোনো সুন্দরী তরুণী যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলে তো অবলীলাক্রমে দিতে পারি, কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তো কিছুই নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী ও ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়িল, মনে মনে কহিলাম, হে মা মঙ্গলচণ্ডী! রক্ষা করো মা। আজিকার মতো সামলাইয়া দাও। রেবা দেবী কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা গান্ধি জেলে, বড়ো বড়ো নেতাদের কেউ জেলের বাইরে নেই, সারা দেশের বুকে আগুন জ্বলে উঠেছে (ন্যাড়াও এমনই ধরনের কথা বলিয়াছিল), আর আপনারা আরাম করে বাড়িতে বসে আছেন? ওদিকে নকুড়বাবু নির্বিচারে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—একদিন আমাদের গৃহে

গোলাভরা ধান ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল, মনভরা সুখ ও শান্তি ছিল। ইংরেজ তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের মতো দরিদ্র, আমাদের মতো হীন ও আমাদের মতো হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কে আছে? নিজের মাকে আমাদের মা বলিয়া ডাকিবার জো নাই, ইংরেজ গলা টিপিয়া ধরিবে, নিজের মায়ের লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে গেলে ইংরেজ বন্দুক উঁচাইবে—। এই সময়ে কতগুলো লোক সামনে বসিয়া রেবা দেবীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্ব্বক মজাদার আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের দিকে তাকাইয়া তর্জনী উঁচাইয়া নকুড়বাবু বলিতে লাগিলেন, আমার কথা আপনাদের ভালো লাগিতেছে না; ভালো লাগিবার কথাও নহে। দুই শত বৎসর ধরিয়া পশুর মতো জীবনযাপন করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মচেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। শৃঙ্খলিতা, নিপীড়িতা, ভূলুণ্ঠিতা দেশজননীর করুণ ক্রন্দন আপনারা শুনিতে পাইতেছেন না। সে ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাত্মা গান্ধি, সে ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র, সে ক্রন্দন শুনিয়াছি আমরা। তাই ঘর ছাড়িয়া আমরা বাহিরে আসিয়াছি। ঘরে আমাদের আগুন লাগিয়াছে, চাহিয়া দেখুন—(সকলে নকুড়বাবুর তর্জনীনির্দিষ্ট দিকে ফিরিয়া চাহিল)। ঘরের মটকায় আগুন লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, (চণ্ডীমণ্ডপের চারিদিকে গ্রামের বাউড়ি ও বাগ্দীদের ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়াছিল। সেখানে কোলাহল উঠিল—আগুন, আগুন। ভলান্টিয়াররা তাহাদের থামাইতে লাগিল, সে আগুন নয়, অন্য আগুন, তোরা চুপ করো।) ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসুন। আগুন নিভাইতে হইবে। সব দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়াছে, প্রাণ দিতেছে, বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে—আর্তনাদে দেশের আকাশ ভরিয়া গেল, আপনারা কী বধির হইয়া বসিয়া থাকিবেন? আসুন—দ্বিধা নয়, প্রতিমুহূর্ত মূল্যবান। আসুন, ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক তেত্রিশে কোটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন ও ছেষট্টি কোটি দৃঢ়মুষ্টি বাহু লইয়া একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ি। দেখিতে দেখিতে গৃহ আবার গড়িয়া উঠিবে, দেখিতে দেখিতে আমাদের মা রাজলক্ষ্মী-মূর্তিতে আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইবেন। বল ভাই সব—বন্দে মাতরম্। ন্যাড়া ও তাহার দল হাঁকিল, বন্দে মাতরম্। দুই একজন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া হাঁকিল, বন্দে মাতরম্।

রেবা দেবী মারাত্মক হাসি হাসিয়া কহিলেন, বলুন, বন্দে মাতরম্, দোষ নেই।

হাসিয়া কহিলাম, বলেছি তো, মনে মনে বলেছি।

রেবা দেবী কহিলেন, কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? ফাকির ফাঁক দিয়া মনুষ্যত্ব যে একেবারে নিঃশেষে বেরিয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন না?

নকুড়বাবু আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ন্যাড়া রাধাশ্যামকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিল। রাধাশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল, ধেৎ! পাগল নাকি। ওসব আমি পারব না। ন্যাড়া কহিল, নিয়ম।

টানাটানি করিয়া ন্যাড়া রাধাশ্যামকে দাঁড় করাইয়া দিল। রাধাশ্যাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। ন্যাড়া তাগিদ দিয়া কহিল, বলুন, বলুন। রাধাশ্যাম কোনোমতে বলিল, ইনি যা বললেন, খুব ভালো কথা। তোমরা সবাই এঁর কথামতো কাজ করো। এমন সময়ে পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, রাধাশ্যামের বিলিতি কাপড়ের দোকানে আজই আগুন ধরিয়ে দাও। রাধাশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, ও কাজ নয়। ওসব করলে ভালো হবে না বলছি। ন্যাড়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল।

রেবা কহিলেন, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আসুন না আমার সঙ্গে আমি ন্যাড়াকে ডাকিতেই কহিলেন, আসুন না আপনিও। রেবা দেবীকে সঙ্গে করিয়া মেয়েদের সামনে যাইতেই ভাদ্রবধূসম্পর্কীয়া মেয়েগুলি ঘোমটা টানিল, বালিকাগুলি ফ্যাল- ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল, ঠাট্টাসম্পর্কীয়া ও অ-ঠাট্টাসম্পর্কীয়া গুরুজনেরা সকলেই মুচকি হাসিল এবং পত্নী তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

রেবা দেবী নারীবৃন্দের উদ্দেশে কহিলেন, আপনাদের ওপরেই আমাদের এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে। আপনাদের এখনই ঘর থেকে বেরুতে আমি বলছি না। আপনারা শুধু পুরুষদের ঘর থেকে বের করে দিন। পতি পুত্র পরিজন নিয়ে আরাম করে সংসার করবার সময় আমাদের নয়। রাজপুত রমণীদের কথা আপনারা জানেন, তাঁরা নিজের হাতে স্বামীপুত্রকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিতেন, পরাজিত হয়ে ফিরে এলে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না, এমনকি চিনতে পর্যন্ত চাইতেন না। তাঁরা কী তাঁদের স্বামীদের আপনাদের চেয়ে কম ভালোবাসতেন? না, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের ভালোবাসতেন খুব, কিন্তু আরও বেশি ভালোবাসতেন স্বাধীনতা, শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্ব। আর একটা কথা, আন্দোলন চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমরা সবাই দরিদ্র, কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে সাগর, কণা কণা বালি নিয়ে মরুভূমি। নারায়ণবাবু আমাদের কিছু চাঁদা তুলে দিয়েছেন, পুরুষদের কাছ থেকে, আপনারাও কিছু দিন। আপনাদের এ দান, যে খাতায় আমাদের জীবনের জমা ও খরচের হিসাব লেখা হচ্ছে, সেখানে জমার ঘরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

ইহার পর সকলেই ঘোমটা টানিল ও পিছন ফিরিয়া বসিল। শুধু আমার পত্নী হাতের একগাছি চুড়ি খুলিয়া আমার মেয়ের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ন্যাড়া রেবা দেবীর কানে কানে কী বলতেই তিনি আমার দিকে মর্মভেদী হাস্য নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ও বুঝেছি। তারপর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল লক্ষ্মী—ন্যাড়ার দিদি। কম্পিত হাতে একজোড়া মাকড়ি রেবা দেবীর হাতে সমর্পণ করিল। হতভাগিনীর বোধহয় পৃথিবীতে উহাই একমাত্র সম্বল—স্বল্পবিবাহিত জীবনের একমাত্র স্মৃতি ছিল। ভাইয়ের আবদারে তাহাই বিসর্জন দিয়া গেল। কোনো দান কোনো খাতায় যদি সত্যিই লেখা হইয়া থাকে তো, লক্ষ্মীর দান সমস্ত দানকে ছাপাইয়া চিরদিন জ্বলজ্বল করিবে।

সভাভঙ্গের পর নকুড় ও নকুড়-কন্যাকে মোটরে চড়াইয়া দিয়া (ন্যাড়াও সঙ্গে গেল)। বাড়ি ফিরিয়া আসিতেই পত্নী কহিলেন, এতক্ষণ কী হচ্ছিল, শুনি? (অন্যমনস্কভাবে কহিলাম, কী আবার হবে? ওঁরা ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। পত্নী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, ওঁদের তো ভারী দায় পড়েছে ধরে রাখবার, তুমিই ছিলে জোঁকের মতো কামড়ে পড়ে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ওরা মানে, ওই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা তো? বাক্য বা ভঙ্গির দ্বারা কোনো জবাব না দিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম এবং পত্নী যে তীব্র দৃষ্টি উদ্যত করিয়া আছেন, সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে পত্নী কহিলেন, এদিকে বাড়িতে একটা কথারও তো জবাব দিতে ইচ্ছে করে না, হাঁড়ির মতো করে মুখ করে বসে থাকা হয়, ওদিকে সারাক্ষণ হেসে হেসে কী এত কথাবার্তা হচ্ছিল, শুনি? বক্তিতে তো শুনতে দেখলাম না।

কহিলাম, এই আন্দোলনের কথা বলছিলেন আর কি!

আমাকে যোগ দিতে বলছিলেন। উনি নাকি শিগগির জেলে যাবেন। আমাকে বলছিলেন, আসুন না, একসঙ্গে জেলে যাই।

পত্নী সরোষে কহিলেন, হ্যাঁ, তা না হলে মজা হবে কেন? সেইজন্যেই তো বলা হচ্ছিল, আমরা যেন ঘর থেকে পুরুষদের তাড়িয়ে দিই; আমি কী বুঝি নি, কাকে বলা হল? জুতো জামা পরে ফেরতা দিতে না পারলেও ঘটে বুদ্ধি আছে গো! একেবারে বোকা পাও নি। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে কী হাসি! মুখে আগুন ওদের!

কহিলাম, ছিঃ, ওসব বলতে আছে! কত প্রশংসা করছিলেন তোমার।

ঝাঁটা মারি প্রশংসার মুখে। মিছিমিছি চুড়িখানা খোয়ালাম। দেবদ্বিজে দিলে ওর চেয়ে কাজ হত।

কহিলাম, খুব ভালো কাজ হয়েছে। সত্যি, দেশের বড়ো দুর্দিন। এখন আর আরাম করে কারও ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। যে যতটুকু পারে, কাজ করতে হবে।

দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া স্ত্রী কহিলেন, তার মানে?

মানে, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পত্নী ধমকাইয়া কহিলেন, কাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, খুলে বল না।

কহিলাম, আমাকে এবং আমাকে দেখে আরও অনেককে।

দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া এবং আমার নাকের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘনঘন আন্দোলিত করিয়া পত্নী কহিলেন, ওসব আশা ছাড়। বুক ফেটে মরে গেলেও একটি পা নড়তে দিচ্ছি না। ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর আমি বানে ভেসে এসেছি, না?

যাক, একদিকে নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু দুদিন পরেই সমস্ত গাঁয়ে একেবারে হিড়িক পড়িয়া গেল। ন্যাড়ার দল আফিং ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতেছে। দেখিতে যাইবার জন্য স্ত্রীর অনুমতি ভিক্ষা করিলাম। অনেক জেরার পর স্ত্রী অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু খবরদারি করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে দিলেন। যাইয়া দেখিলাম, দোকানটার সামনে লোকে গিসগিস করিতেছে। ঠেলাঠেলি করিয়া সামনের সারিতে দাঁড়াইলাম। পুত্র ভালো না দেখিতে পাওয়ার জন্য খুঁতখুঁত করিতেছিল, তাহাকে কোলে তুলিতে হইল।

তেনা ও প্যানার সেদিন পালা পড়িয়াছিল। তাহারা হাতজোড় করিয়া ক্রেতাদিগকে না কিনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল, কাহারও পায়ে ধরিতেছিল, কাহারও কাছায় ধরিতেছিল। ক্রেতাদের কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছিল, কেহ বা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল, কেহ বা জোর-জবরদস্তি করিতেছিল, কেহ বা ঠেলাঠেলি করিয়া, হাত ছাড়াইয়া লইয়া, ছুটিয়া গিয়া দোকানে উঠিতেছিল। দর্শকবৃন্দ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। এরকম তামাসা তাহারা সত্যই জীবনে দেখে নাই। এমন সময়ে—'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও', বলিতে বলিতে আমাদের গ্রামের বিশু গোঁরাই একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশু যে নামজাদা নেশাখোর, তাহা তাহার চেহারা দেখিলে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। অস্থিকঙ্কালসার দেহ, হাত পা লিকলিকে সরু, পেটটা ধামার মতো, চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, গাল ফোলা, মাথার চুল স্বল্প ও পাতলা।

তাহাকে দেখিয়া তেনা ও প্যানা তাহার কাছে আসিতেই বিশু হাত পা নাড়িয়া কহিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না দাদাবাবুরা, ওই ব্যাটাদের আটকাও।—বলিয়া যে লোকগুলা এ সুযোগে সড়াৎ করিয়া পার হইয়া গেল, তাহাদের দিকে হাত বাড়াইল। দেখিয়া প্যানা ছুটিয়া গেল। বিশু বলিল, গাঁজা আমি একদম ছেড়ে দিয়েছি। কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে কহিল, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে পিকেটিং করব।—বলিয়া সকলের সামনে আসিয়া যুক্তহস্তে বিনাইয়া বিনাইয়া দর্শকবৃন্দকে আবেদন-নিবেদন করিতে লাগিল, ভাই সব। তোমরা গাঁজা কখনও খাইও না। গাঁজা খাইলে কফ হয়, কাসি হয় ও পেট ধামার মতো হয়।—বলিয়া নিজের পেটে হাত দিল। তারপর বলিতে লাগিল, গাঁজা খাইলে জমি বন্ধক পড়ে, বাগান বিক্রি হয় ও পুকুরে গাঁদি লাগে। অতএব ভাই সব, গাঁজা না কিনিয়া ভালো ছেলের মতো ঘরে ফিরিয়া যাও। সেদিনকার বাবুটি বলিয়াছেন, তোমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে, মটকা পর্যন্ত আগুন উঠিয়াছে, তাহা না নিভাইয়া এখানে ভিড় করিতেছে কেন?—বলিয়া দুই হাত কোমরে দিয়া, দুই চোখ মুদিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া মূর্তিমান জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো দাঁড়াইয়া রহিল; এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে হাসির হররা ছুটিতে লাগিল। ওদিকে প্যানা ও তেনা অন্য দিকে গিয়া খরিদ্দার সামলাইতে ছিল। বিশু হঠাৎ পোজ পরিত্যাগ করিয়া, পিছন ফিরিয়া, 'ওই যে ব্যাটা, ধর ব্যাটাকে।'—বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া একেবারে দোকানে উঠিল এবং দুই প্রসারিত হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটিকে খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে আবার হাস্যরোল উঠিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র আগুনের মতো গরম হইয়া উঠিল, কিন্তু এই মজা ত্যাগ করিয়া দর্শকবৃন্দ এক পা নড়িতে চাহিল না। কিছুক্ষণ পরে 'সরে যাও বাবারা,

ভদ্রলোকের মেয়ে।' বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া একজন লোক ভিন গাঁয়ের এক স্ত্রীলোককে লইয়া সামনে আসিয়া হাজির হইল। স্ত্রীলোকটির সর্বাঙ্গ মোটা চাদর দিয়া ঢাকা, মুখে আবক্ষলম্বী অবগুণ্ঠন, দেখিতে লম্বা-চওড়া ও মোটা।

তেনা আসিয়া স্ত্রীলোকটির সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, মা! আপনি আফিং কিনবেন না। আমি আপনার ছেলের মতো, আমার কথা রাখুন। স্ত্রীলোকটি অবনত মুখে নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গের লোকটি বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, খাবার জন্যে নয় বাবু, বাড়িতে রুগী, আফিং দিয়ে ওষুধ করতে হবে।

তেনা কহিল, অন্য ওষুধ খাওয়ান মা, ও বিষ আর খাওয়াবেন না।

লোকটি একটু রাগতভাবে কহিল, তুমি তো আর চিকিচ্ছক নও বাপু যে, তোমার কথা শুনতে হবে। দর্শকবৃন্দের দিকে তাকাইয়া কহিল, দেখুন দিকি সব, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মরতে বসেছে; আজ যায়, কাল যায়; বলছে, অন্য ওষুধ খাওয়ান। সব ওষুধই দেওয়া হয়েছে, ও ছাড়া বাঁচানো যাবে না, কবরেজ বলেছে। অনেকে বলিয়া উঠিল, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও। তেনা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু লোকটিও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিতেই বাধা দিয়া কহিল, উনি যান, তুমি যেতে পাবে না। লোকটি মুচকি হাসিয়া কহিল, ভারী নজ্জাবতী কিনা, তাই। আচ্ছা, একাই যাও মা তুমি। স্ত্রীলোকটি দোকান হইতে আফিং কিনিয়া ফিরিয়া আসিতেই লোকটি তাহার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিল। সকলে আশ্চর্য হইয়া দেখিল, নগাঁয়ের দিগম্বর পাল, একমুখ দাড়ি, এক ঝুড়ি গোঁফ, লজ্জার নিদর্শনস্বরূপ জিহ্বাটি নির্গত। দর্শকবৃন্দ আবার হাসিয়া উঠিল।

এমনই করিয়া তামাসা চলিতে লাগিল। স্বাধীনতা লাভের এমন সহজ পন্থা আবিষ্কৃত করার জন্য মহাত্মা গান্ধিকে নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

রাত্রে পণ্ডিত মহাশয় খবর দিলেন, দারোগাবাবু গ্রামের সকলকে লইয়া মজলিস করিয়াছেন। জেলা হইতে আদেশ আসিয়াছে, যাহারা পিকেটিং করিতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জেলা শহরে পাঠাইতে হইবে। সেখানে তাহাদিগকে জেলে দেওয়া হইবে। গ্রামের লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। অতএব গ্রামের ছেলেগুলির সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

পরামর্শ দ্বারা কী স্থির হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভীতিপ্রদর্শন ও প্রয়োজন হইলে প্রহার।

কহিলাম, ন্যাড়া কোথায় বলুন তো?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, ন্যাড়া কী গাঁয়ে আছে নাকি মশায়! দিন নেই, রাত নেই, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, সেবক সংগ্রহ করছে। সারা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিলে হতভাগা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পারেও তো। ভোঁদা নাকি বাড়িতে বলেছে, সবদিন খাওয়া পর্যন্ত জোটে না—কোনোদিন একমুঠো মুড়ি, কোনোদিন পান্তাভাত, ঘর না পেলে গাছতলাতেই রাত কাটিয়ে দেয়। সৎপথে থাকলে ছেলেটা মানুষ হত, মা টার অদৃষ্ট! কহিলাম, দারোগাবাবু ওকে ধরছেন না?

পণ্ডিত চোখ মটকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ধরবেন, ধরবেন, এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমাদের মতো তো নয় যে, ফাৎনা নড়লেই ঘাই মারবেন? ওস্তাদ লোক, খেলিয়ে খেলিয়ে টেনে তুলবেন এখন।

পরদিন শুনিলাম, তেনা ও প্যানাকে হাতকড়ি পরাইয়া থানায় লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে পণ্ডিত মহাশয় আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তেনা প্যানাকে ধরেছে বুঝি?

পণ্ডিত কহিলেন, ধরেছিল, ওদের বাবারা মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। ছেলেগুলোও নাকখৎ দিয়ে আর কিছু করবে না বলেছে।

বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, তাই নাকি?

পণ্ডিত স্ফূর্তি সহকারে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাত পা বেঁধে এক পাল করে কেন্নোই গায়ে ছেড়ে দিতেই কী চিৎকার! কোথায় ভারতমাতা আর গান্ধিদাদা। ঘরের বাপ-মার নাম করে হাঁকডাক করতে লাগল। শেষে ছেড়ে দিতেই নাক দিয়ে এদিক ওদিক পর্যন্ত সারা মেঝে চষে দিতে লাগল।

প্রশ্ন করিলাম, আপনার ভোঁদা কী করছে?

কহিলেন, কাল বোধহয় যুদ্ধে যাবেন, তা বলে দিয়েছি, কোলাব্যাঙের ব্যবস্থা করতে।

কেন?

বীরপুঙ্গব কোলাব্যাং দেখলেই তিড়বিড় করে লাফাতে থাকেন। গণ্ডা কয়েক কোলাব্যাং গায়ের ওপর লাফাতে শুরু করলেই দেশোদ্ধারের বাতিক দেশ ছেড়ে পালাবে।

এমনই করিয়া গ্রামের ছেলেগুলো একে একে ঘরে ফিরিল, কিন্তু ভিন্ন গ্রাম হইতে যাহারা আসিল, তাহারা এত সহজে দমিল না। তাহাদিগকে ধরিয়া বাসে চাপাইয়া জেলা শহরে পাঠানো হইতে লাগিল, এবং বিচারে কাহারও এক মাস, কাহারও দুই মাস জেলের ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

দিন দশ পরে। বিকালবেলা হইতে ঝড় ও বৃষ্টি নামিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমানে চলিতে লাগিল। কাজেই সে রাত্রে পণ্ডিত মশায় আসিলেন না। পরদিন সকালবেলায় খবরের জন্য মনটা উসখুস করিতেছিল, এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় হাস্যবিকশিত মুখে উদিত হইলেন। কহিলেন, শুনেছেন খবর? ধাড়ী কাতলা যে ধরা পড়েছে। সাবাস বুদ্ধি! এমন না হলে সরকার দারোগা করে? বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কি ব্যাপার? পণ্ডিত হাত নাড়িয়া কহিলেন, ন্যাড়া ধরা পড়েছে মশায়। কাল রাত্রে দলবল নিয়ে আফিঙের দোকানে তালা ভেঙে চুরি করছিল, একেবারে বামাল সমেত ধরা পড়েছে, এবার বাছাধন বুঝবেন মজাটা।

কহিলাম, কোথায় রেখেছে ন্যাড়াকে?

রাখবে আবার কোথায়? শেষ রাত্রেই বিদেয় করে দিয়েছে।

রাত্রে বাস কোথায়?

পণ্ডিত খ্যাঁকাইয়া কহিলেন, বাসের কী দরকার' চোর। চোরের মতো হাতকড়ি পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে রুলের গুঁতো মারতে মারতে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে।

এই দৃশ্য কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইয়া পণ্ডিতের সমস্ত দেহ যেন নাচিতে লাগিল। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া, দুই চোখ ছোটো করিয়া, হাত দিয়া বাতাসে ঘুষি মারিতে মারিতে কহিলেন, গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে দিক হতভাগার পাঁজরা ভেঙে, মাথার ঘিলু দিক বের করে, তবে হতভাগা জব্দ হবে। বাবা! ইংরেজের সঙ্গে চালাকি! সারা দুনিয়াটা শাসন করছে, তুই তো একটা নেংটি ইন্দুর।—বলিয়া কড়ে আঙুলটি প্রসারিত করিয়া বাক্যের যথার্থ প্রদর্শন করিলেন।

কহিলাম, ন্যাড়া চুরি করেছে, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?

পণ্ডিত আমার কথার জবাব না দিয়া কহিলেন, আপনার হচ্ছে না বুঝি? যান, দারোগাবাবুকে বলুনগে।

তাড়াতাড়ি কথাটা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া কহিলাম, পাগল। আমি কি তাই বলছি! বলছি, ন্যাড়া এরকম ছিল না।

সঙ্গদোষ মশায়, সঙ্গদোষ। সেদিনকার নমুনা দেখলেন তো। সঙ্গদোষে সবই সম্ভব। নইলে আমার ভোঁদা, যার পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, সেই দিনকতক বিগড়ে গেল।—বলিয়া দুই যুক্তহস্ত কপালে ঠুকিতে লাগিলেন। কহিলাম, ওকি হচ্ছে? কহিলেন, প্রণাম করছি দারোগাবাবুকে, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যাই একবার গাঙ্গুলি মশায়ের কাছে।—বলিয়া পণ্ডিত প্রস্থান করিলেন।

বাড়ির মধ্যে খবর দিবার জন্য প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, বারান্দায় ন্যাড়ার মা বসিয়া আছেন। চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে, গালে অশ্রুর দাগ এখনও শুকায় নাই। পত্নী গালে হাত দিয়া বিস্ফারিত চক্ষে বসিয়া আছেন। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই পত্নী কহিলেন, শুনেছ? ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

কোনো উপায় নেই?

নিরুত্তর রহিলাম। পত্নী কহিলেন, মাথায় বজ্রাঘাত হবে। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কার? তীক্ষ্ণকণ্ঠে পত্নী কহিলেন, ওই গাঙ্গুলি বুড়োর। ওই মুখপোড়ার পরামর্শেই তো এত কাণ্ড! চুপ করিয়া রহিলাম। ন্যাড়ার মা ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন, শেষ রাত্রে একটি ছেলে এসে আমাকে ওঠালে। ওরা নাকি জনকয়েক ছেলে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ কতকগুলো পুলিসের লোক ওদের ঘেরাও করে। তাদের হাতে বড়ো বড়ো লাঠি ছিল, তাই একটা কেড়ে নিয়ে ন্যাড়া ওর সঙ্গীদের পালিয়ে যেতে বলে একা যুঝতে লাগল। একা অতগুলো লোকের সঙ্গে কতক্ষণ পারবে? শেষে ধরা পড়ল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, খবর পেয়েই লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে একা থানাতে গেলাম। দেখি, একটা খুঁটিতে পিছমোড়া করে বাছাকে আমার বেঁধে রেখেছে। দারোগাবাবুকে কত বললাম, পায়ে ধরলাম, অপমান করে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাছা আমার আর ফিরবে না বাবা?

পত্নী সাহস দিয়া কহিলেন, কেন ভাবছেন কাকীমা? ইংরেজের রাজত্ব হলেও এত অবিচার হবে? বিনাদোষে শাস্তি দেবে? বলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। আমি জবাব দিলাম না। পত্নী কহিলেন, কালই আপনার ছেলেকে আমি পাঠিয়ে দোব। উনি ন্যাড়াকে ফিরিয়া আনবেন, আপনার কিছু ভয় নেই।

পরদিন সকালে ন্যাড়ার মা আসিয়া কহিলেন, বাবা, আজ কী যাবে? কহিলাম, হ্যাঁ। একটু ইতস্তত করিয়া ন্যাড়ার মা চারিটি টাকা আমার হাতে দিয়া কহিলেন, এর বেশি আর পারলাম না বাবা। তোমাকে বেশি কী আর বলব, যা করবার কর, বাছাকে যেন ছেড়ে দেয়।

কহিলাম, যা করবার কিছু ত্রুটি হবে না। তবে আপনার অদৃষ্ট।

প্রচুর আশীর্বাদ করিয়া ন্যাড়ার মা প্রস্থান করিলেন। এমন সময়ে পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা দেখিয়া কহিলেন, ও কি? কহিলাম, ন্যাড়ার মা দিয়ে গেলেন। পত্নী কহিলেন, আর তুমি হাত পেতে নিলে? কথাটার বক্র গতি দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পত্নী কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ঝাঁঝাল কণ্ঠে কহিলেন, তোমার লজ্জা করল না? পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এল, আর তুমি স্বচ্ছন্দে সেই টাকা নিলে? কহিলাম, কোথায় পাবা টাকা?

পত্নী ভ্যাংচাইয়া কহিলেন, কোথায় পাব টাকা? যদি তোমার নিজের ছেলেকে ধরে নিয়ে যেত, কোথায় পেতে টাকা? কহিলাম নিজের ছেলে—। বাধা দিয়া পত্নী কহিলেন, ওরাই কী তোমাদের পর? তোমরা বলে ন্যাড়ার মাকে দাসীবৃত্তি করতে দিয়েছ, মানুষের মতো মানুষ হলে দিতে না। কেন, দেখ নি আমার বাবার বাড়িতে? দিন পঞ্চাশজন আত্মীয় পাত পাড়ছে যে।

জবাব দিলেন না। মনে মনে কহিলাম, মাস্টারি না করিয়া তোমার বাবার মতো যদি জমিদারের নায়েবি করিতাম তো, অনাথাশ্রম খুলিয়া দিতাম।

পত্নী বড়ো মেয়েকে ডাক দিয়া কহিলেন, টুনী, ন্যাড়ার মাকে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আয়। টাকা আমি দোব। বাবা আম-কাঁঠালের জন্য দশ টাকা পাঠিয়েছেন। কী হবে সেই টাকায়? তুমি নিয়ে যেও।

বিকালবেলায় শহরে পৌঁছিয়া প্রথমে কংগ্রেস-অফিসে দেখা করিতে গেলাম। একটা সরু গলির মধ্যে ছোটো একটা দোতলা বাড়ি। দরজার মাথায় কেরোসিন কাঠের তক্তায় আলকাতরা দিয়া লেখা ছিল, স্বরাজ হোটেল। দরজা অর্ধোন্মুক্ত ছিল; মুখ বাড়াইতেই দেখিতে পাইলাম,

সামনের বারান্দায় মোড়ার উপর বসিয়া একজন ঢ্যাঙাপানা লোক যুক্তমুষ্টি অধরৌষ্ঠে চাপিয়া রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখে মুদ্রিত নয়নে বোধকরি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেছে, এবং অদূরে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া আর একজন লোক বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের কনুই ন্যস্ত করিয়া ও দক্ষিণ হস্ত অর্ধপ্রসারিত করিয়া ক্ষুধার্ত নয়নে প্রথম লোকটির দিকে তাকাইয়া আছে। সহসা গাঢ় কুণ্ডলায়মান ধূমে চারিদিক ছাইয়া গেল। দ্বিতীয় লোকটা দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ-প্রসারিত করিতেই প্রথম লোকটা কড়া গলায় কহিল, দাঁড়া ব্যাটা, কুলকুণ্ডলিনী আগে জাগ্‌গত হোক।—বলিয়া পুনবায় সমাধিস্থ হইল। দ্বিতীয় লোকটা দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া কাঁচুমাচু মুখে কহিল, শুকনো কাঠ হয়ে গেল যে!

একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কংগ্রেস-আফিস কোথায় বলতে পার? দ্বিতীয় লোকটা মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত মুখে কহিল, দোতলায়।

পার্শ্বে অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া দোতলার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা বন্ধ। একটু ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গেল, কিন্তু সভয়ে পিছাইয়া আসিলাম, মনে হইল, এক হাজার গোখরো সাপ একসঙ্গে গর্জন করিতেছে।

কংগ্রেস-আফিসে সাপ! ইংরেজ তাড়াইবার জন্য ইহারা সাপ পুষিতেছে নাকি। খাঁটি স্বদেশি প্রথা নিশ্চয়ই! কিন্তু হঠাৎ চটাস করিয়া শব্দ হইতেই গর্জন বন্ধ হইয়া গেল, তারপর কাসির শব্দ; তবে সাপ নয়! দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ঘর অন্ধকার, সব দরজা জানালা বন্ধ, একটানা ঘর্ঘরধ্বনি ঘরের পরিমিত ও রুদ্ধ বাতাসকে মথিত করিতেছে। একটা জানালা টানিয়া খুলিতেই বুঝিলাম, ইহাই আদি ও অকৃত্রিম কংগ্রেস- আফিস। ইহার মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে সর্বত্র বঙ্গমাতা নিজ করতলের চাপ আঁকিয়া স্বকীয়ত্ব ঘোষণা করিতেছেন। সারা মেঝে খাঁটি ধুলা। বাংলাদেশের কারখানায় তৈয়ারি আধপোড়া বিড়ি ইতস্তত ছড়ানো এবং সারা দেওয়াল ব্যাপিয়া বঙ্গমাতার সেবকবৃন্দের মুখনিঃসৃত থুতু ও কফের দাগ। ছাদে ও কোণে বঙ্গদেশীয় মাকড়সার তৈয়ারি জাল পুরু হইয়া ঝুলিতেছে এবং ওই যে বিশালাকায় ব্যক্তি স্খলিত বসনে চিৎ হইয়া ঘুমাইতেছে এবং যাহার ভুঁড়িটি একটি বৃহৎ হাপরের মতো আন্দোলিত হইতেছে, উনি যে বঙ্গমাতার একজন চিহ্নিত সেবক, তাহা উঁহার চটের মতো মোটা ও মলিন খদ্দরের কাপড় দেখিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার সাধ্য নাই।

দুই কানে আঙুল দিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কি অসামান্য সাধনা, অথচ কী অপর্যাপ্ত অপচয়। যে বিপুল বন্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে সারা দেশের মাটি উর্বর হইয়া উঠিত, তাহা কেবল দুই তীরকে প্লাবিত ও পযুর্দস্ত করিতেছে। অথবা ইহাই বোধ- হয়? এ দেশের ভাগ্যলিপি। না, হইলে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দিয়া বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত রোদে পুড়িয়া পিকেটিং করাইবার এবং নেতাদের রাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা মুখস্ত করিবার কী দরকার? তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া যদি অন্তত তেত্রিশ হাজার সিদ্ধনাশা মহাপুরুষ একত্র করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের গর্জমা নাসিকার সম্মুখে ভারতের মুষ্টিমেয় ইংরেজ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে?

হঠাৎ পটাস করিয়া শব্দ হইল, এবং একটি মাছির মৃতদেহ নিদ্রিতের গাল হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িল। সমুদ্রকল্লোল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল। এই সুযোগে হাঁকিয়া কহিলাম, মশায়, শুনছেন?

নিদ্রা-কলুষ দুই রক্তবর্ণ চক্ষু অর্ধোন্মীলিত করিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, কে?—বলিয়া নিম্ন-ভারাক্রান্ত রবারের পুতুলের মতো অবলীলাক্রমে উঠিয়া বসিলেন।

কহিলাম, নকুড়বাবু কোথায়?

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জবাব আসিল, নকুড়বাবুর কী দরকার? আমি রয়েছি কী জন্যে?

কহিলাম, আপনি—

হ্যাঁ আমি। আমি জেলা-কংগ্রেসের কর্মসচিব কালান্তক কানুনগো। জেলার সমস্ত কাজের ভার আমার হাতে।—বলিয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিলেন।

ন্যাড়াসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ খুলিয়া বলিলাম। নিরাসক্তকণ্ঠে কালান্তকবাবু জবাব দিলেন, বেশ তো! এতে করবার কী আছে?

ওর মা কান্নাকাটি করছেন।

কালান্তকবাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, কান্নাকাটি করছেন? পরমুহূর্তেই কণ্ঠ কঠোর, দৃষ্টি কুটিল এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, বিধবার কান্নাকাটিই শুনতে পাচ্ছেন, আর মায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছেন না?

বিস্মিতকণ্ঠে কহিলাম, মা? কার মা?

কার মা? আমার মা, আমাদের মা, তেত্রিশ কোটি ভারতসন্তানের মা—ভারতমাতা। সহসা দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মস্তক হেলাইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তির্যকভাবে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, ওই শুনুন মায়ের কান্না।

তর্জনীনির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিলাম, কোণে মাকড়সার জালে সদাধৃত জনৈক মাছি করুণ আর্তনাদ করিতেছে।

কহিলাম, ও তো মাছি।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, ঘন ঘন মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে কালান্তক কহিলেন, মাছি নয়—মাতা, মাকড়সার জাল নয়—ইংরেজের পাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল; আপনি অন্ধ।

প্রতিবাদ না করিয়া ভূমিতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। ডজন কয়েক মাছির মৃতদেহ ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, জালে বসিলেই ভারতমাতা, গালে বসিলেই মাছি।

কহিলাম, মায়ের একমাত্র ছেলে—

উত্তর আসিল, হলেই বা একমাত্র ছেলে। মহাভারত পড়েছেন? অভিমন্যুর মায়ের ক ছেলে ছিল মশায়? রেহাই পেয়েছিল কী?

নিজের বুক চাপড়াইয়া কহিলেন, আর আমি? আমিও মায়ের এক ছেলে। তবু, মা বাবা স্ত্রী পরিজন, প্র্যাক্‌টিস্, (দেওয়ালের কাছে একটি ছোটো বাক্স দেখিয়া বুঝিলাম, ইনি হোমিওপ্যাথী ডাক্তার) একঘর ছেলেপিলে, এক গাঁ রুগি ছেড়ে এখানে যে পড়ে আছি, কিসের জন্য? মায়ের পায়ে এই তুচ্ছ প্রাণটাকে (নিজের কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন) বলি দেবার জন্যে। ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া কহিলেন, মায়ের একমাত্র ছেলে।

ঘাবড়াইয়া গিয়া আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, তবু একটা কিছু করা দরকার। উকিল-টুকিলদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ—

বজ্রনাদ করিয়া কালান্তক কহিলেন, কী? আমরা উকিল দোব? ইংরেজের আদালতে তাদের নোকরদের সামনে গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে 'ধর্মাবতার!' বলব আমরা? বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? কিছুক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিসের ভয় করছেন আপনি? জেল? মহাত্মা গান্ধি জেলে, বড়ো বড়ো নেতারা জেলে, সারা দেশের স্ত্রী পুরুষ জেলে, আমরা জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর আপনি ভয় করছেন জেলের?

একটু দম লইয়া কহিলেন, আপনি নিজে কোথায় বলুন দেখি? আপনিও জেলে। সারা ভারতবর্ষ একটা বিরাট জেলখানা। আপনার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন দিকি? কী দেখছেন? শেকল, আষ্টেপৃষ্টে লোহার শেকল; একটু উঠে দাঁড়ান দিকি, ঝনঝন করে উঠবে।

বাধা দিয়া কহিলাম, কিছু করবার নেই তা হলে?

না, পিকেটিং করতে চান তো থাকুন এখানে। হোটেলে খান, এখানে শোন। না হয় সোজা বাড়ি গিয়ে বিধবাকে কান্না থামাতে বলুনগে।

ইহাদের কাছে কোনো কাজ পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া চলিয়া আসিয়া সটান একজন উকিলের বাড়ি গিয়া উঠিলাম। উকিল মহাশয় চেয়ারে প্রায় চিৎ হইয়া, টেবিলে পা চাপাইয়া, সর্বাঙ্গে খবরের কাগজ চাপা দিয়া বসিয়াছিলেন। পদশব্দ শুনিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, কে?

কহিলাম, আমি।

ও, মক্কেল! তা হলে বসুন।—বলিয়া পার্শ্বের বেঞ্চিটা দেখাইয়া দিয়া কাগজ টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া উকিলবাবু পা নামাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কী কেস? কেউ ডোবাচ্ছে, না কাউকে ডোবাতে চান?

কহিলাম, আজ্ঞে না, স্বদেশি কেস।

স্বদেশি বিদেশি বুঝি না, কেসটা কী খুলে বলুন দিকি?

খুলিয়া বলিতেই উকিলবাবু কহিলেন, ও, চুরি! তা এখন এখানে কেন? মোক্তারের কাছে যান। জামিনে খালাস করুন। তারপর ঠিক সময়ে খবর দেবেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই উকিলবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমার ফিটা কে দেবে?

কহিলাম, ফি? দেশের কাজে—

উকিলবাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেশের কাজে! আপনারা কী ভাবেন, স্বরাজ হলে উকিল-মোক্তারের অন্ন উঠে যাবে?

কহিলাম, কিছুই তো করলেন না, তবু ফি?

উকিলবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, করলাম না? বেঞ্চিতে বসতে দিলাম, পরামর্শ দিলাম, এতখানি সময় নষ্ট করলাম, তার দাম কে দেবে? কী করেন আপনি? মাস্টারি বুঝি?

ঠিক চিনিয়াছে দেখিতেছি। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

উকিল লম্বভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাইতেই এই বুদ্ধি! হাত বাড়াইয়া ধমক দিয়া কহিলেন, দিন দিন, ফি দিন। অগত্যা পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিতেই উকিলবাবু টাকাটি টেবিলের উপরেই ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, এক টাকা না, দু টাকা।—বলিয়া সবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি জানি, হয়তো ছিনাইয়া লইবে—এই ভয়ে আর এক টাকা নামাইয়া দিয়া এবার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্থানত্যাগ করিলাম।

পরদিন সকালে একজন মোক্তারের খোঁজ করিবার জন্য কাছারিতে হাজির হইলাম। চারিদিক লোকে গিসগিস করিতেছে, এবং পোশাক আঁটিয়া উকিল ও মোক্তারের দল কাজে ও বিনা কাজে তাহাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া খরিদ্দার সংগ্রহ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কাছে গেলে সস্তায় কাজ সারিতে পারিব স্থির করিতে না পারিয়া একপার্শ্বে বিহ্বলনয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, একজন লোক মরি-কি-মারি করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া তাহার গন্তব্য পথের নিকটবর্তী হইতেই লোকটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রশ্ন করিল, মশায়! অঘোরবাবু কোথায় জানেন? হাঁ কি না, জবাব দিতে না দিতেই লোকটা কহিল, জানেন না? হায় হায়। ওদিকে হাকিম মামলা ধরেছে, ইদিকে বেটা উকিল টাকা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।—বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল।

একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা নিস্ফল ভাবিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে পুরা নহে, পৌনে-প্যান্ট ও তৈলচিক্কণ কালো আলপাকার পৌনে-হাতা কোট পরিয়া একজন মধ্যবয়সী মোটা ও বেঁটে লোক, খুব সম্ভব মোক্তার, একজন মক্কেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতেছে! মোক্তার বলিতেছে, আট দিনে পাঁচ আষ্টে চল্লিশ টাকার চুক্তি, তিরিশ টাকা দিয়েছিস, আরও দশ টাকা দিতে হবে, এক পাই-পয়সা কম হলে চলবে না। মক্কেল কহিতেছে, জিতলে তো সবই দিতাম। হেরে গেলাম যে।

হারলেই বা। হার জিতে কী আমার হাতে? খাটতে কসুর করেছি দেখেছিস?

এজ্ঞে, খেটেছেন বইকি। তবু—

ধমকাইয়া মোক্তার কহিল, আবার তবু! নিজে তো খাড়া দম দাঁড়িয়ে ছিলি, বক্তিমে তো নিজের কানে শুনেছিস! কি রকম বক্তিমে। হাকিমের ভাগ্যি ভালো কড়িকাঠ চাপা পড়ে নি। এততেও যে হারলি, সে কি আমার দোষ? তোর নিজের অদেষ্ট। দে বেটা, টাকা দে।

মক্কেল কোমর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে আমাকে রেহাই দেন বাবু। আর কিছু নেই আমার।

মোক্তার তাড়াতাড়ি তাহা পকেটস্থ করিয়া কহিল, সত্যি বলছিস? কিচ্ছু নেই? কাছাতে? বামুনকে ঠকাস নি ব্যাটা! উচ্ছন্ন যাবি তা হলে।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়িতেই কহিল, তুমি কে হে? ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? কী দরকার তোমার?

বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে, মোক্তারের—

মোক্তারের দরকার তো, হাবাকান্তের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? গড়গড় করে চলে এস না কাছে। মাখন মোক্তারের নাম শোন নি? আমিই মাখন মোক্তার।

কাছে যাইতেই মোক্তার কহিল, কী কেস?

কহিলাম, স্বদেশি—

মাখন পুলকিত হইয়া কহিল, স্বদেশি? তবে বাপু ঘুরঘুর করছিলে কেন? সটান চলে আসতে পার নি? সমস্ত কাছারিতে এক মাখন মোক্তারই শুধু কংগ্রেসের লোক, খাঁটি স্বদেশি।—বলিয়া পটাপট জামার বোতাম খুলিয়া খদ্দরের ফতুয়া টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, এই দেখ খদ্দর—জাপানি নয়, আসল। তা বাপু কেসটা কী?

সমস্ত শুনিয়া মাখন মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, চুরির কেস। শক্ত ব্যাপার। অনেক টাকার জামিন লাগবে। একশো টাকার কমে কোনো মোক্তারই রাজি হতে চাইবেন না, তবে আমার কথা ছেড়ে দাও। দেশের কাজে জীবনই দোব ঠিক করেছি তো সামান্য টাকা। গোটা পঞ্চাশ দিলেই হবে। কত টাকা আছে সঙ্গে?—বলিয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি আমার বুক-পকেটের দিকে নিক্ষেপ করিল। আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, টাকা তো আনি নি। বিস্মিতকণ্ঠে মাখন কহিল, টাকা আন নি? কিচ্ছু না? ঘাড় নাড়িলাম।

ক্রুদ্ধস্বরে মাখন কহিল, টাকা তো আনি নি বিস্মিতকণ্ঠে মাখন কহিল, টাকা আন নি? কিচ্ছু না? ঘাড় নাড়িলাম।

ক্রুদ্ধস্বরে মাখন কহিল, টাকা আন নি তো এসেছ কীসের জন্যে? যাও খসে পড়ো।

কহিলাম, আপনি কংগ্রেসের লোক—

কড়া গলায় মাখন কহিল, হ্যাঁ, কংগ্রেসের লোক, একশো বার কংগ্রেসের লোক। তা বলে বিনা পয়সায় মোকদ্দমা চালানো মাখন মোক্তারের কুষ্ঠিতে লেখেনি। ইতিমধ্যে মাখনের মক্কেল কাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই, ওরে অই ব্যাটা, পালাচ্ছিস কোথায়? শোন শোন।—বলিতে বলিতে মাখন দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

আরও অনেকগুলি কংগ্রেসি ও অকংগ্রেসি মোক্তারের সহিত দেখা হইল। কিন্তু কোটের নীচে ছেঁড়া খদ্দরের ফতুয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য দেখিলাম না। সকলেই প্রাজ্জ্বলভাবে বুঝাইয়া দিল, কেস চালাইতে হইলে কমপক্ষে এক শত টাকার কম হইবে না—স্বয়ং ভারতমাতা আসিলেও না। কিন্তু এত টাকা কী করিয়া সংগ্রহ করিব? ন্যাড়ার মায়ের ভিটাটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই; আর আমি তো স্কুল-মাস্টার। মাস্টারি-জীবনে আর যা কিছুরই প্রাচুর্য থাক,

অর্থের থাকে না। তা ছাড়া আমার সাংসারিক বুদ্ধি অনুক্ষণ এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল যে, এসব হাঙ্গামা করিও না; জলে বাস করিয়া কুমিরের সহিত বিবাদ করিবার দুর্মতি ছাড়ো। অতএব ন্যাড়ার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

একজন নবোদগত-পক্ষ মোক্তারকে দিয়া স্বল্পব্যয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। ন্যাড়া আসিয়া নমস্কার করিল।

কহিলাম, কেমন আছিস?

ন্যাড়া হাসিয়া কহিল, সরকারের অতিথি, আছি ভালোই। আপনারা ভালো আছেন? পিকেটিং চলছে? ঘাড় নাড়িয়া দুই প্রশ্নেরই জবাব দিলাম।

ন্যাড়া কহিল, আপনিও আসুন।

কথাটায় কান না দিয়া তাহার জামিনের কথা পাড়িলাম। ন্যাড়া সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কী হবে দিন কয়েকের জন্যে বাইরে গিয়ে? জেল আমাদের হবেই। তা ছাড়া আমি তো একা নয়।

মানে?

আমাদের অনেককেই ধরেছে যে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যাড়া বলিল, জেলের ভয় আমাদেব নেই। সারা দেশটাই একটা বড়ো জেলখানা। আমাদের ভয় কী জানেন? —পাছে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়!

বাধা দিয়া কহিলাম, কাকিমা কান্নাকাটি করছেন।

ন্যাড়া কহিল, মা! মা কী আমার জন্য কাঁদছেন? ভবিষ্যতে সাহেবের চাকরি করে যে সংসার পেতে দিতে পারতাম, সেই ভাবী সংসারের জন্যে কাঁদছেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাদের মা-বোনরাই আমাদের প্রবল বাধা। অথচ রেবা দেবী! আমাদের দেশেরই তো মেয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে রাজপুত মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে যুদ্ধের সাজ পরিয়ে দিত, হাসতে হাসতে চিতায় প্রাণ দিত, তাদের চেয়ে এক তিল কম নন। আমার মনে হয়—

বাধা দিয়া কহিলাম, তোর মাকে কী কিছু বলতে হবে?

ন্যাড়া কহিল, কী আর বলবেন? বলবেন, ভালো আছি।

বিচারে ন্যাড়াদের তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। চুরি প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীর অভাব হইল না। ন্যাড়ার দলেরই জনকয়েক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, গাঙ্গুলি মহাশয়ের দুইজন প্রজা ন্যাড়াকে স্বচক্ষে দরজা ভাঙিতে দেখিয়াছে বলিল, এবং স্বয়ং দোকানদার ন্যাড়া ও তাহার সঙ্গীদের অপরাধী বলিয়া সনাক্ত করিল। ন্যাড়ার মা দিনকয়েক কান্নাকাটি করিলেন। তারপর যেমন করিয়া স্বামীর মৃত্যু ও কন্যার বৈধব্যকে বহন করিতেছেন, তেমনই নিঃশব্দে পুত্রের বিচ্ছেদব্যথাকে বহন করিতে লাগিলেন।

তিন বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া নেতারা আইন-মান্য আন্দোলন সুরু করিলেন। স্বরাজ সমুদ্র-পার হইতে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইল না। গাঁজা ও আফিঙের বিক্রয় চারগুণ বাড়িয়া গেল; বিলাতি সিগারেট ও বিলাতি সুতার ধুতি পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতমাতা ভারতসমুদ্রে হাঁটুজল না পাইয়া, আত্মহত্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া সবরমতী আশ্রমে আশ্রয় লইলেন।

ন্যাড়ার মা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হ্যাঁ বাবা, আর কতদিন আছে? বাছা আমার কবে ফিরবে? সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম, আবার কী কাকিমা! আসবার সময় হয়ে এল প্রায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় ন্যাড়ার মা আসিয়া একটা সরকারি চিঠি হাতে দিয়া কহিলেন, এই চিঠিটা আজ এসেছে। বোধহয় ন্যাড়ার চিঠি। দেখ দিকি বাবা, কি লিখেছে!

পড়িতে লাগিলাম। ন্যাড়ার মা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা, আসবে তো?

কহিলাম, আসবে।

ভালো আছে তো?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না। অসুখে ভুগছে, দুর্বল। এখান থেকে কাউকে গিয়ে আনতে হবে।

ন্যাড়ার মা বিবর্ণমুখে কহিলেন, অসুখ করেছে? আনতে যেতে হবে? কে যাবে বাবা?

ইতিমধ্যে পত্নী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহস দিয়া কহিলেন, ভয় কী কাকিমা? উনি যাবেন। চিকিচ্ছেপত্র যা করাতে হয়, সব উনি করবেন। কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর গাঙ্গুলি মহাশয়ের কাছে গিয়া ন্যাড়ার কথা জানাইয়া ছুটি চাহিলাম। গাঙ্গুলি মহাশয় চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই তো হে, ছোঁড়া আবার ফিরে আসছে। আবার গোলমাল করবে না তো? কহিলাম, পাগল হয়েছেন। আন্দোলনই বন্ধ হয়ে গেছে। ও একা কী করবে?

একা আর কই ভায়া? সাঙ্গোপাঙ্গ জুটতে কতক্ষণ? দেখ নি, সেবারও কী রকম করে তুলেছিল? সবাই মিলে একরকম করে থামানো গেল তাই, কিন্তু বুদ্ধি বটে দারোগাবাবুর। ও রকম দারোগা আর দেখলাম না, প্রাতঃস্মরণীয় লোক। জবাব দিলাম না। গাঙ্গুলি কহিলেন, ছোঁড়ার খুব অসুখ করেছে, বলছ না? তা হলে সরাসরি আর গাঁয়ে এনে কী দরকার? চিকিচ্ছেপত্র যা করাতে হয়, জেলাতেই করিও। সারে তো আর উপায় কী, আর না সারে তো—

বাধা দিয়া কহিলাম, শহরে থেকে চিকিচ্ছে করাবার পয়সা কই?

গাঙ্গুলি কহিলেন, কেন? ভিটেটা কী মাগির পরকালে সাক্ষী দেবে? বাঁধা দিক, আমি টাকা দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া স্কুলের কথা পড়িলাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে কাজকর্মের ব্যবস্থা-বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি নয়টার সময়ে বাড়ি ফিরিবার পথে গাঙ্গুলি-গিন্নীর সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এই যে দাদা! তোমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছি। কহিলাম, সেকি দিদিমা! আমার পথ চেয়ে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কেন? হুকুম হলে নিজেই কুঞ্জে গিয়ে হাজির হতাম যে। দিদিমা কহিলেন, ঘরে অমন চাঁদপানা বউ, বুড়ি দিদিমার হুকুম কী আর কানে ঢুকবে ভাই? কিন্তু যাকগে, তুমি কী কালই যাচ্ছ?

কহিলাম, হ্যাঁ।

ন্যাড়ার অসুখ কী খুব বেশি?

চিঠি পড়ে তাই মনে হল। একা আসতে পারবে না।

ওই হতভাগীটাকেও নিয়ে যাও, বলা তো যায় না। তারপর অঞ্চল-প্রান্ত হইতে একখণ্ড কাগজ খুলিয়া আমার হাতে দিয়া কহিলেন, পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, ছোঁড়ার চিকিচ্ছেপত্তর করিও। দরকার হলে আরও দোব আমি। কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না দাদা, নাতবউকে পর্যন্ত না।—বলিয়া স্বগৃহোদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে একটা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া জেলখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ফটকের সামনে হাজির হইলাম। প্রায় এক শত বিঘা জমি জুড়িয়া বিরাট জেলখানা; চারিদিক উচ্চ প্রাচীর। বন্দুকধারী পশ্চিমা রক্ষীর কড়া পাহারায় কোথাও কাক-পক্ষী পর্যন্ত বসিবার জো নাই। ইহার মধ্যে শত শত মানুষ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইন ভঙ্গ করিয়া দিনের পর দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; এবং ওই পশ্চিমা রক্ষীগুলা দৈহিক ও উহাদের প্রভুরা মানসিক শক্তি প্রয়োগে হতভাগ্যাদের প্রায়শ্চিত্ত ত্রুটিহীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। জেলখানা নরকের ঐহিক সংস্করণ।

পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ন্যাড়াদের বাহির হইবার সময় হইল। কিছুক্ষণ পরে কতকগুলা ছেলে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা কাহাকে, বোধ হয় ন্যাড়াকে, ধরিয়া ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাছে আসিতেই আমার অনুমান সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

কিন্তু ন্যাড়াকে দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। তেমন ফর্সা রং কালো হইয়া গিয়াছে, এবং পেশিবহুল শক্তিমান ঋজু দেহ অস্থিকঙ্কালসার ও কুব্জ হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। চোখ দুইটি কোটরে ঢুকিয়াছে এবং মাংসহীন বিবর্ণ মুখের মধ্যে শীর্ণ নাকটা খাড়ার মতো উঁচু হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিল, দাদা, এসেছেন।—বলিয়া প্রণাম করিতে গেল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলাম, থাক থাক, কী হয়ে গিয়েছিস? চিনতে পারা যায় না যে! একটি ছেলে কহিল, খুব অসুখ হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। গায়ে হাত দিতেই ন্যাড়ার জ্বরতপ্ত দেহের স্পর্শে আমার হাতটা যেন পুড়িয়া গেল। কহিলাম, জ্বর এখনও রয়েছে যে! ন্যাড়া নিজেকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আছেই তো। কিন্তু আর থাকবে না দাদা। মায়ের কোলে ফিরে এলাম, এবার আমি ভালো হয়ে যাব। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, এই ফাঁকা ময়দান, খোলা আকাশ কতকাল দেখি নি মনে হচ্ছে।—বলিয়াই কাসিতে কাসিতে বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমি কহিলাম, থাক, এখন আর কথা বলে কাজ নেই। চল, গাড়িতে চল।—বলিয়া আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠাইলাম।

ট্রেনে সমস্ত রাস্তা ন্যাড়া নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, দাদা। আসবার সময় রেবা দেবীব সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন? জবাব দিলাম, না! ন্যাড়া কহিল, উচিত ছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিযা কহিল, খবর পেলে নিশ্চয়ই স্টেশনে আসতেন। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমি তো ওঁকে বেশি জানি না। যারা ওঁর সঙ্গে কাজ করেছে, সকলেই ওঁর কত প্রশংসা করে। বলে, বাংলাদেশে কত মেয়েই তো কাজে নেমেছেন, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না—কী রূপে, কী গুণে, কী দেশেব ওপর ভালোবাসায়! আমরা যেদিন এলাম, সেদিন নিজে স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিচ্ছু বললেন না, একদৃষ্টে আমাদের দেখতে লাগলেন। আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে হাতকড়ি, চারিদিকে পুলিস। মনে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কোথায় রইল ভয়! মনে হল ওই মুখের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীতে এমন কাজ নেই, যা আমরা করতে পারি না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, জেলে যখনই কষ্ট অসহ্য হয়েছে, তখনও চোখ বুজে ওঁর মুখ মনে কববার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি, আমার শুধু একার কষ্ট, কিন্তু আমাদের যে যেখানে আছে, সকলের কষ্ট উনি নিজের বুকে তুলে নিয়েছেন। আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিযা বলিতে লাগিল, যখনই মনে মনে ভারতমাতার মূর্তি ফুটিয়ে তোলবাব চেষ্টা করি, তখনই রেবা দেবীর মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

ন্যাড়ার একজন সঙ্গী কহিল, দয়ালবাবুরা যখন জেল থেকে ফিরছিলেন, তখন নাকি খুব প্রোসেশান হয়েছিল? আমরাও তো অনেকগুলি ফিরছি, আমাদের জন্যে কিছু হবে না?

ন্যাড়া কহিল, কি জানি! হবে হয়তো।

গাড়ি হইতে নামিয়া ন্যাড়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল এবং দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইল। যে ছেলেটি প্রোসেশানের জন্য বাহানা করিতেছিল, সে গজগজ কবিতে লাগিল, একজনও কেউ আসে নি। এতদিন পরে ফিরে এলাম। আমরা তো আর লিডার না, ওদের জন্যেই সব।

সদলবলে কংগ্রেস-অফিসে হাজির হইলাম। দেখিলাম, কালান্তকবাবু বসিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন ও চানাচুর খাইতেছেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আবার কে? আমাদের একজন কহিল, আমরা আজ জেল থেকে ফিরলাম। এক দানা চানাচুর মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ভরাট মুখে কালান্তক কহিলেন, ও, তা এখানে কেন? সেই ছেলেটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, কোথায় যাব শুনি?

কেন বাড়িতে?

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছি, আবার ফিরব কোন্ মুখে?

তবে চুলোয় যাও।

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি গিয়ে কী করব আমরা?

কালান্তক জবাব দিলেন, লেখাপড়া অথবা গোচারণ—যা ইচ্ছে। হঠাৎ ন্যাড়ার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওই হাড়গিলে ছোকরা ও রকম বসে বসে ধুঁকছে কেন?

বলিলাম, ওর অসুখ হয়েছে, জেল থেকেই—

চানাচুর চর্বণ বন্ধ রাখিয়া কালান্তক প্রশ্ন করিলেন, কী অসুখ? বিবৃত করিলাম। কালান্তক কহিলেন, তা, এতক্ষণ বসে বসে না ধুঁকে আমাকে বলতে কী হয়েছিল, শুনি? সারা শহরটাকে সারিয়ে দিলাম, আর ওর সামান্য সর্দিজ্বর—বলিয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধের বাক্স খুলিয়া একটি ছোটো শিশি বাহির করিয়া ন্যাড়াকে কহিলেন, এদিকে সরে এস না হে ছোকরা আমাকে যেতে হবে নাকি? ন্যাড়া সারিয়া বসিল। কালান্তক আদেশ দিলেন, হাঁ করো। ন্যাড়া হাঁ করিল। কালান্তকবাবু অতি সতর্কতার সহিত এক ফোঁটা ঔষধ ন্যাড়ার মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এতেই ভালো হয়ে যাবে, বাড়ি চলে যাও।

আমার দিকে তাকাইয়া কালান্তকবাবু কহিলেন, আপনিও-জেল ফেরত নাকি?

কহিলাম, আজ্ঞে না, আমি একে আনতে গিয়েছিলাম।

ওঃ।—বলিয়া কালান্তক দুই ঠোঁট চাপিয়া গাল ফুলাইলেন।

হাসিয়া কহিলাম, আপনি এখনও পা বাড়িয়ে আছেন দেখছি। জেলে যাওয়া আর ঘটে ওঠে নি, না?

মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া অনুযোগের স্বরে কালান্তকবাবু কহিলেন, সবাই ওই কথা বলছে। কিন্তু যাই কখন মশায়? সকলকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে করতেই আন্দোলন ফুরিয়ে গেল। তাছাড়া, পা বাড়িয়ে থাকাটাই কী সোজা? কজন আছে শুনি?—বলিয়া জিজ্ঞাসু মুখে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কহিলাম, আন্দোলন তো বন্ধ হয়ে গেছে বলছেন; তবে নিজে এখনও পড়ে আছেন কেন?

কালান্তক কহিলেন, আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন চলছে হরিজন আন্দোলন। তাইই করছি। ঘরের কোণে কতকগুলা ছেঁড়া বই, ও ভাঙা স্লেট জড়ো করা ছিল, সেইগুলার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, ওই দেখুন। মেথরদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি, চিকিচ্ছে করছি। ওদের দেহ ও মনের সম্পূর্ণ ভার এখন আমার হাতে। ঘরের আর এক কোণে একটা মাটির কলসি দেখাইয়া কহিলেন, ওটায় কি আছে আছেন? সর্বতীর্থের জল—যেখানে যতরকমের হরিজন আছে, সক্কলের ছোঁওয়া জল—খাবেন এক গ্লাস? খাও না হে এক এক গ্ল্যাস করে সব।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, দেখুন, এখানে দিন কতক থাকতে চাই।

কালান্তকবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, এখানে থাকা চলবে না।

কহিলাম, বেশ। এ শহরে?

তা থাকতে পারেন। কিন্তু কেন?

এর চিকিচ্ছে করাবার জন্যে।

বিস্মিতকণ্ঠে কালান্তক কহিলেন, আবার চিকিচ্ছে কেন? চিকিচ্ছে তো হল।

কহিলাম, তা তো হলই, তবু আর দু একজনকে দেখাতে চাই।

মুখ গম্ভীর করিয়া কালান্তক কহিলেন, দেখানগে, তা আমার সঙ্গে পরামর্শ কেন?

মানে, আপনার সঙ্গে ডাক্তারদের আলাপ আছে, যদি একটু বলে দেন—

পাগল হয়েছেন নাকি? তা আবার কোনো ডাক্তার পারে? ওসব আমার দ্বারা হবে না মশায়।

কংগ্রেস-অফিস হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, একটা রিকশা হইতে নকুড়বাবু ও রেবা দেবী নামিতেছেন। সকলে তাঁহাদের অভিবাদন করিল। ন্যাড়া রেবা দেবীর কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কহিল, চিনিতে পারেন? রেবা দেবী জীবনে ন্যাড়াকে কখনও দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া মনে হইল না। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, চিনতে পারছি না তো! ন্যাড়া আত্মপরিচয় বিবৃত করিল। রেবা দেবী ধাপ্পা দিয়া কহিলেন, চিনতে পেরেছি, জেল থেকে ফিরছেন বুঝি?

ন্যাড়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা সবাই।

স্বীয় বদনমণ্ডলে যুগপৎ ঈষৎ হাস্য ও দন্ত বিকাশ কবিয়া রেবা দেবী কহিলেন, ও, সবাই! আচ্ছা এবার বাড়ি যান, অনেকদিন আত্মীয়স্বজনদের দেখেন নি।

আমি কহিলাম, খুব অসুখ হয়েছিল।

আমার দিকে চাহিয়া রেবা দেবী কহিলেন, কার? আপনার নাকি? বেশ ভালো আছেন তো?

কহিলাম, আমার নয়, এর।—বলিয়া ন্যাড়াকে দেখিলাম। রেবা দেবী দুই চক্ষে করুণা ও সমবেদনা ফুটাইয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, আপনাব কি? তাই এমন কাহিল হয়ে গেছেন। খুব কষ্ট হয়েছিল, বুঝি? আহা! ন্যাড়ার দুই চোখ চক চক করিতে লাগিল। একজন ছেলে নকুড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কী করব এবার? নকুড়বাবু কহিলেন, এখন সব বাড়ি যাও। গ্রামে গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করো। দুঃখী দরিদ্র ও অধঃপতিতদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, দেশের গণশক্তিকে জাগিয়ে তোল। আগামী আন্দোলনের ক্ষেত্র আর নগরে নয়, গ্রামে। লক্ষ লক্ষ পল্লি নিয়েই তো ভারতবর্ষ। তেত্রিশ কোটি লোকের—

বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিলাম, এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

নকুড়বাবু কহিলেন, তা করুন। বৃষবাহনবাবু এখানকার ভালো ডাক্তার। তাঁকে দেখান। আচ্ছা, নমস্কার।—বলিয়া সকন্যা কংগ্রেস-আফিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ছেলেরাই চেষ্টা করিয়া একটা বাড়ি খুঁজিয়া দিল। বড়ো রাস্তা হইতে কিছু দূরে, একটি ছোটো গলির মধ্যে। গলিটার গতি এই বাড়ি পর্যন্তই। ছোটো একতলা বাড়ি, চারিদিকে ঘন বসতি, কিন্তু কাহারও বাড়িতে যাতায়াতের পথ নাই। বাড়িওয়ালার বাড়ি কাছেই। জাতিতে মোদক, শহরে দোকানদারি করিয়া দু পয়সা উপার্জন করে। কংগ্রেসের নাম শুনিয়া বেশি ভাড়া চাহিল ও তখনই চাহিল। কারণ সে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল, কংগ্রেসের লোকদের উপর তাহার আস্থা নাই। আরও কোথাও খুঁজিবার ভয়ে তাহার প্রস্তাবে রাজি হইলাম এবং ছেলেদের হেপাজতে ন্যাড়াকে রাখিয়া বাড়ি গিয়া তাহার মাও দিদিকে লইয়া আসিলাম।

তিন দিন পরে সকাল আটটার সময়ে বৃষবাহনবাবুর বাড়িতে হাজির হইলাম। দোতালা বাড়ি, প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে দেওয়ালে কাষ্ঠ-ফলকে ডাক্তারের নাম ও খেতাব লেখা ছিল। ডিস্পেন্সারির বারান্দায় অনেক রোগীর ভিড়। ভিতরে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতেছিলেন। প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। ডাক্তারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; দেখিতে লম্বা ও রোগা; মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। পরিধানে দেশি দর্জির তৈয়ারি গরদের স্যুট, টাই-হীন গলদেশ হইতে স্টেথোস্কোপ লম্বমান। চেয়ারে ঠেস দিয়া ডাক্তারবাবু একজন রোগীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। কথা বলিবার সময়ে, কাঠে র‍্যাদা চালাইবার সময়ে যেমন খ্যাসখ্যাস শব্দ হয়, সেই ধরনের শব্দ হইতেছিল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, যা ডায়াগ্‌নোসিস করেছি, বিধান রায়ের সাধ্য নেই ওতে হাত দেয়, গিয়ে দেখতে পার।

রোগী যুক্তহস্তে কহিল, বিধান-টিধান আমরা জানি না বাবু। আপনার মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে আছি।

তা তো আছ মুখেই শুনছি, ফির বহর দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। দু টাকায় চলবে না বাপু, চার টাকা দিতে হবে।

রোগী কহিল, বাবু, পুরাতন রুগি আমি।

ডাক্তার কহিলেন, রুগি তো পুরাতন, রোগ তো পুরাতন নয়। রীতিমতো নতুন আর সাংঘাতিক। ভালো করে তেড়ে ফুঁড়ে চিকিচ্ছে না করলে এ যাত্রায় বেঁচে ওঠা—

রোগী ভয় পাইয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বাবু, বাঁচব না নাকি?

ডাক্তার অভয় দিয়া কহিলেন, বাঁচবে না, তাই কী আমি বলছি? বাঁচবে, তবে খুব চেষ্টা করতে হবে আর আমাকেই করতে হবে। সস্তা খুঁজতে গিয়ে যদি আর কোথাও যাও, তো শেষ রাস্তা দেখতে হবে।

রোগী বলিল, রাম বল। আর কোথায় যাব বাবু? ডাক্তার কী আর কেউ আছে শহরে? সবগুলিই তো সাক্ষাৎ যমদূত।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, মিছে কথা নয়। চিকিচ্ছের 'চ' জানে না কেউ।—বলিয়া সহাস্য মুখে সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইলেন। রোগী আরও দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিল। ডাক্তার তাহা ড্রয়ারস্থ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন চার টাকাতেই হচ্ছে, বিলেত থেকে ফিরে এলে ষোলো টাকাতেও থই পাবে না।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কখন যাচ্ছেন?

ডাক্তার দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, বাম চোখটি ছোটো করিয়া কহিলেন, সবই তো ঠিক, পাসপোর্ট পেলেই চলে যাচ্ছি।

একে একে সব রোগী বিদায় হইলে আগাইয়া সামনে বসিতেই ডাক্তার কহিলেন, আপনার কী?

ন্যাড়ার নিজেরও রোগের পরিচয় জ্ঞাপন করিলাম। ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জেলে গিছল? কংগ্রেসের লোক? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, যাবার আপত্তি নেই। পুরো ফি দিতে হবে কিন্তু। অনুনয় সহকারে কহিলাম, অত্যন্ত দরিদ্র। ডাক্তার নীরসকণ্ঠে জবাব দিলেন, তা হলে হাসপাতালে নিয়ে যান, একটি পয়সাও খরচ হবে না।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই, বেরুতে হবে। কহিলাম, কিছু অনুগ্রহ করতে হবে ডাক্তারবাবু! ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, কিচ্ছু অনুগ্রহ করতে পারব না, মাপ করুন। কংগ্রেসের কাজ করে আর জেলে গিয়ে এমন কিছু আমার মাথা কিনে রাখেন নি যে, বিনা পয়সায় ছুটতে হবে। কোনো দোকানদার কী কংগ্রেসের নাম শুনে আধা দামে জিনিস ছেড়ে দেয়? তবে আমার ওপরই নেকনজরটা কেন? পুরো ফি দিতে পারবেন তো বলুন, এখনই যাচ্ছি, না হলে অন্যত্র দেখুন।—বলিয়া জোড় হাত বাড়াইলেন।

অগ্রিম পুরা ফি দিয়াই বৃষবাহনবাবুকে লইয়া আসিলাম। রোগী দেখিয়া ডাক্তার গম্ভীর মুখে কহিলেন, নিমোনিয়া হবার উপক্রম হয়েছে, খুব সাবধান হওয়া দরকার। বিদায় লইবার সময় ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রেসক্রিপ্‌শন যা করে দিলাম, তাই-ই চালান। বোধহয় ডাকতে পারবেন না আমাকে। তবে এ পাড়ায় বিজয় ডাক্তার আছে, কম ফি, তাকেই ডেকে দেখাবেন। দরকার হলে আমাকে খবর দিতে পারেন।

সেই দিন রাত্রে ন্যাড়ার জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। পরদিন সকালে বিজয় ডাক্তারের দ্বারস্থ হইলাম। বিজয়বাবুর বয়স প্রায় ত্রিশ, মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করা। গোলগাল চেহারা,

হাস্যময় মুখ। অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত আমার বক্তব্য শুনিলেন এবং আমার সঙ্গেই আসিলেন। রোগী দেখিয়া কিন্তু তাঁহার মুখ কালো হইয়া উঠিল। কহিলেন, নিমোনিয়া, দুটো লাংসই অ্যাফেক্ট করেছে। বৃষবাহনবাবুর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দেখিয়া কহিলেন, এইটাই চলুক, দরকার হলে বদলে দেবেন। ফি দিতে গেলে হাসিয়া কহিলেন, আমাকে এখন ফি দিতে হবে না, রুগির ব্যবস্থা করুন আগে। সেরে উঠুক, তারপর যা হয় দেবেন।

বিজয়বাবু অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মধ্যে আর একদিন বৃষবাহনবাবুকেও ডাকা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগীর অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ন্যাড়া ভুল বকিতে লাগিল। নানা রকমের কথা, জেলখানার নানা অভিজ্ঞতার টুকরা টুকরা স্মৃতি। একদিন দুই রক্তবর্ণ চোখ আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, রেবা দেবী এসেছিলেন, না? কহিলাম, কই, না তো! আমার কথা কানে না তুলিয়া কহিল, এসেছিলেন, আমি দেখেছি।- -বলিয়া দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

ন্যাড়ার মা সেই যে প্রথম দিন হইতে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, দিনান্তে একবার নাওয়া-খাওয়ার জন্য ছাড়া আর মুহূর্তের জন্যও কোথাও নড়িতেন না। কখনও রোগীকে খাওয়াইতেন, মাথায় হাত বুলাইতেন, পাখা করিতেন এবং অধিকাংশ সময়ে একদৃষ্টে ন্যাড়ার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ন্যাড়া যেন দিন দিন দুবে সরিয়া যাইতেছিল, চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। কাহাকেও চিনিতে পারিত না, ডাকিলে সাড়া দিত না, শুধু মাঝে মাঝে দুই রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া কাহাকে যেন খুঁজিত। একদিন রাত্রে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। বিজয়বাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, ক্রাইসিস, আজ রাত্রি কাটে তো ভালো হয়ে যাবে। সমস্ত রাত্রি যমে ও মানুষে টানাটানি হইল। সকালবেলা রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে ফিরিল। জ্বর কমিয়া আসিল, আচ্ছন্ন ভাবটা অনেকটা পরিষ্কার হইল ও চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বিজয়বাবু নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, যাক, ফাঁড়া কেটে গেল, আমি এবার আসি।—বলিয়া বিদায় লইলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম।

বেলা দশটাব সময় বিজয়বাবু আসিয়া রোগী দেখিয়া আমাকে ইঙ্গিতে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, অবস্থা তো ভালো দেখছি না।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, সেকি!

হ্যাঁ, কোলাপ্‌স করে আসছে, আপনি—আপনি একবার বৃষবাহনবাবুকে ডাকুন।

বৃষবাহনবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। বৃষবাবু রোগী দেখিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, হোপ্‌লেস। কোনো আশা নেই, তবে—বলিয়া বিজয়বাবুকে কতকগুলো ঔষধ ইন্‌জেক্‌শন করিতে পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ন্যাড়া হাঁপাইতেছিল। আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া কহিল, দিদিকে দেখব। লক্ষ্মী মাথার কাছে মলিন বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিল। ন্যাড়ার মুখের কাছে নিজের মুখে আনিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল. এই যে ভাই আমি। মাথা নাড়িয়া ন্যাড়া কহিল, তুমি না, রেবাদিদিকে। লক্ষ্মী মলিন মুখ মলিনতর করিয়া সরিয়া বসিল।

রেবা দেবীকে লইয়া আসিবার জন্য নকুড়বাবুর বাড়িতে হাজির হইলাম। বাড়ি দেখিয়া মনে হইল, নকুড়বাবু সম্পন্ন গৃহস্থ। উহার বাবা নাকি সরকারি চাকরি করিয়া অনেক টাকা ও বিষয়আশয় রাখিয়া গিয়াছেন। দোতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে কাঁটা তার দিয়া ঘেরা দেশি ও বিলাতি ফুলের বাগান। বাগানের সামনে কাঠের তৈয়ারি গেট; একটি পত্র-পুষ্প বহুল বৃহৎ লতা অর্ধচক্রাকারে ঘিরিয়া গেটের মাথাটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ির মধ্যে যাইতে হইল। নকুড়বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কী লিখিতেছিলেন। আজ আর পরিধানে কটিবস্ত্র ছিল না, পুরা মাপের মিহি ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে স্যান্ডেল। নমস্কার করিতেই আমার দিকে তাকাইয়া

কহিলেন, কে আপনি? পরিচয় দিতেই কহিলেন, বসুন, কী দরকার আপনার? ন্যাড়ার সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া কহিলাম, বাঁচবার আশা নেই, একবার রেবা দেবীকে দেখতে চায়।

বিস্মিতকণ্ঠে নকুড়বাবু কহিলেন, রেবাকে দেখতে চায়? কেন?

কহিলাম, ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে, একবারটি পাঠিয়ে দিতে হবে আপনাকে।

অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া নকুড়বাবু কহিলেন, পাগল হয়েছেন আপনি? কোথায় যাবে সেখানে!

এমন সময়ে রেবা দেবী 'বাবা!' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে দেখিয়াই একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর গম্ভীরভাবে নকুড়বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবা দেবী সদ্যস্নাতা, পিঠ ছাইয়া খোলা ভিজা চুলের রাশি; কপালে সিন্দুরের টিপ, পরিধানে কালো চওড়া-পাড়ের ফরাসডাঙার শাড়ি ও সাদা শেমিজ, পা খালি। প্রবেশ করিতেই একটি মৃদু সুগন্ধ কক্ষের বাতাসকে আমোদিত করিল।

নকুড়বাবু বিরক্তমুখে কহিলেন, এই ভদ্রলোক কী ফ্যাসাদ আমদানি করেছেন, দেখ! সেদিনের সেই ছোকরা—নারায়ণবাবু না কী নাম—মরতে বসেছে। হঠাৎ তোমাকে দেখবার তার সখ হয়েছে। যেতে পারবে?

রেবা দেবী কহিলেন, তা কী করে হবে বাবা? আজ যে এগারোটার গাড়িতে পিসীমা যাবেন। তুমি যে আমাদের নিয়ে স্টেশনে যাবে বলেছিলে।

নকুড়বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, তাই তো। কিচ্ছু মনে ছিল না। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আর তো সময় নেই। কাউকে একটা গাড়ি শিগগির ডেকে আনতে পাঠিয়ে দাওগে। রেবা দেবী যাইতে উদ্যত হইয়া, থামিয়া আমাকে কহিলেন, দেখুন, সত্যি আমি ভারী দুঃখিত। সময় থাকলে নিশ্চয় যেতাম।

নকুড়বাবু কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও। নিজের ছেলের মতো সব। তা কিছু মনে করবেন না। আপনি নারায়ণবাবুর মাকে আমাদের সমবেদনা জানাবেন। পারি তো একটা শোকসভা ডেকে রিজল্যুশন করে পাঠিয়ে দোব এখন। ঠিকানাটা কংগ্রেস-আফিসে রেখে যাবেন। আর দেখুন, যাবার সময় কালান্তকবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাবেন, শবযাত্রার ব্যবস্থা করবার জন্যে। খুব চৌকস লোক, বিন্দুমাত্র খুঁত থাকতে দেবেন না।

যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, ন্যাড়ার তখন শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, জ্ঞান নাই,দুই চক্ষু মুদ্রিত, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। ন্যাড়ার মা ও লক্ষ্মী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে। আমি কহিলাম, এখন কাঁদবেন না কাকিমা। সারাজীবন ধরে কাঁদবার সময় পাবেন। ওকে শান্তিতে যেতে দিন।

আমি যে আর পারছি না বাবা। বুক যে ফেটে যাচ্ছে আমার।—বলিয়া ন্যাড়ার মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দরজা হইতে কে হাঁক দিল, শুনছেন মশায়। একবার বেরিয়ে আসুন না!

চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বাড়িওয়ালা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, এত কান্নাকাটি কিসের? ব্যাপার কী বলুন দেখি?

আমি কহিলাম, ছেলেটি মারা যাচ্ছে।

আঁৎকাইয়া উঠিয়া বাড়িওয়ালা কহিল, মারা যাচ্ছে। বলেন কী মশায়?

কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। কী করব বলুন? আমাদের অদেষ্ট।

নীরসকণ্ঠে বাড়িওয়ালা কহিল, আপনাদের অদেষ্ট তো বুঝলাম, কিন্তু বাড়ির মধ্যে মরা তো চলবে না মশায়। এর পর ভাড়াটে পাওয়া দুঃসাধ্যি হবে। সরাতে হবে এখনি।

আশ্চর্য হইলাম। কহিলাম, বলেন কী? ঠোঁটের কাছে প্রাণটুকু লেগে আছে, এখনি বেরিয়ে যাবে যে।

কড়া গলায় লোকটা কহিল, তা যাক, কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে যাওয়া চলবে না।

কহিলাম, আপনি মানুষ, না পিশাচ? একটু মনুষ্যত্ব নেই আপনার?

না নেই, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজেরা সরাবে, না লোক ডাকব?—বলিয়া লোকটা বোধ করি লোকজন ডাকিয়া আনিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর ন্যাড়ার ঘরের দিকে যাইতেই ন্যাড়ার মা বাহিরে আসিয়া সজলচক্ষে কহিলেন, কাজ নেই বাবা, ঝগড়া করে। শহর জায়গা, আপনার বলতে কেউ নেই।

ধরাধরি করিয়া ন্যাড়াকে বাহিরে আনিয়া রোয়াকে শোয়াইলাম।

মিনিট কয়েক পরেই মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ন্যাড়া চিরদিনের মতো ঘুমাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে কালান্তকবাবু ও তাঁহার অনুচরবর্গ আসিয়া হাজির হইলেন। বিজয়বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ আসিলেন। শহরের অনেকে আসিল। একটা খাটিয়ায় তোশক ও তাহার উপর ফর্সা চাদর পাতা হইল। ন্যাড়ার মার বুক হইতে ন্যাড়াকে কাড়িয়া লইয়া সেখানে শোয়ানো হইল, এবং একটা স্বরাজ পতাকা দিয়া তাহার আপাদমস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কে একরাশি ফুল লইয়া আসিয়া সমস্ত বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। কংগ্রেস-সেবকরা খাটিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল। পিছনে কীর্তনের দল খোল ও করতাল বাজাইয়া জীবনের অনিত্যতা ও সংসারের অকিঞ্চিৎকরতা বিনাইয়া বিনাইয়া সুরে ও বেসুরে প্রচার করিতে করিতে চলিল; এবং তাহাদের পশ্চাতে শত শত হুজুকপ্রিয় লোক, এমনকী বাড়িওয়ালাটা পর্যন্ত, দেশমাতা ও তাঁহার গতায়ু সেবকের জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ন্যাড়ার মা অশ্রু-সজল বিস্ময়-বিহ্বল নয়ন মেলিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্রের জয়ধ্বনি-মুখর শেষ-যাত্রাপথের পানে তাকাইয়া রহিলেন এবং ন্যাড়ার দেহমুক্ত আত্মা বোধহয় সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে বুঝিতে পারিল যে, এই শোকোচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধাঞ্জলি বাতিকগ্রস্ত জনতার সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র, ইহা কাহারও উদ্দেশ্যে নহে, কাহারও প্রাপ্য নহে—না দেশমাতার, না তাহার।

তার পরদিন সকলকে লইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু ন্যাড়াকে ভুলিতে পারি নাই। যখনই শুনি, কোনো লোক শুধু দেশসেবাদ্বারা বড়োলোক হইয়াছে, কলকাতায় কর্পোরেশনে মোটা মাহিনার চাকুরি পাইয়াছে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি রূপ কল্পবৃক্ষের মগডালে চড়িয়া কাঁচা ডাঁসা ও পাকা ফল নির্বিচারে সাবাড় করিতেছে এবং কাউন্সিলে ঢুকিয়া শুধু হাত তুলিয়া মুঠা মুঠা টাকা ঘরে আনিতেছে, তখনই ন্যাড়ার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ন্যাড়া বাঁচিয়া থাকিলে এমনই হইতে পারিত।

ন্যাড়ার মা এখনও কাঁদিতেছেন, আমায় নিয়ে যা বাবা! আর যে একলা থাকতে পারি না ধন!

সমুদ্রসাক্ষী

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

হেমন্তের সকালের রোদ কাঁচে ফিল্টার হয়ে কবোষ্ণ ওম নিয়ে ঘরে ঢুকছে। এম ডি এখন দেখতে পাচ্ছেন সজীব সকাল, সবুজ গাছ, তাঁর কর্মীদের ধীর, শান্ত, শৃঙ্খলায় বাঁধা চলাফেরা। কাঁচের ওপার থেকে দেখা যায় না কিছুই।

অনেকটা রবীন বসুর মতোই। তিনি যেন মানুষের ভেতরটা দেখতে পান। এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাগাল পায় না কেউই। অতি আবছা নীলরঙা চশমাটার আড়ালে তাঁর চোখ দুটো এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি তৈরি করে। সঙ্গে আঁটা থাকে এক ব্যক্তিত্ব, যা নরম অথচ গাম্ভীর্যে টইটম্বুর।

আগের এম ডি ঘরে এসেই কোট ঝোলানোর স্ট্যান্ডে নিজের স্যুটের কোটটা ঝুলিয়ে রাখতেন। রবীন বসু এসে সেই হ্যাট-কোট স্ট্যান্ডটা সরিয়ে দিয়েছেন। উনি পারেন সুতির হাওয়াই শার্ট। সাদা, ফুটফুটে। শার্টে ইস্তিরির যেখানে যে ভাঁজ পড়ার কথা, সেই ভাঁজে ভাঁজ থাকে নিখুঁত। গরমকালে হাফহাতাই তাঁর পছন্দ। এম ডি, এমনকী কোম্পানির বড়োকর্তা বলেও তাঁকে চেনার উপায় নেই—এত সাধারণ তাঁর পোশাক-আশাক। ছিপছিপে চেহারা। এই বয়সেও এতটুকু মেদ নেই। চশমার ফাঁক দিয়েও বোঝা যায় তাঁর চোখ দুটো বড়ো বড়ো। কালো চকচকে চোখের মণি। বড়ো তীক্ষ্ণ। তিনি যেন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভেতরটা সব দেখতে পাচ্ছেন। তাই বোধহয় কর্মীরা তাঁর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলেন না। হয়তো বলতে পারেন না। সময়ে সময়ে মনে হয়, চোখে কোথায় যেন একটা কঠোরতা গুঁড়ি মেরে গোপনে রয়ে গেছে। সম্ভবত তাঁর অজান্তে। তাঁর চশমার ফ্রেমটা এত সরু, মনে হয় যেন আলতো করে কালো ফ্রেমটা চশমার কাঁচ ছুঁয়ে আছে। তাঁর কালো জুতোজোড়া চকচকে। যেন সদ্য পালিশস্নাত। আলো পড়লে জলের ওপর মুক্তোবিন্দুর মতো সবসময়ে ঝকঝক করে। ঝাঁ চকচকে বলতে তাঁর এ দুটোই।

আগে ম্যানেজাররা স্যুট-টাই পরে আসতেন। এখন এম ডি স্যুট পরেন না বলে তাঁরাও স্যুট পরা ছেড়েছেন। শীতকালে সোয়েটার বা পুলওভার পরেন। ব্লেজার অবধি চড়ান না। এখন ম্যানেজাররাও মাঝেসাঝে হাফহাতা শার্ট পরে অফিসে আসেন।

রবীন বসু আসার পর ঠিক হল একজিকিউটিভ ক্যান্টিন আর স্টাফ ক্যান্টিন মিলিয়ে দেওয়া হবে। আর দুরকম ক্যান্টিন থাকবে না। লাঞ্চ আওয়ারে দুপক্ষ দুরকম ক্রকারিতে, দুরকম খাবার খাবেন, সেটা আর চলবে না। সবার জন্য এক ক্যান্টিন। আমি পারসোনাল ম্যানেজার। কর্মীদের সঙ্গে, ইউনিয়নের সঙ্গে ওঠাবসা আমার কাজ। স্টাফ ক্যান্টিন, ম্যানেজমেন্ট ক্যান্টিন ছেড়ে কর্মীদের কাছে এটা এখন হয়ে উঠেছে আমাদের ক্যান্টিন।

কিন্তু অফিসের বেশির ভাগ একজিকিউটিভের তা বোধ করি পছন্দের ছিল না। আমি লাঞ্চ আওয়ারে ক্যান্টিনে যাই। প্রথম যেদিন আমাদের কমন ক্যান্টিন চালু হল, সেদিন দেখা গেল

আমাদের একজিকিউটিভ ক্যান্টিনের হাঁসের মতো সাদা টেবিলক্লথ ঢাকা ছোটো ছোটো টেবিল সব উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিল ঘিরে থাকত তিন-চারটে করে চেয়ার। মাঝে সরু দীর্ঘাঙ্গী ফুলদানি। কোনোটা হালকা নীল, কোনোটায় বাদামির ছায়া, কোনোটা আবার আবছা গোলাপি। তাতে থাকত লম্বা, ঠিক ফুলদানির মতোই দীর্ঘাঙ্গী ডাঁটির ফুল। একটা কী দুটো। আলতোভাবে ছুঁয়ে থাকত ডাঁটির ডগায়। গ্লাসে পাকানো থাকত সাদা ন্যাপকিন। প্লেটের ওপর রাখা দামি কাচের বোলে মোটা সাদা চামচ দিয়ে প্রথমে সার্ভ করা হত ধোঁয়া ওঠা স্যুপ। বেতের ট্রেতে স্যুপস্টিক। তারপর বেতের চওড়া ঝুড়িতে আসত সাদা তোয়ালে মোড়া নান বা নানারকমের রুটি। বাড়িতে আমরা পাউরুটি বলি। সঙ্গে ইংরেজি বা কন্টিনেন্টাল নামের এক-এক দিন এক-এক রকম সুস্বাদু খাবার। শেষ পাতে মরশুমি ফল দিয়ে ক্রিমছড়ানো স্যালাড। সুন্দর ক্রকারি। সাদা প্লেটের চারপাশে কখনও ফুলকাটা, কখনও জ্যামিতিক নকশা আঁকা। স্টিলের ছুরি, কাঁটা, চামচ এত চকচকে যে রুপো বলে ভ্রম হয়। পাতলা ফিনফিনে কাঁচের গ্লাসে ঠাণ্ডা জল। তার গায়ে টলটলে বিন্দু জমত। সেখানে আজ লম্বা-চওড়া টেবিল পাতা। বেশ কতকগুলো। টেবিলের ওপরে পাতা প্লাস্টিকের ফুলছাপ টেবিলক্লথ। তাকে ঘিরে দুপাশে চেয়ার। ক্রকারির আলাদা ব্যবস্থাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টাফ ক্যান্টিনের অবস্থা হয়েছে অনেক ভালো। সে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে কমনারদের স্বাগত জানাবে বলে।

আর আমাদের মতো একজিকিউটিভ, ম্যানেজারদের আগের লাঞ্চরুম হয়েছে সবার গেমরুম। তাতে টেবিলটেনিস টেবিল পাতা হয়েছে। সবুজ বিলিয়ার্ড টেবিলটাকে রাতারাতি কোথায় যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যারাম খেলার বোর্ড এসে গেছে। তার ওপরে এখন আলো লাগানোর তোড়জোড় চলছে। নতুন এম ডি বলেছেন, তাস আসবে না।

কোম্পানির পরিবেশে এল যেন এক ঝলক টাটকা হাওয়া। আমার মনে হল কৈশোরে শ্রেণিচেতনা দূর করার যে-স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, তা আর দুরপনেয় নেই। আমি পঁচিশ বছর ধরে পারসোনেলে কাজ করছি। এ অফিস সে অফিস ঘুরে এখন এখানে। যৌবন কবে পার করে দিয়েছি। কিন্তু আজ হঠাৎ এত বছর বর রবীন বসুকে দেখে মনে হচ্ছে, যৌবনের স্বপ্নের কাজল এখনও আমার চোখ থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। আমার সিনিয়র ম্যানেজাররা এসব পছন্দ করেননি। তাঁদের সুন্দর লাঞ্চরুমে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে কারা যেন ঢুকে পড়েছে। তাঁদের জন্যে সুনির্মিত নিখুঁত ব্যবস্থাগুলো এক ঝটকায় নষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে, বোধকরি সবার অলক্ষে শুরু হয়ে গেল তাঁদের বাড়ির খাবার আনা, আর নিজের চেম্বারে বসে লাঞ্চ করা। পেটের দোহাই দিয়ে তাঁরা কমন লাঞ্চরুম থেকে সরে পড়লেন। কমন লাঞ্চরুম আমার কোনো বদল আনেনি।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি এমডি-র কাছের লোক হয়ে গেলাম। পারসোনেল ম্যানেজার হিসেবে ইউনিয়ন নেতা রথীন রায়ের সঙ্গে কিছুটা খাতির ছিলই। এখন ঘনিষ্ঠতা আরও একটু জমে উঠল। আমি রথীনবাবুর কাছে ভাব দেখালাম যেন তাঁর জন্যেই এত বড়ো জয়টা এল। ইউনিয়নের লোকজন সেই জয়ে পরম উৎসাহিত। তাদের আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দেওয়ালটা ভেঙে পড়ল। ম্যানেজমেন্ট যতই শ্রমিক-কর্মচারি দরদি হোক, ইউনিয়নের লোক হয়ে এম ডি-র নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যায় না। তাহলেই মালিকের দালাল বলে শিলমোহর পড়ে যায়। রথীন রায় আমার কানে কানে যাই বলুন, সামনে জয়ী-জয়ী ভাবখানা বজায় রাখলেন।

রবীন বসু একটু নীচুতলার কর্মীদের নীল জামা-প্যান্ট পরা তুলে দিলেন। তার বদলে তাঁদের হাতে অফিসের জামাকাপড় কেনার টাকা ধরিয়ে দেওয়া হল। এখন আর কোম্পানিতে ঢুকেই এক ঝলকে চিহ্নিত করার উপায় রইল না কে নীচুতলার, কে উঁচুতলার কর্মী।

এসব রদলবদলে যে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্মান আছে, আমি তা বুঝতে পারতাম। পারতাম বলেই অন্য ম্যানেজারদের সঙ্গে আমার একটা সুতোর মতো ফারাক তৈরি হয়ে গেল। আমি যে তাঁদের ঈষৎ বাঁকা চোখের শিকার, তা আমার সেই সূক্ষ্ম চেতনাই বলে দিত। রবীন বসুই সেই মিহি দূরত্ব তৈরির শিল্পী। আমি আর সুজাতা রাজনীতি করতাম। আমরা দুজনে যে শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। বন্ধুরা কে কোথায় ছিটকে গেছে। আজ কতদিন পর উদয়, প্রবাল, তরুণদের কথা মনে পড়ল। মনে ভিড় করে এল আরও কত নাম। যারা মারা গেছে তাদের জন্যে কতদিন চোখের জল ফেলি না। সুজাতা ওর দাদাকে হারিয়েছে এই রাজনীতি করতে গিয়েই। ওর দাদা যখন রাজনীতি করত তখন সুজাতা রাজনীতিতে আসেনি। দাদা খুন হওয়ার পর ওর আমাদের দলে আসা। তারপর ওর সঙ্গে আমার আলাপ, আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। আমাদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও ও একটি বিষয় আমার কাছ থেকে আড়াল করে এসেছে। ওর দাদাকে কে খুন করেছিল, কারা খুন করেছিল তা নিয়ে ও কোনোদিন কথা বলে না। পুলিশ মেরেছিল? জানি না। শুধু দাদার মৃত্যুদিনে মোমবাতি জ্বালায়, সেদিন চেষ্টা করে ছেলেমেয়েকে এড়িয়ে চোখের জল ফেলতে। আমি ওর পাশে এসে দাঁড়াই। পিঠে হাত দিই। বলি, এসো, এখন যা আছে তা নিয়ে সুখে থাকি। তাই ছিলাম।

হঠাৎ রবীন বসু এসে আমার সব গোলমাল করে দিলেন। কেন যে তাঁকে আগে, সেই যৌবনে পাইনি! উনি আমার সেই কৈশোর, যৌবনের স্মৃতি উসকে দিলেন। তিনি এক একটা সিদ্ধান্ত নেন আর কর্মীরা উত্তেজনায় ফুটতে থাকে। কর্মোদ্দীপনারও আঁচ এসে তাদের গায়ে লাগে। বছরখানেকের মধ্যেই কোম্পানি হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়। এখন বুঝি, পৃথিবীকে সেই অল্প বয়সের ভাবনার মতোটি করে আর গড়া যাবে না। কিন্তু রবীন বসু নিজের জায়গায় পারবেন মানুষের অধিকার তৈরি করে দিতে। হোক না সে জায়গা ছোটো। উনি না পারলে আর কে পারবে।

॥ ২ ॥

সেবার ক্রিসমাস পড়ল সোমবার। এম ডি বললেন, চল পিকনিক। সবাই মিলে। এর আগে একজিকিউটিভদের জন্যে নিউ ইয়ারস ইভ হত কোম্পানির ক্লাবে। ক্রিসমাসে ক্রিসমাস ডিনার। এম ডি টোস্ট শুরু করতেন ওয়াইন দিয়ে। হাততালিতে ফেটে পড়ত রঙিন রাত। তারপর খোলা হত ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনের বোতল। সাদা তোয়ালেতে মুড়িয়ে যত্নে আনা হত সে বোতল। স্বচ্ছ বাদামি রঙের বুদবুদ যাতে ফেনা হয়ে না ছড়িয়ে পড়ে সেজন্যে আগের এম ডি-রা সময় নিয়ে বোতলের মুখে গ্লাস ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে শ্যাম্পেন ঢালতেন। মহার্ঘ খাবার, মহার্ঘ ককটেল।

ম্যানেজার একজিকিউটিভ আর স্টাফ মিলিয়ে পিকনিকও কখনও হয়নি। দীঘায় পিকনিক হবে। রবিবার। পিকনিকের পরদিন সবাই রেস্ট পাবে। আর ক্রিসমাসের দিন ভিড় আরও বেশি হবে। উনি বললেন, 'সকাল সাড়ে ছটায় বাস ছাড়বে, অফিসের গেট থেকে। কেউ যেন দেরি না করে। অনেকটা পথ। রুটটাও এনজয় করার মতো। এখন সময় আর আগের মতো লাগে না। ঠিক সময়ে না পৌঁছলে কিন্তু বাস ছেড়ে দেবে।'

এম ডি-র ডাকা পিকনিক। নাক উঁচু ম্যানেজারদের স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁদের ভাবখানা, 'এলেবেলেগুলোর সঙ্গে বসে খেতে হবে, কথা চালাতে হবে, ছেলেমেয়েদের না নিয়ে যাওয়াই ভালো।'

আমি অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে সুজাতার সঙ্গে গল্প করি। অফিসে টুকরো- টুকরো নানা ঘটনার স্বাদ পাই। ভালো-মন্দয় মেশানো সেসব ঘটনায় পরনিন্দা-পরচর্চার থেকে বেশি ভরপুর থাকে জীবন, অভিজ্ঞতা। ইদানীং আমার বেশির ভাগ গল্পেই কোনো না কোনোভাবে

জড়িয়ে পড়তেন রবীন বসু। এম ডি-কে নিয়ে গল্প করার মতো কিছু না-কিছু ঘটত। অন্তত আমার চোখে। কোনোদিন হয়তো বলতাম, 'আজ সন্ধের মুখে অফিস ছাড়ার আগে এম ডি নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেমরুমে গিয়েছিলেন। এক দান ক্যারম খেললেন। নিখুঁত টিপ। দারুণ খেলেন। জয়দীপ একেবারে হেরে ভূত হয়ে গেল।' আর একদিন বললাম, 'এম ডি আজ ক্যান্টিনের কিচেনে ঢুকে রান্নার কোয়ালিটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরখ করে গেলেন।' এম ডি অফিসে ঢুকতেন বেশ সকাল-সকাল, সময়ের আগে। তারপর হঠাৎ ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ভিজিট—সবাই সময়মতো অফিসে আসছে কি না।

সুজাতা এক-এক সময়ে বলত, 'আর বোলো না তো তোমার এম ডি-র গল্প, শুনে শুনে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।'

আমি বলতাম, 'উনি নতুন ধরনের সব আনকনভেনশনাল স্টেপস নিচ্ছেন। ম্যানেজমেন্টের বইয়ে পাবে না।'

পরমুহূর্তে সুজাতা বলত, 'ঠিক আছে আলাপ করিয়ে দিও তোমার ম্যানেজমেন্ট গুরুর সঙ্গে।'

দীঘা জেনেই আমি ভাবলাম মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন গুরুগুর করে ডাকল। কারণ দীঘা শুনেই সুজাতা চমকে উঠবে। এম ডি স্পট বেছেছেন। নড়চড় হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দীঘার পিকনিকেই এম ডি-র সঙ্গে আলাপ হবে সুজাতার। পিকনিক স্পট হিসেবে দীঘা বেছে নেওয়া হয়েছে জেনে সুজাতার চোখের ঝিলিক ম্লান হয়ে এসেছিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের সেই আশ্চর্য ভাঙাগড়ার খেলা ওকে টানে না। সমুদ্রের শব্দকে ও ভয় পায়। সমুদ্রতীরের আলোকবর্তিকার কথা শুনলে ও ভাবে, সে আলোর নীচে আছে ধ্বংসের গর্জন। সমুদ্রের ঢেউ বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রিয় সব কিছুকে, তার শব্দ ভেঙে দেবে সব দেওয়াল।

আমাদের বিয়ে হয় বেশ অল্প বয়সে। বাড়ির অমতে সুজাতাকে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের আগে সুজাতার বাবা-মা মারা যান। দাদা চলে গিয়েছিল তারও আগে। সবাই বলে, পুত্রশোকেই ওর বাবা-মা বড়ো অসময়ে চলে গেলেন। বিয়েব আগে ও কাকার বাড়িতে থাকত। আমাদের বাড়ি বড়ো রক্ষণশীল। সুজাতারা ব্রাহ্মণ নয় বলে, বাড়ি থেকে ওকে বিয়ে করার ছাড়পত্র পাইনি। বাড়িতে বাবা বলে দিয়েছিল, বিয়ে যদি সুজাতাকেই করি তবে যেন ওকে ঘরে না নিয়ে আসি। তা ছাড়া মা রাজনীতি করা মেয়েদের দেখতে পারত না। ওকে অব্রাহ্মণ তায় রাজনীতি করা! এমন মেয়েকে মা ঘরে তুলবে না। আমারও গোঁ কম ছিল না। সুজাতাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবিনি।

বিয়ের পর সুজাতার বাবা-মায়ের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিলাম। আমাদের ইউনিভার্সিটির স্টাইপেন্ডের টাকায় তখন কোনো মতে সংসার চলত, বা বলব টেনেটুনেও চালানো যেতনা। আমাদের দুজনকেই বেশ কয়েকটা টিউশনি নিতে হয়েছিল। বন্ধুরা বলেছিল, 'দীঘায় হানিমুনে যা। আমরা সবাই মিলে হোটেলের রিজারভেশন করে দেব।' শুনে সুজাতার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল।

দীঘায় সুজাতা যেতে চায়নি বলে আমাদের হানিমুনই করা হল না। ওর থেকে বেশি দূরে যাওয়ার তখন আমাদের পয়সা কোথায়। তবে হানিমুনে না গেলেও আমাদের সে সময়টা আনন্দেই কেটেছিল। দুজনায়। সেই আনন্দধারা আমরা গরিব বলে কিছু মনে করেনি। আমাদের দুজনের দুজনকে পাওয়ার আনন্দ আমাদের গরিবখানাতেও তার ডালি নিয়ে হাজির ছিল। বাবা-মাকে এমন দিনে না পাওয়ার দুঃখ ঘিরে ছিল দুজনকেই। তবু আমাদের বিয়ের দিন গাছেরা আমাদের বিয়েতে পাতা দুলিয়ে সায় দিয়েছিল, আকাশ হেসে রং ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আমি পরে ভেবে দেখেছিলাম, হানিমুন করতে না পেরে সুজাতার বোধহয় একটা দুঃখ ছিল, হয়তো মনের গভীরে কিছু ছিল। ও বলেছিল, 'টুসি কিন্তু আমাদের খরচে হানিমুন যাবে। তুমি

সব ব্যবস্থা করবে।' টুসির বিয়েতে আমি নিজে ওদের হানিমুনের টিকিট কেটে পাহাড়ে ভালো রিসর্ট বুক করে দিয়েছিলাম।

আমি পরেও খেয়াল করেছি সুজাতা সমুদ্রে যেতে চায় না। টুসি আর বাপ্পাকে নিয়ে আমাদের কোনোদিন পুরী, দীঘা যাওয়া হয়নি। পুরী, দীঘা যায়নি এরকম বাঙালির সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। টুসি আর বাপ্পা ছোটোবেলায় সেই বিরল ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ওদের নিয়ে অবশ্য আমরা পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঘুরেছি অনেক। সুজাতা আজও সমুদ্র শুনলে মনে হয় যেন শিউরে উঠছে।

সামনে দেখলে সুজাতাকে সবাই বলবে উচ্ছল, প্রাণবন্ত। ওর এই ছটফটানির জন্যে টুসি আর বাপ্পা মা'র বেশি কাছের। মা ওদের সঙ্গে ছোটোবেলায় লুকোচুরি খেলত। এমনকী টুসির সঙ্গে এক্কা-দোক্কা থেকে শুরু করে আমাদের বাড়ির নীচে ওরা তিনজন মিলে পিট্টু খেলত। সঙ্গে জুটে যেত চারপাশের আর কটা বাচ্চাও। এমন ছটফটে আমার বউ, ওই একটা ব্যাপারে চুপচাপ ছিল।

॥ ৩ ॥

আমি একদিন সুজাতাকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'অতনুদা কী করে মারা গেল?'

—দাদাকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। বাবা, মা'কে মর্গে যেতে দেয়নি। আমি আর বাবা গিয়েছিলাম। পুলিশ বাবাকে জিগ্যেস করেছিল, আপনি অতনু রায়ের কে হন? ডোম দাদার মুখ থেকে চাদরটা সরিয়েছিল। বাবা দেখেছিল দাদার বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। দাদার বুকের যেখানে যেখানে গুলি লেগেছিল, সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে খয়েরি হয়ে গেছে। দাদা খয়েরি বুক নিয়ে শুয়েছিল। বাবা সেখানে পরম মমতায় হাত বোলাতে গিয়ে কেঁদে উঠল। বাবার কান্না দেখে আমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম। পুলিশ বাবাকে জিগ্যেস করেছিল, এটা আপনার ছেলের বডি? বাবা খুব আস্তে বলেছিল, এটাই আমার ছেলে।

—পুলিশের কাছে এসবের দাম কতটুকু? ওরা অনায়াসে এক বাবার সামনে বলতে পারে ছেলের বডিব কথা।

—দাদার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। দাদা যেন যন্ত্রণা সেরে গেলেই উঠে দাঁড়াবে। আমাকে ডেকে উঠবে টুটাই বলে। দাদাকে বাবা-মা ডাকত টোটা বলে। ছোটোবেলায় আমি মোটা ছিলাম বলে দাদা আমাকে খেপাত, টোটার বোন মোটা।

—দাদাকে কারা খুন করেছিল? তুমি কিচ্ছু জানো না? তোমার বাবা-মা দাদার রাজনীতি করার কথা জানতেন না?

সুজাতা অতনুদার মৃত্যুর ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, 'দাদা পোস্টার লিখত লুকিয়ে, রাতের অন্ধকারে। দাদা ছিল পাতলা, ফরসা, রেশম-রেশম কোঁকড়ানো চুল। সারা দিনে চুল আঁচড়াত না। চান করে মাথায় আঙুল চালিয়ে দিত। মা বলত, মাথাটা কাকের বাসা হয়ে রয়েছে, আয় তোর চুল আঁচড়ে দিই। হাফহাতা শার্ট পরত। শীতকালে মার একটা শাল গায়ে জড়িয়ে নিত। সোয়েটার ছিল, পরত না। বলত, কত লোক এটুকুও পায় না, মা। সেই দাদাকে নিয়ে পাড়ার লোকেরা বাবাকে শাসানি দিয়ে গেল। আপনার ছেলে পাড়ায় থাকলে আমাদের ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। মা কাঁদত ঘরের কোণে। আমার যে-দাদাটা বাবা-মার কাছ থেকে দুটোর বেশি শার্ট নেয়নি, যে স্কুলে কোনোদিন সেকেন্ড হয়নি, যার পড়ার জন্যে বাবাকে কিছু খরচ করতে হল না, স্কলারশিপ পেত বছর বছর, যার সেই ছোটোবেলা থেকে কবিতার খাতা ছিল, তার জন্যে নাকি পাড়ার ছেলেরা খারাপ হয়ে যাবে।'

—তখন অল্পবয়সীরা কেউই নিরাপদ ছিল না। মিথ্যে সন্দেহের বশে তাদের তুলে নিয়ে যেত পুলিশ।

—কত সাহস দিয়ে গড়া ছিল আমার দাদা। সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আমরা তার নাগাল পেলাম না। মা বলত, সারা দিন কোথায় থাকিস, কী করিস? সকালে বেরোত, অনেক রাতে ফিরত। কোনো কোনো দিন ফিরতও না। কোনো রকমে খেত। তারপর তার ক্লান্ত চোখ দুটোকে হারিয়ে ঘুম আসত। মা অবসন্ন থাকলেও ঘুমোতে পারত না। মার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সারা রাত ছটফট করত। আমি বুঝতে পারতাম। মা এপাশ- ওপাশ করছে। রাতে জল খেতে, কী বাথরুম করতে উঠেছি, দেখতাম মা তখনও জেগে। ছেলে যেন অনেক দূরের হয়ে গেছে এমনিভাবে মা দাদাকে জড়িয়ে ধরত। বলত, বাবা আমার বড়ো ভয় করে। দাদা মিটিমিটি হেসে গভীর চোখে মার দিকে তাকিয়ে বলত, তোমার ছেলে খারাপ কিছু করবে না। বাবা অনেক কষ্ট করে আমাদের জন্যে কলকাতার বাইরে একটা জায়গা ঠিক করলেন। তখন পাড়ার লোকেদের শাসানিতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। মা অনেক কষ্ট করে দাদাকে বুঝিয়েছিল, চল আমরা কদিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। দাদা কিছুতেই রাজি নয়। দাদার ওপর নাকি অনেক দায়িত্ব। এখন গেলে চলবে না। বাবা বলেছিল, চল টোটা কদিনের তো ব্যাপার। মাকে আর দাদা কিছুতেই এড়াতে পারেনি। মার চোখের জলের কাছে হার মেনেছিল পৃথিবীটাকে বদলে দেওয়ার বিশাল কাজ। তবে দাদা বলেছিল, বেশিদিন হলে কিন্তু আমাকে চলে আসতে হবে।

—কতদিন ছিলে তোমরা?

—আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা সে কথা শুধু অনিলকাকাকে বলে গিয়েছিল, কাউকে বলতে বারণ করেছিল। আমরা যে-বাড়িতে উঠেছিলাম সে বাড়িতে একটা ফোন ছিল। অনিলকাকাকে বলেছিল, বিপদ বুঝলে যেন ফোন করে। অনিলকাকার ছেলে দাদার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। কিন্তু অনিলকাকাকে বিশ্বাস করে আমাদের বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল। বিশ্বাসের শাস্তি পেতে হল। আমরা ওখানে পৌঁছনোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাবা ফোন পায়।

—কারা ফোন করেছিল?

—অচেনা গলা। তখন আমি আর দাদা একটু বেরিয়েছি। বাবা বুঝেছিল সর্বনাশ হয়ে গেছে। অন্য ছেলেরা পেলে দাদাকে মেরে ফেলবে। বাবা সরল লোক ছিল। বিশ্বাসই করতে পারে না পাড়ায় যে-লোকটার সঙ্গে রোজ দেখা হয়, যার সঙ্গে থলি নিয়ে বাজার করা হয়, সে লোকটা আর একটা মা-বাবার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। বাবা দৌড়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আমাদের পায়নি। তখন বিকেল শেষ। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। সে সময়ে অত আলো জ্বলত না। টিমটিমে আলোয় আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম কয়েকটা মুখ। তখন ওদের সম্ভবত ভয়ডর ছিল না। তারা মুখে কোনো কালো কাপড় জড়ায়নি, নিজেদের না চেনানোর কোনো চেষ্টা করেনি। কয়েকজন এগিয়ে আসতেই দাদা আমাকে বলল, টুটাই পালা। আমি দৌড় দিলাম। দাদা আমাকে বাঁচানোর জন্য ওদের মুখোমুখি হল। আমি পালাতে গিয়ে একবার থেমে পিছন ঘুরলাম। আমার পা দুটো কে যেন আটকে দিয়েছে। দাদার 'টুটাই পালা' তখন যেন আমি শুনতে পাচ্ছি না। শুনলাম শুধু গুলির শব্দ।

এই পর্যন্ত বলে সুজাতা কেঁদে ফেলল। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল, 'বাবা তারপর থেকে নিজেকে অপরাধী ভাবত। বাবার দোষেই নাকি দাদা মারা গেল। বাবা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন বলত, অনিলবাবুকে বলে আসাটাই ভুল হয়েছে। বাবার আয়ু অবধি সে আক্ষেপ বেঁচে ছিল। মার চোখ দিয়ে জল গড়াত না। বাবাকে বলত, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শক্ত হও। আমি শক্ত হয়েছিলাম। ঠিকই করে ফেললাম, আমি দাদার মতো হব।'

এবার সুজাতা চুপ করল। চোখের জল মুছে নিল। আমরা অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম। আমি বললাম, 'আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, পারিনি। এখন যারা করতে চায়, পারে না। এখন

একটা সমঝোতার সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। এই সমঝোতার সময় যে কবে শেষ হবে! আবার নতুন করে কিছু ভাবব।'

—কোনো সন্তানকে মেরে যেন আর কিছু করতে না হয়। সমঝোতা শেষে সেই সময় আসুক।

॥ ৪ ॥

দীঘায় পৌঁছে বাচ্চারা মহাখুশি। এমডি একটু পরে গাড়ি করে পৌঁছলেন। এসে কুচোকাচাগুলোকে বললেন, 'আজ তোমরা বাঁধন ছাড়া, সবাই চা-কফি পাবে। তবে সমুদ্রে কেউ একা যাবে না। আমরা বড়োরা যখন যাব, তখন যাবে। বিচের ধারে তোমাদের দেখলে কিন্তু আমি খুব বকব।'

স্পটে পৌঁছনোর আগে বাসেই ওদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট করে পটেটো চিপস দেওয়া হয়েছে। বড়োদের জন্যে ছিল স্যান্ডউইচ আর ছোটোদের জন্য চিকেন বার্গার। মেনু ঠিক করেছেন এম ডি নিজে।

উনি কী করে যে এমনভাবে বাচ্চাদেরও মনের কথা জানতে পারেন। ওদের পছন্দের দিকেও ওঁর সমান খেয়াল।

আমাদের জন্যে তৈরি ছিল বেশ কয়েকটা লাক্সারি বাস। সুজাতা বাসে গান গাইছিল। ও এক সময়ে গান শিখত, এখন আবার শখেই গান শেখা শুরু করেছে। বাংলা ব্যান্ড, রবীন্দ্রসংগীতে বাস বেশ মাতিয়ে রেখেছিল। ও এসে ছুটাছুটি করে একেবারে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কানামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলতে লাগল। ও যেন শৈশবে ফিরে গেছে। এ খেলা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখনকার বাচ্চারা মনের খুশিতে খেলে না, খেলা শিখতে যায়। নিজেরা কমপিউটারে গেমস খেলল তো খেলল। না হলে আর কিছু খেলে না। খেলা শেখার স্কুলে ভর্তি হয়। কানামাছি খেলার কথা শুনে ওরা রীতিমতো হইচই শুরু করে দিল।

আমাদের গেস্ট হাউসটা বিরাট বড়ো। বিচ থেকে অবশ্য একটু দূরে। তাতে ভালোই হয়েছে, না হলে এতগুলো বাচ্চাকে সামাল দেওয়া যেত না। বিরাট সবুজ লন আছে। বিশাল লনে ফুলের মেলা বসানো হয়েছে। শীতকাল বলে মরসুমি ফুলেরা ঝলমল করে ফুটে আছে। খেলতে খেলতে সুজাতা কমলিকাকে ছুঁয়ে দিল।

কমলিকা বলল, 'সুজাতা আন্টি তুমি কিন্তু রুমালের ফাঁক দিয়ে সব দেখছ। আমি বুঝেছি, তুমি চোট্টামি করছ।'

—এই বাজে কথা বলবি না। আন্টিরা কখনও চোট্টামি করে না। একেবারে ঝগড়ার গলায় বলল সুজাতা। ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছে।

তার একটু বাদে এম ডি এলেন। উনি আসতেই বাচ্চাদের সঙ্গে হইহই করতে লেগে গেলেন।

এম ডি এখন বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। মাঝেমধ্যেই ইচ্ছে করে দান ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এমন ভাব করছেন যেন মিস হয়ে গেল। উনি একবার করে মিস করছেন আর বাচ্চারা হাততালি দিয়ে উঠছে। তারপর বেশ চোখ বড়ো করে সিরিয়াস ভাব করে বলছেন, 'দাঁড়াও এমন চাপ মারব না একেবারে তুলতেই পারবে না।' উনি বললেন, 'এবার হাঁফিয়ে গেছি, একটু গল্প করে নিই, তারপর ক্রিকেট খেলব। দাঁড়াও তোমাদের কটা ম্যাজিক দেখাই।'

উনি একটা রুমাল নিলেন। তারপর তাতে কষে গিঁট দিলেন। বাচ্চারা সব খেয়াল করল—না ভালো গিট পড়েছে। তারপর সেটা আলগা করে হাতের মুঠোয় পুরে রাখলেন। সব গিঁট খুলে গেছে। আমি দেখে ভাবলাম উনি জীবনের গিঁটও এমনই সহজভাবে ছাড়ান। কোনো জট এলেও উনি কত যে টেনশন-ফ্রি থাকেন। বাচ্চাদের যেভাবে মন জয় করলেন তাতে বুঝলাম উনি কত সরল পথে মানুষকে জিতে নেন।

সুজাতারা তখন কয়েকজন মিলে তাস খেলছিল। এম ডি এগিয়ে আসতেই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই উঠে দাঁড়াল। আমি সুজাতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। দুজনে দুজনার দিকে তাকাল কিন্তু হাসল না। সুজাতার মুখ সাদাটে হয়ে গেল। এম ডি সুজাতার থেকে চোখ সরিয়ে হইহই করে বলে উঠলেন, 'কী খেলা হচ্ছে?'

—ব্রিজ।

উনি মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা তো সবাই নিশ্চয়ই শপিংয়ে বেরোবেন।'

আমি খেয়াল করলাম সুজাতার মুখটা শক্ত হয়ে গেছে। ও নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। উনি সুজাতার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। অদ্ভুত চোখের চাউনিটা। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু ওই সব দুল, হার বুঝি না।' হাসতে গিয়েও যেন হাসতে পারলেন না। যান্ত্রিক হয়ে গেল ওঁর ভাবখানা। দিলদার মানুষটা কী বেমক্কা হারিয়ে গেল?

হঠাৎ খেয়াল করলাম, সুজাতা কোথাও নেই। সত্যি তো কোথাও নেই। একটু আগে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল। সেখান থেকে উধাও। তাস খেলার জায়গাতেও নেই। এ আবার কী! এম ডি এসেছেন, সবাই রয়েছে। উনি এম ডি-র গাম্ভীর্যের ওভারকোট ছেড়ে দীঘায় ঢুকেছেন। ওঁকে ঘিরে সবাই। অফিসের এম ডি এলে এরকমই হয়। নিছক সৌজন্যবোধেও সুজাতার এখানে থাকা উচিত। শরীর-টরির খারাপ হল নাকি? আমি খুঁজতে বেরোলাম।

তবে কী ওদের দুজনের মধ্যে...?

বেশ খানিকক্ষণ পরে দেখি গেস্ট হাউসের পিছন দিকে একটা মাদুরের ওপর ও টানটান হয়ে শুয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। শুয়ে আছে বললে ভুল বলা হবে। ওর হাতব্যাগে সবসময়ে একটা বই থাকে। বইটা খোলা। ডান হাতে ধরা। সামনে একটা দীঘি। তাতে জল টলটল করছে। শান্ত। শীতের হাওয়ায় মাঝে মাঝে তিরতির করছে। সেদিনের রোদ কড়া নয়, মিঠে। দীঘিতে পদ্ম ফুটে আছে। যেন হাসিমুখে হাতছানি দিচ্ছে। ও বই পড়ছে, না পদ্মফুলের আলতো হাসি দেখছে, তা বলা মুশকিল। মুখ-চোখ থমথমে। আমি জিগ্যেস করলাম, 'শরীর খারাপ করছে?'

—না; বলে ও মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি বুঝলাম না আমার ওপর কেন রাগ হল। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?' রুপোলি রোদের মিঠে ওমে আজ সবার মন ভালো থাকার কথা। কিন্তু বুঝলাম সুজাতার হঠাৎ মন খারাপ হয়েছে। তার আনন্দধারার মতো ছটফটানিটা হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওকে দীঘায় টেনে না আনলেই ভালো হত। ও নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল।

সুজাতার ভাবভঙ্গি দেখে আমার বড়ো অবাক লাগল। কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এম ডি এসেছেন আর তুমি এখানে শুয়ে আছ? উনি জানতে পারলে কী খারাপ ভাববেন। ঠিক আছে, একটু পরে উঠে এসো। বলে আমি হাঁটা দিলাম।

খানিকটা বাদে ঠিক হল, এবার সমুদ্রে যাওয়া হবে। নুলিয়া দেওয়া হবে ছোটোদের জন্যে। তবে ভালো সাঁতার না জানলে কেউ যেন সমুদ্রে না যায়। বিচে বসে বসে ভালোই স্নান করা যায়। তখন সুজাতা এল। ওকে উদভ্রান্ত লাগছে। আমরা প্রত্যেকেই সমুদ্রে যাওয়ার জন্যে শর্টস আর টি-শার্ট পরে নিয়েছি। মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ।

সুজাতা উদাসভাবে বলল, 'আমি ঢেউ ছোঁব না।'

একের পর এক ঢেউ আসে। আমরা তীরে বসে। ঢেউ এসে আমাদের ফেনাময় রুপোলি জল মাখিয়ে চলে যায়। ঢেউ একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে অজস্র বালুকণা। ঢেউ আর বালি হাত ধরাধরি করে আমাদেব ভাসায়। হাসায়। আবার জটিল আবর্ত তৈরি করে। সে ঘূর্ণিতে পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। বাচ্চারা ঝিনুক কুড়োয়। কে কটা একই ধরনের ঝিনুক পেল, তা নিয়ে তাদের মধ্যে

উচ্চকিত প্রতিযোগিতা চলে। বালুতে বসেই রবীন বসুও ঢেউয়ের ওঠাপড়ায় মেতে উঠেছেন। অথচ মুখ কঠিন, নির্মোহ। সত্যিই চশমার আড়ালে লোকটার চোখ দুটো যেন চেনা যায় না। সুজাতাকে দেখলাম অন্যমনস্ক, গম্ভীর। পরিবেশ হালকা করার জন্যে ওকে কতবার বললাম, 'একবার এসো। আমি হাত ধরে থাকব, ভয় নেই। আমি সাঁতারে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, বুঝেছ ম্যাম?'

—থাক না, আমি এখান থেকেই দেখছি। ও কোনোরকমে গলায় জোর এনে বলল যাতে ঢেউয়ের আছাড়ের শব্দে ওর স্বর না ডুবে যায়। আমাদের সমুদ্রস্নান শেষ হল। পেটে চনমনে খিদে। আমরা গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। সুজাতাকে দেখলাম খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রান্না ছিল দারুণ। লাঞ্চের পর মাদুর, শতরঞ্জি পেতে আবার একদফা আড্ডা। মেয়েরা গেল দোকানে। সুজাতা গেল না। কেটারাররা বিকেলের চা দিয়ে গোছগাছ করে রওনা দিল। এম ডি সবার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিলেন। ঘুরে ঘুরে উনি যখন সুজাতার কাছে এলেন তখন সুজাতার চোখের কোণে যেন আগুন। এম ডি ওর দিকে আর তাকালেন না। ওঁর সঙ্গে সুজাতার নমস্কার, প্রতি নমস্কার হল না। আর কেউ খেয়াল করল কি না জানি না।

তবে কী রবীন বসুর সঙ্গে ...?

আমরা এবার ফিরব। তখন বিকেলের রোদ নরম হয়ে এসেছে। নরম কমলা রঙের সূর্যটাকে এক দিকে রেখে বিকেল দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেও আমাদের আর একটু সময় দিতে চায়। সেই যায়নি-যায়নি বিকেলে আমাদের মুখে তখন আবার আসব রং ছড়িয়ে রয়েছে। সুজাতার মুখ তখনও ম্লান। ও বলল, 'চল এবার ফেরা যাক। আর নয়।'

ও এত উদাস কেন সত্যিই বুঝিনি। বাড়ি গিয়ে জিগ্যেস করব। এম ডি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। যিনি অনেক ছোটো ছোটো বিষয় খেয়াল করেন, তিনি এটা লক্ষ করবেন না তা হতে পারে না। এম ডি নিশ্চয়ই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। অন্য দিন ও কিছু না বলতে চাইলে আমি কিছু বলি না। আজ আমাকে জানতেই হবে।

॥ ৫ ॥

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল। বাপ্পার খাবার রাখা ছিল। ও খেয়ে নিয়েছে। আমি নরম করে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার আজ কী হয়েছিল?'

আমি কখনও ওর সঙ্গে কড়াভাবে কথা বলি না। যে-মেয়ের বাপের বাড়ি নেই, তার অনেকটাই নেই-তালিকায়। পুরুষ হয়েও এটা আমি বুঝি। আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেও ও বাবা-মার কাছে যেতে পারে না। দাদাকে ভাইফোঁটা দিতে পারে না। ও বড়ো দুঃখী।

সুজাতা প্রথম থম মেরে ছিল। তারপর কান্না সামলে নিল। ওর দুচোখে তখন যেন লাভা ঝরছে। তাহলে কী...?

এত রাগ, ঝাঁজ দিয়ে যে সুজাতা তৈরি তা জানতে পারেনি। ও যখন রাজনীতি করত তখন ওর সাহস দেখেছি। ওর এক বুক দৃঢ়তা দেখেছি। কিন্তু ওর মধ্যের আগুন মেয়েটাকে চিনতাম না। ও বলল...

—তুমি আমাকে আগে কখনও জানাওনি কেন তোমার দাদা দীঘায় খুন হয়। সেইজন্যে তোমার সমুদ্রের প্রতি এত আক্রোশ।

—আক্রোশ সমুদ্রের ওপর নয়, ওই মানুষটাকে আমি ঘেন্না করি। তোমাদের সামনে অতীতটাকে ঢেকে একরকম সেজে বসে আছে। রবীন বসু আমার দাদাকে খুন করে। দাদার বিপদ বুঝে বাবা-মা আমাদের সকলকে নিয়ে কিছুদিন দীঘার একটা বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু দাদাকে

বাঁচানো গেল না। সেদিন সাগরতীরে আমরা দু-ভাইবোন গিয়েছি। দীঘার তীরে ছোটো-ছোটো দোকানিরা তখনও ছিল। তাদের কাছ থেকে দাদা আমার জন্যে ন্যাশনাল স্কলারশিপের টাকা দিয়ে দুল কিনেছিল। আর মাকে চমকে দেবে বলে মার জন্যে একটা ধূপদানি পছন্দ করেছিল। সেই সময়ে কয়েকটা ছেলে দাদাকে ঘিরে ধরে। আমি পালাতে গিয়ে পিছনে দাদার দিকে ঘুরে তাকাতেই আমার মনে হল আমার পা কে যেন শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তখন রবীন বসু দাদাকে গুলি করে। ওই আবছা আলোয় আমি এখনও মনে করতে পারি সেই মুখ। আমি ওঁকে দেখেই চিনেছি। তোমাদের নিষ্ঠুর রবীন বসু মানুষ খুন করার পর ছুটে এসে রিভলভার দেখিয়ে আমাকে শাসায়, 'কাউকে যদি এ কথা বলেছ তাহলে, তোমার বাবা-মাকে খুন করে দেব। তোমাকেও।' আমি তাই এতদিন চুপ করেছিলাম।

সুজাতার হাতের মুঠি শক্ত। মুখচোখ লাল। ঘেন্না আর রাগের তাপে পুড়ছে। এ আগুন থেকে ওকে আমি বাঁচাই কী করে? ও দাদা মারা যাওয়ার পর মার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে পারেনি। শক্ত হতে হয়েছিল। এখন ছেলেমেয়েদের সামনে কাঁদতে পারে না। আমি চাইছি ও এখন কাঁদুক। কান্না আসুক। পাহাড়ফাটানো জলপ্রপাতের মতো।

অবগুণ্ঠনবতী

উর্মিলা গুপ্তা

১৩০০ সালের প্রারম্ভে, আমি ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ হ্ই এবং বম্বে শহরে, একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়া প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করি। তাহার পর বৎসর, বর্ষাকালে এক দিবস সন্ধ্যার সময়, আমার জানালার নিকট্ বসিয়া, ভবিষ্যত চিন্তা করিতেছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর ডাক্তারী পাশ করিয়াছি; কিন্তু এখনও পর্যন্তও তেমন পসার করিতে পারি নাই। শারদীয়া পূজার আর বিলম্ব নাই। শীঘ্রই কিছু দিবসের জন্য স্পদেশে প্রত্যাগমন করিব। পিতা, মাতা ও ভগ্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একখানি সুন্দর মুখ মনে পড়িয়া হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সেই সুন্দর সরল মুখখানির অধিকারিণী, আমার বাল্যসঙ্গিনী ও ভাবী পত্নী মুক্তাবাই, ব্যবসায়ে পসার করিতে পারিলেই মুক্তাবাই আমার ক্ষুদ্র গৃহ আলোকিত করিতে আসিবে। মুক্তার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল : আমি চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ আমার স্কন্ধদেশে কে হস্তার্পণ করিল : আমি চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমার গুজরাটি বালকভৃত্যটি, আমায় জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার দিকে দৃষ্টি করিতেই সে বলিল, "একটি স্ত্রীলোক হুজুর।" একটি স্ত্রীলোক! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটি স্ত্রীলোক? কে? কোথায়?"

সে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক আমার কন্‌সল্টিং রুম দেখাইয়া দিল। আমার এই ক্ষুদ্র গৃহেও একটি কন্‌সল্টিং রুম ছিল; যদিও তাহাতে প্রবেশ করিবার বিশেষ আবশ্যক আমার প্রায়ই হইত না। আমি বালকের নির্দেশমতো সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। আপাদমস্তক কৃষ্ণ বর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত একটি রমণী মূর্তি, দ্বারের দিকে মুখ করিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত। আমি প্রবেশ করিয়া অনুভব করিলাম, তাঁহার চক্ষু দুটি আমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমি প্রবেশ করিয়া, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও সে আমার সহিত কোনো বাক্যালাপ করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কী আমার পরামর্শ চান?" রমণী মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে একটি চেয়ার দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি এইখানে আসিয়া বসুন।" রমণী একপদ অগ্রসর হইল; কিন্তু আমার বালক-ভৃত্যটির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি আমার ভৃত্যকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম।

সে চলিয়া গেলে রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, আমার প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার পরিধেয় বসন বৃষ্টিজলে আর্দ্র ও কর্দমাক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আসিতে আসিতে বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন?" "হাঁ মহাশয়"— রমণীর কণ্ঠস্বর বেদনাযুক্ত।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কী পীড়িত?" "হাঁ মহাশয়",—রমণী বলিতে লাগিলেন, "আমি পীড়িত, কিন্তু আমার পীড়া শারীরিক নয়, মানসিক! আমি, আমার নিজের কোনো ব্যবস্থার জন্য আপনার নিকট আসি নাই। আমার নিজের কোনো শারীরিক পীড়া হইলে, এত রাত্রিতে এই ঝড় বৃষ্টিতে আপনার নিকট আসিতাম না। বাস্তবিক যদি আমার কোনো সঙ্কটজনক পীড়া হইত, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম। মহাশয়, আমি অন্য একজনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। দিবারাত্রি আমার অন্য কোনো চিন্তা নাই; কোনোরকম সাহায্য ব্যতীত কী করিয়া তাহাকে বিদায় দিব?"

রমণী দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহার এইরূপ বিচলিত অবস্থা দেখিয়া, আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম।

"আপনার কথাতে মনে হইতেছে, আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়। আপনি কী ইহার পূর্বে, আর কোনো ডাক্তার দেখান নাই?"

"না মহাশয়! ডাক্তার দেখাইয়া কোনো ফল হইত না, এখনও হইবে না।"

আমি আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি এক গ্লাস জল তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "আপনি অসুস্থ। এই শীতল জল পান করিয়া একটু বিশ্রাম করুন। তারপর রোগীর অবস্থা আনুপূর্বিক আমায় বলিলে, আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইব।"

রমণী জলের গ্লাস মুখের কাছে তুলিল; কিন্তু তখনই আবার তাহা নামাইয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রমণী বলিতে লাগিল, "আমি জানি আমার কথা শুনিয়া, আমায় পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিবেন না। অনেকেই এরূপ মনে করিয়াছে ও বলিয়াছে। আমি অল্পবয়স্ক নহি! লোকে বলে মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসে, জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু, তাহার সহিত অনেক দুঃখস্মৃতি বিজড়িত থাকিলেও মানুসের নিকট ততই প্রিয়তর হয়। আমার জীবনের সীমা বেশি দূর নয়। আমারও তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু ভগবান জানেন, মৃত্যু এখন আমার নিকট কত স্বাগত। আজ যাহার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, কাল সে মনুষ্যের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবে। কিন্তু তবু আমি আপনাকে আজ তাহার নিকট লইয়া যাইতে পারিতেছি। আমি বিস্মিত হইলাম। রমণী কী সত্যই উন্মাদ? কিন্তু উন্মত্ততার কোনোই লক্ষণ দেখিলাম না। ধীরে ধীরে বলিলাম, "আপনি যাহা গোপন করিতে চাহিতেছেন, সে সম্বন্ধে অনুচিত প্রশ্ন করিয়া, আপনার যাতনা বৃদ্ধি করিতে চাই না; কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইতেছি। আপনি যে ব্যক্তির কথা বলিতেছেন, সে মৃত্যুশয্যায় শয়ান; হয়তো আজ চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারিব। কিন্তু আজ তাহাকে দেখিতে পাইব না। কাল,--আপনি নিজেই বলিতেছেন সে মনুষ্যের সাহায্য ও ক্ষমতার অতীত হইবে; অথচ কাল আমায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। যদি সে বাস্তবিক আপনার কোনো প্রিয় ব্যক্তি হয়, তবে আজই তাহার সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন না কেন"?

"ভগবান আমায় জল দাও!" রমণী কাতর স্বরে বলিলেন, "যে কথা নিজেই এক একসময় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, সে কথা আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিব কী করিয়া?"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তবে আপনি কাল তাহাকে দেখিতে যাইবেন না? "আমি যাইব না একথা বলি নাই। কিন্তু আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি, যে এরূপ অদ্ভুত বিলম্ব করিতে জেদ করিলে, এ ভয়ানক ঝুঁকি আপনাকেই বহন করিতে হইবে?"

রমণী দৃঢ় স্বরে বলিল, "ঝুঁকি কাহাকেও বহন করিতে হইবেই; যেটুকু আমার উপর পড়িবে, সেটুকু বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"আপনার ইচ্ছামতো কার্য করিতে আমি বাধ্য হইতেছি। আমি স্বীকার করিলাম, কল্য রোগী দেখিতে যাইব। আপনার ঠিকানা বলিয়া যান। আর কাল কখন গেলে সুবিধা হইবে?"

রমণী উত্তর করিল "নয়টা"।

"আমি বলিলাম, একটা প্রশ্ন করিতেছি, ক্ষমা করিবেন সেই ব্যক্তি কী এক্ষণে আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?"

"না মহাশয়"।

"আমি তাহার চিকিৎসার সম্বন্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা করিলে কী আপনি আজ রাত্রে তাহার সাহায্য করিতে পারেন না?" রমণী আকুল স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লিল, "কিছুমাত্র না।"

আমি তাহাকে আর কোনো প্রশ্ন করা বৃথা মনে করিলাম। তাহার ব্যাকুলতা, সে কতক পরিমাণে দমন করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহার ক্রন্দন আমার মর্ম স্পর্শ করিল। আমি প্রভাতে যাইব অঙ্গীকার করিয়া, তাহাকে বিদায় দিলাম।

সে চলিয়া গেলে, বসিয়া বসিয়া তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই অদ্ভুত অভ্যাগমন সম্বন্ধে কী করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার শুনিয়াছিলাম কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস হইয়াছিল, কোনো নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহাও সেইরূপ কিছু নয় তো? আবার মনে হইল, ইহার ভিতর কোনো হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র নাই তো? হয় তো এই রমণী, প্রথমে তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সম্মত হইয়া, পরে অনুতপ্ত হইয়াছে; এবং সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য, আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু শহরের এত নিকটে এরূপ হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয় মনে হইল। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদ!

পরদিন প্রভাতে রমণীর গৃহে যাইবার জন্য গৃহপরিত্যাগ করিলাম। রমণী যে স্থানের কথা বলিয়াছিল, তাহা শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। আমি শহরের বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া, অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে, মাঝে মাঝে ২/১টি গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। ২/৩টি বৃষ্টিজলে পূর্ণ বাঁধ ও তৎপার্শ্বে ২/১টি বৃক্ষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানটি প্রায় জনশূন্য, কয়েকখানি কুটীর ও ৩/৪খানি ইষ্টকনির্মিত গৃহমাত্র আছে। স্থানটি বড়ো জঘন্য; স্থানবাসী সকলেই প্রায় দরিদ্র ও অধিকাংশই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক। স্থানটির নির্জনতা যেন স্থানবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম, কিছু জমি লইয়া উদ্যান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু দরিদ্রতা বশতই হউক, আর যাহার জন্যই হউক কেহই কৃতকার্য হয় নাই। একটি কুটীরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম এক বর্ষীয়সী রমণী, একটি ছোটো বাঁধের নিকট বসিয়া বাসন মাজিতেছে ও মধ্যে মধ্যে একটি ছোটো বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেছে।

এইরূপে কর্দম ও আবর্জনার মধ্য দিয়া, প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, একটি গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করাতে সে এই গৃহ দেখাইয়া দিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকনির্মিত, দ্বিতল, কিন্তু অনুচ্চ। অন্যান্য গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের দ্বার ও সমস্ত জানালা রুদ্ধ। আমি দ্বারে আঘাত করিলাম। ভিতর হইতে মৃদু কথোপকথনের শব্দ শুনিলাম, এবং পরক্ষণে দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। দেখিলাম সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। তাহার মুখমণ্ডল কৃশ ও ম্লান। সে মৃদু স্বরে বলিল, "ভিতরে আসুন"।

আমি প্রবেশ করিলে, সে দ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া, আমাকে একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে লইয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি সময়মতো আসিয়াছি তো"?—

"আপনি নিরূপিত সময়ের পূর্বেই আসিয়াছেন।"

আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহার মুখের পানের দিকে চাহিলাম। সে আমার বিস্মিতভাব দেখিয়া বলিল, "আপনি এই গৃহে অপেক্ষা করুন। আপনার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

আমি গৃহে প্রবেশ করিলে, সে ব্যক্তি দ্বার ভেঁজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

গৃহটি ক্ষুদ্র। একটি টেবিল ও ২/৩ খানা ভগ্নপ্রায় চেয়ার ছাড়া আর কিছু নাই। গৃহে জানালা আছে, তাহা দিয়া একখণ্ড জমি দেখা যাইতেছে; কিন্তু তাহা বৃষ্টিজলে পূর্ণ। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টাকাল এই গৃহে বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ একখানা গাড়ির শব্দ হইল। সেখানা গৃহের দ্বারদেশে থামিল। দ্বার মোচন ও তৎসঙ্গে মৃদু কথোপকথনের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎপরে একটু গোলমাল ও ৩/৪ জন লোক মিলিয়া একটা ভারী দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইবার মতো শব্দ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পর, সিঁড়িতে পুনরায় পদশব্দ ও দ্বার মোচনের শব্দ পাইয়া বুঝিলাম যাহারা আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গেল। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল ও পরক্ষণে চারিদিক পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও কেহ আসিল না দেখিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিব মনে করিতেছি, এমন সময় গৃহের দ্বার মুক্ত হইল। দেখিলাম, পূর্বরাত্রের অবগুণ্ঠনবতী রমণী হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমায় ডাকিতেছে। রমণীর সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে। বুঝিলাম সে ক্রন্দন করিতেছে।

রমণী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। সম্মুখেই একটি গৃহ; রমণী তাহার দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, আমায় ইঙ্গিত করিয়া প্রবেশ করিতে বলিল। গৃহে ২/১টি বাক্স ও একখানা তক্তপোষ ভিন্ন আর কোনোই আসবাব নাই। জানালা রুদ্ধ; কিন্তু তাহার ২/১টি পাখি ভগ্ন থাকাতে, গৃহে অল্প অল্প আলোক প্রবেশ করিতেছিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অল্প আলোকের জন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না, ইতস্তত করিতে লাগিলাম। রমণী আমার পাশ কাটাইয়া দৌড়িয়া, তক্তপোষের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

তখন দেখিলাম, শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি মনুষ্যমূর্তি সেই তক্তপোষের উপর শয়ান। তাহার অনাবৃত শির ও বদনমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলাম সে পুরুষ। তাহার চিবুক হইতে মাথার উপবিভাগ পর্যন্ত একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা। চক্ষু দুটি মুদ্রিত ও নিস্পন্দ। হস্তদুটি রমণীর হস্ত মধ্যে স্থিত।

আমি ধীরে ধীরে রমণীকে সরাইয়া দিয়া রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম। করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"কী সর্বনাশ! এ যে মৃত।"

রমণী চমকিয়া উঠিল, তৎপর করযোড়ে বলিতে লাগিল, "ও কথা বলিবেন না। ভগবানের দোহাই, ওরূপ নিষ্ঠুর আমায় বলিবেন না। আমি সহ্য করিতে পারিব না। চিকিৎসকেরা কত অসাধ্য সাধন করে। আপনি কী ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন না? দোহাই আপনার—একটু চেষ্টা করুন" বলিতে বলিতে রমণী মৃতের কপালে ও বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে মৃতের হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "বৃথা চেষ্টা!" বলিয়াই সর্প ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "জানালাটা খুলিয়া দিন"।

রমণী ব্যস্ত হইয়া বলিল "না—না"

আমি দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিলাম "জানালাটা খুলিয়া দিন", বলিয়া তাহার অপেক্ষা না করিয়াই, জানালার দিকে অগ্রসর হইলাম। রমণী দৌড়াইয়া আসিয়া আমার পথরোধ করিল। বলিল, —"আমি ইচ্ছা করিয়া জানালা বন্ধ করিয়াছি। আপনি যখন তাহাকে বাঁচাইতেই পারিবেন না তখন দেখিয়া কী করিবেন?"

রমণীর ঈদৃশ ব্যস্তভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। "এ ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, আমি ইহার মৃতদেহ দেখিতে চাই," বলিয়া জানালা খুলিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, রমণীর অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়াছে—তার জ্ঞান নাই। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বয়স

অনুমান পঞ্চাশৎ হইবে। সৌন্দর্যের রেখা অদ্যাপি বিদ্যমান। দুঃখে কষ্টে ও ক্রন্দনে, মুখমণ্ডল ম্লান ও বিবর্ণ হইয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে ও দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু উছলিয়া পড়িতেছে।

আমি তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলাম, "আমি অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতেছি।"

রমণী স্থিরকণ্ঠে বলিল, "ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে।"

আমি পুনরায় বলিলাম, "এই যুবককে হত্যা করা হইয়াছে।"

রমণী আবেগভরে বলিল, "আমিও ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি ইহাকে অত্যন্ত নির্দয়রূপে হত্যা করা হইয়াছে"। আমি তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হত্যা করিয়াছে?"

রমণী বলিল, "দেহ ভালোরূপ দেখিয়া প্রশ্ন করুন।"

আমি মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম, তাহার কণ্ঠদেশ স্ফীত ও তাহা বেষ্টন করিয়া একটি চিহ্ন। আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি শিহরিয়া ফিরিয়া বলিলাম, "আজ প্রভাতে যে কয়জন হতভাগ্যকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে, এ ব্যক্তি তাহারই একজন।"

রমণীর আমার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টি করিয়া বলিল, "হাঁ!"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কে?"

রমণী অস্ফুট স্বরে "আমার পুত্র" বলিয়া জ্ঞানশূন্যা হইয়া মৃতের পদতলে পড়িয়া গেল। আমি সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হতভাগ্য বিধবা মাতার একমাত্র অবলম্বন। মাতা বহু কষ্টে ও অনশনে পুত্রকে পালন করিয়াছে, কিন্তু পুত্র মাতার ক্রন্দন ও প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া অসৎ সঙ্গে মিশিয়াছে। এবং অবশেষে নিজের মৃত্যু ও মাতার উন্মত্ততার কারণ হইয়াছে।

সময়ের সঙ্গে আমার অবস্থা ফিরিল। মুক্তাবাই আমার গৃহ আলোকিত করিল। আমি মনোমতো ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে ভুলিতে পারি নাই।

পাখির বাসা

গোপা সেন

চড়ুই প্পাখি দুটো ক্রমাগত খড়কুটো নিয়ে আসছে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি; তবু পাশের ঘর থেকে দেখতে পাই। কদিন ধরে ওদের কাজের তাড়া যেন বেড়েছে। কখনো দুটো পাখি একসঙ্গে আসছে, কখনো বা এক এক করে। কখনো খড়, কখনো দড়ির টুক্‌রো, কখনো বা শুকনো পাতা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে আসে। আবার হঠাৎ কখনো পাশের ঘর থেকে আমার ঘরে এসে যে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় বসে ওরা আলাপ জুড়ে দেয়। ওদের কিঁচির মিচির ভাষা বুঝিনে, কিন্তু বেশ অনুমান করতে পারি বাসা তৈরি নিয়ে ওরা আলাপ করছে।

কাজের আমার অন্ত নেই। তবু মাঝে মাঝে চোখ তুলে ওদের ব্যস্ততা দেখতে মন্দ লাগে না। কখনো বা কাজ ভুলে ওদের ঘর বাঁধবার এই ব্যস্ততার দিকে চেয়ে থাকি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে ওরা কিছু স্বপ্ন দিয়ে যায়।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাখি দুটোর ছুটি নেই। সারাদিন নিজেদের ঘর বাঁধতে আমার ঘর আবর্জনায় ভরে দেয়। রোজ বিকেলে শ্রান্ত হয়ে ফিরে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বিরক্তি বোধহয়। সকালে পাখি দুটো সম্বন্ধে যে কৌতূহল থাকে বিকেলে তার কিছুই অবশেষ থাকে না।

আজ ছুটির দিন। ভাবছি বইয়ের তাকগুলি গোছাব কিন্তু পাখির বাসাটা না সরালে বইপত্র, ঘরদোর কিছুই পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না। একটা টেবিল এনে দেয়ালে গাঁথা তাকের সামনে রাখলাম। নীচে থেকে তিনটে তাক গোছানো হয়ে গেল। বেশ কিছু খড়কুটো ঝেড়ে ফেলতে হলো, কিন্তু বাসা কোথায়?

এবার টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম। সবচেয়ে উপরের তাকটা বাকী আছে। কয়েকটা বই ধরে টানতেই বইয়ের পেছন থেকে একটা পাখি হঠাৎ আমার কানের পাশ দিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। অন্য পাখিটা যে এতক্ষণ জানলায় বসে প্রাণপণে চীৎকার করছিল খেয়াল করিনি। এবার দুটোতে একসঙ্গে চীৎকার শুরু করে দিল। বিরক্ত হই, হাসিও পায়; আমার ঘরদোর অপরিষ্কার করবে, অথচ ওদের ঘর ভাঙছি বলে এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ! তাড়া দিতে উড়ে পালালো; তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে এলো। কিচিরিমিচির করে প্রতিবাদ করতে লাগল, যেন ধিক্কার দিতে লাগল আমাকে।

আস্তে আস্তে হাত টেনে আনছি। কিছু খড়কুটো জড়ো করা কী যেন লাগছে। একটা নরম উত্তাপ হাতে লাগলো। পাখি দুটো তারস্বরে চীৎকার করছে। খড়কুটো দিয়ে তৈরি বাটির মতো বাসাটা। সুন্দর বুনানি। ভিতরে পাতার কোমল আস্তরণ। তারই উপর রয়েছে, সঞ্চিত শ্বেত স্নেহ কণিকা। তিনটে ডিম।

পাখি দুটো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। জানালায়, দরজায় কখনো আমার দাঁড়িয়ে থাকা টেবিলের উপরে এসে বসছে।

আর চীৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় মা যেমন কাঁদে, তেমনি। টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছি, হাতে পাখির বাসা, তাতে তিনটে সাদা ডিম। তিনটি প্রাণের জমাট শ্বেত ফসল। এই বাসা বাঁধবার প্রেরণা এবং বাসা ভাঙবার আশঙ্কায় পাখি দুটোর অবিরাম চীৎকার আমার মনের কোনো গোপন তারে ঘা দিল কে জানে।

পাখির চীৎকার ছাপিয়ে সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ কানে এলো। এতক্ষণে খেলা শেষ করে দুষ্টু দুটো উপরে আসছে। বট্টা আবৃত্তি করছে চেঁচিয়ে—'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে—'

শুনতে পাচ্ছি ছোটু উঁচু গলায় বলছে, 'তোর বলা ঠিক হচ্ছে না, দাদা।'

—'তুই খুব জানিস্! বল্ দেখি সবটা।'

এখান থেকেই বুঝতে পারছি দু ভাইয়ে একটা মারামারি শুরু হল বলে। যা ভাবা তাই। কাঁদতে কাঁদতে ছোটু এগিয়ে আসছে : 'মা, ও মা দাদা আমাকে মোরেছে।'

ধমকে উঠলাম, 'একটু কাজ করতে দিবিনে। কেবল দুষ্টুমি আর মাবামারি, সৌমিত্র যে ওদের একটু দেখবে ছুটির দিনে তাও নয়।'

ছুটির দিনে তাড়া নেই। পাশের ঘরে বিছানায় বসে নিশ্চিন্ত মনে সৌমিত্র কাগজ পড়ছে। সামনে চায়ের কাপ, হাতে সিগারেট। চা আর সিগারেট দুটোতেই বড়ো নেশা তার। আজ ছুটির দিন, এই নিয়ে তিন প্রস্থ চা হল। একটু আগে চা দিতে গিয়ে রাগ করেছি। সৌমিত্র তার জবাবে হাসে, বলে, 'ছুটির দিনে বেশি চা না হলে আমার ছুটিই মনে হয় না।' এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। কত কাজ বাকি, কিন্তু ওকে বোঝাবে। এ ঘর থেকেই সিগারেটেব গন্ধ পাচ্ছি, আর চায়ের কাপ মাঝে মাঝে পিরিচে রাখার শব্দ শুনতে পাই।

একটা পাখি বেপরোয়া হয়ে হাতে ঠোকর মারল। সম্বিৎ ফিরে এলো! কোথায় সৌমিত্র, বট্টা আর ছোটু? কার সঙ্গে কথা বললাম? সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মাঝের দরজা দিয়ে ও ঘরে তাকিয়ে চোখে পড়ল কুমারীর সংকীর্ণ শয্যার উপর বিবর্ণ আবরণীটা করুণভাবে পড়ে আছে।

বাসাটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলাম। ভারী ইচ্ছে করছিল ডিমগুলোর উপর একটু হাত বুলিয়ে দিই। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হল। মানুষের ছোঁয়া লাগলে নাকি ডিম ফোটে না। আমি বাধা দেব না, খোলসে বন্দী আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সার্থক হোক।

বইয়ের পেছনে বাসাটা রাখতে গিয়ে হাতে কী যেন ঠেকল। চেনা চেনা মনে হল। টেনে আনলাম। ধুলোয় বিবর্ণ এক তাড়া চিঠি কালো রবারের তাগা দিয়ে বাঁধা। সৌমিত্রর চিঠি। এই চিঠিগুলি আমাকে সৌমিত্র, বট্টা আর ছোটুর স্বপ্ন দিয়েছে। সেই স্বপ্ন আমি পালন করেছি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় কতবার পড়েছি। বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। চিঠিতে আঁকা ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি। কয়েক বছর হল চিঠিগুলি আর খুলি না। সব আশা বিদায় নিয়েছে। এক বাণ্ডিল ডানাভাঙা, রংচটা মৃত স্বপ্নের মতো চিঠিগুলিকে চোখের আড়ালে সরিয়ে রেখেছি।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। আজ এতদিন পরে চিঠিগুলি একে একে খুলতে লাগলাম। এক বিস্মৃতপ্রায় জগৎ আবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমাদের এমন পয়সা ছিল না। যে রেস্তোরাঁ কাফেতে নিরিবিলি এক কোণে বসে কথা বলব। পরিবারের কঠোর সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েছি। তাই সৌমিত্রকে নিয়ে ময়দানে বা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবার সাহস ছিল না। তবু কি করে জানি না ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধ আলাপের মধ্য দিয়েই দুজনের মন বড়ো কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

উপায়টা বের করেছিল সৌমিত্রই। চিঠির টুকরো কখনো করিডোর দিয়ে যেতে যেতে হাতে গুঁজে দিত, কখনো বা বই খাতার মধ্যে রেখে দিত। পড়তে ভালো লাগত খুব কোনো দিন চিঠি না পেলে সব যেন বিস্বাদ ঠেকত। আমিও লিখতাম, তবে ওর তুলনায় অনেক কম।

ক্রমশ চিঠির আকার বাড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে বিষয়ের পরিধি। কলেজের বাইরে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা। এক চিঠিতে ও জানালো আমাদের বিয়ের কথা। আমি লিখলাম, সে কী করে হয়? তুমি জানো না, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়ো?

উত্তর পেলাম পরদিনই। এই তো সেই চিঠি। তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫। লিখেছে : ঊর্মিলা, তুমি আমাকে হাসালে! ভালোবাসার সার্থকতার পথে সমাজের বাঁধা, দারিদ্র্য রোগ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা অন্তরায় হতে পারে মানি। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কবি, কোনো ঔপন্যাসিক বয়সকে ভালোবাসা সফল হবার পথে বাধা বলে দেখেননি। শুনিনি কখনো এমন কথা। নিজের অজান্তে যখন তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম তখন বয়সের হিসেব নেবার কথা তো মনে ওঠেনি। তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমার চাই। ভুলে যাও বয়স, ভুলে যাও আর সব।

কী যে ভালো লেগেছিল!

প্রায়ই লিখত সৌমিত্র, তোমাকে কিন্তু আমার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। একটা ভালো চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না আমাদের।

কেন? আমি প্রশ্ন করতাম। আমিও তো স্কুলে ছোটোখাটো একটা কাজ নিতে পারি। দুজনের আয়ে চলে যাবে মোটামুটি।

ওর চিঠি যেন চীৎকার করে উঠত, 'না, না তা হয় না। উর্মি, তুমি বাইরে চাকরি করলে ঘরে আমার ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে, সে আমার সইবে না। আমার ঘরে সারাক্ষণ তোমার হৃদয়ের পূর্ণ উত্তাপ চাই।'

মুগ্ধ হয়েছি আমি। কদম ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি। তখন বয়সের বাধা, আর সব বাধা অবান্তর হয়ে যেত। আর তখন থেকেই সৌমিত্রকে দেখে আসছি গৃহকর্তা হিসেবে; একে একে কোলে পেয়েছি বড়া আর ছোটুকে। তারপর তারা কোল থেকে নেমে এঘরে-ওঘরে, রকে-সিঁড়িতে দৌড়ঝাঁপ করেছে। মনের নিভৃত কোণে তাদের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না।

দুজনেই বি-এ পাশ করলাম। সৌমিত্র গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে। ওকে বড়ো হতে হবে। আমার আর পড়া হল না। বাবা সামান্য বেতন পেতেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর আয়ের পথ আরও সংকীর্ণ হল। সংসার চালানোই কঠিন; আরও পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সংকট তীব্র হল কয়েক মাস পরে, বাবা যখন চলে গেলেন সামান্য রোগে ভুগে। অকস্মাৎ মা আর ছোটো ভাইয়ের দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। ভাল একটা চাকরি খুঁজে দেখবার সময় ছিল না। প্রথম যেটা পাওয়া গেল তাই নিতে হলো। দূর পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুলে হেড মিস্ট্রেসের পদ।

কলকাতা আর সৌমিত্রকে ছেড়ে চলে এলাম অচেনা নির্বান্ধব পরিবেশে। সৌমিত্রর চিঠি আসত মাঝে মাঝে। লিখত একই কথা : কয়েকদিন ধৈর্য করে কষ্ট করো। একটা ভালো কাজ জুটিয়েই তোমাকে ঘরে নিয়ে আসব। সেদিনকার অন্ধকার জীবনে এই চিঠিগুলিই ছিল আমার আলোকস্তম্ভ।

চালের আড়তদার রামবিলাস সর্দার স্কুলের প্রেসিডেন্ট। একদিন ডাক এলো তাঁর বাড়ি থেকে। একটা চিঠি তুলে ধরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সৌমিত্র কে?

সৌমিত্র আমার কে? পৃথিবীর কোনো মহাকাব্য গীতিকাব্য গল্প-উপন্যাস যে কথা বলতে পারেনি তা আমি এই কুৎসিৎ দর্শন বাঁকা চাউনির লোকটিকে কী করে বোঝাব? শুধু ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, আপনি আমার চিঠি খুলেছেন?

নির্লজ্জ হাসি দিয়ে আমাকে লেহন করে বললেন, আমি স্কুলের কর্তা। ছাত্রীদের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়।

সৌমিত্রকে লিখলাম, এখানে আর চিঠি দিওনা। আমাদের বন্ধুবান্ধব আছে। স্কুলের কাজে যখন কলকাতা যাব তখন তাদের কাছ থেকে তোমার খবর নেব। সময় থাকলে তোমাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করব।

এই অসহ্য পরিবেশ থেকে সরে যাবার একটা সুযোগ এসে গেল। আরও দূর মফঃস্বলে চলে গেলাম নতুন একটা চাকরি পেয়ে। হয়তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এই আশঙ্কায় সৌমিত্রকে নতুন ঠিকানা জানালাম না। কিন্তু কলকাতা গেলেই দেখা করতাম। অবশ্য বছরে দু'তিনবারের বেশি নয়। একবার গিয়ে শুনলাম, চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেছে সৌমিত্র। বড়ো চাকরি কিছু নয়, কিন্তু কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যত উন্নতির আশা আছে। আর সে আশায় সে ফাইলের কবরে নিজেকে সমাহিত করেছে। ছুটি নিয়ে এদিকে আসেও না অনেকদিন।

আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। সৌমিত্রর এই সাধনা তো আমার জন্যই। আমাকে যোগ্য মর্যাদায় ঘরে নেবে বলে।

কোথা দিয়ে যে বারো-তেরো বছর পার হয়ে গেল হিসেব করিনি।

বয়সের হিসেব করতে সৌমিত্রই নিষেধ করেছে। ভালোবাসার যে স্থিরবিন্দু সৌমিত্র রচনা করেছে, তাকে কেন্দ্র করেই দিন আর বছর কেটে গেল। মনে হয়নি বয়স বাড়ছে, যৌবনের শেষ প্রান্তও উত্তীর্ণ হতে চলেছে। সৌমিত্র শিখিয়েছে ভালোবাসার কাছে এসব প্রশ্ন অবান্তর।

এদিকে এতদিনে ভাই পাশ করে একটা চাকরি জুটিয়েছে বাংলার বাইরে। খাওয়া- দাওয়ার অসুবিধা বলে মাকে নিয়ে যাবে। হাওড়া স্টেশনে ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসলাম। শুনেছি সৌমিত্র অল্পদিন হল, কলকাতার আপিসে বদলি হয়ে এসেছে। আজ যাব তার কাছে। বলব, এবার আমাকে নাও। আর কতকাল!

হাজরা পার্কের স্টপে নামলাম। এখান থেকে এক নম্বর বাস ধরতে হবে। দুপুর গড়াতে শুরু করেছে, কিন্তু তখনো বিকেল হয়নি। তেমনি ভীড় নেই। বাস স্টপে এসে দাঁড়াতেই কে ডাকল, ঊর্মিলাদি না?

ফিরে তাকিয়ে চিনতে কষ্ট হল না। অনুভা। সৌমিত্রর বোন। বিয়ের হবার পর বেশ ভারিক্কি চেহারা হয়েছে। কপালে বেশ বড়ো আকারের একটা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা।

অনুভা বলে চলেছে, এক ট্রামেই এলাম ধর্মতলা থেকে। তোমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল বলে ডাকতে সাহস করিনি। কী বিশ্রী চেহারা করেছ। পুকুরের জলে চান করে করে একেবারে কালো হয়ে গেছ। চিনলাম চিবুকের তিল আর মাথার চুল দেখে। তোমার চুল কিন্তু তেমনি আছে।

অনুভার চোখের আয়নায় নিজেকে যেন নতুন করে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে বলে চলেছে : তাহলে বিয়ে আর করলে না। বয়স তো পার হয়ে গেছে, চেহারাটিও যা করেছ। জানো, দাদা তোমার খোঁজ করছিল। পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিয়ে নাকি উত্তর পায়নি। চলো, না এখনি আমার সঙ্গে। আমি দাদার বাড়িই যাচ্ছি। একটু পরেই দাদা আপিস থেকে আসবে। জানো, উর্মিলাদি, দিল্লি থেকে দাদার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, রং হয়েছে ফর্সা। বয়সের ছাপ পড়েনি।—আর জানো, ঘনিষ্ঠ হয়ে অনুভা বলল, কলকাতা আপিসের কর্তা দাদার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান। এই তো রবিবার আমরা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। সুন্দরী, ফর্সা—আমাদের তো সবার খুব পছন্দ। দাদা এখনো কিছু বলছে না। আজ আমরা সবাই যাচ্ছি দাদার কাছ থেকে কথা আদায় করব। সুন্দরী বউ আর চাকরিতে উন্নতির আশা একসঙ্গে কোথায় পাবে।

আমার পনেরো বছরের স্বপ্নের প্রাসাদ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পায়ের নীচে থেকে মাটি

সরে যাচ্ছে। পড়ে যাবো নাকি? বাঁচোয়া, তখনই এসে থামল তেত্রিশ নম্বরের দোতলা বাস। ছুটে উঠে পড়লাম। অনুভা হাঁক দিল। তুমি যাবে না আমার সঙ্গে? ওই তো এক নম্বর এসে গেছে।

ডেকে বললাম, যাবো একদিন। হয়তো কাল।

না, সৌমিত্র, তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।

সেদিন যৌবনের মোহ ছিল আমার মধ্যে; তাই তুমি সহজেই বয়সের হিসেব ভুলতে পেরেছ। কিন্তু আজ তোমার সামনে দাঁড়ালে অনুভার দৃষ্টি দিয়ে যদি আমাকে দেখ, যদি সেদিনের ভালোবাসা করুণায় রূপান্তরিত হয়, তুমি যদি তারপর বয়সের হিসেব করতে বসো, তাহলে আমি তা সইবো কেমন করে? আর সত্যি করে বলতে গেলে আমি কোনো জোর পাচ্ছি না। কী দেব তোমাকে? তোমার পূর্ণ যৌবন; আমি যৌবন উত্তীর্ণা এক নারী। তোমার সন্তানের মা হবার সময়ও বোধহয় আর নেই। তার চেয়ে কলেজ জীবনে তোমার মুগ্ধ চোখে আমার যে ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি তা অক্ষয় হয়ে থাক তোমার মনে। এই জীবনের হার-জিতের খেলায় ওইটুকুই শুধু জমা হোক আমার সঞ্চয়ের ঘরে। কী প্রসঙ্গে আজ মনে নেই; তুমি বলেছিলে, গোলাপ ফুলও একদিন শুকিয়ে যায়; জুতোর চাপে গুড়ো হয়ে যায়। পদদলিত শুকনো গোলাপ হতে চাই না আমি। তার চেয়ে তোমার কল্পনায় যেন সদ্য ফোটা বুনো ফুল হয়ে বেঁচে থাকি চিরদিন।

তোমার চোখে তুচ্ছ হয়ে যাবার আশঙ্কায় তোমার সামনে যেতে পারি। তোমাকে অভিযোগ করছি না, তোমার কোনো দোষ নেই। নিজের দুর্বলতার জন্য পালিয়ে এসেছি বিহারের এই ছোটো শহরে। একদিন তুমি যে স্বপ্নাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিলে চোখে তা এখনো একেবারে মুছে যায়নি। আমার জীবনে সে স্বপ্ন ব্যর্থ হলেও তোমার জীবনে সত্য হয়েছে। ছুটির দিনে নিশ্চয়ই তুমি খবরের কাগজ, চা আর সিগারেট নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাটিয়ে দাও। বারবার চা দিতে এসে আর কেউ হয়তো তিরস্কার করে যায়। বট্রা আর ছোটু তোমার ঘরে দাপাদাপি করছে দেখতে পাই। এই ছবির মধ্যে আমি কোথাও নেই। আছে আর একজন। ফর্সা, সুন্দরী, যৌবনবতী। তাকে যখন আদর করে কাছে টেনে নাও তখন কী হঠাৎ কোনোদিন মনের আকাশে একটি শ্যামলা মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে? যে মুখে বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় দুটি চোখ টলমল করত? আর মনে পড়ে কী মুহূর্তের জন্যও আন্‌মনা হয়ে পড়ো না?

সব আশা তো গেছে। শুধু এইটুকু কল্পনা বিলাস নিয়ে দিন কাটে। হয়তো কখনো কখনো তোমার মধ্যে আমি বেঁচে উঠি। এই আশাই আমার বাঁচবার অবলম্বন।

ঝি এসে দুবার তাগিদ দিয়ে গেছে। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, রান্না চড়াতে হবে। চিঠিগুলি ভাঁজ করে আবার কালো তাগা দিয়ে বেঁধে পাখির বাসার পাশে রেখেদিলাম। এবার পাখি দুটো ভয় পেয়ে উড়ে পালালো না। বোধহয় আশ্বাস পেয়েছে। কিংবা, কে জানে, আমি ঘর বাঁধতে পারিনি বলে ওরা আমাকে করুণা করছে।

ডিম আমি ছুঁইনি। তা পেয়ে পেয়ে একদিন ছানা বেরুবে, তারপর তিন ভাইবোন নীল আকাশে উড়ে যাবে। আমিও তো দীর্ঘ পনেরো বছর তা দিয়েছি আমার স্বপ্নের কোরকে। আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লেগে তা আর ফুটলো না। ফুটবে না কোনোদিন।

মানুষের মতো মানুষ

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

রাত পোহালেই অঙ্ক পরীক্ষা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। তারপর স্কুলবাসের হর্ন। তারপর ওয়ার্নিং বেল। তারপর সেই পায়ের শব্দ। হাড় হিম করা নৈঃশব্দ। তারপর সেই বিভীষিকা। অঙ্ক শেষ। যারা অঙ্কে ভালো, তারা প্রশ্ন পেয়েই কষতে শুরু করবে। মাঝারিরা ইনভিজিলেটরের চোখ এড়িয়ে বলাবলি দেখাদেখির চেষ্টা করবে। আকাশ, (থুড়ি, ও এখন নিউটন, নিউটন চৌধুরী) ওসব কিছুই করবে না। সে শুধু ঘামতে ঘামতে চেষ্টা করবে পাস নম্বর তোলার।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই এফিডেভিট করে আকাশের নামটা বদলে দেওয়া হয়েছে। এখানে ওকে কেউ আকাশ বলে ডাকে না। এমনকী তার মা-বাবাও নয়। কলকাতায় আসার পর তাঁরাও তাকে নিউটন বলে ডাকেন। বাবা-মা নতুন নামে ডাকলে উত্তর দিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করে আকাশ। ক্লাসের বন্ধুরা ওকে আইজ্যাক নিউটন বলে ক্ষ্যাপায়। লজ্জায় কুঁকড়ে যায় আকাশ। ও যখন একা থাকে তখন যেন ওকে একজন ফিসফিস করে 'আকাশ আকাশ' বলে ডাকে। সে তার ছোটো পিসি। আকাশ নামটা তারই দেওয়া। ছোটোপিসি মাটি হওয়ার সময় মারা গেছে হাসপাতালে। বছর তিনেক আগে। ছোটো পিসির মেয়ের নাম মাটি। ছোটোপিসি বলতো, 'তুই আকাশ, আর তোর যদি বোন হয় হয় রাখবো 'মাটি'। আকাশ আর মাটি কাছাকাছি থাকলে দারুন হবে। মাটির বাবা মাটিকে নিয়ে অনেক দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। আকাশের সঙ্গে মাটির আর দেখা হয়নি। ও নিশ্চয়ই এখন থ্রি-তে পড়ে; মাটি বোনের সঙ্গে আকাশ দাদার হয়তো আর জীবনেও দেখা হবে না।

আজ সকাল থেকে শুধু অঙ্ক আর অঙ্ক। আঙ্কেল চলে যাওয়ার পর বাবা নিয়ে বসলেন। বাবা, থুড়ি, ড্যাড নিউটনকে অংক করাবার জন্যে আজ কাল দুদিন ছুটি নিয়েছে। ড্যাড উঠে গেলে আবার মা, থুড়ি, মা নয়, মম। ছেলেও ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি হয়েছে বলে নিউটনের 'মা' এখন 'মম'। বাবা এখন 'ড্যাড'। আকাশের জিভ এখনো সরগড় হয়নি এসব ডাকে।

মম স্পষ্টই বলে দিয়েছে 'পঞ্চাশ হাজার টাকা ডোনেশান দিয়ে অ্যাতো ভালো স্কুলে ভর্তি করেছি, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। সবাই যেন এক ডাকে চেনে। তা ফ্ল্যাট হাতছাড়া হবার ভয়ে ওঁকে সে সময়টুকুও দিলেন না উনি। এতে ভালোটা কার হল? অ্যাডভান্সের টাকা তো দিতেই হয়েছে—আর দুটো দিন সবুর করলে কী ক্ষতি হত?

সুবিধে বলতে এ-ঘরের একটা এন্ট্রান্স। কেন এন্ট্রান্সের মতো বাইরের লোহার গেট অবশ্য নেই, তাহলেও এটা সুবিধে। শুধু ওই খরচ করে উনি চাবির কপি করাতে গেলেন। বারণ করাই যেত। সেটা কী ভালো দেখাত! আগে যিনি থাকতেন, এই ছোটো ঘরেই দিয়েই হয়ত যাতায়াত করতেন, দরজার মাঝখানে একটা বিশ্রী ফুটো করে রেখে গেছেন। এভাবে কেউ করে! এদের

রুচি দেখলে অবাক লাগে। বড়ো ঘরটা পাওয়া গেলেই ভালো হত। তা উনি একবার ভদ্রতা করে জিজ্ঞেসও করলেন না, আপনি কোন্‌টা নেবেন। ও- ঘরে এসব বালাই নেই। আগের ভাড়াটের স্ত্রী হয়তো ও-ঘরটায় থাকতেন। দরজার সামনেই রান্নাঘরের দরজা। রান্নাঘর তো ওঁর কোনো কাজে লাগবে না। উনি বাইরে খাবেন। খামোকা বড়ো ঘরটা নিজের ভাগে রাখলেন। বাথরুমও ওই ঘরের পাশে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে এখন অনেক সমস্যা বেরোবে। ফ্ল্যাটের চাবি করানোর দরকারই ছিল না। লোক দ্যাখানো।

চাবির কপি করিয়ে এনে ছাদে উঠেছিলাম ছাদটা দেখতে। মাসটা গেলেই গরম পড়বে। তার তো ছাদই ভরসা। তা নীচে নেমে এসেই দেখি ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ! একেবারে ছিটকিনি পড়ে গেছে। একবার দিদিমণি বলে ডাকলামও, কোনো সাড়াশব্দ নেই।—যাচ্চলে, এটা কীরকম হল! ঘরের খোঁজ এনে দিলাম, খাতির করে ফ্লোর শেয়ার করলাম, শেষকালে নিজেই হাত লাগিয়ে মালপত্তর টেনে টেনে তুলে দিলাম দোতালায়— এই তার রেজাল্ট! ও কি বাঘ-ভালুকের সঙ্গে বাস করছে নাকি! এত আড়াল হয়ে থাকার কী আছে? এইজন্যে বলে, কখনো কারোর ভালো করতে নেই। ভালো করলেও দোষ। এরা যে ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের কী শেখাবে কে জানে।

বাড়িওয়ালা নীচ থেকে ডাকছিলেন। গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'আপনার রসিদ।'

একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, 'আমার একার নামে কাটলেন কেন?'

বাড়িওয়ালা অবাক, 'তা কার নামে হবে আবার!'

উনি ব্যাপারটা ধরতেই পারেন নি। সরল করে বললাম, 'না না, আমার একার নামে হবে না। দিদিমণির নামও লিখুন, নইলে আবার কী মনে করবেন। টাকা তো উনিও শেয়ার করেছেন।'

'অ-হ্।' বলে রসিদটা নিয়ে উনি ঘরে চলে যাচ্ছিলেন, কী ভেবে ফের দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ-বেলা আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার কী বন্দোবস্ত?'

বললাম, 'হ্যাঁ, দেখি কী করা যায়। দিদিমণি ঘরে ঢুকেছেন, বেরোন আগে।'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক কেন যে আচমকা জানতে চাইলেন, 'খাওয়া-দাওয়া কী আপনাদের একসঙ্গে?'

আমার কেমন মনে হল, রগড়টা সবার আগে বাড়িওয়ালাই শুরু করলেন তাহলে। মমের ধারণা, নিউটন নাম রাখলে ছেলের ওপর নামের একটা প্রভাব পড়বে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানী হওয়া।

শহরের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে আকাশ শুনতে পায় আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কুলো বাজানোর শব্দ 'আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে, মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে।' মমের সব পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়ে তার নাকে আসে তাদের পুরনো বাড়ির উঠোনে ভোরের পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়ে তার নাকে আসে তাদের পুরনো বাড়ির উঠোনে ভোরের শিউলির গন্ধ। অঙ্ক, বিজ্ঞান, সব ছাপিয়ে গ্রামের বাড়ির চোদ্দ শাক, চোদ্দ প্রদীপ, পোষ-পার্বনের কথা মনে পড়ে যায়। এখন 'হেভেন' অ্যাপার্টমেন্টের চার তলার বাসিন্দা নিউটন। মাটি থেকে আকাশের দূরত্ব অনেক। আকাশে সপ্তর্ষিমন্ডল, কালপুরুষ, ছায়াপথ, শুকতারা, ধ্রুবতারা, কোনো কিছুই দেখার সুযোগও নেই, সময়ও নেই। আকাশ এখন নিউটন হওয়ার জন্যে মরীযা, মম-ড্যাড আঙ্কেলরা শুধু ইংরেজি, অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়াতেই ব্যস্ত। বাংলা, ইতিহাস, নাকি পড়ার দরকার হয়না, অথচ পুরনো স্কুলের নির্মল স্যার বলতেন, 'ইতিহাস না পড়লে নিজের দেশকে জানা যায় না, রফিকুল স্যার বলতেন 'মাতৃভাষা ভালো করে না শিখলে নিজেকে জানা যায় না।' এখন যে বিজ্ঞানের টিউটরের কাছে পড়ে নিউটন তাঁর কাছে একদিন, জিগ্যেস করেছিল, 'সিধু-কানু' কারা আঙ্কেল? আঙ্কেল বলেছিলেন, 'ওসব জেনে সময় নষ্ট করতে হবে না। যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে, বিজ্ঞানী হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে তাদের ওসব না জানলেও চলবে। অঙ্ক করো। বিজ্ঞান পড়ো।'

রাত্তির বারোটার পর শোবার অনুমতি পেলো আকাশ। আজ সারা দিনরাত অঙ্ক করেছে আকাশ। কিন্তু সব যেন তার গুলিয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু মনে নেই। কী হবে! অঙ্কে নয়ের ঘরে নম্বর না পেলে মম-ড্যাড-আঙ্কেল কেউ তাকে ছাড়বে না। অ্যাতো কঠিন কঠিন অঙ্ক মুখস্থ করতেও পারবে না। তাহলে! গা গুলিয়ে ওঠে আকাশের। হাতে পায়ে যেন বল নেই। সারাদিন অ্যাতো পরিশ্রম করেছে অথচ ঘুম আসছে না। পাশের ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ড্যাড্-মম। আকাশের ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যায়, কিন্তু সে, যে একটা খাঁচার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। খাঁচাটার লোহার শিক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যাড-মম্-আঙ্কল আর একটা বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আকাশ এখন খাঁচায় বন্দি। গা-বমি ভাবটা আরও বাড়ছে।

এখন রাত তিনটে। আর দু-ঘণ্টা পরেই ভোর হবে। ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজবে। আবার আঙ্কল। আবার অঙ্ক। তারপর পরীক্ষা। কিন্তু কেনো অঙ্কই মনে নেই আকাশের। অথচ তার ড্যাড-মম্‌কে সবার চেয়ে বেশি নম্বর এনে দিতেই হবে। অবশেষে রাতে নিউটন খুঁজে পেলো সমস্যা সমাধানের উপায়। ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার আগেই নিউটনের স্কুল ড্রেসের প্যান্টের পকেট ভরে উঠলো টুকরো টুকরো অজস্র কাগজে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি...। আকাশকে এবার নিউটন হতে হবে।

মানিপ্ল্যান্ট

জয়শ্রী সেন

নর্থ বিহার প্যাসেঞ্জার হাওড়ায় ঢুকল ছ'ঘণ্টা লেট করে। মার্চ মাসের শেষ, দুপুরটা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

ওদিকে—মানে বিহারের যেদিক থেকে সত্যভূষণ এখন ফিরছে—ঠাণ্ডাটা সেখানে যাই যাই করেও এখনও পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু কলকাতার দিকে রীতিমতো গরম।

সাধারণ ফার্স্ট ক্লাসেই এসেছে সত্য। দু-একটা ট্রেনে এখনও আছে সেটা। দুপুরে নিরামিষ থালি নিয়েছিল ট্রেনে—এত খারাপ রান্না যে খেতেই পারেনি ঠিক করে। এসিতে যাতায়াত করলে পছন্দমতো খাবার নিতে পারবে, ভেবেছিল তখন। গরমে নষ্ট হবার ভয়ও থাকবে না। আপিসের কাজে এসি কোচে চড়ার যোগ্য হতে আরেকটা সিঁড়ি ওঠা বাকি—সে জন্য খুব খেটেখুটে নিজেকে তৈরি করছে সত্য। তবে স্ত্রী কমলাই যে এসবের প্রেরণা তা সত্য খোলা মনে স্বীকার করে। স্বীকার করার দায়টা অবশ্য শুধুমাত্র নিজের কাছেই।

নিজেকে বড়ো চাকুরের বউ হিসেবে দেখার খুব শখ কমলার। সেরকম ঠাটবাঁটে অভ্যস্ত হবার জন্য নিজেও কম চেষ্টা করে না! ইংরেজি পত্রিকা জোগাড় করে পড়া ও বোঝার চেষ্টা করে। কারণ নিজে কেনার মতো আত্মবিশ্বাস এখনও হয়নি। বাজার চলতি ট্রেন্ডি পোশাক আর গয়নায় নিজেকে আধুনিক ও সপ্রতিভ রাখার চেষ্টা করে। সস্তায় ভালো আসবাব বা টুকিটাকি কিনতে পারলে তাই দিয়ে ঘর সাজায়। মোট কথা সুন্দর থেকে, সুরুচিপূর্ণভাবে জীবন কাটানোর শখটা ওর খুবই তীব্র। তবে এসবের পেছনে যে টাকাই আসল জিনিস সেটা কমলা ভালোরকমই বুঝে গেছে।

হাতে ছোটো ব্যাগ আর অ্যাটাচি কেস ছাড়া কিছু না থাকলেও একটু আয়েশি হতে ইচ্ছে করলে সত্যভূষণের। তাই বাসের লাইনে না গিয়ে ট্যাক্সির লাইনেই দাঁড়াল। কমলা জানলে খুশি হত—ওর মতে এসব ইচ্ছে এগিয়ে যাবারই লক্ষণ।

মিনিট কুড়ির মধ্যে ট্যাক্সি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। কমলার জন্য একটা জুটের শাল এনেছে, একেবারে অন্য ধরনের জিনিসটা। কলকাতায় এখনও ওঠেইনি। কমলার খুশি মুখটা মনে করে সত্যর নিজের মনটাও যেন আনন্দিত হয়ে উঠল।

মিন্টো পার্কের ট্র্যাফিক জ্যাম পেরিয়ে, গড়িয়াহাটে সেলের ভিড়কে কপালজোরে কাটিয়ে ঢাকুরিয়া উড়াল পুল দিয়ে যাদবপুরের কাছে এসে ট্যাক্সি থামল। থামতে বাধ্য হল। বাসে, মিনিবাসে, রিকশায়, সাইকেলে, বাইকে, অটোতে ধুন্ধুমার কাণ্ড। তার মধ্যে পথসভা চলছে—মাইকে তীব্র চিৎকার করে বক্তৃতা দিচ্ছেন কেউ।

বাড়ি পৌঁছল যখন, তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু—বাড়িতে পৌঁছে সত্যভূষণ দেখল কমলা নেই, দরজা খুলে দিল পারুল।

মাঝারি মাপের চাকুরেরা বাড়ি ফিরে বউ-এর মুখ দেখতে পছন্দ করে। সত্যভূষণ এর ব্যতিক্রম নয়। এছাড়া, ও একটু স্পর্শকাতরও। অল্পে খুশি হয়, কষ্টও পায় তুচ্ছ কারণে।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ট্রেনের পোশাক বদলে বসার ঘরের 'এল' শেপের ফালিটুকুর মধ্যে পৌঁছে গেল সে। এখানেই সাদা সানমাইকা লাগানো ছোট্ট খাবার টেবিলে পারুল ওকে জলখাবার এনে দেবে।

ওর জুতো আর অ্যাটাচি কেস ঠিক করে রাখছিল পারুল। সত্য জিজ্ঞেস করল—"বউদি কোথায় রে? বলে গেছে কিছু?"

"কাচারি গেছে"—পারুল বলল। না তাকিয়েই।

"কী? কাছারি?" তার বউ আবার উকিল হল কবে? টের পায়নি তো। মনে মনে ভাবল সত্য কিন্তু হাসিটা বেরিয়ে এল বাইরে।

একটু অপ্রস্তুত হল পারুল। বুঝল—কিছু একটা ভুল বলেছে। তাই বলল "ডাঁড়াও, ড্যাঁড়াও" বলে বালতে লাগল কী যেন। তারপর হঠাৎ মুখটা আলো করে বলে উঠল,—"হোট্টিকাচার গো—মনে পইরেচে।"

"কেন? সেখানে আজকে কী?" 'হরটিক্যালচার' কথা ধরতে পেরে জিজ্ঞেস করল সত্য, অবাক হয়ে।

"ট্যাকার গাচ কিনতে গেছে, হুই যে, হুই গাচ, আরও নতুন ধাঁচের, তাই আনতে তো যাওয়া কল্লে গো।"

সত্য জানে ইদানীং কমলার বাতিক হয়েছে মানিপ্ল্যান্টের।

অভাবী ঘরের মেয়ে ছিল কমলা। সত্যদের পরিবার ধনী ছিল না বটে, তবে অসচ্ছলও নয়। সত্যর উনিশ বছর বয়সে তার বাবা মারা গেলেও, তাঁর মূল্যবোধ ভালোমতোই অঙ্কুরিত হয়েছিল সত্য আর সুনয়নী—এই দুই ভাইবোনের মধ্যে। বাবার দেওয়া মূল্যবোধকে মূলধন করেই সত্য পথ চলেছে এবং চলছে। যদিও সে পথে দৃঢ়ভাবে থাকা এ যুগে যে কত কঠিন তা বুঝছে প্রতি পদেই। তার মূল্যবোধে যাদের বিশ্বাস আছে ঈশ্বর তাদের খুশি হবার ক্ষমতাও দেন—এটাই বাঁচোয়া। সেই মূল্যবোধের তাড়নাতেই স্বল্পশিক্ষিতা কমলাকে বিয়ে করে ওর বাবা-মাকে স্বস্তি দিয়েছিল সত্য, একটি খাবার মুখ কমিয়ে দিয়ে। বিয়ের দীর্ঘ ন বছর কেটে গেছে, আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই, কমলার যত শখ সাধ ও পূরণ করেই দেয়, তবু প্রাণচঞ্চল ও জীবনমুখী কমলা নতুন করে কিছু স্বপ্ন, কিছু শখ তৈরি করে নেয়। বেডের সোফার পাশে রাখা আখরোট কাঠের তিন তাকওয়ালা সেলফটা হালেই কেনা হয়েছে, কোনো এক বিদেশযাত্রী বাড়ির আসবাব সস্তায় বিক্রি করছিলেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কমলাই সত্যকে বলেছিল। তারপর দুজনে গিয়ে জিনিসটা কিনে আনল সাধ্যমতো দামেই। আঙুরলতার কারুকাজ তলা থেকে ওপর পর্যন্ত। ভারী সুন্দর। একটা তাকে মোরাদাবাদি কাজের শৌখিন জিনিস, একটা তাকে ক্যাকটাস আর একেবারে নীচে ছিমছাম পরিপাটি করে রাখা থাকে রোজকার কাগজ। নিত্য ঝাড়ামোছায় জিনিসটা রীতিমতো জেল্লাদার।

কমলা তো উদয়াস্ত ঘর সাজানো, ফিটফাট থাকা, আর সমাজের ওপরতলার জীবন পাবার ভাবনায় মশগুল। সত্য কিন্তু অনিশ্চয়তাকে ভয় পায়। সচ্ছলতার সবটুকু যদি শখ মেটানোয় চলে

যায় তাহলে বৃষ্টির দিনে কী করবে? এখন না হয় শক্তি আছে, বয়স কম আছে—কিন্তু এই সখ যদি বেড়েই চলে তাহলে তো খুবই মুশকিল।

কিছুটা সময় আনমনা হয়ে গিয়েছিল সত্য। হঠাৎ খেয়াল করল যে পারুল জলখাবার এনে রাখছে। পরোটা, আলুপটোলের তরকারি আর ছোট্ট বাটিতে পাতলা খেজুরের গুড়।

এখনও পটল! বাঁধাকপিতে অরুচি হলেও পটলের দিকে তাকাতেও ভয় হয়। পঁচিশ টাকা কিলো হয়তো!

পারুল জিজ্ঞেস করল—'দাদা, ট্যাকার গাচ পুঁতলিই ট্যাকা আসে? সত্যি?'' পারুলের প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে সত্য একটা নজর বুলিয়ে নিল ছশো বর্গফুটের জায়গাটুকুতে। কম করে গোটা দশেক মানিপ্ল্যান্ট। টবে, বোতলে, ফুলদানিতে। সত্যর প্রথম প্রমোশনের দুদিন আগে গাছটা এসেছিল—এমনিই। এক চোটে দুহাজার টাকা মাইনে বাড়ায় সেই পয়মন্ত গাছের ডালপালা ছেঁটে এ ঘর ও ঘর। কমলার বিশ্বাস—সত্য যদিও পরিশ্রমী তবু মানিপ্ল্যান্টের অবদান কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। সত্যর নিজের অবস্য মাঝে মাঝে একটু ভালো কথা শুনতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে বসের মতো বউও বাহবা দিক, কিন্তু চেষ্টা করেই ও সে ভাবনাটাকে সরিয়ে রাখে।

"পটল কে কিনল? বউদি না তুই?'' পারুলের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সত্য।

"বউদি বইলেছিল, তাই কিনে এনেছিনু—কেন গো? ভালো নয় বুঝি?'' পারুল ঘাবড়ে গেল।

সত্য খুব গম্ভীর গলায় শুধোল—"কত করে?"

এবারে পারুল সত্যিই ভয় পেল—"বাইশ ট্যাকা। তা গোটাগুটি এক কিলো নেলাম তাই একটা ট্যাকা কম নেল''—বলেই পালাবার অছিলায় বলল,—"যাই, চা আনি।"

সত্যর আপত্তি এখানেই। যে জিনিসটা কদিন পরেই দশ-বারো টাকায় বিক্রি হবে—তারপর আরও দর নামবে—তা এত দাম দিয়ে কেনার কী দরকার? অথচ কমলাকে বললেই এমন তার দুঃখ হবে যে সে আরেক ঝামেলা।

সন্ধেবেলা চা খাওয়ার একটা আলাদা জায়গা আছে ওদের। ফালি বারান্দায় দেওয়ালে লাগানো ছোটো একটা কাঠের র‍্যাককে টেবিল করে ওখানে বসে চা খায় ওরা স্বামী-স্ত্রী। কমলা বলে, বারান্দায় বসে চা খাওয়ার মধ্যেও নাকি আরামের জীবন, নিশ্চিন্ত জীবন এরকম একটা ছবি ফোটে। ছেলেমানুষি ভাবনা ছাড়া আর কী! নিজের হায়ার সেকেণ্ডারির বিদ্যে নিয়ে ওর একটু অস্বস্তি আছে, তা-ই বলে উচ্চাশার ঘাটতি নেই, অথচ আর পড়তেও ইচ্ছুক নয়। বি. এ টা পাশ করলে একটা চাকরি-বাকরি করতে পারত। বাচ্চা তো হয়নি এখন পর্যন্ত—অনেকটাই সময় থাকে হাতে।

সত্যি বলতে কী, কমলার প্রাণপ্রাচুর্যই তো সত্যকে তাজা রাখে। কত স্বপ্ন ওর, সাজানো জীবনের স্বপ্ন, লাল গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে বেড়াবার স্বপ্ন—বেঁচে থাকাটাকে ও পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়। তাই সত্যর উন্নতি ওর ধ্যানজ্ঞান। এভাবে ভালো থাকার বীজটা যে আপিসের প্রমোশনের মধ্যেই, সেটা অল্পশিক্ষিতা হলেও ভালোই বোঝে।

তবু, অস্বীকার করতে পারছে না সত্য—আজকে কমলার অনুপস্থিতি ওকে আহত করেছে। আট ন-দিন পরে বাড়ি এল সত্য—তখনই ওর বেরতে হল। আগামীকাল গেলে হত না? তাও কিনা মানিপ্ল্যান্ট কিনতে! গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে ও কি শুধু ডালপালারই পরিচর্যা করবে!

সত্য ভাবল একটু ঘুমুবে। চা খেয়ে ক্লান্তি কাটেনি। এক টুকরো দুঃখ নীলচে মুখ করে এগিয়ে এসে বলতে লাগল—কমলা বাড়ি থাকলে তো সত্য এই অসময়ে শুতো না!

পাতলা চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে ঘুমুবার তোড়জোড় করতে গিয়ে সত্য বুঝতে পারল, কমলার মধ্যে এই যে ছটফটানি তা ওকে এগতে সাহায্য করে এটা যেমন সত্যি, তেমনি মাঝে মাঝে

ক্লান্তও করে। আমি যা আছি, বেশ আছি—মনের বিশ্রামের এই খুব সহজ অথচ দামি এই উপাদানটি তার ভাগ্যে জোটে না।

পারুল ন্যাকড়া ভিজিয়ে মানিপ্ল্যান্টের পাতা মুছছিল। এই গাছগুলোর জন্য বউদির এত মায়া পারুলকেও নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। এই গাছ রাখলে ট্যাকা হয়? পারুল ভাবে। বেশ মজা, তো, হয় নিশ্চয়ই নইলে এই যে বউদিদের ঠান্ডা আলমারি, টিপি, গোটানো ফিতের মধ্যে ভরা ঝামুর ঝুমুর গান—এসব তো অনেক দামেরই জিনিস। শহরে নতুন আসা পারুল যেটুক দেখছে সেটুকুই তার কাছে বিশাল বৈভব। বউদির আরও সব স্বপ্নের কথা সে জানেও না।

পিতলের গাছদানির মধ্যে বসানো গাছটা বের করে আনল পারুল। 'কী ঝাঁকড়া হয়েছে গাচটা, সুবুজ সুবুজ ট্যাকার কী বাহার! গাচদানিটা ভালো করে, তেঁতুল দিয়ে মাজা দরকার। এসব ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব তো তারই।'—ভাবল পারুল।

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। দাদা তো উঠছে না। বউদি যে কতক্ষণে—ভাবতে ভাবতেই দরজার ঘণ্টা বাজল। ছুট্টে এসে দরজা খুলল পারুল।

"একটু কফি কর তো, বড্ড টায়ার্ড লাগছে—"বলেই গাছসুদ্ধ পলিব্যাগটা এককোণে নামাতে গিয়ে চোখ গেল শোবার ঘরের দিকে—।

"দাদা কখন এল রে"—স্বগতোক্তির মতন প্রশ্নটা করে শোবার ঘরে ঢুকল কমলা।

"এই, সন্ধেবেলা ঘুমচ্ছে কেন?" আদুরে গলায় কথাটা বলে ঘুমন্ত সত্যর পিঠে টোকা দিল কমলা।

একটু নড়েচড়ে পাশ ফিরল সত্য। তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

স্লিভলেস ব্লাউজ আর টপনটে সত্যিই ফ্যাশনদুরস্ত লাগছে ওকে। ঝুটো মুক্তোর ঝুমকোটাও দারুণ মানিয়েছে।

"কমলা"—সত্য ডাকল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল কমলা। মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই হালকা গলায় বলল—"ওঠো—চলো ও ঘরে। গল্প শুনব এই কদিনের।"

কমলার গম্ভীর মুখ দেখেই কথাটা সত্যের মনে পড়ে গিয়েছিল। 'কমলা' নামটা নাকি বড্ড পাতি, তাই ও নামটাকে ছেঁটে 'মিলি' করেছে। যাদের সঙ্গে ও মেলামেশা করেছে (নিজেরই আগ্রহে, কিছুটা গায়ে পড়েই) তারা কেউ রিনি, কেউ রিয়া, কেউ বা অবন্তিকা। সত্যরও মনে হল এ স্মার্ট আধুনিক মেয়েটির নাম মিলিই হওয়া উচিত। কমলা নামটা সেই আলতা পরা এলেমেলো পোশাকের মেয়েকে মানাত হয়তো। তখনই খেয়াল হল যে মিলি তাকেও ভূষণবিহীন করেছে। সত্যভূষণ নয়, মিলির স্বামী এস হালদার। নামের প্রসঙ্গে শুধু সত্য। তাও উচ্চারণটা ইংরেজি ঘেঁষা করতে হবে। ওর অবশ্য কিছুই এসে যায় না তাতে। আপিসে তো পদবি ধরেই ডাকাডাকি আর আত্মীয়দের মধ্যে নাম ধরে ডাকার যাঁরা তাঁরা তো সত্য বলেই ডাকেন। কেউ কেউ অবশ্য 'সইত্য'ও বলেন। ভূষণটা নেহাতই খাতায়-কলমে। কমলা নামের চেয়েও নাকি পাতি আর গেঁয়ো নাম এই সত্যভূষণ! উচ্চারণ করতেও লজ্জা করে!

চোখেমুখে জল দিয়ে বসার ঘরে এল সত্য।

"কখন পৌঁছলে তুমি? সকালে এলে না দেখে ভাবলাম কোনোভাবে আটকে পড়েছ। ফোন তো করতে পারতে! শরীর ঠিক ছিল তো? এই কদিন?" তারপর মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল,—"বিকেলে এসে খেয়েছ তো ভালো করে?"

সত্যাকে নিরুত্তর দেখে পারুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিল কী দিয়েছে খেতে ওকে।

"সবই হয়েছে—শুধু এতদিন পরে ঘরে ফিরে দেখি ঘরণি নেই।" ক্ষুব্ধ স্বর সত্যর।

"আজকে ছাড়া সঙ্গি পেতাম না গো। আলিপুরের দিকটা মোটেই চিনি না যে।" সত্যর ক্ষোভ বুঝতে পারল মিলি। তাই আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য উচ্ছল গলায় বলল, —"দেখো—কেমন অন্যরকম মানিপ্ল্যান্ট। কেমন তিনরকম সবুজ আর হলদে দিয়ে ডিজাইন করা! আর এটুকু গাছেই এত বড়ো পাতা—বড়ো হলে কেমন হবে বল তো?"

গাছটা সত্যিই সুন্দর আর অন্যরকম। কিন্তু সত্যর মনে হল ওর জন্য মিলির অপেক্ষা থাকলে সেটা আরও বেশি সুন্দর হত। মানিপ্ল্যান্ট নিয়ে পাগলামি করে যে যাবে! এর অর্ধেক মনোযোগও সত্যর ভাগ্যে জোটে না, যদিও ও জানে মিলির ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নেই।

"পটল কিনেছ কেন এখনই। এরপর যখন দাম কমবে—তখন খেতেই চাইবে না—" সত্য বলল।

বিরক্তি দেখাল মিলি। "এতদিন বাদে বাড়ি ফিরে এরকম কেরানিমার্কা কথা বলবে না তো। একদম নয়।"

"তোমার বাবা কিন্তু কেরানিই ছিলেন মিলি। তাও নীচের দিকে।" সত্য হাসল, একটু ম্লানভাবে! গুম হয়ে গেল মিলি। বেগতিক দেখে সত্য ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে জুটের শালটা নিয়ে এল।

পিচ রঙের শালটা পেয়ে মিলির দুঃখ উধাও। "এই রংটাই তো চলছে এখন! তার মানে চুপচাপ তুমিও এসবে খোঁজ রাখো।" মিলি উজ্জ্বল হল। "লাল, নীল, সবুজ ছেড়ে এই নতুন রংটাই—"

মিলির খুশিতে একটা সবজান্তা ভাব করল সত্য। একটু কাঁধও ঝাঁকাল। আনন্দে ঝলমল করছে মিলি। চালু ফ্যাশনের খবর যখন রাখতে সত্য তবে তো আকাঙ্ক্ষিত জীবন প্রায় হাতের মুঠোয়।

টিভিতে খবর শোনার পরে গত কদিনের বাংলা কাগজ নিয়ে বসল সত্য। আর কমলা বসল সিরিয়াল দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল পারুলও। মেঝেতে, আসনপিঁড়ি হয়ে।

সত্যর মাথাটা সমানে কাজ করে চলেছে। যতই সে তাকে বিশ্রাম দিতে চায়, অনেক ছুটকো ভাবনা এসে ব্যাঘাত ঘটায়। শরীরটা এখন বেশ ক্লান্তই লাগছে—তাড়াতাড়ি শুতে পারলে ভালো হত। কিন্তু মিলি যেরকম মন ডুবিয়ে টিভি সিরিয়াল দেখছে, তাকে উঠতে বলার প্রশ্নই ওঠে না। এবারের ইনসেনটিভের চেকটা মিলিকে দিলে ওর মুখটা কেমন হবে ভেবে নিজেই খুশি হয়ে উঠল সত্য। কিন্তু পিঠের ব্যথাটা ঠিক তখনি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠাতে খুশিটাকে ধরে রাখা গেল না। আজকাল মাঝে মাঝেই এই ব্যথাটা জানান দেয়।

চেয়ারে গা এলিয়ে একটু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। হঠাৎ জেগে উঠে দেখে টিভি বন্ধ। বাথরুমে জলের শব্দ, মিলি সান্ধ্য স্নান সারছে। এরই মধ্যে ছোট্ট টেবিলে পারুল খাবার গরম করে ঢেকে রেখেছে। এখন, সত্য টের পাচ্ছে—ও বিছানা ঝেড়েঝুড়ে মশারি টাঙাচ্ছে।

"পারুল" সত্য ডাকল। "এবার খেতে বসব, ঘুম পাচ্ছে।" খাওয়াব কথায় এদিকে এল পারুল। আটা মেখে রেখেছে। একটা একটা করে গরম রুটি সেঁকে দেবে ও, এরা খেতে বসলে।

সত্য কিন্তু মনে মনে বাহবা না দিয়েও পারে না মিলিকে। তুলছে তো জীবনটাকে টেনেটুনে ওপরে। আগে তো এমন গরম গরম রুটিও জুটত না, এমন টিপটপ ঘরও ছিল না। শুধু যদি সবটুকু কৃতজ্ঞতা ওই লতিয়ে ওঠা টাকার গাছকে না দিয়ে একটুখানি সত্যর জন্যও রাখত, তাহলেই সত্যর কিছু অভাববোধ থাকত না।

মিলিকে নিয়ে মাঝে মাঝে বড়ো ভাবনা হল সত্যর। ওর ছেলেমানুষিতে বাধা দেয় না ও, কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় মাঝে মাঝেই কাবু হয়ে পড়ে। সৎপথে থেকে উপার্জন করার স্বস্তি তার নিজের থাকলেও মিলির স্বপ্ন যে আকাশছোঁয়া। এর ওর তুলনা মাঝে মাঝে দেয় মিলি। কিন্তু সত্য তো খুলে বলতে পারে না ওকে যে এদের জীবনধারায় কত ঘোলা জল!

কয়েকদিন পরে, সেদিন রবিবার, বাজার থেকে ফিরে সত্য খবরের কাগজ ওলটাচ্ছে —ফোনটা বেজে উঠল। বাড়িতে ফোন আসার পরে কমলার সেই উত্তেজনা ভুলতে পারে না সত্য। মনে হয়েছিল পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে ওর। সে কথা বলতেই মিলি বলেছিল—"মুঠোতে এলই তো, ঘরে বসে দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলব, একেই তো মুঠোয় ধরা বলে—তা-ই না?"

"হ্যালো"—সত্য ফোন ধরল।

"মিলিকে একটু ডেকে দেবেন কাইন্ডলি?" এক মহিলা সুকণ্ঠী, বললের ওপাশ থেকে।

মিলি রান্নাঘরে ছিল—এসে ফোন ধরেই উচ্ছ্বসিত।

"ও মা, কী ভাগ্য আমার—বলুন স্মিতাবউদি। ও মা—না-না, কীসের অসুবিধে?"

ওপাশের সংলাপ শোনা গেল না। এপাশে বিনয়ে গলে পড়ল কমলা।

"ছি ছি, কী যে বলেন—আপনারা কত ব্যস্ত মানুষ, আমাকে যে ডাকছেন তাতেই তো...।"

ওপাশের জন বোধহয় কিছু বললেন। কারণ মিলি বলল—"কটায় ইনোগরেশন? —আচ্ছা, ঠিক আছে।" ফোন ছেড়ে দিল সে।

"পারুল—পায়েসটা নামাতে পারবি? প্রায় হয়ে এসেছে, তলায় ধরে যায় না যেন— এই তুমি না (এটা সত্যকে) প্লিজ একটু প্যান্ট শার্ট পরে থাকবে? স্মিতাবউদি আসবেন, ওঁকে দুমিনিট বসতে বলব—নইলে খারাপ দেখায় গো।"

"কে স্মিতাবউদি? আমাকেই বা ছুটির সকালে ধরাচুড়ো পরতে হবে কেন?" সত্য জিজ্ঞেস করল।

"স্মিতাবউদি হলেন এম. এল. এ. যদু বড়ুয়ার ছোটো শালি। কী কেতাদুরস্ত, অঢেল টাকা, দুটো গাড়ি—দেখ না এলে পরে। লেডিস ক্লাবে প্রায়ই আসেন তো—ফাংশানে আমাকে গাইতে শুনেছেন—তাই কোনো অনাথ আশ্রমের ইনোগরেশনে গান গাইবার জন্য আমাকে নিয়ে যাবেন। যার গাইবার কথা ছিল সে নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

ইদানীং প্রমোশনের তাগিদে সত্য নিজেকে খুবই ব্যস্ত রাখে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি রক্তবিন্দুকে তার দায় মেটাতে হয়। কমলাকে সুখী রাখা ছাড়া আর কোনো খোঁজ ইদানীং রাখতে পারছিল না সত্যভূষণ। তাই আজকে, এই ছুটির সকালে মিলির অনুরোধ তাকে বেশ অবাক করল। বেশ স্মার্ট হতে গিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে ফেলছে না তো সে? এম. এল. এ.-এর শালি তার বাড়িতে কেন? এঁরা তো পুরোপুরি অন্য জগতের মানুষ—মিলি এসব বন্ধু জোটায় কোথা থেকে।

মিলি তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে গেছে আর হাঁকডাক করে পারুলকে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিচ্ছে। পারুল একটা কথা দুবার শুনলে বিরক্ত হচ্ছে—তার হাতে সময় নেই। এরই মধ্যে চটপট বেরল একবার। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরেও এল একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে।

সত্য কথা না বাড়িয়ে পোশাক পালটাল। ওর মুখে ফুটে ওঠা অসন্তোষ লক্ষ্য করে কমলা বলে উঠল, "এই অনাথ আশ্রম কার জানো তো? আমাদের এদিককার কাউন্সিলর অরুণদের দত্তর। এই ছুতোয় কাউন্সিলরের সঙ্গে চেনাজানা হলে কত সুবিধে বলো তো? চেনা মহলে কত দর বেড়ে যাবে?"

দর বাড়ানোর জন্য কীসের এত ব্যাকুলতা। হ্যাঁ, কমলা মোটামুটি গাইতে পারে ঠিকই—তবু একটা গান গাইলেই কী কাউন্সিলারের সঙ্গে চেনা হয়ে যাবে? সত্য কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। একবার ভাবল—ওকে কি বলে দেবে যে কথাটা ইনোগোরেশন নয়, ইনঅগারেশন।

কমলাকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এই শাড়িটা আবার কবে হল? সমুদ্র সবুজ জমিতে গাঢ় সবুজ পাড়ের সিল্ক! সত্যর মুগ্ধতা বুঝে ফেলল মিলি, সেইসঙ্গে নীরব জিজ্ঞাসাও।

"এই শাড়িটা একটু চেয়ে আনলাম মিসেস রায়ের কাছ থেকে। আমারগুলো তো দেখে দেখে সবার চোখ পচে গেছে।" সত্য হতবাক হয়ে রইল।

স্মিতাবউদি এলেন, অনেক অনুনয় করে পাঁচ মিনিটের জন্য তাঁকে ঘরে বসাল মিলি। বহু সাধ্যসাধনায় আধ চামচ পায়েস মুখে দিলেন তিনি। তারপর সত্যর সঙ্গে নেহাত মামুলি দু-একটা কথা, মিলির প্রশংসা (হয়তো স্তাবকতার গুণে) ও প্রস্থান। বেরোবার আগে মিলি বলে গেল—"একটা দেড়টার মধ্যে ফিরব।"

এত শখ করে বাজার করে আনল সত্য আর মিলি চলে গেল। ডোরাকাটা ছোটো ট্যাংরা তো ওরই ফরমায়েশি। বড়ো বেগুন পুড়িয়ে টোম্যাটো ধনেপাতা দিয়ে ভর্তা, সেটা সত্যর শখ। দুটো জিনিসেরই সদ্‌গতি হবে পারুলের হাতে।

পোশাক পরাই আছে যখন, চুলটা কেটে আসা যাক। সত্য ভাবল। এরপর আবার সাউথ বিহার, অর্থাৎ রাঁচির দিকে যাওয়া আছে—গরমটা জাঁকিয়ে পড়ার আগেই ওদিকটা সেরে আসতে হবে—নয় গরমে অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে। গত বছর সেলস্-এর একটি জুনিয়র স্টাফ হিট্ স্ট্রোক হয়ে মারাই গেল ওড়িশাতে। ব্যাচেলর ছিল—সেটাই রক্ষে, তবু বুড়ো বাবা-মা তো রয়ে গেলেন।

কোনো ভাবনা থেকে কী। সত্য উঠল। কমলা বাড়ি নেই—একা বসে থেকে কী করবে. চুল কাটা হলে একটা বড়ো কাজ হয়ে যায়।

"পারুল—বেগুন পুড়িয়ে খোসা ছাড়াস আর পেঁয়াজ টামটো ধনেপাতা কুচিয়ে রাখিস, আমি এসে রাঁধব। চুলটা কেটে আসি।"

দাদার স্বরে বিরক্তি আর গম্ভীর মুখ দেখে পারুল অবাক হলেও কিছু বলল না। সরু সরু আলু আর পেঁয়াজকুচির সঙ্গে কাঁচা লংকা চিরে গুছিয়ে রাখল ট্যাংরার ঝাল করবে বলে। এ বাড়িতে এই রান্নাটাই চলে। রান্নাঘর থেকে বারান্দার দিকে তাকাতেই পারুলের খেয়াল হল গাছে জল দেওয়া হয়নি। সব ফেলে চলে এল গাছে জল দিতে। দুটো কচুপাতা আর একটা সন্ধ্যামণি ছাড়া সবই টাকার গাছ। হলুদ পাতাগুলো বাদ দিয়ে গাছগুলোকে স্নান করিয়ে দিল সে। জেল্লা ছড়াতে লাগল তার সদ্যস্নাতা সুন্দরীর মতন।

রান্নাবান্না সেরে খাবার জায়গা দিয়ে যখন কাজ হয় শেষ তখনও একটা বাজেনি। তাই নিজের চানটাও সেরে নিল পারুল। কাচা কাপড় মেলে দিয়ে যখন চুল আঁচড়াচ্ছে— তখন বউদিকে আসতে দেখল।

বউদি বাড়ি ঢুকেই গাছের কাছে দাঁড়াল। ভাগ্যিস জল দেওয়াটা হয়ে গিয়েছিল।

"রান্না হয়ে গেছে তো?" জিজ্ঞেস করল কমলা। তারপর "এই শোন" বলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারল 'এই'-এর অনুপস্থিতি। শাড়ি বদলাতে ঘরে ঢুকে পারুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কমলা—"দাদা কোথায় গেল রে? এত বেলায়?"

বউদির প্রশ্নে সামনে এসে দাঁড়াল পারুল।

"দাদা, বইলেচে চুল কেটে এসে বিগুনভত্তা আঁধবে। তো বেলা হল, আমি এঁধে নিই?"

"রাঁধ"—বলে শাড়ি পালটে একটু বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ল কমলা। আজকের এই সমাবেশ থেকে কর্তার জন্য দুটো ভালো টিউশনি ম্যানেজ করেছে—সেটা বলার জন্য মন আঁকুপাঁকু করছে—আর তিনি চলে গেছেন চুল কাটতে। কতজনের পরে পালা আসছে কে জানে—যা ভিড় হয় রবিবারে সেলুনটায়।

সত্যর ফিরতে প্রায় দুটো বেজে যায়। মেজাজ খারাপ নিয়ে বেরিয়েছিল, স্নান না করা অবধি শরীর মন কোনোটাই সুস্থ হবে না। কমলা শুয়ে রইল যেমন ছিল। সত্য পাত্তাও দিল না। জিজ্ঞেসও করল না গানের কথা। ও যদি সত্যর সঙ্গ না চায়, যদি বাইরের বন্ধুরাই বড়ো হয়,

সত্যরই বা কী দায় ওর মান ভাঙাবার? কিন্তু বেচারা ভালোমানুষ সত্যভূষণ—ঠান্ডা জলে স্নানের পরে শরীর মন স্নিগ্ধ হতেই মিলির প্রতি ভালোবাসায় মন ভরে গেল—বিরক্তি-টিরক্তি সব ইতিহাস হয়ে গেল কয়েক মিনিটেই।

খেতে বসে মনে পড়ল বেগুনভর্তা রাঁধার কথা। ভাগ্যিস পারুল বুদ্ধি করে রেঁধে রেখেছে। নয়তো এত বেলায় ফিরে কমলাকে রাঁধতে হত।

"পারুল" খেতে খেতে ডাকল সত্য। "খুব ভালো হয়েছে বেগুনটা" খুব বেশি হল পারুল, উজ্জ্বল মুখে তাকাল কমলার দিকে।

"সত্যিই খুব ভালো হয়েছে।" হেসে সায় দিল কমলা। "এটা তো তুই আজই প্রথম রাঁধলি—তা-ই না?" খুশির হাসিতে মুখ আলো করে সরে গেল পারুল।

"কী? মাছটা কেমন? এটাই চেয়েছিলে তো"—সত্য বলল কমলাকে।

কমলা মাথা নাড়ল পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে।

"অনেক ঘুরতে হয়েছে, না পেয়ে চলে আসছি ঠিক সেই সময় একজন এসে ঝুড়ি নামাল—দাম হাঁকলে দেড়শো। শেষে অনেক দরাদরি করে..."

বাধা দিল কমলা—"তোমার আরও হাজার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে এলাম। না করো না কিন্তু। আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

দারুণ আশ্চর্য হয়ে সত্য কমলার দিকে তাকাল।

"সুপর্ণা বোসের দুই ভাইপো শুধু রবিবার তোমার কাছে পড়বে। সিক্স আর সেভেন, অঙ্ক আর ফিজিক্স। আমি বলেছি বাড়িতে এসে যদি পড়ে যেতে পারে তাহলে আমার স্বামীর মতো টিচার আপনি পাবেনই না। ঠিক বলিনি? তুমি তো এ দুটো বিষয়ই খুব খুব ভালোবাসো বলে জানি। হাজার টাকা বুঝলে? হা-জা-র। যাতায়াতের খরচ বা সময় কিছু লাগছে না।"

সত্যর মনে হল ও চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। মিলির কি মাথা খারাপ, এখনকার সিক্স আর সেভেনে এসব সাবজেক্ট পড়ানো কি সোজা কথা? বিনা চর্চায়? ট্যাংরার দমটা জানারও তো আগ্রহ দেখাল না কমলা। কথাটা শেষ করতে দিল না। সত্যর সুবিধে, অসুবিধে, আগ্রহ বা অনীহা কোনোটাই ওর কাছে ধর্তব্যের মধ্যে নয় তাহলে? সত্যকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করেনি ও। করবে না। কিছুতেই সত্য ওই টিউশনি করবে না। যতই ও ভালোবাসুক অঙ্ক আর ফিজিক্স—।

কিন্তু শেষ অবধি পারল কি সত্যভূষণ? অনেক বাধা দিয়েছিল, আপিস ট্যুর-এর মাঝে শুধুই তো রবিবার একটা ছুটির দিন।

"কিন্তু হা-জা-র টাকা। মাত্র একদিন। আরও কত কিছু করতে পারব সংসারের"— কমলার মুখের রেখায় অনুনয়। সত্য ভেবে পেল না সংসার মানেটা কী? সেটা কি শুধু দেওয়াল, শাড়ি, আসবাব, গয়না—

'কিন্তু ওই তো একটাই দিন। কত কাজ থাকে, একটু বসে বই পড়ারও তো সময় পাই না।'

"সেজন্যই তো সকাল বা সন্ধে বলিনি। রবিবারে দুপুরে তিনটে থেকে ছ'টার মধ্যে যখন তুমি বলবে, তারপর পুরো সন্ধেটা আমাদের থাকবে। সকালটাও খালি থাকবে বাজার বা অন্য দরকারি কাজের জন্য।" নিজের বুদ্ধির গর্বে জ্বলজ্বল করল মিলি। আর সত্যর মনে হল ওই সময়টা একমাত্র ওই সময়টাই নিজের একার। বই পড়া, স্মৃতি রোমন্থন অথবা কিছুই না করার বিলাসিতা।

চামচে করে চাটনি দিতে দিতে মিলি বলল—"পারুল, আজ বিকেলে সবকটা টাকাগাছ বাইরে রাখবি। মাঝে মাঝে সারারাত ঠাণ্ডা হাওয়াতে রাখতে হয়, ভোরের শিশির লাগাতে হয়—বুঝলি?"

তারপর সত্যর দিকে ফিরে বলল—"বেশ নাম দিয়েছে ও, তা-ই না? 'টাকাগাছ'!" বলে নিজেই হাসতে লাগল সত্যর দিকে তাকিয়ে।

চাটনি খাওয়ার পর সত্য আর বসে থাকতে পারছিল না। ক্লান্তি বা অবসাদ যাই হোক না কেন—শরীরটা যেন আর বইতে পারছিল না সে। মিলি অবাক হয়ে বলল—"একি, পায়েস দিচ্ছি তো, খাবে না?"

"আর কিছু খেতে পারব না, বড্ড পেট ভরে গেছে।" মুখ ধুয়ে সত্য ঘরে চলে এল। যা কোনোদিন করে না, ছুটির দিনে খেয়ে উঠেই বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল সত্যভূষণ। গলা অবধি পাতলা একটা চাদর টেনে নিয়ে। অসীম ক্লান্তিতে বসে থাকাও যেন আর সম্ভব নয়।

চাটনি পায়েস খেয়ে পারুলের খাবার দিয়ে কমলা যখন ঘরে এল তখন সত্য প্রায় গাঢ় ঘুমে ঢেকে গেছে। কিন্তু তার মুখে ঘুমের প্রশান্তির বদলে যন্ত্রণার ছাপ। সে সময় সত্য একটা স্বপ্ন দেখছিল—ভারী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

সত্য দেখছিল যে অনেক পরিশ্রমে অর্জন করা অর্থ নিয়ে সে যখন বাড়ি ঢুকছে, সে পা রাখার জায়গা পাচ্ছে না, তার জন্য কোনো অভ্যর্থনাও নেই। নিত্য তোয়াজে সুপুষ্ট মানিপ্ল্যান্টের কয়েকটা লতা তাকে পেঁচিয়ে ধরে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলছে। ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে নিঝুম রাতে বারান্দার খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেবে বলে কোনোমতে বেরিয়ে এসে দেখে সবকটা গাছই তাদের সব ডালপালাসুদ্ধু বারান্দায় ঠান্ডা হাওয়া খাবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বারান্দাতেও ওর দাঁড়াবার জায়গা নেই।

সীতাহরণ পালা

তন্বী হালদার

রাবণের বউ হল গে সীতা। না এ বাল্মিকীর রামায়ণ নাগো, না এ বাল্মিকীর রামায়ণ না। আমাদের পাড়া থেকে হাফ কিলোমিটার দূরে মেথর কোয়ার্টারটা আছে না, সেখানে ফি বছরের মতো এ বছর চৈত্র মাসের পয়সা থেকে রামযাত্রার আসর বসে। সে দলের মালিক হলগে বিধুসর্দার। সে যাত্রাপালায় রাবণ সাজে। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। কালো লোমশ তাগড়া শরীরে রাম সাজে মানায় না তাই রাবণের পার্ট করতে হয়। তিরিশ বছরকার হাড়গিলে বউটাকেই সীতা সাজতে হয়। বিধুসর্দার ওরফে রাবণের বউ সীতা। সীতা থেকে সীতু হয়েছে। কিন্তু সীতার আর বিশেষ পরিচয় নেই। বছর পাঁচেক এই দলটার সাঙ্গে আছে। গেল বছর বিধুসর্দার দুম করে তাকে বিয়ে করে সীতার আসন পাকাপাকি করে ফেলে। রাম আর লক্ষ্মণের ভূমিকায় বাদুরের দুই ছোঁড়া আছে। তারাও মাঝে মাঝে সীতার দিকে ছুক্ ছুক্ করে, কিন্তু রাবণ সাজা বিধুসর্দারের কড়া হুকুম—পালার সময়টুকু ছাড়া পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাবি তো কেটে ফেলবো এক্কেবারে। সীতু তাই মেথর কোয়ার্টারে ভাড়া নেওয়া দেড়খানা ঘরের অর্ধেকটাতেই দিনের সময় কাটায়। প্রতিদিন রান্নাও করতে হয় না। পুণ্য অর্জনের জ্বালায় কোয়ার্টারের এ ঘর, সে ঘর নিমন্ত্রণ করে। বেশির ভাগ ঘরেই খিচুড়ি খাওয়ায়। সেদিন তবে খাসির মাথার দমটা দারুণ রান্না করেছিল আচ্ছা করে ঝাল দিয়ে। রাম-সীতা-রাবণ সেজে অভিনয় করলে কী হবে, জাত বিচার নিয়ে নাক সিঁটকালে চলে না। যাযাবরী জীবন। আজ বসিরহাটে তো কাল কাকদ্বীপে। নিজেদেরও প্রতিদিন রেঁধে খাওয়া মহা ফ্যাকরা, তাই মাথামুণ্ডু যা পাওয়া যায় খেয়ে নেওয়াই ভালো।

অভিনয়ের সময় দু'খানা ন্যাকরার পুতুল দিয়ে লবকুশ বানাতে হয়। এ ব্যাপারে সীতুর মনে খুব দুঃখ। নাকি সুরে মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে অভিযোগ যে করে না তা-না। কিন্তু বিধুর সাফ উত্তর, "চুপ্, এক্কেবারে চুপ মার।" সেবার জিরাকপুরের মাঠে পালা করবার সময় এক ধন্বন্তরি কবিরাজের সন্ধান মিলেছিল সীতুর। পাড়ার এক বউ-এর সাথে চুপি চুপি দেখিয়েও এসেছিল। তা সেই কবরেজ বললে বিধুকে একটিবার আসতে হবে। সে কথা বলে সীতু সেই যে কাঁকালে লাথি খেয়েছিল তারপর রাবণের কাছে সে আর ছেলে চায়নি। তবে, সে ছেলের স্বপন দেখে। জেগে দেখে, ঘুমিয়ে দেখে। ছেলের জন্য বুকের ভিতর টাঁটায়। ন্যাকরার পুতুল নে অভিনয় করতে আর মন চায় না। লক্ষ্মণ যখন বাল্মিকীর আশ্রম থেকে লবকুশকে নিয়ে চলে যাবার অভিনয় করে, একদিন হঠাৎ করে চোখ টিপে বলেছিল, "হ্যাঁগো ভাবী কতদিন ন্যাকড়া-চোকড়া বইবো।" মনের ভিতর বড়ো কষ্ট হয়। চোখে জল আসে তবু বালিশে মুখ গুঁজে থাকতে হয়।

যখন যেখানে যায় পালা শেষে 'মালা ডাক' ওঠে। সেই সময় কত বউ-ঝি কোলের বাচ্চা নিয়ে এসে সীতার কাছে দেয়। মুখে বলে "মা এট্টু আশীর্বাদ করি দেন।" সীতা তখন নিজের অজান্তে

কেঁপে ওঠে। ইচ্ছে করে ওই একরত্তি মাংসপিণ্ড দলে পিষে একেকার করে দেয়। মনটা তার মাছ-লোভাতুর বিড়ালের মতো হাহাকার করে ওঠে। রাবণের মালা ডেকে লাভ নেই। ও মালা কেউ নেয় না। রাম আর সীতার মালার দর ওঠে সব থেকে বেশি। রাম সাজা তপন মালাকার ছেলেটাকে সীতার কিছুতেই পছন্দ হয় না, বরং লক্ষ্মণ সাজা শিবু হালদার ছেলেটা বেশ ভালো। সীতার প্রতি বেশ মায়া আছে। সে মাঝে মাঝে সীতার জন্য তেলে ভাজা, টিপের পাতা, জরির ফিতে এনে দেয়। সেও চুপি চুপি নেয়। 'মালা ডাকের' সময় রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে পাশাপাশি বসে থাকতে হয় পুরনো, ধুরধুরে জড়ির পোশাক আর রাংতায় মুড়ে। মুখ চড়চড় করে। সেই সঙ্গে ছারপোকার কামড়ে এক ঠাঁই বসে থাকা সে বড়ো যন্ত্রণার। রামের গলায় গাঁদা ফুলের মালা থাকে। সীতা ও লক্ষ্মণেরও তাই, তবে লক্ষ্মণেরটা একটু সরু। 'মালা ডাকের' সময়টা বড়ো একঘেয়েমিতে ভরা। লক্ষ্মণ ছোড়া কিছুতেই এক ঠাঁয়ে বসতে পারে না। মাঝে মাঝেই পর্দার ওপারে গিয়ে বিঁড়ি ফুঁকে আসে। রাবণ তার মোটা হেড়ে গলায় ডাক পারে, "রামের মালা দশ টাকা, দশ এক, দশ দুই, দশ তিন।" পবন হাজরা এই কোয়ার্টারের সবচেয়ে প্রবীণ মেথর। যত বড়ো গান্ধি-চেম্বারই হোক না সে সাফ করার ব্যাপারে ওস্তাদ। সেই পবন হাজরা দুম করে ডেকে দিল পঁচিশ টাকা। ব্যাপারটা জমে গেল। বিধুসর্দার নতুন করে উদ্যম পেয়ে গেল। সে বাজখাই গলায় হেঁকে উঠলো, "রামের মালা পঁচিশ টাকা, পঁ-চি-শ, পঁচিশ এক, পঁ-চি-শ দুই, পঁ-চি-শ তিন, পঁ-চি-শ চার—" না আর কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। ওদিকে ঈশাণ কোণে কালবৈশাখির কালো মেঘ করেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়ছে। এরপর সীতা আর লক্ষ্মণের মালা আছে। ঝড় বৃষ্টি এসে গেলে সব শালা ভেস্তে যাবে। তাই বিধুর মনে হল পঁচিশেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। দিশি মদের ঢেকুর তুলতে তুলতে টলমল পায়ে কাঠের তক্তা দেওয়া মঞ্চের উপর পবন হাজরা এসে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের সতরঞ্চির উপর বসে থাকা কুচো-কাচা, ধারী-মদ্দা, বুড়ো-বুড়ির দল একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো। রাম সাজা তপন মালাকার এসে নিজের গলার মালাটা পবনের গলায় পরিয়ে দেয়। বিধুসর্দার বলে উঠলো, "জোরে জোরে আর এক রাউণ্ড হাততালি দিন সকলে।" বলে নিজেই জোরে জোরে হাততালি দিল। সীতার মালা আর লক্ষ্মণের মালা যথাক্রমে দশ টাকা ও আট টাকা ডাক উঠলো। বিধু খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনে আকাশের অবস্থার কথা ভেবে ছেড়ে দিল।

সেদিন শিবু বসে এফ. এম. রেডিওটায় হিন্দি গান শুনছিল। "ভুলিভালা লেড়কি/খোল তেরি দিল্ কি।" সীতা চিতলের ডাটা কাটছে। সরষে, ঝাল দিয়ে রান্না করলে চমৎকার স্বাদ হয়। বিধুসর্দার দণ্ডির হাটে মন্দিরহাটা গ্রামের কার সঙ্গে যেন কথা বলতে গেছে। এরপরের সিজন সেখানেই তাম্বু ফেলতে চায়। তপন সকালবেলা এক মাছওয়ালার কাছ থেকে কতগুলো লটকে মাছ নিয়ে, সীতাকে দিয়ে বলে গেছে. "ভাবী জমিয়ে রাঁধো। দেবযানিতে নুন শোয়ে একটা হেভী বই দিয়েছে, সেটা মেরে আসি।" চিতলের ডাটা কাটতে কাটতে সীতুর ঝিম ধরে আসে। তখনই শিবু মানে লক্ষ্মণ বলে ওঠে, "এ্যাই সীতু গানটা শুনলে?" শিবুর মুখে নিজের নামটা শুনে সীতু যেন নিজের অজান্তে একটু কেঁপে ওঠে। সীতা ঘাড় কাত করে সায় দেয়, সে শুনেছে। শিবু এবার বলে, "মানে কী বলতো?" সীতা এবার হেসে ফেলে। হেসে হেসেই বলে, "সারাজেবনই তো অশোকবনে বন্দী থাকলুম, হিন্দি শেখা আর হল কই।" শিবু মাথা নীচু করে নখ খোটে। "আমি তোমাকে অশোকবন থেকে মুক্তি দিতে চাই।" সীতা মুখ তোলে। কেন জানে না দু'চোখ জলে ভরে যায়। শিবু আপন মনে বলে, "তুমিই বল সীতু, রামের চেহারার থেকে আমার চেহারা অনেক বেশি সোন্দর না? কিন্তু তোমার ওই রাবণ আমাদের বিধুসর্দার কিছুতেই সে পার্টে আমায় নেবে

না। শালা যে আমায় দেখতে পারে না সে আমি বুঝি। তাই আমার খুব আশা নিজে একটা দল খুলবো। এ শুধু রাম যাত্রা না। পালা করবো লায়না-মজনু, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিল্বমঙ্গল—কত প্ল্যান আমার মাথায় আছে না।" বলেই কী যেন একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। শিবুর গরম শ্বাসের সঙ্গে বিড়ির গন্ধ টের পায় সীতা। খপ্ করে সে সীতার একটা হাত চেপে ধরে। চিতলের ডাটা শুদ্ধু হাত শিবুর হাতের মুঠো থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে সীতা বলে, "ছাড়ো কেউ দেখি ফেলাবে। ও এক্ষুনি চলে আসবেনে।" শিবু আবেগে গদগদ হয়ে বলে, "তুমি আমার সঙ্গে থাকবা তো সীতু?" সীতা ভয় পেয়ে যায়। তার চোখজোড়া তিরতির করে লাফ দেয়। শিবু এবার মোক্ষম লোভ দেখায় তাকে, "তোমায় আমি জোড়া ছেলে দেব সীতু।" সীতা মুখ তোলে, "বড়ো ভয় করে, পারবো আমি।" শিবু তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে, "ব্যাস্ আর কিছু লাগবে না। কেল্লা ফতে, দাঁড়াও তোমার জন্য শোন্‌পাপড়ি কিনে আনি।" প্রায় সমবয়সী ছেলেটার ছেলেমানুষিভরা প্রাণটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে সীতু। নিজের মনেই বলে ওঠে, "পাগল এ্যাকডা।"

বিধুকে একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে সীতা—পালা শেষে যে সব মায়েরা কোলের বাচ্চাকে সীতার কাছে দিয়ে বলে "মা এট্টু আশীর্বাদ দেন" আর তার বদলে দক্ষিণা হিসাবে কলাটা, মুলোটা দেয় এ কাজ সে আর করবে না। ব্যাস্ বেঁধে গেল বিধুর সঙ্গে খিটিমিটি। এমন অবাধ্যতার জন্য বিধুর কাছে বাদশাহী থাপ্পরও খেল, কিন্তু সীতাকে টলানো গেল না।

সেদিন চৈত্র সংক্রান্তি। মেথর কোয়ার্টারের মাঠে জমজমাট গাজনের মেলা হচ্ছে। ঢাকঢোলের শব্দে জায়গাটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আগের দিন গেছে নীল-ষষ্ঠী। যারা সন্তানের মা (বিশেযত ছেলের মা) সারাদিন উপোস থেকে শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢেলে এসেছে। সীতাও কাউকে কিছু না বলে সারাদিন উপোস ছিল। তবে জল ঢালতে সে পারেনি। শিবু গোপনে সান্ত্বনা দিয়েছে, "কেঁদোনা। আর তো কটা দিন— তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাব। আলাদা দল খুলবো। তোমার কোলে সন্তান আসবে, আমি তোমারে সত্যি ভালোবাসি সীতু।" তবু সীতার মন বোঝেনি, অঝোরে সে কেঁদেই চলেছে। বিধুর উপর চাপা আক্রোশ থেকে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে সেই ঘৃণার উল্টো পিঠ তাকে টেনে নিয়ে গেছে শিবুর কাছে। শিবু তাকে রঙের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শিবুর কাছে সীতা ঘন নীল বর্ণের আশ্রয় পেয়েছে, হলুদ বর্ণের প্রশ্রয় পেয়েছে, গোলাপি রঙের ভালোবাসা পেয়েছে। শিবের মাথায় জল ঢালতে না পারার যন্ত্রণায় সে আরও বেশি করে বিধুর উপরে ক্ষেপে উঠেছে। শিবু অবশ্য চুপিচুপি বলেছে, "সীতু, গাজনের মেলার দিন শিবের মাথায় তোমার ছেলের নামে ফুল চাপাবো। ফুল যদি আপনা-আপনি খসে যায় তাহলে আমাদের আর কেউ রুখতে পারবে না।" সীতার মনে শিবুর জন্য কৃতজ্ঞতার পাহাড় জমে। গাজনের মেলার নিয়ম হচ্ছে নীল ষষ্ঠীর পরের দিন সন্ধ্যাবেলা শিবের মাথায় তিনটে চাঁপা ফুল চাপানো হয়। একটা পাড়ার কল্যাণে, দ্বিতীয়টি যে কজন সন্ন্যাসী হয় তাদের মধ্যে মূল সন্ন্যাসীর নামে, তৃতীয়টি শেষ সন্ন্যাসীর নামে। এছাড়া কেউ-কেউ ব্যক্তিগত *কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুল দিতে চায়। যেমন শিবু দিতে চায় সীতার সন্তানের কামনায়।* প্রচুর ঢাক-ঢোল কাঁসর বাজে। সন্ন্যাসীরা জল-কাদার মধ্যে বালা কাটে এবং "বাব বুড়ো শিবের চরণে, বাবা ভোলানাথের চরণে", বলে চীৎকার চেঁচামেচির কারণেই হোক, আর যে কারণেই হোক শিবের মাথায় বসানো ফুলটি খসে পড়ে যায়।

তবে সন্তান কামনায় সীতার শিবের মাথায় ফুল চাপানোর ব্যাপারটা গোপন থাকলো না। পুরোহিত ঠাকুর শিবের মাথায় ফুল চাপিয়ে ডাক দিল, "কই গো সীতা মা এদিকে এসো। বুড়ো বাবার কাছে মনের কথা খুলে বল। তবেই না ফুল পড়বে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" ব্যাস্ ব্যাপারটা আর গোপন থাকলো না। বিধু স্বকর্ণে শুনলো। সীতা ঠাকুবতলার ছাউনি, মানে যেখানে

গাজনের সন্ন্যাসীরা পিঠে কাঁটা বিঁধিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেখানে বাঁশের মাচায় উঠে যে মূল সন্ন্যাসী হরিরলুটের বাতাসা ছড়াচ্ছে, তাই সে আনতে গিয়েছিল। বিধু সেখানে থেকে সকলের সামনে হিড়হিড় করে সীতাকে টেনে নিয়ে সোজা ঘরে ঢুকিয়ে দুই গালে দুই থাপ্পর মারলো। সীতাও থাপ্পরটা হজম করতে পারলো না, সে ফোঁস করে ওঠে, "আমি বাচ্চা চাইলে তোমার এত গায়ে জ্বালা ওঠে কেন, দোষ তাহলে তোমার।" ব্যাস্ কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মতো বিধু জ্বলে ওঠে, হাতের সামনে যা পেল তাই দিয়ে সীতাকে খুব পেটালো।

সে রাতে সীতা উঠলোও না, রাঁধলোও না। তড়কা রুটি এনে বিধু, তপন, আর শিবু খেতে বসলো। শিবু অবশ্য একটার বেশি রুটি খেতে পারলো না। সীতুর জন্য মনটা বড়ো টাটাচ্ছে। তার-ই জন্য অমন করে মার খেতে হল সীতাকে। সে যদি শিবের মাথায় ফুল চাপানোর মতলবটা না করতো তাহলে মারটা খেতে হত না। বিধুরও মেজাজটা সপ্তমে চড়ে আছে। মেজাজটাকে মৌতাত দেবার জন্য পবন হাজরার গাঁজার ঠেকে গিয়ে বসলো। বলে গেল রাতে ফিরতে পারবে না। গাজনের মেলার ঝাঁপ শেষ হয়েছে। সন্ন্যাসীরা গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে মন্দির চাতালেই সব বোম্ ভোলা হয়ে পড়ে আছে। তপনেরও পাত্তা নেই, সে যে কোন্ দলের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে তা কেউ বলতে পারবে না। শুধু পাশাপাশি দুটো ঘরে সীতা আর শিবু নিজেদের যন্ত্রণায় নিজেরা গুমরে মরছে।

রাত তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সীতা নিজেকে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করায়। সে বুঝতেই পেরেছিল পাশের ঘরে শিবু ছাড়া আর কেউ নেই। সে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে শিবুর ঘরের দরজায় দাঁড় করায়। দরজাটা খোলা আছে। ল্যাম্পপোস্টের তেড়ছা আলো শিবুর শরীরের উপর পড়ায়, শিবুকে 'দ' আকৃতির মতো লাগে। সীতা ভিতরে আসে, আস্তে করে ডাক দেয়, "শিবু, এ্যাই শিবু।" শিবু ধরমর করে ওঠে, "তুমি!"

"নতুন দল খুলবে বলেছিলে না? তাহলে গুছিয়ে নাও, চল রাতের আঁধারে বিলের আলপথ ধরে আমরা হাঁটতে থাকি, স্টেশনে পৌঁছোতে ভোর হয়ে যাবে, তারপর ট্রেন ধরে নতুন কোনো দেশে—"

নাকফুল

তিতাস চৌধুরী

শামলী বসে আছে আলো আঁধারি ঘরের কিনারে, সুবলের বিছানার পাশটিতে। ভেজানো গবাক্ষ দিয়ে চিলতে চিলতে আলো এসে পড়েছে সুবলের শরীরের এখানে ওখানে। কলমি শাকের ভাঙা ডাঁটার মতো সুবল টানটান, ঝরে পড়া হলদেটে গাব পাতার মতো সুবলের শরীর। ছোট্ট মৌটুসি পাখির বেতালা নাচানাচির মতো এতটুকু প্রাণ সুবলের গলায় একটু আগেও ওঠানামা করছিল। এখন শান্ত সুবলের শরীর থেকে উঠে আসছে ঠান্ডা শীতের হাওয়া, তারই শিরশিরানি কাঁপন ধরাচ্ছে শামলীর বুকে। একগাছ কৃষ্ণচূড়ার আর্ত লালের উৎসবে শামলী ভেঙে পড়তে চায়, পথ আগলে দাঁড়ায় দূর থেকে ভেসে আসা আবছা কোলাহল। পাঁক ও মাছের অদ্ভুত উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য খাপলা হাতে একদল উদোম ছেলের দল। ও দলের মধ্যেই আছে সুবল অপুষ্ট শরীর নিয়ে, প্রবল মাছমারানির ছদ্মবেশে, আঁশটে গন্ধ গায় শামলীর আশে পাশে। ঝড়ের আগের ধোঁয়াটে নিস্তব্ধতায় যখন প্রকৃতিতে ফুটন্ত দুধের মতো আপাতশান্তের অতলে এক প্রবল বিস্ফোরণ চলে, তখন ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে পাক ধরা রেণু রেণু চুল নিয়ে শামলী একাকী হারিয়ে যেতে চায়, পথ আটকে ধরে সুবল। হয়তো একপাল গরু নিয়ে ছিপটি হাতে যে রাখাল ব্যতিব্যস্ত সে আসলে সুবলেরই অন্তরাত্মা। কালো পিছলানো শরীরে একখণ্ড কাপড় ওড়ে, ভেসে আসে সুবলের ঘ্রাণ, বাতাসের ধুলোয় উড়তে থাকে সুবলের প্রেম, শামলী থেমে যায়। ডাহুকের তৃষ্ণার্ত ডাকে, বুনো টিয়ার সবুজ ঝাঁকে শামলী দেখতে পায় উড়ন্ত সুবলকে। ছোট্টবেলা থেকে তিল তিল আশা সুবল দিয়ে গেছে শামলীর রংবেরংঙের চুড়িতে, কাঁচপোকার টিপে, সস্তা জরির শাড়িতে। ঘরবাঁধার স্বপ্ন, নিকানো উঠোনের স্বপ্ন, সন্তানজন্মের স্বপ্ন, নুনছিটানো পোড়ামাছের স্বপ্ন, চালের ওপর ঢলঢলে সবজ লাউপাতার স্বপ্নে গড়া সুবলের পাকানো শরীর। মাছরাঙার রঙে উড়ন্ত সুবলের এইসব স্বপ্নকে শামলী তার চারপাশে উড়তে দেখে। শাড়ির ফেরের মতো স্বপ্নেরা পাক পাক দিয়ে শামলীকে ঘিরে ধরে। কার্তিকে ধানের শিষের একফোঁটা দুধের মতো মনে হয় জীবনটাকে। শীতের শুরু থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ নাকে আসে, ঈশান কোণ থেকে সরে যায় মেঘের ছায়া, ঝটকা দিয়ে থেকে থেকে বয়ে যায় উত্তুরে হাওয়া। মাঠে ঢল নামে ফসলের, শেষধানের ঢল, রবিশষ্যের হলুদ ফুল, বউকথাকও-এর একটানা ডাকের মতো সুবল-শামলীর যৌবন। বেগুনি ফুলের লম্বা লম্বা পরাগধানীতে হলুদ হলুদ পরাগ চোখ মেলে শামলীকে দেখতে শিখিয়েছে সুবল। জীবনের শেষ ক'মুহূর্ত বাঁচার জন্য ডোবা থেকে তোলা পাঁকাল মাছের অনন্ত ধড়ফড়ানির ধ্বনি কান পেতে শামলীকে শুনতে শিখিয়েছে সুবল। শীতের রসের গভীর স্বচ্ছ মিষ্টতার মধ্যে পতঙ্গের স্খলিত পতনের আর্তনাদও যে কত মানবিক, সে বোধেরও জন্ম সুবলই শামলীকে দিয়েছে। নেতানো বকুল ফুলের মতো সুবল শুয়ে আছে শামলীর সামনে, শামলী ভাবে গভীর শ্লেষ্মার মতো সুবলের

এসব স্বপ্নেরা এখন কোথায়? সুবলের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদেরও মৃত্যু হয়েছে—এ বাস্তবকে শামলী মানতে পারেনা। শামলী ভাবে লুকোনো স্বপ্নেরা এখন ঘুমিয়ে আছে তার অন্তরে, তাদের উত্তরাত্মাদের অন্তরে। ঘরে গবাক্ষ দিয়ে চোখ চলে যায় দূরের সরলবর্গীয় পাহাড়রেখায়। পাহাড়ের ওপারে যে সুবল-শামলী আছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবির কথা বহুবার শামলী অবসরে ভেবেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা ছায়া ছায়া মেঘ আর ঘুমন্ত শিশিরের কান্নার কথা ভাবতে ভাবতে শামলী পাহাড়কে বড়ো আপন করে নিয়েছে। নিজের দুঃখবেদনাকে অনন্ত কুহকে সে ভাসিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের শিখরে। না বলা নিজের কথা এখনো উড়ন্ত সর্পকন্যা হয়ে ভেসে বেড়ায় দূরের পাহাড়তলির অরণ্যে। এ হেন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে শামলী দুঃখ পায়। সুবলের মৃত্যুসংবাদ জানাতে গিয়ে অজান্তেই চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে।

মৃত্যুসংবাদ পোয়াতির পেটের মতো নিজেকে জানান দেয়। দাওয়ায় রাখা বালতির জলের পাশে, চালের শুকনো খড়ের পাশে, ঘরের পেছনের ছাইগাদায় ফুচিপাখির পোকা খোঁজার পাশে, চাব দেওয়ালে অপদেবতার পরিখা গণ্ডীর পাশে, আকাশে রোহিনীনক্ষত্র উদয়ের পাশাপাশি খবর ছড়িয়ে পড়ে, সুবলের মৃত্যুর। করমচা গাছের পাশে যে হলদেটে চারাগাছে ফুল ধরেছে, রাতের আকাশে অগুনতি নক্ষত্র পতন হয় যে মাটিতে, দুপুর ফেরত তৃষ্ণার্ত সুবলের ঘামের নুনে যে মাটি উর্বর, ঘরের পেছনের ছাইগাদার সেই জমিতে অনন্ত সমাধিভূমি রচনার কথা বারবার সুবল করে গিয়েছিল। মৃত্যুর পরে সুবলের শব দাহ হবে না অথচ সুবল ঘুমিয়ে থাকবে বাবলাকাঁটা ভরা জীবন ছেড়ে, গাবের আঠার মতো থকথকে প্রণয় ছেড়ে অন্য কোনো নতুন জীবনে। যে জীবনের দিশা হাতের নাগালে অথচ তা স্পর্শের অতীত। এমন কোনো ভবিতব্যের ইঙ্গিত শামলী জীবনে কোনোদিন কল্পনা করেনি। বসন্তের পরাগে হলুদে, শীতের হিমেল রাতে, বোশেখের মাদলের তালে, ভেরেণ্ডার-স্বর্ণলতার জংলি সুবাসের মাদকতা মৃত সুবলের শরীরকে ঘিরে থাকবে? থাকবে। কিন্তু কুঁড়োজমির পাতালের কোন্ অন্ধকারে? এ এক অদ্ভুত ধন্দ, শামলীর চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। সংসারের অমঙ্গল হবে না তো? এলানো সুবলের শরীর ছেড়ে গবাক্ষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায় শামলী। সামনের বিস্তৃত বুনোজমি নিরালা, একাকী, গড়িয়ে পড়া শকুনের শবের মতো অন্ধকার। সুবলের দিকে চোখ পড়ে, শামলী কুঁকড়ে ওঠে। সুবলের দুর্গন্ধগুলো সেই কৈশোরকাল থেকে শামলী আড়াল করতে চেয়েছে। আলো আঁধারি মাচার ছায়া, টগবগে লতানো সবুজ দেখলেই যেমন কিছু মানুষ ফুলের প্রতি ঐকান্তিক টান অনুভব করে, তেমনি বেড়ে ওঠা নারীশরীর ঘিরে সুবলের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সৌরকলঙ্ক ছাপিয়ে প্রতিদিন প্রতিভাত হয় সূর্যের অকৃপণ রশ্মি, সেই রশ্মির অতলে ঘুমিয়ে থাকে কলঙ্ক। তেমনি নানা বর্ণে সুবলকে, সুবলের তীব্র আকর্ষণকে অনুভব করতে করতে শামলী স্পর্শ পেত কলঙ্কের। পাকশালের কালো দাগের মতো চিরকালই সেগুলোর সঙ্গে সহাবস্থান করেছে শামলী, কোনো অভিযোগই সুবলকে তার কাঙ্খিত অভীপ্সা থেকে সরাতে পারেনি। পুকুরপাড়ে ছিপ হাতে সে লক্ষ করত ভেজা রমণী শরীর, অন্ধকারে শামলীকে অন্য নারীরূপে কল্পনা করে সুবল পরস্ত্রীর প্রতি তীব্র আকুতি ব্যক্ত করত। প্রবল যৌবনাসক্তি থেকে নানান কাহিনি গড়ে তুলে অক্লেশে শামলীর কাছে মিথ্যাচারণ করত। ধুলোর প্রতিটি কণা কালো, শামলী প্রমাণ করার পরেও তার আস্ফালন থামত না, প্রয়োজনে সে মারধোর করতেও পিছপা হত না। অত্যধিক গরমে শরীরময় ফোস্কা নিয়ে মানুষ যেমন জলকে আশ্রয় করে তেমনি বহুবার বহু নির্যাতনের পর শামলীর আশ্রয় ছিল তার ফেলে আসা কৈশোরগৃহ। দু-একদিন সেখানে অবস্থানের পর শীতের শুরুর যাযাবর পাখির মতো সেখানে উপস্থিত হত সুবল। *বিলের আধিপত্য নিয়ে শীতের সকালের যেমন কোনো সংশয় থাকে না, তেমনি শামলীর*

অনুপস্থিতির কোনো হিসাব না নিয়ে সে শামলীকে নিয়ে রওনা হয়ে যেত গোধুমরঙা এক বিকেলে। বিকেলের সূর্যাস্তের রঙে সুবলের চোখমুখ রক্তাভ হয়ে উঠত, একচিলতে গামছায় শরীরের চকচকে কালোয় নিভে আসা আলোর খেলা চলত। শামলীকে সে চেনাত ঘরে ফেরা গরুর ক্লান্ত পদধ্বনি, গজিয়ে ওঠা ঘাসফুলের বিন্দু বিন্দু সাদা আভা, কচি ধানগাছের একটানা সবুজ ইঙ্গিতের ছবি। সুবলের এই তোলপাড় প্রাণের কাছে শামলী বারবার পরাজিত হয়েছে। ঘটে যাওয়া দগ্ধতায় শান্ত প্রলেপ লাগিয়ে রাত এসেছে। অন্ধকার ভয়াবহ হয়েছে, ঠাণ্ডা হাওয়া শরের বন থেকে, আখের খেত থেকে ভেসে এসেছে। ইতস্তত নেতিয়ে পড়া কাশফুলের মতো সুবলের বুকের দুএকটা সাদা চুল হাওয়ায় নড়ে ওঠে। শামলী ভাবে তার স্মৃতিনির্ভর এই সব পূর্বজন্মেরা কথা বলে উঠছে। শামলী ভয় পায়। পাকধরা সাদা চুল যেন তার জীবনেরই এক প্রতীক। সমস্ত কালোর অবসানে এক অমলিন শুভ্রতা। সব কালোকে, সুবলের আর তার নিজের সব অন্ধকারকে সে যেন সমাধি দিতে চলেছে তাদের ঘরের পেছনের কুঁড়োজঙ্গলে। সে সব আবর্জনাকে আজ আবার কেন উন্মোচন করতে চায় সুবল? কেন সে শেষবয়সে বারবার আজ আবার কেন উন্মোচন করতে চায় সুবল? কেন সে শেষবয়সে বারবার নির্ভার ঘুমের বাসনা করত ঘরের পেছনের ওই আমলকী ছায়াকে ঘিরে। ডেকে ওঠা তক্ষকের একাকিত্বের ছন্দে, শেষ বিকেলের পড়ে আসা আলোয় টুনটুনির ডানার একঘেয়ে ঝটপটধ্বনির মাঝে বারবার সুবল আশ্রয় চাইত, সে কী নিতান্তই শামলীর প্রেমে? না কী নিজের পরিবারের সাথে একান্ততার অনুভূতি থেকে? অথবা আরো গভীরে লুকিয়ে থাকা কোনো বাসনা, জীবনের অর্জিত সম্বল মৃত্যুব পরেও রক্ষা করার দায়িত্ব, সনাতন যখের ধ্যানধারণা সুবলের অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছিল। শামলী এ সব নানান চিন্তাব ঢেউয়ে তলিয়ে যায়, বিষণ্ণ এক ভোঁতা অনুভূতি তাকে ঘিরে ধরে। নাকের ওপর হালকা আলো খেয়ে যায়, পুরোনো পাথর থেকে তীব্র নীল বিষ ঝরে পড়ে। আনমনে খুলে ফেলে নাকের আভরণ। নেড়ে নেড়ে দেখে। গোলাপি, আশমানি, হালকা হলুদ রঙের চেকনাইয়ে ধরা আছে নানান স্মৃতি। নাকফুলকে চুম্বন করে শামলী। সুবলের নশ্বর শরীরের মতো নাকফুলকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয় কুঁড়োজঙ্গলে। জীবনে প্রথম শামলী নাকফুলহীন হয়ে অদ্ভুত শান্তি পায়। শরীর অবশ আর হালকা হয়ে আসে। মনে পড়ে না শৈশবের কোনো অতলে শরীরে নানান ছিদ্র করে সে পরে ফেলেছিল নানা আভরণ। বাস্তবের রঙ্গে ঢঙ্গে, যৌবনের খরদীপ্তিতে আভরণেরা তার সঙ্গি। তারাও তাকে সময়োচিত নানা সুষমা দান করে গেছে। এখন বার্ধক্যে ধীরে ধীরে নাকফুলহীন হয়ে নির্ভার শামলী স্মিত হেসে সুবলের অর্ধনিমীলিত চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? সুবল স্থির, জবাব দেয় না। জবাব আসে দূরের কাঠবেড়ালির কণ্ঠ থেকে। কূট কুট শব্দ করে হালকা হেসে সে উঠে যায় দূরের গাছের ডালে।

দিনের আলো ফিকে হয়ে আসে। জাফরান রঙা মেঘ ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। দূরের পাহাড়ের মাথায় শেষ সূর্যের আলো মৃতপ্রায় রোগীর বিছানায় সাদা চাদরের মতো ফ্যাকাশে হয়ে আসে। ছেলের দলের মাতামাতি আর কানে আসে না। দূরের পিচের রাস্তা নিঃসঙ্গ প্রেমিকের মতো আকাশমুখী হয়ে স্থিরভাবে পড়ে থাকে। দুচারটে মালবাহী গাড়ি খঞ্জনার গভীর ব্যস্ততা নিয়ে অতিক্রম করে যায় পারাপার। দূরের চাপাকল থেকে শহরতলির ব্যতিব্যস্ত রমণীরা নিয়ে চলে বালতি বালতি জল, নক্ষত্রপতনের আগে, দিনের শেষ রেশ কাটান দিতে। শামলী রোজকার মতো আজকেও লক্ষ করে তার চারপাশ, তার আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততিদের। হাতের ক্ষয়ে যাওয়া সাদা লাল চুড়ির মতো তার যৌবনও ক্ষয়ে গেছে। নেহাত কিছু উদ্বৃত্ত এখনো সঞ্চিত রয়েছে কাপড়ের ভাঁজের তলায়, ঢেকে রাখা বুকের গভীরে। তা না হলে এক বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে তার প্রভেদটা কোথায়? শরীরের মাতালগন্ধ পচে পচে দেশি মদের তলানিতে এসে ঠেকেছে। হাতে-পায়ে

খিল ধরেছে, চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সাদা মহুলফুলের মাদকতা কোথায়? নিঃসঙ্গ রাতে, অন্ধকার বাবলা ছায়ায় তাকে পুরুষ বলেই বোধহয়। নেতানো, ঝুলে পড়া স্তন দুখানি অনেক কালের সাক্ষী। বহুকাল আস্তাবলের চালের কালো লুণ্ঠনের মতো আলো দিয়ে দিয়ে আজ সে জীবনের থেকে ছুটি নিয়েছে। কফিনের সাদা আচ্ছাদনের মতো তেলতেলে শাড়ির ভাঁজই আজ তার আশ্রয়। কোনো চাঁদনি রাতে মাতাল পুরুষের কোনো সঙ্গ সে পাবে না। অকৃত্রিম প্রেমে, গভীর দাম্পত্যে কোনো পুরুষ তার কাছে আর আশ্রয় চাইবে না। কোনো শিশুর ক্ষুধাকে সে আর শান্ত করতে পারবে না। জীবনের কাছে আজ সে প্রলম্বিত প্রাণ মাত্র। খুশির মাদকতা থেকে, যৌবনের অতৃপ্তি থেকে, নারীর অঙ্গজ কামনা থেকে আজ সে মুক্তি পেয়েছে। শামলীর মনে হয় সামনে এখনো তার অনন্ত পথ পড়ে রয়েছে। হাইওয়ের সর্পিল বাঁকে, কালো পিচের ঘন আবরণে এখনো তার জন্য কিছু প্রেম ঘুমিয়ে আছে। সুবল নয়, অন্য কোনো পুরুষ নয়, কিন্তু এখনো এই মৃত স্বামীর শরীরের দিকে চেয়ে শামলীর মনে হয়, জীবনে প্রকৃত ভালোবাসা থেকে এখনো সে বঞ্চিত রয়েছে। কোনো প্রণয় নয়, কোনো মদিরতা নয়, কোনো নেশা নয়, অনাবিল জ্যোৎস্নায়, পুকুরের চকচকে রূপোলী জলের মতো এক ভালোবাসা এখনো তার অন্তরে ঘুমিয়ে আছে। সে ভালোবাসার পাত্র কোনো প্রেমিক পুরুষ নয়, কোনো সন্তান নয়, কোনো উত্তরসন্তান নয়। প্রকৃতিতে এক মানুষ যে বিকেলের শান্ত বিলের মতো। তার ভালোবাসা এখনো ঘন হয়ে রয়েছে শামলীর জন্য। কোনো নারীরূপী শামলী নয়, মানুষ শামলীর অপত্য ভালোবাসার আশ্রয়ে প্রকৃতিতে সন্ধ্যার আকাশ তারায় ছায়, সকালের আলোয় সে তারারা ঘুমিয়ে পড়ে নীলের অতলে। হাতের চুড়িগুলো ধীরে ধীরে খুলে ফেলে শামলী। ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে হাত দুটোকে। দুহাতের দিকে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারে স্তরে স্তরে পলি জমাট বেঁধে আছে দুহাতে। ছেলেবেলায় কোন্ কালে উজ্জ্বলা কমলা রঙের কতকগুলো চুড়ি কে পরিয়ে দিয়েছিল শামলী জানে না। তারপর থেকে জীবনের নানা রংবদল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে চুড়িব বদল। আশমানি বেলোয়ারি চুড়ি পরলে সুবল বলতো—তোমার হাতের জোয়ারে আমি ভেসে যাবো। হাসি পায় শামলীর, বাস্তবে সে কী নিজে কোনোদিন জোয়ারে ভাসতে পেরেছে না জোয়ার তুলতে পেরেছে, যে সুবলকে ভাসাবে। ওসব সুবলের চটকদারি শ্লোক। হলুদের মাঝে মাঝে সোনালি বুটি দেওয়া চুড়িতে সূর্যের আলো পড়লে সাতরঙে আলো ঠিকরাতো। শামলীর মনে হত তার হাতের ঈশারায় সূর্য পাগল। সূর্যই তার প্রেমিক পুরুষ, সাতরঙে সে শামলীকে ভরিয়ে রাখতে চায়। সুবল নয় চুড়ির আলোয় ঠিকরে পড়া সূর্যকে পেয়ে শামলীর গহন নারীসত্তা তৃপ্ত হত। এসব গোপন কথা সে কোনোদিন সুবলের আঁশটে গন্ধের অতলে তলিয়েও জানায়নি। আজ সেসব একান্ত কথাগুলো স্বামীকে না জানালে তার পাপ হবে। নারীত্বের আবরণ থেকে তার মুক্তি হবে না ভেবে নির্ভার হাতের দিকে সে তাকায়। বার্ধক্যের শেষসময়ে তার সঙ্গিনী ক্ষয়ে যাওয়া এই লাল সাদা চুড়ির সঙ্গে তার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। নিতান্তই একটা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা। জীবনের কাছে কতগুলো অধিকার, নিরাপত্তা আর মাতৃত্বের স্মৃতির মতো এই ছিল তার শেষ সম্বল। ভ্যাপসা গরমের কিছু দান আর দীর্ঘদিন রন্ধনের সাক্ষী হাতের ছিটে ছিটে পোড়া দাগগুলোকে তার আকাশের গায়ের বিন্দু বিন্দু আলোর মতো মনে হয়। জীবনের এই শেষক্ষণে এসে মনে হয় তার এই শরীর আসলে এক পোড়া কয়লা। জ্বলন্ত লাল কয়লার আঁচ যৌবনে দিনের পর দিন সে সুবলকে দিয়েছে। তার এই ঘর-সংসারের মধ্যে সে উত্তাপ প্রতিনিয়ত সে ছড়িয়ে গেছে। আজ সে তার তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা আর শান্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরের পেছনের ওই কুঁড়োজঙ্গলে হয়তো সুবলের পাশেই তার ছেলেরা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে পোড়া হিম হয়েও সে সুবলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে না। সুবলের অনন্ত ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে এক নির্ভার ঘুমহীনতা তাকে গ্রাস করেছে। আজ

এ পৃথিবীতে একাকী মানুষ হিসেবে সূর্যের আলোয় নিজের ছায়া, নিঃসঙ্গতা, হতাশার সঙ্গে সে বাস করতে চায়। আচমকা ধরে ফেলে শীতের সকালে ক্ষেত থেকে তোলা আনাজের মতো সুবলের ঠান্ডা শীর্ণ হাত। মনে হয় ঘরেলু শান্তি দিয়ে, শীতের হিম দিয়ে, নেতিয়ে পড়া পুরুষের একখণ্ড পুরুষাঙ্গ দিয়ে সুবল তাকে শান্ত করতে চাইছে। দীর্ঘজীবনের দাম্পত্য অধিকার দিয়ে সুবল তাকে ঘিরে ধরতে চাইছে আগের মতো। স্থির হয় শামলী। চারদিকে চেনা অচেনা নারীপুরুষ। বিবাহযোগ্য মেয়ের দিকে বরপক্ষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে সেভাবেই সবার চোখ শামলীর দিকে। শামলীর চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করে সে একজন মানুষ, কোনো নারী নয়, কোনো বিধবা অনাথ রমণী নয়। সংসারের শেষ প্রান্তে ঠেকে যাওয়া এক ক্ষুদ্র মানবসত্তা মাত্র। সংসারের কাছে এখনো তার অনেক হিসাবনিকাশ বাকি।

সন্ধ্যায় পাখিরা যে যার বাসায় ফিরে আসে। অন্ধকারে মাঝে সাঝে পথহারানো দুএকটা কাকের আর্ত চিৎকার মাত্র শোনা যায়। রাতপাখির ডানা সচল হয়। খড়ের চালের ওপর ঝটপট করে উড়ে বসে রাতের পেঁচা। শামলীর পুত্র-পুরুষেরা শাবল দিয়ে কুঁড়োজঙ্গল খনন করে। শাবলের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে শামলীর হৃদস্পন্দনের ধ্বনি মিলে যায়। শব দাহ হবে না পোঁতা হবে—এ সংস্কারবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে মন সায় দেয় না। ছেলেরাও সুবলের ইচ্ছেটাই মেনে নিল? ওদের আর দোষ কী? না-মানতে-মানতে এরকম কত কথাই তো সেও মেনে নিল জীবনভর। কিন্তু এই যে ভিড় করা মানুষজন? নানান রটনা কটূক্তির তীব্র বিষ এতগুলো মানুষের ফিসফিসানির ধ্বনিতে শামলী স্পষ্ট শুনতে পায়। সুবল শুয়ে থাকে ঘরের টিমটিমে আলোয়, নানা বয়সের রমণী পরিবৃত হয়ে। রমণীসঙ্গের প্রতি পুরুষদের ঐকান্তিক টানের স্বরূপ শামলী কোনোদিনই অনুধাবন করতে পারেনি। পরিণত যৌবনে বা পড়তি যৌবনেও যে কোনো পুরুষ শামলীকে টানেনি তা নয়, তবে তা ছিল ক্ষণিকের। খুঁটে বাঁধা গোরু যেমন নিজের দড়ির সীমানাকেই স্বাধীনতা বলে মনে করে, তেমনি শামলী নিজস্ব চৌহদ্দিতে কখনও কোনো পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সারা দিনের কাজের ফাঁকে সুবলের চোখের আড়ালে জঙ্গলে গজানো বুনোটমেটোর মতো সৌন্দর্য বিলিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছে সুবলের ক্লান্ত শরীরে। সুবলের নিজস্ব, একরোখা, দানাদার প্রেমের সঙ্গে দেহমিলনের মাঝে পছন্দের পুরুষের গন্ধ খুঁজেছে, কিন্তু তা সাময়িক। মুহূর্তেই মিলিয়ে গেছে সুবলে, কারণ শৈশব থেকেই সে তার সহচর, স্বামী, রক্ষক। সুবলের সমাধির গর্ত রাতের গাঢ় আঁধারের ছন্দে ছন্দে আরও গভীর হতে থাকে। স্তূপীকৃত মাটি, ভাঙা চুড়ির টুকরো, শামুকের খোলা, ছেঁড়া প্লাস্টিকের খন্ডাংশ জমা হতে থাকে। স্তূপাকার আবর্জনায় গবাক্ষ ঢেকে যায়। আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, চরাচরের শান্ত হাওয়া থেমে যায়। রাতের চেয়েও গাঢ় এক গভীর অন্ধকার শামলীর অন্তরাত্মাকে ঢেকে দেয়। জন্মানো প্রথম সন্তানের মতো মায়াময় মনে হয় সুবলের শরীরটাকে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সুবলের ঘনকালো শরীর আরও কোনো কালোর অতলে চিরতরে সমাহিত হবে ভাবতেই শামলীর গলার কাছে প্রথম কান্নার দানা আটকে আসে। ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকে সুবলের নিষ্প্রাণ শরীরে। ঘোলাটে চোখে সুবল চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জ্বলন্ত উত্তাপে দুক্রোশ পথ হেঁটে এসে সুবল মালসাভরা ভাত মুহূর্তে শেষ করে দিত। বর্ষার রাতে উন্মুক্ত জলের সঙ্গে প্রবল নৃত্যে সুবল মেতে যেত, সকালের আলোয় গামছাভরা মাছ নিয়ে সগর্বে সে দেখা দিত। জঙ্গলের মোরগের টুকটুকে লাল ঝুঁটি ধরে এক একদিন সন্ধ্যায় সুবল ঘরে ফিরত। তারপর প্রবল উৎসাহে লাল আগুনে তাকে সেঁকে নুন মরিচের পর্ব চলত। শামলীর দেখা পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে লোভী আর আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ সুবল। এসব খুঁটিনাটি অকাজের পাশাপাশি সে ক্ষেতখামারে প্রতি ফসল পর্বে জনমজুর হিসেবে খাটত। সংসার প্রতিপালন করে

সামান্য বসতজমি কিনে মাথা গোঁজার এই আশ্রয়টুকু সে একান্ত নিজের পরিশ্রমেই করেছে। এ সব তার পুরুষসত্তার এক প্রকৃতি। আর অন্য প্রকৃতিতে রয়েছে লোভ, নিজেকে দমন না করার অদম্য ইচ্ছা। স্বার্থসংলগ্ন যে কোনো অন্যায় কাজে তার প্রশ্রয় চিকের আড়াল থেকে শামলী দিনদিন নিরীক্ষণ করে গেছে। এখন সুবলের শরীরে হাত রেখে শামলীর অন্তর থেকে এই সব দৈনন্দিন কথা উঁকি দিয়ে যায়। সুবলের শরীর থেকে ভেজা কচুরিপানার স্পর্শ শামলী অনুভব করে। ছেলেরা খননকাজ প্রায় সমাধা করে ফেলে। সন্ধ্যার তারারা মাথার ওপর উঠে আসে একটা জীবনের সমাপ্তি দেখার জন্য। ঠান্ডা জলে সুবলের শরীর ধুইয়ে দেওয়া হয়। শরীরের ময়লা কাপড় খুলে ধপধপে সাদা কাপড়ে সুবলকে ঢেকে দেওয়া হয়। বেশবাসের এই পরিবর্তনে সুবলকে ভারী অদ্ভুত দেখায়। পুকুরের অনেক গভীরে যে সব শাপলারা ফুটে আছে, তাদের প্রতি ঘরের বউদের যে আকর্ষণ তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে সুবল শামলীর কাছে। মনে পড়ে না বিয়ের রাত, মনে পড়ে না বাপ শ্বশুরের চেনা মুখ, মনে পড়ে না গোঁফ ওঠা সদ্যতরুণ সুবলের কালো শরীর, মনে পড়ে না প্রথম দাম্পত্যকলহ, মনে পড়ে না সাদা কাপড় পরা সুবল। নোংরা একখণ্ড তেনা পরবার জন্যই সুবলের জন্ম। এ হেন সুবল সাদা কাপড় পরা পৃথিবীর বাইরের—একজন মানুষ, বড়ো অচেনা ঠেকে শামলীর কাছে। চিরাচরিত রীতিকে প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা শামলীর নেই, তা না হলে এক টানে সে সুবলের শরীর থেকে সাদা কাপড় সরিয়ে দিত। পাকানো শরীর ধরে পুত্রেরা সুবলকে নিয়ে চলে গর্তের সামনে। শামলী দাঁড়িয়ে থাকে তার অন্ধকার গবাক্ষে। সুবলবিহীন বিছানা, আর ঘরখানাকে বড়ো ভাঙাচোরা লাগে। ক্রমশ সুবলকে মাটিতে শোয়ানো হয়, ফুল জল ছিটানো হয়। প্রথাবহির্ভূত শবদাফনে পুরোহিত আসে না। সুবলের আত্মীয়পরিজনেরাই তারা অন্তিমযাত্রার সঙ্গি হল। অন্ধকার মাটিতে প্রলেপ সুবলের ওপর ঢেকে দেওয়া হয়। এ সব ঘটনা ঘটে শামলীর অলক্ষ্যে। সাক্ষী থাকে করমচা গাছ, রাতের পেঁচা আর অগুনতি মিটমিটে নক্ষত্র। পরের দিন ভোরে ঘরামি আসে। যত্ন করে সুবলের সমাধি নিকিয়ে দেয়। ঠিক উত্তরের যে কোণে সুবল মাথা রেখে অন্ধকার পৃথিবীর অতল নিরীক্ষণ করছে সেখানে একটা মাটির বেদি তৈরি করে। সমাধির চারকোণে বাঁশের খুঁটি পুঁতে দরমার চালা লাগিয়ে দেয়। স্বর্গের দেবালয় কুঁড়োজমিতে নেমে আসে। মাটির বেদির ওপর শামলীর নিজের হাতে বানানো তারার ফুলের নক্সা করা লাল ঝালরের আসন বিছিয়ে দেওয়া হয়। সে আসনের ওপর স্টিলের রেকাবিতে মিষ্টি আর গেলাসে দুধ রেখে দেওয়া হয়। ছেলেরা ধূপ প্রদীপের সব বন্দোবস্ত করে বাবাকে মরণোত্তর অমরতা দান করে। অচঞ্চল শামলী সুবলবিহীন প্রথমভোরের বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নেয়। কুঁড়োজমির দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে সুবলের সমাধিমন্দির। মনে হয় জীবনে এ তার দ্বিতীয় বন্ধন। ধীর পায়ে এগিয়ে চলে সমাধিমন্দিরের দিকে। নীচু হয়ে খুঁজতে থাকে কুঁড়োজমির জঞ্জালে নিজের ফেলে দেওয়া নাকফুল। জীবনে সুবলের দেওয়া প্রথম স্মৃতির রোশনাই দেখতে তার বড়ো ইচ্ছে করে। সূর্যের সঙ্গে তাল রেখে মনে হয় পুরোনো পাথর নানা বর্ণের রং বিলিয়ে যাচ্ছে। শামলী অবশ শরীরে কুঁড়োজঞ্জালে নাকফুল খুঁজতে থাকে।

নীড়ভ্রষ্ট

পুষ্পলতা দেবী

আঘাতটা যতক্ষণ সহনের সীমার মধ্যে থাকে, ধ্বনিতে, ভাষাতে মানুষ ততক্ষণ তাহাকে অসহনীয় বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থই সে যখন সেই অসহনীয়তার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ রাখিয়া দেয় না— রাখিয়া দেয় আপনার নিষ্ঠুর ছাপটা আহতের চোখে মুখে।

পঙ্কজ যে দিন শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতর পদটা ত্যাগ করিল, সে দিন ক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গ তীব্রকণ্ঠে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো আপনার যথাসর্বস্ব সাধারণের হিতকল্পে দান করিয়া রিক্ত হস্তে পণ্ডিচারী আশ্রমে চলিয়া গেল, সে দিন মর্মাহত সুহৃদ-মণ্ডলীর মুখে আর একটিও বাণী ফুটিল না,— শুধু বর্ষার দিনে ঘোলাটে আকাশের মতো নিষ্ঠুর বেদনার একটা গ্লানিমা সকলকে যেন ঢাকিয়া রাখিল।

ইহাই হইল পঙ্কজের হেঁয়ালীভরা জীবনের প্রথম আরম্ভ। কিন্তু এই আরম্ভেরও একটা সূচনা আছে,— সপ্তমীতে পূজা হইলেও প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হয়। চৌধুরীরা বংশানুক্রমে বড়োলোক। সেই বংশের শেষে পুরুষ পঙ্কজের পিতা প্রশান্ত। জন্মগ্রহণের পূর্ব হইতেই ভাণ্ডার যাহাদের ভোগের নিমিত্ত পূর্ণ থাকে, সৌভাগ্যের সহিত দুর্ভাগ্যও তাহাদের জীবনের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে। বনেদী বংশের ছেলে প্রশান্তও তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। বরঞ্চ অন্তরের উচ্চতা, চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এই উভয়বিধ জিনিসই চাঁদের আলোক-দীপ্তি ও ছায়ার অন্ধকারের মতো তাঁহার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইহার একটা কারণও ছিল। শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া প্রশান্ত বিধবা দিদির অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনের তুলনায় আদরের পরিমাপটা প্রশান্তের ভাগ্যে বেশি পরিমাণেই জুটিত। কিন্তু-অতি জিনিসটা কখনই ভালো ফল দিতে পারে না, তাহার উদাহরণ অনেক আছে। প্রশান্তর বেলা তাহার অভাবও হইল না। তখন প্রশান্ত ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। কথাটা প্রতিমার কানে উঠিল,— বিশ্বাস হইল না। শত্রুরা হিংসা করিয়াই বলিয়াছে।

যাহারা কথাটা বলিয়াছিল, প্রশান্তর কোপ-দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল! ছল-ছুতার অভাব হইল না, দিদির দরবারে অভিযোগ রুজু হইল, বিদায়ের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। বুদ্ধিমানরা বুঝিতে পারিল, চৌধুরী সংসারে স্থায়িত্ব লাভ করিতে হইলে কোন্ পথটা অবলম্বন করিতে হইবে?

কিন্তু মৃগ যেমন কস্তুরীর গন্ধ লুকাইতে পারে না, প্রশান্তর ব্যাপারটা তেমনই চাপা পড়িয়াও গুপ্ত রহিল না— প্রশান্তর জন্যই।

সে দিন প্রতিমা কনিষ্ঠের পড়িবার ঘরটায় কী একটা প্রয়োজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এটা-ওটা নাড়িতে-চাড়িতে অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে মেয়েলি হাতের লেখা একখানি পত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আতর-মাখা রঙিন কাগজে আড়ম্বরপূর্ণ প্রণয়-সম্ভাষণটাও ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার খামখানি ছিল না। তাই প্রতিমা পত্রখানি যে কাহার উদ্দেশে লিখিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রশান্ত জবাবদিহি করিলেন, নব বিবাহিত বন্দুর পত্নীর লিখিত পত্র তিনি কাড়িয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্নেহের দুলাল, কনিষ্ঠের কথাটা প্রতিমা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্নেহই মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসী করিয়া তুলে। মাসকয়েক পূর্বে প্রশান্ত বন্ধুর বিবাহ বলিয়া প্রতিমার কাছ হইতে এক জোড়া ব্রেসলেট আদায় করিয়াছিলেন। আপনার নির্মল অন্তরখানির পানে চাহিয়াই যে প্রতিমা প্রশান্তর বিচার করিতে বসিতেন!

প্রতিমা অবশেষে ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। নিজের না-পরা হিরা-মুক্তার গহনাগুলা ভ্রাতৃবধূর অঙ্গে পরাইয়া তিনি নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিলেন। মা যে মৃত্যুকালে শান্তকে তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন।

নূতন জীবন, তীব্র মাদকদ্রব্যের মতো প্রশান্তকে কিছুদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। প্রতিমা নিঃশ্বাস ফেলিলেন,— দুঃখ নহে, আরামে। দুষ্টগ্রহ কাটিয়াছে বোধ করিয়া। প্রশান্তও সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিদির স্নেহ মমতা-ভরা বুকখানিকে স্ফীত করিয়া তুলিলেন। গভীর আনন্দে প্রতিমা ক্ষণেকের জন্য কনিষ্ঠের মাথাটা আপনার বুকে চাপিয়া ধরিলেন, দুই চোখে তাঁহার আনন্দের অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

গৃহের সুখ পুরাতন হইয়া আসিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত স্বাধীনতাও পাইয়াছিলেন। সুতরাং এবার তিনি গভীর জলের মাছ হইলেন।

শরতের নির্মল আকাশ হইতে বজ্র বাহির হয়। একদিন সকালে দেওয়ান শ্যামাচরণ আসিয়া মূলচাঁদ জহুরীর গহনার তালিকাখানি দিদি-রানির সম্মুখে দাখিল করিল। কিছু না বুঝিতে পারিয়া প্রতিমা সে খানি তুলিয়া লইলেন। তালিকার নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যার পানে চাহিয়া সহসা তাঁহার বিশাল নেত্র বিস্ফারিত হইল— ভীতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এত গহনার ক্রেতা কে?"

উত্তর হইল, "খোকাবাবু।"

প্রতিমার আর বাক্‌স্ফূরণ হইল না। তিনি পাষাণ প্রতিমার মতোই স্তম্ভিত-ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শুধু অন্ন-জল নহে, চন্দ্র-সূর্যের মুখদেখা অবধি বন্ধ করিয়া প্রতিমা শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বধূ রমা ভীত হইল; প্রশান্তও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রুদ্ধ কপাটগাত্রে আঘাতের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল; চোখের জলে ভাসিয়া প্রশান্ত পুনঃ পুনঃ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, অনেক শপথ-বাণীর সহিত মিনতি চলিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বিফল হইল, প্রতিমা দরজা খুলিলেন না। অবশেষে প্রশান্ত জানাইলেন, না খাইয়া তিনি আজ সারা দিন দাঁড়াইয়া আছেন, দিদি কপাট না খুলিলে তিনি অন্ন গ্রহণও করিবেন না। এবার প্রতিমার আসন টলিল। আর কী তিনি রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? শান্ত তাঁহলে অনাহারে! সারাদিনের বন্ধ দুয়ার সেই মুহূর্তে মুক্ত হইয়া গেল। প্রশান্ত দিদির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

গম্ভীর মুখে প্রতিমা কহিলেন,— "শান্ত, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।"

প্রশান্ত কহিলেন,— "তা হলে আমরাও যাব, দিদি-ভাই।" প্রশান্তর অন্তরটাও বোধ- হয় একটা পরিবর্তন চাহিতেছিল।

প্রতিমা চমকিয়া উঠিলেন। উপস্থিত বুদ্ধি একটা সৎপরামর্শ দিল— প্রশান্তর এ মোহ কাটাইতে হইলে এখান হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই সুপরামর্শ। এত দূরে তাহাকে লইয়া সরিয়া যাইতে হইবে, যেখানে এই সর্বনাশা সংসর্গের অতি ক্ষীণ প্রভাবও পতিত হইতে পারিবে না।

কনিষ্ঠের হাতখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে প্রতিমা কহিলেন,— "শান্ত, যাবি ভাই আমার সঙ্গে?"

অপরাধটা যখন অপরাধীর নিজের স্কন্ধে বোঝার মতো ভারী হইয়া চাপ দেয়, কৃত- কর্মের অনুশোচনা তখনই জাগিয়া উঠিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনকে অধীর করিয়া তুলে। আর সেই সন্ধিক্ষণের শুভ মুহূর্তে ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন থাকে, নিপুণ পরিচালকের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া সে জীবনের স্রোতটা ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হয়। দুর্বল মন লতার মতো একটা সুদৃঢ় অবলম্বন প্রার্থনা করিয়া থাকে; যাহাকে জড়াইয়া সে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে। প্রশান্ত সম্মত হইল।

প্রতিমা কহিলেন,— "এই দণ্ডেই যেতে হবে।"

প্রশান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার কক্ষের চারিপাশে দৃষ্টিপাতের পর দিদির মুখের পানে তাকাইলেন,— কৃষ্ণ, প্রোজ্জ্বল নেত্র-তারকা তুলিয়া প্রতিমা স্থির-দৃষ্টিতে সহোদরের পানে চাহিয়াছিলেন। প্রশান্ত আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মতিজ্ঞাপনের চিহ্নস্বরূপ মাথাটা এক পাশে হেলিল।

* * * * *

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে উচ্ছৃঙ্খলার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে স্বাস্থ্যের পরিণাম কী হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রভাতচন্দ্রের মতো ভ্রাতার দীপ্তিহারা মুখের পানে চাহিয়া প্রতিমা শঙ্কিত-চিত্তে পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলায় বাসা বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘুণধরা গাছে যেমন হাজার জল ঢালিলেও রক্ষা করা যায় না, তেমনই ঘুণধরা দেহ-মনকে হাজার যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না। প্রতিমা সব বুঝিতেন! ভ্রাতৃবধূ রমার সরলতা-ভরা মুখখানির পানে চাহিলেই তাঁহার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিত। দেবতার পায়ে প্রার্থনা করিতেন, "ঠাকুর, আমার যদি এতটুকু পুণ্য থাকে, একদিনও যদি তোমায় প্রাণ দিয়ে ডেকে থাকি, তবে তার পরিবর্তে আমি স্বর্গ-মোক্ষ কিছুই চাই না, ইষ্টদেবতা! শুধু রমার সিঁথের সিঁদুরটুকু উজ্জ্বল রেখো তুমি।"

দেবতা দয়াময়। একান্ত প্রার্থনা তিনি নিষ্ফল করিতে পারেন না। রমার সীমান্তে সিঁদুরের রেখাটা তিনি উজ্জ্বল রাখিলেন। অন্নপূর্ণা তাহাকে আপনার পায়ে স্থান দিলেন। সেবার অন্নকূটের পর কাশীতে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

রমার শেষকৃত্যটুকু সারিয়া আসিয়া প্রশান্ত করিলেন,— "আর কেন দিদি ভাই! ফেরা যাক।"

প্রথম আঘাতটা জীবনে বড়ো দুঃসহ হইয়াই অনুভূত হয়। প্রশান্তের অস্বাভাবিক শান্ত ও নির্বিকার মুখের পানে চাহিলেই উহা বেশ বুঝা যাইত। ভূমিকম্প থামিয়া যাওয়ার পর চূড়াহীন মন্দিরের মতোই তাঁহাকে দেখাইতেছিল।

জীবনে যাঁহারা যত বেশি আঘাত পাইয়া থাকেন, সহিবার শক্তিটা তত বেশি পরিমাণেই তাঁহাদের বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানুষের স্বভাবই এই। প্রতিমা নীরবে কনিষ্ঠের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

দিদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া প্রশান্ত পড়িয়াছিল; বিয়োগান্তদৃশ্যপূর্ণ অতীত আজ এই শোকাহত চিত্তের উপর আপনার অমোঘ আধিপত্য দেখাইতেছিল। দিদির এই কোলটুকুতে শোয়া লইয়া শৈশবে কত দিন কত মান অভিমানের পালা অভিনীত হইয়াছে! শরীরের এতটুকু অসুস্থতা বোধ হইলে এই কোলের মাঝেই প্রশান্তর সারাটা দিন কাটিয়া যাইত। দিদি বকিতেন, নামাইতে চেষ্টা করিতেন,— আবার দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া চুমাতে চুমাতে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই আনন্দ-চঞ্চলতাভরা সুখের শৈশব অতর্কিতে কখন সরিয়া গেল; বাল্য আসিল; দুরন্তপনার আর অন্ত রহিল না। তাহাও সরিয়া গেল,— কৈশোর দেখা দিল, তাহার শেষ সীমা হইতে তিনি একটু একটু করিয়া দিদির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। তাঁহার আলাদা ঘর, স্বতন্ত্র বিছানা।

লোকজন সবই দিদি নিজস্ব করিয়া তাঁহাকে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। আশ্রিত অনুগতের উপর একটু একটু করিয়া প্রভুত্ব সঞ্চয়ও তিনি করিতে লাগিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার লইয়া যৌবনে দেখা দিল, দিদির কাছে আসিবার সাহস তাঁহার লুপ্ত হইয়া গেল। একটা মস্ত জমিদারীর মালিক তিনি, তাঁহার নামের স্বাক্ষরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, ইহা ক্রমে তিনি বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যে দিন দিদি তাঁহাকে সর্বপ্রকার অনাচারের মধ্য হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া আসিলেন, সে দিন সমস্ত অন্তরখানি দিয়া প্রশান্তও যে যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবনের একটা পৃষ্ঠা উলটাইয়া দিবেন! একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত পাশ ফিরিলেন।

প্রতিমা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন,— "শান্ত!"

প্রশান্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। প্রতিমা কহিলে,— "কোথা যেতে চাস? বাড়ি?"

প্রশান্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। সেখানে যে অনেক প্রলোভনের ফাঁদ পাতা আছে! দুর্বল চিত্তকে তিনি বিশ্বাস করেন না। রমার কাছে আর তাঁহাকে অপরাধী হইতে হইবে না, ইহাই যে তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশান্ত কহিলেন,— "না।"

প্রতিমা স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন,— "তবে কোথা যাবি, ভাই?"

প্রশান্তর শূন্য দৃষ্টি অস্তগামিনী দিবার শেষ আলোকরেখার প্রতি নিবদ্ধ ছিল; সেখান হইতে দৃষ্টিটাকে সরাইয়া, দিদির কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া কহিলেন,— "না, দিদি ভাই, আর কোথাও যাব না।"

* * * * *

দেবতার দুয়ারে তাহার জন্য যখন প্রতিমার মাথা খোঁড়ার অন্ত ছিল না, মানতেরও সংখ্যা ছিল না, তখন সে আসে নাই। যখন আসিল, তখন সম্পূর্ণ অনাহূত হইয়াই দেখা দিল। তাই তাহার আগমনে প্রতিমার ওষ্ঠে হাসি ফুটিল না। মন তাঁহার কুণ্ঠিত হইল। নিজেকে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন,— শিশু দেবতা!

প্রতিমা এবার অতি সতর্কতার সহিত পঙ্কজকে লইয়া দূরে দূরে ফিরিতেন— আত্মীয়দের কাছে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। জীবন-ভরা দুঃখের মধ্য দিয়া প্রতিমা সংসারের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রৌঢ়বেলায় ভ্রাতুষ্পুত্র পঙ্কজের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা পঙ্কজকে শিখাইতেন, জন্ম অধিকারে প্রাপ্যটার যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে পরিণামে ক্ষতিকর দুর্ভাগ্যকেই বরণ করিতে হয়। বুঝাইতেন, মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে কর্মের উপর। অনেক জমা আছে বলিয়া অনেক খরচের অধিকারী হওয়া মহা পাপ।

উর্বর ভূমিতে বীজনিক্ষেপের মতো পঙ্কজের শিক্ষা সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য পঙ্কজ য়ুরোপ যাইতে চাহিল। বিনা প্রতিবাদে প্রতিমা সম্মতি দিলেন। জীবন ভরিয়া তিনি একে একে যাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিতে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে অসময়ে ফাঁকি দিয়া সরিয়া গিয়াছে। তাই পঙ্কজ যখন আসিয়া সুদূর সাগরপারে গোটাকয়েক বছর কাটাইয়া আসিবার প্রস্তাব করিল, নিষেধের বাণী তখন প্রতিমার ওষ্ঠে ফুটিতে পারিল না।

অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত— ইউনিভার্সিটি হইতে প্রাপ্ত উচ্চ উপাধি-প্রাপ্তির সংবাদ পঙ্কজ যখন তার যোগে পিসিমার নিকট প্রেরণ করিত, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রতিভার গৌরব প্রতিমা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আপনার ব্যথা, আনন্দ সবই আপনার ভাঙ্গা বুকখানির মধ্যে চাপিবার শক্তিটুকু প্রতিমা নিয়ত অন্তর্যামীর পায়ে ভিক্ষা করিতেন।

পঙ্কজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। জগতে তাহার একটিমাত্র স্নেহচ্ছায়াশীতল আশ্রয় ছিল। দুই হাতে সে প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিল, শিশুর মতো পঙ্কজ প্রতিমার বুকের উপর মাথাটা রাখিয়া আনন্দের অশ্রুতে তাহা ভাসাইয়া দিল।

প্রতিমা বেশি কথা কহিতেন না, আস্তে আস্তে শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের গাত্রে নিবিড় স্নেহভরা আপনার কোমল হাতখানা বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

না খুঁজিলেও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। অযাচিত হইয়া প্রতিমাকে পরামর্শ দিল, এইবার ভাইপোর বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরবাসী করো।

প্রতিমার তরফ হইতে উৎসাহ ত দূরের কথা, মুখের একটা উত্তর অবধি আসিল না; তা বলিয়া উৎসাহের অভাব হইল না। পাঁচজন পঙ্কজের বিবাহের সম্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু প্রতিমার উদাসীনতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিস্মিত আত্মীয়বর্গ পঙ্কজের কাছে অনুযোগ করিল। উচ্চহাসিতে পঙ্কজ কহিল— নিজে খেতে পাই না, শঙ্করাকে দেবো কোথা হতে? লোক অবাক হইয়া গেল। কতবড়ো জমিদারীর মালিক না পঙ্কজ। আত্মীয়রা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিল। আত্মীয়তার দাবি লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, অভিমান করিয়া পরের মতো তাহারা সরিয়া গেল।

পঙ্কজের একটা পেটের সংস্থান এইবার যাহা হইল,— সেটাকে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পঙ্কজ নিজে অবধি পারিল না। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের যে উচ্চ পদটায় সে বসিবার অধিকার পাইল, তাহার বেতনের সংখ্যায় চারিটা অঙ্কপাত করিতে হয়।

প্রজাপতির দৌরাত্ম্য এইবার তাহার উপর আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। তনুহীন দেবতাটিও বোধ করি এই অবসরে পঙ্কজের উপর একটা অলক্ষ্য শরনিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে পঙ্কজের এক প্রতিবাদী যখন তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিতে করিতে বয়সের প্রভেদ ভুলিয়া অথবা অন্তঃপুরের তাড়নায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় পঙ্কজের পায়ের উপর হাত দিলেন, তখন পঙ্কজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। কথাটাকে হাসিয়া উড়াইবার শক্তিও তাহার ফুরাইয়া গেল। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে পঙ্কজ তাঁহাকে পিসিমার কাছে যাইতে অনুরোধ করিল।

উমাপদ জানাইলেন,— তাহাই করা হইয়াছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি নির্বাক্।

পঙ্কজ নিজেকে মনে মনে অত্যন্ত বিপন্ন জ্ঞান করিল, রীতার কমনীয় মুখখানির উপর অজ্ঞাতে যে একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে, ইহা সে প্রথম অনুভব করিল। উমাপদকে আশ্বাস দিল— কথাটা সে নিজেই পাড়িবে। ভদ্রলোক তখনকার মতো প্রফুল্ল মুখে গৃহে ফিরিলেন।

আহার করিতে করিতে পঙ্কজ একসময় হাসিয়া কহিল,— "তোমার হাতের রান্না না খেলে পেটই ভরে না, পিসিমা! যা অভ্যেস ক'রে দিচ্ছ।"

একটু হাসিয়া প্রতিমা কহিলেন,— "আমি ত সব রাঁধি না। দু'একখানা যা—"

বাধা দিয়া পঙ্কজ কহিল,— "ওই দু'একখানাতেই ত মাটি ক'রে দিয়েছ, পিসিমা। আর যদি কাউকে শেখাতে—" পঙ্কজ আশা করিয়াছিল,— তাহার এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হইবে না, পিসিমা বিবাহের কথা পাড়িবেন; কিন্তু পিসিমা তাহার ধার দিয়াও গেলেন না। মৃদু হাস্যে প্রতিমা কহিলেন,— "অভ্যাসটা কোনো কিছু নয় রে! যখন যেমন।"

পঙ্কজ হতাশ হইল; কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল,— "হাঁ, ভালো কথা পিসিমা! আজ যে উমাপদ বাবু এসেছিলেন। সে এক মহা কাণ্ড বাপু।"

পিসিমা নীরব। ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিহিত মহা কাণ্ডটা যে কী, তাহা অবধি জিজ্ঞাসা করিলেন না, তথাপি পঙ্কজ নিরস্ত হইল না। বিপরীত স্রোতের মুখ হইতে নৌকাখানা ঘুরাইয়া লইবার জন্য মাঝি যেমন করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার সমস্ত শক্তিটুকু হস্তস্থিত হালখানার উপর সুকৌশলে প্রয়োগ করে, পঙ্কজ তেমনই করিয়া আপনার মনের সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করিয়া বলিয়া চলিল, — "উমাপদ বাবু বললেন, এবার ত চাকরি-বাকরি কর্চ্ছ— গরীবের দায় তোমাকেই উদ্ধার কর্ত্তে হবে! হ্যাঁ পিসিমা, রীতাকে তুমি দেখেছ?"

পঙ্কজ যে মেয়েটির নাম অবধি জানে, তাহাও পিসিমাকে জানাইয়া দিল। প্রতিমার মুখে কিন্তু উৎসাহ বা উদ্বেগের কোনো চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। ঈষৎ আনত মুখে তিনি কহিলেন,— "হাঁ, রোজ যে আমায় ফুল দিয়ে যায়।"

পঙ্কজ হাসিয়া উঠিল। "ও হরি! এর মধ্যে সে তোমার ফুল যোগাতে আরম্ভ করেছে। কৈ, আমার চোখে ত তা একদিনও পড়েনি।" যাহার প্রভাবটা নষ্ট করিবার জন্য দ্রুতকণ্ঠে পঙ্কজ এতগুলো কথা বলিয়া গেল, যৌবন-সুলভ সেই দুষ্ট লজ্জাটা কিন্তু তাহার আরক্ত আভা পঙ্কজের সুগৌর মুখখানির উপর বুলাইয়া দিতে ভুলিল না। প্রতিমার দৃষ্টির কাছেও তাহা চাপা রহিল না।

পঙ্কজের আহার শেষ হইয়া আসিয়াছিল। "পান আনি" বলিয়া প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল।

* * * * *

পঙ্কজ উমাপদকে জানাইয়া দিল,— বিবাহে সে সম্মত।

দুই হাত তুলিয়া আন্তরিক লক্ষ আশীর্বাদ করিতে করিতে উমাপদ মহা উৎসাহে বাহির হইয়া গেলেন।

ভিতরে আসিয়া পঙ্কজ প্রতিমাকে সংবাদটা দিল,— অনেকক্ষণ একটা উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিমা মুখ তুলিলেন না; কথা কহিলেন না; নীরবে শুধু তরকারিগুলা যেমন খণ্ড বিখণ্ড করিতেছিলেন, তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন।

পঙ্কজের যৌবনস্ফীত মুখখানা একটা নিগূঢ় অভিমানের ব্যাথায় ভরিয়া উঠিল। কুণ্ঠিত-চরণে, নিঃশব্দে সে আপনার পড়িবার ঘরখানিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। ইটালি দেশ হইতে পঙ্কজ পিতার একখানি ফটো অয়েলপেন্টিং করাইয়া আনিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ সেই চিত্রের পানে চাহিতেই দুই চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। পিতৃ-অভাবের দুঃখ জীবনে এই প্রথম ত্রিশ বৎসর বয়সে অনুভূত হইল।

একটা নিষ্ফল আবেদন পঙ্কজের সারা অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া সেই চিত্রখানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রিতে আহারের স্থানে প্রতিমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পঙ্কজ আসনের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল "পিসিমা কোথা?"

দাসী উত্তর করিল, "জ্বর হয়েছে! শুয়ে আছেন।"

আসনে আর বসা হইল না। উদ্বিগ্ন-মুখে পঙ্কজ প্রতিমার কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

কক্ষের আলো নিভানো ছিল। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক শয্যায়, মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঙ্কজ নিঃশব্দচরণে বিছানায় বসিল, পিসিমার কপালে হাত দিল।

প্রতিমা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। চমকিয়া হাঁকিলেন, "শান্ত!"

পঙ্কজ কহিল,— "আমি, পিসিমা। অসুখ করেছে তোমার?"

প্রতিমা আর কোনো কথা কহিলেন না। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পঙ্কজ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। আস্তে আস্তে কহিল,— "ডাক্তারকে ফোন করি?"

তেমনই অবস্থায় থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন,— "না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পঙ্কজ ডাকিল,— "পিসিমা!"

প্রতিমা কহিলেন,— "বাবা!"

প্রতিমার বুকের উপর হাতখানা রাখিয়া পঙ্কজ কহিল,— "আমাকে এমন ক'রে তুমি দূরে ঠেলেছ কেন, পিসিমা?"

প্রতিমার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি দেখা দিল। পঙ্কজের কোলের উপর আপনার মাথাটা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,— "তোকে কী আমি দূরে ঠেলতে পারি, যাদু! তুই যে আমার শান্তর দেওয়া ধন, বাবা।"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,— "তবে?"

"তবে? সে আর কী শুনবি, বাবা। তোর পিসিমার দুঃখের বোঝা একটুখানি নেড়ে দেখতে গেলে সারা জীবনটা তোর দুঃখে যে ভরে উঠবে, সোনা আমার! তাই যত আঘাত এই বুকখানাতেই সয়ে নিয়েছি। আমার শেষের সঙ্গে যেন এরও শেষ হয়ে যায়।"

পঙ্কজ কিছু বুঝিতে পারিল না। কী যেন একটা অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হইবার উৎকট আগ্রহে তাহার সারা বুক খানা ভরিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,— "সুখ হোক, দুঃখ হোক, আমার ন্যায্য পাওনা হতে আমায় বঞ্চিত করো না, পিসিমা।"

প্রতিমা কহিলেন,— "ভয়াবহ ভূমিকম্পটা যতক্ষণ পৃথিবীর তলায় ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ জগতের মঙ্গল।"

"তা হোক, পিসিমা। তুমি ত এটুকুও জানো, চিরদিন সে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না; একদিন তাকে জাগতেই হবে, সে আছে এই প্রমাণ কর্ত্তে। সেই জন্যই মানুষ আগে হতে তাকে চিন্‌তে শেখে তার হাত হতে নিজেকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবে ব'লে।"

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিলেন। যে ধ্বংসকারী হলাহলকে তিনি আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে এই স্নেহ-নিধিটিকে দিবেন?

পঙ্কজ আবার ডাকিল, "পিসিমা—"

প্রতিমা ব্যাকুল-দৃষ্টিতে পঙ্কজের মুখের পানে চাহিলেন। প্রশান্তর হারানো মুখখানি যেন অনুক্ষণ পঙ্কজের মুখের মাঝে ধরা দিতেছে। ত্রস্তকণ্ঠে পিসিমা কহিলেন,— "কেমন ক'রে তোর আশা আনন্দভরা বুকখানা চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দেব, বাবা!"

দৃঢ়কণ্ঠে পঙ্কজ কহিল, "ভাঙ্গাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাই হোক্। ভগবানের ইচ্ছার প্রতিরোধ করবার শক্তি মানুষের নেই। তার চেষ্টা শুধু বাতুলতা!"

প্রতিমা কহিলেন, "তা জানি; কিন্তু মানতে পারি কী? সত্য হলেও অপ্রিয় ব'লে আমরা পদে পদে অনেক কিছু গোপন কর্ত্তেই চাই— ব্যথার হাত হতে রক্ষা পাব ব'লে।"

অধীরকণ্ঠে পঙ্কজ কহিল,— "দু'দিন পার বটে, কিন্তু চিরদিন পার না। সে শুধু সত্য বলেই যে একদিন ব্যক্ত হবে। তাকে বৃথা গোপন করার দুঃখ এমন ক'রে তুমি একা ভোগ কর কেন, পিসিমা?"

"কেন করি?—" একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতিমা চোখ বুজিলেন, সেই মুদিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণেক পরে প্রতিমা চোখ চাহিলেন। তিনি যেন এই কয় মুহূর্ত ধরিয়া অন্তরের মাঝে ডুবিয়া অতীতের ছবিখানিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার পর যখন কথা কহিলেন, তখন মনে হইল, এ যেন প্রতিমার কণ্ঠস্বর নহে। সেই সংযত বাণী, উচ্ছ্বাসবিহীন একান্ত শান্ত কণ্ঠস্বর নহে। কঠোর অপরাধে সঙ্কুচিতা নারীর মিনতিভরা কণ্ঠের অনুনয়পূর্ণ বাণী বিচারকের কাছে দয়া-ভিক্ষার মতো।

প্রতিমা কহিলেন, "তোর বাপকে, আমার শান্তকে তুই অভিসম্পাত করিস নি, পঙ্কজ। তাকে হারিয়ে তার কাছ হতে পাওয়া ব'লে তার প্রতিকৃতি তুই। তোকে বুকে জড়িয়ে আমি বেঁচেছিলুম, বাবা।"

অশরীরী আত্মার আগমনে ভয়ার্ত মানুষের দেহ-মন যেমন কণ্টকিত হইয়া উঠে, পঙ্কজের দেহ-মন যেন তেমনই একটা আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মাথার চুলগুলা অবধি সোজা হইয়া

উঠিল। বিস্ফারিত-নেত্রে সে শুধু কহিল, "বল।"

যন্ত্র-চালিতের মতো প্রতিমা কহিলেন, "অতি জিনিসটা ভালো ফল দিতে পারে না। শান্তর জীবনে তার অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। আমার অত্যধিক আদর-স্নেহই তাকে অমন দ্রুতভাবে অধঃপতনের চরম সীমায় ঠেলে দিয়েছিল, বাবা। তা ব'লে দিদির প্রতি ভালোবাসার তার অভাব হয় নি, বাবা। বুঝতে পাল্লুম, যে ঘূর্ণাবর্ত্তে সে পড়েছে, সেখান হতে উদ্ধারের একমাত্র পথ— তাকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে পালান।"

"তাই পালালুম। ভাই আমার একটা আপত্তি অবধি তুল্লে না। রমাকে নিয়ে, শান্তকে নিয়ে, আমি অনেক দেশ ঘুরলুম; পঙ্কজ, তখন তোর আগমনই আমার একান্ত প্রার্থনা হয়েছিল।"

প্রতিমা উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিলেন। পঙ্কজের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "পঙ্কজ, যাদু আমার! ধন আমার! মানিক আমার! ভগবান সে দিন তোকে দিলেন না যদি, তবে কেন এ পথ দিয়ে দিলেন?" প্রতিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পঙ্কজের মনে হইল, রবিকরালোকিত উজ্জ্বল সৌধচূড়া হইতে তাহাকে যেন অতল অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইতেছে। অসহায়ভাবে সে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আপনার মুঠাটায় আপনি চাপিয়া ধরিল। না জানি কোন্ কঠোর সত্য তাহাকে ধূম্র হইতে ধুলা করিয়া দিবে।

প্রতিমা কহিলেন, "অকালে যে ফুটে, অকালেই তারে শুকাতে হবে। তাই ঠাকুরের কাছে শান্তর আয়ু ভিক্ষা করতে পাত্তুম না। চাইতুম রমার এয়োত, তা পেলুম,— ভাগ্যমানী আমার কপাল-ভরা সিঁদুর নিয়ে চ'লে গেল। শান্ত যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বুঝলুম, এ পরিবর্তন তার সইবে না, তবু কথা কইতে পাত্তুম না। রমার শোকে তার দুর্বল বুকখানা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাবার দিন শান্ত আমার হাত দুখানা চেপে ধল্লে, একটা ভিক্ষা চাইলে, না বল্‌তে পাল্লুম না। যত বড়ো বজ্র হোক, বুক পেতে নেব স্বীকার কল্লুম! শান্ত তোর কথা বল্‌লে। তুই আমার রমার কোলে না এলেও তুই শান্তর ছেলে! শান্ত আকুল-মিনতিতে বল্লে, "সে অস্থানে তাকে রেখ না! অনাচারে উৎপত্তি হলেও আমার দ্বারা আনীত ব'লে তার মানুষ হওয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। দিদি-ভাই, শিশু- দেবতা।' আরও বল্লে কি জানিস্? বল্লে, 'দিদি-ভাই' এইবার অনেক বোঝা-পড়ার সময় হয়ে এল, যতটা পারি, বোঝাটা হাল্কা করবার চেষ্টা কর্চ্ছি। বল্‌তে বল্‌তে সে বসে উঠল, এক ঝলক তাজা রক্ত বেলয়ারের পটটায় তুলে দিয়ে বল্লে, 'দিদি-ভাই' আমার সব কর্ত্তব্য তুমি নিয়ে আমায় ছুটি দাও, আমি আর পারছি না।"

"তোকে আনালুম— যে ঠিকানা সে দিয়ে গিয়েছিল, সেখান হতে। তখন তুই দেড় বছরের। দেশ হতে অনেকগুলা বছর বাইরে কাটিয়েছিলুম, কেউ বুঝতে পাল্লে না, তুই রমার কোলে এসেছিলি কি না। সে সন্দেহ অবধি কোনো দিন কারু মাঝে জাগে নি। তবু ভয়, ভাবনা, আতঙ্ক আমায় দেশে থাকতে দিত না। আত্মীয়বর্গের ত্রিসীমা মন আমার মাড়াতে চাইত না। সকল জান্‌ত, শান্তর শোকেই আমি বাড়িতে থাক্‌তে পারি না; দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।"

চোখের সম্মুখে মুহূর্তে যদি কক্ষটা উল্টাইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ করি, পঙ্কজ এমন করিয়া অভিভূত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিমা কহিলেন, "আমার সবখানি অন্তর জুড়ে আজ তুই বসেছিস্। শান্তর বংশধর ব'লে তোকেই প্রতিষ্ঠা করেছি। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, রূপ সব দিক দিয়েই তুই চৌধুরী-বংশ উজ্জ্বল করেছিস। কিন্তু এমনই দুর্বল এই মন, এমন ক'রে এ আপনার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে আছে, কিছুতেই একে আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, বাবা। চৌধুরী-বংশের চৌদ্দপুরুষ তোর হাতের জল পাবে, ভাবতে গা আমার শিউরে উঠে।"

বহুধা

বনানী দাস

॥ এক ॥

আনু আড়চোখে একবার নতুন ছেলেটিকে দেখে। অন্যরা শ্রীনন্দের জন্মদিনে কী দেওয়া যায় সেইসব বলছে। প্রীতম ওদের মধ্যে ডাকাবুকো।

আনু প্রীতমের কনুই টেনে বলল, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না!'

'ও হ্যাঁ।' প্রীতম সোজা হয়, 'এ হল বুবুন। ভালো নাম সুপ্রকাশ। অবশ্য ওটা বলার দরকার নেই। বুবুন বললেই চলবে। এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রথম এসেছে। হিস্ট্রি ফার্স্ট ইয়ার এম এ।' বলেই বুবুনকে বলে, 'ঠিক আছে? কাফি?'

বুবুন দুদিকে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'কাফি'। আনুর দিকে হেসে বলল, 'তোমার নাম অন্যপূর্বা তো! আমি তোমার কথা শুনেছি।'

আনু ভুবনভোলানো (প্রীতমের মতে) হাসি ছড়িয়ে বলল, 'আমাকে সবাই আনুই বলে। আর 'তুমি' বলবি না প্লীজ!'

প্রীতম বলছে, 'শ্রীনন্দ খ্যাপাকে একটা দম দেওয়া জোকার পুতুল দেব। পোদ্দার মার্কেটে পাওয়া যাবে। একশো দেড়শোর মধ্যে হয়ে যাবে।'

জয়ন্ত প্রস্তাব দিল, 'যদি এক প্যাকেট দারুণ মিল্ক চকোলেট দেওয়া যায়! আমি জানিস তো বাপের জন্মেও একটা গোটা চকোলেট খাইনি। ব্যাটাচ্ছেলে একদিন খাক।'

'ধ্যাত! সিনু কী বাচ্চা নাকি! চকোলেট, পুতুল-যত্ত সব। এমনি দিস আলাদা ব্যাপার। জন্মদিনে একটা সিরিয়াস কিছু না দিলে... ধর বই টই,' পৃথা তেড়ে বলতে থাকে।

মুখ দিয়ে আফশোষের শব্দ, প্রীতম বলে, 'ওঃ হো! বই তো আর পালাচ্ছে না। আজকাল সবকিছু অত গুরুগম্ভীর করার রেওয়াজটাই উঠে যাচ্ছে।'

'সেটা কথা নয়। তবু সব কিছুর একটা...' পৃথা নিজের পয়েন্টে নাছোড়বান্দা।

আনু নীচু গলায় বুবুনকে বলল, 'জন্মদিন ব্যাপারটা কিন্তু অন্য অনেক অনুষ্ঠানের থেকে আলাদা বল্!'

বুবুনের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। 'মতলব? মানে কীরকম বলছ!'

আনু ফিক্ করে হেসে বলল, 'আবার 'তুমি'! বলেছি না 'তুই'! বলতে চাইছি কোনো ধর্মীয় দায়বদ্ধতা নেই। তিথি নক্ষত্র নেই। বেশ মনের ইচ্ছে মতো করা যায়। ধানদুব্বো, পায়েস, মোমবাতি, কেক, সব মিলে মিশে এক।'

প্রবাসী বুবুন মন দিয়ে আনুর কথা বোঝবার চেষ্টা করে। চপল মেয়েটির মধ্য থেকে শিখার মতো যেন অন্য আনু।

'অনুষ্ঠান যদি এরকম দায়হীন, নির্মল হয় তবেই সুন্দর বল্!' আনু যেন একটা উত্তর শুনতে চায়।
বুবুন তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে। আনু একটু হতাশ হয়।
ওদের মধ্যে কিছুতেই মনের মিল হচ্ছে না। শ্রীনন্দকে কী দেওয়া হবে তা নিয়ে ছোটোখাটো তর্ক বেঁধে যাচ্ছে।
আনু হাত তুলে বলল, 'আমি সিনুকে একটা মালা দেব।'
সকলে হইহই করে হেসে উঠল। জয়ন্ত বলল, 'গলায় দিবি নাকি!'
'নিশ্চয়ই। সুন্দর একটা বর্ষার সাদা ফুলের মালা সিনুর গলায় দিয়ে দেব।'
বাদল শেষের সরু একটা তীর হাওয়া যেন দলটার মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ল। হিউম্যানিটিজ্ বিল্ডিং-এর হেলানো ছায়া পড়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে থাকা লহর-এর গাঢ় জলে। জয়ন্ত ছুট ফট করে বলল, 'উঃ আনুটা... সত্যি মাথাতেও আসে!'
বুবুন একটু অবাক হয়ে হাসছিল। আনু হঠাৎ বলল. 'বাঃ তোর হাতের পাঞ্জাটাতো বেশ বড়ো। ছাতিও., বেশ চওড়া... ঠিক আছে চলবে!'
বুবুনের বিস্ময়ে ঠোঁট ফাঁক, 'চলবে!'
প্রীতম হাত জোর করে বলল, 'আনু প্লীজ ওকে ছেড়ে দে। প্রথম দিন অত বোর করিস না।'
'ও মা! বোর করলাম নাকি!' আনু মিষ্টি হেসে বুবুনকে ইঙ্গিত করে 'চল্ বটগাছতলায় বসি। এরা যা সব ছাঁইপাশ বকছে।'
বুবুন বাধ্য হয়েই আনুর পাশে পাশে হাঁটে। লাল পথের নুড়ি, তাল বেতাল জোলো হাওয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেয়ে, সর্বকিছুকেই তার অচিন দুর্বোধ্য লাগে। আনু ততক্ষণে জন্মদিনের আনুষ্ঠানিকতার প্রসঙ্গে ফিরে গেছে। খই এর মতো ছড়িয়ে ফুটে উঠছে তার কথা।

॥ দুই ॥

'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' চুড়ি উঠেছে এবার পুজোয়। একটাই চুড়ি, প্যাঁচানো প্যাঁচানো। ন'বছরের আনু বারান্দার রেলিং-এ পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আনুর হাতে চুড়ি। হলুদ, ফিরোজা, নীল রিং টিং চুড়ি। কাঠের গেট খুলে ঢুকছে ব্যাট হাতে সৌরভ। আনুর হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি আকর্ষণের সমাহার তাতে, আনু ভাবে।
'এ্যাই বুম্বা কই রে!' সৌরভ বলছে।
আনু চুড়ি পরা হাত তুলে ডান গালটা একটু চুলকোয়।
'দাদা নেই তো। জান না জামশেদপুর চলে গেছে মা বাবার সঙ্গে। এখন থেকে খালি আম্মা আর আমি এখানে থাকব।'
আনু ঠাকুমাকে আম্মা বলে। সৌরভ ব্যাট কাঁধে ফেলে বলে, 'বুম্বার কাছে তো আমার 'বাঘের দেশে' বইটা আছে।'
'গরমের ছুটিতে এলে নিয়ে নিও' আনু ঝুপ করে রেলিং থেকে নামতেই চুড়ির টুন টুন আওয়াজ পায়। সৌরভের দিকে তাকায়। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে পিক্সি। সাদা লোমঅলা পিক্সিকে কোলে নিয়ে আনুর দিকে একবারও না তাকিয়ে সৌরভ দৌড় লাগায়, 'আনু, আম্মাকে বলে দিস। পিক্সুকে আমি দৌড় করাতে নিয়ে গেলাম।'
আনু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুখ ভ্যাংচায়। ঘরে যেতে যেতে ডাকে 'আম্মা! আম্মা গো!'
আম্মা পেছনের গাছে জল দিচ্ছে। আনুর পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'অত দৌড়য় নাকি! বড়ো হচ্ছ না! মিনু মাসিকে বলব এরপর থেকে তোমার জামা বানালে বুকে বড়ো বড়ো কুচি লাগিয়ে দেবে।'
চোখ মাটির দিকে নেমে যায় আনুর। সরে সরে আসে। 'বড্ড বুক চিতিয়ে হাঁটি আমি!' মায়ের আয়নায় কুঁজো আরও কুঁজো হয়ে আগেকার সমতল আনু হবার চেষ্টা করে। বিছানা থেকে আস্তে

তুলে নেয় 'টুনটুনির বই'। উপেন্দ্রকিশোরের পাখপাখালি, জন্তুর বই বগলদাবা করে কেমন ঘোরের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। ছাদে পা দেবার আগে চিৎকার করে 'আম্মা আমি ছাদে আছি'।

বলেই ছুঁড়ে দেয় টুনটুনির বই। যার পাতা উল্টে বেরিয়ে যায় 'আনুবেটীকে বাবা'। আনু দৌড়য়। দৌড়য় দুহাত মেলে। ছাদের টানা হাওয়ায় সে মিশিয়ে দেয় শব্দ বাবা...আ... বাবা...আ। হাতের নীল, ফিরোজা, হলুদ চুড়িতে বাজে রিন্, টিন্ টিন্।।

॥ তিন ॥

পর পর দুটো ক্লাস ছিল এস. এমের। আনুর হাই উঠছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল শেষ বেঞ্চে হরিপদ। খাতা বই গুছোচ্ছে।

আনু হরিপদর কাছে গেল।

'সেকেন্ড লেকচারটার নোট নিয়েছিস?'

হরিপদ একটু সম্মানিত হল। আনু ওর কাছে এসেছে। বলল, 'কিছু কিছু নিয়েছি।'

'পরে খাতাটা দিস তো!' আনু হরিপদর পাশে বসে। 'আজ বাড়ি যাবি হরি!'

'যেতে পারতাম। কাল তো মোটে একটা ক্লাশ। কিন্তু আমাকে প্রচুর নোট করতে হবে। এ হপ্তায় যাওয়া হবেই না।'

'তুই বেশ সিন্সিয়ার। তোর গাঁয়ের নাম যেন কী?' আনু হরিপদর খাতার মলাটে মীরাবাঈ-এর ছবি দেখে। আজও মোটা ক্যালেন্ডারের পুরনো পাতা দিয়ে মলাট দেয় ও। কে যেন মীরাবাঈ-এর মোঁচ এঁকে দিয়ে তলায় লিখে দিয়েছে দম্ মারো দম্।

'গ্রামের নাম মুলটি। সিঙ্গী নেমে যেতে হয়।'

'জানি। আলপথে সাড়ে তিন কিলোমিটার। হরি একবার তোদের গাঁয়ে যাব' আনু হরিপদর সঙ্গে কথা হলেই গ্রামের ছোটো ছোটো নানা টুকরো দেখতে থাকে তার বই-এ. শরীরে।

'ওমা বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখটা অত বড়ো করেছিস! ময়লা জমে না!'

'নিয়মিত পরিষ্কার করি। আমার পিসতুতো দাদারটা আরও বড়ো। কলকাতায় প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে প্রায় পাঁচ বছর' হরিপদ যে কোনোভাবেই একটি আলাদা ধরনের মানুষ হয়েই থাকে। তার মুকের লকেটের যদিও লোকনাথ নেই, আছেন বিবেকানন্দ ও হলুদ পাগড়ি।

'তুই রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য নাকি?'

'রামকৃষ্ণ মিশনের নয়, তবে আমি বিবেকানন্দের ভক্ত। ওই একজনকেই তো অনুসরণ করা যায়। উনি তো আসলে সমাজসংস্কারক।'

আনু তীক্ষ্ণভাবে হরিপদকে দেখে। 'অনুসরণ করা যায় মানে কী হরি! একদল সংসারত্যাগী যুবককে নিয়ে মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেভাবে বিবেকানন্দ সমাজ সেবায় নামতেন আজকের যুবকদের পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব? এসবের প্রাসঙ্গিকতাই বা আজ কোথায়। সেবার নামে হাজারটা প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাবসা ফেঁদে বসেছে!'

'ওসব প্রতিষ্ঠান বাদ দে। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা নেই বলতে পারিস না। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের মানুষের কাছে জানালেন কে?' হরিপদ যেন তুরুপের তাসটা বার করে।

'তুই কতটুকু হিন্দুধর্ম পালন করিস হরি! কজনই বা করে। করলে সিডিউল কাস্ট হিসাবে তোকে সংরক্ষণ না দিয়ে অস্পৃশ্য হিসেবে সুযোগ সুবিধা সব কেড়ে নেওয়া হত। বিবেকানন্দও তা ঠেকাতে পারতেন না, পারেন নি।' আনুর গলা একটু চড়ে যায়। দু-তিনজন চারপাশে এসে গেছে।

'একজন মানুষ তো সমাজটাকে একেবারে চেঞ্জ কর দিতে পারেন না!'

'বিবেকানন্দ একা চেঞ্জ করবেন কেন? তাঁর সঙ্গে তো লোক ছিল। তাদের তিনি কাজে লাগালেন কোথায়। সমাজে আজও ধর্মের গোঁড়ামি, হানাহানি লেগে আছে। এখনও কী আমরা বিবেকানন্দের

দু চারটে বাণী আর তেজোদৃপ্ত কাজকর্মকেই অন্ধভাবে ভক্তি করে যাব? নাকি সমস্যাগুলোকে অন্য দিক থেকেও বোঝবার চেষ্টা করব?'

হরিপদর প্রেস্টিজ প্রায় যায় যায়। সে যথেষ্ট গাম্ভীর্য এনে বলল, 'এইসব লোকেদের এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। উনি ছিলেন সপ্তর্ষীর এক ঋষি। আজও হাজার হাজার ভক্ত তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে। ওনার জীবন সংযমের প্রতীক। অখন্ড বীর্য্যসত্বা।'

কথার মোড় ঘুরে যাওয়ায় আনু হঠাৎ বলে ফেলে 'কী সত্বা!' হরিপদ কেমন লজ্জায় বেগুনী হয়ে যায়। আনু হাসি চেপে বলে 'ওটা অনুসরণ করাও কিন্তু খুব কঠিন বল্!' পৃথা আনুকে পিঠে একটা চিমটি কাটে। আনু চট করে প্রসঙ্গ বদলিয়ে বলে 'তোর বউদির সোয়েটারটা পাল্টেছিস হরি! সেই যে বললি নীল রং পছন্দ হয়নি!'

'হ্যাঁ গত হপ্তাতেই বদলিয়েছি' হরিপদ স্বাভাবিক হতে চায়।

'কী রং নিলি'?

'গোলাপি।'

॥ চার ॥

পূজো প্যান্ডেল। ক্লাশ নাইনের আনু। দাঁড়িয়ে কচি কলাপাতা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে। ঠাকুমা এবার পূজোতে শাড়ি দিয়েছে। স্কুলে শাড়ি পরতে পারে আর এমনি পারবে না! আনু দাঁড়িয়ে একা। ঢাক প্রচন্ড বাজছে। ধুনোর ধোঁয়ায় মা দুর্গার মুখটা আবছা। বাবাদের পূজো বলে এখানে মস্তানদের ভিড় নেই! ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকেই আসছেন। চলে যাচ্ছেন। অনেকে দাঁড়িয়ে পূজো দেখছেন।

বাপীদা, আনুর ভেতরে যেন বিদ্যুৎ চলে যায়। বাপীদা কোথাও এলে অন্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, আবার বাপীদার দিকেও দেখা যায় না। শুধু বুকে কী একটা দুড়মুড় করে ভাঙ্গে। গত সরস্বতী পূজোর ভাসানের দিন থেকে এই এক অদ্ভুত অনুভব হয়েছে তার। সন্ধে সন্ধে মা সরস্বতীকে ঠেলায় বসিয়ে পাড়ার বিশাল গ্রুপটা যাচ্ছে বিসর্জনে। ঢাক ঢোল, নৃত্য সবই আছে। পেছনে মেয়েদের গ্রুপে কাঁচা কুল নুন দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছিল আনুও। হঠাৎ সারা শহরে লোডশেডিং। তখন শুধু একটা হ্যাচাক সম্বল করে কচি কাঁচাদের শোভাযাত্রা। এভাবে অন্ধকার হয়ে যাবে জানলে হয়ত আম্মা ভাসানে আসতেই দিত না। পাশের বাড়ির মেয়ে চারবছরের রিংকুর হাত শক্ত করে ধরে আনু অন্ধকারেই হন্‌হন্ করে হাঁটছিল। ওর বয়সী অন্য মেয়েরা কৈশোরের সেই প্রথম অন্ধকারে কেমন কলকল ফিসফিস করে উঠছিল। আনু ছিল চুপ। সংবেদন ছিল তার ভেতরে। প্রথমে আশঙ্কা ভয় জড়তা হয়ে তার ভেতরে জেগে উঠছিল বেপরোয়া এক মেয়ে। বাঁহাতের নুনটুকু ঝেরে ফেলে শেষ কুলটা হঠাৎ কচ্‌কচ্ করে মুখে ফেলে চিবিয়ে ছিল সে। মুখ ভরে গেছিল টকে। আঁধার-আচ্ছন্ন মেয়েদের দল ছাপিয়ে তার দৃষ্টি ছুটেছিল হ্যাচাক বহনকারী সামনের দলটার দিকে। তখনই চোখ দেখেছিল বাপীদাকে। বাপীদা নেতা। সবাইকে সামলে হাঁটছে সামনে। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন। সবাই বলে ভালো ছেলে। বাবা নেই। মাকে দেখবে বাপীদা। পাড়ার পূজোয়, পরোপকারে সবার আগে। সবসময় কেমন বিনীত ভাব কিন্তু কী এক কঠিন বলয় ঘিরে থাকে তাকে। টকজল ভর্ত্তি মুখ আনুর বালিকা উর্ত্তীন যৌব-ঢেউ তার বলয়ে হঠাৎ আছড়ে পড়ে। পাড় ভাঙ্গতে থাকে বুকে। মাটি থেকে মাটিতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ আনুকে বার বার ঝাঁকুনি দেয়। মা সরস্বতী বাঁই বাঁই করে ঘুরে চিৎ হয়ে পড়ে যায় ডোবার জলে। শূন্য ঢাক নিয়ে ফিরতি দলটা একটু চুপ হয়ে যায়। আসছে বছর... ইত্যাদির মধ্যে আনু বাড়ি ফেরে এক নতুন ধুক পুকুনি বুকে নিয়ে। তারপর থেকে আরও থেমে যাওয়া। চোখের পাতা ভরে কাজল বাপীদার জন্য, শাড়ির খসখস, চুলের ফুরফুর বাপীদার অনুপস্থিত উপস্থিতির জন্য। যে বাপীদার সঙ্গে কথা বলার ভাষা আনু জানেনা। সে সেতার বাজায় শুনে হঠাৎ লাউডগা সাপ হয়ে তার বালিশ আঁকড়ে নেওয়া। বর্ষার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া মধ্য রাত গুলোতে ভাবনা, হয়ত সে এখনও বাজাচ্ছে সেতার।

হয়ত সেতারে রাগ মেঘমল্লার। যে রাগ আনু জানে না। কিন্তু একমাত্র যার মাধ্যমে সে বাপীদার সঙ্গে বিনিময় করতে পারত নিজেকে।

বাপীদা চটি খুলে প্রণাম করছে। প্রণাম করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখছে বাপীদা। বাপীদাকে সবসময় অমন শুকনো শুকনো লাগে কেন। এখন যদি আনু গিয়ে বাপীদার পাশে দাঁড়ায়! ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে! ওর হাতটা হঠাৎ ধরে। বাপীদার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আনু আন্‌চান করে। দুজন আলাদা ভাষার মানুষ কীভাবে বলবে কথা! কোথায় রাগ মেঘমল্লার। এদিকে বড্ড কোলাহল। ঢাক, ঢোল, ধুনো। জল আছড়ায়, জল আছড়ায়। কথাতে বলা যায় না। বাপীদা ফিরে যাচ্ছে। বাপীদা চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

কমনরুমের কোণের চেহারটাতে এইভাবে গা ছেড়ে প্রীতম বসে থাকলে মনে হয় মাচার ওপর নধর ময়াল পড়ে আছে। অত দশাসই চেহারায় অত শিশুর মতো সারল্য প্রীতমকে নিদারুণ জনপ্রিয়তা দিয়েছে। পলু, প্রীতমের ইলেকশনে জিতে মিরাক্‌ল ঘটানোর পেছনে এই সারল্য অনেকটাই কাজে দিয়েছে আনুর মনে হয়। আর মিরাক্‌লটার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কেমন সলতে পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের সংসদ মালিকানা সেই দলীয় দাদাদের মুখের ওপর থেকে সেলোফেনের মসৃণ আবরণটা ছিঁড়ে গেছে। নকশাল গন্ধী পলু, প্রীতমের জিতে যাওয়ায় বাকি ডিপার্টমেন্ট গুলোতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়াটাও কেমন হালকা হয়ে গেছে। আঁতেল দাঁড়িঅলা পলুটা যে প্রীতমের জনপ্রিয়তার ডিঙ্গিতে পার হয়ে গেছে এটা প্রমাণ করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

গত রাতেও প্রীতমকে থ্রেট করা হয়েছে। খবরটা আনুদের ক্লাশেও ছড়িয়েছে। বিবেকানন্দ হোস্টেলে তিনটে ছেলেকে ভালো ঘর থেকে বাথরুমের পাশে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে। ক্লাশে ভয়মিশ্রিত একটা আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে। সব মিলে প্রীতম হিরো হয়ে গেছে।

প্রথম তিনটে ক্লাশে আসেনি বলে প্রীতমের জন্য সকলেই চিন্তিত ছিল। টিফিনে কমনরুমের কোণের চেয়ারে ছ'ফুট দুই ইঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে ভ্রমরের মতো ছেঁকে ধরে সবাই। গতরাতের শাষানী চোখ রাঙানীর উপাখ্যান শুনতে শুনতে সকলেই বেশ উত্তেজিত বোধ করে। সূঁচের মতো চোখ পলুকে অনেকেই বোঝে না, নকশাল পন্থা জিনিসটি সাপ না ব্যাং সে সম্বন্ধেও অনেকেরই ধন্দ থাকলেও দৃপ্ত, বালকোচিত, সৎ প্রীতমকে এই বিজয়ীর ভূমিকা পৌঁছে দিতে যে তাদেরও বড়ো অবদান আছে সেটাই সকলকে খুব উত্তপ্ত ও গর্বিত করে।

ভিড়টা ছড়িয়ে পড়লে প্রীতম নীচু গলায় আনুকে বলে, 'ভাবছি এই ক্রেজটাকে কাজে লাগিয়ে ম্যাগাজিনটার ওপর কব্জা করব। পাঁচবছর ধরে ওটাকে যা বানিয়ে তুলছে হনুর দল। লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রামটাই বোঝে না।'

'ক্রেজ কিন্তু গরম পেঁয়াজির মতো। খোলা হাওয়ায় রাখলেই একটু পরে মিইয়ে যায়' আনু যোগ করে।

'জানি, কিন্তু এছাড়া মাস্‌কে ইনভলভও করার রাস্তা দেখতে পাইনা'।

প্রীতম জলের গ্লাসে রুমালটা ভেজায়। কপালে লাগিয়ে বলে, 'মাথাটা ফেটে যাচ্ছে রে!'

'টিপে দেব!'

'না না। তাহলে এই কমনরুমের মধ্যে একবারে 'হাম্ তুম...' হয়ে যাবে। ওরা ছেড়ে দেবে ভেবেছিস!'

'বাব্বা তুই পারিসও। আমি সরল মনে কথাটা বললাম। আর তুই কদ্দুর পর্যন্ত ভেবে বসলি' আনু একটু রেগেই যায়।

প্রীতম রুমালটা নিঙ্‌রোতে নিঙ্‌রোতে বলল, 'আনু আমার বউ হবি!' এক মুহূর্ত চুপ করে আনু উজ্জ্বল মুখে বলে, 'হব। আসলে তোর মতো বর আমার দরকার। তুই আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না, কারণ তোর নীতিবোধ আছে। আমার কিন্তু একজন প্রেমিকও দরকার।'

প্রীতম দাঁত কিড়মিড় করে নাকের কাছে ঘুষি পাকিয়ে বলল, 'ও আমি নীতি নিয়ে চলবো! আর তুমি বউদিবাজী করে বেড়াবে. তাই না। ওসব চলবে না।'

আনু গালটা ফুলিয়ে বলে, 'তা বলে প্রেমিকের প্রয়োজনটা তুই ইগনোর করবি!'

'প্রেমিক! প্রেমিক! প্রেমিকটা কী? প্রেমিকটা কে, কেন?'

প্রীতম প্রবল হয়ে কথা বললে আরও বালখিল্য হয়ে ওঠে 'প্রেমিক মানে ধর্... প্রেমিক মানে... অখন্ড ড্যাস ড্যাস সত্বা! এই যে অখন্ড ড্যাস ড্যাস সত্বা!' হরিপদ কমনরুমে ঢুকেছে। আনু এক লাফে ওর কাছে পৌছয়।

হরিপদ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। আনু চোখ গোল করে বলে, 'ইলেকশনের সময় বাড়ি পালিয়েছিলি কেন! তোর পানিশমেন্ট হবে। আজকে ঘুগনীর অর্ডার তুই দিবি।'

॥ ছয় ॥

একটা গোটা চিঠি। আনুর বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে। প্রথমেই দরজাটা বন্ধ। আম্মা হঠাৎ রান্নাঘর থেকে আসবে নাতো! চারকোণা কাগজে গোল করে লেখা Take my love একেই কী বলে প্রেমপত্র। কে লিখেছে? মস্ত চিঠির তলায় নাম সৌরভ। কলকাতা পড়তে গিয়ে সৌরভ চিঠি পাঠিয়েছে! আনুর আশ্চর্য্য লাগে। ওর পনেরোতম জন্মদিনে সৌরভ এসেছিল তিনমাস আগে। সেদিন দু ঘন্টা দুজনের দাবা খেলার কথা মনে আসে। কই তখন তো আনু কিছু...

'এখানে এসে শুধুই তোমার কথা মনে পড়ছে। একটা পেয়ারা গাছকে চুপি চুপি আমাব মনের কথা বলি। একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের নাম রেখেছি অন্যপূর্বা।' ইংরেজি কোটেশন দিয়েছে সৌরভ। হঠাৎ আনুর মন খারাপ হয়ে যায়। বানান ভুল লিখেছে সৌরভ। ভালোবাসার কথায় বানান ভুল! আনুর কেমন সব জোলো মনে হয়। না লিখলেই পারতো।

আনু চিঠিটা ভাঁজ করে রাখে ডাইরির মধ্যে। মনটা একদম চুপ হয়ে গেছে। খুঁজেপেতে সেদিনের তারিখ বার করে হাত-হাত লেখে চিঠির খসড়া। বাবা বাবা! তুমি কী জান তোমার আনুবেটি চারটে নতুন কবিতা লিখেছে। একটা গঙ্গানদীর ওপর, একটা স্কুলের সুছন্দাদিকে নিয়ে (উনি আমার প্রিয় দিদিমনি) আর দুটো সমুদ্রের ওপর! বাবা তুমি যে কাঠ চাঁপার চারাটা পুঁতেছিলে (যেটা দাদা একবার উপড়ে ফেলেছিল) সেটাতে ছোট্ট একটা কুঁড়ি এসেছে। আমি নাক ঠেকিয়ে দেখেছি দারুণ মাতালের মতো গন্ধ রয়েছে বুকে। বাবা, তুমি জান আজকাল আমার মন কেমন খারাপ করে। কেমন শুধুশুধু মন খারাপ আমার। আম্মা যেন আজকাল কেমন বদলে গেছে। আগের মতো ভালোবাসে না। সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলে, ভদ্রলোকের মতো...

'টুকটুক্ খেতে আয়' আম্মা ডাকছে। আম্মা অনুকে টুকটুক্ বলে। ঠাকুমা নিরামিষ খায় বলে আনুও নিরামিষ। আনুর আজ আলুপোস্ত ভালো লাগছে না।

'টুকটুক্ গৌতম, পিকুরা কিন্তু ভালো ছেলে না। ওরা কোনোবার আসেনা এবার বিজয়ার পর এসেছিল' আম্মা হঠাৎ বলে।

আনু ডালের বাটির দিকে চেয়ে আছে। রংটা জনডিস হওয়া পাশের বাড়ির কাকিমার মতো। গাটা কেমন গুলোচ্ছে। আনু আকুল হয়ে ঠাকুমাকে বলে, 'আমি কী করব আম্মা।'

ভাতের প্রথম গ্রাসটাকে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দেবার আগে ঠাকুমা বলে, 'কিচ্ছু না। শুধু তোমাকে বলে রাখলাম। বড়ো হচ্ছ তো! সবকিছু বুঝতে হবে তো আস্তে আস্তে!'

॥ সাত ॥

নর্দান রিডিং রুমে উঁকি মারে আনু। উঁহু আসে নি। সাদার্নে দেখা যাক। ওই তো। প্রায় এক লাফে আনু, পৌঁছে যায় কাছে।

'দেবার্স্য দা' যথেষ্ট আস্তে ডাকে।

দেবার্স্য দা মুখ তোলে 'ওঃ আনু।'

'কী পড়ছ তুমি?'

'Today দেখছি'

দেবার্স্যদা India Today-র পাতায় কোনো রাজনৈতিক প্রবন্ধে চটপট চোখ বোলায়। টিফিনের একটা ক্লাশের পর থেকেই এই সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে বহু ছেলেমেয়েই এসে জমা হয়। বাইরে বারান্দায় দু চার জায়গায় জটলা হলেও নর্দান, সাদার্ন দুটো রিডিং রুমেই অস্বাভাবিক চুপচাপ বজায় থাকে। সেটা অনেকটা লাইব্রেরির স্বাভাবিক ধমকের জন্য আবার অনেকটা বইপত্র ছড়িয়ে বসে থাকা গম্ভীর-মুখো রিসার্চ স্কলারদের জন্যও বটে।

'আচ্ছা দেবার্স্যদা, তোমার আর কতদিন লাগবে রিসার্চ শেষ হতে?'

'তিনবছর তো হল।' দেবার্স্যদা একটা ডাইরি খুলে পাতা ওল্টায়, 'দেখা যাক আর কতদিন লাগে। কাল তুমি লাইব্রেরি আসনি কেন আনু?' দেবর্স্যদা পাতা উল্টেই যাচ্ছে।

দেবার্স্যদার হাতের আঙুলগুলো শিল্পের মতো। আনু চকিতে চুরি করে দেখে নেয়।

'এটা পড়ো।' দেবার্স্যদা ডাইরির একটা পাতা এগিয়ে দেয়। আনুর সামনে একটা কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ, শুরুটা এরকম—

ভালোবাসার ব্রাহ্মণী এল নবীগাঙের কূলে

বাঁধাঘাটে ক্লিশে দাগ, ব্রাহ্মণী জলের কাছে

                    বনজ ব্যাকুলতা খোঁজে

প্রার্থিত জল যেন সখ্য ছুঁয়ে ধুয়ে দেবে

মানব-আঁধার।।

আনুর ভেতরটা ফিসফিস বলে ওঠে। ভালোবাসার ব্রাহ্মণী! থইথই এক গাঙ। তীরে অচেনা নৌকো, পুঁটি মাছ লাফাচ্ছে তীরের অগভীর জলে। পিছল ঘাট। ভালোবাসার ব্রাহ্মণী থমকে গেছে সেখানে। তীর্ণ বাঁধাঘাটে নয়, চিরকালীন জলের কাছে সে খোঁজে এক বন্য ডাক যে ডাকের আবহে আলো হয়ে ওঠে তার মনন-আঁধার। আনু অবাক হয়ে যায়।

'দেবার্স্যদা এই কবিতাটা কবে লিখেছ?'

'চারবছর আগে।'

'কারোর আসা উপলক্ষে?'

'উঁহু! এমনি!'

'তবে যে লিখেছ ব্রাহ্মণী এল!'

'ভেবেছিলাম যেন এল। এতো আমারই প্রার্থিত কোনো নারীমুখ! প্রার্থিত মুখের মধ্যে আমারই প্রত্যাশা। সে মুখ কখনো তোমার মতো, কখনো আমার মায়ের মতো, কখনো বা...'

'তোমার ম্যাডামের মতো' আনু নিজস্ব গলায় বলে, 'দেবার্স্যদা এই যে তুমি আমার দিকে চেয়ে কথা বললে, কী সুন্দর লাগল। পড়তে পড়তে তুমি যখন হাত তুলে চশমাটা বসিয়ে নাও — অদ্ভুত লাগে।'

'ওঃ আনু। একদম পাগল!' দেবার্স্যদা আজ কেমন আনমনা, 'আনু অনেকদিন ম্যাডামের চিঠি পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছ না!' আনু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে যেন কেমন ফুলগাছ দুলে ওঠে। দুর কার্শিয়াং-এ একজন ছিপছিপে স্টিল ফ্রেমের চশমা পরা মেয়ে গবেষণা করছে মানুষের ভালোর জন্য। সে চিঠি লিখতে ভুলে গেছে। আর তার জন্য সমতলের লাইব্রেরিতে বসে অন্যমন হয়ে যাচ্ছে তার প্রেমিক। আনুর গলায় বাষ্প জমা হয়। 'ম্যাডামকে দেখতে খুব সুন্দর না!'

'না খুব সুন্দর নয়। আমি বলি ম্যাডাম তুমি আমার Step mother। আমায় এত অনাদর তোমার!' দেবার্স্যদার মুখে জোনাকির মতো হাসি একটু, চোখ সুদূরে। 'ও আমাকে ধরে রাখে।'

আনু মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেবার্স্যদার সারা মুখে ওঠে নামে একটা আলো।

॥ আট ॥

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। ঘড়িটা চলছে। আনু শুয়ে আছে।

'আনু'! প্রীতিকনা ডাকছে।

'হ্যাঁ কী বল্' আনু উঠে বসে।

প্রীতি ঘরে আসে। 'কিছু না। আমি তোর ঘরে বসে পড়ছি, হ্যাঁ! একা একা ভালো লাগছে না।'

প্রীতি টেবিলে বসে। আনু ছুটির দিনটা আজ শুয়ে শুয়েই কাটালো। সারাদিন বর্ষা। দানবের মতো হোস্টেল বাড়িটা কক্ষে কক্ষে রং বেরং এর মেয়ে নিয়ে যেন রঙ্গ তামাসা ভুলে ঘুমিয়েই পড়েছে। আনুর জানলার বাইরে একটা থির থির দীঘি, তার ধারে মস্ত নিমগাছ, নিমগাছতলায়, পুকুরের জলে হলুদ নিমফল। নবদ্বীপের মেয়ে সায়নী বলেছিল, 'নিমগাছে মহাপ্রভু থাকেন'। খুব বর্ষার ঘনঘোর দিনগুলোতে আনু ঝাপসা চোখে কল্পনা করেছে আধো প্রস্ফুটিত ওই নবনীদেহ যেন চেয়ে আছেন অনন্তে। মানুষের আদি মিলনের মন্ত্র যিনি সন্নিবেশিত করে গেলেন বাঙালির প্রাণে, মনে, সাহিত্যে। চোখ পরিষ্কার করে নিলেই আর মহাপ্রভু নেই। এখন ভেদ বিভেদ সহ ক্ষতবাহী মানবসমাজ। জলে ভেজে, স্নান করে অবিরাম।

'প্রীতি!' আনু বালিশ জড়িয়ে আধশোয়া হয়ে উঠে বসে, 'কী পড়ছিস?'

'ব্রাউনিং।'

'ও' আনু কিছু বলতে চায়। বলা হয় না।

প্রীতিকণা বাইরে তাকিয়ে বলে, 'ওই ইউক্যালিপটাস গাছটা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, ওর গুঁড়িটা দেখ সাদা ধবধবে মসৃণ। ব্রাউনিং মেয়েদের উরুর সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গুঁড়ির তুলনা করেছেন।'

চওড়া একটা রাস্তা। দুধারে সারি সারি ইউকালিপটাস গাছ। বর্ষাতি গায়ে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে একজন লোক হেঁটে আসছে। আনু একটা গাছের আড়ালে। উনি কী কবি? ব্রাউনিং! টালির ছাউনি দেওয়া একটা কাঠের ঘরের দরজায় টোকা মারল লোকটা। কাঁচের দরজার ওপাশে দেখা যাচ্ছে সোনালি চুল একটা মেয়ে ছুটে আসছে দরজা খুলতে...

'ঠিকই বলেছেন জানিস। ব্রাউনিং ভুল বলেননি' আনু উত্তেজনায় উঠে বসে। আচ্ছা প্রীতি নিজের উরুতে একদিন হাত বুলিয়ে দেখিস। কেমন একটা লাগে না! মনে হয় যেন কোনো প্রাচীন গাছের গায়ে হাত বোলাচ্ছি। অনেক বর্ষার জল যেন তার গুঁড়ি বেয়ে নেমেছে। তাই মসৃণ।'

প্রীতি অবাক হয়ে বলে, 'ধুর কী যে বলিস না।' নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে কারো ওরকম হয় নাকি!'

'হয় না তোর, না!' আনু কেমন মিইয়ে যায়।

'জানিস প্রীতি মাঝে মাঝে মনে হয়,' আনু সুদূর থেকে বলে, 'আমি যে কী চাই বুঝি না। কোথায় ভাসছি, কোথায় নোঙর আমরা জানি না। তবু পৃথিবীর কাছে কৃতজ্ঞ লাগে, এটুকু ভাসাবার জন্য, অনেকে তো তাও পায় না।'

প্রীতি চেয়ার ছেড়ে বিছানায় উঠে এসে আনুর হাঁটু জড়িয়ে বলে, 'আনু কষ্ট হচ্ছে!'

'হ্যাঁ' আনু উঠে বসে ডাইরি টেনে একটা পাতা খুঁজে নিয়ে বলে, 'একটা কবিতা শুনবি?'

প্রীতি আঙুল দিয়ে আনুর চোখের কোণ মুছে বলে 'শুনব!'

ভালোবাসার ব্রাহ্মণী এল নবীগাঙের কূলে—

উত্তরাধিকার

বেলা মুখোপাধ্যায়

হৃষীকেশ থেকে শ্রীনগর যাবার পথে মাঝামাঝি জায়গায় এই বৃদ্ধাবাস পড়ে। সুন্দর মনোরম জায়গা, নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছেন মা গঙ্গা। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। শীতে এখানে ভয়ানক ঠান্ডা পড়ে। তবে ঘর গরমের বন্দোবস্ত আছে। বছর পনেরো আগে স্ত্রী কৃষ্ণাকে নিয়ে বদ্রীনাথ দর্শন করতে আসেন কেদারবাবু। ফেরার পথে একটু এদিক-ওদিক ঘোরার সময় এখানে আসেন। তখন সবে এই আবাসের ভিত গাঁথা হচ্ছে। নন্দলাল বাজাজ তৈরি করছিল এই আবাস। এমনিই ঝোঁকের মাথায় একটা সেট বুক করে নিয়েছিলেন, একতলায়। এটা অনেকটা ফ্ল্যাটবাড়ির মতো। দু'খানা ঘরের সেট, একতলা আর দোতলা। নীচে যারা, তারা এক টুকরো বাগান আর উঠোন পাবে, উপরতলায় যারা ছাদটা তাদের। চারদিকে চারটে ব্লক, মাঝখানে পার্ক, এক দিকে মন্দির। প্রতিদিন তিনবার পুজো হয়। অন্যদিকে ডাইনিং রুম, লাইব্রেরি আর একটা কমন রুম। তবে যদি কেউ নিজেরা রান্না করতে চান তো ফ্ল্যাটে সুন্দর গোছান রান্নাঘর আছে। কৃষ্ণা অবশ্য রান্নার ঝামেলায় যায়নি, ওঁরা ডাইনিং হলেই খেতেন।

গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ বসে কেদারবাবু উঠলেন। ঠান্ডা বাড়ছে, শালটা জড়ালেন ভালো করে। সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ চওড়া, রোজ ধোওয়া-মোছা হয়। এখানে প্রায় দশ বছর হল আছেন কেদারবাবু, কৃষ্ণা চলে গেলেন পাঁচ বছর হতে চলল। বড়ো একলা করে দিয়ে গেছেন কৃষ্ণা। চোখের সামনে ভেসে এল এলাহাবাদের সেই নিজের হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলা বাড়িখানা। দু'জনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া বাড়ি। ঘর, দালান, জানলা, আলমারি সব কিছু নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা, তর্ক, রাগারাগি, আবাব মিটমাট। কৃষ্ণার বড়ো সাধের বাগানবাড়ি। মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন বাড়িখানা। টাকাও অনেক গেছে। মাঝে মাঝে রেগেই যেতেন, এটা কী 'তাজমহল' তৈরি হচ্ছে...।

কৃষ্ণা হাসতেন, 'আমাদের তো মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে হবে। একমাত্র ছেলে মানুষ হয়ে এল প্রায়। কী করবে টাকা জমিয়ে!'

কিন্তু হ্যাঁ, কৃষ্ণার রুচি ছিল, শিল্পীর মতো নিপুণ হাতে সাজিয়েছিলেন বাড়িটা। যে দেখত সেই প্রশংসা করত। সেই বাড়ি ছেড়ে এই বৃদ্ধাবাসে চলে আসতে ওঁর বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কষ্ট হয়েছিল ছোট্ট ছোট্ট নাতি-নাতনিদের ছেড়ে আসতে। প্রায়ই একান্তে বসে চোখের জল ফেলতেন। ওঁকে দেখলেই তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সামাল দিতেন, 'কষ্ট হয় ছোটুটার জন্য, বড্ডই ছোটো তো, কিছু বুঝতেই পারে না। হয়তো বাড়িময় আমাকে খুঁজছে, বাববার আমাদের ঘরে যাচ্ছে...। আমাকে ডাকতে...।'

ওঁরও বুকটা মুচড়ে উঠত কিন্তু না এসে সত্যি উপায় ছিল না। ছেলে-বউ দু'জনেরই উপেক্ষা-অবহেলা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। চুপচাপ সরে আসাই একমাত্র পথ ছিল।

রাতে ঘুম আসছিল না। কত দিনের কথা সব ভেসে আসছে মনের ভেতর। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল দুই প্রাণের বন্ধুর কথা। ইস্কুল থেকে চাকরিজীবন শেষ করে অবসর নেওয়া পর্যন্ত সেই বন্ধুত্বে এতটুকু চিড় ধরেনি। এখানে আসার পর আর যোগাযোগ রাখেননি। ওঁরা এলাহাবাদেই আছেন। ভূপেন্দ্র আর উনি ছিলেন ধনী অভিজাত পরিবারের সন্তান কিন্তু নরেশ ছিলেন বেশ গরিব ঘরের ছেলে। ওঁরা পাশে না থাকলে ম্যাট্রিক করেই কাজে ঢুকে পড়তেন, কিন্তু ওঁরাই জোর করে কলেজে টেনে এনেছিলেন। ওঁর ফিজ, বইখাতা সব জোগান দিতেন দু'জনে মিলে। দুটো টিউশনও জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ওঁরা কেরিয়ারের স্বপ্ন দেখলেও নরেশ ছিলেন বাস্তবধর্মী, বলতে, 'তোরা রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মানো বড়োলোকের ছেলে, তোরা যত খুশি স্বপ্ন দেখ কিন্তু আমি ভাই গরিবের বড়ো ছেলে, চারটে ছোটো ভাইবোনের দায়িত্ব, সংসার টানতে রুগি বাবা ধুঁকছে, তাড়াতাড়ি গ্র্যাজুয়েট হয়ে আমাকে যেমন-তেমন চাকরিতে লাগতেই হবে।'

সত্যিই বি.এ পাস করেই উনি পোস্ট অফিসে ক্লার্কের চাকরিতে ঢুকে পড়েছিলেন। অবসর নেবার কাছাকাছি এসে বোধহয় বড়োবাবু হতে পেরেছিলেন। ভূপেন্দ্র বেশ বড়ো চাকরি করতেন, তা ছাড়া বাড়িও অবস্থাপন্ন। ওঁর দুই ছেলেই ডাক্তার। ওঁরা দু'জনেই নিজের নিজের বাড়িতে দিব্যি আছেন, উনিই শুধু নিজের বাড়ি থেকে ছিটকে সরে এসেছেন.. । এখানে অবশ্য খুব খারাপ আছেন তা না, ভালো খাওয়াদাওয়া, দেখাশোনা, নিজের পছন্দমতো থাকা, সবাই প্রায় সমবয়সী। আর মানসিক, আর্থিক প্রায় সবাই একই ধাপের, কাজেই ভালোই আছেন। কৃষ্ণা ভালোই ছিলেন, শুধু বাচ্চাগুলোর জন্য মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। কেদারবাবুর বয়স পঁচাত্তর কিন্তু শরীর মজবুত। দাপুটে মানুষ, অর্থের অভাব নেই। হঠাৎই ঠিক করলেন যে একবার বাড়ি যাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবেন। কেমন আছেন সবাই?

সবে সকাল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভেতরে এলেন। ছেলে-বউ অবাক।

'তুমি আসছ জানালে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে যেতাম।'

'তোর অত সময় আছে?'

বউ এসে প্রণাম করল, 'এসেছেন তো এবার থেকেই যান। বয়স বাড়ছে তো!'

মনে মনে হাসলেন, খুব চালাক মেয়ে। কায়দা করে জেনে নিতে চায় ক'দিনে বিদায় হবে বুড়ো! নাতি-নাতনিরা প্রায় ভুলেই গেছে দাদুকে, কিন্তু ভদ্র শিক্ষা, পিঠে ইস্কুল ব্যাগ নিয়ে হাত নেড়ে দাদুকে টা-টা করে গেল। চাকররা সব নতুন, ওঁর ঘর খুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ছেলে-বউও কাজে বেরিয়ে গেল। এত বড়ো বাড়িটায় একদম একলা। ড্রইং রুমে এলেন আর এসেই ধাক্কা খেলেন, আমূল বদলে গেছে। কৃষ্ণা বড়ো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন ঘরখানা। ওঁর সেই শরীর-ডোবা নরম মখমলের গদি আঁটা সোফাসেট উধাও, সেখানে হাড়-পাঁজরা বার করা খাড়া পিঠের রট আয়রনের কিম্ভুতকিমাকার বেঞ্চি না সোফা কে জানে! সঙ্গে আবার ওই চেহারায় দু'খানা চেয়ার জাতীয় কিছু। কোণে ছোট্ট টুলে নিজের হাতে কাজ করা টেবিলক্লথ বিছিয়ে পেতলের মিনা করা জয়পুরী কলসিতে ডাল সমেত মরশুমি ফুল সাজিয়ে রাখতেন কৃষ্ণা। মালিই জোগাড় করে আনত পলাশ, কদম, গন্ধরাজ, চাঁপা, রঙ্গন। সেখানে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে ওই কালো লোহার লম্বা একটা ল্যাম্প স্ট্যান্ড। ওঁর ইচ্ছে হল সব ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেন। সামনের দেওয়ালে খুব সুন্দর পেন্টিং ছিল, সেখানে মাথামুণ্ডু ছাড়া এক মডার্ন আর্ট। বাইরে তাকালেন, অনেকটা বাগান আর লন দেখা যাচ্ছে। থাকবার মধ্যে ওই দুটোই আগের মতো আছে আর আছে নিজের ঘরের ডবল বেডখানা।

ভাড়া মিটিয়ে গেটের সামনে এসে অবাক... ভেতরের দিকে তালা ঝুলছে। সবে সাড়ে চারটে বেজেছে, চারিদিকে গমগমে বিকেল, এখন থেকে গেটে তালা! ভূপেন্দ্র আর বীণা দু'জনেই খুব মিশুকে। ওদের বাড়িতে সারাক্ষণ লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল আর সেই গেটে তালা! বাড়িখানাও

কেমন নির্জন। ভেতরে তাকালেন, বাড়ির পাশেই শর্মাদের খুব বড়ো একটা প্লট পড়েছিল, ভূপেন্দ্র কিনে নিজের বাউন্ডারি-ওয়ালের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল। ভেবেছিল, ছেলেরা ফিরে ওখানে নার্সিংহোম খুলবে। সেখানে বড়ো বড়ো আগাছার জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে নিজে থেকে জন্মানো বড়ো বড়ো পেয়ারা, আম, জাম, কাঁঠালগাছ ছন্নছাড়া দশায় দাঁড়িয়ে। বীণার বাগানের খুব শখ ছিল, বাগানখানা ছিলও সুন্দর। সেই বাগানও জঙ্গল হয়ে গেছে। কেমন যেন ভুতুড়ে ভুতুড়ে... কেদারবাবু ঘাবড়ালেন। তবে কী ওরা দু'জনেই গত...? ছেলেরা কেউ এখানে থাকে না! কিন্তু পোর্টিকোর উপর ড্রইং রুমের দরজা খোলা, পর্দা উড়ছে। গেটের থামে কলিংবেলের বোতাম দেখতে পেয়ে টিপলেন। একটু পরে চাবি নিয়ে যিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন তাঁকে ভূপেন্দ্র বলে চিনতে বেশ কষ্ট হল কেদারবাবুর। বেশ দশাসই চেহারা ছিল ওঁর, এখন হাড়ের উপর চামড়া জড়ানো, কোলকুঁজো, তোবড়ানো গাল, চোখ কোটরে, বেশ খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। চোখে বোধহয় কম দেখেন, চিনতে পারেননি।

'কাকে চাইছেন?'

'তালা খোল আগে তারপর বলছি কাকে চাই।'

চমকে উঠলেন, 'কেদার... তুই...।'

তাড়াতাড়ি তালা খুলে ওঁকে ভেতরে নিয়ে আবার তালা আঁটলেন। উনি অবাক, 'এ কী রে? দিনদুপুরে তালার মধ্যে বসে আছিস?'

'কী করি বল? এত বড়ো বাড়িতে দুই বুড়োবুড়ি... চোরের উপদ্রবও বেড়েছে...। তা তুই কবে এলি?'

'আজই...।'

'হঠাৎ... কিছু কাজ আছে...!'

'আরে... বাড়ি সংসার সব রয়েছে। বাড়ি আসব না...।'

'বাড়ি...।'

'হ্যাঁ বাড়ি.... তোদের দেখতে ইচ্ছে হল।'

বীণা বসে টিভি দেখছিলেন। ওঁকে দেখে আরও কষ্ট হল। তিন জনের মধ্যে সব থেকে সুন্দরী ছিপছিপে আর হুল্লোড়ে ছিলেন বীণা। নরেশের বউ উষা গরিব ঘরের মেয়ে, ঠিক সহজ হতে পারতেন না এঁদের সঙ্গে, আর কৃষ্ণা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। এই বীণাই মাতিয়ে রাখতেন। বেজায় মোটা হয়ে গেছেন, মুখেচোখে ক্লান্তির ছাপ। হাঁপাচ্ছেন কিন্তু চিনতে পারলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'ওমা আপনি? ভালো আছেন?'

'তা আছি, কিন্তু তোমাদের এ কী হাল হয়েছে!'

'হাজার রোগে ধরেছে।'

ভূপেন্দ্র রোগগুলো বলেন, "ওর লো প্রেশার, সুগার, আবার হাঁপানি।'

'আর তোর....?'

'আরথরাইটিস, হাই প্রেশার, হার্টের অবস্থাও।'

'বাহ্ চমৎকার. .. ডাক্তারের বাড়ির হাল এল!'

'ডাক্তার বলতে ওই মোড়ের জগন্নাথ তিওয়ারি।'

'সে কী... বড়ো ছেলে তো এখানেই ছিল। ছোটোটাই বা কী করছে?'

'ওরা? একজন আমেরিকা অন্য জন ফ্রান্সে।'

'ওখানে কী বড়ো পোস্ট পেয়েছে? এখানে তো এতদিনে প্রফেসার হয়ে যেত।'

'ওখানে অতি জুনিয়ার তবে মাইনে ডলারে। নীচে একখানা গুদোমঘর আর উপরে একখানা কুঠুরি, তাতে ওদের সুখের সংসার। সব কাজ নিজে। এখানে হাতে-পায়ে কাজের লোক ছিল, এই বিশাল বাড়ি। তা বললে কী হবে? এই ধুলো গরমের দেশ, ওখানকার কথাই আলাদা।'

'কিন্তু নিজের বাড়ি, মা-বাবা।'

'কে থাকতে আসবে বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে। হ্যাঁ, মরে গেলে ছুটে আসবে এত সম্পত্তি. টাকা, সোনা... দুই ভাই লাঠালাঠিও করতে পারে। এখন চলে গেলে বাঁচি।'

'কিন্তু ওদের একটা দায়িত্ব তো আছে বাবা-মায়ের প্রতি...।'

মাথা নাড়লেন ভূপেন্দ্র।

'না না! সেদিকে আমার দুই ছেলে হিরের টুকরো, বাবা-মার প্রতি অগাধ টান। ন'মাসে-ছ'মাসে ফোন করে, নতুন বছরে কার্ড পাঠায়, শ্বশুরবাড়ি এলে ঘুরেও যায়, এলে সস্তা দামের বিদেশি উপহারও আনে। এরপর কী করে বলবি যে দায়িত্ব নেই!'

'কী সব বলছিস তুই...।'

'যা সত্যি তাই বলছি। তোর না বোঝার তো কোনো কারণ নেই। কারণ, তুইও তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিস।'

'হ্যাঁ গেছি। কিন্তু অসহায় হয়ে না, জায়গাটা ভালো। মনের মতো সব লোকজন। ভালো লেগে গেল, তাই থেকে গেলাম। তাছাড়া নিজের দেশ, বাচ্চাদের কাছে না পাওয়ার কষ্ট মনোরম পরিবেশ ভুলিয়ে দিয়েছে আর যখন ইচ্ছে বাড়ি আসতে পারি। যেমন এলাম।'

'চা করি একটু...।'

কেদারবাবু বীণার দিকে তাকালেন।

'শরীরের এই হাল নিয়ে চা করবে?'

'রান্নাও তো করি।'

'সে কী রে? চাকর রাখতে পারিস না একটা?'

'দেখছিস তো শরীরের হাল। শেষে ওই চাকরের হাতেই প্রাণ যাবে। ঘর ভরা দামি দামি জিনিস। তাই ভরসা পাই না। সেই পুরনো ঝিয়ের মেয়েটা কাজটাজ করে যায়। তারপর তালার মধ্যে বসে থাকি।'

একটা নিশ্বাস ফেললেন কেদারবাবু, 'শোন এভাবে জীবন চলে না। তুই এত ভেঙে পড়বি আমি ভাবতেই পারছি না। সব থেকে দাপুটে ছিলি তুই, আর বীণা ছিল প্রাণবন্ত।'

মাথা নাড়লেন ভূপেন্দ্র, 'সব হিসাব যে বেহিসাব হয়ে গেল রে কেদার, আর বাঁচা কেন?'

'নিজের জন্য বাঁচ। টাকা তোর কাছে কোনো ব্যাপার নয়। পাশে ওই অত বড়ো জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, ওখানে একটা হস্টেল তোল, চিরদিন প্রশাসনে ছিলি, হস্টেলের ম্যানেজমেন্ট সামলা, বীণা রান্নার দিকটা দেখবে। বাড়ির মতো খাওয়া আর পরিবেশ— রোজ দেখবি ছেলের দল হাজির হবে। জোয়ান, তাজা ছেলেদের সঙ্গে থেকে দেখবি তোদের শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে আর চোর কী ডাকাতেও এদিকে তাকাতে ভয় পাবে। লোকজন রাখ, তাদের খাটাতেই সময় চলে যাবে আর আজেবাজে কথা ভাবার সময়ই পাবি না। আসলে কোনো কাজ না থাকলেই বাজে চিন্তা মাথায় আসে।'

চোখে আলো ফোটে ভূপেন্দ্রর, 'খুব ভালো কথা বলেছিস। আসলে আমিই হাল ছেড়ে বসে পড়েছিলাম, আমায় দেখে বীণাও ভেঙে পড়ল। আমি আজই ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলছি। সত্যিই তো আমরা কেন শেষ হয়ে যাচ্ছি সামর্থ থাকতেও।'

'এবার উঠব।'

'বাড়ি ফিরছিস?'

'না, একবার নরেশের কাছে যাব। কেমন আছে ও?'

ভূপেন্দ্র মিনমিন করেন, 'বাড়ি থেকেই বার হই না। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

বাড়িটার কাঠামো সেই আছে তবে ঝকঝকে হয়েছে। বাইরের চাতালটা আগে কাঁচা ছিল, এখন

পাকা হয়েছে। ছ'ফুট বাউন্ডারিওয়াল উঠেছে, তার কোলে তিন ফুট কাঁচা মাটিতে নানান ফুলগাছ। জবা, টগর, গন্ধরাজ, শিউলি, বেল, যুঁই, একটা লেবু আর একটা পেয়ারাগাছও আছে। ঝেঁপে পেয়ারা ফলেছে। একখানা চৌকি। তার উপর শতরঞ্চি পাতা। নরেশ পা ঝুলিয়ে বসে হাসছেন। পিঠে গলা জড়িয়ে দোল খাচ্ছে বছর চারেকের একটা ছেলে। ঊষা সামনে একটা স্টিলের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। দশ বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলেন, ওঁরা প্রায় সেই রকমই আছেন। চেহারা টসকায়নি একটুও। শুধু চুলের পাক একটু বেড়েছে। মনে মনে শঙ্কিত ছিলেন কেদারবাবু, নরেশের দুই ছেলে, দুই বউ, তার উপর ট্যাঁকের জোর বলতে কিচ্ছু নেই। পেনশন নামমাত্র, ওদের যে কী হাল করেছে ছেলে-বউ, কে জানে! কিন্তু বেশ চমক খেলেন। নরেশ দেখেই চেঁচালেন, 'আরে আরে কবিমশাই! কতদিন পর দর্শন দিলে। এসো এসো.... এই পিন্টু একটা চেয়ার দিয়ে যা।'

ঊষা একগাল হাসলেন, 'ওমা দাদা! আমাদের ভুলেই গেছেন।'

সেই মিষ্টি হাসি আজও ধরে রেখেছে কোন্ জাদুতে কে জানে! ভূপেন্দ্র আর বীণার মুখ মনে পড়ল। এক অসহায় দুর্বল দম্পতি বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। ঘোলাটে চোখ আর ভয়ানক একাকিত্ব নিয়ে জীবন থেকে কত দূরে সরে গেছে। এক কিশোর একখানা চেয়ার এনে পেতে দিয়ে গেল। নরেশের গলায় সেই দাপট, সেই আগের মতো খোলামেলা, 'এই হচ্ছে লালীর ছেলে।'

লালী ওর সব থেকে ছোটো বোন। নরেশ ধারদেনা, বউয়ের গয়না দিয়ে মোটামুটি ভালো ঘরেই বিয়ে দিয়েছিল ওর। সেই সময় দশ হাজার দিয়েছিলেন আর ফেরত নেননি। বলেছিলেন, 'লালী তো আমারও বোন।'

বসলেন কেদারবাবু, 'লালী এসেছে?'

ঊষা বাচ্চাটাকে নরেশের পিঠ থেকে নামিয়ে মুখে দুধের গ্লাস ধরলেন। অপরিচিত মানুষ দেখে বাচ্চাটা চোঁ-চোঁ করে দুধ খেয়েই ভেতরে ছুটল।

'না দাদা। লালী ভূপালে, শান্তি বেনারস, অবনী কানপুর, আর রমণী মিরাটে থাকে। তবে পুজোর সময় সবাই এখানেই আসে, বাড়িতেই বিরাট যজ্ঞি হয়। সবাই চলে গেছে। পিন্টুর কলেজ খুলতে দেরি আছে তাই রয়ে গেছে।'

'পিন্টু বউদিকে বল চা পাঠাতে।'

'ওরা সবাই ভালো আছে?'

'ঠাকুরের দয়ায় সব ভালো। সবাই আসে। জায়গা কম হয় তাই ছেলেরা দুই ভাই মিলে দোতলাটা তুলল।'

এবার উপরে তাকালেন। তাই তো নেড়ামুণ্ডি ছাদে মাদুর পেতে ওঁদের আড্ডা বসত। নীচে থেকে ঊষা চা তেলেভাজা, সিঙাড়া করে পাঠিয়ে দিত। সেখানে সুন্দর রেলিং দেওয়া টানা বারান্দা, কোলে কোলে বড়ো বড়ো দরজা-জানলা দেওয়া ঘর, পড়ন্ত বিকেলের সোনারোদে ঝলমল করছে। ভূপেন্দ্রর ছন্নছাড়া বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে এল। নিজের বাড়িখানার ভেতরের সাজসজ্জা যতই বদল হোক, তিনটে বাচ্চা, বউ, ছেলে, চাকর-বাকর নিয়ে জমজমাট আছে।

'বাহ্... বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'তা তুই বানপ্রস্থ ছেড়ে হঠাৎ গেরস্থ আশ্রমে উদয় হলি যে?'

রেগে যান কেদারবাবু, 'আমি কী স্ট্যাম্প পেপারে লিখে গিয়েছিলাম যে, আর কোনোদিন ফিরব না? বাড়িটা আমার।'

'সেদিনও তোর ছিল। তবে কেন পালিয়েছিলি?'

'আমি না। কৃষ্ণা কিছুতেই থাকতে চাইছিল না। আসলে ছেলে-বউয়ের অতি ভদ্র উপেক্ষা, অবহেলা সইতে পারছিল না বেচারি।'

'ওখানে কেমন আছিস?'

'খুব ভালো, গঙ্গা মা, পাহাড়, জঙ্গল, ঠান্ডা আর সবাই এক বয়সি, শিক্ষিত লোক। ব্যবস্থা খুবই ভালো। কৃষ্ণা ভালোই ছিল। তবে বাচ্চাদের জন্য বড়ো কষ্ট পেত মনে মনে। কী আর করা। তারপর তো চলেই গেল।'

'তুই ভূপেন্দ্রর বাড়ি গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ রে, বড়ো কষ্ট হল দেখে।'

'আমি সময়ই পাই না। ছেলে দুটো কুঁড়ের হদ্দ। চাকরি ছাড়া কোনো কাজ করবে না। নিজের ছেলেমেয়ে, তাদের পড়াশোনা, ভর্তি, ফিজ জমা, বইখাতা সব দায়িত্ব আমার।'

বলছে বটে কিন্তু চোখেমুখে ছলকানো সুখ।

'তুই ভাগ্যবান।'

বেশ খানিক চুপ করে বসে রইল নরেশ। তারপর বললেন, 'ভূপেন্দ্রকে বাঁচাবার কোনো পথ বার করো কেদার। ও তিল তিল করে মরে যাচ্ছে।'

'আমি ওকে বলেছি নিজেকে কাজের মধ্যে রাখতে।'

'কাজ...।'

কেদার সবিস্তারে বলেন ভূপেন্দ্রকে কোনো স্বপ্ন দেখিয়েছেন। নরেশ বলেন, 'ও রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজই ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলবে, এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ আরম্ভ করবে। হাতে কাজ এলেই দেখবি ওর বয়স দশ বছর কমে যাবে।'

বছর চোদ্দোর ফুটফুটে একটা মেয়ে ট্রেতে চা-বিস্কুট নিয়ে এল।

'এই যে ইনি আমার গার্লফ্রেন্ড। ঠাকুমার সতীন। রঞ্জুর মেয়ে।'

মেয়েটা পালাল। কেদারবাবু চা নিলেন, 'আবার বলছি, তুই মহা ভাগ্যবান।'

'ভাগ্য তো আছেই। কিন্তু ছেলেমেয়ে কেমন হবে, তার দায়ও আমাদের, কেদার। শুধু কেরিয়ার বোঝালে হয় না। ওদের সম্পর্ক বোঝাতে হয়।'

'ঠিক বলেছিস। হয়তো অজান্তে কিন্তু ভুলটা আমরাই করেছি। কেরিয়ার ছাড়া আর কিছুই ওদের শেখাইনি আমরা।'

'তাই আজ ওরা স্বার্থপর।'

'ওরা যা হয় হোক, কিন্তু দোষটা আমাদেরই। ওদের ল্যাজ ধরে বসে থাকব, অভিমান করে দূরে সরে যাব, মুখে কিছু না বলে মনে মনে আশা করব যে ওরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে কাছে আসুক। নিজের শারীরিক, আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে অর্থবের মতো বসে বসে শুধু ওদের কথা ভাবব, সেটা আমাদের দোষ না! আরে সে আসে আসুক, যে যাবে সে যাক, আমরা কেন থেমে যাব! জীবনটা কাজ করার জন্য, কিছু না-কিছু কাজ জোগাড় করে রাখলে, নিজেকে ব্যাপ্ত রাখলে আর মনে করার সময়ই থাকবে না যে কে কোথায় আছে, কী করছে না-করছে। মন চাঙ্গা তো শরীরও চাঙ্গা।'

নরেশ হাসল, 'বাহ, বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিস দেখছি। তা তুই আবার ফেরত যাচ্ছিস কবে?'

'দাঁড়া ভাবি আগে। ভাবছি আমিও একটা কিছু করি। বাড়িতে তো প্রচুর জায়গা।'

'ছেলে-বউ আপত্তি করবে না?'

'করলে অন্য বাড়ি দেখুক...।'

'কিন্তু করবিটা কী?'

'শোন্ একটা পাবলিকেশন খুললে কেমন হয়? তুই আয় আমার সঙ্গে। আমরা তো স্কুলে-কলেজে সাহিত্য-কাব্যচর্চা করছি। সব তো ভুলে যাইনি। থাকবি না নরেশ আমার সঙ্গে?'

'আছি... একখানা পত্রিকা শুরু করো।'

'তাই ভাবছি।'

'আর তোর বৃদ্ধাবাস।'

'বড়ো চমৎকার জায়গাটা। যাব মাঝে মাঝে।'

বোধ

সোনালি চক্রবর্তী

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে;

আমি মগ্ন হয়ে দেখতে থাকি লাল টগবগে সূর্যটা স্থির হয়ে ঝিলের ঠিক মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাণপণে আমি ঠিক শব্দের উৎসটা বুঝতে চাই। শীতের সন্ধে নামার শব্দ। শব্দটা হবেই, তবু ঝুপ করে সন্ধে হয়ে যায়। গাঢ় সন্ধে। আমাকে বুঝতে না দিয়ে।

এই দিনগুলোয় আমার বেরোনো বারণ, এই দিনগুলোর জন্য পলাশ আমাকে একটা বেতের চেয়ার কিনে দিয়েছে। চেয়ারটা দোলে। আমি বারান্দায় বসে থাকি চেয়ারটার উপর নানান ভঙ্গিমায়। আমার কাজের মেয়েটা ভাবে আমি বোধহয় ঝিমুচ্ছি। সে আমায় কিছুই জিজ্ঞাসা না করে নিজের মতো কাজ সারে, চুল বাঁধে, টিভি চালায়, গান শোনে। পলাশ নিঃশব্দে অফিস থেকে ফেরে, দূর থেকে কুয়াশার মতো আমাকে দেখে, পোষাক বদলায়, স্নান সারে, কখনো আমার পাশে এসে বসে, আবার কখনো বেরিয়ে যায়। আমি কিন্তু বসেই থাকি, এসময় যে আমি নিজে কোনো কাজই করতে পারি না। এমনকী সেই দোলনা চেয়ারটা থেকে কীভাবে উঠতে হয় তাও ভুলে যাই আমি। আমি শুধু ভাবি, দিন রাত এক করে ভাবি। ভাবনাগুলো কেঁচোর মতোই কিলবিল করতে থাকে মাথায়। পলাশ বলে, এবারের ওযুধটা কী বেশি কড়া?

বাবার কাছে আমার আদর ছিল সবচেয়ে বেশি। বাবা আদর করে ডাকত, পাগল ও পাগল। মা রাগ করত, বলত, কীসব ছাইপাশ নাম। বাবা মজা পেত, আমিও, সেই ছোটোবেলা থেকে আমার মনে হত 'পাগল' এই শব্দটা আসলে অনেক বড়ো। বিশাল বড়ো একটা মানে আছে এর। অনেকটা রসাতলের কাছাকাছি। আমার মতো যাদের ডাকনাম 'পাগল' কিংবা যারা সত্যিই পাগল, রসাতল তাদেরই পৃথিবীর নাম। অসংখ্য বাজ, ভাঙা পাহাড়, প্রচুর বৃষ্টি, একটা গনগনে সূর্য আর একটা উত্তাল সমুদ্র সেই রসাতলে। সেই ছোট্টোবেলা থেকেই আমার মনে হত বাবার মতো করে কেউ কোনোদিনও বোঝেনি আমাকে। পলাশ শুধু চেয়ে থাকে, বুঝতে চায়, আমি যেন ওর কাছে একটা দুধের শিশুর মতো, যার কথা ফোটেনি, যে বলতে পারে না তার কষ্টের কথা। যতই সে কাঁদে মা ভাবে, আহা সোনা, কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোর, মা তাকে আঁকড়ে ধরে, জড়িয়ে ধরে বসে থাকে ভাবে এভাবেই কষ্ট সেরে যাবে। পলাশও এই সময়টায় আমার সাঙ্গে এমনই করে। আমার কষ্ট সারে না। বরং বাড়ে।

আমি ভীষণ কালো। আমার ঠিক ওপরের দিদি অভাবনীয়ভাবেই টুকটুকে ফর্সা, গোলগাল, আহ্লাদী। আমি ঠিক বিপরীত। রোগা, ভোঁতা নাক, মোটা ঠোঁটের একটা মেয়ে। নির্মল বলত, তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর, সব সময় কথা বলছে, ঠিক তোমার উল্টো। পলাশও অনেকটা

একই কথা বলে। তবে নির্মলের মতো করে বলতে পারে না। নির্মল কবিতা লিখত, ছবি আঁকত। বড়দার ভীষণ প্রিয় ছাত্র ছিল, পরের দিকে কলেজে চাকরি পেয়েছিল। আর পলাশ একটা চামড়ার ব্যাগের কারখানায় চাকরি করে। নির্মলের মতো কথা বলা তো দূরের ও কোনোদিন একটা সম্পূর্ণ বাক্যই গঠন করতে পারেনি।

আমার জীবনে এখন কোনো গল্প নেই। একটা সময়ে একটা গল্প ছিল, এখন গল্পটা থেমে আছে। গল্পটা নিজেই নিজের শেষ খুঁজছে। নিজের মতো করে তৈরি হওয়া একটা গল্পের শেষটাও ভীষণ ব্যক্তিগত। যেদিন শেষ হবে আমি তাতে নাক গলাবো না। শুধু চোখ তুলে, গলা বাড়িয়ে দেখে নেব কেমন হল শেষটা?

—আমারই এমন কেন হল রে দিদি, এমন মাথার রোগ?

—মায়ের ছিল শুনেছি, দিদির নিরুত্তাপ গলা।

—ছোড়দা? ছোড়দারও তো হয়। এমনই হয়। কিছু ভালো লাগে না ওর তখন। পুরনো রেকর্ডগুলোকে কীভাবে একটার পর একটা পোড়াতে দেখেছি আমি। আমি দিদির দিকে তাকাই।

—ফ্রাস্টেশন, গানটা কন্টিনিউ না করতে পারার একটা কষ্ট। তার উপর ছোটোবউদির কড়া শাসন, ও তো ভীষণ খামখেয়ালী ছিল একসময়।

—তোর মনে পড়ে দিদি ছোড়দা ঝড়ের সময় কীরকম জোরে জোরে গান গাইত, যত জোরে ঝড় উঠত, ছোড়দার গানও পাল্লা দিয়ে বেড়ে যেত, আমাকে বলত, খুকুবুড়ি শিগগির বারান্দায় আয়, গঙ্গাটার দিকে তাকা, আমাদের পুরোনো বাড়িটা যদি তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে যায় কী অসম্ভব মজা হবে বলত, ঠিক ঠাকুর ভাসানের মতো আমাদের মা দুর্গাকে নিয়ে আমরা চার ভাইবোন জলে তলিয়ে যাব। ছোড়দা এত জীবন্ত ছিল, কিন্তু মরতে চাইতো সবসময়।

নির্মল আর ছোড়দাকে অনেকেই পিঠোপিঠি দুই ভাই বলে ভুল করত। আসলে বড়দা আমাদের থেকে অনেকটা বড়ো। বাবার মৃত্যুটা হয়েছিল হঠাৎ করে। একদিন রোজকার মতো অফিস বেরিয়ে আর ফিরলো না বাবা, তিন-চারদিন কোনো খবর নেই, দাদা থানা, পুলিশ কত কিছু করল, পাঁচদিনের মাথায় কোন্নগরের রেলস্টেশনের ধারে বাবার মৃতদেহটা পাওয়া গেল। কোনো অশান্তি নেই, নির্ঝঞ্ঝাট একটা লোক। আমাদের মতো মাথার অসুখও ছিল না কখনও। পরে শুনেছিলাম অফিসেরই কোনো গোপন ঘটনা জেনে যাওয়ায় মরে যেতে হল বাবাকে, ঝুপ করে শীতের সন্ধের মতো। দাদা সেই থেকে কেমন একটা বুড়ো হয়ে গেল, একটু কুঁজো, চুলগুলো পাকা, দাদা আর দাদা রইল না, বাবা হয়ে গেল, আমাদের সবার বাবা, মাও যেন বড়ো ছেলে হিসেবে দেখত না, দেখত এ-পরিবারের কর্তা হিসেবে। এমনিতেই বাবার আকস্মিক মৃত্যু মাকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছিল। দাদা স্কুল থেকে ফিরলেই মা এক গলা ঘোমটা দিয়ে বলত, কর্তামশাই আজ এত তাড়াতাড়ি যে! একই কথা যে বাবাকে বলত মা।

বাবার মৃত্যুর পর নির্মলের আসাযাওয়া অনেক বেড়ে গেল। ছোড়দা আর নির্মল দিন রাত এক করে কত বিষয় নিয়ে কথা বলত, বেশির ভাগ সময় আমি ওদের শ্রোতা ছিলাম। নির্মল রাজনীতি করত, ছোড়দা রাজনীতির গান গাইত। আমাদের উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়িটা ওদের দাপুটে আলোচনা আর অট্টহাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠত। আমি হাঁ করে নির্মলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ও আমায় আদর করে ডাকত খুড়ি, আমার বাড়ির নাম খুকুবুড়িটাকে ছোটো করে। আমি ভীষণ রেগে যেতাম, নাক ফুলিয়ে ঘুষি দেখাতাম।

নির্মলকে আমি ভালোবেসেছিলাম। শুরুটা হয়েছিল বড়দার বিয়ের সময় থেকে। সেই সময়টা ছোড়দা কেমন একটু বদলে গিয়েছিল। সারাদিন বাড়ির বাইরে বাইরে থাকত, সারা মুখ ভর্তি দাড়ি, কত নতুন নতুন বন্ধু আসত ওর সেইসময়, গম্ভীর অচেনা লোকেরা। বিয়ের দিন বড়দা আমায়

একটা হলুদ রঙের শাড়ি দিয়েছিল, সেই প্রথম শাড়ি পড়া একটা হলুদ পাখি আমি, নির্মল অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল সেদিন। সেইদিন প্রথম বাবার মৃত্যুর পর আমি সেজেছিলাম, তার আগে দীর্ঘ দেড় বছর আয়নার সামনে দাঁড়াতেই ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ আমার কানে সবসময় বাজত পাগল, অ্যাই পাগল।

আয়নায় আমি আমার পেছনে নির্মলকে দেখলাম। এক লহমায় ও টেনে নিল আমায়, জনিয়ে ধরে আমার ঠোঁটটাকে ছিঁড়ে দিতে চাইল। ওর বাঁ হাতটা আমার বুককে পিষে দিতে চাইছিল। আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলাম, পারলাম না। প্রায় এক মিনিট ও আমায় অধিকার করে নিল। নিজেই ছেড়ে দিল তারপর একসময়। চলে গেল, আমি আর ঘর থেকে বেরোতে পারলাম না। লেপ্টে যাওয়া কাজল, ধেবড়ে যাওয়া টিপ নিয়ে ফুলে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম সারাটা দিন। মাঝে একবার কারা যেন ডেকেছিল খুকুবুড়ি বলে। আমি এক গভীর অপরাধবোধ নিয়ে কুঁকড়ে ছিলাম খাটের নীচে, আর সারারাত কেঁদেই চলেছিলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একটা অসম্ভব হইচইতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর থেকে বেরোলাম আমি, শুনলাম বাড়িতে পুলিশ এসছিল, ছোড়দা আর নির্মলের খোঁজে। ওরা পালিয়েছে। কনেযাত্রীরা হতভম্ব, দাদা লজ্জিত, মা একনাগাড়ে কেঁদে চলেছেন, দিদিকে সেইরাত্রেই শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়েছিল জামাইবাবু। আর সেই রাত্রেই ধরা পড়েছিল ছোড়দা। নির্মল পালিয়েছিল। আমি আর মা তারপর সকাল থেকে রাত অবধি বসে থাকতাম বারান্দায় ছোড়দার ফিরে আসার অপেক্ষায়। পুলিশ ওকে কোথায় রেখেছিল তাও জানতে পারেনি। বড়দা একা অনেক খুঁজেছিল, তারপর একদিন সেও এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। বড়ো বউদিকে নিয়ে ভিন্ন হল বড়দা।

একটা দুঃসময়কে কী সাংঘাতিকভাবে প্রত্যক্ষ করেছি সে শুধু আমি জানি, আমি আর আমার পাগলিনী মা দুজনে দুজনকে আগলে রাখতাম অবুঝভাবে। মাও আমায় তখন পাগল বলে ডাকত বাবারই মতো। যদিও আমার সব কথা এখন মনে পড়ে না। কড়া কড়া ওযুধগুলো সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সেটা একাত্তর সাল, যারা ছিল সেসময়টা, অথবা হয়ত ছিল না তারাও কত নতুন তথ্য, গল্প, ঘটনার কথা শোনায়। আর আমি একটা জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়েও সমস্ত বিস্মৃত হয়েছি। নির্মলই এনে দিয়েছিল ছোড়দার খবর। ছোড়দা তখন প্রেসিডেন্সী জেলে। একসঙ্গে নাকি অনেকগুলো অপরাধের চার্জ ওর বিরুদ্ধে। দিদি গিয়েছিল ওকে দেখতে, ফিরে এসে শুধু একটানা কেঁদেই চলেছিল। আমি ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। ততদিনে একটা গভীর মাথার অসুখ আস্তে আস্তে গ্রাস করছে আমাকে।

—এটা অসম্ভব, আমি বারবার ভেবেছি খুড়ি। তুই এবং আমি একসঙ্গে থাকতে পারি না। আমি তোকে ঠকাতে পারব না, তুই পারবি?

—ঠকাবো কেন? আমি অপার বিস্মিত।

—শোন্ আজকাল আমার ভীষণ মনে হয় এই বিবাহপ্রথাটা একধরনের জোচ্চুরি। একজন পতিতা এবং একজন বহুগামী একসঙ্গে থাকবে কী করে?

—মানে?

—ভীষণ সিম্পল। সেই আদিম সময়ের সবকটা প্রবৃত্তিই কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে জানিস। একজন পুরুষ যে একটা বিশাল সময় ধরে বিভিন্ন নারীর কাছে যেত আবার সেই নারীও যে আরও অন্যান্য পুরুষের ভোগ্যা ছিল। আর সেটাই সত্য। এই সত্যটাকে বিবাহ নামক একটা ভণ্ড প্রতিষ্ঠান ঢাকার চেষ্টা করছে। হয়ত এটা অন্যায় নয়। কিন্তু আমি এটা মানতে পারি না। আমি তোকে চাই, কিন্তু তা বলে তোকে নিয়ে, মানে একা তোকে নিয়ে সুখী হওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমি বোকার মতো চেয়েছিলাম ওর দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না ওর কথা, সে কী আমি পাগল বলে? বিয়ের আগে পলাশকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি ওর বিয়েটা নিয়ে বিশ্বাস কী? আমার জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি। নির্মল আমাকে মুখের উপর না বলে দিয়েছিল। ও চলে গিয়েছিল কলকাতার বাইরে পড়াশোনার জন্য। আমি একটা কুৎসিত কালো মেয়ে, তার ওপর পিতৃহীনা, যার দাদা ফেরারী আসামী, মা সম্পূর্ণ পাগলিনী তাকে কোনো সাহসই মানায় না। দিদি আর জামাইবাবু সেইসময় বহু চেষ্টা করেছিল আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য। রোজ রোজ নতুন একটা করে সম্বন্ধ আনত ওরা। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক ছবি তোলা হয়েছিল আমার, তবুও আমায় কেউ পছন্দ করল না। কালো, কুৎসিত, একটা রোগা মেয়ে।

নির্মল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর প্রায় দু মাস আমি কলেজে যাইনি। ঘরে আলো জ্বালাইনি। অসুবিধা হত না, কারণ বাড়িতে প্রাণী বলতে আমি আর মা, যাদের কারোরই আলোর প্রয়োজন নেই। এরই মধ্যে একদিন রাত্রিবেলার ট্রেনে হঠাৎই একা এসে হাজির হয়েছিল জামাইবাবু; আমি তখন আমার ঘরে দ এর মতো হাঁটু মুড়ে বসে আছি। একমনে ভাবছি, কী ভাবছি জানা নেই। দরজাটা কখন বন্ধ হয়েছিল, কখন আবার খুলে গেল তাও ঠিক মনে নেই। শুধু সারা শরীরে অসম্ভব এক যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। আর বিছানার চাদরে চাপ চাপ কিছু রক্ত।

তারপর থেকে জামাইবাবুই আমায় নিয়ে যেত পাগলদের ডাক্তারের কাছে। প্রচুর ওষুধ আর ঘুমপাড়ানী ইঞ্জেকশন। এরই মধ্যে আমার শরীর একটা নতুন ভাষা পেল, মা হতে চলেছিলাম আমি। সেই দীর্ঘ দু বছর দিদি আমাদের বাড়িতে আসেনি। জামাইবাবুই আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেল, বলল, পাপ রাখতে নেই। সেদিন প্রথম আমি অনেকদিন বাদে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। চিৎকার করে কেঁদেছিলাম নির্মলের নাম ধরে। মা হতে চেয়েছিলাম আমি, মা, তারপর সব অন্ধকার...।

—আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে।

—সকালে দেখলাম তুমি গুনগুন করে গান গাইছ, মনটা বোধহয় ভালো....। ব্যাগটা নামাল পলাশ। ডঃ নন্দীর কথামতোই আমার এই অসুখটার সময় আপ্রাণ আমার খেয়াল রাখে পলাশ। ছোড়দাও ডঃ নন্দীর পেশেন্ট। সেই চরম অত্যাচারের সময়টাকে ভুলতে পারেনি ছোড়দা। দিদি বলত ওকে নাকি ঝুলিয়ে পেটানো হত জেলে। মাঝখানে একবার আমাদের পাড়ায় পুলিশের গাড়িতে করে ওকে নিয়ে এসেছিল ওরা, ওর শরীর ঢাকা ছিল বোরখা দিয়ে। দিদিই চিনেছিল, আমি চিনতে পারিনি। পাটা সামান্য ফোলা ছিল। বুড়ো আঙুলে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। ছোড়দার বাঁ পায়ের একটা আঙুল বেশি ছিল, সেই দেখেই চিনেছিল দিদি। একটা খুন হয়েছিল তখন সেই কারণেই সনাক্তকরণের জন্য ছোড়দাকে এনেছিল ওরা। এই খবরটাও নির্মল দিয়েছিল আমাদের। মা জানতো ছোড়দাকে সেদিন সঙ্গে করে নিয়েই ফিরবো আমরা। আমরা যথারীতি একা ফিরে আসি। মায়ের তখন সে কী বুকফাটা কান্না।

কাজের মেয়েটাই ফোনটা এগিয়ে দিল। অসুখের সময় আমার ফোন ধরতে ইচ্ছে করে না। কারোর সঙ্গে কথা বলতে মন চায় না। কিন্তু পলাশ তখন বাথরুমে। ফোনে নাকি আমাকেই চাইছে। ওপারে ছোটো বউদির গলা। জড়িয়ে জড়িয়ে কীসব বলছে ছোটো বউদি, কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট হলো কথাগুলো—

—খুকুবুড়ি, তোর ছোড়দার একটা সিভিয়ার অ্যাটাক...আজ রেওয়াজ করার সময়, তুই পলাশকে একটা খবর...আমি পরের কথাগুলো শুতে পাইনি। পলাশ কাজের মেয়েটার চিৎকারেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমি ততক্ষণে চেয়ার থেকে একদম মেঝেতে।

আমার প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট করে দেওয়ার পর আমার দ্বিতীয়বারের জন্য বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা

শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছোড়দার আদরের বোন ছিলাম আমি, আমায় ও প্রায়ই বলত, খুকুবুড়ি তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় পূরবী রাগের মতো। পূরবী রাগ গাইলেই আমি একটা দুখী নিষ্পাপ মেয়েকে দেখতে পাই। তুই যত স্পষ্ট হয়ে উঠিস তত এই রাগটার মানে খুঁজে পাই আমি। জেল থেকে ফিরে আসার পর সব জানতে পেরেছিল ছোড়দা। জামাইবাবু আর আমার সম্পর্কের কথা, বাচ্চাটার কথা, দিদিই জানিয়েছিল ওকে। বাড়িতে ফিরে এসে সেই যে ঘরের শিকল তুলে দিল সেদিন আর খুললই না। পরের দিন ভোরবেলা আমার ঘরে এসে আমায় ঘুম থেকে তুলেছিল। বলেছিল, একবার বল খুকুবুড়ি এই সমস্ত কিছু মিথ্যা। তোর সায় ছিল না? আমি মাথা নীচু করে রইলাম। চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। কেমন করে বলি, না, রাতের পর রাত লোকটাকে সহ্য তো আমিও করতাম। তখন আসলে কেউ ছিল না রে ছোড়দা, বাবা নেই, বড়দা ভিন্ন সংসার পেতে উদাসীন, তুই জেলে, এমনকী নির্মল তার নিজের ধারণায় বন্দী। একমাত্র ওই লোকটাই পাশে ছিল। যেভাবেই থাকুক না কেন, ছিল তো। ভাবতাম যদি বাধা দিলে ছেড়ে চলে যায়। একটা পুরুষের তো প্রয়োজন হয় জীবনে। নির্মলকে চাইতাম আমি মন দিয়ে, শরীর দিয়ে। কিন্তু একটা পরিণত লোকের আঙুলগুলো যখন একজন সদ্যযুবতীর বিভিন্ন স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গে খেলা করে একটা রোমাঞ্চ তো আসেই। একটা যুবতী তার শরীরের ভাষাকে অস্বীকার করবে কী করে। শরীর বাঁচতে চায়, এঁটো হয়েও বাঁচতে চায় শরীর। পারিনি রে ছোডদা। মায়েব চিকিৎসার খরচটা ছিল, তোর কেসের খরচ, আমার মাথার অসুখের ওষুধও সেই সময় কিনে দিত লোকটা। তোকে কী করে বোঝাবো বল ওই ভয়ানকভাবে বাঁচাটাকেই জীবন বলে ভাবতে চেয়েছিলাম আমি।

এসব কিছুই বলে উঠতে পারিনি আমি ছোড়দাকে। আমার মাথায় হাত দিয়ে ছোড়দা সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনোদিনও পূরবী গাইবে না, মরে গেছে তার খুকুবুড়ি। আমার যখন একেব পর এক সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে, আমি জানি ছোড়দা কিন্তু নির্মলকে একবাব বললেই ও হয়তো আমায় বিয়ে করত। ছোডদা বলেনি বরং নিজে গিয়েছিল নির্মলের সাঙ্গে নির্মলের জন্য মেয়ে দেখতে। অসুস্থ মায়ের পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল সেই সতীসাবিত্রী মেয়েটিব কথা। আর নির্মল যে মেয়েদেরকে পতিতা ছাড়া কিছুই ভাবত না, যে আমায় বুঝিয়েছিল পুরুষ মাত্রই বহুগামী, সে কিন্তু খুব সাধারণভাবেই বিয়ে করল মেয়েটিকে। মেনেও নিল ছোডদার ভাষায় সতীসাবিত্রী সেই মেয়েটিকে ও বিবাহ নামক একগামী জীবনের এক ভণ্ডামিকে।

সেই বছরের শীতের শুরুতেই মা মারা গেল। আমরা কেউই কাঁদিনি। কারণ আমাদের মা অনেক আগেই মৃতা ছিলেন আমাদের কাছে। মাকে আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। সেদিন তাকে দাহ করা হল মাত্র। মায়ের মৃত্যুর মাধ্যমেই আবার দিদি স্বাভাবিকভাবই আসা যাওয়া শুরু করল আমাদের বাড়িতে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় ওই বিশাল বাড়িটাতে থাকতাম আমি আর ছোড়দা, দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের মতো। ছোড়দা তখন যেন আমার মুখ দেখাটাকেও পাপ বলে মনে করত। একদিন এর হাত ফিরে, ওর মুখ দিয়ে পলাশের সঙ্গে সম্বন্ধটা এল। অনাথ ছেলে পলাশ এক অভাগিনী কালো কুৎসিত মেয়ের পাণিগ্রহণ করল রূপকথার মতোই। কিন্তু রূপকথাটা শেষ হল না। প্রেতপুরীর ছায়ায় অভিশপ্ত হয়ে রইল আমাদের গোটা সংসারটা। দিদির একটা অসুখী জীবন, বড়োদার পুরো সংসারটা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, ছোড়দার একটা ভুল বিয়ে, গান থেকে যাওয়া, আর আমার মাথার অসুখ, মা হতে না পারা। আমরা সবাই মিলে একটা বড়ো 'না' এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম একটা বিশাল 'হাঠাৎ' এর জন্য।

সমস্ত হাসপাতালে একটা লম্বা স্ট্রাইপের নীল পর্দা ঝুলতে দেখেছি বরাবর। অবশ্য এটা

একেবারেই অন্যরকম। পর্দাটার গায়ে একটা স্নিগ্ধ নদীর ছবি আঁকা, তাতে এক পালতোলা নৌকা, বাঁদিকে লম্বা করে লেখা রয়েছে 'সোনার তরী'র আমার প্রিয় পংক্তিগুলো—'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে?/বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে'...। উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির বারান্দায় বসে আমি আর ছোড়দা 'সোনার তরী' আবৃত্তি করতাম। সূর্যাস্তের সময় যেদিন ছোড়দা বাড়িতে থাকত, আমাকে ডেকে বলতো, খুকুবুড়ি দেখ সেই নৌকাটা। আমরা দুজনেই জানতাম না ওটা কোন্ নৌকা? শুধু একটা অচেনা জিনিসের সঙ্গে রোজ নতুন করে একান্ত হতে চাইতাম আমরা। ছোড়দা চেঁচিয়ে বলত ও রহিম মিঞা, জল কত গভীর? ও সফিকুল চাচা, মাছ হল? হ্যাঁগো রতন ভাই, বাড়ির সব ভালো তো? ওরা কেউই আমাদের কথা শুনতে পেত না। আমরাও কেউ শোনাতেও চাইতাম না, দুজনে দাঁড়িয়ে গল্প বানাতাম ওদের নিয়ে আর হো হো করে হাসতাম। সেই অসুখের সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে কতবার চিৎকার করে ডেকে উঠেছি সেই সব পুরনো নাম ধরে। পালাতে চাইতাম ওইসব মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে। পালানোই বোধহয় পাগল মানুষদের একমাত্র বিশ্বাস, একমাত্র আশ্রয়।

—জানো এই ঘরে আমার ঠিক আগের রোগীই ছিলেন একজন শিল্পী, উনিই নাকি দিয়ে গেছেন এই পর্দাগুলো। সুন্দর না?

—রিপোর্ট আজ বিকেলের মধ্যেই. তারপরই বাড়ি...যাওয়া কেমন? পলাশকে বেশ ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো।

আমি একটু জোরেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম, ছোড়দার খবর নিয়েছো আজকে?

—হ্যাঁ, ডাক্তার বলল তো চিন্তার কিছু নেই, তবে কিছুদিন একদম বিশ্রামে. উত্তেজনা নয়, বেরোনো বারণ।

আমার তিন চার ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষা চলেছে। নার্ভের ওষুধগুলো এখন বন্ধ। এখনও বেশ কিছুদিন এই ঘরটাতে থাকতে হবে আমায়। সেদিন সন্ধেবেলা পলাশের আসার ঠিক আগেই আমার আয়া এসে বলল একজন মাঝবয়সী পুরুষ নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি ভাবতে পারিনি নির্মলকে আবার কোনো দিন দেখতে পাবো। ওর সেই ছিপছিপে চেহারাটা নেই, তবে বাঙালি মাঝবয়সী পুরুষের মতো মোটাসোটা, গোলগালও হয়নি। ও বলল দিল্লির লোকেরা কলকাতার মানুষের মতো শুয়ে বসে থাকার সুযোগ পায় না। কলেজ ছাড়াও একটা আঁকার স্টুডিও আছে ওর। ওর বউয়ের একটা নিজস্ব বুটিকও আছে, দুজনে মিলে তা চালায়। নির্মল বউ অন্ত প্রাণ, সম্পূর্ণ একগামী, নির্ভেজাল এক স্বামী। বউটিও নাকি লক্ষ্মীমন্ত। নির্মল ভালোবাসার এক সংসারের গল্প শুনিয়ে গেল। আমায় বলল দ্রুত সেরে উঠতে।

আমি হয়ত একদিন সত্যিই সেরে উঠব। ডঃ নন্দীর সেই ভয়াল চেম্বারটাতে আর হয়ত কোনোদিনও যেতে হবে না আমায়। সেই বউটা যে হঠাৎ হঠাৎ চেম্বারের বন্ধ দরজাটা খুলে ঢুকে যেত ভেতরে আর বলত আমাকে বাঁচান, ওরা পুড়িয়ে দেবে নাহলে। সেই ছোট্ট ছেলেটা যে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদত আর বলত মারছে, ওরা মারছে, কে যেন দিনরাত ওকে মারার ভয় দেখিয়ে চলত। আমার ভীষণ অবাক লাগত সেই সুদর্শন লম্বা পুরুষটির কথা ভেবে, হাতে একটা অ্যাটাচি আর একটা দামি ব্লেজার পরে আসত, সবার কাছে ঘুরে ঘুরে যে জিজ্ঞাসা করত, আপনি দেখেছেন? দেখেছেন আপনি? কী হারিয়েছিল সেই মানুষটা আমি জানি না, তবে নিরন্তর ওর এই খুঁজে চলা আমাকে ভাবাত। খোঁজই কী তবে মানুষকে পাগল করে, সুখের খোঁজ, আশার খোঁজ, স্বপ্নের খোঁজ, ভালোবাসার খোঁজ..

আমি অভাবনীয়ভাবেই ফের অন্তঃসত্বা, পলাশ রিপোর্টটা হাতে নিয়ে আমায় বলতে এসেছিল, বলার আগের সময় থেকেই কেঁদে চলেছিল ও। দিদি এসেছিল খবরটা পেয়ে, বলল, কম ডেকেছি

ঠাকুরকে, দিনরাত বলতাম ঠাকুর ওকে মাপ করে দেও, একটা ছেলেপুলে দেও, আর কত কষ্ট দেবে, ওকে একটু স্থিতু হয়ে একটা সংসার করতে দেও ঠাকুর। ওরা সবাই ভীষণ খুশি হয়েছিল। পলাশ আরও কয়েকটা নতুন চাকরির খোঁজ করতে শুরু করল। আমারও উচিত মনে হল ওদের সঙ্গে আবার একটা স্বপ্নকে বিশ্বাস করতে শুরু করা।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। কাজের মেয়েটা আমাকে দেখে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। মনে হল ও যেন একটুকুও খুশি হয় নি। আসলে আমি সবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুশি নিয়ে এত বেশি ভাবতাম। ছোটো বউদির ফোন এসেছিল ছোড়দাও সুস্থ হয়ে উঠছিল, অনেকটা বদলে গিয়েছে ছোটোবউদি, ছোড়দাকে হারানোর ভয়ে ভালোবাসতে শুরু করেছে ওকে। আমি ঘুমোতে চাইলাম, পলাশকে বললাম, আমি আজ ঘুমের ওষুধ খাবো না। অনেকদিন পর একটা নিশ্চিন্তির ঢেউ নাচছিল তিরতির করে সারা শরীরে। শেষরাতেই বোধহয় তখন, একটা চাপা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভাঙল, আমি বিছানায় উঠে বসলাম। পাশে পলাশ নেই, বুঝলাম বসার ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে! আমি এগিয়ে গেলাম, কাজের মেয়েটা পলাশের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে আর বলছে, এবার বলে দেও আমি কী করব, বউদির পেটে বাচ্চা, আমার পেটেও, কেন তবে তুমি বলেছিলে তোমাদের বাচ্চা হবে না। একে আমি মারব কী করে? পাঁচ মাসের পোয়াতি, বলে দেও কী করব আমি?

—আঃ আস্তে, আজ তোর বউদি ঘুমের ওষুধ নেয়নি, আজ জেগে উঠতে পারে। সরে যা, পরে কিছু একটা ভেবে...

কখন, কখন হল এসব, হা ঈশ্বর, যদি, কোনো রাতেই না খেতাম ওই কড়া ওষুধগুলো, তবে হয়ত এমনটা হত না। তাই রোজ রাত্রে পলাশ আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করত, ঘুমের ওষুধটা খেয়ে শুয়েছ তো? নিজের হাতেও কতবার মনে করে ওষুধটা এগিয়ে দিয়েছে ও, তখন ভাবতাম যত্ন নিচ্ছে আমার। বিষ দিলে না কেন আমায় পলাশ, একেবারে মেরে না ফেলে তিলতিল করে ঘুম পাড়ানোর কী প্রয়োজন ছিল। নির্মলের কথাই সত্যি। পারেনা, একজন বহুগামী আর একজন পতিতা। একসঙ্গে থাকবে কী করে তারা। পৃথিবীটা এত বড়ো নয় যে দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারে। আবার হয়ত এত ছোটোও নয় যে দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারে না।

খুকুবুড়ি, আজ একবার আসবি, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তোকে।

—আমারও রে ছোড়দা, তুই ছাড়া এখন আমি কার কাছে যাই বল। কাকে গিয়ে বলি সর্বনাশের কথা, মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে তোর বুকে মাথা গুঁজে কাঁদি। ছোড়দার ফোনে গলা পেয়ে কান্নাটা দলা পাকিয়ে গলায় উঠে আসল। আমি চুপ করে রইলাম।

—কথা বলবি না খুকুবুড়ি? এত অভিমান! আজ অনেকদিন পর তোকে দেখতে চাইছি, আসবি না?

—আসব। এইটুকু বলেই ফোন রেখে আঝোরে কাঁদতে লাগলাম আমি। পলাশকে বলা নেই। এখন আমার বেরোনো বারণ। বাচ্চাটা একটু অসাবধানতায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার তাতে কী, এটা পলাশের সন্তান, পলাশ নিশ্চিন্ত, ও বাবা হবেই, নয় ওই মেয়েটার, নয় আমার।

ছোড়দা বারান্দায় ছিল। বাড়িতে ছোটোবউদিকে দেখলাম না; বোধহয় নেই। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম আর ফিরব না পলাশের কাছে। ছোড়দার কাছেও থাকব না, ঠিক সূর্যাস্তের সময় সূর্য ডোবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝুপ করে নেমে যাব গঙ্গায়, তলিয়ে যাব, আর উঠব না। নিঃশব্দে আমি ছোড়দার পাশের চেয়ারে বসলাম। ছোড়দা ঘাড় ঘুরোলো, কেমন এক ক্লান্ত শ্রমণের মতো চেহারা হয়েছে ছোড়দার। দীর্ঘদিনের না কামানো দাড়ি। বড্ড প্রণাম করতে ইচ্ছে করছিল আমার। ও হাসল আমায় বলল, আরও কাছে এসে বোস, ভালো করে দেখি, কেমন আছে পাগলিটা।

ছোড়দা আমার হাতটা ছুঁলো, আমি নিজেকে সংযত করতে পারলাম না, হু করে কাঁদতে লাগলাম বললাম, আমি বাঁচতে চাই না ছোড়দা, আমি বাঁচতে চাই না। আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল ছোড়দা। ঠিক সূর্যাস্তের সময়, নৌকাগুলো ভীষণ ধীর লয়ে বয়ে যাচ্ছে তখন একটা রক্তিম নদীর ওপর দিয়ে। আমি বলতে থাকলাম সমস্ত কথা সেই প্রথম ছোড়দাকে।

খুকুবুড়ি, চোখ মোছ দ্যাখ সেই সফিকুল চাচা, রহিম মিঞা, রতন ভাইয়ের নৌকাগুলো। ওরা কী ভীষণভাবে সত্য হয়ে রয়েছে দ্যাখ। আমি বদলে গেছি, তুই বদলে গেছিস, আমরা মরে গিয়েছি মৃত্যুর আগে, ওরা কিন্তু টাটকা, জ্যান্ত হয়ে রয়েছে। এই সব কিছুর পরেও তোকে, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের একটা মজা আছে জানিস, সেটা হল গিয়ে জীবনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘুরতে থাকা লাট্টুর মতো এই জীবনটাকে দেখা। তুই মা হবি, তোর সন্তান একদিন বড়োও হবে, আরও একটা নতুন জীবন, একটা নতুন ইতিহাস। তুই এখন ইতিহাসের এক চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে তিন প্রজন্মকে বহন করছিস খুকুবুড়ি, আমার মা, তোর নিজের, আর এই অনাগত শিশুটির। এই ইতিহাসই পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে পুরনো, একটা মেয়েই পারে এর সাক্ষী হতে। তুই আমার পাগলি মা, আমার পাগলি বোন, আবার আমার পাগলি মেয়েও। নির্মল তোকে এক আদিম প্রবৃত্তির গল্প শুনিয়েছে মাত্র, সেটা দাসত্বের। প্রভুত্ব তো করেছে ভালোবাসা। একটা সনাতন ধর্ম সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। প্রবৃত্তির ইতিহাসের থেকে চেতনার ইতিহাস অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি মহার্ঘ্য। আমরা বাঁচব রে খুকুবুড়ি, আমাদের বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকাই আমাদের প্রতিবাদ।

সন্ধে তখন অসম্ভব গাঢ় হয়ে সারা শহরটার বুকে চেপে বসেছে। শীতটা জাঁকিয়ে নামছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার গল্পের শেষটা কী হবে, পলাশের ওই বাচ্চাটার কি হবে, কী হবে ছোড়দার গানের? কেমন থাকব আমি? ওই কাজের মেয়েটা? আমরা সবাই? ছোড়দার দিকে চাইলাম আমি বললাম, গাইবে ছোড়দা? একবার ওই পূরবীটা, আবারও। ছোড়দা রাগটার মুখরা শুরু করল। একটা দুখী মেয়ের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে, একটা করুণ সন্ধের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে দুজন অতৃপ্ত মানুষ দুজনের মধ্যে দিয়ে, একই রাগের মূর্ছনার মধ্যে দিয়ে একটা সত্য খোঁজার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল। সঙ্গীত তাদের সারা শরীরে শুশ্রূষার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। তাদের ক্ষত জুড়োচ্ছিল একটু একটু করে। তাদের দুজনের মাথার ভেতর কার অশান্ত, অসংখ্য কেঁচোগুলো সবাই শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল তখন। অনেকদিনের সহবাস ওদের, ওরাও ক্লান্ত। তৃপ্তির পরেও কেন এত ফাঁকা হয়ে যায় হৃদয়, কেন এত গভীর অসুখ ওদের সমস্ত জীবনটা জুড়ে। এক অতিকায় 'কেন' ওদের ঠিক পাশেই শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু ওরা দুজনে এখন মগ্ন। আপাতত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, ভালো থাকবে।

ফতেমা

সৌতি মিত্র

খিরিশতলা আজ একটু বেশি সরগরম। প্রখর রোদে ঝিমিয়ে পড়া গাছটার ফাঁক দিয়ে যেন আগুন নামছে। ছোটো ছোটো ছাউনির তলায় বসে যারা কোর্ট পেপার বিক্রি করছে কিংবা কোনো কেসের দিন নেওয়ার দরখাস্ত লিখে দিচ্ছে তাদের হাসফাঁস অবস্থা। অনেকে পাশের মিষ্টির দোকানে ঢুকছে তো বেরোচ্ছে না। খিরিশতলায় দিন দিন লোকের আনাগোনা বাড়ছে দেখে সুদর্শন বাগুই এই জমকালো দোকানটা দুই বছর হল করেছে। জেরক্সের দোকানগুলোও বেশ চলছে। এই অঞ্চলে পাঁচ বছর আগে এক কলেজ সংলগ্ন একটি হ্যাণ্ড জেরক্স ছিল মাত্র। এখন খিরিশতলার আশেপাশেই চারটে অটোমেটিক জেরক্স। আজকাল কোনোদিন এমন ভয়ঙ্কর ভিড় ও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো সাধারণত রাজনৈতিক দাঙ্গার শুনানির দিন। এখন তো ভায়ে-ভায়ে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদও রাজনৈতিক দাঙ্গার চেহারা নেয়। এক একটা কেসের আসামী পঞ্চাশ একশ পর্যন্ত। রবি মুহুরীর ডেরায় বসেছে একদল। সবার মাঝখানে কাদের সেখ আর তার ভাই নাসের। তাকিয়ে কাছে বিপক্ষ দলের দিকে। এ দলের মধ্যমণি ফতেমার মা। এ পক্ষে লোকসংখ্যা কম। কাদের সেখ ফতেমার মার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকালেও মহিলার চোখে বিন্দুমাত্র শঙ্কার ছায়া নেই। মাঝে মধ্যে নাসের সেখের গা জ্বালানে টিপ্পনী—

এ্যাতদিন শুধু দেখতিচি কৎদূর বাড়তে পারে, এবার একদিন তুলে এনে ধানি লঙ্কা ছেঁচার মতো ছিটোবো।

কোর্টচত্বরে লোকে এসব রসিকতার মতো উপভোগ করে। ফতেমার মাও জবাব দেয়—

হাগ্‌তে বসতে হয় পানী দেখে। এখন পোঁদে গু লিয়ে কৎদূর ছুটাই দ্যাখ উলাউটো। পাড়ায় হলে এই নিয়েই লাঠালাঠি শুরু হয়ে যেত। এখানে সে সুযোগ নেই বলে এই বাক্‌যুদ্ধই সম্বল। ভ্যাপসা গরমটাকে আরও কঠোর করে তোলে এই অপেক্ষমান আসামীদের উত্তেজনা।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ডাক পড়ে এদের। পাঁচ বছর আগের একটা রাজনৈতিক খুনের একমাত্র আসামী ফতেমার মা। কিন্তু খুনের পরবর্তী উত্তেজনায় ঘর ভাঙে, লুট-তরাজ হয় আগুন জ্বলে, উভয় পক্ষের এফ. আই. আর.-এ আসামী হয় এক একটি গ্রাম। আদালত চত্তরে মেলা বসে যায়। কোনো দল গ্রামে ঢুকতে পারে না, কিন্তু আদালতে আসে। আকারে, ইঙ্গিতে, কৌতুক রসিকতায়, ব্যঙ্গের হাসিতে, আগুন ঝরানো চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেয়—শোধ তারাও নেবে; অথবা এখনো অনেক বাকি। কখনো প্রকাশ্য খুনও লোপাট হয়ে যায়। টাকা দিয়ে পি. পি.-কে কিনে নিলেই হল। সরকার পক্ষের উকিল নির্বাক থাকলে জজেরই বা কী করার আছে। ফতেমার মা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসে দুবার যে কথা বলে গেছে—এবারেও সেই একই কথা চিৎকার করে বলে যাচ্ছে।

—মুই লিজের চক্ষে দেখিচি, সোকাল বেলা কালাম চাচা পাইখানা ফিরে বড়ো বাঁধে উঠেচে, আর ওই কাদের ও নাসের উলাউঠাদুটো বাবলা গাছের আড়াল থিকে গুলি ছুঁড়েছে। চাচা মোর মাটিতে পড়ে ছট্‌কাচ্ছে, ছুটে গিয়ে দেখি লোয়ে (রক্তে) ভেসে যেচ্ছে কাপুড়, লুনি। মুই আল্লার নামে কবুল করিচি জর্জ সাহেব মুয়ে (মুখে) মিথ্যে কতা কখুনই বলবনি।

প্রতিবারের মতো এবারেও দিন পড়ে যায় কেসের। কাদের সেখের দল হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। সোজা মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়ে।

ফতেমার মা কাটগড়া থেকে থেকে নেমে দলনেতা বিমলেন্দুবাবুর কাছে জানতে চায়—এবারেও অরা জিতে গেল বাবু?—

বিমলেন্দুবাবু বলেন—

জিততে এখন অনেক দেরি চাচি। তবে মনে হয় উকিলকে প্রচুর টাকা খাইয়েছে। দেখি কী করা যায়। আমরাও পার্টিগতভাবে লড়ে যাব।

বেশ একটু জোর পায় ফতেমার মা। বলে—

সি কতা বলতে, মুই জমি লিড়িয়ে, জরির কাজ করে কেসের টাকা জুগাড় করতিচি। দু'বছর তো পার্টিই সব করেচে। তারপর পার্টির লোকই বলল একটা রফাসলা করে লাও। মুই রাজি হইনি। এক বছর পাড়ার ছেলেদের লিয়ে একাই কোর্টে এইচি। তারপর ভাবনুন—ই সব লিতাদের দ্বারা হবেনি। ছেলেদের লিয়ে তুমার আর লেখাদির কাছে গেনুন। ঠিক কিনা বল? বিমলেন্দুবাবু বলেন—

ঠিক আছে চাচি, আমি লেখাদির সঙ্গে কথা বলব, কী হয় না হয়। আমার একটা মিটিং আছে। যারা এসেছে তাদের নিয়ে সাবধানে বাড়ি যান। লেখাদির কাছে থেকে খবর নেবেন। বলে বিমলেন্দুবাবু বেরিয়ে যান।

কাদের সেখের দল এরপর দু'বার পাড়ায় ঢুকে শাসিয়ে গেছে। হাটে, বাজারে, রাস্তায়, গ্রামে যাকে যেখানে পেয়েছে খুন, লুট-তবাজেব ভয় দেখিয়েছে। ফতেমার মা-কে গালিগালাজ করেছে অকথ্য ভাষায়। পাড়ার ডাকাবুকো ছেলেরা তখন মাঠে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফতেমার মাও মেয়ে-জামাই-এর বিবাদ মেটাতে একদিন ফেরেনি। সুযোগ বুঝেই এসেছিল। শাসিয়ে গেছে এম.এল.এ.কে নিয়ে মিছিল করে গ্রামে ঢুকবে; এবার ঢুকলে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেবে।

এইসব ছোটোখাটো রাজনৈতিক দাঙ্গা দেশের ইতিহাসের পাতা সেভাবে ভরায় না। এগুলি অন্তর্বিরোধের খাতায় লট্‌কে থাকে। দীর্ঘদিন শাসকরূপে থাকতে থাকতে কখনো একই দলের মধ্যে কখনো শরিক দল বলে পরিচিত দলগুলির সঙ্গে এই লড়াই চলতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষত নাগরিক জীবনে ঠাণ্ডা লড়াই বা প্রতিযোগিতামূলক লড়াই-এর কঠিন মোড়কে এ লড়াই বহু প্রাচীন। গ্রাম্য রাজনীতি সেই গুপ্ত তরবারি খেলা সেভাবে রপ্ত করতে পারেনি। তাই প্রকাশ্য লড়াই-এর ময়দানে এরা নেমে পড়ে। খবরের কাগজে, দূরদর্শনের পর্দায় দেখে উচ্চকোটিতে কীভাবে বাঘে-ছাগলে একঘাটে জল খাচ্ছে। নেতাদের উদ্দেশ্যে গাল পেড়ে, খবরের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে, দূরদর্শনের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিস্ফল প্রতিবাদ জানায়।

খবরটা পাওয়ামাত্র ফিরে এসেছে ফতেমার মা। কাল সারাদিন মেয়ে-জামাইকে বুঝিয়েছে। জামাই-এর কাছ থেকে ভালো কোনো ইঙ্গিত পায়নি। বুঝতে পারে পাড়ার কিছু লোক গোপনে ওর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। এখন জামাই শুধু ফতেমাকে মারে না, বিদ্রূপ করে শোনায়—এবং মুশায়েরা।

যেমন দজ্জাল মা! এই বয়সেও পাড়ার জোয়ান মদ্দদের নিয়ে কোর্টে যাচ্ছে। কেন, কালাম কী তোমার মায়ের এ ছিল?

ফতেমা রাতভোর মায়ের বুক জড়িয়ে কেঁদেছে। ফতেমার মা সারারাত গর্জেছে। সকালে একটা হেস্তনেস্ত করেই যাবে। কিন্তু ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই খবর এল। এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েও আসার আগে জামাইকে বলে এসেছে।

—মোর বুন বেঁচে থাকলে দেখতুন, তুই কী করে মোর মেয়ের গায়ে হাত তুলিস! বুনটা মরে যেয়ে মোর কাল হল। মুই ভাবনুন, বুনের ছেলে বড়ো লাচারে পড়েছে, বাপটাও নেই। মোর মেয়েটারে তোর হাতে তুলে দিলুম। তুই মোর দুদের ছেনারে মারতিছিস্। মুই এট্টু ঝামেলায় আছি বলে সুযোগ লিচ্ছিস্? মোর মেয়েরে ডেঁট্রে যেচ্ছি, তকেও বলছি—এবার মেয়ের গায়ে হাত দিলে ভালো হবেনি বলে গেলুম।

খবর নিয়ে এসেছিল নাসির। খুন হয়ে যাওয়া কালাম অর আব্বা। জামাই নাসিরকে দেখে মুখ বেঁকিয়ে ঘরে ঢুকে গেছে। মেয়েকে এভাবে রেখে আসতে মন চায়নি, তবু আসতে হল। দু'মাইল হাঁটা পথ, কোথা পা পড়ছে তার ঠিক্ নেই। মনের মধ্যে ঝড় বহে চলেছে। কাদের সেখের দলকে সে ভয় পায় না। পাঁচ বছর ধরে তাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ইঁট ছোঁড়া, কত কষ্ট করে সেবার কাটা দশেক ধান চাষ করেছিল। 'উলাউটোরা' পাকা ধানে মই টেনে সব ঝড়িয়ে দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। ওইটুকু মেয়ের উপর অত্যাচার করবে শাসিয়ে গিয়েছিল। সেদিন ফতেমার কী কান্না। 'জরকেসে' নাসের হাটের লোকের সামনে ওর হাত ধরে টানাটানি করেছিল। হঠাৎ লোক জমে যাওয়ায় তবে ছেড়েছিল। সেই জ্বালাতেই তো চোদ্দ বছরের মেয়েটাকে 'বুনের ছেলের' হাতে তুলে দিয়েছিল। এখন আর পারে না। ওসব ফুঁকো গর্জানোকে ফতেমার মা ভয় পায় না। ভয় পেয়েছে অন্য কথায়। ওপর তলার নেতাদের কোনো বিশ্বাস নেই। রফাসলার কথা বলেছিল রাজি হয়নি। এখন সত্যিই যদি এম.এল.এ.কে নিয়ে মিছিল করে ঢুকে পড়ে! 'হায়! আল্লাশয়তানের কোনো শাস্তি হয় না কেন?'

পাড়ায় যাবার আগে লেখাদির সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা জানতে হবে। এই ভেবে ফতেমার মা নাসিরকে বলে—তুই ঘরকে যা নাসির। দিদির সঙ্গে দেখা করে মুই যেচ্ছি।

হা দিদি শুনেছ, মুই একদিন ছিলুমনি উলাউটোরা পাড়ায় ঢুকে সেঁসে গেছে—এম.এল.এ.কে লিয়ে নাকি পাড়ায় ঢুকবে। ওদিকে মোর মেয়েটারে লিয়ে আর এক ঝামেলা। মেয়েটাকে রোজ মারে। দিদি গো, একটা মেয়ে, জামাই যখুন যা চাই, চাই দিয়িছি।

উত্তেজনায় কোন্‌টা যে আগে জানাতে চায় তা নিজেই বুঝতে পারে না দেখে লেখাদি থামিয়ে দেন। জিজ্ঞেস করেন—

তা আমাদের ছেলেরা কী ভয় পেয়েছে? কে তাদের পাড়ার বাইরে থাকতে বলেছে। অর এল.এম.এ. আসবে আসুক না। একবার যখন ঘা খেয়েছে তখন পাড়ায় ঢুকলেও আর বিশেষ তড়পাতে পারবে না। তাছাড়া কেসের রায়ও বেরুবে খুব তাড়াতাড়ি ওনিয়ে তোমায় ভয় পাবার কিছু নেই চাচি। তা মেয়ের কথা কী বলছিলেন?

সি দিদি অনেক কতা। চোদ্দ বচ্ছরে মেয়ের বিয়ে দিয়িছি। তিন বচ্ছর হয়েছে গো দিদি, এখুনো ছেলেপুলে হয়নি। মোর জামাইকে কারা নেগ্নেছ— মোর মেয়ে নাকি বাঁজা। এই লিয়ে গো দিদি মেয়েটারে খালিখালি মেরে তাড়িয়ে দেয়। কত করে বুজাই—আর কিছুদিন সবুর করো না বাবা। মুই আল্লার কাছে কত করে দোয়া মানচি আল্লাপাক ঠিক তোদের সোন্তান দেবে। মোর মেয়ের বয়স কিছুই লয় বাবা। অর জুড়ি অলেক মেয়ের এখুনো সাদিই হয়নি।

দু চারদিন চুপ করে থাকে গো দিদি। ফের যে কে সেই।

তা আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথা?

ওই তো গো দিদি কুড়ুলে।

তা কুড়ুলিয়ায় যখন আপনি তো মানসদাকে চেনেন, তাকে জানাননি?

মানুস কী অকে কম বুজান বুঝাইছে গো দিদি! চিক্কিসে করার টাকাও দিয়েছিল—খারাপ লোগের পাল্লার পড়েছে গো দিদি। কারু কতা শুনতে চায়নি।

সব শুনে লেখাদি জানান—

ঠিক আছে চাচি। আমি এব্যাপারেও মানসদার সঙ্গে কথা বলব। ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা আছি একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যান, বাড়ি গিয়ে আমাদের ছেলেদের বোঝান—এখন যেন কোনোরকম গোলমাল না করে।

একমাস পরে ফতেমার মার দাওয়ায় বসানো ডেগের আওয়াজ ছাপিয়ে মিছিলের কণ্ঠ শোনা গেল! দাওয়ায় দুটো 'ঢাড়ড়া' ফেলে পাড়ার ছেলেছোকরাদের নিয়ে জরির কাজ তোলে ফতেমার মা। একাজে পঁয়ষট্টি কেন, পঁচাত্তর ডেসিবেলেরও জোরে ডেগ না বাজালে চলে না। কী বাজছে বড়ো কথা নয়, একটা কিছু চলতেই হবে। শুনতে শুনতে তারও অভ্যাস হয়ে গেছে। ফতেমা চলে যাবার পর থেকেই ভীষণ একা। এখন তবু ছেলেগুলো আসে হৈ হৈ করে ঘর ভরিয়ে রাখে। আওয়াজটা আর একটু স্পষ্ট হতেই ডেগটা থামিয়ে দেওয়ায় সকলের হাত বন্ধ। ফতেমার মাকে কিছু বলতে হয় না। অনেকেরই চোখ তখন উঠোন ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে। এম.এল.এ.কে সঙ্গে নিয়েই ঢুকেছে। মিছিলের সামনে এম.এল.এ.র গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটছে নাসের। আর একটু কাছে আসতে ফতেমার মা আবার ডেগের সুইচটা অন করে সকলের দিকে তাকাতেই আবার সকলে বসে যায় কাজে। লেখাদির নির্দেশ—

ওরা গণ্ডগোল পাকাতে চাইলেও এ-কদিন আমাদের চুপ করে থাকতে হবে।

মিছিলের আওয়াজকে ঢেকে দিয়ে ফতেমার মায়ের স্মৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেবার ফতেমার সাদি দেবার পর পাড়ার যেসব ছেলেরা বাইরে কাজে গিয়েছিল সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ভীরু লোকগুলোকে একটা কথা বলতে দেওয়া হয়নি। ডাকাবুকো ছেলেগুলোকে সামনে রেখে সে কী লড়াই! একসময় ছেলেবুড়ো মেয়েরা যখন লাঠিসোটা, কাঠারি, কাস্তে, ঝাঁটা বঁটি নিয়ে বেরিয়ে এল তখন কাদের সেখের দল বন্দী গোলামদের বেগুনডাঙায়। বাধ্য হয়ে কয়েকটা হাতেগড়া পেটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিল। দু'বছর পাড়ায় ঢোকার সাহস দেখায়নি। দুবার এসেছিল এরকম মিটিং করতে নেতাদের নিয়ে; আর ওই মাসখানেক আগে পাড়ায় ঢুকে শাসিয়ে গিয়েছিল।

যেন একটা ঘুমিয়ে পড়া গ্রামের মাঝখান দিয়ে মিছিলটা শেষপ্রান্তে সেখদের বাড়ির সামনে একটা সভা করেছিল। ঘুমিয়ে থাকলেও ছেলেরা ঠিক খবর এনেছিল—এম.এল.এ. নাকি বিশেষ কিছু বলেননি। মিলেমিশে থাকার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

পরবর্তী কেসের দিন যতই কাছে আসছে ততই কাদের সেখের দলের যেন টু শব্দ নেই। কোনো জাদুকাঠির খেলায় বিষাক্ত সাপেরা যেন বাস্তুসাপ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে ওদের ভালমানুষীর খপ্পরে পড়ছে অনেকে। পঞ্চাশোর্ধ ফতেমার মা স্বামীকে হারিয়েছে দশবছর। তার কয়েক বছর পর থেকেই এই ঝামেলা। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও এবারের দিনটার জন্য ফতেমার মাও অপেক্ষায় আছে। জামাই-এর কুইঙ্গিত মনটাকে আরও অস্থির করে তুলেছে। এতগুলো বছর এই ঝামেলা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে শত্রুপক্ষও কখনো এমন ইঙ্গিত করেনি। বয়সে খুব বড়ো ছিল না। সবাই ওকে কালামচাচাই বলত। কতবার বাড়িতে এসেছে, জলখাবার খেয়েছে এমন কথা কখনোই মনে আসেনি। —মেয়েটারে আর কত দুখখু দেবে আল্লা!

আবছা অন্ধকারে দুটো শরীরের ছায়া চমকে উঠে ফতেমার মা। কাজ ছেড়ে ছেলেরা সব বাড়ি চলে গেছে। প্রতিদিন এই রাত দশটার পর বাড়িটাকে বড়ো ফাঁকা মনে হয়। ফতেমাও সেই থেকে আর আসেনি। এই রাতটুকু মেয়েটার ভাবনাতেই কাটে। এসময় বাড়ির উঠোনে দুটো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল কেন? একটা তো খুব চেনা মনে হয়—কালামচাচাব ছেলে নাসির। কিন্তু ওই ছায়াটা? আর নাসিরই বা ওর সঙ্গে কেন?

বাড়ির পিছনের নিমগাছটার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কালই তো কেসের দিন। ভুল দেখছে না তো! কদিন চিন্তায় শরীরটা একটু গরম হয়ে উঠেছে। ফতেমার কথা তো দু'দিন ভাবাই হয়নি। সদাসর্বদা ওই এক চিন্তা—একটা অন্যায়ের পিত্তিকার আল্লা নিশ্চয়ই করবে।—এই ভাবনাটাই বড়ো হয়েছে। হঠাৎ পরিচিত ছায়াটা নড়ে উঠে ডাকতে শুরু করল—

ভাবি একবার শুনবে?

দুবার ডাকটা শোনার পর সম্বিৎ ফিরে পায়। ঠিকই তো, নাসিব আর সঙ্গে কাদের সেখ। তার মানে তিনমাসে জল গড়িয়েছে অনেক দূর। কাজের ছেলেরা দু'একবার কথাটা তুলেছিল বটে পাত্তা দেয়নি। দেখা যাক ওদের মতলোভটা কী? হায় আল্লা কোনো লজ্জায় বাপের খুনির সঙ্গে ঘুরে বেড়াস—এঁটো কুত্তার জাত। ইচ্ছে করে কপাটটা সজোরে আওয়াজ করে বেরিয়ে আসে ফতেমার মা। বলে—

'কী বলবে লাসির?'

বলছিলাম ভাবি কাল তো কেসের দিন। কাদের চাচা বলছিল—মোরা তোর হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি নাসির। একটা বড়ো অন্যায় মোরা করে ফেলেছি। তোর আব্বাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবনি। তুই মোদের ক্ষমা করে দে। মোরা তোকে সাধ্যমত দেবো। শ্মশানতলায় যে পাঁচ বিঘাটা আছে তোকে লিখে দেবো। আর ভাবিরও তো অনেক খরচ-পাতি হযেছে, নাসের বলেছে, তার তিন বিঘেটাও ভাবির নামে করে দেবে। পাড়ার মধ্যে মোবা যে যা পার্টিই করি, সবাই একসঙ্গে থাকবো!

এতটা শুনতে পারবে ফতেমার মা ভাবতেও পার্বেনি। একটা উত্তপ্ত অগ্নিশিখা মাথাব মধ্যে এলোমেলো ছোটাছুটি করতে করতে পায়ের দিক থেকে একটা শীতলতা ওকে অসাড় করে দিচ্ছিল। নইলে চিৎকার করে সকলকে ডাকল না কেন? নাসিরের গালে একটা থাপ্পড় আছড়ে পড়ল না কেন? টলতে টলতে কপাটটা খিল দেবার আগে একটা ক্ষীণকণ্ঠ গোঁ গোঁয়ানি হুঙ্কারে বলে উঠল—

ফতেমার মা এখুনো মরে যায়নি লাসির। আল্লা একটা অল্যায়ের পিত্তিকার ঠিক কববে।

কুড়ুলিয়ার মিলাদে দু'চার মাইল দূর থেকেও লোক এসে জড়ো হয়। মৌলানা আলম বক্স মিলাদের বক্তৃতায় বেশ নাম করেছেন। বক্তৃতার মাঝে তার বিশেষ সুরের আবেগ রেশটুকু ধরে রাখে অনেকক্ষণ। আজ মিলাদের বক্তৃতার বিষয়—

সাদি ইসলামে এক পবিত্র কর্ম আছে...এ...এ। আল্লাতালা রহমোতুল্লায় দোয়ায় এই যে সৃষ্টির বাগিচা মোদের ঘর সংসারকে ভরিয়ে রেখেছে তাকে মোরা খোদার বান্দা হিসাবে মেনে চলি...ই...ই। আর যে মোসলমান সাদি করেও সোন্তানের মুখ দেখতে পায় না, আব্বা ডাক শুনতে পায় না, তারা আল্লার কুদ্‌রত্‌ থেকে বঞ্চিত আছে...এ...এ। এখানে আল্লাতালা কী বলছে তবে? বলছে, সোন্তানাদি না হওয়ার কারণে যদি কোনো মোসলমান পুনর্বার সাদি করে তবে আল্লা তার গুণাহ্‌ মাপ করে দেবে...এ...এ।

মিলাদ শুনতে শুনতে মাথা নীচু করে বসেছিল লতিব। সাড়ে তিনবছর হল সাদি করেছে, ফতেমাব পেটে একটা বাচ্চা জন্মাল না। এইজন্যেই তো মাঝে মাঝে মাথায় খুন চেপে যায়।

মারতে মারতে জোর করে কখনো ধর্ষণ করে। কিছুতেই কিছু হয় না। ভাবতে ভাবতে লতিব উঠে যাবার ধান্ধা করছিল। হঠাৎ খপ্ করে হাতটা ধরে টেনে নিয়ে গেল মুজিবর মৌলবি ও শ্বশুরবাড়ির কাদের সেখ বলে লোকটা। ফতেমা কাল তাকে বলেছিল—এবার নাকি ওদের জেল হবেই। ওর মা খবর পাঠিয়েছে—

তুই আর কটাদিন মুখ বুজে থাক্ মা। এবার একটা ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব। রেগে উঠেছিল লতিব—

ও তার মানে এবার মোকে শায়েস্তা করতে আসবে নাকি?

ফতেমা পরের কথাগুলো শুনতে চায়নি, ঝট্ করে সরে গিয়েছিল। অন্যমনস্ক লতিব প্রায় চমকে উঠেছে। কাদের সেখ ও মুজিবর মৌলবি ওকে নিয়ে এসেছে মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায় বসে আছে কিছু গণ্যমান্য লোকজন আর একপাশে মাথায় হাত রেখে কাদেরের ভাই নাসের। লতিব প্রায় হতভম্ব। ওকে বসিয়ে দেওয়া হল সবার মাঝখানে। মুজিবর মৌলবি এবারে কানের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল—

এ সুযোগ হাতছাড়া করিসনি লতিব। এ একেবারে যাকে বলে ফলন্ত গাছ। একটা বছর কাছে রাখলে তোর আব্বা হওয়া কে আটকায়।

লতিব দেখল কাদের সেখ ও আরও কয়েকজন তাকিয়ে আছে ওর দিকে, আর অন্যরা ক্রুর দৃষ্টিতে দেখছে নাসেরকে। কাদেরের চোখে হতাশার ছায়া, তবু একটা প্রত্যাশা নিয়েই তাকিয়ে। ও যে তখন ঠিক বুঝতে পারেনি অনুমান করে কাদের বলল—

এতটা দূর থেকে এসেছি। এখন তুমি মোদের একমাত্র ভরসা। ভাইটা রাগের মাথায় বিবিজানকে তিন তালাক দিয়ে বসেছে। এখন তুমি যদি ওর বিবিকে 'ইদ্দত' কাল রাখ, তবে আল্লা তোমায় দোয়া করবে।

'তালাক' আর 'ইদ্দত' শব্দে আচ্ছন্নতা কেটে গেল বটে কিন্তু লতিব ভাবল,-না, সে অন্যের সাদি করা বিবিকে ঘরে নিয়ে যাবে না। ওকে নিরুত্তর দেখে হঠাৎ নাসের সকলকে অবাক করে এক কাণ্ড করে বসে। লতিবের পা জড়িয়ে ধরে—মোর বিবিজান বড়ো ভালো। মুই রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দিয়িছি। এখুন মৌলবি বলতেছে ই ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

লতিব তাকিয়ে দেখে সবকটা চোখ ওর রায় শোনার জন্য একদৃষ্টে তাকিয়ে। মুজিবর এবং মুশায়েরা আবার কানের কাছে মন্ত্রণা দেয়—

এ সুযোগটা ছাড়িস্নি, তোর বিবি বাঁজা, ইটাকে রাখ, আব্বা ডাক শুনতে পাবি।

ফতেমা জানত এমন একটা কিছু ঘটবে। তবু স্বামীর সঙ্গে বোরখা পরা যে মেয়েটা রাতে ঘরে ঢুকল হ্যারিকেনের আলোয় সেই তিন ছেলের মাকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিল। প্রতিবাদে ঘর থেকে টেনে বের করে সমস্ত বাসনপত্র, জামাকাপড়, বিছানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল চাঁদের আলো ছড়ানো উঠনে। তারপর দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিটা ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়েছিল। দজ্জাল মায়ের মেয়ে হলেও ফতেমা নীরব, অভিমানী। প্রকৃতি কেন যে তাকে এভাবে গড়েছিল! সংসারের এই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নীরব অভিমান যেন খাপ খায় না।

লতিব যেন কিছুই ঘটেনি, এমন একটা ভাব দেখিয়ে চাঁদের আলোয় ঝক্‌মক্ করা ফতেমার মায়ের জরির নক্সা করা চাদর-বিছানা কুড়িয়ে এনে নতুন বিবিজানকে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

দাওয়ার খুঁটি ধরে কাঁদতে কাঁদতে অনেক রাতে ঘরে ঢুকেছিল ফতেমা। নির্লজ্জ পুরুষটা নতুন বিবির গায়ে ঠ্যাং তুলে ঘুমোচ্ছে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল বিছানাসুদ্ধ দুজনকে টেনে মেঝেতে ফেলে দিতে। মাগিটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে। শান্ত প্রকৃতির মেয়েটা তা পারেনি। মায়ের দেওয়া ছোটো সুটকেসটা মাথায় নিয়ে

নীরবে বেরিয়ে এসেছিল। ভোর রাতে মায়ের দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রথমে হাঁউমাউ করে পরে সব কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফতেমার মা বলল—

শত্তুর! শত্তুর! এমন কাল শত্তুরের হাতে মেয়ে দিয়েছিনুন মুই!

তা, পেলিয়ে এয়েছো, বেশ করেছো। মোক উদ্ধার করেছো। মোর প্যাটের মেয়ে হয়ে তুই ই-ভাবে চলে এলি! অমন শত্তুরের মুয়ে (মুখে) নুড়ো গুঁজে দিয়ে এলি তো পারতিস্। মোর কাচে এসে ফোঁ ফোঁ করে কান্তিছিস্, তা মুই কী করব? আল্লা! এক মুহুত্তও মোর সোয়াস্তি পাবার জো নেই।

ফতেমা দুদিন ভোর দাঁতে কুটো দিয়ে পড়ে আছে। জেলে যাবার আগে কাদের ও নাসেরের এ যেন একটা অদ্ভুত চাল। বাইরের শত্রুর সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করা যায় কিন্তু নিজের বোনের ছেলে, জামাই! ফতেমার মা মেয়েকে বোঝায়—

কানতিছিস কেন? খেয়ে নে মা। লেখাদিকে লিয়ে, মানুষদাকে লিয়ে, ভালো-মন্দ লোকদের লিয়ে একবার বুঝাবার চিষ্টা করব, না বোঝে অকেও মুই জেল খাটাব।

তিন সপ্তাহের মাথায় লতিব এসেছিল ফতেমার কাছে মাপ চাইতে। ভেবেছিল দুপুরে হয় খালা থাকবে না, নয়তো ঘোমবে। সেই সুযোগে ফতেমাকে বুঝিয়ে চুপি চুপি নিয়ে চলে আসবে। ফতেমাকে তো ও বোঝে। একটু নরম হলেই ও একেবারে গলে পড়বে। কিন্তু দাওয়ায় পা দেবার আগেই ফতেমার মা'র মুখোমুখি হতে হয়। তাও অপরাধ স্বীকার করে ফতেমাকে নিয়ে আসার কথা তুলেছিল। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। আগুনে ঘি ঢালার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে জামাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে ফতেমার মা। ছেলেটাকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ে জমাটবাঁধা ক্রোধের পাহাড় কিছুটা হাল্কা হয়েছিল বটে, তবু দুঃশ্চিন্তায় ফতেমার মা ঘোমাতে পারেনি। মেয়েটার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে না তো? তাই সকাল না হতেই ছুটে গিয়েছিল লেখাদির কাছে। লেখাদি অনেক রাত করে শোয়। একটু বেলা গড়াতে তবে ফতেমার মা লেখাদিকে জাগায়—

কী গো চাচি, আবার কিছু হল নাকি, এত সকাল-সকাল?

তার কাছে খবর ছিল গতরাতে পুলিশ কাদের ও নাসেরকে তুলে নিয়ে যাবে। ভেবেছিল সেই খবরটা বুঝি চাচি জানাতে এসেছে। এতদিনের একটা লড়াই। ফতেমার মায়ের জন্য গর্ব হয়, শ্রদ্ধা করতে হয় এদের। আপাতত তিনমাসে ওরা কোর্টে বেল পাবে না। ফতেমার মা বলল—

জামাই এইছালো গো দিদি! বলে কী, মেয়েটারে পেট্টে দাও!

মুই বলিচি, উসব হবেনি, আগে সিটারে ছাঁটকাট করো!

দিদি গো সি কী বুঝান বুঝাচ্ছে। বলে কী—

অ মোর পয়লাকারের পরিবার। অকে কী মুই ভুলতে পারি। আ চলে আসায় মোর সব বিরান হয়ে গেছে। নারকেল গাছে নারকেল হয়নি, কাঁঠাল পড়েনি, সব্বের গাছে আম হয়েছে, মোর গাছে হয়নি।

বলতে বলতে ফতেমার মাও হেসে ফেলে। লেখাদির হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। কথাগুলো বিশ্বাস্য করে তুলতে ফতেমার মা হাসতে হাসতে আবার বলে—

হ্যাঁ গো দিদি! সি কী বুঝান বুঝাচ্ছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গলার স্বর একেবারে নিখাদে নিয়ে গিয়ে লেখাদির আর একটু কাছ ঘেঁষে বলে—

আর বুঝাবেনে কেন গো দিদি, মোর মেয়ে মোর মতো ঝাঁঝিয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তুন বোকা লয়। মোর মেয়ে অর ই. লাই. সি.-র কাগজপত্তর, রেশনকার্ড, জমির দলিল—সব লিয়ে পেলিয়ে এসেছে।

তারপর দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ে। মেয়ে এস হাঁউ মাঁউ করে কান্না জুড়ে দেওয়ায় ফতেমার মা ওকে বকেছিল বটে, কিন্তু মেয়ের বুদ্ধিকে সেও তারিফ করেছে।

সকাল হতে না হতেই মা কোথা বেরিয়ে গেছে। রাত থেকেই শরীরটা কেমন কেমন করছে। কেমন যেন অম্বল অম্বল ভাব। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মাথাটা হঠাৎ একবার ঘুরে গিয়েছিল। ফতেমা বসে বসে সেই থেকে মায়ের কথাই ভাবছিল। পাড়ার সবাই বলছে কাল কখন নাকি পুলিশ এসে কাদের, নাসেরকে ধরে নিয়ে গেছে। কেসের রায় শোনার পর থেকে পাড়ায় মায়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। যারা মাকে আড়ালে আবডালে টিটকারী করত তারাও এখন প্রশংসা করছে। কালাম চাচা মার্ডারের পরে যে ভয়, উত্তেজনা এতদিন সমস্ত গ্রামকে আচ্ছন্ন করে রাখতো সেই ভয় কেটে যাবার একটা সুখ সবাই অনুভব করছে। গত কয়েক মাসে ওদের নেতিয়ে পড়া ভাব সে সুখের আভাস দিচ্ছিল ও একবার, এখন অ্যারেস্ট করে তুলে নিয়ে যেতে যেন হইচই পড়ে গেছে। এ সময় এ একবার মায়ের খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের দুঃখের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল। আবার হঠাৎ গা-টা গুলিয়ে ওঠায় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল—

হায়! হায়! কি হল গো মেইছেলের। এমন করে লেতিয়ে পড়তিছিস্ কেন মা।

দু-হাত জড়িয়ে ধরে ফতেমাকে উঠোনের একপাশে নামিয়ে দিতেই বমি করে ফেলে। মুখে চোখে জল দিয়ে ভালো করে মাথা মুছিয়ে মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শরীরের লক্ষণ দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়ে ফতেমার মা। মেয়েকে আর তখনি কিছু জানায় না। আদব করে বিছানায় শুইয়ে বলে—

চুপ করে শুয়ে পড়ে থাক্ মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকে বলে পাপ কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। সুখবরও কী লুকিয়ে রাখা যায়? বিশেষত যে পরিবার একটা সন্তানের আশায় অনেকদিন অপেক্ষার দিন গুনেছে। সমাজে যার নিন্দে রটে গিয়েছিল বাঁজা বলে, তার সন্তান সম্ভাবনার খবর বুঝি বাতাসও দশ-বিশ মাইল ছড়িয়ে দেয়। এভাবে উঠো কানে খবরটা এসেছিল লতিবের কাছে। শোনামাত্রই বিশ্বাস করেনি। বারবার অসহায় ফতেমার মুখখানা মনে পড়েছে। নাসেরের জেল যাবার খবর পেয়ে নতুন বিবিজানও দু-দিন হল প্রায় নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেছে। রাতবেলায় বিছানায় এককোণে হাত-পা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। লতিবও কিছু বলতে পারে না। প্রথম দু-দিনের পর থেকেই লতিব বুঝেছে একটা অসহায়তা নাসেরের বিবিকে কুঁকড়ে রাখে। ওব ওই অসহায়তা লতিবের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দেয় একটা অপরাধবোধের যন্ত্রণা। একসঙ্গে থাকলেও দু-জন দু-জনকে সেই থেকেই দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। লতিবের বারবার মনে পড়ে ফতেমার কথা। তাই একদিন ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু খালাকে কিছুই বোঝাতে পারেনি। এখন সন্তানের খবরটা যদি সত্যি হয়, তবে খালার হাতে-পায়ে ধরে হলেও ফতেমাকে ফিরিয়ে আনবে। আর কটাদিন পরেই তো নতুন বিবিজানের ইদ্দতের দিন শেষ হবে। নতুন বিবিটাকে রেখে আসবে তার পুরনো শ্বশুরবাড়িতে।

নির্জন দুপুরে ফতেমা দাওয়ায় বসে তৃষ্ণার্ত চাতকের ডাক শুনতে পায়। পাখির ডাক শেষ হলে নিজেও সুর করে ডাকে—ফটিক..... জল। ফটিক......জল। ভাবে—

আল্লা অর ডাক শুনতি পেয়ে আকাশ থিকে পানী দেয়। পৃথিবীর পানীতে অর জান ঠাণ্ডা হয় না।

ফতেমার গলা শুকিয়ে আসে। বারবার উঠে উঠে পানী খেতে ওর ভালো লাগে না। মায়ের কড়া হুকুম—

এসময় কক্‌খনুই দুপুরবেলা ডাঙায় বেরুস না। জিনে লজর দিলে ছেলের রক্ত শুষে খাবে।

ফতেমার বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো বন্ধ। স্বামীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যায়--

নাসেরের বিবিটাকে নিয়ে আছে। অপমানে, ঘেন্নায় গা রি রি করে ওঠে। দু-বছর ধরে কত সোহাগের কথা বলেছে। তারপর একদিন নামাজ পড়ে ফিরে এসেই বদলে গিয়েছিল। ফতেমা বুঝতে পারত ইচ্ছে করেই সারাদিন আর বাড়ি ফিরত না। রাতের বেলা জোর করত আর কী সব বিড় বিড় করে বলত। ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকারটুকু হারিয়ে নীরব কান্নাই সার হয়েছিল। হঠাৎ ওর মনে হয়, নাসেরের বিবিকে ঘরে এনে ভালোই হয়েছে। পালিয়ে আসার এমন সুযোগ কী লতিব ওকে দিত! ফতেমা পানী খেতে ঘরে ঢুকেছে, ভাবছে—আকাশের পানী আর কোথা থেকে পাবে, মেটে কলসীর পানী খেয়েই গলাটা ভিজিয়ে নিক্। পানীর গ্লাসটা গলায় ঢালতে যাবার মুহূর্তে শুনতে পেল—একটা ক্ষীণ কান্না জড়ানো কণ্ঠস্বর—

ফতেমা, মোকে ক্ষমা করে দে, ফতেমা। বয়সে অনেকটা ছোটো বলে লতিব কখনো ফতেমাকে তুমি বলত না। ভয়ে ভয়ে কখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে কিছুটা আড়াল থেকে ফতেমাকে দেখছিল। তীক্ষ্ণ চক্ষু চালিয়ে দেখতে চাইছিল সত্যিই পেট্‌টে উঁচু হয়ে উঠেছে কিনা। ফতেমা উঠে দাঁড়াতে স্পষ্ট বুঝতে পারে ফতেমার শরীরটা সতিাই কেমন যেন ভরপুর হয়ে উঠেছে। খুব বড়ো হয়ে ওঠার আগে এই ভরা শরীরটা যে এত আশ্চর্য সুন্দর দেখতে হতে পারে লতিব কল্পনাও করতে পারেনি। তখনই অপরাধবোধটা প্রবল হয়ে ওর গলাটা কান্নায় বুজে এসেছিল।

আশ্চর্য ফতেমা কিন্তু একটুও নরম হল না। জলের গ্লাসটা শূন্য করে বলল—তুমি আবার ইখানে এইচ কেন? তোমার কাগজপত্তর লিতে বুঝি? বলে গট্ গট্ করে ঘরে ঢুকে গেল। লতিব বলতে যাচ্ছিল—

এখন তোর এভাবে রেগে যাওয়া ভালো নয়, একটু সামলে চলাফেরা করা উচিত।

কিন্তু ফতেমার মূর্তি দেখে আর বলতে পারল না। মাতৃত্ব যে এমন ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে লতিব তা জানত না। গতরাত থেকে কত করে ভেবে তবে এসেছে।

যেকোনো প্রকারে ফতেমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ওকে রাজি করাতেই হবে।

কতবার মেয়েটার মান ভাঙিয়েছে। ওর মনের মধ্যে এমন একটা নরম মাটি আছে, যাকে ছুঁতে পারলে ও কোনো কথাই অবিশ্বাস করে না।

কখনো কখনো মিথ্যা অভিনয় করেও ওর বিশ্বাস জয় করি নিয়েছে। আজ তো ওকে মিথ্যা অভিনয় করতে হচ্ছে না। ও তো সত্যিই অনুতপ্ত। তবুও ফতেমা এভাবে সরে দাঁড়াচ্ছে। যদি ফতেমাকেই রাজি করাতে না পারে তবে খালার কাছে দাঁড়াবে কী করে? ভরসা ছিল—খালার পায়ে ধরে ও ক্ষমা চাইবে। ফতেমা কাঁদতে কাঁদতে ওর কাছে ফিরে যেতে চাইবে—তাহলে আর খালা না করতে পারবে না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে লতিব।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে ফতেমা। লতিবের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় তার এল. আই. সি.-র প্রিমিয়ামের রসিদ, জমির দলিল আর রেশন কার্ড। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে খুঁটি ধরে বসে পড়ে। কান্নার স্বর ধীরে ধীরে নেমে আসে গোঁ গোঁয়ানিতে।

উঠোন জুড়ে অর্থময় পৃথিবীর মানপত্রগুলো হাওয়ায় সরে সরে যাচ্ছে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে লতিব। ফতেমার কান্নার স্বর তিরের মতো শিরায় শিরায় বিঁধছে। মনে পড়ছে তার মায়ের কথা। মা ছিল এমনই অভিমানী। আব্বার অত্যাচার সহ্য করত নীরবে। রাতের অন্ধকারে মাও এভাবে কাঁদতো। এখন শুধু ফতেমার কাছে নয়, লতিব ক্ষমা চাইছে আল্লার কাছে—

তোমার বান্দারে তুমি ক্ষমা করো, আল্লা!

টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে পায়ের পাতায়।

ফতেমার মা ফিরেছিল একটু পরেই। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ছড়িয়ে পড়া কাগজপত্তরগুলো কুড়ানো শেষ করে বলল—

উঠোনে দাঁড়িয়ে কেন বাবা। ঘরে এসো। তুমি তো শুধু মোর জামাই লয়, মোর বুনের ছেলে।

সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি

নগেন্দ্রবালা দাসী : জন্ম : ১২৮৪, হুগলির পালপাড়ায়। মৃত্যু : ১৩১৩।

স্বর্ণকুমারী দেবী : জন্ম : ১৮৫৫। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বসন্ত-উৎসব', 'হুগলীর ইমামবাড়ী', 'নবকাহিনী', 'স্নেহলতা' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৩২।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী : জন্ম : ১৮৬১। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'চোরবাগানে', 'শুভবিবাহ', 'শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯২০।

মানকুমারী বসু : জন্ম : ১৮৬৩, যশোরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রিয় প্রসঙ্গ', 'হারানো প্রণয়' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৪৩।

সুশীলা সেন : জন্ম : ১৮৬৫। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'অশ্রুমালিকা'। মৃত্যু : ১৯২৮।

হিরন্ময়ী দেবী : জন্ম : ১৮৭০। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'সখা', 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মৃত্যু : ১৯২৫।

হিরন্ময়ী বসু : জন্ম : ১৮৭০। পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গল্প। মৃত্যু : ১৯২৫।

সরলা দেবী : জন্ম : ১৮৭২। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'জীবনের ঝরাপাতা' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৪৫।

সরলাবালা দাসী : জন্ম : ১৮৭২ কলকাতায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'মিরণ'। মৃত্যু : ১৯৩৯।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : জন্ম : ১৮৭৩। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নারীর উক্তি', 'বাংলার স্ত্রীআচার', 'পুরাতনী', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৬০।

সত্যবাণী গুপ্ত : জন্ম : ১৮৭৩। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পিঞ্জরের বাহিরে'।

সরলাবালা সরকার : জন্ম : ১৮৭৫, নদিয়া। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নিবেদিতা', 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'পিঙ্কুর ডায়েরী', 'হারানো অতীত' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৬১।

সরোজকুমারী দেবী : জন্ম : ১৮৭৫, ভাগলপুরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'হাসি ও অশ্রু', 'শতদল', 'অশোকা', 'কাহিনী', 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানী' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯২৬।

ইন্দিরা দেবী : জন্ম : ১৮৭৯, কলকাতায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ফুলের তোড়া', 'স্পর্শমণি', 'নির্মাল্য', 'কেতকী', 'শেষদান' ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯২২।